ভারতকোষ

চতুর্থ খণ্ড

দই - ফ্লেমিং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ভারতকোষ

চতুর্থ খণ্ড

দই - ফ্লেমিং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলকাতা - ৬

মূল্য: ৫৫.০০

ভারতকোষ

চতুর্থ খণ্ড

মূল্য দশ টাকা

ভারতকোষ

চতুর্থ খণ্ড

দই - ফ্লেমিং

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র
শ্রীআদিত্য ওহদেদার
শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীচিন্তামণি কর
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
শ্রীনির্মলকুমার বসু
শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী
শ্রীবিনয় দত্ত
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীসুকুমার সেন
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক

শ্রীঅশোকা সেনগুপ্ত
শ্রীউষা সেন
শ্রীকামিনীকুমার দে
শ্রীদেবজ্যোতি দাশ
শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়
শ্রীসুধেন্দুপ্রসাদ বসু

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

কলিকাতা

ব্যবস্থাপনা-সমিতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীনির্মলকুমার বসু
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কর্মসচিব

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রকাশন-সহকারী

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীরাধামাধব তর্কতীর্থ
শ্রীদীপ্তি সমাদ্দার

সহায়ক

শ্রীমিনতি দাশগুপ্ত
শ্রীযুথিকা চক্রবর্তী
শ্রীনিমাইচাঁদ দে
শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কর্মী

শ্রীপাঁচুগোপাল ধাওয়া
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নতিবিধানকল্পে প্রদত্ত সরকারি অর্থানুকূল্য লাভের ফলে পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করা হইয়াছে।

বিশিষ্ট সহায়কবৃন্দ

ভারতকোষ চতুর্থ খণ্ডের প্রসঙ্গনির্বাচন, তথ্যসংকলন, রচনাসম্পাদন এবং প্রকাশনা বিষয়ে ইঁহারা সম্পাদকমণ্ডলীকে সাহায্য করিয়াছেন :

আচার অনুষ্ঠান

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ

দর্শন

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণা রায়চৌধুরী
শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য
শ্রীরমা চৌধুরী

ভাষাতত্ত্ব

শ্রীদীপংকর দাশগুপ্ত
শ্রীসুহাস চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য

শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
আঁতোয়ান, ফাদার রবেয়ার
শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
শ্রীপুলিনবিহারী সেন
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীব্রহ্মানন্দ গুপ্ত
শ্রীভবতোষ দত্ত
শ্রীসংযুক্তা গুপ্ত

অর্থনীতি

শ্রীঅজিতকুমার বিশ্বাস
শ্রীঅমিয় বাগচী
শ্রীঅশোক মিত্র
শ্রীঅশোক সেন
শ্রীশক্তিব্রত সরকার
শ্রীশ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী
শ্রীসঞ্জিত বসু

আইন

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূগোল ও গেজেটিয়ার

শ্রীঅভিজিৎ গুপ্ত
শ্রীঅসিতকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীকমলা মুখোপাধ্যায়
শ্রীতারাপদ মাইতি
শ্রীদিনেনকুমার সোম
শ্রীবীণাপাণি মুখোপাধ্যায়
শ্রীসৌগতপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞান

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅজিতকুমার চৌধুরী
শ্রীঅজিতকুমার সাহা
শ্রীঅনিলকুমার আচার্য
শ্রীঅনিলকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য
শ্রীঅরূপকুমার সিংহ
শ্রীআরতি দাশ
শ্রীকপিল ভট্টাচার্য
শ্রীকমলকুমার মল্লিক
শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীতিমিররঞ্জন সর্বাধিকারী
শ্রীত্রিগুণা সেন
শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী
শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী
শ্রীপদ্মনাভ দাশগুপ্ত
শ্রীপরিমলবিকাশ সেন
শ্রীপরিমল রায়
শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক
শ্রীবাসন্তিকা লাহিড়ী
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবেদান্তকুমার সিংহ
শ্রীভাস্কর চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমনীষা বসু
শ্রীমহাদেব দত্ত
শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ

শ্রীরঙ্গলাল ভট্টাচার্য
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
শ্রীরমাতোষ সরকার
শ্রীশক্তিকান্ত চক্রবর্তী
শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায়
শ্রীশ্যামলকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীসত্যময় মুখোপাধ্যায়
শ্রীসত্রাজিৎ দত্ত
শ্রীসন্তোষকুমার পাইন
শ্রীসীমানন্দ অধিকারী
শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য
শ্রীসুবিমল দেব
শ্রীসুব্রত রায়
শ্রীসুরজিৎ সিংহ
শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র
শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য

চলচ্চিত্র

শ্রীকরুণাশংকর রায়
শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত
শ্রীধ্রুব গুপ্ত
শ্রীমৃগাঙ্কশেখর রায়

নাট্য ও রঙ্গমঞ্চ

শ্রীকুমার রায়
শ্রীকৌস্তুভ মুখোপাধ্যায়
শ্রীনির্মাল্য আচার্য
শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

চিত্রকলা

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য
শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীভাস্কর মিত্র
শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ক্রীড়া

শ্রীঅজয় বসু
শ্রীমুকুল দত্ত

ভারতকোষে অনুসৃত বর্ণানুক্রম

অ আ অ্যা ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড়
ঢ ঢ় ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম
য য় র ল শ ষ স হ

অ্যা স্বতন্ত্র স্বর হিসাবে আ-এর পরে গণ্য হইয়াছে, যেমন 'আহোম'-এর পর 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান'; কিন্তু য-ফলা + আ-কার-এর উচ্চারণ 'অ্যা'-এর মত হইলেও উহা যথাস্থানেই বিন্যস্ত হইয়াছে, তাই 'অগ্নিহোত্র'-এর পর 'অগ্ন্যাশয়'। ৎ স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে পরিগণিত না হইয়া হস্‌-যুক্ত 'ত'-রূপে গৃহীত হইয়াছে। বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ-কারান্ত ব্যঞ্জন হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়, তাই স্থলনির্দেশপ্রসঙ্গে কোনও বর্ণের হসন্ত ও অ-কারান্ত রূপের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয় নাই; যথা 'অকলঙ্ক'-এর পর 'অক্ল্যাণ্ড', 'উৎপলবংশ'-এর পর 'উত্তঙ্ক'। বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে 'ণ্ট' বা 'ণ্ড' ণ্‌ + ট বা ণ্‌ + ড হিসাবে উল্লিখিত হয় নাই, ন্‌ + ট ও ন্‌ + ড-রূপে গৃহীত হইয়াছে। তাই যদিও 'অণুবীক্ষণ'-এর পর 'অণ্ড'— তথাপি 'অ্যানেস্‌থেসিয়া-এর পর 'অ্যান্টিবায়োটিক্‌স' বা 'ইনস্থলিন'-এর পর 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েণ্টালিস্ট্‌স' দেওয়া হইয়াছে।

ভারতকোষের পঞ্চম খণ্ড

ভারতকোষের প্রকাশ পূর্বপরিকল্পিত চার খণ্ডের পরিবর্তে পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। এজন্য গ্রাহকদিগকে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত অগ্রিম মূল্যের অতিরিক্ত কিছু দিতে হইবে না; পৃথক পৃথক খণ্ডের ক্রেতাদিগের পক্ষে প্রথম তিন খণ্ডের প্রত্যেকটির মূল্য পূর্বনির্দিষ্ট ২০ টাকা হারে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের মূল্য প্রতি খণ্ডে ১০ টাকা হারে ধার্য হইল।

নির্মলকুমার বসু
সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে

সংকলন ও প্রকাশন -কার্যে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীইন্দ্রাণী রহমান, শ্রীগোপালদাস রায়, শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক, শ্রীতারকনাথ লাহিড়ী, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীনকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিঃশঙ্ক ঘোষ, শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত ('যুগান্তর'), শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীমুকুলিকা কোনার ও শ্রীহিরণকুমার সান্যাল। ইহাদের নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

লেখকবিবরণ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, শারীরবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/ নার্ভতন্ত্র ; নাসিকা ; প্রতিবর্ত ক্রিয়া ; প্লীহা

শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্তী, ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ পোতাশ্রয়

শ্রীঅজয় বসু, ক্রীড়া বিভাগ, 'যুগান্তর'/ নিসার, মহম্মদ ; পোলো

শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়/ নাটক, বাংলা

শ্রীঅজিতকুমার চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যাপক, শারীরবিদ্যা বিভাগ, বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজ/ পরিপাক ; পাকস্থলী ; পাচনতন্ত্র ; পিত্ত ; পিত্তস্থলী ; পেশী

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, কলিকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ/ ফাট্‌কা

শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্তী, কলিকাতা/ দেশাই, ভুলাভাই জীবনজী ; প্যাটেল, বল্লভভাই সর্দার ; প্যাটেল, বিঠলভাই

শ্রীঅধীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/ পুষ্যভূতিবংশ

শ্রীঅনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ/ প্রবাল ; প্রাণীবিদ্যা

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর, রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট অফ প্রাকৃত, জৈনোলজি অ্যাণ্ড অহিংসা, বৈশালী/ প্রভাকর মিশ্র

শ্রীঅনিন্দ্যকুমার পাল, ভূগোল বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়/ দিনাজপুর ; দুর্গাপুর ; নাসিক ; নেল্‌লুরু ; নোয়াখালি ; পদ্মা

শ্রীঅনিলকুমার আচার্য, ভারতীয় দশমিক সমিতি/ দৈর্ঘ্য-পরিমাপ

শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা-সহায়ক/ পহ্লবী ভাষা ; ফরাসী ভাষা ; ফিরদৌসি ;

শ্রীঅনিলকুমার কুণ্ডু, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাইজেশন/ নাগার্জুন সাগর ; নৈহাটি

শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সম্পাদক, 'গ্রন্থপরিক্রমা' / নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, কর্মসচিব, 'ভারতকোষ'/ প্রফুল্লকুমার সরকার ; প্রমোদকুমার ঘোষাল ; ফস্‌ফরাস

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ পহ্লব

শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন/ দশসালা বন্দোবস্ত ; দার্তোঁ, জর্জেস জ্যাক ; দূত ; ধনতন্ত্র ; ধনসম্পদ ; নির্বাচন ; নীলবিদ্রোহ ; নেহরু, জওহরলাল ; নেহরু, মোতীলাল ; প্রতিযোগিতা ; প্রুধঁ, পিয়ার জোসেফ ; ফরওয়ার্ড ব্লক

শ্রীঅমলকুমার ঘোষ, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ/ প্ল্যাস্টিক সার্জারি

শ্রীঅমলচন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজ/ পশুশালা

শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/ পালযুগ

শ্রীঅমিতা রায়, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন/ দামোদর উপত্যকা প্রকল্প

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, অধ্যক্ষ, বাণীপুর স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়/ নিবেদিতা

শ্রীঅমৃতানন্দ দাস, অর্থনীতি বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ দাবা ; দুর্ভিক্ষ

শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ/ পরিবার পরিকল্পনা ; পেপ্‌টিক আল্‌সার

শ্রীঅরুণকান্তি চট্টোপাধ্যায়, দীঘা উন্নয়ন কার্যালয়/ দীঘা

শ্রীঅরুণকুমার শীল, যক্ষ্মা বিভাগ, অল ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যাণ্ড পাব্‌লিক হেল্‌থ/ নিউমোনিয়া ; প্লুরিসি

শ্রীঅরুণচন্দ্র বসু, বিশ্বভারতী/ পিল্লৈ, চম্পক রামন

শ্রীঅরুণ মিত্র, ফরাসী বিভাগ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়/ দুমা, আলেক্‌সাঁদ্‌র১ ; দুমা, আলেক্‌সাঁদ্‌র২

শ্রীঅলকা চট্টোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন/ পদ্মসম্ভব

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/ দিক্‌পাল ; দিগ্‌গজ

শ্রীঅশোক বাগ্‌চী, ইন্‌স্টিটিউট অফ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ/ পাথুরি রোগ ; পোড়া ; পোলিও রোগ ; ফোড়া

শ্রীঅশোক মুস্তাফি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বারাসত গভর্নমেণ্ট কলেজ/ পন্থ, গোবিন্দবল্লভ

শ্রীঅশোকা সেনগুপ্ত, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি/ দয়ালবাগ ; দয়াল সিং ; দলীপ সিংহ ; দুর্গাচরণ লাহা ; দুর্গাদাস লাহিড়ী ; দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ; দ্বারকানাথ গুপ্ত ; নগেন্দ্রনাথ সেন ; ননীগোপাল মজুমদার ; নলিনীকান্ত ভট্টশালী ; নায়নার ; নিহাল সিংহ ; পরমানন্দ, ভাই ; পান্না, ধাত্রী ; প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজা ; প্রণবানন্দ, স্বামী ; প্রবর্তক ; প্রমথনাথ বন্দ্যো-

পাধ্যায়[১]; প্রসন্নকুমার আচার্য; প্রসন্নকুমার রায়; প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ

শ্রীঅসিতকুমার দত্ত, গবেষক, ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ ধোঁয়া; পরিবর্ধক

শ্রীঅসীমকুমার চক্রবর্তী, গবেষক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়/ নেকড়ে বাঘ

আঁতোয়ান, ফাদার রবেয়ার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ ফ্লবেয়ার, গুস্তব

শ্রীআদিত্য ওহদেদার, মুখ্য গ্রন্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি

শ্রীআরতি দাশ, মনোবিদ্যা বিভাগ, বেথুন কলেজ/ নার্সারি শিক্ষা; পরীক্ষা; ফ্রয়েড, সিগমণ্ড

শ্রীআর্যবংশ মহাস্থবির, মহাবোধি সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া/ ধম্ম

শ্রীআশীষ বসু, অখিল ভারত হস্তশিল্প পর্ষদ/ দড়ি; পট; পুতুল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ ধর্মপূজা; নারায়ণদেব; পালাগান

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ/ দস্তা; দিয়াশলাই; নাইলন; ন্যাফ্‌থলিন; নিয়ন

শ্রীইন্দ্রাণী রায়, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ ফরাসী, ভারতে

শ্রীউমা ঘোষ, ভূগোল বিভাগ, গোখেল মেমোরিয়াল গার্ল্‌স স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ/ পাঁচমঢ়ী

শ্রীউমা মিত্র, স্বাস্থ্য বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ নার্সিং

শ্রীউমা মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ কলেজ/ দেউস্কর, সখারাম গণেশ; ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন

শ্রীঊষা সেন, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ দক্ষিণেশ্বর

শ্রীকনকশংকর রায়, নিদানতত্ত্ববিদ্, কলিকাতা/ নীলরতন সরকার

শ্রীকপিল ভট্টাচার্য, ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা/ নলকূপ

শ্রীকমলকুমার গুহ, সভাপতি, গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার এক্স-প্লোরেশন কমিটি/ ধনুষ্কোটি; নীলগিরি; পক্ষীতীর্থ; পাওয়াপুরী; প্রভাস

শ্রীকমলকুমার মল্লিক, ইন্‌স্টিটিউট অফ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ, কলিকাতা/ ন্যাবা

শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ/ পুশকিন, সারগেভিচ আলেকজাণ্ডার

শ্রীকমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিসংখ্যানবিদ্, ইণ্ডিয়ান জুট মিল্‌স অ্যাসোসিয়েশন/ পাটশিল্প

শ্রীকমল ভট্টাচার্য, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'/ দুঃখীরাম

শ্রীকমল সরকার, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'/ প্রাণনাথ দত্ত; ফণীন্দ্রনাথ বসু (রায় চৌধুরী)

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত, প্রাক্তন সম্পাদিকা, 'মন্দিরা'/ প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার

শ্রীকমলা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা/ দাস্তগিলসার; দিলওয়াড়া; ধবলগিরি; নর্মদা; নাম্‌চে বারওয়া; নেপাল; পশুপতিনাথ

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ নটরাজ; প্রিন্সেপ, জেম্‌স

শ্রীকল্যাণকুমার সেনগুপ্ত, ইতিহাস বিভাগ, মৌলানা আজাদ কলেজ/ পৃথ্বীরাজ; পেশোয়া; প্রতাপাদিত্য

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত, প্রাক্তন অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ ধর্ম

শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক, 'দৈনিক বসুমতী'/ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর; প্রসন্নকুমার ঠাকুর

শ্রীকল্যাণী দত্ত, সংস্কৃত বিভাগ, বাসন্তীদেবী কলেজ/ দধীচি, দধীচ, দধ্যঙ্; দশরূপক; দেবীভাগবত; দৌলতাবাদ; দ্রোণ; দ্রৌপদী; দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ; নবীনচন্দ্র দাস[১]; নবীনচন্দ্র দাস[২]; নব্যন্যায়; নরক; নাথপন্থ; পওহারী বাবা; পক্ষধর মিশ্র

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, রাজা রামমোহন রায় কলেজ, আরামবাগ/ নিকেল; পারদ

শ্রীকানাই সামন্ত, বিশেষ রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্প, বিশ্বভারতী/ নন্দলাল বসু

শ্রীকান্তিভূষণ দত্ত, ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ ফার্নেস

শ্রীকামাখ্যাকুমার চক্রবর্তী, আইন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ ন্যাস

শ্রীকামিনীকান্ত ভট্টাচার্য, গ্রন্থাগারিক, ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ/ ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট

শ্রীকামিনীকুমার দে, প্রাক্তন অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, গুরুদাস কলেজ/ দশমিক পদ্ধতি; নভঃস্থানাঙ্ক; নেপচুন; পদ্মনাভ[১]; পরিমিতি; পাস্কাল, ব্লেইজ;

পিথাগোরাস ; পৃথিবী ; প্রক্সিমা সেণ্টরাই ; প্লুটো ; ফের্মা, পিয়ের স্ত

শ্রীকালীচরণ কর্মকার, ফরাসী ভাষা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ দ্যুপের্, আঁকেতিল

শ্রীকালীপদ সরকার, কৃষি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়/ পান

শ্রীকালীপদ সেন, প্রাক্তন সদস্য, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাব্লিক সার্ভিস কমিশন/ পাব্লিক সার্ভিস কমিশন

শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, প্রাক্তন অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ দ্রাবিড় সভ্যতা ; পাটলিপুত্র

শ্রীকুমারনাথ বাগচী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ/ ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল ইন্স্টিটিউট

শ্রীকুমুদরঞ্জন দাস, বর্ধমান রাজ কলেজ/ ফিচ, র‍্যাল্‌ফ

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য, গ্রন্থাগার বিভাগ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ/ ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি

শ্রীকৃষ্ণা রায়চৌধুরী, গ্রন্থাগার বিভাগ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ/ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

কৌশিক, শ্রীশম্ভুদয়াল, ভূগোল বিভাগ, এস. এস. ভি. কলেজ, হাপুর/ পাঞ্জাব

শ্রীগণেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ, পাস্তুর ইন্স্টিটিউট/ পাস্তুর ইন্স্টিটিউট

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বসু বিজ্ঞান মন্দির/ দর্পণ ; পারমাণবিক বোমা ; প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, জয়নগর-মজিলপুর/ দক্ষিণরায় ; পঞ্চানন্দ

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, প্রচার ও জনসম্পর্ক বিভাগ, পূর্বোত্তর রেলওয়ে/ ফ্লীট, জন ফেইতফুল

শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী, ডিরেক্টর অফ রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান ল ইন্স্টিটিউট, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিট/ দ্বারকানাথ মিত্র ; ধর্মাধিকরণ

শ্রীচিত্রা সেন, ভূগোল বিভাগ, হুগলি উইমেন্স্ কলেজ/ পক প্রণালী ; পারাদ্বীপ ; পুলীকট

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/ দই ; দক্ষিণা ; দশকর্ম ; দশ মহাবিদ্যা ; দশহরা ; দান ; দীক্ষা ; দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ; দুর্গা ; দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ; দুর্গামোহন ভট্টাচার্য ; দেওয়ালি ; ধান ; নবান্ন ; নষ্টচন্দ্র ; নাগপঞ্চমী ; নীলপূজা ; পঞ্চরাত্র ; পঞ্চানন তর্করত্ন ; পাকশাস্ত্র ; পান ; পুথি ; পুরশ্চরণ ; পূজা ; প্রমথনাথ তর্কভূষণ ; প্রসাদ ; প্রাণায়াম ; প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ দাউদ খাঁ কররানী ; দুর্গাবতী, রাণী ; দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস ; নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ ; নওরোজ ; নাজিবুদ্দৌলা

শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত, ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, পুনা/ ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি

শ্রীজবা গুহ, অর্থনীতি বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ পারেতো, ভিল্‌ফ্রেডো ; পিগু, আর্থার সিসিল

শ্রীজয়ন্তী সেন, সম্পাদিকা, 'সাপ্তাহিক বসুমতী'/ প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীজয়শ্রী রায়, ভূগোল বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন/ পেনগঙ্গা

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, রামমোহন কলেজ/ ধৃতরাষ্ট্র

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ, বাংলা বিভাগ, সেণ্ট পল্স কলেজ/ প্রহসন, বাংলা

শ্রীজ্যোতির্ময় বসুরায়, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'/ নো

শ্রীজ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, ন্যাশন্যাল অ্যাট্লাস অর্গানাইজেশন/ দাদরা ও নগরহাভেলী ; নাগরকয়েল ; পনজী

টিকেকর, শ্রীশ্রীপদ রামচন্দ্র, বোম্বাই/ নামদেব

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা/ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শ্রীতরুণবিকাশ লাহিড়ী, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন/ দার্জিলিং

শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, দার্জিলিং গভর্নমেণ্ট কলেজ/ পদ্ম ; পাতাবাহার ; পিয়াজ ;

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, লণ্ডন/ নবীনচন্দ্র সেন

শ্রীতারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ/ পরলোক

শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, বিদ্যানগর কলেজ/ ফুলখেলা

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ/ দামোদর গুপ্ত ; নগর ; নন্দকুমার, মহারাজা ; পাশা ; প্রসাধন

দাতার, শ্রীচিন্তামন বামন, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি/ দত্তাত্রেয় ; নওরোজী, দাদাভাই

শ্রীদিলীপকুমার বসু, ভূবিজ্ঞানী, খনিজ বিভাগ, বার্ড অ্যাণ্ড কোম্পানি/ প্রমথনাথ বসু

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/ দয়ানন্দ সরস্বতী ; নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; পার্জিটার, ফ্রেডেরিক ইডেন ; পিণ্ডারী ;

ফার্গুসন, জেম্‌স ; ফা-হিয়েন
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা/ দক্ষিণাচরণ সেন ; দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার ; দামোদর মিশ্র ; দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ; ধামার ; নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ; নলিকাতরঙ্গ ; ন্যাসতরঙ্গ ; পালুস্কর, দত্তাত্রেয় বিষ্ণু ; পিয়ানো ; প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়২ ; ফৈয়াজ খাঁ
দীন্‌শা, আর্দেশীর, কলিকাতা/ দখ্‌মা, দোখ্‌মা ; পার্শী, ভারতে
শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ দৃষদ্বতী ; দেবদাসী ; নায়কবংশ ; পরমারবংশ ; পল্লববংশ ; পীঠস্থান ; পুলকেশী
শ্রীদীপংকর দাশগুপ্ত, অ্যান্থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া/ নহালী
শ্রীদীপক ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বিভাগ, বোলপুর কলেজ/ নচিকেতা ; পণি
শ্রীদীপকরঞ্জন দাস, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/ দুর্জনশাল ; দূত
শ্রীদেবকুমার বসু, যুগ্ম সম্পাদক, 'দর্শক'/ নির্মলেন্দু লাহিড়ী
শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, শারীরবিদ্যা বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ/ দই ; দুধ ; দেহতাপ ; ধাতু ; নস্য ; পশুশালা ; প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ; প্রোস্টেট গ্রন্থি ; ফ্লেমিং, আলেক্‌জাণ্ডার
শ্রীদেবব্রত রেজ, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট/ ফ্রাঁস, আনাতোল
শ্রীদেবব্রত সিংহ, দর্শন বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/ দৃষ্টিতত্ত্ববাদ
শ্রীদেবলা মিত্র, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া/ দেওগড় ; ধার ; নাগার্জুনকোণ্ডা ; নালন্দা ; নাসিক ; পট্টদকল ; পাণ্ডুয়া১ ; পাণ্ডুয়া২ ; পাহাড়পুর ; পেশোয়ার
শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ দীনবন্ধু মিত্র ; দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ; নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; প্যারীচাঁদ মিত্র
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ দিদেরো, ডেনিস ; দেকার্ত
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ নাগপুরিয়া ; নিকোবরী ; নিগ্রো ; পলিনেশীয় ভাষা
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পাভ্‌লভ ইনস্টিটিউট/ পাভ্‌লভ, ইভান পেত্রোভিচ
শ্রীনরেশচন্দ্র দাস, ডাঃ আর. আমেদ ডেন্টাল কলেজ অ্যাণ্ড হস্‌পিট্যাল/ দন্ত ; দন্তরোগ
শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী, গণিত বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/ পাটীগণিত ; ফুরিয়ার
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ দস্তয়েভ্‌স্কি
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা/ ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ; নলিনী বাগচি ; পুলিনবিহারী দাস ; পূর্ণচন্দ্র দাস ; প্রফুল্ল চাকী
শ্রীনারায়ণী বসু, মধ্যমগ্রাম, চব্বিশ পরগনা/ ফাসিবাদ
শ্রীনিতাই রায়, প্রাক্তন শৈলারোহণ-প্রশিক্ষক, হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশন/ পর্বতারোহণ
শ্রীনিরঞ্জন ঘোষ, ইতিহাস বিভাগ, আনন্দমার্গ কলেজ, পুরুলিয়া/ নকুলীশ
শ্রীনির্মলকুমার বসু, কমিশনার ফর শিডিউল্‌ড কাস্ট্‌স অ্যাণ্ড শিডিউল্‌ড ট্রাইব্‌স/ দোল ; নাগা ; নৃতত্ত্ব ; নৈরাজ্যবাদ ; প্রত্নতত্ত্ব
শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ/ দল
শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী, প্রাক্তন সম্পাদক, ক্যালেণ্ডার রিফর্ম কমিটি/ পঞ্জিকা
শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহ, নাম্‌গিয়াল ইন্‌স্টিটিউট অফ টিবেটোলজি, গ্যাংটক/ দালই লামা ; পাঞ্চেন লামা
শ্রীনির্মল সিংহ, কর্মসচিব, পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ/ নবগোপাল মিত্র
শ্রীনীতীশকুমার বসু, ইংরেজী বিভাগ, শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ/ প্রহসন
শ্রীনীলা দে, বি. টি. বিভাগ, লোরেটো হাউস/ দাস১ ; দাস২, দাসত্ব
শ্রীনীহারকণা মজুমদার, ইতিহাস বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ/ প্রতাপ সিংহ
নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাক্তন ম্যানেজার, প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা শাখা/ প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া
শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল, প্রাক্তন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, কলিকাতা/ পুলিশ
শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ/ দক্ষিণেশ্বর ; নান্নুর ; পানিহাটী
শ্রীপদ্মনাভ দাশগুপ্ত, সাহা ইন্‌স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স/ নোবেল, আল্‌ফ্রেড বের্নহার্ড ; নোবেল পুরস্কার
শ্রীপরিমলবিকাশ সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক, শারীরবিদ্যা

বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ নিউক্লিওপ্রোটিন ; প্রোটিন
শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অধিকর্তা, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ পাণ্ডুরাজার ঢিবি
শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত, বাংলা বিভাগ, দেশবন্ধু কলেজ/ প্রবন্ধ, বাংলা
পিশারতি, শ্রীপিশারথ রাম, ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি, আমেদাবাদ/ ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি, আমেদাবাদ
শ্রীপীযূষ সাহা, ভূগোল বিভাগ, শিলিগুড়ি কলেজ/ পেরিয়ার
শ্রীপুলিনবিহারী সেন, অধ্যক্ষ, বিশেষ রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্প, বিশ্বভারতী/ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; প্রতিমা ঠাকুর ; প্রিয়নাথ সেন
শ্রীপ্রণতি মুখোপাধ্যায়, গবেষক, সংস্কৃত কলেজ/ নয়পাল
শ্রীপ্রণবকুমার চক্রবর্তী, ভূগোল বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়/ দণ্ডকারণ্য ; দ্বারকেশ্বর ; ধনশ্রী ; ধানবাদ ; নৈনীতাল ; পণ্ডিচেরী ; পাতিয়ালা ; পিণ্ডোর ; পিলানি ; পুনা ; পুরী ; পুরুলিয়া ; ফতেপুর সিক্রি
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীপ্রণীতা ভট্টাচার্য, ভূগোল বিভাগ, শেঠ সুরযমল জালান গার্ল্‌স কলেজ/ দামোদর ; দামোদর উপত্যকা প্রকল্প
শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ পর্তুগীজ, ভারতে
শ্রীপ্রদীপকুমার দাশগুপ্ত, ভূবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/ পর্বত ; পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ; পূর্বঘাট পর্বতমালা
শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, কলিকাতা/ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; ধর্মদাস সুর ; নরীসুন্দরী ; নীহারবালা ; প্রভা
শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক, নৃবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ ধীবর ; পোশাক পরিচ্ছদ
শ্রীপ্রভাতকুমার সেন, চন্দননগর/ পোর্ট ব্লেয়ার
শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট/ নীট্‌শে, ফ্রেডারিক উইল্‌হেল্‌ম
শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রফুল্লচন্দ্র রায়
শ্রীপ্রিয়াংশুশেখর ভট্টাচার্য, মনোবিদ্যা বিভাগ, গোখেল মেমোরিয়াল গার্ল্‌স কলেজ/ দলবদ্ধ আচরণ
ফালোঁ, ফাদার পিয়ের, ফরাসী বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ দান্তে ; দোম আন্তোনিয়ো ; পোপ
শ্রীবঙ্কুবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/ পুনর্জীবন
শ্রীবরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ/ নিম ; পটল
শ্রীবারীন বসু, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস/ দ্রাঘিমা
শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য, শিক্ষানিকেতন, কলানবগ্রাম/ নঈ তালিম
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, কলিকাতা/ দন্তপুর ; দরেইওস, ডেরিয়াস ; দশনামী ; দাদাজী কোণ্ডদেব ; দাহির ; দিদ্দা ; দুর্জনশাল[২] ; দ্যুপ্লেক্স ; নসরৎ শাহ্‌ ; নানক ; নানা ফড়নবিশ ; নানা সাহেব ; পঞ্চাল ; পাণ্ড্য ; ফিনিসীয় সভ্যতা
শ্রীবিনয় ভট্টাচার্য, পল্লীশিক্ষা সদন, বিশ্বভারতী/ পিয়ার্স‍ন, উইলিয়াম উইনস্ট্যান্‌লি
শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী, আইনজীবী, কলিকাতা/ পাহাড়ী চিত্রকলা
শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, অধ্যক্ষ, ইম্‌দাদ্‌খানী স্কুল অফ সিতার/ ধ্রুপদ
শ্রীবিমলেন্দু মিত্র, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বসু বিজ্ঞান মন্দির/ পরমাণু ; ফের্‌মি, এন্‌রিকো
বিমানবিহারী মজুমদার, পাটনা/ দণ্ড ; দুঃখী শ্যামদাস ; নরহরি চক্রবর্তী, ঘনশ্যাম ; নরহরি সরকার ঠাকুর ; নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় ; নারায়ণী ; নিত্যানন্দ ; পদাবলী ; পরকীয়াতত্ত্ব ; পরশুরাম চক্রবর্তী ; পীতাম্বর দাস ; পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি
শ্রীবিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়, চীনাভবন, বিশ্বভারতী/ দেবদত্ত
শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ পেত্রার্কা, ফ্রান্‌চেস্‌কো
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী/ ধর্মকীর্তি ; নাগার্জুন ; পাতিমোক্‌খ ; প্রজ্ঞাপারমিতা
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ নেপালী[১]
শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার বিভাগ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ/ দীনেন্দ্রকুমার রায় ; পৃথ্বীশচন্দ্র রায় ; প্রবোধচন্দ্র বাগচী ; প্রিয়রঞ্জন সেন ; ফোর্ড, হেনরি
শ্রীবিশ্বময় বিশ্বাস, জুঅলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া/ পাখি
শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ/ দ্যৌঃ ; ধ্বনি ; নন্দনতত্ত্ব ; পতঞ্জলি

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়/ দ্রাবিড়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার, সম্পাদক, গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার এক্সপ্লোরেশন কমিটি/ নন্দাদেবী ; নাঙ্গা পর্বত

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীব্রতীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, সংস্কৃত বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়/ নাট্যশাস্ত্র

শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্নাতকোত্তর ও গবেষণা প্রশিক্ষণ বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/ দীনার

শ্রীব্রহ্মানন্দ গুপ্ত, সংস্কৃত বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়/ ধন্বন্তরি

শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত, সাহা ইন্‌স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স/ প্লাজ্‌মা ফিজিক্স

শ্রীভকতপ্রসাদ মজুমদার, ইতিহাস বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়/ দ্বারকা ; ধনুস্কোটি ; পরেশনাথ ; পাওয়াপুরী ; পৃথূদক

শ্রীভবতোষ দত্ত, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/ দীনেশচরণ বসু ; দেবেন্দ্রনাথ সেন ; দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; নিধুবাবু ; পাঁচালী[১] ; প্রমথ চৌধুরী ; প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ

শ্রীভবদেব ভট্টাচার্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ/ নীলকণ্ঠ

শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/ পরিসংখ্যান

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, কলিকাতা/ দীনেশচন্দ্র গুপ্ত ; দীনেশচন্দ্র মজুমদার ; পিল্লৈ, চিদম্বরম

শ্রীমঞ্জুশ্রী বসু, ভূগোল বিভাগ, উইমেন্‌স খ্রীষ্টিয়ান কলেজ/ নেরিয়ামঙ্গলম ; ফল্গু

শ্রীমণীন্দ্রমোহন লাহিড়ী, চাকদহ, নদিয়া/ নরেন্দ্রমোহন সেন

শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ, 'হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড'/ প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া

শ্রীমনোরঞ্জন বসু, কলিকাতা/ দিঙ্‌নাগ ; ন্যায়, পাশ্চাত্য ; ন্যায়, ভারতীয় ; প্রমাণ

শ্রীমন্মথ রায়, নাট্যকার, কলিকাতা/ নরেশচন্দ্র মিত্র

শ্রীমহাদেব দত্ত, গণিত বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজি, বোম্বাই/ পোয়্যাঁকারে, ঝ্যুল আঁরি ; পোঁসলে, ঝাঁ ভিক্তর

মাসুদ, শ্রীএস. এ., বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট/ নিকা

শ্রীমিনতি ঘোষ, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাইজেশন/ দেরাদুন

শ্রীমীরা গুহ, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ নগ্নীভবন ; নদী ; পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীমুকুলকুমার বসু, ভূগোল বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ/ নাসিক

শ্রীমুক্তি দাশগুপ্ত, শিক্ষকশিক্ষণ বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়/ নদিয়া ; নবদ্বীপ

শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, ইউনিয়ন পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশন/ ধান ; নারিকেল ; পাট; পেঁপে ; পেয়ারা

শ্রীমৃগেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাইজেশন/ দারভাঙ্গা ; দেওঘর

শ্রীমৃণিকা ঘোষ, সংস্কৃত বিভাগ, বেথুন কলেজ/ দক্ষ ; দশরথ ; দুঃশাসন ; দুর্যোধন ; ধ্রুব ; নহুষ ; নারদ ; পরশুরাম ; পুরূরবা ; প্রহ্লাদ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ইতিহাস বিভাগ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ/ দারা শিকোহ্‌ ; দাসবংশ ; দুর্গাদাস রাঠোর ; দেবলাদেবী ; দেবী সিংহ , দোস্ত মহম্মদ ; দৌলত খাঁ লোদী[১] ; দৌলত খাঁ লোদী[২] ; নাদির শাহ্‌ ; নাসিরুদ্দীন মামুদ ; নিজামবংশ ; নূরজাহান ; পদ্মিনী ; পাণিপথ ; ফেরিস্তা, মহম্মদ কাশিম

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, 'প্রবাসী'/ দুবোয়া, জাঁ আঁতোয়ান ; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; দ্বারকানাথ ঠাকুর ; নবকৃষ্ণ, মহারাজা ; প্যারীচরণ সরকার ; প্রমথনাথ মিত্র ; ফেডারেশন হল

শ্রীরঘুবীর চক্রবর্তী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ/ পাসপোর্ট

রথীন্দ্রনাথ রায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ দামোদর মুখোপাধ্যায় ; দেবকুমার রায়চৌধুরী ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ; নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়, সাহা ইন্‌স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স/ ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি ; নিউট্রনবিদ্যা

শ্রীরমা চৌধুরী, উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়/ নিম্বার্ক ; পরিণামবাদ

শ্রীরমাতোষ সরকার, বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম/ দূরবীক্ষণ ; ধূমকেতু ; ধ্রুবতারা ; নক্ষত্র ; নীহারিকা ; প্ল্যানেটেরিয়াম

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাক্তন উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ব-

বিদ্যালয়/ দিব্য ; দেওয়ানি ; দেবপাল ; ধর্মপাল ; নন্দ-বংশ ; পালবংশ

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র, কলিকাতা/ দুন্দুভি ; দোতারা ; ধুন ; পাখোয়াজ ; পাঁচালী২

শ্রীরাধামাধব তর্কতীর্থ, 'ভারতকোষ'/ নাগরীপ্রচারিণী সভা

শ্রীরাধারাণী দেবী, কলিকাতা/ প্রিয়ম্বদা দেবী

শ্রীরামচন্দ্র পাল, দর্শন বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়/ প্লাতো

শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য, শিপ হাইড্রোডাইনামিক্স ল্যাবরেটরি, মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়/ নৌকা ; নৌ-নির্মাণবিদ্যা

শ্রীরাষ্ট্রপাল ভিক্ষু, নালন্দা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট/ ধম্মকায়

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, প্রাক্তন অধ্যাপক, শারীরবিদ্যা বিভাগ, ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ/ প্রাকৃতিক চিকিৎসা ; প্লেগ

শ্রীরেবতীরঞ্জন সিংহ, সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি/ প্রেমচন্দ

শ্রীরেবা দে, কলিকাতা/ পিয়ালী

শ্রীলতা চট্টোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, লোরেটো হাউস/ পর্বত

লালওয়ানী, শ্রীগণেশ, জৈনভবন, কলিকাতা/ দিগম্বর সম্প্রদায় ; নেমিনাথ ; পার্শ্বনাথ

শ্রীলীনা চট্টোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, উইমেন্‌স খ্রীষ্টিয়ান কলেজ/ নর্মদা ; নাগপুর ; নাগাল্যাণ্ড ; প্রণালী

শ্রীলোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ/ দক্ষিণ আমেরিকা ; পাটনা

শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু, গান্ধী স্মারকনিধি, বারাকপুর/ প্রজাসোশ্যালিস্ট পার্টি

শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী, কলিকাতা/ প্লাঙ্ক, ম্যাক্স্‌

শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র, 'যুগান্তর'/ পতৌদির নবাব

শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ইংরেজী বিভাগ, রামমোহন কলেজ/ নাটক

শ্রীশরদিন্দু বসু, অ্যান্থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া/ নাগাল্যাণ্ড ; নীফা

শর্মা, শ্রীকে. শংকর, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি/ দশরা, দশেরা

শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, জুট টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি/ নাইলন ; পশম

শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ নাথধর্ম, নাথসাহিত্য

শ্রীশিবদাস চৌধুরী, গ্রন্থাগারিক, এশিয়াটিক সোসাইটি/ নিখিলনাথ রায় ; পোলো, মার্কো

শ্রীশিবনাথ রায়, রিসার্চ অফিসার, মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স/ পঞ্চানন কর্মকার

শ্রীশিশির চট্টোপাধ্যায়, ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ পো, এড্‌গার অ্যালেন ; প্রুস্ত, মার্সেল ; ফক্‌নার, উইলিয়াম

শ্রীশীলা চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা/ পায়রা

শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সঙ্গীতভবন, বিশ্বভারতী/ নৃত্যনাট্য

শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কলিকাতা/ নিঘণ্টু ; নিরুক্ত ; পাণিনি

শ্রীশ্যামল সেনগুপ্ত, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ/ নিউটন, অ্যাইজ্যাক ; ফ্যারাডে, মাইকেল

শ্রীশ্রীমতী ঠাকুর, কলিকাতা/ নৃত্য

শ্রীশ্রীলা সেন, কলিকাতা/ পুষ্কর

শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, নববিধান পাব্‌লি-কেশন কমিটি/ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ; প্রমথলাল সেন ; প্রশান্তকুমার সেন

শ্রীসতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দর্শন বিভাগ, সিটি কলেজ/ পূর্বমীমাংসা

শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর, প্রাক্তন অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বসু বিজ্ঞান মন্দির/ পদার্থবিদ্যা

শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, রিসার্চ অফিসার, রাজ্য আইন কমিশন/ দণ্ড ও দণ্ডবিধি ; দান

শ্রীসত্যরঞ্জন ঘটক, কলিকাতা/ প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়/ দৌলত কাজী

শ্রীসত্রাজিৎ দত্ত, ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ ম্যানেজ্‌মেণ্ট/ প্রত্যক্ষণ

শ্রীসনৎকুমার সরকার, ইন্‌স্টিটিউট অফ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ/ প্রাকৃতিক চিকিৎসা ; ফিজিওথেরাপি

শ্রীসন্তোষকুমার পাইন, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী/ পতঙ্গভুক উদ্ভিদ ; পরাগযোগ ; পাইন ; পানা ; পাম ; প্লাস্টিড ; ফার্ন

শ্রীসন্তোষ ঘোষ, স্থপতি ও নগরপরিকল্পনাবিদ, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন/ নগরবিন্যাস

শ্রীসমর রায়চৌধুরী, সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল স্টেট ব্রান্‌চ/ ফাইলেরিয়া

শ্রীসরলা ঘোষ, স্ত্রীরোগবিশারদ, কলিকাতা/ ধাত্রীবিদ্যা

শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ/ নিরুপমা দেবী
শ্রীসলিলকুমার চৌধুরী, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ পঞ্চনদ ; পশ্চিম দিনাজপুর ; পহলগাঁও ; পুনর্ভবা
শ্রীসাধনা দাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ নাৎসীবাদ ; ন্যাটো ; ন্যাসবাদ
শ্রীসান্ত্বনা দাস, ভূগোল বিভাগ, রানী বিড়লা গার্ল্‌স কলেজ/ পাল্লার
শ্রীসাবিত্রী মুখোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়/ দ্বীপ ; প্রশান্ত মহাসাগর
সিংহ, শ্রীরামঅধার, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ নেওয়ারী ; নেপালী২ ; পশতো ভাষা ; পাঞ্জাবী ভাষা ; পাহাড়ী ; ফারসী
সিংহ, শ্রীহরবন্‌স, গভর্নমেণ্ট কলেজ, মুক্তসর/ পাঞ্জাবী সাহিত্য
সিদ্ধানন্দ সরস্বতী, স্বামী, শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম, কোচবিহার/ নিগমানন্দ সরস্বতী
শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্‌থ সার্ভিস/ ধনুষ্টংকার
শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ নল ; নৃসিংহ ; পরীক্ষিৎ ; প্রমীলা১ ; প্রমীলা২ ; ফল্গু
শ্রীসীমানন্দ অধিকারী, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, দার্জিলিং গভর্নমেণ্ট কলেজ/ পেঙ্গুইন
শ্রীসুকুমার সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ দোহা ; ধ্বনিবিজ্ঞান ; নগেন্দ্রনাথ বসু ; নাগরী ; নিয়া প্রাকৃত ; পদ্মনাভ২ ; পরমানন্দ অধিকারী ; পরাগল খান ; পালি ভাষা ; পিঙ্গল ; পৈশাচী ; প্রাকৃত ভাষা ; প্রাকৃত সাহিত্য ; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ
শ্রীসুকোমল চৌধুরী, পালি বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/ নিকায় ; পঞ্চশীল
শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, সংস্কৃত ও দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী/ দেবতা ; দৈত্য ; পতঞ্জলি ; পরমাণুবাদ ; পূর্বমীমাংসা ; প্রলয় ; প্রেত
শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী/ দনুজমর্দনদেব ; দেবীবর ঘটক ; পলাশির যুদ্ধ
শ্রীসুখময় লাহিড়ী, প্রাক্তন অধ্যাপক, শারীরবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/ নাড়ী ; ফুসফুস
শ্রীসুজয়া গুহ, কলিকাতা/ নীলগিরি
শ্রীসুজিতকুমার দাশগুপ্ত, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ/ পঙ্গপাল ; পতঙ্গ ; পিপীলিকা ; প্রজাপতি
শ্রীসুজিতকুমার বসু, ধাতুবিদ্যাবিশারদ, কলিকাতা/ ধাতু
শ্রীসুধাংশুবিকাশ রায়চৌধুরী, কলিকাতা/ নলিনীরঞ্জন সরকার
শ্রীসুধাংশুশেখর চক্রবর্তী, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি, রাঁচি/ দীনেশচন্দ্র সেন ; পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, শান্তিনিকেতন/ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী/ দ্বৈতবাদ ; দ্বৈতাদ্বৈতবাদ
শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য, অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া/ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ
শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী, দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী/ নির্বাণ
শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ/ প্রাথমিক শিক্ষা
শ্রীসুধেন্দুপ্রসাদ বসু, ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ পাম্প ; প্যারাসুট ; পেরিস্কোপ
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক/ নিষাদ
শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক, অধ্যক্ষ, ভোটভাষা মহাবিদ্যালয়/ দালাই লামা ; পালি সাহিত্য
শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, দার্জিলিং গভর্নমেণ্ট কলেজ/ ধুতুরা, নারিকেল ; পরজীবী উদ্ভিদ ; পরভোজী উদ্ভিদ ; পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ ; ফল ; ফুল
শ্রীসুব্রতা সেন, গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ দুর্বাসা
শ্রীসুব্রতেশ ঘোষ, অর্থনীতি বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ ধর্মঘট ; পরিবহণ ও যোগাযোগ
শ্রীসুভদ্রকুমার সেন, ইংরেজী বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ/ পর্তুগীজ ভাষা
শ্রীসুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিনির্বাপন অধিকার/ দমকল
শ্রীসুমন্ত মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা/ ফ্রেজারগঞ্জ
শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ/ দণ্ডী ; ধর্মশাস্ত্র ; নাটক, সংস্কৃত ; পঞ্চতন্ত্র
শ্রীসুশীল রায়, সম্পাদক, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'/ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ; নীলমণি ঠাকুর ; পিরালী
শ্রীসুশোভন সরকার, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/ ফরাসী বিপ্লব

সোব্হান, শ্রীআব্দুস, আরবী, ফারসী ও উর্দু বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ/ দরবেশ ; দুলদুল ; নবী ; নামাজ ; পীর

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়/ নাট্যপ্রযোজনা

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী/ দাদূ

শ্রীসৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা/ দমদম ; নিভেলী ; পাকিস্তান ; পাবনা ; পার্বত্য চট্টগ্রাম ; পেন্নার ; পেশোয়ার ; ফরিদপুর

শ্রীসৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবাসী ইভ্‌নিং কলেজ/ দিগম্বর মিত্র ; দ্রবময়ী১ ; দ্রবময়ী২

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ইতিহাস বিভাগ, আনন্দমোহন কলেজ/ প্রসেনজিৎ

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, চন্দননগর কলেজ/ দেউস্কর, সখারাম গণেশ ; ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন

শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়/ দাশরথি রায় ; পাঁচালী১

শ্রীহিমাংশুকুমার সরকার, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাই-জেশন/ দিল্লী

শ্রীহীরালাল সাহা, অধিকর্তা, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্‌থ সার্ভিস/ নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ

ভারতকোষ

দই দুগ্ধজাত খাদ্য। দই-এ নানাপ্রকার জীবাণু বর্তমান। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জীবাণু ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড উৎপাদন করে এবং অপর কতকগুলি জীবাণু প্রোটিনের নানারূপ পরিবর্তন ঘটায়। কোনও কোনও প্রকার দই-এ অ্যাল্‌কোহল-উৎপাদক জীবাণুও থাকে। সাধারণতঃ ঈষদুষ্ণ দুধে সামান্য দই বীজ বা দম্বল হিসাবে মিশাইয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিলে দুধ দই-এ পরিণত হয়। দম্বলে যে সকল ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড উৎপাদক জীবাণু থাকে, তাহাদের ক্রিয়ার ফলে দুধের কার্বোহাইড্রেট ল্যাক্‌টোজ্‌-এর সন্ধান (ফার্মেণ্টেশন) ঘটে এবং ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়; ইহার প্রভাবে দুধ জমিয়া দই হয়। দম্বলের কতকগুলি জীবাণু দুধের প্রোটিনেরও ঈষৎ পরিবর্তন ঘটাইয়া দুধ জমাইতে সাহায্য করে। দই উৎপন্ন হইবার সময় দুধের প্রোটিনের কিয়দংশ জমাট বাঁধে এবং অবশিষ্টাংশ পেপ্‌টোন, অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রভৃতি সুপাচ্য ও সহজে আত্তীকরণের উপযোগী পদার্থে পরিণত হয়; এজন্যই দই দুধ অপেক্ষা সহজপাচ্য। দই-এ কিছু পরিমাণে বি-বর্গীয় ভিটামিন বর্তমান। তাহা ছাড়া দই ক্ষুদ্রান্ত্রে ঈষৎ অম্লের পরিবেশ সৃষ্টি করে, ইহাতে ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে খাদ্যের ক্যালসিয়ামের বিশোষণ সহজসাধ্য হয়।

প্রখ্যাত রুশ চিকিৎসাবিজ্ঞানী মেশ্‌নিকফ মনে করিতেন যে অন্ত্রে পচনক্রিয়ার সহায়ক জীবাণুগুলিই স্বাস্থ্যনাশ ও বার্ধক্যের কারণ। তাঁহার মত ছিল, দই এ সকল জীবাণুর ক্রিয়া হ্রাস করিয়া দীর্ঘ জীবন দান করে। তাঁহার মত সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য না হইলেও একথা ঠিক যে দই-এর জীবাণুগুলির সহিত খাদ্য লইয়া প্রতিযোগিতার ফলে অন্ত্রে নানাপ্রকার পচন-সহায়ক জীবাণুর পুষ্টি ব্যাহত হয়; তাহা ছাড়া দই অন্ত্রে যে ঈষৎ অম্লের পরিবেশ সৃষ্টি করে, তাহাও শেষোক্ত জীবাণুগুলির পক্ষে ক্ষতিকর। এ সকল কারণে দই অন্ত্রে উদরাময় ও অন্যান্য বহু রোগের জীবাণুর সংখ্যা হ্রাস করে।

প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে দধির যথেষ্ট ব্যবহার আছে। ভারতের পশ্চিম বঙ্গে মিষ্ট দধি ও অন্যান্য অঞ্চলে মিষ্টত্বহীন দধি আহার করা হয়। ভারতে প্রধানতঃ গো-মহিষের দুধ হইতেই দই প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু নানা দেশে অন্যান্য প্রাণীর দুধও এ কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এ প্রসঙ্গে মধ্য এশিয়ায় অশ্বদুগ্ধ হইতে একপ্রকার দধির উৎপাদন উল্লেখযোগ্য।

দেবজ্যোতি দাশ

বিবিধ ধর্মীয় ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে দই-এর ব্যবহার প্রচলিত। নানা উপলক্ষে ব্যবহৃত পবিত্র পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত ও দেবপূজায় প্রয়োজনীয় মধুপর্কের অন্যতম উপকরণ দই। যাত্রাকালে দই ও ঘি দেখা বা দই ও ঘি-এর নাম শোনা বা নাম করা প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতেই যাত্রাকালে দই খাওয়া ও দই-এর ছিটা দেওয়ার প্রথা দাঁড়াইয়াছে। আভ্যুদয়িক বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধের সমস্ত উপকরণে দই-এর ছিটা দেওয়ার রীতি আছে। যজ্ঞ-সমাপ্তিতে দই দিয়া অগ্নিস্থানকে শীতল করা হয়। বিবাহাদি অনুষ্ঠানের দিন ভোরবেলায় বরকন্যাকে দই খাওয়ানো হয়; ইহার নাম দধি-মঙ্গল। দেবপূজায় বিসর্জনের দিন দই-খই মাখিয়া দেবতাকে নিবেদন করা হয়, ইহার নাম দই-কোর্মা (দধিকর্ম ?)। জন্মাষ্টমীর পরের দিন গোয়ালাদের মধ্যে যে নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে দই-এর হাঁড়ি মাথায় নিয়া নাচিতে নাচিতে ভাঙিয়া ফেলিয়া ‘দই-কাদা’র সৃষ্টি করা হয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দক্ষ দক্ষ প্রজাপতি সম্বন্ধে নানা পুরাণে নানা কাহিনী পাওয়া যায় (মহাভারত ১।৬০।৯-১৫ ; হরিবংশ ২-৩ ; গরুড়পুরাণ ১।৫-৬ ; ভাগবত ৪।২-৭, ৬।৪-৬ ; মৎস্যপুরাণ ৪-৫ ; কালিকাপুরাণ ৮, ১৬-১৮) ইহাদের মধ্যে দক্ষযজ্ঞের কাহিনী সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ভাগবতোক্ত (৪।২-৭) কাহিনীটি এইরূপ : মনুর কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতির গর্ভে ব্রাহ্ম দক্ষের যে ১৬টি কন্যার উৎপত্তি হয় তাহাদের মধ্যে ১৩টি ধর্মের, ১ জন অগ্নির, ১ জন সংযুক্ত পিতৃগণের ও সতী নামে কন্যা মহাদেবের পত্নী হন। একবার বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞ-সভায় দক্ষ প্রবেশ করিলে মহাদেব ও ব্রহ্মা ভিন্ন সমাগত দেবগণ সম্মান প্রদর্শনের জন্য আসন হইতে উত্থিত হন। ইহাতে কুপিত দক্ষ জামাতা মহাদেবের নিন্দা করিতে

দক্ষিণ আমেরিকা

করিতে শাপ দেন যে, যজনকালে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত তিনি ইহাতে যজ্ঞভাগ পাইবেন না। কিছুকাল পরে ব্রহ্মার অনুগ্রহে সকল প্রজাপতির আধিপত্যলাভে গর্বিত দক্ষ বৃহস্পতি নামক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করেন। পতিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া দক্ষকন্যা সতী বিনা নিমন্ত্রণে যজ্ঞ-স্থানে উপস্থিত হন এবং পতির যজ্ঞভাগ নাই দেখিয়া ব্যথিত হন, তখন অপমানিতা হইয়া সতী যোগবলে দেহত্যাগ করেন। এই সংবাদে ক্রোধোন্মত্ত মহাদেব মস্তক হইতে একটি জটা ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে বিরাটাকার সহস্রবাহু ত্রিনেত্র বীরভদ্রের উৎপত্তি হয়। মহাদেবের আদেশে তাঁহার অনুচরগণের সহিত উদ্যতাস্ত্র বীরভদ্র দক্ষের যজ্ঞ-বিনাশে প্রবৃত্ত হন। শিবদ্বেষী দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া তিনি দক্ষিণাগ্নিতে হোমানুষ্ঠানপূর্বক যজ্ঞশালা সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মহাদেবকে দক্ষযজ্ঞ উদ্ধার করিতে অনুরোধ করেন। মহাদেবের অনুগ্রহে দক্ষের দেহে ছাগমুণ্ড যোজিত হইলে তিনি পুনরায় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ও মহাদেবের স্তব করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন।

যূথিকা ঘোষ

দক্ষিণ আমেরিকা ১৩° উত্তর হইতে প্রায় ৫৬° দক্ষিণ এবং ৩৪° পূর্ব হইতে ৮২° পশ্চিম। আয়তন হিসাবে এই মহাদেশের প্রায় ৮৫% নিরক্ষরেখার দক্ষিণে অবস্থিত, কাজেই ইহাকে দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশ বলা হয়। ইহার সর্বোত্তর বিন্দু পুণ্টা গালিনাস অন্তরীপ এবং সর্বদক্ষিণ হর্ন অন্তরীপ; পূর্ব দিকের শেষ প্রান্তে রেসিফে (পার্নাম্বুকো) বন্দর এবং সর্বপশ্চিম বিন্দু পুণ্টা পরিণাস বা পারিণা অন্তরীপ। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরে ক্যারিবিয়ান উপসাগর ও উত্তর অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে অ্যান্‌টার্ক্‌টিক মহাসাগর, পূর্বে দক্ষিণ অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর।

এই মহাদেশের আকৃতি ত্রিভুজের মত, উত্তর হইতে দক্ষিণে ক্রমশঃ সংকীর্ণ। উত্তর দিকে ইহা সংকীর্ণ পানামা যোজক দ্বারা উত্তর আমেরিকার সহিত যুক্ত ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তথায় পানামা খাল খনন করা হয়। মহাদেশের আয়তন প্রায় ১৭৫৯৮৯১৬ বর্গ কিলোমিটার (প্রায় ৭০০০০০০ বর্গ মাইল)।

ত্রিভুজাকৃতি এই মহাদেশের তিন দিকে উপকূলরেখা বর্তমান। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব উপকূল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও ধীরে সমুদ্রের দিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলেরও কতক অংশ প্রশস্ত; ইহা ভিন্ন অন্যান্য অংশে উপকূল সংকীর্ণ। পশ্চিম উপকূল প্রায় সোজাসুজি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এবং সাধারণতঃ অভগ্ন; কেবল দক্ষিণ সীমান্তে ইহা অত্যন্ত ভগ্ন। পশ্চিম দিকে ভূভাগ অত্যন্ত খাড়া হইয়া গভীর সমুদ্রের দিকে নামিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ সীমায় মাজেল্যান প্রণালী ও টিয়েরা-ডেল ফুয়েগো (দ্বীপ) অবস্থিত। বিভিন্ন উপকূলের এরূপ অবস্থার জন্য এই মহাদেশে উপদ্বীপ, সাগর, উপসাগর প্রভৃতি কম এবং বৃহৎ বন্দর, পোতাশ্রয় প্রভৃতির সুযোগ অল্প; তথাপি আমাজন নদীর ব দ্বীপে মারাজোর দক্ষিণে সুবৃহৎ বেলেম (পারা); ব্রাজিল মালভূমির উপকূলে রেসিফে, স্যাল্‌ভাডর (বাহিয়া) ও রিও দ্য জেনেরো; রিও দ্য লা প্লাটা নদীর প্রশস্ত মোহানার পূর্ব দিকে মন্টিভিডিও এবং পশ্চিমে বুয়েনেস এয়ারেস উল্লেখযোগ্য বন্দর।

দক্ষিণ আমেরিকার ভূপ্রকৃতি বিচিত্র, কতক বিষয়ে অতুলনীয়। মহাদেশের পশ্চিম অংশে উত্তর হইতে দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত প্রায় ৮০০০ কিলোমিটার (৫০০০ মাইল) বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী। ইহা পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম পর্বত-শ্রেণী। উহার উচ্চতা গড়ে ৩৬৬০ মিটার (১২০০০ ফুট)। ইহার দৈর্ঘ্য হিমালয়ের দৈর্ঘ্যের তিনগুণ এবং কেবলমাত্র উচ্চতাই হিমালয় হইতে কম। এই পার্বত্য ভূমির সাধারণ নাম কর্ডিলেরা দ্য লস্ অ্যাণ্ডীজ (অ্যাণ্ডীজ পর্বতমালা)। ইহা মধ্যভাগে ১৬০-৬৪০ কিলোমিটার (১০০-৪০০ মাইল) প্রশস্ত এবং ইহা অক্‌সিডেণ্টাল, ওরিয়েণ্টাল, সেণ্ট্রাল প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই অ্যাণ্ডীজ পর্বতমালাই এই মহাদেশের সর্বপ্রধান জল-বিভাজিকা।

অ্যাণ্ডীজ পর্বত অঞ্চলে ৬১০০ মিটারের (২০০০০ ফুট) অধিক উচ্চ বহু গিরিশৃঙ্গ আছে ও তাহার মধ্যে কয়েকটি আগ্নেয়গিরিও আছে। চিলি দেশে আকোনকাগয়া (৭০৩২ মিটার বা ২২৯১০ ফুট) সমগ্র পশ্চিম গোলার্ধের উচ্চতম শৃঙ্গ। ইকুয়েডর রাজ্যের চিম্বোরাজো (৬২৭২ মিটার বা ২০৫১৭ ফুট), কটোপাক্সি (৫৯৮০ মিটার বা ১৯৬০০ ফুট), বলিভিয়া রাজ্যের সোরাটা ও ইলিমানি (উভয়ে প্রায় ৬৪০৫ মিটার বা ২১০০০ ফুট) এই মহাদেশের উচ্চ শৃঙ্গসমূহের মধ্যে অন্যতম।

এই মহাদেশের তিনটি অঞ্চলে অধিক মালভূমি লক্ষিত হয়। একটি বিভাগ পশ্চিম দিকের অ্যাণ্ডীজ পর্বত অঞ্চলে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে বলিভিয়া মালভূমির স্থান এই মহাদেশে প্রথম এবং পৃথিবীতে দ্বিতীয়। মালভূমি-সমূহের দ্বিতীয় বিভাগ অ্যাণ্ডীজ পর্বত অঞ্চলের উত্তর সীমা হইতে আমাজন নদীর উত্তর দিক দিয়া ঐ নদীর

দক্ষিণ আমেরিকা

প্রায় মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মালভূমি দক্ষিণ দিকে ঢালু এবং ইহার পশ্চিম অংশ (কলম্বিয়া-ভেনেজুয়েলা) এখানকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ। মালভূমি-সমূহের তৃতীয় বিভাগ আমাজন নদীর দক্ষিণ দিক দিয়া পূর্ব দিকে অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা উত্তর দিকে ঢালু এবং ইহার দক্ষিণ-পূর্ব অংশই উচ্চতম এবং তাহাকে বলা হয় ব্রাজিলিয়ান হাইল্যাণ্ড্স্। ইহার দক্ষিণের অংশ মত্তোগ্রসো মালভূমি নামে পরিচিত; ইহা একটি বিখ্যাত জলবিভাজিকা। এই মালভূমি অঞ্চলে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার সীমান্তে বিখ্যাত ইগোয়াস্থ জলপ্রপাত অবস্থিত। ইহা পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত-সমূহের অন্যতম।

মহাদেশের সমভূমির অধিকাংশই তিনটি প্রধান নদীর অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে সর্বোত্তরে কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলার কতকাংশে ওরিনকো নদীর অববাহিকার সমভূমি অবস্থিত। ব্রাজিল দেশের উত্তর অর্ধাংশ ব্যাপিয়া আমাজন অববাহিকার সমভূমি ও নিম্নভূমি বিস্তৃত আছে। ইহা পশ্চিমে অ্যাণ্ডীজের পাদদেশ হইতে পূর্বে অ্যাটল্যান্টিক উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাই এদেশের বৃহত্তম সমভূমি। ইহার দক্ষিণে বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনার কতকাংশ লইয়া রিও দ্য লা প্লাটার অববাহিকার সমভূমি বিস্তৃত। ইহা দক্ষিণ দিকে আর্জেন্টিনার প্যাম্পার তৃণভূমির সহিত যুক্ত এবং অপর তিন দিকে উচ্চভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর অংশের গিয়ানা মালভূমিতে ও ব্রাজিলের নিম্ন মালভূমি অঞ্চলে পৃথিবীর প্রাচীনতম পর্যায়ের অর্থাৎ প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের ভূগঠনের প্রচুর চিহ্ন (প্রাচীনতম গ্র্যানিট ও নিস্‌জাতীয় শিলা) বিদ্যমান। ব্রাজিলের পশ্চিম অংশে ও আর্জেন্টিনার প্রায় মধ্য ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া সিলুরিয়ান যুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের প্রাচীন শিলা দেখা যায়। এই মহাদেশের পূর্ব উপকূলের দক্ষিণ অংশ এবং তাহার নিকটবর্তী ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জেও ঐরূপ প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শিলা বিদ্যমান। পরে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে ঐ সকল দ্বীপে কতক পাললিক শিলা সঞ্চিত হয়। পারমিয়ান যুগে ব্রাজিলের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ হইতে দক্ষিণে ফকল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত অংশে কতক ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্ট হইয়াছে। আফ্রিকা, দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি স্থানের ভূগঠন এবং এই সময়ের উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ সম্পদ-সম্পর্কে এই মহাদেশের মিল লক্ষ্য করিয়া ইহাকে প্রাচীন গণ্ডোয়ানা ভূভাগের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম অংশে অ্যাণ্ডীজ পর্বতমালার অবস্থানের ফলে এখানকার পশ্চিমবাহিনী নদীসমূহ অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং পূর্ববাহিনী নদীগুলি দীর্ঘ। পূর্ববাহিনী নদী-সমূহের মধ্যে সর্বোত্তরে ওরিনকো। ইহা অ্যাণ্ডীজ পর্বতের ওরিয়েণ্টাল কর্ডিলেরা হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার (১৫০০ মাইল) পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার উপনদী অনেক। ক্যারোনি নদীর এঞ্জেল পৃথিবীর সর্বোচ্চ জলপ্রপাত। ইহা ৯৭৬ মিটারের (৩২০০ ফুট) অধিক উচ্চ। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে মাত্র ১৬০ কিলোমিটার (১০০ মাইল) দূরে অ্যাণ্ডীজ পর্বত অঞ্চল হইতে আমাজন ও উহার বহু উপনদী উৎপন্ন হইয়াছে। তথা হইতে উহারা গভীর খাতের মধ্য দিয়া ভূমির ঢাল অনুসারে কিছু দূর নামিয়া আসিয়া অত্যন্ত ধীরগতিতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। মূল নদী আমাজন প্রায় ৬৪০০ কিলোমিটার (৪০০০ মাইল) দীর্ঘ। তন্মধ্যে উহার মোহানা হইতে পেরু দেশে অ্যাণ্ডীজের পাদদেশের ইকুইটস শহর পর্যন্ত ৩৬৮০ কিলোমিটার (২৩০০ মাইল) পথ নাব্য। ইহার উপনদীর মধ্যে মাদিরা, তাপাজোজ, মারানিওন, নেগ্রো প্রভৃতি অনেকগুলি গঙ্গা নদী অপেক্ষা দীর্ঘ। আমাজন নদীর মোট অববাহিকার আয়তন প্রায় ৭৭০০০০০ বর্গ কিলোমিটার (৩০ লক্ষ বর্গ মাইল)। ইহার অধিকাংশ নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত নিম্নভূমি। প্যারাগুয়ে নদী মত্তোগ্রসো মালভূমির উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে উৎপন্ন হইয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে গিয়াছে; ইহা ঐ মালভূমির দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে উৎপন্ন প্যারানা নদীর সহিত মিলিত হইয়া মিলিত নদীটি প্যারানা নামে কিছু দূর বহিয়া গিয়াছে। পরে ব্রাজিলিয়ান হাইল্যাণ্ডের প্রায় দক্ষিণ অংশ হইতে উৎপন্ন এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত উরুগুয়ের সহিত মিলনের পর সমগ্র নদীটি রিও দ্য লা প্লাটা নামে অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীপথে এত রৌপ্য স্পেনীয় ও পর্তুগীজগণ এদেশ হইতে লইয়া গিয়াছিল যে ইহা লা প্লাটা অর্থাৎ রৌপ্যের নদী আখ্যা পাইয়াছে। ইহার মোহানা প্রশস্ত কিন্তু অত্যন্ত অগভীর। মহাদেশের অন্যান্য নদীর মধ্যে কলোরেডো, সাওফ্রান্সিস্কো, ম্যাগ্‌ডোলেনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি হ্রদ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে অ্যাণ্ডীজ অঞ্চলের পেরু ও বলিভিয়ার অন্তর্গত টিটিকাকা পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম হ্রদ। ইহা ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩৮১২ মিটার (১২৫০০ ফুট) উচ্চে অবস্থিত। ইহার

দৈর্ঘ্য প্রায় ২২০ কিলোমিটার (১৩৮ মাইল), প্রস্থ ১১০ কিলোমিটার (৬৯ মাইল), সর্বাধিক গভীরতা ২৭০ মিটার (৯০০ ফুট) এবং আয়তন ৮১৯২ বর্গ কিলোমিটার (৩২০০ মাইল)। ইহার দক্ষিণ-পূর্বে বলিভিয়ার পুপো হ্রদ আকারে অনেক ছোট। উত্তরে ম্যারাকাইবো বৃহত্তম উপহ্রদ। ইহাছাড়া এই মহাদেশে বহু হিমবাহ হ্রদও আছে।

দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ স্থল উষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও তথায় উচ্চতার জন্য নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা বিরাজমান। পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিকে উচ্চ পর্বত ও মালভূমি অঞ্চলে ভূমির উচ্চতার জন্য উষ্ণতা খুবই কম। গহন অরণ্যের জন্য উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত কম। মহাদেশের উত্তর অংশের তুলনায় দক্ষিণ ভূভাগ ক্রমশঃ অধিক সংকীর্ণ হওয়ার ফলে তথায় উত্তর অংশের তুলনায় গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুর উষ্ণতার পার্থক্য অত্যন্ত কম। পূর্ব উপকূলের নিকট দিয়া উষ্ণ ব্রাজিল স্রোত ও পশ্চিম উপকূলের নিকট দিয়া শীতল পেরু বা হাম্‌বোল্‌ড স্রোত প্রবাহিত হওয়ার ফলে উপকূল অঞ্চলে উষ্ণতার পার্থক্য খুব বেশি। গ্রীষ্মকালে (জানুয়ারি) এই মহাদেশের মধ্য ভাগে উষ্ণতা থাকে ২৭° সেন্টিগ্রেড, অথচ দক্ষিণ অংশে উষ্ণতা থাকে ১০° সেন্টিগ্রেড। মধ্যভাগে শীত ও গ্রীষ্মকালের উষ্ণতার তারতম্য সাধারণতঃ খুবই কম হইয়া থাকে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ অংশে আয়নবায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টি হয়। পশ্চিম দিকের পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশ পর্যন্ত এইপ্রকার অবস্থা দেখা যায়। অ্যাণ্ডীজ পর্বতের বাধার ফলে ঐ পর্বতের পশ্চিমে চিলি দেশের বৃষ্টিহীন উত্তর অংশে আটাকামা মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার দক্ষিণে চিলির মধ্য ভাগে শীতকালে প্রত্যায়ন বা পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয়। সেজন্য তথাকার জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয় প্রকৃতির। তাহার দক্ষিণ হইতে এই মহাদেশের সর্বদক্ষিণ বিন্দু পর্যন্ত অ্যাণ্ডীজ পর্বতের পশ্চিমাংশে সমস্ত বৎসর প্রত্যায়ন বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাহিরে হর্ন অন্তরীপের মত নিত্যদুর্যোগ পৃথিবীর অন্যত্র ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। তথায় বৎসরে ৯ মাস বৃষ্টি হয়। ইহা ভৌগোলিক আতিশয্যের দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য। অ্যাণ্ডীজ পর্বতের বাধার ফলে দক্ষিণে পর্বতের পূর্ব দিকে বৃষ্টি হয় না। সেজন্য তথায় নাতিশীতোষ্ণ প্যাটাগনিয়া মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে।

এই মহাদেশে নানাপ্রকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে আমাজন নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকার নিম্ন ও সমভূমি অংশে চির উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর জন্য পৃথিবীর যে বৃহত্তম চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য অবস্থিত উহার নাম সেল্‌ভাস। তথাকার অধিকাংশ গাছ ৬০-৯০ মিটার উচ্চ; অধিক মোটা নহে, কিন্তু উহাদের শাখা-প্রশাখা সুদূরপ্রসারী ও বিস্তীর্ণ। এখানকার সিডার, আব্‌লুস, রোজউড, মেহগনি, লগ্‌উড, গ্রীন্‌হার্ট, মোরা, বল্গরবার, বালাটা প্রভৃতি গাছের কাঠ খুব শক্ত ও মূল্যবান। তবে এখানে দারু-শিল্পের উপযোগী কোমল কাঠের একান্ত অভাব। ইহাছাড়া এখানকার বনে যাতায়াতের অনুন্নত ব্যবস্থা, অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব, হিংস্র বন্যজন্তু ও বিষাক্ত পোকার অত্যাচার প্রভৃতির জন্য লোকবসতি অতি কম। তাহার ফলে এখানকার অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগের অভাব খুব বেশি। অরণ্য অঞ্চল হইতে ক্রমশঃ উত্তর ও দক্ষিণে উদ্ভিদের পরিবর্তন হয়। নিরক্ষীয় অরণ্য হইতে ক্রমশঃ দূরের দিকে গাছের সংখ্যা কমিতে থাকে, তথায় দীর্ঘ ঘাসেরই প্রাধান্য। আরও দূরে ঘাস কম ও হ্রস্ব। এখানে মাঝে মাঝে বাবলাজাতীয় গাছ আছে। এই অঞ্চলের বৃক্ষযুক্ত বিস্তৃত তৃণভূমিকে পার্কল্যাণ্ডও বলা হয়। এই মহাদেশের বিভিন্ন অংশে তাহা ভিন্ন নামে অধিক পরিচিত। উত্তর দিকে ওরিনকো অববাহিকাতে উহার নাম ল্যানোস। বলিভিয়াতে উহাকে মন্টানা ও দক্ষিণ ব্রাজিলে ক্যাম্পস বলা হয়। আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের বিস্তীর্ণ অংশে আছে বিখ্যাত নাতিশীতোষ্ণ প্যাম্পা তৃণভূমি, তাহার উত্তর-পশ্চিমে চিলির আটাকামা মরুভূমি ও দক্ষিণে প্যাটাগনিয়া নাতিশীতোষ্ণ মরুভূমির স্থানে স্থানে কয়েকটি মরূদ্যান। চিলির মরুভূমির দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে বাবলা, চিরহরিৎ লরেল ও ভূমধ্যসাগরীয় উদ্ভিদ (দীর্ঘমূল পুরুপত্র) জন্মায়। সংবৎসরব্যাপী বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ওক, এলম, মেপল, বীচ, বার্চ প্রভৃতি গাছ অধিক জন্মে। ইহাদের কাঠ অত্যন্ত মূল্যবান। উচ্চতার তারতম্যের জন্য পশ্চিম দিকের পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভিদের পার্থক্য হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন এই মহাদেশের অন্যান্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ উল্লেখযোগ্য; আর্জেন্টিনার এল্‌ গ্রান চাকো অঞ্চলে কেব্রাচো গাছের সাহায্যে প্রচুর ট্যানিক অ্যাসিড তৈয়ারি হয়। প্যারাগুয়ের অম্বু, টিম্বো ও প্যারানা পাইন গাছ বিখ্যাত। প্যাম্পা অঞ্চলে প্রচুর ইউক্যালিপ্‌টাস বৃক্ষ জন্মে। শুষ্ক ও উষ্ণ অঞ্চলের কার্ণাউবা গাছের তৈলজাতীয় পদার্থদ্বারা মোম, গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। অ্যাণ্ডীজ পর্বত অঞ্চলের টাগুয়াপাম গাছের পাকা বীজ ভেজিটেব্‌ল আইভরি নামে পরিচিত। ইহা বিদেশে প্রচুর রপ্তানি করা হয়। ঐ অঞ্চলের

কর্ক্‌উড বা বালসা গাছের কাঠ শক্ত অথচ সোলা অপেক্ষা হালকা, তাহার দ্বারা তৈয়ারি নৌকা বালসা নামে পরিচিত। ঐ কাঠের দ্বারা বিমানপোতের বিভিন্ন অংশ এবং বৈদ্যুতিক শিল্পের ইন্‌সুলেটিং জিনিষপত্র তৈয়ারি হয়। তৃণগুল্মাঞ্চলে স্ক্রুপাম বা পানামা হ্যাটপাম জন্মায়। ইহার পাতার আঁশের দ্বারা প্রস্তুত টুপি পানামা হ্যাট নামে পরিচিত। এখানকার ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে সিন্‌কোনা, সার্সাপারিল্লা প্রভৃতি বিখ্যাত।

এই মহাদেশের কৃষিঅঞ্চল-সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, উষ্ণ-ক্রান্তীয় ও নিরক্ষীয় জলবায়ু, ঘন বন ও জলাভূমির জন্য ব্রাজিলের ৮০% সমভূমি ও নিম্নভূমি হওয়া সত্ত্বেও তথাকার ৪-৫%-এর অধিক জমিতে কৃষিকার্য হয় না। অপরপক্ষে বিভিন্ন মালভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলের গায়ে ও উপত্যকাতে যথেষ্ট চাষ-আবাদ বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তথাকার কতক অংশে ধাপে ধাপে চাষ হয়। এই মহাদেশের বিভিন্ন অংশে উৎপন্ন ফসলসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—এখানে পৃথিবীর অধিকাংশ কফি জন্মে এবং তাহার দুই-তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হয় ব্রাজিলের পূর্ব অংশের মালভূমিতে। কফি-উৎপাদনে কলম্বিয়ার স্থান ঐ মহাদেশে দ্বিতীয়। তবে ভেনেজুয়েলার কফি আরও উৎকৃষ্ট, সেজন্য উহাই সে দেশের প্রধান রপ্তানিদ্রব্য। ব্রাজিল, ইকুয়েডর প্রভৃতি দেশে প্রচুর কোকো জন্মে। পৃথিবীর মধ্যে কোকো-উৎপাদনে ব্রাজিলের স্থান দ্বিতীয়। ব্রাজিলের কিছু আবাদি জমিতে ফোর্ড মোটর কোম্পানীর পরিচালনায় রবার চাষ হয়। মহাদেশের ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে আখ, কার্পাস, তামাক প্রভৃতি ফসল প্রচুর উৎপন্ন হয়। বর্তমানে এখানকার অনেক বৃহৎ চাষের খামারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য হয়। দক্ষিণে আর্জেন্টিনার প্যাম্পা অঞ্চলের প্রধান ফসল গম। মহাদেশের উত্তর অংশে খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান ও ভুট্টা প্রধান। এখানকার ভুট্টা-উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে দ্বিতীয়। উষ্ণ অঞ্চলে আম, নারিকেল, চুপড়ি আলু প্রভৃতি জন্মে। ব্রাজিলে কমলালেবু-উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীতে দ্বিতীয়। পশ্চিমে মধ্য চিলির ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বড় বড় খামারে জলসেচের সাহায্যে প্রচুর গম, যব, আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি এবং কমলালেবু, অলিভ, আঙুর প্রভৃতি ফল জন্মে। পূর্ব দিকে ব্রাজিলের দক্ষিণ অংশে ও প্যারাগুয়ে প্রভৃতি দেশে ইয়ার বা মাটে (সবুজ চা) জন্মে। ইহা তথাকার প্রিয় পানীয়।

এই মহাদেশের বিভিন্ন অংশে নানাপ্রকার বিচিত্র

প্রাণী বাস করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সেল্‌ভাস অরণ্যে আছে বহু পুমা (সিংহের মত), জাগুয়ার ও বন্য বিড়াল। এখানে দন্তহীন পিপীলিকা-ভুক আর্মাডিলো আছে। উষ্ণমণ্ডলের ল্যানোস ও অন্যান্য সাভানাজাতীয় অঞ্চলে অনেক পেকারি ও টেপির বাস করে। ক্রান্তীয় তৃণভূমি ও পশ্চিম দিকের গালাপাগস দ্বীপপুঞ্জে অসংখ্য রকমের পাখি দেখা যায়। গালাপাগসকে প্রকৃতিবিদ্‌গণের স্বর্গ বলা হয়। সেখানে পৃথিবীর বৃহত্তম কচ্ছপ দেখা যায়। পশ্চিম দিকের পার্বত্য অঞ্চলে বহু লামা, আলপাকা ও ভিকুনিয়া বাস করে। ইহাদের লোমদ্বারা মসৃণ পশম নির্মিত হয়। আলপাকার পশম উৎকৃষ্ট। লামা উট-জাতীয় প্রাণী, কিন্তু কুঁজহীন। ইহারা পার্বত্য অঞ্চলে ভারবহনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

দক্ষিণ আমেরিকা স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, তাম্র, হীরক, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি বহু খনিজ সম্পদে পূর্ণ; কিন্তু এখানকার অধিকাংশ খনি উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত থাকায় তথায় যাতায়াত ও পরিবহন অসুবিধাজনক, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং তাহাদের খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহের কাজও অসুবিধাজনক। ইহা ভিন্ন পূর্বে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের পক্ষেও অসুবিধা ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ে সুবিধা ও উন্নতির ফলে এখানকার খনিজ-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। খনিজ সম্পদের মধ্যে অ্যাণ্ডীজের পার্বত্য অঞ্চলে আটাকামা মরুভূমির নিকট তাম্রই প্রধান। চিলির অ্যাণ্ডীজ পর্বত অঞ্চলে ২৪৪০ মিটার (৮০০০ ফুট) উচ্চে অবস্থিত চুকুইকামাটা পৃথিবীর বৃহত্তম তাম্রখনি। তাম্র-উৎপাদনে চিলির স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। উৎকৃষ্ট লৌহ পাওয়া যায় ব্রাজিল দেশের পার্বত্য অঞ্চলে। তথাকার লৌহসম্ভারের পরিমাণ সম্ভবতঃ পৃথিবীতে প্রথম। ম্যাঙ্গা-নিজের উৎপাদন-সম্পর্কেও ঐ অঞ্চল বর্তমানে প্রায় ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক বক্সাইট পাওয়া যায় গিয়ানা রাজ্যগুলিতে। গিয়ানা রাজ্যে স্বর্ণ, হীরক, লৌহ, ক্রোমাইট ও গ্রাফাইটও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। খনিজ তৈল-উৎপাদনে ভেনেজুয়েলা রাজ্যের স্থান পৃথিবীতে তৃতীয়। তথাকার প্রধানকেন্দ্র মারাকাইবো হ্রদ অঞ্চল। ঐ দেশের উত্তর উপকূলে কুমানার পাশে অবস্থিত বের্মুডেজ হ্রদ পৃথিবীর একটি প্রধান অ্যাসফল্ট সংগ্রহের কেন্দ্র। টিন-উৎপাদনে বলিভিয়া দেশের স্থান পৃথিবীতে তৃতীয়। ঐ রাজ্যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিসমাথ পাওয়া যায়। রৌপ্য-উৎপাদনে বলিভিয়ার স্থান পৃথিবীতে তৃতীয়; সীসা-উৎপাদনে ঐ দেশের স্থান পঞ্চম। পূর্বে এই মহাদেশের একটি প্রধান খনিজ সম্পদ ছিল চিলি

সল্ট পিটার। চিলি সল্ট পিটারের সহিত পটাসিয়াম আয়োডাইড পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন উৎপন্ন হয়। বর্তমানে কৃত্রিম বা রাসায়নিক সার তৈয়ারির ফলে চিলি সল্ট পিটারের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে।

এই মহাদেশের শিল্পসমূহ সাধারণতঃ ক্ষুদ্র বা কুটীর-শিল্পের অন্তর্গত। ব্রাজিল ও পেরু দেশের চিনিশিল্প, আর্জেন্টিনার দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ও পশমশিল্প, বিভিন্ন স্থানের চর্মশিল্প, নানাপ্রকার বস্ত্রশিল্প, কাগজশিল্প, রবারশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, মদ্যশিল্প, রাসায়নিকশিল্প প্রভৃতি যথেষ্ট উন্নত।

এই মহাদেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নত। গম, কার্পাস, কফি, মাটে কোকো, তামাক, চিনি, কমলালেবু, গবাদি পশু প্রভৃতি পণ্য হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তামাক, আলু, বিলাতী বেগুন এখান হইতেই প্রথম নীত হইয়া সভ্যজগতে প্রচলিত হয়। এখানকার বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উত্তর আমেরিকা ও ইওরোপের সহিত অধিক হইয়া থাকে। ব্রাজিল সর্বাপেক্ষা অধিক কফি (মোট রপ্তানির ৫০%) রপ্তানি করে। প্রাণিজ সম্পদের মধ্যে আর্জেন্টিনা রপ্তানি করে প্রচুর মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য ও চর্ম এবং ব্রাজিল করে প্রচুর কুমীরের চামড়া। খনিজ সম্পদের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান রপ্তানিদ্রব্য হইল খনিজ তৈল, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ, রৌপ্য, টিন, সীসা, সোডিয়াম নাইট্রেট ও আয়োডিন।

মহাদেশের যানবাহন ও যাতায়াতের ব্যবস্থার বর্তমানে যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। এখানকার বিভিন্ন পথের মধ্যে পশ্চিম উপকূল দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্যান-আমেরিকান হাইওয়ে বিখ্যাত। পূর্বে বিভিন্ন শিল্পের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে রেলপথের স্থাপনা করা হয়, কিন্তু এইগুলি প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন মাপের বলিয়া পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের অসুবিধা হইয়াছে। এই মহাদেশের আর্জেন্টিনাতে ৪৩২০০ কিলোমিটার (২৭০০০ মাইল) ও ব্রাজিলে ৩৩৬০০ কিলোমিটার (২১০০০ মাইল) দীর্ঘ রেলপথ আছে। পেরু দেশে সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৪৭৭৮ মিটার (১৫৬৬৫ ফুট) উচ্চ অংশ দিয়া বিস্তৃত। ইহাই পৃথিবীর উচ্চতম রেলপথ। ইহা ছাড়া পেরু দেশের সাদার্ন রেলওয়ে, চিলি ও বলিভিয়ার এরিকা-লা প্লাজ রেলওয়ে, চিলি ও বলিভিয়া রাজ্যের এন্টোফাগাস্টা-বলিভিয়া রেলওয়ে, ইকুয়েডর-গুয়াকিলকিটো রেলওয়ে প্রভৃতি রেলপথ দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন উচ্চ অংশের উপর দিয়া বিস্তৃত। এই মহাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর মধ্য দিয়া যাতায়াত ও পরিবহনের যথেষ্ট সুবিধা ও ব্যবস্থা আছে। বিমানযোগে আকাশপথে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত হইতেছে।

বহু প্রাচীনকাল হইতে এশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ অংশের কিছু অধিবাসী বিভিন্ন সময়ে দলে দলে স্থলপথে উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অংশের আলাস্কা হইয়া উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অংশে এবং ক্রমশঃ আরও দক্ষিণে মধ্য আমেরিকা ও এই মহাদেশে আসিয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এরূপ লোক-সমাগমের প্রমাণ পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ শতকে ইওরোপীয়গণের আগমনের পূর্বে এই মহাদেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতির বহু লোক বাস করিত। তাহাদের মধ্যে উত্তর উপকূলে ছিল কারিব ও আরাওয়াক জাতি; তাহার দক্ষিণে ভেনেজুয়েলা ও গিয়ানা মালভূমি অঞ্চলে ছিল চিবচা জাতি, মধ্যভাগের পূর্ব অংশে ব্রাজিলে ও লা প্লাটা অববাহিকাতে টুপিগুয়ারানি জাতি বাস করিত, মধ্য ভাগের নিম্ন অংশে ছিল কুইচুয়া জাতি এবং পশ্চিমের পার্বত্য অংশে ছিল আইমারা ইণ্ডিয়ান জাতি। অন্যান্য মহাদেশের মত এই মহাদেশের অধিকাংশ লোক উপকূল অঞ্চলে বা তাহার নিকটে সুবিধাজনক স্থানে বাস করিত। জলবায়ু ও ঘন বনের জন্য মধ্যভাগের সমভূমি ও নিম্নভূমিতে লোক বসতি প্রায় ছিল না। এই জাতিগুলির অন্যতম ইন্কা জাতি পরবর্তী কালে অন্যান্য জাতিদের উপর প্রভুত্ব করে। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনীয় ও পর্তুগীজদের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত কুইটো হইতে বলিভিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ দেশ ইন্কাদের অধিকারে ছিল।

ইওরোপের অধিবাসীগণ এই মহাদেশের অস্তিত্ব বহু পূর্বে অবগত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৪৯২-৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলম্বাসকর্তৃক উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কতক অংশ আবিষ্কার এবং তাহার প্রায় সমসাময়িক (১৪৯৯ খ্রী) আমেরিগো ভেস্পুচিকর্তৃক ঐ সকল স্থানে অভিযান ও তাহার বিবরণ প্রকাশের পর হইতেই ইওরোপের অধিবাসীগণের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয়। ১৫শ শতকে নবাগত ইওরোপীয়গণের মধ্যে স্পেনীয়গণ মোটামুটি ৪৮° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখার পশ্চিম অংশে এবং পর্তুগীজগণ পূর্ব অংশে আপন আপন রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। স্পেনদেশীয় পিৎসারো ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্কাগণের রাজধানী কুজ্কো অধিকার করে। ইহার পর মাত্র ৩০ বৎসরের মধ্যে ঐ মহাদেশের পশ্চিম অংশের উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪৮০০ কিলোমিটার (৩০০০ মাইল) বিস্তৃত অঞ্চল তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়। ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজগণ ঐ মহাদেশে আসিলেও প্রধানতঃ অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য তথায় রাজ্য বিস্তারে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই।

দক্ষিণ আমেরিকায় দ্রুত রাজ্যবিস্তার আরম্ভ করার

দক্ষিণ আমেরিকা

সঙ্গে সঙ্গে এখানকার শাসন ও সমাজব্যবস্থা-সম্পর্কে নিম্নলিখিত মর্যাদা-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়—সর্বোপরি স্পেন ও পর্তুগাল সরকারকর্তৃক নিযুক্ত ও তথা হইতে প্রেরিত গভর্ণরগণ, তাহার নীচের স্তরে গভর্ণরগণের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ, তাহার নীচের স্তরে ঔপনিবেশিক স্পেনীয় ও পর্তুগীজগণের খাঁটি বংশধরগণ এবং সর্বনিম্নে মিশ্রজাতিদের স্থান ছিল। স্বদেশের সহিত এখানকার পর্তুগীজ কর্তাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না; পরবর্তী কালে উনবিংশ শতকে পর্তুগালের সহিত এখানকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়। নাপোলেঅঁকর্তৃক স্পেন জয় ও স্পেনের নৌশক্তি খর্ব করার ফলে এখানে স্পেন দেশের সরকারের প্রভাব নষ্ট হয়। ইহাছাড়া গভর্ণর এবং তাহাদের নিম্নস্তরের অধিবাসীগণের সহিত ইণ্ডিয়ান, নিগ্রো প্রভৃতি অধিবাসীগণের স্বার্থসম্পর্কে বিরোধ ক্রমশঃ বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। ফলে দক্ষিণ ইওরোপের সহিত এখানকার বাণিজ্য ও অন্যান্য সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে এখানকার বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এইভাবে উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে এই মহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনযুগের অবসান ও গণতান্ত্রিক যুগের সূত্রপাত হয়। এই সময়েই এখানে নূতন দেশসমূহ সৃষ্ট হয় এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সীমা ও অন্যান্য বিষয়ে কিছুকাল বিবাদ-বিসংবাদও চলে। এই সময়ে জনগণের নেতা সাইমন বলিভারের নাম অনুসারে রাজ্যের বলিভিয়া নামকরণ হয়। বর্তমানে গিয়ানার তিনটি অংশ ভিন্ন বাকি দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। এখানকার বিভিন্ন দেশের রাজধানী, আয়তন, লোকসংখ্যা প্রভৃতি নিম্নে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল :

দেশ	রাজধানী	আয়তন (হাজার বর্গ কিলোমিটারে)	লোকসংখ্যা (লক্ষ) বিগত আদমশুমার অনুসারে
আর্জেন্টিনা	বুয়নেস এয়ারেস	২৭৮৯	২২২
ইকুয়েডর	কিটো	২৭১	৪৬
উরুগুয়ে	মন্টিভিডিও	১৮৬	২৬
কলম্বিয়া	বোগোটা	১১৮৩	১৭৫
গিয়ানা	জর্জটাউন	২১৫	৬
চিলি	সান্টিয়াগো	৭৪১	৮৫
প্যারাগুয়ে	আসান্‌সিওন	৪০৭	১৮
পেরু	লিমা	১২৮৫	১০৪
ফরাসী গিয়ানা	কায়য়েন	৫৮	৫
সুরিনাম	প্যারা মোরিনো	১৬০	৩

দক্ষিণ আমেরিকার নবজন্মের পর হইতে তথায় কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ ও পরিবহনব্যবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সময়েই ব্রাজিলে কফির চাষ আরম্ভ হইয়াছে। কোকো ও কার্পাসের চাষ, চর্ম ও নানাবিধ কৃষিজাত শিল্পের প্রচলন এই সময় হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রেলপথনির্মাণ আরম্ভ হয়। বিভিন্ন শিল্প, যোগাযোগ ও পরিবহনব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। পানামা খাল খনন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য এখানকার সকল বিষয়ে উন্নতির পথ সুগম হইয়াছে।

বর্তমানে এই মহাদেশের বিভিন্ন অংশে মোট ১৬ কোটির অধিক লোক বাস করে। অধিবাসীগণ নিগ্রো, ইন্‌কা ও অন্যান্য আদিম জাতির বংশধর এবং বিভিন্ন মিশ্রজাতি লইয়া গঠিত। ইহাছাড়া বিদেশীয়গণের মধ্যে প্রাচীন ইওরোপীয়গণের বংশধর ও নবাগতও আছে। এখানকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইহারাই সর্ব্বোচ্চ স্তরের অধিবাসী। প্রাচীন স্পেনীয় ও পর্তুগীজগণের বংশধরগণ দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিল, লা প্লাটা অববাহিকা ও মধ্য চিলিতে অধিক বাস করে; ইটালীয়গণ বাস করে প্রধানতঃ দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিলে, উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনাতে; জার্মানগণ দক্ষিণ ব্রাজিলে এবং ইংরেজগণ প্রধানতঃ আর্জেন্টিনাতে বাস করে; নিগ্রোগণ প্রধানতঃ উষ্ণমণ্ডলে বাস করে। ইহারা আর্থিক বিচারে প্রায় সর্বনিম্ন স্থানের অধিকারী। ইন্‌কাগণের বংশধরগণ পেরু দেশেই অধিক সংখ্যায় বাস করে। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানকার বিভিন্ন দেশের মোট অধিবাসীগণের কত অংশ ইণ্ডিয়ানগণের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত তাহা নিম্নের তালিকা হইতে সহজেই বুঝা যায় :

প্যারাগুয়ে ৬৫%; পেরু বলিভিয়ার বিভিন্ন অংশে ৩৭-৬২%; ইকুয়েডরের বিভিন্ন অংশে ২৭-৬০%; চিলি ৭·৪%; কলম্বিয়া ২-৭%; ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে ২%।

অর্থনৈতিক বিচারে ইণ্ডিয়ানগণ খুব নিম্নস্তরে। বিভিন্ন দেশে ইহাদের ঘরবাড়ি প্রায় কুঁড়ে ঘরের মত। ইহারা তীর-ধনুর সাহায্যে মাছ ও পশু শিকার করিয়া থাকে। ভেনেজুয়েলার ম্যারাকাইবো হ্রদের ধারে ইহারা উঁচু খুঁটির উপর ঘর তৈয়ারি করিয়া বাস করে। ইণ্ডিয়ানগণের বিভিন্ন উপশাখার মধ্যে চিলির তৃণভূমি অঞ্চলের হুয়াসো এবং আর্জেন্টিনার গৌচাগণ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী বলিয়া পরিগণিত। এই মহাদেশের নানাপ্রকার মিশ্র-জাতিসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল

মেষ্টিজোগণ; ইহারা ইওরোপীয় ও ইণ্ডিয়ানগণের মিশ্রজাতি। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু ও চিলি দেশে ইহারা অধিক সংখ্যায় বাস করে। ইহাদের অবস্থা খাঁটি ইওরোপীয়গণের পরেই। ইহাদের কতক উপশাখা অন্যান্য অংশেও আছে। ইণ্ডিয়ান নিগ্রোগণের মিশ্র মুলাটো জাতির লোকেরা ব্রাজিলে অধিক সংখ্যায় বাস করে। ইহা ভিন্ন আরও নানা রকমের মিশ্রজাতি আছে।

এই মহাদেশে প্রায় ১০০টি ভাষা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রাচীন ভাষাসমূহ প্রধান। আরাওয়াকান এখানকার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত ভাষা এবং বহু শাখায় বিভক্ত। টুপিগুয়ারানিও একটি অত্যন্ত ব্যাপক ভাষা। ইহার টুপি শাখা ব্রাজিলের পূর্বাংশে এবং গুয়ারানি ভাষা প্যারাগুয়ে দেশে অধিক প্রচলিত। জি ভাষা ব্রাজিলের পূর্বাংশে ও ক্যারিবিয়ান ভাষা আমাজন নদীর উত্তর হইতে উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত অংশে প্রচলিত। পশ্চিম দিকের পার্বত্য অঞ্চলের পেরু ও বলিভিয়া দেশে আয়মারান ভাষা এবং কলম্বিয়াতে চিবচান ভাষা প্রচলিত ছিল। পরে চিবচানের পরিবর্তে কুয়েচান ভাষা প্রচলিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসনকালে স্পেনীয় পর্তুগীজ ভাষা প্রচলিত হয়। তদবধি এই দুইটিই তথাকার সর্বপ্রধান ভাষা।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাদির ফলে উত্তর-পশ্চিমে ইকুয়েডর, দক্ষিণ-পশ্চিমে চিলি এবং পূর্ব দিকে ব্রাজিলের পূর্বাংশে আবিষ্কৃত প্রস্তর ও অস্থিনির্মিত বিভিন্ন জিনিস লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অংশের অধিবাসীগণের প্রায় সমকালে এখানে কতকগুলি যাযাবরজাতিও বাস করিত। পেরু দেশের উপকূল, ঐ দেশ ও বলিভিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রস্তর-নির্মিত বিভিন্ন জিনিস লক্ষ্য করিলে ঐ সকল স্থানে পরবর্তী সময়ে (২৫০০-১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল আরও উন্নত সভ্যতার এবং আরও পরবর্তী সময়ের (১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ-৩০০ খ্রী) উন্নততর সভ্যতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্যসম্পর্কে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পরবর্তী ১০০০ বৎসর কালকে 'সভ্যতার স্বর্ণযুগ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ঐ সময়ে পেরু দেশের উত্তর অংশে মোচিয়া বা প্রাচীন চেমু সভ্যতা এবং দক্ষিণ অংশে নাজকা সভ্যতা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ঐ সকল স্থানে বস্ত্র ও মৃৎশিল্পের বহু উন্নততর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সামান্য পরে বলিভিয়া দেশের টিয়া হুঁয়াকো সভ্যতা ইহাদের তুলনায় অধিকতর উন্নত ছিল এবং পেরু দেশ হইয়া দক্ষিণে চিলি পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; কিন্তু অল্প কালের মধ্যে তাহার পতন ঘটে এবং চেমু বা মোচিয়া সভ্যতা আবার প্রাধান্য লাভ করে। ঐ সময়েই (আনুমানিক ১২০০ খ্রী) ইকুয়েডর, পেরু ও চিলি দেশের বিস্তীর্ণ অংশে স্থাপিত হইয়াছিল ইন্‌কা সভ্যতা। ইন্‌কাগণের সমাজব্যবস্থায় দুইটি স্তর ছিল; প্রথম স্তরে স্বয়ং ইন্‌কারাজ ও তাহার পরিবারবর্গ এবং দ্বিতীয় স্তরে শ্রমিক, কর্মচারী প্রভৃতি। ইন্‌কাগণ তাহাদের নেতাকে রাজা ও সূর্যের প্রতীক মনে করিত। তাহাদের সমাজ ও শাসনব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ছিল। জনসাধারণ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক দল ও উপদলের এক-একজন নেতা ছিলেন। দেশের শ্রমকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইত; বার্ধক্য ও অসুস্থতা প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোনও কারণে কেহই কায়িক শ্রম হইতে অব্যাহতি পাইত না; দেশে উৎপন্ন সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত ছিল, তখন অর্থের প্রয়োজন ছিল না, বাণিজ্যও ছিল না। শাসন ও অন্যান্য কাজের পারিশ্রমিক বা শ্রমমূল্য এবং পুরস্কার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসের মাধ্যমে সাধারণতঃ পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণ করা হইত। তখন তাহাদের সমাজে সংগঠন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক সর্ববিষয়ে যথেষ্ট উন্নতির প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

তখন তাহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষিকার্য। বিভিন্ন অংশে ভুট্টা, আলু, যব প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। তাহারা লামা, আলপাকা ও ভিকুনা প্রভৃতি পশু পালন করিত এবং মহিলারা ঐ সকল পশুর পশমদ্বারা নানাপ্রকার বস্ত্র তৈয়ারি করিত। তখন লৌহের ব্যবহার ছিল না, কিন্তু স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত বস্ত্র ও অলংকার এবং স্বর্ণমণ্ডিত মন্দির ও গৃহসজ্জার নির্মাণে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চুণ-সুরকির ব্যবহার ব্যতীত ও লৌহের ব্যবহার ব্যতীত পাথরের বিরাট খণ্ডদ্বারা দুর্গ, রাজপথ, প্রাসাদ, মন্দির, রাজধানীর প্রাচীর, সেতু প্রভৃতির নির্মাণে তাহাদের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ইন্‌কারা উপযুক্ত স্থানে খাল, সুরঙ্গ বা নালা কাটিয়া মরুভূমিকেও উর্বর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। লিখিত ভাষা না থাকিলেও তাহারা গিট দেওয়া রঙ্গিন সুতলী বা অন্য কিছুর সাহায্যে ভাষার কাজ চালাইত।

এই মহাদেশের বিভিন্ন মন্দির, রাজপ্রসাদ ও ঐরূপ বিখ্যাত স্থানে প্রাচীন শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বলিভিয়াতে প্রাচীন টিয়া হুঁয়াকো যুগের ব্যসনল, কঠিন বেলে পাথর প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত

অপূর্ব গম্বুজ, মৃতদেহের মমি প্রভৃতি প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শনের মতই চিত্তাকর্ষক। পেরু দেশে মিশরীয় পিরামিডের মত শত শত পিরামিড আছে। তথাকার চোচুলা পিরামিড পৃথিবীতে বৃহত্তম, চেপস পিরামিডের উচ্চতা আরও অধিক, তবে আয়তন কম। পরবর্তী ইন্‌কাযুগে তাহাদের রাজধানী কুজ্‌কো ও তাহার পার্শ্ববর্তী মাচুপিচু দুর্গের নির্মাণকৌশল অতি চমৎকার। ঐ সময়ের মন্দিরগাত্রের মৃন্ময় পাখি, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, দেবমূর্তি প্রভৃতি মৃৎশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। তাহার পূর্ববর্তী টিয়া হুঁয়াকো যুগের মৃৎশিল্পও চমৎকার। ঐ উভয় যুগের স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন প্রভৃতির তৈয়ারি বিভিন্ন অলংকার, মুখোশ প্রভৃতি তৎকালীন শিল্পোন্নতির নিদর্শন। ইহা ভিন্ন চানচানে নানাপ্রকার প্রাচীন মূর্তি ও কারুকার্যখচিত দীর্ঘ প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ যুগের বস্ত্র এবং সূচিশিল্পও বিখ্যাত। তখনকার কতকগুলি বস্ত্রের উভয় দিকেই সুন্দর বর্ণ ও চিত্রপারিপাট্য লক্ষিত হয়। পেরু দেশের কার্পাস ও পশমশিল্পের নিদর্শন আরও চমৎকার।

এই মহাদেশের বিভিন্ন নগর ও বন্দরের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

বলিভিয়া দেশের লা পাজ ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয়গণ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর সর্বোচ্চ (প্রায় ৩৬৬০ মিটার বা ১২০০০ ফুট উচ্চ) রাজধানী। উহা পার্বত্য খাতে প্রায় ৬১০ মিটার বা ২০০০ ফুট উচ্চ পর্বতশ্রেণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ রাজ্যের সুক্রে ইন্‌কাযুগের বিখ্যাত তীর্থ। তথাকার সূর্যমন্দির তৎকালীন পশ্চিম গোলার্ধের সর্বপ্রধান অট্টালিকা। ঐ দেশের কুজ্‌কো লা পাজের প্রায় সমান উচ্চ। উহা ইন্‌কাযুগে রাজধানী ছিল। তথায় ঐ যুগের বিখ্যাত সূর্যমন্দির, রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও সেচব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। পেরু দেশের চানচান (চান—মেক্সিকো ভাষায় সর্প) একটি বিখ্যাত সর্পনগর। তথায় সর্পকে জীবন্ত দেবতা জ্ঞান করা হইত এবং তাহাদের বাসস্থান হিসাবে প্রাসাদ তৈয়ারি হইত। ঐ দেশের রাজধানী লিমা (নৃপতিগণের নগর) পিৎসারো-কর্তৃক ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ও উপাসনাগার বিখ্যাত। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ঐ সকল স্থান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাহাদের কতক পরে পুনর্গঠিত হয়। এখানে প্রায় ৪৫৭৫ মিটার বা ১৫০০০ ফুট উচ্চে পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেলপথ নির্মিত হইয়াছে। তাহা প্রকৃত এল ডোরাডো বা অ্যাণ্ডীজ পর্বতের বিভিন্ন স্বর্ণখনি এবং পটোসি ও কার দ্য পাস্কোর রৌপ্যখনির সহিত যুক্ত। ইকুয়েডর দেশের রাজধানী কিটো ঠিক নিরক্ষরেখার উপর ধ্বংসপ্রাপ্ত ইন্‌কা-নগরের উপর স্পেনীয়গণ কর্তৃক পুনর্নির্মিত হইয়াছে। ইহা প্রায় ২৭৪৫ মিটার বা ৯০০০ ফুট উচ্চ এবং এখানে বৈচিত্র্যহীন চিরবসন্ত (নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু) বর্তমান। ইহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে পিচিঞ্চা (জলন্ত পর্বত)-নামক আগ্নেয়গিরি। ব্রাজিলের প্রাচীন রাজধানী রিও দ্য জেনিরো ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নিমজ্জিত উপত্যকাতে অবস্থিত। ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর সমুদ্র-বন্দর ও পোতাশ্রয়-সমূহের অন্যতম। ব্রাজিলের দ্বিতীয় নগর সাও পাওলো 'পামযুক্ত শিকাগো' নামে পরিচিত। ইহা ল্যাটিন আমেরিকার শিল্পরাজধানী নামেও অভিহিত। এখানে বিভিন্ন জাতের লোক বাস করে। এই রাজ্যের কার্টাজেনা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। তাহাদের কোনও কোনওটির দেওয়াল ১২ মিটার (৪০ ফুট) পর্যন্ত পুরু ছিল। প্যারাগুয়ের রাজধানী আসানসিওন স্পেনীয় যুগে প্রতিষ্ঠিত। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীনতম নগরসমূহের অন্যতম। বর্তমান কালে ইহার বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। উরুগুয়ের রাজধানী মন্টিভিডিওতে সে দেশের অর্ধেক লোক বাস করে। এখানে সমুদ্রের দিকে প্রসারিত প্রস্তরময় নিম্ন ভূমির উপর প্রাচীন নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখন তাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। পার্শ্বের উচ্চ ভূমিতে আধুনিক নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার প্লাজা ইণ্ডিপেণ্ডেন্সিয়া (স্বাধীনতার ভূমি) রাজনৈতিক ও সামাজিক কেন্দ্র। এখানকার মার্বেল প্যালেসসংলগ্ন গোলাপফুলের উদ্যান এত চমৎকার যে এই নগরকে গোলাপফুলের নগরও বলা হয়। আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়নেস এয়ারেস দক্ষিণ আমেরিকার সর্বাপেক্ষা সুন্দর নগর। ইহাকে দক্ষিণের পারী (প্যারিস) বলা হয়। ইহা রিও দ্য লা প্লাটা নদীর তীরে সমুদ্র হইতে ২৭৫ কিলোমিটার বা ১৭২ মাইল দূরে অবস্থিত নদী-বন্দর। বন্দর হিসাবে পশ্চিম গোলার্ধে নিউ ইয়র্কের পরেই ইহার স্থান। ইহা ২৪ঘণ্টা কর্মচঞ্চল নগর। সেজন্য বলা হয় যে এই নগর কখনও ঘুমায় না। চিলির রাজধানী স্যান্টিয়াগোর অবস্থিতি ও জলবায়ু চমৎকার। এখানে বহু প্রাচীন প্রস্তরনির্মিত গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আছে। ঐ দেশের দক্ষিণ সীমায় ম্যাজেলান প্রণালীতে অবস্থিত পুণ্টা এরেনাস পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ অংশের শহর।

দ্র M. B. Synge, *A Book of Discovery*, London, 1912; L. D. Stamp & others, *Geography for*

Today, Book II: Southern Continents, London, 1937; H. T. Wilkins, *Secret Cities of Old South America*, London, 1952; H. Bernstein, *Modern & Contemporary Latin America*, Philadelphia, 1952; *South American Handbook*, 30th Edition, 1953; J. H. Steward, *Native Peoples of South America*, New York, 1959; B. Mackworth Praed and others, *Year with Three Summers (South America)*, London, 1964.

লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী

দক্ষিণরায় বাংলার প্রসিদ্ধ লৌকিক দেবতা। ইহাকে মেদিনীপুর, যশোহর, খুলনা এবং চব্বিশ পরগনা জেলায় প্রায় সকল শ্রেণীর, বিশেষতঃ অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুরা পূজা করে। ইহার পূজার আধিক্য দেখা যায় চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশে, সম্ভবতঃ ঐ অঞ্চলই দক্ষিণ-রায়ের পূজার উৎপত্তিস্থল। সুন্দরবনের অধিবাসী এবং ঐ অরণ্যে যাতায়াতকারী সকল শ্রেণীর হিন্দু, এমন কি বহু মুসলমানও দক্ষিণরায়কে অরণ্যরক্ষক এবং ব্যাঘ্রকুলের অধিদেবতা বলিয়া বিশ্বাস ও পূজা করেন। দক্ষিণরায়ের পূর্ণ মূর্তি অতি সুশ্রী এবং বীরোচিত। পরিচ্ছদ ও প্রহরণাদি হিন্দুযুগীয় যোদ্ধা বা রাজার অনুরূপ। মূর্তিব্যতীত ইহার 'বারা' বা মুখমণ্ডল-অঙ্কিত ঘট প্রতীকরূপে পৌষ-সংক্রান্তি বা পয়লা মাঘে ব্যাপকভাবে পূজিত হয়। দক্ষিণরায়ের বার্ষিক বা বিশেষ পূজাকে 'রায়ের জাতাল পূজা' বলা হয়। অনেক স্থলে ব্রাহ্মণেতর জাতির লোক ইহার পূজায় পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণরাম দাস প্রভৃতি ইহার মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। 'কালুরায়' দ্র।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

দক্ষিণা শ্রাদ্ধ, ব্রত, পূজা, দানাদি ধর্মকার্যের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণকে—সাধারণতঃ পুরোহিতকে দেয় দ্রব্য বা অর্থ। বলা হয়, দক্ষিণা না দিলে কার্য নিষ্ফল হয়। কোনও জিনিস দান করিবার সময়েও তাই গ্রহীতাকে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে হয়। কোনও কার্যোপলক্ষে ব্রাহ্মণ, সাধু-সন্ন্যাসী, এমন কি কাঙালী ভোজন করাইলেও ভোজনান্তে দক্ষিণা দেওয়ার রীতি আছে। ইহাকে ভোজনদক্ষিণা বলা হয়। সাধারণ কাজে সোনা ও শ্রাদ্ধে রুপা দক্ষিণা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কার্যতঃ অধিকাংশ স্থলে সোনা-রুপার মূল্যাবাদ নিয়মরক্ষার জন্য সামান্য কিছু অর্থ দেওয়া হয়। বিবাহে কন্যাদানের দক্ষিণারূপে বরকে সোনার বোতাম, আংটি প্রভৃতি দেওয়া হয়। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণা দিতে হইত। নচিকেতার পিতা ও রঘু এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন (কঠোপনিষদের শাংকর ভাষ্য-১, রঘুবংশ ৫।৮৬)। শিক্ষা-সমাপনান্তে শিষ্যকে অনেক সময়ে গুরুদক্ষিণা হিসাবে গুরু বা গুরুপত্নীর প্রার্থিত দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করিয়া দিতে হইত।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দক্ষিণাচরণ সেন (১৮৬০-১৯২৫ খ্রী) প্রসিদ্ধ সংগীত-বিদ্, সুরকার এবং ভারতে ইওরোপীয় সংগীত-পদ্ধতি অনুযায়ী অর্কেস্ট্রাবাদনের অন্যতম প্রবর্তক।

রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমোদ-কুমার ঠাকুরের সহায়তায় দক্ষিণাচরণ পাশ্চাত্ত্য সংগীতের চর্চা করেন ও পরে আপন প্রতিভাবলে বিখ্যাত 'ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা' গঠন করেন। তাঁহার এই অর্কেস্ট্রা প্রথম ও দ্বিতীয় বেহালা, ভায়োলা, পিক্‌লো, ফ্লুট, ক্ল্যারিওনেট, কর্নেট, ইফোনিয়ম, চেলো, ডাব্‌ল্ ভাস ইত্যাদি যন্ত্রসহ সংগঠিত ও বাদিত হইত। তাঁহার পরিচালিত এই অর্কেস্ট্রার জন্য দক্ষিণাচরণ প্রধানতঃ ইওরোপীয় প্রণালীর বহু মিল বা হারমনি-সংবলিত সুরের রচনা ও সংযোজনা করিতেন। কখনও কখনও ভারতীয় রাগের ভিত্তিতে সংযোগ-অলং-করণও (হার্মোনাইজেশন) তাঁহার অর্কেস্ট্রায় অনুষ্ঠিত হইত।

স্টার থিয়েটারে দক্ষিণাচরণের ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা দীর্ঘকাল শ্রোতাদের পরম আকর্ষণের বস্তু ছিল।

দক্ষিণাচরণের রচিত সংগীতবিষয়ক ৫খানি গ্রন্থ: 'গীতশিক্ষা' (১৮৯৩ খ্রী), 'সরল হারমোনিয়ম-সূত্র' (১৯০৬ খ্রী), 'ঐকতানিক স্বরসংগ্রহ', 'হারমোনিয়মে গানশিক্ষা' (১৯২২ খ্রী, ৩য় সংস্করণ) ও 'রাগের গঠনশিক্ষা' (১৯২৪ খ্রী)।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণায়ন অয়ন দ্র

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭ খ্রী) বাংলার 'কথা-সাহিত্য' ও 'শিশু-সাহিত্যে'র প্রসিদ্ধ লেখক। ঢাকা জেলার সাভার-এর নিকটবর্তী উলাইল গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা রমদারঞ্জন মিত্রমজুমদার ও জননী কুসুমময়ী। স্কুলে শিক্ষালাভের পর ২১ বৎসর বয়সে তিনি পিতার

সহিত মুর্শিদাবাদে আসিয়া পাঁচ বৎসর বাস করেন। সেই সময়ে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। মুর্শিদাবাদে বাসকালে তিনি চারি বৎসর যাবৎ 'সুধা' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন; তখন ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায় প্রভৃতির রচনায় 'সুধা' সমৃদ্ধ হইত।

তাহার পর দক্ষিণারঞ্জন পিতৃষ্বসার জমিদারির পরিদর্শনের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ময়মনসিংহে বাস করিতে যান। তখন হইতে ময়মনসিংহ ও ঢাকার অতি নিভৃত পল্লী অঞ্চল হইতে বিভিন্ন পর্যায়ে দশ বৎসরাধিক কাল যাবৎ তিনি বিলীয়মান 'কথা-সাহিত্যে'র সংগ্রহ তথা গবেষণা করিতে থাকেন। পরে কলিকাতায় বাসকালে সংগৃহীত ও পুনর্লিখিত উক্ত উপাদানগুলি দীনেশচন্দ্র সেনের যোগাযোগে ক্রমে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই 'কথা-সাহিত্য' চারি ভাগে বিভক্ত: গীতিকথা, রূপকথা, ব্রতকথা ও রসকথা। দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার রচিত চারিটি প্রধান গ্রন্থে এই বিপুল কথা-সাহিত্যজগতের পরিচয় অনেকাংশে রূপায়িত করেন। তাঁহার 'দাদামশায়ের ঝুলি' পুস্তকে মালঞ্চমালা, পুষ্পমালা প্রভৃতি গীতিকথা, 'ঠানদিদির থলে' গ্রন্থে নারীদের ব্রতকথা, 'ঠাকুরমার ঝুলি' পুস্তকে বালকদের উপযোগী রূপকথা এবং 'দাদামশায়ের থলে' গ্রন্থে বৈঠকী গল্পের সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে। এইভাবে, পূর্ববঙ্গের পল্লীঅঞ্চলের 'কথা-সাহিত্য'কে বাংলা সাহিত্যে তিনি স্থায়ী রূপ দান করেন।

বাংলার শিশুসাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জনের অবদানস্বরূপ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়: 'খোকাখুকুর খেলা', 'আমাল বই', 'চারু ও হারু', 'ফার্স্ট বয়', 'লাস্ট বয়', 'উৎপল ও রবি', 'কিশোরদের মন', 'বাংলার সোনার ছেলে', 'পৃথিবীর রূপকথা' (অনুবাদ), 'চিরদিনের রূপকথা' (কথা-সাহিত্যের রূপকথা বিভাগ), 'সবুজ লেখা' (মৌলিক রূপকথা), 'আমার দেশ', 'আশীর্বাদ' ও আশীর্বাণী' প্রভৃতি।

বঙ্গীয় বিজ্ঞানপরিষদের সহ-সভাপতিত্ব (১৯৩০-৩৩ খ্রী), তাহার মুখপত্র 'পথ'-এর সম্পাদকতা এবং উক্ত পরিষদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সমিতির সভাপতিরূপে বাংলায় বিজ্ঞানের অনেক পরিভাষারচনাও দক্ষিণারঞ্জনের জীবনের গণনীয় কার্য।

প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় দক্ষিণারঞ্জনের জীবনাবসান হয়।

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কেন রে বাঁশি বাজিস না', দেশ, ১ বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮ খ্রী) পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাবুদের দৌহিত্র-সন্তান। গোপীমোহন ঠাকুরের (১৭৬১-১৮১৮ খ্রী) জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্যকুমার ঠাকুর (১৭৮৪-১৮২০ খ্রী) তাঁহার মাতামহ। তাঁহার মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী সূর্যকুমারের প্রথমা স্ত্রী অভয়া দেবীর কন্যা; পিতা ভাটপাড়ার পরমানন্দ (পরে জগন্মোহন নামে পরিচিত) মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জন হিন্দু কলেজে পাঠ গ্রহণ করেন এবং ডিরোজিওর প্রিয়ছাত্র হন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের অল্পবয়স্কা বিধবা পত্নী রানী বসন্তকুমারীর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। কলিকাতার সদর আদালতের নির্দেশে বসন্তকুমারী বর্ধমান রাজবাটীর বন্দিনীদশা হইতে মুক্ত হইয়া অন্য বাটীতে উঠিয়া গেলে দক্ষিণারঞ্জন তাঁহাকে একদিন গভীর রাত্রে কলিকাতায় নিজের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে লইয়া আসেন এবং বিবাহ করেন। দক্ষিণারঞ্জন পরে লখনৌ শহরে বাস করিতে থাকেন এবং অযোধ্যায় একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে তিনি নানাভাবে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করেন। বিদ্রোহের অন্তে তিনি পুরস্কার হিসাবে রায় বেরিলিতে একটি বড় তালুক লাভ করেন। তিনি লখনৌ ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন এবং অযোধ্যা-তালুকদার-সমিতির প্রথম কর্মসচিব হন। ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে তিনি রাজা খেতাব লাভ করেন (১৮৭১ খ্রী)। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের মৃত্যু হয়।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণেশ্বর কলিকাতা হইতে ১৪ কিলোমিটার উত্তরে বরাহনগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণেশ্বর গ্রামটি হুগলি নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। গ্রামটির উত্তর ভাগ কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ও দক্ষিণ ভাগ বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত। ইহার দক্ষিণ দিক দিয়া ঈস্টার্ন রেলপথ (বর্ধমান কর্ডলাইন) চলিয়া গিয়াছে।

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইংরেজ হেস্টি সাহেবের কুঠি, মুসলমানদের কবরডাঙ্গা ও গাজী সাহেবের পীরের স্থান লইয়া গঙ্গাতীরে জঙ্গলে পরিপূর্ণ প্রায় ৮ হেক্টর (৬০ বিঘা) জমি ক্রয় করিয়া ১২৬২ বঙ্গাব্দে কলিকাতার জানবাজারের পুণ্যশীলা রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের সুবিখ্যাত কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত

করেন। একই প্রাঙ্গণে দ্বাদশ শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ, বিষ্ণুমন্দিরে রাধাকৃষ্ণ ও নয়টি চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরে ভবতারিণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এখানে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের সাধনা করেন। তাঁহার সাধনপীঠ হিসাবে বর্তমান যুগে এই কালীবাড়ি তীর্থের গৌরব অর্জন করিয়াছে।

দক্ষিণেশ্বর আজ বৃহত্তর কলিকাতার অন্তর্গত হইয়াছে। এখানকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিবেকানন্দ (উইলিংডন) ব্রিজের নিকট অবস্থিত পেপার মিল ও মন্দিরসংলগ্ন উইম্‌কো-র দিয়াশলাই কারখানাটি উল্লেখযোগ্য।

দ্র গোপালচন্দ্র রায়, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ; A. Mitra, *District Handbook: 24 Parganas, 1951*, Calcutta, 1954.

উষা সেন
পঞ্চানন চক্রবর্তী

দখ্‌মা, দোখ্‌মা ইংরেজী 'টাওয়ার অব সাইলেন্‌স' বা 'নিঃশব্দ শান্ত স্তম্ভ বা মন্দির'। ইহার অর্থ শকুনির দৃষ্টিপথে ও রৌদ্রে অনাবৃত শবদেহ স্থাপনের জন্য মন্দির বা আধার। এই প্রাচীন ইরানীয় প্রথায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পারসীরা এখনও অনুসরণ করেন। ইহার মুখ্য অঙ্গগুলি এইরূপ: ১. লৌহদ্বারসহ বৃত্তাকার উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত কূপাকার গৃহ ২. শবদেহ স্থাপনার্থে শিলানির্মিত উন্মুক্ত মঞ্চ ৩. ভিতরে মধ্যস্থলে কুণ্ড, এই কুণ্ডমধ্যে অস্থিসমূহ অথবা অস্থিচূর্ণ যাহা বৃষ্টিধারায় নালাবাহিত হইয়া আসে তাহা একত্রিত হয় ৪. বাহিরে চারিটি কুণ্ড, এইগুলিতে নালাবাহিত বৃষ্টির জল আসিয়া পড়ে, কুণ্ডগুলিতে জল-শোধনার্থ বালু ও কয়লা স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট রাখা হয় এবং স্তরগুলি সময়মত পরিষ্কার করা হয়। নীরব শান্তিতে বিরাজিত স্তম্ভাকার এই মন্দির দর্শন করিয়া পূর্ব কালের ইওরোপীয় যাত্রীগণ 'টাওয়ার অব সাইলেন্‌স' শব্দটি রচনা করিয়া ইহার নামকরণ করেন।

আর্দেশীর দীন্‌শা

দড়ি বাংলা দেশে সাধারণতঃ পাট ও শণ হইতে দড়ি প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করিয়া কেরল অঞ্চলে নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি তৈয়ারি হয়। পাট, শণ ও নারিকেলের ছোবড়া ছাড়াও সিসল, আনারসের আঁশ ইত্যাদির দ্বারাও দড়ি তৈয়ারি হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে দড়িতৈয়ারি শিল্পটির জন্ম বাংলা দেশে। আজিও বাংলা দেশই প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের দড়ির চাহিদা মিটাইয়া থাকে। কেরল হইতে যে দুই পাকের (টু প্লাই) নারিকেল-ছোবড়ার দড়ি আসে তাহাকেও বাংলা দেশের কারখানায় পাকাইয়া মোটা দড়ি তৈয়ারি করা হয়। সিঙ্গাপুর, হংকং, পেনাং প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাংলা দেশের দড়ি রপ্তানি হয়।

পশ্চিম বাংলার গঙ্গাতীরে হাওড়া, হুগলি ও চব্বিশ পরগনাতেই দড়িতৈয়ারির ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহ রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা পুরাতন কারখানা 'এইচ. এইচ. হার্‌টন অ্যাণ্ড কোম্পানি' ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে চালু হয়। পরে 'গ্যাঞ্জেস্ রোপ' ও 'শালিমার রোপ' এই দুইটি বড় কারখানা বসে। চব্বিশ পরগনার বারুইপুর অঞ্চল, হাওড়ার কোনা, একসরা, চামরাইল এবং হুগলি জেলার কোতরং, শেওড়াফুলি প্রভৃতি অঞ্চলে বহু ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানও কুটিরশিল্প হিসাবে দড়িতৈয়ারির কাজ করিতেছে। বৎসরে আনুমানিক দেড় কোটি টাকার মত নানাশ্রেণীর দড়ি একমাত্র বাংলা দেশেই তৈয়ারি হয়। পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের মাদারিপুর (ফরিদপুর) অঞ্চলে অতি উৎকৃষ্ট দড়ি তৈয়ারি হইত।

দড়ি তৈয়ারির জন্য গাঙ্গেয় পশ্চিম বঙ্গে পাট এবং বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে শণ পাওয়া যায়। শণ হেম্প বিহারের পূর্ণিয়াতে, ওড়িশার গঞ্জামে ও উত্তর প্রদেশের বারাণসীতেও হয়। সর্বাপেক্ষা ভাল সিসল পাওয়া যায় পূর্ব আফ্রিকায় (ব্রিটিশ) ও সর্বাপেক্ষা ভাল শণ ম্যানিলা হেম্প পাওয়া যায় ফিলিপ্পীন-এ।

দড়িতৈয়ারির বড় কারখানায় প্রায় কাপড়ের কলের মতই যন্ত্রপাতি লাগে। ছোট কারখানায় অবশ্য ঘুরঘুরি (টুইষ্টিং মেশিন), চাপসা যন্ত্র (রোপ মেকিং) ও কামরাঙা, ফিনকি প্রভৃতি ছোট ছোট যন্ত্রেই কাজ হয়। দড়িতৈয়ারির পূর্বে আকরিক তৈল (ব্যাচিং অয়েল) ও আকরিক সাবানে (ব্যাচিং সোপ) পাট ও শণ ভিজানো হয়। জাহাজের কাছি পাটে তৈয়ারি হয় না, তাহার জন্য লাগে নারিকেলের ছোবড়া, সিসল বা ম্যানিলা। বড় বাজার (কলিকাতা) অঞ্চলে দড়ি কেনাবেচার পাইকারী বাজার আছে।

আশীষ বসু

দণ্ড মহাভারত (১২।১৫।৩৪), মনু (৭।২২), যাজ্ঞবল্ক্য (১।৩৬১), শুক্র (১।২৩) এবং কামন্দক (২।৪০-৪৩) বলেন যে, দণ্ডই মানুষকে ধর্মপথে অবিচল রাখে। দণ্ড না থাকিলে লোক অধর্ম ও অন্যায় কার্যে প্রবৃত্ত হইত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (১।৪) এবং কামন্দকীয় নীতিসারে

আছে যে, দণ্ড না থাকিলে পৃথিবীতে মাৎস্য ন্যায় দেখা দিত। গৌতম (১১।২৮) 'দম' শব্দ হইতে দণ্ডের উৎপত্তি স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে, দণ্ডধর রাজা উন্মার্গগামী-দিগকে দমন করিবেন। অসংযতদিগকে দমন করে বলিয়া রাজার এই শক্তিকে দণ্ড বলা হয় (মৎস্যপুরাণ ২২৫।১৭; অগ্নিপুরাণ ২২৬।১৬)। মহাভারত (১২।১২১।১৫) এবং মনু প্রভৃতি (৭।২৫) ধর্মশাস্ত্রে দণ্ডকে প্রায় দেবতা করিয়া তোলা হইয়াছে। গীতায় (১০।৩৮) শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে "দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্" বলিয়াছেন। ইহাদ্বারা শাসকের শাসন করিবার শক্তিকে দণ্ড বলা যাইতে পারে। ইহার সহিত পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের Majestas কিংবা Sovereignty-র বিশেষ সাদৃশ্য নাই।

মেধাতিথি মনুসংহিতার (৭।১৪-২৯) টীকায় দণ্ডের কার্য, স্বরূপ এবং প্রয়োগবিধির আলোচনা করিয়াছেন। দণ্ড ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কৌটিল্য (১।৪) বলেন যে দণ্ডের প্রয়োগে রাজার অযথা মৃদুতা বা নির্দয়তা প্রকট করা কর্তব্য নহে। অঙ্গ দেশের প্রাচীন নৃপতি বসু হোম মান্ধাতাকে বলিয়াছিলেন—"দণ্ডের প্রভাবেই সমস্ত জগৎ শাসিত হইতেছে। সাক্ষাৎ কালস্বরূপ মহাদেব আদি, মধ্য ও শেষ তিন কালেই জাগরিত রহিয়াছেন এবং দণ্ডও ঐ তিন কালেই জনসমাজে বিরাজিত থাকে। সেইজন্য ধর্মপরায়ণ নরপতি ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া দণ্ড প্রয়োগ করিবেন।" (মহাভারত ১২।১২২)।

বিমানবিহারী মজুমদার

দণ্ড ও দণ্ডবিধি প্রকৃত অর্থে দণ্ড বলিতে শাস্তি, শাসন বা শিক্ষা বুঝায়; কিন্তু অপকর্মজনিত দোষ বা আইন-বিরুদ্ধ কর্মজনিত রাজদ্বারে উপযুক্ত শাস্তিকেই সাধারণতঃ দণ্ড বলিয়া অভিহিত করা হয়।

মানুষের অপরাধপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষা দণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজবদ্ধ হইবার পূর্বেও মানুষের মধ্যে দণ্ডদান করার প্রথা প্রচলিত ছিল। মানুষ সমাজবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডদানের অধিকার ব্যক্তির নিকট হইতে সরাইয়া সমাজের উপর অর্পিত হয়। কালক্রমে যদিও দণ্ডদানের অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই বর্তিয়াছে, তথাপি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এখনও শরীর ও সম্পত্তির অনিষ্ট নিবারণ করার জন্য ব্যক্তিরও দণ্ডমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অধিকার স্বীকৃত আছে।

ভারতবর্ষে অপরাধ দমন করিবার জন্য একটি সুসংবদ্ধ দণ্ডবিধি (Indian Penal Code) আছে। উহাতে বিভিন্ন প্রকারের অপরাধ ও তৎসংশ্লিষ্ট দণ্ডমূলক ব্যবস্থাদি বিধিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের দ্বারা যে পদ্ধতিতে অপরাধীর বিচার ও দণ্ডদান করা যায় তাহাও বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ এইসব বিচার ও দণ্ডদান ফৌজদারি আদালতে হয় বলিয়া দণ্ডাধিকরণ বলিতে ফৌজদারি আদালতকেই বুঝায়।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে অপরাধের শ্রেণীবিন্যাসে মোটামুটিভাবে ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধের তালিকায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্র বা সাহায্য করা হইতে শুরু করিয়া যুদ্ধবন্দীর পলায়নে সরকারী কর্মচারীর সাহায্য-দান প্রভৃতি অপরাধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরবর্তী ভাগে সামরিক বাহিনীসংক্রান্ত অপরাধ ও অন্য ভাগে সাধারণ শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধ সন্নিবিষ্ট আছে। এতদ্ব্যতীত সরকারি কর্মচারীগণের বা তাহাদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধ, নির্বাচনসংক্রান্ত অপরাধ, মিথ্যা সাক্ষ্য দান ও অন্যান্য বিচারসংক্রান্ত অপরাধ, মুদ্রা ও সরকারি টিকিটসম্বন্ধীয় অপরাধ, মাপ ও ওজনসংক্রান্ত অপরাধ, ধর্মসংক্রান্ত অপরাধ, নৈতিক শালীনতা ও জনস্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় অপরাধ, দৈহিক সর্বপ্রকার আঘাত ও তৎসংক্রান্ত অপরাধ, সম্পত্তিসংক্রান্ত অপরাধ, দলিলসংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধ, বিবাহসংক্রান্ত অপরাধ, মানহানি, ভীতিপ্রদর্শন প্রভৃতি অপরাধেরও শ্রেণীবিভাগ ও পৃথক পৃথক দণ্ডব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দণ্ডনীতির মূল উদ্দেশ্য হইতেছে: ১. অপরাধীকে পুনরায় অপরাধের অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করা ২. অপরাধীর শাস্তিদর্শনে অন্যে যাহাতে অপরাধের অনুষ্ঠানে বিরত হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা। সুতরাং মুখ্যতঃ দণ্ডনীতি শিক্ষামূলক হইলেও ইহার প্রতিহিংসা-মূলক দিককেও অস্বীকার করা হয় নাই। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে নিম্নলিখিত দণ্ডগুলির বিধান আছে: ১. মৃত্যুদণ্ড ২. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৩. সশ্রম ও বিনাশ্রম কারাদণ্ড ৪. সম্পত্তি-বাজেয়াপ্তকরণ ৫. অর্থ-দণ্ড। এতদ্ব্যতীত সংশোধনালয়ে অন্তরীণ রাখাকেও দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দণ্ডের তারতম্য করা হইয়াছে। অধিকাংশ অপরাধের ক্ষেত্রেই দণ্ডের সর্বোচ্চ সীমা উল্লিখিত হইয়াছে। সংঘটিত অপরাধের গুরুত্ব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অপরাধীর মানসিক অবস্থা প্রভৃতি বিচার করিয়া যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার পূর্ণ অধিকার আদালতকে দেওয়া হইয়াছে,

তথাপি লঘু পাপে গুরু দণ্ড বা গুরু পাপে লঘু দণ্ড উভয়ই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ইহা আদালতকে মনে রাখিতে হয়। দেশ ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের গুরুত্ববিষয়ক ধারণারও পরিবর্তন হয়। বর্তমান কালে চৌর্যাপরাধে মৃত্যুদণ্ডের কথা অকল্পনীয়; কিন্তু মনুর বিধানে ক্ষেত্রবিশেষে চৌর্যাপরাধে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থাও ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-ৎসাঙ ও অন্যান্য বিদেশীয় পরিব্রাজকগণের বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, চৌর্যাপরাধে অঙ্গচ্ছেদের দণ্ড তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।

ভারতবর্ষে উচ্চ আদালত (High Court) ব্যতীতও নিম্নলিখিত ৫টি আদালতে অপরাধীর বিচার হইয়া থাকে: যথা, দায়রা আদালত, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। সাধারণতঃ যে সকল অপরাধে অপরাধীর প্রতি দুই বৎসরের অনধিক শাস্তিদানের বিধান আছে সেগুলিই ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচার করিতে পারেন। উহার মধ্যে আবার ম্যাজিস্ট্রেটের শ্রেণী অনুযায়ী দণ্ডদানের ক্ষমতাও সীমিত আছে। গুরুতর অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধীকে দায়রা আদালতে সোপর্দ করিলে তথায় বিচার হয়। বর্তমানে বিচার এবং শাসনবিভাগের পৃথককরণের ফলে মুখ্যতঃ বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের উপরেই ফৌজদারি বিচারের ভার অর্পিত হইয়াছে। মোটামুটিভাবে দণ্ডবিধি আইনে বর্ণিত সকলপ্রকার অপরাধের বিচারের দায়িত্ব বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এবং ফৌজদারি কার্যবিধি আইনে বর্ণিত কোনও কোনও নিবর্তনমূলক অপরাধবিচারের দায়িত্ব শাসনবিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত দণ্ডনীতির অনুসরণে বর্তমান ভারতীয় দণ্ডনীতির মূল কাঠামো রচিত বলিয়া বিচার-পদ্ধতিতে অনেক জটিলতা প্রবেশ করিয়াছে এবং সন্দেহাতীতরূপে অপরাধ প্রমাণিত না হইলে কাহাকেও দণ্ডদান নিষিদ্ধ আছে বলিয়া অভিযোক্তা বা ক্ষেত্র-বিশেষে রাষ্ট্রের উপরই অপরাধপ্রমাণ করিবার সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে বর্তমান দণ্ডনীতি প্রকৃতপক্ষে 'অনুকম্পাপরবশ'-নীতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। এই নীতি হইতেছে '৫জন অপরাধীও যদি সন্দেহের অবকাশে অব্যাহতি পায় সেও ভাল, তবুও একজন নিরপরাধ ব্যক্তির দণ্ডপ্রাপ্তির সম্ভাবনা যেন না থাকে।'

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

দণ্ডকারণ্য দাক্ষিণাত্যের বিশাল আরণ্য অঞ্চল। মধ্য প্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্র প্রদেশ ও মহারাষ্ট্র এই চারিটি রাজ্য ব্যাপিয়া ইহার বিস্তৃতির পরিমাণ ২০৭১২০ বর্গ কিলো-মিটার। রামায়ণে স্থানটির উল্লেখ আছে।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে মধ্য প্রদেশ রাজ্যের বস্তার জেলা এবং ওড়িশা রাজ্যের কোরাপুট ও কলাহাণ্ডি জেলা লইয়া বর্তমান দ্বিমুখী দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনা রচিত হয়। ইহার দুইটি লক্ষ্যের মধ্যে একটি ছিল পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন এবং অপরটি হইল স্থানীয় আদিবাসী উপজাতি-গুলির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করা। ইহার আয়তন ৭৭৬৭০ বর্গ কিলোমিটার (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে)। কলিকাতা হইতে ৮২৯ কিলোমিটার দূরে হাওড়া-নাগপুর রেলপথে অবস্থিত রায়পুর অথবা ৮১৯ কিলোমিটার দূরে হাওড়া-ওয়ালটেয়ার রেলপথে অবস্থিত ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে সড়কপথে এই অঞ্চলে আসা যায়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত 'দণ্ডকারণ্য ডেভেলপ্‌মেণ্ট অথরিটি'-নামক একটি সংস্থার হাতে উহার গঠনের ভার সম্পূর্ণ ন্যস্ত হয়। এই প্রকল্পের সদর কার্যালয়টি ওড়িশা রাজ্যের কোরাপুট শহরে অবস্থিত। এ পর্যন্ত প্রায় ১৬০০০ হেক্টর বনভূমি উদ্ধার করিয়া শরণার্থীদের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে।

এই বিশাল এলাকার মধ্যে পূর্বঘাট পর্বতমালার বিস্তার হওয়ায় অধিকাংশ অঞ্চলই পর্বতময় ও দুর্গম। মছকুন্দ বা মৎস্যকুণ্ড, শবরী, ইন্দ্রাবতী, বংশধারা, নাগবল্লী প্রভৃতি বহু নদী এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এখানকার জলবায়ু শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। পূর্বেকার প্রধান ব্যাধি ম্যালেরিয়া অধুনা চিকিৎসার সু-ব্যবস্থায় বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় প্রায় ১৫৬০ মিলিমিটার (৬০ ইঞ্চি)। এই অরণ্যাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষের মধ্যে আমলকী, হরীতকী, মহুয়া, শাল, সেগুন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখানকার কাষ্ঠ ও নানাপ্রকার বনজ সম্পদ অন্যত্র রপ্তানি হয়। জঙ্গলে নানাপ্রকার হিংস্র জন্তু-জানোয়ার দেখা যায়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এখানকার জনসংখ্যা ছিল ৩৬৭৫৪২৬ জন। ইহাদের অধিকাংশই আদিবাসী। উহাদের নিজেদের মধ্যে নানাপ্রকার ভাষার প্রচলন আছে; কিন্তু ওড়িশা অঞ্চলের আদিবাসীদের অন্যের সঙ্গে ব্যাবহারিক ভাষা হইল ওড়িয়া এবং মধ্য প্রদেশের আদিবাসীদের অনুরূপ ভাষা হইল হিন্দী। জনসংখ্যার ঘনত্ব কম; প্রতি বর্গ কিলো-মিটারে মাত্র ৩৬৮ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ১৪২ জন)। জনশিক্ষার হার অতি নিম্নস্তরের। অধুনা নানাপ্রকার

শিক্ষার সহিত বুনিয়াদী ও কারিগরী শিক্ষারও বিস্তার হইতেছে।

প্রধান কৃষিজ দ্রব্য ধান্য, ভুট্টা, সরিষা, তিসি প্রভৃতি। নদী-উপত্যকা ও অন্যান্য অঞ্চলে কৃষিকার্য সীমাবদ্ধ। আদিবাসীগণ সাধারণতঃ জুমচাষ করিত। এখন নানা স্থানে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করিয়া আধুনিক পদ্ধতিতে চাষআবাদ শুরু করিয়াছে।

খনিজ সম্পদে এই অঞ্চল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোরাপুট জেলার চুনা পাথর, অভ্র ও আকরিক লৌহ, কলাহাণ্ডি জেলার বক্সাইট ও ম্যাঙ্গানিজ এবং বস্তার জেলার বাইলাডিলার লৌহসম্পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত অ্যাজ্‌বেস্টস, নানাপ্রকার মৃত্তিকা, তাম্র, কোয়র্টজ ইল্‌মেনাইট, মোনাজাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। এই এলাকায় জলবিদ্যুৎ-সম্পদও প্রচুর রহিয়াছে।

কৃষিব্যতীত জনগণকে অন্য উপজীবিকার উপরও নির্ভর করিতে হয়। চাউলকল, তৈলকল প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। মৌমাছিপালন ও রেশমউৎপাদনও সামান্য হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কুটিরশিল্পের মধ্যে কাঠকয়লা, কাগজ, কাঠ-চেরাই, বাঁশের কাজ, আসবাব-নির্মাণ প্রভৃতিও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই অঞ্চলে লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট, রাসায়নিক ও অ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি ভারীশিল্প-স্থাপনের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

বর্তমানে ৪৩ সংখ্যক জাতীয় সড়কটি রায়পুর হইতে বিশাখ্‌পট্টনম যাইবার পথে এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে একটি রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধুনা ডাক ও তারবিভাগেরও প্রসার হইয়াছে।

এখানকার আদিবাসীরা নানা ধরনের উৎসব করে; ইহাদের নিজস্ব দেবতা থাকিলেও ইহারা হিন্দুদের দেবদেবীকেও মান্য করে ও নানাপ্রকার হিন্দু-উৎসবে ও মেলায় অংশ গ্রহণ করে। এই অঞ্চলের ঘন অরণ্যে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

দ্র National Council of Applied Economic Research, *Development of Dandakaranya*, New Delhi, 1963; *Census of India 1961, Orissa, District Census Handbook: Koraput District*, vol. II, Cuttack, 1965; *Census of India 1961, Orissa, District Handbook: Kalahandi District*, Cuttack, 1965.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

দণ্ডী (আনুমানিক ৮ম শতকের আদি ভাগ) প্রসিদ্ধ 'কাব্যাদর্শ'-নামক অলংকারগ্রন্থের রচয়িতা দণ্ডীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি বাল্মীকি ও ব্যাসের পরবর্তী তৃতীয় কবি বলিয়া উল্লিখিত ('উদ্ভটসাগরঃ') হওয়ায় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন কবিরূপেই পরিচিত। ইহার তিনখানি গ্রন্থ ত্রিলোকবিশ্রুত বলিয়া সপ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা কোন্ কোন্ গ্রন্থ তাহার নামোল্লেখ নাই। 'দশকুমারচরিতম্' নামে একখানি গদ্য কাব্যের রচয়িতারূপে দণ্ডীর নাম সংশ্লিষ্ট। এই গ্রন্থকারই 'কাব্যাদর্শে'র রচয়িতা কিনা তাহা লইয়া বিতর্ক আছে। 'দশকুমারচরিতম্' গ্রন্থে রাজবাহন প্রভৃতি আটটি কুমারের অসম্পূর্ণ চরিত্রবর্ণন পাওয়া যায়। 'পূর্বপীঠিকা'-নামক আদ্য অংশে দুইটি অবশিষ্ট কুমারের চরিত্রবর্ণনা দেখা যায়, তাহা সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে যোজিত হইয়াছে। 'উত্তরপীঠিকা' নামক অন্ত্য অংশে বিশ্রুত-নামক রাজকুমারের অসমাপ্ত অংশের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাও সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে লিখিত। 'অবন্তিসুন্দরীকথা' নামে অধুনালব্ধ খণ্ডিত গ্রন্থখানিকেও 'দশকুমারচরিতে'র লুপ্ত আদ্য অংশ বলিয়াও কেহ কেহ মনে করেন।

'দশকুমারচরিতে'র পদলালিত্য পণ্ডিতসমাজে প্রশংসা লাভ করিয়াছে। সুবন্ধু ও বাণভট্টের রচনার তুলনায় ইহার রচনা সরল। গ্রন্থটিতে প্রচুর হাস্যরস এবং চরিত্রচিত্রণে নৈপুণ্যও দেখা যায়। গ্রন্থখানি কবিপ্রতিভায় সৃষ্ট একটি অভূতপূর্ব গদ্যকাব্য।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দত্তাত্রেয় তিনটি মস্তক-বিশিষ্ট পশ্চিম ভারতের বহুজন-পূজিত দেবতা। ইনি একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অবতাররূপে পরিগণিত এবং মহর্ষি অত্রি ও তৎপত্নী অনসূয়ার পুত্র বলিয়া বিদিত। কথিত আছে যে, উক্ত দেবতাদের বরে সতী অনসূয়ার গর্ভে অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমায় দত্তাত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন। জম্ভাসুর-এর সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার সাহায্যে বিপদগ্রস্ত দেবতাদের জয়লাভ হইয়াছিল এবং কার্তবীর্য তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। 'দত্ত-গীতা', 'অদ্ভুত-গীতা' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থগুলি তাঁহার রচিত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

'দত্তাত্রেয়-মহাপূজা-বর্ণন' পুস্তকে ইহার পূজাবিধির বিস্তৃত বিবরণ আছে। দত্তাত্রেয়ের অবতাররূপে কথিত নরসিংহ সরস্বতী নামে এক সন্তের প্রচেষ্টায় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দত্তাত্রেয়-সম্প্রদায়ের পুনর্গঠন হয়। সরস্বতী

গঙ্গাধর-কর্তৃক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত 'গুরুচরিত্র' গ্রন্থে দত্তাত্রেয় হইতে নরসিংহ সরস্বতী পর্যন্ত সম্প্রদায়-পরম্পরা (ক্রম) পাওয়া যায়। পুস্তকখানি এই সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থরূপে পূজিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের ঔডুম্বর, গণতাপুর, নর্সোবচীওয়াড়ি প্রভৃতি স্থান সম্প্রদায়ের তীর্থক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃত।

সি. ভি. দাতার

দধীচি, দধীচ, দধ্যঙ্ অথর্বা ঋষির পুত্র (ঋগ্বেদ ১।৮০।১৬)। ইহার অস্থি লইয়া ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেন (ঐ ১।৮৪।১৩)। ইনি অশ্বমস্তক ধারণ করিয়া অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা দান করেন (ঐ ১।১১৬।১২)। তৈত্তিরীয় ও কাঠক সংহিতায়, শতপথ, পঞ্চবিংশ ও গোপথ ব্রাহ্মণে এবং বৃহদ্দেবতায়ও ইনি উল্লিখিত হইয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মধুবিদ্যাদান প্রসঙ্গও দ্রষ্টব্য (২।৫)। মহাভারতে ইনি মহর্ষি ভৃগুর পুত্র বলিয়া উল্লিখিত; অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা দান করিয়া ইন্দ্রের বিরাগভাজন হইলেও বজ্রনির্মাণের জন্য ইনি নিজ অস্থি দান করেন। ইহার তপোভঙ্গের জন্য অপ্সরা অলম্বুষা প্রেরিত হইলে সরস্বতী নদীর গর্ভে দধীচির বেদবিৎ পুত্র সারস্বতের জন্ম হয় (শল্যপর্ব, ৫২ অধ্যায়, বঙ্গবাসী সংস্করণ)। ভাগবতে ইহার নামান্তর দধ্যঙ্ (দধ্যঞ্চ্) এবং অশ্বশিরা ও ইহার মাতা চিত্তি। পুরাণান্তরে কর্দম প্রজাপতির কন্যা শান্তি দধীচির মাতা। বায়ু এবং কূর্মপুরাণে ইনি দক্ষকে শিবহীন যজ্ঞ করিতে নিষেধ করেন। ইহার শিষ্য নন্দী শিবপার্ষদরূপে পরিচিত হন। লিঙ্গপুরাণে ইনি চ্যবন-তনয়, শুক্রাচার্যের প্রসাদে নব কলেবর লাভ করেন। রাজা ক্ষুপ এবং বিষ্ণুও দধীচির নিকট পরাস্ত হন (ঐ পূর্বভাগ, ৩৫ অধ্যায়, বঙ্গবাসী সংস্করণ)। শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড এবং পুরাণান্তরেও দধীচির নানা উপাখ্যান রহিয়াছে।

দ্র শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, জীবনীকোষ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ; তারানাথ তর্কবাচস্পতি, বাচস্পত্যম্, বারাণসী, ২০১৮ সংবৎ; A. A. Macdonell & A. B. Keith. *Vedic Index*, vol. I, Varanasi, 1958.

কল্যাণী দত্ত

দনুজমর্দনদেব মুসলিম আমলের হিন্দু গৌড়েশ্বর। ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দে ইনি পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও ও চাটগাঁও হইতে নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকদের মতে, এই দনুজমর্দনদেব বিখ্যাত হিন্দু গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের (ফার্সী-সূত্রে 'কান্‌স্' নামে উল্লিখিত) সহিত অভিন্ন। গণেশ ছিলেন উত্তর বঙ্গের ভাতুড়িয়া অঞ্চলের জমিদার এবং বিপুল সামরিক শক্তির অধিকারী। তিনি ইলিয়াস শাহী-বংশের সুলতানদের অমাত্য ছিলেন। এই বংশের শেষ কয়জন সুলতানের অপদার্থতার সুযোগ লইয়া গণেশ বাংলার শাসনক্ষমতা হস্তগত করেন। প্রথমে তিনি অন্যের বেনামীতে শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, কিন্তু অতঃপর নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪১৫ খ্রী)। বাংলার মুসলিম দরবেশরা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গণেশের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকিলে গণেশ তাঁহাদের দমন করেন। তখন দরবেশদের নেতা নূর কুতুব্ আলমের অনুরোধে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কী গণেশকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গণেশের পুত্র যদু ইব্রাহিমের সহিত যোগ দিলেন। অতঃপর গণেশ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং যদুকে মুসলমান করিয়া জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ নাম দিয়া বাংলার সুলতান করা হইল। ইব্রাহিম দেশে ফিরিয়া গেলে গণেশ জালালুদ্দীনের নিকট হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেন এবং কিছুদিন পরে নিজে দনুজমর্দনদেব নাম লইয়া রাজা হইলেন। ইহার পর গণেশ জালালুদ্দীনের শুদ্ধি করান এবং নূর কুতুব্ আলমের পুত্র আনোয়ারকে বধ করান। কিন্তু ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে আকস্মিকভাবে, কাহারও কাহারও মতে জালালুদ্দীনের ষড়যন্ত্রে গণেশের মৃত্যু হয়।

দ্র সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল: ১৩৩৮-১৫৩৮, শান্তিনিকেতন, ১৯৬২; Jadunath Sarkar, ed., *History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1948.

সুখময় মুখোপাধ্যায়

দন্ত খাদ্যাদি কর্তন, ছেদন ও পেষণের অঙ্গ। মানুষের দুইবার দন্তোদ্‌গম হয়। ৬ মাস হইতে ২ বৎসর বয়স পর্যন্ত 'দুধে দাঁত' বা অস্থায়ী দন্তের উদ্‌গম হয়; ৬ বৎসর হইতে এক-একটি করিয়া সেই অস্থায়ী দন্ত পড়িতে থাকে ও নূতন স্থায়ী দন্তের উদ্‌গম হইতে থাকে। সাধারণতঃ ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী দন্তের উদ্‌গম হইয়া থাকে। গর্ভস্থ শিশুর চোয়ালের অস্থির মধ্যে দন্তকোরক (টুথ বাড) নামক টিস্যু বা দেহকলার উৎপত্তি হয়। প্রতিটি দন্তকোরক যথাসময়ে দন্তে রূপান্তরিত হইয়া মুখগহ্বরে দেখা দেয়। প্রত্যেক দন্তই এক-একটি পৃথক দন্তকোরক হইতে উৎপন্ন হয়।

উপর ও নীচের চোয়ালে ১০টি করিয়া মোট ২০টি অস্থায়ী দন্ত থাকে— প্রত্যেক চোয়ালের সম্মুখে চারিটি কৃন্তক (ইন্‌সাইজ়র) দন্ত, উহাদের উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া ছেদক (ক্যানাইন) দন্ত এবং প্রত্যেক ছেদক দন্তের পশ্চাতে দুইটি করিয়া পেষক (মোলার) দন্ত। স্থায়ী দন্তের মোট সংখ্যা ৩২। প্রত্যেক চোয়ালে ১৬টি করিয়া স্থায়ী দন্ত থাকে। স্থায়ী দন্তের ক্ষেত্রে প্রতি চোয়ালে চারিটি কৃন্তক দন্ত ও উহাদের উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া ছেদক দন্ত ব্যতীত প্রতিটি ছেদক দন্তের পশ্চাতে দুইটি করিয়া পুরঃপেষক (প্রিমোলার) দন্ত ও সর্বশেষ পুরঃপেষক দন্তের পশ্চাতে তিনটি করিয়া পেষক দন্ত থাকে।

প্রত্যেক দন্তের দুইটি অংশ— দৃশ্য অংশ বা দন্তশির (ক্রাউন) এবং চোয়ালের অস্থিতে প্রবিষ্ট অংশ বা দন্তমূল (রুট)। দন্তে তিনটি স্তর—বহিঃস্তর বা এনামেল, মধ্যস্তর বা দন্তাস্থি (ডেন্‌টিন) এবং অন্তঃস্তর বা দন্তনালী (পাল্‌প ক্যানাল)। দন্তমূলে এনামেলের পরিবর্তে দন্তপলস্তারা (সিমেণ্টাম) বর্তমান। এনামেলে নার্ভ না থাকায় এখানে তাপ বা শৈত্যের অনুভূতি নাই; দন্তের অন্যান্য স্তরে নার্ভ বর্তমান। দন্তনালী দন্তমজ্জায় (পাল্‌প) পূর্ণ থাকে। চোয়ালের অস্থি হইতে রক্তবাহ ও নার্ভের শাখা দন্তমূলের তলদেশের এক বা একাধিক ছিদ্রপথে দন্ত-নালীতে প্রবেশ করে, এজন্যই দন্তের প্রদাহ নার্ভ ও রক্তের দ্বারা দেহকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করিতে পারে। চোয়ালের অস্থিতে প্রতিটি দন্তমূলের জন্য নির্দিষ্ট দন্তপ্রকোষ্ঠ (টুথ-সকেট) আছে, ইহার গাত্র হইতে বহু স্থিতিস্থাপক সূত্র বাহির হইয়া মাড়ি ও দন্তপলস্তারার গাত্রে যুক্ত থাকে, এজন্যই দন্ত দন্তপ্রকোষ্ঠে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকিয়া চাপ সহ্য করিতে পারে।

নরেশচন্দ্র দাস

দন্তপুর প্রাচীন কলিঙ্গের রাজধানী। কথিত আছে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার একটি দন্ত কলিঙ্গে নীত হয়। কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত উক্ত নগরীতে বুদ্ধের দন্ত স্থাপিত করিয়া তাহার উপর মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম হয় দন্তপুর। কলিঙ্গরাজ গুহশিবের মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা হেমমালা ও জামাতা উজ্জয়িনীর রাজপুত্র দন্তকুমার-কর্তৃক উক্ত দন্ত দন্তপুর হইতে সিংহলে নীত হয়।

দন্তপুর নগরীর ভৌগোলিক স্থাননির্ণয় লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ফার্গুসন ও নন্দলাল দে-র মতে ওড়িশার পুরী নগরীই বৌদ্ধ যুগের দন্তপুর। প্লিনি বলিয়াছিলেন যে, কলিঙ্গের দন্তগুড় বা দন্তগুল নগরী (সম্ভবতঃ দন্তপুর) গঙ্গার মোহানা হইতে ৬২৫০০০ পদক্ষেপ (৫৭৪ মাইল) দূরে অবস্থিত। এই সূত্র ধরিয়া কানিংহ্যাম মত প্রকাশ করেন যে, দন্তপুর রাজমহেন্দ্রীর সহিত অভিন্ন। সিলভ্যাঁ লেভির মতে দন্তপুর টলেমীর দ্বারা উল্লিখিত পলৌর নগরী (তামিল পল্লু-দন্ত, উর-নগর)। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রীর মতে মেদিনীপুর জেলার দাঁতন-নামক স্থানই প্রাচীন দন্তপুর।

বৌদ্ধ কাহিনীতে আছে, মহাগোবিন্দ যে ছয়টি নগরী নির্মাণ করেন, দন্তপুর তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। মহাবস্তুতে এবং চুল্লকলিঙ্গ, কুম্ভকার, কলিঙ্গবোধি, কুরুধম্ম—এই কয়টি জাতকে দন্তপুরের নাম পাওয়া যায়। জৈন সাহিত্যেও দন্তবক্র-নামক রাজা কলিঙ্গের দন্তপুরে রাজত্ব করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে দন্তপুরের উল্লেখ নাই।

দ্র Surendranath Mazumdar Shastri, ed., Cunningham's *Ancient Geography of India*, Calcutta, 1924; N. L. Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India*, London, 1927; Sylvain Levi, Jean Przyluski & Jules Bloch, *Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India*, Probodhchandra Bagchi, tr., Calcutta, 1929.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

দন্তরোগ দন্তরোগ দুই শ্রেণীর—দন্তক্ষয় (কেরিজ়) এবং মাড়ির রোগ। দন্তক্ষয় রোগের প্রথম পর্যায়ে দাঁতের উপর একটি বাদামি রঙের দাগ দেখা যায় এবং ঠাণ্ডা ও মিষ্টান্নের সংস্পর্শে দাঁত শিরশির করে। পরবর্তী পর্যায়ে বাদামি দাগটি কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত হইয়া ক্ষুদ্র একটি গর্তে পরিণত হয়, ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে বেদনার মাত্রা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু উষ্ণ জলে বেদনার উপশম ঘটে। রোগের তৃতীয় পর্যায়ে গর্তটি আকারে বৃদ্ধি পাইয়া দন্তনালী ও দন্তমজ্জা পর্যন্ত প্রসারিত হয়, উষ্ণ তরল পদার্থের স্পর্শেও বেদনা বাড়ে, চর্বণে অসুবিধা ঘটে, এমন কি ব্যথার ফলে রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে; ইহাকেই দন্তশূল বলে। দন্তক্ষয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের চিকিৎসায় দাঁতের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশটুকু পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করিয়া ধাতব বস্তু দ্বারা উহা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয় পর্যায়ের চিকিৎসা দুরূহ ও অনিশ্চিত। অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তের উৎপাটনই চিকিৎসার একমাত্র পথ।

মাড়ির রোগ তিন প্রকার—প্রদাহ, টিউমার ও মাড়ির ক্ষয়। মাড়ির প্রদাহে রোগলক্ষণ কেবল মাড়ির উপরিভাগে সীমাবদ্ধ থাকে। জীবাণুর সংক্রমণ, তীব্র অম্ল বা ক্ষারের প্রভাব, ঔষধাদির প্রতিক্রিয়া, যৌনগ্রন্থির ক্ষরণে তারতম্য, মাড়ির উপর দন্তের চতুষ্পার্শে পাথর (টার্টার) জমা প্রভৃতি কারণে মাড়ির প্রদাহ ঘটে। ক্ষণস্থায়ী তীব্র প্রদাহে মাড়ির স্ফীতি, অল্প আঘাতে বেদনা, মাড়ি হইতে রক্তক্ষরণ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায় ; যে সকল স্থিতিস্থাপক তন্তু দন্তকে মাড়ির সহিত যুক্ত করে, তাহারা এ পর্যায়ে অক্ষত থাকে। প্রদাহ দীর্ঘস্থায়ী হইলে ঐ তন্তুগুলির স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পাইয়া দন্তের গাত্র হইতে মাড়ি বিযুক্ত হয় ও গর্তের সৃষ্টি হয়। এই গর্তে খাদ্যকণা ও জীবাণু জমিয়া মুখে দুর্গন্ধ হয়। ইহা ছাড়া অল্প আঘাতে মাড়ি হইতে রক্তক্ষরণ হয়, ঠাণ্ডা জলে মাড়ি শিরশির করে এবং দাঁতের পাশে প্রচুর পাথর জমে। অবহেলিত ও দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে, দাঁতের চারিপার্শ্বে অত্যধিক চাপ অথবা খাদ্যকণা ও পাথর জমিয়া থাকার ফলে জটিল পায়োরিয়া রোগ হয়। মাড়ি হইতে পুঁজ পড়া, চটচটে লালা ও মুখের দুর্গন্ধ এই রোগের বিশেষত্ব। মাড়ি ও দন্তগাত্রের সংযোগস্থলে সৃষ্ট গর্ত দন্তমূলের দিকে প্রসারিত হইয়া ৮-১০ মিলিমিটার পর্যন্ত গভীর হয় এবং দন্তের সংলগ্ন তন্তুগুলি নষ্ট হইয়া দাঁত নড়িতে থাকে। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড মিশ্রিত উষ্ণ জলে কুল্লি করিলে এবং ২% মারকিউরোক্রোম মাড়িতে লাগাইলে মাড়ির প্রদাহের উপশম হয়। অত্যধিক পাথর জমিলে তাহা দন্তচিকিৎসকের সাহায্যে পরিষ্কার করাইয়া লওয়া উচিত। শল্যচিকিৎসার সাহায্যে জটিল পায়োরিয়ার উপশম করা হয়।

দন্তোদ্‌গমের সময়েও মাড়ির একপ্রকার প্রদাহ হইতে পারে ; বিশেষতঃ সর্বশেষ পেষক দন্ত উদ্‌গমের সময় মাড়ি দন্তোদ্‌গমের পথে বাধা সৃষ্টি করিলে মাড়ির প্রদাহ সৃষ্ট হয়। জীবাণুনাশক ঔষধমিশ্রিত জলে কুল্লি, পেনিসিলিন-জাতীয় ঔষধের ইন্‌জেক্‌শন ও অবস্থাবিশেষে দন্তোৎপাটন বিধেয়।

মাড়ি ও দন্তের মধ্যবর্তী গর্তে অত্যধিক পুঁজ ও রক্ত জমিয়া দন্তস্ফোটক উৎপন্ন হইতে পারে ; শল্যচিকিৎসার দ্বারা পুঁজ বাহির করিয়া দিলে ইহার উপশম হয়।

মাড়ির টিউমার আকারে পুঁজরক্ত-বিহীন দন্তস্ফোটকের ন্যায় ; ইহাতে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটিলে পুঁজ ও ব্যথা হয়। শল্যচিকিৎসার দ্বারা ইহার অপসারণ আবশ্যক।

দাঁতের এনামেল হইতে বিযুক্ত হইয়া মাড়ির স্থানচ্যুতি ঘটিলে তাহাকে মাড়ির ক্ষয় বলে। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মাড়ির কিছুটা স্থানচ্যুতি স্বাভাবিক ; কেবল বয়সের অনুপাতে অত্যধিক স্থানচ্যুতি ঘটিলেই তাহাকে মাড়ির ক্ষয় বলা চলে। মাড়িতে আঘাত লাগিলে, পাথর জমিলে বা মাড়ি ও দাঁতের ব্যবহার হ্রাস পাইলে এ রোগ দেখা দেয়। ক্ষয় রোধ করা যায়, কিন্তু চিকিৎসার দ্বারা ক্ষয় পূরণ করা যায় না।

নরেশচন্দ্র দাস

দমকল অগ্নিনির্বাপণের জন্য জল নিক্ষেপের যন্ত্র। সাধারণ ভাবে অগ্নিনির্বাপক সংস্থাকে দমকল বাহিনী বলা হয়। প্রায় ৪ হাজার বৎসর পূর্বেও মিশরে অগ্নিনির্বাপক সংঘ ছিল। আনুমানিক ৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোমে সুসজ্জিত অগ্নিনির্বাপক বাহিনী থাকিলেও খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের অন্য কোনও দেশে এরূপ বাহিনীর অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায় না। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের অভিজ্ঞতার ফলে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই উক্ত শহরে নিয়মতান্ত্রিক অগ্নিনির্বাপক বাহিনী সংগঠিত হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় বাষ্পচালিত জলনিক্ষেপক যন্ত্র। লণ্ডনের 'মেরী ওয়েদার্স' নামক কারিগরি প্রতিষ্ঠান ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিশেষ কার্যকরী অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পেট্রোল-চালিত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র প্রস্তুত করে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে লণ্ডনে 'মেট্রোপলিটান ফায়ার ব্রিগেড অ্যাক্ট' নামে আইনটি প্রবর্তিত হয়।

কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ের ক্ষতি হওয়ার ফলেই ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এশিয়ার সর্বপ্রথম অগ্নিনির্বাপক বাহিনী গঠিত হয়। অবশ্য তখন এই বাহিনী কেবল জল, মাটি ও বালি দিয়াই আগুন নিভাইতে জানিত। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন ভারত সরকার দাহ্যপদার্থের গুদামে অগ্নি প্রতিরোধের জন্য 'ওয়্যারহাউস অ্যাক্ট' নামে আইন প্রণয়ন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত দমকল বাহিনীর প্রসার মন্থর ছিল ; ভারতে তখন ঘোড়ায় টানা দমকল ও হস্তচালিত জলনিক্ষেপক পাম্প ব্যবহৃত হইত। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতার লালবাজারেই একমাত্র দমকল কেন্দ্রটি অবস্থিত ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস্টব্রুক-এর তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় আরও ৭টি দমকল কেন্দ্র স্থাপিত হয় ; সে সময় সর্বসাকুল্যে ২৪টি দমকল ও ১০০ জন কর্মী ছিলেন। ইতিমধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ প্রভৃতি শিল্প-বাণিজ্যপ্রধান শহরেও দমকল বাহিনী গঠিত হয়। প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চাত্ত্য হইতে উন্নত মানের আধুনিক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রাদি আমদানি হইতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বহু প্রকার উন্নত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, নানা রাসায়নিক পদার্থ ও গ্যাস ব্যবহার করিয়া আগুন নিভাইবার রীতির বহুল প্রচলন হয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়ীভাবে গঠিত 'অক্সিলিয়ারি ফায়ার সার্ভিস' নামক সংস্থার অধীনে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩০০০ জন কর্মী ও ৫০০টি আধুনিক দমকল লইয়া মোট ৫০টি দমকল-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশের জেলাগুলির প্রয়োজন পূরণের জন্য ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস' নামক অন্য একটি অস্থায়ী সংস্থা গঠিত হয়; ইহার অধীনে ৪০০০ কর্মী ও ১০০০ দমকল লইয়া ১০০টি দমকল-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তে অস্থায়ী দমকল-কেন্দ্রগুলি ক্রমশঃ কমাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু শিল্পসংস্থার সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সরকার কলিকাতায় 'ক্যালকাটা ফায়ার ব্রিগেড' ও 'এক্সপ্যাণ্ডেড ফায়ার ব্রিগেড'-এর অধীনে ৮৪টি দমকল ও ১০০০ কর্মী লইয়া ১৪টি দমকল-কেন্দ্র ও রাজ্যের অন্যত্র 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিসেস'-এর অধীনে ২০০টি দমকল ও ১৫০০ কর্মী লইয়া ৩০টি দমকল-কেন্দ্র পরিচালনা করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে উপরিউক্ত তিনটি সংস্থার মিলনে সৃষ্ট 'পশ্চিমবঙ্গ দমকল বাহিনী' নামক স্থায়ী সংস্থার অধীনে ১০৬টি দমকল ও ১৫০০ কর্মী লইয়া ৩০টি দমকল কেন্দ্র চালু রাখা হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে চীনা আক্রমণের সময় অসামরিক প্রতিরক্ষার জন্য ১০০০ কর্মী ও ৮০টি দমকল লইয়া আরও ২২টি দমকল-কেন্দ্র খোলা হয়। অসামরিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪০টি দমকল লইয়া আরও ১৬টি কেন্দ্র খুলিবার ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩৯০০ কর্মী ও ২৩২টি দমকল লইয়া গঠিত ৭৭টি অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র থাকিবে। ইহা ছাড়া রাজ্যের সর্বত্র বিশেষ প্রণালীর (চ্যানেল) মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ দমকল বাহিনীর বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা করা হইতেছে। ভূনিম্নে জলাধার নির্মাণ, নদীবক্ষে অগ্নিনির্বাপণের জন্য ভাসমান অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের (ফায়ার ফ্লোট) ব্যবস্থা, বহুতলা অট্টালিকায় আগুন নিভাইবার জন্য যান্ত্রিক মই (টার্নটেব্‌ল ল্যাডার) প্রভৃতি আমদানির আয়োজন এবং ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধারের জন্য বিশেষ বিভাগের সংগঠন প্রভৃতিও দমকল বাহিনীর বর্তমান কার্যসূচীর অন্তর্গত।

সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দমদম ২২° ৬´ উত্তর ও ৮৮° ২৫´ পূর্ব। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় ও কলিকাতার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি শহর। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব রেলপথে ১১ কিলোমিটার (৭ মাইল) এবং যশোহর রোড পথে ১৩ কিলোমিটার (৮ মাইল)। শহরটির দমদম নাম দমদমা (উচ্চটিপি বা কামান রাখিবার মঞ্চ) হইতে হইয়াছে। একটি টিপির উপর অবস্থিত প্রাচীন ঐতিহাসিক ভবনকে স্থানীয় অধিবাসীগণ কেল্লা বলিত। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণের সময় ইহার অস্তিত্ব ছিল। এই বাড়ির প্রথম উল্লেখ ওরমস্ লিখিত 'হিস্ট্রি অফ্ ওয়ার ইন বেঙ্গল' পুস্তকে পাওয়া যায়।

দমদমে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে ইংরেজদের পূর্বে অনুসৃত সকল সুখ সুবিধাই অনুমোদন করা হয়। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি সৈন্যনিবাস বা ক্যান্টনমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ১৮৫৩ পর্যন্ত 'বেঙ্গল আর্টিলরি'র হেড কোয়ার্টার ছিল। ক্যান্টনমেণ্টের বর্তমান আয়তন প্রায় ২ বর্গ কিলোমিটার।

দমদম শহরটি নর্থ দমদম ও সাউথ দমদম এই দুইটি মিউনিসিপ্যালিটিতে বিভক্ত। নর্থ দমদমের বর্তমান আয়তন ক্যান্টনমেণ্ট বাদে ১৭ বর্গ কিলোমিটার (৭ বর্গ মাইল) এবং ইহা পূর্ব ও পশ্চিম ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) বিস্তৃত। ইহার কাডিহাটি ও নিমতা অঞ্চল প্রায় গ্রাম্য। সাউথ দমদমের মিউনিসিপ্যালিটির পশ্চিমে কলিকাতা, উত্তরে নর্থ দমদম, পূর্বে অর্জুনপুর, কৃষ্ণপুর ও ধাপা গ্রাম অবস্থিত। বর্তমান আয়তন প্রায় ১৫ বর্গ কিলোমিটার (৫.৯৮ বর্গ মাইল)। ইহার কিছু অংশ লবণ হ্রদ (সল্ট লেক) অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বাগজোলা খাল দ্বারা হয় ও সল্ট লেকে গিয়া পড়ে। গড়ভাঙ্গায় ও নাগের বাজারে দুইটি বাজার আছে। এখানকার যাতায়াতের ব্যবস্থা বেশ উন্নত। 'কলিকাতা-দমদম সুপার হাইওয়ে' প্রধান, যশোহর রোড ও দমদম রোড উল্লেখযোগ্য।

দমদমের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানা ও গ্রামোফোন রেকর্ড তৈয়ারির কারখানা উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া কলিকাতার উপকণ্ঠে বলিয়া এখানে নানা শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

এখানে দমদম মোতিঝিল কলেজ, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন, কৃষ্ণকুমার হিন্দু একাডেমি ক্রাইস্ট চার্চ গার্লস হাইস্কুল, বৈদ্যনাথ ইনস্টিটিউশন প্রভৃতি কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে সাউথ দমদমের লোকসংখ্যা ১১১২৮৪ জন, তন্মধ্যে ৬২৫৯২ পুরুষ ও ৪৮৬৯২ স্ত্রীলোক। শিক্ষিতের হার ৫৯%। ১৯৬১ সালে নর্থ দমদমের লোক-সংখ্যা ৩৮১৪০ ; তন্মধ্যে ২০৩৬৪ জন পুরুষ ও ১৭৭৭৬ জন স্ত্রীলোক। ক্যান্টনমেন্টের লোকসংখ্যা ২০০৪১ জন।

দমদমে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে। এখানে দৈনিক গড়ে ৮০টি বিমান উঠানামা করে। ইহা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিমানবন্দর। এখান হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন দেশে যাওয়া যায়।

দমদমের কয়েকটি দ্রষ্টব্যের মধ্যে সেন্ট স্টিফেনের গীর্জা, রোমান ক্যাথলিক গীর্জা, ওয়েস্ট লিয়েন চ্যাপেল প্রভৃতির নাম করা যায়। এখানে একটি ইওরোপীয় ও ভারতীয় হাসপাতাল আছে।

এখানকার নিমতায় ফেব্রুয়ারি মাসের চৌকধানীর মেলা ও গৌরীপুরে ফকির সাহেবের মেলা উল্লেখযোগ্য।

দ্র A. Mitra, *Census of India 1951, District Handbook : 24 Parganas*, Alipore, 1951 ; State Statistical Bureau, *West Bengal Statistical Abstract*, Calcutta, 1961.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

দমন গোয়া, দমান, দীউ দ্র

দময়ন্তী নল দ্র

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩ খ্রী) উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ভারতীয় ধর্ম-সংস্কারক ও আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। পশ্চিম ভারতে কাথিয়াওয়াড়-এর মোর্‌ভি শহরে এক বিত্তশালী নিষ্ঠাবান সামবেদী ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম মূলশংকর। বাল্যশিক্ষা পিতার নিকটে। দয়ানন্দ ইংরেজী শিক্ষা পান নাই, প্রথম হইতেই তিনি সংস্কৃতশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন ও ক্রমশঃ সমগ্র যজুর্বেদ ও আংশিকভাবে অপর তিন বেদ, ব্যাকরণ, তর্ক ও দর্শনশাস্ত্র, কাব্য, অলংকার, স্মৃতি প্রভৃতিতে যথেষ্ট অধিকার অর্জন করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রে তেজস্বিতা ও জিজ্ঞাসু মনোবৃত্তির স্ফুরণ লক্ষিত হয়। শিবোপাসনা এই পরিবারের কুলধর্ম ছিল। কথিত আছে, চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে একদা শিবরাত্রির উপবাসরত অবস্থায় সম্মুখস্থ শিবমূর্তির উপর একটি মূষিককে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে দেখিয়া দয়ানন্দ দেবমূর্তির ঈশ্বরত্বে সন্দিহান হন এবং ক্রমশঃ প্রতিমাপূজায় বিশ্বাস হারান। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে নিজ ভগ্নী ও খুল্লতাতের মৃত্যুদর্শনের ফলে তাঁহার সংসারে উদাসীনতা ও জীবন-মৃত্যুর রহস্যভেদ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। তাঁহার পিতা সংসারের প্রতি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিবার মানসে তাঁহার বিবাহ দিবার আয়োজন করিলে তিনি গৃহ হইতে পলায়ন করেন ও সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করেন। ১৮৪৫ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়া অবিরাম শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মথুরা-বাসী সন্ন্যাসী স্বামী বিরজানন্দের নিকট হিন্দুশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা বিশেষতঃ বৈদিক-সাহিত্য অধ্যয়নপূর্বক সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞরূপে পরিচিত হন। সন্ন্যাসজীবনে তিনি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৬০ হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের প্রবক্তা ও সংস্কারকরূপে বিশুদ্ধ বেদসম্মত হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দয়ানন্দ ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন ও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল বোম্বাইয়ে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে ইহার গঠনতন্ত্র ও ধর্মমত চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দয়ানন্দের জীবনের অবশিষ্ট ভাগ প্রচার, গ্রন্থ-রচনা ও সমগ্র ভারতব্যাপী আর্যসমাজ আন্দোলনের প্রসার ও সংগঠন কর্ম-সংক্রান্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। আজমীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'আর্যসমাজ' দ্র।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে সকল সংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য, মনীষা ও সংস্কারাদর্শ সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত হিন্দু-শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া বিকশিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে তিনি আসেন নাই। আদর্শের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কোনরূপ সমন্বয় করিবার চেষ্টাও তিনি করেন নাই। সমসাময়িক হিন্দুসমাজের অধঃপতিত অবস্থা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল। অন্তর্দ্বন্দ্ব, বাল্যবিবাহ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, সত্যাদর্শচ্যুতি ও বেদের অননুশীলন প্রভৃতি অনাচারকেই তিনি ইহার কারণরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন। এই সকল অনাচার দূরীকরণপূর্বক বৈদিক আর্য স্বর্ণযুগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে ভারত-বর্ষের সকল দুঃখের অবসান হইবে ; ইহাই তাঁহার দৃঢ় অভিমত ছিল। হিন্দুসমাজের এই আভ্যন্তরীণ সংস্কারকার্যকে তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অজেয় পৌরুষ,

সম্পূর্ণ নির্ভীকতা ও প্রতিপক্ষের প্রতি অপোষহীন সংগ্রামের মনোভাব তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। যদিও তাঁহার সাধনা কতকাংশে প্রত্যাবর্তনের সাধনা, অগ্রসর হইবার নহে, তথাপি তাঁহার আন্তরিকতা ও অদম্যতা যে হিন্দু-সমাজে সংহতি ও গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়াছিল একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সংস্রবে না আসিলেও আর্যসমাজের মাধ্যমে প্রসারিত তাঁহার মতবাদ উত্তর ভারতের চরমপন্থী রাজনীতিবিদ্‌গণকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, প্রচারকার্যোপলক্ষে দয়ানন্দ ১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসিলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ঘটে কিন্তু উভয়পক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্য জন্মিলেও মতের মিল হয় নাই। উত্তরকালে আশুতোষ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্রগণ দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের যোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহাও সাফল্যলাভ করে নাই। দয়ানন্দের রচনাবলী: 'যজুর্বেদভাষ্য (সম্পূর্ণ)', 'ঋগ্‌বেদভাষ্য (আংশিক)', 'ঋগ্‌বেদভাষ্য ভূমিকা', 'সত্যার্থ প্রকাশ', 'সংস্কারবিধি', 'পঞ্চ মহাযজ্ঞবিধি', 'আর্যাভিবিনয়', 'আর্যোদ্দেশ্যরত্নমালা', 'সংস্কৃতবাক্যপ্রবোধ', 'ভ্রান্তি নিবারণ', 'ভ্রমোচ্ছেদন', 'ব্যবহার ভানু ও গোকরুণানিধি'।

দ্র পণ্ডিত লেখরাম ও লালা আত্মারাম, মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ কা জীবনচরিত, ১৮৯৭; দয়ানন্দ সরস্বতী, সত্যার্থপ্রকাশ (বঙ্গানুবাদ), কলিকাতা, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ; দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ, কলিকাতা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ; স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর জন্মস্থানাদি নির্ণয়, কলিকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ; F. Max Muller, *Biographical Essays*, London, 1884; Lajpat Rai, *The Arya Samaj: An Account of Its Aims, Doctrine and Activities with a Biographical Sketch of its Founder*, London, 1915; H.B. Sarda, *Life of Dayananda Saraswati*, Ajmere, 1946; Amales Tripathi, *The Extremist Challenge*, Calcutta, 1967.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

দয়ালবাগ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা শহরের সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার (সাড়ে তিন মাইল) দূরে দয়ালবাগ উপনগরী প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেঠ শিবদয়াল সিং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ বৎসরব্যাপী সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর রাধাস্বামী ধর্ম নামে স্বীয় ধর্মদর্শন প্রচারার্থে এখানে এক সভা আহ্বান করেন। ক্রমে তাঁহার শিষ্যেরা এখানে সৎসঙ্গ নামে এক ধর্ম-সম্প্রদায় গড়িয়া তোলেন এবং স্বামীজীর নামানুযায়ী ইহার নাম দয়ালবাগ রাখেন। ইহা স্বামীবাগ বলিয়াও অভিহিত হয়। যদিও এই অঞ্চলে প্রধানতঃ সৎসঙ্গের ব্যবসায়-বাণিজ্য, দোকান-বাজার, চুগ্ধালয়, প্রদর্শনী কেন্দ্র প্রভৃতির সমাবেশ তথাপি দয়ালবাগ স্বামীজীর সমাধি-মন্দিরের জন্যই সমধিক খ্যাত।

স্বামীজীর মৃত্যুর (১৮৭৮ খ্রী) পর তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত সৎসঙ্গের তৃতীয় অধ্যক্ষ মহারাজ সাহেব কর্তৃক পরিকল্পিত গুরুর সমাধি স্থলে মন্দির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার মৃত্যুর (১৯০৭ খ্রী) পর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি এই কার্য স্থগিত ছিল। পঞ্চম অধ্যক্ষ বাবুজী মহারাজের সময়ে পুনরায় মন্দির নির্মাণকার্য পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়।

স্বামীজীর ভজনগৃহকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে বৃহদাকার বারান্দাযুক্ত ১৩টি করিয়া মোট ৫২টি ঘর সমন্বিত এই প্রাসাদোপম শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত অট্টালিকা, কূপ এবং মনোরম উদ্যান বেষ্টিত। বিভিন্ন ভাষাবলম্বী শিষ্য সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে স্বামীজীর বাণী বিভিন্ন ভাষায় প্রস্তর গাত্রে ক্ষোদিত আছে।

আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মন্দিরগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কার্যক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বাইশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরও নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় নাই। ব্যয়ভার সমস্ত বহন করিতেছেন সৎসঙ্গ-সম্প্রদায়। স্বামীবাগের প্রশাসনিক পরিষদ কর্তৃক নির্মাণকার্য পরিচালিত হইতেছে।

দ্র *Radha Soami Satsangh*, Agra, 1960.

অশোকা সেনগুপ্ত

দয়াল সিং (১৮৪৮-৯৯ খ্রী) মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধীন খালসা সেনাদলের অন্যতম সেনাপতি লহনা সিং-এর পুত্র। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মানিথিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সরদার দয়াল সিং পৈতৃক জমিদারী পরিচালনার কার্যে ব্যাপৃত হন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে প্রত্যাবর্তনের পর সাংবাদিক শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় তিনি 'ট্রিবিউন' (Tribune) সাপ্তাহিক

সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি ক্রমে সপ্তাহে তিন বার এবং শেষে দৈনিক পত্রিকায় উন্নীত হয়।

দয়াল সিং তাঁহার দান এবং সমাজ সেবার জন্য দাতা ও কর্মবীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তিনি পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'দয়াল সিং' কলেজ নামে একটি কলেজ স্থাপনার্থে তিনি প্রায় পনর লক্ষ টাকা দান করেন।

অশোকা সেনগুপ্ত

দরবেশ ফারসী 'দরিউস' শব্দ হইতে বাংলা দরবেশ শব্দের উৎপত্তি। দরিউস-এর অর্থ ভিক্ষা করা। ইসলামের ইতিহাসে নানা সময়ে ৩২টি (বা ৩৬টি) ভ্রাতৃত্বমূলক ধর্মীয় সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল সংঘের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা দরবেশ নামে অভিহিত। আল্লাহের সান্নিধ্যে পৌছানোর সাধনায় দরবেশ পীর বা পথপ্রদর্শকের নির্দেশে চালিত হন। বিখ্যাত দরবেশদের জীবনচরিতে তাঁহাদের ভাবোন্মাদ ও তন্ময়তা, বাহ্যজ্ঞান বিলোপ, ঈশ্বরে স্বীয় অস্তিত্বের নিমজ্জন, ঈশ্বরের গুপ্ত রাজ্যের মহিমা অবলোকন প্রভৃতি বর্ণিত।

মওলানা সাইয়েদেনা আবদুল কাদের জিলানী (বড়পীর, মৃত্যু ১১৬৬ খ্রী) কর্তৃক দরবেশী ভ্রাতৃসংঘ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাকে দরবেশ তরিকার পথিকৃৎ বলা হয়। নিম্নোক্ত কয়েকটি দরবেশ সংঘ বিখ্যাত, যথা মওলুবী, সাদী, রেফায়ী ও আহমদী। মওলুবী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দীন আল-রুমী (১২০৭-৭৩ খ্রী)। মওলুবীরা ভাবাবেগে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করেন। রেফায়ী সংঘ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। রেফায়ী দরবেশেরা জ্বলন্ত অঙ্গার ভক্ষণ করিতে ও কাচ চর্বণ করিতে পারেন ইত্যাদি কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত। যে সকল দরবেশ কোরাণের অনুশাসন মানেন তাঁহাদিগকে বাশর বলা হয়; যাঁহারা মানেন না (যেমন বক্তাপী দরবেশ) তাঁহারা বেশর।

দ্র J. P. Browne, *The Dervishes*, London, 1868.

আব্দুস সোব্হান

দরেইওস, ডেরিয়াস একেমিনিড পারস্য সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। কিরোস দি গ্রেট (৫৫৮-৫৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি মিডিয়ার একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। বিদ্রোহ করিয়া মিডিয়া দখলে আনেন এবং অল্প কালের মধ্যেই লিডিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া হিন্দুকুশ হইতে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ভূখণ্ডে শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। হেরোদোতস বলেন পারসিকেরা তাঁহাকে জাতির পিতা বলিত। তাঁহার পুত্র ক্যাম্বাইসেস মিশর দখল করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৫২২ অব্দে পারস্য সম্রাট ক্যাম্বাই-সেসের মৃত্যুর পর হিস্টাস্‌পেসের পুত্র দরেইওস পারস্যের সম্রাট হন। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই সুজিয়ানা, ব্যাবিলন ও মিডিয়ায় ও অন্যান্য প্রদেশে বিদ্রোহ হয়, দরেইওস এই বিদ্রোহ দমন করেন। অতঃপর তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৫১২ অব্দে দক্ষিণ রাশিয়ার সিথিয়ায় শক দেশে এক বিরাট ব্যর্থ অভিযান করেন। ইহার পর আয়োনিয়ার ও কেরিয়ার গ্রীকগণ বিদ্রোহ করেন (৪৯৯-৪৯৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) দরেইওস ইহাও দমন করেন। এই সময়ে তাঁহার সাম্রাজ্য সিরেনাইকা-লিবিয়া মিশর হইতে আমুদরিয়ার (অক্সাস) উভয় তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য তিনি কুড়িটি প্রদেশে (সাত্রাপি, Satrapy) বিভক্ত করেন। এই সাম্রাজ্য হইতে তিনি বাৎসরিক ১৪৫৬০ ইউবোরিক ট্যালেন্ট কর পাইতেন, যাহার আধুনিক মূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড। বিদ্রোহী আয়োনীয় ও কেরিয়গণকে অ্যাথেন্স ও এরেত্রিয়া সাহায্য করায় দরেইওস ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে মার্দোনিওস-এর অধীনে একটি অভিযান পাঠান। এই অভিযান ঝটিকায় বিধ্বস্ত হয়। দ্বিতীয় অভিযানটি ডেটিস ও আর্টাফার্নেসের অধীনে জলপথে যাইয়া এরেত্রিয়া ধ্বংস করে, কিন্তু ম্যারা-থনের স্থলযুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯০ অব্দ) ও এথেন্স নিরাপদ হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৮ বা তাহার কিছু পূর্বে ক্ষোদিত দরেইওসের বেহিস্তুন লেখ-তে ভারতের কোনও উল্লেখ নাই কিন্তু ৫১৮ খ্রীষ্টপূর্বের পরে অন্য দুইখানি লেখ-তে হিদু অর্থাৎ হিন্দুর উল্লেখ থাকায় মনে হয়, খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৮ অব্দে তিনি ভারতের কিয়দংশ জয় করেন। হেরোদোতস হইতে জানা যায় যে ভারত দরেইওসের রাজত্বের বিংশ প্রদেশ ছিল ও ইহা সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ রাজস্বের ⅓ অংশ কর দিত। এই করের পরিমাণ ছিল ৩৬০ ট্যালেন্ট স্বর্ণরেণু, যাহা কানিং-হ্যামের মতে ১০৭৮২৭২ পাউণ্ড। দরেইওস খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৭ অব্দে স্কাইলাক্সকে সিন্ধু আবিষ্কারের জন্য পাঠান। পণ্ডিতগণের মতে দরেইওসের রাজত্ব সিন্ধু নদীর পূর্ব দিকে কিয়দংশ লইয়া গঠিত ছিল ও ইহা সিন্ধুর মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু সিন্ধুর বা রাজপুতানার মরুভূমি ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৫ অব্দে দরেইওসের

মৃত্যু হয়। তিনি সুশাসক ছিলেন ও ইহুদীদের সহিত সদ্ব্যবহার করেন। তিনিই স্বর্ণ ডেরিক মুদ্রা প্রচলিত করেন।

দ্বিতীয় দরেইওস: দ্বিতীয় ক্সেরক্সেসের হত্যাকারীকে নিহত করিয়া দ্বিতীয় দরেইওস পারস্যের সম্রাট হন। তিনি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৩?-৪০৪ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

তৃতীয় দরেইওস: তৃতীয় আর্টাক্সেরক্সের পুত্র তৃতীয় দরেইওস কোদোমান্নস্ (Codomannus) খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৬ অব্দে পারস্যের সম্রাট হন। তাঁহার রাজত্বের সময় আলেক্সান্দর দি গ্রেট পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। গ্রাণিকাসের যুদ্ধে (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৪ অব্দ) পারসিকগণের পরাজয় হইলে পারস্য সম্রাট স্বয়ং আলেকসান্দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে ইসাসের যুদ্ধে (৩৩৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ও পরে আরবেলার (Arbela) যুদ্ধে (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩১ অব্দ) পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং নিহত হন (৩৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

দ্র G. Rawlinson, tr., *Herodotus*, London, 1858-60; *Cambridge Ancient History*, vol. IV and VI, Cambridge, 1929; R. C. Majumdar, *The History and Culture of the Indian People*, vol. II, Bombay, 1960.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

দর্পণ মুখ দেখিবার জন্য সর্বপ্রথম কোন সময়ে যে দর্পণের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে পৌরাণিক কাল হইতেই যে আমাদের দেশে ধাতু নির্মিত দর্পণের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে দর্পণ, কংকতিকা প্রভৃতি যুদ্ধ সজ্জার অন্যতম উপকরণ (বোধ হয় প্রসাধনের উদ্দেশ্যে) হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বর্তমান কালেও হিন্দুদের বিবাহানুষ্ঠান ও অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সেই প্রাচীন আমলের দর্পণের ব্যবহার প্রচলিত আছে। হিন্দু সমাজের বিবাহানুষ্ঠানে বরকে যে দর্পণ প্রভৃতি ধারণ করিতে হয়, তাহা সম্ভবতঃ সেই প্রাচীন প্রথারই অনুকরণমাত্র। আজও বিজয়া দশমীর পরে ক্ষৌরকারেরা বাড়ি বাড়ি গিয়া সকলকে দর্পণ দেখাইয়া থাকেন। দুর্গাপূজার প্রথম অনুষ্ঠান—নব পত্রিকার (কলা বৌ) মহাস্নান। গঙ্গার সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীরা গঙ্গার ঘাটে এই স্নান-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী হিন্দুরা প্রাচীন কালের ধাতব দর্পণে প্রতিমার মূর্তি প্রতিফলিত করিয়া সেই দর্পণের উপরেই মহাস্নান সম্পন্ন করেন। ইহাকে দর্পণ-স্নান বলা হইয়া থাকে।

ধাতব দর্পণ কুব্জপৃষ্ঠ। এই পৃষ্ঠদেশকে যতদূর সম্ভব মসৃণ করিবার পর মুখ দেখিবার দর্পণ হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যে কোনও বস্তু হইতে প্রতিফলিত হইয়া আলোকরশ্মি দর্পণের মসৃণ পৃষ্ঠের উপর পতিত হইলেই তাহা পুনরায় প্রতিফলিত হইয়া দর্শকের চোখের উপর পড়ে। ইহার ফলেই দর্শক সেই পদার্থটির অবিকল প্রতিকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে।

কাচ আবিষ্কৃত হইবার পর যখন মসৃণ সমতল প্লেট গ্লাস তৈয়ারি করা সম্ভব হইল, তখন হইতেই কাচের আয়না বা দর্পণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয়। স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া আলোকরশ্মি অনায়াসেই চলিয়া যায়, কাজেই আলো যাহাতে কাচ অতিক্রম করিবামাত্র প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, সেইজন্য সমতল কাচের প্লেটের অপর পৃষ্ঠে পারদের আস্তরণ দেওয়া হইত এবং সেই আস্তরণকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার জন্য তাহার উপর মেটে সিঁদুর বা ঐ জাতীয় কোনও জিনিসের প্রলেপ দেওয়া হইত। কিন্তু এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিল না। কাজেই পরবর্তী কালে পারদের পরিবর্তে কাচের এক পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রকারে রৌপ্যাস্তরণ দিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়। শুধু মুখ দেখিবার জন্যই নয়, আজকাল বিভিন্ন কাজে, বিশেষতঃ গৃহসজ্জা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, চিকিৎসাবিদ্যা ও আলোক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের দর্পণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দর্পনারায়ণ ঠাকুর (১৭৩১-৯৩ খ্রী) দর্পনারায়ণ হইতে ঠাকুরবংশের পাথুরিয়াঘাটা শাখার সূত্রপাত। পলাশীর যুদ্ধের পর পিতা জয়রামের কলিকাতাস্থ গড়ের মাঠ এলাকার বসতবাটী ও বাগানবাড়ি ইংরেজরা ক্রয় করিয়া লইলে ভ্রাতা নীলমণি-সহ তিনি পাথুরিয়াঘাটায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। হুইলার সাহেবের দেওয়ানি করিয়া ও নানাবিধ ব্যবসার দ্বারা তিনি অনেক অর্থের অধিকারী হন। ভ্রাতা নীলমণি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কালেক্টরের সেরেস্তাদারি লইয়া ওড়িশায় থাকাকালে উপার্জিত অর্থ দর্পনারায়ণকে পাঠাইতেন। এই অর্থ লইয়া উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে, অতঃপর তাহার মীমাংসা হইলে নীলমণি পাথুরিয়াঘাটা ত্যাগ করিয়া জোড়াসাঁকোয় বসতি স্থাপন করেন।

দর্পনারায়ণের ৭ পুত্র। এই বংশেই রাজা শৌরীন্দ্র-

মোহন, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুশীল রায়

দল অর্থাৎ রাজনৈতিক দল, ইহা নাগরিকগণের সমিতি-বিশেষ। রাষ্ট্রের নাগরিকগণের একটি লক্ষণীয় অংশ যদি দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বিষয়ে একমত হয় এবং সেই নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী দেশের শাসনপরিচালনার উদ্দেশ্যে একযোগে প্রচারকার্য চালাইয়া শাসন ক্ষমতা অধিকার করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই একতাবদ্ধ নাগরিকসমূহকে রাজনৈতিক দল বলা হয়।

আধুনিক পৃথিবীতে প্রতি দেশেই এক বা একাধিক রাজনৈতিক দল আছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলগঠনের স্বাধীনতা রহিয়াছে, তাই সেই সমস্ত দেশে একাধিক দল গঠিত হইয়াছে। ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইটালী, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ এই শ্রেণীভুক্ত। এই সকল গণতান্ত্রিক দেশে একনায়কত্বে বিশ্বাসী দলগুলিকেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কিন্তু একনায়কত্বভিত্তিক শাসনব্যবস্থার আওতায় ক্ষমতাধিকারী দল অন্য সকল দলের অবলোপ ঘটাইয়া আপন দলের নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করিয়া থাকে। ফ্যাসিজ্‌ম্‌ বা কমিউনিজ্‌ম্‌ মতাবলম্বী রাষ্ট্রে একমাত্র ফ্যাসিস্ট বা কমিউনিস্ট দল স্বীকৃত হইয়া থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি দল প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে, যথা—রিপাব্‌লিক্যান ও ডেমোক্র্যাটিক দল। ব্রিটেনের শ্রমিকদল, রক্ষণশীল দল ও উদারপন্থী দল এই তিনটি দলই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আজকাল উদারপন্থী দলভুক্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যসংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছে যে, ব্রিটেনকে এখন পূর্বের মত দ্বি-দলীয় রাষ্ট্র বলা চলে। ভারতবর্ষে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল আছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি সর্বভারতীয় দল হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে; যথা কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দল। প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য কতকগুলি মতবাদ ও কর্মপন্থায় বিশ্বাসী। সংঘশক্তি-প্রয়োগে প্রতি দল ঐ মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি জনগণের মধ্যে দিনের পর দিন প্রচার করিয়া থাকে। সভা-সমিতি, আলোচনা বৈঠক, সংবাদপত্র, ইস্তাহার, প্রচারপত্র, পুস্তকাদি ও রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে দলগুলি জনসাধারণের সমর্থনলাভের চেষ্টা করে। যে দল বা সংযুক্ত একাধিক দল সাধারণ নির্বাচনে বিধান মণ্ডলী বা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সংসদীয় গণতন্ত্রে তাহারাই সরকার গঠন করিবার অধিকার পায়। ব্রিটেন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশে এই নিয়মানুযায়ী দলীয় সরকার স্থাপিত হইয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র বিদ্যমান; কিন্তু সেই দেশে দলীয় ভিত্তিতে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই প্রশাসন-ক্ষমতার অধিকারী হন; সুতরাং এই অর্থে ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রের সরকারও দলীয় সরকার।

আধুনিক কালে রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য। একনায়কত্ব-ভিত্তিক রাষ্ট্রেও দলই দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা। পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত শ্রেণীর রাষ্ট্রে একটিমাত্র দলই আইনতঃ স্বীকৃত। অন্য দলগঠনের স্বাধীনতা আইনানুযায়ী নিষিদ্ধ। আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল শুধু সরকার পরিচালনায় অপরিহার্য নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেশের উপকার সাধন করিতে সক্ষম। রাজনৈতিক দল সুচিন্তিত ও সুগঠিত দলীয় নীতির মাধ্যমে দেশের সমস্যা ও তাহার সমাধানের ইঙ্গিত দেয়; প্রচার দ্বারা রাষ্ট্রচেতনা, দেশাত্মবোধ ও সুনাগরিকতা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। গণতান্ত্রিক দলগুলি যদি আপন আপন আদর্শ অনুযায়ী দেশ-সেবায় অগ্রসর হয় তাহা হইলে সত্যই দেশের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ দলই আপন আপন ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়। ইহার ফলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন, নাগরিকগণ যে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হন তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ, বিভিন্ন মনোভাবাপন্ন মানুষ সব দেশেই আছে। একশ্রেণীর মানুষ স্বভাবতঃই পুরাতন পন্থী; দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ স্বভাবতঃ বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতি পরিত্যাগ করিতে নারাজ, ইহারা রক্ষণশীল; তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ ধীর ও সুস্থভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনকামী, ইহারা উদারপন্থী; চতুর্থশ্রেণীভুক্ত মানুষ রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল সংস্কারকামী হইলেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন পছন্দ করেন না। পঞ্চম শ্রেণীর মানুষ প্রকৃতিগতভাবে বিপ্লবী-মনোভাবাপন্ন; রক্তাক্ত বিপ্লবের পথেও তাঁহারা অগ্রসর হইতে দ্বিধা বোধ করেন না। কার্ল মার্ক্‌স মনে করেন, অর্থনৈতিক ও শ্রেণীগত কারণেই বিভিন্ন মনোভাবাপন্ন মানুষের উদ্ভব

হয় এবং শ্রেণীর ভিত্তিতেই বিভিন্ন দল গঠিত হইতে থাকে ও দলের সংঘর্ষ অপরিহার্য হইয়া ওঠে।

যে সকল দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বর্তমান সে সকল দেশে যদি দুইটি মাত্র প্রধান দল থাকে, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক দলীয় সরকার স্থায়িত্ব-লাভ করে। কিন্তু বহু দল যেখানে সংসদে অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হইয়া প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, সেখানে সরকার বহু দলের দ্বারা গঠিত হইতে বাধ্য। সেইরূপ অবস্থায় সরকারের অন্তর্বিবাদ প্রায় অনিবার্য হইয়া পড়ে বলিয়া সুসম্বদ্ধ নীতি অনুযায়ী প্রশাসন-পরিচালনা সুকঠিন হয় এবং গঠিত সরকারও বেশি দিন স্থায়ী হইতে পারে না। এইজন্যই ইংল্যাণ্ডের শক্তিশালী দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে এবং ফ্রান্সের বহু-দলীয় শাসনব্যবস্থা সরকারকে পরিবর্তন-শীল ও দুর্বল করিয়া রাখিয়াছে।

নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য

দলবদ্ধ আচরণ (গ্রুপ বিহেভিয়ার) একগোষ্ঠীভুক্ত-গণের সমবেত আচরণ। দলভুক্ত হইলেই মানুষের ব্যক্তিত্ব, সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য অধিকাংশ সময়েই লোপ পায় ও ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে দলগত আচরণ অনুযায়ী কাজ করে। মনোবিদ্‌দের মতে কোনও একটি স্থানে, কোনও এক সময়ে, কোনও কারণে জনসমাবেশ হইলেই দলের সৃষ্টি হয় না; যখন একত্র সমাগত একাধিক ব্যক্তি একই কেন্দ্র-বিন্দু ঘিরিয়া একই ভাবে চিন্তা করে, অনুভব করে ও কাজ করে তখনই মনোবিজ্ঞান-সম্মত দলের উৎপত্তি হয়। দলগত ব্যবহার বা আচরণ দলভুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণ হইতে পৃথক বলিয়া তাহা উচ্চ মানের বা নিম্ন মানের হইতে পারে এবং তাহা (দলবদ্ধ আচরণ) দলভুক্ত ব্যক্তিদের মানসিক ক্রিয়ার গড় নহে। ব্যক্তিসমষ্টিই দল হইলেও এই আচরণের পার্থক্যবিষয়ে বহু মনোবিদ্ তাঁহাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, মানুষ দলবদ্ধ হইলে এক নূতন স্বতন্ত্র মানসিকতার সৃষ্টি হয় এবং তাহাই দলবদ্ধ আচরণের কারণ। তাঁহারা সেই নূতন মানসিক সত্তাকে 'গোষ্ঠীমন' (গ্রুপ মাইণ্ড) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আধুনিক মনোবিদ্‌গণ এই ধারণায় বিশ্বাসী নহেন।

দলবদ্ধ আচরণ অপর ব্যক্তির সান্নিধ্যে উন্মেষিত ও উদ্দীপিত হয়। ইহাতে চিন্তাগ্রাহিতা ও অতিবিশ্বাসের ভাব প্রবল থাকে এবং আবেগের অতিরিক্ত বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। এই কারণে বুদ্ধিবৃত্তির সুষ্ঠু প্রকাশ দলে খুবই কম দেখা যায়। দলবদ্ধ ব্যবহারে দলীয় শক্তিমত্তাসম্বন্ধে এত বেশি বিশ্বাস জন্মে যে দলবদ্ধ আচরণে অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস দেখা যায়। দলবদ্ধ পরিবেশের অবর্তমানে এই সকল অস্বাভাবিক শক্তি ও প্রেরণা লুপ্ত বা সুপ্ত থাকে।

ল্য বঁ (Le Bon) ফরাসী বিপ্লবের কালে জনতার দলবদ্ধ অযৌক্তিক উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারকে বিশেষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেন ও 'দি ক্রাউড' (১৮৯৫ খ্রী) গ্রন্থে ইহার প্রথম আলোচনা করেন।

দলবদ্ধ আচরণে নেতার অবদানও কম নহে। দলবদ্ধ আচরণে ও দলে নেতার অংশ কতখানি এই বিষয় লইয়া সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে বহু তত্ত্ব ও আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে।

দ্র Gustave Le Bon, *The Crowd*, F. Unwin, tr., London, 1907; W. Mc Dougall, *The Groupmind*, Cambridge, 1920; S. Freud, *Group Psychology and the Analysis of the Ego*, London, 1922; F. H. Allport, *Social Psychology*, Cambridge, 1924; J. P. Guilford, ed., *Fields of Psychology*, New York, 1940.

প্রিয়াংশুশেখর ভট্টাচার্য

দলীপ সিংহ (১৮৩৮-৯৩ খ্রী) মহারাজ রঞ্জিত সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর (মতান্তরে ৪ সেপ্টেম্বর) লাহোরের রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জুন রঞ্জিত সিংহের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র শের সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে ৫ বৎসরের শিশু দলীপকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া রাজমাতা জিন্দ কাউর নাবালক রাজার অছিপদে নিয়োজিত হন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মহারানীকে অছিপদ হইতে বিতাড়িত করিয়া এক নবনির্মিত অছিপরিষদের দ্বারা রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা করে এবং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দলীপকেও বিতাড়িত করিয়া পাঞ্জাব রাজ্য সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে। দলীপ এবং রাজমাতা জিন্দ কাউর বেতনভোগীর পর্যায়ভুক্ত হন। দলীপকে প্রায় বন্দী অবস্থায় ফতেগড়ে জন লগিনের অভিভাবকত্বে স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ধর্মান্তরিত হন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ শাসকেরা দলীপ সিংহকে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করেন।

ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে দলীপ সিংহ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির দাবিতে ব্রিটিশ সরকারের নিকট বিচার প্রার্থনা করিয়া আবেদন করেন ; কিন্তু আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ায় দলীপ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে দলীপ ভারতের পথে যাত্রা করিয়া এডেন বন্দরে আটক হইয়া পড়েন। ব্রিটিশ সরকার তাঁহার ভারতে পদার্পণ করিবার অনুমতিপত্র নাকচ করিয়া দেয়। তিনি ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন না করিয়া পারী শহরে গমন করেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি পুনরায় শিখধর্মে দীক্ষিত হন এবং ইংরেজদের কবল হইতে পাঞ্জাব রাজ্য পুনরুদ্ধারের সংকল্পে বাকি জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ফরাসী সরকারের নিকট ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সহায়তা প্রার্থনা করিয়া আশাপ্রদ প্রত্যুত্তর না পাইয়া তিনি রাশিয়ায় গমন করেন। রাশিয়ায় জারের নিকট ইংরেজের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কতকাংশে সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন ; রাশিয়া হইতে তিনি ভারতীয় জনমতকে ইংরেজের বিরুদ্ধে জাগ্রত করিতে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ পত্রাদি প্রেরণ করেন। তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচারকল্পে পুনরায় পারীতে গমন করেন। তথায় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র *The Maharajah Duleep Singh and the Government*, London, 1884 ; Ganda Singh, *The British Occupation of the Punjab, Patiala*, 1955.

অশোকা সেনগুপ্ত

দশকর্ম মূল অর্থ দশসংস্কার বা শিশু ও তরুণের বিশুদ্ধি ও মঙ্গলসাধক শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। গৌণ ও ব্যাপক অর্থ বিবিধ ধর্মানুষ্ঠান। এই অর্থে যে কোনও ধর্মানুষ্ঠান দশকর্মের অন্তর্গত। বেদোক্ত মুখ্য দশটি সংস্কারের নাম গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি পরিচিত বা নামমাত্র প্রচলিত। 'গর্ভাধান', 'অন্নপ্রাশন', 'উপনয়ন', 'বিবাহ' দ্র। প্রসঙ্গান্তরে অনুল্লিখিত সংস্কারগুলির মধ্যে পুংসবন গর্ভের তৃতীয় মাসে, সীমন্তোন্নয়ন চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং জাতকর্ম পুত্রের জন্মমাত্রে অনুষ্ঠেয়। পুংসবনে পুরুষ-সন্তান কামনা করা হয়। সীমন্তোন্নয়নে গর্ভিণীর সিঁথি তুলিয়া দেওয়া হয়। মনে হয়, ইহার পর হইতে গর্ভাবস্থায় প্রসাধন বর্জন করা হইত। জাতকর্মে ধান ও যবের গুঁড়া, ঘৃত ও মধুসংযুক্ত স্বর্ণখণ্ড প্রভৃতির সাহায্যে নবজাত কুমারের জিহ্বা মার্জন করিয়া তাহার দীর্ঘ-জীবন প্রার্থনা করা হয়। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের বেশির ভাগ এখন লুপ্ত বা লোপোন্মুখ। পক্ষান্তরে কিছু কিছু লৌকিক বা অবৈদিক অনুষ্ঠানের প্রচলন হইয়াছে। গর্ভের পঞ্চম বা সপ্তম মাসে গর্ভিণীকে পঞ্চামৃত (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি ও মধু) বা সপ্তামৃত পান করাইবার প্রথা কোথাও কোথাও আছে। সপ্তম বা নবম মাসে সাধভক্ষণের রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই উপলক্ষে অনেক ক্ষেত্রে উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। গর্ভিণীকে নূতন কাপড় ও ভাল খাদ্যবস্তু দেওয়া হয়। প্রসবান্ত-অনুষ্ঠানের পরিচয় 'আঁতুড়' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

দ্র গৃহ্যসূত্র ; রঘুনন্দন, সংস্কারতত্ত্ব ; সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পুরোহিত-দর্পণ, কলিকাতা, ১৯০৫।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দশনামী শংকরাচার্যের চারিজন প্রধান শিষ্য ছিলেন পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। উইল্‌সনের মতে মণ্ডনের অপর একটি নাম সুরেশ্বর ও চতুর্থ শিষ্যের নাম ত্রোটক। পদ্মপাদের দুইজন শিষ্য ছিলেন তীর্থ ও আশ্রম ; হস্তামলকের দুইজন শিষ্যের নাম বন ও অরণ্য ; মণ্ডনের তিনজন শিষ্যের নাম গিরি, পর্বত ও সাগর ; তোটকের তিন শিষ্যের নাম সরস্বতী, পুরি ও ভারতী। এই দশজন হইতে দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত নাম কল্পিত উপাধিবিশেষ বলিয়াই মনে হয়।

দশনামী সন্ন্যাসীদের পরিচয় এইরূপ ; ত্রিবেণীসংগম তীর্থে যিনি তত্ত্বার্থভাবে স্নান করেন তিনি তীর্থ। যিনি আশ্রমগ্রহণে দক্ষ, আশাপাশবিবর্জিত, অবাধগতি তিনি আশ্রম। বনে সুরম্য নির্ঝরসান্নিধ্যে যিনি কামনামুক্ত হইয়া বাস করেন তিনি বন। সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া আনন্দদায়ক অরণ্যে যিনি 'আরণ্য ব্রত' অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করেন তিনি অরণ্য। যিনি নিত্য পর্বতবাসী, গীতাভ্যাসে তৎপর, গম্ভীর ও অচপলবুদ্ধি তিনি গিরি। যিনি পর্বতমূলে বাসকারী, ধ্যানধারণানিপুণ, সারাৎসারজ্ঞ তিনি পর্বত। যিনি সাগরের ন্যায় গম্ভীর হইয়া, ফলমূলাদি বনরত্ন গ্রহণ করিয়া, আপন মর্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া অবস্থান করেন তিনি সাগর। যিনি স্বরজ্ঞানী, স্বরবাদী, কবিশ্রেষ্ঠ, সংসার-সাগরে সারজ্ঞানী তিনি সরস্বতী। বিদ্যাভারে সম্পূর্ণ হইয়া যিনি সর্বভার পরিত্যাগ করেন ও দুঃখভার জানেন না তিনি ভারতী। যিনি

জ্ঞানতত্ত্বে সম্পূর্ণ, পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিত ও নিত্য পরব্রহ্মে রত তিনি পুরি নামে খ্যাত। দশনামী সন্ন্যাসীদের মধ্যে যিনি যে শ্রেণীভুক্ত হন তিনি সেই শ্রেণীর নাম প্রাপ্ত হন।

শংকরাচার্যপ্রতিষ্ঠিত চারটি প্রধান মঠ হইল শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গেরী, দ্বারকায় সারদা, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্ধন ও বদরিকাশ্রমে জ্যোসী মঠ। শৃঙ্গেরী মঠে পুরি, ভারতী ও সরস্বতী; সারদা মঠে তীর্থ ও আশ্রম; গোবর্ধন মঠে বন ও অরণ্য এবং জ্যোসী মঠে গিরি, পর্বত ও সাগরের প্রাধান্য দেখা যায়। এখন অরণ্য, সাগর ও পর্বত অতি বিরল।

তীর্থ, আশ্রম ও সরস্বতী এই তিনটি ও ভারতীর অর্ধাংশ, ইহারা এখনও শংকরের যথার্থ শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হন। বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, পুরি ও ভারতীর অর্ধাংশ, এই সাড়ে ছয়টি অংশ আচারভ্রষ্ট ও স্বধর্মচ্যুত বলিয়া বিবেচিত হন। ইহাদিগকে সাধারণতঃ অতীত বলা হয়। প্রথমোক্ত সাড়ে তিন শ্রেণী দণ্ড ব্যবহার করেন, অতীতগণ তাহা করেন না। ইহা ব্যতীত অতীতগণ বস্ত্র পরিধান ও অলংকারাদি ব্যবহার করেন; অর্থ গ্রহণ ও ব্যয় করেন এবং নিজেরা রন্ধন করেন। হিন্দুগণের মধ্যে যে কোনও সম্প্রদায় অতীতগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। প্রথম সাড়ে তিনটি শ্রেণীতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণই শিষ্য হইতে পারেন। অতীতগণের মঠ থাকিলেও তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যাদিও করিয়া থাকেন। অতীতগণের কেহ কেহ বিবাহ পর্যন্ত করেন, কিন্তু তখন অন্য অতীতগণ হইতে পৃথক করিয়া তাঁহাদিগকে সংযোগী বলা হয়। কিন্তু এক বিষয়ে দশনামী সম্প্রদায়ের সকলেরই একমত; তাঁহারা শবদাহ করেন না, মৃতদেহ জলমধ্যে নিক্ষেপ বা মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন। ইহাই তাঁহাদের জলসমাধি বা মৃৎসমাধি। দশনামীরা নির্গুণ উপাসক বলিয়া পরিচিত হইলেও অনেকে শিবমন্ত্র গ্রহণ করেন ও বিভূতি প্রভৃতি শৈব চিহ্ন ধারণ করেন। তাঁহাদের সাধারণতঃ শৈব বলিয়া ধারণা করা হয়। শৈব ও বৈষ্ণবের মধ্যে যে চিরাচরিত বিরোধ দেখা যায় তাহা প্রধানতঃ দশনামী ও বৈষ্ণবদের বিরোধ।

দশনামী সম্প্রদায়ে পূর্বে অনেক সুপণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার ছিলেন। শংকরশিষ্য আনন্দগিরি বহু বেদান্তগ্রন্থ ও 'শংকরদিগ্বিজয়' রচনা করিয়া যশস্বী হন। রামাশ্রম অমরকোষের টীকা রচনা করেন। বিদ্যারণ্য বা মাধবাচার্য বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার ছিলেন। দশনামীদের মধ্যে গিরি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী প্রথম হইতে বঙ্গ দেশে তারকেশ্বরের মোহান্ত ছিলেন। দশনামীদের মধ্যে যাঁহারা দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া নিয়ত পর্যটন করেন তাঁহাদিগকে দশনামী দণ্ডী বলা হয়।

দ্র অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, কলিকাতা, ১৮৮৮; H. H. Wilson, *Religious Sects of the Hindus*, Calcutta, 1958.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

দশ মহাবিদ্যা জগন্মাতার দশবিধ প্রসিদ্ধ রূপ। ইহাদের নাম কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। কথিত আছে—পিতা দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে অনিমন্ত্রিত অবস্থায় যোগ দেওয়ার প্রস্তাবে শিব বাধা দিলে দেবী এই সমস্ত রূপ দেখাইয়া শিবকে অভিভূত করেন এবং শিব বাধাদানে নিরস্ত হন (মহাভাগবত ৮)। এই মহাবিদ্যাদের মধ্যে প্রথম তিন মহাবিদ্যা প্রসিদ্ধতর এবং ইহাদের উপাসকসংখ্যাও বেশি। মহাবিদ্যার নাম ও সংখ্যাসম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক মতে ইহাদের সংখ্যা ২৭ এবং দুর্গা, অন্নপূর্ণা প্রভৃতিও মহাবিদ্যা।

ইহারা নানা উপলক্ষে নানা নামে ও নানা রূপে পূজিত হন। 'কালী' ও 'ছিন্নমস্তা'র কথা যথাস্থানে বলা হইয়াছে। অন্যান্য মহাবিদ্যার বৈশিষ্ট্যদ্যোতক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে: তারিণী, উগ্রতারা, একজটা, নীল-সরস্বতী প্রভৃতি নামে ও রূপে উপাসিতা তারা একরূপে ঘোরা প্রত্যালীঢ়পদা মুণ্ডমালাবিভূষিতা খর্বা লম্বোদরী চতুর্ভুজা ঘোরদ্রংষ্ট্রা লোলজিহ্বা। তাঁহার কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্মাবৃত, মস্তকে পিঙ্গল উগ্র একজটা, মৌলি অক্ষোভ্যভূষিত; প্রজ্বলিত চিতার মধ্যে ইহার অবস্থান, বিশ্বব্যাপী জলমধ্যস্থ শ্বেতপদ্মের উপরে ইনি দণ্ডায়মান। ষোড়শী, শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরী পদ্মনিভা বালার্ক-কিরণোজ্জ্বলা জবাকুসুমসঙ্কাশা। ইহার ভ্রূলতা পিনাকীর ধনুকের ন্যায়। রক্তবস্ত্রপরিহিতা, রক্তাভরণভূষিতা সর্বশৃঙ্গারবেশযুক্তা দেবী জগদাহ্লাদকারিণী। ধূমাবতী দেবী বিধবা রুক্ষা মলিনবসনা বিবর্ণকুন্তলা বিরলদন্তা বিলম্বিত-পয়োধরা দীর্ঘনাসা চঞ্চলা রুষ্টা কলহপ্রিয়া দীর্ঘা নিত্য ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িতা। দেবী দ্বিভুজা, তাঁহার এক হস্তে কুলা, অপর হস্তে বর। ইনি রথারূঢ়া, রথের ধ্বজ কাকচিহ্নিত। বগলামুখী পীতবর্ণা পীতাম্বরা পীতাভরণা সুধাসমুদ্রের মধ্যস্থিত মণিমণ্ডপে রত্নবেদির উপর সিংহাসনে উপবিষ্টা দ্বিভুজা। ইনি বাম হস্তে শত্রুর জিহ্বা ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের গদা দ্বারা শত্রুকে নিপীড়িত করেন। মাতঙ্গী দেবী শ্যামবর্ণা ত্রিনয়না রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা চতুর্ভুজা।

দ্র কৃষ্ণানন্দ, তন্ত্রসার।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দশমিক পদ্ধতি এক হইতে নয় পর্যন্ত নয়টি সংখ্যার জন্য নয়টি অঙ্ক চিহ্ন এবং শূন্য চিহ্ন সাহায্যে দশগুণোত্তর গণনার লিখন ও পঠনপ্রণালী। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক চিহ্নের দুইটি অর্থ—একটি ইহার স্থানীয় মান, অপরটি পরম মান। এই দশটি চিহ্নের এক বা একাধিক লইয়া যে কোনও সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। প্রত্যেক সংখ্যা দশের শক্তি (ঘাত) সমন্বয়ে এক পঙ্‌ক্তিতে লেখা হয়। যথা—৭৩, ০৫৬=৭.১০^{৪}+৩.১০^{৩}+০.১০^{২}+৫.১০^{১}+৬ (৭ অযুত+৩ সহস্র+০ শতক +৫ দশক +৬ একক) সহগ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ০ এর মধ্যে যে কোনওটি হইতে পারে।

দশমিক গণনাপদ্ধতি হিন্দুদের আবিষ্কার। খ্রীষ্টজন্মের অনধিক শত বৎসর পূর্বে কিংবা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কোনও সময়ে ভারতবর্ষে স্থানীয় মানের সাহায্যে দশমিক পদ্ধতিতে সংখ্যা লিখিবার জন্য শূন্যের আবিষ্কার হয়। গণিতশাস্ত্রে আবিষ্কারের ইতিহাসে ইহার সমতুল কোনও ঘটনা ঘটে নাই। ইহার দ্বারা গণিতের চারটি নিয়ম যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ক্রিয়া সহজে সম্পাদন করা সম্ভব হইয়াছে এবং গণিতের ক্রমোন্নতি অব্যাহতভাবে চলিয়াছে।

স্থানীয় মান এবং শূন্য আবিষ্কারের পূর্বে সুদূর অতীতেও ভারতবর্ষে দশভিত্তিক গণনা প্রচলিত ছিল। যজুর্বেদ সংহিতাতে সংখ্যাগণনার নিম্নলিখিত দশগুণোত্তর সংজ্ঞা পাওয়া যায় :—এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, প্রযুত, অর্বুদ (১০^{৭}) ন্যর্বুদ, সমুদ্র, মধ্য, অন্ত, পরার্ধ, (১০^{১২})। ইহাদের প্রত্যেক সংখ্যা তৎপূর্ববর্তী সংখ্যার দশগুণ।

কোনও সংখ্যার দশগুণ একটা সংখ্যার ধারণা করা যায় এবং তাহার একটি নামও দেওয়া যায়। কিন্তু স্থানীয় মান এবং শূন্য আবিষ্কারের পরেই যে কোনও সংখ্যা লিখিয়া প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। এক, দশ, শত, সহস্র প্রভৃতি যাহারা পূর্বে দশগুণোত্তর এক-একটি সংখ্যা বুঝাইত তাহারা এখন স্থানীয় মান বুঝায়। আর্যভট্টের গ্রন্থে (৪৯৯ খ্রী) এই অর্থে ইহাদের ব্যবহার দেখা যায়। অধিকাংশ গণিতে এরূপ ১৮টি নাম আছে। শ্রীধর (৭৫০ খ্রী) ১৮টি নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহাদের পরেও নাম আছে। মহাবীর (৮৫০ খ্রী) ২৪টি স্থানীয় মানের নাম দিয়াছেন। পরবর্তী যুগে নিযুত, প্রযুত, অর্বুদ, ন্যর্বুদ যথাক্রমে আমাদের পরিচিত লক্ষ, নিযুত, কোটি, অর্বুদ-আখ্যা পাইয়াছে। অন্যান্য নামেরও কিছু পরিবর্তন হইয়াছে।

দশমিক গণনাপদ্ধতি ৮ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ হইতে আরব দেশে নীত হয়। পরে পাশ্চাত্য দেশসমূহ আরবদের নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করে। এজন্য এই পদ্ধতি পাশ্চাত্য দেশে হিন্দু-আরব গণনাপদ্ধতি নামে পরিচিত হইয়াছিল।

দ্র B. B. Datta & A. N. Singh, *History of Hindu Mathematics*, Bombay, 1938 ; Lancelot Hogben, *Mathematics for the Million*, London, 1957 ; T. Dantzig, *Number*, London, 1962.

কামিনীকুমার দে

দশমিক ভগ্নাংশ : ইহা দশমূল ভগ্নাংশ, ইহার হর সর্বদা দশ অথবা দশের শক্তি (ঘাত)। এই প্রণালী দশগুণোত্তর সংখ্যা-লিখনপ্রণালীরই অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে এককের বাম দিকের অঙ্কগুলির স্থানীয় মান ক্রমান্বয়ে দশগুণ করিয়া বাড়িয়া যায় এবং উহার দক্ষিণ দিকের অঙ্কগুলির স্থানীয় মান ক্রমান্বয়ে দশগুণ করিয়া কমিয়া যায়। এককের দক্ষিণ দিকে কোনও অঙ্ক বসাইতে হইলে একটি বিন্দুচিহ্ন (·) দিতে হয়, ইহাকে দশমিক বিন্দু বলে। যথা, ৩৫·৭২৮, এ স্থলে এককের অঙ্ক ৫ ; ইহার বাম দিকের অঙ্ক ৩-এর স্থানীয় মান, যেমন ৩×১০ সেইরূপ ৫ এককের দক্ষিণ দিকের অঙ্ক ৭-এর স্থানীয় মান সাত-দশাংশ (৭×১০$^{-১}$), তৎপরবর্তী ২-এর স্থানীয় মান দুই শতাংশ (২×১০$^{-২}$) এবং ৮-এর স্থানীয় মান আট সহস্রাংশ (৮×১০$^{-৩}$)। দশমিক পদ্ধতির এই প্রসারণের দ্বারা সকলপ্রকার ধনাত্মক সংখ্যা—পূর্ণ, অপূর্ণ এবং অমূলদ—দশমিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায়।

দশমিক মুদ্রা : বিভিন্ন মূল্যমানের মুদ্রাসমূহ প্রমাণ একক মুদ্রার দশগুণোত্তর এবং দশাংশোত্তর হইলে তাহা দশমিক মুদ্রা। যথা প্রমাণ মুদ্রা ১ হইলে উচ্চ মানের মুদ্রাসমূহ ১০, ১০০, ১০০০ এবং নিম্ন মানের মুদ্রাসমূহ ·১, ·০১ ·০০১ প্রভৃতি। আদর্শ দশমিক মুদ্রায় ইহার কোনও ব্যতিক্রম হইবে না। কিন্তু ব্যাবহারিক দশমিক মুদ্রায় এই প্রণালী অনুসৃত হয় না। ফরাসী দেশে প্রমাণ মুদ্রা ফ্রাঙ্ক। উচ্চ মানের মুদ্রা ১০ ফ্রাঙ্ক, ১০০ ফ্রাঙ্ক, নিম্ন মানের মুদ্রা ১০ সেন্টিম। কিন্তু ৫, ২০, ৫০ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা এবং ২০ সেন্টিম, ৫০ সেন্টিম মুদ্রাও আছে। আমাদের দেশে প্রমাণ মুদ্রা টাকা, নিম্ন মানের মুদ্রা টাকার দশাংশ ১০ পয়সা, এবং ১০ পয়সার দশাংশ ১ পয়সা ; উচ্চ মানের মুদ্রা ১০ টাকা, ১০০ টাকা, ১০০০ টাকা ;

কিন্তু ২,৩,৫২৫ এবং ৫০ পয়সা আছে ; উচ্চ মানের মুদ্রা ২, ৫ টাকা আছে।

সর্বপ্রথম আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (১৭৮৫ ও ১৭৯২ খ্রী) দশমিক মুদ্রা গ্রহণ করে। কিছু পরে ফরাসী দেশ (১৭৯৯-১৮০৩ খ্রী) আমেরিকার অনুসরণ করে। ক্রমশঃ সর্বত্র ইহার উপযোগিতা উপলব্ধ হয়। বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেন ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান দেশেই দশমিক মুদ্রার প্রচলন আছে।

কামিনীকুমার দে

দশরথ সূর্যবংশীয় অযোধ্যাপতি, অজের পুত্র ও রাম-লক্ষ্মণাদির পিতা। তাঁহার তিন প্রধানা মহিষী—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। দশরথ পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ঋষিদের পরামর্শ অনুযায়ী বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পরিচালনায় সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করিয়া প্রথমে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও পরে পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন (রামায়ণ, বালকাণ্ড ৮)। যজ্ঞাগ্নি হইতে প্রাদুর্ভূত ও প্রজাপতি-কর্তৃক প্রেরিত এক দৈত্য পুরুষ দশরথকে পুত্রলাভের জন্য পবিত্র পায়স দান করেন। মহিষীগণের মধ্যে তিনি সেই পায়স যথাক্রমে ভাগ করিয়া দেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের পর দ্বাদশ মাসে দশরথ কৌশল্যা হইতে রাম, কৈকেয়ী হইতে ভরত এবং সুমিত্রা হইতে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে চারি পুত্র লাভ করেন (রামায়ণ, বালকাণ্ড ১৬)। পুত্রগণের বিবাহের পর রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে কৈকেয়ী দাসী মন্থরার কুপরামর্শে দশরথের নিকট পূর্ব-প্রতিশ্রুত দুইটি বর প্রার্থনা করেন। পূর্বে দেবাসুরের যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত দশরথকে কৈকেয়ী সুনিপুণ পরিচর্যায় সুস্থ করেন, সেই সময়ে প্রীত দশরথ কৈকেয়ীকে দুইটি বরদানের অঙ্গীকার করেন। কৈকেয়ী একটি বরে রামচন্দ্রের চতুর্দশ বৎসর বনবাস ও অন্য বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ১১।১৮-৩০)। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র বনে প্রস্থান করিলে স্নেহকাতর দশরথ করুণ সুরে বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যার নিকট পূর্বানুষ্ঠিত একটি পাপ-কর্ম নিবেদন করেন। বর্ষাকালে রাত্রিতে সরযূ-তীরে মৃগয়ারত যুবরাজ দশরথ জলপানরত গজভ্রমে কলসীতে জলপূরণে নিরত অন্ধমুনির একমাত্র পুত্রকে শব্দবেধী বাণের আঘাতে বধ করিলে মুনি অনুরূপ পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু হইবে এই অভিশাপ দেন (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ৬৩-৬৪)। বিলাপরত অবস্থায় কৌশল্যা ও সুমিত্রার সম্মুখে দশরথের জীবনাবসান ঘটে। দশরথের মৃতদেহ তৈলদ্রোণীতে রক্ষিত হয় এবং ভরত মাতুলালয় হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ৭৬-৭৭)। সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময়ে দশরথ আবির্ভূত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে আশীর্বাদ করেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষা অন্য নারীদের যশ নিষ্প্রভ করিয়া দিবে ইহা সীতাকে বলিয়া তিনি ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করেন (রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড ১২২।১৩-৩৮)।

যূথিকা ঘোষ

দশরা, দশেরা একটি সর্বভারতীয় উৎসব। গোপথ-ব্রাহ্মণে এই উৎসবের উল্লেখ আছে। দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীই প্রধানতঃ পূজিত হইয়া থাকেন। তবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ইহাকে রামচন্দ্রের উৎসব বলিয়াই পালন করিয়া থাকেন। এই উৎসব দশ রাত্রি ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে 'দশরাত্র' বলা হয়। সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রে ইহা 'নবরাত্র' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা শুক্লা চতুর্দশীতে অনুষ্ঠিত হয়। পরে আশ্বিনে (শারদা) এবং চৈত্র মাসে (বসন্ত) এই অনুষ্ঠানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে এই দুই মাসকে 'কালদংষ্ট্রা' বলা হয় অর্থাৎ মহামারী ও বিভিন্ন রোগের কারণ। ইহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই দেবী দুর্গার আরাধনা করা হয়। সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা করা হয়।

ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে দুর্গা বিশ্রাম করিতে যান এবং আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমীতে জাগিয়া ওঠেন। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময়ে ব্রহ্মার অনুরোধে দেবী অসময়েই জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। চণ্ডী অনুসারে ব্রহ্মা মধু ও কৈটভ-নামক অসুরের হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার জন্য দেবীকে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও শ্রীবিদ্যার ললিতা অনুসারে কামদেবের ভস্ম দ্বারা গঠিত ভাণ্ডনামক অসুরকে নিধন করিবার জন্য দেবীকে জাগানো হইয়াছিল।

আশ্বিন মাসের প্রতিপদে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যে পূজা আরম্ভ হয়, তাহা দশ দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইবার পর দশমীর দিন সন্ধ্যায় সমাপ্ত হয়। দ্রাবিড় দেশে যেখানে শ্রীবিদ্যাসম্প্রদায়ের প্রাধান্য আছে সেই সব স্থানে দেবী দুর্গা নামে পূজিত হন। প্রথমা হইতে তৃতীয়া এই তিন দিন সংহারশক্তিরূপিণী দুর্গার পূজা হয় ; লক্ষ্মীর পূজা হয় চতুর্থী হইতে ষষ্ঠী এবং সরস্বতীর পূজা হয় সপ্তমী হইতে নবমী। এই তিনজন দেবী তিনটি শক্তির প্রতীক।

ইহাদের উপাসনায় সমস্ত অকল্যাণ দূর হইয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পৃথক পূজার ব্যবস্থা নাই। বিজয়া দশমী বিদ্যারম্ভের দিন বলিয়া প্রসিদ্ধ। সকল-প্রকার পবিত্র ক্রিয়াকর্মই এই দিনে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যন্ত্রপাতি, কল-কব্জা প্রভৃতির পূজা ও কারিগরী কার্যেরও এই সময়ে উদ্বোধন করা হয়।

ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, পুডুকোট্টা, মহীশূর প্রভৃতির দক্ষিণ ভারতীয় রাজারা দশেরা উৎসব জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করেন।

কোচিন : সংস্কৃতের পণ্ডিতগণ বিভিন্ন স্থান হইতে তর্কসভায় উপস্থিত হন এবং প্রতি বৎসর এক ব্যক্তিকে পণ্ডিতরাজ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

পুডুক্কোট্টাই : পণ্ডিতগণ বিভিন্ন বিষয়ের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহারা যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কৃত হন। বিনা দক্ষিণায় পণ্ডিতগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

মহীশূর : এই উৎসব টিপু সুলতান ও হায়দর আলীর সময়েও প্রচলিত ছিল। তাঁহারা ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতেন। এখানে প্রতি বৎসরই একটি সর্বভারতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। রাজা চামুণ্ডেশ্বরী দেবীর পূজা করেন। এই সময়ে সমস্ত শহর আলোকিত করা হয়। সংস্কৃতের বিখ্যাত পণ্ডিত এবং সূক্ষ্ম শিল্পকলার শিল্পীগণকে পুরস্কৃত করা হয়। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় এবং রাজা তাহাতে অংশগ্রহণ করেন। রাজকীয় যাত্রা (স্টেট ড্রাইভ) প্রভৃতি এখানে খুবই প্রসিদ্ধ।

দক্ষিণ ভারতে জনসাধারণ মন্দিরে এবং নিজেদের গৃহেও পূজানুষ্ঠান করেন। বাংলা, আসাম ও ওড়িশার মত এখানে সর্বজনীন পূজার প্রচলন নাই।

দক্ষিণ ভারতে 'দশহরা' মেয়েদের উৎসব। অমাবস্যার পূর্বে প্রতিটি বাড়ি চুনকাম করা হয় এবং কাঠের ব্যালকনি তৈয়ারি করিয়া সজ্জিত স্থানের মধ্য স্থলে স্থাপনা করা হয়। ব্যালকনির সিঁড়িগুলি নানারকম মাটি, ধাতু, রুপা প্রভৃতির পুতুল দিয়া সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। প্রথমা তিথিতে কলসস্থাপনা করা হয়। এই প্রদর্শনীকে বলা হয় কালু। মনে হয়, ইহা দেবী ললিতার দরবার। বালিকারা নানা রঙের পোশাকে সজ্জিত হইয়া কখনও কখনও বিভিন্ন দেব-দেবীর সজ্জায় সাজিয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া মহিলা ও বালিকাদের পূজা দর্শন করিবার নিমন্ত্রণ জানায়। যে সমস্ত দর্শনার্থী পূজা দেখিতে আসে তাহাদের প্রত্যেককে পান, সুপারি, মিষ্টি, হলুদ, নারিকেল ও নানারকম কাপড় প্রভৃতি গৃহস্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। সন্ধ্যায় মহিলারা দেবী ললিতার কীর্তন করেন। ইহাকে বলা হয় ললিতাম্বিকল্ সভানম্ (Lalitambikal Sabhanam)। কলসস্থাপনের দিন হইতে বিসর্জন পর্যন্ত একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা হয়, এই দীপটিকে 'অখণ্ড দীপ' বলা হয়। ললিতা দেবীর বৈদিক স্তবগানও করা হয়। কুমারীপূজার প্রচলন আছে। কুমারীদের কাপড়, অলংকার প্রভৃতি দেওয়ার এবং ভোজন করানোর রীতি আছে। কেহ কেহ চণ্ডী পাঠ করেন। তবে বেশির ভাগ গৃহেই ললিতার গীত গাওয়া হয়। অষ্টমী অথবা নবমীতে বই, পুথি, সংগীতযন্ত্র ইত্যাদির পূজা করা হয়। বিজয়া দশমীর দিনে বিদ্যারম্ভ অনুষ্ঠানে প্রত্যেকেই নূতন পাঠ গ্রহণ করেন।

মিস্ত্রি এবং কারিগররা নবমীর দিনেই তাহাদের যন্ত্রপাতি প্রভৃতির পূজা করে।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিতে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষভাবে এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে হয়। পণ্ডিতগণ বেদগান করিতে থাকেন, বিশেষ পূজার অনুষ্ঠান করা হয় এবং নানারকম সংগীতসভা, সাংস্কৃতিক সভারও আয়োজন করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথমও 'শরসন্ধান' অনুষ্ঠান অবলোকন করিতে আসেন। এই সময়ে দেবী স্বেচ্ছামূলকভাবে নয় দিন উপস্থিত থাকিয়া রাজার জয় কামনা করেন। দশম দিনে রাজা শত্রুর প্রতিমূর্তি তীরবিদ্ধ করেন।

ওড়িশা : অস্ত্রশস্ত্রের উপর ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞার পূর্ববর্তী কালে ওড়িশায় অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী হইত এবং সেখানে কৃত্রিম যুদ্ধের দ্বারা অস্ত্রশস্ত্রচালনার কৌশলও প্রদর্শিত হইত। কথিত আছে, দশরার সময়ে পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে বিমলার পূজা হইত এবং অষ্টমীর দিনে পশুবলিও হইত। উত্তর ভারত, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে রামলীলা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়া দশমীর দিনে রাবণের প্রতিমূর্তি দগ্ধ করা হয়।

গুজরাত : গরবা-গরবী নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। 'ভব্য'-নামক অনুষ্ঠান (একজাতীয় যাত্রা) জাঁকজমকপূর্ণ এবং বিখ্যাত। সন্ধ্যায় বালিকারা রঙিন পোশাক পরিধান করিয়া মাথায় ছিদ্রযুক্ত অলংকৃত মাটির ঘট লইয়া বাড়ি বাড়ি লোকসংগীত গাহিয়া বেড়ায়। বালিকাদের কাপড় এবং ধাতুনির্মিত খেলনা উপহার দেওয়া হয়। উপহার গৃহস্বামী সামর্থ্য অনুযায়ী দেন।

পাঞ্জাব : কুলু উপত্যকায় ইহা প্রকৃতই দেবতার উৎসব। বিজয়া দশমীর দিনে শুরু হয় এবং পূর্ণিমা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। রাজা জগৎ সিংহের গৃহদেবতা রঘুনাথজীর মন্দিরে

অন্যান্য সমস্ত মন্দিরের বিগ্রহকে লইয়া আসা হয়। রঘুনাথ-জীকে মধ্য স্থলে রাখিয়া এবং অন্যান্য দেব-দেবীকে সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হয়।

মহারাষ্ট্রে দেবীর পূজার সময়ে চণ্ডীর যে স্তোত্র গাওয়া হয় তাহাতে ভবানীর সহস্র নাম গীত হয়। মহারাষ্ট্রের প্রধানগণ দশরা উৎসব পালন করেন এবং বিজয়া দশমীর দিনে সীমালঙ্ঘন, শরসন্ধান ও লক্ষ্যভেদ অনুষ্ঠানও পালন করেন। কেরলের রাজা সুদর্শন সর্বপ্রথম চৈত্র মাসের বসন্ত নবরাত্রির উৎসব পালন করেন। ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী এই ব্রতের রীতি-পদ্ধতি সবই আশ্বিন মাসের শারদ নব-রাত্রির অনুরূপ।

শংকর শর্মা

দশরূপক সংস্কৃত অলংকার সাহিত্যের বিশিষ্ট গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা বিষ্ণুর পুত্র ধনঞ্জয়। খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকে দ্বিতীয় বাক্‌পতিরাজ মুঞ্জ পরমারের সভাসদ ছিলেন।

ইহা চারিটি প্রকাশ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত: প্রথমে দশপ্রকার রূপকাদির বিচার, দ্বিতীয়ে নায়কাদির ভেদ, তৃতীয়ে রূপকের প্রয়োগবিধি ও লক্ষণনির্দেশ এবং চতুর্থে রসবিচার বর্ণিত হইয়াছে। ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে নাটকসম্বন্ধে অতি বিস্তৃতভাবে এবং বিচ্ছিন্ন রীতিতে যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহার প্রায় সমুদয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে এবং পরিপাটিরূপে বিধৃত হওয়ায় ইহা সবিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। 'সাহিত্যদর্পণ'-এর দৃশ্যকাব্য-নিরূপণ 'দশরূপক' অবলম্বনে লিখিত। বিষ্ণুর অপর পুত্র ধনিক-কৃত 'দশরূপাবলোক' টীকাও বিশেষ মান্য গ্রন্থ; অসংখ্য উদ্ধৃতিযুক্ত হওয়ায় ইহা সাহিত্য জগতের কালনির্ণয়ের বিশেষ সহায়ক।

দ্র কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব, 'দশরূপকম্', ৫ম সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯৪১; Hall Fitzedward, *The Dasa Rupa*, Calcutta, 1865; George C. O. Haes, *The Dasarupa*, New York, 1912; P. V. Kane, *Sahitya Darpana*, 2nd ed., Bombay, 1923.

কল্যাণী দত্ত

দশসালা বন্দোবস্ত ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস-কর্তৃক বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় (মেদিনীপুর জেলা) দশ বৎসরের জন্য প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত। ইহাই ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী (জমিদারি) বন্দোবস্ত বলিয়া ঘোষিত হয়। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দ্র।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

দশহরা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের দশমী বা ঐ দিনের গঙ্গা। ঐ দিনে যিনি যে কোনও নদীতে, বিশেষ করিয়া গঙ্গায় স্নান করেন, এই তিথি বা গঙ্গা তাঁহার দশবিধ পাপ হরণ করেন। তাই নাম দশহরা। দশটি পাপের মধ্যে তিনটি (অদত্ত বস্তু গ্রহণ, শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই এমন হিংসা ও পরস্ত্রীগমন) কায়িক, চারিটি (পরুষ ও মিথ্যাভাষণ, পৈশুন্য বা দোষোদ্‌ঘাটন ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ) বাচিক, তিনটি (পরদ্রব্যের কামনা, অপরের অনিষ্টচিন্তা ও মিথ্যায় আসক্তি) মানসিক। জীমূতবাহন, বৃহস্পতি রায়-মুকুট, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রাচীন বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণ এই দিনে গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন— কেহ গঙ্গাপূজার উল্লেখ করেন নাই। কার্যতঃ মাটির প্রতিমা গড়িয়া এই দিনে গঙ্গাতীরে গঙ্গাদেবীর পূজার অনুষ্ঠান করা হয়। তবে এই অনুষ্ঠান বর্তমানে কমিয়া যাইতেছে। তাই বর্তমানে আর এই দিন সরকারি ছুটির দিন হিসাবে পরিগণিত হয় না। ভগীরথ-আনীত গঙ্গা এই তিথিতে পর্বতগহ্বর হইতে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। সেইজন্য চলতি কথায় ইহা ভগীরথ-দশরা নামে পরিচিত। বিজয়া দশমীকে শুধু দশরা এবং বিজয়া দশমীর পরবর্তী কয়েক দিনকে বারদশরা বলা হয়।

দ্র রঘুনন্দন, তিথিতত্ত্ব।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দস্‌তয়েভ্‌স্কি (১৮২১-৮১ খ্রী) রুশ ঔপন্যাসিক দস্‌ত-য়েভ্‌স্কি, ফিয়োদোর মিখাইলোভিচ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর মস্কো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সামরিক বিভাগের সার্জন ছিলেন এবং নিজ ভূমিদাসের হস্তে নিহত হন। ইহার ফলে কৈশোরেই দস্‌তয়েভ্‌স্কির জীবনে এক গম্ভীর বিষণ্ণতার ছায়াপাত ঘটে। তাহা ছাড়া এই সময় হইতেই তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হন, এই ব্যাধি আমরণ তাঁহার সহচর ছিল। দস্‌তয়েভ্‌স্কির সাহিত্য-জীবনকে এইগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিয়া দস্‌তয়েভ্‌স্কি সরকারি সমরবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করেন এবং অল্প কাল পরেই সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্যে তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন। বিখ্যাত রুশ লেখক গোগোলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পর-পর দুইখানি উপন্যাস প্রকাশ করেন: 'গরীব মানুষ' (*Bednye Lyudi*) এবং 'দ্বয়ী' (*Dvoinik*)। বস্তুবাদী এবং আত্মদ্বন্দ্বে জটিল এই দুইটি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াই

গ্রন্থকারকে খ্যাতিমান করে। ইতোমধ্যে দস্তয়েভ্স্কি তৎকালীন বিপ্লবী কর্মধারায় যোগদান করেন। ফলে তিনি গ্রেফতার হন এবং তাঁহার উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয় (১৮৪৯ খ্রী)। এই আদেশ কার্যকর হইবার প্রায় পূর্ব মুহূর্তে মৃত্যুদণ্ড রদ হইয়া যায়— তিনি সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন।

চারি বৎসর পরে সাইবেরিয়ার ওম্স্ক আসামীশিবির হইতে মুক্তিলাভ করিলেও তাঁহাকে সাইবেরিয়াতে বাধ্যতা-মূলকভাবে সামরিক জীবন যাপন করিতে হয়। এখানে তিনি মারিয়া ইসায়েভা-নামক এক বিধবাকে বিবাহ করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজক্ষমা লাভ করিয়া তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে আসেন। এখন হইতে দস্তয়েভ্স্কি পুনরায় সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার ভ্রাতা মিকায়েলের সহযোগে 'ভ্রেমিয়া' নামে একটি সাময়িক পত্র প্রচার করিয়া তাহাতে তাঁহার ভয়ংকর সাইবেরীয় অভিজ্ঞতার পরিচায়ক 'মৃত্যুপুরীর স্মৃতি' (*Zapiski iz Mertvogo Doma*, ১৮৬১ খ্রী) এবং উপন্যাস 'অপমানিত ও আহত' (*Unizhonnyie i Oskarblyonnyie*, ১৮৬২ খ্রী) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। সরকারি নির্দেশে 'ভ্রেমিয়া' বন্ধ হইয়া গেলে (১৮৬৩ খ্রী) আর একটি স্বল্পায়ু পত্রিকাও তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পত্নী ও ভ্রাতার মৃত্যু হয়। ওই বৎসর প্রকাশিত হয় তাঁহার 'পাপপুরীর চিঠি' (*Zapiski iz Podpolya*)। পরবর্তী কালের দস্তয়েভ্স্কি এই গ্রন্থেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'পাপ ও শাস্তি' (*Prestuplenie i Nakazaniye*) আত্মপ্রকাশ করে। তরুণ খুনী রাসকলনিকভের নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা এই উপন্যাসে পড়িতে পড়িতে পাঠকের স্নায়ুও যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করে। ইহাকে অনুসরণ করিয়া আসে আর একটি ভয়াল উপন্যাস 'নির্বোধ' (*Idiot*, ১৮৬৮-৬৯ খ্রী) যাহার 'প্রিন্স' চরিত্রটি অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আনা গ্রিগোরিয়েভনা স্নিতকিনাকে বিবাহ করেন। ১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় 'মন্ত্রমুগ্ধ' (*Besy* বা *The Possessed*) এবং ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'কারমাজভ ভ্রাতৃগণ' (*Bratya Karmazovy*) প্রকাশিত হয়।

জুয়ার নেশা এবং তাহার ফলে ঋণগ্রস্ত দস্তয়েভ্স্কিকে সাময়িকভাবে দেশ হইতে পলায়ন করিতে হইয়াছে, ব্যক্তিজীবনে নানা দুঃখ ও দুর্গতিও সহিতে হইয়াছে। তথাপি জীবনের শেষ পর্যায় তাঁহার শান্তি ও সমৃদ্ধিতেই অতিবাহিত হইয়াছে। মানুষের জীবন-রহস্য, তাঁহার সুকঠিন আন্তর দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি ও সমাজের সংঘর্ষ, পাপ-পুণ্যের সংগ্রাম, অধ্যাত্মচিন্তার সহিত সংশয়বাদ ইত্যাদি বিবিধ টানাপোড়েনে দস্তয়েভ্স্কির শিল্পীসত্তা বিচিত্র এবং গভীর। পৃথিবীর এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি লোকান্তরিত হন।

দ্র Constance Garnett, *The Novels of Dostoevsky*, vol. XII, New York, 1913-23, London, 1912-20 ; Avrahm Yarmolinsky, *Dostoievsky : A Study in His Ideology*, New York, 1921 ; J. Middleton Murry, *Fydor Dostoevsky, a critical study*, London, 1923.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দস্তা মৌল ধাতু। ইহার পারমাণবিক ওজন ৬৫.৩৮, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭.১, গলনাঙ্ক ৪১৯.৪° সেন্টিগ্রেড এবং বর্ণ ঈষৎ নীলাভ শ্বেত। বায়ুর সংস্পর্শে ইহার উপর শাদা আস্তরণ পড়ে ও ঔজ্জ্বল্য লোপ পায়। ৯০৭° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে দস্তা বাষ্পে পরিণত হয় এবং ১০০০° পর্যন্ত উত্তপ্ত করিলে দস্তা জ্বলিতে থাকে।

ক্যালামিন নামক আকরিক হইতে দস্তা নিষ্কাশন করা হয়। আকরিককে বায়ুর সংস্পর্শে উত্তপ্ত করিলে দস্তার অক্সাইড উৎপন্ন হয়, পরে উক্ত রাসায়নিক পদার্থের গুঁড়া কয়লার সহিত মিশাইয়া বকযন্ত্রে অতি উচ্চতাপে গরম করিলে দস্তা বাষ্পে পরিণত হয়, পরে ঐ বাষ্পকে ঠাণ্ডায় জমাইয়া কঠিন দস্তা পাওয়া যায়।

দস্তা প্রয়োজনীয় ধাতু। লোহার নল ও পাতের উপর দস্তার আস্তরণ দিয়া লোহাকে মরিচা হইতে রক্ষা করা হয়। বিভিন্ন ধাতুর সহিত দস্তা মিশাইয়া নানা ধাতুসংকর (অ্যালয়) উৎপন্ন হয়—দস্তাকে তামার সহিত মিশাইয়া পিতল, তামা ও নিকেলের সহিত মিশাইয়া জার্মান সিল্ভার এবং তামা ও লৌহের সহিত মিশাইয়া ডেল্টা মেটাল নামক ধাতুসংকর প্রস্তুত করা হয়। মুদ্রায় এবং বৈদ্যুতিক সেল ও ব্যাটারিতে দস্তা ব্যবহৃত হয়। দস্তার অক্সাইড রঙ-এ এবং ইহার সাল্‌ফেট ও কার্বনেট ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দাউদ খাঁ কররানী (রাজত্বকাল ১৫৭২-৭৬ খ্রী) সুলেমান কররানীর (করলানী, কিরানী) দ্বিতীয় পুত্র ও বঙ্গের (বিহার ও ওড়িশার) শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান। প্রজারঞ্জক সুলেমানের মৃত্যুর পর (অক্টোবর, ১৫৭২ খ্রী)

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান বায়াজিদের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী লোদী খাঁ অন্যান্য আমীরদের সহায়তায় তাঁহাকে নিহত করিয়া দাউদকে সিংহাসনে বসাইলেন। বায়াজিদের পুত্র সেনাপতি গুজর খাঁয়ের প্রভাবে বিহারে দাউদের বিরোধিতা করেন।

দাউদ ছিলেন এক নির্বোধ, উদ্ধত, লম্পট ও শাসন-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ যুবক। তিনি তাঁহার আত্মীয়গণকে অত্যাচারে পীড়িত ও অপমানিত করেন ও প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞাতির প্রাণনাশ করেন। তিনি লোদী খাঁয়ের জামাতাকে হত্যা করায় লোদী খাঁ রোটাসে চলিয়া যান।

বিপুল বৈভবের অধিকারী হইয়া দাউদ ৪০০০০ উত্তম অশ্বারোহী, ১৪০০০০ পদাতিক, ২০০০০ বন্দুক, ৩৬০০ হস্তী ও কয়েক শত রণতরী লইয়া এক বিশাল বাহিনী গঠিত করেন। গর্বে স্ফীত হইয়া তিনি পিতার বিচক্ষণ নীতি পরিত্যাগ করিলেন ও স্বাধীনতা ঘোষণার পর মোগল প্রদেশ জামানিয়া (উত্তর প্রদেশের গাজিপুর জেলায় অবস্থিত) আক্রমণ করেন। বিহার ও বঙ্গ দেশ জয়ের জন্য আকবর মুনিম খাঁয়ের অধীনে এক অভিযান প্রেরণ করেন (১৫৭৩ খ্রী)। লোদী খাঁ দাউদের অনুনয়ে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার মন্ত্রী হইলেন; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দাউদ লোদী খাঁকে নিহত করিলে মুনিম খাঁ পাটনা অবরোধ করেন; কিন্তু দাউদের দৃঢ় প্রতিরোধের ফলে আকবরকে স্বয়ং আসিতে হয়। আকবর প্রথমে হাজিপুর ও পরে পাটনা অধিকার করেন (৭-১০ আগস্ট, ১৫৭৪ খ্রী)। বিজয়লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া দাউদ নৌকাযোগে বাংলার দিকে পলায়ন করেন। তাঁহার মুখ্য সেনাপতি গুজর খাঁ স্থলপথে সৈন্যসহ পলায়ন করেন। মোগলেরা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ক্রমান্বয়ে সুরজগড়, মুঙ্গের, ভাগলপুর, কহলগাঁও অধিকার করিল। তেলিয়াগড়ির ১৪ কিলোমিটার (৯মাইল) পশ্চিমে দাউদ শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুনিম খাঁ দক্ষিণে ঘুরিয়া দাউদের পশ্চাতে আসিয়া বঙ্গ দেশের রাজধানী টাণ্ডায় উপনীত হইলে (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৫৭৪ খ্রী) দাউদের মন্ত্রী শ্রীহরি (বিক্রমাদিত্য, প্রতাপাদিত্যের পিতা) জলপথে খুলনার দিকে পলায়ন করেন এবং দাউদ নিজে সাতগাঁও-এর মধ্য দিয়া ওড়িশায় কটকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোগলেরা দাউদের সেনাপতি রাজু (কালাপাহাড়) ও সুলেমানের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধার জন্য মোগলদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ মতভেদ ও কলহের সৃষ্টি হয়। তাহার সুযোগ লইয়া দাউদ মেদিনীপুরে ফিরিয়া আসেন। বালেশ্বর জেলায় তুকরোই (দাঁতনের ৯ মাইল পূর্বে) যুদ্ধ (৩ মার্চ, ১৫৭৫ খ্রী) বঙ্গের ভাগ্য নির্দেশ করিল। এই সময়ে খান-ই-আলমের মৃত্যু ও আহত মুনিমের পশ্চাদপসরণের পর টোডরমলই মোগল সৈন্যদের উৎসাহিত করেন এবং দাউদের সেনাপতি গুজর খাঁয়ের মৃত্যু ঘটিলে সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ হয় ও মোগলেরা সহজেই জয়লাভ করে। ফলে দাউদ হতাশ হইয়া কটকে পলায়ন করেন ও সন্ধির প্রস্তাব করেন। দাউদের কপটতা লক্ষ্য করিয়া টোডরমল ইহাতে আপত্তি করেন। তথাপি মুনিম খাঁ তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। দাউদের হাতে ওড়িশা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। দাউদের যথেষ্ট সৈন্য থাকিলেও তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ হস্তীশ্রেণী সমর্পণ করেন ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে জামিনস্বরূপ প্রেরণ করেন (১২ এপ্রিল, ১৫৭৫ খ্রী)।

দাউদ স্বাধীনতা পুনরধিকার করিবার সুবিধার অপেক্ষায় ছিলেন। হাজিপুরের শাসনকর্তা মজঃফর খান ও মুনিম খাঁয়ের মনোমালিন্যের ফলে মোগলদের অবস্থা দুর্বল হইয়া পড়িলে দাউদের এক নিকট আত্মীয় জুনেদ বিহার আক্রমণ করে এবং বিহারের আফগানগণ মোগলদের বহিষ্কৃত করিবার প্রয়াস করে। অতঃপর মুনিম খাঁয়ের মৃত্যুতে (২৩ অক্টোবর ১৫৭৫ খ্রী) দাউদ সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ ও হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ভদ্রক ও জলেশ্বর অধিকার করিয়া বঙ্গ দেশ পুনরধিকার করেন। মোগলেরা বিহারে পলায়ন করিলে আকবর খাঁন-ই-জাহান ও টোডরমলকে দাউদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন (১৫৭৫ খ্রী)। তাঁহারা তেলিয়াগড়ি অধিকার করিয়া আক্‌মহলের (রাজমহল) সম্মুখে অবস্থান করেন এবং মজঃফর খাঁও তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। রাজমহলের যুদ্ধে (১১ জুলাই, ১৫৭৬ খ্রী) দাউদ পরাজিত ও সন্ধিভঙ্গকারী হিসাবে নিহত হন ও দুই শত বৎসরের অধিকস্থায়ী বঙ্গ দেশের স্বাধীন রাজ্যের (১৩৪০-১৫৭৬ খ্রী) পরিসমাপ্তি ঘটে। পর বৎসরে দাউদের মাতা ও অন্যান্য পরিবারবর্গ মোগলদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

দ্র Abul Fazal, *Akbarnama*; Nizamuddin Ahmad, *Tabqut-i-Akbari*; Badaoni, *Muntakhab ut Tawarikh*; A. L. Srivastava, *Akbar the Great*, Agra, 1962.

জগদীশনারায়ণ সরকার

দাতোঁ, জর্জেস জাক (১৭৫৯-৯৪ খ্রী) ফরাসী বিপ্লবের নেতা ও প্রসিদ্ধ বাগ্মী। দাতোঁ অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি ছিলেন।

তাঁহার গলার আওয়াজে অ্যাসেম্ব্লি কক্ষের গম্বুজে কাঁপন ধ্বনিত। বিপ্লবের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন পারীর একজন কৃতকর্মা ব্যারিস্টার। পারী পৌর-সংস্থার ও বিখ্যাত কর্ডেলিয়ার ক্লাবের নেতা হিসাবে তিনি বৈপ্লবিক রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্ব্লির ও তাহার পর জাতীয় কন্ভেন্শনের সদস্য নির্বাচিত হন। কন্ভেন্শনে প্রধান জাকোবিন নেতাদের তিনি ছিলেন অন্যতম। ঐ বৎসর ১০ আগস্ট তুইলেরিয়ে (Tuileries) রাজপ্রাসাদ-দখলের অভিযানে তিনি অগ্রণী-ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের নবগঠিত অস্থায়ী সরকারে তিনি ছিলেন বিচারমন্ত্রী। অস্ট্রিয়া ও প্রুসিয়া-কর্তৃক ফ্রান্স আক্রান্ত হইলে (আগস্ট, ১৭৯২ খ্রী) দাতোঁ প্রতিরোধের স্পর্ধিত বাণীর দ্বারা পিতৃভূমিরক্ষার কাজে স্বদেশের জনগণকে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি ফ্রান্সের প্রধান জাতীয় নেতা হইয়া ওঠেন। অতঃপর তাঁহার প্রভাব কমিতে থাকে। মধ্যপন্থী দাতোঁর সহিত বিশুদ্ধ বিপ্লবী রোবেসপিয়ারের বিরোধ ক্রমেই ঘনীভূত হয়। সন্ত্রাসরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দাতোঁ করুণার জন্য আবেদন করেন। তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিচারের পর গিলোটিন করা হয় (এপ্রিল, ১৭৯৪ খ্রী)।

ইতিহাসে একদিকে সাহস, বীরত্ব, দেশপ্রেম, রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা প্রভৃতি কারণে দাতোঁর যেমন স্তুতি করা হয়, তেমনই বাক্সর্বস্বতা, উৎকোচগ্রহণ, সম্ভাব্য দেশদ্রোহিতা প্রভৃতি কারণের জন্য তাঁহার নিন্দাও করা হয়।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

দাদরা ও নগরহাভেলী ২০°৩´-২০°২১´৩০´´ উত্তর ও ৭২°৫৪´৪০´´-৭৩°১৩´ পূর্ব। ভারতের পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রাক্তন পর্তুগীজ উপনিবেশ দমানের অন্তর্ভুক্ত দাদরা ও নগরহাভেলী অধুনা একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে (ইউনিয়ন টেরিটরি) পরিণত হইয়াছে। ইহা দাদরা ও নগরহাভেলী নামক পৃথক দুইটি ভূমিখণ্ড লইয়া গঠিত। নগরহাভেলী হইতে দাদরা প্রায় ১৩ কিলোমিটার (৮ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে ও দাদরা হইতে দমান প্রায় ৯ কিলোমিটার (সাড়ে পাঁচ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাক্ ভারতভুক্তির যুগে ব্রিটিশশাসিত ভারতের ভূমি দ্বারা এই পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই অঞ্চলটিকে পূর্বে, পশ্চিমে ও উত্তরে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে গুজরাতের সুরাট জেলা ও ইহার দক্ষিণে রহিয়াছে মহারাষ্ট্রের থানা জেলা। বর্তমান আদমশুমার (১ মার্চ, ১৯৬২ খ্রী) অনুসারে ইহার আয়তন ৪৭৩ বর্গকিলোমিটার (১৮৯ বর্গমাইল) লোকসংখ্যা ৫৭৬৯৩ জন। পুরুষ ও নারীর সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে ২৯২৫৪ জন ও ২৮৪৩৯ জন।

দামনগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত দাদরা প্রায় সমতল। নগরহাভেলীর পূর্বাংশ পাহাড়সংকুল। দক্ষিণের পাহাড়ের একটি নাতিপ্রশস্ত শাখা উত্তরে নগরহাভেলীর পশ্চিম সীমানা দিয়া আথাল গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার স্থানটির সর্বাধিক উচ্চতা ৩৬৯ মিটার (১১৯২ ফুট)।

দাদরা ও নগরহাভেলীর প্রধান নদী দামনগঙ্গা। এই নদীটি পূর্ব দিক হইতে প্রবেশ করিয়া নগরহাভেলী অঞ্চলটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। নগরহাভেলীর সীমানা অতিক্রম করিয়া ইহা গতি পরিবর্তন করিয়া পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। দামনগঙ্গা নদীতে বৎসরের সকল সময়েই জল থাকে।

জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও তাপমাত্রা যথাক্রমে ১৬২৫ মিলিমিটার ও ২৭° সেন্টিগ্রেডের (৬৫″ ও ৮০° ফারেনহাইটের) নিকটবর্তী। মৃত্তিকা আর্দ্র এবং উর্বরা। মধ্যাঞ্চলে মৃত্তিকা অতীব কর্দমাক্ত এবং উত্তর ও দক্ষিণে মৃত্তিকাস্তর অগভীর। প্রধান কৃষিজ দ্রব্য হইতেছে ধান, গম, তামাক এবং অন্যান্য নিকৃষ্টতর খাদ্যশস্য। কৃষিকার্য অল্লায়াসেই সুসম্পন্ন হয়। উত্তর-পশ্চিমে কিয়দংশ ব্যতীত সমগ্র দাদরা কৃষিকার্যের উপযোগী। উল্লেখযোগ্য খনিজ পদার্থ কিছুই পাওয়া যায় না। বনজ সম্পদে নগরহাভেলী পরগনা অত্যধিক সমৃদ্ধ। অরণ্যানীর দুই-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া রহিয়াছে সেগুন বৃক্ষ। অপরাপর বৃক্ষগুলির মধ্যে সাদারা, খয়ের, শিশু ও বাবুল উল্লেখযোগ্য। বনভূমি হইতে প্রচুর আয় হয়। দমানের জাহাজনির্মাণ কারখানায় ব্যবহৃত সেগুন-কাষ্ঠ নগরহাভেলী হইতে প্রেরিত হইত।

এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটিতে কোনো শহর নাই। এখানে মোট ৭২টি গ্রাম আছে। দাদরা গ্রামটি হইতেছে এই অঞ্চলের দাদরা-অংশ। অন্যান্য গ্রামগুলির মধ্যে জনসংখ্যার দিক হইতে অমলি ও নারোলি গ্রামদ্বয় উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা হইতেছে কৃষিকার্য। পূর্বে এই অঞ্চল তাঁত ও রঞ্জনশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার ভাষা গুজরাতি এবং কতিপয় মুসলমান ও খ্রীষ্টান ব্যতীত অধিবাসীরা সকলেই হিন্দু।

যাতায়াতের পথ এখনও অনুন্নত রহিয়াছে। নিকটবর্তী ওয়াপি রেলস্টেশনটি সিলভাসা হইতে ১৭ কিলোমিটার

(১১ মাইল) দূরে অবস্থিত ও রাজপথ (মেটাল্ড রোড) দ্বারা যুক্ত। গ্রামগুলি গো-শকট পথ (কার্ট ট্র্যাক) দ্বারা পরস্পরের সহিত যুক্ত। দক্ষিণ-পূর্বের পাহাড়িয়া ভূমিখণ্ডে এই পথও বিরল।

পর্তুগীজগণ ইওরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে প্রথমে ভারতে কুঠি নির্মাণ করেন (১৫০০ খ্রী)। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া অধিকার করিয়া প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। উত্তরকালে দিউ ও দমান তাঁহাদের উপনিবেশভুক্ত হয়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারি পুণায় স্বাক্ষরিত এক সন্ধি অনুযায়ী পেশোবা মাধবরাও নগরহাভেলী পরগনা পর্তুগীজদিগকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে অর্পণ করেন। এই হস্তান্তরের ফলে নগরহাভেলী পর্তুগীজ দমান উপনিবেশের তিনটি পরগনার মধ্যে একটিতে পরিণত হয়। ইহা ইটেলি পাটি ও উপেলি পাটি নামে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। দমানের শাসনকর্তার অধীন একজন প্রশাসক ইহার শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।

পর্তুগীজ সাম্রাজ্যভুক্ত গোয়ার জনগণ ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বহুবার পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ব্যাপক আইন অমান্যকরণ আন্দোলনের (সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স মুভ্মেণ্ট) সূত্রপাত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ চলিয়া যাইবার পর পর্তুগীজগণও ভারত ত্যাগ করিয়া যাইবে, এইরূপ আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু পর্তুগীজ সরকার গোয়া প্রভৃতি অঞ্চল পর্তুগীজ সাম্রাজ্যভুক্ত ও পর্তুগালেরই একটি সাগরপারস্থিত প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

পর্তুগীজ পুলিশের সহিত সামান্য সংঘর্ষের পর ইউনাইটেড ফ্রণ্ট অফ গোয়ান্স দলের সদস্যগণ-কর্তৃক স্থানীয় অধিবাসীদের সহায়তায় দাদরা-পর্তুগীজ ছিটমহলটি (এন্‌ক্লেভ) ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুলাই মুক্ত হয়। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইউনাইটেড পার্টি এবং গোয়া পিপল্স পার্টির সদস্যদের সহায়তায় স্থানীয় অধিবাসীরা ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২ আগস্ট নগরহাভেলীকে পর্তুগীজ-কবলমুক্ত করে। দাদরার উপর সশস্ত্র আক্রমণ নিকটবর্তী ভারতভূমিতে উদ্ভূত হইয়াছে ঘোষণা করিয়া কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পর্তুগাল ভারতভূমির উপর দিয়া দাদরা ও নগরহাভেলীতে সৈন্যবাহিনী লইয়া যাইবার জন্য গমনাধিকার (প্যাসেজ) দাবি করে। ভারত এই রটনা অস্বীকার করে ও গমনাধিকার দিতে অস্বীকৃত হয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর পর্তুগাল আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে (ইণ্টারন্যাশনাল কোর্ট) ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'ভারতভূমির উপর দিয়া গমনাধিকার' মামলা (রাইট্ অফ প্যাসেজ ওভার ইণ্ডিয়ান টেরিটরি) দায়ের করে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের (১২ এপ্রিল, ১৯৬০ খ্রী) রায়ে পর্তুগালের সৈন্য, সশস্ত্র পুলিশ, অস্ত্রশস্ত্র, ও গোলাবারুদ ভারতভূমির উপর দিয়া দাদরা ও নগরহাভেলীতে লইয়া যাইবার দাবি নাকচ করিয়া দেয়।

যুক্ত ছিটমহলগুলি প্রথমে প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে (অটোনমাস অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ্ টেরিটরিস) পরিণত হয়। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত গঠিত হয়। সমগ্র দাদরা ও নগরহাভেলীর জন্য একটি বরিষ্ঠ পঞ্চায়েৎ অর্থাৎ জনগণের সভা হয় ও শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা একজন প্রশাসকের হস্তে ন্যস্ত হয়। নূতন শাসনে এই অঞ্চলের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। বনসম্পদ হইতে আয় ১'৪ লক্ষ টাকা (১৯৫৩ খ্রী) হইতে ১৬ লক্ষ টাকায় (১৯৬০ খ্রী) পরিণত হয়। ভারত সরকার সংবিধানের ১০ম সংশোধনের দ্বারা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আগস্ট তারিখে দাদরা ও নগরহাভেলীকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। দাদরা ও নগরহাভেলী রাষ্ট্রপতি-কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রশাসকের অধীন ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়।

এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য গ্রাম সিলভাসা—(২০°১৬'৩০" উত্তর, ৭২°৫৯'৩০" পূর্ব) দামনগঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে উত্তরের সমভূমিতে এই গ্রামটি অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা ২৬৪৫ জন ও আয়তন ১৭২৬ একর (১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার)। নবগঠিত দাদরা ও নগরহাভেলীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির সদরদপ্তর এই গ্রামে অবস্থিত। অধিবাসীদের অধিকাংশই জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল।

দ্র *Imperial Gazetteer of India*, vol. XI, Oxford, 1908 ; R. P. Rao, *Portuguese Rule in Goa*, Bombay, 1963.

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

দাদাজী কোণ্ডদেব শিবাজীর অভিভাবক, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ; পুণা জেলার মালথানা গ্রামে তাঁহার জন্ম। শাহজী বিজাপুররাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত পুণা জেলার চাকণ হইতে ইন্দপুর ও শিরওয়াল জায়গির লাভ করিয়া দাদাজী কোণ্ডদেবকে তাহার পরিচালনার ভার দেন ও স্বীয় পত্নী জিজাবাঈ ও পুত্র শিবাজীকে পুণায় তাঁহার কর্তৃত্বে রাখেন এবং তাঁহাদের খরচ-পত্রের জন্য যথাযোগ্য অর্থ প্রদান করেন।

দাদাজী কোণ্ডদেব যখন পুণা জেলার জায়গিরের ভার পান তখন ঐ জেলা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। দাদাজী পুণা জায়গিরের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। তাঁহার কঠোর ন্যায়বিচারের ফলে পুণা জেলায় ডাকাতি ও জমির জবরদখল দুইই বন্ধ হয়। তিনি দেশপাণ্ডেদিগকে (স্থানীয় কর্তা) উপহারদানে ও কৌশলী ব্যবহারে স্বীয় দলভুক্ত করেন ও মাবল বা মাওয়লীদিগের উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেন।

দাদাজী চাহিতেন যে শিবাজী তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের পন্থা অনুসরণ করিয়া আদিলশাহীরাজের সেনাধ্যক্ষ হইয়া অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু শিবাজী স্বাধীনভাবে থাকিতে চাহিতেন। পার্বত্য দস্যুদিগের সহিত মিলিয়া একদিন তিনি হঠাৎ তোরণা দুর্গ দখল করেন। ইহাতে ভীত হইয়া দাদাজী শিবাজীর ক্রিয়াকলাপ শাহজীকে জানান; কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। উদ্বিগ্ন ও চিন্তাগ্রস্ত মনে দাদাজী কোণ্ডদেব ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যদুনাথ সরকারের মতে দাদাজী কোণ্ডদেব সৎ, কর্মদক্ষ ও নিয়মানুগ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কোনও উচ্চ আদর্শ, নির্ভীকতা, দুরাকাঙ্ক্ষা এবং সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি ছিল না।

দ্র Jadunath Sarkar, *Shivaji and His Times*, Calcutta, 1929.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

দাদূ (১৫৪৪-১৬০৩ খ্রী) ভক্ত-সাধক দাদূ জন্মগ্রহণ করেন ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার জন্মস্থান লইয়া পণ্ডিত মহলে মতভেদ আছে। কেহ বলেন গুজরাতের আমেদাবাদে তাঁহার জন্ম, অন্যদের মতে উত্তর প্রদেশের জৌনপুরে। চর্মকার বা মুচির বংশে, মতান্তরে মুসলমান ধুনকর-বংশে দাদূর জন্ম হয়। উইলসন ও ট্যাসীর মতে দাদূ রামানন্দ হইতে শিষ্যপরম্পরাক্রমে ৬ জনের পর। অর্থাৎ তিনি বুঢ়ন বা বৃদ্ধানন্দের শিষ্য। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস দাদূ কবীরের পুত্র ও শিষ্য কমালের নিকটই অধ্যাত্মসাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। দাদূশিষ্য রজ্জব, জনগোপাল প্রভৃতির বিবরণ হইতে জানা যায় যে সম্রাট আকবর ফতেপুর সিক্রীর নিকটবর্তী স্থানে দাদূর সঙ্গে ধর্ম ও মানবজীবনের সাধনা বিষয়ে চল্লিশ দিন আলোচনা করিয়াছিলেন। শিষ্যদের মতে এই সাক্ষাৎকার আকবরের ব্যক্তিত্ব ও কর্মপ্রণালীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। লোকসাধারণের জীবনেও দাদূর প্রভাব গভীর ও ব্যাপকভাবে পড়িয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এক সময়ে দেশপরিক্রমাকালে তিনি বাংলা দেশে আসিলে বাংলার বাউল সাধকেরা দাদূর প্রতি নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করেন। আজও কোনও কোনও বাউলের বন্দনাগীতির নামাবলীতে দাদূর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দাদূ এদেশের বিচিত্র সাধনার সঙ্গে পরিচিত হন এবং সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ঐক্যটি আবিষ্কার করেন।

বিবাহিত হইয়া দাদূ পূর্ণ গৃহস্থ হইয়াছিলেন। নীচ-জাতীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে প্রভূত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহা তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দাদূ তাঁহার জীবনের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে সহজ সরল কথ্য হিন্দী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। দাদূ-বাণী মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি দাদূর অপরিমেয় স্নেহ ও করুণা ছিল। তিনি মানুষে-মানুষে সর্ববিধ কৃত্রিম বিভেদের বিরোধী ছিলেন। জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভেদবুদ্ধিই যে সাধনার বাধা ও ধর্মের অন্তরায়, ইহাই তিনি সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিষ্প্রাণ সাধন-পদ্ধতি, অর্থহীন আচার, বাহ্য ভেখ এবং সম্প্রদায়সৃষ্টির প্রতি তাঁহার বিরাগ ছিল। তিনি বারবার বলিতেন, "আমি হিন্দু নই, মুসলমানও নই; আমি পরমকারুণিক ঈশ্বরকে ভালবাসি।" 'করামাত' বা অতিপ্রাকৃতে তাঁহার আস্থা ছিল না। দাদূ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের চিন্তায় সর্বমানবকে যুক্ত করিতে এবং সত্যের সাধনায় মানব-চিত্তকে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫৯ বৎসর বয়সে রাজস্থানের নারাইনায় দাদূর জীবনাবসান হয়।

দাদূ অগণিত ভক্ত ও বহু শিষ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রখ্যাত শিষ্যদের সংখ্যা ছিল ৫২। দুইজন শিষ্য জনগোপাল ও জগজীবন দাদূর 'জীবন পরচী' বা জীবন-পরিচয় লেখেন এবং অন্য দুইজন সন্তদাস ও জগন্নাথ দাদূ-বাণী সংগ্রহ ও সংকলন করেন। দাদূর দুই কন্যা ও কয়েকজন শিষ্যার কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মরমিয়া সাধক দাদূর বাণী ভারতেরই মর্মবাণীকে প্রকাশ করিয়াছে। ভগবানের প্রতি অহৈতুক প্রেম এবং মানবের প্রতি সুনিবিড় মৈত্রীবোধ ইহার সার কথা। দাদূ-বাণীতে কাব্যের বিশুদ্ধ রসরূপ প্রকাশিত বলিয়া তাহা মধ্যযুগের সৃষ্টি হইয়াও আজিও সাহিত্য হিসাবে সমাদৃত।

দ্র ক্ষিতিমোহন সেন, দাদূ, কলিকাতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ; অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৮৮৮; W. Crooke, *Tribes and*

Castes of the N. W. Provinces and Oudh, vol. II, Calcutta, 1896.

সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দান যথাশক্তি দান করা হিন্দু গৃহস্থের অন্যতম অবশ্য কর্তব্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত। রাজারাজড়াদের অপূর্ব দানের কাহিনীতে প্রাচীন সাহিত্য পরিপূর্ণ। অলৌকিক দানের গৌরবে অঙ্গরাজ কর্ণ দাতাকর্ণ নামে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন এবং বাংলা দেশে তাঁহার পুত্র-মাংস দানের কাহিনী বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্ব-দানের কাহিনীও সুপরিচিত। স্বর্ণাদি ধাতুদান, গোদান, ভূমিদান, অন্নদান, জলদান, দানের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। শ্রাদ্ধাদি কার্যে এই সমস্ত দানের কিছু কিছু প্রচলন এখনও আছে; তবে সামান্য মূল্যের দ্বারাই অনেক ক্ষেত্রে কার্য সমাধা করা হয় ('আদ্যশ্রাদ্ধ', 'গোরু' দ্র)। তুলাপুরুষদান বা তুলাদানে দাতার দেহের সম-পরিমাণ ওজনের স্বর্ণাদি দ্রব্য দান করা হইত। শতাধিক বর্ষ পূর্বেকার এইরূপ দানের বিবরণ পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও কেহ কেহ এই দান অনুষ্ঠান করিয়াছেন শোনা যায়। রাজা-জমিদারদের ভূমিদানের পরিচয় পাওয়া যায় শত শত তাম্র-শাসন, ব্রহ্মোত্তর ও পীরোত্তর পত্রের মধ্যে। অতিথি-সৎকার, কাঙালীভোজন ও অন্নসত্রের ব্যবস্থা অন্নদানের বিভিন্ন রূপ। প্রতি সংক্রান্তিতে ব্রত হিসাবে অন্নাদিদানের বিধান আছে। চৈত্র-সংক্রান্তিতে জলপূর্ণ মাটির কলসীদান সুপরিচিত ধর্মানুষ্ঠান। দারুণ গ্রীষ্মের সময় অনেকে তৃষ্ণার্ত পথিককে জল দান করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাকে জলসত্র বলা হয়। বিদ্যাদানের প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল; বিদ্যাবিক্রয় নিন্দনীয় ছিল। তাই দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্রকে বেতন দিয়া পড়িতে হইত না ('টোল' দ্র)। তবে দান করা যেমন প্রশংসনীয় ছিল, দানগ্রহণ তেমন প্রশংসার বিষয় ছিল না; অনেক ক্ষেত্রে ইহা নিন্দনীয় ছিল। তাই সকলে সকলের নিকট হইতে বা সকল বস্তু দান হিসাবে গ্রহণ করিতেন না, কেহ কেহ প্রতিগ্রহ বা দানগ্রহণ একেবারে ত্যাগ করিতেন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

স্বেচ্ছায় এবং বিনামূল্যে নিজস্বত্ব ত্যাগ করিয়া কোনও সম্পত্তি অপরকে হস্তান্তর করার নামই দান। দানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইতেছে গ্রহণ। গ্রহীতা গ্রহণ না করা পর্যন্ত দান সম্পূর্ণ হয় না এবং এই গ্রহণানন্তর-মাত্রেই প্রদত্ত সম্পত্তিতে গ্রহীতার স্বত্ব অর্শায়। দানের আবশ্যিক উপাদানগুলি হইতেছে: ১. কোনও মূল্য গ্রহণ না করা ২. দাতা ৩. গ্রহীতা ৪. বিষয়বস্তু ৫. হস্তান্তর ৬. গ্রহণ। হস্তান্তরের পরিবর্তে কোনও কিছু গ্রহণ করিলে উহা দান হইবে না। বিক্রয় ও অন্যান্য হস্তান্তরাদির সহিত দানের এখানেই পার্থক্য। সাবালক সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিমাত্রেই নিজস্বত্বীয় সম্পত্তি দান করিবার অধিকারী। নাবালক গ্রহীতার পক্ষে অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তি দান গ্রহণ করিতে পারেন, তবে অসুবিধাজনক ও দুর্বহ (অনেরাস) দানের ক্ষেত্রে সাবালক হইবার পর পর্যন্ত উক্ত দান প্রত্যাখ্যান করিবার অধিকার গ্রহীতার থাকে। গর্ভস্থ শিশুর অনুকূলে দানও আইনসিদ্ধ এবং উহার পক্ষে অন্যে এই প্রকার দান গ্রহণ করিলেই চলে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়বিধ আইনেই এরূপ দান নিষিদ্ধ ছিল। মুসলমান-আইনে উহা এখনও নিষিদ্ধ।

স্থাবর ও অস্থাবর উভয়প্রকার সম্পত্তিই দানের বিষয়বস্তু হইতে পারে, তবে দানকালে উক্ত সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকা এবং উহাতে দাতার স্বত্ব বর্তমান থাকা প্রয়োজন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের সম্পত্তি-হস্তান্তর আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তিমাত্রেই দানের বিষয়বস্তু হইতে পারে। হিন্দু ও মুসলমান আইনে এই প্রকার হস্তান্তরের জন্য কোনও প্রকারের দলিল আবশ্যক হইত না; কিন্তু তৎপরিবর্তে প্রদত্ত সম্পত্তিতে গ্রহীতাকে দখলপ্রদান আবশ্যিক ছিল। মুসলমান আইনে উক্ত বিধান এখনও বলবৎ আছে; কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এখন সম্পত্তি-হস্তান্তর আইনের বিধানানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি দানের ক্ষেত্রে দলিলসম্পাদন ও পঞ্জীকরণ (রেজিস্ট্রেশন) বাধ্যতামূলক; কিন্তু গ্রহীতাকে দখলপ্রদান আবশ্যিক নহে। অবশ্য গ্রহীতা-কর্তৃক দানগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়। পূর্বে এ বিষয়ে হিন্দু মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ আইনে পার্থক্য ছিল। বর্তমানে সম্পত্তি-হস্তান্তর আইনের ১২২ ধারানুযায়ী দাতার জীবনকালের মধ্যে গৃহীত না হইলে দান আইনসিদ্ধ হয় না। অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দখলপ্রদান করিলেই দান সম্পূর্ণ হয়, দলিলসম্পাদন আবশ্যিক নহে।

উপরি-উক্ত দান ব্যতীত চরমপত্র বা উইল দ্বারাও দান করা হয়। এইরূপ দান দাতার মৃত্যুর পর কার্যকর হয়। ইহা ব্যতীত ন্যাসপত্র (ডিড অফ ট্রাস্ট) দ্বারা দানের প্রথা প্রচলিত আছে।

একবার গৃহীত হইয়া গেলে একমাত্র প্রবঞ্চনা ও অবৈধ প্রভাব-জাত দান ব্যতীত অন্য কোনও দান প্রত্যাহারযোগ্য নহে।

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

দানীবাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্র

দান্তে (১২৬৫-১৩২১ খ্রী) ইটালীর 'আদি কবি' এবং মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের মহত্তম কাব্যের স্রষ্টা দান্তে আলিগিয়েরি ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লাতিন ভাষায় ও সাহিত্যে এবং দর্শন-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া তিনি প্রভাঁসাল ত্রুবাদুরদের গীতিকাব্য ও ফরাসী রোমান্স সাহিত্য এবং ইটালীয় লেখকদের 'নব রম্য রীতি' (dolce stil nuovo)-র প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। 'ভিতা নুওভা' (Vita Nuova) তাঁহার প্রথম রচনা; এই গ্রন্থে পঁচিশটি সনেট, পাঁচটি 'গীতি', একটি ব্যালাড আছে। পরে তিনি আরও কবিতা লিখিয়াছিলেন। 'চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা' (De Vulgari Eloquentia) গ্রন্থে তিনি শুধু কবিতা নয়, এক বিস্তারিত কাব্যতত্ত্ববিষয়ক নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। লাতিন ভাষায় দান্তে রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও নানাবিধ নিবন্ধ রচনা করেন। রাজনৈতিক কারণে ফ্লোরেন্স হইতে নির্বাসিত হইয়া তাঁহার জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি 'কম্মেদিয়া'-নামক ইটালীয় মহাকাব্যের রচনায় অসাধারণ কবিপ্রতিভা ও অগাধ পাণ্ডিত্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই কাব্যরচনায় দান্তের প্রেরণাদাত্রী হইয়াছিলেন বেয়াত্রিচে। বাল্যকালেই কবি এই মেয়েটির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়া আজীবন তাঁহাকেই অপার্থিব কল্যাণ ও সুন্দরের মানসমূর্তিরূপে মনে মনে ভালবাসিয়াছিলেন; বেয়াত্রিচে চব্বিশ বৎসর বয়সে মারা গেলে তাঁহার স্মরণার্থে দান্তে 'কম্মেদিয়া' কাব্যটি লিখিয়াছিলেন। বেয়াত্রিচে নামটির অর্থ নন্দিনী, আনন্দদায়িনী। 'দিভিনা কম্মেদিয়া' (*Divina Commedia*, দিব্য নাট্য বা দিব্য প্রেমগাথা) তিন খণ্ডে ও শত সর্গে বিভক্ত এক বিরাট কাব্য। রূপকের বাচ্যার্থ নায়ক কবির পরলোকপরিভ্রমণ এবং নরক (Inferno), শোধনভূমি (Purgatorio) ও স্বর্গের (Paradiso) সন্দর্শন; ব্যঙ্গ্যার্থ মানবহৃদয়ের বিচিত্র ভাবধারার রূপায়ণ এবং প্রেম ও অপ্রেমের সর্বপ্রকার বিকাশ-বিশ্লেষণ। নরক অপ্রেমের স্থান; শোধনভূমি প্রেম ও অপ্রেমের সংঘাতস্থান; স্বর্গ প্রেমেরই রাজ্য। দান্তের রূপক-কল্পনা স্বতন্ত্র ও বিশেষ চিত্তাকর্ষক; বিদেহী ভাবপ্রত্যয়ের উপর কৃত্রিম ব্যক্তিত্বের আরোপ না করিয়া তিনি বরং সুপরিচিত ও সুনির্দিষ্ট বহু নরনারীর সজীব ও বাস্তব চিত্রাঙ্কনে নাটকীয় দক্ষতার সঙ্গে এক একটি জীবনাদর্শের পরিণত রূপ প্রদর্শিত করেন। অসংখ্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, বহুবিধ ঐতিহাসিক ঘটনার আলেখ্য, রাজনীতি, দর্শন ও অধ্যাত্মসাধনা-বিষয়ক আবেগ ও চিন্তাশীলতায় পূর্ণ অনেক কবিত্বময় আলোচনা এবং অত্যাশ্চর্য প্রতীকী কল্পনার প্রয়োগ 'কম্মেদিয়া'-কে এক অতুলনীয় শিল্পসৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে। এই কাব্যের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্য ও খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যধারা সর্বপ্রথম সমন্বিত হইয়াছে।

দ্র এক্ষণ, দান্তে বিশেষ সংখ্যা, পৌষ, মাঘ, ১৩৭৩; P. Toynbee, *Dante Alighieri, His Life and Works*, 1910; E. Moore ed. *The Complete Works of Dante*, 4th ed. Oxford, 1924.

পিয়ের ফালোঁ

দাবা ইহাকে শতরঞ্জ এবং চতুরঙ্গও বলা হইয়া থাকে। একপ্রকার অব্যায়ামী ক্রীড়াবিশেষ। ইহাতে দুইজন খেলোয়াড় একটি চতুঃষষ্টিকোষ্ঠ সমচতুষ্কোণ 'বোর্ড' অথবা 'কোষ্ঠকের' উভয়পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই খেলার অবলম্বন ৩২টি ঘুঁটি—১৬টি শাদা এবং ১৬টি কালো। প্রত্যেক দলে ১টি রাজা, ১টি মন্ত্রী (উজীর, 'কুইন'), ২টি হাতি (গজ, পিল, 'বিশপ'), ২টি ঘোড়া ('নাইট'), ২টি নৌকা (রুথ্, 'ক্যাস্‌ল') এবং ৮টি বোড়ে (পদাতি, 'পন', 'পিওন') থাকে। ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর চলনের বিভিন্ন রীতি আছে। এই খেলার লক্ষ্য হইল প্রতিপক্ষের রাজাকে এমনভাবে আক্রমণ করা যাহাতে প্রতিপক্ষ সেই আক্রমণের কোনও প্রতিরোধ না করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় প্রতিপক্ষ 'মাৎ' হইয়াছেন বলা হয়। 'মাৎ' শব্দটি আরব্য 'শাহ্‌মৎ' (রাজা মরিয়াছেন) হইতে গৃহীত এবং ইংরেজী 'চেক্‌মেট' বা রুশীয় 'শাখ্‌মাৎ'ও তাহাই। কোনও এক পক্ষ মাৎ হইয়া গেলে প্রতিপক্ষ বিজয়ী হন। ইহা ছাড়াও খেলা দুইভাবে শেষ হইতে পারে—যথা, চালমাৎ (এক পক্ষের কোনও আইনসঙ্গত 'চাল' বা দান না থাকিলে) এবং বললোপ (কোন পক্ষেই মাত দিবার মত বল অবশিষ্ট না থাকিলে)। উভয় ক্ষেত্রেই খেলায় হারজিত নাই। খেলা চলাকালীন কোনও এক পক্ষ হার স্বীকার করিলে অথবা উভয় পক্ষ যুগপৎ হারজিত অসম্ভব মানিয়া লইলেও খেলা শেষ হইয়া যায়।

এই প্রসিদ্ধ খেলাটির ঐতিহাসিক উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ। অন্ততঃ বুদ্ধের সময়ে হইতেই যুদ্ধমূলক চতুরঙ্গ ক্রীড়ার বহুল প্রচলন ছিল। তবে এই সময়ে খেলায় মন্ত্রী সর্বাপেক্ষা দুর্বল বল ছিল (ইহার চলন ছিল বর্তমান রাজার অনুরূপ) এবং 'রথ' (যাহাকে বর্তমানে 'নৌকা' বলা হয়) ছিল

আক্রমণের প্রধান অবলম্বন। গুপ্তযুগের অবসানের সময় হইতেই দাবাখেলার আর এক এক ধাপের সূত্রপাত হয়, যাহাকে বলা হয় 'নববল' (নয়টি বল যথা— ১টি রাজা, ১টি মন্ত্রী, ২টি হস্তী, ২টি ঘোড়া, ২টি নৌকা ও পদাতিক)। এই 'নববল' খেলায় মন্ত্রীর প্রাধান্য বর্তমানের খেলারই অনুরূপ। হূণগণ ভারত হইতে এই 'নববল' শ্রেণীর খেলাকেই মধ্য এশিয়ায় লইয়া যান এবং তথা হইতেই ইহা রাশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে। দাবার দ্বিতীয় ধারা শতরঞ্জের বিস্তার ঘটে আরবগণের ভারতে আগমনের পরে। আরবদের নিকট হইতে ইওরোপীয় ধর্মযোদ্ধাগণ (ক্রুসেডার্স) ইহার শিক্ষা করেন এবং কালক্রমে ইহা সমগ্র ইওরোপে বিস্তৃত হয়। 'শতরঞ্জ' এবং 'নববল' ধারার সংমিশ্রণে মধ্য ইওরোপে দাবার বর্তমান আন্তর্জাতিক রূপের সৃষ্টি হয় এবং ইটালীয় এবং স্পেনীয় যাজকগণের সাধনায় ইহা ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিকরূপ ধারণ করে। এই যুগে ইটালীয় জি. গ্রেকো (G. Greco) এবং স্পেনে লোপেজ্ (Lopez)-এর স্মৃতি আজও তাঁহাদিগের সৃষ্ট ক্রীড়ারম্ভে (ওপেনিং) বিধৃত। ১৯শ শতক হইতেই আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয় এবং জার্মান দেশীয় দাবাড়ে আণ্ডারসেনই (Anderssen) প্রথম বিশ্ববিজয়ীরূপে স্বীকৃত হন।

ইহার পরে ক্রমান্বয়ে স্টাইনিট্স (Steinitz), লাস্কর (Lasker), কাপাব্লান্কা (Capablanca), আলেখীন্ (Alekhine), বৎভিন্নিক (Botvinnik), স্মিস্লভ্ (Smyslov), প্রেত্রোসিয়ান (Petrosian) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ দাবাবিশেষজ্ঞগণ এই পদাধিকার লাভ করিয়াছেন। বর্তমানে রুশীয় দাবাখেলোয়াড় তিগ্রান্ পেত্রোসিয়ান (Tigran Petrosian) এই পদ অলংকৃত করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে এককালে সর্বাধিক বৎসর পদাধিষ্ঠিত ছিলেন এমানুয়্যাল লাস্কর (২৭ বৎসর)।

বর্তমানে দাবা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও তত্ত্বগভীর ক্রীড়ায় পরিণত হইয়াছে। ক্রীড়ারম্ভ (ওপেনিং), মধ্য ক্রীড়া (মিড্‌ল গেম) এবং অন্ত্য ক্রীড়া লইয়া সহস্র সহস্র পুস্তক রচিত হইয়াছে এবং প্রতিবৎসর রচিত হইতেছে। এজন্য বর্তমানে অপণ্ডিতের পক্ষে দাবা খেলায় উন্নত স্থান অধিকারের আশা সম্পূর্ণ অলীক, যদিও তত্ত্বগত পাণ্ডিত্য অর্জন করিলেই ভাল দাবা খেলা যায় না। দাবা লইয়া গবেষণার একটি ধারা এখন গণকযন্ত্রকে দাবা খেলা শিখাইবার চেষ্টায় আছেন। এই শ্রেণীর গবেষকগণ মনে করেন যে দাবার তাত্ত্বিক অংশকে গণিতীকৃতরূপে একবার গলাধঃকরণ করাইতে পারিলে যান্ত্রিক দাবা খেলোয়াড়ই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ে পরিণত হইবে। এখনও পর্যন্ত তাহা সম্ভব হয় নাই।

দ্র H. Golombek, *The Game of Chess*, London, 1956 ; Dr. M. Euwe, *Judgement & Planning of Chess*, London, 1963 ; H. Golombek, *Capablanca's 100 Best Games*, London, 1963.

অমৃতানন্দ দাস

দামোদর দামোদর নদ খামারগড় বা খামারপাতনামক (পালামৌ জেলার টোরির নিকট) ১০৫১ মিটার (৩৫০৪ ফুট) উচ্চ গিরিশৃঙ্গ (২৩°৩৭'উত্তর-৮৪°৪১' পূর্ব) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে প্রধান ঝরণা হইতে দামোদরের উৎপত্তি তাহার স্থানীয় নাম সোনাসাথী ও দামোদরের স্থানীয় নাম দেওনদ। হাজারিবাগ জেলায় ৩০০ মিটার (১০০০ ফুট) উচ্চ উপত্যকাতেই দামোদর নামের প্রচলন হইয়াছে। দামোদরের উপনদীর মধ্যে বরাকর, কোণার, বোকারো ও যমুনীয়া উল্লেখযোগ্য। দেওনদের বহু জলপ্রপাত আছে, বরকা গাঁয়ের নিকট ৩৩ মিটার (১১০ ফুট) উচ্চ জলপ্রপাতটি তাহাদের অন্যতম।

সর্পিল গতিতে বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্য দিয়া প্রায় ৫৩৭ কিলোমিটার (৩৩৬ মাইল) অতিক্রম করিয়া কলিকাতার ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) দক্ষিণে দামোদর হুগলি নদীর সহিত মিশিয়াছে। নদীর উৎস হইতে আসানসোলের নিকট বরাকর নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত দামোদরের উচ্চাংশ। উপত্যকার মালভূমি অংশে জমির অত্যন্ত ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় নদীর মধ্য ও নিম্নাংশে স্রোতোবাহিত অতিরিক্ত বালি ও পলির অবক্ষেপণে নদীগর্ভ ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। বরাকরের সঙ্গমস্থল হইতে বর্ধমান শহরের নিকট পর্যন্ত দামোদরের সমভূমি অংশ। দামোদর সাধারণতঃ তাহার উৎসদেশের বর্ষার বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল, এইজন্য বৎসরের অন্যান্য সময়ে জলের গভীরতা অত্যন্ত অল্প হওয়ায় এই অংশ নাব্য নয়। বর্ধমান হইতে রূপনারায়ণ হুগলির সঙ্গম পর্যন্ত দামোদরের নিম্ন অংশ। দামোদর-রূপনারায়ণের সঙ্গম হুগলির সমুদ্রগামী নাব্য-প্রণালী অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করে। শেষ ২০৮ কিলোমিটারেই (১৩০ মাইল) দামোদরের বন্যার প্রকোপ। দামোদরের ব-দ্বীপ-প্রবাহে স্রোতের বেগ অত্যন্ত কম ও শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত, নিম্ন দামোদর এলাকার জলনিকাশের সমস্যাই প্রধান। অনেক সময়ে

দামোদর উপত্যকা প্রকল্প

চীনের হোয়াংহো অথবা ইয়াংসির বন্যার সহিত দামোদরের বন্যার তুলনা করা হয়।

দ্র এস, মহাপাত্র, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, কলিকাতা, ১৯৬১।

প্রণীতা ভট্টাচার্য

দামোদর উপত্যকা প্রকল্প ২২° হইতে ২৪°৩০´ উত্তর এবং ৮৪°৪৫´ হইতে ৮৮°৩০´ পূর্বে বিস্তৃত। বিহার ও পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত দামোদর উপত্যকার আয়তন ২৩১০০ বর্গকিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ৫০ লক্ষেরও অধিক। এই উপত্যকা অঞ্চলে হাজারিবাগ, রাঁচী, পালামৌ, সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া এই দশটি জেলা আছে। বহু কাল ধরিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মালভূমিতে উপত্যকা ও পর্বতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই স্থানের মালভূমিকে ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি (ডাইসেক্‌টেড প্লেটো) বলা হয়। এখানে অনেক ক্ষয়ীভূত সমভূমির (পিনিপ্লেন-এর) সৃষ্টি হইয়াছে।

দামোদর উচ্চ অববাহিকা অঞ্চল ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ এবং নিম্ন অববাহিকা অঞ্চল অবক্ষেপিত পলি মাটি দ্বারা গঠিত উর্বর সমতলভূমির অন্তর্গত। মালভূমি অঞ্চল অতি প্রাচীন কঠিন গ্র্যানিট, নিস, শিস্ট প্রভৃতি আগ্নেয় বা রূপান্তরিত শিলার দ্বারা গঠিত। আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলাস্তরের উপরের সঞ্চিত পাললিক শিলা-স্তরে, ভারতের বিখ্যাত কয়লাখনিসমূহ অবস্থিত।

ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ ও কাঁসাই ইত্যাদি নদীগুলি ছোটনাগপুরের উচ্চ ভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া ভাগীরথী হুগলিতে আসিয়া মিশিয়াছে। ইহাদের বন্যা উচ্চ ভূমিতে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। নিম্নাঞ্চলেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উচ্চ ভূমিতে ১০০০/১২০০ মিলিমিটার ও নিম্ন ভূমিতে প্রায় ১৪০০/১৫০০ মিলিমিটার। জুন হইতে অক্টোবর মাসে মৌসুমী বায়ুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণবাতবৃষ্টি এই অঞ্চলের প্রধান বৃষ্টিপাতের কারণ। খাঁড়ি, বাঁকা ও বেহুলা নদী দামোদরেরই প্রাচীন খাত বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আজ এই নদীগুলির সহিত দামোদরের কোনই যোগ নাই। নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রচুর বারিবর্ষণের ফলে নিম্ন উপত্যকার উর্বর জমি-নদনদী-নালা জলে প্রায়ই পরিপূর্ণ হইয়া যায়। দামোদর পরিকল্পনাপ্রসূত বাঁধগুলি না থাকিলে নিম্ন উপত্যকায় অবস্থিত জেলাগুলির যে পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হইত তাহা অনুমান করা দুষ্কর।

দ্র এস. মহাপাত্র, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, কলিকাতা, ১৯৬১; V. R. Khedkar, *Mineral Resources of the Damodar Valley and Adjacent Region and their Utilisation for Industrial Development*, Calcutta, 1950; Amal Home, ed., *D. V. C. In Prospect and Retrospect*, Calcutta, 1958; G. P. Ganguli, ed., *D. V. C. Samachar*, vol. V, no. III, Calcutta, 1966.

প্রণীতা ভট্টাচার্য

দামোদর উপত্যকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বিধানকল্পে দামোদর উপত্যকা প্রকল্প রচিত হয় ও উহার রূপায়ণের জন্য ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুলাই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। দামোদর এবং ইহার বোকারো, কোনার প্রভৃতি শাখানদীগুলির বন্যার প্রবলতার কথা সর্বজন-বিদিত। গত একশত বৎসরের মধ্যেই ঐ সকল নদীতে অন্যূন কুড়িটি লোকক্ষয়কারী বন্যা হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায়। ঐ বৎসরই মেঘনাদ সাহা-প্রমুখ ১০ জন সদস্য সমবায়ে একটি অনুসন্ধানী সমিতি গঠিত হয় ও ঐ সমিতি আমেরিকার টেনেসি উপত্যকা প্রকল্পের আদর্শে এক বহুমুখী প্রকল্পসৃষ্টির প্রস্তাব করেন। টেনেসি ভ্যালি অথরিটি-র ভুর্ডুইন ঐ প্রকল্পের প্রাথমিক খসড়া রচনা করেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বিল পাস হয় ও ঐ বৎসর ২৭ মার্চ উহা স্ট্যাটুট বুক-এ লিপিবদ্ধ হয়।

দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের মুখ্য কার্যসূচী বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন এবং নৌবহন, ভূমিসংরক্ষণ, মৎস্যচাষ, জনস্বাস্থ্যরক্ষা ও সামগ্রিকভাবে উপত্যকার কৃষি-শিল্পের অর্থ নৈতিক উন্নয়নসাধন ইহার কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের (সংক্ষেপে ডি. ভি. সি.) কার্যধারার প্রথম পর্যায়ে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি সম্পন্ন হয়।

তিলাইয়া বাঁধ ও বিদ্যুৎকেন্দ্র : বিহারের হাজারিবাগ জেলায় বরাকর নদের উপর ৩৬০ মিটার (১২০০ ফুট) দীর্ঘ বাঁধ, ৫৭ বর্গকিলোমিটার (২৩ বর্গমাইল) জলাধার ও মোট ৪০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-উৎপাদনক্ষম ২টি ইউনিট-সম্পন্ন জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরু ইহার উদ্বোধন করেন।

হাজারিবাগ জেলায় কোনার নদের উপর ৩৭৪৬ মিটার (১২৪৮৭ ফুট) দীর্ঘ বাঁধ ও ২৫ বর্গকিলোমিটার (১০ বর্গমাইল) জলাধার। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরু ইহারও উদ্বোধন করেন।

মাইথন বাঁধ ও বিদ্যুৎকেন্দ্র: বিহারের ধানবাদ জেলায় বরাকর নদের উপর ৪৮৪৪ মিটার (১৫৮৯২ ফুট) দীর্ঘ বাঁধ, ১০৬ বর্গকিলোমিটার (৪১ বর্গমাইল) জলাধার ও মোট ৬০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-উৎপাদনক্ষম ৩টি ইউনিট-সম্পন্ন জলবিদ্যুৎকেন্দ্র। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরু ইহারও উদ্বোধন করেন।

পাঞ্চেত বাঁধ ও বিদ্যুৎকেন্দ্র: ধানবাদ জেলায় দামোদর নদের উপরে ৬৭৫২ মিটার (২২১৫৫ ফুট) দীর্ঘ বাঁধ, ১৫৩ বর্গকিলোমিটার (৫৯ বর্গমাইল) জলাধার ও ৪০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-উৎপাদনক্ষম একটি ইউনিট-বিশিষ্ট জলবিদ্যুৎকেন্দ্র। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরু ইহার উদ্বোধন করেন।

দুর্গাপুর আড়বাঁধ (ব্যারাজ): ইহা পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার মধ্যে প্রবহমান দামোদর নদের উপর ৬৯২ মিটার (২২৭১ ফুট) দীর্ঘ। এই বাঁধের দ্বারা ঐ দুইটি জেলা সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার উভয় তীরের সেচখালগুলির মোট দৈর্ঘ্য ২৪৯৪ কিলোমিটার (১৫৫০ মাইল)। তন্মধ্যে বাম তীরের ১৩৭ কিলোমিটার (৮৫ মাইল) দীর্ঘ খালটি নৌবহনযোগ্য। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ইহার উদ্বোধন করেন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২ ডিসেম্বরে দুর্গাপুর আড়বাঁধসমেত ডি. ভি. সি.-র সেচ ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও কার্যচালনার ভার পশ্চিম বঙ্গ সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৬৫-৬৬ আর্থিক বৎসরে ডি. ভি. সি.-র সেচব্যবস্থা হইতে ২৭০৩৩০ হেক্টর (৬৬৮০০০ একর) খরিফচাষের জমি ও ১৭০০০ হেক্টর (৪২০০০ একর) রবিশস্যের জমিতে জলসেচ করা হইয়াছে।

বোকারো বিদ্যুৎকেন্দ্র: হাজারিবাগ জেলায় বোকারো নদীর উপর মোট ১৭২৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-উৎপাদনক্ষম ৩টি ইউনিটবিশিষ্ট তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরু ইহারও উদ্বোধন করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় যোজনাকালে ইহার সহিত আর একটি ৭৫০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-উৎপাদনক্ষম ইউনিট যুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় যোজনাতে ডি. ভি. সি. দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরায় দুইটি তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ শুরু করেন। দুর্গাপুরের কেন্দ্রটি বর্ধমান জেলার ওয়ারিয়া রেলস্টেশনের বিপরীত দিকে অবস্থিত। ইহার ৩টি ইউনিটের মোট উৎপাদনক্ষমতা ২৯০০০০ কিলোওয়াট। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ইউনিটে যথাক্রমে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে উৎপাদন শুরু হয়।

চন্দ্রপুরার কেন্দ্রটি হাজারিবাগ জেলায় দামোদর নদের অদূরে চন্দ্রপুরা রেলস্টেশনের নিকটে অবস্থিত। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিটে যথাক্রমে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর ও ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বিদ্যুৎউৎপাদন শুরু হয়। ইহাদের মোট উৎপাদনক্ষমতা ২৮০০০০ কিলোওয়াট।

ডি. ভি. সি.-র সবগুলি বিদ্যুৎকেন্দ্র ১৩২ কিলোভোল্ট গ্রিডের সহিত সংযুক্ত। বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের ৪৫টি উপকেন্দ্র ও তথা হইতে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত ১৭৯৭ কিলোমিটার (১১১৭ মাইল) বৈদ্যুতিক তার এই গ্রিডের অন্তর্ভুক্ত। ডি. ভি. সি. আরও জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে আগ্রহশীল। ডি. ভি. সি.-র তাপবিদ্যুৎউৎপাদন-ব্যবস্থার আরও উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হাজারিবাগে ডি. ভি. সি.-র ভূমিসংস্করণ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ইহাতে প্রয়োজনানুযায়ী ছোট ছোট বাঁধ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণের দ্বারা কৃষিভূমি প্রস্তুতীকরণ, কৃষকদের নিকট বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকলাসমূহের প্রদর্শন, জলাধারের তীরভূমিতে কৃষিকার্য ও পক্ষীপালন, তৃণভূমিসংরক্ষণ ও বনসৃষ্টি প্রভৃতি বহুবিধ পরিকল্পনা অন্তর্গত হয়। কৃষি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা বা গবেষণার উদ্দেশ্যে বর্ধমান জেলার পানাগড়ে ও হাজারিবাগ জেলার দেওচন্দায় ডি. ভি. সি. কর্তৃপক্ষ ২টি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। পঞ্চম যোজনাকালের মধ্যে সমগ্র উচ্চ অববাহিকায় ভূমি-সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রণালী প্রয়োগ করার পরিকল্পনা আছে।

ডি. ভি. সি.-র ৪টি জলাধারের প্রায় ২০২৩০ হেক্টর (৫০০০০ একর) মৎস্যচাষের উপযুক্ত। উহা সদ্ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ডি. ভি. সি.-র মৎস্যচাষ বিভাগ স্থাপিত হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মৎস্যচাষ বিভাগ এই বিভাগটি ইজারা লইয়াছেন।

দামোদর উপত্যকায় ডি. ভি. সি.-র প্রতিটি কেন্দ্রকে ঘিরিয়া একটি করিয়া জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ডি. ভি. সি. প্রধান প্রধান জনপদগুলিতে হাসপাতাল, সমাজকল্যাণ-কেন্দ্র ও প্রায় সর্বত্রই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

উপত্যকার নানা স্থানে পর্যটকদের সুবিধার জন্য বাসগৃহস্থাপনা, স্থানে স্থানে মনোরম উদ্যানের সৃষ্টি ও নৌকাবিহারের ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্যাবলীও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক ভ্রমণকারী ও শিক্ষার্থীর দল ডি. ভি. সি.-র বিভিন্ন কেন্দ্রে আসেন।

১৯৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ডি. ভি. সি.তে বিভিন্ন কারিগরি

কাজে প্রায় ৩৪০০ ও প্রশাসনিক কাজে প্রায় ৪৭০০ নিয়মিত কর্মী নিযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়মিত কর্মীর সংখ্যা প্রায় ১১০০০ ছিল।

১৯৬৫-৬৬ আর্থিক বৎসর পর্যন্ত ডি. ভি. সি.-র বিভিন্ন কার্যে ইহার তিন অংশীদার—কেন্দ্র, পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার সরকার মোট ২০১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ঐ সময় পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে মোট ৯ কোটি ৫২ লক্ষ ১০ হাজার ডলার মূল্যের বৈদেশিক সাহায্য বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োজিত হইয়াছে।

অমিতা রায়

দামোদরগুপ্ত ভট্ট দামোদরগুপ্ত প্রসিদ্ধ কবি। ইনি খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। কাশ্মীরের কর্কোটবংশীয় নৃপতি জয়াপীড় বিনয়াদিত্যের রাজত্বকালে (৭৭৯-৮১৩ খ্রী) ইনি তাঁহার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ইনি আর্যা ছন্দে ‘কুট্টনীমতম্’-নামক প্রসিদ্ধ কাব্যের রচয়িতা। এই কাব্যটিকে হেমচন্দ্র ‘নিদর্শন’ কাব্য বলিয়াছেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের বৈশিক অধিকরণটি প্রায় সম্পূর্ণই এই কাব্যের দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে শাস্ত্রকাব্যও বলা চলে। এই কাব্যে কবি বহুশাস্ত্রগত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ‘সুভাষিতাবলী’, ‘শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি’, ‘কাব্যপ্রকাশ’, ‘পঞ্চতন্ত্র’, ‘কবিকণ্ঠাভরণ’, ‘কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়’, ‘দুর্ঘটবৃত্তি’, ‘মঙ্খ-কোষ-টীকা’, ‘অলংকার-সর্বস্ব’ প্রভৃতি গ্রন্থে দামোদরগুপ্তের বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, তিনি আরও দুই-একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে।

দ্র ত্রিদিবনাথ রায়-সম্পাদিত, কুট্টনীমতম্, কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

ত্রিদিবনাথ রায়

দামোদর মিশ্র সংগীততত্ত্বজ্ঞ ও পণ্ডিত। ইনি ১৮শ শতকের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। ‘সংগীতদর্পণ’ গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবেই ইঁহার প্রসিদ্ধি। ইনি কোন প্রদেশের লোক ছিলেন সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে; একটি মত এই যে, দামোদর মিশ্র যশোহর অঞ্চলনিবাসী বাঙ্গালী ছিলেন।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭) ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমি ছিল শান্তিপুর। সাহিত্যসেবাতেই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসের উপসংহার ‘মৃন্ময়ী’ (১৮৭৪) রচনা করিয়াই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে তিনি ‘বিমলা’ (১৮৭৭), ‘দুই ভগ্নী’ (১৮৮১), ‘মা ও মেয়ে’ (১৮৮৪), ‘যোগেশ্বরী’ (১৮৯৮), ‘শান্তি’, ‘সোনার কমল’ (১৯০১), ‘নবাব-নন্দিনী’ (‘দুর্গেশনন্দিনী’র উপসংহার, ১৯০১), ‘অন্নপূর্ণা’ (১৯০২), ‘সপত্নী’ (১৯০৪), ‘ললিতমোহন’ (১৯০৫) প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেন। ইংরেজী উপন্যাসের বাংলা অনুবাদেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি স্যর ওয়াল্টার স্কটের ‘ব্রাইড অফ লামের মুর’ অবলম্বনে ‘কমল-কুমারী’ (১৮৮৪) ও উইল্কি কলিন্সের ‘ওয়ম্যান ইন্ হোয়াইট’ অবলম্বনে তিন খণ্ডে ‘শুক্লবসনা সুন্দরী’ (১৮৮৫-৯০) উপন্যাস রচনা করেন। দামোদরের উপন্যাসে অতিনাটকীয়তা ও রোমান্সের আতিশয্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার ১৫টি টীকাসমন্বিত ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’র বিস্তৃত অনুবাদ (১৮৯৩) স্মরণীয় রচনা। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ‘প্রবাহ’-নামক একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ‘অনুসন্ধান’নামক অনুসন্ধান সমিতির পাক্ষিক মুখপত্রের ৭ম খণ্ড (১৩০০ বঙ্গাব্দ) তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ‘নিউজ অফ দি ডে’-নামক একখানি ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রও তিনি কিছু কাল সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৮৫, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ; সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

রথীন্দ্রনাথ রায়

দায়ভাগ হিন্দু আইন দ্র

দারভাঙ্গা বিহারের উত্তরাংশের একটি জেলা ও শহর। ইহা ২৫°২৮′ হইতে ২৬°৪০′ উত্তর এবং ৮৫°৩১′ হইতে ৮৬°৪৪′ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জেলার উত্তর সীমায় নেপাল রাষ্ট্র, পূর্ব দিকে সহর্ষ জেলা, পশ্চিমে মজঃফরপুর জেলা, দক্ষিণ-পূর্বে মুঙ্গের জেলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা নদী ও পাটনা জেলা সীমানা নির্ধারণ করিতেছে।

জেলার প্রধান শহর দারভাঙ্গার নামানুসারে এই

জেলার নাম করা হইয়াছে। স্থানীয় পণ্ডিতদের মতে, 'দ্বার-বাঙ্গালা' বা 'দ্বার-ই-বংগল' অর্থাৎ 'বাংলার দ্বার' এই শব্দ হইতে দারভাঙ্গা নাম হইয়াছে। অনেকের মতে, মুসলমান যুগে 'দারভাঙ্গি খাঁ'নামক এক ব্যক্তি দারভাঙ্গা শহরের পত্তন করেন। তাঁহার নামানুসারে এই জেলার নাম হইয়াছে দারভাঙ্গা। পূর্বে দারভাঙ্গা তিরহুত জেলার অংশ ছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিরহুতের অধিকাংশ লইয়া দারভাঙ্গা জেলা গঠিত হয়।

দারভাঙ্গা জেলার বর্তমান আয়তন ৮৬৮৯ বর্গ-কিলোমিটার (৩৩৫৫ বর্গমাইল)। দারভাঙ্গা জেলা সমস্তিপুর, দারভাঙ্গা, মধুবনী এই তিনটি মহকুমায় বিভক্ত। ইহার মোট গ্রামের সংখ্যা ৩০১০টি এবং শহরের সংখ্যা ৬টি।

সমস্ত দারভাঙ্গা জেলাটি পলিমাটির দ্বারা গঠিত বৃহৎ সমভূমি। ভূমির ঢাল সাধারণতঃ উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে জেলার মধ্য ভাগে ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বহু অগভীর জলাভূমি ও নিম্নভূমির সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রধান নদী হইল—গঙ্গা, বুড়িগণ্ডক, বাগমতী, কারাই, কামলা, তিলযুগ এবং কুশী। গঙ্গা নদী দারভাঙ্গা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দিয়া ও কুশী এই জেলার পূর্ব প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত। বুড়িগণ্ডক ছাড়া সমস্ত নদীই কুশী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীগুলি জেলার পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বহু শাখাপ্রশাখায় বিচ্ছিন্ন হইয়া উক্ত অঞ্চলে জালের ন্যায় বিস্তৃত আছে। প্রায় প্রতি বৎসর বর্ষা ঋতুতে এই নদীগুলি জেলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বিধ্বংসী বন্যার সৃষ্টি করে এবং গতিপথ পরিবর্তন করে। বর্তমানে কুশী-প্রকল্পের সাহায্যে বন্যানিয়ন্ত্রণ সম্ভব হইবে।

জেলার জলবায়ু শীতকালে মনোরম। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক ও উষ্ণ। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় প্রায় ১২৭০ মিলিমিটার (৫০ ইঞ্চি)।

লৌকিক প্রবাদ এবং কিংবদন্তি অনুসারে দারভাঙ্গার অনেক গ্রামের নামের সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। কাকরাউল গ্রাম কপিলমুনির, আহিরী অহল্যার ও বিশাউন গ্রাম বিশ্বামিত্রের স্মৃতি বহন করিতেছে। বর্তমান দারভাঙ্গা জেলা প্রাচীন কালে ছিল মিথিলা রাজ্যের কেন্দ্রভূমি ও মৈথিলী সংস্কৃতির জন্মস্থল। মিথিলা রাজ্যের পূর্বনাম ছিল বিদেহ। ইহার সহিত বুদ্ধ ও মহাবীরের নাম সংশ্লিষ্ট। মিথিলার একটি গৌরবময় যুগ হইল পালরাজাদের সময়ে। খ্রীষ্টাব্দ ১১শ শতক হইতে ১৬শ শতক পর্যন্ত মিথিলায় অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। এই যুগেই এই স্থানে প্রখ্যাত বাচস্পতি মিশ্র এবং নৈয়ায়িক উদয়নাচার্যের আবির্ভাব হয়। সুগাউনা বংশীয় রাজাদের কালেও (১৩২৫-১৫২৫ খ্রী) গদাধর, শংকর, পক্ষধর মিশ্র, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বহু পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। মহারাজ শিবসিংহের পর হইতেই মিথিলা সম্পূর্ণভাবে মোগল রাজাদের অধীনে আসে। বকসার-যুদ্ধের (১৭৬৪ খ্রী) পর দারভাঙ্গা ব্রিটিশ-শাসনে আসে।

জেলার প্রধান কৃষিজ দ্রব্য হইল ধান, গম, যব, ভুট্টা, জোয়ার, ছোলা, মসুর প্রভৃতি নানাপ্রকার রবিশস্য, সরিষা, তিল, তিসি, রেড়ী প্রভৃতি তৈলবীজ এবং ইক্ষু, পাট ও তামাক। ইহা ছাড়া এখানে নানাবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। দারভাঙ্গার আম ও লিচু প্রসিদ্ধ। কৃষির উন্নয়নের জন্য এই জেলার পুষায় কেন্দ্রীয় কৃষিগবেষণা-কেন্দ্র, কৃষিবিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। ধোলিতে আঞ্চলিক কৃষিগবেষণাকেন্দ্র অবস্থিত। এছাড়া অনেক স্থানে গবাদি পশু চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। শিল্পোন্নয়নক্ষেত্রে এই জেলা বেশি অগ্রসর নহে। পূর্বে এ অঞ্চল নীলচাষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। জেলায় ২টি পাটকল, ৫টি চিনির কল, ২টি কাগজকল আছে। কুটির-শিল্পের মধ্যে তাঁতশিল্প, মাদুরশিল্প ও চীনামাটির বাসন-শিল্পের প্রাধান্য দেখা যায়। ইহা ছাড়া সমগ্র জেলায় প্রচুর ঘি উৎপন্ন হয়।

জেলায় মোট পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য ৮৭০ কিলোমিটার (৫৪১ মাইল)। কাঁচা রাস্তা হইল ৪৮০০ কিলোমিটার (৩০০০ মাইল)। দারভাঙ্গা জেলার রেলপথগুলি উত্তর-পূর্ব রেলপথের অন্তর্গত। রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ২৩৫ কিলোমিটার (১৪৬ মাইল)।

শিক্ষিতের সংখ্যা এই জেলায় শতকরা ১৮ জন। এই জেলায় বহু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩টি উচ্চ মাধ্যমিক ও ১টি বহুমুখী বিদ্যালয় আছে। কলেজে বুনিয়াদী শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। সংস্কৃত-শিক্ষা প্রসারের জন্য দারভাঙ্গা শহরে সংস্কৃতবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই জেলায় ৯৮টি টোলও আছে। স্নাতকো-ত্তরশ্রেণীতে সংস্কৃত ভাষার গবেষণার জন্য মিথিলা গবেষণা সংস্থা (মিথিলা রিসার্চ ইনষ্টিটিউট) স্থাপিত হইয়াছে। দারভাঙ্গা শহরে একটি মেডিকেল কলেজ আছে।

এই জেলায় মোট ১৭টি সরকারি হাসপাতাল, ৩টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১টি যক্ষ্মাচিকিৎসালয় এবং ১টি কুষ্ঠচিকিৎসা-কেন্দ্র আছে।

এখানকার কৃষিজীবীর মধ্যে শতকরা ৬০ জনই ভূমিহীন। সেজন্য এখান হইতে বহুসংখ্যক লোক

জীবিকার অন্বেষণে বিহার ও বাংলার শহর ও শিল্পাঞ্চলে চলিয়া যায়।

জেলার প্রধান শহর দারভাঙ্গা (২৬°১০´ উত্তর, ৮৫°৫৫´ পূর্ব) বাগমতী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার মোট আয়তন ১৮ বর্গকিলোমিটার (৭ বর্গমাইল)। ইহার লোকসংখ্যা ১০৩১০৬ জন (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার)। ইহা পাকা রাস্তা এবং রেলপথের দ্বারা বিহার ও অন্যান্য শহরের সহিত সংযুক্ত। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই শহরে পৌরসভা গঠিত হয়। এখানে ৩টি কলেজ, ১টি মেডিকেল কলেজ, ১টি হোমিওপ্যাথিক এবং ১টি আয়ুর্বেদিক কলেজ, মিথিলা গবেষণাকেন্দ্র, সংস্কৃতবিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিদ্যালয় আছে। দারভাঙ্গায় গঙ্গাসাগর, হরসি প্রভৃতি ঐতিহাসিকযুগের পুষ্করিণী আছে। অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু হইল মহারাজার প্রাসাদ এবং তৎসংলগ্ন যাদুঘর। দারভাঙ্গার মহারাজা প্রচুর ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন। পূর্ব ভারতের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং দারভাঙ্গা জেলায় উচ্চ শিক্ষার প্রসারের জন্য মহারাজাদের দান সর্বজনবিদিত।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XI. Oxford, 1908; P. C. Roy Choudhury, *Darbhanga District Gazetteer*, Patna, 1964.

মৃগেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ

দারা শিকোহ্ (১৬১৫-৫৯ খ্রী) মোগল সম্রাট শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা আজমীরে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন।

যথাসময়ে তিনি মোগল রাজকুমারদের উপযোগী শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল সুন্দর। তিনি গতানুগতিক শিক্ষা পাইয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, সারা জীবন তিনি নূতন নূতন বিষয়, বিশেষ করিয়া নানা ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পরভেজের কন্যা করিম উন্নেসার (নাদিরার) সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বৎসরের অক্টোবর মাসে তিনি বারহাজারি মন্‌সব্‌দার হইলেন; ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনেক পদোন্নতি হয় এবং এক সময়ে তিনি ষাটহাজারি মন্‌সব্‌দারও হইয়াছিলেন। এলাহাবাদ, পাঞ্জাব, গুজরাত, মুলতান ও কাবুল এবং বিহারের প্রদেশপালের পদও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ ঐসব প্রদেশে না গিয়া তিনি সম্রাটের মনোনীত কর্মচারীর দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। শাহ্‌জাহান তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিতেই ভালবাসিতেন। ফলে দারা দক্ষ সেনানায়ক বা নিপুণ রাজনীতিক হইতে পারেন নাই।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাট শাহ্‌জাহান রোগাক্রান্ত হন। তখন তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারী দারার উপরে সম্রাটের নামে শাসনকার্য পরিচালনা করার ভার অর্পিত হয়। সিংহাসনের জন্য চারি ভ্রাতা— দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় তাহাতে ঔরঙ্গজেব বিজয়ী হন। আগ্রা দুর্গের ৮ মাইল পূর্ব দিকে সামুগড় নামক স্থানে দারা ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট পরাস্ত হন এবং ঔরঙ্গজেব আগ্রা দুর্গ অধিকার করেন (১৬৫৮ খ্রী)।

পরবর্তী বৎসর দারা আবার আজমীরের ৭ কিলোমিটার (৪½ মাইল) দক্ষিণে দেওরাই-গিরিবর্ত্মে ঔরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত এবং ভারতত্যাগের পথে বোলান গিরিবর্ত্মের ১৪½ কিলোমিটার (৯ মাইল) দূরে দদর-নামক স্থানে ধৃত হইয়া বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে নীত হন। সেখানে প্রকাশ্য রাজপথে তাঁহাকে অপমানিত করার পরে ধর্মদ্রোহিতার অজুহাতে তাঁহাকে হত্যা করা হয় (৯ সেপ্টেম্বর, ১৬৫৯ খ্রী)।

রাজমুকুট দারার ভাগ্যে ছিল না। দারা ছিলেন সমসাময়িক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে এবং সম্রাট আকবরের ন্যায় উদার। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সহায়তায় তিনি ভগবদ্‌গীতা ও উপনিষদ্ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ও সুফী ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার ভাল জ্ঞান ছিল এবং তিনি নিজেও কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মুসলমান ধর্ম তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। রাজমুকুটের অধিকারী না হইলেও চরিত্রমাধুর্য, বিদ্যাবত্তা, উদারতা ও ধর্মানুরাগ প্রভৃতির জন্য ভারতের ইতিহাসে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে।

দ্র Jadunath Sarkar, *History of Aurangzib*, vols. I-IV, Calcutta, 1912-24; Banarashi Prasad, *History of Shah Jahan of Delhi*, Allahabad, 1932; K.R. Quanungo, *Dara Sukoh*, Calcutta, 1935; Bikram Jit Hasrat, *Dara Shikuh : Life and Works*, Santiniketan, 1953.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

দার্জিলিঙ পশ্চিম বঙ্গের একটি জেলা, মহকুমা ও শহর। জেলাটি ২৬°৩১´ হইতে ২৭°১৩´ উত্তর ও ৮৭°৫৯´ হইতে ৮৮°৫৩´ পূর্বে পশ্চিম বঙ্গের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। ইহার উত্তরে সিকিম, দক্ষিণে বিহার ও পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে ভূটান এবং দক্ষিণ-পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলা। দার্জিলিঙ সদর, কালিম্পং, কার্শিয়াং ও শিলিগুড়ি—এই চারিটি জেলার মহকুমা। দার্জিলিঙ জেলার আয়তন ৩০০০ বর্গকিলোমিটার।

ভূপ্রকৃতি অনুসারে দার্জিলিঙ জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তরে হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত পার্বত্য অঞ্চল; ইহা জেলার অধিকাংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত এবং দক্ষিণে গভীর অরণ্যপূর্ণ তরাই অঞ্চল ('তরাই' দ্র)। উত্তরাঞ্চল নানা গভীর সঙ্কীর্ণ নদীখাতে পূর্ণ ও তাহার পর্বতশ্রেণী নিবিড় অরণ্যাবৃত। হিমালয় পর্বতের একটি অংশ সিঙ্গালিলা পর্বতশ্রেণী জেলার পশ্চিম সীমান্ত দিয়া দক্ষিণে প্রলম্বিত হইয়া গিয়াছে। উচ্চতার আকস্মিক উত্থান দার্জিলিঙ জেলার একটি বৈশিষ্ট্য। সিঙ্গালিলা পর্বতশ্রেণীর সন্দক-ফো প্রায় ৩৬০০ মিটার উচ্চ। নেপাল সীমান্তে মানে-ভঞ্জঙের নিকট এই অঞ্চলের উচ্চতা ৭৮০০ মিটার। দক্ষিণে দার্জিলিঙের গড় উচ্চতা মাত্র ৯০ মিটার। সিঙ্গালিলার আর একটি উচ্চ শৃঙ্গ ফালুটও উল্লেখযোগ্য।

এই জেলার উত্তর ভাগ কেলাসিত শিলা ও দক্ষিণ ভাগ স্তরীভূত শিলার দ্বারা গঠিত।

কেলাসিত অভ্র-সিস্ট অঞ্চলের মধ্যে মধ্যে নীস শিলা অনুপ্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ নীস শিলা ডালিং সিরিজ বা দার্জিলিঙ নীস নামে পরিচিত। অন্যান্য শিলার মধ্যে গণ্ডোয়ানা যুগের শিলা, শেল পাথর ও বেলে পাথর উল্লেখযোগ্য। জেলার পর্বতমালার অভ্যুত্থান হইয়াছিল টার্শিয়ারি যুগে। দার্জিলিঙে পর্বতভূমি যেখানে অপেক্ষাকৃত কোমল সেইখানে বর্ষার সময়ে ও বর্ষার পরে বেশি প্রস্তরচ্যুতি ঘটিয়া থাকে।

দার্জিলিঙ জেলার নদীগুলির মধ্যে তিস্তা, মহানন্দা বালাসন, মেচী ও জলঢাকা প্রধান। তিস্তার কয়েকটি প্রধান উপনদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

উচ্চতা ও পার্বত্য ঢালের পার্থক্যের জন্য দার্জিলিঙের জলবায়ু নিকটবর্তী শহর কার্শিয়াং ও কালিম্পং-এর জলবায়ু হইতে স্বতন্ত্র। কালিম্পং-এ বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২১৯০ মিলিমিটার, কিন্তু দার্জিলিঙ শহরে বৃষ্টি হইয়া থাকে ৩১৫০ মিলিমিটার ও কার্শিয়াং-এ হয় ৪০০০ মিলিমিটার। মার্চ হইতে জুন পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির প্রবণতা থাকে। বেশির ভাগ বৃষ্টি হয় জুন ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে। মে ও অক্টোবরেও বেশ বৃষ্টি হইয়া থাকে। দার্জিলিঙ শহরের বাৎসরিক সর্বোচ্চ গড় তাপ ১৬·৬° সেন্টিগ্রেড ও সর্বনিম্ন গড় তাপ ১০·২° সেন্টিগ্রেড। প্রতি বৎসর দার্জিলিঙের তাপমাত্রা কয়েক দিন হিমাঙ্কের নিম্নে থাকে।

দার্জিলিঙ পূর্বে সিকিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৩৫ সালে স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করিবার পরিকল্পনায় তৎকালীন ইংরেজ সরকার সিকিমরাজের নিকট হইতে দার্জিলিঙ ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি পাহাড় বাৎসরিক ৩০০০ টাকা খাজনায় গ্রহণ করেন এবং পরে উহা আরও বর্ধিত হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন ইংরেজকে অন্যায়ভাবে বন্দী করার অপরাধে খাজনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে ইংরেজ ও সিকিমরাজের মধ্যে যুদ্ধ বাধে এবং ইরেজগণ তরাই অঞ্চল অধিকার করিয়া লয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূটান-যুদ্ধের ফলে তিস্তার পূর্বে প্রায় ১২১৫ বর্গকিলোমিটার ভূমি অধিকৃত হয়।

দার্জিলিঙ জেলার মত এরূপ অল্প পরিসরে এত প্রকারের বৃক্ষের সমারোহ পৃথিবীর খুব কম স্থানেই আছে। ইহা মূল্যবান কাষ্ঠ ও ভেষজ সম্পদে পূর্ণ।

এই জেলা কয়লা, গ্রাফাইট, লৌহ ও তাম্র প্রভৃতি খনিজ সম্পদেও পূর্ণ; কিন্তু এখন কয়লা ব্যতীত কোনও খনিজ সম্পদ কার্যকরী হয় নাই। পানখাবাড়ি হইতে ডালিংকোট পর্যন্ত স্থানে কয়লা পাওয়া যায়; কিন্তু উহা গুঁড়া অবস্থায় থাকে। নাগরাকোট কয়লাখনি হইতে প্রধানতঃ কয়লা উত্তোলন করা হয়।

কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে আলু ও এলাচের বিশেষ স্থান আছে। নানাবিধ সবজি ও ফল এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে কমলালেবু সর্বত্র পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া আনারস, লিচু ও নাশপাতি প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। খাদ্য শস্যের মধ্যে ধান, গম, যব ও ভুট্টা উৎপন্ন হয়। পর্বতের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে ধান ও পার্বত্য অঞ্চলে ভুট্টাই প্রধান। এখানে খামার-চাষের মধ্যে চায়ের চাষ প্রধান। সুগন্ধিযুক্ত চায়ের জন্য এখানকার খ্যাতি আছে। উপত্যকা ও পাহাড়ের ঢালু অংশে বহু চায়ের বাগান আছে। চায়ের পর সিঙ্কোনার খামার উল্লেখযোগ্য।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সিঙ্কোনার চাষ হয়। বর্তমানে জেলার মংপু, মানসং, রঙ্গো ও লাতপানচর এই চারিটি স্থানে সিঙ্কোনার চাষ হয়। ইহা ছাড়া এখানে ডিজিটালিস ও 'রাওয়ালফিয়া সার্পেন্‌তিনা' প্রভৃতি উদ্ভিদের প্রচুর চাষ হয়।

দার্জিলিঙে জমির ব্যবহারের দিক দিয়া দেখা যায় সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ ১০৯২·৫ বর্গকিলোমিটার, চায়ের খামারভূমির পরিমাণ ২৪৭·৫ বর্গকিলোমিটার, ৯২ বর্গকিলোমিটার সিঙ্কোনার এবং অন্য কৃষিজমির পরিমাণ ৮০ বর্গকিলোমিটার। এখানে শিল্পের মধ্যে চা শিল্পই প্রধান। পশম, বস্ত্র প্রভৃতি কিছু কিছু কুটির-শিল্পের প্রচলন আছে। কুটির-শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কালিম্পং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলের নাম উল্লেখযোগ্য। বস্ত্রের জন্য কালিম্পং এবং কুকরীর জন্য ঘুম বিখ্যাত। কাঠকয়লার

উৎপাদনও আর একটি প্রধান শিল্প। শিলিগুড়ি কাষ্ঠ-শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র। কালিম্পং-এ মৌমাছির চাষ ও সংরক্ষণের একটি কেন্দ্র আছে।

দেশবিভাগের পর কলিকাতার সহিত দার্জিলিঙের সহজ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। 'আসাম রেল লিংক'-পরিকল্পনা রূপায়িত হইলে পুনরায় সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। মালদহের মধ্য দিয়া নতুন ব্রডগেজ লাইন খোলার পর ফরাক্কা হইয়া যাতায়াতের আর একটি বন্দোবস্ত হইয়াছে। শিলিগুড়ির নিকটবর্তী বাগডোগরা উত্তর বঙ্গের বৃহত্তম বিমানবন্দর। এই জেলার মধ্য দিয়া ৩১সংখ্যক জাতীয় সড়ক চলিয়া গিয়াছে। এই জেলায় দুইটি প্রধান রোপওয়ে আছে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত কালিম্পং রোপওয়ে কোম্পানীর রোপওয়ে কালিম্পং ও রিল্লীর যোগসাধন করে। দার্জিলিঙ-বিজনবাড়ি রোপওয়ে ১৯৩৯ সালে স্থাপিত হয়।

দার্জিলিঙে বহুপ্রকার জাতি বাস করে। আদিম অধিবাসী লেপচাগণ পূর্বে সিকিমের অধিবাসী ছিল। বর্তমানে নেপালীরা প্রধান। ইহাদের মধ্যে গুর্খা, গুরুং, নেওয়ার ও রাই প্রভৃতি জাতি আছে। পর্বত-আরোহণে এখানকার শেরপা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া এখানে ভুটিয়া, সাঁওতাল ও ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্যের লোকই কম-বেশি বাস করে। ১৯৬১ সালে দার্জিলিঙের জনসংখ্যা ৬২৪৬৪০ জন ছিল। দার্জিলিঙ জেলায় চারিটি শহর—শিলিগুড়ি, দার্জিলিঙ, কালিম্পং ও কার্শিয়াং। ১৯৫১-৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শিলিগুড়ি শহরের জনসংখ্যা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। শিলিগুড়ি শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি+৩২৯৯৯ ঐ সময়ে দার্জিলিঙ-এর বৃদ্ধি+৭০৪৬।

দার্জিলিঙ জেলার সদর শহর দার্জিলিঙ (২৭°৩´ উত্তর ও ৮৮°১৬´ পূর্ব) কলিকাতা হইতে ৬৬১ কিলোমিটার এবং শিলিগুড়ি হইতে ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ইহা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গ্রীষ্মাবাস। মূল শহর এবং কাটাপাহাড় ও লেবঙ-এর সেনানিবেশ লইয়া ইহার আয়তন প্রায় ১০ বর্গকিলোমিটার। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পৌরশাসনের অধীনে আসে।

সিঙ্গালিলা শৈলমালার একটি প্রলম্বিত অংশের উপর দার্জিলিঙ শহরটি অর্ধবৃত্তাকারে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। শহরের সর্বাপেক্ষা উচ্চ অংশ কাটাপাহাড় (২৩৬৫ মিটার)। শহরের মধ্য স্থলে অবশিষ্ট অব্জারভেটারি হিল নামক পাহাড়টিও বেশ উচ্চ। কিংবদন্তী আছে, এই পাহাড়ের উপরে দুর্জয়লিঙ্গ নামে মহাদেবের এক মন্দির ছিল এবং দার্জিলিঙ নামের উৎপত্তি সেই দুর্জয়লিঙ্গ হইতেই হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

১৯৬১ সালে শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৪০৬৫১ জন। অধিবাসীদের মধ্যে নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা ও বাঙালী প্রধান।

দার্জিলিঙে অনেক মিশনারী স্কুল আছে। ইহা ছাড়া সরকার-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ও আছে। বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য ১টি ও ছেলেদের জন্য ১টি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। অব্জারভেটারি হিলে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট নামে একটি পর্বত-আরোহণ-বিদ্যার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। শহরে বহু স্বাস্থ্যনিবাস ও হোটেল আছে। হোটেল পরিচালনা এখানকার বড় ব্যবসা।

দার্জিলিঙ শহর হইতে ৭৩ কিলোমিটার দূরে তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য পর্বতশ্রেণী অতি সুন্দরভাবে দেখা যায়। শহর হইতে ৯ কিলোমিটার দূরে টাইগার হিল হইতে এভারেস্টের উপর সূর্যোদয়ের দৃশ্য অতি অপরূপ। দার্জিলিঙের বোটানিক্যাল গার্ডেন বিখ্যাত। ইহা ছাড়া শহর ও শহরের নিকটে বার্চ হিল, সিঞ্চল লেক, ম্যাল, বাতাসিয়া লুপ, ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতও দর্শনীয় স্থান। তিব্বতী ও বৌদ্ধদের বহু মন্দির ও মঠ দার্জিলিঙ শহরে ও ঘুমে আছে।

জেলার নানাবিধ মেলা ও উৎসবের মধ্যে তিস্তা ও রংগীতের সঙ্গমে মকর-সংক্রান্তির মেলা, তিস্তা বাজারের নিকট বেণী মেলা, কৃষি-উৎসব উপলক্ষে পেডং মেলা ও দলাই লামার জন্মোৎসব প্রধান।

দ্র A. Mitra, *Census 1951*, *District Handbook : Darjeeling*, Alipore, 1954 ; Govt. of West Bengal, State Statistical Bureau, *Statistical Abstract, West Bengal, 1961*, Alipore, 1968.

তরুণবিকাশ লাহিড়ী

দালই লামা, দলাই লামা তিব্বতের গে-লুগ-পা-সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু। তিনি খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকে এই বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন। তা-লই শব্দটি মোঙ্গলীয়, ইহার অর্থ সাগর। তালই শব্দটি সাধারণতঃ দালইরূপে উচ্চারিত। লা-মা শব্দটি তিব্বতী, ইহার অর্থ গুরু। সামগ্রিকভাবে এই শব্দের অর্থ সাগরোপম শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রধান ধর্মগুরু। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকে যখন মধ্য তিব্বতে ফা-মোড়ু সামন্তপরিবার ও চাঙ্ প্রদেশের রাজশক্তি চীনের উদীয়মান মাঞ্চুরাজবংশের সম্রাটের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ এবং কুবলাই খাঁর মৃত্যুর পর মোঙ্গলশক্তি সেখানে ক্ষীয়মাণ হয়, সেই সময়ে তিব্বতের উন্নতিশীল গে-লুগ-পা-

সম্প্রদায়কে বশ করিয়া ধর্মনিষ্ঠ তিব্বতের উপর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার আশায় মোঙ্গলসম্রাট অল্‌তাই খান ডেপুন মঠের প্রধান লা-মাকে এই বিশেষ সম্মান দান করেন। তদবধি গে-লুগ-পা-সম্প্রদায়ের প্রধান লামা পরম্পরাক্রমে এই উপাধিতে ভূষিত হইয়া আসিতেছেন। এক তালই লামার দেহান্তরপ্রাপ্তির পর বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহারই অবতার হিসাবে নির্ধারিত ব্যক্তি পরবর্তী তালই লামা নিরূপিত হন। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকে ৫ম তালই লামার সময় হইতে তিব্বতের রাজশক্তির অধিকারও তালই লামার উপর আসিয়া পড়ে।

সুনীতিকুমার পাঠক

দালই লামা অবলোকিতেশ্বরের অবতার। তিনি গে-লুগ-পাদের (পীত দল) প্রধান এবং তিব্বতের পার্থিব নেতা। প্রথম অবতার হন প্রায় ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমান দালই লামা (১৯৩৫ খ্রী) ১৪শ অবতার। ইহার নাম তেন্‌জিন গাৎসো (বস্‌তন-জিন-গ্যাম্‌ৎসো)। ইহার অর্থ আগমধর সাগর। দালই লামা ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিব্বত ত্যাগ করেন এবং ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দালই শব্দটি মোঙ্গলীয় ; ইহার অর্থ মহাসমুদ্র। 'লামা' দ্র।

নির্মলচন্দ্র সিংহ

দাশরথি রায়, দাশু রায় (১৮০৬-৫৭ খ্রী) বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার বাঁধমুড়া গ্রামে দাশরথি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। বাল্যকালে দাশরথি পীলা গ্রামে মাতুলালয়ে থাকিয়া পড়াশুনা করেন এবং উত্তর কালে পীলা গ্রামেই বাস্তু নির্মাণ করিয়াছিলেন। পদ্যরচনায় তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। তখন কবিগানের স্বর্ণযুগ। আত্মীয়বর্গের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও দাশরথি আকা বাঈর (অক্ষয় কাটানী) কবির দলে যোগদান করেন। কিন্তু এক কবির লড়াইয়ের আসরে প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষোত্তম দাস বৈরাগ্য তাঁহাকে জাত-কুল তুলিয়া গালাগালি দিলে অপমানে দাশরথি কবির দল ত্যাগ করিয়া ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচালীর আখড়া স্থাপন করেন। কবিগানের ঝাঁঝালো ছড়া ও চাপান-উতোর ভঙ্গী যোগ করিয়া দাশরথি পাঁচালীর নববিন্যাস করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজের উচ্চ প্রশংসায় তাঁহার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হয় এবং অবিলম্বে তিনি শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকাররূপে খ্যাত ও প্রভূত অর্থের অধিকারী হন। ১২৬৪ বঙ্গাব্দের ২ কার্তিক দাশরথির মৃত্যু হয়। গানের সংগ্রহ বাদে দাশরথি ৬৮টি পালা রচনা করিয়াছিলেন এবং দশ খণ্ডে তাহা প্রকাশিতও হইয়াছিল। ৺হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৬৪টি পালার একটি বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দাশরথির পূর্ণাঙ্গ রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্র চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত, কাটোয়া, ১২৮০ বঙ্গাব্দ ; হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা, ১৩১১ বঙ্গাব্দ ; রমানাথ মুখোপাধ্যায়, 'দাশরথি রায়', আর্যাবর্ত, শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ ; হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, কলিকাতা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ ; হরিপদ চক্রবর্তী, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, কলিকাতা, ১৯৬২।

হরিপদ চক্রবর্তী

দাস[১] অনার্যজাতি। দাস ও দস্যু, উভয় শব্দই দস্‌ ধাতু (অর্থ ধ্বংস করা) হইতে উৎপন্ন। বৈদিক সাহিত্যে দাস ও দস্যুরা আর্যদের শত্রু বলিয়া বর্ণিত। দাসেরা সুরক্ষিত আয়সী পুরে অর্থাৎ দুর্গপুরীতে বাস করিত। তাহারা বিশে (গোষ্ঠীতে) বিভক্ত ছিল। তাহারা কৃষ্ণত্বচ (কৃষ্ণচর্ম), অনাস, মৃধ্রবাচ্‌ (দুষ্টভাষী)। বেদে ইলিবিশ, শম্বর, বর্চিন প্রভৃতি দাস রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় ; তাঁহারা প্রভূত ধনশালী ছিলেন। কিরাত, কীকট, চণ্ডাল প্রভৃতি দাসেরা গাঙ্গেয় উপত্যকায় বাস করিত। অনেক পণ্ডিত বৈদিক দাস ও ইরানীয় দাহ এক বলিয়া মনে করেন। কখনও কখনও অসুর বলিয়া অভিহিত হইলেও বেদে তাহারা মানুষ বলিয়াই গণ্য।

দস্যুরা বেদে অকর্মন্‌ (ক্রিয়াকাণ্ডহীন), অযজ্বন্‌ (যজ্ঞহীন), দেবপীয়ু (দেবনিন্দুক), অন্যব্রত (অনাচারী), ইত্যাদি শব্দে উল্লিখিত। তাহাদের বিশে বিভক্ত হওয়ার কোনও উল্লেখ নাই। ঋগ্‌বেদে দাস শব্দের চেয়ে দস্যু শব্দটি অধিকতর নিন্দাসূচক। দস্যুরা মানুষ নয়, অসুর ; কিন্তু বেদে দস্যুদের এমন বর্ণনাও আছে যাহা পড়িলে মনে হয়, তাহারাও মানবিক শত্রু। মোটের উপর ঋগ্‌বেদের গাথাকারগণ দাস ও দস্যুর মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ করিতেন না। কখনও কখনও একই ব্যক্তিকে দাস ও দস্যু দুইই বলা হইয়াছে। জিমার (Zimmer) ও মায়ার (Meyer) মনে করেন, প্রথমে দস্যুর (এবং দাসের) অর্থ ছিল 'শত্রু' ; পরে ইরানে শত্রু হইয়া ওঠে 'শত্রু দেশ' এবং ভারতে শত্রুর অর্থ দাঁড়ায় আসুরিক শত্রু। পরবর্তী কালে দাস বলিতে বুঝাইত ক্রীতদাস

(Slave)। সম্ভবতঃ শত্রু অনার্যেরা যুদ্ধে বন্দী হইয়া ব্যাপকভাবে দাসকর্মে নিযুক্ত হইত বলিয়া দাস ও ক্রীতদাস সমার্থক হইয়াছিল।

দ্র Dev Raj Chavana: *Slavery in Ancient India*, New Delhi, 1907; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. I, Bombay, 1951.

নীলা দে

দাস২, দাসত্ব কোনও ব্যক্তির উপর সম্পত্তির সমস্ত বা কোনও একটি শর্ত প্রযোজ্য হইলে সে দাস বলিয়া বিবেচ্য হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে দাসত্বের নানা প্রকারভেদ ও মাত্রাভেদ দেখা গিয়াছে। দাসত্বমূলক প্রভুত্ব-বশ্যতা সম্পর্ক এমন হইতে পারে যে, দাসের মালিকই তাহার জীবন-মরণের বিধাতা অথবা উভয়ের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সামাজিক বিধির বা আইনের দ্বারা বিশদভাবে নিয়ন্ত্রিত। প্রভুর এই অধিকার আছে যে, সে বলপূর্বক দাসের শ্রমকে নিজের লাভার্থে উৎপাদন-কার্যে লাগাইতে পারে অথবা স্বীয় পরিচর্যার্থে নিযুক্ত করিতে পারে; ইহাই দাসত্বপ্রথার সার কথা। দাস-শ্রমের প্রয়োগের দিক হইতে দাসত্ব প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর: ব্যবসায়গত দাসত্ব (commercial slavery) ও গার্হস্থ্য দাসত্ব (domestic slavery)। সৈনিক, রাজার দেহরক্ষী, প্রাসাদরক্ষী, রাজদপ্তরের মুনশী ও হিসাবরক্ষক, রাজসভার নর্তক ও গায়ক ইত্যাদিরূপে দাস কাজ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

পৃথিবীতে প্রাচীন যুগেই দাসত্বের উদ্ভব ঘটিয়াছিল; মৃগয়াজীবী মানবসমাজে দাসত্ব দেখা দেয় নাই। তখন যুদ্ধবন্দীদের মারিয়া ফেলা হইত। গোপালক-সমাজেও দাসত্ব বড় একটা দেখা যায় নাই। কৃষি ও শিল্পকর্মের কিছুটা বিকাশের পর সভ্যতার প্রত্যুষকালেই দাসত্বের উদ্ভব। তখনই যুদ্ধবন্দীদের নিহত না করিয়া দাসরূপে তাহাদের শ্রমকে লাভজনক কার্যে নিয়োগ করা সম্ভব ও আবশ্যক হইল। ইহার ফলে উৎপাদনশক্তির বিকাশ ও ধনোৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। একদিকে বলপূর্বক কঠোর কায়িক শ্রমে নিযুক্ত দাস বা ক্রীতদাস এবং অন্যদিকে সর্বপ্রকার কায়িকশ্রম হইতে মুক্ত যোদ্ধা স্বাধীন নাগরিক, ইহারা পরস্পরের অনুপূরক হইল।

প্রাচীন যুগে সুমের, মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে দাসত্বপ্রথা ব্যাপকভাবে চলিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় সহস্রকে ব্যাবিলন-রাজ হাম্মুরাবির অনুশাসনে দাস ও দাসসম্বন্ধীয় বহু নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে। প্রাচীন মিশরে, বিশেষতঃ সম্রাট তৃতীয় থথমোসের কালে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রীসে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল। দাসত্বপ্রথা প্রাকৃতিক বিধান এবং দাসদের পক্ষে মঙ্গলকর, আরিস্তোতলের এই উক্তি সুবিদিত। গ্রীক মনীষী এউরিপিদেস দাসত্বপ্রথার বৈধতা ও যৌক্তিকতাসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন রোমে দাসত্বপ্রথা সুপ্রচলিত ছিল এবং রোমসাম্রাজ্যের যুগে উহা সমাজের ভিত্তিস্বরূপ ছিল বলা যায়। যোদ্ধা রোমীয় নাগরিক তাহার যাবতীয় ব্যক্তিগত বৈষয়িক কর্ম দাসের দ্বারা করাইত এবং ধনোৎপাদনও দাসশ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ভারতবর্ষেও দাসত্বপ্রথা আবহমান কাল হইতেই চলিত ছিল বলা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাপ্ত এবং অন্যান্য প্রমাণ হইতে সিন্ধু-সভ্যতায় দাসত্বপ্রথার বিদ্যমানতা সূচিত হয়। প্রাচীন আর্যসমাজে দাসত্ব সাধারণভাবে প্রচলিত না হইলেও ঋগ্‌বেদের কোথাও কোথাও উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। যজুঃসংহিতায় ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে রাজ-কর্তৃক ঋষিকে দাস উপহার দেওয়ার উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ যুদ্ধবন্দীই দাস হইত। ইহা ব্যতীত দ্যূত-ক্রীড়ার ফলে দাসত্ববরণের উল্লেখ ঋগ্‌বেদে আছে (ঋগ্‌বেদ ১০-৩৪।৪)। দাস কৃষ্ণযোনি, অবজ্ঞাভাজন এবং একান্তরূপে প্রভুর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। দাস বা দাসপুত্রের সোমযজ্ঞের অধিকার ছিল না। মহাভারতে তৎকালীন দাসত্বপ্রথার নিদর্শনস্বরূপ বহু কাহিনী আছে; যথা অম্বিকার দাসীনিয়োগ, দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবদের দাসত্ববরণ ও পরে মুক্তিলাভ, কদ্রু ও বিনতার উপাখ্যান ইত্যাদি। কিন্তু দাসের সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই।

জাতকের গল্পে ও বৌদ্ধ সাহিত্যে দাসত্বপ্রথা ও দাস বিষয়ে বহু উল্লেখ আছে। দাসের প্রতি প্রভুর ব্যবহার, দাসের সামাজিক অধিকার ও বিভিন্ন পর্যায়ের দাসের বিষয় বৌদ্ধ সাহিত্যে আলোচিত হইয়াছে। দাস-দাসী কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রভুর পরিবারভুক্ত গণ্য হইত ও তাহাদের শিক্ষাদান ও তাহাদের উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের উল্লেখ রহিয়াছে। অপরপক্ষে দাসকে তাড়ন, পীড়ন, কারাগারে নিক্ষেপ প্রভৃতি দুর্ব্যবহারেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্মে দাসের সংঘে যোগদানের অধিকার ছিল না; কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসীর সংঘে যোগদান ও অর্হত্বলাভের অনেক উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ

ধর্মের প্রভাবে দাস-দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার ও তাহাদের মুক্তিদান সমাজে স্বীকৃত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকে মহারাজ অশোক দাস-দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। দাসের মূল্য সাধারণতঃ ১০০ কার্ষাপণ হইলেও অল্প মূল্যেও দাস পাওয়া যাইত।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস ভারতে দাসত্বপ্রথা নাই বলিয়াছিলেন; তবে তিনি মৌর্যরাজের দেহরক্ষী নারী-সৈন্যেরা ক্রীতদাসী ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে দাসত্ব ছিল অপেক্ষাকৃত মৃদু ধরনের পরিচর্যামূলক গার্হস্থ্য-দাসত্ব; গ্রীস ও রোমের ন্যায় ভারতে কৃষিকার্যে ও শিল্পকর্মে দাসশ্রম নিযুক্ত হইত না।

কৌটিল্য ৬ প্রকার, মনু ৭ প্রকার এবং নারদ ১৫ প্রকার বিভিন্ন পর্যায়ের দাসের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রধান প্রধান কয়েকটি পর্যায় ছিল এইরূপ: যুদ্ধে প্রাপ্ত, ক্রীত, পণে জিত, গৃহজ, ভক্তদাস (অন্নদাস), ঋণদাস, দণ্ডদাস ইত্যাদি। দাসের সামাজিক বা আইনগত মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না। মীমাংসাসূত্রে জৈমিনি দাসকে হস্তান্তরের অযোগ্য বলিয়াছেন। নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়ন প্রতিলোম-দাসত্বকে অনুচিত ও আইনতঃ দণ্ডার্হ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে দাসকর্মে নিয়োগ বা ব্রাহ্মণীকে দাসীরূপে বিক্রয় অনুচিত বলা হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে দাসের প্রতি যথাযথ ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। অনিচ্ছুক দাসীকে বিক্রয়কারী সচ্ছল প্রভু অথবা দাসীর সম্ভ্রমহানিকারী প্রভু আইনতঃ দণ্ডার্হ ছিল।

কৌটিল্য প্রভুর কার্যের ক্ষতি না করিয়া অর্জিত ধনে, এমন কি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনেও দাসের অধিকার স্বীকার করেন। দাস তাহার সম্পত্তি জ্ঞাতি-বন্ধুকে দান করিতেও পারিত। অপরপক্ষে মনু বলেন, ভার্যা, পুত্র ও দাসের কোন নিজস্ব সম্পত্তি নাই। ক্ষেত্রবিশেষে দাসপুত্রের সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কৌটিল্য গর্ভদাস, স্বয়ংদাস প্রভৃতির মুক্তিক্রয়ের অধিকার স্বীকার করেন। ধর্মশাস্ত্রে সাধারণতঃ দাসের মুক্তিক্রয়ের অধিকার নাই। প্রভুর ইচ্ছায় অথবা প্রভুর জীবনরক্ষাকারী দাস মুক্তিলাভ করিত। মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের নাগরিক-মর্যাদা মনু স্বীকার না করিলেও নারদ তাহার পূর্ণাধিকার স্বীকার করেন।

কোরানে দাসের প্রতি সদয় ব্যবহার বিহিত হইয়াছে এবং দাসমুক্তি পুণ্যকর্ম বলা হইয়াছে। ইসলামীয় অনুশাসনে প্রভুর ঔরসে জাত দাসীপুত্র স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা লাভ করিত ও তাহার মাতাও মুক্তিলাভ করিত। দাস ও তাহার স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করিতে প্রভু আইনতঃ বাধ্য ছিল। যুদ্ধবন্দীরূপে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির, এমন কি রাজপুত্রের দাসত্ববরণও আশ্চর্য ছিল না। মুসলিম ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কুতবুদ্দীন, ইলতুৎমিস, সেনাপতি মালিক কাফুর, বিজাপুর আদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদিলশাহ্‌ প্রথমজীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। মুসলমান সমাজে দাস ও প্রভুর মধ্যে সামাজিক ব্যবধান দুস্তর ছিল না। মুক্তিপ্রাপ্ত দাস প্রভুকন্যাকে বিবাহ করিয়া প্রভুর সম্পত্তি লাভ করিতে পারিত। দাসকে শিক্ষাদান ও উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিয়োগ করা হইত। ফিরুজ তুঘলকের ৮০০০০ দাস ছিল, এই বিশাল দাসসংঘের পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল।

মধ্যযুগের ভূমিদাসত্ব কার্যতঃ দাসত্ব ছিল। উহার অবসানের পরে অগ্রসর ইওরোপীয় জাতিগুলি ঔপনিবেশিক দাসত্ব আরম্ভ করিল। জাতিসমূহের মধ্যে স্পেন তাহার উপনিবেশগুলিতে প্রথম দাস-ব্যবসায় শুরু করে। ইংরেজ ব্যবসায়ীগণও আফ্রিকার গ্রামে আগুন লাগাইয়া পলায়নপর অধিবাসীদিগকে ধরিয়া ইওরোপীয় উপনিবেশ-গুলিতে চালান দিত। প্রধানতঃ বাগিচাশিল্পেই নিগ্রো দাসেরা নিযুক্ত হইত। ইংল্যাণ্ডে অ্যাডাম স্মিথ, ব্যাক্সটার, জনসন, ক্লহাম, মেকলে, কুপার এবং আরও বহু গুণী ব্যক্তি এবং কোয়েকরি ধর্ম-সম্প্রদায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। দাসত্ববিরোধী আন্দোলনের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন উইলিয়াম উইলবারফোর্স। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ও ইংরেজ-উপনিবেশগুলিতে দাস-ব্যবসায় বা দাস-পরিবহণ আইনতঃ দণ্ডার্হ হয়। অপর ইওরোপীয় দেশগুলিও ক্রমে দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ করে। ভিয়েনা কংগ্রেসে (১৮১৪ খ্রী) দাস-ব্যবসায়বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশ গুলিতে দাসত্বপ্রথার অবলোপ ও দাসমুক্তির জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আইন বিধিবদ্ধ করে। অন্যান্য ইওরোপীয় দেশগুলি ক্রমে ব্রিটেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর দেশগুলিতে দাসত্ব-বিরোধী জনমত জাগ্রত হইলেও অর্থনৈতিক কারণে দক্ষিণ রাজ্যগুলিতে ব্যাপক দাসত্বপ্রথা চলিতেছিল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী হ্যারিয়েট বীচার স্টাও-রচিত 'আঙ্ক্‌ল টম্‌স কেবিন' যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়িয়া তোলে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম লিঙ্কন রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেণ্ট) নির্বাচিত হইলে দাসত্ব লইয়া উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যগুলির মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধে। বিজয়ী যুক্তরাষ্ট্র-দল আইনতঃ দাসত্বের অবসান ঘটায় (১৮৬৫ খ্রী)।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জাতিসংঘ দাসত্ব ও বেগার-

শ্রমের নিরোধকল্পে কয়েকটি কমিটি গঠন করে। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি দাসত্বচুক্তি (Slavery Convention) এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে একটি বাধ্যতামূলক শ্রমচুক্তি (Forced Labour Convention) অবলম্বিত হয়। জাতিসংঘের আরব্ধ কার্য উত্তরাধিকারীরূপে রাষ্ট্রসংঘ (United Nations Organization) গ্রহণ করিয়াছে।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *History and Culture of the Indian People*, vol. I-VI, Bombay, 1951-1960; Deb Raj Chanana, *Slavery in Ancient India*, New Delhi, 1960

নীলা দে

দাসবংশ কুতবুদ্দীন হইতে আরম্ভ করিয়া কাইকোবাদ-এর শাসনকাল পর্যন্ত (১২০৬-৯০ খ্রী) দিল্লীর সুলতানগণ সাধারণভাবে দাসবংশ নামে অভিহিত হন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মাত্র কুতবুদ্দীন, ইলতুৎমিস্ ও গিয়াসুদ্দীন বলবন এই তিনজন প্রথম জীবনেই ক্রীতদাস ছিলেন এবং কর্মদক্ষতায় সিংহাসনলাভের পূর্বেই দাসত্বমুক্ত হইয়া উচ্চ পদাধিকারী হন।

উল্লিখিত সময়ের সুলতানগণের মধ্যে কুতবুদ্দীন আইবক (১২০৬-১০ খ্রী), ইলতুৎমিস (১২১১-৩৬ খ্রী), রাজিয়া (১২৩৬-৪০ খ্রী), নাসিরুদ্দীন মামুদ (১২৪৬-৬৬ খ্রী) এবং গিয়াসুদ্দীন বলবন (১২৬৬-৮৭ খ্রী) এই ৫ জন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরির মৃত্যুর পরে কুতবুদ্দীন দিল্লীর প্রথম সুলতান হন। ('কুতবুদ্দীন আইবক' দ্র)। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। পরবর্তী সুলতান আরামকে পদচ্যুত করিয়া ইলতুৎমিস দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ('ইলতুৎমিস' দ্র)। পরবর্তী সুলতান ইলতুৎমিসের পুত্র ফিরোজ অপদার্থ ছিলেন। দিল্লীর আমীরগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইলতুৎমিসের কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভা, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলীর অধিকারিণী; কিন্তু প্রধানতঃ আমীর-ওমরাহদের নারীর শাসনের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব ও তাঁহাদের উচ্চাভিলাষ তাঁহার পতন ঘটায়। পরবর্তী দুইজন সুলতান ছিলেন অকর্মণ্য ও তাঁহাদের ৬ বৎসর রাজত্বকালে সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না। তাঁহারা উভয়েই সিংহাসনচ্যুত হন।

ইহার পরে ইলতুৎমিসের অপর এক পুত্র নাসিরুদ্দীন মামুদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন দুর্বল, অমায়িক ও ধর্মভীরু। সেই জটিলতাপূর্ণ সময়ে শাসকের যোগ্যতা তাঁহার ছিল না; তাঁহার শ্বশুর সুযোগ্য মন্ত্রী বলবন অধিকাংশ সময়ে তাঁহাকে শাসনকার্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।

অপুত্রক অবস্থায় নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পরে গিয়াসুদ্দীন বলবন সুলতান হন। তিনি ছিলেন নির্ভীক ও দৃঢ়শাসক। তাঁহার সামরিক সংস্কার, শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী-গঠন, বঙ্গদেশের বিদ্রোহ ও মেওয়াটী দস্যুদের কঠোর হস্তে দমন, তুর্কী আমীরগণের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাসের ব্যবস্থা এবং মোগল-আক্রমণের প্রতিরোধ প্রভৃতি কার্য সাম্রাজ্যের বনিয়াদকে সুদৃঢ় করিয়াছিল। বলবনের মৃত্যুর পরে তাঁহার পৌত্র কাইকোবাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন অপদার্থ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ; তাঁহাকে ও তাঁহার শিশুপুত্রকে হত্যার পরে জালালুদ্দীন ফিরোজ খলজী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে (১২৯০ খ্রী) দাসবংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। 'খিলজী' দ্র।

দ্র *The Cambridge History of India*, vol. III Cambridge, 1928; Iswari Prasad, *History of Mediaeval India*, Allahabad, 1933; R. C. Majumdar, ed. *The History and Culture of the Indian People*. vol. V. Bombay 1957 A. B. M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India*, Allahabad, 1961.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

দাস্তগিলসার, দস্তাগিল একটি যুগ্ম শৃঙ্গ। উচ্চতা যথাক্রমে ৭৮৮৫ মিটার এবং ৭৬৯৬ মিটার (যথাক্রমে ২৫৮৬৮ এবং ২৫২৫০ ফুট)। ৩৬°১৯´৩৫´´ উত্তর এবং ৭৫°১১´২০´´ পূর্বে মহান কারাকোরামের অন্তর্ভুক্ত গিলগিট এজেন্সির নাগর ও হুনজা সামন্তরাজ্যের সীমানাতে এই যুগ্ম শৃঙ্গ অবস্থিত। ইহাকে দ্বিমস্তকযুক্ত পর্বত বলা হয়। ইহার অর্থ পর্বতের মেষদের বাসস্থান (শিপ্‌ফোল্ড ইন দি হিল্‌স) ইহার দুইটি শৃঙ্গ একটি উচ্চ গিরিশিরা দ্বারা যুক্ত— ইহার দৃশ্য খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ ও সুন্দর। ইহার উত্তর দিকের ঢাল হইতে মালুংগাট্টি হিমবাহ বাহির হইয়া সিমশল উপত্যকায় পড়িয়াছে— দক্ষিণ দিকের ঢাল হইতে কানইয়াং হিমবাহ বাহির হইয়া হিসপার হিমবাহতে পড়িয়াছে।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ এজেন্সির গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসার জর্জ ককরিল ইহা আবিষ্কার করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কে. ম্যাসন ইহার অবস্থিতি ও উচ্চতা

নির্ণয় করেন। তিনিই ইহাকে স্থানীয় প্রচলিত নাম অনুসারে দস্তাগিল বা দাস্তগিলসার নামটি দেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিসার হুক্‌ট মোলুংগাটি হিমবাহের দিক হইতে মিসেস জেনী ও তাঁহার স্বামী ইহা সর্বপ্রথম দেখেন ও ইহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ান কারাকোরাম-অভিযাত্রী দলের দুইজন সদস্য বিনা অক্সিজেনে ৯ জুন তারিখে এই শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

দ্র *Himalayan Journal*, vol. X, 1936-37; Anthony Huxley, ed., *Standard Encyclopaedia of the World's Mountains*, London, 1962; B. G. Berghese, *Himalayan Endeavour*, Bombay, 1962.

কমলা মুখোপাধ্যায়

দাহির, দাহর সিন্ধু দেশের ব্রাহ্মণরাজ চচের পুত্র ও সিন্ধু দেশের শেষ হিন্দুরাজা দাহির বা দাহর তাঁহার ভ্রাতা দহরসিয়ার মৃত্যুর পর একক সিন্ধুর রাজা হন (৭০৮ খ্রী)। এই সময়ে অল-হজ্জাজ ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন। সিংহল হইতে একটি জাহাজে কয়েকজন মুসলমান মহিলা অল-হজ্জাজের নিকট যাইবার সময়ে দেবল বন্দরের নিকট জলদস্যুগণ কর্তৃক ধৃত হন। অল-হজ্জাজ দাহিরকে বন্দীদের মুক্তি দিতে বলেন। জলদস্যুদের উপর দাহিরের কোনও ক্ষমতা না থাকায় দাহির তাঁহার অক্ষমতা জানান। অল-হজ্জাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দুইবার সিন্ধু দেশের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, দুইবারই মুসলমান সেনাপতি নিহত হন। ইহার পর অল-হজ্জাজ তাঁহার জামাতা মহম্মদ-বিন-কাসিমের নেতৃত্বে ৩য় অভিযান পাঠান। মহম্মদ প্রথমে দেবল (বর্তমান থাট্টা বা ভাম্বোর) দখল করেন পরে নীরুণ (বর্তমান হায়দরাবাদ) দখল করেন। শেষোক্ত স্থানের বৌদ্ধগণ মহম্মদকে রসদ যোগান। ইহার পর মহম্মদ শিবিস্তান বা শেওয়ান দখল করেন। এখানে ও অপরাপর স্থানে বৌদ্ধগণ মহম্মদকে সাহায্য করেন। অনেক হিন্দুও বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এইরূপ একজন বিশ্বাসঘাতক হিন্দু সামন্তরাজ মোকার সাহায্যে মহম্মদ সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া রাওর দুর্গের নিকট দাহিরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। দ্বিতীয় দিন যুদ্ধের পর মহম্মদের সৈন্যগণ প্রায় পরাজিত হন, সেই সময়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ দাহির তীরবিদ্ধ হইয়া নিহত হন ও হিন্দুদের পরাজয় ঘটে (৭১২ খ্রী)। ইহার পরে মহম্মদ সহজেই সিন্ধু জয় করেন।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *History and Culture of the Indian People*, vol III, Bombay, 1954.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

দিক্‌পাল দিক্‌পাল বা লোকপাল বলিতে হিন্দু মতে পৃথিবীর বিভিন্ন দিকের পালকরূপ দেবগণকে বুঝায়। সুসম্প্রসারিত পৌরাণিক মতানুসারে দিক্‌পাল ও তাহাদের স্ব স্ব দিকসমূহ সংখ্যায় আটটি, চারিটি প্রধান ও চারিটি অপ্রধান। প্রধান দিকসমূহের মধ্যে ইন্দ্র পূর্ব, যম দক্ষিণ, বরুণ পশ্চিম এবং কুবের উত্তর দিকের অধিপতি। দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব এই সকল অপ্রধান দিক্‌সমূহের বা কোণের অধিপতি হইলেন যথাক্রমে অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান। প্রাচীনতর গ্রন্থাদিতে দিক্‌পাল বা দিগধিপতিগণের উল্লেখ থাকিলেও তাঁহাদের সংখ্যা ও নামের তারতম্য দেখা যায়। প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও লোকপালদের সংখ্যা ও নামের তারতম্য লক্ষিত হয়। পরবর্তী হিন্দুমতে দিক দশটি এবং সেই অনুসারে উপরি-উক্ত দেবগণের সহিত ব্রহ্মা ও অনন্তের নাম যথাক্রমে ঊর্ধ্ব ও অধঃ দিকের রক্ষক হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

অশোককুমার ভট্টাচার্য

দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ বলিতে দিকরক্ষক হস্তী বুঝায়। পৌরাণিক মতানুসারে দিগ্‌গজগণ আকাশের আট দিকে দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্বাদিক্রমে অষ্ট দিকরক্ষক হস্তীগণ হইলেন ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক। কোনও কোনও গ্রন্থে দিগ্‌গজের সংখ্যা প্রধান দিকসমূহের হিসাবে চার বলিয়া ধার্য করা হইয়াছে।

অশোককুমার ভট্টাচার্য

দিগ্‌দর্শন যন্ত্র চুম্বক দ্র

দিগম্বর মিত্র (১৮১৭—১৮৭৯ খ্রী) কোন্নগরের মিত্র-বংশে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। পিতার নাম শিবচন্দ্র মিত্র। হেয়ার স্কুলে ও হিন্দু কলেজে দিগম্বর শিক্ষা লাভ করেন। তিনি প্রথমে মুর্শিদাবাদের কালেক্টরের অধীনে আমিনের কর্ম গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি কাসিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের গৃহশিক্ষক ও পরে তাঁহার ম্যানেজার হন। মহারাজ তাঁহাকে লক্ষাধিক টাকা দেন। তিনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নীল ও রেশমের কারবার আরম্ভ করেন। মালদহে

ও বহরমপুরে তাঁহার কয়েকটি নিজস্ব কারখানা ছিল। ব্যবসায়ের লাভ হইতে তিনি প্রচুর জমিদারি সম্পত্তি করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর জন্মলগ্নে তিনি ইহার সহকারি সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মিউনিসিপ্যাল কমিশন'-এ যোগদান করেন এবং 'ইন্‌কাম ট্যাক্‌স কন্‌ফারেন্স'-এ প্রতিনিধি মনোনীত হন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'এপিডেমিক ফিবার কমিশন'-এর সভ্য হন ও জলনিষ্কাশনের পথ বন্ধ হইতেছে বলিয়া বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ বাড়িয়াছে এই মত প্রকাশ করেন। দিগম্বর তিনবার 'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা'র সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম বাঙ্গালী শেরিফ নিযুক্ত হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'সি. এস. আই.' এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ রদ আইন প্রবর্তন আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থটি তাঁহাকেই উৎসর্গ করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দিগম্বরের মৃত্যু হয়।

দ্র শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, জীবনীকোষ (ভারতীয়-ঐতিহাসিক), ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ; C. E. Buckland, *Dictionary of Indian Biography*, London, 1906.

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

দিগম্বরসম্প্রদায় জৈনেরা প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্তঃ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। জৈন সাধুদের মধ্যে নগ্ন থাকার রীতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও শ্বেতাম্বর ও দিগম্বররূপে সংঘ-বিভাগ অনেক পরবর্তী কালের। বস্তুতঃ দ্বিতীয় ভদ্রবাহুর দাক্ষিণাত্যে গমন (খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের মধ্য ভাগে) হইতে এই সংঘ-বিচ্ছেদের আরম্ভ হয়। ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে যাঁহারা জৈন ধর্ম প্রচারের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন তাঁহাদের মধ্যে অঙ্গশাস্ত্রের জ্ঞান ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে থাকে ও আচার-ব্যবহারও ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই সমস্ত সাধুদের একাংশ খ্রীষ্টীয় ১ম বা ২য় শতকে আর্যাবর্তে প্রত্যাবর্তন করার পর নিজেদের ভিন্নতর আচার ব্যবহারের সংশোধন না করিয়া এক পৃথক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। প্রত্যেক সাধুকে নগ্ন থাকিতে হইবে, স্ত্রীলোকের মুক্তি হইতে পারে না, কেবলীরা শরীর ধারণ করিলেও আহার গ্রহণ করেন না ইত্যাদি কয়েকটি নূতন মতবাদ গ্রহণ করিয়া ইহারা নূতন শাস্ত্র-রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সম্প্রদায়ই পরবর্তী কালে নগ্নত্বের জন্য দিগম্বর আখ্যায় অভিহিত হন। মূল জৈনসম্প্রদায় দিগম্বর শব্দের বিপরীত শ্বেতাম্বর নামে অভিহিত হইতে থাকে।

গণেশ লালওয়ানী

দিঙ্‌নাগ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক। তিনি খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষ ভাগে দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাকে বৈভাসিক ও সৌত্রান্তিক যে কোনও শাখাভুক্ত বলা যায়।

প্রথমাবস্থায় তিনি আচার্য নাগদত্তের নিকট দীক্ষালাভ করেন এবং স্থবিরবাদীদের ত্রিপিটকে পারদর্শী হন। পরে তিনি বসুবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং মহাযানীয় শাস্ত্রসমূহে বিশেষ পারদর্শী হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ পর্যটন করেন। বিরুদ্ধবাদীদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় মতে আনয়ন করেন। দিঙ্‌নাগের বিচার ও বৈশ্লেষণিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ এবং সেইজন্য তিনি 'তর্ক পুঙ্গব' নামে অভিহিত হইতেন।

জৈন দার্শনিক সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ দিঙ্‌নাগ ন্যায়শাস্ত্রকে ধর্মতত্ত্ব ও তত্ত্বদর্শনের বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে স্থাপন করেন বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের অভিমত। বস্তুতঃ মধ্যযুগের ভারতীয় দর্শনের তাঁহারাই পূর্বাচার্য ছিলেন।

আচার্য দিঙ্‌নাগ রচিত প্রধান গ্রন্থ 'প্রমাণ সমুচ্চয়'। উক্ত গ্রন্থখানি তিনি অন্ধ্রের বেঙ্গী নামক স্থানে অবস্থান-কালে রচনা করেন। অনুষ্টুভ ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থখানি রচিত। মূল গ্রন্থখানি এখন পাওয়া যায় না, তবে তিব্বতীয় ভাষায় গ্রন্থখানির অনুবাদ আছে। বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকদিগের মতবাদ খণ্ডন করিয়া দিঙ্‌নাগ স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় এক নূতন ধারা তিনি প্রবর্তন করেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের স্বরূপ, তাহাদের বিষয় প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা-ক্ষেত্রে দিঙ্‌নাগ ছিলেন অগ্রণী। পরে আচার্য ধর্মকীর্তি প্রমাণসমুচ্চয়ের টীকাস্বরূপ 'প্রমাণবার্তিক কারিকা' রচনা করেন। বাচস্পতি মিশ্র 'ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য' টীকা গ্রন্থে দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন করেন। একথা বলা যায় যে কুমারিল দিঙ্‌নাগের কাছে অনুমান ও অনুমানের লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কীয় আলোচনায় অনেকাংশে ঋণী।

মনোরঞ্জন বসু

দিতি দৈত্য দ্র

দিদেরো, ডেনিস (১৭১৩-৮৪ খ্রী) অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী জাগৃতির অন্যতম নায়ক, বিশ্বকোষ রচয়িতা ও দার্শনিক। জন্মস্থান লাংগ্রীস (Langres)। ১৯ বৎসর বয়সে পারী (প্যারিস) হইতে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। স্বীয় অধ্যবসায়ে অল্প কালের মধ্যেই তিনি নানা ভাষায় ও বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ পেন্‌সিস ফিলোজফিকস্ (Pensées Philosophiques) প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর হইতে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার প্রধান কাজ ছিল বিখ্যাত ফরাসী বিশ্বকোষ সম্পাদনা করা ও উহার জন্য রচনা প্রণয়ন করা। পরবর্তী দুই বৎসর তিনি রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের রাজদরবার সেন্টপিটার্সবুর্গে অতিবাহিত করেন। শেষ জীবনে তিনি নির্জনে বসবাস করিতেন। তাঁহার রচিত শেষ গ্রন্থে তিনি দার্ঢ্য ধর্মের (স্টোইকিজ্‌ম্) গুণগান করেন। পারীতেই দিদেরোর মৃত্যু হয়।

দিদেরোর জগৎ-বিষয়ক মতামত বস্তুবাদী। জ্ঞানতত্ত্বে তিনি প্রত্যক্ষবাদী। তাঁহার মতে মন মস্তিষ্কের ক্রিয়া বই কিছুই নয়। তাঁহার বস্তুবাদ অদ্বৈতধর্মী। বস্তুতেই গতি অন্তর্নিহিত। বস্তুপুঞ্জের বিপরীত ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতেই সকল পরিবর্তন ও রূপান্তর সম্ভব হয়। তাঁহার মতে সকল বস্তুপুঞ্জই সংবেদনশীল এবং অনুকূল পরিবেশে সংবেদনশীল অজৈব বস্তুতেও জৈব ধর্মের উদ্ভব হয়। দিদেরো স্বাধীন ইচ্ছা বলিতে সচরাচর যাহা বুঝানো হয় তাহাতে বিশ্বাসী ছিলেন না, তবে তিনি অদৃষ্টবাদেও বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মতে স্মৃতি ও কল্পনা দ্বারা মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলিকে পরিবর্তন করিতে সক্ষম। দিদেরো সৌন্দর্যসৃষ্টি ও নীতিধর্মের মধ্যে একটি গভীর সম্বন্ধ রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। দিদেরোর মতে সার্বভৌম ক্ষমতার আধার জনগণ। দিদেরো এই গণসার্বভৌমত্ব-মত রুশোর পূর্বে ঘোষণা করেন। রাজনীতিকে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

ইংরেজীতে অনূদিত দিদেরোর গ্রন্থাবলী : 'Selected Works of Diderot' ও 'Diderot's Early Philosophical Works.'

দ্র L. G. Crocker, *Diderot : The Embattled Philosopher*, Ann Arbor, Mich., 1954 ; Arthur M. Wilson, *Diderot : The Testing Years (1713-59)*, New York, 1957.

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দিদ্দা কাশ্মীরের রাজা ক্ষেমগুপ্তের (৯৫০-৫৮ খ্রী) পত্নী, লোহাররাজের দুহিতা ও বিশিষ্ট কূটরাজনীতিবিদ্। ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যুর পর দিদ্দার অভিভাবকত্বে তাঁহার অল্প বয়স্ক পুত্র অভিমন্যুগুপ্ত রাজা হন (৯৫৮-৭২ খ্রী) এবং অভিমন্যুগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নন্দিগুপ্ত, ত্রিভুবন ও ভীমগুপ্ত যথাক্রমে রাজা হন। ইহারা সকলেই দিদ্দার হস্তের ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। ভীমগুপ্তকে নিহত করিয়া ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে দিদ্দা স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পর্ণোৎসের পূর্বতন এক মহিষপালক খসবংশীয় তুঙ্গকে তাঁহার মন্ত্রী করেন। এই তুঙ্গ তাঁহার প্রণয়ী ছিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া লোহাররাজপুত্র বিগ্রহরাজ বিদ্রোহ করিলে দিদ্দা কূটনীতিবলে তাঁহাকে দমন করেন। পরে রাজপুরীর বিদ্রোহ ও দামরগণের বিদ্রোহ তুঙ্গ দমন করেন। ইহার পর দিদ্দা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সংগ্রামরাজকে যুবরাজ মনোনীত করেন। ১০০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিদ্দার মৃত্যু হয়। দিদ্দা নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত করেন এবং দিদ্দাপুর ও কঙ্কণপুর নামে দুইটি নগরী ও বিষ্ণুদিদ্দাস্বামীর মন্দির নির্মাণ করেন।

দ্র রাজতরঙ্গিণী, ১ম খণ্ড : ১ম-ষষ্ঠ তরঙ্গ, কলিকাতা, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ ; H. C. Roy, *The Dynastic History of Northern India*, vol. I, Calcutta, 1931.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

দিনাজপুর ২৫°৫৫′ হইতে প্রায় ২৬°৬৫′ উত্তর ও ৮৮°৩′ হইতে ৮৯°১৯′ পূর্ব। পূর্ব পাকিস্তানের একটি জেলা, মহকুমা, থানা ও শহর। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ বিভাগের সময় অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর জেলাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পশ্চিম অংশ পশ্চিম দিনাজপুর (পশ্চিম দিনাজপুর দ্র) নামে পশ্চিম বঙ্গের ও পূর্ব অংশ দিনাজপুর নামে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দিনাজপুর জেলার আয়তন ৬৯৯০ বর্গ কিলোমিটার (২৬৯৯ বর্গমাইল)। উক্ত জেলার উত্তর-পূর্বে জলপাইগুড়ি, পশ্চিমে পশ্চিম দিনাজপুর, পূর্বে রঙপুর, দক্ষিণে বগুড়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মালদহ। দিনাজপুর জেলায় দিনাজপুর সদর ও ঠাকুরগাঁও এই দুইটি মহকুমা।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, এই জেলা সমতল কিন্তু বারিন্দ (Barind) নামে সামান্য উচ্চ ভূমি দক্ষিণে বিদ্যমান। এখানে খুব ছোট ছোট পাহাড় আছে যাহাদের উচ্চতার গড় ৩০ মিটার (১০০ ফুট)। এইরূপ ছোট পাহাড় উত্তর-পশ্চিমেও অবস্থিত। অসংখ্য নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বারিন্দের উচ্চ ভূমি পূর্ব ও পশ্চিমে বাহিত নদীগুলির জলবিভাজিকা। এই জলধারাগুলি পশ্চিম দিকে মহানন্দা ও পূর্ব দিকে পুরাতন তিস্তা নদীতে পতিত হইয়াছে। মহানন্দার শাখানদীগুলির মধ্যে তাঙ্গন ও পুনর্ভবা প্রধান। পুরাতন তিস্তা এখনও আত্রাই, যমুনা ও করতোয়ার মধ্য দিয়া এই জেলায় প্রবাহিত। আত্রাই রঙপুর হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে দিনাজপুরে প্রবেশ করিয়াছে। করতোয়া ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) ধরিয়া জেলার পূর্ব দিকের সীমা নির্দেশ করিতেছে।

এই জেলার অধিকাংশ স্থান নদীবাহিত আধুনিক পাললিক মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। এই মৃত্তিকায় বেলেমাটি ও বালি মিশ্রিত। বারিন্দের উচ্চ ভূমি পুরাতন পলি দ্বারা গঠিত। ইহার রঙ ধূসর লাল, ক্ষয়ের ফলে রঙ পীত বর্ণও হয় এবং এখানে কঙ্কর পাওয়া যায়। এখানে বিভিন্ন প্রকারের স্বাভাবিক উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। যে সমস্ত স্থান প্লাবিত হয় তথায় খাগড়া-জাতীয় তৃণ জন্মায়। এই সকল প্লাবিত স্থানে হিজল গাছ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। এই জেলায় অরণ্য নাই তবে কতিপয় স্থান কণ্টকবৃক্ষের জঙ্গল দ্বারা আবৃত। স্থানে স্থানে শাল বৃক্ষ দেখা যায়। বাঁশ এই জেলার সর্বত্র জন্মায়। বৃক্ষের মধ্যে আম্র ও কাঁঠাল প্রধান।

জলবায়ু মনোরম। উত্তাপ চরম নয়। বাৎসরিক শীতকালীন গড় উত্তাপ ১৯° সেন্টিগ্রেড (৬৬° ফারেনহাইট)। জানুয়ারীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ৯·৫° সেন্টিগ্রেড (৪৯° ফারেনহাইট)। এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৫° সেন্টিগ্রেড (৯৫° ফারেনহাইট) পর্যন্ত হইয়া থাকে। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের প্রারম্ভে প্রচুর বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ১৬০০ মিলিমিটার (৬৩'ইঞ্চি)।

এই জেলা ৯ম শতাব্দীতে পাল রাজাদের অধিকারে ছিল। ১৫শ শতাব্দীতে দিনওয়াজের রাজা গণেশ এখানে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ দিনওয়াজ বা দিনাজ হইতেই এই জেলার দিনাজপুর নামকরণ হইয়াছিল।

জেলার মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলমান। এখানে সাঁওতাল পরগনা হইতে আগত অধিবাসীর সংখ্যাও কম নয়। জেলার প্রায় ৯০ ভাগ লোক কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে এই জেলার জনসংখ্যা ছিল ১৩৫৪৪৩২।

জেলার উত্তরাংশে হালকা ধূসর বর্ণের দো-আঁশ মাটি দেখা যায়। এই মৃত্তিকা জল সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে। এই মৃত্তিকায় দুইবার ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু দক্ষিণাংশে ইহা বারিন্দের কঠিন লাল মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। এই স্থানে একবার মাত্র শস্য জন্মায়।

পূর্ব বাংলার জেলাসমূহের মধ্যে ধান্য-উৎপাদনে দিনাজপুর অন্যতম। পাট, ইক্ষু, তামাক, সরিষা ও ডাল এই জেলার অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪০০৮০০ হেক্টর (৯৯০৪০০ একর) জমিতে ধান, ১২৭৫০ হেক্টর (৩১৫০০ একর) জমিতে পাট উৎপন্ন হয়। ঐ বৎসর এই জেলায় পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা অধিক ইক্ষু উৎপন্ন হয়।

শিল্পকার্যে দিনাজপুরের গুরুত্ব নগণ্য। এই স্থানে মাদুর প্রস্তুত হয়। মোটা বস্ত্র হাতে বোনা হইয়া থাকে। দীর্ঘস্থায়ী মোটা কার্পাস বস্ত্র ও বন্য রেশমের এণ্ডি প্রস্তুত হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে নল-খাগড়ার মাদুর তৈয়ারি করা হয়। বর্তমানে এখানে কয়েকটি চাউলকল, পাটকল ও চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে।

ঈস্ট বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে উত্তর ও দক্ষিণ অংশের যোগাযোগ বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। মোট রাস্তা ১৭৬৫ কিলোমিটার (১০৯৭ মাইল)।

প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্য দিনাজপুর বিখ্যাত ছিল। জেলার প্রধান শহর দিনাজপুর পুনর্ভবা নদীর উপর অবস্থিত প্রাচীন স্থান। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পৌর-শাসনের অন্তর্গত হয়।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XI, Oxford, 1908; Nafis Ahmad, *An Economic Geography of East Pakistan*, London, 1958.

অনিন্দ্যকুমার পাল

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫ খ্রী) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র; মাতা সুশীলা দেবী। জন্ম ২ পৌষ ১২৮৯ বঙ্গাব্দ (১৬ ডিসেম্বর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ); মৃত্যু ৫ শ্রাবণ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ (২১ জুলাই, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

তরুণবয়সেই দিনেন্দ্রনাথ সংগীত ও অভিনয়ে বিশেষ

দক্ষতা ও সাহিত্যে অনুরাগ প্রদর্শন করেন এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহ আকর্ষণ করেন। ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যে তিনি বিশেষ কৃতবিদ্য ছিলেন; রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে দিনেন্দ্রনাথ অধ্যাপকরূপে তথায় যোগ দেন এবং কর্মজীবনের অধিকাংশ কাল ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতের একজন প্রধান ধারক ও বাহকরূপে তিনি গীতরসিক সমাজে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। শান্তিনিকেতনে ও শান্তিনিকেতনের বাহিরে বহু রবীন্দ্রগীত-শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান ব্যতীত বহু শত রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া তিনি ইহার বহুল প্রচারের পথ সুগম করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'আমার সকল গানের ভাণ্ডারী' আখ্যায় সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন।

দিনেন্দ্রনাথ-কৃত রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি প্রধানতঃ এই সকল গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে: 'গীতলেখা' ১-৩ (১৩২৪, ১৩২৫, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ); 'গীতপঞ্চাশিকা' (১৩২৫ বঙ্গাব্দ); 'বৈতালিক' (১৩২৫ বঙ্গাব্দ); 'গীতবীথিকা' (১৩২৬ বঙ্গাব্দ); 'কেতকী' (১৩২৬ বঙ্গাব্দ); 'শেফালি' (১৩২৬ বঙ্গাব্দ); 'কাব্যগীতি' (১৩২৬ বঙ্গাব্দ); 'নবগীতিকা' ১-২ (১৩২৯ বঙ্গাব্দ); 'বসন্ত' (১৩৩০ বঙ্গাব্দ); 'গীতমালিকা' (১৩৩৩, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ); 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ); 'তপতী' (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ); 'স্বরবিতান' ১-৩, ৫, ১৩ (১৩৪২, ১৩৪৩, ১৩৪৫, ১৩৪৯, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)।

রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে, যথা 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় বাল্মীকি ও প্রথম দস্যুর ভূমিকায় (বিভিন্ন সময়ে), 'অচলায়তন'-এ পঞ্চকের ভূমিকায় (১৯১৪, ১৯১৭ খ্রী), 'বিসর্জন'-এ রঘুপতিরূপে (১৯২৩ খ্রী), 'তপতী' অভিনয়ে দেবদত্তের ভূমিকায় (১৯২৯ খ্রী), দিনেন্দ্রনাথ অসামান্য অভিনয়দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

কবিতা ও সংগীত-রচনাতেও তাঁহার কুশলতা ছিল; যৌবনে রচিত তাঁহার কতকগুলি কবিতা 'বীণ' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদেশী গল্পের অনুবাদেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পত্নী কমলা দেবী তাঁহার কবিতা ও গানের অধিকাংশ 'দিনেন্দ্র-রচনাবলী' গ্রন্থে (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) সংকলন করেন।

দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দিনেন্দ্রনাথ,' প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ; দিনেন্দ্র-রচনাবলী, কলিকাতা, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ; প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, 'দিনেন্দ্রনাথ', রবিচ্ছবি গ্রন্থ, কলিকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ; সুধীরচন্দ্র কর, 'দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর', শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা গ্রন্থ, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

পুলিনবিহারী সেন

দিব্য, দিব্বোক বাংলার পালবংশীয় রাজা ৩য় বিগ্রহপালের তিন পুত্র ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর আনুমানিক ১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ পুত্র মহীপাল (২য়) সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যে তখন বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। শীঘ্রই বরেন্দ্রভূমির (অর্থাৎ উত্তর বঙ্গের) সামন্তবর্গ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। মহীপাল তাঁহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন কিন্তু পরাজিত ও নিহত হইলেন। দিব্য বা দিব্বোক নামক কৈবর্তজাতীয় একজন উচ্চ রাজকর্মচারী বরেন্দ্রের রাজা হইলেন। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, দিব্য এই বিদ্রোহীদলের নেতা ছিলেন। প্রায় সমসাময়িক সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামচরিত' কাব্যে এই বিদ্রোহের উল্লেখ মাত্র আছে, কিন্তু এসম্বন্ধে বিস্তৃত কোনও বিবরণ জানিবার উপায় নাই। 'রামচরিতে' উক্ত হইয়াছে যে রাজা মহীপাল নীতিবিরুদ্ধ কার্যে রত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শূরপাল ও রামপাল এই বিদ্রোহের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন মনে করিয়া তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের টীকায় এই নীতিবিরুদ্ধ কার্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে বিচক্ষণ মন্ত্রীগণের পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া মহীপাল যথেষ্ট সৈন্যসংগ্রহ না করিয়াই বিদ্রোহদমনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। দিব্য সম্বন্ধে 'রামচরিতে' যে কয়টি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, কৈবর্তজাতীয় দিব্য একজন উচ্চ রাজকর্মচারী এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, কিন্তু 'উপধিব্রতী' বা ছদনব্যবহার-নিরত 'দস্যু' ছিলেন। তিনি কত দিন বরেন্দ্রে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তাঁহার পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রের রাজা হন। রামপাল তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পুনরায় বরেন্দ্র অধিকার করেন।

'রামচরিত' কাব্য প্রকাশিত হইবার পর বাংলার একদল লোক বিশ্বাস করিতেন যে, দিব্য অত্যাচারী মহীপালকে বধ করিয়া দেশ ও রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই মহৎ কার্যের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক রাজা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কোনও কোনও স্থানে দিব্যকে মহাপুরুষ কল্পনা করিয়া প্রতি বৎসর দিব্যস্মৃতি

উৎসবের ব্যবস্থা করা হইত। কিন্তু 'রামচরিত'-এ এই বিশ্বাসের সমর্থক কোনও প্রমাণ নাই।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

দিয়াশলাই আদিমযুগে মানুষ প্রধানতঃ দুইখণ্ড শুষ্ক কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালাইত। ক্রমে একখণ্ড চকমকি পাথরে লৌহখণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া আগুনের স্ফুলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া উহা সহজদাহ্য জ্বালানির মধ্যে ফেলিয়া আগুন জ্বালাইবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়; নানাপ্রকার 'সিগারেট লাইটার'-এ ঐ পদ্ধতি আজিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে গডফ্রে হাউক্‌উইৎস গন্ধকের প্রলেপযুক্ত কাঠিতে চকমকির সাহায্যে আগুন ধরাইবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। পরবর্তী কালের দিয়াশলাই-এ ক্লোরেট অফ পটাশ, চিনি ও গঁদের আঠার মিশ্রণ কাঠির প্রান্তে পুটুলির মত লাগানো থাকিত ও দরকার মত উহা ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবাইয়া আগুন জ্বালানো হইত। ওয়াকার নামক এক ইংরেজ বিজ্ঞানী ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ একটি কাঠির মাথায় লাগাইয়া রাখিতেন ও উহা কোনও অমসৃণ স্থানে ঘষিয়া আগুন জ্বালাইতেন। ইহার ২০ বৎসর পরে লুসিফর দিয়াশলাই নামক একপ্রকার দীপশলাকা প্রস্তুত হয়; উহা বালিকাগজে ঘষিলে জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু ইহা হইতে একটি বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হইত। এই দিয়াশলাই-এ শাদা ফসফরাস ব্যবহৃত হইত। এই শাদা ফসফরাসযুক্ত কাঠি নিজেদের মধ্যে ঘর্ষণেও জ্বলিয়া উঠিত বলিয়া ক্রমে দিয়াশলাইয়ে শাদা ফসফরাসের পরিবর্তে লাল ফসফরাস ব্যবহৃত হইতে থাকে। 'সেফ্‌টি ম্যাচ' প্রস্তুতিতে সাধারণতঃ লাল ফসফরাস, ক্লোরেট অফ পটাশ ও গাম আরাবিয়া কাঠির মাথায় পুটুলির মত লাগানো হয় ও খোলের গায়ে রেড লেড, সোডিয়াম নাইট্রেট, গঁদ ও অতিমিহি বালির মিশ্রণ লেপিয়া দেওয়া হয়। কাঠির মাথা খোলের গায়ে ঘষিলে আগুন জ্বলিয়া ওঠে। আগুন নিভিবার পরও আঙরার মত এই কাঠি জ্বলিতে থাকে এবং দুর্ঘটনার সৃষ্টি করিতে পারে, তাই অধুনা দিয়াশলাই-এর কাঠি প্রথমে অ্যামোনিয়াম ফস্‌ফেট -এর দ্রবণে ডুবাইয়া শুষ্ক করিয়া পরে উহার প্রান্তে সামান্য পরিমাণে গলিত মোম লাগাইয়া ঐ রাসায়নিক মিশ্রণ লাগানো হয়। ইহাতে দিয়াশলাই অতি দ্রুত জ্বলিয়া ওঠে, কিন্তু অগ্নি নির্বাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কোনও আঙরার উৎপত্তি না করিয়া সম্পূর্ণ নিভিয়া যায়। অনেক দেশে আজকাল কাঠের কাঠির পরিবর্তে শক্ত কাগজের কাঠির দিয়াশলাই ব্যবহৃত হয়। ইহাতে খরচ অনেক কম পড়ে। অধুনা এই কাঠিকে একপ্রকার প্ল্যাষ্টিক দ্রব্যের মধ্যে ডুবাইয়া এবং পরে শুষ্ক করিয়া যে দিয়াশলাই কাঠি প্রস্তুত হয় উহা ৮-১০ ঘণ্টা জলে ভিজিলেও, এমন কি সেই ভিজা অবস্থাতেও, খোলে ঘর্ষণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিয়া ওঠে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দিলওয়াড়া রাজস্থানে আবু পর্বতে অবস্থিত একটি জগদ্বিখ্যাত জৈন তীর্থস্থান। মাউণ্ট আবু হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৩ কিলোমিটার (২ মাইল)।

দিলওয়াড়ার ৫টি মন্দিরের মধ্যে স্থাপত্য কলার দৃষ্টিতে ৪টি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। প্রত্যেকটি মন্দিরই ধনী জৈন ব্যবসায়ীদের দানে সমৃদ্ধ। ১১২৭ কিলোমিটার (৭০০ মাইল) দূরে অবস্থিত জাওয়ায়িয়া হইতে বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে সঙ্গমর্মর বা মার্বেল আনিয়া ১২২০ মিটার (৪০০০ ফুট) উচ্চ পর্বতের উপর মন্দির নির্মাণ করা হয়। উচ্চ পর্বতে এই মন্দিরগুলি বাস্তবিকই অতি অপূর্ব শোভাবিশিষ্ট। বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে গেলে কারুকার্যের তেমন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না—সাধারণ চতুষ্কোণ সমতল ভূমির উপর প্রাচীরবেষ্টিত ও প্রাঙ্গণ-সমন্বিত মন্দির। কিন্তু একবার মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ইহার তক্ষণ শিল্প অনুপম বলিয়া প্রতিভাত হয়।

শিলালিপি অনুসারে ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে (১০৮৮ সংবৎ) চালুক্যরাজ প্রথম ভীমের রাজপ্রতিনিধি বণিক বিমলাশাহ্‌-কর্তৃক নির্মিত প্রসিদ্ধ মন্দিরটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বৃহৎ। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি প্রথম জৈন তীর্থংকর আদিনাথ বা ঋষভনাথের। পদ্মাসনে উপবিষ্ট মূর্তি মন্দিরের অভ্যন্তরে বেদিকায় স্থাপিত। প্রকোষ্ঠ ও উহার সম্মুখে প্রসারিত বেদি প্রাঙ্গণ হইতে প্রায় ৩ ধাপ উচ্চ। ৪৮টি স্তম্ভের উপরে স্থাপিত একটি মণ্ডপ দ্বারা সমগ্র বেদি ও প্রাঙ্গণের অধিকাংশ আচ্ছাদিত। মধ্য ভাগের অষ্টভুজাকারে প্রতিষ্ঠিত আটটি স্তম্ভের উপর একটি গম্বুজ স্থাপন করা হইয়াছে। চক্রাকার বেষ্টনী ও সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত দোলক (পেন্‌ড্যাণ্ট)-সহ গম্বুজটি স্থাপত্য-শিল্পের অনবদ্য নিদর্শন। গম্বুজের অলংকরণে বহু বিদ্যাধরীদের মূর্তি ক্ষোদিত আছে। ইহাদের সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য অতি অপূর্ব। গর্ভগৃহ, মণ্ডপ ও গম্বুজটি ৫৫টি প্রকোষ্ঠবেষ্টিত ৪৩ মিটার (১৪০ ফুট) দীর্ঘ ও ২৭ মিটার (৯০ ফুট) প্রস্থ একটি প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। প্রকোষ্ঠগুলির প্রত্যেকটিতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট তীর্থংকরদের মূর্তি রক্ষিত আছে। একটি প্রকোষ্ঠে বিমলা শাহ্‌-এর

আরাধ্যা দেবী অম্বিকা মূর্তি স্থাপিত। ইহা ছাড়া অন্য কয়েকটি প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণ মূর্তি ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিও আছে। এই ৫৫টি প্রকোষ্ঠের প্রত্যেকটির সম্মুখে পূর্বের ন্যায় ৩ ধাপ উচ্চ বেদির উপর অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের যুগ্মস্তম্ভ স্থাপন করিয়া বারান্দার মত রচনা করা হইয়াছে। ইহাদের সম্মুখে অলিন্দ। গম্বুজের সম্মুখের তিন দিকে উচ্চ স্তম্ভের উপর অলিন্দের ছাদ ন্যস্ত। স্তম্ভগুলিতে তীর্থংকরদের মূর্তি ক্ষোদিত আছে। দ্বারে মনুষ্য প্রমাণ বিমলা শাহ্-এর অশ্বারোহী মূর্তি রক্ষিত। মূল প্রকোষ্ঠটি সাধারণ কৃষ্ণ প্রস্তরের, কিন্তু চতুর্দিকের বারান্দা ও কক্ষগুলি মূল্যবান শ্বেত মর্মর-প্রস্তরে নির্মিত। মনে হয় ঐগুলি পরবর্তী কালে স্থাপিত হইয়াছে। গর্ভগৃহের চতুর্দিকে ১'২ মিটার (৪ ফুট) উচ্চ নয়টি শ্বেত মর্মরের হস্তী মূর্তি আছে। স্থাপত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল দেওয়ালের প্রলম্বিত তাকগুলি হইতে কারুকার্যখচিত তোরণসমূহ বাহিরে বিস্তৃত হইয়া প্রধান স্তম্ভশীর্ষে মিলিয়াছে। ইহাদের কারুকার্য কমনীয় ও অতি সূক্ষ্ম। মন্দিরের বাহিরে দণ্ডায়মান ভৈরবমূর্তি। তাহার হস্তে ছিন্নমস্তক, পার্শ্বে বাহন সারমেয়।

এই মন্দিরটি স্থাপয়িতার নামানুসারে বিমলবসহী নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় মন্দিরটি দ্বিতীয় তীর্থংকর নেমিনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। উহা প্রথম মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। দুই ভ্রাতা তেজপাল ও বাস্তুপাল এই মন্দিরটিকে ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮৭ সংবৎ) নির্মাণ করান। ইহাদের লুনাবসহী বলা হয়। এই মন্দিরের নির্মাণশৈলী প্রায় পূর্বে বর্ণিত মন্দিরের মতই। তবে অষ্ট স্তম্ভের উপর স্থাপিত গম্বুজ অন্য মন্দিরটির গম্বুজ অপেক্ষা আরও ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজের দোলকটি অর্ধপ্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় কারুকার্যে অলংকৃত। পদ্মের পাপড়িগুলি এত স্বচ্ছ ও সূক্ষ্মভাবে নির্মিত যে বাস্তব বলিয়া ভ্রম হয়। পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠগুলির একটিতে আছেন ১৬শ তীর্থংকর শান্তিনাথ, সিংহাসনে তাঁহার প্রতীক মৃগমূর্তি আসীন। স্তম্ভগুলিতে নেমিনাথের জীবনালেখ্য ক্ষোদাই করা আছে। চতুষ্পার্শ্বস্থিত পাথরের জালিকাটা পরদার কারুকার্য খুবই মনোরম।

এই দুইটি উল্লেখযোগ্য মন্দির ছাড়া চৌমুখা মন্দিরও উল্লেখ্য। ইহাতে পার্শ্বনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

জৈন মন্দিরের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে তীর্থংকরদের মূর্তি সংবলিত প্রাচীরগাত্রগুলি পশ্চিম ভারতের জৈন মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য। ইহাকে 'দেবকুলিক' বলা হয়। গর্ভগৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বার পর্যন্ত মন্দিরের অন্যান্য অংশ মূল গাভরো (মূলগর্ভ), গূঢ় মণ্ডপ ও সভামণ্ডপ নামে পরিচিত।

এই মন্দিরগুলির নিকটে পুরাতন হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

দ্র Mulk Raj Anand, *Marg*, vol. XII, no. 2 Bombay, 1959; S. K. Saraswati, *Dilwara Temples*, Souvenir, Mahavira Jayanti Week, Calcutta, 1964.

কমলা মুখোপাধ্যায়

দিল্লী, দেহলি ভারতের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য (ইউনিয়ন টেরিটরি) ও ভারত যুক্ত-রাষ্ট্রের রাজধানী।

রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে (১৯৫৬ খ্রী) দিল্লী টাউন গ্রুপ ও ৩০০টি গ্রাম লইয়া রাষ্ট্রপতি শাসিত 'দিল্লী ইউনিয়ন টেরিটরি' গঠিত হয়। ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য একটি 'অ্যাড্‌ভাইসরী কাউন্সিল' আছে। রাজ্যের আয়তন ১৪৮৪ বর্গকিলোমিটার (৫৭৩ বর্গমাইল) ও জনসংখ্যা ২৬৫৮৬১২ (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে)। দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (পুরাতন দিল্লী, ননাক-গড়, নারেলা, সিভিল লাইন্‌স, পশ্চিম দিল্লী, শাহ্‌দারা, দিল্লী ফোর্ট ও মেহেরৌলি), নয়াদিল্লী ও দিল্লী ক্যান্টনমেণ্ট লইয়া 'দিল্লী টাউন গ্রুপ' গঠিত। ইহার আয়তন ৩২৬ বর্গকিলোমিটার (১২৬ বর্গমাইল) ও জনসংখ্যা ২৩৫৯৪০৮। দিল্লীর গ্রামাঞ্চলের আয়তন ১১৫৮ বর্গকিলোমিটার (৪৪৭ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা ২৯৯২০৪।

দিল্লী নগরী ভারত প্রজাতন্ত্রের রাজধানী। ইহা গাঙ্গেয় উপত্যকায় যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে (২৮°৪১' উত্তর এবং ৭৭° ১৩' পূর্ব) অবস্থিত। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১৩ মিটার (৭০০ ফুট) উচ্চে অবস্থিত।

দিল্লীতে অবস্থিত আরাবল্লি পাহাড়ের অংশবিশেষ প্রস্তরযুক্ত নিম্ন মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ইহা প্রস্থে ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল)। দিল্লী শহরের ১৬ কিলোমিটার (১০ মাইল) দক্ষিণে আরাবল্লি পাহাড় দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘুরিয়া গুরগাঁও জেলার সীমানায় প্রবেশ করিয়াছে। অপর শাখা উত্তরদিকে দিল্লী শহরের পশ্চিম দিক দিয়া গিয়া ঐতিহাসিক দিল্লী রিজ (Delhi Ridge) নামে পরিচিত হইয়া যমুনা নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। জেলার অধিকাংশ স্থান পলল মৃত্তিকায় গঠিত। রাজ্যের দক্ষিণাংশে অলওয়ার কোয়ার্জাইটের ছোট ছোট পাহাড় আছে।

দিল্লী

এখানে মে মাসে সর্বাপেক্ষা গরম (৪১° সেন্টিগ্রেড) অনুভূত হয়। জানুয়ারি মাসে শীতের প্রকোপ বেশি হয় (৬° সেন্টিগ্রেড)। মে ও জুন মাসে দিনের বেলায় অসহ্য উষ্ণ বায়ু (লু) প্রবাহিত হয় ; কিন্তু রাত্রে ঠাণ্ডা থাকে। শীত ও গ্রীষ্মের অন্তর্বর্তী সময়ে প্রবল ধুলিঝড় প্রবাহিত হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জুন-সেপ্টেম্বর মাসে এখানে বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৬৩৫ মিলিমিটার (২৫ ইঞ্চি)। উত্তর-পূর্বে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জানুয়ারি-এপ্রিল মাসে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়।

পূর্ব দিকে যমুনা নদী, উত্তর-পশ্চিম দিকে ক্ষয়িষ্ণু আরাবল্লি পাহাড় ও দক্ষিণ দিকে ওখলা ও মেহেরৌলি পর্যন্ত বিস্তৃত ত্রিভুজাকৃতি দিল্লী সমতটে বহু ঐতিহাসিক নগরের পত্তন ও লয় যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মহাভারত হইতে জানা যায় পাণ্ডবেরা খাণ্ডবারণ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে এক নগরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা চন্দ্রবংশীয় পাণ্ডবগণের রাজধানী ছিল। কেহ কেহ 'পুরানা কিল্লা'কে ইন্দ্রপথ বা ইন্দরপৎ বলেন। অনেকে অনুমান করেন, এইখানেই প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের অবস্থান ছিল। কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুর বর্তমান দিল্লীর ৯৭ কিলোমিটার (৬০ মাইল) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল।

ভৌগোলিক টলেমি (Ptolemy)-কৃত ভারতবর্ষের মানচিত্রে মথুরা ও থানেশ্বরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দাইদালা নামে একটি স্থানের অবস্থান চিহ্নিত আছে। অনেকের অনুমান, এই দাইদালাতেই বর্তমান দিল্লীর অবস্থান।

খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম অনঙ্গপাল নামে তোমর বংশীয় এক রাজপুত রাজা কুতব মিনারের নিকট লাল কোট দুর্গ নির্মাণ করিয়া দিল্লী নগরীর পত্তন করেন। ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে পৃথ্বীরাজ চৌহান বা রায় পিথোরা স্বীয় নামে প্রাকার বেষ্টিত দুর্গনগর 'রায় পিথোরা'র পত্তন করেন। রাজা পৃথ্বীরাজ কর্তৃক এখানে ২৭টি হিন্দু মন্দির রাজপুত স্থাপত্যের আদর্শে নির্মিত হয়। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রী) পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘুরীর নিকট পরাভূত হন এবং দিল্লীতে মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয়। মহম্মদ ঘুরী কর্তৃক দিল্লীর শাসন কর্তা নিযুক্ত হইয়া কুতবুদ্দীন আইবক পৃথ্বীরাজের হিন্দুমন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া সেই উপাদানে মেহেরৌলির নিকটে কুবাত-উল-ইসলাম নামে এক বিখ্যাত মসজিদ নির্মাণ করেন। আজিও তাহার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ('কুতব মিনার' দ্র) ইহার পাশে তিনি বিখ্যাত কুতব মিনারের নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন (১১৯৯ খ্রী)। কুতবুদ্দীনের উত্তরাধিকারী ইলতুত্‌মিসের সময়ে দিল্লী লাল কোটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তার লাভ করে।

আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালে মঙ্গোলগণ বারবার দিল্লী আক্রমণ করে। পরিশেষে তিনি তাহাদের আক্রমণ পর্যুদস্ত করিয়া তাহাদের বিতাড়িত করেন এবং লাল কোটের ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) উত্তরে সিরি নামক একটি দুর্গ নির্মাণ করেন (১৩০৪ খ্রী)। পরে এই দুর্গের চতুর্দিকে বসতি গড়িয়া ওঠে। ইহার কিছু দূরে তিনি 'হউজ খাস' নামে এক বৃহৎ জলাশয় খনন করেন।

১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গিয়াসুদ্দীন তোগলক পুরাতন দিল্লীর ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) দক্ষিণ-পূর্বে তোগলকাবাদ নামে এক শহরের পত্তন করেন। পরিস্রুত জলের অভাবের জন্য তাহা স্থায়ী হয় নাই। পরবর্তী সুলতান মহম্মদ-বিন-তোগলক রাজধানী দিল্লী হইতে ১২৮৭ কিলোমিটার (৮০০ মাইল) দূরে দাক্ষিণাত্যের দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত করেন। ইহার ফলে দিল্লী প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়ে। কিছুদিন পরে দৌলতাবাদ হইতে রাজধানী দিল্লীতে পুনরায় স্থানান্তরিত হয়। তিনি দিল্লী ও সিরির মধ্যবর্তী শহরতলী অঞ্চল প্রাচীরবেষ্টিত করেন এবং মধ্যস্থলে প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রাচীর-বেষ্টিত এই নূতন শহরটি 'জাহানপানা' নামে পরিচিত। শহরটি কুতব মিনার হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) বিস্তৃত।

ফিরোজ শাহ্‌ তোগলক অবলুপ্ত ইন্দ্রপ্রস্থের স্থানে 'ফিরোজাবাদ' নামে এক নূতন শহরের পত্তন করেন। তিনি কুতব মিনারের নিকটস্থ দিল্লী হইতে রাজধানী ফিরোজাবাদে স্থানান্তরিত করেন। ইহা পরবর্তী কালের 'শাহ্‌জাহানাবাদ' পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফিরোজ শাহ্‌ হউজ খাস জলাশয়ের নিকট আরবী ভাষা প্রসারের জন্য এক সুদৃশ্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পরিবহণের সুবিধার জন্য তিনি দিল্লীর সহিত যমুনা খালের সংযোজনকারী এক খাল খনন করেন।

১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ করেন। দিল্লীকে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যান।

১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে লোদীবংশীয় দ্বিতীয় সিকান্দার আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর দিল্লী অধিকার করেন। রাজত্বের অধিকাংশ সময়ে তিনি আগ্রায় বসবাস করিতেন। তিনি দিল্লীর প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার সময়ে দিল্লীতে ৫২টি বাজার ও ৩৬টি মণ্ডি ছিল। তাঁহার পুত্র

হুমায়ুন ইন্দ্রপ্রস্থের স্থানে 'পুরান কিল্লা' নামে এক দুর্গ-নগরের নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ্ কর্তৃক হুমায়ুন বিতাড়িত হন। শের শাহ্ প্রাচীরের দ্বারা পুরান কিল্লাকে এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিয়া হুমায়ুনের আরব্ধ কার্য শেষ করেন। তিনি লুপ্ত ফিরোজাবাদে 'শিরগড়' নামে এক জনপদের পত্তন করেন এবং বর্তমান যমুনা সেতুর স্থলে সালিমগড় নামে এক দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৬ বৎসর পর হুমায়ুন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় শতাব্দী কাল দিল্লী রাজধানীর মর্যাদা হইতে বিচ্যুত ছিল। আকবর এবং তাহার পুত্র জাহাঙ্গীর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যথাক্রমে আগ্রা এবং লাহোরে অবস্থান করেন।

শাহ্জাহান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজধানীকে আগ্রা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। তিনি প্রশস্ত রাজপথ ও সুদৃশ্য উদ্যানবিশিষ্ট 'শাহ্জাহানাবাদ'-এর পত্তন করেন। বহু দিনের উপেক্ষিত দিল্লীর সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়া আসে। শহরটি ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। তিনি শহরের পূর্বপ্রান্তে যমুনার অনতিদূরে বিখ্যাত লাল কেল্লার পত্তন করেন (১৬৩৯ খ্রী) এবং শহরের অন্তঃস্থলে জুম্মা মসজিদ নির্মাণ করেন। সমসাময়িক জৈনগণ কর্তৃক বর্তমান চাঁদনি চকের প্রবেশ পথে 'লাল জৈন মন্দির' নির্মিত হয়। বেগমবাগ (বর্তমান কুইন্স্ গার্ডেন) তৎকালে নির্মিত হয়। সবজিমণ্ডির নিকটস্থ রোশনারা বাগ অদ্যাপি বিদ্যমান।

শাহ্জাহানের পর মাত্র কয়েক বৎসর ব্যতীত দিল্লী মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দিল্লীর উন্নতি অব্যাহত ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে দিল্লীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ২ লক্ষ হয় এবং জনবসতি ফিরোজাবাদ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ কর্তৃক দিল্লী আক্রান্ত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে নাদির শাহ্ কর্তৃক দিল্লী আক্রান্ত হয় ও প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লেকের অধীনে ইংরেজগণ মারাঠাদের পরাভূত করিয়া দিল্লীতে প্রবেশ করে এবং মোগল অধিপতিকে আশ্রয় দান করে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী শহর এবং ইহার উত্তর ও দক্ষিণের দুইটি পরগনা লইয়া দিল্লী জেলার সৃষ্টি হয়। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে রেসিডেন্ট ও চিফ কমিশনারের পদ রহিত করিয়া দিল্লীর শাসনভার উত্তর-পশ্চিম প্রাদেশিক সরকারের অধীন এক কমিশনারের উপর অর্পিত হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে দিল্লী তিন মাস কাল সিপাহীদের অধীনে ছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর শাসনভার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লাল কেল্লা 'দিল্লীর দুর্গ' নামে অভিহিত হয় এবং ইহা ইংরেজদের সেনা-ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রেলপথে দিল্লীর সহিত কলিকাতার এবং পরবর্তী বৎসর সিন্ধু ও পাঞ্জাবের যোগাযোগ সংস্থাপিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেলপথে বোম্বাই দিল্লীর সহিত সংযুক্ত হয়। ইহার পরে ক্রমে দিল্লী ভারতের বিভিন্ন অংশের সহিত রেলপথ দ্বারা যুক্ত হয়। কয়েক বৎসর পরে সড়কপথে দিল্লী মীরাট ও কর্নালের সহিত যুক্ত হয় এবং ক্রমশঃ উত্তর ভারতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ হইয়া ওঠে।

১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লীর উপকণ্ঠে বহু উপনগরীর সৃষ্টি হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী প্রথম শ্রেণীর পৌর সংস্থায় পরিণত হয়। ২০শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'দিল্লী নগর পৌরসংস্থা'-র আয়তন ছিল প্রায় ১৪ বর্গ-কিলোমিটার (৫'৫ বর্গমাইল)।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লী পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর তারিখে ঐতিহাসিক দিল্লীর দরবারে ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের এক ঘোষণায় ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী জেলা স্বয়ংশাসিত প্রদেশে পরিণত হয়। পূর্বে দিল্লী, সোনেপাত ও বল্লভগড় তহশীল লইয়া দিল্লী জেলা গঠিত ছিল। উক্ত বৎসরে শুধু দিল্লী তহশীল এবং বল্লভগড় তহশীলের কয়েকটি গ্রাম লইয়া দিল্লী প্রদেশের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে যুক্ত প্রদেশের (অধুনা উত্তর প্রদেশ) মীরাট জেলার ৪৬টি গ্রাম দিল্লী প্রদেশের সহিত যুক্ত হয়।

প্রায় দেড়শত বৎসর পরে দিল্লী পুনরায় রাজধানীর মর্যাদা প্রাপ্ত হওয়ায় ইহা দ্রুত প্রসারিত হইতে থাকে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জনসংখ্যা শতকরা ৫০ জন বৃদ্ধি পায় এবং আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া ১২৪ বর্গকিলোমিটার (৪৮ বর্গমাইল) হয়।

দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের ঘোষণার পরে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের পূর্বে এবং শাহ্জাহানাবাদের দক্ষিণে অবস্থিত রায়সিনায় নূতন নগরের পরিকল্পনা করা হয়। এডুইন লুটেন্স্ (Edwin Lutyens) ও হার্বার্ট বেকারের (Herbert Baker) পরিকল্পনায় ১৮ বৎসর কাজ করিয়া কিঞ্চিদধিক অর্ধলক্ষ লোকের জন্য ১৫ কোটি

দিল্লী

টাকা ব্যয়ে এবং ২৯ হাজার শ্রমিকের শ্রমে বহু উদ্যান ও প্রশস্ত রাজপথশোভিত নূতন নগরের পত্তন হয়। পুরাতন দিল্লীর নিকটে নগরের অন্তঃস্থলে সুদৃশ্য বিপণিশোভিত কনট প্লেস অবস্থিত। এখান হইতে বহু প্রশস্ত রাজপথ চতুর্দিকে বাহির হইয়া নগরের বিভিন্ন অংশের সহিত যুক্ত হইয়াছে। কনট প্লেসের ২·৪ কিলোমিটার (১·৫ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে সরকারী দপ্তর-সমূহ অবস্থিত। ইহার কয়েক মাইল পশ্চিমে ক্যাণ্টনমেণ্ট অবস্থিত। ভাইসরয় ভবন (অধুনা রাষ্ট্রপতি ভবন) এবং সেক্রেটারিয়েট ভবন ভারতীয় ও রোমীয় মিশ্র স্থাপত্যের নিদর্শন। পরিষদ্ ভবন (অধুনা সংসদ্ ভবন) সেক্রেটারিয়েট ভবনের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

সেণ্ট্রাল পার্ক নয়া দিল্লীকে দুইটি অংশে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তর প্রান্তে অবস্থিত কনট প্লেসের পশ্চিমে নিম্ন ও মধ্য আয়ের কর্মচারীদের বাসস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। নয়া দিল্লীর দক্ষিণাংশে উচ্চতম আয়ের কিছু ভারতীয় ও ইংরেজ কর্মচারীদের বাসগৃহ গড়িয়া উঠিয়াছে। 'গোল মার্কেট' নির্মিত হয় দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয়ের জন্য। নাগরিকদের চিকিৎসার জন্য তিনটি বৃহৎ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ প্রান্তে ঘোড়দৌড়ের মাঠ ও গল্‌ফ খেলার মাঠ নির্মিত হয়।

সিভিল লাইন্‌স-এ অবস্থিত ক্যাণ্টনমেণ্টকে নয়া দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত করা হয়। দিল্লী-গুরগাঁও সড়ক দ্বারা উহা দিল্লীর সহিত যুক্ত হয়। ইহার উত্তর দিকে কৃষি গবেষণার জন্য 'ইম্পিরিয়াল এগ্রিকাল্‌চারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে এখানে 'ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবরেটরি' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্টের পর দিল্লী স্বাধীন ভারতের রাজধানী হয়। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের জন্য পশ্চিম পাঞ্জাব, বালুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে প্রায় পাঁচ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু দিল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লীর চতুর্দিকে বহু উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়িয়া তোলেন। এইভাবে দক্ষিণে নিজামউদ্দীন, জঙ্গপুরা, ভোগল, লাজপৎনগর, কালকাজী ও মালব্যনগর এবং পশ্চিম দিল্লীতে দুইটি রাজেন্দ্রনগর, তিনটি প্যাটেলনগর, মোতিনগর, রমেশনগর, তিলকনগর, ১ম ও ২য় তিহার গড়িয়া ওঠে। কোটলামাঠের বিপরীত দিকে অবস্থিত দিল্লী-জেলখানা পশ্চিম দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় এবং পুরাতন জেলখানার গৃহে মেডিক্যাল কলেজ ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহ্‌দারায় গান্ধীনগরের পত্তন হয়। দিল্লীর উত্তরে তিন লক্ষ উদ্বাস্তুর চিরস্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য কিংসওয়ে ক্যাম্প নির্মিত হয়।

দিল্লীকে সহজেই পাঁচ প্রকার বৃত্তিভিত্তিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—১. ব্যবসায়-বাণিজ্য অঞ্চল ২. শিল্প অঞ্চল ৩. প্রশাসন -সংস্কৃতি অঞ্চল ৪. আবাসিক অঞ্চল ও ৫. সংস্কৃতি অঞ্চল। বিভাগগুলির স্বাতন্ত্র্য সহজেই পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীন ভারতে বহু সরকারী অফিস দিল্লীর বিভিন্ন স্থানে নির্মিত হয়। ক্রমে কৃষিভবন, উদ্যোগভবন, রেল-ভবন, বায়ুভবন প্রভৃতি নির্মিত হয়। জনপথে জাতীয় সংগ্রহাগার নির্মিত হয়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমাবেশ ও সভার জন্য মৌলানা আজাদ রোডে বিজ্ঞান-ভবন নির্মিত হয়।

ক্রমবর্ধমান সরকারি কর্মচারীদের বাসস্থানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিনটি বিনয়-নগর, শ্যামনগর, মাননগর, কাকানগর, মোতিবাগ এবং রামকৃষ্ণপুরমের পত্তন করেন। ইহা ছাড়া সুন্দরনগর, গল্‌ফ লিংক্‌স, জোরবাগ, কৃষাণনগর পরিবর্ধিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিকদের কার্যালয় ও বাসস্থানের জন্য চাণক্যপুরী উপনগরীর সৃষ্টি হয়। চাণক্যপুরীর নিকটে কিচনের রোডে রেলওয়ে কর্মীদের জন্য বাসস্থান নির্মিত হয়। ইহা ব্যতীত হউজ খাস, গ্রীন পার্ক, নিউ দিল্লী সাউথ একস্‌টেনসন ও মডেল টাউনে বেসরকারি অধিবাসীর আবাসস্থল গড়িয়া ওঠে। লাজপৎ-নগরের নিকটে ও রিং রোডের উভয় পার্শ্বে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের জন্য 'ডিফেন্স কলোনি' গড়িয়া উঠিয়াছে। দিল্লীর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বিভিন্ন শিল্প প্রসারের ফলে নূতন নূতন বাণিজ্য-অঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে।

দিল্লী ইউনিয়ন টেরিটরির অন্তর্গত ৮৪১৪টি কারখানার মধ্যে দিল্লীর শহর অঞ্চলে ৮১৮৩টি এবং দিল্লীর গ্রাম অঞ্চলে ২৩১টি কারখানা প্রতিষ্ঠিত (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী) হয়। সবজিমণ্ডি দিল্লীর শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ।

ইংরেজদের আগমনের পূর্বে দিল্লীতে আধুনিক শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীন দিল্লীর হস্ত ও কুটিরশিল্পের, সুনাম ভারতের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে বিভিন্ন শক্তি-পরিচালিত আধুনিক শিল্পের প্রসার ঘটিতে থাকে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীতে বিভিন্ন ছোটবড় কারখানার সংখ্যা ছিল ২২ এবং কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩৫০০।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের সময় হইতে বিভিন্ন যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটিতে থাকে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রধানতঃ বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে সর্বাঙ্গীণ শিল্পোন্নতি দেখা যায়।

বস্ত্রবয়ন শিল্পের জন্য দিল্লী বিখ্যাত। এখানে ৭টি কাপড়ের কল এবং ৮৬টি সূতার কল আছে। ইহা এখানকার পুরাতন শিল্প। এখানকার হোসিয়ারি বস্ত্রও বিখ্যাত। ইহা ছাড়া এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্যসূত্র শিল্পের ২৮টি প্রতিষ্ঠান আছে।

শহরে ১৭৩টি লৌহশিল্পের বড় প্রতিষ্ঠান আছে। তাম্র ও পিত্তল-নির্মিত বাসনপত্র দিল্লীর আদি শিল্প। উত্তর ভারতের মধ্যে দিল্লী এই শিল্পে শীর্ষস্থানীয়। দিল্লীতে তিনটি এনামেল কারখানা আছে। চর্মশিল্প এখানে কুটির-শিল্প হিসাবে প্রসার লাভ করিয়াছে। দারুশিল্প আর-মেনিয়ান রোড ও কুতব মিনারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছে। দিল্লী ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে গম, জোয়ার, বাজরা, ছোলা, ইক্ষু ও তামাক উৎপন্ন হয়।

গার্স্টেন ব্যস্‌সন, নয়া বাজার রোড, কুইন্‌স রোড, ফৈজ বাজার, চাঁদনি চক এবং চৌরি বাজার রোড প্রভৃতি পুরাতন দিল্লীর প্রধান রাজপথ। পার্লামেণ্ট স্ট্রীট, কুইন্‌স-ওয়ে, কার্জন রোড প্রভৃতি নয়াদিল্লীর প্রধান রাজপথ। পুরাতন দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে সদর বাজার রোড, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড প্রভৃতি রাস্তা প্রধান। দিল্লীর সহিত অন্যান্য শহর ও অঞ্চলের যোগাযোগকারী বড় বড় সড়কের মধ্যে মথুরা-দিল্লী রোড, আম্বালা-দিল্লী রোড, মীরাট-দিল্লী রোড এবং কানপুর-আলীগড়-দিল্লী রোড প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইহা ছাড়া রেলপথে দিল্লী ভারতের প্রতিটি প্রধান শহর, বন্দর ও অঞ্চলের সহিত যুক্ত। বিমানপথে দিল্লী পৃথিবী ও ভারতের প্রধান প্রধান নগরের সহিত যুক্ত। এখানকার পালাম বিমান বন্দর হইতে ৮টি অন্তর্দেশীয় ও ৫টি বহির্দেশীয় বিমানপথে বিমান চলাচল হয়। দেশের মধ্যে বিমান চলাচলের জন্য সফদারজঙ্গ নামে আর একটি ছোট বিমান বন্দর আছে।

দিল্লীর শহর অঞ্চলে ৩২৫টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ২৭টি কলেজ আছে। ১৫টি টেকনিক্যাল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসাবিদ্যা ও তৎসংলগ্ন বিষয় পাঠের জন্য ৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ৪টি শিক্ষক-শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান আছে। কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য 'ইণ্ডিয়ান এগ্রিকাল্‌চারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট' রহিয়াছে। উচ্চতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া দিল্লীতে অবস্থিত।

দিল্লীর বিখ্যাত রামলীলা-ময়দানে বড় বড় সভা সমিতি ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পুরাতন দিল্লীতে কুইন্‌স গার্ডেন, কিং এডওয়ার্ড পার্ক, আজমলখান পার্ক ও কুদসিয়া গার্ডেন বিখ্যাত। নয়াদিল্লীতে ওয়েলিংটন পার্ক, তাল কোতরা গার্ডেন, কনট প্লেসের অভ্যন্তরস্থ নেহরু পার্ক, বুদ্ধ জয়ন্তী পার্ক এবং জন্তর-মন্তর উদ্যান উল্লেখ-যোগ্য। পুরাতন দিল্লীর ১৩ কিলোমিটার (৮ মাইল) দক্ষিণে ওখলায় যমুনা ও আগ্রা খালের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত প্রমোদ-উদ্যান ভ্রমণকারীদের এক উপভোগ্য স্থান।

খেলাধুলার মাঠের মধ্যে ফিরোজ শা কোটলা গ্রাউণ্ড, মিউনিসিপ্যাল ফুটবল গ্রাউণ্ড, নিউ দিল্লী স্পোর্টস স্টেডিয়াম ও তালকোতরা মাঠ বিখ্যাত।

দিল্লীর শহর অঞ্চলে ১২টি হিন্দু-মন্দির, ৯টি শিখ-গুরুদ্বার, ৫টি আর্যসমাজ মন্দির, ৪টি মসজিদ ও ১০টি চার্চ আছে। দিল্লী স্থাপত্য-শিল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। ইহার অতুলনীয় ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যের মধ্যে লাল কেল্লা, জুম্মা মসজিদ, চাঁদনি চক, অশোক স্তম্ভ, পুরাতন কিল্লা, হুমায়ুনের সমাধি, হউজ খাস সরোবর, লৌহস্তম্ভ, জন্তর-মন্তর, কুতব মিনার, সূর্যকুণ্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যমুনা-তীরে শান্তিবনে মহাত্মা গান্ধীর সমাধি রক্ষিত আছে।

বিভিন্ন দেশের আগন্তুকদের জন্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভাল হোটেল আছে। যেমন সরকার পরিচালিত 'অশোকা হোটেল'।

দ্র *The Imperial Gezetteer of India*, vol. XI, Oxford, 1908 ; Ministry of Transport, Govt. of India, Tourist Division, *Guide to Delhi*, New Delhi, 1956 ; A. Bopegamage, *Delhi : A Study in Urban Sociology*, Bombay, 1957 ; Govt. of India, Department of Tourism, *Delhi*, New Delhi, 1963.

হিমাংশুকুমার সরকার

দীউ গোয়া, দমান, দীউ দ্র

দীক্ষা গুরুর নিকট হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে উপাস্য দেবতার মন্ত্রগ্রহণ। অদীক্ষিত ব্যক্তি তন্ত্রনির্দিষ্ট দেবপূজা

বা পূজার সমস্ত কার্য করিতে পারেন না। দীক্ষিত হইলে স্ত্রী এবং শূদ্রেরাও ইহা করিবার অধিকার লাভ করেন। গুরুরূপে স্ত্রীলোকের মন্ত্রদানের অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছে। সকলে সকল মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারেন না। কে কোন মন্ত্র গ্রহণের যোগ্য তাহা স্থির করিবার জন্য দীক্ষাভিলাষীর নাম, জন্মনক্ষত্র, জন্মরাশি প্রভৃতির সহিত গ্রহণীয় মন্ত্র মিলাইয়া দেখিবার ব্যবস্থা আছে। উপাস্য দেবতা ও গৃহীত মন্ত্র কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নাই। শাস্ত্রনিরূপিত দিনে গৃহস্থ গুরু নির্ধারিত মন্ত্রে উপাস্য দেবতার যথাবিহিত পূজা করিয়া শিষ্যের কানে মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, এইরূপ নিয়ম আছে। সাধারণতঃ শিষ্য সপত্নীক দীক্ষিত হইতেন। পতির দীক্ষার পূর্বে পত্নীর দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। বংশানুক্রমে কুলগুরুর বংশধরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের প্রথা ছিল। নানা কারণে সে প্রথা ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে এবং এখন অনেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী গুরুর নিকট স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে দীক্ষিত হইতেছেন।

দ্র কৃষ্ণানন্দ, তন্ত্রসার; রঘুনন্দন, দীক্ষাতত্ত্ব।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দীঘা ২২°৪০′ উত্তর ও ৮৭°৫০′ পূর্ব। ইহা মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত উপনগরী। সুদৃঢ় বেলাভূমি ও নিরাপদ অগভীর সমুদ্র ইহার বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের খড়্গপুর জংশন এবং কণ্টাই রোড স্টেশনের সহিত যথাক্রমে ১২২ কিলোমিটার এবং ৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ বর্ত্মদ্বারা সংযুক্ত। রূপনারায়ণ এবং কংশাবতী নদীর উপর সেতু নির্মিত হওয়ায় বর্ত্মপথে কলিকাতা আরও নিকটবর্তী হইয়াছে।

জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। তাপমাত্রা ১৭° হইতে ৩৫° সেন্টিগ্রেডের ভিতর। মোট বৃষ্টির পরিমাণ বাৎসরিক ১০৯২ মিলিমিটার (৪৩ ইঞ্চি)।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের 'বেঙ্গল গেজেট'-এ বীরকুলের (যে পরগনায় আধুনিক দীঘা অবস্থিত) উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎকালিক হিকির গেজেটে এবং অন্যান্য পুস্তকেও ইহার উল্লেখ আছে। ঐ সময়েও এই স্থানে একটি আধুনিক নগর নির্মাণের সরকারি পরিকল্পনা গঠিত হইয়াছিল এবং ওয়ারেন হেস্টিংস প্রমুখ রাজন্যবর্গের গৃহাদিও নির্মিত হইয়াছিল। এইরূপ অনুমান করা যায় যে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার জনপ্রিয়তা লুপ্ত হইয়া যায়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী পুরাতন কাগজপত্র হইতে অনুসন্ধিৎসু হইয়া পথহীন এই বেলাভূমি পুনরাবিষ্কার করেন এবং সরকারকে ইহার উন্নতিকল্পে অনুরোধ করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইহার উন্নয়ন-পরিকল্পনা সরকারি নথিভুক্ত করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতার পর বেলাভূমির বালিয়াড়ির উপর প্রথম বন গঠন আরম্ভ হয় এবং ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দীঘা উন্নয়ন-পরিকল্পনা গৃহীত হয়। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক নগরী গঠিত হইবার কাজ চলিতেছে।

দীঘার পুরাতন গ্রামটি বালিয়াড়ির বিস্তারের জন্য উপকূল হইতে প্রায় ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) দূরে চলিয়া গিয়াছে। উপকূলে কোনও গ্রাম নাই। গ্রামের অনেক অধিবাসী সমুদ্রে মৎস্যশিকার করিয়া জীবিকানির্বাহ করে।

অরুণকান্তি চট্টোপাধ্যায়

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩ খ্রী) বাংলার অন্যতম প্রধান নাট্যকার। নদিয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম। পিতা কালাচাঁদ মিত্র বালক দীনবন্ধুকে কলিকাতায় আনাইয়া কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (পরবর্তী কালে হেয়ার স্কুল) ভর্তি করিয়া দেন। বাল্যকাল হইতেই দীনবন্ধু মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল ও হিন্দু কলেজে পাঠকালে কয়েকবার বৃত্তি পান।

তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় পোস্টমাস্টারের পদ পান। দেড় বৎসর পরে ওড়িশার ইন্‌স্পেক্টিং পোস্টমাস্টার নিযুক্ত হন এবং পরে নদিয়া ও ঢাকা বিভাগে প্রেরিত হন। এই সময়ে তিনি স্বচক্ষে নীলকরদের অত্যাচার দেখেন। ১৮৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় পোস্টমাস্টার জেনারেলের সাহায্যকারী হিসাবে নিযুক্ত হইয়া আসেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে লুসাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য তিনি কাছাড়ে যান। সেই সময়ে ডাক বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল হগের অপ্রীতিভাজন হওয়ায় পোস্টমাস্টার জেনারেলের সহকারীর পদ হইতে তিনি অপসারিত হন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটে।

দীনবন্ধু প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকাদ্বয়ে গুপ্তকবির অনুকরণে রচিত গদ্য-পদ্য প্রকাশ করেন। 'সাধুরঞ্জন'-এ প্রকাশিত 'মানবচরিত্র' কবিতাটি তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। দীনবন্ধুর 'সুরধুনী কাব্য' ১ম ভাগ (১৮৭১ খ্রী) ও ২য় ভাগ

(১৮৭৬ খ্রী) হিমালয় হইতে গঙ্গাদেবীর সাগরসঙ্গমে যাত্রার ছন্দোবদ্ধ বর্ণনা। ইহাতে উত্তর ভারতের বিভিন্ন জনপদ এবং বঙ্গদেশ ও সমকালীন কলিকাতার বিশিষ্ট স্থান ও স্মরণীয় মনীষীদের চমৎকার বর্ণনা রহিয়াছে। দীনবন্ধুর অপর কাব্য 'দ্বাদশ কবিতা' (১৮৭২ খ্রী)-র খণ্ড কবিতাগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুসরণ থাকিলেও ১৮শ শতকের ইংরেজী কবিতার প্রভাব লক্ষিত হয়।

নাট্যকাররূপেই দীনবন্ধু সমধিক খ্যাত। তাঁহার 'নীলদর্পণ' (১৮৬০ খ্রী) 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়া নীলকরদের বিরুদ্ধে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। মাইকেল মধুসূদন ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া গোপনে তিরস্কৃত হন, পাদ্রী লং সাহেব ইহা প্রকাশ করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং সীটনকার অপদস্থ হন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে 'আংকল টম্‌স কেবিন'-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। বাঙালীর জাতীয় রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উপর এই নাটকের প্রভাব অসামান্য। বাংলার কৃষকদের বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থানকে নাটকে রূপায়িত করার যে ধারা দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ'-এ প্রবর্তিত করিলেন, বিংশ শতাব্দীতে তাহা বহু নাট্যকার কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্তী রচনা 'নবীন তপস্বিনী' নাটক (১৮৬৩ খ্রী)। তাঁহার 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬ খ্রী) উচ্চাঙ্গের সামাজিক নাটক; দীনবন্ধু এই নাটকে দক্ষ নাট্যকারের উপযুক্ত 'নিরপেক্ষ' বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। পরবর্তী রচনা 'লীলাবতী' (১৮৬৭ খ্রী) সামাজিক নাটক। শেষ নাট্যরচনা 'কমলে কামিনী' নাটক (১৮৭৩ খ্রী)। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬ খ্রী) এবং 'জামাই বারিক' (১৮৭২ খ্রী) নামে দুইখানি প্রহসনও তিনি রচনা করেন।

দীনবন্ধু ছিলেন মাটির কাছাকাছি মানুষ, সমাজ-কল্যাণনিষ্ঠ শিল্পী। তিনি মেকির শত্রু এবং সত্যের পথগামী ছিলেন। তিনি জীবন সম্বন্ধে বহুব্যাপ্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা কল্পনাশক্তির ন্যূনতাকে পূরণ করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণ সমাজদৃষ্টি, লোকচরিত্রজ্ঞান, জীবন্ত চরিত্রের সৃষ্টি এবং মানবিক সহানুভূতি তাঁহার সৃষ্টিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

দ্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা,' বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ২১, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

দীনার দীনার নামটির উৎপত্তি দীনারিউস (Denarius) রূপে খ্যাত এক প্রকারের রোমক মুদ্রার নাম হইতে। প্রথমে ইহার মূল্য দশটি ২ আউন্স ওজনের ব্রঞ্জ 'এস' (Aes)-এর সমতুল্য ছিল বলিয়া ইহাকে 'দীনারিউস' (দশ-এর সমন্বয়) আখ্যা দেওয়া হয়।

আনুমানিক ১৮৭ অথবা ১৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রৌপ্যমুদ্রা হিসাবে দীনারিউসের প্রথম প্রচলন আরম্ভ হয়। প্রতিটির ওজন ছিল ৭০ গ্রেন; শীঘ্রই উহা নামিয়া আসে ৬০ গ্রেনে। প্রথম দিকে দীনারিউসের মুখ্য (অবভার্স) ও গৌণ (রিভার্স) দিকে যথাক্রমে বেল্লোনা (Bellona)-র মুখ ও অশ্বারূঢ় দিয়সকুরি (Dioscuri)-র প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকিত। বিভিন্ন রোমক সম্রাটদের রাজত্বকালে রৌপ্য দীনারিউস, স্বর্ণ অরিয়ুস ও অন্যান্য রোমক মুদ্রার তৌলরীতির বহু পরিবর্তন ঘটে। অনেক সময়ে রোমক স্বর্ণমুদ্রাও দীনারিউস বা দীনারিয়ুস অরিয়ুস নামে অভিহিত হইত। দীনারিউসের জনপ্রিয়তা ও বহু ব্যবহারের ফলে বোধহয় ১ম শতাব্দী হইতেই ইহা 'মুদ্রা' কথাটির প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং পরে অরিয়ুস নামের সহিত দীনারিউস কথাটি যুক্ত হয়।

অগাস্টাসের আমলে (খ্রীষ্টপূর্ব ২৭-১৪খ্রী) ভারতের সহিত রোমক সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং বিক্রীত পণ্যের মূল্য হিসাবে, এমন কি বোধহয় পণ্যদ্রব্য হিসাবেও, এগুলির আমদানি হইত। দক্ষিণ ভারতে স্থানীয় মুদ্রারূপে এইগুলির ব্যবহারের ও ঐগুলির অনুকরণে নূতন মুদ্রা তৈয়ারি করার যথেষ্ট প্রমাণ আছে এবং অলংকারের অংশরূপে দীনার ব্যবহারের পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণও আছে। এই প্রসঙ্গে জৈন কল্পসূত্রে উল্লিখিত 'দীনারমাল্য' কথাটি স্মরণযোগ্য।

ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে, রাজা বিমকদফিসেসের রাজত্বকালে প্রবর্তিত কুষাণ সাম্রাজ্যের স্বর্ণমুদ্রার তৌলরীতির (প্রায় ১২৩ গ্রেন) সহিত অগাস্টাসের আমলের রোমক স্বর্ণমুদ্রার ওজনরীতির (১২২·৬ গ্রেন) বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান। কুষাণ মুদ্রার উপরে রোমক 'কয়েন-টাইপ'-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। ইহা অসম্ভব নয় যে, কুষাণ স্বর্ণমুদ্রা কখনও কখনও দীনার নামে অভিহিত হইত। কয়েকটি গুপ্তকালীন লেখ-তে দীনার (<দীনারিউস) মুদ্রার উল্লেখ আছে। কুষাণ মুদ্রাই গুপ্তরাজ্যের প্রথম যুগের স্বর্ণমুদ্রার ওজন ও একটি টাইপ-এর (দণ্ডায়মান রাজা : উপবিষ্টা দেবী) উৎস বলিয়া স্বীকৃত। সুতরাং কয়েকটি গুপ্তকালীন লেখ-তে দীনার মুদ্রার উল্লেখ হইতে মনে হয় যে অন্ততঃ কখনও কখনও কুষাণ স্বর্ণমুদ্রাও দীনার নামে

অভিহিত। বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন স্মৃতির মতে 'সুবর্ণ' ও 'দীনার'-এর মূল্য একই; অমরকোষে 'নিষ্ক' ও 'দীনার' শব্দ দুইটি সমার্থক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। অবশ্য গুপ্তকালীন একটি লেখ-এ 'দীনার' ও 'সুবর্ণ' এই দুইজাতীয় মুদ্রার পৃথক উল্লেখ আছে।

অন্ধ্র প্রদেশের নাগার্জুনকোণ্ডায় প্রাপ্ত ইক্ষ্বাকুদের আমলের একটি লেখ-তে 'দীনারি' (<'দীনার') কথাটির উল্লেখ আছে। অবশ্য এই দীনারগুলি স্বর্ণ অথবা রৌপ্য মুদ্রা তাহা ঐ লেখ পাঠে বোঝা যায় না। ঐ সময়কার অন্য কয়েকটি লেখ-তে 'দীনারি-মাসক' নামে আর এক শ্রেণীর মুদ্রার কথা বলা হইয়াছে; 'মাসক' এক প্রকারের ভারতীয় মুদ্রা বা ওজনের নাম।

মধ্যযুগের আদিভাগে কাশ্মীরের দীনার কথাটি আরও বৃহত্তর অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। 'রাজতরঙ্গিণী'তে রাজা হর্ষের আমলের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র দীনারের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা মুদ্রার প্রতিশব্দ হিসাবে দীনার কথাটির ব্যবহারের ইঙ্গিত করে। কাশ্মীরের প্রথম উল্লেখযোগ্য 'কয়েন-টাইপ' (দণ্ডায়মান রাজা : উপবিষ্টা দেবী) বোধহয় এই ইঙ্গিতই করে যে দীনার কথাটির কাশ্মীরে আমদানির মূলে ছিল ঐ অঞ্চলের সহিত কুষাণ মুদ্রার পরিচিতি। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে এবং এমন কি একেবারে শেষভাগেও দক্ষিণ ভারতে দীনার মুদ্রার প্রচলন ছিল।

যেমন ভারতে তেমনই ভারতের বাহিরেও অনেক দেশের মুদ্রা-জগতে রোমক মুদ্রার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে যুগোস্লাভিয়ায় বর্তমানে দীনার মুদ্রার প্রচলন আছে।

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩ খ্রী) প্রখ্যাত কথাশিল্পী। নদিয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট দীনেন্দ্রকুমারের জন্ম হয়। পিতার নাম ব্রজনাথ রায়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মহিষাদল এইচ. ই. স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ (?) খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজসাহীর জেলা জজের কর্মচারী হিসাবে চাকরি করিতে যান। রাজসাহী থাকিতে কবি রজনীকান্ত সেনের উৎসাহে দীনেন্দ্রকুমার একখানি ফরাসী উপন্যাসের (ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে) অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত (১২৯৫ বঙ্গাব্দ) 'একটি কুসুমের মর্মকথা : প্রবাদ প্রশ্নে' দীনেন্দ্রকুমারের প্রথম প্রকাশিত রচনা। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অরবিন্দের বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বরোদায় গমন করেন। সেখানে দুই বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সহকারী সম্পাদকরূপে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'-তে যোগদান করেন; কিছুকাল পরে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'-র সম্পাদকের কার্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 'নন্দন-কানন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'নন্দন-কানন সিরিজ' বা 'রহস্য লহরী সিরিজ'-এর পুস্তকমালার উপর তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জুন মেহেরপুরে দীনেন্দ্রকুমারের মৃত্যু হয়।

দীনেন্দ্রকুমারের প্রকাশিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'বাসন্তী' (১৮৯৮ খ্রী), 'হামিদা' (১৮৯৯ খ্রী), 'পট' (১৯০১ খ্রী), 'অজয়সিংহের কুঠী' (১৯০২ খ্রী), 'পল্লীচিত্র' (১৯০৪ খ্রী), 'পল্লীবৈচিত্র্য' (১৯০৫ খ্রী), 'পল্লীকথা' (১৯১৭ খ্রী), 'পল্লী চরিত্র' (১৯২৩ খ্রী) ও 'ঢেঁকির কীর্তি' (১৯২৫ খ্রী) গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

দীনেশচন্দ্র গুপ্ত (১৯১১-৩১ খ্রী) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর জন্ম। পিতা সতীশচন্দ্র ও মাতা বিনোদিনী। পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের যশোলং।

দীনেশচন্দ্র শুধু শহিদ বিপ্লবী ছিলেন না, ফাঁসির প্রতীক্ষায় থাকাকালে লিখিত দীনেশের পত্রাবলী সুধীসমাজে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়।

ঢাকা জেলায় ও পরে মেদিনীপুরে বিপ্লবী সংগঠন গড়িয়া তোলা দীনেশের অসাধারণ কীর্তি। এই সংগঠনের ফলেই বিপ্লবী দল মেদিনীপুরে পরপর তিনজন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হত্যায় সমর্থ হয়।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর বিনয় বসুর নেতৃত্বে বাদল (সুধীর গুপ্ত) ও দীনেশ রাইটার্স বিল্‌ডিং আক্রমণ করেন, ফলে কারা-বিভাগের প্রধান সিম্প্‌সনের প্রাণ যায়, পরে অফিসের ঘর হইতে ঘরে তাড়া করিয়া এই তিনজন বিপ্লবী কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইওরোপীয় কর্মচারীকে গুরুতরভাবে আহত করেন। পরিশেষে তাঁহারা উগ্র বিষ খাইয়া এবং নিজেদের মাথায় গুলি করিয়া আত্মবিলোপের চেষ্টা করেন। বিনয় ও বাদলের মৃত্যু হয়, কিন্তু দীনেশকে বাঁচাইয়া তোলা হয়। বিচারের পর ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুলাই আলিপুর জেলে তাঁহার ফাঁসি হয়।

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯০-১৯৫৭ খ্রী) রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও হুগলি প্রভৃতি কলেজের অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের গবেষণায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। হাতের লেখা পুরানো পুথি, কুলজি ও সরকারি দপ্তরের কাগজপত্র ঘাঁটিয়া তিনি প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপে সংগৃহীত বিবরণ অবলম্বনে রচিত তাঁহার বহু ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধ বিভিন্ন প্রখ্যাত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টার্লি', 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', 'প্রবাসী' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত 'বাঙালীর সারস্বত অবদান : বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) ও দারভাঙ্গার মিথিলা রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট প্রকাশিত 'হিস্টরি অফ নব্য ন্যায় ইন মিথিলা' (১৯৫৮ খ্রী) গ্রন্থে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার কিছু অংশ স্থানলাভ করিয়াছে। প্রথম গ্রন্থখানি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করিয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহার অপর দুইখানি গ্রন্থ হইতেছে 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) ও রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন' (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ)। পুথিশালাধ্যক্ষ, পত্রিকাধ্যক্ষ এবং সহঃসভাপতি রূপে তিনি অনেক দিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দীনেশচন্দ্র মজুমদার (১৯০৭-১৯৩৪ খ্রী) স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী নেতা। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বসিরহাটে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পূর্ণচন্দ্র মজুমদার। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা সেনহাটির রসিকলাল দাসের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দীনেশ যুগান্তর বিপ্লবীদলে যোগদান করেন; ইহার পর (১৯২৮-২৯ খ্রী) জনসেবা ও বিপ্লবীদলের প্রসার-চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ আগস্ট ডালহৌসি স্কোয়ারে সেনহাটির অনুজা সেন ও অতুল সেন সহ দীনেশচন্দ্র বোমা ও রিভলবার সহকারে তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে আক্রমণ করেন; বোমার আঘাতে অনুজার মৃত্যু হয় এবং অতুল সেন পলায়ন করেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র পুলিশের হস্তে ধৃত হন। ইহার ফলে দীনেশচন্দ্র মজুমদারের ৬৩ বৎসর দ্বীপান্তরাদেশ হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অপর দুইজন বন্দীসহ দীনেশচন্দ্র মেদিনীপুর জেল হইতে পলায়ন করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে ফরাসী পুলিশ কমিশনার দীনেশচন্দ্রের হস্তে নিহত হন। তিন মাস পরে কলিকাতায় দীনেশচন্দ্র ও তাঁহার অপর দুইজন সঙ্গীর সহিত পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয় ও তিনজনেই পুলিশের হস্তে ধৃত হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে দীনেশচন্দ্রের ফাঁসি হয়।

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯ খ্রী) বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক এবং গবেষক। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩ নভেম্বর মাতুলালয় ঢাকা জেলার বগজুড়ী গ্রামে জন্ম। পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র সেন। পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুয়াপুর গ্রাম। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জগন্নাথ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স ও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হবিগঞ্জে শিক্ষকতা করার সময়ে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরেজীতে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে গ্রাম্য বাংলায় রক্ষিত জীর্ণ এবং লুপ্ত-প্রায় অপ্রকাশিত প্রাচীন বাংলা পুথির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং বিভিন্ন গ্রামে পদব্রজে ঘুরিয়া ঐ সকল পুথি সংগ্রহ শুরু করেন। এইভাবে সংগৃহীত বহু অমূল্য পুথি তিনি পরে সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন ; তন্মধ্যে শ্রীকর নন্দী রচিত 'ছুটিখানের মহাভারত' (১৯০৫ খ্রী) বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থের সহযোগিতায় এবং মাণিক গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীধর্মমঙ্গল' (১৯০৫ খ্রী) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় প্রকাশ করেন। তিনিই প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। এই গবেষণার ফলস্বরূপ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬ খ্রী), 'হিস্টরি অফ বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাণ্ড লিটারেচার' (১৯১১ খ্রী), 'বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়' ১ম ও ২য় খণ্ড (১৯১৪ খ্রী) এবং 'দি বেঙ্গলী রামায়নজ়' (১৯২০ খ্রী) প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দীনেশচন্দ্রের প্রধান কীর্তি। প্রাচীন সাহিত্যের পৌরাণিক আখ্যায়িকা লইয়া তিনি 'রামায়ণী কথা' (১৯০৪ খ্রী), 'বেহুলা' (১৯০৭ খ্রী), 'সতী' (১৯০৭ খ্রী), 'ফুল্লরা' (১৯০৭ খ্রী) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য অবলম্বনে 'দি বৈষ্ণব লিটারেচার অফ মিডিয়েভ্যাল বেঙ্গল' (১৯১৭ খ্রী), 'চৈতন্য অ্যাণ্ড হিজ় কম্প্যানিয়ন্‌স' (১৯১৭ খ্রী), 'চৈতন্য অ্যাণ্ড হিজ় এজ' (১৯২২ খ্রী), 'বৃহৎ বঙ্গ' (১৯৩৫ খ্রী) প্রভৃতি গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে বিশেষতঃ

পূর্ব বঙ্গে মুখে মুখে প্রচলিত লোকগীতি অবলম্বনে তিনি 'দি ফোক লিটারেচার অফ বেঙ্গল' (১৯২০ খ্রী) প্রকাশ করেন। অতঃপর মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং তাহার ইংরেজী আলোচনা ও অনুবাদ 'ঈস্টার্ণ বেঙ্গল ব্যালাড্‌স: মৈমনসিংহ' এবং 'ঈস্টার্ণ বেঙ্গল ব্যালাড্‌স' নামে সর্বসমেত মোট আট খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৯২৩-৩২ খ্রী)। ১৯০৯ ও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত 'রীডার' পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ'-এর পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি-স্বরূপ তিনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করেন।

দীনেশচন্দ্র ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মূল-সভাপতি এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের মূল ও সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর কলিকাতার উপকণ্ঠে বেহালার বাসভবনে তিনি পরলোকগমন করেন।

সুধাংশুশেখর চক্রবর্তী

দীনেশচরণ বসু (১৮৫১-১৮৯৮ খ্রী) ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত শ্রীবাড়ি ছিল কবি দীনেশচরণ বসুর পৈতৃক নিবাস। পিতা অভয়াচরণ বসু পূর্ণিয়ার ফৌজদারি আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। সেখানেই কবির জন্ম। ইনি নাসিরাবাদ মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পূর্ব বঙ্গের সামাজিক আন্দোলনের সহিত-তাঁহার যোগ ছিল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ আগস্ট ভারত-সভার অনুকরণে ময়মনসিংহ-সভা স্থাপনে দীনেশচরণ অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ইনি গোয়ালন্দে কলেরায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দীনেশচরণ বিশ বৎসর বয়সেই কবিখ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'মানসবিকাশ' কাব্যের সমালোচনাসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।

দীনেশচরণের কবিতা 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব', 'বামা-তোষিণী', 'আলোচনা' এবং 'বাঙালী'-তে প্রকাশিত হইত। সম্পাদনাসূত্রে তিনি 'ভারতমিহির', 'চারুবার্তা', 'ঢাকাপ্রকাশ' এবং 'চারুমিহির' পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। প্রধানতঃ কবি বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার 'কুলকলঙ্কিনী' উপন্যাসটি সেকালে যথেষ্ট পরিচিত ছিল। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 'সংগীত মুক্তাবলী'তে তাঁহার সাতটি গান সংকলিত আছে; 'বাঙালীর গান'-এ এগুলি ছাড়া আরো দুইটি গান আছে।

'মানসবিকাশ'-এ দীনেশচরণের নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ আছে; কিন্তু পরবর্তী কাব্যে হেমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দও হেমচন্দ্রের অনুরূপ। দীনেশচরণ ছবি আঁকিতেও পারিতেন। ইহার প্রকাশিত গ্রন্থ: 'মানসবিকাশ' (১২৮০ বঙ্গাব্দ); 'কবিকাহিনী' (১৮৭৬ খ্রী); 'কুলকলঙ্কিনী' (১৮৮৩ খ্রী); 'মহাপ্রস্থান কাব্য' (১৮৮৭ খ্রী)।

ভবতোষ দত্ত

দুঃখীরাম, উমেশ মজুমদার (১৮৭৫-১৯২৯ খ্রী) কলিকাতায় ফুটবল ও ক্রিকেটের প্রথম যুগের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ এবং এরিয়ান ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার অগণিত শিষ্যস্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে বিজয় ভাদুড়ি, শিব ভাদুড়ি, পাটু মুখার্জি, ফকির মুখার্জি, টগর মুখার্জি, ফকির শী, ছোনে মজুমদার, পণ্টু গাঙ্গুলী, সামাদ, মতিয়ার রহমান, করুণা ভট্টাচার্য, সুঁটে ব্যানার্জি ও কমল ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবাহ করেন নাই; আজীবন খেলাধূলার পরিচর্যা করিয়াই কাটাইয়া দেন; এমন কি ব্যবসায়ে যাহা উপার্জন করিতেন তাহারও অধিকাংশই খেলার জন্য ব্যয় করিতেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুন তাঁহার মৃত্যু হয়।

কমল ভট্টাচার্য

দুঃখী শ্যামদাস 'গোবিন্দমঙ্গল'-এর রচয়িতা। শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সহচর উৎকলনিবাসী শ্যামানন্দ দাসের উপনাম ছিল দুঃখী। শ্যামানন্দ দুঃখী এবং সম্ভবতঃ দুঃখিনী ভণিতায় পদরচনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি দুঃখী শ্যামদাস ভণিতা ব্যবহার করেন নাই। 'গোবিন্দমঙ্গল' হইতে জানা যায় যে কবির পিতার নাম শ্রীমুখ এবং মাতার নাম সুমতি। কবি বহু স্থানে বলিয়াছেন, 'শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে মজাইয়া চিত। কহে দুঃখী শ্যামদাস মধুর সংগীত॥' অথবা 'গোবিন্দমঙ্গল পোথা, ভুবনে দুর্লভ কথা, শ্রীমুখনন্দন রস গান।' ইহা হইতে ধারণা জন্মে যে কবি গান করিয়া তাঁহার কাব্য শুনাইতেন। 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় হইতে ঈশানচন্দ্র বসু এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে দুঃখী শ্যামের বংশীয়

গৌরাঙ্গ অধিকারীকে দেবোত্তরের যে সনন্দ দেওয়া হয় তাহাতে "শ্রীশ্রী৺সেবার কারণ" লিখিত হয়; তিনি অনুমান করেন যে 'গোবিন্দমঙ্গল' গ্রন্থখানিই সেই দেবতা। এই অনুমানের পোষক কোনও প্রমাণ তিনি দেন নাই। তিনি আরও বলেন যে মেদিনীপুর জেলার কেদারকুণ্ড পরগনার হরিহরপুর গ্রামে দুঃখী শ্যামদাসের বাস ছিল এবং ইনি ভরদ্বাজগোত্রীয় দে-বংশীয় কায়স্থ। এই কিংবদন্তির ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া কেহ কেহ বলেন যে শ্যামদাসের পিতা শ্রীমুখ এবং কাশীরাম দাসের খুল্লপিতামহ শ্রীমুখ অভিন্ন।

'গোবিন্দমঙ্গল'-এ ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত লীলা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া কবি দানলীলা ও নৌকাখণ্ড লিখিয়াছেন, তবে নৌকাখণ্ডে যমুনার জলের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনা করিয়াছেন।

বিমানবিহারী মজুমদার

দুঃশাসন ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর দ্বিতীয় পুত্র। দুর্যোধনের কনিষ্ঠ সহোদর ও তাঁহার পাপাচরণের প্রধান সহায়ক। কপট দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলে দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করিয়া রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভাস্থলে লইয়া আসেন এবং ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজন ও পাণ্ডবগণের সম্মুখে অশ্লীল ভাষায় তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে থাকেন। অঙ্গরাজ কর্ণের প্ররোচনায় তিনি দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত হইলে দ্রৌপদী ব্যাকুলভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দ্রৌপদীর অঙ্গ হইতে বহুবর্ণ বস্ত্র অফুরন্তভাবে বাহির হইতে থাকায় দুঃশাসনের চেষ্টা ব্যর্থ হয় (মহাভারত, পুনা সংস্করণ, ২।৬০।১৮-৬১।৪১)। পিতামহ ভীষ্ম ও মহামতি বিদুর এই কুকর্মের নিন্দা করেন এবং অনুজ বিকর্ণও যুক্তিপূর্ণ বাক্যে দ্রৌপদীর অবমাননা যে অসঙ্গত তাহা দৃঢ়তার সহিত বলেন। দ্রৌপদীর অবমাননায় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ভীম যুদ্ধে দুর্বৃত্ত ভরতবংশের কলংকস্বরূপ দুঃশাসনের বক্ষোরক্ত পান করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সপ্তদশ দিনে ভীম গদাঘাতে ভূপাতিত দুঃশাসনের বিদীর্ণ বক্ষ হইতে উষ্ণ শোণিত পান করিয়া পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। ভীমের তীক্ষ্ণধার অসির আঘাতে দুঃশাসনের মৃত্যু ঘটে।

যূথিকা ঘোষ

দুধ স্তনের ক্ষরণ। শিশু স্তন্যপায়ীর ইহা স্বাভাবিক আহার্য। বিশ্বে গোদুগ্ধের প্রচলন সর্বাধিক হইলেও বিভিন্ন দেশে অন্যান্য প্রাণীর দুধও অল্পাধিক পান করা হয়। ভারত, মিশর, ফিলিপ্পীন প্রভৃতি দেশে মহিষদুগ্ধের যথেষ্ট প্রচলন আছে। ইরাক ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলিতে ছাগদুগ্ধ, মধ্য এশিয়ায় গাধার দুধ, আরব দেশগুলিতে উটের দুধ, তিব্বত ও নেপালে চমরীর দুধ, ইওরোপ ও আমেরিকার উত্তরাঞ্চল ও উত্তর মেরু অঞ্চলে বল্গা হরিণের দুধ এবং ফ্রান্স, ইটালী, গ্রীস প্রভৃতি দেশে মেষদুগ্ধের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

পুষ্টিতত্ত্বের দিক দিয়া দুধ প্রায় আদর্শ খাদ্য। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন, অজৈব লবণ ও জল— খাদ্যের সকল উপাদানই দুধে বর্তমান। নারীর স্তন হইতে সাধারণতঃ দৈনিক ৩০০-৯০০ মিলিলিটার দুধ ক্ষরিত হয়। নারী, গাভী বা ছাগীর ১০০ গ্রাম দুধের খাদ্যমূল্য প্রায় ৬৮ কিলোক্যালরি; কিন্তু ১০০ গ্রাম মহিষদুগ্ধের খাদ্যমূল্য ১০০ কিলোক্যালরিরও অধিক ('খাদ্য' দ্র)।

বিভিন্ন প্রাণীর দুধে জলের শতকরা পরিমাণ নিম্নরূপ— নারীদুগ্ধ-৮৭·৫, গোদুগ্ধ-৮৭·৩, ছাগদুগ্ধ-৮৭·৫, মহিষদুগ্ধ-৮২·৯ এবং অশ্বদুগ্ধ-৯০·৬। ঐ সকল প্রাণীর দুধে অজৈব লবণের শতকরা পরিমাণ এইরূপ—নারীদুগ্ধে-০·২, গোদুগ্ধ-০·৫, ছাগদুগ্ধ-০·৭, মহিষদুগ্ধ-০·৭ এবং অশ্বদুগ্ধ-০·৪। অজৈব লবণের উপাদানগুলির মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্লোরিন উল্লেখযোগ্য; সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লৌহ, তামা, দস্তা, গন্ধক প্রভৃতিও স্বল্প পরিমাণে বর্তমান; লৌহ ও তামার পরিমাণ অতি সামান্য।

বিভিন্ন প্রাণীর দুধে প্রোটিনের শতকরা পরিমাণ নিম্নরূপ—নারীদুগ্ধ-১·৬, গোদুগ্ধ-৩·৭, ছাগদুগ্ধ-৩·৪, মহিষদুগ্ধ-৩·৫ এবং অশ্বদুগ্ধ-২·১। নারীদুগ্ধে অন্যান্য দুধ অপেক্ষা প্রোটিনের পরিমাণ কম। দুধের প্রোটিন প্রধানতঃ তিনপ্রকার—ল্যাক্‌ট্‌-অ্যালবুমিন, ল্যাক্‌ট্‌-গ্লোবিউলিন এবং ফসফরাস-ঘটিত প্রোটিন কেসিন। নারীদুগ্ধে কেসিনের পরিমাণ গোদুগ্ধের তুলনায় অনেক কম। এসকল প্রোটিন রক্তরসের অ্যামাইনো অ্যাসিড ও প্রোটিন হইতে স্তনেই উৎপন্ন হয়। দুধের প্রোটিনে অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির সুষম সমাহার থাকায় ইহাদের প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন বলা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পাকস্থলীতে পাচনের সময় ছাগদুগ্ধের কেসিন হইতে যে ছানা উৎপন্ন হয় তাহা অন্যান্য দুগ্ধ হইতে অনুরূপভাবে উৎপন্ন ছানা অপেক্ষা কোমলতর ও সহজপাচ্য।

নানা প্রাণীর দুধে কার্বোহাইড্রেটের শতকরা পরিমাণ নিম্নরূপ—নারীদুগ্ধ-৬·৯, গোদুগ্ধ-৪·৯, ছাগদুগ্ধ-৪·৫, মহিষদুগ্ধ-৫·১ এবং অশ্বদুগ্ধ-৫·৮। দুধের কার্বোহাইড্রেট

ল্যাক্‌টোজ্‌ বা দুগ্ধশর্করা রক্তের গ্লুকোজ হইতে স্তনেই উৎপন্ন হয়। নারীদুগ্ধে ল্যাক্‌টোজের পরিমাণ অন্যান্য দুধের তুলনায় অধিক। অশ্ব ও সমগোত্রীয় প্রাণীদের দুধে ল্যাক্‌টোজের পরিমাণ মনুষ্যেতর অন্যান্য প্রাণীর দুগ্ধের তুলনায় বেশি।

বিভিন্ন প্রাণীর দুধে স্নেহপদার্থের শতকরা পরিমাণ নিম্নরূপ—নারীদুগ্ধ-৩·৮, গোদুগ্ধ-৩·৬, ছাগদুগ্ধ-৩·৯, মহিষদুগ্ধ-৭·৫ এবং অশ্বদুগ্ধ-১·১। মহিষদুগ্ধে স্নেহপদার্থের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ায় রোগী ও শিশুর পক্ষে উহা অপেক্ষাকৃত গুরুপাক। ছাগদুগ্ধের স্নেহপদার্থের অণুগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বলিয়া অনেক প্রাণীর দুধের তুলনায় উহা সহজপাচ্য। দুধের স্নেহপদার্থে ক্ষুদ্রাণু চর্বিজাতীয় অ্যাসিডগুলির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘাণু চর্বিজাতীয় অ্যাসিডগুলির মধ্যে ওলেইক, মিরিস্টিক ও পামিটিক অ্যাসিড অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বর্তমান। রক্তরসের গ্লুকোজ, অ্যাসেটিক অ্যাসিড প্রভৃতি হইতে স্তনে এই স্নেহপদার্থের সংশ্লেষণ ঘটে। ইহা ছাড়া খাদ্য হইতে আহৃত স্নেহপদার্থও দুধের স্নেহপদার্থে পরিণত হইতে পারে।

দুধের ভিটামিনগুলির মধ্যে ভিটামিন এ এবং রাইবোফ্ল্যাভিন উল্লেখযোগ্য; ভিটামিন বি-গোত্রের অন্য কয়েকটি ভিটামিনও স্বল্প পরিমাণে বর্তমান। দুধে ভিটামিন সি দেহের প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প পরিমাণে থাকে। বর্তমানে বহু উন্নত দেশে দুধে ভিটামিন ডি মিশাইয়া দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শাদা দুধে পীতাভ বর্ণের দুধ অপেক্ষা ভিটামিন এ কম—এ ধারণা ভ্রমাত্মক।

দিনে ৫০০ গ্রাম গোদুগ্ধ পান করিলে তাহা হইতে প্রাপ্তবয়স্কের দেহে শক্তি ও বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণের নিম্নরূপ অংশগুলির পূরণ হয়ঃ শক্তি (ক্যালরি) -একাদশমাংশ, প্রোটিন -একচতুর্থাংশের অধিক, ক্যালসিয়াম -তিনচতুর্থাংশ, ফসফরাস -একতৃতীয়াংশের অধিক, ভিটামিন এ -একষষ্ঠাংশ, থিয়ামিন-একঅষ্টমাংশ এবং রাইবোফ্ল্যাভিন -অর্ধাংশ।

নারীদুগ্ধ ও অন্যান্য প্রাণীর দুগ্ধের মধ্যে প্রোটিন ও ল্যাক্‌টোজের পরিমাণের তারতম্য থাকায় শিশুকে মাতৃস্তন্যের পরিবর্তে গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ দেওয়ার সময় ঐ দুধে জল মিশাইয়া প্রোটিনের পরিমাণ হ্রাস করা উচিত এবং অতিরিক্ত ল্যাক্‌টোজও মিশাইয়া দেওয়া উচিত।

প্যাস্টেরাইজেশন পদ্ধতির দ্বারা দুধ সংরক্ষণ করিলে খাদ্যমূল্যের বিশেষ তারতম্য হয় না (‘খাদ্যসংরক্ষণ’ দ্র)। দুধ ফোটাইয়া লইলে উহা জীবাণুমুক্ত হয়, কিন্তু সামান্য যেটুকু ভিটামিন সি দুধে থাকে তাহা ফোটানোর ফলে নষ্ট হইয়া যায়।

বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে স্তনের গ্রন্থিগুলি অবিকশিত থাকে। বয়ঃপ্রাপ্তির সময় ডিম্বাশয় হইতে ক্ষরিত ঈস্ট্রোজেন নামক স্ত্রীযৌনহর্মোনের প্রভাবে স্তনের নালীগুলি বর্ধিত হয়, ফলে সে সময়ে স্ত্রীঅঙ্গে স্তনের কিছু বিকাশ ঘটে। গর্ভধারণের সময় ডিম্বাশয় হইতে ক্ষরিত প্রোজেস্টেরোন নামক স্ত্রীযৌনহর্মোনের প্রভাবে স্তনের গ্রন্থিগুলির বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পূর্ণ হয়। গর্ভকালের অন্তে রক্তে স্ত্রীযৌনহর্মোনের পরিমাণ কমিয়া গেলে পিটুইটারি গ্রন্থি হইতে প্রোল্যাক্‌টিন নামক হর্মোন ক্ষরিত হয়; ইহার ক্রিয়ার ফলে স্তন হইতে দুগ্ধক্ষরণ আরম্ভ হয়। সন্তান যতদিন মাতৃস্তন্যের উপর নির্ভর করে, ততদিন তাহার স্তন্যপানের সময় স্তনবৃন্ত হইতে উদ্ভূত আবেগ (ইম্‌পাল্‌স্‌) নার্ভ বাহিয়া মস্তিষ্কে গিয়া প্রোল্যাক্‌টিনের ক্ষরণ উদ্দীপিত করে, ফলে বহুদিন ধরিয়া দুগ্ধক্ষরণ অব্যাহত থাকে। প্রতিবার স্তন্যপানের সময় স্তনবৃন্ত হইতে উদ্ভূত আবেগ পিটুইটারি গ্রন্থি হইতে অক্সিটোসিন হর্মোনের ক্ষরণ ঘটায়, ইহার প্রভাবে স্তনে দুগ্ধনালীগুলি সংকুচিত হইয়া সঞ্চিত দুগ্ধ বাহির করিয়া দেয়। থাইরয়েড এবং অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির হর্মোনও দুগ্ধক্ষরণকে প্রভাবিত করে।

সন্তানজন্মের পর প্রথম ৪-৫ দিন যে দুধ নিঃসৃত হয়, তাহার প্রকৃতি সাধারণ দুধ হইতে ভিন্ন; ইহাকে ‘কলোস্ট্রাম’ বলে। কলোস্ট্রামে শর্করা ও স্নেহপদার্থের পরিমাণ কম; কিন্তু অজৈব লবণ ও রক্তরসের গ্লোবিউলিনের মত প্রোটিন ইহাতে যথেষ্ট থাকে। ঐ প্রোটিনের অণুগুলি অপরিবর্তিত অবস্থাতেই নবজাতকের আন্ত্রিক ঝিল্লী অতিক্রম করিয়া তাহার রক্তে বিশোষিত হয় ও তাহার দেহে জীবাণুবারক (অ্যান্‌টিবডি) পদার্থরূপে কাজ করে।

সন্তানের প্রায় ৬ মাস বয়স পর্যন্ত নারীর দুধের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়; সন্তানের বয়স বাড়িলে স্তন্যপান কমিয়া যায়, তখন দুধের পরিমাণও কমিতে থাকে।

দুধ হইতে ছানা, ঘন দুধ, ননি, মাখন, দই, পনির, ঘি, আইসক্রিম প্রভৃতি নানা দ্রব্য উৎপন্ন হয়। দুধে পরিমাণ মত সাইট্রিক অ্যাসিড, ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড বা ফটকিরি মিশাইয়া ফোটাইলে দুধের প্রোটিন কেসিন স্নেহপদার্থসহ জমিয়া গিয়া ছানায় পরিণত হয়; দুধের শর্করা, অজৈব লবণ এবং কিছু পরিমাণে ল্যাক্‌ট্‌-অ্যাল্‌বুমিন ছানার জলে দ্রবীভূত হইয়া থাকিয়া যাওয়ায়

ছানার জলেরও কিছু খাদ্যমূল্য থাকে। দুধে চিনি মিশাইয়া অবাত (ভ্যাকুয়াম) পরিবেশে উহাকে ঘন করিলে সুমিষ্ট ঘন দুধ (কন্‌ডেন্‌স্‌ড মিল্‌ক) উৎপন্ন হয়; ইহাতে সাধারণতঃ প্রায় ২৭ ভাগ জল, ৫৫ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ৮ ভাগ প্রোটিন, ৮ ভাগ স্নেহপদার্থ ও ২ ভাগ অজৈব লবণ থাকে। ঘন দুধে জেলাটিন নামক জান্তব প্রোটিন, চিনি, সুগন্ধি পদার্থ প্রভৃতি মিশাইয়া ঠাণ্ডায় জমাইলে আইসক্রিম উৎপন্ন হয়; বিভিন্ন প্রকার আইসক্রিমে শতকরা প্রায় ৬১ ভাগ জল, ২১ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ৪ ভাগ প্রোটিন, ১৩ ভাগ স্নেহপদার্থ ও ১ ভাগ অজৈব লবণ বর্তমান। দুধের উপরের স্তরে যে স্নেহপদার্থ ভাসিয়া ওঠে তাহাকে পৃথক করিয়া লইয়া ননি তৈয়ারি করা হয়; ননিতে শতকরা প্রায় ৭০-৭৩ ভাগ জল, ২-৩ ভাগ প্রোটিন, ২০-২৫ ভাগ স্নেহপদার্থ, ৩-৪ ভাগ কার্বোহাইড্রেট এবং ১ ভাগেরও কম অজৈব লবণ থাকে। ননি মন্থন করিলে মুখ্যতঃ তাহার স্নেহপদার্থ পৃথক হইয়া যায়, ইহাতে কিছু অজৈব লবণ যোগ করিয়া ও জলের ভাগ কমাইয়া মাখন তৈয়ারি করা হয়; মাখনে শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ জল, ৮১-৮৩ ভাগ স্নেহপদার্থ, ০·৫ ভাগ প্রোটিন, ০·৫ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ২ ভাগ অজৈব লবণ এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন এ বর্তমান। মাখন অথবা সন্ধিত (ফার্মেন্টেড) সর জ্বাল দিলে জল এবং কিছু কিছু অসংপৃক্ত ও ক্ষুদ্রাণু চর্বিজাতীয় অ্যাসিড উড়িয়া গিয়া অর্ধতরল ও ঈষদচ্ছ ঘি উৎপন্ন হয়। ঘৃতে উপরি-উক্ত দুইপ্রকার চর্বিজাতীয় অ্যাসিড কম থাকায় ইহা মাখনের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী। অনেক সময় ঘৃতে নানা রঞ্জক দ্রব্য ও গন্ধদ্রব্য মিশানো হয় (‘ঘি’ দ্র)। রিনিন (rennin) নামক এন্‌জাইমের সাহায্যে দুধ হইতে প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ পৃথক করিয়া লইয়া তাহাদের সন্ধান (ফার্মেন্টেশন), বিশুদ্ধীকরণ প্রভৃতির দ্বারা পনির তৈয়ারি করা হয়। বিভিন্ন পনির উৎপাদনের কার্যে লাক্‌তোবাসিল্লস কাসেই (*Lactobacillus casei*), প্রোপিওনিবাক্‌তেরিয়ম শের্‌মানিই (*Propionibacterium shermanii*), পেনিসিল্লিয়ম রোক্‌ফোর্তি (*Penicillium roqueforti*) প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাক্‌টিরিয়া ও ছত্রাক ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকার পনিরে সাধারণতঃ শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ জল, ৩০-৩৫ ভাগ স্নেহপদার্থ, ২০-২৫ ভাগ প্রোটিন, ১·৫-২ ভাগ কার্বোহাইড্রেট ও ২-৫ ভাগ অজৈব লবণ থাকে। দুধে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড উৎপাদক ব্যাক্‌টিরিয়া মিশাইয়া প্রায় ৪০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে রাখিয়া দিলে ঐ জীবাণুগুলির ক্রিয়ায় ক্রমশঃ দুধের শর্করা ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডে পরিণত হয় ও উহার প্রভাবে দুধের প্রোটিনগুলি জমিয়া দই উৎপন্ন হয়; দধিবীজ বা দম্বলে ঐরূপ জীবাণু থাকে। দই খাইলে উহার অম্লত্ব এবং জীবাণুগুলির প্রভাবে অন্ত্রে নানাপ্রকার রোগজীবাণুর বৃদ্ধি নিবারিত হয়। দধির অম্লত্ব অন্ত্র হইতে খাদ্যের ক্যালসিয়ামের বিশোষণেও সাহায্য করে (‘দই’ দ্র)।

দুধের প্রোটিন কেসিন রঙ, আঠালো সংযোজক পদার্থ (গ্লু) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। কেসিনের সহিত ফর্ম্যাল্‌ডিহাইডের বিক্রিয়ার ফলে হাল্কা রঙের একপ্রকার প্লাষ্টিক উৎপন্ন হয়। কৃত্রিম হস্তীদন্ত, ঝিনুক বা মহিষশৃঙ্গের মত আকারের শোভনদ্রব্য এবং খেলনা, কৌটা, বোতাম প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফর্ম্যাল্‌ডিহাইডের সাহায্যে কেসিন হইতে একপ্রকার বয়নযোগ্য তন্তুও প্রস্তুত করা হয়। শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন অবদ্রবের (ইমাল্‌শন) স্থায়িত্ববর্ধনে কেসিনের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। খাদ্য ও কাগজ শিল্পেও ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। ‘গোরু’, ‘ছাগল’ ও ‘ডেয়ারি’ দ্র।

দ্র S. J. Folley, *The Physiology and Biochemistry of Lactation*, Edinburgh, 1956.

দেবজ্যোতি দাশ

দুন্দুভি প্রাচীনতম বৃহৎ চর্মবাদ্যের অন্যতম। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ৩৩ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে স্বাতিমুনি দেবগণের দুন্দুভিকে দেখিয়া মুরজবাদ্য নির্মাণ করেন। এই বাদ্যটির আকৃতি অর্ধগোলাকার বৃহৎ গামলার ন্যায়। শাস্ত্রীয় বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে আম্রকাষ্ঠে নির্মিত এই বাদ্যের ভিতর দিকটি কাঁসার পাতে মোড়া থাকিত এবং মুখভাগ চর্মে আচ্ছাদিত হইত। ইহাতে কোনও বলয় যুক্ত হইত না। চর্মকৃত দৃঢ় দণ্ড বা সারঙ্গশৃঙ্গ দণ্ড দ্বারা যন্ত্রটি বাদিত হইত। মঙ্গলোৎসবে, বিজয়োৎসবে বা দেবালয়ে ইহার ব্যবহার প্রসিদ্ধ। নাকাড়া নামক অনুরূপ যন্ত্রটি মুসলমান যুগ হইতে এদেশে প্রচলিত আছে এবং উৎসব ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।

দ্র নাট্যশাস্ত্র, ৩৩ অধ্যায়, কাশী সংস্কৃত সিরিজ; শার্ঙ্গদেব, সঙ্গীত রত্নাকর, কলিকাতা, ১৯৫১।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

দুবোয়া, জাঁ আঁতোয়ান (১৭৬৫-১৮৪৮ খ্রী) ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও গ্রন্থকার। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে

জন্ম। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক (মিশনারি)-রূপে পণ্ডিচেরীতে আসেন, সেখান হইতে এই কার্যের নিমিত্ত টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর মহীশূরে যান এবং প্রথমে শ্রীরঙ্গপত্তনে ও পরে মহীশূরের সাথলি নামক স্থানে দীর্ঘকাল কাটান। তিনি মুসলমান-ধর্মান্তরিত হিন্দুদের খ্রীষ্টান করার কাজে ব্যাপৃত হন। ডুবোয়া দক্ষিণ ভারতে সাধারণ মানুষের মধ্যে একাদিক্রমে ৩১ বৎসর কাল অবস্থান করেন এবং ভারতীয়দের একান্ত প্রীতিভাজন হন। দক্ষিণ ভারতের হিন্দু অধিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি এবং আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তিনি 'হিন্দু ম্যানার্স, কাস্টম্‌স অ্যাণ্ড সেরিমনিজ' নামে এক প্রামাণিক গ্রন্থ লেখেন। ভারতে খ্রীষ্টানধর্মের অবস্থাসংক্রান্ত পত্রাবলীতে ডুবোয়া এই মত ব্যক্ত করেন যে, বর্ণহিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা অসম্ভব। তিনি ফরাসী ভাষায় 'পঞ্চতন্ত্র' অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ডুবোয়া ফ্রান্সে ফিরিয়া যান। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি পারীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যোগেশচন্দ্র বাগল

ডুমা, আলেক্‌সাঁদ্‌র[১] (১৮০২-৭০ খ্রী) ফরাসী ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত তাঁহার নাটক 'হেনরি দি থার্ড' (১৮২৯ খ্রী) তাঁহাকে বিখ্যাত করে। পূর্বের বাঁধাধরা নিয়ম ও প্রকরণ হইতে বিচ্ছিন্ন রোম্যান্টিক নাটকের অভিনয় সেই প্রথম। অতঃপর সুদীর্ঘ কাল নিরলস উদ্যমে তিনি ইতিহাস-আশ্রিত বহু নাটক ও উপন্যাস রচনা করেন। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকগুলি ২৭৭ খণ্ডে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাসগুলি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে, তন্মধ্যে সর্বাধিক সমাদৃত হয় 'লে ত্রোআ মুস্কেতেয়ার' (Les Trois Mousquetaires, ১৮৪৪ খ্রী)। এই গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং উহা আজও যথেষ্ট জনপ্রিয়। ভাষার উচ্ছলতায়, ঘটনার চমকপ্রদ বিন্যাসে এবং গতিশীলতায় তাঁহার রচনা জীবন্ত। ডুমা বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী এবং আত্মজীবনীমূলক রচনাও প্রকাশ করেন। প্রধান কয়েকটি গ্রন্থ—উপন্যাস : Les Trois Mousquetaires ; Le Comte de Monte-Cristo ; Vingt ans aprés ; Le Chevalier de Maison Rouge ; নাটক : Henri III et sacour ; Antony. তাঁহার পুত্র আলেক্‌সাঁদ্‌র ডুমা-ও ক্ষমতাবান লেখক ছিলেন। 'ডুমা, আলেক্‌সাঁদ্‌র[২]' দ্র।

দ্র A. C. Bell, tr., *Alexandre Dumas,* London, 1950.

অরুণ মিত্র

ডুমা, আলেক্‌সাঁদ্‌র[২] (১৮২৪-৯৫ খ্রী) জনপ্রিয়তায় পিতার সমকক্ষ না হইলেও পুত্র আলেক্‌সাঁদ্‌র ডুমা ক্ষমতাবান লেখকরূপে ব্যাপক স্বীকৃতিলাভ করেন। প্রধানতঃ নাট্যকার হিসাবেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। স্বরচিত উপন্যাসের নাট্যরূপ 'লা দাম-ও-কামেলিয়া' (La Dame aux Camélias, ১৮৪৮ খ্রী) তাঁহার খ্যাতির সূত্রপাত করে। ফ্রান্সের বাহিরেও এই গ্রন্থ সুপরিচিত। ইহার প্রভূত মঞ্চ-সাফল্যের পর ডুমা আরও অনেক নাটক লেখেন। সামাজিক রীতিনীতি এই পরবর্তী নাটকগুলির বিষয়বস্তু। পিতার অবৈধ সন্তান ছিলেন বলিয়া সমাজ ও পরিবারের বিশেষ কয়েকটি দিকসম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিযোগ প্রখর ছিল ; তাঁহার রচনায় তাহা মূর্ত হয়। লেখকরূপে তিনি সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁহার নাটকগুলি নিঃসন্দেহে প্রাণবন্ত ও আগ্রহোদ্দীপক। তাহাদের গঠন দৃঢ়বদ্ধ, ঘটনাপরম্পরা যুক্তি-অনুসারী এবং সংলাপ হৃদয়গ্রাহী।

দ্র André Maurois, *The Titans,* New York, 1957.

অরুণ মিত্র

ডুরানী আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী দ্র

দুর্গা শক্তিদেবীর অন্যতম নাম। বৈদিক সাহিত্যে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্ত্র ও পুরাণে ইহার বিশেষ বিবরণ ও পূজার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দুর্গা, মহিষমর্দিনী, শূলিনী, জয়দুর্গা, বনদুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী প্রভৃতি বিভিন্ন পরিচিত অপরিচিত নামে ইহার পূজার ব্যবস্থা আছে। তন্ত্রে দুর্গা চতুর্ভুজা, সিংহস্থা মরকতবর্ণা। বাংলায় প্রচলিত পৌরাণিক পদ্ধতি অনুসারে ইনি অতসী-পুষ্পবর্ণাভা, দশভুজা, জটাজুট-সমাযুক্তা। অর্ধচন্দ্র ইহার শিরোভূষণ। ইহার পাদদেশে ছিন্নমস্তক মহিষ, মহিষের দেহ হইতে খড়্গ-হস্তে বহির্গত এক দানবের হৃদয় দেবীর শূলে বিদ্ধ। দেবীর দক্ষিণ পদ সিংহের উপর স্থাপিত। বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে মহিষের উপর বিন্যস্ত।

অষ্টশক্তি ও দেবগণের দ্বারা ইনি পরিবেষ্টিত ও সংস্তুত। দেবীর দুই পার্শ্বে কার্তিক-গণেশ ও লক্ষ্মী-সরস্বতী বা জয়া-বিজয়ার যে মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার বিধান কালীবিলাস তন্ত্রে আছে। দুর্গা বিশেষ জনপ্রিয় ও জন-সমাদৃত দেবতা। ইনি দুর্গতিনাশিনী বলিয়া পরিচিত। নিত্য নানা প্রসঙ্গে (শয্যাত্যাগ, যাত্রা, চিঠিপত্রলেখা, শান্তিস্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি) ইহার নাম স্মরণ করার রীতি আছে। ইষ্টদেবী হিসাবে নিত্য নিয়মিতভাবে দুর্গার উপাসনা করেন এমন লোকেরও অভাব নাই। শরৎ-কালে (আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে) ও বসন্তকালে (চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে) সাড়ম্বরে ইহার পূজার ব্যবস্থা আছে। এই পূজা শারদীয়া পূজা ও বাসন্তী পূজা নামে প্রসিদ্ধ। শারদীয়া পূজা বাঙালীর জাতীয় উৎসব। বস্তুতঃ বিভিন্ন নামে ও রূপে (দুর্গাপূজা, নবরাত্রি, দশেরা, রামলীলা) ইহা সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত। এই পূজা ও উৎসব রামচন্দ্রের স্মৃতির সহিত বিজড়িত। বাংলা রামায়ণের কাহিনী অনুসারে রাম পূজার দ্বারা দুর্গাকে সন্তুষ্ট করিয়া রাবণ-বধে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। বাল্মীকি-রামায়ণে এই জাতীয় কোনও কাহিনী নাই। কালিকাপুরাণের (৬০।২৬-৩) মতে রামের প্রতি দেবীর অনুগ্রহ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা দেবীকে উদ্বোধিত করেন ও দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার পূজা করিতে থাকেন। নবমীর দিনে রাবণের নিধন উপলক্ষ্যে দেবীর বিশেষ পূজা করিয়া দশমীর দিনে উৎসবসহকারে দেবীকে স্বস্থানে প্রেরণ করা হয়। অনুরূপ কাহিনী দেবী-ভাগবত (৩।৩০) ও মহাভাগবত পুরাণেও (৩৬, ৪২) পাওয়া যায়। দুর্গোৎসব আড়ম্বর-বহুল অনুষ্ঠান। তাই ইহা কলির অশ্বমেধ নামে পরিচিত। জীমূতবাহন, শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি, শূলপাণি, গোবিন্দানন্দ, রঘুনন্দন প্রভৃতির গ্রন্থে ইহার বিধিব্যবস্থা ও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 'গন্ধেশ্বরী', 'জগদ্ধাত্রী' ও 'জয়দুর্গা' দ্র।

দ্র লক্ষ্মণদেশিক, শারদাতিলক ; কৃষ্ণানন্দ, তন্ত্রসার ; সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পুরোহিতদর্পণ, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দুর্গাচরণ লাহা (১৮২২-১৯০৪ খ্রী) কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রেণীভুক্ত লাহা-বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজ হইতে অধ্যয়ন সমাপনান্তে মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে পিতা প্রাণকৃষ্ণ লাহার সহকারী হিসাবে ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।

ব্যবসায়ে তিনি অত্যল্পকালের মধ্যেই তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয়দানে সমর্থ হন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি লাহা কোম্পানির কর্ণধার হন ও ইহার প্রচুর উন্নতিসাধন করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বন্ধুবর্গের সহযোগিতায় 'ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন' নামে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। ইহাই পরে 'ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া' নামে খ্যাত হয়।

দুর্গাচরণই প্রথম ভারতীয় যিনি কলিকাতা বন্দরের পরিচালক সমিতির সদস্য (পোর্ট কমিশনার) মনোনীত হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার শেরিফ পদে নিয়োজিত হন। তিনি কলিকাতার মেয়ো হাসপাতালের অন্যতম পরিচালক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৮৭৪ খ্রী), বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৮৮২ ও ১৮৮৮ খ্রী) এবং কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। দাতা বলিয়াও তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষায়তনে তাঁহার প্রচুর দান ছিল। তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সি. আই. ই.', ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজা' এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'মহারাজা' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, জীবনীকোষ (ভারতীয়-ঐতিহাসিক), ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ; C. E. Buckland, *Dictionary of Indian Biography*, London, 1906.

অশোকা সেনগুপ্ত

দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (১৮৬৬-১৯৪৮ খ্রী) উপনিষদ ও বেদান্তদর্শনের অনুবাদক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। শাংকর ভাষ্যসহ ঈশোপনিষদ ও কেনোপনিষদের সানুবাদ সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। ১৩১৮ হইতে ১৩২২ বঙ্গাব্দে ৫ খণ্ডে শ্রীভাষ্য বা রামানুজ ভাষ্যসহ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগোপাল বসুমল্লিক ফেলো হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তদর্শন সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি তিনি ১৩৩১-৩৩ বঙ্গাব্দে শ্রীগোপাল বসুমল্লিক ফেলোশিপ প্রবন্ধ নামে ৪ খণ্ডে প্রকাশ করেন। পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ভারত সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি-দ্বারা ভূষিত হন। ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দর্শন

শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত অখিল ভারত সংস্কৃত মহাসম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৩৩৮-৪০ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ হইতে তিনি আমরণ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৪৩ খ্রী) বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা। প্রথম জীবনে চিত্রকর ছিলেন। তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী এবং আর্ট থিয়েটারে তিনি প্রথমে চিত্রকর হিসাবেই যোগ দেন। পরে ঐ দুই প্রতিষ্ঠানে কিছু দিন ছোট-খাটো ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার পর ক্রমশঃ বড় ভূমিকা পাইতে থাকেন এবং ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে অসুস্থতার জন্য অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। দুর্গাদাসের অবয়ব, মুখশ্রী, কণ্ঠস্বর এবং অভিনয়ের ভঙ্গী সমস্তই নায়কোচিত ছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রবোধকুমার দাস

দুর্গাদাস রাঠোর মাড়ওয়াড়ের মহারাণা যশোবন্ত সিংহের মন্ত্রী আস্কারাণের পুত্র; ইনি অবিচলিত স্বার্থত্যাগ, একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, অদম্য বীরত্ব ও অসাধারণ কর্তব্য-পরায়ণতার জন্য রাজপুতানার ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছেন। মোগলদের অর্থ বা শক্তি কোন কিছুই তাঁহাকে কর্তব্যচ্যুত করিতে পারে নাই। রাজপুত চারণ বলিয়াছেন—"প্রত্যেক রাজপুতজননী যেন দুর্গাদাসের মত পুত্রসন্তান লাভ করেন"।

ঔরঙ্গজেব ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিশুপুত্র অজিত সিংহকে মোগল অন্তঃপুরে রাখিয়া মাড়ওয়াড়কে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হন, কিন্তু দুর্গাদাস ঔরঙ্গজেবের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া রাজপরিবারকে দিল্লী হইতে মাড়ওয়াড়ে আনিতে সমর্থ হন। তাঁহার অসীম বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ইহার পর ঔরঙ্গজেব মাড়ওয়াড় আক্রমণ করিয়া রাজধানী যোধপুর এবং আরও কতকগুলি স্থান অধিকার করেন, কিন্তু যুদ্ধ বহু বৎসর ধরিয়া চলিলেও তাঁহার জীবিতকালে ইহার মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। দুর্গাদাস মোগলদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে থাকায় ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে অজিত সিংহ যোধপুর অধিকারে সক্ষম হন; শেষ পর্যন্ত ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট প্রথম বাহাদুর শাহ্ অজিত সিংহকে মাড়ওয়াড়ের রাণা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন।

দুর্গাদাসের উদারতা ও চরিত্রমাধুর্য শত্রু-মিত্র সকলকে মোহিত করিয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের পুত্র আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্যে যাইবার সময়ে তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে দুর্গাদাসের নিকটে রাখিয়া যান। দুর্গাদাস সযত্নে তাহাদের লালনপালনের ব্যবস্থা করেন; এমনকি, আজমীর হইতে মুসলমান শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া কন্যাটির কোরান-শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

দ্র J. N. Sarkar, *History of Aurangzib*, vols. III-V, Calcutta, 1921-24; R. Burn, ed., *The Cambridge History of India*, vol. IV, Cambridge, 1937; A. L. Srivastava, *The Mughal Empire: 1526-1804 A. D.*, Agra, 1957.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৮৫৮?-১৯৩২ খ্রী) প্রখ্যাত সাহিত্যিক। দুর্গাদাস নদিয়া জেলার নবদ্বীপের নিকটবর্তী চকব্রাহ্মণগড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে গ্রামীণ পাঠশালায় প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার পর দুর্গাদাস পিতার সহিত কলিকাতায় আগমন করেন। মেট্রোপলিটান কলেজে পাঠকালে তিনি বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও তাঁহার উপদেশে ও উৎসাহে সাহিত্যসেবায় ব্রতী হন। তৎকালীন সংবাদপত্র এবং সাময়িকী 'সোমপ্রকাশ', 'নববিভাকর', 'সুলভসমাচার' প্রভৃতিতে তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে তাঁহার পরিচালিত 'অনুসন্ধান' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরে তিনি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদনা-কার্যে নিয়োজিত হন। এই সময়ে তিনি 'রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস' কর্তৃক ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসাবে আমন্ত্রিত হন; কিন্তু তিনি আমন্ত্রণরক্ষার্থে ইংল্যাণ্ডে গমন করেন নাই। বাংলা হরফে মূল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ চতুর্বেদ প্রকাশ তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। তাঁহার রচিত এবং সম্পাদিত অন্যান্য পুস্তকাবলী: 'দ্বাদশনারী', 'নির্বাণ জীবন', 'ভারতে দুর্গোৎসব', 'চুরি জুয়াচুরি', 'জাল ও খুন', 'স্বাধীনতার ইতিহাস', 'রাণী ভবানী', 'বাঙালীর গান', 'বৈষ্ণব পদলহরী', 'শিখ যুদ্ধের ইতিহাস', 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'। তাঁহার সর্বপ্রধান কীর্তি পৃথিবীর ইতিহাসরচনার প্রয়াস। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, জীবনীকোষ (ভারতীয় ঐতিহাসিক), ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

অশোকা সেনগুপ্ত

দুর্গাপুর ২৩°৩৫´ উত্তর ও ৮৭°৫৫´ পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি শিল্পনগরী। ইহা পূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত। কলিকাতা হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব ১৭১ কিলোমিটার। জলপথেও এখানে যাতায়াতের সুবিধা আছে। সম্প্রতি একটি বড় খালের দ্বারা এই স্থানটি ভাগীরথীর সহিত যুক্ত হইয়াছে।

দুর্গাপুর পূর্বে একটি গ্রামমাত্র ছিল। এই অঞ্চলের উন্নত ধরনের কয়লা, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অন্যান্য কাঁচামালের প্রাচুর্য, দামোদর পরিকল্পনা হইতে জলবিদ্যুৎ সরবরাহ, যাতায়াতের সুব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অঞ্চলটিকে শিল্পকেন্দ্র হিসাবে নির্বাচন করেন। বর্তমানে এখানে সরকারি ও বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় ইহা দ্রুত বৃহৎ ও উন্নত শিল্পকেন্দ্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাকে ভারতের রুর (Ruhr) বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

এই অঞ্চলের শিল্পসংস্থাগুলির মধ্যে কোক ওভেন প্রোজেক্ট এবং লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারির কারখানা প্রধান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোক ওভেন প্রোজেক্টের কাজ ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চালু হয়। এই শিল্পসংস্থা হইতে দৈনিক ১০১০ মেট্রিক টন কোক কয়লা উৎপাদন করা হয়। কোক ওভেন হইতে উৎপন্ন গ্যাস ১৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্যাসপাইপ দ্বারা কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া লৌহ ও কয়লা হইতে অ্যামোনিয়াম সালফেট, বেন্‌জিন, জাইলিন, ন্যাফ্‌থলিন, আলকাতরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। 'কোক ওভেন'-এর বসতি-অঞ্চল (টাউনশিপ) স্টেশনের নিকটে অবস্থিত।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ কেন্দ্র-পরিচালিত লৌহ ও ইস্পাত শিল্পসংস্থাটির উদ্বোধন করেন। বৎসরে প্রায় ১২ লক্ষ মেট্রিক টন ইস্পাত এই সংস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইস্পাত তৈয়ারি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা, চুনাপাথর, আকরিক লৌহ ও ডলোমাইট রানীগঞ্জ, সিংভূম, গাংপুর প্রভৃতি নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করা হয়। এখানকার ঢালাই লৌহের উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরে প্রায় ৩ লক্ষ মেট্রিক টন।

ইস্পাত শিল্পসংস্থা হইতে ৮ কিলোমিটার ও দুর্গাপুর স্টেশন হইতে ১২ কিলোমিটার দূরে এই সংস্থার কর্মচারীদের বসতি-অঞ্চল অবস্থিত। ১৭ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া এই নূতন নগরী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ইহাকে অন্যান্য শিল্প-অঞ্চল হইতে পৃথক করিয়াছে। ধোঁয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহাকে প্রায় ২ কিলোমিটার প্রস্থবিশিষ্ট অরণ্য-বলয় দ্বারা বেষ্টন করা হইয়াছে। এখানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিন প্রকারের রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে— ২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আর্টারিয়ান রাস্তা, ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ মাধ্যমিক রাস্তা ও ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রতিবেশী রাস্তা। বসতি-অঞ্চলকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রতিবেশী পদ্ধতিতে উন্নয়ন করা হইতেছে। প্রতিটি বিভাগে স্কুল, বাজার, উন্নয়নকেন্দ্র, ডাকঘর, ডাক্তারখানা, আনন্দ-বিনোদনকেন্দ্র প্রভৃতি আছে। জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত আছে। অধিবাসীগণ নিকটবর্তী দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার জলবিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে।

দুর্গাপুরের অন্যান্য শিল্পসংস্থার মধ্যে রাশিয়ান পারদর্শীদের (টেক্‌নিশিয়ান) সহযোগিতায় ও এঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন পরিচালিত কয়লা উত্তোলনের নানাবিধ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার কারখানা, ফরাসী পারদর্শীদের সহযোগিতায় দুর্গাপুর কেমিক্যাল্‌স, জাপানী ও কানাডিয়ান পারদর্শীদের সহযোগিতায় হিন্দুস্থান স্টিল লিমিটেডের 'অ্যালয় স্টিল প্রোজেক্ট' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ. ভি. বি.-র বয়লার প্রস্তুত করার বৃহৎ এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসংস্থা ও ফিলিপ্‌স কারবন ব্ল্যাকের কারখানা উল্লেখযোগ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনাসংস্থা কর্তৃক বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের জন্য দুর্গাপুর গ্রামের নিকট দামোদর নদীতে ৬৯২ মিটার (২২৭১ ফুট) দীর্ঘ বাঁধ (দুর্গাপুর ব্যারেজ) নির্মিত হয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ এপ্রিল দুর্গাপুর, ফরিদপুর, অণ্ডাল, কাংসা এবং বুদবুদ এই পাঁচটি থানা লইয়া নূতন মহকুমা দুর্গাপুরের সৃষ্টি হইয়াছে।

দ্র Government of India, *Durgapur Steel Project*, New Delhi, 1961.

অনিন্দ্যকুমার পাল

দুর্গাবতী, রানী ভারতীয় বীরাঙ্গনা, মাহোবার বিখ্যাত চন্দেল্ল-বংশের রাজা শালিবাহনের কন্যা ও গণ্ডোয়ানা বা গড় কটঙ্গী (বর্তমান মধ্য প্রদেশে অবস্থিত) প্রদেশের রাজা দলপতের পত্নী। স্বামীর মৃত্যুর পর (১৫৪৮ খ্রী) তিনি পঞ্চবর্ষীয় পুত্র রাজা বীরনারায়ণের অভিভাবিকারূপে

১৬ বৎসর সাহস, বুদ্ধি, কূটনীতি, দক্ষতা ও বদান্যতার সহিত দেশ শাসন করেন। তিনি মালবের বাজ বাহাদুর ও সিরঙ্গের মিয়ানা আফগানদের পরাজিত করেন। তাঁহার ২০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ১০০০ হস্তী ও বহু পদাতিক সৈন্য ছিল। তিনি গণ্ডোয়ানার রাজনৈতিক একতাসম্পাদন ও রাজ্য-সম্প্রসারণও করেন। বন্দুক ও তীরধনুক লইয়া তিনি শিকার করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। বাঘ আসিয়াছে শুনিলেই তিনি তাহাকে শিকার না করা পর্যন্ত জলস্পর্শ করিতেন না।

আকবরের আদেশে কারামানিকপুরের (বর্তমান এলাহাবাদের) শাসক খাজা আবদুল মজিদ আসফ খান এক বিশাল বাহিনী লইয়া অতর্কিতে গণ্ডোয়ানা আক্রমণ করিলে (১৫৬৪ খ্রী) দুর্গাবতী আসফ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। রাজকর্মচারীদের সাবধান বাণীর উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'হতমান হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা গৌরবের সহিত মৃত্যুবরণ বাঞ্ছনীয়'। রানী নরহীগ্রামে শিবির সন্নিবেশ করেন। সেখানে একটি মাত্র সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া আসফ খানের বিশাল সৈন্য প্রবেশ করার সময় রানীর নিকট বিধ্বস্ত হয়। রানীর ইচ্ছা ছিল, রাত্রিকালে আসফ খানকে আক্রমণ করিয়া শত্রুসেনাকে নিশ্চিহ্ন করা, কিন্তু তাঁহার সেনানায়কেরা তাহাতে সম্মত হন নাই। পরদিন আসফ খান ঐ গিরি-সংকট অধিকার করিলেন। বীরনারায়ণ আহত হন, গোণ্ড সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়, কিন্তু মুষ্টিমেয় সৈনিক লইয়া রানী সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে থাকেন। তাঁহার দেহে দুইটি তীর বিদ্ধ হয় কিন্তু তিনি নিজেই তাহা বাহির করেন। অবশেষে রানী স্বীয় অঙ্গে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করেন। এই বীরাঙ্গনার নাম ভারতের ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

দ্র Abul Fazl, *Akbarnamah ;* V. A. Smith, *Akbar the Great Mogul*, Oxford, 1919 ; A. L. Srivastava, *Akbar the Great*, Agra, 1962.

জগদীশনারায়ণ সরকার

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য (১৮৯৯-১৯৬৫ খ্রী) দুর্গামোহন ভট্টাচার্য এম. এ. কাব্যসাংখ্যপুরাণতীর্থ দীর্ঘকাল স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা করার পর পরিণত বয়সে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গবেষণা বিভাগে বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আমরণ তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈদিক সাহিত্য—বিশেষ করিয়া বৈদিক সাহিত্যে বাঙালীর দান সম্পর্কে গবেষণা করিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করেন। পণ্ডিতসমাজে লুপ্ত বলিয়া বিবেচিত অথর্ব বেদের পৈপ্পলাদ শাখার পুথি আবিষ্কার তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ওড়িশার গ্রামাঞ্চলে আবিষ্কৃত এই পুথি অবলম্বনে তিনি এই গ্রন্থের এক নূতন সংস্করণ প্রকাশের কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় গ্রন্থের প্রথম কাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯৬৪ খ্রী)। তাঁহার সম্পাদিত অন্য গ্রন্থ : গুণবিষ্ণু-কৃত 'ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য' (১৯৩০ খ্রী), গুণবিষ্ণু ও সায়ণের ভাষ্যসহ 'ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ' (১৯৫৮ খ্রী), হলায়ুধকৃত 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' (১৯৬০ খ্রী)। ইংরেজী ও বাংলা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সমিতির সভ্য হিসাবে বাংলা পরিভাষা প্রণয়নে তাঁহার কৃত কার্যও উল্লেখযোগ্য। পুথিশালাধ্যক্ষ ও সহকারী সভাপতিরূপে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি 'ভারতকোষ'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দুর্জনশাল[১] রাজস্থানের অন্তর্গত কোটার অধিপতি হারবংশীয় ভীমসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র। ভীমসিংহের মৃত্যুর কিছুকাল পরে গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে দুর্জনশাল কোটার রাজা হন। মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌ দুর্জনশালকে রাজযোগ্য খিলাত প্রদান করেন। এই সময়ে কোটারাজের প্রার্থনামত মুহম্মদ শাহ্‌ যমুনাতীরে হার-অধ্যুষিত অঞ্চলে গোহত্যা বন্ধের নির্দেশ দেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পেশবা প্রথম বাজীরাও উত্তর ভারতে অভিযান করিলে দুর্জনশাল তাঁহাকে সাহায্য করেন এবং প্রতিদানে নাহরগড় দুর্গটি লাভ করেন। বীরবিক্রমে বহু যুদ্ধ করিয়া তিনি কোটা রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করেন এবং ইহার আয়তন বৃদ্ধি করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র J. Tod, *Annals and Antiquities of Rajasthan*, vol. II, Calcutta, 1879.

দীপকরঞ্জন দাস

দুর্জনশাল[২] ভরতপুরের একজন রাজা। রাজা বলদেব সিংহের ভ্রাতা লক্ষ্মণ সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভরতপুরের রাজা বলদেব সিংহ স্বর্গত হন ও বালক বলবন্ত সিংহ রাজা হইলে দুর্জনশাল কয়েক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য হস্তগত করিয়া ভরতপুরের দুর্গ

দখল, বলবন্ত সিংহকে বন্দী ও স্বীয় পিতৃব্য ও প্রধানমন্ত্রী পার্থ সিংহকে নিহত করেন। রেসিডেন্ট অক্টার্লোনি ভরতপুর আক্রমণ করা স্থির করেন ; কিন্তু গভর্নর জেনারেল আমহার্স্ট অন্যমত হওয়ায় অক্টার্লোনি পদত্যাগ করেন ও তাঁহার স্থলে চার্ল্‌স মেট্‌কাফ রেসিডেন্ট হন। ইতিমধ্যে দুর্জনশালের ভ্রাতা সাধু সিংহ দীগ দুর্গ দখল করেন ও দুর্জনশালের উহা পুনরাধিকারের চেষ্টা প্রতিহত করেন। ইহার ফলে অশান্তি ও অরাজকতা বৃদ্ধি পাইলে গভর্নর জেনারেল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভরতপুর আক্রমণে সম্মতি দেন। লর্ড লেকের পরাজয়ের প্রতিশোধও আর একটি কারণ ছিল। সর্বপ্রধান সেনাধ্যক্ষ লর্ড কম্বারমিয়ার ভরতপুর আক্রমণ করেন ও ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ ডিসেম্বর ভরতপুর দুর্গ দখল করেন। দুর্জনশাল বন্দী হইয়া এলাহাবাদে প্রেরিত হন ও বলবন্ত সিংহ ভরতপুরের রাজা হন।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. IX, Bombay, 1963.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

দুর্বাসা কোপন স্বভাবের জন্য প্রসিদ্ধ পৌরাণিক ঋষি। চলতি বাংলায় ক্রোধী ব্যক্তিকে 'দুর্বাসা' বলা হইয়া থাকে। ইহার উগ্র স্বভাবের পরিচয় নানা কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়।

একবার দুর্বাসা একটি সন্তানক পুষ্পের মালা দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলে ইন্দ্র ঐরাবতের গলায় ঐ মালা পরাইয়া দেন ও ঐরাবত উহা মাটিতে ফেলিয়া দেয়। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্বাসা ইন্দ্রকে শ্রীভ্রষ্ট হইবার অভিশাপ দেন। হৃতশ্রী ইন্দ্রকে শাপমোচনের জন্য সমুদ্র মন্থন করিতে হয় (বিষ্ণুপুরাণ ১।৯)। অম্বরীষের প্রতি তাঁহার অকারণ ক্রোধও সুবিদিত ('অম্বরীষ' দ্র)। কালিদাস 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে পতিচিন্তায় নিমগ্না অনন্যমনা শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার কঠোর অভিশাপের বিবরণ দিয়াছেন। এই অভিশাপের ফলে পতি দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হন এবং তাঁহাকে দীর্ঘকাল পতি-বিরহবেদনা সহ্য করিতে হয়।

দুর্বাসার শান্ত ভাবের নিদর্শনও অজ্ঞাত নহে। তাঁহারই অনুগ্রহে কুন্তী সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চ পুত্রের জননী হন (মহাভারত, আদি পর্ব, ১১১ অধ্যায়) এবং শ্রীকৃষ্ণের শরীর শস্ত্র-অস্ত্রের অভেদ্য হয় (মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, ১৫৯ অধ্যায়)।

সুব্রতা সেন

দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক অথবা মানবিক কারণে সংঘটিত খাদ্যশস্যের অত্যন্ত অভাবের ফলে ব্যাপক অন্নকষ্ট। সাধারণতঃ বহুস্থলে খাদ্যাভাবে মৃত্যু ঘটিলে তবেই অবস্থাটিকে দুর্ভিক্ষ বলা হয়। শাস্ত্রমতে দুর্ভিক্ষের কারণ 'ঈতি'-র প্রকোপ। ঈতি বলিতে বুঝায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, মূষিক ও পক্ষীর উপদ্রব এবং যুদ্ধঘটিত মানবীয় উপদ্রব। প্রাচীনকালে দুর্ভিক্ষের ভয় এবং দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা অধিক ছিল। বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপদ্ধতির প্রসার তথা উন্নততর পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে অন্ততঃ উন্নত দেশগুলিতে দুর্ভিক্ষের ভয় অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। এমন কি অনুন্নত দেশগুলিতেও উন্নত পরিবহণ ও আন্তর্জাতিক সাহায্য ব্যবস্থার ফলে পূর্বের ন্যায় দুর্ভিক্ষের কবলে প্রভূত প্রজাক্ষয়ের সম্ভাবনা দূরীভূত হইয়াছে বলিলেই চলে।

ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থা অনেকটাই মৌসুমী বায়ুর মর্জির উপরে নির্ভরশীল বলিয়া প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে দুর্ভিক্ষের প্রবণতা চলিয়া আসিতেছে। বেদ, ব্রাহ্মণ ও পুরাণে যজ্ঞের সাহায্যে সুবৃষ্টি ঘটাইয়া দুর্ভিক্ষ-নিবারণের চেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়। পৌরাণিক যুগে দুর্ভিক্ষ-নিবারণ ও আর্তত্রাণ রাজধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। ঐতিহাসিক কালে মৌর্য-সাম্রাজ্যের সময় হইতেই উত্তম বৎসরে শস্য সঞ্চয় করিয়া দুর্বৎসরের জন্য প্রস্তুত হইবার প্রচেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়ে এবং মহারাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালেও অনুরূপ ব্যবস্থার কথা শুনা যায়। মোটামুটিভাবে ভারতীয় হিন্দু যুগে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকিলে দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের যথাসাধ্য সুব্যবস্থাই ছিল বলিতে পারা যায়। মুসলমান যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহের বাহুল্যের ফলে এই জাতীয় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা অনেকাংশেই বিলুপ্ত হয়, যদিও মহম্মদ বিন তোগলক, শেরশাহ্‌ এবং আকবর এইরূপ ব্যবস্থার পুনঃ-প্রবর্তনের বহুবিধ চেষ্টা করেন।

ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসনের প্রসারের সময়ে দীর্ঘকাল-ব্যাপী নৈরাজ্যের যুগে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ চরম হইয়া ওঠে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে কুখ্যাত 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। ইহাতে তদানীন্তন বাংলা, বিহার ও ওড়িশা প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ইহা বহুলাংশে ছিল 'মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ'। ১৮০২, ১৮২৪ ও ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দেও প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কোম্পানির শাসনের অবসানের পরও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ চলিতে থাকে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশার দুর্ভিক্ষে ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। জন ক্যাম্প্‌বেল ওড়িশার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তদন্ত করেন। ১৮৭৬-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে

দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষে ৫২ লক্ষ লোকের মৃত্যুর পরে রিচার্ড স্ট্রাচি-র অধিনায়কতায় প্রথম দুর্ভিক্ষ-কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের নির্দেশক্রমে প্রতি বৎসর বাজেটে দেড় কোটি টাকা দুর্ভিক্ষত্রাণ তথা দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য সরাইয়া রাখা হইত। ১৮৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের পুনরাবির্ভাবের পর জেম্‌স লায়ালের অধ্যক্ষতায় দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ-কমিশনের নিয়োগ হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে অ্যান্টনি ম্যাক্‌ডোনেল তৃতীয় দুর্ভিক্ষ-কমিশনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর সুবিখ্যাত 'ফেমিন কোড'গুলি রচিত হয়।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের পরে দুর্ভিক্ষে পূর্বেকার মত ভয়াবহ লোকক্ষয় ঘটিত না। ইহার প্রধান কারণ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি এবং ফেমিন কোডগুলির ব্যবহার। লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষের পুনরাবির্ভাব ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বাংলা প্রদেশে ১৫ লক্ষ (মতান্তরে ৩৫ লক্ষ) লোকের প্রাণহানি ঘটে। প্রধানতঃ মানবীয় কারণে এই দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল।

স্বাধীন ভারতে দুর্ভিক্ষ বিলুপ্ত হয় নাই, তবে লোকক্ষয়ী দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই। ১৯৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তীব্র ও ব্যাপক অনাবৃষ্টির ফলে বিহারে বিরাট দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক সাহায্যের ফলে এই দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয় নিবারিত হয়।

অমৃতানন্দ দাস

দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান উদ্যোক্তা। দুর্যোধনের জন্মকালে চতুর্দিকে দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বিদুর ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে দুর্যোধন হইতেই কুরুকুলের বিনাশ হইবে (মহাভারত, পুনা সংস্করণ, ১।১০৭)। দুর্যোধন ও ভীম একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

পাণ্ডবদের গুণগরিমা, বিশেষতঃ ভীম ও অর্জুনের রণ-কৌশল ও শক্তিমত্তা দুর্যোধনের ঈর্ষার কারণ হয়। তিনি বাল্যকাল হইতে নানাভাবে তাঁহাদের বিরোধিতা করেন। একবার দুর্যোধন কৌশলে ভীমকে বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করাইলে ভীম অচৈতন্য হইয়া পড়েন, তখন মৃতকল্প ভীমকে দুর্যোধন গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন (মহা-ভারত ১।১১৯), কিন্তু দৈবক্রমে ভীম রক্ষা পান।

দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পরামর্শ করিয়া পাণ্ডবদের বারণাবতে প্রেরণ করেন এবং অমাত্য পুরোচনের দ্বারা জতুগৃহ নির্মাণ করাইয়া পাণ্ডববিনাশের উদ্দেশ্যে সেই গৃহে অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা করেন (মহাভারত ১।১৩২)। দুর্যোধনের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ইহার কিছু পরে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে লক্ষ্যভেদে অসমর্থ দুর্যোধন অর্জুনের সাফল্যদর্শনে অতীব বিষণ্ণ হন।

রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবদের শ্রীবৃদ্ধিদর্শনে ঈর্ষান্বিত দুর্যোধন মাতুল শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। কপট দ্যূতক্রীড়ায় দুর্যোধন দ্রৌপদীসহ পঞ্চ-পাণ্ডব ও তাঁহাদের রাজ্য জয় করেন। দুর্যোধন সভাস্থলে আনীতা দ্রৌপদীকে স্বীয় উরুতে উপবেশনের জন্য বাম উরু প্রদর্শন করিলে ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গের কঠোর প্রতিজ্ঞা করেন। ধৃতরাষ্ট্রের অনুগ্রহে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবগণ প্রথমবার মুক্তিলাভ করিলে দুর্যোধন দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন করেন। পাণ্ডবগণ পুনরায় পরাজিত হইয়া ১২ বৎসর বনবাস ও ১ বৎসর অজ্ঞাতবাসের শর্ত পালন করেন।

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস পূর্ণ হওয়ার পর যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যকামনায় দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া ১০ লক্ষ নারায়ণী সেনা লাভ করেন। অতঃপর কৃষ্ণ দূতরূপে হস্তিনাপুরে আসিয়া পাণ্ডবগণের প্রাপ্য রাজ্যাংশ প্রার্থনা করিলে দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিদানেও আপত্তি করেন।

কুরুক্ষেত্রে ১৮ দিন ব্যাপী যুদ্ধে সমগ্র কৌরব সৈন্য বিধ্বস্ত হইলে শেষ দিবসে দুর্যোধন একাকী দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠিরের বিদ্রূপবাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া দুর্যোধন হ্রদ হইতে উঠিয়া আসিয়া ভীমের সহিত প্রচণ্ড গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। দুর্যোধনকে পরাস্ত করিতে অসমর্থ ভীম অর্জুনের ইঙ্গিতে দুর্যোধনের বাম উরুপ্রদেশে আঘাত করিয়া উরুভঙ্গ করেন। উরুভগ্ন অবস্থায় দুর্যোধন সেনাপতি অশ্বত্থামাকে ভীমের মুণ্ড আনিতে বলেন। রাত্রিকালে অশ্বত্থামা পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া ভ্রান্তি-বশতঃ দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করেন। পঞ্চ পাণ্ডবের ছিন্নমুণ্ডের পরিবর্তে দ্রৌপদীর পুত্রগণের মুণ্ড দেখিয়া হর্ষ-বিষাদে দুর্যোধনের মৃত্যু ঘটে। বহুদোষদুষ্ট হইলেও দুর্যোধন প্রজাপ্রিয় সুশাসক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন।

যূথিকা ঘোষ

দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৭২-১৯৩৮ খ্রী) প্রখ্যাত পাখোয়াজবাদক। ইনি নন্দলাল বিদ্যারত্নের কনিষ্ঠ পুত্র। কলিকাতায় মাতামহ কাশীরাম তর্কবাগীশের বাসগৃহে তিনি আবাল্য অতিবাহিত করেন। দুর্লভচন্দ্রের খুল্লতাত ও একাধিক ভ্রাতা ধ্রুপদগায়ক

ছিলেন। পারিবারিক সাংগীতিক পরিবেশে বালক-বয়স হইতেই তাঁহার সংগীতজীবনের সূত্রপাত হয়। প্রতিবেশী মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তের নিকট তিনি ১৩ বৎসর বয়সে পাখোয়াজ-বাদন শিক্ষা আরম্ভ করেন। প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ তিনি মুরারিমোহনের শিষ্য ছিলেন। অসামান্য গুণী পাখোয়াজীরূপে তিনি সুপরিচিত হন। সংগীতজীবনে অপেশাদার হইলেও তিনি কৃতী শিষ্য-মণ্ডলী গঠিত করিয়াছিলেন। পাখোয়াজ ভিন্ন তিনি তবলা-বাদনেও দক্ষ ছিলেন এবং তবলাতেও কয়েকজনকে শিষ্য করেন। মুরারিমোহন গুপ্তের মৃত্যুর (১৯০৪ খ্রী) পর বৎসর হইতে দুর্লভচন্দ্র তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে 'মুরারি সম্মেলন' নামে বার্ষিক সংগীত-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন ও দীর্ঘ ৩০ বৎসরাধিক কাল তাহার পরিচালনা করেন। ইহা বাংলা দেশে রাগসংগীত-চর্চার প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের পাথুরিয়াঘাটাস্থ ভবনে একটি সঙ্গীত-অনুষ্ঠানে বাদনকালে দুর্লভচন্দ্র সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া জ্ঞানশূন্য হন এবং সেখানেই ২৮ ঘণ্টা পরে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস নির্গত হয়।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

দুলদুল আলেক্‌জান্দ্রিয়াপতি মোকাওরিস স্বীয় দুহিতার সহিত একটি ধূসর বর্ণের অশ্বতরী পয়গম্বর হজরত মহম্মদকে উপহারস্বরূপ অর্পণ করেন। ইহাই উত্তর কালে দুলদুল নামে খ্যাতি লাভ করে। পয়গম্বর সাহেব যুদ্ধ ও পর্যটনকালে উহা বাহনরূপে ব্যবহার করিতেন। পরে তিনি তাঁহার প্রিয়তম জামাতা আমিরুল মোমেনিন হযরত আলী আলাইহেস সালামকে উহা দান করেন। তিনি জামাল ও সিফফিন যুদ্ধে স্বীয় বাহনরূপে উহাকে ব্যবহার করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক মতে কারবালা শরিফের মহাসমরেও ইমামপাক কর্তৃক দুলদুল ব্যবহৃত হইয়াছিল। তজ্জন্য অদ্যাবধি মুসলিমগণ মহরম শরিফের সময়ে বিভিন্ন অশ্বকে নানাভাবে সজ্জিত করিয়া দুলদুলের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেন। পয়গম্বর-প্রেমিকগণের নিকটে উহা অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানিত বলিয়া বিবেচিত হয়। ইয়াম্বু নামক স্থানে অত্যন্ত জরা-গ্রস্ত ও দন্তহীন অবস্থায় দুলদুলের জীবনান্ত ঘটে।

আব্দুস সোব্‌হান

দুষ্মন্ত শকুন্তলা দ্র

দুহ্যু, দ্রুহ যযাতি দ্র

দূত কথাটির অর্থ সংবাদবাহক, বার্তাবহ। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় বার্তাবাহক দূতের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। রাজাকে বলা হইত 'চারেক্ষণো দূতমুখঃ' অর্থাৎ চরই রাজার চক্ষু এবং দূতই তাঁহার মুখস্বরূপ, রাজা যাহা কিছু বলিবেন সবই দূতমুখে। ধর্মগ্রন্থাদিতে দূতের লক্ষণ, গুণাগুণ প্রভৃতির বিশদ আলোচনা আছে। মৎস্যপুরাণে (২১৫।১২-১৩) দূতের আবশ্যকীয় গুণের বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, যথোক্তবাদী, দেশভাষা-বিশারদ, কার্যকুশল, ক্লেশসহ, দেশকালবিভাগবিদ্ অর্থাৎ প্রয়োজনে যথোপযুক্ত কার্য করিতে বিশেষরূপে দক্ষ এবং নীতিশাস্ত্রে বক্তা, এইরূপ লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি দূত হইবার উপযুক্ত। মহাভারত (উদ্যোগ ও শান্তিপর্ব), মনুস্মৃতি, কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থেও দূতের গুণাগুণ-সম্পর্কিত আলোচনা আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসারে মন্ত্রণার বিষয় নির্ধারিত হইবার পরই কেবল দূতপ্রেষণ কার্য বিবেচিত হওয়া উচিত। দূত তিন প্রকারের হইতে পারে: ১. যে দূত সর্বপ্রকার অমাত্য-গুণযুক্ত তাহাকে 'নিসৃষ্টার্থ' বলা হয় ২. যে দূত প্রথমোক্ত অপেক্ষা একচতুর্থাংশ ঊন গুণ-সম্পন্ন তাহাকে 'পরিমিতার্থ' বলা হয় ৩. যে দূতের ঐ সকল গুণের অর্ধাংশ কম থাকিবে তাহাকে 'শাসনহর' বলা হয়।

শত্রুরাষ্ট্রে দূতের ইতিকর্তব্য, তাহার আচার-আচরণ, চর মারফৎ সংবাদসংগ্রহ-পদ্ধতি প্রভৃতির এক বিশদ বিবরণ কৌটিল্যের গ্রন্থে পাওয়া যায়। কামন্দক একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলিয়াছেন যে, শত্রুরাষ্ট্রে রাজার প্রতি বিদ্বিষ্ট ব্যক্তিসমূহকে খুঁজিয়া বাহির করা, তাহার বন্ধু এবং আত্মীয়পরিজনকে স্বপক্ষে আনয়ন, দুর্গসম্পর্কিত গুপ্ত তথ্য-সংগ্রহ, শত্রুর পরিকল্পনার খবরাখবর-সংগ্রহ, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীগণকে বশীভূত করা, সম্ভাবিত যুদ্ধের উপযুক্ত ক্ষেত্রের সন্ধান প্রভৃতি দূতের কর্তব্য। মনু বলিয়াছেন, দূতই সন্ধি অথবা যুদ্ধের কারণস্বরূপ।

কৌটিল্য নির্দেশ দিয়াছেন যে, অপ্রিয় সংবাদ বহন করিলেও দূত অবধ্য। রামায়ণেও বলা হইয়াছে, দূতের বক্তব্য ক্রোধের কারণ হইলেও তাহাকে শাস্তি প্রদান করা যাইবে না। মহাভারতের মতে, যে নৃপতি দূতকে বধ করেন তিনি সপারিষদ নরকে নিক্ষিপ্ত হইবেন।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূত বিনিময়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রীকরাজ সেলিউকসের দূতরূপে মেগাস্থেনেস মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। বিন্দুসারের রাজ-

সভায় দাইমাকোস নামক অপর এক গ্রীক দূত আসিয়াছিলেন। কথিত আছে, অশোক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁহার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তক্ষশীলার গ্রীক-রাজ আন্তিয়ালকিদাসের দূত হেলিওদোরস বিদিশায় আসেন। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সিংহলরাজের দূতকে নিজের রাজসভায় গ্রহণ করেন। পারস্যসম্রাটের সহিত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী দূত বিনিময় করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে চীন এবং রোমক সাম্রাজ্যেও দূত প্রেরিত হইয়াছিল।

দীপকরঞ্জন দাস

দূত এক রাষ্ট্র হইতে অপর রাষ্ট্রে প্রেরিত কূটনৈতিক প্রতিনিধি। সাধারণ দূত সার্বিক কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কালের জন্য স্থায়ীভাবে প্রেরিত হন; অ-সাধারণ দূত বিশেষ উদ্দেশ্যে অল্পকালের জন্য প্রেরিত হন। শান্তি, সন্ধি, চুক্তিসম্পাদন ইত্যাদির নিষ্পত্তির জন্য দূত পূর্ণ-ক্ষমতাপ্রাপ্ত (প্লেনি-পোটেন্‌শিয়ারি) হইতে পারেন; আবার তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইতে পারে।

সর্বোচ্চ পদস্থ কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে রাষ্ট্রদূত (অ্যাম্‌বাসাডর) বলা হয়। পদমর্যাদাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর দূতদের আখ্যা : পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত অমাত্য ও বিশেষ দূত (মিনিস্টার্‌স প্লেনিপোটেন্‌শিয়ারি অ্যাণ্ড এনভয়েজ় একস্‌ট্রাঅর্ডিনারি), অধিষ্ঠিত অমাত্য (মিনিস্টার্‌স রেসিডেণ্ট) এবং ভারপ্রাপ্ত দূত (শারজ্‌ দ্য আফেয়ার্‌স)। রাষ্ট্রদূত স্বীয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিভূ, তাঁহার সম্মান ও মর্যাদার দ্বারা মণ্ডিত; বৈদেশিক রাষ্ট্রের রাজার বা রাষ্ট্রপতির সহিত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার তাঁহার এক বিশেষ অধিকার। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই রাজার বা রাষ্ট্রপতির সহিত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানমাত্র; পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সহিত যোগাযোগই বড় কথা। পূর্বে অল্প কয়েকটি বড় বড় রাষ্ট্রই রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিত; আজকাল প্রায় সকল রাষ্ট্রই এই ক্ষমতার অধিকারী। কমনওয়েল্‌থ রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের নিকটে যে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করে তাঁহার উপাধি হইল হাই কমিশনার। দিল্লীতে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৬৯ জন বৈদেশিক কূটনৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে ৪৯ জন রাষ্ট্রদূত, ১১ জন হাই কমিশনার, ৭ জন ভারপ্রাপ্ত দূত, ১ জন পোপের 'ইণ্টারনান্‌শিও' ও ১ জন বিশেষ দূত ও পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত অমাত্য। রাষ্ট্রসংঘে প্রেরিত প্রধান প্রতিনিধিও রাষ্ট্রদূত বলিয়া অভিহিত।

বিদেশে স্বীয় রাষ্ট্রের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করাই রাষ্ট্রদূতের কাজ। দূতাবাস বহির্ভৌম (একস্‌ট্রা-টেরিটোরিয়াল) অধিকার ভোগ করে; রাষ্ট্রদূত ও তাঁহার অনুচরেরা যে রাষ্ট্রে অধিষ্ঠিত সেখানকার দেওয়ানি আইনের বশীভূত নন। দূত তাঁহার বিশেষ অধিকার, নিষ্কৃতি, অব্যাহতি ইত্যাদির অপব্যবহার করিলে তিনি অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি বলিয়া ঘোষিত হইতে পারেন এবং তাঁহার পদচ্যুতি বা প্রত্যাহরণ ঘটিতে পারে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

দূরবীক্ষণ জ্যোতির্বিদ্যা তথা জ্ঞানবিজ্ঞানের সামগ্রিক ইতিহাসে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অবদান অপরিসীম। দূরবীক্ষণ বলিতে সাধারণতঃ যাহাকে বুঝায় তাহার উদ্দেশ্য দূরস্থিত বস্তুকে দৃশ্যতঃ নিকটস্থ বা বর্ধিত করা।

দূরবীক্ষণ নির্মাণের কৌশল আবিষ্কৃত হয় ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডে লিপারশ্যে (Lippershey) নামক একজন চশমা-ব্যবসায়ীর দ্বারা। পর বৎসর ইটালীয় বিজ্ঞানী গালিলেও প্রথম স্ব-নির্মিত একটি দূরবীক্ষণ সহযোগে জ্যোতিষিক পর্যবেক্ষণ শুরু করেন।

পরবর্তী সাড়ে তিনশত বৎসরে দূরবীক্ষণের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে নানা শক্তির, নানা আকার-প্রকার ও গঠনের নানা দূরবীক্ষণ উদ্ভাবিত ও নির্মিত হইয়াছে।

গালিলেও-এর দূরবীক্ষণ ছিল প্রতিসরণ-নির্ভর (রিফ্র্যাক্‌টিংগ)। এই জাতীয় দূরবীক্ষণের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ দুইটি অভিসারী (কন্‌ভারজিংগ) লেন্‌স বা পরকলা— একটি বস্তুমুখী (অব্‌জেক্‌ট্‌-গ্লাস), অপরটি দ্রষ্টামুখী (আই-পিস)। প্রথমটির উদ্দেশ্য দূরস্থ বস্তুটির একটি গ্রাহ্য (রিয়্যাল) প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করা; তাহাকে বর্ধিত অগ্রাহ্য (ভার্চুয়্যাল) প্রতিবিম্বে পরিণত করা দ্বিতীয় লেন্‌সটির উদ্দেশ্য। প্রথম লেন্‌সটির ব্যাস বৃহত্তর এবং নাভিদূরত্ব দীর্ঘতর। লেন্‌স দুইটি ইহাদের নাভিদূরত্বের সমষ্টির সমান দূরত্বে একটি চোঙার দুই প্রান্তে বসানো থাকে। এই জাতীয় দূরবীক্ষণের পরিবর্ধন-ক্ষমতা (ম্যাগ্‌নিফিকেশন) লেন্‌স দুইটির নাভিদূরত্বের অনুপাতের দ্বারা সূচিত হয়।

প্রতিসরণ-নির্ভর দূরবীক্ষণের বস্তুমুখী লেন্‌স আকারে যত বড় হয়, বস্তুনির্গত আলোক তত বেশি সংগৃহীত হয়; ফলে প্রতিবিম্ব তত বেশি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়। কিন্তু বড় বস্তুমুখী লেন্সের অসুবিধাও আছে—যথা, বর্তুলাকার অপেরণ (স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন) ও বর্ণঘটিত অপেরণ (ক্রোম্যাটিক অ্যাবারেশন)। আবার উক্ত অসুবিধাগুলি দূর বা প্রশমিত করিতে পারিলেও, বৃহদাকার লেন্‌স

নির্মাণ ও স্থাপন করার কতকগুলি বড় রকমের ব্যবহারিক অসুবিধাও আছে। এই সকল কারণে নিউটন-উদ্ভাবিত প্রতিফলন-নির্ভর (রিফ্লেক্টিং) দূরবীক্ষণের ব্যবহারই আজকাল বেশি। শেষোক্ত ধরনের দূরবীক্ষণে বস্তুমুখী লেন্সের পরিবর্তে একটি অবতল (কন্‌কেভ) আয়না থাকে। আয়না দূরস্থ বস্তুর একটি গ্রাহ্য প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। প্রতিবিম্বটি স্বভাবতঃই আয়নার সম্মুখভাগে অর্থাৎ দূরস্থ বস্তুর সহিত একই পার্শ্বে সৃষ্ট হয়। তাই দ্রষ্টামুখী লেন্সের সাহায্যে দেখিবার পূর্বে উহাকে প্রায়শঃ একটি সমতল আয়না অথবা সমকোণী প্রিজ্‌ম বা ত্রিশিরা কাচের সাহায্যে ৯০° ঘুরাইয়া দেওয়া হয়।

পূর্বোল্লিখিত কারণে শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের স্ব-নির্মিত দূরবীক্ষণগুলি প্রায় সবই প্রতিফলন-নির্ভর। পৃথিবীর অধিকাংশ বড় বড় মানমন্দিরের বিশাল বিশাল দূরবীক্ষণগুলিও এই শ্রেণীর। আমেরিকায় ইয়ার্কস (Yerkes) মানমন্দিরে একটি ৪০ ইঞ্চি (প্রায় ১০২ সেন্টিমিটার) ব্যাসবিশিষ্ট প্রতিসরণ-নির্ভর দূরবীক্ষণ আছে ; মাউন্ট উইল্‌সন ও মাউন্ট পালোমার মানমন্দিরে যথাক্রমে ১০০ ও ২০০ ইঞ্চি (যথাক্রমে প্রায় ২৫৪ ও ৫০৮ সেন্টিমিটার) ব্যাসবিশিষ্ট প্রতিফলন-নির্ভর দূরবীক্ষণ আছে।

বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দূরবীক্ষণের অনেক রকমফের হয় ; যথা—আলোকচিত্র গ্রহণের উপযোগী স্মিড্‌ট (Schmidt) দূরবীক্ষণ।

জ্যোতিষিক ব্যবহার ছাড়াও দূরবীক্ষণের প্রভূত অন্যবিধ ব্যবহার আছে। সেক্ষেত্রে দূরবীক্ষণগুলি হয় আকারে ছোট এবং প্রতিসরণ-নির্ভর।

দৃশ্য আলোক-ব্যবহারী নয় এমন দূরবীক্ষণও আছে। রেডিও দূরবীক্ষণ ইহাদের মধ্যে অন্যতম।

রমাতোষ সরকার

দৃষদ্বতী নামটি ‘দৃশদ্বতী’-রূপেও লিখিত হইত। ইহা পূর্ব পাঞ্জাবের একটি নদীর নাম। ঋগ্‌বেদে ইহার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার বর্তমান নাম চিতাং, চিত্রাংগ বা চৌতাংগ। সুবিখ্যাত সরস্বতী নদীর ইহা একটি উপনদী। ঋগ্‌বেদের বর্ণনা হইতে মনে হয়, ভরতবংশীয়গণ সরস্বতী, দৃষদ্বতী এবং আপগা নদীর তীরে বাস করিতেন। ক্রমে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর তীরভূমি যজ্ঞ সম্পাদনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। মহাভারতে (৩।৮৩।২০৪-০৫) সরস্বতীর দক্ষিণে এবং দৃষদ্বতীর উত্তরে অবস্থিত কুরুক্ষেত্রকে স্বর্গের সমান বলা হইয়াছে। আবার মনুস্মৃতিতে (২।১৭ হইতে) বলা হইয়াছে যে, ঐ দুইটি দেবনদীর মধ্যবর্তী দেবনির্মিত দেশের নাম ব্রহ্মাবর্ত এবং উহা সদাচারের উৎস। এই পবিত্র তীর্থস্থানের তুলনায় ব্রহ্মর্ষিদেশের অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল এবং শূরসেন দেশের মর্যাদা কিছু কম বলা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, কুরুক্ষেত্রের অংশবিশেষের নাম ছিল ব্রহ্মাবর্ত। কালিকাপুরাণে (অধ্যায় ৪৮।৪৯) দৃষদ্বতী নদীর তীরবর্তী করবীরপুরকে জনৈক নরপতির রাজধানী বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাগবত পুরাণে (৩।২২।২৮) ব্রহ্মাবর্ত দেশের প্রধান নগরীর নাম বর্হিষ্মতী। সরস্বতী-দৃষদ্বতী-বিধৌত জনপদ প্রাচীন কালের মধ্যদেশ ও উত্তরাপথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল।

দ্র N. L. Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India*, London, 1927 ; A. A. Macdonell & A. B. Keith, *Vedic Index of Names and Subjects*, vol. I, Varanasi, 1958 ; D. C. Sircar, *Cosmography and Geography in Early Indian Literature*, Calcutta, 1967.

দীনেশচন্দ্র সরকার

দৃষ্টিতত্ত্ববাদ ফেনোমেনোলজি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জার্মান দার্শনিক এডমণ্ড হুসেরেল (১৮৫৯-১৯৩৮ খ্রী) ইওরোপীয় দর্শনে এক নূতন ধারার প্রবর্তন করিলেন তাঁহার দৃষ্টিতত্ত্ববাদে। হুসেরেল-এর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং মূলগত প্রশ্ন লইয়া এক যুক্তিনিষ্ঠ ও সুসংহত দর্শনের পত্তন করা। একদিকে তৎপূর্ববর্তী পরাবিদ্যামুখী দর্শন এবং অপর দিকে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মনোবিদ্যক প্রত্যক্ষবাদ ও দৃষ্টবাদ (পজিটিভিজ্‌ম)—এই উভয় ধারা হইতে মুক্ত পূর্বতন-ধারণা-নিরপেক্ষ এক দর্শনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

প্রথমে হুসেরেল তাঁহার ‘লজিক্যাল ইন্‌ভেস্টিগেশন’ (১৯০০ খ্রী) গ্রন্থে মানসবাদের বিরোধিতা করেন। মানসবাদের মতে চিন্তনের নিয়মগুলি সবই ছিল মূলতঃ মনস্তত্ত্বগত নিয়ম এবং আত্ম-নিরীক্ষণ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়াই তাহারা প্রতিষ্ঠিত। মনস্তত্ত্বগত এই আপেক্ষিকতার বিরুদ্ধে হুসেরেল তাঁহার বিষয়গত সত্যের ধারণা উপস্থিত করেন—যে সত্য ন্যায়শাস্ত্রসম্মত যুক্তিনিষ্ঠ, যাহার মূল্য মানস-নিরপেক্ষ এবং যাহা একমাত্র তত্ত্বস্বভাবমাত্রগ্রাহী দৃষ্টি দ্বারা ধরা যায় (যেমন দেখা যায় গণিতশাস্ত্রে)। এই তত্ত্বধর্মগ্রাহী দৃষ্টিতে পৌঁছাইতে

হইলে চৈতন্যের দ্বারা ঈপ্সিত বিষয়, যাহা প্রদত্ত, তাহাকে ধরিতে হইবে। চৈতন্যের নিকট তদীপ্সিত বিষয়কে আনার প্রক্রিয়াই দৃষ্টিতত্ত্ববাদের একান্ত নিজস্ব পদ্ধতি। হুসেরেল তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আইডিয়াজ্: পিওর ফেনোমেনোলজি অ্যাণ্ড ফেনোমেনোলজিক্যাল ফিলজফি' (১৯১৩ খ্রী)-তে চৈতন্যের বিশ্লেষণে একটি উভয়মুখী পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। বিশুদ্ধ দৃষ্টিতত্ত্ববাদে তত্ত্বের স্বভাবমাত্র বর্ণনা করা হয়, স্বভাবাতিরিক্ত সত্তা (একজিস্টেন্স) উহার বিচার্য নয়। এইজন্য দৃষ্টিতত্ত্ববাদকে অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স) বলা যায় না। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে সত্তানিরপেক্ষ তত্ত্ব ও তত্ত্বস্বভাবমাত্রগ্রাহী দৃষ্টি একই ব্যাপার, অর্থাৎ ইহা সেই চৈতন্য যাহা তত্ত্বস্বভাব নিরীক্ষণ করে এবং যাহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল কোনও কিছুর প্রতি উল্লেখ করা (ইনটেন্শনালিটি)। সৎ (প্রাকৃত) বস্তু তদভিমুখী চৈতন্যের সহিত অতি শিথিলভাবে লিপ্ত থাকে। উহা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা বিশুদ্ধ চৈতন্য; কিন্তু এই বিশুদ্ধ চৈতন্যের সহিত যুক্ত থাকে তাহার জগৎবোধকতা। এইভাবে হুসেরেল অনেকটা কান্টের মত এক নূতন ধরনের ভাববাদের (ট্রান্সেন্ডেন্টাল আইডিয়ালিজ্ম্) প্রবর্তন করেন, যে ভাববাদ সত্তা-নিরপেক্ষ নিছক জ্ঞপ্তিবিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দৃষ্টিতত্ত্ববাদ প্রত্যক্ষভাবে সৎ (বাস্তব) তত্ত্ব লইয়া বিচার না করিলেও, সৎ বস্তু, অস্তিত্ব ইত্যাদির ধারণা দার্শনিক জগতে আরও সুস্পষ্টভাবে আনিয়া দিয়াছে। এই বিশ্লেষণের ফলেই পরোক্ষভাবে পরবর্তীকালে অস্তিবাদের পথ মুক্ত হয়।

দেবব্রত সিংহ

দেউস্কর, সখারাম গণেশ (১৮৬৯-১৯১২ খ্রী) বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে এক নির্ভীক দেশপ্রেমিক, লেখক ও সাংবাদিক। দেওঘর-প্রবাসী মারাঠী ব্রাহ্মণ গণেশ সদাশিব দেউস্করের পুত্র সখারাম। দেওঘর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বসু ও দেওঘরপ্রবাসী সাহিত্যাচার্য রাজনারায়ণ বসুর সস্নেহ সাহচর্যে সখারাম একদিকে যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সেবক হইলেন, অন্যদিকে তেমনই স্বদেশ-সেবায় জীবন উৎসর্গে কৃতসংকল্প হন। তাঁহার ঐতিহাসিক নিবন্ধাদি ছাত্রাবস্থায়ই 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় স্থান লাভ করিতে থাকে।

কিছুদিন দেওঘর স্কুলে শিক্ষকতা করিবার পর তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সপরিবারে কলিকাতাবাসী হন ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পরিচালিত 'হিতবাদী' পত্রিকায় কর্ম গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল 'হিতবাদী'র সহ-সম্পাদকরূপে কাজ করিবার পর তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সুরাট কংগ্রেসে টিলকের ভূমিকার সমালোচনা করিয়া সম্পাদকীয় লিখিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে 'হিতবাদী'র সম্পাদনা পরিত্যাগ করিতে হয়। কর্মজীবনের পরবর্তী ধাপে সখারাম ন্যাশন্যাল কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে বৃত হন। কিন্তু রাজনীতিতে তাঁহার চরমপন্থী আচরণ কর্তৃপক্ষের পছন্দসই নয় মনে করিয়া এ কাজেও তিনি ইস্তফা দেন।

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইলে সখারাম বাংলার রাজনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০২-০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে যে শিবাজী-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সখারাম ছিলেন তাহার প্রাণস্বরূপ। বৈধ আন্দোলন ছাড়া বিপ্লবধর্মী শাখার সঙ্গেও তাঁহার সম্পর্ক সুনিবিড় ছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কলিকাতায় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিপ্লবধর্মী যে আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়, সখারাম সেখানে ছাত্রদিগকে নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিতেন ও পরে 'যুগান্তর' পত্রিকায়ও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার বহু প্রবন্ধ আজও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। বাংলা ভাষায় তিনি প্রায় ১২ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে দেশাত্মবোধক 'দেশের কথা' বইটি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯০, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ; হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ, কলিকাতা, ১৯৬১।

উমা মুখোপাধ্যায়
হরিদাস মুখোপাধ্যায়

দেওগড় উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার ললিতপুর তহসিলের ক্ষুদ্র গ্রাম ও জৈন তীর্থক্ষেত্র। দেওগড়ের অবস্থান ২৪°৩২' উত্তর ও ৭৮°১৫' পূর্ব। সেন্ট্রাল রেলওয়ের জখলৌন স্টেশন হইতে প্রায় ১১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ললিতপুর হইতে হাঁটা পথে ইহার দূরত্ব ৩০ই কিলোমিটার (১৯ মাইল)। অধিবাসীদের অনেকেই জৈন। গ্রামের মধ্যেই একটি জৈন-ধর্মশালা আছে।

দেওগড়

গ্রামটির পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক ঘিরিয়া স্রোতস্বিনী বেতোয়া (বেত্রবতী) নদী আর পূর্ব দিকে নাতি উচ্চ পাহাড়ের উপর কর্ণালী দুর্গ (প্রাচীন কীর্তিগিরি দুর্গ) রহিয়াছে। স্থানটির প্রাচীন নাম সম্ভবতঃ ছিল কেশবপুর। কর্ণালী দুর্গের অভ্যন্তরস্থ মন্দিরাবলী জৈন-সম্প্রদায়ের। দেওগড় কেবলমাত্র জৈনদের তীর্থস্থান নহে, প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যানুরাগীদের একান্ত কাম্যস্থল।

গুপ্তযুগ হইতে এখানকার ইতিহাস প্রত্নকীর্তির মাধ্যমে মোটামুটি ধারাবাহিক বলা যাইতে পারে। এই যুগেই নির্মিত হয় প্রখ্যাত সাগর মঢ় বা দশাবতার নামে পরিচিত বেলে পাথরের বিষ্ণুমন্দির। গ্রামের উত্তর-পূর্ব সমতল-ভূমিতে এইটি অবস্থিত। গুপ্তযুগের মন্দিরগুলির মধ্যে এবং স্থাপত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে মন্দিরটির স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তু-নকশা সুপরিকল্পিত। একটি উচ্চ বেদিকা বা মঞ্চের মধ্যস্থলে মন্দিরটি গঠিত। মঞ্চের চতুর্দিকের মধ্যভাগে এক-এক প্রস্থ সোপান এবং চারি কোণে সংলগ্ন এক-একটি ক্ষুদ্রাকার মন্দির। কাজেই মন্দিরটি বলা যাইতে পারে পঞ্চায়তন। মঞ্চের গাত্রদেশ ডৌল-কর্মের (মোল্‌ডিংগ্‌স), ভাস্কর্যের এবং পত্রপল্লবের সূক্ষ্ম কারু-কার্যের সুন্দর সমন্বয়ে অলংকৃত। ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু মূলতঃ রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত পুরাণ হইতে গৃহীত। মন্দিরটি ত্রিরথ। ত্র্যঙ্গ বাড় ঘিরিয়া পূর্বে একটি সস্তম্ভ অলিন্দ ছিল। বাড়ের কনিকপগ কারুকার্যবিহীন হইয়া রাহার ভাস্কর্যের মাহাত্ম্য বর্ধিত করিয়াছে। প্রতি রাহাতেই দুইটি কারুকার্যমণ্ডিত গাত্রস্তম্ভ। স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্তী কুলুঙ্গির মধ্যে অবস্থিত মূর্তিগুলির ভাস্কর্যশৈলী উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ দিকের কুলুঙ্গিতে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর অনন্তশায়ী মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া লক্ষ্মী, গরুড়, ব্রহ্মা, শিব-পার্বতী, ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, আয়ুধপুরুষবৃন্দ, মধু ও কৈটভের সমাবেশ। উত্তর রাহাতে বিষ্ণুর গজেন্দ্রমোক্ষের মূর্তি এবং পূর্ব রাহাতে নর এবং নারায়ণের তপোমগ্ন মূর্তি আছে। পশ্চিম রাহাতে প্রবেশদ্বার। দ্বারের উপান্তে এবং শীর্ষোপরি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত পুষ্পলতাপল্লবের কারুকার্য ও দ্বারপাল, গণ, মিথুন, গঙ্গা, যমুনা এবং অন্যান্য মূর্তির ভাস্কর্য অনবদ্য। বাড় ও গণ্ডির সন্ধিস্থল লতা-পাতা ও অন্যান্য নকশায় সুশোভিত। অলিন্দের ছাদের নিম্নস্থ কড়িগুলি সন্ধিস্থলের উপর হইতে প্রসারিত ছিল। গণ্ডির অতি সামান্য অংশই এখন বিদ্যমান। এই অংশের একটি ক্ষুদ্রাকার কাষ্ঠিতে রহিয়াছে গাত্রস্তম্ভ। কাষ্ঠির উপরে চৈত্য-গবাক্ষের অনুকৃতি আছে। গর্ভমূদ-অতিরিক্ত আরও দুইটি মূদ চারি দেওয়ালকে বাঁধিয়া দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিল। মন্দিরের বিগ্রহ অপসৃত। তবে দ্বারোপরি লক্ষ্মীপাটের ললাটবিম্বে অধিষ্ঠিত অনন্তনাগের উপর উপবিষ্ট বিষ্ণুর প্রতিকৃতি হইতে অনুমান করা হয় যে বিগ্রহটি ছিল বিষ্ণুর অনন্তশায়ী অথবা ভোগাসীন মূর্তি।

বেতোয়াতটস্থ কর্ণালী পাহাড়ের দক্ষিণ গাত্রে ক্ষোদিত মূর্তিপুঞ্জ ও শিলালেখে গুপ্তযুগের অন্যান্য নিদর্শন রহিয়াছে। এইগুলির মধ্যে বিশেষভাবে দর্শনীয় নাহরঘাটী ও রাজঘাটী নামক বেতোয়াগামী শৈলখাত সোপানদ্বয়ের পার্শ্বস্থ সপ্ত-মাতৃকা, বিষ্ণু ও মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি। রাজঘাটীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত সিধ-কী-গুফা নামক অসম্পূর্ণ গুহাটিও এই যুগের।

গুপ্তোত্তর যুগের প্রত্নকীর্তির মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে বরাহের মন্দির। ইহা সাগর মঢ়ের অনুকরণে নির্মিত এবং পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। মন্দিরটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। সাগর মঢ়ের মত এই মন্দিরটির তিন রাহাতে বিন্যস্ত ছিল নর-নারায়ণ, গজেন্দ্রমোক্ষ ও অনন্তশায়ীর মূর্তি। গর্ভগৃহে বরাহ অবতারের দণ্ডায়মান প্রতিমা। মন্দিরের চতুর্দিকে বিভিন্ন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে দেওগড় গুর্জর-প্রতীহারদের সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। এই রাজবংশীয় ভোজদেবের একটি লেখ (৮৬২ খ্রী) কর্ণালী দুর্গমধ্যস্থ ১২শ-সংখ্যক জৈনমন্দিরের মণ্ডপের একটি স্তম্ভে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। প্রতীহার রাজবংশের আমলেই জৈনসংস্থার পাকা ভিত্তি এই স্থলে গড়িয়া ওঠে। নির্মাণকার্য অব্যাহত থাকে চন্দেল্ল রাজ-বংশের রাজত্বকালেও। এখানকার মূর্তিগুলির অধিকাংশই ২৪ তীর্থংকর ও তাঁহাদের শাসনদেবী ও যক্ষদের।

চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মণের রাজত্বকালের একটি লেখ (সংবৎ ১১৫৪) রহিয়াছে রাজঘাটী সোপানের পার্শ্বস্থ শিলাগাত্রে। পাহাড়ের পশ্চিম সানুদেশে একটি বিশাল সরোবর ; বাঁধের সাহায্যে সম্ভবতঃ চন্দেল্লদের আমলে ইহা নির্মিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতক পর্যন্ত চন্দেল্লরাজদের আধিপত্য এই অঞ্চলে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তাহার পর এই অঞ্চল মুসলমান সুলতানদের করায়ত্ত হয়। মাণ্ডুর সুলতানদের হস্তচ্যুত হইবার পর দেওগড় বুন্দেলাদের করায়ত্ত হয়। বুন্দেলাদের স্মরণীয় কীর্তি দেওগড় গ্রামের পার্শ্বস্থ শিব-মন্দির। মন্দিরের উত্তর দিকে বহু সতীফলক। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়ারা এ স্থল অধিকার করে।

প্রাচীন জৈনপ্রতিষ্ঠানটি দুর্গের পূর্ব প্রাকারের সমীপবর্তী একটি স্বতন্ত্র প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। বর্তমানে

৩১টি মন্দির এবং বেশ কয়েকটি মানস্তম্ভ দণ্ডায়মান। মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে ১২শ-সংখ্যকটি; স্থাপত্যধারার ইতিহাসে ইহার স্থান সু-উচ্চে। গর্ভগৃহের চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণপথ এবং সম্মুখে অন্তরাল, সভামণ্ডপ এবং মণ্ডপ। প্রদক্ষিণপথের দেওয়াল-গাত্রে ২৪ শাসনদেবীর মূর্তি বিদ্যমান। মন্দিরের শিখরটি সুন্দরভাবে অলংকৃত। গর্ভগৃহে শান্তিনাথের বিশাল বিগ্রহ। মন্দিরগুলির সংস্কারকালে বহু মূর্তি ও দ্বিশতাধিক লেখ পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া যক্ষী শাসনদেবীর মূর্তিগুলি উল্লেখযোগ্য; ইহাদের হস্তস্থিত আয়ুধগুলি বিচিত্র। লেখগুলির মধ্যে কমপক্ষে ৬০টি তারিখসংবলিত; প্রাচীনতমটির তারিখ ৯১৯ বিক্রমসংবৎ আর আধুনিকতমটির ১৮৭৬ বিক্রমসংবৎ। ১২শ-সংখ্যক মন্দিরের মণ্ডপে রক্ষিত একটি সলেখ প্রস্তর-ফলক বিশেষত্বপূর্ণ। লেখটিতে ফলককে জ্ঞান-শিলা বলা হইয়াছে। এই ফলকটিতে ১৮টি ভাষা ও লিপির পরিচিতি ও নমুনা রহিয়াছে।

দ্র A. Cunningham, *Archaeological Survey of India: Report of tours in Bundelkhand and Malwa in 1874-75 and 1876-77*, vol. X, Calcutta, 1880; P. C. Mukherjee, *Report on the Antiquities in the District of Lalitpur, N. W. Provinces, India*, vol. I & II, Roorkee, 1899; D. R. Sahni, *Annual Progress Report of the Superintendent: Hindu and Buddhist Manuments, Northern circle, for the year ending 31st March, 1918*, Lahore; D. L. Drake-Brockman, *District Gazetteer: Jhansi*, Allahabad, 1929; M. S. Vats, *The Gupta Temple at Deogarh*, Memoirs of Archaeological Survey of India, No. 70, Delhi, 1952.

দেবলা মিত্র

দেওঘর বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা জেলার পশ্চিমে অবস্থিত একটি মহকুমা ও শহর। ইহা ছোট-নাগপুর মালভূমির দক্ষিণে অবস্থিত একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। শহরটির অবস্থান ২৪°৩০′ উত্তর ও ৮৬°৪২′ পূর্ব; সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ২৪০ মিটার (৮০০ ফুট)। শহরের ১১ কিলোমিটার (৭ মাইল) পূর্বে ৭৫০ মিটার (২৪৭০ ফুট) উচ্চ (সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে) ত্রিকূট পাহাড় অবস্থিত। পূর্ব রেলপথের প্রধান পথে অবস্থিত জসিডি শহর হইতে দেওঘরের দূরত্ব প্রায় ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল)। দেওঘর শহর জসিডির সহিত একটি শাখা-রেলপথ ও রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত। কলিকাতা হইতে দেওঘরের দূরত্ব ৩২৬ কিলোমিটার (২০৪ মাইল)। সাঁওতাল পরগণা জেলার প্রধান শহর দুমকা হইতে দেওঘরের দূরত্ব ৬৬ কিলোমিটার (৪১ মাইল)। দেওঘর শহর হইতে প্রায় ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) দূরে তপোবন পাহাড়।

দেওঘর বৈদ্যনাথের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। সেজন্য ইহার অপর নাম 'বৈদ্যনাথধাম'। ইহা একটি পবিত্র তীর্থস্থান। বৈদ্যনাথের মন্দিরের বিরাট চত্বরে ২২টি মন্দির আছে; তন্মধ্যে বৈদ্যনাথের মন্দির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কথিত আছে যে, এই মন্দিরের শিবলিঙ্গটি ভারতের সুপ্রাচীন ১২টি শিবলিঙ্গের মধ্যে অন্যতম। পুরাণে এই স্থানটি বিভিন্ন নামে উল্লিখিত আছে; যথা 'হরিদ্রাপীঠ', 'রাবণ-কানন', 'কেতকীবন' ও 'বৈদ্যনাথ'। শিবপুরাণে লিখিত আছে যে, রাক্ষসরাজ রাবণ কৈলাস হইতে শিবের প্রতীক একটি জ্যোতির্লিঙ্গ লঙ্কায় বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন; বিষ্ণু কৌশলপূর্বক সেই জ্যোতির্লিঙ্গটি নামাইয়া লন। যে স্থানে সেই জ্যোতির্লিঙ্গটি নামানো হইয়াছিল সেই স্থানটি হইল বর্তমান দেওঘর। দেওঘর ভারতবর্ষের ৫২টি পীঠস্থানের অন্যতম; এখানে সতীর হৃৎপিণ্ড পতিত হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। সাঁওতালদের আদি বীরপুরুষ শিবভক্ত বৈজুর নামানুসারে বৈদ্যনাথের নামকরণ হইয়াছে, একথাও অনেক পণ্ডিত মনে করেন। দেওঘরে বৈদ্যনাথের মন্দিরটি কোন সময়ে নির্মিত হইয়াছিল, এসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। মন্দিরগাত্রে প্রাচীন বাংলা ও মৈথিলীতে দুইটি লিপি উৎকীর্ণ আছে। বাংলা লিপি হইতে জানা যায় যে, গিধোরের রাজা পূর্ণমল্ল তাঁহার প্রধান পুরোহিত রঘুনাথের আদেশানুক্রমে ১৫১৮ শকাব্দে (১৫৯৬ খ্রী) এই মন্দির নির্মাণ করেন। মৈথিলী লিপিতে রাজা আদিত্য সেনের (৮৭১-৯০৭ খ্রী?) উল্লেখ আছে; তিনি ছিলেন চোল-বংশের রাজা। মনে হয়, তিনিই প্রথম মন্দিরটি নির্মাণ করেন, পরে মল্লরাজ পূর্ণমল্ল ইহার সংস্কার করেন। বৈদ্যনাথমন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত বৈদ্যনাথ ও জয়দুর্গার মন্দিরদুইটির চূড়া কাপড় ও রেশমী সুতার দ্বারা যুক্ত করা আছে।

দেওঘর শহরটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পৌরশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। শহরটির বর্তমান আয়তন ১৬·৩ বর্গ-কিলোমিটার (৬·২৯ বর্গমাইল) ও বর্তমান লোকসংখ্যা ৩০৮১৩। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতি বৎসর

দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস

এখানে লক্ষাধিক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়; বিশেষতঃ শিবরাত্রি এবং বসন্তপঞ্চমী ও ভাদ্রপূর্ণিমার মেলা উপলক্ষ্যে বহু জনসমাগম হয়। মন্দিরটি বহুদিন অবধি অস্পৃশ্যদের জন্য রুদ্ধ ছিল; বর্তমানে বিনোবা ভাবের নেতৃত্বে ইহা সকলের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XI, Oxford, 1908.

মৃগেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ

দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস মোগল সম্রাটের যে উন্মুক্ত দরবারে জনসাধারণ উপস্থিত থাকিত তাহাকে দেওয়ান-ই-আম বা সাধারণ সাক্ষাৎকারের সভাগৃহ এবং যেখানে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেন তাহাকে দেওয়ান-ই-খাস বা নির্জন সাক্ষাৎকারের কক্ষ বলা হইত। মোগল যুগের শুধু স্থাপত্যশিল্পেরই নিদর্শন নহে, প্রশাসনিক সংগঠনের সহিতও ইহারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ফতেপুর সিক্রী, আগ্রা ও দিল্লীর দেওয়ানগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ। ফতেপুর সিক্রীতে প্রাঙ্গণের সম্মুখেই দেওয়ান-ই-আম অবস্থিত। ইহার ভিত্তি উচ্চ ও ইহা সূক্ষ্ম কারুকার্যবিশিষ্ট একটি আয়ত (অব্‌লংগ) ঘর। আকবর এইখানে সিংহাসনে বসিতেন। দেওয়ান-ই-আমের পশ্চাতে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের স্বতন্ত্র বেষ্টনীটি শুধু সম্রাট ও তাঁহার পরিবারবর্গ ও রাজ্যের সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের জন্য। রক্তবর্ণ বালুকা-প্রস্তরের উচ্চ বেদির উপর অবস্থিত একটি রম্য গৃহ দেওয়ান-ই-খাস নামে অভিহিত। বাহির হইতে ইহা একটি দ্বিতল ও প্রতি কোণে গম্বুজবিশিষ্ট চালাঘর-সমন্বিত অট্টালিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু অভ্যন্তরে ইহা একটি সমচতুষ্কোণ কক্ষমাত্র। ইহা তলদেশ হইতে ছাদ পর্যন্ত উন্মুক্ত; মধ্যে একটি খিলান দেওয়া সমকোণ প্রকোষ্ঠ। চিত্র-বিচিত্র শানের মেঝে। সভাগৃহের মধ্যস্থল হইতে একটি অত্যুৎকৃষ্ট সুবিশাল ক্ষোদিত অষ্টবাহুবিশিষ্ট স্তম্ভ গবাক্ষের পত্তনপ্রস্তর পর্যন্ত উঠিয়াছে। ইহাকে অতিক্রম করিয়া এক বিরাট গোলাকার স্তম্ভাগ্র ও প্রস্তরমঞ্চ। ৩৬টি ঘন, সুবিন্যস্ত ও কুণ্ডলীকৃত পুষ্পসম তিন সারি বন্ধনী বিস্তারিত। ইহা হইতে চারটি প্রস্তর-কড়ি অট্টালিকার চার কোণ পর্যন্ত প্রসারিত।

আকবরের ব্যবহৃত রক্তবর্ণ বালুকা-প্রস্তরের স্থলে শাহ্‌জাহান আগ্রায় শ্বেত মর্মরের ইমারত নির্মাণ করেন। দুই সারির ৪০টি স্তম্ভবিশিষ্ট তিন দিকে উন্মুক্ত সুবিশাল সভাগৃহই দেওয়ান-ই-আম। তিন সারি উচ্চ স্তম্ভের উপর ইহার ছাদ। স্তম্ভগুলি সুদৃশ্য মর্মর খিলানের দ্বারা যুক্ত। চতুর্থ দিকের মধ্যদেশে এক উচ্চ দীর্ঘ কুলুঙ্গি বা মঞ্চ আছে, ইহা শ্বেত মর্মরের ও পিয়েট্রা ডুরায় (অর্থাৎ মর্মরে মহামূল্য প্রস্তরখচিত) পত্রপুষ্পে শোভিত। এই মঞ্চের উপর এক প্রকোষ্ঠে সম্রাট যে মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণসিংহাসনে বসিতেন তাহাই তখ্‌ৎ-ই-তাউস।

দেওয়ান-ই-আমের পশ্চাতে অবস্থিত মচ্ছী-ভবনের উত্তর-পশ্চিমে দেওয়ান-ই-খাস। ইহা যমুনার উপরে এক উন্নীত চাতালে নির্মিত শ্বেত মর্মরের আয়ত হর্ম্য ইহাতে কেবল নির্বাচিত আমীরগণ ও সর্বোচ্চ কর্মচারীবৃন্দ সম্রাট কর্তৃক আহূত হইতেন। ইহাতে দুইটি কক্ষ, মধ্যে এক উন্মুক্ত মর্মরমঞ্চ ও এক খিলান দ্বারা আচ্ছাদিত স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা যুক্ত। কক্ষদুইটি স্থাপত্যশিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। স্তম্ভ ও খিলান সুন্দর কারুকার্যে শোভিত ও অন্তর্নিবদ্ধ। প্রাচীরগুলি ভৃঙ্গার পত্রপুষ্পশোভিত।

প্রাচীন দিল্লীতে লালকেল্লার প্রায় মধ্য স্থলে লাহোর গেট দিয়া প্রবেশ করিলে নহবৎখানার পূর্বে এক বিরাট প্রাঙ্গণ। ইহারই মধ্যস্থলে শাহ্‌জাহানের দেওয়ান-ই-আম অবস্থিত। ইহার পরিকল্পনা আগ্রারই অনুরূপ। কক্ষটি জমকালো রক্তবর্ণ বালুকা-প্রস্তরনির্মিত। ইহাতে নয়টি খিলান; প্রত্যেক খিলানের মধ্যে জোড়া স্তম্ভ ও কোণে চারিটি স্তম্ভ। সর্বসমেত ৪০টি স্তম্ভ আছে বলিয়া ইহাকে ‘চেহেল সাতুন’ও বলা হয়। তিন দিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। চতুর্থ দিকে প্রাচীরগাত্রে এক প্রকোষ্ঠমধ্যে একটি উচ্চ ও আবৃত কারুকার্য-সংবলিত মঞ্চ বা কুলুঙ্গি। এই মঞ্চ শ্বেত মর্মর ও ইটালীয় পিয়েট্রা ডুরায় পক্ষী ও পত্রপুষ্পে শোভিত। বন্য পশু ও অর্ফিয়ুস প্যানেলটি অষ্টিন দ্য বোর্দো নামক বিদেশী শিল্পীর রচিত বলিয়া মনে করা হয়। এইখানেই একদা বিশ্ববিশ্রুত ‘ময়ূর-সিংহাসন’ শোভা পাইত। বালুকা-প্রস্তরের উপর নবনির্মিত অবস্থায় শেল প্লাস্টারের পলস্তারা (আইভরি পলিশ) দিয়া চতুর্দিকের মর্মরপ্রাসাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখা হইয়াছিল।

দেওয়ান-ই-আমের উত্তর-পূর্বে যমুনাতীরে দেওয়ান-ই-খাস অবস্থিত। ইহার সম্মুখে একটি প্রাঙ্গণ আছে। ইহার মূল্যবান ছাদের অভ্যন্তর ভাগ রৌপ্যময় ও ইহার মর্মরগাত্র স্বর্ণ ও মণিমুক্তায় খচিত ছিল। কারুকার্য ও সমগ্র পরিকল্পনার রূপ অতুলনীয়। এখানে এই ফার্সী লিপিটি উৎকীর্ণ আছে, ‘অগর ফিরদৌস্ বর্ রু-ই-জমীন্ অস্ত্, হমীন্ অস্ত্ উ হমীন্ অস্ত্ উ হমীন্ অস্ত্’; অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যদি কোনও স্বর্গ থাকে, তবে তাহা এখানেই, তাহা এখানেই, তাহা এখানেই।

দ্র H. C. Fanshawe, *Delhi Past and Present*, London, 1902 ; Percy Brown, *Indian Architecture*, vol. II, Bombay, 1942 ; V. A. Smith, *History of Fine Art in India & Ceylon*, Bombay, 1962.

জগদীশনারায়ণ সরকার

দেওয়ানি, দিওয়ানি ভারতে মুসলমান আমলে রাজ্যের প্রধান প্রধান শাসনবিভাগের নাম ছিল দিওয়ানি। সুলতানী ও মোগল আমলে প্রধান দিওয়ানি ছিল: ১. দিওয়ান-ই-ৱিজারৎ (রাজস্ব ও সাধারণ শাসন) ২. দিওয়ান-ই-রিসালৎ (ধর্মসংক্রান্ত) ৩. দিওয়ান-ই-আর্জ (সৈন্য) ৪. দিওয়ান-ই-ইনসা (চিঠিপত্র) ৫. দিওয়ান-ই-খয়রাৎ (দাতব্য) ৬. দিওয়ান-ই-কাজি-মসলিক (বিচার, সংবাদসংগ্রহ, ডাক) ৭. দিওয়ান-ই-রিয়াসৎ (হাট-বাজার) ৮. দিওয়ান-ই-বন্দোগন (ক্রীতদাস) ৯. দিওয়ান-ই-আমির কোহি (কৃষি) ইত্যাদি। মোগলসাম্রাজ্যে রাজস্ব-আদায় ও আয়-ব্যয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পদবী ছিল দিওয়ান। মন্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান। প্রতি প্রদেশেও একজন দিওয়ান ছিলেন, তিনি স্বয়ং সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার অধীন এবং কার্যের জন্য তাঁহার নিকট দায়ী থাকিতেন। সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার পরেই তিনি সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা প্রকারান্তরে সুবাদারের ক্ষমতা কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইত।

বাংলা দেশের ইতিহাসে দিওয়ান-পদের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ান নিযুক্ত করেন। এই বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ কোম্পানি ঐ তিন প্রদেশের রাজস্ব-আদায়ের ভার পাইল। সংগৃহীত রাজস্ব হইতে দিল্লীর সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাবকে বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা দিয়া যাহা বাকি থাকিত কোম্পানি তাহা যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারিত। কিছু দিন পরেই ইংরেজ কোম্পানি সম্রাটের বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করিল এবং নবাবের বার্ষিক বৃত্তি ক্রমে ক্রমে অনেক কমাইল। এইরূপে বাংলা দেশে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও মীর কাশিমকে যুদ্ধে হারাইয়া ইংরেজ বাংলার প্রকৃত প্রভু হইয়াছিল এবং মুর্শিদাবাদের নামমাত্র নবাব তাহাদের সম্পূর্ণ অধীন ছিলেন, কিন্তু তথাপি বাংলার শাসনে ইংরেজদের কোনও বিধিসঙ্গত দাবী বা অধিকার ছিল না। দিওয়ান-পদ লাভ করিয়া বাংলা দেশের উপর তাহাদের আইনসঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

দেওয়ালি দীপদানের উৎসব। ইহাতে প্রদীপ দিয়া বাড়িঘর সাজান হয়। ধর্মশাস্ত্রে ইহা দীপাবলী নামে উল্লিখিত। মুখ্য উৎসব কার্তিক মাসের অমাবস্যার সন্ধ্যায়; তবে উৎসবের সূচনা কয়েকদিন পূর্ব হইতে হইয়া থাকে। ইহা সর্বভারতীয় উৎসবগুলির অন্যতম। বিভিন্ন সম্প্রদায় (হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন) কর্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বলা হয়, রাম রাবণকে বধ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলে প্রজাগণ যে আনন্দোৎসবের আয়োজন করে, তাহাই স্মরণ ও অনুকরণ করিয়া ভারতবাসী দেওয়ালির উৎসব পালন করিয়া আসিতেছে। পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধগ্রহণের উদ্দেশ্যে যমলোক হইতে আগত পিতৃপুরুষের প্রত্যাবর্তনের পথপ্রদর্শনার্থে এইদিন উল্কা জ্বালাইবার ব্যবস্থা আছে। ইহা হইতেই বর্তমান বাজি পোড়াইবার রীতি প্রচলিত হইয়া থাকিতে পারে। বৌদ্ধেরা এই সময়ে বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও বুদ্ধশিষ্য মহামোগ্‌গলায়নের পরিনির্বাণ উপলক্ষ্যে উৎসব করিয়া থাকেন। জৈন তীর্থংকর মহাবীর আশ্বিনী কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রিতে নির্বাণলাভ করেন। সেইজন্য দীপমালা প্রজ্বলিত করিয়া এই সময়ে জৈনদের মধ্যেও উৎসব অনুষ্ঠানের রীতি আছে। চতুর্দশীতে দীপ সাজাইবার নিয়ম হিন্দুদের মধ্যেও আছে। ইহা কৃষ্ণ কর্তৃক নরকাসুরবধের স্মারক। এই চতুর্দশীর নাম নরক-চতুর্দশী বা ভূত-চতুর্দশী। দীপোৎসবই দেওয়ালির একমাত্র অনুষ্ঠান নয়; অমাবস্যার সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপূজার প্রথা প্রাচীন ও ব্যাপক। কোথাও কোথাও এই উপলক্ষ্যে অলক্ষ্মী-বিদায়ের অনুষ্ঠান করা হয়। বাংলা দেশে সাড়ম্বরে আয়োজিত কালীপূজাই এই দিনের প্রধান অনুষ্ঠান। ইহা দীপান্বিতা কালীপূজা নামে পরিচিত। দেওয়ালির বদলে কালীপূজা নামই বাংলায় বেশি প্রচলিত; তবে এই পূজার প্রথা প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। প্রসিদ্ধ কোনও প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০ খ্রী) দার্শনিক। ফ্রান্সের লা এ গ্রামে ইহার জন্ম। তখন রেনাশাঁ-অপরাহ্ণ। টাইকো ব্রাহে, কোপার্নিকাস, কেপলার, গালিলেও প্রভৃতি

দিকপালদের প্রভাবে তখন পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম-প্রভাবে প্রায়-অবরুদ্ধ মধ্যযুগীয় দর্শনকে বিজ্ঞানের মুক্ত বিচারের আলোকে দেকার্ত সঞ্জীবিত করিলেন। দেকার্তের মতে দর্শন প্রজ্ঞার সাধনা। তিনি গণিতের ছাঁচে দর্শন রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ মৌল সূত্র হইতে যেমন অন্য সমস্ত পরিণাম-বাক্য নিগমন-পদ্ধতিতে অনিবার্যভাবে পাওয়া যায়, সেইভাবেই দেকার্ত দর্শনের সমগ্র কাঠামোকে কয়েকটি স্বতঃপ্রমাণিত মৌল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দর্শনকে গণিতের মর্যাদায় উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন। জ্ঞানের নিশ্চয়তাই ছিল তাঁহার প্রধান অন্বিষ্ট। নিশ্চয়তার সন্ধানী দেকার্ত তাই তাঁহার দর্শন শুরু করিলেন সন্দেহ ও জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়া। প্রচলিত কোনও ধ্যান-ধারণাকেই তিনি বিনা জিজ্ঞাসায় গ্রহণ করিবার পক্ষে ছিলেন না। সন্দেহ ও জিজ্ঞাসার শেষে তিনি তিনটি মৌল সূত্র লাভ করেন, যাহা তাঁহার নিকট অবশ্যস্বীকার্য মনে হইল: চৈতন্য, ঈশ্বর এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাবিশিষ্ট বিস্তার (দেশ)। তাঁহার দার্শনিক পথ-পরিক্রমা এইরূপ: আত্মচৈতন্য হইতে ঈশ্বর এবং ঈশ্বর হইতে বাহ্য জগৎ।

'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি' ('Cogito, ergo sum'), এই হইল দেকার্তের প্রারম্ভিক সূত্র। চিন্তার বিষয়ীরূপে 'আমি'-র অস্তিত্ব তাঁহার নিকট সন্দেহাতীত। সন্দেহও একপ্রকার চিন্তা, সুতরাং সন্দিগ্ধ 'আমি'ও চিন্তার বিষয়ী। চিন্তার মৌল স্বরূপ সন্দেহাতীত। চিন্তা ও 'আমি' মূলতঃ একাত্ম। আত্মচিন্তা এতই স্পষ্ট যে ইহা সত্য হইতে বাধ্য। যাহা স্পষ্ট তাহা সত্য। ঈশ্বরচিন্তাও একান্ত স্পষ্ট, সুতরাং এই চিন্তা নিশ্চয়ই সত্য। ঈশ্বরচিন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বেরই ফল; ঈশ্বর না থাকিলে আমি ঈশ্বরচিন্তা করিতে পারিতাম না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ঈশ্বরচিন্তা হইতেই অনুসৃত; কারণ অস্তিত্ব চিন্তায় অনুস্যূত। পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বরকে অস্তিত্বহীনরূপে চিন্তা করা যায় না। এইরূপে দেকার্ত আত্মতত্ত্ব হইতে ঈশ্বরতত্ত্বে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিস্তারতত্ত্বের স্থান দেকার্তের দর্শনে একটু স্বতন্ত্র। ঈশ্বরচিন্তা হইতে যেভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানা যায়, সেভাবে কিন্তু বিস্তারচিন্তা হইতে বিস্তারের অস্তিত্ব জানা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আত্মচিন্তা করে, সে বিস্তারচিন্তাও করে। ব্যক্তির যেমন আত্মা আছে, তেমনি দেহ (বিস্তার)-ও আছে। আত্মার সারধর্ম চৈতন্য; দেহের সারধর্ম বিস্তার। ব্যক্তিসত্তা দ্বি-রূপ—আত্মা ও দেহ। দেকার্ত দ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে আত্মা ও দেহ সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী; দেহ যান্ত্রিক কার্য-কারণ নিয়মাধীন, কিন্তু চৈতন্যধর্মী আত্মা মুক্ত। ভিন্নধর্মী হইলেও দেহ ও আত্মার মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। দেকার্তের দ্বৈতবাদ পরবর্তীকালীন ইওরোপীয় দর্শনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে।

দেকার্তের মতে, ঈশ্বর, আত্মা ও দেহ—এই তিনটি দ্রব্য। আত্মায় চিন্তাভিন্ন এমন কতকগুলি নিষ্ক্রিয় অভিজ্ঞতা আছে, যাহা বাহ্য বস্তুজগৎ স্বীকার না করিলে ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বরূপে অবস্থিত বিস্তারকে বলা হয় দেশ। পক্ষান্তরে বলা যায়, দেহাশ্রয়ী ও সান্ত দেশ হইল বিস্তার। যেখানেই বিস্তার সেখানেই স্বনির্ভরশীল দ্রব্য। যেখানেই দেশ সেখানেই বস্তু। শূন্য দেশের কোনও অস্তিত্ব নাই। বস্তুর (ম্যাটার) দ্বারা দেশ পূর্ণ; আর দেশজন্য বস্তু অনন্ত। বস্তু বিভাজ্য, রূপময় এবং গতিশীল পরিমাণ। দেহী যাহা কিছু সৎ তাহাই বিস্তার; দেহী যাহা কিছু পরিবর্তনশীল তাহাই গতি। কোনও দেহ বা বস্তু-অংশ যখন তাহার সন্নিহিত স্থাণু দেহ বা বস্তু-অংশ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া অন্য কোনও দেহ বা বস্তু-অংশের সন্নিহিত হয় তখন সেই স্থানান্তরণকে গতি (মোশন) বলা হয়। গতিকে শুধু ক্রিয়াশীলতা মনে করিলে ভুল হইবে; ক্রিয়াশীলতা ও স্থাণুত্ব উভয়ই গতির অবস্থাভেদ। যেহেতু শূন্য দেশ নাই, সেহেতু বস্তুপূর্ণ দেশে গতি সৃষ্ট হইলেই তাহা সন্নিহিত বস্তুতে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে। গতির মূল কারণ ঈশ্বর।

দেকার্তের মতে, মানুষের পরম লক্ষ্য হইল অজ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ করা। মানুষ অস্পষ্ট ধারণার উপর নির্ভর করিয়াই যদি বিচার করে তবেই সে ভুল করে। আমাদের বিচার সান্ত, কিন্তু ইচ্ছা অনন্ত। আমাদের ভ্রম ও ভ্রম-মুক্তির সম্ভাবনা উভয়েরই মূলে রহিয়াছে ইচ্ছা। যে পর্যন্ত আমাদের ধারণা বা চিন্তা স্পষ্ট না হয় সে পর্যন্ত ইচ্ছাপূর্বক বিচার স্থগিত রাখিলে আমরা অভ্রান্ত জ্ঞানের পথে চলিতে পারি। জ্ঞানের পথ আদর্শ জীবনের পথ; মূলতঃ সত্য ও শুভ একাত্ম।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দেবকী কৃষ্ণ দ্র

দেবকুমার রায়চৌধুরী (১৮৮৪ ?-১৯২৯ খ্রী) কবি ও জীবনীকার। বরিশাল জেলার লাখুটিয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। দেবকুমারের মাতা মহিলা-ঔপন্যাসিক

দেবতা

কুসুমকুমারী দেবী। অল্প বয়সেই দেবকুমারের কবিত্ব-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। 'অরুণ', 'প্রভাবতী', 'মাধুরী' ও 'ধারা' নামে চারখানি কাব্যগ্রন্থ এবং 'দেবদূত' নামক কাব্যনাট্য তাঁহার কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দেয়। দেবকুমার গদ্যরচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' নামক পুস্তিকাটিতে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া মীমাংসার পথ দেখাইয়াছেন। দেবকুমারের 'দ্বিজেন্দ্রলাল' (১৯১৭ খ্রী) বাংলা চরিত-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। তাঁহার কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল দুইজনেরই প্রভাব সুপরিস্ফুট।

রথীন্দ্রনাথ রায়

দেবতা শব্দটি 'দিব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে দ্যুতিবিশিষ্ট। দেবতা সম্বন্ধে চারিপ্রকার ধারণা দৃষ্টিগোচর হয়।

১. যাজ্ঞিক-সম্প্রদায় দেবতাকে মন্ত্রস্বরূপ বলিয়া থাকেন। যজ্ঞাদিতে ত্যজ্যমান হবিঃ যাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত হয়, তিনিই দেবতা।

২. একত্ববাদী উপাসকসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম সাধকের উপাসনার নিমিত্ত বহুপ্রকার রূপ ধারণপূর্বক সাধককে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রত্যেকটি রূপই তাঁহা হইতে অভিন্ন এবং বাস্তব। এক মহান ব্রহ্মের বিভিন্ন আকৃতিই বিভিন্ন দেবতানামে পূজিত হন। দেবগণের বাহন, আয়ুধ প্রভৃতিও তাঁহারই বিবর্ত-মাত্র। সাকার-উপাসকের নিকট তাঁহার দেবতাই পরমেশ্বর। সকল দেবতাই একের স্বরূপমাত্র। তাঁহাদের মধ্যে যথার্থতঃ কোনও ভেদ নাই। এইপ্রকার সিদ্ধান্ত হইতেই শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য উপাসক-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র এবং উপনিষদাদিতে প্রধানতঃ এই সিদ্ধান্তই প্রকটিত।

৩. অচেতন বস্তুর অধিষ্ঠাতৃরূপে দেবতার কল্পনা আমাদের দেশে খুবই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। যাস্কের নিরুক্তভাষ্যে অগ্নি, ইন্দ্র বা বায়ু এবং সূর্য—এই তিনজন-মাত্র দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে। অগ্নি হইতেছেন পৃথিবীর অধিপতি, ইন্দ্র বা বায়ু অন্তরীক্ষের অধিপতি এবং সূর্য দ্যুলোকের অধিপতি। উল্লিখিত প্রত্যেক লোকে ১১ জন দেবতা রহিয়াছেন, এইরূপ কথাও ঋগ্বেদে দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাতে দেবতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩। আবার ৩৩৩৯ জন দেবতার কথাও শুনা যায়। এইভাবে বিভিন্ন জড় বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী বা অভিমানিনী দেবতার কল্পনার ফলে পুরাণাদি শাস্ত্রে দেবতার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৩ কোটি। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সংখ্যাতীত দেবতা কল্পিত হইয়াছেন। দেবতার ক্রমবিকাশের পর্যালোচনায় বোঝা যায়, জড় বস্তুর মধ্যেও যে মহাশক্তির লীলা চলিতেছে, ঋষিগণ বিস্মিত হইয়া সেই শক্তিকেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।

৪. অপর সম্প্রদায়ের মতে দেবতাগণ একশ্রেণীর উন্নত জীবমাত্র। তাঁহাদের জন্ম ও মৃত্যু আছে; অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু বলিয়া তাঁহাদিগকে অমর বলা হয়। আদি দেবতাগণ হইতেছেন মরীচিপুত্র কশ্যপের জ্যেষ্ঠা পত্নী অদিতির সন্তান। স্বর্গলোক দেবগণের বাসভূমি। স্বর্গ অতি মনোহর স্থান। দেবগণের আকৃতি বিচিত্র, তাঁহাদের সাজসজ্জা, আয়ুধ, বাহন প্রভৃতিও নানাপ্রকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্র হইতেছেন দেবগণের রাজা, তাঁহার ঐশ্বর্যের অন্ত নাই। দেবগণের আকৃতিতে মানবীয় রূপেরই বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়।

দেবগণের প্রধান খাদ্য হবির্ভাগ এবং প্রধান পানীয় হইতেছে সোমরস। এই সম্প্রদায়ের একদলের সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, বেদে বর্ণিত স্তবস্তুতি হইতে বোঝা যায়, দেবগণের আকৃতি মানুষের ন্যায় নহে। দেবগণ স্বেচ্ছায় রূপ পরিবর্তন করিতে পারেন।

দেবগণ নানাভাবে মর্ত্যলোকের কল্যাণসাধন করেন। মানুষও যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণকে পরিতৃপ্ত করে। অগ্নিই দেবগণের মুখ। মানবীয় এক বৎসর কাল দেবতাদের এক দিন। উত্তরায়ণের ছয় মাস কাল দেবতাদের দিন এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাস তাঁহাদের রাত্রিরূপে কল্পিত হয়। দক্ষিণায়নে দেবগণ নিদ্রিত থাকেন। বিশেষ বিশেষ তিথি ও নক্ষত্রের যোগে বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজা সমধিক ফলপ্রদ।

কেহ কেহ ইন্দ্র ও সূর্যকে একই দেবতা মনে করেন।

মনুষ্যসমাজের চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থার ন্যায় দেবতাদেরও চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থা রহিয়াছে বলিয়া পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে। দেবতারা সকলেই অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যে বলীয়ান। মর্তলোকেও তাঁহাদের গতিবিধি আছে। অসুর বা দৈত্য-দানবের সহিত তাঁহাদের শত্রুতা সহজাত।

পাপ-পুণ্যে দেবগণও লিপ্ত হন, তাঁহাদের মধ্যেও উপাস্য-উপাসকভাব এবং পারিবারিকতা রহিয়াছে। যেহেতু দেবতারাও একপ্রকার উন্নতশ্রেণীর জীব বলিয়া পুরাণাদিতে কীর্তিত হইয়াছেন, সেইহেতু তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও মানুষেরই আশা-আকাঙ্ক্ষার মত।

তাঁহারাও মুক্তির নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। তাঁহারাও তপস্যা করিয়া মুক্তি লাভ করেন।

মনুষ্য ও দানবের সমাজে তাঁহাদের বিবাহাদির কথাও শোনা যায়। দেবগণ যখন ছদ্মবেশে মর্তলোকে বিচরণ করেন, তখনও তাঁহাদের শরীরে কখনও ঘর্ম দেখা যায় না, চক্ষুতে পলক থাকে না এবং চরণ ভূমিকে স্পর্শ করে না। দেবতাদের পুষ্পমালাও কখনও মলিন হয় না।

স্তবস্তুতি ও মন্ত্রাদির দ্বারা দেবগণকে তুষ্ট করিতে পারিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়, এইপ্রকার ধারণাও এই চতুর্থ সম্প্রদায়ের রহিয়াছে।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় অর্থাৎ দেবতাগণের একত্ববাদী উপাসকগণ সকল দেবতাকেই এক মহান আত্মার বিভূতি বা বহুরূপে প্রকাশ বলিয়া মনে করেন। এই একদেবত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদই দেবতাতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্তরূপে উপাসক-সম্প্রদায়ের সম্মত।

সুখময় ভট্টাচার্য

দেবদত্ত বুদ্ধের খুল্লতাত-পুত্র। বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিনয়ে ও নিকায়ে ইঁহার সম্বন্ধে বিচিত্র বিবরণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক মতে, খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমে অভিজাত শাক্যবংশে দেবদত্তের জন্ম হয়। তিনি নিজ ভ্রাতা আনন্দের ন্যায় যৌবনে স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করিয়া বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুকে প্রভাবান্বিত করেন। সংস্কারবাদী বুদ্ধের সঙ্গে রক্ষণশীল দেবদত্তের মতবিরোধ ঘটে। তিনি পরম্পরাক্রমে বুদ্ধের পরে সংঘের নেতা হইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বুদ্ধ স্থির করেন যে, তাঁহার নেতৃত্বের অবসানে বিনয় ও ধর্ম অনুসারেই সংঘকার্য পরিচালিত হইবে।

কৃচ্ছ্রসাধনের পরিপোষক কয়েকটি নিয়ম সংঘে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভিক্ষুরা বুদ্ধের অনুমোদিত বিকল্প ব্যবস্থাগুলিও পালন করিতেন। দেবদত্ত বাসস্থান, ভোজন ও পরিধেয় বস্ত্রসম্পর্কিত পাঁচটি কঠোর নিয়ম বাধ্যতামূলক করার ও বিকল্প নিয়মগুলি অগ্রাহ্য করার দাবি জানান; কিন্তু সংঘের তিনবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি স্বমত ত্যাগ না করায় সংঘাবশেষ অপরাধে অপরাধী হন। পরে এই পাঁচটি নিয়মের ভিত্তিতে সংঘসীমার মধ্যে একই দিনে স্বতন্ত্র উপাসথের অনুষ্ঠান করিয়া দেবদত্ত সংঘ-ভেদ করেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে দেবদত্তসম্বন্ধে নানা প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধকে একাধিকবার হত্যার চেষ্টাও উল্লিখিত আছে।

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

দেবদাসী বড় বড় মন্দিরে দেবতার সম্মুখে নৃত্য ও গীত-বাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। সেজন্য অনেকে স্বীয় পুত্র-কন্যাকে (বিশেষতঃ কন্যাকে) দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেন। এই বালিকাদিগকে দেবদাসী বলা হইত। নৃত্যগীতে তাহারা অত্যুত্তম শিক্ষা লাভ করিত। প্রথাটি ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। হিন্দুমন্দিরের ন্যায় বৌদ্ধদিগের মন্দিরেও দেবদাসী থাকিত।

দেবদাসীপ্রথা কত প্রাচীন তাহা বলা কঠিন। ইহার উৎপত্তিসম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, দেশের রাজার অনুরূপ দেবতাদিগেরও ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, এইরূপ ধারণার সহিত প্রথাটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। রাজার চিত্তবিনোদনের জন্য নৃত্যগীতের প্রয়োজন হইত, তাই দেবতার জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা কল্পিত হইয়াছিল। কালক্রমে প্রথাটিতে কদর্যতা প্রবেশ করে, কারণ এই দেবদাসীরা গণিকার জীবন যাপন করিত।

আদি মধ্যযুগে বাংলা দেশের বৃহৎ মন্দিরসমূহে যে বহুসংখ্যক দেবদাসী পরিপালিতা হইত, তাহা ভবদেব-ভট্টের 'ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি' এবং বিজয় সেনের 'দেওপাড়া-প্রশস্তি' হইতে জানা যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' এবং ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যেও দেবদাসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'রাজতরঙ্গিনী' হইতে জানা যায় যে, ৮ম শতাব্দীতে উত্তর বাংলার পুণ্ড্রবর্ধন নগরীস্থিত কার্তিকেয়মন্দিরে কমলা নাম্নী জনৈকা দেবদাসী ছিল; তাহার অলৌকিক রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া কাশ্মীররাজ জয়াপীড় বিনয়াদিত্য তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবরণ সত্য হইলে জয়াপীড়কে অবশ্যই কার্তিকেয়মন্দিরের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কমলাকে ক্রয় করিতে হইয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনায় সোমবংশীয় নরপতি কর্ণ ওড়িশায় রাজত্ব করিতেন। কর্ণরাজের রত্নগিরি-তাম্র-শাসন হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাণী কর্পূরশ্রী পূর্বে সলোণপুরের বিহারস্থির বৌদ্ধমন্দিরে দেবদাসী ছিলেন। কর্পূরশ্রীর মাতা মাহূণ দেবীকেও 'মহারী' অর্থাৎ দেবদাসী বলা হইয়াছে। তাম্রশাসনে তাঁহার পিতার নামোল্লেখ নাই, কারণ দেবদাসীকন্যার পিতৃপরিচয় না থাকিবারই কথা।

দেবদাসীদের নৈতিক জীবন যেরূপই হউক, দেবতার অনুগৃহীতা হিসাবে সমাজে তাহাদের মর্যাদার অভাব ছিল না।

দ্র R. C. Mazumdar, ed, *History of Bengal*, vol. I, Dacca, 1943; D. C. Sircar, 'Note on Ratnagiri Plate of Somavamsi Karna',

Epigraphia Indica, vol. XXXIII, Delhi, 1959-60; D. C. Sircar, 'Devadasis in Buddhist Temples', *Epigraphia Indica*, vol. XXXV, Delhi, 1963-1964.

দীনেশচন্দ্র সরকার

দেবপাল (আনুমানিক ৮১০-৫০ খ্রী) পালবংশীয় সম্রাট ধর্মপালের পুত্র। তিনি পিতার বিশাল সাম্রাজ্য অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন এবং অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার একখানি তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাঁহার বিজয়বাহিনী দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত এবং পশ্চিমে কাম্বোজ দেশ অর্থাৎ কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। অন্য একখানি তাম্রশাসন হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি ওড়িশা, আসাম এবং হুণ, দ্রাবিড় ও গুর্জর দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্বত ও পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কিছু অত্যুক্তি থাকিলেও দেবপাল যে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই উক্তির সত্যতাসম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এই সময়ে মগধ, কলিঙ্গ, চোল, পল্লব ও গঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য মিলিত হইয়া পাণ্ড্যরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল ইহার প্রমাণ আছে এবং মগধরাজ বলিতে নিঃসন্দেহে দেবপালকেই বুঝায়। সুতরাং অসম্ভব নহে যে সুদূর দাক্ষিণাত্যে দেবপালের সৈন্যগণ পাণ্ড্যদেশের বিরুদ্ধে কোনও যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল; পাণ্ড্যরাজ্য রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সুতরাং দেবপালের সভাকবি ইহাই অতিরঞ্জিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। দেবপাল যে দ্রাবিড়রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনিই এই পাণ্ড্যরাজ এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে। মোটের উপর দেবপাল একজন দিগ্বিজয়ী পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার খ্যাতি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতির অধীশ্বর শৈলেন্দ্রবংশীয় মহারাজ বালপুত্রদেব তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে দেবপাল ইহার ব্যয়নির্বাহের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত দেবপালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। একখানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে দেবপাল নগরহার অর্থাৎ জালালাবাদ-নিবাসী বীরদেবকে নালন্দার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

দেবপাল অন্ততঃ ৩৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ধর্মপালের মন্ত্রী গর্গের পুত্র ও পৌত্র দর্ভপাণি ও কেদার মিশ্র উভয়েই দেবপালের সুযোগ্য মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার পিতৃব্যপুত্র জয়পাল তাঁহার একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। পিতার ন্যায় দেবপালও বৌদ্ধ ছিলেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৮৬২-১৯৩৫ খ্রী) রাজনীতিবিদ ও দেশসেবক। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলায় খানাকুল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সূর্যকুমার সর্বাধিকারী খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দেবপ্রসাদ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন ও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাটর্নি হন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে তিনি দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরি, মাদক-নিবারণী সভা, সাহিত্যসভা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতির পরিচালনার সহিত তিনি দীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সভার সভ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং সিণ্ডিকেটের সভ্য হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে তিনি দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হন এবং লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সিটিজ্ অফ দি এম্পায়ার কংগ্রেসেও দুইবার যোগদান করেন। অ্যাবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক এল. এল. ডি. উপাধি দেয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য দেবপ্রসাদ ইওরোপে প্রেরিত হন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেবপ্রসাদ ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের অবস্থা পর্যালোচনা ও ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তথ্যের অনুসন্ধানে প্রেরিত হন।

সংস্কৃত ভাষার প্রসারকল্পে তাঁহার উৎসাহ এবং চেষ্টার জন্য তিনি নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ার পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক সম্মানিত হন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জাতিসংঘে (লীগ অফ নেশন্স) ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'ইওরোপে তিন মাস'।

দ্র শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, জীবনীকোষ, ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ; C. E. Buckland, *Dictionary of Indian Biography*, London, 1906.

অশোকা সেনগুপ্ত

দেবযানী কচ দ্র

দেবলাদেবী গুজরাতের বাঘেলা-বংশীয় রাজপুত রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেব ও কমলাদেবীর কন্যা। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী গুজরাতের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়া ইহার রাজধানী অনহিল্‌বার অধিকার করেন (১২৯৯ খ্রী)। কর্ণদেব আহমদাবাদের নিকটে শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং তাঁহার মহিষী কমলাদেবী শত্রুহস্তে পতিত হন। দিল্লীতে নীত হইবার পর আলাউদ্দীন কমলাদেবীকে বিবাহ করেন। কর্ণদেব গুজরাত পুনরায় অধিকার করেন, কিন্তু দিল্লীর সেনাবাহিনীর নিকটে আবার পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। দেবলাদেবী মুসলমান সেনাবাহিনীর হস্তে পতিত হন ও দিল্লীতে নীত হন। আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কেহ কেহ বলেন, খিজির খাঁ নিহত হইবার পরে দেবলাদেবীর সহিত খিজির খাঁর ভ্রাতা মুবারক শাহের এবং ইহার পরে নাসিরুদ্দীন খুসরু-র সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে এই সংবাদের উপরে নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত নয়।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. VI, Bombay, 1960.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৫৪-১৯২০ খ্রী) 'নব্যভারত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্ভীক সম্পাদক। ফরিদপুর জেলার উলপুর গ্রামের বঙ্গজ কায়স্থ বংশে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র রায়চৌধুরী। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্‌স পরীক্ষার পর তিনি মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন, কিন্তু ৪ বৎসর পরে উহা পরিত্যাগ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সুলভ-সমাচার' পত্রিকার অনুকরণে 'ভারতসুহৃদ' নামে এক-পয়সার সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। ইহার পর তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন ও বিধবা ভগিনী বিরজার ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেন। 'কুচবিহার বিবাহ' আন্দোলনকালে তিনি কেশবচন্দ্র সেনকে পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এই সময়ে মাত্‌সিনি-র 'নব্য ইতালী'-কে প্রচার করিতে থাকেন। ঐ আদর্শে দেবীপ্রসন্ন 'নব্যভারত' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি নিজে 'শরচ্চন্দ্র', 'বিরাজ-মোহন', 'ভিখারী', 'সন্ন্যাসী', 'পুণ্যপ্রভা', 'মুরলা' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করিলেও 'নব্যভারত' পত্রিকায় কোনও গল্প বা উপন্যাস ছাপিতেন না। স্বদেশী-আন্দোলনকালে মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের জন্য তাঁহাকে জামিন দিতে বলা হইলে তিনি 'নব্যভারত' বন্ধ করিয়া দেন। (পরে ইহা পুনঃ-প্রকাশিত হয়।) তিনি সমাজসংস্কারক ও সমাজসেবী ছিলেন। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'সোপান', 'বিবেক-বাণী', 'বিবাহ-সংস্কারক', 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত (উৎকল)', 'দ্যুতি', 'দীপ্তি', 'প্রসূন', 'প্রণব', 'সান্ত্বনা', 'যোগজীবন'।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

দেবীবর ঘটক বন্দ্যঘটি বংশীয় ব্রাহ্মণ। পিতার নাম সর্বানন্দ ঘটক বিশারদ। সমসাময়িক কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বল্লালসেন কর্তৃক নির্দিষ্ট নবগুণের অভাব দেখিয়া দেবীবর এক-একপ্রকার দোষযুক্ত কুলীনদিগকে লইয়া এক-একটি দল বা 'মেল' (মোট ৩৬টি মেল) গঠন করেন এবং নিয়ম করেন যে, প্রতি কুলীনকে সমান পর্যায়ে বৈবাহিক আদানপ্রদান করিতে হইবে, কুলীনরা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিলে কৌলীন্যভ্রষ্ট হইবে, কিন্তু রণ্ড-পিণ্ড বলাৎকারাদি দোষে কুলীনের কুল নষ্ট হইবে না। দেবীবর ১৫শ শতকের শেষ ও ১৬শ শতকের প্রথম দিকের লোক। কুলজিগ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোনও প্রাচীন সূত্রে ইহার নাম পাওয়া যায় না।

দ্র লালমোহন বিদ্যানিধি, সম্বন্ধনির্ণয়, কলিকাতা, ১৯০৮; নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯১১।

সুখময় মুখোপাধ্যায়

দেবীভাগবত একটি প্রসিদ্ধ উপপুরাণ। ইহাতে দ্বাদশ স্কন্ধে এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নানা বিচিত্র উপাখ্যানের সহিত দেবীমাহাত্ম্য বিশিষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এক শ্রেণীর পণ্ডিতের মতে দেবীভাগবতই ব্যাসকৃত মহাপুরাণ। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে বিষ্ণুভাগবত নামে পৃথক এবং

অপ্রধান পুরাণ বলিলেও তাঁহাদের এই উক্তির মূলে বিশেষ প্রমাণ বা যুক্তি পাওয়া যায় না। দেবীভাগবতের প্রাচীন টীকাকার শৈব নীলকণ্ঠ; তিনি মহাভারতের টীকাকার নহেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মতে, ইহার রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ শতক। আধুনিক মতে, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণে পরবর্তীকালে রচিত।

দ্র পঞ্চানন তর্করত্ন, দেবীভাগবতম্, ২য় সংস্করণ, ১৮৩২ শকাব্দ; শ্যামাচরণ কবিরত্ন, দেবীভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা, কাশী, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

কল্যাণী দত্ত

দেবী সিংহ (?-১৮০৫ খ্রী) ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলে কোম্পানি ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ইজারা দেওয়ার নীতি অনুসরণ করে। দেবী সিংহ ছিলেন এইরূপ একজন ইজারাদার। তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে রাজস্ব-আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রেজা খাঁর অধীনে তিনি পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা ও ইজারাদার হন। ক্রমে তিনি নানা উপায়ে বহু অর্থের অধিকারী হন। এবিষয়ে নানা কাহিনী ছিল। রাজস্ব-আদায়ের বিষয়ে জমিদার ও কৃষকগণ অত্যন্ত উৎপীড়িত বোধ করিতে থাকে। ফলে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরে বিদ্রোহ হয়; কিন্তু উহা দমন করা হয়।

সমস্ত ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য দুইটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছিল।' এ ব্যাপারে সরকারের আদেশ প্রকাশিত হয় ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিসের সময়ে। দেবী সিংহের অপরাধ প্রমাণিত হইল না বটে, তবে কোম্পানির কাজ হইতে তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়।

পরে তিনি মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত নসিপুরে বাস করেন এবং শেষকালে সৎকার্যে অর্থ ব্যয় করেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রী) ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ নেতা ও ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রবর্তক। ইনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে তারিখে কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথের পিতা। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে কিছুকাল হিন্দু কলেজেও পাঠে লিপ্ত হন। খুব অল্প বয়সে তিনি রামমোহনের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। ছাত্রাবস্থায়ই ইংরেজীয়ানার মোহ কাটাইয়া তিনি বাংলা ভাষার চর্চায় আকৃষ্ট হন এবং সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৩৩ খ্রী)। কৈশোরেই সম্ভবতঃ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোহরের রায়চৌধুরী-বংশীয়া সারদাসুন্দরী দেবীর সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়।

হিন্দু কলেজ পরিত্যাগের পর দ্বারকানাথের নির্দেশে তদীয় বিষয়কর্মে দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষানবিশী আরম্ভ করেন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানির সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পিতামহীর মৃত্যুকালে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়; তাঁহার ধর্মজিজ্ঞাসা প্রবল হইয়া ওঠে এবং মূর্তিপূজার প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মায়। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার মাধ্যমে 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার' ও লোকহিতকর কার্যে মন দেন। ঐ সভার যাবতীয় কার্য মুখ্যতঃ তাঁহারই নির্দেশে পরিচালিত হইত। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছুকাল পরে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার মারফত ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবর্তন করেন। ঐবৎসর ২১ ডিসেম্বর (১৭৬৫ শক, ৭ পৌষ) তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ২০ জন বন্ধুসহ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিশনারিদের দ্বারা এদেশীয়দের খ্রীষ্টানীকরণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি করেন। ইহাতে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দুরাও তাঁহার সহিত যোগ দেন। ইহার ফলে হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় নামে একটি অবৈতনিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ স্থাপিত হয়।

পিতার মৃত্যুর পর ঠাকুর কোম্পানির দায়ভার প্রধান অংশীদার হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতাদের উপর পড়ে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কার ঠাকুর কোম্পানি ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ খুবই বিব্রত হইয়া পড়েন। দেবেন্দ্রনাথ পাওনাদারদের যাবতীয় ঋণ তাহাদেরই সম্মতি-ক্রমে কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে প্রায় ২০ বৎসর কাটিয়া যায়। পারিবারিক কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও তত্ত্ববোধিনী সভা, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির দরুন ব্যয় তিনি মাথা পাতিয়া লন।

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদে ব্রতী হইয়াছিলেন। উক্ত

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রিকায় ইহার প্রকাশ ক্রমান্বয়ে ২৪ বৎসর চলিতে থাকে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্মঃ' গ্রন্থ রচনা করিতে শুরু করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে নির্দেশাবলী সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হয়।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ইহার প্রথম সম্পাদক হন। ২ বৎসর ৩ মাস এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি সভাটিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন।

তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভার সভ্য ছিলেন। সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি সভ্যপদ ত্যাগ করেন (১৮৫৩ খ্রী)। এই সময়ে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও দেবেন্দ্রনাথ সক্রিয় সহযোগিতা করেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির (ন্যাশন্যাল লাইব্রেরির পূর্বজ) অন্যতম অংশীদার হইয়া উহার বিভিন্ন উন্নতিমূলক কার্যে সহায়তা করেন। হেয়ার স্মৃতিসভার সদস্যরূপে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যে হেয়ার প্রাইজ় ফাণ্ড কমিটি স্থাপিত হয়, দেবেন্দ্রনাথ তাহারও অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। পূর্ব দশকে প্রতিষ্ঠিত বেথুন সোসাইটির তিনি ছিলেন একজন প্রধান উদ্যোক্তা। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়া যায় এবং দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে সভার যাবতীয় কর্মভার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেন। এই সময় দেবেন্দ্রনাথ প্রধান সহযোগীরূপে পান কেশবচন্দ্র সেনকে। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের অনুপ্রাণনায় ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি নূতন সমাজহিতকর কার্যে হাত দেয়; ইহার একটি অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা। দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে এবং কেশবচন্দ্রের পরিচালনায় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক পত্র আত্মপ্রকাশ করে। ইহার প্রথম সম্পাদক পরবর্তীকালের বিখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ।

কেশবচন্দ্রের সমাজসংস্কারমূলক কার্যের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বেশি দিন সায় দিতে না পারায় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র অনুবর্তীদের লইয়া আলাদা হইয়া যান এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে তিনি একটি নূতন সমাজ গঠন করেন। পূর্বেকার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ অতঃপর আদি ব্রাহ্মসমাজ নাম পরিগ্রহ করিল। দেবেন্দ্রনাথ ইহার কার্যভার রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ মনীষীদের উপর অর্পণ করিয়া একপ্রকার অবসরই লইলেন।

দেবেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় এবং অর্থানুকূল্যে নবগোপাল মিত্র ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যাশন্যাল পেপার' নামক একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, আচার-আচরণে, পোশাকে পরিচ্ছদে সম্পূর্ণ স্বাদেশিক। দেবেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা নামে একটি স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। হিন্দুমেলার অন্তর্গত ন্যাশন্যাল সোসাইটি বা জাতীয় সভার কার্যেও দেবেন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল যথেষ্ট। ইহার অন্ততঃ দুইটি অধিবেশনে তিনি পৌরোহিত্য করেন। কলিকাতায় প্রথম দিকে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের যে সব অধিবেশন হইত তাহার প্রতিনিধিবর্গকে দেবেন্দ্রনাথ সাদরে আপ্যায়িত করিতেন।

পারিবারিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে সকল কাজ অপরের হাতে দিয়া দেবেন্দ্রনাথ অতঃপর ধর্মচর্চায় মন দেন। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। দেবেন্দ্রনাথ ধর্মোপাসনার একটি প্রকৃষ্ট ক্ষেত্ররূপে বর্তমান শান্তিনিকেতন স্থানটিকে বাছাই করিয়া লন। তিনি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মার্চ একটি ট্রাস্ট-ডীড করিয়া শান্তিনিকেতন পরিচালনার সুব্যবস্থা করেন।

পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ পিতৃপ্রতিশ্রুত এক লক্ষ টাকা সুদ সমেত (১৩৬হাজার টাকা) অন্ধ-আতুরদের সাহায্যার্থে ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল সোসাইটির হস্তে অর্পণ করেন। ইহা ছাড়াও দেবেন্দ্রনাথ জীবনে প্রচুর অর্থ দান করেন। বাষ্পের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যশোহর-নিবাসী সীতানাথ ঘোষকে তিনি ৭ হাজার টাকা দেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের নির্মাণকল্পেও তাঁহার দান ছিল অনুরূপ।

দেবেন্দ্রনাথ বিবিধ গ্রন্থের রচয়িতা; তাহার কয়েকখানি: 'বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ'; *Vedantic Doctrines Vindicated* (১৮৪৫ খ্রী); 'ব্রাহ্মধর্মঃ' (১৮৫০ খ্রী); 'ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী' (১৮৬৪ খ্রী); 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত'; 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি'; 'স্বরচিত জীবনচরিত' (১৮৯৮ খ্রী); 'পত্রাবলী'।

দ্র অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা, ১৯১৬; যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার নব্য সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫৮; সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, আত্মচরিত, কলিকাতা, ১৯৬৪; যোগেশচন্দ্র বাগল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩১,

কলিকাতা, ১৯৬৭; হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৯৬৭।

যোগেশচন্দ্র বাগল

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮?-১৯২০ খ্রী) কবি। উত্তর প্রদেশের গাজিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ সেন হুগলি জেলার বলাগড় গ্রামের আদি নিবাস ছাড়িয়া গাজিপুরে ব্যবসায় করিতে যান। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করেন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতিতে প্রবৃত্ত হন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'ফুলবালা', 'উর্মিলা' ও 'নির্ঝরিণী' নামে তাঁহার তিনখানি কাব্য প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগুলি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরে গাজিপুরে উভয়ের পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে দেবেন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করিতে থাকেন। 'সবুজপত্র' পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার 'অশোক-গুচ্ছ', 'শেফালীগুচ্ছ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ২১।

দেবেন্দ্রনাথের রচনাপ্রাচুর্য সর্বত্র গুণগত সমতা রক্ষা করে নাই। বিহারীলাল-প্রবর্তিত সৌন্দর্যপ্রীতির আদর্শ গ্রহণ করিলেও দেবেন্দ্রনাথ বিহারীলালের মত আত্মভাবমগ্ন ভাবুক কবি ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রীতিপ্রবণ কবি; তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতি নরনারীর সংসারে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে, নারী-মহিমার বন্দনায়, গার্হস্থ্য জীবনলীলায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পুষ্পবিষয়ক কবিতার অজস্রতার জন্যও তিনি স্মরণীয়। শেষ জীবনের কবিতায় ভক্তিরসের প্রাচুর্য দেখা যায়। সনেট রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব ছিল। ভাষা-রীতিতে তিনি মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দেরাদুন শৈলাবাসে তিনি পরলোকগমন করেন।

দ্র মোহিতলাল মজুমদার, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬১, কলিকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

ভবতোষ দত্ত

দেবোত্তর হিন্দু আইন দ্র

দেরাদুন উত্তর প্রদেশের একটি জেলা ও শহর। দেরাদুন জেলাটি পশ্চিমে তমসা ও যমুনা নদী, উত্তর ও পূর্বে গাড়ওয়াল ও টিহরী গাড়ওয়াল এবং দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সাহারানপুর ও বিজনৌর জেলা দ্বারা বেষ্টিত। এই জেলা ২৯° ৫৭´ উত্তর হইতে ৩১° ২´ উত্তর পর্যন্ত এবং ৭৭° ৩৫´ পূর্ব হইতে ৭৪° ২০´ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার আয়তন ৩১১১ বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ৪৩০৩৯২। জেলার দুইটি তহসিল চাক্রাতা ও দেরাদুন।

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই জেলাকে পার্বত্য ও উপপার্বত্য-অঞ্চল এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। পার্বত্য অঞ্চল চাক্রাতা তহসিলের এবং উপপার্বত্য অঞ্চল দেরাদুন তহসিলের অন্তর্ভুক্ত। জৌনসর বাওয়ার-এর পার্বত্য পরগনা লইয়া চাক্রাতা তহসিলের পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অতি বন্ধুর, সংকীর্ণ গিরিখাত ও পর্বতসংকুল। প্রায় সমস্ত ভূখণ্ড চুনা পাথরে গঠিত এবং এই জেলায় চুনা পাথরের স্ট্যালাক্‌টাইট ও স্ট্যালাক্‌মাইট গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। পার্বত্য অঞ্চলের বন্ধুরতার জন্য এই স্থান চাষের পক্ষে অনুকূল নয়।

হিমালয়ের এই পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে উপপার্বত্য অঞ্চল বা দুন উপত্যকা। ইহার দক্ষিণে শিবালিক পর্বতশ্রেণী, পূর্বে গঙ্গা নদী ও পশ্চিমে যমুনা নদী। এই দুন উপত্যকা উত্তর হইতে দক্ষিণে একটি জলবিভাজিকা দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিম দুন এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উপত্যকাটি বহু পার্বত্য নদীর দ্বারা খণ্ডিত; তন্মধ্যে রিশপানা, বিন্ধ্যাল, আসান, তমসা, সোং ও সুসওয়া নদীর নাম উল্লেখযোগ্য। গঙ্গা ও যমুনা যথাক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমে সীমানা বরাবর প্রবাহিত হইয়াছে। এখানকার মৃত্তিকা সমভূমির ন্যায় উৎকৃষ্ট নয়; প্রস্তরখণ্ডের উপর পলিমাটি পড়িয়া কৃষিকার্যের সহায়তা করিয়াছে।

এই জেলার বৃষ্টিপাত গড়ে ২৩৭৫ মিলিমিটার (৯৫ ইঞ্চি)। রাজপুর ও মুসৌরী অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের অভাব ঘটিয়া থাকে। এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। উপত্যকা অঞ্চলে বৎসরে প্রায় ৩° সেন্টিগ্রেড হইতে ৩৮° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত এবং পার্বত্য অঞ্চলে তাপমাত্রা ৫° সেন্টিগ্রেড হইতে ২৭° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হইয়া থাকে। নিম্ন বনভূমি ও নদী-তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমস্ত জেলার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া দেরাদুনে শৈলাবাস গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই জেলার বনভূমির অধিকাংশই চাক্রাতা তহসিলের অন্তর্ভুক্ত। ওক, পাইন, ফার, পপ্‌লার, উইলো, হেজেল, আখরোট প্রভৃতি বৃক্ষ দেখা যায়। বনভূমিতে চিতাবাঘ, হাতী, হায়েনা, ভল্লুক, হরিণ, শিয়াল, বন্য বরাহ প্রভৃতির

বাস উল্লেখযোগ্য। দুনের সমতলভূমিতে নানাপ্রকার পাখি দেখা যায়। নদীগুলিতে প্রচুর মাছ আছে। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গোরু, ছাগল, ভেড়া ও টাট্টুঘোড়াই প্রধান।

কৃষিকার্য সাধারণতঃ সেচের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেচকার্যের মধ্যে খালের প্রাধান্যই বেশি। পার্বত্য নদীগুলি বর্ষায় খুব স্ফীত হয় এবং খাল কাটিয়া কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ করা হইয়া থাকে। খারিফ ও রবিশস্যের মধ্যে খারিফের উৎপাদনই বেশি এবং ধানই প্রধান শস্য। রবিশস্যের মধ্যে যব ও ভুট্টাই উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য অঞ্চলে সোপানাকৃতি কৃষিকার্যের (টেরাস কাল্টিভেশন) চলনই বেশি। দেরাদুনের বাসমতী চাল অতি প্রসিদ্ধ। অন্যান্য কৃষিদ্রব্যের মধ্যে নানা রকমের শাকসবজি, তামাক, আফিম, চা, কার্পাস, তৈলবীজ, রাগী (মারুফ) প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জেলা উৎকৃষ্ট ফলের জন্যও বিখ্যাত।

এই জেলায় ৭৮৩টি গ্রাম ও ৮টি শহর আছে। প্রধান প্রধান শহর দেরাদুন ক্যান্টনমেণ্ট, মুসৌরী, ল্যান্‌ডাউর, চাক্রাতা ও হৃষীকেশ।

অতি পুরাতন কাল হইতেই দেরাদুন জেলা প্রসিদ্ধ। কালসিতে সম্রাট অশোকের শিলালিপি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পরে এই রাজ্য মুসলমানদের হস্তগত হয়। তারপর শিখ ও গোর্খারা পরপর এই রাজ্য আক্রমণ করে। ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে গোর্খাদের সঙ্গে যুদ্ধের পর ইংরেজগণ এই অঞ্চল অধিকার করে।

দেরাদুনের শিল্পের মধ্যে তার্পিন, চা, বোতাম, চিনি ও কাষ্ঠশিল্পই প্রধান। কুটিরশিল্পের মধ্যে পশমবস্ত্র, কম্বল, কাঠের খেলনা, আসবাবপত্র, ঝুড়িনির্মাণ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। প্রধান রপ্তানিদ্রব্য কাঠ, বাঁশ, চুন, কাঠকয়লা, বাসমতী চাল, আলু, চা, চিনি, তামাক, শুষ্ক ফল, কম্বল, খাদ্যশস্য, মশলা, মধু, মোম, লাক্ষা ইত্যাদি। আমদানিদ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি, লৌহদ্রব্য ও খাদ্যশস্যই প্রধান। এই জেলার মনোরম স্বাস্থ্যনিবাস ও শৈলাবাসগুলি রাস্তা ও রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। প্রতি বৎসর বহু দর্শনার্থী ও পর্যটক আগমন করায় এই সব স্থানে অনেক ডাকবাংলো, রেস্ট হাউস, হোটেল, বাজার প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

দেরাদুন শহরটি (৩০°১৯′ উত্তর ও ৭৮°২′ পূর্ব) জেলার প্রধান কার্যালয়; ইহা ৭০০ মিটার উচ্চে রিশপানা ও বিন্ধ্যাল নদীর মধ্যে অবস্থিত। মহাভারতের দ্রোণাচার্যের বাসস্থান এইখানে ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। তাহার নামানুসারে ইহা ডেরা বা দ্রোণ নামে পরিচিত হইয়াছে। ইহার পৌরাণিক নাম ছিল কেদারখণ্ড—শিবভূমি—যাহা হইতে শিবালিক পর্বতের নামের উৎপত্তি। দেরা-হরিদ্বার রেলপথের শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি সুড়ঙ্গ-পথের মধ্য দিয়া দেরাদুন শহরের প্রবেশ পথ। শহরটি চাক্রাতা, মুসৌরী ও রাজপুরের সহিত রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত। এখানে ডাকবাংলো ও রেস্ট হাউস আছে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে দেরাদুন টাউন গ্রুপের লোকসংখ্যা ১৫৬৩৪১ জন ছিল। এখানকার শিখ গুরুদ্বার বিখ্যাত। দেরাদুনের প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) উত্তর-পূর্বে গোর্খাদের নির্মিত কালাঙ্গা দুর্গ। এখানকার উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলির নাম: ১. সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া ২. ফরেস্ট রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট ৩. ন্যাশন্যাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি ৪. অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন ৫. বটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া ৬. অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ৭. ন্যাভাল হাইড্রোগ্রাফিক অফিস ৮. ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ পেট্রোলিয়াম। দেরাদুন হইতে ১৬ কিলোমিটার (১০ মাইল) উত্তর-পূর্বে সহস্রধারা গন্ধকপ্রস্রবণ আছে। এখানে চুনা পাথরের গুহা আছে।

মুসৌরী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৯৮০ মিটার উচ্চে হিমালয় পর্বতের উপর একটি মনোরম স্বাস্থ্যনিবাস ও শৈলাবাস। ল্যান্‌ডাউর মুসৌরীর পূর্বে ২২৫৪ মিটার উচ্চে অবস্থিত একটি মনোরম স্থান। পূর্বে এখানে ব্রিটিশ সৈন্যদের আস্তানা ছিল। হৃষীকেশ গঙ্গার দক্ষিণ তীরে হিমালয়ের উপরে হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। এখান হইতে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ প্রভৃতি বিখ্যাত তীর্থস্থানগুলিতে যাইতে হয়। ৫ কিলোমিটার পূর্বে লছমনঝোলায় ঝোলানো পুল, স্বর্গদ্বার ও গীতাভবন দ্রষ্টব্য। হৃষীকেশে অনেক মন্দির আছে তন্মধ্যে ভরতের মন্দিরই বিখ্যাত। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে অনেক হোটেল ও ধর্মশালা আছে। এখান হইতে দেরাদুন, টিহরী, পাওরি পর্যন্ত পাকা রাষ্ট্রীয় সড়ক আছে। ইহা হরিদ্বার-হৃষীকেশ রেলপথের শেষ স্টেশন।

দ্র *District Census Handbook, 1951 : Uttar Pradesh, Dehra Dun District*, Allahabad, 1954.

মিনতি ঘোষ

দেশাই, ভুলাভাই জীবনজী (১৮৭৭-১৯৪৬ খ্রী) বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত আইন ব্যবসায়ী ও জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। তিনি বোম্বাইয়ের এল্‌ফিন্‌স্টোন কলেজ

ও গভর্নমেণ্ট ল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ভুলাভাই কিছুদিন আমেদাবাদের গুজরাত কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন, বোম্বাই প্রদেশের অস্থায়ী অ্যাডভোকেট জেনারেলও হইয়াছিলেন। বর্দৌলি সত্যাগ্রহে কৃষকদের বীরত্ব তাঁহাকে জাতীয় আন্দোলনের দিকে টানিয়া আনে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রুমফিল্ড কমিটির সম্মুখে এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বর্দৌলি অনুসন্ধান কমিটির সম্মুখে কৃষকদের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় শুরু হইলে ভুলাভাই তাহাতে যোগ দেন। বিচারে তাঁহার ১ বৎসরের কারাদণ্ড ও ১০০০০ টাকা জরিমানা হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়া ১ বৎসর কারাবাস করেন। কংগ্রেসের সংগঠন কাজে ও স্বেচ্ছাসেবক পোষণে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। আনসারী ও বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে স্বরাজ্য পার্টি পুনর্গঠনে ভুলাভাই দেশাইয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দিল্লীতে যে আইনসভা শুরু হয় তাহাতে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে ভুলাভাই দেশাই মনোনীত হন। তিনি ১০ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় হইতেই রাজনীতিতে তিনি সমাদর লাভ করেন। ভুলাভাই-এর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল কেন্দ্রীয় আইন সংসদে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের নেতা জিন্নাহ্ সাহেবের সহযোগিতা লাভ করিতে সক্ষম হয় এবং বিরোধী পক্ষ সরকারি দলকে একাধিকবার পরাজিত করে।

কংগ্রেস-লীগ আপোষ চেষ্টায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে ভুলাভাই যুক্ত ছিলেন। কেন্দ্রে এক প্রতিনিধিমূলক অন্তর্বর্তী সরকার (interim government) প্রতিষ্ঠার জন্য ভুলাভাই দেশাই ও লিয়াকৎ আলী খান দীর্ঘ আলোচনার পর দেশাই-লিয়াকৎ চুক্তি (১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ খ্রী) সম্পাদন করেন। স্থির হয় যে ভাইস্‌রয়ের আমন্ত্রণে ভুলাভাই দেশাই ও মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিবেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে সমান সংখ্যক সদস্য মনোনয়ন করার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

চুক্তিটি গান্ধীজীর আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিল কিন্তু অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা ইহাকে অগ্রাহ্য করেন। জিন্নাহ্ও প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, দেশাই-লিয়াকৎ চুক্তি সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। সিমলা সম্মেলনের (১৯৪৫ খ্রী) ব্যর্থতার পর ভুলাভাই রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজ বন্দীদের বিচারকালে তাঁহাদের পক্ষে দাঁড়াইয়া ভুলাভাই দেশাই স্বাধীনতার জন্য ভারতীয়দের বিদ্রোহ করার অধিকারের সমর্থনে এক স্মরণীয় ভাষণ দেন। বন্দীদের মুক্তির ফলে ভুলাভাই-এর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা চরম শিখরে ওঠে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অতুলানন্দ চক্রবর্তী

দেহতাপ প্রাণীদেহের তাপমাত্রা। জীবনের জন্য বিশেষ তাপমাত্রার প্রয়োজন। কোনও কারণে দেহের তাপমাত্রার তারতম্য ঘটিলে বিভিন্ন জৈব ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং মৃত্যুও ঘটিতে পারে। দেহে খাদ্যবস্তুর বিপাক বা দহনের ফলে উত্তাপ উৎপন্ন হয়; এই উত্তাপ আবার পরিবহণ (কন্‌ডাক্‌শন), পরিচলন (কন্‌ভেক্‌শন) এবং বিকিরণ (রেডিয়েশন)-এর দ্বারা দেহ হইতে চারিপাশের হাওয়ায় চলিয়া যায়, কখনও বা ক্ষরিত ঘর্মের বাষ্পীভবন (ইভাপোরেশন)-এর ফলেও উত্তাপ হ্রাস পায়। উত্তাপের এই উৎপাদন ও অপসারণের মধ্যে সমতার দ্বারাই দেহে বিশেষ একটি তাপমাত্রা বজায় থাকে। হাঙর, মাছ, উভচর, সরীসৃপ প্রভৃতি শীতল রক্তের প্রাণীর দেহে তাপনিয়ন্ত্রণের কোনও জৈব ব্যবস্থা নাই; ইহাদের দেহতাপ তাই আবহমণ্ডলের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। অত্যধিক শীতে ইহারা দেহের তাপ বজায় রাখিতে না পারায় জৈব ক্রিয়া সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়; ইহারা অনেকেই তখন গর্ত, কোটর প্রভৃতির ভিতর শীতনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। স্তন্যপায়ী ও পাখির দেহে তাপনিয়ন্ত্রণের জৈব ব্যবস্থা আছে; এজন্য তাহাদের দেহতাপ স্বাভাবিক অবস্থায় আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে না এবং সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার ঊর্ধ্বেই থাকে; ইহাদের উষ্ণরক্তের প্রাণী বলে। বিভিন্ন উষ্ণরক্তের প্রাণীর গড় স্বাভাবিক দেহতাপ (সেন্টিগ্রেড মানে) নিম্নরূপ: মানুষ ৩৫.৮°, অশ্ব ৩৭.৬°, গোরু ৩৮.৩°; বিড়াল ৩৮.৬°, কুকুর ৩৮.৯°, শূকর ৩৯.২°, খরগোশ ৩৯.৫°, ছাগল ৩৯.৯° এবং মুরগী ৪১.৭°।

উষ্ণরক্তের প্রাণীর দেহতাপ নিয়ন্ত্রিত হয় মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত তাপকেন্দ্রের দ্বারা। দেহতাপ বাড়িবার উপক্রম হইলে তাপকেন্দ্রের সম্মুখভাগ উদ্দীপিত হয় এবং নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিগুলির একক বা একত্র ব্যবহারের দ্বারা স্বাভাবিক তাপমাত্রা অব্যাহত রাখে: ১. ত্বকে রক্তবাহগুলি প্রসারিত হয়; ফলে ত্বকে অধিক পরিমাণে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হয় এবং সেই রক্ত হইতে অতিরিক্ত উত্তাপ পরিবহণ, পরিচলন এবং বিকিরণের দ্বারা দেহ

হইতে চারিপাশের বায়ুতে চলিয়া যায়। ২. স্বেদগ্রন্থিগুলি উদ্দীপিত হইয়া ঘর্ম ক্ষরণ করে ; ত্বকের উপর হইতে বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় সেই ঘর্ম দেহ হইতে বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ শোষণ করিয়া লয়। ৩. শ্বাস-প্রশ্বাস বাড়িয়া যাওয়ার ফলে ফুসফুস হইতে অধিকতর জল বাষ্পে পরিণত হইয়া নিঃশ্বাস বায়ুতে যায় ; এই জলও বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ দেহ হইতে শুষিয়া লয়। এ সকল ক্রিয়ার ফলে অতিরিক্ত উত্তাপ বাহির হইয়া গিয়া দেহ শীতল হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মানুষ, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর প্রভৃতির দেহে বহু স্বেদগ্রন্থি থাকায় উপরি-উক্ত দ্বিতীয় পদ্ধতির সাহায্যে গ্রীষ্মে তাহারা সহজেই দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে ; গো-মহিষ, কুকুর, বিড়াল, পাখি প্রভৃতির দেহে স্বেদগ্রন্থি কম থাকায় তাহাদের প্রধানতঃ তৃতীয় পদ্ধতিরই আশ্রয় লইতে হয়।

দেহতাপ স্বাভাবিক হইতে কমিবার উপক্রম হইলে তাপকেন্দ্রের পশ্চাদ্‌ভাগ উদ্দীপিত হওয়ায় নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ঘটিতে থাকে : ১. ত্বকের রক্তবাহগুলি সংকুচিত হয়, ফলে ত্বকে রক্তসঞ্চালন কমে এবং ত্বক হইতে পরিবহণ, পরিচলন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার দ্বারা তাপক্ষয় হ্রাস পায়। ২. ত্বকে অনৈচ্ছিক পেশীর সংকোচনের ফলে লোম, পালক ইত্যাদি খাড়া হইয়া ওঠে ; লোম বা পালকের এই পুরু স্তরটি উত্তাপের পরিবহণ, পরিচলন প্রভৃতি রোধ করিয়া তাপক্ষয় কমাইয়া দেয়। ৩. হাতপায়ের পেশীর ঘনঘন সংকোচনের ফলে কাঁপুনি ধরে ; এরূপ সংকোচনে পেশীগুলিতে যথেষ্ট উত্তাপ উৎপন্ন হয়। ৪. অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি হইতে অ্যাড্রিন্যালিন ও থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে থাইরক্সিন হর্মোনের ক্ষরণ উদ্দীপিত হয় ; ইহারা বিভিন্ন টিস্যুর কোষে বিপাক বাড়াইয়া দেহে উত্তাপের উৎপাদন বর্ধিত করে। এসকল ক্রিয়ার দ্বারা দেহ হইতে তাপক্ষয় কমাইয়া ও দেহে উত্তাপের উৎপাদন বাড়াইয়া দেহতাপ অপরিবর্তিত রাখা হয়।

হাইপোথ্যালামাসের তাপকেন্দ্রে বা তৎসন্নিহিত অঞ্চলে আঘাত বা রোগের ফলে দেহতাপের অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। শিশুর দেহতাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায় কম।

জৈব প্রক্রিয়া ব্যতীত কয়েকটি স্বেচ্ছাকৃত কাজের দ্বারাও দেহতাপ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যথা—গ্রীষ্মে শীতল জলে স্নান, ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ, হিমশীতল পানীয় পান প্রভৃতি এবং শীতে পশমী বস্ত্র পরিধান, ঘরে আগুন জ্বালাইয়া রাখা ইত্যাদি। এসকল কার্যের জন্য তাপকেন্দ্রের প্রয়োজন হয় না।

দ্র Y. Kuno, *The Physiology of Human Perspiration*, London, 1934; E. Du Bois, *Heat Loss from Human Body, Bulletin of New York Academy of Medicine*, vol. XV, New York, 1939; E. Du Bois, *Fever and the Regulation of Body Temperature*, Springfield, 1948.

দেবজ্যোতি দাশ

দৈত্য প্রজাপতি দক্ষের ৬০টি কন্যা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ১৭টি কন্যাকে মরীচিপুত্র কশ্যপের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। কশ্যপের পত্নী অদিতির পুত্রগণ 'আদিত্য' বা 'দেব' নামে খ্যাত, আর দিতির পুত্রগণ দৈত্য ও দনুর পুত্রগণ 'দানব' নামে খ্যাত। সুরবিদ্বেষী বলিয়া দিতি ও দনুর পুত্রগণকে 'অসুর'ও বলা হইত। দিতির পুত্র ছিলেন ২জন—হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। তাঁহারাই ছিলেন আদি দৈত্য। আদি দানবের সংখ্যা ছিল ৬১। তাঁহাদের মধ্যে ১৮ জনকে প্রধানরূপে গণ্য করা হয়। শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি তাঁহাদেরই বংশধর ছিলেন। 'দৈত্যরাজ' শব্দে হিরণ্যকশিপুকে বোঝায়। দৈত্যগণের গুরু ছিলেন শুক্রাচার্য। মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে তিনি যুদ্ধহত দৈত্যগণের জীবন দান করিতেন।

দৈত্য-দানবের বংশে অনেক তপস্বীও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বংশে প্রহ্লাদ, বলি প্রমুখ প্রখ্যাত ভক্ত ও দাতার আবির্ভাবও ঘটিয়াছে। দেবগণের সহিত তাঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধও দৃষ্টিগোচর হয়। দৈহিক সৌন্দর্য, সামর্থ্য ও বিদ্যাবুদ্ধিতে দৈত্যগণ দেবগণ অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, কিন্তু কূট-কৌশলে তাঁহারা দেবগণের সমকক্ষ ছিলেন না। দেবগণের সহিত একযোগে দৈত্যগণও সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুর ছলনায় তাঁহারা অমৃতের ভাগ পান নাই। স্থাপত্যবিদ্যায় দৈত্যগণ অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ময়দানবের লেখা বলিয়া প্রসিদ্ধ 'ময়মত' বিখ্যাত গ্রন্থ।

সুখময় ভট্টাচার্য

দৈর্ঘ্য-পরিমাপ বৈদিক সাহিত্যে দৈর্ঘ্য-পরিমাপের জন্য অঙ্গুলি (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০. ২. ১. ২), অঙ্গুষ্ঠ (কঠোপনিষদ, ৪।১২, ৬।১৭), পাদ (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৬. ৫. ৩. ২, ৭. ২. ১. ৭, ৭. ৭. ২. ১৭ ; আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র, ৬।১০), প্রক্রম (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০. ২. ৩. ১.), প্রাদেশ (বিঘত—আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র, ১.৭ ; সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র, ১. ১০.১, ২. ৯. ১৪ ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৮. ৫ ; শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩. ৫.

দৈর্ঘ্য-পরিমাপ

৪. ৫১ ; ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৫. ১৮. ১), বাহু (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৬. ২. ১১. ১), শল (অথর্ববেদ, ৮. ৭. ২৮ ; কাঠক সংহিতা, ১২. ১০) প্রভৃতি এককের ব্যবহার দেখা যায়।

বৃদ্ধ মনুতে মাপের নিম্নোক্ত নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে : ৮ ত্রসরেণুতে (বায়ুতে ভাসমান ও গবাক্ষজালরন্ধ্রগত রৌদ্রে পরিদৃশ্যমান ধূলিকণা) ১ রেণু ; ৮ রেণুতে ১ বালাগ্র বা কেশাগ্র ; ৮ বালাগ্রে ১ লিক্ষা (পোস্তদানা) ; ৮ লিক্ষাতে ১ যূক ; ৮ যূকে ১ যব ; ৮ যবে ১ অঙ্গুলি। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া দৈর্ঘ্য-পরিমাপের জন্য মনু নিম্নোক্ত এককসমূহ যোগ করেন : ১২ অঙ্গুলিতে ১ বিতস্তি (বিঘত) ; ২ বিতস্তিতে ১ হস্ত। রামায়ণ, মহাভারত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, লীলাবতী প্রভৃতি গ্রন্থেও দৈর্ঘ্য-পরিমাপের বিভিন্ন একক উল্লিখিত দেখা যায়। মনুবর্ণিত এককসমূহ ছাড়াও এই সব গ্রন্থে নিম্নোক্ত এককসমূহও দেখা যায় : ৪ হস্তে ১ দণ্ড বা যষ্টি ; ১০ হস্তে ১ বংশ ; ২ দণ্ডে ১ নাড়িকা ; ২০০০ দণ্ডে ১ ক্রোশ ; ২ ক্রোশে ১ গব্যূতি ; ৪ ক্রোশে ১ যোজন।

সুপ্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে দৈর্ঘ্য-পরিমাপের সূক্ষ্ম একক-সমূহ ওজনের এককসমূহের মত শস্যবীজের সহিত যুক্ত ছিল। তাহা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত মানব-দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিত্তিতে মাপের রেওয়াজ ভারতবর্ষেও গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দৈর্ঘ্য-মাপের এককসমূহ আশ্চর্যজনকভাবে মুদ্রার একক-সমূহের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে মুদ্রাসমূহ একাধারে মুদ্রা ও ওজনের কাজ করিত। পরবর্তী যুগে মুসলমান সম্রাটগণ আরও একটি ভূমিকা দান করিয়া তাহাকে দৈর্ঘ্য-পরিমাপের একক হিসাবেও ধার্য করিলেন। সিকন্দর বিন বাহলোল লোদীর সময় (১৪৮৮-১৫৪৭ খ্রী) হইতেই এই পদ্ধতির প্রচলন হয়। বাহলোল লোদী তাঁহার নূতন মুদ্রাকে দৈর্ঘ্যের মাপ হিসাবে ব্যবহারের আদেশ দিলেন। তৎকালে প্রচলিত গজের মাপের তিনি কোনও পরিবর্তন করিলেন না ; ৪১½ তঙ্কের ব্যাসের পরিমাণ ১ গজ বলিয়া নির্ধারিত হইল। ইংরেজী ইঞ্চির মাপে সিকন্দরি গজের দৈর্ঘ্য ৩০ ইঞ্চি হইতে ৩০·০২১১ ইঞ্চির মধ্যে সঞ্চরণশীল ; অর্থাৎ ৩০ ইঞ্চিতে ব্যবধান মাত্র ১ ইঞ্চির $\frac{২১১}{১০০০০}$ ভাগ।

হুমায়ুনের রাজত্বকালে গজের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ খানিকটা বাড়াইয়া ১ গজকে ৪২ সিকন্দরি তঙ্কের সমান বলিয়া ধার্য করা হয়। শের শাহ্ ও গোলাম শাহের রাজত্বকালে (১৫৪০-৫২ খ্রী), এমনকি আকবরের রাজত্বের প্রথম ৩১ বৎসরে (১৫৫৬-৮৭ খ্রী) মাপের এই নিয়মই প্রচলিত ছিল। তাহার পর আকবর আইন করিয়া বিভিন্ন প্রকার গজের বিলোপ সাধন করেন এবং সকল ক্ষেত্রেই গজের পরিমাণ ৪১ তঙ্কের সমান বলিয়া ধার্য করেন এবং ইহার নাম দেন 'ইলাহী গজ'। ইংরেজী ইঞ্চির মাপে এই গজের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯·৬৩৮৪৯ ইঞ্চি।

উত্তর ভারতে ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে মাপ-জোখের ফলে দেখা যায়, ইংরেজী ইঞ্চির মাপে তৎকালে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত গজের পরিমাণ সাধারণতঃ ২৯ ইঞ্চি হইতে ৩৫ ইঞ্চির মধ্যে সঞ্চরণশীল। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেহেতু ফল ৩৩ ইঞ্চিতে দাঁড়ায়, সেই হেতু ব্রিটিশ আইনে ইহাকেই দৈর্ঘ্য-পরিমাপের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ১৮৮৯ ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যে আইন পাশ হয়, তাহাতে ১২ ইঞ্চিতে ১ ফুট, ৩ ফুটে ১ গজ, ১৭৬০ গজে ১ মাইল—এই নিয়মকেই স্ট্যাণ্ডার্ড ধার্য করিয়া সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গ্রহণের চেষ্টা হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ অক্টোবর হইতে ভারত কর্তৃক মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণের ফলে দেশীয় বিভিন্ন পদ্ধতি ও ইঞ্চি-ফুট-গজমূলক ব্রিটিশ পদ্ধতির পরিবর্তে মিটার-সেন্টিমিটার-কিলোমিটারমূলক পরিমাপ-পদ্ধতির প্রবর্তন হইয়াছে।

মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের মূল এককের নাম মিটার। ইহার পরিমাণ পৃথিবীর মেরুদণ্ড হইতে বিষুবরেখা পর্যন্ত দূরত্বের কোটি ভাগের এক ভাগ—প্রায় ১.১ গজের সমান। এই মূল একককটিকে পর্যায়ক্রমে ১০ দিয়া গুণ অথবা ভাগ করিলে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য মেট্রিক এককসমূহ পাওয়া যায়। এই গুণ ও ভাগ করিবার জন্য সাধারণতঃ নিম্নোক্ত ছয়টি উপসর্গের ব্যবহার হয় :

ডেকা—১০ গুণ	ডেসি—$\frac{১}{১০}$
হেক্টো—১০০ গুণ	সেন্টি—$\frac{১}{১০০}$
কিলো—১০০০ গুণ	মিলি—$\frac{১}{১০০০}$

ইহাদের মধ্যে ডেকা, হেক্টো, কিলো—এই তিনটি গ্রীক শব্দ এবং ডেসি, সেন্টি, মিলি—এই তিনটি লাতিন শব্দ। এই ছয়টি উপসর্গ দৈর্ঘ্যের মূল একক মিটারের সহিত যোগ করিয়া নিম্নোক্ত এককসমূহ পাওয়া যায় : ডেকামিটার, হেক্টোমিটার, কিলোমিটার, ডেসিমিটার, সেন্টিমিটার ও মিলিমিটার।

মেট্রিক পদ্ধতিতে কোনও একটি নাম উচ্চারণ করিলেই মূল এককের সহিত ইহার সম্পর্ক জানা যায়। তাহা ছাড়া এই পদ্ধতির বিভিন্ন এককগুলির মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত সম্পর্ক আছে। এই বিজ্ঞানসম্মত

সম্পর্কের ফলে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে দৈর্ঘ্য-পরিমাপের এককে ওজনের এককে অথবা ওজনের এককে দৈর্ঘ্য-পরিমাপের এককে পরিবর্তন করা যায়। যেমন, মেট্রিক পদ্ধতির মূল একক হইল গ্রাম ; এক সেন্টিমিটার লম্বা, এক সেন্টিমিটার চওড়া ও এক সেন্টিমিটার উঁচু একটি পাত্র পরিস্রুত জলে পূর্ণ করিয়া চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে রাখিলে যে পরিমাণ জল পাওয়া যায়, তাহার ওজন হইল এক গ্রাম। ওজনকে দৈর্ঘ্যে অথবা দৈর্ঘ্যকে ওজনে পরিবর্তনের এই বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোনও ওজন বা পরিমাপ-পদ্ধতিতে নাই।

দ্র D. Marsden, *Numismata Orientalia*, Pt. I, London, 1823-25 ; Edward Thomas, *Ancient Indian Weights*, London, 1874; James Princep, *Essays on Indian Antiquities*, vols. I & II, London, 1874 ; D R. Bhandarkar, *Carmichael Lectures on Ancient Indian Numismatics*, Calcutta, 1921 ; S. K. Chakravarty, *A Study of Ancient Indian Numismatics*, Calcutta, 1931 ; A. A. Macdonell & A. B. Keith, *Vedic Index*, vols. I & II, Varanasi, 1958.

অনিলকুমার আচার্য

দোতারা বাদ্যযন্ত্র। লম্বায় প্রায় দুই হাত। নীচের দিকে কুঁদিয়া খোল করা হয় এবং তাহার উপর চর্মের আবরণ থাকে। এই চর্মাবরণের উপর সওয়ারী থাকে। ইহার উপর দুই হইতে চারিটি তার প্রলম্বিত হয়। তারগুলি উপরের দিকে কানের সঙ্গে বাঁধা থাকে। কাষ্ঠনির্মিত বাদনদণ্ডের উপর ধাতুর পাত থাকে। ইহাতে পরদা থাকে না। সাধারণতঃ পল্লীসংগীতে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

দোম আন্তোনিয়ো সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যশোহর-ফরিদপুর অঞ্চলের অন্তর্গত ভূষণা রাজ্যের জনৈক রাজকুমার দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো বা সংক্ষেপে দোম আন্তোনিয়ো পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রথম প্রচারক ও প্রবর্তক হইয়াছিলেন। আরাকানের মগেরা ও পর্তুগীজ জলদস্যুরা তখন প্রায়ই পূর্ব বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে হানা দিয়া বহু লোককে বন্দী করিত এবং গোলাম-রূপে বিক্রয় করিত। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত রাজপুত্র তাহাদের হাতে ধরা পড়িয়া আরাকানে নীত হন ; যুবকের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একজন পর্তুগীজ ধর্মযাজক তাঁহাকে উদ্ধার করেন। যুবকটি আস্থাবান হিন্দু ছিলেন। কথিত আছে যে, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি দিব্যদর্শন লাভ করিয়া সাধু আন্তনির নিকট হইতে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের আদেশ পাইলেন। সাধু আন্তনি এবং তাঁহার উদ্ধারকর্তা ফাদার দো রোজারিয়োর স্মরণার্থে দীক্ষার সময়ে তিনি 'দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো' নাম গ্রহণ করিলেন। ভূষণায় ফিরিয়া রাজপুত্র তাঁহার পত্নী ও আরও কয়েকজন আত্মীয়কে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। প্রবল উৎসাহে তিনি গ্রামে গ্রামে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করিয়া অনেককে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী করেন। গোয়া ও ব্যাণ্ডেল হইতে তিনি কয়েকজন আগুস্তিনীয় ও যীশুসংঘী যাজককে নবদীক্ষিতদের শিক্ষাদান ও ধর্মসেবার জন্য আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার জমিদারিতে কোষাভাঙা নামক স্থানে একটি মিশনকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং কয়েক বৎসর পরে সেই কেন্দ্র কোষাভাঙা হইতে ভাওয়াল পরগনার অন্তর্গত নাগরীতে স্থানান্তরিত হয়। আজও পর্যন্ত ভাওয়ালে অনেক বাঙালী খ্রীষ্টান বাস করে, তাহারা সেই বাঙালী রাজপুত্রকে তাহাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের আদি প্রবর্তয়িতা বলিয়া শ্রদ্ধা করে। দোম আন্তোনিয়োর বংশ-পরিচয়, তাঁহার দীক্ষাপূর্ব নাম, জন্ম ও মৃত্যুর সন-তারিখ সঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই। তাঁহার সত্যকার জীবনবিবরণীর সঙ্গে নানা কিংবদন্তি মিশ্রিত হইয়াছে।

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' নামক একটি গ্রন্থ সেই রাজপুত্রের দ্বারা রচিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বইটির পাণ্ডুলিপি এভোরায় পাওয়া গিয়াছে এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। বাংলা গদ্যরচনার অন্যতম সুপ্রাচীন নিদর্শনরূপে এই বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্র দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো, ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ, সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৩৭ ; J. J. A. Campos, *History of the Portuguese in Bengal*, Calcutta, 1919 ; J. J. A. Campos, *Bandel History of the Augustinian Convent and Church*, Calcutta, 1927.

পিয়ের ফালোঁ

দোল উত্তর ভারতে হোলি বা বঙ্গদেশের দোলযাত্রা এক বিখ্যাত উৎসব। ইহার মধ্যে তিনটি অঙ্গ বর্তমান। ফাল্গুন মাসে শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে 'বুড়ির ঘর' বা মেড়া পোড়ানো হয়। তাহার পরদিবস রাধাকৃষ্ণের মূর্তিকে

যথারীতি পূজা করিয়া দোলায় বসাইয়া আবীর-কুঙ্কুমে রঞ্জিত করা হয়। সেইদিন সকলে পরস্পরের সহিত রং মাখাইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করে। তৃতীয় অঙ্গ হইল, বাংলা দেশের কোনও কোনও জেলায়, যথা মুর্শিদাবাদ বা রংপুরে, দোলের ৩-৪ দিন পরে এক ব্যক্তিকে সং বা 'হোলির রাজা' সাজাইয়া গ্রামে ঘোরানো হয়। 'রাজা' যাহাকে পান তাহার নিকট হইতে খাজনা আদায় করেন, সেই পয়সায় আমোদআহ্লাদ হয়।

ওড়িশায় মেড়া পোড়ানোর নাম 'মেনটা পোড়েই'। কিছুদিন পূর্বেও কোথাও কোথাও একটি জীবন্ত ভেড়াকে আগুনে দগ্ধ করা হইত। আজও পুরীর জগন্নাথমন্দিরের পাশে দোলমঞ্চের নিকটে একটি ভেড়ার গায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আগুন ছোঁয়াইয়া দেওয়া হয়। বিহারে কোথাও কোথাও হোলির সং সাজানো হয়, রং-এর খেলার সহিত কাদা মাখানো, অশ্লীল গান গাওয়ার রীতিও প্রচলিত আছে; বাংলাদেশেও নাকি এক সময়ে তাহার চলন ছিল। গুজরাতে একটি মানুষের প্রতিকৃতি পোড়ানো হয়, হোলির সং-ও আছে। উত্তর প্রদেশে মথুরাতে আগুন জ্বালার পর একজন মানুষকে তাহার মধ্য দিয়া ছুটিয়া পার হইতে হয়। দক্ষিণ ভারতে দোলের উৎসব চৈত্র মাসে সাধিত হয়; কিন্তু ফাল্গুন মাসে আগুনের উৎসব উত্তর ভারতের মত অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম 'কামদহনম্'। সারা ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের এই বসন্ত উৎসবটির মধ্যে এইরূপে বিভিন্ন উপাদানের সমাবেশ দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে শবরস্বামী-রচিত পূর্ব-মীমাংসা গ্রন্থের ভাষ্যে বলা হইয়াছে, হোলাকাদি উৎসব প্রাচ্যগণের দ্বারাই করণীয়। হয়ত সর্বভারতে ইহার প্রচলন ছিল না। মেড়া পোড়ানো বা খড় অথবা পিটালি-নির্মিত মানুষের আকৃতি পোড়ানোর সহিত ওড়িশার কন্ধজাতির কৃষিসম্পর্কিত নরবলিপ্রথার অনেকাংশে মিল আছে। মধ্যপ্রদেশের রামগড় গুহালিপি (খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী) ও বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র (খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দী?) হইতে জানা যায়, দোলায় বসিয়া আমোদপ্রমোদ করা তখন হইতেই ভারতের নানাস্থানে প্রচলিত ছিল। যাহা সাধারণ মানুষের আরাম বা আদরের খেলা, দেববিগ্রহকেও সেইরূপ আরাম দেওয়া স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারতে, এমন কি প্রাচীন ইরানেও বসন্তকালে নববর্ষের প্রারম্ভে রং লইয়া নানাবিধ ক্রীড়া বা উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইরানে এক ব্যক্তিকে সং সাজাইয়া তামাসা করা হইত, বিদায়ী পুরাতন বৎসরের প্রতীক হিসাবে তাহাকে গণ্য করা হইত।

অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, বসন্তকালীন কয়েকটি স্বতন্ত্র উৎসব একত্র সংযুক্ত হইয়া দোল বা হোলি উৎসবের বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

দ্র Nirmal Kumar Bose, *Culture and Society in India*, Bombay, 1967.

নির্মলকুমার বসু

দোস্ত মহম্মদ (১৭৮৯-১৮৬৩ খ্রী) দোস্ত মহম্মদ ছিলেন বারাকজাই সর্দারদের মধ্যে খুব কর্মঠ ও উদ্যোগী পুরুষ এবং সুচতুর কূটনীতিজ্ঞ। বহু পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও দ্বন্দ্বের ফলে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাবুল অধিকার করেন এবং আফগানিস্তানের আমীর হন।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ পেশোয়ার অধিকার করিলে তিনি প্রথমে ইংরেজদের সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহাদের সহায়তায় পেশোয়ার পুনরধিকার করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতের গভর্নর জেনারেল অক্ল্যাণ্ড্ ইহাতে রাজি না থাকায় তিনি রাশিয়ার দিকে ঝুঁকিলেন। ইংরেজদের তখন ছিল অতিরিক্ত রাশিয়াভীতি। দোস্ত মহম্মদের কার্য অক্ল্যাণ্ডকে অত্যন্ত বিচলিত করিল। তিনি সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়া দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন (১৮৩৯ খ্রী) ও নিজেদের আশ্রিত ও আফগানিস্তানের সিংহাসনচ্যুত শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। দোস্ত মহম্মদের আত্মসমর্পণের (১৮৪০ খ্রী) পরে বন্দী অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল। ইহাতে স্বাধীনতাপ্রিয় আফগানগণ ইংরেজদের ক্রীড়নক শাহ সুজাকে সুনজরে দেখে নাই; তাহারা বিদেশী সৈন্যের অবস্থিতির অত্যন্ত বিরোধী ছিল। উপরন্তু বিদেশীদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার অসহনীয় হইয়া উঠিল। ফলে তাহারা বিদ্রোহ করিল।

ইহার ফলে ইংরেজদের বহু লোকক্ষয় ও অর্থক্ষয় হইল, শাহ সুজা নিহত হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা আফগানিস্তান ত্যাগ করিল (১৮৪২ খ্রী)। দোস্ত মহম্মদকে মুক্তি দেওয়া হইল এবং তিনি কাবুলের সিংহাসন পুনরায় অধিকার করিলেন (১৮৪৩ খ্রী)। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বল্‌খ (Balkh) ও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহার দখল করেন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরেজদের সহিত দোস্ত মহম্মদের সম্পর্ক মোটামুটি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য কর্তৃক হিরাট আক্রমণের সময়ে ইংরেজরা তাঁহাকে সাহায্য

করিয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করেন নাই।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র G. B. Malleson, *History of Afghanistan*, London, 1878 ; *The Cambridge History of India*, vol. V, Cambridge, 1929 ; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. IX, part I, Bombay, 1963.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

দোহা, দোঁহা অপভ্রংশে অবহট্‌ঠে (এবং কোনও কোনও নব্যভারতীয় আর্য ভাষাতেও) তিনটি অর্থে ব্যবহৃত: ১. দুই চরণের কবিতা ২. এমন কবিতার ছন্দোবিশেষ এবং ৩. দুই চরণের কবিতাবলী অর্থাৎ দোহাকোষ অথবা দুই চরণের কবিতাময় অর্থাৎ দোহাত্মক আখ্যান-কাব্য। শব্দটি পরবর্তীকালে সংস্কৃত রূপ পাইয়া 'দোধক' হইয়াছে। গ্রন্থনামে যেমন অবহট্‌ঠে, সরহপাদের দোহা ('দোহাতিউ'), 'পাহুডদোহা'; প্রাচীন রাজস্থানীতে 'ঢোলা-মাজরা দোহা', প্রাচীন গুজরাতীতে 'মাধবানল-কামকন্দলা দোহা (বা দোধক)', প্রাচীন অবধীতে তুলসীদাসের দোঁহা (বা দোঁহাবলী)।

দোহা শব্দটি আসিয়াছে সংস্কৃত 'দ্বিপদ (দ্বাপদ)' শব্দের সঙ্গে 'দ্বিধা (দ্বিধ)' শব্দের সংযোগে। অর্থ দুইভাগের সমষ্টি। ঋগ্‌বেদে কোনও কোনও ছন্দের বিশিষ্ট রূপে—যেখানে শ্লোকটি দুই অর্ধে বিভক্ত—অনুরূপ অর্থে 'দ্বিপদা' (যেমন, দ্বিপদা বিরাট্) ব্যবহৃত আছে। এই অর্থে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের ছন্দগুলি সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়: দুই চরণের শ্লোক 'দোঁহা' এবং চারি চরণের শ্লোক 'চউপঈ' (চতুষ্পদী)। অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠে 'দোঁহা' শব্দের দ্বারা চতুষ্পদী সমেত সব ছন্দের শ্লোক বুঝাইলেও একটি বিশিষ্ট দ্বিপদী ছন্দের নাম হয় 'দোহা'। এই ছন্দে আছে অন্ত্যমিল এবং প্রত্যেক চরণে আছে চব্বিশ মাত্রা এবং প্রথম ত্রয়োদশ মাত্রার পরে যতি। যেমন—

২২   ২১১   ১১১   ১১   ১১১   ২১   ২২১
রাঈ   দোহড়ি   পঢ়ণ   সুনি | হসিউ   কন্থ   গোআল।
২২ ১১   ১১   ২১   ১১   ১১২   ১১১   ১২১
বৃন্দাবন   ঘন   কুঞ্জ - ঘর | চলিউ   কমণ   রসাল॥

সুকুমার সেন

দৌলত কাজী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন কবি। ইনি ১৭শ শতাব্দীতে আরাকানরাজ থিরি-থু-ধম্মের (১৬২২-১৬৩৮ খ্রী) রাজসভায় থাকিয়া তাঁহার একমাত্র ও অসম্পূর্ণ কাব্য 'সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। দৌলত থিরি-থু-ধম্মকে শ্রীসুধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রাজ্যাভিষেকের প্রথম বৎসরেই থিরি-থু-ধম্মের মৃত্যু ঘটিবে, এক গণৎকার এই ভবিষ্যদ্বাণী করায় তাঁহার রাজ্যাভিষেক দ্বাদশ বৎসর স্থগিত থাকিয়া ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসুধর্ম মৃত্যুভয়ে এই কালে মন্ত্রী আশরফ খানের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। এই সময়ের মধ্যেই (১৬২২-১৬৩৫ খ্রী) আশরফের আজ্ঞাক্রমে এক প্রাচীনতর হিন্দী-কবি সাধনের 'মৈনাসত' কাব্য অবলম্বনে দৌলতের কাব্য রচিত হয়।

দৌলতের অসমাপ্ত রচনা ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাওল কর্তৃক সমাপিত হয়। আলাওল লিখিয়াছেন, কাব্য-রচনার অর্ধপথেই দৌলতের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। দৌলত সুফী-মতাবলম্বী মুসলমান ছিলেন। তাঁহার কাব্যে রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। দৌলত শক্তিশালী কবি ছিলেন। তাঁহার অসমাপ্ত কাব্যের মৌলিকতা ও রচনাসৌষ্ঠব সাহিত্যরসিকদের দ্বারা প্রশংসিত। অনেকের মতে তিনি আলাওলের চেয়ে বড় কবি ছিলেন। সংস্কৃত মিশাইয়া বাংলায় পদরচনার প্রথম কৃতিত্ব দৌলতেরই।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

দৌলত খাঁ লোদী[১] তোগলক বংশের শেষ সুলতান নাসিরুদ্দীন মামুদের রাজত্বকালে দৌলত খাঁ লোদী ছিলেন দিল্লীর একজন সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী আফগান আমীর। মন্ত্রী মল্লু ইক্‌বালের মৃত্যুর পরে মামুদ শাহ তাঁহাকে গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তখন কার্যতঃ তিনিই রাজ্যের শাসক হন।

মামুদের মৃত্যুর পরে দিল্লীর আমীরগণ তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন (১৪১৩ খ্রী)।

কিন্তু পর বৎসর তৈমুরের প্রতিনিধি ও মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া হিসারে প্রেরণ করেন।

দ্র *The Cambridge History of India*, vol. III, Cambridge, 1928 ; A. L. Srivastava, *The Sultanate of Delhi*, Agra, 1950 ; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. VI, Bombay, 1960.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

দৌলত খাঁ লোদী[২] (?-১৫২৫ খ্রী) দৌলত খাঁ লোদী ছিলেন দিল্লীর লোদী বংশের রাজত্বকালে লাহোরের একজন শাসনকর্তা।

দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদী তাঁহার প্রতি বৈরিভাবাপন্ন এই সংবাদ পাইয়া দৌলত খাঁ কাবুলের অধিপতি বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইব্রাহিমের খুল্লতাত আলম খাঁ-ও প্রায় ঐ সময়েই ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধে বাবরের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। বাবর সসৈন্যে লাহোরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে ইব্রাহিম লোদীর যে সৈন্যবাহিনী দৌলত খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। দিল্লীর সামরিক বাহিনী পরাস্ত হইলে বাবর লাহোর অধিকার করিলেন (১৫২৪ খ্রী); কিন্তু দৌলত খাঁ আর লাহোর ফিরিয়া পাইলেন না। ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল।

১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে দৌলত খাঁ ও আলম খাঁ মিলিতভাবে দিল্লী আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। ইহার পরে দৌলত খাঁ বাবরের নিকট পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দ্র *The Cambridge History of India*, vols. III-IV, Cambridge, 1928-1929 ; Iswari Prasad, *History of Mediaeval India*, Allahabad, 1940 ; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. VI, Bombay, 1960.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

দৌলতাবাদ পুরাতন হায়দরাবাদ রাজ্যের ও বর্তমান মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত ঔরঙ্গাবাদ জেলার শহর (১৯°৫৭′ উত্তর, ৭৫°২০′ পূর্ব); এলোরা গুহা হইতে ১১ কিলোমিটার (৭ মাইল) এবং ঔরঙ্গাবাদ শহর হইতে ১৪ কিলোমিটার (৯ মাইল) দূরে অবস্থিত। প্রাচীন নাম দেবগিরি; যাদব রাজগণের রাজধানী ছিল। ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন (পরে দিল্লীর খিলজী সুলতান) দেবগিরি আক্রমণ করিলে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেব পরাজিত হইয়া অপরিসীম ধনরত্নের বিনিময়ে সন্ধি করেন। পরবর্তীকালে ইহা দিল্লীর অধীনে আসে এবং সঞ্চিত ঐশ্বর্যের জন্য মহম্মদ বিন তোগলক ইহার নামকরণ করেন দৌলতাবাদ। তাঁহার দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করার কাহিনী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহানের রাজত্বকালে এই দুর্গ মোগলদের দ্বারা বিজিত হয়।

ভূপৃষ্ঠ হইতে ৬০০ ফুট উচ্চে একটি মোচাকৃতি ক্ষুদ্র পর্বতের চূড়ায় এই সুন্দর দুর্গটি অবস্থিত। বাহমনি রাজ্যের সুলতানগণ দুর্গের নানা শ্রীবৃদ্ধি করেন। প্রবেশপথে চাঁদমিনার, অভ্যন্তরে চীনীমহল, ভগ্নপ্রাসাদ ও বন্দীশালা, হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং অসমাপ্ত চৈত্যের নিদর্শন প্রভৃতি নানা দ্রষ্টব্য এখানে রহিয়াছে। গভীর পরিখা, সুউচ্চ প্রাকার, বিশাল সিংহদ্বার এবং প্রবেশপথের সর্বত্র শত্রুনিবারণের নানা বিচিত্র কৌশলের জন্য দাক্ষিণাত্যের দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে ইহা বিখ্যাত ছিল।

থিভেনো (Thevenot), তাভের্নিয়ে, ইব্‌নবতুতা প্রভৃতি পর্যটকগণ এই দুর্গসংক্রান্ত নানা বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. VI, Bombay, 1960.

কল্যাণী দত্ত

দ্যুপের্‌, আঁকেতিল (১৭৩১-১৮০৫ খ্রী) স্বনামধন্য ফরাসী প্রাচ্যবিদ্‌ ও ভারতপ্রেমিক। ইনি ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর পারী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ণনাম আব্রাহাম হিয়াস্যাঁথ আঁকেতিল দ্যুপের্‌। পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার পর তিনি হল্যাণ্ডে রিন্‌স্‌ভিক ও আম্যেরসফুর্ট সেমিনারিতে হিব্রু ও আরবী ভাষা শিখিয়াছিলেন। পারীর রাজ-গ্রন্থাগারে (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগার) প্রাচ্য পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার কালে তিনি ভারতীয় ভাষা চর্চার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। সম্পূর্ণ জেন্দ (জন্দ্‌) অবেস্তা, বেদ, উপনিষদ ও অন্যান্য ভারতীয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহার্থে এবং প্রাচীন পারসিক ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার মানসে তিনি ভারতে আসিতে মনস্থ করেন।

ফরাসী ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বদান্যতায় ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ আগস্ট তিনি পণ্ডিচেরিতে পদার্পণ করেন। তিনি প্রথমে 'মালাবার' ভাষা শিক্ষা করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল তিনি চন্দননগরে আসেন। এখানে ফার্সী পুস্তক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। ফরাসী সুরাট-প্রধান ভ্যোরিয়ের নিকট হইতে জেন্দ্‌ অবেস্তা পঠনের সুযোগের সংবাদ পাইয়া তিনি চন্দননগর হইতে ছদ্মবেশে পণ্ডিচেরি হইয়া সুরাট যাত্রা করেন এবং এক বৎসর পরে সেখানে পৌছান (১৭৫৮ খ্রী)। তাঁহার এই ভ্রমণকাহিনী ১৮শ শতাব্দীর ভারতের সমাজব্যবস্থা ও আচারপদ্ধতির একটি অমূল্য তথ্যভাণ্ডার।

সুরাটে ২ বৎসর অবস্থানকালীন পুরোহিত দস্তুর

দারাবের নিকট প্রায় সম্পূর্ণ জেন্দ্ অবেস্তার ফরাসী অনুবাদ সমাপ্ত করেন এবং স্বোপার্জিত অর্থ হইতে প্রায় ১৮০ খানি সংস্কৃত, পারসিক ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার পুথি, ৭খানি ফার্সী ও তিনখানি সংস্কৃত অভিধান সংগ্রহ করেন। ঐ পুথি ও অভিধানগুলি বর্তমানে পারীর জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পারীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জেন্দ অবেস্তা গ্রন্থ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তিনিই প্রথম পারসিক হইতে লাতিন ভাষায় উপনিষদ অনুবাদ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যে ১৮শ শতাব্দীতে ভারত-সংক্রান্ত প্রগাঢ় জ্ঞান তাঁহার মত কাহারও ছিল না। তিনি ভারতবর্ষের উপর অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য *L' Inde en rapport avec l' Europe* (১৭৯০ খ্রী)। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি পারীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র Anquetil Duperron, *Recherches historiques et geographiques sur d' Inde*, Berlin, 1786; Kalicharan Karmakar, 'Anquetil Duperron and India', *Bengal Past and Present*, vol. LXXVII, part II, July-December, 1958.

কালীচরণ কর্মকার

ড্যুপ্লেক্স (১৬৯৭-১৭৬৩ খ্রী) যোসেফ ফ্রান্সিস ড্যুপ্লেক্স ১৬০৭ খ্রী লঁদ্রাসিতে (Landrecies) জন্মগ্রহণ করেন। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিচেরিতে উচ্চ কার্যে যোগদান করেন। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চন্দননগরে ইন্‌টেন্ডাণ্ট (Intendant) হইয়া তাহার সমৃদ্ধিসাধন করার পর পণ্ডিচেরিতে ফরাসী উপনিবেশসমূহের ডিরেক্টর-জেনারেল হন। প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধে (১৭৪৫-৪৮ খ্রী) অভিজ্ঞতার ফলে ড্যুপ্লেক্স বুঝিলেন যে সুশিক্ষিত ইওরোপীয় সেনাপতি-গণের অধীনে ভারতীয় সিপাহিদের শিক্ষিত করিলে তাহারা দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। তিনি সিপাহিসেনার সাহায্যে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিলেন। এ-লা-শাপেলের (Aix la Chapell) সন্ধির (১৭৪৮ খ্রী) পর ড্যুপ্লেক্স দেশীয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। নিজাম আসফ জার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার পুত্র নাসিরজঙ্গকে সমর্থন না করিয়া দৌহিত্র মজঃফর-জঙ্গের পক্ষ লন ও কর্ণাটকের নবাব আনোয়ারুদ্দীনের বিরুদ্ধে চাঁদসাহেবকে সমর্থন করেন। ইংরেজরা ইহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া নাসিরজঙ্গকে ও আনোয়ারুদ্দীনের পুত্র মহম্মদ আলীকে সাহায্য করে। প্রথম দিকে ড্যুপ্লেক্সের নেতৃত্বে ফরাসীদের জয় হয় এবং ইংরেজদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া ওঠে। মজঃফরজঙ্গ নিজাম হইয়া ড্যুপ্লেক্সকে কৃষ্ণার দক্ষিণে সমগ্র মোগল রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন ও মসুলিপট্টম্ বন্দরটি ফরাসীদের দেন।

মজঃফরজঙ্গ নিহত হইলে ফরাসীরা আসফ জার পুত্র সালাবতজঙ্গকে নিজাম করে। ফরাসী সেনাপতি বুসী (Bussy) তাঁহার পরিচালক নিযুক্ত হন ও একদল ফরাসী সৈন্য হায়দরাবাদে থাকে। মহম্মদ আলী পলায়ন করিয়া তিরুচ্চিরপ্পল্লিতে আশ্রয়গ্রহণ করেন। চাঁদসাহেব ও ফরাসীরা তিরুচ্চিরপ্পল্লি অবরোধ করেন।

ইংরেজদের এই দুর্দিনে রবার্ট ক্লাইভ ইংরেজ-শক্তির ভাগ্য ফিরাইয়া দেন। তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া অতর্কিতে চাঁদসাহেবের রাজধানী আর্কট দখল করেন। চাঁদসাহেবের বাহিনী আর্কট পুনরধিকারের চেষ্টা করে, কিন্তু ক্লাইভের দ্বারা পরাজিত হয়। অতঃপর ক্লাইভ ও স্ট্রিঙ্গার লরেন্স তিরুচ্চিরপ্পল্লিকে অবরোধমুক্ত করেন। ইংরেজ-সমর্থিত হইয়া মহম্মদ আলী আর্কটের নবাব হন।

ইহার পরেও ড্যুপ্লেক্স ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু তাঁহার দেশ তাঁহাকে সমর্থন করে নাই। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদচ্যুত হন এবং ফরাসী দেশে প্রত্যাগমনের আদেশ পান। তাঁহার পরবর্তী ফরাসী গভর্নর ইংরেজদের সহিত সন্ধি করেন। দেশে ফিরিবার পর ড্যুপ্লেক্স আর্থিক দুরবস্থায় পতিত হন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মার্কুইস হইয়াছিলেন। ড্যুপ্লেক্স ভারতে ফরাসীগণের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন। দেশীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার যে নীতি ড্যুপ্লেক্স প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাই ইংরেজগণ ভারতে সাফল্যের সহিত অনুসরণ করিয়াছিলেন।

দ্র Colonel Malleson, *Dupleix*, Oxford, 1890; H. H. Dodwell, ed., *The Cambridge History of India*, vol. V, Cambridge, 1929.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

দ্যৌঃ প্রাচীন ইন্দো-ইওরোপীয় দেবমণ্ডলীর অন্তর্গত যে সকল দেবতা বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক ঋগ্‌বেদীয় সূক্তগুলিতে স্তুত হইয়াছেন, 'দ্যৌঃ' (বা দৌস্পিতা) তাঁহাদের অন্যতম। গ্রীসদেশে ইনি 'জেউস' বা 'জেউস-পাতের্' (পরবর্তী যুগে জুপিটার) রূপে কীর্তিত। কিন্তু ঋগ্‌বেদের বর্তমান সংহিতায় 'দ্যৌঃ' স্বতন্ত্র ভাবে কোনও সূক্তে কীর্তিত হন নাই। হয় তিনি উষস্, অগ্নি, পর্জন্য, সূর্য, আদিত্য,

মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের পিতৃরূপে কীর্তিত হইয়াছেন, নতুবা পৃথিবী, ভূমি কিংবা অন্য কোনও দেবতার সাহচর্যে তিনি স্তুতি লাভ করিয়াছেন। 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ'—এই প্রসিদ্ধ দেবতাদ্বন্দ্বেই তাঁহার যথার্থ স্থান সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন বৈদিক আর্যগণ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যৌঃ—এই তিনটি লোকে সমগ্র পরিদৃশ্যমান ভুবনকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। 'দ্যৌঃ' পিতা এবং 'পৃথিবী' মাতা—এই দেবদম্পতির মিলনেই বিশাল সৃষ্টির উদ্ভব। ঋগ্‌বেদের ১।১৮৫ সূক্তে ঋষি অগস্ত্য এই দেবমিথুনের মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অন্ন, বল এবং দীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "দ্যু এবং পৃথিবী ইহাদিগের মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন; কে পরে উৎপন্ন হইয়াছেন; কি নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন; হে কবিগণ! একথা কে জানে? উহারা অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করেন, এবং দিবা ও রাত্রির ন্যায় চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছেন।" (ঋক্ ১।১৮৫।১, রমেশচন্দ্র দত্ত -কৃত অনুবাদ)।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

দ্রবময়ী[1] খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ বেড়াবাড়ি গ্রামে ১৮৩৭ (?) খ্রীষ্টাব্দে দ্রবময়ীর জন্ম। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালংকারের নিকট দ্রবময়ী সংস্কৃত শিক্ষা করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পিতার টোলে তিনিও মাঝে মাঝে অধ্যাপনার কার্য গ্রহণ করিতেন। তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা-বুদ্ধির কথা শুনিয়া যে সকল অধ্যাপক পণ্ডিত তাঁহার সহিত বিচার করিতে আসিতেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি বিচারে পরাস্ত করিতেন। এই সময়ে দ্রবময়ীর বয়স ছিল মাত্র ১৪ বৎসর।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী বঙ্গ মহিলা, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৮৯, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

দ্রবময়ী[2] বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রামে ১৯শ শতাব্দীর ৭ম দশকে এক চণ্ডাল-দম্পতি বাস করিতেন। স্বামী বৈকুণ্ঠ সর্দার ছিলেন গ্রামের চৌকিদার। স্ত্রী দ্রবময়ী অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে অপূর্ব কৌশলে লাঠিখেলা দেখাইয়া সন্তুষ্ট করেন ও মৃত স্বামীর স্থানে গ্রামের চৌকিদারের পদটি লাভ করেন।

দ্র অক্ষয়কুমার সরকার, 'দ্রবময়ী চণ্ডালিনী', আর্যাবর্ত, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

দ্রাঘিমা নিরক্ষরেখা বরাবর কোনও নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে অপর কোনও বিন্দুর কৌণিক দূরত্ব। নিরক্ষরেখার উপর লম্ব এবং উত্তর মেরুবিন্দু হইতে দক্ষিণ মেরুবিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত ৩৬০টি কাল্পনিক দ্রাঘিমারেখায় পৃথিবীকে বিভাজিত করা হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আন্তর্জাতিক চুক্তির বলে লণ্ডনের নিকটবর্তী গ্রীন্‌উইচ্-এর রাজকীয় মানমন্দিরের উপর দিয়া কল্পিত দ্রাঘিমারেখাকে ০° ধরা হয়। গ্রীনউইচ রেখা হইতে পূর্বে বা পশ্চিমে ০ হইতে ১৮০ পর্যন্ত ডিগ্রীতে দ্রাঘিমা পরিমাপিত হয়।

দ্র W. G. Moore, *A Dictionary of Geography*, Middlesex, 1958.

বারীন বসু

দ্রাবিড় দ্রাবিড় শব্দটি বর্তমানে প্রধানতঃ ভাষা অর্থে ব্যবহৃত হয়; কখনও কখনও জাতি এবং দেশ বুঝাইতে শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। দ্রাবিড় শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলা কঠিন। প্রাচীন আর্য ভাষায় এবং বর্তমান তামিলে ইহার লিখিত রূপ যথাক্রমে 'দ্রামিড' ও 'তিবারিট'। সংকীর্ণ অর্থে দ্রাবিড় শব্দটি কখনও কখনও 'তামিল' শব্দের সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়। 'দ্রাবিড়' ও 'তামিল্' (তমিল্) শব্দ দুইটির মূল বা উৎপত্তি একই, এই মত সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। (আদি রূপ *Dramizha, তাহা হইতে একদিকে প্রাচীন সংস্কৃতে Dramida ও পরে Dravida—'দ্রমিড, দ্রবিড, দ্রাবিড', এবং অন্যদিকে তামিল ভাষায় ইহার পরিণতি এইভাবে হয়—*Dramizha >, *Damizha, Tamizh বা 'তমিড়্, তমিল্, (তামিল)'। সংস্কৃত 'দ্রমিড' শব্দটিই তামিল বানানে 'তিরমিট'-রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমানে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে এবং সিংহলের উত্তরাংশে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত; বিচ্ছিন্নভাবে ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায় মধ্য ভারতের মধ্য প্রদেশে, ওড়িশার কিছু কিছু বন ও পার্বত্য অঞ্চলে ও বিহার প্রদেশের ছোটনাগপুরে, সাঁওতাল পরগনায় এবং গঙ্গাতীরবর্তী রাজমহল পাহাড়ে। দ্রাবিড় ভাষার অপর একটি শাখা (ব্রাহুই) সুদূর বেলুচিস্তানে প্রচলিত আছে।

বর্তমানে দ্রাবিড়ভাষীর সংখ্যা ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ। ভারতবর্ষের ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে আর্যভাষাগুলির পরেই ইহাদের স্থান। যতদূর জানা যায়, দ্রাবিড়গোষ্ঠীর প্রচলিত ভাষাসংখ্যা ১৮; দক্ষিণ ভারতে ও উত্তর সিংহলে প্রচলিত তামিল (৩ কোটি), তেলুগু (৩·৭ কোটি), কন্নড (১·৭৪ কোটি), মালয়ালম (১·৭ কোটি), তুলু (১৫ লক্ষ), কুর্গী বা কোডগু (৪৫ হাজার), তোডা (১ হাজার), কোটা, বডগ, মধ্য ভারতে প্রচলিত গোণ্ডি, কুই বা কন্ধ (ওড়িশায়), কুরুখ বা ওরাঁও (বিহার-ওড়িশায়), মাল্‌তো (রাজমহল পাহাড়ে), পারজি ও ওল্লার (ওড়িশায়), কোলামি (মধ্য প্রদেশে), মলহর, ব্রাহুই (বেলুচিস্তানে)।

ভারতের প্রথম স্থানীয় আর্যগোষ্ঠীর ভাষা হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা শব্দ-ভাণ্ডার এবং ব্যাকরণের নিয়মাবলীতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। কয়েক সহস্র বৎসর পাশাপাশি অবস্থানের জন্য পারস্পরিক প্রভাবের ফলে আর্য ও দ্রাবিড় উভয় গোষ্ঠীর ভাষার ব্যাকরণ ইত্যাদিতে কিছুটা সমতা লক্ষ্য করা যায়। দ্রাবিড়ের উপর আর্যভাষার প্রভাব অবশ্যই সমধিক। কিন্তু আর্যভাষার উপর দ্রাবিড় প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। দ্রাবিড় ভাষা হইতেই সংস্কৃতের মূর্ধন্য ধ্বনির উৎপত্তি বলিয়া অনেকে মনে করেন।

দ্রাবিড় ভাষাসমূহে প্রচুর সংস্কৃতপ্রভাব থাকিলেও উহাদের মৌলিক বা আদিম দিকটিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। দ্রাবিড়গোষ্ঠীর গ্রাম্য ভাষাসমূহে সংস্কৃতের প্রভাব নাই বলিলেই চলে। উন্নত ও মার্জিত ভাষাসমূহের মধ্যে মালয়ালম সর্বাধিক পরিমাণে সংস্কৃতপ্রভাবিত, তৎপরে কন্নড ও তেলুগু এবং তামিলে সংস্কৃত প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম।

বর্তমান দ্রাবিড় ভাষাসমূহে তিনটি পৃথক লিপির প্রচলন রহিয়াছে—তামিল লিপি, মালয়ালম লিপি এবং কন্নড-তেলুগু লিপি (কন্নড ও তেলুগু ভাষার লিপিগত পার্থক্য সামান্যই)। ইহা ছাড়া তামিলনাডে সংস্কৃত লিখিবার জন্য একটি পৃথক লিপি আছে। তামিলদের মধ্যে সংস্কৃত লিখিবার জন্য ব্যবহৃত এই লিপিকে 'গ্রন্থ-লিপি' বলা হয়। সংস্কৃত ভাষা লিখিবার পক্ষে তামিল লিপি অনুপযোগী বলিয়া দ্রাবিড় বা তামিল ব্রাহ্মণেরা এই লিপি ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ তামিল ভাষার লিপিকে গ্রন্থলিপিরই একটি সংক্ষিপ্ত রূপ বলা যায়। সংস্কৃতের তুলনায় তামিল লিপির বর্ণসংখ্যা অনেক অল্প। স্বরধ্বনির জন্য বর্ণগুলি ঠিক আছে; কিন্তু ঋ, ৠ ও ঌ নাই, উপরন্তু দীর্ঘ এ-কার ও ও-কারের পাশে হ্রস্ব এ-কার ও হ্রস্ব ও-কার আছে। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পাঁচটি বর্গে কেবল প্রথম ও পঞ্চম বর্ণই ব্যবহৃত হয়—যথা, ক—ঙ, চ—ঞ, ট—ণ, ত—ন, প—ম (খ গ ঘ, ছ জ ঝ, ঠ ড ঢ, থ দ ধ, ফ ব ভ নাই); শ, ষ, স, হ নাই (তবে গ্রন্থলিপি হইতে আবশ্যক মত ষ, স, হ, জ এই অক্ষরগুলি গ্রহণ করা হয়); মূর্ধন্য ল আছে; ঘোষবৎ মূর্ধন্য উষ্মধ্বনি ড় বা ঝ (zh) এবং দন্তমূলীয় ন, ল আছে।

বর্তমান দ্রাবিড়ভাষাগুলি পরস্পরের নিকটে সুবোধ্য না হইলেও উহাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়; যথা, ১. অপ্রাণীবাচক ও ইতরপ্রাণীবাচক শব্দসমূহ ক্লীবলিঙ্গ ২. নামপুরুষের সর্বনামের একবচনে তিন লিঙ্গ, কিন্তু বহুবচনে দুই লিঙ্গ (স্ত্রী-পুরুষের রূপে কোনও ভেদ নাই) ৩. উত্তমপুরুষের বহুবচনে ভিন্নার্থক দুইটি রূপ—একরূপে শ্রোতার অন্তর্ভুক্তি, অন্যরূপে বহির্ভুক্তি বোঝায় ৪· শব্দরূপের উভয় বচনে একই বিভক্তি-চিহ্নের প্রয়োগ ৫. উপসর্গ ও কর্মবাচ্যের অভাব ৬. নেতিবাচক ধাতুরূপের ব্যবহার ৭. দশের উর্ধ্বে সংখ্যাবাচক শব্দের গঠনে সংস্কৃতের বিপরীত রীতি ৮. নিত্য সম্বন্ধসূচক শব্দের অভাবে জটিল বাক্যগঠনে অসুবিধা ৯. কৃদন্ত বিশেষণ ও বিশেষ্য-পদের বহুল ব্যবহার ১০. এক বাক্যে অজস্র অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত মাত্র একটি সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ।

দ্র সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারত-সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ; G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. IV, Calcutta, 1906; Robert Caldwell, *A Comparative Grammar of the Dravidian in South Indian Family of Languages*, Madras, 1961; S. K. Chatterjee, *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta, 1963.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

দ্রাবিড় সভ্যতা দ্রাবিড় বলিতে সাধারণতঃ দক্ষিণ ভারতের এবং সিংহল দ্বীপের এক আর্যেতর জাতিকে বুঝাইয়া থাকে। তাহাদের ভাষা সংযোগমূলক (অ্যাগ্লুটিনেটিভ)। তাহাদের শারীরিক আকৃতি সম্বন্ধে কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন, তাহারা কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত কেশ, লম্বা মস্তক, প্রশস্ত নাসিকাযুক্ত এবং স্থূল ওষ্ঠাধরবিশিষ্ট। কেহ কেহ মনে করেন, এই জাতির মধ্যে

মৃত্যুশিলা (dolmen)-নির্মাণ, বুমেরাং নামক নিক্ষেপ-যন্ত্রের ব্যবহার, স্ত্রী-জাতির মধ্যে উত্তরাধিকারপ্রথা প্রভৃতি বহু আদিম জাতির আচরণ প্রচলিত ছিল। ইহাদের মধ্যে শিল্পকলা ও সাহিত্য প্রভৃতি উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গসমূহ যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। ভারতের ইতিহাসে ইহাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি সুদূরপ্রসারী। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন কালে মধ্য ভারত, উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারত এবং সম্ভবতঃ পূর্ব ভারতেও দ্রাবিড়ীয় ভাষা প্রচলিত ছিল। আর্যদের বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে দ্রাবিড়ীয় ভাষার শব্দ-সম্পদের প্রভাব অল্পবিস্তর দৃষ্টিগোচর হয়। আর্যভাষা (বৈদিক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত) এবং দ্রাবিড় ভাষা বহু শতক ধরিয়া পাশাপাশি থাকার ফলে একে অপরকে প্রভাবিত করে। শত শত সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ দ্রাবিড়-ভাষাগুলিতে স্থান পাইয়াছে এবং কয়েক শত দ্রাবিড় শব্দ তেমনি রূপ বদলাইয়া আর্যভাষায় (সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক ভাষাসমূহে) প্রবেশ করিয়াছে। বর্তমানে দ্রাবিড়ীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা ১০·৭ কোটি কিংবা ভারত-বর্ষের মোট লোকসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কন্নড প্রভৃতি ভাষা দ্রাবিড়ীয় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। বেলুচিস্তানে প্রচলিত ব্রাহুই ভাষা দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠীরই অন্তর্গত। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সাহিত্যসম্পদের দিক হইতে তামিল ভাষার স্থানই সকলের উপরে ('তামিল' ও 'দ্রাবিড়' দ্র)।

দ্রাবিড় সভ্যতা বলিতে দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের সভ্যতা বুঝিতে হইবে। দ্রাবিড়রা বাস্তবিক কোন জাতির লোক এবং কোন দেশের মূল অধিবাসী ছিল, ইহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, দ্রাবিড়রা পূর্বে পশ্চিম এশিয়ায় বাস করিত, পরে ইহারা বেলুচিস্তানের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে উত্তর ভারতে বসবাস শুরু করে এবং পরে আর্যদের আক্রমণের ফলে ক্রমশঃ দক্ষিণ ভারতে সরিয়া পড়ে। জেম্স্ হর্নেল ও অন্যান্য কেহ কেহ মনে করেন, আদি দ্রাবিড় জাতি ভূমধ্যসাগরবাসী জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত। ইন্দো-আর্য ভাষাভাষীদের আগমনের পূর্বে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ক্রীট দ্বীপ ও অন্যান্য সন্নিহিত স্থান হইতে বিভিন্ন আকৃতির ও বিভিন্ন ভাষার লোকেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তাহাদিগকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, ১. আদি ভূমধ্যসাগরীয় জাতি (প্যালিও-মেডিটেরানিয়ান টাইপ) কৃষ্ণবর্ণ ও খর্বকায়; বর্তমানে যেখানে কন্নড, তামিল ও মালয়ালম প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত সেই অঞ্চলে দেখা যায় ২. খাঁটি ভূমধ্যসাগরীয় কিংবা ইওরোপীয় জাতি দেখিতে পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা দীর্ঘকায় ও সুদর্শন; ভারতে আগমনের পর পাঞ্জাব এবং গঙ্গোত্তরীর নিকটবর্তী স্থানে তাহাদের প্রথম বাস। অনেকে মনে করেন ইহারাই সুসভ্য দ্রাবিড় জাতি এবং ভারতের আর্যপূর্ব সভ্যতা ইহাদেরই সৃষ্ট। পরবর্তীকালে আর্যভাষার প্রভাবে ইহারা আর্যভাষাভাষী হইয়া উত্তর ভারতীয় হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে ৩. ভূমধ্যসাগরীয় জাতির তৃতীয় প্রবাহ তথাকথিত প্রাচ্য (ওরিয়েন্টাল) শাখা; ইহারা সুদীর্ঘ নাসিকাযুক্ত এবং গৌরবর্ণ; সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে ইহাদিগকে দেখা যায়। জাতিবর্ণবিচারে মোটামুটি দেখা যায় উত্তর-পশ্চিম ভারতে পরবর্তী কালে আগত বিশিষ্ট নর্ডিক (Nordic) অথবা আর্যজাতির সঙ্গে প্রকৃত ভূমধ্যসাগরীয় ও প্রাচ্য -জাতি এই উভয়েই মিশ্রিত হইয়া পড়ে এবং দক্ষিণ ভারতে আদি ভূমধ্যসাগরীয় জাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

উল্লিখিত আদি ভূমধ্যসাগরীয়, মূল ভূমধ্যসাগরীয় এবং তথাকথিত প্রাচ্য এই জাতিত্রয় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতা লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তাহাদের মস্তক দীর্ঘাকৃতি এবং তাহাদের সকলেই অন্ততঃ ভারতবর্ষে দ্রাবিড়ীয় ভাষায় কথা বলিত। ভারতের বিশিষ্ট নাগরিক সভ্যতা তাহাদেরই কৃতিত্ব। কেহ কেহ মনে করেন, সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা ছিল দ্রাবিড় জাতি।

আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে হিন্দু-সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাতে দ্রাবিড়দের অবদান কি ছিল তাহা ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের দ্বারা পণ্ডিতগণ নির্ণয় করার চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন, পূজা-অনুষ্ঠান দ্রাবিড়ীয় (দ্রাবিড় 'পূ'=পুষ্প) এবং হোম-অনুষ্ঠান আর্য। পূজায় ফুল, ফল, পত্র প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু হোমে এই সমস্তের প্রয়োজন হয় না; ইহাতে গব্যঘৃত প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদিক দেবলোক এবং পৌরাণিক দেবলোক, উভয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। এইরূপ অনুমান করিতে পারা যায় যে, বৈদিক দেব-কল্পনা এবং দ্রাবিড় জাতির স্বকীয় দেব-কল্পনা উভয়ের মিলনের ফলে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রধান প্রধান দেবতাদের উদ্ভব হইয়াছে: বৈদিক 'রুদ্র'=দ্রাবিড় ও পৌরাণিক

'শিব'; বৈদিক 'অদিতি'=দ্রাবিড় ও পৌরাণিক 'উমা'; বৈদিক 'বিষ্ণু'=দ্রাবিড় 'মাল্‌', পৌরাণিক 'বিষ্ণু' বা 'নারায়ণ' ইত্যাদি।

দ্র সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারত-সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. I, London, 1951; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. II, Bombay, 1951.

কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী

দ্রোণ, দ্রোণাচার্য মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। দ্রোণ শব্দটির অর্থ কলস। তিনি কলসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাভারতের এই অলৌকিক কাহিনী সুবিদিত। পিতার নিকট তিনি বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রথমে অগ্নিবেশ্য মুনির নিকট ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন; পরে পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা ও অস্ত্রলাভ করেন। শরদ্বান-কন্যা কৃপী ইঁহার পত্নী; ইঁহার পুত্রের নাম অশ্বত্থামা। বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গী দ্রুপদ বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজা হইলে দ্রোণকে তাঁহার অর্ধেক রাজ্য দিবেন। দারিদ্র্যপীড়িত দ্রোণ দ্রুপদকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলে দ্রুপদ তাঁহাকে অপমান করেন। অতঃপর দ্রোণ হস্তিনাপুরে আসিয়া কৃপাচার্যের গৃহে গোপনে বাস করিতে থাকার কালে ঘটনাক্রমে ধনুর্বিদ্যায় তাঁহার অসামান্য পারদর্শিতা প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং ভীষ্ম কর্তৃক তিনি কুরুপাণ্ডু-পুত্রগণের অস্ত্রগুরু নিযুক্ত হন।

প্রিয়তম শিষ্য অর্জুনকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। অর্জুনকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করার জন্য তিনি একলব্যের দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠটি গুরুদক্ষিণারূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে অস্ত্রপ্রয়োগের অযোগ্য করিয়াছিলেন। অর্জুনের সাহায্যে দ্রুপদের রাজ্য জয় করিয়া দ্রোণ দ্রুপদকে দক্ষিণ পঞ্চাল প্রত্যর্পণ করেন এবং উত্তর পঞ্চালের অহিচ্ছত্রে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। দুর্যোধনাদি কর্তৃক পাণ্ডবদের প্রতি অধর্মাচরণকে তিনি কখনও সমর্থন করেন নাই, কিন্তু কৌরবদের অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। অর্জুন তাঁহাকে গুরু-দক্ষিণা দান করিতে চাহিলে দ্রোণ বলিলেন, তাঁহার প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগ করাই হইবে অর্জুনের উপযুক্ত গুরু-দক্ষিণা।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ১১শ হইতে ১৫শ দিবস পর্যন্ত দ্রোণাচার্য কৌরব-সেনাপতি হইয়া অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুবধে সাহায্য করেন এবং দ্রুপদ ও বিরাটকে বধ করেন। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মুখে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' এই কূটবাক্যের প্রথমাংশটি কেবল তাঁহার কর্ণগোচর হওয়ায় ১৫শ দিবসে পুত্রশোকে পঞ্চাশীতিবর্ষ-বয়স্ক দ্রোণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া যোগারূঢ় অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন গতাসু দ্রোণাচার্যের শিরশ্ছেদ করেন।

দ্র মহাভারত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮২৬ শকাব্দ।

কল্যাণী দত্ত

দ্রৌপদী পাণ্ডবমহিষী, পঞ্চাল-রাজ দ্রুপদের কন্যা। ইনি কৃষ্ণা, যাজ্ঞসেনী, পাঞ্চালী প্রভৃতি নামেও পরিচিতা। মহাভারতে কথিত আছে যে, দ্রোণবধার্থে দ্রুপদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অনলে ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত ইঁহার উৎপত্তি হইয়াছিল। শচীর অংশে ইঁহার জন্ম। ইনি শ্যামবর্ণা, চিরযুবতী, অসামান্যা রূপবতী, রন্ধননিপুণা, সেবাপরায়ণা ও কলাবতী বলিয়া বর্ণিত। স্বয়ংবরসভায় অর্জুন মৎস্যচক্র বেধ করিয়া ইঁহাকে লাভ করেন। পরে কুন্তীর আদেশে এবং ব্যাসদেবের বিধানে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। নারদ পাণ্ডবগণের বিবাহিত জীবনযাপনের ব্যবস্থা নির্দেশ করেন। ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করে।

যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের সহিত অক্ষক্রীড়ায় ইঁহাকে পণ রাখিয়া পরাজিত হইবার ফলে ইনি সভাগৃহে নিরতিশয় লাঞ্ছিতা হন। পরে ধৃতরাষ্ট্রের বরে ইনি স্বামীগণের সহিত দাসত্বমুক্ত হন। পাণ্ডবগণের সহিত ইনি বনগমন করেন। বনবাসকালে ইনি শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় দুর্বাসার অভিশাপ হইতে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করেন। একদা জয়দ্রথ কর্তৃক অপহৃতা হইলে ভীম ইঁহাকে উদ্ধার করেন। অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট-মহিষীর সৈরিন্ধ্রীরূপিণী দ্রৌপদীকে কীচক অপমান করিলে ভীম কীচককে বধ করেন। ইনি সর্বদা যুধিষ্ঠিরকে কৌরবদের সহিত যুদ্ধে প্ররোচিত করিতেন। দুর্যোধন ও দুঃশাসনের হস্তে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধগ্রহণ কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের অন্যতম নাটকীয় ঘটনা। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধান্তে অশ্বত্থামা ইঁহার পঞ্চপুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় বধ করেন। কিছুকাল রাজ্য-ভোগান্তে দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের সহিত মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। অর্জুনের প্রতিই দ্রৌপদীর বিশেষ অনুরাগ ছিল বলিয়া প্রথমেই দ্রৌপদীর মৃত্যু ঘটে।

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী ইঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। ইনি কৃষ্ণের প্রিয় সখী এবং পাণ্ডবগণের আজীবন সঙ্গিনী ছিলেন। সাধারণ জনসমাজেও ইনি

বিশেষ সম্মানিতা। প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যাদের ইনি অন্যতমা।

কল্যাণী দত্ত

দ্বারকা ২২°১৪′ উত্তর ও ৬৯°১′ পূর্ব। গুজরাতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগরের তীরে অবস্থিত একটি শহর ও বন্দর। ওখা বন্দর হইতে দ্বারকার দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার, আমেদাবাদ হইতে রেলপথে দ্বারকার দূরত্ব ৫৩২ কিলোমিটার। দ্বারকা হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ইহা সপ্ততীর্থের অন্যতম। দ্বারকা হইতে ৩২ কিলোমিটার (২০ মাইল) দূরে বেট দ্বারকা দ্বীপ। দ্বারকাতীর্থ বলিতে ইহাকেও বুঝায়।

প্রাচীনকালে দ্বারকা দ্বারাবতী নামেও অভিহিত হইত। বৈদিক যুগে দ্বারকার নাম তীর্থরূপে পাওয়া যায় না। পাণ্ডবদের তীর্থযাত্রার সূচীতেও দ্বারকার নাম উল্লেখিত হয় নাই। পুসলকরের মতে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে দ্বারকা তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। বৈষ্ণব-তীর্থরূপে ইহার প্রসিদ্ধি থাকিলেও ইহা একটি বিশিষ্ট শৈবতীর্থ। শিবপুরাণ অনুসারে দ্বারকার জ্যোতির্লিঙ্গ হইলেন নাগেশ শিব।

বন্দর হিসাবেও দ্বারকার খ্যাতি আছে। প্রাচীনকালে এইস্থান দিয়া পারস্য প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য চলিত। ১৯শ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত এই অঞ্চলে ওয়াঘের (Wāgher) নামক রাজপুত জলদস্যুদের উপদ্রব ছিল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দ্বারকার জনসংখ্যা ১৪৩৯৪।

দ্বারকার প্রাচীন আর এক নাম কুশস্থলী। মহাভারত, হরিবংশ, বায়ু, ব্রহ্ম, অগ্নি এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুসারে আনর্তদেশের রাজধানী কুশস্থলীতেই দ্বারকা স্থাপিত হয়। পুণ্যজন রাক্ষস কুশস্থলী অধিকার করায় শর্যাতির বংশধর-গণ ঐ নগর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কালক্রমে যাদবগণ কালযবন এবং জরাসন্ধের আক্রমণে জর্জরিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ কুশস্থলীর জনহীন ভূখণ্ডে দ্বারকাপত্তন স্থাপন করেন। গর্গসংহিতার দ্বারকামাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে যে আনর্তের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের উপর দ্বারকা নির্মাণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যায়।

মহাভারত অনুযায়ী দ্বারকা প্লাবিত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও কালক্রমে দ্বারকা পুনর্বার স্থাপিত হয়। শ্রীচৈতন্য দ্বারকা তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। প্রাচীন দ্বারকার অবস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। অনেকে বলেন যে, উহা জুনাগড় বা গিরিনগরে অবস্থিত ছিল; কাহারও কাহারও মতে বেট দ্বারকাই প্রাচীন দ্বারকা।

দ্বারকার মুখ্য মন্দির হইল রনছোড়্জী রায়ের সাত-তলা মন্দির। ৫৬টি সিঁড়ি চড়িবার পর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ওখা রেলস্টেশনে নামিয়া বেট দ্বারকায় যাইতে হয়। এখানে তপ্তমুদ্রার ছাপ দিবার রীতি আছে। কথিত আছে, বেট দ্বীপে ভগবান বিষ্ণু শঙ্খসুর দৈত্যকে নিহত করিয়া তাহার পত্নী তুলসীকে চারাগাছে পরিণত করেন। ঐ গাছ পবিত্র তুলসী নামে খ্যাত।

ভারতবর্ষে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত শঙ্করাচার্যের চারিটি ধাম বা মঠের পশ্চিম ধামটি দ্বারকায় অবস্থিত।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XI, Oxford, 1908.

ভকতপ্রসাদ মজুমদার

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-৯৮ খ্রী) সাংবাদিক, সমাজ-সংস্কারক ও রাজনৈতিক নেতা। দ্বারকানাথ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত মাগুরখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গো-পাধ্যায় ও মাতা উদয়তারা দেবী। দ্বারকানাথ ফরিদপুরের লোনসিংহ গ্রামে শিক্ষকতাকার্যে ব্রতী হন। এই স্থান হইতে তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মে 'অবলাবান্ধব' পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহা নারীসমাজের মুখপত্র ছিল। তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে কলিকাতায় আসিয়া এখান হইতেই উক্ত পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন।

দ্বারকানাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা এবং শিক্ষক ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায়ও (১৫ মে, ১৮৭৮ খ্রী) তিনি অগ্রণী ছিলেন। কাদম্বিনী বসুর সঙ্গে দ্বারকানাথ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। মহিলাদের কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তিনি তাহারও পুরোভাগে ছিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে কাদম্বিনী দেবী মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নে রত হন।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতসভার কার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ইহার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনায়ও তিনি লিপ্ত হন এবং আসামের চা-বাগানস্থ কুলিদের দুঃখ-দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া পত্রিকায় উহা প্রকাশ করেন।

দ্বারকানাথ 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক। দ্বারকানাথের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই : 'বীর-নারী' (১২৮১ বঙ্গাব্দ), 'জীবনালেখ্য' (১২৮৩ বঙ্গাব্দ), 'সুরুচির কুটীর' (১২৮৬ বঙ্গাব্দ) ও 'নববার্ষিকী' (১২৮৪ বঙ্গাব্দ)। ইহা ছাড়া দ্বারকানাথ 'জাতীয় সংগীত' নামক স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীতমালা সংকলন করেন (১৮৭৬ খ্রী)। ইহাতে তাঁহার 'না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না' সংগীতটি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জুন দ্বারকানাথের জীবনাবসান ঘটে।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, 'দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৭৩, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ ; যোগেশচন্দ্র বাগল, 'হিন্দুমহিলা-বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিলা-বিদ্যালয়', প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ ; শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ১৯৫৭ ; যোগেশচন্দ্র বাগল, স্ত্রী-শিক্ষার কথা, কলিকাতা, ১৯৬১ ; J. C. Bagal, *History of the Indian Association*, Calcutta, 1953.

যোগেশচন্দ্র বাগল

দ্বারকানাথ গুপ্ত, ডি. গুপ্ত (১৮৩৮-৮২ খ্রী) প্রসিদ্ধ জ্বরঘ্ন ঔষধের আবিষ্কারক। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে প্রথম যাঁহারা চিকিৎসাবিদ্যার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাঁহাদের অন্যতম। চিকিৎসাবিদ্যায় তিনি তৎকালীন স্নাতক উপাধি (জি. এম. সি. বি.) লাভ করিয়াছিলেন।

কিছুকাল সরকারি চাকরি করার পর দ্বারকানাথ চাকরি পরিত্যাগপূর্বক চিকিৎসাবিদ্যার গবেষণায় রত হন। তিনি বহুবিধ পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হইল ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধক (অ্যাণ্টি-পিরিয়ডিক মিক্সচার)। ইহা সাধারণতঃ ডি. গুপ্তের মিক্সচার নামে খ্যাত। ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও এই ঔষধের বহুল প্রচলনের ফলে দ্বারকানাথ খ্যাতি লাভ করেন। এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া তিনি বিপুল অর্থ অর্জন করেন এবং কলিকাতার ধনিক-সম্প্রদায়ের অন্যতম বলিয়া গণ্য হন।

তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের চিকিৎসক ছিলেন। ঠাকুর-বাড়ির সংলগ্ন জমিতেই তাঁহার ঔষধের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। শোনা যায়, এই জমি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে দান করেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুন তিনি হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যান।

অশোকা সেনগুপ্ত

দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬ খ্রী) 'প্রিন্স' নামে দেশ-বিদেশে আখ্যাত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা নীলমণি ঠাকুরের পৌত্র। ইহার পিতা রামমণি ঠাকুর ও মাতা মেনকা দেবী। জ্যেষ্ঠতাত রামলোচন অপুত্রক ছিলেন বলিয়া দ্বারকানাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথ বাল্যকালে শেরবোর্ন নামক একজন ফিরিঙ্গি শিক্ষকের স্কুলে ইংরেজীর প্রথম পাঠ লন। তিনি পরে এই ভাষা চর্চা করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ব্যবহার-শাস্ত্রও ক্রমে তাঁহার আয়ত্ত হয়। তিনি সুপ্রিম কোর্টে বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারদের প্রতিভূরূপে কার্য করিয়া প্রভূত ধন-সম্পদ অর্জন করেন। পৈত্রিক সম্পত্তি বাদে তিনি নূতন নূতন জমিদারিও কিনিয়াছিলেন। তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনার নিমক মহলের দেওয়ান হন এবং কর্মদক্ষতা ও সততা-গুণে ছয় বৎসর পরে শুল্ক লবণ ও অহিফেন বোর্ডের দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত তিনি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পদত্যাগ করেন। দেওয়ানপদে নিযুক্ত থাকা কালেই তিনি বেসরকারি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন। তিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাবধি (১৮২৯ খ্রী) তাহার অন্যতম অংশীদার ও পরিচালক ছিলেন। তিনি কয়েকটি বীমা কোম্পানিরও পরিচালক ছিলেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারি বীমা কোম্পানি স্থাপনের কথা হইলে অন্যান্যদের সঙ্গে দ্বারকানাথও ইহার বিরোধিতা করেন এবং শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আয়োজিত সরকারি সেভিংস ব্যাঙ্কের তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন প্রথম আমানতকারী।

ইওরোপীয়দের সঙ্গে একযোগে দ্বারকানাথ কার ঠাকুর কোম্পানি নামক একটি বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ও পরিচালক। নীল, শর্করা, রেশম প্রভৃতি শিল্পকর্মে দ্বারকানাথ ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। রানীগঞ্জের কয়লার খনি পরিচালনায় তিনি বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন ; ক্রমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথকেও উক্ত কোম্পানির অংশীদার করিয়া লইয়াছিলেন।

জাহাজ মেরামত ও নির্মাণের কারখানাও তিনি স্থাপন

করেন। তাঁহার কয়েকখানি নিজস্ব জাহাজ ছিল। তাহার মধ্যে 'দ্বারকানাথ' প্রাচ্যে যাত্রী ও ডাক চলাচলে নিযুক্ত হয়। ভারতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বাষ্পীয়পোত প্রবর্তনকল্পে যে সভা হয় তাহারও তিনি একজন প্রধান ছিলেন।

স্বদেশের হিতকল্পে অনুষ্ঠিত বিবিধ কার্যের সঙ্গেও দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। রাজা রামমোহনের আত্মীয়সভার (১৮১৯ খ্রী) তিনি ছিলেন একজন সভ্য। তৎপ্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো হিন্দু স্কুলের তিনি ছিলেন একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-লোপের ব্যবস্থা হইলে রামমোহন রায়ের সঙ্গে যে ৬ জন বাঙালী-প্রধান প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে এবং পরে ইংল্যাণ্ডে রাজার নিকট ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করেন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন দ্বারকানাথ। দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়ী বড়লাট মেট্‌কাফ সেই বিধি তুলিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

দ্বারকানাথ ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের সহযোগে 'বেঙ্গল হেরাল্ড' এবং ইহার বাংলা 'বঙ্গদূত' প্রকাশের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এই কাগজ দুই-খানির অন্যতম স্বত্বাধিকারী। 'ইংলিশম্যান'-এর আর্থিক বিপর্যয় উপস্থিত হইলে তিনি ইহাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য দিয়া দায়মুক্ত করেন (১৮৩৩-৩৪ খ্রী)। এই সময়ে 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রেরও তিনি একজন প্রধান অংশীদার হইলেন।

ইওরোপীয়েরা স্থায়ীভাবে বসবাস করিলে ভারতবর্ষের যথেষ্ট স্থায়ী উন্নতি সাধিত হইতে পারে, এই বিশ্বাসে তিনি রামমোহনের সঙ্গে এদেশে উহাদের উপনিবেশ স্থাপনবিষয়ক আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। সতীদাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর যে কয়জন বাঙালী-প্রধান বড়লাট বেণ্টিংককে অভিনন্দনপত্র দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দ্বারকানাথকেও দেখিতে পাই। হিন্দু কলেজের সহিত তাঁহার সর্বপ্রথম যোগস্থাপন হয় ইহার অন্যতম পরিচালকরূপে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই যোগ রক্ষা করিয়া যান। ঐ কলেজের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলা পাঠশালা'র তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা; বাংলার মাধ্যমে এখানে যাবতীয় বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা হয়। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের একজন প্রধান সমর্থক ও উৎসাহ-দাতা ছিলেন দ্বারকানাথ। তিনি প্রথমে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসর যাবৎ উহার উৎকৃষ্ট ছাত্রদের বার্ষিক দুই হাজার টাকা করিয়া পারিতোষিকের ব্যবস্থা করেন। মেডিক্যাল কলেজ হইতে বিলাতে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেরিত চারজন ছাত্রের মধ্যে দুইজনের ব্যয়ভার তিনি বহন করেন।

দ্বারকানাথ ক্যালকাটা পাব্লিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায়ও অগ্রণী হন। তিনি ইহার প্রথম শেয়ার-হোল্ডার ছিলেন। বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন বা ভূম্যধিকারী সভা প্রতিষ্ঠায় (১৮৩৮ খ্রী) তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। দ্বারকানাথ প্রথমবার বিলাতে যান ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে। সেখানে তিনি রাজকীয় সম্মান লাভ করেন। ফিরিবার সময় তিনি মানবহিতৈষী জর্জ টম্‌সন্‌কে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন এবং নব্য বঙ্গের নেতৃবৃন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার বিলাতে যান। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ আগষ্ট বিলাতে দ্বারকানাথের জীবনাবসান ঘটে।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, 'দ্বারকানাথ ঠাকুর,' বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯২৭; কিশোরীচাঁদ মিত্র, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কলিকাতা, ১৯৬২।

যোগেশচন্দ্র বাগল

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-৮৬ খ্রী) কৃতী পণ্ডিত। ইহার পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। জন্ম ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার দক্ষিণে চাংড়িপোতা গ্রামে। তিনি সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র, ঐ স্থানেই পুস্তকাধ্যক্ষ, ব্যাকরণ ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং কিছুকাল অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের সহকারী ছিলেন। মৃত্যু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যভারতের সাতনায়। শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার ভাগিনেয়।

সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ'-এর সম্পাদনাই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি (প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৮৫৮ খ্রী)। বিজ্ঞতা ও শুচিতার সমন্বয়ে বিশুদ্ধ রাজনীতি ও সুস্থ সাহিত্যের প্রসারে ইহা বহুদিন ধরিয়া বাংলা সংবাদপত্র-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। 'কল্পদ্রুম' মাসিক পত্রিকাও (১২৮৫-৯১ বঙ্গাব্দ) দ্বারকানাথ সম্পাদনা করেন। ইহার অন্যান্য প্রধান রচনা : 'নীতিসার' ৩খণ্ড (১৮৫৬, ১৮৫৬, ১৮৭৮ খ্রী), 'রোমরাজ্যের ইতিহাস' (১৮৫৭ খ্রী), 'গ্রীসদেশের ইতিহাস' (১৮৫৭ খ্রী), 'ভূষণসার ব্যাকরণ' (১৮৬৫ খ্রী), 'বিশ্বেশ্বর বিলাপ পদ্য' (১৮৭৪ খ্রী) ইত্যাদি।

দ্র শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ১৯৫৭; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১১, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

কল্যাণী দত্ত

দ্বারকানাথ মিত্র (১৮৩৩-৭৪ খ্রী) স্বনামখ্যাত আইনজীবি ও হাইকোর্টের বিচারপতি। হুগলি জেলার অন্তর্গত আগুন্‌সি গ্রামে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হরচন্দ্র মিত্র হুগলি আদালতের মোক্তার ছিলেন। হুগলি কলেজিয়েট স্কুল ও হুগলি কলেজে শিক্ষালাভের পর আইন-শিক্ষা কমিটির পরীক্ষা পাস করিয়া দ্বারকানাথ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে তিনি হাইকোর্টে যোগ দেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ঠাকুরাণী দাসী বনাম বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়'— এই খাজনাবৃদ্ধির মোকদ্দমার আপীলে (দি গ্রেট রেন্ট কেস) দ্বারকানাথ বিনা পারিশ্রমিকে প্রজাগণের পক্ষ সমর্থন করেন এবং ১৫ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত এক বৃহত্তর এজলাসের বিচারে জয়লাভ করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। ইহার পর তিনি হাইকোর্টে সরকারি উকীল নিযুক্ত হন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু হইলে দ্বারকানাথ তাঁহার স্থলে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে বিচারপতি নিযুক্ত হন। সুদক্ষ এবং সুপণ্ডিত বিচারপতি বলিয়াও তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। পিণ্ডদানাধিকারই দায়ভাগ-শাসিত উত্তরাধিকারক্রমের ভিত্তি, এই তত্ত্ব দ্বারকানাথই বাংলা দেশের আইনে প্রথম প্রচলিত করেন। 'কালো জজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া দ্বারকানাথের প্রতি কটাক্ষপাতপূর্ণ একটি পত্র প্রকাশ করিবার জন্য 'ইংলিশম্যান' সংবাদপত্র ও পত্রলেখক টেইলরের বিরুদ্ধে বিখ্যাত আদালত-অবমাননার মামলা হইয়াছিল।

দ্বারকানাথ ফরাসী দার্শনিক কঁৎ-এর বিশ্বমানবধর্মবাদের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং কলিকাতায় এক পজিটিভিস্ট সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সামাজিক আচার এবং নীতি সম্পর্কে তিনি পরম্পরাগত রক্ষণশীল মতবাদেরই পোষকতা করিতেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কিঞ্চিদধিক ৪০ বৎসর বয়সে ক্যান্সার রোগে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

চারুচন্দ্র চৌধুরী

দ্বারকেশ্বর পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার প্রধান নদী। ইহা পুরুলিয়া জেলার তিলাবনী পাহাড় হইতে উত্থিত হইয়া ছাতনার নিকটে বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্বে আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হওয়ার পর কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইয়া বাঁকুড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর ও কোতলপুর থানার হুজরা এলাকার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার সীমান্তে সিলাই নদীর সহিত মিলিত হওয়ার পর রূপনারায়ণ নামেই নদীটি পরিচিত। উপরিভাগে নদীটির নাম দ্বারকেশ্বর। নদীর ঢাল সামান্য, নভেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত শীর্ণকায়া ও স্রোতহীন। বর্ষায় জলস্ফীতির ফলে বন্যা হয় এবং তীব্র গতিবেগ দেখা যায়। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অংশ নদীটি দ্বারা প্লাবিত হয়। নদীটি স্থানে স্থানে নৌবহনযোগ্য। ইহার উপনদী ফুলুয়াড়ী, দুধভরিয়া, আরকুসা ইত্যাদি।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XXI, Oxford, 1908; L.S.S.O' Malley, *Bengal District Gazetteer : Bankura*, Calcutta, 1908.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬ খ্রী) কবি, গণিতজ্ঞ, দর্শনতত্ত্ববিদ, বাংলায় শর্টহ্যাণ্ড এবং স্বরলিপির উদ্ভাবক, বহুপ্রতিভাসম্পন্ন দেশহিতৈষী পুরুষ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্ম জোড়াসাঁকো (কলিকাতা)—১১ মার্চ, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ। বাল্যশিক্ষা প্রধানতঃ গৃহেই সম্পন্ন হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন্ট পল্‌স স্কুলে এবং পরে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু কোনও পাস না করিয়াই কলেজ ত্যাগ করেন (১৮৫৫ খ্রী) এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত আপনার ইচ্ছামত জ্ঞানানুশীলনে কাটাইয়া যান। মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার প্রতি দ্বিজেন্দ্রনাথ আজীবন গভীর অনুরাগ পোষণ করিতেন। ২০ বৎসর বয়সে তাঁহার কৃত মেঘদূতের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয় (১৮৬০ খ্রী)। তাঁহার 'স্বপ্নপ্রয়াণ' নামক রূপক-কাব্যটি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং বঙ্গসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৭ বৎসর তিনি পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। ১৮৮৪ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদনা করেন। বাংলা সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'-র প্রকাশেও (১৮৯১ খ্রী) তাঁহার যথেষ্ট দান ছিল; নামটিও তাঁহার দেওয়া। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত হন; উপর্যুপরি ৩ বৎসর (১৮৯৭-১৯০০ খ্রী) তিনি পরিষদের সভাপতি হিসাবে কার্য করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ৭ম অধিবেশনে

(১৯১৩ খ্রী) মূল সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। তিনি ১৮৬৪-৭১ খ্রীষ্টাব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭০-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দুমেলার সম্পাদকতা করেন। তিনি ন্যাশন্যাল সোসাইটি-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' নামক সাহিত্যসভার উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

গান্ধীজী দ্বিজেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করিতেন। দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুও দ্বিজেন্দ্রনাথের একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের (১৯০৫ খ্রী) পরদিন দ্বিজেন্দ্রনাথ চিরকালের মত জোড়াসাঁকোর বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া বোলপুরে শান্তিনিকেতনে যান এবং 'নিচু বাংলা' নামক টালি-ছাওয়া বাড়িতে বসবাস করিতে থাকেন। সেখানেই ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি পরলোকগত হন।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

দ্বিজেন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; সকলগুলি এখনও গ্রন্থবদ্ধ হয় নাই। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন বিষয়ে রচিত। তবে এগুলিকে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে চিহ্নিত করা যায়—দর্শনতত্ত্ববিষয়ক এবং সমাজতত্ত্ববিষয়ক। ব্রাহ্মধর্ম বিষয়েও তাঁহার অনেকগুলি রচনা আছে। দর্শন-তত্ত্ববিষয়ক রচনাগুলিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ শংকরের পূর্ণাদ্বৈত-বাদকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট আদর্শে উপাসনামূলক ব্রহ্মবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমাজতত্ত্ববিষয়ক রচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘাতের জাতীয় তাৎপর্য গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আলোচনা করিয়াছেন। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার চিন্তাগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

কবি হিসাবে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্থান অতিশয় বিশিষ্ট। তাঁহার 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যটিকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'রূপকের রাজপ্রাসাদ'। ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গীর দিক দিয়া ঈশ্বর গুপ্তের 'বোধেন্দুবিকাশ' (১৮৬৩ খ্রী) এবং বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' (১২৭৭ বঙ্গাব্দ) দুইয়েরই আদর্শ 'স্বপ্নপ্রয়াণে' সম্মিলিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে 'কাব্যমালা' (১৯২০ খ্রী) নামে দ্বিজেন্দ্রনাথের আরও একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ কয়েকটি ব্রহ্মসংগীতও রচনা করিয়াছিলেন।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৬, কলিকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ; পুলিন-বিহারী সেন সম্পাদিত, স্বপ্নপ্রয়াণ, কলিকাতা, ১৯৬৪।

ভবতোষ দত্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩ খ্রী) কবি ও নাট্যকার। জন্মভূমি কৃষ্ণনগর। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুলাই জন্ম। ইঁহার পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান ছিলেন। কার্তিকেয়চন্দ্রের বাসভবনে তদানীন্তন অনেক জ্ঞানী-গুণী সমবেত হইতেন। এই বিদগ্ধ পরিবেশ দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবন রচনায় সহায়তা করিয়াছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম. এ. পাস করেন এবং ঐ বৎসরেই কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য সরকারি বৃত্তি লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে প্রবাসকালেই তাঁহার একমাত্র ইংরেজী কাব্য 'দি লিরিক্স অফ ইণ্ড' (১৮৮৬ খ্রী) প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরেই তিনি দেশে ফিরিয়া সরকারি কার্যে যোগদান করেন। অপটু স্বাস্থ্যের জন্য তিনি কর্মকাল পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার দুই মাস পরে সন্ন্যাস রোগে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৭ মে, ১৯১৩ খ্রী)।

দ্বিজেন্দ্রলাল অল্প বয়সেই কাব্য-রচনা শুরু করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রীবিয়োগের পূর্বে তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন: ১. কাব্যগ্রন্থ—'আর্যগাথা' (১ম ভাগ, ১৮৮২ খ্রী), 'আর্যগাথা' (২য় ভাগ, ১৮৯৩ খ্রী), 'মন্দ্র' (১৯০২ খ্রী); ২. নক্‌শা ও প্রহসন—'একঘরে' (১৮৮৯ খ্রী), 'কল্কি-অবতার' (১৮৯৫ খ্রী), 'বিরহ' (১৮৯৭ খ্রী), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০ খ্রী), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২ খ্রী); ৩. ব্যঙ্গকবিতা ও হাস্যরসাত্মক কবিতা—'আষাঢ়ে' (১৮৯৯ খ্রী), 'হাসির গান' (১৯০০ খ্রী); ৪. কাব্যনাট্য—'পাষাণী' (১৯০০ খ্রী)। 'আর্যগাথা' ও 'মন্দ্র' রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। বাংলা কবিতায় নূতন ধরনের আঙ্গিক ও ছন্দের সৃষ্টি করিয়া তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্র-জীবনের শেষ ১০ বৎসরকে প্রধানতঃ নাটক রচনার কাল বলা যায়। এই সময়ে তিনি নিম্নলিখিত নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন: ১. ইতিহাসাশ্রিত বা ঐতিহাসিক নাটক—'তারাবাঈ' (১৯০৩ খ্রী), 'রানা প্রতাপসিংহ' (১৯০৫ খ্রী), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬ খ্রী), 'নূরজাহান' (১৯০৮ খ্রী), 'সাজাহান' (১৯০৯ খ্রী), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১ খ্রী); ২. কাব্যনাট্য—'সীতা' (১৯০৮ খ্রী), 'ভীষ্ম' (১৯১৪ খ্রী); ৩. সামাজিক নাটক—'পরপারে' (১৯১২ খ্রী), 'বঙ্গনারী' (১৯১৬ খ্রী); ৪. প্রহসন—'পুনর্জন্ম' (১৯১১

খ্রী), ‘আনন্দ-বিদায়’ (১৯১২ খ্রী), ৫. রোম্যান্টিক ও পৌরাণিক নাটক—‘সোরাব-রুস্তম’ (১৯০৮ খ্রী); ‘সিংহল বিজয়’ (১৯১৬ খ্রী)। এই পর্যায়ে তিনি ‘আলেখ্য’ (১৯০৭ খ্রী) ও ‘ত্রিবেণী’ (১৯১২ খ্রী) এই দুইটি কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা প্রধানতঃ তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলির উপর নির্ভরশীল। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালীচিত্তের যে অভিনব জাগরণ ঘটিয়াছিল দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাকেই তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। ‘কালিদাস ও ভবভূতি’ তাঁহার সর্বাপেক্ষা সুবিদিত প্রবন্ধ।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল ‘পূর্ণিমা-মিলন’ নামক একটি সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেন। সম্মেলনটি স্বল্পায়ু হইলেও তৎকালীন সংস্কৃতিবান বাঙালীর একটি মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। শেষ জীবনে তিনি ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করেন, কিন্তু ইহার ১ম সংখ্যা (আষাঢ়, ১৩২০ বঙ্গাব্দ) প্রকাশের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

বলিষ্ঠতায় ও স্বাতন্ত্র্যে রবীন্দ্রযুগের বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশিষ্ট ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত।

দ্র দেবকুমার রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল, বরিশাল, ১৯২১; নবকৃষ্ণ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কলিকাতা, ১৯২৯; দিলীপকুমার রায়, উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, কলিকাতা, ১৯৪৫; রথীন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার, কলিকাতা, ১৯৬০।

রথীন্দ্রনাথ রায়

বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে গীতিকার ও সুরকাররূপে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। সংগীত সৃষ্টিতে তাঁহার দ্বিবিধ সত্তা প্রকাশ পাইয়াছে। একদিকে তিনি ভারতীয় রাগসংগীতের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন, অপরপক্ষে ইওরোপীয় সংগীতের গতিতরঙ্গ (মুভ্‌মেন্ট্‌স) প্রয়োগ করিয়া তিনি বাংলা গানে অভিনবত্ব সঞ্চার করিয়াছেন।

কাব্যসংগীতে দ্বিজেন্দ্রলাল বিভিন্ন রাগের ভিত্তিতে ও আদর্শে সুর সংযোজনা করেন, যেমন—‘নীল আকাশের অসীম ছেয়ে’ (দেশ), ‘প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে’ (জয়জয়ন্তী), ‘তোমারেই ভালবেসেছি আমি’ (দরবারী কানাড়া), ‘মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে’ (নটমল্লার) ইত্যাদি।

রাগসংগীতের ধ্রুপদ ও খেয়াল অঙ্গের ঐতিহ্যে তাঁহার কাব্যসংগীত গভীরভাবে প্রভাবিত। তাই সেখানে চটুলতার পরিবর্তে গম্ভীর ভাবরসের প্রাধান্য। ঠুংরির ভঙ্গিমা তিনি গ্রহণ করেন নাই। বাউল, ভাটিয়ালি ইত্যাদি বাংলার সহজিয়া লোকসংগীতের ধারাও তাঁহার সংগীতে অনুপস্থিত। কীর্তনাঙ্গের স্বল্প নিদর্শন আছে। তাঁহার রাগসংগীতের সংস্কার উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত। তাঁহার পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় শিক্ষিতপটু ও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার সৃষ্ট সাংগীতিক পরিবেশে আবাল্য বর্ধিত হইয়াছিলেন। একথা স্বরচিত অসম্পূর্ণ আত্মজীবনীতে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ টপ-খেয়াল গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহিত আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বসূত্রে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার ফলেও দ্বিজেন্দ্রলাল রাগসংগীতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অতিশয় জনপ্রিয় স্বদেশী ও চারণ গীতিগুলিকেও দ্বিজেন্দ্রলাল কেদারা, ইমন, দেশ, হাম্বির, ঝিঁঝিট, ইমনকল্যাণ প্রভৃতি রাগের ঠাটে গঠিত করেন; যেমন—‘ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’ (কেদারা), ‘যেদিন সুনীল জলধি হইতে’ (ভূপ-কল্যাণ), ‘মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়’ (ইমনকল্যাণ) ইত্যাদি। অবশ্য তাঁহার এই শ্রেণীর উন্মাদনাসৃষ্টিকারী গানগুলি গাহিবার ভঙ্গী ও স্বরক্ষেপণের ধরন ইওরোপীয় সংগীতের অনুকৃতি। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি ইওরোপীয় সংগীতের যে চর্চা করেন, তাঁহার স্বদেশী ও চারণ গীতাবলীর বহিরঙ্গ-গঠনে তাহার প্রভাব রহিয়াছে।

স্বরচিত হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী, স্কচ ইত্যাদি সুরের অনুকরণ করিয়াছেন। ‘বলি ত হাসব না’ প্রভৃতি গানের সাংগীতিক গঠনভঙ্গীতে তাহা পরিস্ফুট। তাঁহার হাসির গানগুলি রঙ্গ, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের বিষয়বস্তুর জন্য বিখ্যাত ও লোকপ্রিয় হইয়াছিল, তবে তাহাদের সাংগীতিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর। বাংলার গীতিকারদের মধ্যে হাসির গান রচনার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের দান সর্বাধিক।

বাংলার সংগীতক্ষেত্রে সমবেত কণ্ঠে গীত বা সম্মেলক সংগীতের যে ধারার তিনি প্রবর্তন করেন, তাহা তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়া তোলে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত গীতাবলীর মোট সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৪০০।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ গুপ্তবীজী দ্র

দ্বীপ, দ্বীপমালা চতুর্দিকে জলবেষ্টিত ভূখণ্ডকে দ্বীপ বলে। মহাদেশের মহীসোপানে অবস্থিত নিকটবর্তী মহাদেশের

সহিত ভৌগোলিক সাদৃশ্যে গঠিত মহাদেশীয় দ্বীপ সেই মহাদেশেরই বিচ্ছিন্ন অংশস্বরূপ। সমুদ্রস্থিত মগ্ন মালভূমির উন্নততর অংশ, সমুদ্রতলস্থ ক্রমবর্ধমান আগ্নেয়গিরি এবং প্রবালকীট দ্বারাও দ্বীপের সৃষ্টি হয়। দ্বীপপুঞ্জের সারিবদ্ধ বিন্যাসে দ্বীপমালার সৃষ্টি। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সারিবদ্ধ অর্ধচন্দ্রাকৃতি দ্বীপমালার (আইল্যাণ্ড ফেস্টুন) উৎপত্তি সম্বন্ধে সমধিক প্রচলিত মতানুসারে প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টন করিয়া সমুদ্রতলদেশে যে আগ্নেয়গিরিসমৃদ্ধ ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণী রহিয়াছে, এইসব দ্বীপমালা তাহারই উচ্চ অংশ। কখনও বা পর্বতশ্রেণী স্থলভাগ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রমধ্যে বিস্তৃত হয়; তাহারও উচ্চতর অংশ দ্বীপমালার ন্যায় শোভা পায়। এতদ্ব্যতীত প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ কখনও বৃত্তাকারে কখনও বা কোনও দ্বীপের একাংশ অথবা চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া প্রবাল দ্বীপমালার সৃষ্টি করে।

সাবিত্রী মুখোপাধ্যায়

দ্বৈতবাদ দার্শনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা জীব এবং ঈশ্বরকে পৃথক বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের মতকেই সাধারণতঃ দ্বৈতবাদ বলা হয়। ন্যায়সূত্রকার গোতমের মতে ঈশ্বর বা পরমাত্মা এবং জীব বা জীবাত্মা উভয়েই নিত্য এবং বিভু। তাঁহাদের মধ্যে পরমাত্মা সর্বজ্ঞ এবং এক; কিন্তু জীবাত্মা অল্পজ্ঞ, দেহে দেহে ভিন্ন এবং সংখ্যায় বহু। এই মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ইহা একপ্রকার দ্বৈতবাদ। যদিও অদ্বৈতবাদী ভিন্ন অপর সকলেই জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন তথাপি গোতম ও মধ্বাচার্য ব্যতীত অপর কেহ এই ভেদের গুরুত্ব প্রদর্শন করেন নাই। সাংখ্যেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহেন; কিন্তু তাঁহারাও দ্বৈতবাদী, কারণ তাঁহাদের মতে চরম তত্ত্ব দুইটি। তাঁহারা জীবাত্মাকে পুরুষ নামে এবং জড় জগতের মূল উপাদান কারণকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ অবশ্যস্বীকার্য।

মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবান বিষ্ণু বা শ্রীহরিই সর্বোত্তম তত্ত্ব এবং জগৎ সত্য; সুতরাং ভগবান, জীব ও জড়ের পরস্পরভেদ অবশ্যস্বীকার্য; জীবগণ স্বরূপতঃ শ্রীহরির অনুচর এবং তাহাদিগের মধ্যে যোগ্যতার তারতম্য বর্তমান; জীবের মুক্তি অর্থ তাহার স্বরূপানুগত সুখের অনুভূতি; অহৈতুকী ভক্তিই মুক্তির সাধন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত হইলেও একমাত্র শ্রুতি হইতেই শ্রীহরির তত্ত্ব জানা যায়। মধ্বাচার্য বলেন যে, ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদজ্ঞাপন শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবাক্যের প্রকৃত অর্থ 'তস্য ত্বং অসি' অর্থাৎ 'তুমি তাঁহার'। জীব ব্রহ্মের নিয়ত সেবক, সহচর ও অনুচর এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর স্বতন্ত্র, জীব অস্বতন্ত্র। ব্রহ্ম সর্বতোভাবে স্বাধীন, জীব তাঁহার অধীন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, 'ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এই বাক্যের অন্তর্গত 'এক' শব্দের অর্থ 'একমাত্র'। সুতরাং ব্রহ্মের সংখ্যা একাধিক নহে ইহাই বুঝিতে হইবে। 'এব' শব্দের তাৎপর্য এই যে, একত্ব ব্রহ্মের স্বভাবগত। ব্রহ্ম নিত্য একত্বযুক্ত বলিয়া স্বরূপতঃ অনেক বা বহু হইতে পারেন না। তাঁহাকে 'অদ্বিতীয়' আখ্যা দেওয়ার কারণ এই যে, তিনি তাঁহার সৃষ্ট বস্তুসমূহ হইতে পৃথক। ব্রহ্মই প্রথম বস্তু। তাঁহার সৃষ্ট জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় বস্তু হইতে ভিন্নরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। শ্রুতিতে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, এক ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে সকল বস্তুরই জ্ঞানলাভ হয়। মধ্বাচার্যের মতে সকল বস্তুর সহিত ব্রহ্মের অভেদস্থাপন এইপ্রকার শ্রুতির লক্ষ্য নহে। কোনও গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে জানিতে পারিলেই যেমন সেই গ্রামটিকে জানা হয়, পিতাকে জানিলেই যেমন পুত্রকে জানা হয়, সেইরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বা ব্রহ্মকে জানিলে অপরাপর বস্তু জানা হইয়া থাকে। ইহাই এই প্রকার শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য। মধ্বাচার্য বলেন যে, সর্বদোষরহিত, নিত্য স্বতন্ত্র এবং অশেষ সদ্‌গুণের আশ্রয় বিষ্ণু বা শ্রীহরিই ব্রহ্ম। রাজা যেমন ভৃত্যের সেব্য, সেইরূপ বিষ্ণুই জীবের একমাত্র সেব্য। ব্রহ্ম সেব্য, জীব তাঁহার সেবক। জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদচিন্তন অর্থাৎ জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা অপরাধজনক। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ ইহা নহে যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ; জীব ও ব্রহ্মের অভেদস্থাপন এই বাক্যের অভিপ্রেত নহে। এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মের ন্যায় সর্বজ্ঞত্বাদি-গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন। শ্রুতিতে মায়া শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। মধ্বমতে মায়া অদ্বৈতবাদীর কল্পিত অবিদ্যার তুল্য নহে। মায়া, অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনী, প্রকৃতি ও বাসনা এই ছয়টি শব্দ ভগবানের ইচ্ছামাত্র বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। মধ্বমতে বিশ্বপ্রপঞ্চ মিথ্যা নহে। প্রপঞ্চ শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট পঞ্চভেদ; জীবের সহিত পরমেশ্বরের, জড়ের সহিত পরমেশ্বরের, জড়ের সহিত জীবের, জীবের সহিত জীবের এবং জড়ের সহিত জড়ের ভেদ সত্য এবং নিত্য-

সিদ্ধ। মোক্ষই একমাত্র স্থায়ী পুরুষার্থ। ইহা পরমেশ্বরের প্রসন্নতানাপেক্ষ। মোক্ষলাভ করিতে হইলে সেবা ও সেবকের পার্থক্যবোধ এবং বিষ্ণুর পরমোৎকর্ষের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক।

দ্র মধ্বাচার্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও অনুব্যাখ্যান ; K. Narayana, *Outline of Madhva Philosophy*, Allahabad, 1962.

সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ যাঁহারা বলেন যে জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদ এবং অভেদ উভয়ই সত্য, তাঁহাদের মতবাদের নাম দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। ভাস্করাচার্য এবং নিম্বার্কাচার্য উভয়েই জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদ এবং অভেদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ভাস্করমতে ভেদ স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক ; অভেদ স্বাভাবিক এবং চিরস্থায়ী। নিম্বার্কমতে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই স্বাভাবিক, নিত্য এবং সমভাবে সত্য। এইজন্য নিম্বার্কের মতকেই প্রকৃত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলা হয়। এই মতে ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, সগুণ ; ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিলে বুঝিতে হইবে যে তিনি হেয়গুণরহিত। ব্রহ্ম নিত্য, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ। তিনি একাধারে বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। ব্রহ্ম, চিৎ এবং অচিৎ—এই তিনটি তত্ত্বই নিত্য। ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ প্রদর্শন করিতে গিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলেন যে, ব্রহ্ম কারণ ; জীব ও জগৎ কার্য। ব্রহ্ম শক্তিমান ; জীব ও জগৎ তাঁহার শক্তি। ব্রহ্ম সমগ্রসত্তা। ব্রহ্ম অংশী ; জীব ও জগৎ তাঁহার অতি ক্ষুদ্র অংশ। ব্রহ্ম ধ্যেয়, জ্ঞেয় ও প্রাপ্তব্য ; জীব ধ্যাতা, জ্ঞাতা ও প্রাপক। ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা, সর্বব্যাপী এবং সর্বতোভাবে স্বাধীন ; জীব সৃষ্ট্যাদিশক্তি-হীন, অণুপরিমাণ এবং পরাধীন। শুধু বদ্ধ জীবই নহে, মুক্ত জীবও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। জগৎ অচেতন, জড়, স্থূল, অশুদ্ধ ও কার্যরূপ বলিয়া স্বভাবতঃ ব্রহ্ম হইতে পৃথক। ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের স্বাভাবিক অভেদ প্রদর্শন করিতে গিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলেন যে, কার্যলীনরূপে কারণ কার্য হইতে অভিন্ন এবং কারণসত্তাময় বলিয়া কার্য কারণ হইতে অভিন্ন। যেমন মৃৎপিণ্ডরূপ কারণটি মৃন্ময়ঘটরূপ কার্য-ব্যতিরিক্ত অন্যান্য কার্যেরও জনক বলিয়া মৃন্ময়ঘট হইতে ভিন্ন, কিন্তু মৃৎপিণ্ড মৃন্ময়ঘটে লীন বলিয়া মৃৎপিণ্ড ও মৃন্ময়ঘট অভিন্ন, সেইরূপ ব্রহ্ম কার্যাতিরিক্তরূপে জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন এবং জগল্লীনরূপে জীব ও জগৎ হইতে অভিন্ন। যেমন মৃন্ময়ঘট আকারে ও উপযোগিতায় মৃৎপিণ্ড হইতে ভিন্ন হইলেও মৃদাত্মক ও মৃদাশ্রয়ী বলিয়া মৃৎপিণ্ডের সহিত অভিন্ন, সেইরূপ জীব ও জগৎ গুণতঃ ও কার্যতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও ব্রহ্মাত্মক ও ব্রহ্মাশ্রয়ী বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। জীব ও জগতের পরতন্ত্র-সত্তার ভাব এবং স্বতন্ত্রসত্তার অভাবই দ্বৈতাদ্বৈতবাদের ভিত্তি।

দ্র সন্তদাস বাবাজী, বেদান্ত-দর্শন, দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত (নিম্বার্কাচার্যের ভাষ্যসহ), কলিকাতা, ১৯৩২ খ্রী ; Roma Bose, *Vedanta-Parijat-Saurava of Nimbarka and Vedanta-Kaustuva of Srinivasa*, Calcutta, 1940 ; Umesh Mishra, *Nimbarka School of Vedanta*, Darbhanga, 1966.

সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

দ্বৈপায়ন বেদব্যাস দ্র

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৩৬ খ্রী) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক। পিতা তমলুকের আইন-ব্যবসায়ী কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়, অগ্রজ বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ধনগোপালের অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাই ব্রাদার্স ফেস' এই অগ্রজেরই কথা। স্কুলশিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯০৯ (১৯০৮ ?) খ্রীষ্টাব্দে ধনগোপাল যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য জাপান যাত্রা করেন এবং কিছুকাল পরে আমেরিকায় আসেন। এক মার্কিন রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি স্থায়ীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করিতে থাকেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'গে নেক' (চিত্রগ্রীব) গ্রন্থটির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন' তাঁহাকে জন নিউবেরী মেডাল পুরস্কার দেয়।

দূরচারী কল্পনা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং যথার্থ অধ্যাত্ম অনুরাগের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আদর্শের সম্মেলনে সম-সাময়িক ভারতীয় মানসের অন্যতম সার্থক নিদর্শন ধনগোপালের রচনাবলী। পূর্বোল্লিখিত বই দুইটি ছাড়া তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে আত্মজীবনীমূলক 'কাস্ট অ্যাণ্ড আউট্‌কাস্ট' (১৯২৩ খ্রী), মিস মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া'-র যোগ্য প্রত্যুত্তর 'এ সন অফ মাদার ইণ্ডিয়া আন্‌সার্‌স' (১৯২৮ খ্রী), গীতা ও উপনিষদের বাণীসংকলন 'ডিভো-শনাল প্যাসেজেস অফ দি হিন্দু বাইব্‌ল' (১৯২৯ খ্রী), শিশু-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'দি চীফ অফ দি হার্ড' (১৯২৯ খ্রী), শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী 'দি ফেস অফ সাইলেন্‌স' (১৯৩০ খ্রী) প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনীষী রোমাঁ রোলাঁ এই জীবনীপাঠেই তাঁহার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনী রচনায় প্রভাবিত হন। সাময়িক

মানসিক অবসাদে বিদেশেই আত্মহত্যায় তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

ধনতন্ত্র পুঁজিতন্ত্র বা পুঁজিবাদ; ইংরেজীতে বলা হয় 'ক্যাপিট্যালিজ্‌ম'। নামটি কার্ল মার্ক্‌স উদ্ভাবন না করিলেও চালু করিয়াছেন। মূলতঃ ইহা এক বিশেষ-প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ইহাতে উৎপাদন ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে বেসরকারিভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার এবং ব্যক্তিগত লাভের প্রেরণায় পণ্যোৎপাদন, এই দুইটি ইহার প্রধান লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ক্রেডিট বা ঋণের ব্যবহার ও উন্নততর কৃৎকলার অবলম্বন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মার্ক্‌সীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ধনতন্ত্রের সারমর্ম হইল উৎপাদনকার্যে সম্পত্তিশালী বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক সম্পত্তিহীন মজুরশ্রেণীর নিয়োগ।

আগ্রাহিতা (অ্যাকুইজিটিভনেস), প্রতিযোগিতা এবং অর্থনৈতিক যুক্তিময়তা (ইকনমিক র‍্যাশন্যালিটি), এই তিনটিকে হেবর্নার সোম্বার্ট ধনতন্ত্রের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলিয়াছেন। কার্ল মার্ক্‌সের মতে পুঁজির তথা পুঁজিগত সম্পত্তির অবিরাম বৃদ্ধিসাধন ধনতন্ত্রের আবশ্যিক ও অনতিক্রম্য বিধি। আগ্রাহিতা ও প্রতিযোগিতা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অবিরত প্রসারকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলে। স্বকীয় ব্যয়হ্রাসের জন্য উদ্যোক্তাশ্রেণী কর্তৃক নিত্য নবতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৃৎকলা অবলম্বিত হয়। অর্থের মানদণ্ডে নির্ভুলভাবে হিসাব করিয়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী আগাগোড়া যুক্তিযুক্তভাবে পরিকল্পিত হয়। সামগ্রিকভাবে কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অপরিকল্পিত। তাহা মূল্যযন্ত্রের (প্রাইস মেকানিজ্‌ম্) দ্বারা চালিত। ধনতন্ত্রে উৎপাদনশক্তির বিপুল বিকাশ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দশসালা বাণিজ্যচক্রে (ট্রেড সাইক্‌ল) এবং ৪৫ বৎসর অন্তর অন্তর দীর্ঘ তরঙ্গে (লং ওয়েভ) আবর্তিত হইয়া ঘটিয়াছে।

ক্রুসেড যুদ্ধের পর ইওরোপে উত্তর ইটালী, ফ্লাণ্ডার্স প্রভৃতি অঞ্চলের মুক্ত, সার্বভৌম শহরগুলিতেই ধনতন্ত্রের প্রথম সূত্রপাত ঘটে। আমেরিকা আবিষ্কার ও ভারতে যাওয়ার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের পর খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকেই ধনতন্ত্রের যুগ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়। ইওরোপে কৃষি ও শিল্পে ধনতন্ত্রের বিকাশের মূলে বহু কারণ বিদ্যমান ছিল, যথা—ম্যানরীয়-প্রথার ও ভূমিদাসত্বের ক্ষয়প্রাপ্তি, অর্থের ও বিলাসদ্রব্যের জন্য সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের ও অস্ত্রসজ্জার জন্য রাষ্ট্রের চাহিদাবৃদ্ধি, আমেরিকার ভূখণ্ড হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিপুল আমদানি, জমি হইতে কৃষকদের উৎসাদন (এনক্লোজার অ্যাক্ট), শহরের কারুজীবী গিল্ডগুলির অবক্ষয় এবং 'গিল্ড-মাস্টার'দের মালিকশ্রেণীতে ও 'জার্নিম্যান' ও শিক্ষানবিশদের মজুরে রূপান্তর, বণিক গিল্ডগুলির বিকাশ ও ক্ষমতাবৃদ্ধি; ক্ষুদ্রাকার ও গার্হস্থ্য শিল্পের উপর বণিকদের প্রভুত্ব বিস্তার, ক্রমবর্ধমান পণ্যোৎপাদনের উপযোগী দেশীয় ও বিদেশী বাজারের সৃষ্টি, রিফর্মেশন আন্দোলন ইত্যাদি।

প্রথমে দেখা গিয়াছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ভিত্তিতে স্থাপিত বাণিজ্যবাদী ধনতন্ত্র (মার্-ক্যান্টাইলিজ্‌ম)। ইহার স্থাপনে বণিক-অভিযাত্রীদের একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্পসংরক্ষণ নীতির অবলম্বন, ঔপনিবেশিক প্রসার, একচ্ছত্র রাজগণ কর্তৃক বণিকগণকে ও বণিক-কোম্পানিগুলিকে বিশেষ অধিকার ও একচেটিয়া অধিকার দান এবং অনুকূল বাণিজ্য-ব্যালেন্সের স্পৃহা ছিল ইহার বৈশিষ্ট্য। ১৭শ শতকে হল্যাণ্ডই ছিল অগ্রণী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৮শ শতকে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স প্রধান ধনতান্ত্রিক শক্তি হইয়া ওঠে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে যে কৃষিবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব সাধিত হয় তাহাই শিল্পগত ধনতন্ত্রের জন্ম দেয়। এই সময় হইতেই আধুনিক ধনতন্ত্রের প্রকৃত আরম্ভ। উৎপাদনের ক্ষেত্রে আসিল মেশিনের ব্যবহার ও ফ্যাক্টরি প্রথা। নেপোলিয়নের যুদ্ধকাল হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ইহার দ্রুত বিকাশ ঘটে। ইংল্যাণ্ডই ছিল ইহার কেন্দ্রস্থল এবং তাহার প্রাধান্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত চলিতে থাকে। জার্মানীতে ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন ঘটে ১৯শ শতকের শেষার্ধে এবং জাপানে মেইজি রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার (১৮৬৮ খ্রী) পরে। এই শতকে বাষ্পীয় শক্তি ও ইস্পাতের ভিত্তিতে এক দ্বিতীয় কৃষিবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব ঘটে।

এই যুগে ধনতন্ত্রের প্রধান বুলিগুলি ছিল শিল্পবাণিজ্যের ব্যাপারে রাষ্ট্রের অ-হস্তক্ষেপ (লেসে ফেয়ার), অবাধ প্রতিযোগিতা, অবাধ বাণিজ্য, সুস্থ মুদ্রাব্যবস্থা অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান, উপনিবেশবাদের বিরোধিতা ও আন্তর্জাতিক শান্তি। রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইহার নীতি ছিল শুধুমাত্র আয়ের জন্য করস্থাপন, সমীকৃত (ব্যালেন্‌স্‌ড) বাজেট, জাতীয় ঋণের হ্রস্বীকরণ ও দ্রুত পরিশোধ ইত্যাদি। 'লেসে ফেয়ার' বুলি সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডে ১৯শ শতাব্দীই ছিল ফ্যাক্টরি আইন, ট্রেড ইউনিয়ন

ধনতন্ত্র

আইন ও স্বাস্থ্য আইন প্রবর্তনের যুগ। অর্থনৈতিক জীবনের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীতেই ঘটে।

১৮৭৩-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সুদীর্ঘ মন্দার ফলে ধনতন্ত্রের এক চারিত্রিক রূপান্তর সাধিত হয়। প্রতিযোগিতার স্থলে দেখা দেয় একচেটিয়াত্ব ও জোটবদ্ধতার (ট্রাস্ট, কার্টেল ইত্যাদি) প্রবণতা। ফাইন্যান্স্ পুঁজি অত্যন্ত প্রভাবশালী হয় ও উপনিবেশবাদ প্রবল হইয়া ওঠে। পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়ার জন্য বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। বিদেশে জিনিস বিক্রয়ের বাজার ও পুঁজি রপ্তানির ক্ষেত্র করায়ত্ত করা, অনুন্নত দেশের সস্তা শ্রম নিযুক্ত করিয়া অতি-মুনাফা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা—এই সকল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য উপনিবেশবাদের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। নব পর্যায়ের ধনতন্ত্রকে নাম দেওয়া হয় 'ফাইন্যান্শিয়াল ক্যাপিট্যালিজ্ম' অথবা একচেটিয়া ধনতন্ত্র। হব্সন, হিল্ফার্ডিং, লেনিন, ত্রৎস্কি প্রমুখ মনস্বীরা ইহার নাম দিয়াছেন সাম্রাজ্যবাদ। এই যুগে সমগ্র পৃথিবী ধনতন্ত্রের আওতায় আসে, উদ্ভূত হয় বিশ্ব ধনতন্ত্র। উপনিবেশগুলি হইয়া পড়ে রাজধানীস্বরূপ উন্নত দেশগুলির উপগ্রহ। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতেও ধনতন্ত্রের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং কোথাও কোথাও (যেমন ভারতে) তাহা বেশ একটু প্রসার লাভ করে।

ধনতন্ত্র ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এক অসামান্য সমৃদ্ধির যুগে প্রবেশ করে। বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক, অটোমোবাইল ও রবার শিল্পের বিকাশ এক তৃতীয় শিল্পবিপ্লব সাধিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইয়া ওঠে জগতের সর্বপ্রধান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯২৩-২৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল সমৃদ্ধির পর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে দেখা দেয় ধনতন্ত্রের জাগতিক সংকট এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিতে থাকে মহামন্দা (গ্রেট ডিপ্রেশন)। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যাপক বেকারত্ব, অলস যন্ত্রসজ্জা ও জাতীয় উৎপাদনের সুতীব্র হ্রাস দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে দেখা দেয় কৃষিজ পণ্যের ও কাঁচামালের সর্বনাশা মূল্যহ্রাস। এই দশকের ধনতন্ত্রে পূর্বেকার বাণিজ্যবাদী ধনতন্ত্রের বহু লক্ষণ পুনরায় অত্যন্ত প্রকট হইয়া ওঠে। আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান ধ্বংস হইয়া যায়, প্রতি রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থা, জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধপ্রস্তুতি প্রবল হইয়া ওঠে, রপ্তানি-বৃদ্ধি ও আমদানি সংকোচের দ্বারা প্রতিটি জাতি 'অপরাপর জাতির মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া' নিজ দেশের সমৃদ্ধিসাধনের ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির চেষ্টা করে। মহামন্দা অর্থনৈতিক চিন্তার জগতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়াছিল। কেইন্স বলিলেন, অতি-পরিপক্ক ধনতন্ত্রে লগ্নীকরণের সুযোগ হ্রাস পাইয়াছে, সঞ্চয়ের আধিক্যই মন্দার মূল কারণ, পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য চাই রাষ্ট্রীয় ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা প্ররোচিত ভোগপ্রবৃত্তির বৃদ্ধি। পূর্ণ কর্মসংস্থান হইয়া ওঠে অর্থনীতিবিদদের মূল স্লোগান। রাষ্ট্রীয় ব্যয়বাহুল্য ও ঘাটতি বাজেট তিরস্কৃত হওয়ার পরিবর্তে প্রশংসিত হইতে থাকে। 'লেসে ফেয়ার' সম্পূর্ণ মর্যাদাহীন হইয়া পড়ে। অর্থনৈতিক জীবনের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক যোজনার সপক্ষে জনমত প্রবল হইয়া ওঠে। এক নূতন 'লিবার‍্যালিজ্ম' প্রবর্তিত হয় যাহা সমাজতন্ত্রের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করে এবং যাহার প্রধান স্লোগান হয় জনকল্যাণ রাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রাংক্লিন রুজ্ভেল্টের 'নব বিধান' (নিউ ডিল) বৃহৎ ব্যবসায়ীদের রাষ্ট্রীয় শাসনাধীনে আনার চেষ্টা করে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দ্বারা দেশের পুনরুন্নয়নের প্রয়াস করে এবং সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুরক্ষিত করিয়া তাহাকে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের বিপক্ষে একটি 'প্রতিরোধী শক্তি' (কাউন্টারভেলিং পাওয়ার)-রূপে গড়িয়া ওঠায় সহায়তা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তে ধনতন্ত্রের সম্বল ও শক্তিসামর্থ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অত্যধিক ভাবে কেন্দ্রীভূত হয়। ডলারই হইয়া পড়ে ধনতান্ত্রিক জগতের বিশ্বমুদ্রা। এই যুগে ধনতন্ত্র পূর্বেকার অতি-জাতীয়তাবাদী মনোভাব ত্যাগ করিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ও সাহায্যের ভিত্তিতে নিজেকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করে। বহু আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা—আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বিশ্বব্যাঙ্ক, GATT, UNCTAD, ইওরোপের ৭টি দেশের বারোয়ারি বাজার (কমন মার্কেট) ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (ILO) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই স্থাপিত হইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপান, পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সের অতি দ্রুত আরোগ্যলাভ ও বিস্ময়কর অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এযুগের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেখা দেয় ভোগবৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় ব্যয়বৃদ্ধি, পূর্ণ এমন কি অতি পূর্ণ কর্মসংস্থান, অবিরাম মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি। এ যুগের ধনতন্ত্রকে বলা যায় রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র (স্টেট ক্যাপিট্যালিজ্ম) অথবা মার্ক্সবাদীদের ভাষায় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র (স্টেট মনোপলি ক্যাপিট্যালিজ্ম)। উন্নত দেশগুলি হইয়া উঠিয়াছে ধনী

সমাজ (অ্যাফ্লুয়েণ্ট সোসাইটি)। কম্পিউটার যন্ত্রের ব্যবহার ও অটোমেশনের ফলে ধনতন্ত্র 'সাইবারনেশন' বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করিয়াছে।

সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ২০শ শতকের ধনতন্ত্রে পূর্ব শতকের তুলনায় অনেক নূতন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুট হইয়াছে। ধনতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ে যেরূপ নির্মম শ্রমিকশোষণ চলিত—যথা, দিনে ১৬-১৭ ঘণ্টা কাজ এবং শিশু ও নারী -শ্রমের অবাধ নিয়োগ, তাহা আজ অতীত ইতিহাস। পূর্বেকার 'টাইকুন'দের যুগ গত হইয়াছে। উদ্যোক্তাদের (আঁত্রেপ্রেনেয়ার), কাজের পূর্ব গুরুত্ব আর নাই। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার কাজ আজকাল বেতনভোগী বিশেষজ্ঞ ও কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত। একটি পরিচালনাগত বিপ্লব (ম্যানেজেরিয়াল রেভলিউশন) ঘটিয়া গিয়াছে। যৌথ মূলধনী কোম্পানির প্রসার অসংখ্য বেতনভোগী ও মধ্যম আয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণকেও উৎপাদন-যন্ত্রের আংশিক মালিক করিয়া তুলিয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি ক্ষমতাশালী সামাজিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। উন্নত দেশগুলিতে উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বাস্থ্য-বীমা, বেকারত্ব-বীমা, বার্ধক্য-পেনশন প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা শ্রমিক-জীবনের পূর্বেকার অনিশ্চয়তা ও ভয়গ্রস্ততাকে বহুলাংশে দূর করিয়াছে।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সাইবারনেশন বিপ্লবের দ্রুত বিকাশে ধনতান্ত্রিক জগতে কর্মসংস্থানসমস্যা পুনরায় উগ্র হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বেসরকারি 'সেক্টর'-এ নূতন কর্মসৃষ্টির পরিমাণ অতি দ্রুতহারে হ্রাস পাইতেছে। সরকারি 'সেক্টর'-এ কর্মসৃষ্টির উপর ধনতন্ত্র ক্রমশঃ অধিকতর নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে। কর্মের (job) সহিত আয়ের যোগসূত্র অত্যাধুনিক ধনতন্ত্রের পক্ষে এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আয়সৃষ্টির কোনও নূতন বৈপ্লবিক নীতি অবলম্বন করা যায় কিনা এ বিষয়ে ধনতান্ত্রিক মনস্বীরা জল্পনাকল্পনা করিতেছেন।

দ্র J. A. Hobson, *Evolution of Modern Capitalism*, London, 1919 ; J. M. Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, New York, 1936 ; J. A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, London, 1944 ; J. K. Galbraith, *American Capitalism*, New York, 1952 ; Karl Marx, *Capital*, vol. I, Moscow, 1954 ; J. K. Galbraith, *Affluent Society*, London, 1958.

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

ধনশ্রী, ধনশিরি নদী। আসামে এই নামের দুইটি নদী আছে।

প্রথম ধনশিরি নদীটি নাগা পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্থিত হইয়া ডিমাপুরের নিকটে শিবসাগর জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং উত্তর-উত্তরপূর্বে গোলাঘাট পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার পর পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ২৯০ কিলোমিটার (১৮০ মাইল)। নদী-উপত্যকাটি উচ্চাংশে বেশ প্রশস্ত, কিন্তু নাগা ও মিকির পাহাড় অঞ্চলের মধ্যে সংকীর্ণ। গ্রীষ্মকালে গোলাঘাট পর্যন্ত প্রায় ৪ মেট্রিক টন ভারবাহী নৌকা যাতায়াত করিতে পারে ; বর্ষার সময়ে ডিমাপুর পর্যন্ত যাতায়াত করে। কিন্তু নদী-উপত্যকা জনসমাকীর্ণ না হওয়ার ফলে নদীটির ব্যবসায়িক গুরুত্ব কম।

দ্বিতীয় ধনশিরি নদীটি নীফা অঞ্চলের তাওয়াং প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া আসামের দরং জেলার উদলগুড়ির দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। নদীটি যে স্থানে পার্বত্যভূমি ত্যাগ করিয়া সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে, সেইস্থানে ভৈরবকুণ্ড নামে একটি সুগভীর কুণ্ড আছে। স্থানীয় জনগণ এই কুণ্ডের জলকে অতি পবিত্র মনে করে। নদীটি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পথ পরিবর্তন করিয়াছে। জলসেচ বা ব্যবসা-বাণিজ্যে নদীটির গুরুত্ব কম।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ধনসম্পদ যে সকল দ্রব্যের অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে এবং যাহা ব্যক্তি, শ্রেণী বা জাতির (অর্থাৎ রাষ্ট্রের) স্বত্বাধীন, তাহাদের সম্ভারকে বলা হয় ধনসম্পদ অথবা সম্পদ। হাওয়া, আলো, নদী, জলবায়ু প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যগুলিও উৎপাদনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে সত্য, কিন্তু তাহারা ধনসম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা তাহাদের কোনও অর্থনৈতিক তাৎপর্য নাই ; তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে হিসাব করিয়া চলিতে হয় না, তাহাদের পরিমাপ নাই, মূল্য নাই। কিন্তু ভূমি ও ভূগর্ভস্থ খনিজ দ্রব্যগুলি যদিও প্রকৃতিদত্ত, তথাপি তাহারা ধনসম্পদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় ; তাহারা অপ্রচুর, পরিমাপনীয় ও হস্তান্তরযোগ্য এবং তাহাদের মূল্য বা বাজারদর আছে।

মানুষের প্রতিভা, নৈতিক চরিত্র, শিক্ষা, কর্মদক্ষতা

ও শ্রমশীলতার উপর জাতীয় উৎপাদন বিশেষভাবে নির্ভর করে। কিন্তু এই সকল গুণাবলী মানুষের ভিতরে অবস্থান করে, ইহারা হস্তান্তরযোগ্য নহে, অতএব ধনসম্পদ নয়। সম্পদ মানুষের বহিঃস্থিত। যে সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত নাই সেখানে মানুষ নিজে সম্পদরূপে গণ্য নয়। জাতীয় ধনসম্পদের হিসাব হইতে দেশের শ্রমিকবাহিনীকে বাদ দেওয়া হয়।

মুদ্রা ব্যক্তির দিক হইতে সম্পদরূপে গণ্য, কিন্তু জাতির দিক হইতে নয়। ব্যক্তির দ্বারা ধৃত মুদ্রা জাতির অর্থনৈতিক দ্রব্যসম্ভারের উপর ব্যক্তির দাবিকে সূচিত করে। যাহার দাবি যত বেশি সে তত অধিকমাত্রায় ধনী এবং অপরে তত কম মাত্রায় ধনী। মোট মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণিত হইলে জাতির সকলে মিলিয়া দ্বিগুণ ধনী হইয়া উঠিতে পারে না। সিকিউরিটি বা ঋণপত্র খাতকের নিকট হইতে মহাজনের দাবি, অতএব তাহা মহাজনের সম্পদরূপে গণ্য। যাহা মহাজনের পাওনা তাহা খাতকের দেনা। মহাজন ও খাতক উভয়েই যদি জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে জাতীয় সম্পদ হিসাব করিবার বেলায় দেনা-পাওনায় কাটাকাটি হইয়া যায়। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ঋণপত্র (রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয়) জাতির সম্পদরূপে বিবেচ্য নয়। জাতীয় ধনসম্পদের হিসাবে অপরাপর দেশের নিকটে জাতির পাওনাকে যোগ ও দেনাকে বিয়োগ করিতে হয়।

সম্পদ ও আয়, এই দুই ধারণা পরস্পরসম্পর্কিত। সম্পদ বলিতে বোঝা যায় কোনও বিশেষ দিনে বা বিশেষ মুহূর্তে অবস্থিত দ্রব্যসম্ভার; কিন্তু আয় বলিতে বোঝায় এক নির্দিষ্ট কাল (যথা, এক মাস বা এক বৎসর) ব্যাপিয়া দ্রব্যের বা সেবার প্রবাহ। সম্পদ আয়ের উৎস; অবশ্য একমাত্র উৎস নয়। যে সকল ভোগ্য-দ্রব্য ক্ষণস্থায়ী, একবার ভোগ করিলেই নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহারা সম্পদ নয়। পোশাক, আসবাব, ঘড়ি, রেফ্রিজারেটার, মোটরগাড়ি প্রভৃতি দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য ব্যক্তির তথা জাতির সম্পদরূপে গণনীয়। তাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া একটু একটু করিয়া উচ্ছযোগরূপী বা সেবারূপী আয় বিকিরণ করে, যদিও এই আয়কে মুদ্রার মানদণ্ডে মাপ করা যায় না এবং জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হয় না। গৃহস্বামী কর্তৃক ব্যবহৃত বাসগৃহ অবশ্যই ধনসম্পদ এবং তাহার সম্ভাব্য ভাড়াকে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয়। যুদ্ধজাহাজ, বোমারু বিমানপোত প্রভৃতি স্থায়ী সামরিক দ্রব্য জাতীয় ধনসম্পদরূপে সচরাচর পরিগণিত হয়, যদিও জাতীয় সম্পদকে এক বিশেষ সংজ্ঞা দান করিয়া এইগুলিকে তাহা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

কপিরাইট, পেটেন্ট, গুড্‌উইল (ব্যবসায়ের সুনাম) প্রভৃতি অ-শারীর, অবাস্তব সম্পত্তি ব্যক্তির বা ব্যবসায়-সংঘের সম্পদরূপে বিবেচিত হয়। ইহারা জাতীয় সম্পদ-রূপে গণ্য হইতে পারে, তবে জাতীয় ধনসম্পদের হিসাবে শুধু শারীর ও বাস্তব দ্রব্যসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করাই সাধারণ রীতি। কোম্পানির শেয়ার সম্পত্তির নিদর্শনপত্র; ইহা ব্যক্তিগত সম্পদ, জাতীয় সম্পদ নয়। দুর্লভ চিত্র, পুরাতন পুস্তক ও পুঁথি প্রভৃতি মূল্যবান অ-পুনরুৎপাদনীয় দ্রব্য জাতীয় সম্পদের অঙ্গীভূত। ভারতের ধনসম্পদের হিসাবে তাজমহল ও কণারক অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হইবে না; ইহারা 'অমূল্য' বলিয়া সকল হিসাবনিকাশের ঊর্ধ্বে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, দুর্লভ চিত্রাদি বাদ দিলে বাস্তব ভাণ্ডাররূপে জাতীয় ধনসম্পদ নিম্নলিখিত শ্রেণীর উপাদানগুলি লইয়া রচিত: ১. জমি (কৃষি, কারখানা-নির্মাণ, বাসগৃহনির্মাণ প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত) ২. ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ ৩. জমির সহিত সংশ্লিষ্ট নানা নির্মাণকার্য (বসতবাড়ি, কারখানা, রাস্তা, সেতু ইত্যাদি) ৪. স্থায়ী উৎপাদনসজ্জা (যথা যন্ত্র, হাতিয়ার, রোলিং স্টক) ৫. উৎপাদকদের (বণিকগণ এই পর্যায়ভুক্ত) হাতে অবস্থিত দ্রব্যভাণ্ডার ('ইন্‌ভেন্টরি') ৬. ভোক্তাদের হাতে অবস্থিত দ্রব্যভাণ্ডার (যথা গাড়ি, আসবাব প্রভৃতি) ৭. স্থায়ী সামরিক দ্রব্য (যথা ট্যাংক, বোমারু বিমানপোত ইত্যাদি, দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয়) ৮. বিদেশের নিকটে দেনা অপেক্ষা পাওনার আধিক্য। প্রতিটি দফার অন্তর্গত সমস্ত দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করিয়া মূল্যগুলিকে যোগ করিলে যোগ-ফলটি হইবে এক বিশেষ মুহূর্তে জাতির মোট ধনসম্পদ (মূল্যে প্রকাশিত)।

উপরের পদ্ধতিকে বলা যাইতে পারে ভাণ্ডারনির্ণয় পদ্ধতি। ইহা জাতীয় সম্পদের বণ্টনের উপর আলোক-পাত করে না। দাবিনির্ণয় পদ্ধতির দ্বারা জাতীয় ধনসম্পদ হিসাব করিলে কোন কোন শ্রেণী জাতীয় সম্পদের কি কি অংশের স্বত্বাধিকারী তাহা জানা যায়।

পাশ্চাত্য দেশে জাতীয় ধনসম্পদের মূল্যনির্ণয় ও বণ্টন সম্বন্ধে গত ২০০-২৫০ বৎসর ধরিয়া বেসরকারি ভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীতে ইওরোপ ও আমেরিকায় জাতীয় ধনসম্পদ নির্ণয়ের যেরূপ ব্যাপক বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান পরিচালিত হইয়াছে, ভারতে সেরূপ কিছু হয় নাই। তবে এ বিষয়ে ভারতে যে সকল

গবেষণাকার্য হইয়াছে তাহা হইতে ভারতের জাতীয় সম্পদ ও তাহার বণ্টন-সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। ভারতে পুনরুৎপাদনীয় বাস্তব ধনসম্পদের পরিমাণ ছিল ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ১৭০৮৬ কোটি টাকা এবং ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৩২১৬৪ কোটি টাকা। জাতীয় ধনসম্পদে গৃহস্থালী ক্ষেত্র, বেসরকারি সংঘবদ্ধ ক্ষেত্র এবং সরকারি ক্ষেত্র, এই তিন ক্ষেত্রের শতকরা অংশ ছিল ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে ৭১, ১২ ও ১৭ এবং ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে ৬০, ১৫ ও ২৫।

ভারতে জমিধারণের বণ্টন এইরূপ: ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গৃহস্থালীর উপরিতম ১ শতাংশের হাতে ছিল মোট জমির শতকরা ১৭ ভাগ, উপরিতম ৫ শতাংশের হাতে ছিল মোট জমির শতকরা ৪১ ভাগ ও উপরিতম ১৬ শতাংশের হাতে ছিল মোট জমির শতকরা ৫৬ ভাগ; ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে অনুপাতগুলি প্রায় সমানই থাকে। নিম্নতম ২০ শতাংশ গৃহস্থালী সম্পূর্ণ জমিহীন।

ভারতের পুনরুৎপাদনীয় বাস্তব ধনসম্পদ

ধনসম্পদ	পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
	১৯৪৯-৫০ খ্রী	১৯৬০-৬১ খ্রী
কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি	৫২৩৬	৮৭৮৩
খনি ও বৃহৎ শিল্প	১৮১৬	৫৬৪২
ক্ষুদ্র শিল্প	৭৬৩	১২০০
পরিবহণ ও যোগাযোগ	২৩৮৭	৪২১৮
সরকারি প্রশাসনে বিনিয়োগ	৭০৭	১৮১০
ব্যবসায় ও বাণিজ্য	১৭৭২	৩৩৯৮
গৃহ সম্পত্তি	৪৪০৫	৭১১৩
মোট	১৭০৮৬	৩২১৬৪

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে শহরে পরিবারগুলির শতকরা ৪০টি নিজ বাসগৃহে বাস করিত। গৃহস্বামী কর্তৃক ব্যবহৃত বাসগৃহ সম্পত্তির বণ্টন ছিল এইরূপ: উপরিতম ১০ শতাংশ পরিবারের হাতে ছিল উক্ত সম্পত্তির শতকরা ৫৭ ভাগ এবং উপরিতম ২০ শতাংশ পরিবারের হাতে ছিল শতকরা ৭৩ ভাগ; নিম্নতম ১০ শতাংশ পরিবারের হাতে ছিল ১ শতাংশেরও কম।

শেয়ারসম্পত্তির বণ্টন ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে ছিল এইরূপ: ভারতের মোট গৃহস্থালীর ১ শতাংশের উপরিতম এক-দশমাংশের হাতে ছিল মোট ব্যক্তিগত শেয়ার-সম্পদের অর্ধাংশ।

দ্র A. Marshall, *Principles of Economics*, London, 1890; *Estimates of Tangible Wealth in India: Reserve Bank of India Bulletin*, Bombay, 1963; Government of India, *Report of the Committee on Distribution of Income and Levels of Living*, Delhi, 1964.

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

ধনুষ্কোটি (৯°১২′ উত্তর ও ৭৯°২৫′ পূর্ব) মাদ্রাজ রাজ্যের রামনাথপুরম জেলায় অবস্থিত একটি বন্দর ও দক্ষিণ রেলপথের একটি প্রান্ত স্টেশন। ইহা পাম্‌বান দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। মাদ্রাজ ও মাদুরা হইতে ইহার দূরত্ব যথাক্রমে ৬৮০ কিলোমিটার ও ১৮৯ কিলোমিটার। পাম্‌বান হইতে ধনুষ্কোটি পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার (১৬ মাইল) দীর্ঘ একটি রেলপথ বিদ্যমান। এই রেলপথের দুই দিকে সমুদ্র। ধনুষ্কোটি হইতে জাহাজ আদম ব্রিজ পার হইয়া সিংহলের তালাই-মান্নারে নিয়মিত যাতায়াত করে।

ধনুষ্কোটি একটি প্রসিদ্ধ সমুদ্রস্নান-তীর্থ। কথিত আছে, রামচন্দ্র ধনুকের কোটি বা কোণ দ্বারা এই স্থানের সেতু ভঙ্গ করেন। ধনুষ্কোটির নিকটেই রামেশ্বর তীর্থ।

ভকতপ্রসাদ মজুমদার
কমলকুমার গুহ

ধনুষ্টংকার বাসিলস তেতানি (*Bacillus tetani*) নামক রোগজীবাণুর সংক্রমণঘটিত ব্যাধি। এই রোগের জীবাণু ক্ষতস্থান দিয়া শরীরে প্রবেশ করে। ধুলাময়লা দ্বারা দূষিত ক্ষত হইতে এই রোগের সম্ভাবনা অধিক। ইহার প্রধান লক্ষণ শরীরের বিভিন্ন মাংসপেশীর খিঁচুনি। চোয়ালের পেশী শক্ত হইয়া যাওয়ায় মুখ খুলিতে অসুবিধা হয়। মুখমণ্ডলের পেশীগুলি শক্ত হওয়ার ফলে মুখের ভাব বিকৃত হয়। পিঠের পেশী শক্ত হওয়ায় শরীর পিছনদিকে ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যায়, সেইজন্য ইহার নাম ধনুষ্টংকার। ঘাড় এবং পেটের পেশীগুলিও শক্ত হয়। পরে সমস্ত শরীরের খিঁচুনি আরম্ভ হয়। খিঁচুনির ফলে শ্বাসরুদ্ধ অথবা অবসন্ন হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। জীবাণু ধ্বংস করিবার জন্য পেনিসিলিন, উহার বিষকে নিষ্ক্রিয় করিবার জন্য 'অ্যান্টিটিটেনাস সিরাম' এবং খিঁচুনি কমাইবার জন্য 'সেডেটিভ' ঔষধ দেওয়া হয়। রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিলে পেশীগুলিকে ঔষধ

প্রয়োগে শিথিল করিয়া কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। প্রতিরোধক হিসাবে 'টিটেনাস টক্‌সয়েড' বিশেষ ফলপ্রদ।

সিদ্ধেশ্বর রায়

ধন্বন্তরি ধন্বন্তরি-গোত্রের প্রবর্তক প্রাচীন ঋষি। ঋগ্‌বেদে ধন্বন্তরির উল্লেখ থাকিলেও দিবোদাসের নাম বহুবার উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদে (১।১৩০।১০) দিবোদাস-গোত্রের উল্লেখ আছে। সুশ্রুতসংহিতা (১ম অধ্যায়) হইতে জানা যায়, যখন কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া বনে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় সুশ্রুত সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং ধন্বন্তরি তাঁহাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। বর্তমানেও চিকিৎসাবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিকে 'ধন্বন্তরি' বলে। গরুড়পুরাণে (১৩৯।৮-১১) ধন্বন্তরির যে বংশ-তালিকা লিপিবদ্ধ আছে তাহা হইতে জানা যায়, গৃৎসমদ ঋষির পুত্র ছিলেন শৌনক, তাঁহার পুত্র দীর্ঘতমা। দীর্ঘ-তমার পুত্র হইলেন বৈদ্য ধন্বন্তরি। বিষ্ণুপুরাণ (৪।৮।২-৫), ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণ (২৬।৫) এবং হরিবংশেও (২৯ অধ্যায়) ধন্বন্তরির উল্লেখ আছে। কিন্তু ধন্বন্তরির কুলপঞ্জিকা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত এবং পুরাণকারগণ কেহই ধন্বন্তরি ও দিবোদাসকে এক ব্যক্তি বলেন নাই। তবে ধন্বন্তরি কাশীরাজবংশোদ্ভূত এবং দীর্ঘতমা বা দীর্ঘতপার পুত্র এ বিষয়ে পৌরাণিক সাহিত্যে মোটামুটি মতৈক্য আছে। সম্ভবতঃ সুশ্রুত-কথিত দিবোদাস ধন্বন্তরির বংশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই ধন্বন্তরি পদবী পাইয়াছিলেন। কথা আর আখ্যায়িকাকে ভিত্তি করিয়া ধন্বন্তরির সময়ের হদিস পাওয়া আজও সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। তবে সুশ্রুত যে দিবোদাস ধন্বন্তরির নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে কোনও কোনও পণ্ডিতের অনুমান যে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম-৬ষ্ঠ শতকের কাছাকাছি হয়ত বা জীবিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভায় এক কবি ধন্বন্তরিরও প্রসিদ্ধি শোনা যায়; কালিদাসের সমকালীন ধরিয়া লইলে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের সন্নিহিত কালে ইঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করিতে হয়।

ধন্বন্তরি দেববৈদ্যরূপেও প্রাচীন সাহিত্যে কীর্তিত। তিনি সর্ববেদে অধিকারী এবং মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে ধন্বন্তরির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পুরাকালে দেবতারা যখন সমুদ্র মন্থন করেন সেই সময়ে তাঁহার আবির্ভাব। রামায়ণের আদিকাণ্ডে (৪৫।৩১।৩২) দেখা যায় যে, মন্থনের দ্বিতীয় পর্বে দণ্ড ও কমণ্ডলুলাঞ্ছিত সৌম্যদর্শন ধন্বন্তরি সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসেন। এই ধন্বন্তরি হইলেন দেবতা; কিন্তু দেবতা হইলেও তিনি বৈদ্য অর্থাৎ চিকিৎসক। যুদ্ধে আহত দেবতাদের অস্ত্রক্ষত নিরাময় করিয়া তিনি তাঁহাদের প্রাণদান করিতেন। অলৌকিক চিকিৎসানৈপুণ্যে তিনি দেবতাদের মতই পূজিত হইতেন এবং যজ্ঞের ভাগও পাইতেন; সেজন্য মনুসংহিতায় (৩।৭৫) সর্বজনের নিত্য উপাস্যের তালিকায় ধন্বন্তরি শ্রদ্ধার আসন পাইয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত

ধবলগিরি হিমালয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ ও উচ্চ শৃঙ্গ। ধবলগিরির ৭৫০০ মিটারের (২৫০০০ ফুটের) অধিক চারিটি শৃঙ্গ আছে। উহাদের যথাক্রমে ধবলগিরি-১,-২, -৩ ও -৪ বলা হয়। ধবলগিরি-১ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ; ইহার উচ্চতা ৮১৬৭ মিটার (২৬৭৯৬ ফুট)। পঞ্চমটির উচ্চতা ৭৫৮৫ মিটার (২৪৮৮৫ ফুট)।

ধবলগিরির অর্থ শুভ্র পর্বত। সর্বদাই বরফে আবৃত দেখা যায় বলিয়া ইহার এই নাম। একদিকে থালী ভেরী নদী ও অন্যদিকে কালী গণ্ডকীর গভীর প্রশস্ত খাত, এই দুইয়ের মধ্যে ধবলগিরি পর্বত অবস্থিত। ধবলগিরি-১ শৃঙ্গটি কালী গণ্ডকীর পশ্চিমপ্রান্তে প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার জরীপ বিভাগের কর্তা কোলব্রুক প্রথম ইহার আনুমানিক উচ্চতা নির্ণয় করেন। কে-২, এভারেস্ট প্রভৃতি আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত বহুদিন ইহা সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত।

ধবলগিরি-১ শৃঙ্গে আরোহণ করা খুবই কঠিন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বার্নহার্ড লয়াটারবার্গ-এর নেতৃত্বে একটি সুইস অভিযাত্রীদল এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্‌সিস্‌কো ইবানেজের নেতৃত্বে আর্জেন্টিনার একটি অভিযাত্রীদল এই শৃঙ্গে উঠিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ম্যাক্স আইসেলিনের নেতৃত্বে গঠিত সুইস অভিযাত্রী-দলের ৬জন শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

দ্র Toni Hagen, *Nepal : The Kingdom of the Himalayas*, Calcutta & New Delhi, 1961 ; A. Huxley, ed. *Encyclopaedia of the World's Mountains*, London, 1962.

কমলা মুখোপাধ্যায়

ধম্ম পালিতে ধম্ম শব্দের অর্থ খুবই ব্যাপক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। "সা মাগধী মূল ভাসা" এই দৃষ্টিতে ধম্ম

শব্দটি বাংলা ভাষায় ধর্ম নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। বুদ্ধের ধর্ম পরিয়ত্তি, পটিপত্তি এবং পটিবেধ-ধম্মরূপে ত্রিবিধ; আবার সংখত ও অসংখত এবং লোকীয় ও লোকোত্তর ধম্ম হিসাবে দ্বিবিধ। নব লোকোত্তর ধম্মই "উত্তরি মনুস্‌স ধম্ম" নামে অভিহিত। পালি সাহিত্যে ধম্ম শব্দ নিয়ম, শীল, গুণ, দেশনা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ধম্ম সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিয়াছেন—"বুদ্ধের ধম্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দ্রষ্টব্য, কালাকালহীন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদায়ী। 'এস দেখ' এভাবে সকলকে আহ্বানের যোগ্য, নির্বাণের পথপ্রদর্শক, বিজ্ঞগণ কর্তৃক স্ব-হৃদয়ে অনুভবন যোগ্য।"

বুদ্ধোপদিষ্ট পরিয়ত্তিধম্ম অবলম্বনে জাগতিক ভোগ-সুখের ঊর্ধ্বে দুঃখবিহীন পরমশান্তি নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য যে সাধনা, তাহাই ধম্ম নামে অভিহিত।

আর্যবংশ মহাস্থবির

ধম্মকায় বুদ্ধের আধ্যাত্মিক শরীর। এই শরীরে বুদ্ধোপযোগী সমস্ত গুণের সমাবেশ হইয়াছে। এই শরীর অনন্ত এবং বিশ্বব্যাপী। সংক্ষেপে বলা যায় বুদ্ধের বুদ্ধত্ব এবং অনাস্রব ধর্মই তাঁহার ধম্মকায়। ধম্মকায় অচিন্তনীয়, অবর্ণনীয়, অপরিবর্তনীয়, অজ্ঞেয় এবং জন্ম-মৃত্যুর ও নির্বাণের ঊর্ধ্বে। ধম্মকায়কে তথতার (সাংসারিক বস্তুর সমতার) এবং ধর্মধাতুর (সম্পূর্ণ বিশ্বজগতের) সমপর্যায়বাচী বলা যাইতে পারে। মহাযান সম্প্রদায়ের মতানুসারে ধম্মকায়ই নির্বাণ।

দ্র আচার্য নরেন্দ্রদেব, বৌদ্ধ-ধর্ম-দর্শন, পাটনা, ১৯৫৬; Daisetz Teitaro Suzuki, *Mahayana Buddhism*, London, 1907.

রাষ্ট্রপাল ভিক্ষু

ধর্ম ধর্ম শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যাহা ধারণ বা পোষণ করে'। 'স্বাভাবিক গুণ' বা 'নৈতিক চরিত্র' অর্থে ধর্ম শব্দটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় এই শব্দের বিভিন্ন পারিভাষিক অর্থ আছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে ইংরেজী শব্দ 'রিলিজন' (Religion) অর্থে ধর্ম শব্দটিকে ব্যবহার করা হইবে। এই অর্থে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মসমূহের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়া থাকে। এই ধর্মগুলিকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলা হয়। ঈশ্বর, পরলোক ও পাপ-পুণ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস এবং পাপ বা দুঃখরাশি হইতে নিশ্চিত পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে অনুসৃত বিশেষ বিশেষ পূজা, উপাসনা বা জীবনযাত্রার পদ্ধতি সাম্প্রদায়িক ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঈশ্বরের অবতার বলিয়া কথিত অথবা ঈশ্বর-প্রেরিত কোনও ব্যক্তি, ঋষি, জ্ঞানী বা সিদ্ধপুরুষ এই সকল ধর্মের প্রবর্তক অথবা প্রবক্তা। সাম্প্রদায়িক ধর্মের সহিত সমাজ বা গোষ্ঠী-জীবনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। পাপভয়ে ভীত ও দুঃখ-পীড়িত মানবজাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য দিব্য দৃষ্টি-বিশিষ্ট ও দিব্যজীবনধারী এক বা একাধিক মহাপুরুষ ঈশ্বরের নামে যে সকল বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন সেগুলিকে ভিত্তি করিয়া এক একটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ এক বা একাধিক শাস্ত্রবিশেষে লিপিবদ্ধ ঈশ্বরের অথবা ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের বাণী, উপদেশ প্রভৃতিকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং সেইগুলির নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রগ্রন্থে লিপিবদ্ধ উপদেশ ও আচরণবিধিগুলির মধ্যে কিন্তু বহুস্থলে পার্থক্য এমন কি সুস্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়। বহু ধর্মেই এক অদ্বিতীয়, করুণাময়, সর্বশক্তিমান, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও কোনও কোনও ধর্মে ইহা স্বীকৃত হয় নাই। বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে একমাত্র ত্রাণকর্তা বলিয়া স্বীকার করা হয়। মুক্তির স্বরূপ এবং মুক্তিলাভের প্রকৃত উপায় লইয়াও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মতবিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় ধর্মের কোনও সাধারণ লক্ষণ আছে কিনা, এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অধুনা প্রচলিত ধর্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া এবং ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে মানবসভ্যতার প্রকৃতি আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। সমগ্র জগতের প্রতি এক বিশেষ মনোভাবই ধর্মচেতনা। দৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে অবস্থিত এক অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস এবং সেই সত্তার উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এইরূপ একটা বোধ এই মনোভাবের প্রধান উপাদান। এই সত্তাকে সমগ্রভাবে এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়া ধারণা করিলে ইহাকে পরমেশ্বর এবং কতকগুলি বিভিন্ন শক্তির সমষ্টি বলিয়া ধারণা করিলে ইহাকে দেবতামণ্ডলী বলা যাইতে পারে। মানবের প্রকৃতির সহিত ঈশ্বরের (ইনি পরমেশ্বরই হউন অথবা দেবতাবিশেষই হউন) প্রকৃতির মূলগত সাদৃশ্য থাকিলেও ইনি মানবাপেক্ষা বহুগুণ, এমন কি অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠ এবং মানুষের পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

ঈশ্বরই মানুষকে সকলপ্রকার দুঃখকষ্ট, বিপদ ও পাপ চিন্তা হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ এবং জীবনে চরিতার্থতা লাভ করিতে হইলে মানুষকে নিজেদের ক্ষমতার উপর নির্ভর না করিয়া উপাস্য দেবতার নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—এই বিশ্বাসকেই সকল ধর্মের সার বলা যাইতে পারে। এইরূপ বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত প্রবল ভাবাবেগ পরমেশ্বর বা দেবতা-বিশেষের পূজা, উপাসনা এবং নানারূপ বাহ্য অনুষ্ঠান বা ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পাপ ও দুঃখ-দুর্দশা হইতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা এবং পরহিতসাধনও এইসকল ক্রিয়ার অন্তর্গত। সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোনও অনন্ত শক্তিসম্পন্ন অথচ দুর্বল জীবের প্রতি সহানুভূতিবিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এবং নানারূপ ক্রিয়া ও চেষ্টার মাধ্যমে সেই বিশ্বাস ও অনুরাগের অভিব্যক্তি, এই তিনটি ধর্মের অপরিহার্য উপাদান। বৌদ্ধমত, জৈনমত প্রভৃতিতে ঈশ্বর-বিশ্বাসমূলক প্রেরণা হইতে সঞ্জাত পূজাদির কোনও স্থান নাই, অন্ততঃ মূল বৌদ্ধমত বা জৈনমতে ছিল না। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধসমাজে বুদ্ধ এবং জৈনসমাজে মহাবীর, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি জিনগণ ঈশ্বরের মর্যাদা লাভ করিলেন এবং মন্দিরে মন্দিরে জনগণের পূজা পাইতে লাগিলেন, সুতরাং সাধারণ প্রচলিত বৌদ্ধমত ও জৈন-মতকে 'ধর্ম' আখ্যা দেওয়া একান্ত অসঙ্গত হইবে না।

প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম এবং বিচারবুদ্ধিমূলক ধর্ম, এই দুই প্রকার ধর্মকেই বিষয় করিয়া দুই প্রকারের আলোচনা হইতে পারে। ধর্মচেতনা এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানাদিকে জগতের অন্যান্য বস্তু বা ঘটনার সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে উহাদের ব্যাখ্যা করা প্রথম প্রকারের আলোচনা। জগতের চরম সত্তার স্বরূপ, উহার সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ, পাপ-পুণ্য, মুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল বিশ্বাস মনে ধর্মচেতনা হইতে উদ্ভূত হয়, বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সেগুলির সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা।

প্রথম প্রকারের আলোচনার ফলে পাওয়া যায় ধর্ম-বিজ্ঞান এবং দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনার ফলে পাওয়া যায় ধর্মীয় দর্শন। প্রথমটিতে ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় করার কোনও চেষ্টা নাই; দ্বিতীয়টিতে এই চেষ্টাই প্রধান। ধর্মসম্বন্ধীয় যে সকল ব্যাপার মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, ধর্মবিজ্ঞান কেবলমাত্র সেইগুলি লইয়াই আলোচনা করে; অতীন্দ্রিয় সত্তা বা চরম তত্ত্ব ইহার আলোচনাক্ষেত্রের বাহিরে। যাহাকে ধর্মচেতনা বলা হয়, তাহা কি একটি মৌলিক মানসবৃত্তি অথবা অন্য কোনও এক বা একাধিক মানসবৃত্তি বা প্রবণতা হইতে উদ্ভূত, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ধর্ম-বিশ্বাস, ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মীয় প্রথা, রীতি-নীতি ইত্যাদি কোন কোন ঐতিহাসিক বা পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ফলে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে, জড়বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্নমুখী অগ্রগতির সহিত ইহাদের কিরূপ সম্পর্ক—ধর্মবিজ্ঞানে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। আবার—ঈশ্বর সত্যই আছেন কিনা, মানবাত্মা সত্যই অমর কিনা, ঈশ্বরের উপাসনার ফলে মানুষ সত্যই পাপ ও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে কিনা—বিচার-বুদ্ধির দৃষ্টিতে এই প্রকার প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয় ধর্মীয় দর্শনে। ধর্মবিজ্ঞানের লক্ষ্য হইল ধর্মবোধ ও ধর্ম-চিন্তার সর্বপ্রকার বাহ্য প্রকাশের সুশৃঙ্খল ও সুসংহত বিবরণ প্রদান, আর ধর্মীয় দর্শনের লক্ষ্য হইল ধর্মবোধ ও ধর্ম-চিন্তার মূল্যায়ন।

ধর্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনার সম্ভাব্যতা এবং যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিলে ধর্মের সহিত দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। দর্শন ও ধর্মের বিষয়বস্তু এক, কিন্তু উহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য আছে। ধর্ম ও নীতির সম্বন্ধও অতি ঘনিষ্ঠ। ধার্মিক ব্যক্তি সচ্চরিত্র ও পরোপকারী হইবেন ইহা আশা করা হয়।

যাঁহাদের ধর্ম-বিশ্বাস অতি প্রবল তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে ধর্মচেতনা জগতের চরম তত্ত্ব সম্বন্ধে মনে যে সকল ধারণা বা বিশ্বাস উৎপন্ন করে তাহাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করা স্বাধীন বিচারবুদ্ধির ক্ষমতার বাহিরে। শাস্ত্রগ্রন্থে প্রকাশিত ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণীর উপর নির্ভর করিয়াই ধর্ম সম্বন্ধে যে কোনও প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর দেওয়া সম্ভব। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই। উহারা সকলেই একই সত্যকে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছে। 'যত মত তত পথ।' ভারতীয় সাধকদের নিকট এই মতটি বিশেষ আদৃত।

যাঁহারা কেবলমাত্র বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সব কিছুর বিচার করিতে অভ্যস্ত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ধর্মচেতনা, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি কুসংস্কার-মূলক এবং অন্যান্য কুসংস্কারের ন্যায় এগুলির উৎসও অজ্ঞতা এবং বিকৃত ইচ্ছা। মার্ক্সবাদীর মতে ধর্ম জনগণের মনে আফিমের কাজ করে, দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করিবার জন্য হাতিয়ার হিসাবে শোষকশ্রেণী উহা উদ্ভাবন করিয়াছে।

ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের উপর ধর্মের প্রভাব যে বিপুল ও সুদূরপ্রসারী ইহা অনস্বীকার্য। ধর্ম-সাধনা হইতে প্রেরণালাভ করিয়া অসংখ্য ব্যক্তি উন্নত জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, দুঃখী ও বিপন্নের নিঃস্বার্থ সেবা করিয়াছেন। গোষ্ঠীজীবনেও সাহিত্য, দর্শন, কাব্য এবং স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতি কলাবিদ্যার উৎপত্তি এবং উন্নতির মূলে রহিয়াছে ধর্মানুরাগের প্রভাব। অন্যদিকে ধর্মের নামে পৃথিবীতে যুদ্ধ, রক্তপাত, নরহত্যা, মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার ঘটিয়াছে। তবে মানবসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মান্ধতার প্রকোপ যে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে ইহাই সুখের বিষয়।

কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

ধর্মকীর্তি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের চোলদেশে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে আচার্য ধর্মকীর্তি জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধ তর্কশাস্ত্র তাঁহার প্রচেষ্টায় বিশেষরূপে উন্নত হইয়াছিল। দিঙ্‌নাগের পরবর্তী কালে আচার্য ধর্মকীর্তিই ছিলেন বৌদ্ধ তর্কশাস্ত্রের প্রধান পণ্ডিত। শৈশব হইতেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণধী ছিলেন। তিনি কৈশোরেই বেদ, বেদাঙ্গ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি বৌদ্ধ শিক্ষকগণের উপদেশ শ্রবণ করিতেন এবং ধীরে ধীরে তথাগতের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেন। ব্রাহ্মণগণের সহিত আলোচনার সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রশংসা করিয়া উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে থাকিলে ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। স্বীয় সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত হইয়া ধর্মকীর্তি মগধে গমন করিলে আচার্য ধর্মপাল তাঁহাকে বৌদ্ধ সংঘে গ্রহণ করেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি ত্রিপিটক ও অন্যান্য বৌদ্ধশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে ধর্মকীর্তি কলিঙ্গ দেশে একটি বিহার নির্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হন এবং ঐ স্থানেই তাঁহার বহুমূল্য ঘটনাবহুল জীবনের অবসান হয়।

তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল ন্যায়বিন্দু। প্রত্যক্ষ, স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান—এই তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত এই গ্রন্থে তিনি আচার্য দিঙ্‌নাগের মতবাদের সমালোচনা ও খণ্ডন করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল 'প্রমাণবার্তিককারিকা', 'প্রমাণবার্তিকবৃত্তি', 'প্রমাণ-বিনিশ্চয়' প্রভৃতি।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্মঘট আধুনিক শিল্পসভ্যতায় ধর্মঘট সুপরিচিত। নিজেদের দাবিপূরণ ও অভিযোগের প্রতিকারের জন্য শ্রমিকেরা একযোগে কর্মবিরতি ঘটাইয়া ধর্মঘট করে।

প্রচলিত ধারণা এই যে, নানাকারণে ধর্মঘট হয়; যথা—মজুরি ও বোনাস-সংক্রান্ত দাবি, কর্মচারী-সংক্রান্ত সমস্যা (পারসোনেল প্রব্‌লেম্‌স), ছাঁটাইয়ের সমস্যা এবং ছুটি ও কর্মসময়-সংক্রান্ত মতবিরোধ ইত্যাদি। আসলে এইগুলি শিল্পবিরোধের বিষয়মাত্র, কারণ নহে। বহু ক্ষেত্রেই ধর্মঘট ছাড়াই মীমাংসা সম্ভব হয়; যেসব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, তাহার পশ্চাতেও কোনও না কোনও মূল কারণ বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে মতপার্থক্য নিরসনে ব্যর্থতার কারণগুলিই ধর্মঘটের হেতু।

মোটামুটিভাবে ধর্মঘটের মূল কারণগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রতিষ্ঠানিক—এই কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। অনুন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধর্মঘটের মনস্তাত্ত্বিক কারণ হিসাবে অনেক সময়েই মালিকপক্ষের সামন্ততান্ত্রিক বা অদূরদর্শী মুনাফালোভী মনোভাব দায়ী থাকে। উৎপাদনবৃদ্ধি ও উৎপাদন-কৌশলের উন্নয়নে শিল্পে শান্তির ভূমিকা সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা অনেক সময়েই শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকবিরোধ সমাধানের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে অনুন্নত দেশে শিল্পপণ্যের সীমাবদ্ধ বাজার, বাণিজ্যচক্র ইত্যাদি কারণ প্রধান। অনুন্নত দেশে মাথাপিছু গড় আয় কম, শিল্পপণ্যের চাহিদা সীমাবদ্ধ এবং উৎপাদন-কৌশল অনুন্নত। ফলে যন্ত্রশিল্পের আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম হওয়ায় উন্নততর মজুরি ও কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে অনুন্নত দেশের শিল্পপতি-শ্রেণী সক্ষম হয় না। ইহার উপর বাণিজ্যচক্রজাত সমস্যাও অনেক সময়ে শ্রমিকপক্ষের দাবিপূরণে প্রতিবন্ধক হয়। অন্যপক্ষে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে শ্রমিক ও কর্মচারীদের স্বাভাবিক আগ্রহ এবং অনেক সময়ে উন্নয়নের পর্যায়ে মুদ্রাস্ফীতির চাপে জীবনযাত্রার মানের অবনতি রোধের প্রচেষ্টা শ্রমিকপক্ষকে উন্নততর মজুরির দাবিতে অনমনীয় করিয়া তোলে। এই অবস্থায় মীমাংসা অনেক সময়ে বিশেষ কঠিন হয়। এগুলি ছাড়া অনেক সময়ে ইউনিয়নের উপরে রাজনৈতিক দলের প্রভাব এবং ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ কলহ বা প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নের সঙ্গে বিরোধও ধর্মঘটের কারণ হয়।

ধর্মঘটের ফল সর্বাংশে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করা ঠিক নহে। ধর্মঘটের ফলে কোনও বিশেষ কারখানায় যে উৎপাদন হ্রাস পায় তাহা হয়তো সেই কারখানার

প্রতিযোগী অন্য কারখানার পণ্যের চাহিদা বাড়াইতে পারে। আধুনিক গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, ধর্মঘটের ফলে বিনষ্ট শ্রম-সময় অন্যান্য নানা কারণে বিনষ্ট শ্রম-সময় অপেক্ষা কম। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের যন্ত্রশিল্পগুলিতে ধর্মঘটজনিত বিনষ্ট শ্রম-দিবস ও প্রত্যাশিত শ্রম-দিবসের অনুপাত ছিল বার্ষিক গড়পড়তা প্রতি ১০০ শ্রমিকে ০'৪৪২; অন্যপক্ষে একই সময়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে শ্রমিকের অনুপস্থিতি প্রবণতার জন্য বিনষ্ট শ্রম-দিবস ও প্রত্যাশিত শ্রম-দিবসের অনুপাতের বার্ষিক গড় হইতেছে প্রতি ১০০ শ্রমিকে ১৩'৪।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভারতে ধর্মঘট-প্রবণতা নানা কারণে বৃদ্ধি পাইলেও বর্তমানে ইহা খুব আশঙ্কাজনক নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতের কারখানাসমূহে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিল্পবিরোধের ফলে বিনষ্ট শ্রম-দিবসের বার্ষিক গড় ছিল ৯০৮১৪৯১; অন্যপক্ষে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিল্পবিরোধের ফলে বিনষ্ট শ্রম-দিবসের বার্ষিক গড় ছিল ৫৮৫৮৬১৬। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পরবর্তী তিন বৎসরে এই বার্ষিক গড় সামান্য বাড়িয়া ৫৯৬৫৫৮০ হইলেও ১৯৪৮-৫০ খ্রীষ্টাব্দের গড় হইতে কম ছিল।

ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িত বিষয়সমূহের (যথা: মজুরি, ছাঁটাই ইত্যাদি) ভিত্তিতে রচিত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মজুরি ও বোনাস -সংক্রান্ত বিরোধের সংখ্যাই সর্বাধিক। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মোট ধর্মঘটের শতকরা ৫০'১ ভাগ এই দুই বিষয়, ১৭'৮ ভাগ কর্মচারী ও ছাঁটাই -জনিত বিষয়, ০'৪ ভাগ ছুটি ও কর্মসময় -জনিত ও ৩১'৭ ভাগ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল। স্বাধীনতার পর হইতে প্রতি বৎসরই মজুরি ও বোনাস -সংক্রান্ত বিরোধের এই গরিষ্ঠতা চোখে পড়ে।

সাম্প্রতিক কালে সফল ধর্মঘটের হার কিছু বাড়িলেও অধিকাংশ ধর্মঘটই এখনও সফল হয় না। প্রথম পঞ্চ-বর্ষীয় যোজনার প্রথম তিন বৎসরে সম্পূর্ণ সফল ধর্মঘটের শতকরা হার ছিল ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১৭'২, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ২৩'১ এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৭'৮; তাহার তুলনায় তৃতীয় পঞ্চবর্ষীয় যোজনার শেষ তিন বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা হিসাবে ২৩'৪, ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৭'৭ এবং ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০'৭ ভাগ ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল হয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এখনও পর্যন্ত শিল্পবিরোধের ক্ষেত্রে শ্রমিকপক্ষ তুলনামূলকভাবে দুর্বলতর।

দ্র A. Kornhauser, R. Dublin & A. Ross, *Industrial Conflict*, New York, 1954; K. C. Knowles, *Strike*, Oxford, 1954; C. Myers, *Industrial Relations in India*, Bombay, 1958; L. G. Reynolds, *Labour Economics and Labour Relations*, Tokyo, 1959; S. Ghosh, *Indian Labour in the Phase of Industrialization*, Calcutta, 1966; Labour Bureau, Government of India, *Indian Labour Journal*, December, 1965, January, 1967.

সুব্রতেশ ঘোষ

ধর্মচক্র বৌদ্ধধর্ম দ্র

ধর্মদাস সুর (১৮৫২-১৯১০ খ্রী) কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ধর্মদাস সুর কর্মজীবনে প্রথমতঃ এক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ঐ কাজ করিতে করিতেই তিনি ঘটনাচক্রে বঙ্গদেশের প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার'-এর জন্য মঞ্চ ও দৃশ্যপটাদি নির্মাণের ভার পান (১৮৭২ খ্রী) এবং ঐ সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত গ্রেট ন্যাশন্যাল, কোহিনুর, মিনার্ভা প্রভৃতি সাধারণ রঙ্গালয়ের মঞ্চাধ্যক্ষ অথবা কর্মাধ্যক্ষরূপে কাজ করেন।

মঞ্চনির্মাণ-বিষয়ে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবিতকালে তো বটেই, মৃত্যুর পরও বহুকাল ধরিয়া বঙ্গদেশের রঙ্গালয়গুলিতে অনুসৃত হইয়াছিল।

প্রবোধকুমার দাস

ধর্মপাল পাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের পুত্র এবং এই বংশের দ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি অন্ততঃ ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন; তাঁহার রাজ্যকাল আনুমানিক ৭৭০-৮১০ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজকন্যা রন্নাদেবীকে বিবাহ করেন। পিতার মৃত্যুর পর শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী বঙ্গ-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া ধর্মপাল সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করার উদ্যোগ করেন। এজন্য তাঁহাকে বহু যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল; মালব ও রাজপুতানার প্রতীহাররাজ বৎসরাজের সহিত যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেলে ধর্মপালের পথ নিষ্কণ্টক হয় এবং ক্রমে ক্রমে আর্যাবর্তের প্রায় সমুদয় রাজ্যই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। পশ্চিমে সিন্ধু নদ ও পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদভূমি এবং

দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত তাঁহার বিজয়বাহিনী অগ্রসর হয়। আর্যাবর্তের সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়া ইহার প্রকাশ্য ঘোষণা-স্বরূপ তিনি তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ কান্যকুব্জ (কনৌজ) নগরীতে সামন্তরাজগণকে আহ্বান করিয়া এক দরবার করেন। মালদহের নিকটবর্তী খালিমপুরে প্রাপ্ত তাঁহার একখানি তাম্র-শাসনে তাহার নিম্নরূপ বর্ণনা আছে: "তিনি (ধর্মপাল) মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে (অর্থাৎ ইঙ্গিতমাত্রে) ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার, কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতিপরায়ণ, চঞ্চলাবনত মস্তকে 'সাধু সাধু' বলিয়া কীর্তন করাইতে করাইতে হৃষ্টচিত্ত পাঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।" উল্লিখিত রাজ্যগুলির মধ্যে কীর কাংড়া দেশ, গন্ধার ও মদ্র পাঞ্জাবের পশ্চিমে ও মধ্যভাগে, অবন্তি ও ভোজ আর্যাবর্তের দক্ষিণে ও মৎস্য দেশ জয়পুরে এবং কুরু উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত। যবনদেশ সম্ভবতঃ সিন্ধু নদের তীরে মুসলমান-অধিকৃত কোনও রাজ্য। এই সমুদয় দেশই যে ধর্মপালের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; কারণ কেবল পালরাজ-গণের প্রশস্তিতেই পাল-সাম্রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না, ১১শ শতাব্দীতে রচিত সোড্ঢল-প্রণীত 'উদয়সুন্দরী-কথা' নামক চম্পূকাব্যে ধর্মপাল 'উত্তরাপথস্বামী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বাংলার কোনও রাজা ইহার পূর্বে বা পরে এতবড় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন নাই।

ধর্মপাল চক্রায়ুধ নামক এক সামন্তকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে তাঁহার অধীনস্থ রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রতীহাররাজ বৎসরাজের পুত্র নাগভট তাঁহাকে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ তাঁহাকে দমন করিতে না পারিয়া ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের শরণাপন্ন হন এবং তিনি নাগভটকে পরাভূত করেন। সম্ভবতঃ ধর্মপাল ইহার পর নিরুদ্বেগে রাজত্ব করেন।

ধর্মপালের আর এক নাম ছিল বিক্রমশীল। বিহারে গঙ্গাতীরে একটি পর্বতের উপরে তিনি যে বিরাট বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন তাহা বিক্রমশীল নামে এশিয়ায় সমগ্র বৌদ্ধজগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং একটি উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। বরেন্দ্র-ভূমিতে সোমপুর নামক স্থানে ধর্মপাল আর একটি বিশাল বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরে ইহার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে সে যুগের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিব্বতীয় লেখক তারনাথের মতে ধর্মপাল ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দ্র রমাপ্রসাদ চন্দ, গৌড়রাজমালা, রাজশাহী, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ; রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস: প্রাচীন যুগ, কলিকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

ধর্মপূজা ধর্মঠাকুরের পূজা বা ধর্মরাজঠাকুরের পূজা। পশ্চিম বঙ্গে প্রধানতঃ রাঢ় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম দ্বারা ইহা ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ইহার মৌলিক পরিচয় বাংলার অন্যান্য লৌকিক ধর্মের তুলনায় অধিকতর সুস্পষ্ট রহিয়াছে। ডোমজাতীয় লোকই শিলারূপী ধর্মঠাকুরের পুরোহিত। কোনও কোনও অঞ্চলে হিন্দুধর্মের প্রভাব-বশতঃ ব্রাহ্মণ পুরোহিত ধর্মঠাকুরের পূজা করেন বটে, তথাপি ডোমজাতীয় লোকেরা তাহাদের এই বিষয়ক অধিকার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নাই, দেবতার দেয়াসী রূপে পূজাসম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে।

প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে ধর্মরাজঠাকুরের পূজা হয়। ১. নিত্যপূজা: যে গ্রামে ধর্মঠাকুরের স্থায়ী মন্দির এবং পূজার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে প্রতিদিনই তাঁহার পূজা হয়, সে পূজায় বিশেষ কোনও আড়ম্বর হয় না, যদি গ্রামবাসী কাহারও মানসিক থাকে, তবে সেই অনুযায়ী পাঁঠা ও কবুতর বলি দেওয়া হয়। কোনও কোনও অঞ্চলে উচ্চবর্ণের হিন্দুর বাড়িতেও শালগ্রাম শিলার পরিবর্তে ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাতেও তাঁহার নিত্যপূজা হয়। ২. বাৎসরিক পূজা: প্রত্যেক গ্রামেরই নিজস্ব রীতি অনুযায়ী চৈত্রী পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা কিংবা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তবে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির পূজাই সংখ্যায় অধিক হইয়া থাকে। এই পূজায় যে গাজন হয়, তাহাতে সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যা হইবার রীতি আছে। তাহারা শিবের গাজনের অনুরূপ বিবিধ আচার পালন করিয়া থাকে। ধর্মশিলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করানো বাৎসরিক পূজার একটি প্রধান অঙ্গ। কোনও কোনও ধর্মঠাকুরের মন্দিরে এই উপলক্ষ্যে চড়ক হইত, শিবের গাজন উপলক্ষ্যে চড়ক অনুষ্ঠিত হইবার পর হইতে উহা এখন আর অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না। ৩. বারমতি: ১২ দিন ধরিয়া বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান করিয়া এই পূজা হয়। ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, এখন ইহা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে।

ধর্মঠাকুর প্রধানতঃ পুত্রসন্তানদাতা এবং কুষ্ঠরোগ হইতে পরিত্রাতারূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহার মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া মধ্যযুগে এক সমৃদ্ধ আখ্যায়িকা-কাব্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য বলিয়া পরিচিত। ইহাতে ডোমজাতির বীরত্বের কথা কীর্তিত হইয়াছে।

ধর্মঠাকুর আদিম সমাজের সূর্যদেবতা, শাদা রঙের পশু বলি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়। শাদা ঘোড়া তাঁহার বাহন, শাদা ফুলে তাঁহার প্রসন্নতা। সুতরাং তিনি মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রতীক বলিয়া মনে হয়।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

ধর্মমঙ্গল মঙ্গলকাব্য দ্র

ধর্মশাস্ত্র যেসমস্ত গ্রন্থে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ ও ব্রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রমের কর্তব্যাকর্তব্য আলোচিত হইয়াছে সেগুলিই ধর্মশাস্ত্র নামে পরিচিত। প্রসঙ্গতঃ রাজধর্ম, দায়ভাগ ও ব্যবহার ইহার আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহা স্মৃতিশাস্ত্র নামেও পরিচিত। ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে: ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মসংহিতা, ব্যাখ্যা ও নিবন্ধ। প্রথম দুই ভাগ প্রাচীন স্মৃতি ও নিবন্ধ নব্য স্মৃতি। বর্তমানে গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু ও বৈখানসের নামাংকিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত অপর কোনও ধর্মসূত্রগ্রন্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন স্মৃতির টীকা ও নব্য স্মৃতির নিবন্ধগুলিতে সূত্রাকারের এমন বহু বচন প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, যেগুলি হইতে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, এককালে উক্ত ধর্মসূত্র-গ্রন্থগুলি ছাড়াও এজাতীয় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল এবং ঐগুলি কালের করাল গ্রাসে বিলুপ্ত হইয়াছে।

উপলভ্যমান ধর্মসূত্রগ্রন্থগুলির রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণের উপায় নাই। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ 'গৌতমধর্মসূত্র'-এর রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতক। সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন বলিয়া বিবেচিত 'বৈখানসস্মার্তসূত্র'-এর রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ৩য়-৪র্থ শতক বলিয়া অনুমিত হয়। ধর্মশাস্ত্রের সংখ্যা ২০, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য (১।১।৪-৫) নিম্নলিখিত ২০ জন ধর্মশাস্ত্র-কারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন: মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনস্, অঙ্গিরস্, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ। টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বরের মতে সকল ধর্মশাস্ত্রকারের নামই এখানে নাই, মাত্র কয়েকজনের নামোল্লেখই স্মৃতিকারের উদ্দেশ্য। পরাশরও নিজের নামসহ ২০ জন স্মৃতিকারের নাম করিয়াছেন, কিন্তু পরাশরের তালিকায় নামের কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ইহাদের মধ্যে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের নামাংকিত গ্রন্থই অধিক প্রসিদ্ধ। মনুর গ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। নিবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা অগণিত। যুগে যুগে বিভিন্ন প্রদেশে অজস্র নিবন্ধ-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। পি. ভি. কানে মনে করেন যে, প্রাচীন স্মৃতির টীকাটিপ্পনী ও নব্য স্মৃতি নিবন্ধগুলি সম্ভবতঃ ৭০০ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে রচিত।

বঙ্গীয় বা গৌড়ীয়, মৈথিল, দাক্ষিণাত্য ও বারাণসেয়, নব্য স্মৃতির এই কয়টি সম্প্রদায় সুবিদিত। বাঙালী স্মৃতিনিবন্ধকারদিগের মধ্যে ভবদেব ভট্ট (আনুমানিক ১১শ শতক), অনিরুদ্ধ ভট্ট (আনুমানিক ১২শ শতক), বল্লালসেন (১২শ শতক), হলায়ুধ (১২শ-১৩শ শতক), জীমূতবাহন (আনুমানিক ১৩শ-১৪শ শতক), শূলপাণি (আনুমানিক ১১শ-১৫শ শতকের মধ্যবর্তী কোনও সময়), শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি (আনুমানিক ১৫শ শতক) রঘুনন্দন (আনুমানিক ১৬শ শতক) ও গোবিন্দানন্দের (আনুমানিক ১৬শ শতক) নাম উল্লেখযোগ্য। মৈথিল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নিবন্ধকারদের মধ্যে শ্রীদত্তোপাধ্যায় (১২৭৫-১৩১০ খ্রী), চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর (১৪শ শতক), হরিনাথোপাধ্যায় (আনুমানিক ১৪শ শতক), বাচস্পতি-মিশ্র (১৫শ শতক), বর্ধমানোপাধ্যায় (১৫শ-১৬শ শতক), মিসরুমিশ্র (১৫শ শতক) ও রুদ্রধরোপাধ্যায় (আনুমানিক ১৪২৫-৬০খ্রী) প্রসিদ্ধ। বারাণসেয় সম্প্রদায়ের সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নিবন্ধকার মিত্রমিশ্র (১৭শ শতক)। ইহার রচিত 'বীরমিত্রোদয়' সুবিদিত গ্রন্থ। 'স্মৃতিচন্দ্রিকা'-রচয়িতা দেবন (বা দেবন্ন) ভট্ট (১২শ শতক) দাক্ষিণাত্যের সবিশেষ প্রসিদ্ধ নিবন্ধকার।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্মাধিকরণ বিচারালয় বা আদালত এই অর্থে প্রাচীন গ্রন্থে ধর্মাধিকরণ এই শব্দের প্রয়োগ আছে। বিচারককে ধর্মস্থ, ধর্মপ্রবক্তা বা ধর্মাধিকারী বলা হইত। ধর্মস্থ শব্দের অর্থ মেধাতিথি ধরিয়াছেন—'ধর্মস্থঃ ধর্মাধিকরণস্থঃ প্রাড্বিবাকঃ'। রাজা এবং একাধিক ধর্মস্থ বা ধর্মাধিকারী লইয়া ধর্মাধিকরণ গঠিত হইত। রাজার পক্ষে সকল সময় ধর্মাধিকরণের কার্য দর্শন সম্ভবপর না হইলে রাজা একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণকে প্রাড্বিবাক নিযুক্ত করিতেন। প্রাড্-

বিবাকই ধর্মাধিকরণের সভাপতিস্থানীয় ছিলেন। পক্ষ এবং সাক্ষীগণকে জিজ্ঞাসাবাদ তিনিই করিতেন। ধর্মাধিকরণে প্রাড়্‌বিবাক ছাড়া অন্ততঃ আরও তিনজন ধর্মাধিকারী থাকিতেন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও আছে, তিন-তিনজন ধর্মস্থ জনপদসন্ধি প্রভৃতি স্থানে বসিয়া ব্যাবহারিক ব্যাপার বিচার করিবেন। যে অষ্টাদশ বিবাদকার্য প্রধানতঃ লোকের বিবাদের মূল (মেধাতিথির মতে সেগুলি ছাড়াও বিবাদের হেতু থাকিতে পারে) সেগুলি সম্বন্ধে শাশ্বত ধর্ম অনুসরণ করিয়া কার্য-বিনির্ণয় করিবেন, ধর্মাধিকরণের ইহাই ছিল কর্তব্য। ধর্মাধিকরণে অর্থীপ্রত্যর্থীদের পক্ষে কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত হইতে পারিতেন কিনা, তাহার কোনও স্পষ্ট নির্দেশ নারদ-স্মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুস্মৃতি হইতে এই অনুমান সম্ভব যে, ধর্মাধিকরণে ধর্মস্থগণ এবং পক্ষগণ ছাড়াও তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতে পারিতেন; তবে মেধাতিথির মতে তাঁহারা পক্ষাবলম্বন করিবেন না।

সত্যাসত্য নির্ধারণ করা ছিল ধর্মাধিকরণের কর্তব্য; কিন্তু চূড়ান্ত আদেশ বা অন্ততঃ দণ্ড দিবার অধিকার ছিল রাজার।

এখনকার মত প্রাচীন কালে বিচারালয়ের উচ্চ নিম্ন ক্রমপর্যায় (যেমন প্রথম আদালত, আপিল আদালত প্রভৃতি) ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কুল, শ্রেণী, গণ প্রভৃতিরও স্ব স্ব বিষয়ে বিচার করিবার অধিকার ছিল, আধুনিক ভাষায় ইহাদিগকে বলা যাইতে পারে 'ডোমেষ্টিক ট্রাইবিউন্যাল'। কুলানি মেধাতিথি পাঠে এইরূপ মনে হয়, ইহাদের মধ্যে ক্রমপর্যায় ছিল এবং ক্রমান্বয়ে এক হইতে অন্যের নিকট অথবা একের পরিবর্তে অন্যের নিকট (যেমন কোনও এক বিচারকর্তা পক্ষপাতদুষ্ট হইলে) বিচার প্রার্থনা করা যাইতে পারিত। সর্বোপরি ছিলেন রাজা। এই সমস্ত কুল প্রভৃতির বিচারে কোনও পক্ষ পরাজিত হইলে রাজা পুনর্বিচার করিতেন, কিন্তু ন্যায়ভাবে পরাজিত হইয়া থাকিলে রাজা আপিলকারীকে দ্বিগুণ দণ্ড দিতে পারিতেন। ধর্মাধিকরণ অন্যায় বিচার করিলেও রাজার পুনর্বিচারের অধিকার ছিল। মনুর মতে, অন্যায় বিচার করিলে প্রাড়্‌বিবাক অথবা ধর্মস্থ-গণের সহস্র পণ দণ্ড হইত।

চারুচন্দ্র চৌধুরী

ধাতু আয়োডিন, কার্বন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস, ব্রোমিন, বিভিন্ন গ্যাস ইত্যাদি কয়েকটি মৌল ব্যতীত মৌলসমূহের পর্যায়সারণীর (পিরিয়ডিক টেব্‌ল) অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সকল মৌলই তাহাদের পারমাণবিক গঠনের পারম্পর্য এবং ইলেকট্রন-পরিবাহিতা (ইলেকট্রন কন্‌ডাকটিভিটি) প্রভৃতি বিশেষ গুণের জন্য ধাতু বলিয়া গণ্য হয়। একাধিক ধাতুর মিশ্রণে বিভিন্ন সংকর ধাতুর (অ্যালয়) উৎপত্তি ঘটে। সাধারণভাবে ধাতু ও সংকর ধাতু উভয়কেই ধাতু বলিয়া অভিহিত করা হয়। লৌহ ও তদ্‌ঘটিত সংকর ধাতুগুলিই সর্বাধিক ব্যবহৃত ধাতু। ধাতুর ব্যবহার ব্যতীত বর্তমান সভ্যতা আদৌ চলিতে পারে না। প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়। অল্প যে কয়টি ধাতু আদিযুগেই মানুষের কাজে লাগিয়া-ছিল, সম্ভবতঃ টিন তাহাদের অন্যতম।

অধিকাংশ ধাতুই সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থ-রূপে বর্তমান; অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও আছে, যথা পারদ সাধারণ তাপমাত্রায় তরল। ধাতব দ্যুতি, প্রসার্যতা, নানা অবস্থা ও পরিবেশে সক্রিয়তা, ইলেকট্রন-পরিবাহিতা, পারমাণবিক গঠনের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি ধর্মই ধাতুর পরিচয়। ব্যবহার ও ধর্ম অনুযায়ী ধাতু ও সংকর ধাতুগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ— ১. লৌহ-বর্গীয় ধাতু ও সংকর ধাতু: লৌহ, ঢালাই লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি ২. বর-ধাতু (নোব্‌ল মেটাল): সোনা, রুপা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু; ইহাদের অধিকাংশই সাধারণভাবে অ্যাসিডের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না ৩. সক্রিয় ধাতু: ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি ৪. তেজস্ক্রিয় ধাতু: ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি ৫. কঠিন ধাতু: টাংগ্‌স্টেন, মলিব্‌ডেনাম, ট্যান্‌ট্যালাম প্রভৃতি ধাতু-ঘটিত সংকর ধাতু ৬. কোমল ধাতু: টিন, সীসা প্রভৃতি ৭. দুর্গল ধাতু (রিফ্র্যাকটরি মেটাল): টাইট্যা-নিয়াম, টাংগ্‌স্টেন, ট্যান্‌ট্যালাম, নিওবিয়াম, জ্বার্‌কোনি-য়াম প্রভৃতি উচ্চ গলনাংকবিশিষ্ট ধাতু ৮. শৈত্যে ব্যবহার-যোগ্য ধাতু (ক্রায়োজেনিক মেটাল): যে সকল ধাতু বা সংকর ধাতু অতি শীতল তাপমাত্রায়— প্রায় -২৭৩° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয় ৯. পরি-বাহী ধাতু (কন্‌ডাক্‌টর মেটাল): তামা, রুপা, সোনা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু ১০. ভঙ্গুর ধাতু: টাংগ্‌স্টেন কার্বাইড, ট্যান্‌ট্যালাম কার্বাইড ইত্যাদি যে সকল সংকর ধাতু সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় ১১. বিরল মৃত্তিক ধাতু (রেয়ার আর্থ মেটাল): ল্যান্‌থেনাম, লুটেসিয়াম ইত্যাদি যে সকল ধাতু অত্যল্প পরিমাণে ভূত্বকে ছড়াইয়া আছে ১২. ক্ষার-ধাতু (অ্যাল্‌ক্যালি মেটাল): লিথিয়াম,

সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি যে সকল ধাতুর হাইড্রক্সাইড অত্যন্ত ক্ষারধর্মী ১৩. লঘু ধাতু: অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, টাইট্যানিয়াম প্রভৃতি ১৪. প্রলেপক ধাতু: সোনা, রুপা, তামা, দস্তা, টিন, ক্যাড্‌মিয়াম, পারদ, নিকেল প্রভৃতি যে সকল ধাতু অন্য ধাতু, কাচ বা প্লাস্টিকের উপর প্রলেপ দেওয়ার কার্যে প্রযুক্ত হয় ১৫. মুদ্রা ধাতু: সোনা, রুপা, নিকেল, তামা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি যে সকল ধাতু মুদ্রায় ব্যবহৃত হয় ১৬. চূর্ণ ধাতু: শিল্পে ব্যবহারের সুবিধার্থ সকল ধাতুকেই চূর্ণ অবস্থায় নিষ্কাশন বা আনয়ন করা যায়, এরূপ অবস্থার ধাতুকে চূর্ণ ধাতু বলে। এতদ্ব্যতীত গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে বহু নূতন নূতন শ্রেণীর ধাতু আবিষ্কৃত হইতেছে।

ভারতে লৌহ, ম্যাংগানিজ্, ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি কতিপয় সক্রিয় ধাতুও ভারতে পাওয়া যায়। টাইট্যানিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, দস্তা প্রভৃতি লঘু ধাতু এদেশে লভ্য আকরিক হইতে ভবিষ্যতে নিষ্কাশিত হইতে পারে। কিন্তু টাংগ্‌স্টেন, কোবাল্ট, নিকেল, মলিব্‌ডেনাম প্রভৃতি অন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধাতুর আকরিক এখনও ভারতে পাওয়া যায় নাই। এদেশে তামার আকরিকের অবক্ষেপ (ডিপজ়িট) অত্যন্ত কম। সোনা, রুপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুও ভারতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন ধাতু ও সংকর ধাতুর উৎপাদন, ইচ্ছানুরূপ আকারপ্রদান ও মানবকল্যাণে প্রয়োগকল্পে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনসাধন সম্পর্কিত বিজ্ঞান ধাতুবিদ্যা (মেটালার্জি) নামে পরিচিত। নূতন নূতন ধাতু ও সংকর ধাতু সম্বন্ধে গবেষণা ও অন্বেষণও সাধারণভাবে ধাতুবিদ্যার অন্তর্গত। শিল্পাদিতে ধাতু ও সংকর ধাতুর প্রয়োগ ধাতব এঞ্জিনিয়ারিং (মেটালার্জিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং) বিদ্যার অংশ।

অন্যান্য মৌলের মত ধাতুও প্রকৃতিতে মুক্ত অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌগ অবস্থায় বর্তমান। ভূবিদ্যায় বর্ণিত অবক্ষেপগুলিতে অধিকাংশ ধাতুই অক্সাইড, সাল্‌ফাইড, সাল্‌ফেট, কার্বনেট প্রভৃতি অবস্থায় পাওয়া যায়; কোনও কোনও মূল্যবান ধাতু শিলা ও অন্য খনিজের মধ্যে খুব ছড়াইয়া থাকে। আকরিক হইতে ধাতু নিষ্কাশনের জন্য প্রথমে ধাতব যৌগকে সংশ্লিষ্ট শিলা ও মৃত্তিকা-ঘটিত অপ্রয়োজনীয় পদার্থ হইতে পৃথক করা হয়। ঐ ধাতব যৌগের বিজারণের (রিডাক্‌শন) দ্বারা বিশুদ্ধ অথবা অন্যান্য ধাতুর সহিত মিশ্রিত অবস্থায় আকাঙ্ক্ষিত ধাতুটি উৎপন্ন হয়। নিষ্কাশনের এরূপ পদ্ধতি প্রায়ই উত্তাপভিত্তিক হইয়া থাকে। তড়িদ্‌বিশ্লেষ (ইলেক্‌ট্রোলিসিস) পদ্ধতির সাহায্যে নিষ্কাশনের সময় সাধারণতঃ আকরিক হইতে আহৃত ধাতব পদার্থের আয়ন-প্রদায়ী দ্রবণ হইতে তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে বিশুদ্ধ ধাতু উপযুক্ত আকারে নিষ্কাশন করা হয়; নিষ্কাশিত ধাতু সাধারণতঃ তড়িদ্‌বিশ্লেষক সেলের মধ্যে ক্যাথোড দণ্ডের উপর সঞ্চিত হয়। অনেক সময়েই লব্ধ ধাতুর গুণাবলীর উন্নতিকল্পে উহার আরও বিশোধনের প্রয়োজন হয়। নিষ্কাশনের ফলে গলিত অবস্থায় প্রাপ্ত ধাতুকে প্রয়োজনানুগ আকৃতির ছাঁচে ঢালাই করিয়া সরাসরি ব্যবহার করা যায়; অবশ্য প্রায়ই উহার আরও পরিবর্তনসাধনের আবশ্যকতা থাকে। চূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত ধাতুকে নির্দিষ্ট আকার প্রদানের পূর্বে সাধারণতঃ সংকর ধাতুতে পরিণত করিতে হয়। উৎপাদন ও আকারপ্রদানের পদ্ধতিগুলি প্রয়োগের ফলে ধাতুর ধর্মেরও বহু পরিবর্তন ঘটে।

সুজিতকুমার বসু

প্রাণিদেহে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, তামা, ম্যাংগানিজ্, দস্তা, কোবাল্ট, মলিব্‌ডেনাম, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু অল্পাধিক পরিমাণে অজৈব লবণ ও জৈব যৌগ-রূপে বর্তমান। ইহাদের মধ্যে প্রথম ৪টি ধাতু অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে এবং অবশিষ্টগুলি অত্যল্প মাত্রায় প্রাণিদেহে পাওয়া যায়। এজন্য শেষোক্ত ধাতুগুলিকে 'লেশ মৌল' (ট্রেস এলিমেন্ট্‌স) বলা হয়। ৬০ কিলোগ্রাম ওজনবিশিষ্ট পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দেহে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাতুর গড় পরিমাণ নিম্নরূপ: ক্যালসিয়াম- ১২০০ গ্রাম, পটাসিয়াম- ২০০ গ্রাম, সোডিয়াম- ৯০ গ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম- ৩০ গ্রাম, লৌহ- ২.৫ গ্রাম, ম্যাংগানিজ্- ২০০ মিলিগ্রাম এবং তামা- ৯০ মিলিগ্রাম।

আহার্য লবণ, মাখন, মার্গারিন, পনির, গলদা চিংড়ি, মেটে, কিডনি, ডিম প্রভৃতি খাদ্যে সোডিয়াম-ঘটিত যৌগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বর্তমান। দৈনিক খাদ্যে ১-২ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড নামক সোডিয়াম-ঘটিত লবণ থাকা প্রয়োজন। প্রত্যহ ঘাম, মূত্র, লালা প্রভৃতির সহিত যথেষ্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। অত্যধিক গরমে অতিরিক্ত ঘাম হইতে থাকিলে পানীয় জলের সহিত অল্প পরিমাণে লবণ মিশাইয়া পান করা উচিত, নচেৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের অভাবে পেশীর

ধাতু

অস্বাভাবিক সংকোচন ঘটিতে পারে। পক্ষান্তরে কিডনির প্রদাহ, গর্ভকালীন রক্তদুষ্টি (টক্সিমিয়া অফ প্রেগ্ন্যান্সি) প্রভৃতি যে সকল রোগে টিস্যুতে রসবৃদ্ধি (ইডিমা) ঘটে, সেগুলিতে লবণ আহার কমাইতে হয়। রক্তচাপবৃদ্ধি রোগেও খাদ্যে লবণের পরিমাণ হ্রাস করা আবশ্যক। রক্তরস, লসিকা (লিম্ফ), মস্তিষ্কসুষুম্নারস (সেরিব্রোস্পাইন্যাল ফ্লুইড) প্রভৃতি কোষবহির্ভূত রসে এবং অশ্রু, ঘর্ম, লালা ইত্যাদি ক্ষরণে সোডিয়াম ক্লোরাইড গুরুত্বপূর্ণ অজৈব লবণ। রক্তরস, লসিকা, দেহকলারস (টিস্যু ফ্লুইড) প্রভৃতি কোষবহির্ভূত রসে অভিস্রবণ প্রেষ (অস্মোটিক প্রেসার) অব্যাহত রাখিয়া সোডিয়াম ক্লোরাইড কোষের ভিতর ও বাহিরে জলের সুষম বণ্টনে সাহায্য করে। এজন্যই সোডিয়াম সকল কোষের স্বাভাবিক জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। ইহা ছাড়া সোডিয়াম হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন এবং পেশী, নার্ভ প্রভৃতি টিস্যুর স্বাভাবিক উদ্দীপনাশক্তি অব্যাহত রাখে।

অনেক সময়ে বন্য হাতীকে অরণ্যের উপান্তে লোকালয়ে লবণ খাইতে আসিতে দেখা যায়। গো-মহিষাদি প্রাণীকে পৃথকভাবে লবণ খাইতে দিবার আবশ্যকতাও সুবিদিত। এসকল উদ্ভিজ্জভোজী প্রাণীর অতিরিক্ত লবণ খাইবার প্রবণতা বা প্রয়োজনীয়তার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ অধিকাংশ উদ্ভিজ্জ খাদ্যে রক্ত, মাংস প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীর আহার্যের তুলনায় সোডিয়ামের পরিমাণ কম। দ্বিতীয়তঃ উদ্ভিজ্জ খাদ্যে পটাসিয়ামের মাত্রাধিক্য থাকায় তাহার প্রভাবে নিরামিষাহারী প্রাণীর মূত্রে সোডিয়ামের নির্গমন বৃদ্ধি পায়। এসকল কারণেই উদ্ভিজ্জভোজী প্রাণীকে পৃথকভাবে লবণ খাইতে হয়।

প্রাণিদেহের কোষাভ্যন্তরে পটাসিয়ামের পরিমাণ সোডিয়ামের তুলনায় অধিক ; কোষের বাহিরে অবস্থা ইহার বিপরীত। আখের গুড়, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালংশাক, মটর, গাজর, বীট, খেজুর, লেবু, কলা সয়াবিন প্রভৃতি খাদ্যে পটাসিয়ামের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। প্রাণিদেহে পটাসিয়াম হৃৎপিণ্ডের শ্লথন (ডায়াস্টোল) বৃদ্ধি করে এবং পেশী, নার্ভ প্রভৃতি টিস্যুর উদ্দীপনাশক্তিকে স্বাভাবিক রাখে। বিভিন্ন জৈব ক্রিয়ার সময় সক্রিয় কোষের ঝিল্লীতে তড়িত-বিভব সৃষ্ট হয় ; ইহাকে ঝিল্লী-বিভব বা 'মেম্ব্রেন পোটেন্শিয়াল' বলে। ইহার সৃজনে পটাসিয়াম আয়ন (ion) গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। পটাসিয়াম দেহে বিভিন্ন এন্‌জ়াইমের ক্রিয়ায় সহায়তা করে। লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক রঙ্গক (পিগ্‌মেণ্ট) পদার্থটি পটাসিয়াম-ঘটিত যৌগরূপেই বর্তমান।

মূত্রে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম -ঘটিত লবণের নির্গমন, কোষের ভিতর ও বাহিরে তাহাদের সুষম বণ্টন প্রভৃতি কার্য অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির বহিরাংশের হর্মোন 'অ্যাল্‌ডোস্টেরোন' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

দেহে ক্যালসিয়ামের অধিকাংশই অস্থিতে ফসফরাস-ঘটিত লবণরূপে বর্তমান। প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষের দৈনিক আহার্যে ১ গ্রাম, গর্ভবতী নারীর দৈনিক খাদ্যে ১·৫ গ্রাম এবং স্তন্যদাত্রী মাতার প্রাত্যহিক আহার্যে ২ গ্রাম ক্যালসিয়াম থাকা প্রয়োজন। খর জল, দুধ, পনির, ডিমের কুসুম, আইসক্রিম, বাদাম, লেটুস, সয়াবিন, গাজর, বাঁধাকপির সবুজ পাতা, ওলকপি, আখের গুড়, পানের সহিত ব্যবহৃত চুন প্রভৃতি হইতে যথেষ্ট ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। গম, ওট্‌স প্রভৃতি খাদ্যশস্যে ফাইটিক অ্যাসিড এবং পালংশাক, ওল, কচু প্রভৃতিতে অক্সালিক অ্যাসিড বর্তমান ; এসকল খাদ্যের ক্যালসিয়াম ঐ অ্যাসিডগুলির সহিত মিলিয়া অদ্রাব্য যৌগ উৎপন্ন করে, ফলে অন্ত্র হইতে সেই ক্যালসিয়ামের বিশোষণ অত্যন্ত ব্যাহত হয়। ভিটামিন ডি অন্ত্র হইতে ক্যালসিয়ামের বিশোষণে এবং ক্যালসিয়াম-ঘটিত লবণের সাহায্যে অস্থিগঠনে সাহায্য করে।

ক্যালসিয়াম অস্থি ও দন্তের অপরিহার্য অংশ এবং উহাদের কাঠিন্য ও দৃঢ়তার কারণ। খাদ্যে ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন ডি-এর অভাব ঘটিলে অস্থির উৎপাদন ও গঠন বিপর্যস্ত হয়, ফলে শিশুর 'রিকেট্‌স' রোগ হইতে পারে। দেহে নার্ভ ও পেশীর অতিরিক্ত উদ্দীপনা হ্রাস করিয়া ক্যালসিয়াম তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় সাহায্য করে ; রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমিয়া গেলে নার্ভ ও পেশীর উদ্দীপনা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায় ও 'টিটানি' রোগ জন্মায়। রক্তপাতের সময় রক্ততঞ্চনে সাহায্য করিয়া ক্যালসিয়াম অত্যধিক রক্তক্ষয় রোধ করে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ক্যালসিয়ামের প্রভাবে বৃদ্ধি পায়। ক্যালসিয়াম দুধের অন্যতম উপাদান, সেজন্য স্বাভাবিক দুগ্ধক্ষরণের জন্যও ইহার আবশ্যকতা আছে।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির হর্মোন 'প্যারাথর্মোন' অস্থি হইতে উপযুক্ত মাত্রায় ক্যালসিয়ামকে রক্তে মুক্ত করিয়া দিয়া রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অব্যাহত রাখে।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যে দৈনিক ৫০০-৬০০ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম থাকাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। চাল, গম, বাদাম, সয়াবিন প্রভৃতি খাদ্যে ইহার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য।

ম্যাগনেসিয়াম দেহে নার্ভ ও পেশীর অতিরিক্ত উদ্দীপনা রোধ করে; রক্তে ম্যাগনেসিয়ামের মাত্রাল্পতা ঘটিলে ঐ সকল টিস্যুর উদ্দীপনাশক্তি অত্যন্ত বর্ধিত হয়, ফলে 'টিটানি' রোগ জন্মায়।

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দৈনিক খাদ্যে ১০ মিলিগ্রাম, প্রাপ্তবয়স্ক নারীর প্রাত্যহিক আহার্যে ১২ মিলিগ্রাম এবং গর্ভবতী বা দুগ্ধদাত্রী নারীর দৈনিক আহার্যে ১৫ মিলিগ্রাম লৌহ থাকা উচিত। মাংস, মেটে, ডিমের কুসুম, কিডনি, মসুর ডাল, বাদাম, কিসমিস, সয়াবিন, আখের গুড় প্রভৃতি খাদ্যে লৌহের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। দেহে জারণ (অক্সিডেশন)-এর সহায়ক নানা এন্‌জাইমের অণুতে লৌহ আছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ সাইটোক্রোম অক্সিডেজ্‌, পেরক্সিডেজ্‌ প্রভৃতি এন্‌জাইম উল্লেখনীয়। আবার যে সকল রঙ্গক পদার্থ শ্বাসকার্যে সহায়তা করে, তাহাদের অনেকের অণুতেই লৌহ বর্তমান; লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন এবং অধিকাংশ কোষের রঙ্গক পদার্থ সাইটোক্রোম এজাতীয় লৌহ-ঘটিত শ্বাস-রঙ্গক (রেস্‌পিরেটরি পিগ্‌মেণ্ট)। হিমোগ্লোবিনের অণুতে লৌহ থাকায় লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনের জন্য লৌহ অপরিহার্য; খাদ্যে লৌহের অভাব ঘটিলে হিমোগ্লোবিন ও লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন বিপর্যস্ত হওয়ায় রক্তাল্পতা রোগ জন্মায়।

দৈনিক আহার্যে ১-২ মিলিগ্রাম তামা থাকা প্রয়োজন। মেটে, ডিম, ডাল, শাকসবজি প্রভৃতি খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে তামা আছে। লৌহের সাহায্যে হিমোগ্লোবিন উৎপাদনের কার্যে তামা অনুঘটক হিসাবে অংশগ্রহণ করে; সেজন্যই তামার অভাবে রক্তাল্পতা রোগ হইতে পারে। প্রাণিদেহে টাইরোসাইনেজ্‌, স্কোয়াশ-এ অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড অক্সিডেজ্‌ প্রভৃতি এন্‌জাইমের অণুতে তামা আছে। কবচী প্রাণীর (ক্রুস্‌তাসিয়া) রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিবর্তে হিমোসায়ানিন নামে তাম্র-ঘটিত শ্বাস-রঙ্গক বর্তমান।

তামার মতই কোবাল্টও হিমোগ্লোবিন উৎপাদনে লৌহের অংশগ্রহণে সাহায্য করে। কোবাল্টের অভাবে হিমোগ্লোবিন উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় অন্ততঃ গোমহিষাদি গৃহপালিত প্রাণীর রক্তাল্পতা রোগ হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ভিটামিন বি-১২ নামক বি-বর্গীয় ভিটামিনের অণুতে কোবাল্ট বর্তমান।

প্রাত্যহিক খাদ্যে ৫ মিলিগ্রাম ম্যাংগানিজ্‌ থাকাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। মেটে ও অন্যান্য অনেক খাদ্যে ম্যাংগানিজ্‌ থাকে। দেহে হেক্সোকাইনেজ্‌, ফস্‌ফাটেজ্‌, আর্জিনেজ্‌ প্রভৃতি এন্‌জাইমের কার্যে ইহা অংশগ্রহণ করে।

দৈনিক খাদ্যে ১০ মিলিগ্রাম দস্তা থাকাই যথেষ্ট। লোহিত রক্তকণিকার অভ্যন্তরে কার্বনিক অ্যান্‌হাইড্রেজ্‌ নামক যে এন্‌জাইমটি কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে কার্বনিক অ্যাসিড উৎপাদন করে, দস্তা তাহার অপরিহার্য অংশ।

মলিব্‌ডেনাম ধাতুটি জ্যান্‌থিন অক্সিডেজ্‌, নাইট্রেট রিডাক্‌টেজ্‌ প্রভৃতি জারণ-সহায়ক এন্‌জাইমের অণুতে বর্তমান।

তামা, কোবাল্ট, ম্যাংগানিজ্‌, দস্তা, মলিব্‌ডেনাম প্রভৃতি ধাতু খাদ্যে অল্প পরিমাণে থাকিলেই চলে এবং অনেক খাদ্যেই ইহারা বর্তমান; সেজন্য সাধারণতঃ খাদ্যে ইহাদের লভ্যতা সম্বন্ধে পৃথক মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। 'লেশ মৌল' শ্রেণীর অন্তর্গত অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল প্রভৃতি ধাতু আদৌ দেহের কোনও কাজে লাগে কিনা, সঠিক জানা নাই।

দ্র A. L. Lehninger, 'Role of metal ions in enzyme systems', *Physiological Reviews*, vol. 30, 1950; W. D. Mc Elroy & B. Glass, *Copper Metabolism*, Baltimore, 1950; M. G. Wohl & R. S. Goodhart, *Modern Nutrition in Health and Disease*, Philadelphia, 1955; J. T. Irving, *Calcium Metabolism*, London, 1957; T. H. Bothwell & C. A. Finch, *Iron Metabolism*, Boston, 1962.

দেবজ্যোতি দাশ

ধাত্রীবিদ্যা সন্তানসম্ভাবনার প্রারম্ভ হইতে শিশুজন্মের পর পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রসূতিপরিচর্যা। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদে চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসাশাস্ত্রে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিপরিচর্যার বিবরণ পাওয়া যায়, প্রসবকার্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির বিবরণও দৃষ্ট হয়— ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'যুগ্ম পঞ্চ'। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, সে যুগে প্রসবকালীন অস্ত্রোপচারের প্রচলন ছিল। নিউবার্গার-এর মতে, এ বিষয়ে ভারতের সহিত হিব্রু ও গ্রীক সভ্যতার যোগসূত্র লক্ষণীয়। হিপ্পোক্রাতেস (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০-৩৭৭ অব্দ)-এর রচনায় হিব্রু ও মিশরীয় ধাত্রীর এবং তৎকালীন ধাত্রীবিদ্যার উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে সোরানিয়স ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেন। তবে খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকের আগে বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা

হিসাবে প্রসূতিপরিচর্যার অগ্রগতি হইতে দেখা যায় নাই। বঙ্গদেশে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয় এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রসূতিবিভাগ খোলা হয়।

ধাত্রীবিদ্যায় বিশদ জ্ঞানলাভের জন্য স্ত্রীলোকের তলপেটের গঠন ও সংস্থান সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। ইহার গহ্বরেই সন্তানের দেহ গঠিত হয় এবং প্রসবের সময় নানাবিধ দৈহিক কৌশলের মাধ্যমে এখান হইতেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সুতরাং সন্তানের নিরাপদ নির্গমনের জন্য মাতার তলপেটের আকার ও মাপের জ্ঞান থাকা ধাত্রীর পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন।

গর্ভসঞ্চার হইতে প্রসববেদনা পর্যন্ত প্রসূতির পরিচর্যা ধাত্রীর কার্য। প্রসূতির কিভাবে চলাফেরা করা উচিত, কেমন খাদ্য গ্রহণ ও পরিধেয় ব্যবহার করা উচিত এবং কিভাবে তাহার শুশ্রূষা করা কর্তব্য, এসকলের নির্দেশ ধাত্রীবিদ্যায় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কি উপায়ে সহজে বিনা সংকটে প্রসব হইতে পারে, প্রসবের সময় ও পরে মাতা ও শিশু সুস্থ থাকিতে পারে, সেসকল ব্যবস্থাও ধাত্রীবিদ্যা হইতেই জানা যায়। শিশুর জন্মের সময় কোনও প্রকার অসুবিধা হইবে কিনা, তাহা পূর্ব হইতেই বোঝা যায়। তদনুসারে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া মাতা ও নবজাত শিশুকে নিরাপদে রাখা, প্রসবের পর প্রসূতির ক্ষতস্থানে জীবাণুর সংক্রমণ রোধ করা প্রভৃতি কার্যও ধাত্রীবিদ্যার অন্তর্গত। ধাত্রীবিদ্যার সুপ্রয়োগের দ্বারা গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব সম্পর্কে বহু বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়।

সরলা ঘোষ

ধান একবীজপত্রী ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ওরিজা সাতিভা (*Oryza sativa*); গোত্র—গ্রামিনিঈ (Family-Gramineae)। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য। ভারতে মোট ৩৬০৭৭০০০ হেক্টরে ধান চাষ করা হয় এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৩৮৭৩২০০০ মেট্রিক টন। এদেশে আউশ, আমন ও বোরো ধান প্রচলিত। ঢুলার, ধাইরাল, এন. সি. ১৬২৬, ষাটিকা, চার্নক, আঁশকাটা প্রভৃতি জাতের আউশ; সীতাশাল, রঘুশাল, লাঠিশাল, ঝিঙ্গাশাল, ভাদামানিক, বাদকলমকাটি ৬৫ নং, চূর্ণকাটি, নাগরা ৪১/১৪, আছড়া ১০৮/১, পাটনাই ২৩ নং কাটারি-ভোগ, বাদশাভোগ (সুগন্ধি) প্রভৃতি জাতের আমন এবং চিন্‌সুরা বোরো ১নং, টেপা প্রভৃতি জাতের বোরো উল্লেখযোগ্য। লবণাক্ত মাটির জন্য এস. আর. ২৬-বি, পাটনাই ২৩ নং ও সীতাশাল এবং বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে এফ. আর. ১৩-এ, এফ. আর. ৪৩-বি ইত্যাদি উপযোগী। কতকগুলি আমন ধান খারিফ এবং বোরো উভয় ঋতুতেই সাফল্যের সহিত চাষ করা যায় এবং বোরোতে ফলন বেশি দেয়। লাঠিশাল এবং বাদকলমকাটি ৬৫ নং এই পরীক্ষায় আশাতীত ফলন দেওয়ায় বর্তমানে ইহাদের চাষের ব্যাপক প্রসার করা হইতেছে। আউশ আষাঢ়-শ্রাবণে, আমন শ্রাবণে ও বোরো অগ্রহায়ণ-পৌষে বপন করা হয়। বোরো বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে, ছিটাইয়া-বোনা আউশ শ্রাবণ-ভাদ্রে, রোয়া আউশ আশ্বিনে, জলদি জাতের আমন কার্তিকে এবং নাবি জাতের আমন পৌষে পাকে।

অধুনা তাইওয়ান হইতে আনা একটি নূতন জাতের ধান ভারতের সর্বত্র আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। তাইচুং (দেশী)-১ একটি আউশ-জাতীয় বেঁটে আকারের ধান; ইহা প্রচুর সার প্রয়োগেও হেলিয়া পড়ে না। ইহা আউশ, আমন এবং বোরো সব মরসুমেই চাষ করা যায়, প্রচুর ফলন দেয় এবং ব্যাঙচোখ রোগ প্রতিরোধ করে।

ধানচাষের জন্য উর্বর জমি ও প্রচুর জল প্রয়োজন। ৪-৬ বার চাষ দিয়া জমি তৈয়ারি করিতে হয় এবং ১৫-২০ বার সেচের প্রয়োজন হয়। ধান ছিটাইয়া বা রোয়া লাগাইয়া চাষ করা যায়। ছিটাইয়া বপন করিলে হেক্টরপ্রতি ৪৬-৬৯ কিলোগ্রাম ও রোয়া লাগাইলে হেক্টরপ্রতি ২৩ কিলোগ্রাম বীজধানের প্রয়োজন। ধান-বীজ নুনজলে ডুবাইয়া, ডুবিয়া যাওয়া (পুষ্ট) বীজ শুখাইয়া রোগনাশক ঔষধ দিয়া শোধন করিয়া ব্যবহার করিলে বীজবাহিত রোগ দমন করা যায়। রোয়া ধানে বীজ কম লাগে, আগাছা-নিয়ন্ত্রণের ব্যয় কম হয় এবং হেক্টরপ্রতি প্রায় ২.৮ কুইন্টাল অধিক ফসল পাওয়া যায়। ছিটাইয়া বপনে জমিতে কাদা করিয়া বীজ ছিটানো হয়; রোয়া ধানের জমিতে কাদা করিবার অন্ততঃ ১ মাস পূর্বেই বীজতলায় বীজ বপন করা উচিত। বর্তমানে উন্নত পদ্ধতিতে উঁচু ও স্বল্পপ্রশস্ত বীজতলায় জৈব সার দিয়া বীজ বসানো হয়। বীজতলা হইতে ৩০-৫০ দিনের চারা-গুলি তুলিয়া আনিয়া চাষের জমিতে রোপণ করা হয়; চাষের জমিতে সেসময় ৫-১০ সেন্টিমিটার জল দাঁড়াইয়া থাকা প্রয়োজন। আউশ ধানের রোয়া ২৩ এবং আমন ২৫ সেন্টিমিটার অন্তর সারিতে বসানো হয়। সারির মধ্যে রোয়ার দূরত্ব ১৫-২০ সেন্টিমিটার রাখা উচিত। প্রতি গর্তে ২-৩টির অধিক চারা দেওয়া উচিত নয়।

জমির অবস্থা অনুযায়ী হেক্টরপ্রতি ২২-৪৫ কিলোগ্রাম

নাইট্রোজেন ও ২২-৪৫ কিলোগ্রাম ফস্‌ফেট-ঘটিত সার প্রয়োগ করা চলে। আউশ ধান পাকিতে কম সময় লাগে এবং ইহা বেশি সার লইতে পারে না, সেজন্য আউশে অপেক্ষাকৃত কম সার লাগে। ফস্‌ফেট সার জমিতে কাদা করিবার সময় প্রয়োগ করা বিধেয়। ছিটাইয়া বপনের ক্ষেত্রে বপনের সময় মোট নাইট্রোজেন সারের দুই-তৃতীয়াংশ ও প্রথম নিড়ানোর সময় অবশিষ্টাংশ প্রয়োগ করা ভাল। রোয়া ধানের ক্ষেত্রে উক্ত সারের অর্ধাংশ কাদা করিবার সময় ও বাকি অর্ধাংশ রোয়া বসাইবার ১ মাস পরে প্রয়োগ করিতে হয়। জৈব সারের জন্য হেক্টরপ্রতি প্রায় ৫০ গাড়ি আবর্জনা সার দেওয়া ভাল। কয়েক বৎসর অন্তর জমিতে সবুজ সারের চাষ করা উচিত; সবুজ সারের চাষের দরুন সেই বৎসর আউশ ধানের চাষ করা যায় না।

ধানের প্রধান রোগ তিলছিট (হেল্‌মিন্‌থোস্‌পোরিয়াম), শিকড়পচা এবং ব্যাঙচোখ (পাইরিকুলেরিয়া)। বপনের পূর্বে বীজ-শোধনে উপকার পাওয়া যায়। কীট-শত্রুর মধ্যে মাজরা পোকা, লেদা পোকা, শিষকাটা লেদা পোকা, গন্ধি পোকা, ফড়িং এবং পামরি পোকা প্রধান। সময়মত কীটনাশকের প্রয়োগে পোকা দমন করা যায়।

ফসল-তোলা পর্যন্ত প্রায় সকল সময়েই ধানের জমিতে দাঁড়ানো জল রাখা প্রয়োজন। ইহা জমিতে আগাছা জন্মানো বন্ধ রাখে। রোয়া বসাইবার প্রায় ৪০ দিন পরে জমি হইতে সমস্ত জল বাহির করিয়া দিয়া ৫-৭ দিন পরে আবার নূতন করিয়া জল আটকাইয়া দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ধানের ফুল ফুটিবার সময় জমিতে অবশ্যই জল থাকা প্রয়োজন, তবে চাল শক্ত হইবার সময় অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

ধান সম্পূর্ণ পাকিয়া শুখাইয়া যাওয়ার পূর্বেই কাটা উচিত। ইহার পর ধান ঝাড়িয়া লওয়া হয়। আধুনিক পদচালিত যন্ত্রে ঝাড়াই ভাল হয় এবং খরচও কম পড়ে। ভালভাবে না শুখাইয়া ধান গুদামজাত করা অনুচিত। 'চাল' দ্র।

দ্র Indian Council of Agricultural Research, *Handbook of Agriculture*, New Delhi, 1966; *Indian Agriculture in Brief*, Delhi, 1966.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

ধান বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় পঞ্চশস্যের (ধান, মাষকলাই, মুগ, তিল ও যব) অন্যতম; পবিত্র ও মাঙ্গলিক দ্রব্য। দেবপূজায় ঘটের নীচে ধান দিতে হয়। লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীর আসনে ধান রাখিতে হয়। ধান্যাঙ্কুরযুক্ত স্থানে কার্তিকপূজা করার বিধান। মাটির সরায় ধানের চারা গজাইয়া কার্তিকপ্রতিমার পাশে রাখা হয়। ইহাকে 'হালা' বলা হয়। যমপুকুর ব্রত, ইতুপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও ধানের চারার প্রয়োজন হয়। মাথায় ধান-দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করা হয়। নূতন গৃহে প্রবেশের সময় গৃহিণীকে ধানভরা কুলা মাথায় লইয়া যাইতে হয়। ধান্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে (বোনা, কাটা, ঘরে আনা প্রভৃতি) পবিত্র ও আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ করিবার নিয়ম আছে। আশ্বিনের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত গারু বা গামি ব্রতে ধানগাছকে সাধ খাওয়ানোর উৎসব করা হয়। সকলের বড় উৎসব নূতন ধানের চাল প্রথম ব্যবহারের উৎসব। 'নবান্ন' দ্র।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ধানবাদ বিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটি জেলা, মহকুমা ও শিল্পনগর। জেলাটি ২৩°২৫′ হইতে ২৪°৪′ উত্তর এবং ৮৬°৪′ হইতে ৮৬°৫০′ পূর্বে বিস্তৃত। প্রাক্তন মানভূম জেলার ধানবাদ মহকুমার সহিত পুরুলিয়া মহকুমার চাস ও চন্দনকেয়াড়ি থানাদ্বয় যুক্ত করিয়া রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর বিহার-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে এই জেলাটি গঠিত হয়। ইহার পশ্চিমে হাজারিবাগ জেলা, উত্তরে হাজারিবাগ ও সাঁওতাল পরগনা জেলা, পূর্বে বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলা এবং দক্ষিণে পুরুলিয়া জেলা অবস্থিত। জেলার মোট আয়তন ২৮৮৫ বর্গ কিলোমিটার (১১১৪ বর্গ মাইল)। জেলাটি সদর ও বাঘমারা এই দুইটি মহকুমায় বিভক্ত। জেলায় ১০টি উন্নয়ন অঞ্চল, ১৬টি থানা ও ১৯টি শহর আছে।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে ধানবাদ জেলার উত্তর অংশ গণ্ডোয়ানা-কয়লা অধ্যুষিত, মধ্যভাগ আর্কিয়ান যুগের নীস ও শিস্ট দ্বারা গঠিত ও দক্ষিণপ্রান্ত ধারওয়ার যুগের শিলার ন্যায় শিলাদ্বারা গঠিত। জেলাটির উত্তর-পশ্চিমাংশ অসম বা বন্ধুর। কিছু উত্তরে পরেশনাথ পাহাড় অবস্থিত। মৃত্তিকা অধিকাংশই অনুর্বর ল্যাটেরাইট-জাতীয়। উত্তরের পাহাড়ী অঞ্চলে শাল, শিশু, শিরীষ, মহুয়া ও পলাশ বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। প্রধান নদী দামোদর জেলার মধ্য দিয়া এবং বরাকর জেলার উত্তর সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

জেলার জলবায়ু শুষ্ক। শীতকাল আরামদায়ক। বার্ষিক সর্বোচ্চ গড় উত্তাপ ২৪° সেন্টিগ্রেড (৭৬° ফারেন-

হাইট) ও সর্বনিম্ন গড় উত্তাপ ১৪° সেন্টিগ্রেড (৫৮° ফারেনহাইট)। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ১৩০৬ মিলিমিটার (৫১'৪ ইঞ্চি)। জুলাই মাসে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়।

জেলার শতকরা ৩৭ ভাগ জমিতে কৃষিকার্য করা হয়। প্রধান কৃষিজ দ্রব্য ধান, গম, ইক্ষু ও তৈলবীজ। ভুট্টা ও নানাবিধ ডাল প্রচুর উৎপন্ন হয়। ধানবাদের ঝরিয়া অঞ্চল গণ্ডোয়ানা-কয়লার জন্য বিখ্যাত। ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান কয়লা উৎপাদনকেন্দ্র। ইহা ব্যতীত লৌহ, অভ্র, চীনামাটি, চুনাপাথর প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়।

জেলার মোট লোকসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে ১১৫৮৬১০ জন। কৃষিকার্য, খনির কার্য এবং চাকরিই অধিবাসীগণের প্রধান উপজীবিকা।

জেলার গণ্ডোয়ানা-কয়লা অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া বহু শিল্প-অঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে কয়লা-উত্তোলন (ঝরিয়া), সার-উৎপাদন (সিন্দ্রি), 'ফায়ার ক্লে' প্রস্তুতকরণ (কুমারডুবি) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের পাঞ্চেত ও দামোদর বাঁধের সাহায্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ও জলসেচে জেলার শিল্প ও কৃষির প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। ধানবাদ শহর হইতে ৪৬ কিলোমিটার দূরে চন্দ্রপুরায় তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ঝরিয়া ও সিন্দ্রি এই জেলার শিল্পনগরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

জেলায় যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা আছে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। জেলায় রজ্জুপথেরও ব্যবহার আছে। জল সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত তোপচাঁচির হ্রদটি প্রমোদকেন্দ্র হিসাবেও মনোরম।

ধানবাদ (২৩°৪৮' উত্তর এবং ৮৬°২৬' পূর্ব) জেলার প্রধান শহর ও শাসনকেন্দ্র। শহরটি আসানসোল হইতে ৫৯ কিলোমিটার (৩৭ মাইল) পশ্চিমে এবং কলিকাতা হইতে ২৫৭ কিলোমিটার উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ধানবাদ পূর্বরেলপথের গ্র্যাণ্ড কর্ড শাখার জংশন স্টেশন। ধানবাদ মিউনিসিপ্যালিটির মোট জনসংখ্যা ৪৬৭৫৬ জন ও রেলওয়ে কলোনির মোট জনসংখ্যা ১০৫৯৬ জন। এখানে খনিবিদ্যা শিখাইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। জিয়ালগোবার ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউট উল্লেখযোগ্য গবেষণা-প্রতিষ্ঠান।

দ্র *Bengal District Gazetteers : Manbhum*, Calcutta, 1911 ; *Census of India 1961 : Paper No. I of 1962*, New Delhi, 1962 ; *Bihar District Gazetteer : Dhanbad*, Patna, 1964.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ধামার ধামার গান ভারতীয় রাগ-সংগীতের একটি বিশিষ্ট গীতিরীতিরূপে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ধামার একটি তালের নাম। ধ্রুপদাঙ্গের যে গান চৌদ্দ মাত্রায় গঠিত, তাহাই ধামার ; কিন্তু ধ্রুপদের সহিত ইহার কিছু পার্থক্য আছে। ধ্রুপদ-সংগীত গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং ঋজু প্রকৃতির ; ধামার গান বিষয়বস্তু ও পরিবেশনার বৈশিষ্ট্যে অপেক্ষাকৃত লঘু প্রকৃতির। আসরে ধ্রুপদের পরে ধামার পরিবেশিত হইয়া থাকে। ধামার গানের কথাবস্তুতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা এবং শৃঙ্গাররসাত্মক বিষয়ের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ভারতে বৃন্দাবন ও মথুরার নিকটবর্তী যতিপুরায় ধামার গানের ঐতিহ্য ও চর্চা সমধিক ছিল। ২০শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও ধামার গানকে 'বাঁট'-এর চিত্তাকর্ষক প্রয়োগের দ্বারা বাংলাদেশের সংগীত-আসরে জনপ্রিয় করিয়া তুলেন।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ধার (২২°৩৫' উত্তর ও ৭৫°১৫' পূর্ব) মধ্য প্রদেশ রাজ্যের ধার জেলার সদর শহর। ইহার প্রাচীন নাম ধারা, মালবের পরমার-বংশীয় নৃপতিদের প্রখ্যাত রাজধানী। ধারের প্রাচীনত্ব প্রাক্-পরমার-যুগীয় হইলেও পরমার যুগেই ইহার সমৃদ্ধি। মুঞ্জ (আনুমানিক ৯৭৪-৯৯৫ খ্রী), সিন্ধুরাজ (আনুমানিক ৯৯৫-১০০০ খ্রী) এবং ভোজ (আনুমানিক ১০০০-১০৫৫ খ্রী)—এই তিন পরমার-নৃপতির রাজত্বকালেই ধারার চরম সমৃদ্ধি এবং বিদ্যানিকেতনরূপে বিপুল খ্যাতি হয়। এই পরাক্রান্ত রাজগণ সাহিত্য ও শিল্পকলার উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ধনঞ্জয়, ভট্ট হলায়ুধ, ধনিক, পদ্মগুপ্ত, অমিতগতি, শোভন, ধনপাল ও উবট প্রমুখ যশস্বী গ্রন্থকারবৃন্দ ইহাদের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। মুঞ্জ এবং ভোজ উভয় নরপতিই কবি এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে বিরচিত ২০টিরও অধিক গ্রন্থ ধারেশ্বর ভোজের নামে প্রচলিত আছে। সমসাময়িক এবং পরবর্তী কবিদের রচনায় ধারার প্রশস্তি পাওয়া যায়।

ত্রয়োদশ শতকে পরমারদের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং অবশেষে ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর সেনানায়ক আইন-উল-

মুল্‌কের হস্তে এই রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সময় হইতে ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধারা দিল্লীর অধীন মালবের শাসকবর্গের প্রধান কর্মস্থল ছিল। ১৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান মহম্মদ বিন তোগলক এই স্থলে আগমন করেন এবং তাঁহার নির্দেশে ধারায় একটি পাথরের প্রাকারবেষ্টিত দুর্গ নির্মিত হয়। ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে মালবের তদানীন্তন শাসক দিলওয়ার খাঁ ঘুরী মালবের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহার পুত্র সুলতান হুসঙ্গ শাহ্‌ ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী ধারা হইতে মাণ্ডুতে স্থানান্তরিত করেন। ইহার ফলে ধারার গুরুত্ব ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে থাকে। অষ্টাদশ শতকে পাওয়ারের মারাঠা-বংশের ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী এস্থলে স্থাপিত হইলে ধারার লুপ্ত গৌরব আংশিকভাবে পুনরুদ্ধার হয়।

ধারায় পরমারদের সমস্ত কীর্তিই এখন অবলুপ্ত। আধুনিক ধার শহরের প্রান্তভাগে বিদ্যমান কমল মৌলা মসজিদ প্রাচীন ভোজশালার উপাদানে নির্মিত। আদিতে এই ভোজশালা সরস্বতীমন্দির ও তৎসংশ্লিষ্ট বিদ্যাপীঠ ছিল। সরস্বতীর মূর্তিটি এখন লণ্ডনের ব্রিটিশ সংগ্রহালয়ে রহিয়াছে। মসজিদের প্রধান মেহ্‌রাবের দেওয়ালে প্রাপ্ত একটি প্রকাণ্ড ফলকে পরমার-নৃপতি অর্জুনবর্মণের রাজত্বকালে রাজগুরু মদন বালসরস্বতী (১৩শ শতক) কর্তৃক বিরচিত 'পারিজাত-মঞ্জরী' নামক নাটিকার ১ম ও ২য় অঙ্ক উৎকীর্ণ। মেহ্‌রাবের দেওয়ালের আর একটি ফলকে বিষ্ণুর কূর্ম অবতারের দুইটি স্তোত্র উৎকীর্ণ; ইহাদের মধ্যে একটি নৃপতি ভোজের রচনা বলিয়া বিবেচিত হয়। কয়েকটি পাথরে আবার বর্ণমালার লিপি এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র ও নিয়মাবলী উৎকীর্ণ দেখা যায়; সম্ভবতঃ বিদ্যার্থীদের শিক্ষার নিমিত্ত এগুলি উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল।

প্রাচীন সৌধটির পৃষ্ঠবেদীর উপর কমল মৌলা মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদের মধ্যভাগে বৃহৎ উন্মুক্ত অঙ্গন। অঙ্গনের সম্মুখভাগে প্রবেশকক্ষ, পার্শ্বদ্বয়ে স্তম্ভবীথি এবং পশ্চাতে প্রশস্ত উপাসনাকক্ষ। স্তম্ভগুলি ও উপাসনাকক্ষের কারুকার্যখচিত সিলিং (ceiling) প্রাচীন সৌধটি হইতে সংগৃহীত। মসজিদের প্রবেশিকার সন্নিকটে এবং একটি ক্ষুদ্রাকার বেষ্টনীর মধ্যে ৪টি সমাধি বিদ্যমান; ইহাদের মধ্যে একটি মাহমুদ খিলজীর এবং আর একটি শেখ কমল মৌলার বলিয়া বিবেচিত হয়।

শহরের দক্ষিণ প্রান্তে লাট-কী-মসজিদ দণ্ডায়মান; ইহার প্রবেশিকার সম্মুখস্থ খণ্ডিত লৌহস্তম্ভটির নামেই ইহার নামকরণ। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইহাকে জামী মসজিদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দিলওয়ার খাঁ কর্তৃক নির্মিত এই মসজিদের ভিত্তি-নকশা ও রূপকল্প কমল মৌলা মসজিদের অনুরূপ। স্তম্ভবীথিতে হিন্দুস্তম্ভ ও ব্র্যাকেট-সমূহের এবং প্রার্থনাকক্ষের গম্বুজগুলির অধোভাগে হিন্দুমন্দিরের সিলিং-এর ক্ষোদিত প্রস্তরের প্রয়োগ দেখা যায়। ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যের মালব রূপরীতির প্রথম পর্বের নির্দেশক এই মসজিদদ্বয়।

লৌহস্তম্ভটির নির্মাতা ও নির্মাণকাল সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে এইটি পরমার-যুগের একটি জয়স্তম্ভ। স্তম্ভটির খণ্ডিত সর্বনিম্নাংশের একটি লেখ হইতে জানিতে পারা যায়, সম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্যের পথে এ স্থলে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

১৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ বিন তোগলক কর্তৃক নির্মিত পাথরের দুর্গটির অভ্যন্তরস্থ ইমারত স্থাপত্যের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যহীন।

ধারের অপর দুইটি উল্লেখযোগ্য সৌধের একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালিকাদেবীর মন্দির। দ্বিতীয়টি আবদুল্লা শাহ চঙ্গলের সমাধিসৌধ। এই ধর্মপ্রচারক এই স্থানে ইসলাম ধর্মপ্রচারে অগ্রণী হইয়াছিলেন। একটি লেখ হইতে জানা যায়, মাহমুদ খিলজী ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সৌধটির সংস্কার করিয়াছিলেন।

ধূলিসাৎকৃত মন্দিরগুলির ভাস্কর্যের কিছু কিছু নিদর্শন বর্তমানে একটি স্থানীয় সংগ্রহালয়ে স্থান পাইয়াছে। এখানকার সরোবরগুলির অধিকাংশই প্রাচীন, তন্মধ্যে মুঞ্জতালাওটি সম্ভবতঃ পরমার-নৃপতি মুঞ্জের সৌজন্যে খ্যাত।

দ্র C. E. Luard, *Dhar and Mandu*, Allahabad, 1912; D. C. Ganguly, *History of the Paramara Dynasty*, Dacca, 1933.

দেবলা মিত্র

ধীবর মৎস্যজীবী সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী। পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ধীবর সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, সেখানে ধীবরের অর্থ 'মৎস্যঘাতী'। কৈবর্ত বলিতে কেহ কেহ জালিক বা জালিয়া অর্থাৎ মৎস্যজীবী বলিয়া মনে করিলেও অনেকের মতে কৈবর্ত অর্থে কর্ণধার বা নৌকর্মজীবী। ধীবর পূর্বে অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলের মৎস্যজীবীরা 'তীবর' নামে অভিহিত। রাজবংশীরা মৎস্যজীবী। মালো, ঝালোমালো, হালদারদের অনেকে মৎস্যজীবী। কেওট, বাগদিদেরও মৎস্যনির্ভর সম্প্রদায় বলা হয়।

আদিবাসী-উদ্ভূত মাঝিরা মৎস্যজীবী। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় তাহাদিগকে দেখা যায়।

মেদিনীপুর জেলার দুই-একটি প্রসিদ্ধ শীতলা বা চণ্ডী-মন্দিরের প্রধান পূজক ধীবর।

প্রবোধকুমার ভৌমিক

ধুতুরা বেগুন গোত্রের (ফ্যামিলি-সোলানাসিঈ, Family-Solanaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী গুল্ম-জাতীয় উদ্ভিদ। প্রায় ১৫টি প্রজাতি ধুতুরাগণের (জেনাস-দাতুরা) অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের পত্র সরল এবং শিরাবিন্যাস করতলাকার। বড় বড় শাদা বা বেগুনি ফুল একটি একটি করিয়া ফোটে। প্রত্যেক ফুলে পাঁচটি করিয়া বৃত্যংশ ও দল থাকে। পাঁচটি দীর্ঘ পুংকেশর পাপড়ির সহিত যুক্ত থাকে। ইহার গর্ভপত্রের সংখ্যা দুইটি। ফলের বহির্ভাগ কণ্টকপূর্ণ। শুষ্ক হইলে ফল আপনি ফাটিয়া যায় এবং বীজগুলি আপনি বাহির হইয়া আসে। ইওরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার বহুস্থানে ইহারা জন্মাইয়া থাকে; আমেরিকা ও ইওরোপের কোথাও কোথাও চাষও হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই ইহাদের আগাছারূপে দেখা যায়।

দাতুরা স্ত্রামোনিয়ম (*Datura stramonium*) একটি অতি বিষাক্ত গাছ। ইহার পাতা ও ফুলের অংশ হইতে স্ত্রামোনিয়ম নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ফলের ভিতর হাইওসিয়্যামাইন, অ্যাট্রোপিন ও স্কোপোল্যামাইন নামক কয়েকটি উপক্ষার (অ্যাল্‌কালয়েড) থাকে। ধুতুরার বিভিন্ন প্রজাতি পৃথিবীর নানা স্থানে বহুদিন হইতে নেশা করিবার কাজে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

দ্র A. F. Hill, *Economic Botany*, New York, 1962.

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

ধুন ধ্বনি শব্দের চলিত রূপ। ইহা রাগপদবাচ্য নহে, বিভিন্ন স্বরের একপ্রকার মিশ্র রূপ। তথাপি সংগীতের মতই ইহাকে রূপায়িত করা হয়। মিষ্টতাই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ওস্তাদগণ নূতন নূতন ধুন উদ্ভাবিত করেন। রাধামোহন সেন তদীয় 'সঙ্গীত-তরঙ্গ' গ্রন্থে পিলু, জংলা, মাজ, ঝিঁঝিট ও লুম, এই সুরগুলিকে ধুন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্র রাধামোহন সেন দাস, সঙ্গীত-তরঙ্গ, কলিকাতা, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

ধূমকেতু আকাশের নানা শ্রেণীর জ্যোতিষ্কের মধ্যে ধূমকেতুর একটি সবিশেষ আকর্ষণ সকলেরই মনে আছে। ইহার প্রধান কারণ তাহার আকার-আকৃতির বৈচিত্র্য ও অনন্যতা এবং আবির্ভাবের আকস্মিকতা। খালি চোখে বা অল্প শক্তির দূরবীনে ধূমকেতুকে যখন দেখা যায় তখন সাধারণতঃ তাহাকে দেখায় উজ্জ্বল, শুভ্র, বৃহৎ এক ঝাঁটার মত, যদিও সূর্য হইতে যথেষ্ট দূরে অবস্থানকালে ধূমকেতুর ঐ প্রকার রূপ থাকে না। ধূমকেতুর আবির্ভাবের অনির্দিষ্টতা প্রবাদখ্যাত, যদিও অবশ্য নিয়মানুবর্তী কতকগুলি ধূমকেতুর কথাও জানা আছে।

ধূমকেতুর ঝাঁটার মত সুবিস্তৃত অংশের নাম পুচ্ছ (টেল); এই অংশের অগ্রভাগে ঘনীভূত বর্তুলাকার একটি অংশ থাকে, যাহাকে শিরোদেশ (হেড) নামে অভিহিত করা যায়। শিরোদেশের দুইটি অংশ—মধ্যভাগের অধিকতর ঘনীভূত ও উজ্জ্বল অংশ বা কেন্দ্রীন (নিউক্লিয়াস) ও তাহার চতুষ্পার্শ্বের লঘু অংশ বা আবরণ (কোমা)। আবরণ অংশটিকে কখনও কখনও একাধিক বিভিন্ন অংশের সমবায় বলিয়া মনে হয়। শিরোদেশের ব্যাস ২৯০০০ কিলোমিটার (১৮০০০ মাইল) হইতে ১৮৪০০০০ কিলোমিটার (১১৫০০০০ মাইল) পর্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। দীর্ঘতম পুচ্ছ যাহা দেখা গিয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য ৩২০০০০০০০ কিলোমিটার (২০০০০০০০০ মাইল)।

ধূমকেতুর পুচ্ছ তাহার সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি-আকর্ষক অংশ। অবস্থানভেদে একই ধূমকেতুর পুচ্ছের আকার, আকৃতি, বিন্যাস ও রূপের প্রভূত তারতম্য ঘটে। অনসূর (পেরিহেলিয়ন) অবস্থানে পুচ্ছ দীর্ঘতম এবং উজ্জ্বলতম। পুচ্ছের বিস্তৃতি প্রায়শঃ সূর্যের বিপরীতমুখী। কখনও কখনও একটি ধূমকেতুর একাধিক পুচ্ছ দেখা গিয়াছে।

ধূমকেতুর শিরোদেশ সম্ভবতঃ বরফ এবং শিলীভূত মিথেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া দ্বারা গঠিত। আর সূর্যের প্রভাবে শিরোদেশ হইতে নিঃসৃত উল্লিখিত উপাদানগুলিরই কণা এবং বায়বীয় রূপ পুচ্ছ গঠন করে। ধূমকেতুর ঘনত্ব খুবই কম; পুচ্ছ তো বটেই, এমন কি শিরোদেশের মধ্য দিয়াও সাধারণতঃ অন্য জ্যোতিষ্ক দেখিতে অসুবিধা হয় না।

যতদূর দেখা যায়, ধূমকেতুর গতিবিধি সূর্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কতকগুলি সূর্যের চতুর্দিকে উপবৃত্তাকার (এলিপ্‌টিক্যাল) পথে আবর্তিত হয়, যেমন হ্যালী-র ধূমকেতু। অন্যগুলির কক্ষপথ পরাবৃত্ত (প্যারাবোলা) অথবা অধিবৃত্ত (হাইপারবোলা)। প্রথমোক্ত শ্রেণীর

ধূমকেতুগুলি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হয়। হ্যালী-র ধূমকেতু শেষবার দেখা গিয়াছে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ও পুনরায় দেখা যাইবে ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে।

ধূমকেতুর গঠন, উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহলে এখনও অনেক মতভেদ আছে। সংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা ধূমকেতুর আবির্ভাবের সহিত দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি ঘটনার যোগসূত্র কল্পনা করিয়া থাকেন।

রমাতোষ সরকার

ধূমাবতী দশ মহাবিদ্যা দ্র

ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে বিচিত্রবীর্যের ভার্যা কাশীরাজকন্যা অম্বিকার গর্ভে কুরুবংশের বংশধর দুর্বলচরিত্র ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম। তিনি জন্মান্ধ; কিন্তু তিনি 'প্রজ্ঞাচক্ষু' ও অযুত নাগের শক্তিসম্পন্ন। জন্মান্ধতাবশতঃ তিনি রাজা হইতে পারেন নাই; কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুই রাজা হন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর প্রকৃত প্রস্তাবে ধৃতরাষ্ট্রই পাণ্ডবগণের অভিভাবক হন। ভার্যা গান্ধারীর গর্ভে তিনি দুর্যোধনাদি শতপুত্র ও একটি কন্যা লাভ করেন। কালক্রমে পাণ্ডবগণের বলবীর্য লক্ষ্য করিয়া তিনি অসূয়া-পরবশ হন এবং নিজ পুত্রগণের স্বার্থে রাজ্যাভিলাষী হইয়া দুর্যোধনের কুমন্ত্রণাকে সমর্থন করেন। জতুগৃহদাহে পাণ্ডবগণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে তিনি বাহিরে দুঃখ প্রকাশ করেন, কিন্তু পরে পাণ্ডবগণ কুশলে আছে ও দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছে সংবাদ পাইয়া অন্তরে বিচলিত হন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শে তিনি পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রপ্রস্থের অধিকার প্রদান করেন। কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবগণের অতুল বৈভবের কথা শুনিয়া দুর্যোধনের পরামর্শে তাঁহাদের রাজশ্রী হরণের মানসে অক্ষক্রীড়া অনুমোদন করেন। এ বিষয়ে তিনি বিদুরের ধর্মোপদেশ ও গান্ধারীর আবেদন উপেক্ষা করেন। শকুনি যখন কপট দ্যূতে একে একে যুধিষ্ঠিরের সর্বস্ব জিতিয়া লইতে-ছিল, তখন ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে উল্লসিতই হইয়াছিলেন; এমন কি যখন কৃষ্ণাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া আরম্ভ হইল, তখন মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া স্পষ্ট উল্লাসে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'কিং জিতং কিং জিতম্'। তারপর প্রকাশ্য সভায় কুলবধূর লাঞ্ছনায়, বিদুরের ক্ষোভে, বিকর্ণের প্রতিবাদে ও ভীমের সক্রোধ প্রতিজ্ঞায় যখন সভা উত্তাল, তখন পুত্রগণের বিনাশ-আশঙ্কায় দ্রৌপদীকে বর দিয়া পাণ্ডবগণকে স্ব-অধিকার ফিরাইয়া দিলেও পরমুহূর্তেই ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের যুক্তিতে দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়া অনুমোদন করিয়াছেন। দ্বিতীয় দ্যূতে পরাজিত পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনবাস এবং আরও এক বৎসরের জন্য অজ্ঞাতবাস বরণ করিয়া বনে গমন করেন। অজ্ঞাত-বাসের পর পাণ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ করিলে দুর্যোধনের অধিকারপ্রমত্ততায় কুলক্ষয়কারী যুদ্ধ শুরু হয়। ব্যাসদেবের বরে সূত সঞ্জয় দিব্যচক্ষুসমন্বিত হইয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রতিদিনের বিবরণ ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেন। যুদ্ধের বিবরণ শ্রবণকালে ধৃতরাষ্ট্র আত্মপক্ষের পরাজয়ে বিষাদিত হইতেন। যুদ্ধান্তে শতপুত্রের নিধনে অভিতপ্ত ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ অতি করুণ। এই সময় সূত সঞ্জয় স্পষ্ট ভাষায় ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্র সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র একদিকে ধারযুক্ত অসির ন্যায় কেবল নিজের বুদ্ধিতে কার্য করিতেন। তাঁহার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে কোথাও সুকৃত নাই। মধ্যস্থ হইয়াও তিনি মধ্যস্থের ন্যায় কার্য করেন নাই। ধর্ম সম্পর্কে দ্বিধাচিত্ততা, দুর্বল পুত্রস্নেহবশতঃ পক্ষপাত ও পাণ্ডবগণের প্রতি বিদ্বেষ, কুটিল মনোভাব এবং ন্যায়পরতার অভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও বংশনাশ। যুদ্ধের অবসানে ধৃতরাষ্ট্র ১৫ বৎসর পাণ্ডবদের আশ্রয়েই থাকেন এবং পরে গান্ধারীসহ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন; কুন্তীও তাঁহাদের অনুগমন করেন। বিশাল দাবানলে দগ্ধ হইয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রাণত্যাগ করেন।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

ধোঁয়া জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহনোদ্ভূত দৃশ্যমান গ্যাস। দাহ্য বস্তু ও দহন-প্রক্রিয়ার দ্বারাই ধোঁয়ার প্রকৃতি ও আকৃতি নির্ধারিত হয়। ধোঁয়ামাত্রেই দহনক্রিয়ার ফল হইলেও দহনক্রিয়ামাত্রই ধোঁয়া উৎপন্ন করে না। অধিকাংশ ইন্ধনেই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সামান্য পরিমাণে সালফার পাওয়া যায়। ইন্ধনের পরিপূর্ণ দহনে অদৃশ্য কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ও সামান্য জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে তাহাকে ধোঁয়া বলা হয় না। পরিমিত অক্সিজেনে অসম্পূর্ণ দহনে ইন্ধন ও কার্বনের সূক্ষ্ম কণা, অম্লবাষ্প ও সামান্য আল-কাতরা-জাতীয় পদার্থ বাতাসে পরিবাহিত হয়। এই ধূম-কণার সাধারণ ব্যাস ০·১ হইতে ০·৩ মাইক্রনের মধ্যে; (১ মাইক্রন = $\frac{১}{১০০০}$ মিলিমিটার) তুলনামূলকভাবে ধূলি-কণার ব্যাস ১০০ মাইক্রন। ভারি কণাগুলি উৎপত্তিস্থলের সন্নিকটে এবং সূক্ষ্ম কণাগুলি দূরে বাহিত হয় ও পরে জলীয় বাষ্পের সংমিশ্রণে আঠালো কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের প্রলেপে পরিণত হয়। তরল ইন্ধনের অপরিপূর্ণ দহনে, কার্বন মনো-অক্সাইড ও ভুসার উৎপত্তি ঘটে। অসম্পূর্ণ দহনোদ্ভূত

গ্যাস এবং ধোঁয়া স্বাস্থ্যহানিকর এবং তত্ত্বগতভাবে তাপ অপচয় করে। তাই আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পসংস্থায় ধোঁয়া নিবারণের বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসৃত হয়। প্রভূত অক্সিজেন এবং উচ্চ তাপমাত্রায় পরিপূর্ণ দহন ধুম নিবারণের সাধারণ উপায় হইলেও বিদ্যুৎসংস্থাগুলিতে বৈদ্যুতিক অধঃক্ষেপক যন্ত্র থাকে। ইহা ব্যতীত বিচুর্ণীকৃত কয়লা ও চিমনির উচ্চতা পরিপূর্ণ দহনের সহায়ক। তথ্যগত-ভাবে কয়লার সাধারণ ও শিল্পগত ব্যবহারই প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া উৎপন্ন করে। ধোঁয়া স্বাস্থ্যহানিকর বলিয়া কোনও কোনও দেশে শহরাঞ্চলের শিল্পসংস্থাগুলির উপর আইনের বিধিনিষেধ আরোপিত আছে। সাধারণতঃ এই আইনগুলির প্রয়োগে 'রিংলেম্যান চার্ট' দ্বারা ধোঁয়ার ঘনত্বের তুলনামূলক বিচার করা হয়। আইন দ্বারা শুধু শিল্পসংস্থাগুলিকে আবদ্ধ করিলেই ধোঁয়ার ব্যাপকতা কমিবে না, কারণ কয়লার গার্হস্থ্য ব্যবহার ধোঁয়ার অন্যতম প্রধান উৎপত্তিস্থল।

ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে 'ধোঁয়াশা' (স্মগ, smog) বলিয়া আর একটি শব্দ বর্তমানে শোনা যাইতেছে। ধোঁয়া ও কুয়াশাকে মিলিতভাবে ধোঁয়াশা বলা হয়। ধোঁয়াশার ঘনত্ব তিনটি কারণের উপর নির্ভরশীল: ১. ধোঁয়া উৎপাদনের তীব্রতা ২. ধোঁয়ার ঊর্ধ্বাধঃ ব্যাপ্তি ৩. বাতাসের গতিবেগ। বাতাসের গতিবেগ কম থাকিলে, শীতকালে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় ভূমিসন্নিকটে বায়ুর ঊর্ধ্বাধঃ আলোড়ন কম থাকে; তখন কুয়াশার সহিত ধোঁয়া মিশ্রিত হইয়া অনচ্ছ আবরণের সৃষ্টি করে ও দৃষ্টি ব্যাহত হয়। সূর্যতাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ঊর্ধ্বাধঃ আলোড়ন বৃদ্ধি পায় ও ধোঁয়াশার অনচ্ছ আবরণ অপসৃত হয়। ধোঁয়াশা যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে ও অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কারণস্বরূপ হইয়া ওঠে।

অসিতকুমার দত্ত

ধ্রুপদ শাস্ত্রে ধ্রুবপদ প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। আধুনিক ভাষায় যাহা গান নামে পরিচিত, তাহারই বাক্যাংশের শাস্ত্রীয় নাম প্রবন্ধ। ধ্রুবপদ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এই যে, একমাত্র ঈশ্বরই ধ্রুব, সুতরাং ঈশ্বরনাম বা গুণকীর্তন পদই ধ্রুবপদ। সাংগীতিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে শাস্ত্রীয় ধ্রুবপদ প্রবন্ধই বর্তমান ধ্রুপদের পূর্বরূপ। শাস্ত্রীয় প্রবন্ধের বাক্যাংশের নাম মাতু এবং স্বরাংশের নাম ধাতু। ধাতু পাঁচটি কলিতে বিভক্ত: উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুবা, অন্তরা এবং আভোগ। বর্তমান ধ্রুপদের সহিতও এই কলিবিভাগের সামঞ্জস্য আছে। বর্তমানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ এই চারিটি মুখ্য কাল ধ্রুপদে বর্তমান। কেহ কেহ ভোগ নামক আর একটি কলিরও উল্লেখ করেন। স্থায়ীর সহিত শাস্ত্রীয় ধ্রুবা, সঞ্চারীর সহিত শাস্ত্রীয় মেলাপক, অন্তরা এবং আভোগ উভয়তঃই অনুরূপ। আভোগ কলিতে শাস্ত্র এবং বর্তমান প্রচলন উভয় মতানুসারেই গীত-রচয়িতার নাম থাকে। ধ্রুবপদ প্রবন্ধের গায়নভঙ্গীকে শাস্ত্রে গীত বলা হইত। গীতি পাঁচ প্রকার: শুদ্ধাগীতি, ভিন্নাগীতি, গৌড়ীগীতি, বেসরা বা বেগস্বরাগীতি এবং সাধারণীগীতি। বর্তমান ধ্রুপদের গায়নভঙ্গী বাণী নামে পরিচিত, যথা শুদ্ধবাণী, গৌড় বা গৌড়হারবাণী, নওহার-বাণী, ডাগরবাণী ও খাণ্ডারবাণী। অধিকাংশ গুণীর মতে ডাগরবাণীরই অপর নাম শুদ্ধবাণী। এস্থলে শাস্ত্রীয় শুদ্ধাগীতির সহিত বর্তমান শুদ্ধবাণী, ভিন্নাগীতির সহিত খাণ্ডারবাণী, গৌড়ীগীতির সহিত গৌড়হারবাণী এবং সাধারণীগীতির সহিত নওহারবাণীর সামঞ্জস্য আছে।

প্রাচীন শাস্ত্রীয় যুগে রাগ শব্দটির প্রচলন ছিল না; বর্তমানে রাগ বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহারই এক এক গোষ্ঠীর নাম জাতি ছিল এবং প্রবন্ধাদি জাতির আশ্রয়ে গীত হইত, বর্তমানে যেরূপ ধ্রুপদ রাগের আশ্রয়েই গীত হয়। পরবর্তী কালে রাগ শব্দটির প্রচলন হইলে প্রবন্ধাদি রাগের আশ্রয়েই গীত হইত। খ্রীষ্টীয় ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে বৈজুবাওরা, নায়ক গোপাল প্রমুখ গুণীবৃন্দ ধ্রুবপদ প্রবন্ধ গাহিতেন। আমীর খসরুও ধ্রুবপদ প্রবন্ধের একজন মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ১৫শ-১৬শ শতাব্দীর মধ্যে গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ পূর্বতন ধ্রুবপদ প্রবন্ধগীতির পরিবর্তন সাধন করিয়া বর্তমান ধ্রুপদের প্রচলন করেন। তাঁহারই প্রায় সমসাময়িক সম্রাট আকবর শাহের দরবারে বর্তমান ধ্রুপদ পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। স্বামী হরিদাস, স্বামী কৃষ্ণদাস, রামদাস, মিঞা তানসেন প্রমুখ গুণীবৃন্দ ধ্রুপদ গীতির প্রভূত উন্নয়ন সাধন করিয়াছেন।

ধ্রুপদিয়া প্রথমে রাগের আলাপ করিবেন এবং তৎপরে সেই রাগেরই ধ্রুপদ গাহিবেন। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আলাপ অনিবদ্ধ এবং ধ্রুপদ নিবদ্ধ সংগীত; যন্ত্রসংগীতের আলাপে অনিবদ্ধ এবং নিবদ্ধ অংশ উভয়ই বর্তমান থাকে; কিন্তু কণ্ঠসংগীতের আলাপ সম্পূর্ণই অনিবদ্ধ, সুতরাং উহারই নিবদ্ধ পরিণতি ধ্রুপদ। ধ্রুপদে স্বরের এবং ছন্দের বিস্তার (প্রচলিত কথায় 'বাঁট') ভিন্ন অন্য কোনওরূপ অলংকরণের (তাল, গিটকারি, মুরকী ইত্যাদি) ব্যবহার নিষিদ্ধ; মাত্র গম্ভীর মীড় এবং গমক অলংকার ধ্রুপদে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং তজ্জন্য রাগরূপ

অতি নিষ্ঠার সহিত অবিকৃত থাকে। মধ্যযুগে ঈশ্বরগুণ-বর্ণনা ব্যতিরেকে নরপতিগণের কীর্তিবর্ণনায় ধ্রুপদ রচিত হইত। শ্রীকৃষ্ণের লীলা, বিশেষতঃ বসন্তোৎসব উপলক্ষ্যে ধামার তালে রচিত ধ্রুপদকে ধামার বা হোরি বলা হইয়া থাকে। অনুরূপ ঝাঁপতালে রচিত ধ্রুপদকে সাদ্‌রা বলা হয়। দিল্লীর সন্নিকটে সাহদারা গ্রামের নামানুসারে সাদ্‌রা বলা হয়। সাধারণ ধ্রুপদ চৌতালেই রচিত হইয়া থাকে।

মোগল যুগে ধ্রুপদের সমাদর সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। মোগল দরবারের অবসানে বিশিষ্ট গুণীবৃন্দ ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে আশ্রয় লইলেন এবং ধ্রুপদের ধারা প্রতিষ্ঠা করিলেন। বেতিয়া, বিষ্ণুপুর, ত্রিপুরা, ঢাকা, মেটিয়াবুরুজ এবং অন্যান্য অঞ্চলে ধ্রুপদ ক্রমে ক্রমে প্রসিদ্ধিলাভ করিল। বঙ্গদেশে বিষ্ণুপুর ধ্রুপদধারাই বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল। কিন্তু আনুমানিক ৩৫ বৎসর পূর্ব হইতে ধ্রুপদের সমাদর ক্ষীণতর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ধ্রুপদের রাগমাধুর্য তালতাণ্ডবে পর্যবসিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে তৎপূর্বে ধ্রুপদ এবং টপ্পাই শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রধান উপকরণ ছিল, তদ্ব্যতীত টপখেয়াল নামক গীতিরীতির প্রচলন ছিল। দ্রুত লয়ের খেয়াল সে-যুগে কদাচিৎ শ্রুতিগোচর হইত। পরবর্তী কালে খেয়ালের উদ্দামতা ধ্রুপদকে প্রায় উচ্ছেদই করিয়াছিল। বিগত ১৫ বৎসর যাবৎ হরিদাস ডাগুারের শিষ্য, উদয়পুর ঘরাণার ধারকবাহক ডাগর-বন্ধুগণ জন-হৃদয়ে ধ্রুপদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন।

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

ধ্রুব আদর্শ বিষ্ণুভক্ত। নৃপতি উত্তানপাদের নিগৃহীত পুত্র। উত্তানপাদের প্রিয়পত্নী সুরুচির গর্ভে উত্তম এবং উপেক্ষিতা পত্নী সুনীতির গর্ভে ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। একদিন ভ্রাতা উত্তমকে পিতৃক্রোড়স্থিত দেখিয়া ধ্রুবও পিতার নিকট হইতে অনুরূপ আদরলাভের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সুরুচি তাঁহাকে কটুভাষায় তিরস্কার করেন। পুণ্যই মানুষের সুখসমৃদ্ধির হেতু এই বলিয়া সুনীতি পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে পুণ্যার্জনে উৎসাহিত করেন। পঞ্চ-বর্ষীয় বালক গৃহত্যাগ করেন এবং যমুনাতীরস্থ মধুবনে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে সপ্তর্ষিগণ ধ্রুবকে অচঞ্চল-চিত্তে বিষ্ণুর উপাসনা করিতে নির্দেশ দেন। ধ্রুব কঠোর তপস্যায় মগ্ন হন।

ধ্রুবের তপস্যায় প্রীত বিষ্ণু তাঁহাকে বরদানে অভিলাষী হইলে ধ্রুব অত্যুত্তম স্থানলাভের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন। বিষ্ণুর অনুগ্রহে ধ্রুব সর্বনক্ষত্রের আশ্রয়স্থল হইলেন এবং সূর্য, বৃহস্পতি প্রভৃতির ঊর্ধ্বে ধ্রুবলোকে তাঁহার স্থানও কল্পিত হইল। জননী সুনীতি তারকা হইয়া ধ্রুবের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। (বিষ্ণু-পুরাণ ১।১১-১২)।

যূথিকা ঘোষ

ধ্রুবতারা ধ্রুবতারা লঘু সপ্তর্ষি বা শিশুমার (আর্সা মাইনর) মণ্ডলের অন্তর্গত নাতি-উজ্জ্বল একটি তারকা। উত্তর গোলার্ধের যে কোনও স্থান হইতে সারারাত্রি ধ্রুবতারাকে দেখা যায়। ইহা কতকটা দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাজ করে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের সব জ্যোতিষ্ককে ধীরে ধীরে পূর্ব হইতে পশ্চিমে সরিয়া যাইতে দেখা যায়; কিন্তু ধ্রুবতারাকে সব সময় দেখা যায় উত্তর আকাশে উত্তর বিন্দুর (নর্থ পয়েন্ট) ঠিক উপরের কোনও একটি জায়গায়—কোন জায়গায় অর্থাৎ কতটা উচ্চতায় তাহা নির্ভর করে পৃথিবীর যে অংশ হইতে আকাশ পর্যবেক্ষণ করা হইতেছে তাহার অক্ষাংশের উপরে। যেমন কলিকাতার অক্ষাংশ ২২° ৩৫′ উত্তর এবং কলিকাতার আকাশে ধ্রুবতারার অবস্থান উত্তর বিন্দুর প্রায় ২২° ৩৫′ উপরে।

ধ্রুবতারার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের কারণ পৃথিবীর মেরু-রেখার উপর তাহার অবস্থিতি। কিন্তু পৃথিবী পুরাপুরি গোলকাকৃতি না হওয়ার ফলে সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণ পৃথিবীর মধ্যবিন্দুতে প্রযুক্ত হয় না এবং তাহার ফলে পৃথিবীর মেরুরেখা একটি স্থির রেখা নয়। মেরুরেখা তথা বিষুবরেখার গতি অয়নচলন নামে অভিহিত ('অয়ন' দ্র)। অয়নচলনের ফলেই ধ্রুবতারা তাহার সকল বর্তমান বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে, ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে তাহা হারাইয়া ফেলিবে এবং প্রায় ২৬০০০ বৎসর পরে আবার তাহা ফিরিয়া পাইবে। অয়নচলনের গতি পর্যায়-ক্রমিক (পিরিয়ডিক)—বৎসরে প্রায় ৫০.২৪ সেকেণ্ড; একটি পর্যায় সম্পূর্ণ হয় প্রায় ২৬০০০ বৎসরে। অভিজিৎ (ভিগা) প্রভৃতি কতকগুলি তারকা পর্যায়ক্রমে ধ্রুবতারার বৈশিষ্ট্যগুলি উপভোগ করিয়া থাকে।

দক্ষিণ গোলার্ধ হইতে ধ্রুবতারাকে দেখা যায় না। কিন্তু সেখানকার অকট্যান্স মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত একটি তারকা (হ্যাড্‌লিজ্‌ অকট্যান্ট) অনেক পরিমাণে ধ্রুবতারার অনুরূপ।

রমাতোষ সরকার

ধ্বনি ধ্বনি শব্দটি শব্দকর্মক ধ্বন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, অতএব তাহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ শব্দ। কিন্তু বৈয়াকরণ দার্শনিকদের মতে অর্থপ্রত্যায়ক, অখণ্ড, পৌর্বাপর্যপরামর্শ-শূন্য নিত্যশব্দই স্ফোট বা ধ্বনি-রূপে গণ্য।

সংস্কৃত সাহিত্যবিচারে ধ্বনিবাদের প্রবর্তনের মূলে স্ফোটবাদী দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত বর্তমান। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন ধ্বনিলক্ষণের ব্যাখ্যায় ইহা স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন। স্ফোটবাদীগণের দৃষ্টান্তানুসারে ধ্বনিবাদী আলংকারিকগণও ধ্বনি শব্দটির মুখ্যতঃ ত্রিবিধ ব্যবহার স্বীকার করিয়া থাকেন: কর্তৃবাচ্যে বাচক শব্দ ও বাচ্য অর্থ, কর্মবাচ্যে প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং ভাববাচ্যে ব্যঞ্জনারূপ ব্যাপার বোধিত হইয়া থাকে। আবার এই ত্রিবিধ অর্থেরই আশ্রয়ভূত সমুদায়াত্মক কবিকর্ম বা কাব্যও 'ধ্বনি' এই সংজ্ঞার দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

ধ্বনিবাদী আলংকারিকগণের মতানুসারে প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্য অর্থই কাব্যে প্রধান, তাহাই সমস্ত কাব্যসৌন্দর্যের আধার; যেমন স্ফোটবাদী বৈয়াকরণগণের দৃষ্টিতে নিত্য স্ফোটাখ্য শব্দই একমাত্র পরমার্থ। কাব্যের অন্য যাহা কিছু তাহা উপাদানবাচক শব্দই হউক বা বাচ্য অর্থই হউক অথবা অনুপ্রাস উপমা প্রভৃতি অলংকারই হউক, গুণই হউক বা রীতিই হউক—সব কিছুই গৌণ। ধ্বনিবাদীগণের এই সিদ্ধান্ত সংস্কৃত কাব্যবিচারক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ অভিনব এবং বৈপ্লবিক পদক্ষেপরূপে গণ্য। এই ধ্বনিই তাঁহাদের মতে কাব্যের 'আত্মা'—'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ'। ধ্বনির তিনপ্রকার ভেদ সম্ভব—বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি এবং রসধ্বনি। এই ত্রিবিধ ভেদের মধ্যে আবার রসধ্বনিই প্রধান—তাহাই প্রকৃতপক্ষে কাব্যের সারভূত তত্ত্ব, তাহা পরমব্যঙ্গ্য। রসভাবাদিশূন্য রচনা যতই অলংকার মণ্ডিত হউক না কেন প্রকৃতপক্ষে তাহা কবিকর্ম বা কাব্যরূপেই পরিগণিত হইতে পারে না। এইরূপ 'অব্যঙ্গ্য' অলংকারপ্রধান রচনাকেই ধ্বনিকার 'চিত্র' সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। 'শব্দচিত্র' ও 'বাচ্য-চিত্র' এই চিত্রকাব্যেরই দুইটি প্রধান শ্রেণী। চিত্রকাব্য সম্বন্ধে আনন্দবর্ধন স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—'ন তন্মুখ্যং কাব্যং, কাব্যানুকারো হ্যসৌ'। সুতরাং ধ্বনিবাদকে ভরতমুনি-প্রবর্তিত রসপ্রস্থানের পরিপূরকরূপেও গণনা করা চলে।

ধ্বনিবাদের আবির্ভাবের ফলে প্রাচীন কাব্যবিচার-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হইল। 'ধ্বনি' বা ব্যঙ্গ্যার্থকেই সকল কাব্যবিষয়ের কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া গুণ, অলংকার, রীতি, বৃত্তি প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় পূর্বাচার্যসম্মত উপাদানগুলির উপযোগিতা ও সার্থকতা যাচাই করিয়া দেখিবার দিকে নব্য আলংকারিকগণের প্রবৃত্তি হইল। অলংকার প্রভৃতি যে কাব্যের বহিরঙ্গ উপাদানমাত্র, অভিধা বা লক্ষণা প্রভৃতি শব্দব্যাপার যে কাব্যের পরম রহস্য বা উপনিষদভূত রসাদিরূপ অর্থের বোধনে অক্ষম, রসস্পর্শবশতঃ অতি পুরাতন বহু কবি কর্তৃক ব্যবহৃত অর্থও যে বসন্তসমাগমে জীর্ণ তরুর ন্যায় নবীনতায় মণ্ডিত হইয়া ওঠে, রসাবিষ্ট কবিচিত্তেই যে প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়া থাকে এবং তাহাই যে কাব্যসৃষ্টির একমাত্র নিদান, ইহা ধ্বনিবাদের প্রবর্তনের ফলে যেন নূতন করিয়া শেখা হইল। অথচ ধ্বনিকার স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন যে এই ধ্বনিতত্ত্ব রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতেও লক্ষিত, ইহা 'সর্বত্রপ্রসিদ্ধব্যবহার'; শুধু যাহা 'অস্ফুট স্ফুরিত' ছিল, যাহা সহৃদয়ের চিত্তে 'প্রসুপ্তকল্প' ছিল, তাহাকেই তিনি লক্ষণাদিনিরূপণের দ্বারা ব্যাকৃত করিয়াছেন মাত্র। অভিনবগুপ্ত 'লোচন' টীকায় বলিয়াছেন, যদিও কোনও বিশিষ্ট গ্রন্থে ইহার আলোচনা হয় নাই তথাপি গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে কাব্যজ্ঞসমাজে অবিচ্ছিন্নপ্রবাহে এই ধ্বনিবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আনন্দবর্ধন 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে সেই চিরপ্রচলিত মতবাদকেই একটি পরিচ্ছিন্ন সুসংহত রূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন মাত্র। ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব, এইজন্যই তিনি 'ধ্বনিকার' বা 'ধ্বনিকৃৎ'।

পরবর্তীকালে অধিকাংশ আলংকারিকই ধ্বনিকারের মতবাদকেই কাব্যবিচারের একমাত্র মানদণ্ডরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তথাপি ধ্বনিবাদের বিরোধিতাও যে একেবারে হয় নাই তাহা নহে। বিস্তৃতভাবে ধ্বনিপ্রস্থানের যাঁহারা খণ্ডন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ভট্টনায়ক, মহিমভট্ট, কুন্তক, ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতি আলংকারিক-গণের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভট্টনায়কের অধুনালুপ্ত মূল্যবান নিবন্ধ 'হৃদয়দর্পণ' 'ধ্বনিধ্বংস' গ্রন্থরূপে আলংকারিকসমাজে পরিচিত। মহিমভট্টের 'ব্যক্তিবিবেক' ব্যঞ্জনা ব্যাপারের নিরাকরণপূর্বক 'অনুমান'কে তাহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। কুন্তকের 'বক্রোক্তি-জীবিত' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এই যে, ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা না বলিয়া বক্রোক্তিকেই কাব্যের আত্মা বলা সমীচীন। প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট তাঁহার 'ন্যায়মঞ্জরী' নিবন্ধে ধ্বনিকারকে 'পণ্ডিতম্মন্য' বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও ধ্বনিবাদই সংস্কৃত কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সম্মানিত আসন অধিকার করিয়া আছে।

দ্র আনন্দবর্ধন ; সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য, ধ্বন্যালোক ও লোচন, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ ; K.C. Pandeya, *Abinavagupta, Historical and Philosophical Study*, Banaras, 1935; S. K. De, *History of Sanskrit Poetics*, Calcutta, 1960.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতত্ত্ব ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহের আলোচনা এবং তদ্‌ঘটিত বিদ্যা। এ বিদ্যার তিনটি প্রধান বিভাগ : ১. ভাষানির্বিশেষে ধ্বনিসমূহের উৎপত্তি, প্রকৃতি, বিকৃতি, শ্রেণীবিভাগ ও পরস্পর সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণ ও বিচারই যথার্থ ধ্বনিবিজ্ঞান (phonetics) ২. কোনও নির্দিষ্ট ভাষায় নির্দিষ্ট অবস্থায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহের উৎপত্তি, প্রকৃতি, বিকৃতি, সংশ্লেষ ইত্যাদির বিশ্লেষণ ও বিচারও পূর্বে ধ্বনিবিজ্ঞানের অন্তর্গত ছিল, এখন বাংলায় স্বতন্ত্র নাম স্বনবিজ্ঞান অথবা বর্ণবিজ্ঞান (phonemics) দেওয়া যাইতে পারে ৩. কোনও ভাষায় অথবা সম্পর্কিত ভাষাগুচ্ছে ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহের কালানুক্রমে ধারাবাহিক আলোচনার নাম ধ্বনিতত্ত্ব (phonology)।

অর্থজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে মুখোদ্‌গীর্ণ শব্দের অবিভাজ্য অথবা প্রায়-অবিভাজ্য অংশগুলির নাম 'ধ্বনি' (phone বা speech-sound)। সাধারণতঃ ধ্বনি উচ্চারিত হয় নিঃশ্বাস অর্থাৎ পরিত্যক্ত শ্বাসবায়ুর দ্বারা। ফুসফুসের চাপে বহির্গামী বায়ুপ্রবাহ শ্বাসনালীর (trachea) মধ্য দিয়া কণ্ঠনালীতে (larynx) আসে এবং সেখান হইতে মুখবিবরে আসিয়া মুখপথে অথবা যুগপৎ মুখপথে ও নাসাপথে অথবা নাসাপথে নির্গত হয়। নির্গমনকালে শ্বাসবায়ু যদি কোথাও—কণ্ঠনালী হইতে ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে কোনও স্থানে কোনও রকম বাধা পায় তবেই তাহা ধ্বনি উৎপন্ন করে। তবে এমন ভাষাও আছে যাহাতে স্বরধ্বনি এভাবে নিঃশ্বাস-উচ্চারিত নয়, কোনও কোনও ধ্বনি মুখপথে প্রযত্নে গৃহীত বায়ুর দ্বারা উচ্চারিত হয় (যেমন গাড়োয়ানদের বাহন চালানোর টক্‌-টক্‌ শব্দ)। বর্তমান আলোচনার পক্ষে এ রকম ধ্বনির কথা নিষ্প্রয়োজন।

নির্গম্যমান শ্বাসবায়ুর বাধার স্থান ও বাধার প্রকার হিসাবে ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

কণ্ঠনালীর মধ্যে যে কণ্ঠতন্ত্রী (vocal chords) আছে তাহা শ্বাসবায়ুর নির্গমন সময়ে খোলা থাকিতে পারে, বন্ধ থাকিতেও পারে। খোলা থাকিবার সময় বায়ু স্বচ্ছন্দে বাহির হইয়া যায়। বন্ধ থাকিলে বায়ু ঠেলিয়া বাহির হয় এবং সেজন্য বায়ুতে কম্পন জাগে। সেই কম্পনকে বলে ঘোষ (voice)। এই কম্পন থাকা না থাকার উপর ধ্বনির এক মৌলিক শ্রেণীবিভাগ হয়। যে ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কম্পন হয় সেগুলিকে বলে সঘোষ বা ঘোষবৎ (voiced), আর যেগুলিতে কম্পন হয় না তাহাদের বলে অঘোষ বা ঘোষহীন (unvoiced)।

ধ্বনির আর এক মৌলিক শ্রেণীবিভাগ হইল—স্বর ও ব্যঞ্জন। স্বরধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ুতে কম্পন থাকে এবং মুখবিবরের মধ্যে কোথাও বাধা থাকে না। ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কম্পন থাকিতে বা না থাকিতে পারে, তবে মুখবিবরে কোথাও না কোথাও শ্বাসবায়ুকে বাধা পাইতে হয়। মুখবিবরে জিহ্বার অবস্থান এবং সেইসঙ্গে ওষ্ঠাধরের আকুঞ্চন বা প্রসারণের উপরে স্বরধ্বনির বিভিন্নতা নির্ভর করে, আর মুখবিবরে বাধার স্থান এবং প্রকৃতির উপরে ব্যঞ্জনধ্বনির বিভিন্নতা নির্ভর করে।

স্বরধ্বনির বৈচিত্র্য বিপুল। তাহার মধ্যে এই আটটি ধ্বনি মৌলিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সব ভাষারই স্বরধ্বনির এগুলি মানদণ্ডের মত : জিহ্বার অগ্রভাগ সম্মুখে প্রসৃত—ই এ এ' আ'; জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ পিছনে আকৃষ্ট—আ অ° ও উ।

প্রথম চারিটিকে সম্মুখ (front) স্বরধ্বনি এবং শেষের চারিটিকে পশ্চাৎ (back) স্বরধ্বনি বলা হয়। ই উ হইল সংবৃত (close), আ' আ বিবৃত (open), এ ও অর্ধসংবৃত (half close), এবং এ' অ° অর্ধবিবৃত (half open)। স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে যদি শ্বাসবায়ুকে নাসাবিবরে অনুরণিত করিয়া যুগপৎ নাসাপথে ও মুখপথে বাহির করা হয় তবে সে স্বরধ্বনি হয় অনুনাসিক (nasalized)।

মুখবিবর উচ্চারণকালের গোড়ার দিকে একরকম থাকিয়া শেষের দিকে যদি অন্যরকম হয়, অর্থাৎ এক স্বরধ্বনি যদি দুই স্বরধ্বনির অর্ধাংশ লইয়া গঠিত হয় তবে তাহাকে দ্বিস্বরধ্বনি (dipthong) বলে, যেমন বাংলায় ঐ ঔ।

সংবৃত স্বরধ্বনি দুইটির ই উ উচ্চারণকালে মুখবিবর যদি বেশি সংকীর্ণ হয় তবে ঈষৎ বাধার সৃষ্টি হয় এবং ধ্বনি দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয় য়্‌ ব্‌। তখন এ দুইটিকে বলে অর্ধস্বর (semi-vowel)।

স্বরধ্বনির একটা বিশেষত্ব হইল ইহা যথেচ্ছ দীর্ঘ করা যায়, এ গুণ কোনও কোনও ব্যঞ্জন ধ্বনিরও আছে। সে সব ব্যঞ্জনধ্বনিতে সেই সঙ্গে স্বরধ্বনির মত স্পষ্ট সুরও

ধ্বনিবিজ্ঞান

আছে এবং যাহা স্বরধ্বনির মত অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিকে বহন করিতে পারে তাহাকে বলে অর্ধব্যঞ্জন (sonant)—ন্ ম্ র্ ল্।

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ হয় তিন ধারায় : ১. কণ্ঠ-তন্ত্রীর কম্পন অর্থাৎ ঘোষের (voice) উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি অনুসারে, সঘোষ ও অঘোষ ২. বাধার স্থান (place of articulation) অনুসারে ৩. বাধার প্রকার ভেদ (manner of articulation) অনুসারে।

শ্বাসবায়ুর নির্গমনে বাধার সৃষ্টি হয় এই সব উপায়ে ঃ পেশীসংকোচনের দ্বারা, পেশীসংকোচন ও জিহ্বাচালনার দ্বারা, কেবলমাত্র জিহ্বাচালনার দ্বারা, দন্ত ও জিহ্বা-চালনার দ্বারা, ওষ্ঠ ও দন্ত দ্বারা এবং ওষ্ঠ ও অধর দ্বারা।

পেশী-আকুঞ্চনের দ্বারা কণ্ঠনালীকে সংকীর্ণ করিয়া বাধা সৃষ্টি করিলে উচ্চারিত ধ্বনি হয় কণ্ঠনালীয় (glottal বা laryngeal)। জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ, অলিজিহ্বা অথবা তৎসংলগ্ন স্থান স্পর্শ করিয়া বাধার সৃষ্টি করিলে ধ্বনি হয় কণ্ঠমূলীয় (uvular)। জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ কোমল-তালুর নিম্নাংশ স্পর্শ করিলে ধ্বনি হয় কণ্ঠ্য (velar) আর উর্ধ্বাংশ স্পর্শ করিলে হয় তালব্য (palatal)। জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তমূলচ্ছদ স্পর্শ করিলে হয় তালুদন্তমূলীয় (alveopalatal), আর কঠিন-তালুর সম্মুখভাগ স্পর্শ করিলে হয় অগ্রতালব্য (prepalatal)। জিহ্বার অগ্র উর্ধ্বদন্ত স্পর্শ করিলে হয় দন্ত্য (dental), উপরের দন্তমূল স্পর্শ করিলে হয় দন্তমূলীয় (alveolar); জিহ্বা খাড়া হইয়া পিছনের দিকে বাঁকিয়া কঠিন-তালু স্পর্শ করিলে হয় প্রতিবেষ্টিত (retroflex)। উচ্চারণ-কালে ওষ্ঠ অধর স্পর্শ করিলে হয় ওষ্ঠ্য (labial বা bilabial)। উর্ধ্বদন্ত অধর স্পর্শ করিলে হয় দন্তৌষ্ঠ্য (labiodental বা dentilabial)।

শ্বাসবায়ু মুহূর্তমাত্র সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইলে ধ্বনি হয় স্পৃষ্ট (plosive, stop বা occlusive)। আংশিক নিরোধ হইলে হয় উষ্ম (fricative বা spirant), মুখগহ্বরে অথবা নাসায় রণিত বা প্রতিধ্বনিত হইয়া উচ্চারিত হইলে বলে রণিত (resonant)।

শ্বাসবায়ু নাসাগহ্বরে রণিত হইয়া যুগপৎ মুখ ও নাসা-পথে নির্গত হইলে হয় নাসিক্য (nasal)। শ্বাসবায়ু জিহ্বার পাশ ঘেঁষিয়া নির্গত হইলে ধ্বনি হয় পার্শ্বিক (lateral)। উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগ অথবা কোমল তালুর নিম্নাংশ ঘন ঘন কম্পিত হইলে বলে কম্পিত (trilled বা rolled)। জিহ্বার তলদেশ দিয়া দন্তমূলে তাড়না করিলে সে ধ্বনিকে বলে তড়িত (flapped)।

কোনও কোনও ধ্বনির উচ্চারণে একসঙ্গে দুই স্থানে অথবা এক স্থানে দুইরকম বাধার সৃষ্টি হয়। একসঙ্গে দুই স্থানে বাধাজনিত ধ্বনির নাম মহাপ্রাণিত (aspirated)। এরকম ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিটির বিশিষ্ট বাধার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীর পেশীও আকুঞ্চিত হইয়া আর একটি বাধার সৃষ্টি করে ; উচ্চারণের প্রথম দিকে বাধা সম্পূর্ণ এবং শেষের দিকে বাধা আংশিক হইলে হয় ঘৃষ্ঠ (affricate) ধ্বনি।

কোনও ভাষারই বর্ণমালা সে ভাষার সকল ধ্বনি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, অন্য কোনও ভাষার তো নয়ই। একটিমাত্র বর্ণমালার সাহায্যে যাহাতে যে কোনও ভাষার ধ্বনি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা এক বিশিষ্ট বর্ণমালা ব্যবহার করেন। এই পরিকল্পিত বর্ণমালার নাম সর্বজনীন ধ্বনিমূলক লিপি (international phonetic alphabet)।

ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে ধ্বনিকে আরও একভাবে শ্রেণী-বিভক্ত করা যায়। যে ধ্বনির উচ্চারণ-ব্যাপারকে খণ্ডিত করিয়া দেখা যায় তাহাকে বলা হয় বিভাজ্য (segmental) ধ্বনি। যে ধ্বনিকে কোনও রকমেই অংশে বিভাগ করিয়া দেখা যায় না তাহাকে বলে অবিভাজ্য (supra-segmental) ধ্বনি। উপরে আলোচিত স্বর ও ব্যঞ্জন-ধ্বনিগুলি সবই বিভাজ্য ধ্বনি। অবিভাজ্য ধ্বনির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল স্বর, সুর বা স্বরাঘাত (intonation) ও ঝোঁক, বল বা শ্বাসাঘাত (stress)।

একটি নির্দিষ্ট অক্ষরে (অর্থাৎ স্বরধ্বনিতে) সুর চড়িয়া গেলে বলে স্বরাঘাত। অনেক ভাষায় স্বরাঘাতের বৈশিষ্ট্যের উপর পদের (অথবা বাক্যের) অর্থ নির্ভর করে, আর কোনও নির্দিষ্ট অক্ষরে যদি শ্বাসবায়ুর নির্গমবেগ দ্রুততর করা হয় তবে বলে শ্বাসাঘাত। অনেক ভাষায় শ্বাসাঘাত সংস্থানের উপর পদের (অথবা বাক্যের) অর্থ নির্ভর করে। যে সব ভাষায় স্বরাঘাত একটি বৈশিষ্ট্য, সেখানে স্বরধ্বনির সুর (অর্থাৎ কণ্ঠতন্ত্রীর অনুরণন) নানা রকমের হইতে পারে। ঋগ্বেদের ভাষায় ছিল তিনরকম সুর ঃ 'উদাত্ত' অর্থাৎ উর্ধ্বগামী (rising), 'স্বরিত' অর্থাৎ উর্ধ্ব হইতে নিম্নগামী (falling) এবং 'অনুদাত্ত' অর্থাৎ সমস্থায়ী (level)। ঝোঁকে এমন তারতম্য নাই, তবে পদটিতে অক্ষর বেশি থাকিলে

সাধারণতঃ এক অক্ষরে প্রধান ঝোঁক (primary stress) পড়ে, তাহা হইতে দূরে আর এক অক্ষরে গৌণ ঝোঁক (secondary stress) থাকে। ইংরেজীতে এই রকম দেখা যায়।

ভাষার একক (unit) হইল বাক্য, বাক্যের একক পদ, পদের একক অক্ষর (syllable)। অক্ষর একধ্বনিময় অথবা একাধিক ধ্বনির সমষ্টি। সুতরাং ধ্বনিই ভাষার ক্ষুদ্রতম অণু। ভাষায় কালক্রমে যে পরিবর্তন ঘটে তাহা প্রধানতঃ ধ্বনিতেই পরিলক্ষিত হয়। ধ্বনির বিকৃতি ও পরিবর্তন ধ্বনিসমূহের পরস্পর প্রভাব—ইহাই ধ্বনিতত্ত্বের প্রধান নির্ণেয় বিষয়।

ধ্বনিপরিবর্তন সাধারণতঃ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ঘটে। প্রত্যেক ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়ম তাহার নিজস্ব হইলেও মোটামুটি সব ভাষাতেই কতকগুলি সাধারণ ব্যাপার দেখা যায়। তাহার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

অনেক সময় পাশাপাশি দুই বা ততোধিক ধ্বনি পরস্পরকে অথবা একটি আর একটিকে প্রভাবিত করে, এমন ব্যাপারকে বলে সমীভবন (assimilation)। যেমন সংস্কৃত ভাষায় সন্ধিতে: তৎজলম্ > তজ্জলম্, চিৎশক্তি > চিচ্ছক্তি।

দুইটি স্বরধ্বনি মিলিয়া একটি স্বরধ্বনিতে পরিণত হইতে পারে; যেমন সদা এব > সদৈব, পিতা আয়াতি > পিতায়াতি।

পাশাপাশি দুই ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি স্বরধ্বনি আসিয়া যুক্তধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করিতে পারে। এ ব্যাপারকে বলে বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি (anaptyxis); যেমন সংস্কৃত সর্ষপ > প্রাকৃত সরিসপ, ইংরেজী গ্লাস > বাংলা গেলাস।

পদের আদিতে, অন্তে এবং মধ্যে স্বরধ্বনির লোপ হইতে পারে। এ ব্যাপারকে বলে যথাক্রমে আদিস্বরলোপ (aphepis), অন্ত্যস্বরলোপ (apocope) এবং মধ্য-স্বরলোপ (syncope); যেমন সংস্কৃত অপিধান > পিধান, সংস্কৃত আকাশ > বাংলা আকাশ্, স্বর্ণ > স্বর্ণ, রাঁধনা > রাঁধ্না (> রান্না)।

স্বরধ্বনির অতিরিক্ত আগম হইতে পারে। তাহাকে বলে অপিনিহিতি (epenthesis); যেমন বাংলা কাঁচি > কাঁইচি (উপভাষা)।

পদের মধ্যে এক স্বরধ্বনি অন্য স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করিতে পারে। সে ব্যাপারকে বলে স্বরসংগতি (vowel harmony); যেমন বিলাতি > বিলিতি (উপভাষা), মূলা > মূলো (উপভাষা)।

সুকুমার সেন

নঈ তালিম গান্ধীজী-প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি। গান্ধীজীর দেওয়া এই হিন্দী নামের অর্থ নূতন শিক্ষা। এই শিক্ষার ভিতর দিয়া গান্ধীজী মানুষ ও তাহার সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। এখানেই এই নামের সার্থকতা।

মানুষের সমগ্র জীবন, তাহার দেহ, মন এবং আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশই এই শিক্ষার লক্ষ্য। এ শিক্ষা সমস্ত জীবন ধরিয়া শিক্ষা। গান্ধীজীর ভাষায়, জননী-জঠরে জন্মগ্রহণের সময়ে ইহার আরম্ভ হয় এবং মৃত্যুতে ইহার সমাপ্তি ঘটে। এ শিক্ষা জীবনের ভিতর দিয়া অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়া লাভ করিতে হয়; কেবলমাত্র স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করিয়া এ শিক্ষা লাভ করা যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে, এ শিক্ষা জীবন গঠনের জন্য জীবনের ভিতর দিয়া জীবনব্যাপী শিক্ষা।

নঈ তালিমের উদ্দেশ্য সর্বোদয় অর্থাৎ সকলের কল্যাণের আদর্শে পরিচালিত নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা। ইহার লক্ষ্য দেশের ছেলেমেয়েদের এই নূতন সমাজের যোগ্য নাগরিক-রূপে গড়িয়া তোলা। সমাজের কল্যাণের মধ্যেই ব্যক্তির কল্যাণ। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোনও মানুষ তাহার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে না। সেইজন্য এই শিক্ষায় একই সঙ্গে ব্যক্তির এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য চেষ্টা করা হয়।

শুধু বই পড়াইয়া এই শিক্ষা দেওয়া যায় না। সকলের সহযোগিতার উপর নির্ভর করিয়া সমবেত জীবনচর্যার দ্বারা এই শিক্ষা দিতে হয়। সকলে সকলের সহিত মিলিয়া একই উদ্দেশ্যে একভাবে জীবনযাপন করিয়া শিক্ষার্থীরা সত্য ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্যাশ্রিত সমাজ গঠনের জন্য প্রস্তুত হইবে, এই শিক্ষাপদ্ধতিতে এই দিকেই দৃষ্টি রাখা হয়।

এই শিক্ষার কাজ হইবে সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় গঠিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ রচনা করা। এই সমাজ স্বশাসিত এবং স্বাবলম্বী হইবে। এই সমাজে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই—অন্নবস্ত্র গৃহ এবং গৃহোপকরণ সব কিছুই—যথাসম্ভব নিজেদের চেষ্টায় উৎপন্ন করা হইবে। এই সমাজ আপনার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিবে, আপনার ধর্মকর্ম উৎসব-অনুষ্ঠান

আপনিই সম্পন্ন করিবে। এই সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বাহিরের কোনও সাহায্য আবশ্যক হইবে না। এখানে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই সমান মর্যাদা পাইবে, মানুষ এবং মানুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকিবে না।

গান্ধীজী ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য এই শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। এই শিক্ষা 'বুনিয়াদী শিক্ষা' নামে পরিচিত হয়। এই ৭ বৎসর মানুষের জীবনের একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র। এই ৭ বৎসরে তাহার সমস্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে, ইহা সম্ভব নয়। সেইজন্য পরে তিনি জীবনব্যাপী শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং ইহাকে নঈ তালিম নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষা এই সামগ্রিক শিক্ষারই একটি অঙ্গ।

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য

নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ (?—১৭৫৫ খ্রী) নবাব আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহ্‌মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসিটি বেগমের স্বামী। বিহারের নায়েব সুবেদার হিসাবে আলীবর্দী নওয়াজেসকে বিদ্রোহদমনের জন্য বেতিয়া, নওয়াদা, রাজমহল ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন (১৭৩৫-৪০ খ্রী)। সরফরাজ খাঁ নবাব আলাউদ্দৌলার বিরুদ্ধেও তিনি আলীবর্দীকে সাহায্য করেন। আলীবর্দী বঙ্গদেশের নবাব হইলে (এপ্রিল, ১৭৪০ খ্রী) নওয়াজেস বঙ্গের খালসার দেওয়ান ও চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, শ্রীহট্টসহ জাহাঙ্গীরনগরের (ঢাকা) নায়েব সুবেদার নিযুক্ত হন (১৭৪০-৫৫ খ্রী)। তাঁহার সহকারী ছিলেন হুসেন কুলী খাঁ। কিন্তু উভয়েই মুর্শিদাবাদে থাকিতেন বলিয়া ঢাকার শাসনভার প্রকৃতপক্ষে হুসেনের দেওয়ান গোকুলচাঁদের হস্তেই ছিল। সম্রাটের সনন্দের জোরে নওয়াজেস বঙ্গের দেওয়ানী ও শহামৎজঙ্গ উপাধি প্রাপ্ত হন (নবেম্বর, ১৭৪০ খ্রী)।

রুগ্‌ণ ও দুর্বল ছিলেন বলিয়া শহামৎজঙ্গ তাঁহার বিষয়-কর্মাদি পত্নী ঘসিটি বেগম ও তাঁহার প্রিয়পাত্র হুসেন কুলী খাঁর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। হুসেন জমিদার ও সর্দারদের নিকট প্রভূত অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। গোকুলচাঁদের চক্রান্তে অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে হুসেন কুলীকে শহামৎজঙ্গ পদচ্যুত করেন। কিন্তু ঘসিটির প্রভাবে হুসেন কুলী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উদ্ধত ও অহংকৃত হন এবং গোকুলচাঁদের স্থানে বিক্রমপুর-নিবাসী বৈদ্য রাজবল্লভকে নিযুক্ত করেন।

সিরাজের সহিত হুসেন কুলীর প্রতিযোগিতা ছিল। সিরাজ হুসেনকে হত্যা করার পর (১৭৫৪ খ্রী) রাজবল্লভ ঢাকার নায়েব নিযুক্ত হন ও সর্বেসর্বা হন।

শোথ রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর শহামৎজঙ্গের মৃত্যু হয়।

শহামৎজঙ্গ ছিলেন দয়ালু ও উদার প্রকৃতির। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র নির্মল ছিল না বটে, কিন্তু বৃদ্ধ, অক্ষম, দরিদ্র, বিধবা, অনাথ ও অভাবগ্রস্তদের তিনি আর্থিক সাহায্য দান করিতেন। তিনিই মুর্শিদাবাদ-প্রাসাদের দেড় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মোতিঝিল খনন ও শোভিত করিয়াছিলেন। মতিঝিল মসজিদের প্রাঙ্গণে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল।

দ্র *The Riyaz-us-Salatin, A History of Bengal*, Maulavi Abdus Salam, tr., Calcutta, 1902 ; K. K. Dutta, *Alivardi and His Times*, Calcutta, 1939 ; Jadunath Sarkar, ed., *History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1948.

জগদীশনারায়ণ সরকার

নওরোজ প্রাচীন পারস্যে পার্শী পঞ্জিকার নববর্ষকে (১লা ফরওরর্দিন) নওরোজ বলিত। এই দিনে সূর্য মেষরাশিতে প্রবেশ করে। কথিত আছে, শাহ্‌ নৌশেরোয়াঁও এই দিনে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। পারস্যের প্রাচীন নৃপতিগণ ও তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া সেখানকার মুসলমান শাহ্‌গণ ও ভারতের কয়েকজন মোগল বাদশাহও নওরোজ পালন করিতেন। আবুল ফজল বলেন যে, আকবর প্রাচীনকালের উত্তম রীতি-নীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া যাহা ভাল লাগিত গ্রহণ করিতেন। এইরূপে তিনি জামসেদ রাজগণের আনন্দোৎসব ও পার্শী পুরোহিতদের পর্ব সম্বন্ধে তথ্য জানিয়া তাঁহার রাজত্বের ২৫তম বৎসরের প্রারম্ভ হইতে (মার্চ, ১৫৮০ খ্রী) পারস্য-পঞ্জিকা (ক্যালেণ্ডার) প্রচলন করেন ও ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মার্চ হইতে নওরোজ ও পার্শীদের অন্যান্য উৎসবও পালন করিতে আরম্ভ করেন। ১৯ দিনব্যাপী এই উৎসবের প্রথম ও শেষ দিন (অর্থাৎ ১ ও ১৯শে ফরওরর্দিন) ছিল বিশেষ পর্বের দিন। ঐদিন আকবর বদান্যতার সহিত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের বিপুল অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি উপহার দিতেন। প্রত্যেক প্রহরের গোড়াতেই নাকাড়া বাজানো হইত, গায়কেরা গান গাহিত, রঙিন আলোও ব্যবহৃত হইত। বদায়ুনী ইহাকে নওরোজ-ই-জলালী নামে অভিহিত করেন।

এই সুযোগে মোগল-দরবারে ও সাম্রাজ্যের সর্বত্র আনন্দোৎসব হইত; কিন্তু সাধারণে এই দিনকে বিশেষ পবিত্র ও ঈদের ন্যায় শুদ্ধ ও মহত্ত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিত।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব ইহাকে ইসলাম ধর্মের নৈষ্ঠিক রীতির বিরুদ্ধে এক নবপ্রবর্তন মনে করিয়া ইহার পালন নিষিদ্ধ করিয়া দেন, তবে দরবারে প্রচলিত এই দিনের আনন্দোৎসবটি রমজানে তাঁহার সিংহাসনারোহণের উৎসবের সহিত যুক্ত করিয়া দেন।

দ্র Abul Fazl, *Akbarnamah*; Badaoni, *Maasir-i-Alamgiri*; J. N. Sarkar, *Aurangzeb*, vol. III, Calcutta, 1924; H. Blochmann, tr., *Ain-i-Akbari*, Calcutta, 1939.

জগদীশনারায়ণ সরকার

নওরোজী, দাদাভাই (১৮২৩-১৯১৭ খ্রী) ভারত-বিখ্যাত রাজনীতিবিদ। বোম্বাই শহরে এক প্রসিদ্ধ পুরোহিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৪ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর বোম্বাই-এর এল্‌ফিন্‌স্টোন স্কুল ও কলেজে বিদ্যার্জন করিয়া ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছাত্রজীবন শেষ করেন এবং এল্‌ফিন্‌স্টোন কলেজে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গণিত ও দর্শনের অধ্যাপকের পদে বরণ করেন। গুজরাতী ভাষা চর্চার জন্যও তিনি উদ্যমশীল ছিলেন। বোম্বাই শহরে বালিকাদের জন্য প্রথম বিদ্যালয়ের স্থাপনা প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই হয়। রাজনৈতিক আলোচনার সুবিধার্থে বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠা দাদাভাই-এর উৎসাহেরই ফল বলা যাইতে পারে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কামা অ্যাণ্ড কোম্পানি নামে পার্শী যৌথ-কারবারের অংশীদার হন এবং ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লণ্ডন-এ গুজরাতী ভাষার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

ইংল্যাণ্ডে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়া দাদাভাই প্রধানতঃ রাজনীতি লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়ের প্রবেশাধিকার লইয়া তিনি এ সময় আন্দোলন আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের আর্থিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে ইংরেজ জাতিকে ওয়াকিফহাল করিবার অভিপ্রায়ে তিনি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' নামে সভা স্থাপন করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিবার জন্য ইংল্যাণ্ডে গমন করেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ২ বৎসর কাল বরোদা রাজ্যের দেওয়ান পদ অলংকৃত করেন। ইহার পর বোম্বাই পৌর-প্রতিষ্ঠান ও বোম্বাই আইনসভার সদস্য হন। দাদাভাই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস-এর সর্বপ্রথম অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। পরে তিনি পুনরায় ইংল্যাণ্ডে গমন করেন এবং পার্লামেন্টের সভ্যপদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য চেষ্টিত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে মধ্য ফিন্স্‌বেরী হইতে উদারনৈতিক দলের সভ্য হিসাবে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য। পরবর্তী ৩ বৎসর কার্যকালের মধ্যে তিনি 'ইণ্ডিয়ান পার্লামেন্টারি কমিটি' নামক একটি সংস্থার পত্তন করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দাদাভাই ভারতবর্ষের ব্যয়-সংক্রান্ত রাজকীয় কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত হন এবং ওয়েলবি কমিশনে সাক্ষ্য দেন। তাঁহার ইংল্যাণ্ডে আগমনের কাল হইতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার প্রবাসজীবনে ভারতবর্ষের বিবিধ সমস্যা তিনি ইংরেজ জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পভার্টি অ্যাণ্ড আন্‌-ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' নামক তাঁহার বিখ্যাত বহু তথ্যপূর্ণ পুস্তকটি ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনার নিদর্শন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতার অধিবেশনে দাদাভাইকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয় এবং এই অধিবেশনেই স্বায়ত্তশাসনের দাবি দাদাভাই কর্তৃক বিঘোষিত হয়। ভারতীয় প্রজা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল প্রজার সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার যাহাতে লাভ করে দাদাভাই তাহার জন্য দাবি উত্থাপন করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আম্‌স্টার্ডাম-এ অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট্‌স্‌-এ দাদাভাই ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তাঁহার রচনাবলী: 'অ্যাড্‌মিশন অফ এডুকেটেড নেটিভ ইন্‌টু দি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' (১৮৯৩ খ্রী), 'পভার্টি অ্যাণ্ড আন্‌-ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' (১৯০১ খ্রী) এবং 'স্পীচেস অ্যাণ্ড রাইটিং্‌স অফ দাদাভাই নওরোজী' (১৯১৩ খ্রী)।

দ্র R. P. Masani, *Dadabhai Naoroji*, London, 1939.

চিন্তামন বামন দাতার

নকুলীশ, লকুলীশ মহাদেবের অষ্টবিংশতিতম ও শেষ অবতার। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর নকুলীশকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নকুলীশ পশ্চিম ভারতে খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবির্ভূত হইয়া পাশুপত ধর্মসম্প্রদায়ের সূচনা করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, নকুলীশের অনুসারে পাশুপত শৈবগণই পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী) 'শিবভাগবত'রূপে আখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মথুরায় প্রাপ্ত গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের (৬১ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৩৮০-৮১ খ্রী) একটি প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত লেখ হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আলোচ্য সম্প্রদায়ের প্রবর্তক নকুলীশ খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের ২য় পাদের প্রথম দিকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং পুরাণবর্ণিত কাহিনী অনুসারে তিনি কায়াবতার বা কায়ারোহনে (আধুনিক কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলের কার্বান গ্রামে) সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের এই মত মানিয়া লইলে পাশুপতাচার্য নকুলীশকে মহাভাষ্যে বর্ণিত শিবভাগবতগণের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কারণ অধিকাংশ পণ্ডিতই মহাভাষ্য খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে রচিত বলিয়া মনে করেন। নকুলীশ যদি আদি শৈবসম্প্রদায়ের প্রবর্তক না হন তাহা হইলে অনুমান করিতে হয় যে খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের প্রথমার্ধে কোনও সময়ে তিনি পূর্বপ্রচলিত শৈবপাশুপতধর্মের পুনঃ-সংগঠন করিয়াছিলেন এবং সেই ধর্মের পুনরুজ্জীবনে তাঁহার ভূমিকা এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে পরবর্তী কালে তাঁহার নাম পাশুপত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে সংযুক্ত হইয়া যায়।

নকুলীশের মূর্তিপূজা কখন প্রচলিত হয় তাহা সঠিক বলা যায় না। উল্লেখিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন স্তম্ভলেখটির নিম্নভাগে যে দণ্ডায়মান মূর্তি খোদিত আছে তাহা লগুড়হস্ত ও ত্রিনয়নবিশিষ্ট। এই মূর্তিটি নকুলীশের বলিয়াই অনুমিত হয়। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর এই মূর্তির প্রায় সমসাময়িক ৪টি মূর্তি সম্প্রতি আজমীরের অন্তর্গত নান্দগ্রামে পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিগুলি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত বলিয়া মুখ ও হাত দৃষ্টিগ্রাহ্য না হইলেও ঊর্ধ্বলিঙ্গবৈশিষ্ট্যের জন্য (পরবর্তী কালে নকুলীশ মূর্তির পরিচিতি-চিহ্ন) এইগুলিকে নকুলীশ মূর্তি বলিয়া মনে করা যায়। গুপ্তযুগের নকুলীশ মূর্তির সংখ্যা বেশি না হইলেও গুপ্তোত্তরকালের নকুলীশ মূর্তি অনেক পাওয়া যায়। পশ্চিম ভারতের রাজস্থান অঞ্চলে এবং পূর্ব ভারতের বিশেষতঃ ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু নকুলীশ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভুবনেশ্বরের 'রাজা-রানী', 'মুক্তেশ্বর', 'শিশিরেশ্বর' প্রভৃতি শিবমন্দিরগুলির গাত্রে নকুলীশ মূর্তির সহিত আরও ৪টি মূর্তি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে এগুলি নকুলীশের ৪ জন শিষ্য কুশিক, মিত্র, গর্গ এবং পৌরুষ্যেরই মূর্তি। পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার বেগুনিয়া গ্রামে মধ্যযুগের একটি শিবমন্দিরের শিখরের সম্মুখস্থ মধ্যভাগে নকুলীশের যোগাসনে উপবিষ্ট, লগুড়হস্ত ও ঊর্ধ্বলিঙ্গবিশিষ্ট খোদিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় কালীঘাটের মন্দিরের নিকটে যে শিবমন্দির আছে তাহার অভ্যন্তরস্থ শিবলিঙ্গ নকুলীশ ভৈরবের প্রতীকরূপে এখনও পূজিত হয়।

দ্র জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চোপাসনা, কলিকাতা, ১৯৬২ খ্রী ; J. N. Banerjea, *Development of Hindu Iconography*, Calcutta, 1956.

নিরঞ্জন ঘোষ

নক্ষত্র নক্ষত্র শব্দটি অনেক সময়ে বাংলায় (এবং সংস্কৃতেও) তারার সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ('তারা' দ্র)। কিন্তু ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় শব্দটির আর একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থও আছে। বর্তমান নিবন্ধে ঐ পারিভাষিক অর্থেই নক্ষত্রের আলোচনা করা হইয়াছে।

চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ—উপবৃত্তাকার একটি কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। একটি প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হইতে প্রায় ২৭ দিন সময় লাগে। চান্দ্র কক্ষপথ আকাশের পটভূমিকায় একটি গুরু বৃত্ত (গ্রেট সার্ক্‌ল); ইহা ক্রান্তিবৃত্ত (এক্লিপ্‌টিক)-এর কাছেই অবস্থিত, কিন্তু একটু ব্যবধান আছে—প্রায় ৫°৯′ পরিমাণের কৌণিক ব্যবধান। চান্দ্র কক্ষপথটিকে আকাশের গায়ে চিহ্নিত করার জন্য এবং চন্দ্র কিরূপ বেগে উহা অনুসরণ করে তাহার পরিমাপ করার জন্য প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় একটি পন্থা গ্রহণ করা হয়—২৭টি 'নক্ষত্র'-এর পরিকল্পনা করা হয়। নক্ষত্র এক্ষেত্রে একক বিচ্ছিন্ন তারা নয়; চান্দ্র কক্ষপথে অবস্থানকারী তারার এক-একটি জোট। প্রতিটি জোটেই অবশ্য একটি বিশেষ প্রতিনিধিস্থানীয় তারা আছে, তাহার নাম

'যোগতারা'; আর প্রতিটি নক্ষত্রের যাহা নাম, তাহার অন্তর্গত যোগতারারও সেই একই নাম, যেমন অশ্বিনী নক্ষত্রের যোগতারার নামও অশ্বিনী।

২৭ দিনের অনুরূপ ২৭টি নক্ষত্র আছে, যথা—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব ফল্গুনী, উত্তর ফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব আষাঢ়া, উত্তর আষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা, উত্তর ভাদ্রপদা ও রেবতী। বৈদিক যুগে আরও একটি তারা ও তারাপুঞ্জকে নক্ষত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইত, তাহার নাম অভিজিৎ।

নক্ষত্রগুলি রাশিচক্রের মধ্যেই অবস্থিত, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে রাশি নামে অভিহিত তারকাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়; যেমন কালপুরুষ কোনও রাশি নয়, কিন্তু মৃগশিরা ও আর্দ্রা নক্ষত্র কালপুরুষের অন্তর্গত।

রাশিচক্রের পটভূমিকায় নক্ষত্রগুলির দৈর্ঘ্য মোটামুটিভাবে ১৩°২০′ পরিমাণ, কিন্তু তারাপুঞ্জের আকৃতিকে সম্পূর্ণতা দিবার জন্য কোথাও কোথাও দৈর্ঘ্যের কিছু কমবেশিও আছে।

রমাতোষ সরকার

নগর ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যেখানে পর্বতশ্রেণীর ন্যায় সৌধসমূহ বিদ্যমান তাহাকে নগর বলে। প্রাচীন ভারতে নগরগুলির অধীনে অনেকগুলি গ্রাম থাকিত। নগর তিন প্রকার—নগর, পত্তন ও খর্বট। নগরের অধীনে ৮০০ গ্রাম থাকিত, যেখানে রাজধানী থাকিত তাহাকে পত্তন বলিত এবং ২০০ গ্রামবিশিষ্ট নগরকে খর্বট বলা হইত। সুতরাং নগরের আয়তন প্রয়োজন অনুসারে অর্ধ যোজন হইতে এক যোজন বা ততোধিক বিস্তৃত হইত। ইহার আকৃতি চতুষ্কোণ, ত্রিভুজাকৃতি এবং কদাচিৎ গোলাকার হইত। নগরের মধ্য দিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে দুইটি প্রশস্ত রাজপথ নগরকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করিত। আবার ঐ রাজপথগুলির সমান্তরালে অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পথ থাকিত, তাহাতে নগরটি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণে বিভক্ত হইত। নগরটি সাধারণতঃ সুদৃঢ় প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত হইত। সাধারণতঃ এই প্রাকার প্রস্তরনির্মিত হইত; তবে বৃহৎ নদী বা সমুদ্রতীরবর্তী নগরগুলি কাঠের প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত করা হইত, যেমন পাটলিপুত্র। রাজপথ দুইটির উভয় প্রান্তে ৪টি প্রধান প্রবেশদ্বার থাকিত; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পথের প্রান্তেও প্রবেশদ্বার থাকিত। মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন, পাটলিপুত্র নগরে ৬৪টি প্রশস্ত প্রবেশদ্বার ছিল। নগরে পণ্যক্রিয়াদিনিপুণ ৪ বর্ণের লোক, অনেক জাতি, অনেক শিল্পী এবং সকল ধর্মাবলম্বী লোক বাস করিত। বিভিন্ন বৃত্তির লোক নগরের বিভিন্ন স্থানে বাস করিত। দেবায়তনগুলি নগরের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইত এবং সাধারণতঃ ঐ দেবায়তনগুলির আশেপাশে পণ্যবীথিগুলি সুবিন্যস্ত হইত। নগরের এক প্রান্তে নদীতীরে শ্মশান বা সমাধিস্থানগুলি থাকিত। নগর সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত হইত। এই সৈন্যই জনপদ অঞ্চল অর্থাৎ গ্রামগুলিকে রক্ষা করিত। নগরের মধ্যে বাপীতড়াগাদি থাকিত। নগরগুলির শাসনব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত কর্মচারী থাকিত; অর্থশাস্ত্রে ইহাদের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণী হইতে জানা যায়, মৌর্য যুগে পাটলিপুত্রের পৌরসংঘের শাসনভার ৬টি উপসমিতিতে বিভক্ত ৩০ জনের এক পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল। মহেঞ্জো-দড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানের উৎখনন হইতে প্রাচীন নগরগুলি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। রামায়ণে অযোধ্যানগরীর একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। প্রাচীন নগরগুলিতে রাজপথে দীপস্তম্ভ ও পথপ্রান্তে আবৃত পয়ঃপ্রণালী থাকিত। নগরে নগরবাসীগণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভবন থাকিত। তথায় নানারূপ উৎসবাদি, নাটক-অভিনয় ও নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হইত। বহু বিদেশী নগরে বাণিজ্য বা অন্যান্য কারণে যাতায়াত করিতেন, সেইজন্য অর্থ দিলে ভোজনাগারে ভাত ও পক্ব মাংস সর্বদা পাওয়া যাইত। নগরের রাজপথ প্রত্যহ প্রভাতে সম্মার্জিত ও জলসিক্ত করা হইত। কোনও ব্যক্তি পথে আবর্জনা ফেলিলে সে দণ্ডনীয় হইত।

ত্রিদিবনাথ রায়

নগরবিন্যাস ভারতীয় নগরবিন্যাস ভারতীয় স্থাপত্যের ন্যায় ব্যাপক, ঐশ্বর্যময় ও আড়ম্বরপূর্ণ না হইলেও অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিশেষ ঐতিহ্যময়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্বের মহেঞ্জো দড়ো ও হরপ্পায় স্নানাগার, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, সমান্তরাল পথঘাট ও বাসগৃহের বিন্যাস দেখা যায়।

বৈদিক যুগের সভ্যতা গ্রাম-কেন্দ্রিক। পরবর্তীকালে রামায়ণ ও মহাভারতে এক-একটি রাজধানী বা রাজ্য লইয়া নগরপত্তনের কাহিনী জানা যায়; যেমন অযোধ্যা, মিথিলা, হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, কোশল ইত্যাদি। বৌদ্ধযুগে চৈত্য ও বিহার স্থাপত্যের সমধিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

অনেক সমৃদ্ধিশালী নগরও গড়িয়া ওঠে ; যেমন তক্ষশিলা, পাটলিপুত্র, বুদ্ধগয়া, উজ্জয়িনী ইত্যাদি।

মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতনের এক শতাব্দী পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক সভ্যতার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তক্ষশিলা অঞ্চলে সিরকাপ ও সিরসুকে দুইটি নগর ক্রমান্বয়ে গড়িয়া ওঠে। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর শেষে তক্ষশিলা রাজধানী এবং শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র ছিল। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা বা জলবায়ু অনুযায়ী এই সব নগরে চক ও চত্বরের চারিধারে গৃহাদির বিন্যাস করা হইত এবং নগরের বিশিষ্ট প্রাসাদ ও পথের গুরুত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল। এই ধরনের বিন্যাস পরবর্তী কয়েক শত বৎসর ধরিয়া ভারতীয় নগর-পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে।

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে ভারতবর্ষে বহুক্ষেত্রে উপাসনাকেন্দ্র বা মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল ; রাজধানী ও বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া নগরপত্তনের সংখ্যা কম। নালন্দার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। খজুরাহো, কাঞ্চীপুরম ইত্যাদি ছিল মন্দিরনগর। উত্তর ভারতীয় নগরবিন্যাসের মূলনীতিই দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরে ব্যবহৃত হইয়াছে ; গোপুরম, প্রাঙ্গণ, জলাশয়, বিশ্রামকক্ষ, নৃত্যগীতশালা ইত্যাদি মূল মন্দিরের চতুর্দিকে পরিকল্পিত হইয়াছে।

সেকালে অনেক নগরই এক একটি দুর্গবিশেষ ছিল। এই ধরনের নগরগুলি প্রাকার ও পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণে পাটলিপুত্রের ৬৪টি প্রবেশদ্বার, এক পরিখা ও প্রাকারের উল্লেখ আছে। মোগল-যুগে দুর্গনগরের বিন্যাসে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়।

সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নগরবিন্যাসেরও প্রভাব বিস্তৃত হয়।

ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী নগরবিন্যাসের শেষ উদাহরণ জয়পুর। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক বাঙ্গালীর পরিকল্পনা অনুসারে এই নগর গড়িয়া ওঠে। নগরের মধ্যভাগে রাজপ্রাসাদ এবং সবশুদ্ধ ৭টি চতুর্ভুজাকার মহল্লা ; উহার এক-একটি আবার নানা ভাগে বিভক্ত। উহাতে বিভিন্ন গৃহের আকৃতি-প্রকৃতি ও রঙের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান এবং স্থাপত্যকলার নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাও গৃহীত হয়।

বাংলা দেশ প্রধানতঃ গ্রামপ্রধান হইলেও অতি প্রাচীন সাহিত্যে অনেক নগরের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, ত্রিবেণী ও লক্ষ্মণাবতী এবং পরবর্তী কালের গৌড় উল্লেখযোগ্য।

ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশে যতগুলি নগরের কথা জানা যায়, তাহার অধিকাংশই সম্ভবতঃ ব্যবসায়-বাণিজ্যনির্ভর ; পরে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে নগর পত্তন হইয়াছিল। তখনকার প্রত্যেকটি নগরই প্রাকারবেষ্টিত এবং প্রাকারের পরেই পরিখাবৃত। তাহাতে রাজপ্রাসাদ, সৈন্যসামন্তনিবাস, হাটবাজার, মন্দির ইত্যাদি সবই দুর্গের মতই সজ্জিত থাকিত।

অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীতে মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া ছোট ছোট নগরের পত্তন হয়। এপ্রসঙ্গে মাদুরাই ও শ্রীরঙ্গমের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৪শ শতাব্দীর ৩য় দশকে তুঙ্গভদ্রার তীরে বিজয়নগর একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীতে মুসলমানদের রাজধানী স্থাপনের পর স্থাপত্য ও নগরপরিকল্পনায় নূতন ধারা প্রবাহিত হয়। ইহাতে খিলান, গম্বুজ ও মিনারের আধিক্য দেখা যায়। আয়তক্ষেত্রাকার ও প্রাকারবেষ্টিত কয়েকটি দুর্গনগরও গড়িয়া ওঠে ; যেমন তোগলকাবাদ, ফিরোজাবাদ ইত্যাদি। ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত দিল্লীর ফিরোজ শাহ্ কোটলায় বিভিন্ন চক বা চত্বরকে কেন্দ্র করিয়া যে গৃহের বিন্যাস, তাহাই পরবর্তী কালে মুসলিম নগরবিন্যাসের মূলনীতি হইয়া দাঁড়ায়। আকবরের আমলে প্রতিষ্ঠিত ফতেপুর সিক্রীতে রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, প্রমোদোদ্যান ইত্যাদির সুসংবদ্ধ বিন্যাস নন্দনতত্ত্বের দিক দিয়াও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগ্রা ও লাহোর দুর্গের অভ্যন্তরের পরিকল্পনাতেও রুচি ও বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। দিল্লীতে শাহ্‌জাহানের রাজধানী শাহ্‌-জাহানাবাদে (১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পরিকল্পিত হইয়া ১০ বৎসরে শেষ হয়) লালকেল্লা, জুম্মা মসজিদ, চাঁদনি চক, উদ্যান ইত্যাদির বিন্যাস বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। শাহ্‌জাহানের আমলে শ্বেত প্রস্তরের ব্যবহারে নগরগুলি সৌন্দর্যে ভাস্বর হইয়া ওঠে।

দ্র P.K. Acharya, *A Summary of the Manasara*, Leiden, 1918 ; B. B. Dutta, *Town Planning in Ancient India*, Calcutta, 1925 ; Percy Brown, *Indian Architecture*, vols. I & II, Bombay, 1942 ; S. C. Mukberjee, 'Early chapters in Indian town planning' : I-IV, *Journal of the Institute of Town Planners*, Nos. 3, 4, 7 & 15, 1955-58.

সন্তোষ ঘোষ

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০ খ্রী) সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ইনি বিহারের মোতিহারিতে জন্মগ্রহণ

করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি করাচির 'ফিনিক্স' (Phoenix) পত্রিকার সম্পাদক হন। ৭ বৎসর পরে তিনি লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক হন এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল' সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। 'ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল' দৈনিক 'লিডার'-এর সহিত সম্মিলিত হইলে তিনি যুগ্মসম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ২ বৎসরের জন্য তিনি 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। নগেন্দ্রনাথ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪ মাস 'প্রদীপ'-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'প্রভাত' পত্রিকারও সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সাহিত্য-রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি 'স্বপন-সংগীত' নামে একখানি গীতিকাব্য রচনা করেন (১৮৮২ খ্রী)। পরবর্তী কালে তিনি অনেকগুলি ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। 'ভারতী' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁহার বহু ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস ঝার পদাবলী পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দেয়।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৬, কলিকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

রথীন্দ্রনাথ রায়

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৯১৩ খ্রী) ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক ও বাংলা ভাষায় রাজা রামমোহন রায়ের জীবনীকার। হুগলি জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়ার এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দ্বারকানাথ তর্কচূড়ামণি ও মাতার নাম তারাসুন্দরী দেবী। শিক্ষা টালিগঞ্জের রসা পাগলা স্কুল, চুঁচুড়া কলেজিয়েট স্কুল, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল ও কৃষ্ণনগর কলেজে। তরুণবয়সে বেহালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও রামতনু লাহিড়ীর সংস্পর্শে আসিয়া ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা শুনিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়নকালে উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এইজন্য তাঁহাকে সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। প্রথম জীবনে তিনি কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন; ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কর্মত্যাগপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেন ও কেশবচন্দ্র সেনের মণ্ডলীভুক্ত হন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁহার অবশিষ্ট জীবন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সেবাতেই কাটিয়াছিল। দেশে রাজনৈতিক চেতনাসঞ্চারের কার্যেও নগেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অল্প ছিল না। হিন্দুমেলায় 'স্বদেশ-প্রীতি' বিষয়ে জাতীয়ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা ও পরবর্তী কালে ভারতসভার অন্যতম মুখপাত্ররূপে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণপূর্বক বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতার দ্বারা তিনি ভারতবাসীকে নিজ ঐতিহ্য ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি বাগ্মী ও সুনিপুণ তার্কিক ছিলেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার রচিত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' (১ম সংস্করণ, ১৮৮১ খ্রী) রামমোহন রায়ের সর্বাধিক সুলিখিত ও প্রামাণ্য জীবনী। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত 'ধর্ম-জিজ্ঞাসা', ১ম ভাগ (১৮৮৪ খ্রী), ২য় ভাগ (১৮৮৯ খ্রী) এবং ৩য় ভাগ (১৮৯২ খ্রী?), 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' (১৩০১ বঙ্গাব্দ), 'অনন্তের উপাসনা' (১৩০৭ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্র বঙ্কুবিহারী কর, ভক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনবৃত্তান্ত, ঢাকা, ১৯৩২।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮ খ্রী) প্রথম জীবনে নগেন্দ্রনাথ সাহিত্যকর্মে ব্রতী হইয়া কবিতা ও উপন্যাস রচনায় এবং পত্রিকা-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর ইনি মন দেন নাটক রচনায়। প্রকাশিত নাট্য রচনার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য 'ম্যাক্‌বেথ'-এর অনুবাদ 'কর্ণবীর' (১২৯১ বঙ্গাব্দ), 'ধর্মবিজয় বা শংকরাচার্য' (১২৯৫ বঙ্গাব্দ)। দুই-একটি নাটক অভিনীতও হইয়াছিল। 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর পরিশিষ্ট সংকলনে নিযুক্ত হইয়া নগেন্দ্রনাথ সাহিত্যকর্ম ছাড়িয়া দিয়া সংস্কৃত বিদ্যায় ও পুরাতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হন। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের আরব্ধ 'বিশ্ব-কোষ'-এর ভার ইনি প্রথম হইতেই নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লন। ভারতীয় ভাষায় এই প্রথম কোষগ্রন্থ (এন্‌সাইক্লোপিডিয়া) তিনি ২২ খণ্ডে সম্পূর্ণ করেন (শেষ খণ্ডের প্রকাশকাল ১৩১৮ বঙ্গাব্দ) এবং ইহার হিন্দী সংস্করণও প্রকাশ করেন (২৪ খণ্ডে, ১৯১৬-৩১ খ্রী)। ইহা ব্যতীত নগেন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য কাজ হইল বহু খণ্ডে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', 'দি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ময়ুরভঞ্জ', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ, শুশুনিয়া প্রত্নলিপি, মদনপালের অনুশাসন ইত্যাদির পাঠ উদ্ধার ও প্রকাশ

ইত্যাদি। নগেন্দ্রনাথ বহু বাংলা, সংস্কৃত ও ওড়িয়া পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজস্ব পুঁথি সংগ্রহ লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ শুরু হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি একটি মূল স্তম্ভের মত ছিলেন। বাংলা বিদ্যায় এবং ভারতীয় প্রত্নবিদ্যায় তাঁহার কৃতিত্ব অত্যন্ত স্মরণীয়।

দ্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত, বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

সুকুমার সেন

নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৫৬-১৯৩৩ খ্রী) দিকপাল সংগীতজ্ঞ। গায়করূপে নগেন্দ্রনাথ খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও ধ্রুপদ ও ঠুংরি গানেও পারদর্শী ছিলেন। অনুপম কণ্ঠসম্পদের অধিকারী নগেন্দনাথের সংগীত-গুরু ছিলেন—ধ্রুপদে যদু ভট্ট ও পিতা উমানাথ, খেয়ালে বন্নে খাঁ ও আহম্মদ খাঁ, টপ্পায় ইমাম বাদী (রমজান খাঁর জননী), পিতা উমানাথ ও মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ঠুংরিতে শ্রীজান বাঈ।

রানাঘাটের নিকটবর্তী মালিপোতা গ্রামে নগেন্দ্রনাথের পৈত্রিক নিবাস হইলেও তাঁহার সংগীতজীবন প্রধানতঃ রানাঘাটে অতিবাহিত হয়। তাঁহার পিতা বঙ্গবিশ্রুত কথক উমানাথ (১৮২৯-৯৮ খ্রী) সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন এবং নগেন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতশিক্ষা পিতার নিকটেই সম্পন্ন হইয়াছিল। উত্তরজীবনে নগেন্দ্রনাথ রানাঘাটে কৃতী শিষ্যমণ্ডলীসহ আচার্যরূপে অবস্থান করিলেও কলিকাতা তথা বাংলার নানা সংগীতাসরে, বারাণসীতে এবং নেপাল দরবারেও খ্যাতিমান হন। নগেন্দ্রনাথের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন খেয়াল ও টপ্পা-গুণী নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পদ্মবাবু), নগেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (নগেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র)।

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, 'সঙ্গীতময় জীবন', প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

নগেন্দ্রনাথ সেন (? - ১৩২৬ বঙ্গাব্দ) প্রখ্যাত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। বর্ধমান জেলার কালনায় জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসাব্যবসায়ে তিনি প্রচুর পরিমাণে যশ এবং অর্থ অর্জন করেন। 'কেশরঞ্জন' তৈলের আবিষ্কর্তা হিসাবে নগেন্দ্রনাথ সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকাবলী: 'রোগিচর্চা', 'পাচন ও মুষ্টিযোগ', 'সচিত্র কবিরাজি শিক্ষা', 'সচিত্র ডাক্তারিশিক্ষা', 'সচিত্র পরিচর্যাশিক্ষা', 'সচিত্র সুশ্রুত-সংহিতা' এবং 'দ্রব্যগুণশিক্ষা'।

অশোকা সেনগুপ্ত

নগ্নীভবন পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রস্তরখণ্ডে অবিরত যে জটিল ক্ষয়কার্য চলিয়াছে তাহা প্রধানতঃ তিনধারায় বিভক্ত: আবহবিকার বা বিচূর্ণীভবন, অপসারণ এবং ক্ষয়ীভবন। এই তিন কার্যকে একত্রে নগ্নীভবন বলা হয়। আবহবিকার হইলে উন্মুক্ত প্রস্তরখণ্ডে ভাঙ্গন অথবা বিঘটন ঘটে। ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড নদী, হিমবাহ বা বায়ুর দ্বারা অপসারিত বা স্থানান্তরিত হইলে শিলার ক্ষয়ীভবন হয়। ইহা ছাড়া স্থানান্তরিত হইবার সময়ে প্রস্তরখণ্ড ঘর্ষণের দ্বারাও ভূত্বকের ক্ষয়কার্যের সহায়তা করে। এই সকল ক্ষয়ীভবন সকল ভূমিতে সমান হয় না। ইহার ফলে ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রকারের ভূ-প্রকৃতি দেখা যায়।

মীরা গুহ

নচিকেতা বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে নচিকেতা নামে ঋষিপুত্রের উপাখ্যান প্রসিদ্ধ। ঋগ্‌বেদে (১০।১৩৫) ইহার প্রথম আভাস পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের (৩।১১।৮।১) কাহিনী অনুসারে যম নচিকেতাকে মৃত্যু জয়ের জন্য নাচিকেত অগ্নি-চয়ন ও উপাসনার উপদেশ দেন। কঠোপনিষদে আত্মতত্ত্বের উপদেশের কথা আছে। মহাভারতে (অনুশাসন ৭১) উদ্দালকি-নাচিকেত সংবাদ কাহিনীটিতে যম নচিকেতাকে যমলোকস্থিত দুগ্ধহ্রদ প্রভৃতি দেখাইবার সময়ে গোদান-মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। বরাহপুরাণ (১৯৩-২১২) অনুসারে যমলোক হইতে ফিরিয়া নচিকেতা ঋষিগণের নিকট সুকর্মের ফল, পাপের ফল প্রভৃতি বর্ণনা করেন ('কঠোপনিষদ্' দ্র)।

দীপক ভট্টাচার্য

নটরাজ মহাদেব শিবের তাণ্ডবনৃত্যের লীলামূর্তি। ইহা 'সভাপতি' নামে পরিচিত। শিবের নটরাজ মূর্তির অধিকাংশই দক্ষিণ ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই মূর্তির রূপকল্পনা দক্ষিণ ভারতের কোনও স্থানে উদ্ভূত হইয়াছিল মনে করা অসঙ্গত নহে। বস্তুতঃ শিল্পরসিক সমাজের প্রশংসাধন্য চারিহস্তবিশিষ্ট যে নটরাজ মূর্তি ভারতে সুপরিচিত তাহার উদ্ভব দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের আমলে; চোল শিল্পশৈলীর অন্তর্গত ব্রঞ্জনির্মিত এই মূর্তিগুলি মধ্যযুগের ভারতীয় শিল্পীদের অসাধারণ সৃষ্টিরূপে নন্দিত হইয়াছে। এই রূপপ্রমূর্তিতে শিব

অপস্মার-পুরুষ (তামিল ভাষায় 'মূয়লক') নামক এক কুশ্রী বামনের উপর নর্তনশীল, তাঁহার দক্ষিণ পদ অপস্মারের পৃষ্ঠদেশে প্রোথিত, বাম পদ একটু দক্ষিণ ঘেঁষিয়া উত্থিত; তাঁহার চারি হাতের মধ্যে সম্মুখস্থ বাম হাত দোল বা গজহস্তভঙ্গীতে উত্থিত বাম পদকে নির্দেশ করিয়া প্রলম্বিত, সম্মুখের দক্ষিণ হস্ত অভয়মুদ্রায় বিন্যস্ত, পশ্চাতের বাম হস্তে অগ্নিগোলক এবং পশ্চাতের দক্ষিণ হস্তে ডমরু (তামিল ভাষায় 'উডুক্কই'); একটি পীঠিকায় সংস্থাপিত সম্পূর্ণ মূর্তি অগ্নিশিখার অলংকরণ-সমন্বিত প্রভাবলী (তামিল ভাষায় 'তিরুবসি') দ্বারা বেষ্টিত, প্রভাবলীর প্রান্ত দুইটি পীঠিকায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। 'উণমইবিলক্কম্' নামে একটি মধ্যযুগীয় তামিল গ্রন্থে এই অপূর্ব মূর্তি-রূপের শিল্পব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে: ডমরু হইতে সৃষ্টির শুরু, অভয়মুদ্রায় স্থিতির ইঙ্গিত; অগ্নিগোলক প্রলয় বা ধ্বংসের প্রতীক, উত্থিত বাম পদে মুক্তির (অন্যভাবে অনুগ্রহ প্রসাদের) আভাস, প্রভাবলী তাঁহার তিরোভাবের দ্যোতক; অর্থাৎ নটরাজ মূর্তির মধ্যে দেবতার পঞ্চকৃত্যের (সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, অনুগ্রহ এবং তিরোভাব) রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে।

উপরিবর্ণিত চারিহস্তবিশিষ্ট নটরাজ মূর্তি ছাড়া নৃত্যপর শিবের আরও বিভিন্ন ধরনের মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সকল মূর্তিতে দেবতার হাতের সংখ্যা ৮, ১০, ১২ এবং ১৬; তাঁহার নৃত্যভঙ্গীতেও বৈচিত্র্য বিদ্যমান। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও বিখ্যাত নটরাজ মূর্তিগুলির মধ্যে বাদামি, এলোরা, এলিফ্যান্টা প্রভৃতি গুহাগুলি এবং কাঞ্চী বা কাঞ্জিবরমের মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাদামি গুহার মূর্তিতে (আনুমানিক ৬ষ্ঠ শতাব্দী) অতিভঙ্গ ভঙ্গীতে নৃত্যপর দেবতার হাতের সংখ্যা ১৬; বাম হাতগুলির একটি গজহস্ত এবং দক্ষিণ হাতগুলির একটি 'চতুর' ভঙ্গীতে বিন্যস্ত। তিনি বিভিন্ন হাতে ত্রিশূল, দণ্ড, ডমরু, পরশু ইত্যাদি ধারণ করিয়া আছেন। বামদিকে তাঁহার বাহন নন্দী, দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান গণেশ ও ঢোলকবাদনরত জনৈক পুরুষ। এলোরার মূর্তিতে (আনুমানিক ৮ম শতাব্দী) কটিসম ভঙ্গীতে নৃত্যরত শিবের হাতের সংখ্যা ৮। কয়েকটি হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দক্ষিণ হাতের একটিতে ডমরু এবং একটি কটক ভঙ্গীতে, বাম হাতগুলির একটি ত্রিপতাক ভঙ্গীতে বিন্যস্ত। তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে তাঁহার অনুচর ও ভক্তবৃন্দ, বিমুগ্ধভাবে তাহারা দেবতার নৃত্যকলা নিরীক্ষণ করিতেছে। বাদামি এবং এলোরার নৃত্যমূর্তিগুলিতে এবং কৈলাসনাথ মন্দিরের মূর্তিতেও শিবের পদতলে শায়িত অপস্মার-পুরুষ নাই। অপস্মার-পুরুষের সংযোজন যে পরবর্তী কালের তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কম।

মূর্তিতত্ত্বের ক্ষেত্রে দেশকালের প্রভাব যে কত গভীর হইতে পারে, বাংলা দেশে প্রাপ্ত নটরাজমূর্তিগুলি তাহার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। মধ্যযুগের বঙ্গীয় শিল্পশৈলীর অন্তর্গত এই মূর্তিগুলির অধিকাংশ পাওয়া গিয়াছে ঢাকা জেলার রামপাল এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে। এইরূপ একটি সুন্দর মূর্তি রামপালের কাছে শংকরবান্ধায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্তিতে নাগোপবীত পরিহিত শিব তাঁহার বাহন নন্দীর উপর নৃত্য করিতেছেন, আনন্দে আত্মহারা হইয়া নন্দী তাহার প্রভুর দিকে তাকাইয়া আছে এবং তাহার সামনের ও পিছনের দুইটি পা তোলা থাকাতে মনে হইতেছে যে, সেও যেন প্রভুর নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে ব্যগ্র; নৃত্যশীল শিবের ১০ হাতে ত্রিশূল, দণ্ড, গদা, ঢাল, পাশ ইত্যাদি নানাবিধ আয়ুধ, তাঁহার দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে তাঁহার দুই শক্তি পার্বতী ও গঙ্গা স্ব স্ব বাহন সিংহ ও মকরের উপর দণ্ডায়মান; মূর্তির প্রভাবলী ও পীঠিকায় উৎকীর্ণ নাগগণাদি দেবতাকল্পগণ মুগ্ধভাবে নটরাজ শিবের নৃত্যকৌশল নিরীক্ষণ করিতেছেন। ত্রিপুরা জেলায় ভারেল্লা গ্রামে প্রাপ্ত অনুরূপ একটি মূর্তির হাতের সংখ্যা ১২ এবং ইহার পাদপীঠে উৎকীর্ণ লেখতে 'নর্তেশ্বর' রূপে মূর্তিটির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত মূর্তিও শংকরবান্ধার নিদর্শনের মত ১০ হাতবিশিষ্ট। অপস্মার-পুরুষের পরিবর্তে বৃষের উপর নৃত্যপর শিবের রূপকল্পনা করা হইয়াছে। বাংলা দেশের নটরাজ মূর্তি-গুলির সঙ্গে মৎস্যপুরাণে (২৫৯ অধ্যায়) বর্ণিত নটরাজ মূর্তির সৌসাদৃশ্য বর্তমান।

সংক্ষেপে, শিব-নটরাজ মূর্তির রূপকল্পনায় ভারতীয় শিল্পিগণ বিশ্বসৃষ্টির মূলতত্ত্বকে আশ্চর্য সুন্দর রূপ দান করিয়াছেন এবং বিজ্ঞান, ধর্ম ও শিল্পের অন্তর্নিহিত সত্যকে সমন্বিত করিয়াছেন।

দ্র T. A. Gopinath Rao, *Elements of Hindu Iconography*, vol. II, Madras, 1916; A. K. Coomaraswamy, *Dance of Siva*, London, 1925; N. K. Bhattasali, *Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, Dacca, 1929; J. N. Banerjea, *Development of Hindu Iconography*, Calcutta, 1956.

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

নদিয়া ২২°৫৩´ হইতে ২৪°১১´ উত্তর ও ৮৮°৯´ হইতে ৮৮°৪৮´ পূর্ব। পশ্চিম বঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিভাগের একটি সীমান্তবর্তী জেলা। ইহার উত্তর ও উত্তরপশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা, উত্তরপূর্বে পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিমে ভাগীরথী নদী ও বর্ধমান জেলা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বে চব্বিশ পরগনা জেলা। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবিভাগের ফলে নদিয়ার ৫টি মহকুমার মধ্যে তিনটি মহকুমা কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশিষ্ট ২টি মহকুমা—কৃষ্ণনগর সদর ও রানাঘাট মহকুমা লইয়া ভারতের নদিয়া জেলা গঠিত হয়। বর্তমানে ইহার আয়তন ৩৯২১ বর্গ কিলোমিটার (১৫১৪ বর্গ মাইল)। নদিয়া জেলায় নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রানাঘাট, কল্যাণী, চাকদহ প্রভৃতি শহর আছে।

জেলাটি জলাভূমি ও ক্ষুদ্র নদী -সমন্বিত পলিগঠিত সমতল অঞ্চল। করিমপুর ও সদর মহকুমা ব্যতীত প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই হালকা বালিযুক্ত দোঁ-আশ মৃত্তিকা দেখা যায়। কালান্তর নামে নিম্নভূমি অঞ্চলটি মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথী ও জলাঙ্গি নদীর অববাহিকার মধ্য দিয়া দক্ষিণপূর্বদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। অঞ্চলটির উপরিস্থিত মৃত্তিকা শক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ। এই অঞ্চলে প্রায়ই জল জমিয়া থাকে।

এই জেলার প্রধান নদীগুলি হইল ভাগীরথী, জলাঙ্গি, মাথাভাঙা, চূর্ণী ও ইছামতী। নদীগুলি বহুবার গতিপথ পরিবর্তন করিয়াছে। নাকাশিপাড়া, কালিগঞ্জ, শান্তিপুর ও চাকদহ অঞ্চলে বন্যা হয়।

জেলার সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৬° সেন্টিগ্রেড (৯৭° ফারেনহাইট) ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১১° সেন্টিগ্রেড (৫২° ফারেনহাইট)। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪৪৭ মিলিমিটার (৫৭ ইঞ্চি)।

লক্ষ্মণসেন নদিয়ার অন্তর্গত নবদ্বীপের পত্তন করেন বলিয়া কথিত আছে। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা সেনবংশীয় রাজাগণ কর্তৃক শাসিত হয়। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খল্‌জী নবদ্বীপ জয় করেন। পরবর্তী কালে বঙ্গদেশের রাজা আদিশূর কর্তৃক কনৌজ হইতে আনীত বলিয়া কথিত ব্রাহ্মণ ভট্টনারায়ণের বংশধরগণ নদিয়া শাসন করিতেন। এই বংশের রাজা রুদ্র রায় ও রামকৃষ্ণের সময়ে রাজ্যের উন্নতি ও বিস্তার হয়। রুদ্র রায়ের প্রপৌত্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নদিয়ারাজ যথাসময়ে রাজস্ব না দেওয়ার দরুন ইংরেজ সরকার তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা অপহরণ করেন ও ভাতার বন্দোবস্ত করেন। ইহার পর হইতে নদিয়া ইংরেজগণ কর্তৃক শাসিত হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নদিয়া নীলবিদ্রোহের একটি প্রধান অঞ্চল ছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েকবার ইহার সীমা পরিবর্তিত হয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী এই জেলার মোট জনসংখ্যা ১৭১৩৩২৩ জন; তন্মধ্যে ৮৭৯৪৩০ জন পুরুষ ও ৮৩৩৮৯৩ জন স্ত্রীলোক। প্রতি হাজারে শহরের লোকসংখ্যা ১৮৪ এবং গ্রামের লোকসংখ্যা ৮১৬। নবদ্বীপ শহরে সর্বাপেক্ষা ঘনবসতি।

এই জেলায় নিম্নবঙ্গের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ধানই প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। ইহা ছাড়া ছোলা, নানা প্রকার ডাল ও তৈলবীজ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বর্তমানে এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে পাটের চাষ হইতেছে। এই জেলায় কৃষিকর্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৯৯৭৩৬ ও কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা ৭৭৯০২ জন। এখানে সেচের খুব ব্যাপক বন্দোবস্ত নাই। নলকূপের সাহায্যে সেচব্যবস্থা কিছু পরিমাণে প্রবর্তিত হইয়াছে।

নদিয়ার নানাবিধ শিল্পের মধ্যে তাঁতশিল্প উল্লেখযোগ্য। শান্তিপুরের তাঁতশিল্পের উৎকর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান। শান্তিপুর ব্যতীত করিমপুর, চাপড়া, রানীবাঁধ, আড়ংশাড়িয়া, পীতাম্বরপুর, নাকাশিপাড়া, পলাশি ও নবদ্বীপেও তাঁতকেন্দ্র আছে। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি বহুদিন যাবৎ মৃৎশিল্পের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়া আসিতেছে। ইহা ব্যতীত রানাঘাট, হবিবপুর, কায়েতপাড়া, বৃদ্ধপুর, নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের গোয়াড়িতে মৃৎশিল্পকেন্দ্র আছে। গঙ্গাপুর, ফুলিয়া ও বড় আন্দুলিয়ায় তাল ও খেজুর গুড় শিল্প আছে। কল্যাণী, কৃষ্ণনগর, রামনগর, রানাঘাট, হরিণঘাটা, কাঁচরাপাড়া ইত্যাদি স্থানে কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প বর্তমান।

এই জেলার প্রধান রপ্তানিদ্রব্য পাট, ছোলা, ডাল, চিনি ও গুড়; প্রধান আমদানিদ্রব্য ধান ও চাউল। প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র নবদ্বীপ, বগুলা, রানাঘাট, কালিগঞ্জ, মাতিয়ারি, করিমপুর, তেহট্ট, আন্দুলিয়া, কৃষ্ণনগর ও স্বরূপগঞ্জ।

এই জেলার শতকরা ৭৭ জন হিন্দু, ২২ জন মুসলমান। তফশিলী উপজাতির মধ্যে উরাঁও ও সাঁওতাল প্রধান। এই জেলার সংস্কৃত শিক্ষার খ্যাতি বহু শতাব্দীর। বর্তমানে প্রতি হাজারে ২৭২ জন শিক্ষিত। কল্যাণীতে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহা ব্যতীত এই জেলার প্রধান মহাবিদ্যালয়গুলি কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, রানাঘাট, শান্তিপুর ও বগুলায় অবস্থিত। এখানে ৬৩টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও ৪৩টি নৈশবিদ্যালয় আছে। এই জেলায় ছেলেদের

জন্য মোট ৮২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে ৩৯টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ; মেয়েদের জন্য ৩৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তন্মধ্যে ৮টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। হরিণঘাটায় পশুগবেষণাকেন্দ্র ও প্রজননকেন্দ্র আছে। কৃষ্ণনগরেও কয়েকটি কৃষিগবেষণাকেন্দ্র আছে।

নবদ্বীপ অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৈষ্ণবপ্রধান স্থান। নদিয়ার চৈতন্যদেবই এই ধর্মের প্রবর্তক। তদ্ব্যতীত এখানে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কাঁচরাপাড়ায় শ্রীকৃষ্ণরায়ের মন্দির, কুলিয়ার অপরাধভঞ্জন পাট, ঘোষ-পাড়ার মেলা, জাসড়ার জগন্নাথদেবের মন্দির, পালপাড়ার মন্দির, যবন হরিদাসের সমাধিক্ষেত্র ও কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়া, আনুমানিক ৮০০ বৎসরের পুরাতন শহর শান্তিপুর, নদিয়ার রাজাদের রাজধানী মাতিয়ারি, নৃসিংহ-দেবের মন্দির, চৈতন্যদেবের জন্মভূমি বল্লালদীঘি বা মায়াপুর, চাঁদ কাজীর সমাধিক্ষেত্র বামনপুকুর, চৈতন্যদেবের লীলাক্ষেত্র নবদ্বীপ ও পলাশি যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভসহ পলাশি প্রভৃতি নদিয়া জেলার উল্লেখযোগ্য ও দ্রষ্টব্য স্থান। কৃষ্ণনগরে একমাসব্যাপী বার দোলের মেলা, শান্তিপুরে ১৫ দিনব্যাপী রাসমেলা, মাতিয়ারিতে ১৫ দিনব্যাপী পীরের পূজা, ঘোষপাড়ায় ১০ দিনব্যাপী দোলের মেলা ও আড়ংঘাটায় একমাসব্যাপী যুগলকিশোরের মেলা হয়।

দ্র J.H.E. Garrett, *Bengal District Gazetteers : Nadia*, Calcutta, 1910 ; A. Mitra, *Census 1951 : West Bengal : District Handbooks: Nadia*, Calcutta, 1953 ; *Census of India : Paper 1 of 1962 : 1961 Census*, Delhi, 1962.

মুক্তি দাশগুপ্ত

নদী অসমতল ভূ-প্রকৃতির ঢাল দিয়া প্রবাহিত বৃষ্টির জলের মিলিত ধারা হইতে নদীর জন্ম। গঙ্গা নদীর ন্যায় বৃহৎ নদী সাধারণতঃ প্রস্রবণ, গলিত বরফ, হিমবাহের শেষাংশ অথবা হ্রদ হইতে উদ্ভূত ছোট নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ছোট নদীগুলি শাখাপ্রশাখাযুক্ত আরও নদীর সহিত মিলিত হইয়া বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া ভূখণ্ডের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং পরিশেষে সাধারণতঃ সাগরে মিলিত হয়। কোনও কোনও নদী দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত হ্রদ বা নিম্ন জলাভূমিতে পতিত হয়।

বড় নদীতে পতিত নদী উপনদী ও নদী হইতে নির্গত নদী শাখানদী নামে পরিচিত। যে সকল ছোট নদী হইতে বড় নদীর উৎপত্তি তাহাদের মধ্যে দৈর্ঘ্য, আকার, নিঃসরণ ও ঐতিহ্যের দ্বারা যেটি সর্বপ্রধান বলিয়া বিবেচিত তাহাকেই বড় নদীর উৎস বলা হয়। যেমন গঙ্গোত্রী হিমবাহ হইতে উৎপন্ন ভাগীরথীকে গঙ্গা নদীর উৎস মনে করা হয়। সাগর বা উপনদীর সহিত নদীর মিলনস্থানকে সঙ্গম বলা হয়।

গতিপথের ঢাল ও জলস্রোতের বেগ অনুসারে আদর্শ নদীর প্রবাহকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয় : প্রাথমিক বা তরুণ অবস্থা, মধ্য বা পরিণত অবস্থা এবং নিম্ন বা বৃদ্ধ অবস্থা। প্রাথমিক অবস্থায় অসমতল নদীগর্ভের জন্য নদীপথে খরস্রোত ও জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় প্রবল স্রোত এবং ঢালু উপত্যকার জন্য নদী ক্রমাগত উহার গতিপথকে ক্ষয় করিতে থাকে। এই ক্ষয়কার্যই নদীর তরুণ অবস্থার বৈশিষ্ট্য। হিমালয় পর্বত হইতে আগত তিস্তা, রায়ডক, জলঢাকা প্রভৃতি নদীগুলি অপরিণত নদীর দৃষ্টান্ত। নদী উহার অসমতল গতিপথকে ক্ষয় করিয়া এমন অবস্থায় আনে যখন উহার স্রোত ঠিক পরিপূর্ণভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত ভগ্নাবশেষ বহিয়া লইতে সক্ষম হয়। এই পর্যায়ে নদী পরিণত অবস্থায় পদার্পণ করে। এই অবস্থায় নদীর ক্ষয়কার্য উহার গঠনকার্যের সহিত সম্পূর্ণ-ভাবে সমান হয় এবং তখনই নদীগর্ভের পার্শ্বচিত্র (প্রোফাইল) স্থিরতা বা ভারসাম্য লাভ করে।

বৃদ্ধ অবস্থায় ক্ষয়কার্য অপেক্ষা নদীর গঠনকার্য বেশি হয় এবং এসময়ে নদীর ক্ষয়কার্য উপত্যকার গভীরতা বাড়ায় না, কিন্তু উপত্যকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ক্রমশঃ ক্ষয় হওয়ায় একটি বৃহৎ সমভূমির সৃষ্টি হয়। নদীগর্ভে অধিক পলিমাটি অবক্ষেপণের ফলে অনেক সময়ে নদী উহার গতি পরিবর্তন করে কিংবা বিভিন্ন ছোট অথবা বড় নদীতে বিভক্ত হইয়া এক জটাজালের ন্যায় নকশার সৃষ্টি করে। কোনও কোনও সময়ে অধিক পলিমাটিতে নদীগর্ভের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। বন্যার সময় দুই কূলে পলি জমিয়া তীরে স্বাভাবিক বাঁধের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে নদীর বেগ কমিয়া যাওয়ায় নদী সর্বদা আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হয়, ফলে নদীতটের বক্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যখন বক্রতার মাত্রা একটি সীমা অতিক্রম করে তখন দুই বাঁকের মধ্যবর্তী অংশ ক্ষয় করিয়া নদী তাহার চক্রপথে না ঘুরিয়া নূতন ও সরল পথে প্রবাহিত হয়। পরিত্যক্ত অংশটি তখন অশ্বখুরাকৃতি হ্রদে পরিণত হয়। পশ্চিম বঙ্গের নদিয়া জেলার নিম্ন-অঞ্চলগুলিতে এইরূপ হ্রদের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

নদী অবশেষে নিম্ন-সমভূমিতে প্রবেশ করিয়া উহার সমস্ত পলিমাটি সম্পূর্ণভাবে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। এই পলিমাটি বিভিন্ন আকৃতিতে জমা হয়। সাধারণতঃ এই

গঠনকার্যে ব-দ্বীপের আকৃতি পরিলক্ষিত হয়। প্রায় সর্বত্রই ব-দ্বীপের সমুদ্রদিকের অংশটি প্রশস্ত হয়।

উৎস হইতে মোহানা পর্যন্ত নদীগর্ভের দৈর্ঘ্য-বরাবর পার্শ্বচিত্র নদী-প্রবাহিত ভূমির ঢালের অনুরূপ হইয়া থাকে। এই পার্শ্বচিত্রের খিলানের মত অবতল (কন্‌কেভ) রেখার প্রথম উচ্চতর অংশ নদীর প্রবল জলপ্রবাহ ও বিপুল ক্ষয়কার্য এবং প্রশস্ত নিম্নাংশ নদীর মন্দগামী প্রবাহ ও মৃদু ক্ষয়কার্য নির্দেশ করে।

যে ভূমিখণ্ড নদী এবং উহার শাখানদীর দ্বারা ধৌত হয় উহাকে নদী-প্রবাহিত অঞ্চল বলে। দুইটি বিপরীত ঢালবিশিষ্ট নদী-প্রবাহিত অঞ্চল নদী-বিভাজিকা দ্বারা বিভক্ত হয়, যথা পামির-হিমালয় দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত ও উত্তরপশ্চিমে আরল সাগরের দিকে প্রবাহিত নদ-নদীর নদী-বিভাজিকারূপে বিরাজ করিতেছে।

দ্র A K. Lobeck, *Geomorphology*, New York, 1939; C. Strickland, *Deltaic Formation*, Calcutta, 1940.

মীরা গুহ

ননীগোপাল মজুমদার (১৮৯৭-১৯৩৮ খ্রী) প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক। ননীগোপাল যশোহর জেলার অন্তর্গত দেবরাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বরদাপ্রসন্ন মজুমদার।

ননীগোপাল ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ও গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করেন। ৪ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর তিনি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহীতে অবস্থিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত হন। তাঁহার কৃতিত্বপূর্ণ কার্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা জন মার্শালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মার্শাল তাঁহাকে সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত মহেঞ্জো-দড়োতে খননকার্য করিবার জন্য লইয়া যান এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সহকারী কর্মাধ্যক্ষরূপে নিয়োজিত করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে খননকার্যে ব্যাপৃত থাকেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্মাধ্যক্ষ হন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর সিন্ধু প্রদেশের দাদু জেলায় অনুসন্ধানকার্যে রত থাকাকালীন মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে হুর দুর্বৃত্ত কর্তৃক নিহত হন। প্রত্নতত্ত্বের নানা বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ ছিল, বিশেষ করিয়া সিন্ধু-সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণাগুলি অতীব মূল্যবান।

দ্র চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, 'ঐতিহাসিক ননীগোপাল মজুমদার', ইতিহাস, ৫ম খণ্ড, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

অশোকা সেনগুপ্ত

ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৯৫ খ্রী - ?) বিপ্লবী। তিনি বিপ্লবী নেতা জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের শিষ্য। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ননীগোপাল কলিকাতায় শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী নামক একজন গোয়েন্দা হেডকনস্টেবলকে নিহত করেন। এই সময় উচ্চতম গোয়েন্দা অফিসার ডেন্‌হামকে হত্যার কার্যে ননীগোপালকেই নিযুক্ত করা হয়। একদিন বিকালে তাঁহারই গাড়ির মত এক গাড়িতে অন্য এক সাহেব কাউনি রাইটার্স বিল্ডিং হইতে রওনা হইলে অদূরে অপেক্ষমাণ ননীগোপাল সেই গাড়ির মধ্যে এক বোমা নিক্ষেপ করেন; বোমাটা কিন্তু ফাটে নাই এবং ননীগোপাল ধরা পড়িয়া যান। বিচারে ননীগোপালের ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয় এবং তিনি আন্দামানে প্রেরিত হন। তাঁহার উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইলেও তিনি কোনও স্বীকারোক্তি করেন নাই। আন্দামানে ননীগোপাল কাজবন্ধ ধর্মঘটে ও অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। কাজবন্ধ ধর্মঘটের সময় বহুদিন তাঁহাকে দাঁড়া-হাতকড়িতে ঝুলাইয়া রাখা হয়। নানা বিড়ম্বনা ভোগ শেষ করিয়া ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ননীগোপাল আন্দামান হইতে মুক্ত হন এবং দেশে ফিরিয়া প্রথমে কংগ্রেস ও পরে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং জামসেদপুর কারখানায় চাকরি গ্রহণ করিয়া সেখানকার একজন শ্রমিকনেতা হন। কংগ্রেসে তিনি সুভাষচন্দ্রের সমর্থক ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতালাভের পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নন্দকুমার, মহারাজা (? -১৭৭৫ খ্রী) বীরভূম জেলার ভদ্রপুরে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বংশে নন্দকুমারের জন্ম হয়। পিতার নাম পদ্মনাভ রায়। ইনি মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের অধীনে আমিনের কার্যে নিযুক্ত হন এবং পরে পুত্র নন্দকুমারকে নিজ সহকারী নিযুক্ত করেন। নবাব আলীবর্দীর রাজত্বকালে তিনি হিজলি ও মহিষাদলের আমিন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সিরাজুদ্দৌলার সময়ে তিনি হুগলির ফৌজদার নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইংরেজরা ফরাসীদের চন্দননগর অধিকারের চেষ্টা করিলে নন্দকুমার নবাবের নির্দেশ অমান্য করিয়া ইংরেজদিগকে বাধা না দেওয়ায়

তাঁহারা সহজেই চন্দননগর অধিকার করিয়া লন। মীর জাফর প্রথমবার সিংহাসনে বসিলে নন্দকুমার ক্লাইভের মুন্সি ও দেওয়ান হন। কোম্পানির দেনা পরিশোধ করিতে না পারায় মীর জাফর বর্ধমান, নদিয়া প্রভৃতির রাজস্ব কোম্পানিকে ছাড়িয়া দেন। সেই সময় কোম্পানির পক্ষ হইতে নন্দকুমার ঐ রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন (১৭৫৮ খ্রী)। এই রাজস্ব আদায় লইয়া নন্দকুমার ও রেসিডেণ্ট ওয়ারেন হেস্টিংসের মধ্যে মনোমালিন্যের স্ত্রপাত হয়। মীর জাফরের দ্বিতীয়বার নবাবীর সময় নন্দকুমার তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হন। সম্ভবতঃ তিনি এই সময়ে ইংরেজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে তাড়াইবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে কোনও ফল হয় নাই। কোম্পানির কর্মচারিগণের অত্যাচারাদি সম্বন্ধে সংবাদ বিলাতে পৌছিলে নূতন রাজ্যবিধির প্রবর্তন হয়। বিলাত হইতে যাঁহারা গভর্নর জেনারেলের সহকারী সদস্য হইয়া আসিলেন, তাঁহারা ঐ সব অত্যাচার সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য নন্দকুমারের সাহায্য গ্রহণ করেন। নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ করেন। ইহাতে হেস্টিংস ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার সংকল্প করেন। নন্দকুমার এক সময়ে বুলাকিদাস নামে এক মহাজনের নিকট কতকগুলি অলংকার বিক্রয়ের জন্য দেন। ঐ অলংকার লুণ্ঠিত হইয়া যাওয়ায় বুলাকিদাস তাহার মূল্য বাবদ একখানি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেন। সেই অঙ্গীকারপত্রের বলে নন্দকুমার বুলাকির মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি হইতে ঐ টাকা আদায় করিয়া লন। হেস্টিংস বুলাকিদাসের সম্পত্তির আমমোক্তার মোহনপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তিকে হস্তগত করিয়া অঙ্গীকারপত্র জাল বলিয়া সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করেন। মোকদ্দমায় সরকার বাদী হইলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ ইলাইজা ইম্পে-র সহিত হেস্টিংসের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জুন মোকদ্দমা শুরু হয়। তখন বিলাতি আইনে জালের অপরাধে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হইত। নন্দকুমার মোকদ্দমায় দোষী সাব্যস্ত হইলেন এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল (১৬ জুন, ১৭৭৫ খ্রী)। নবাব মোবারকউদ্দৌলা ও কলিকাতার অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার প্রাণদণ্ড রহিত করার জন্য আবেদন ও অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁহার ফাঁসি হয় (৫ আগস্ট, ১৭৭৫ খ্রী)। নন্দকুমার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধর্ম বিষয়ে তিনি উদার মনোভাব পোষণ করিতেন। সে সময়ে তিনি ব্রাহ্মণসমাজের নেতা ছিলেন।

দ্র N. N. Ghosh, *Memoirs of Maharaja Nabakissen Bahadur*, Calcutta, 1901; R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, vol. I, Calcutta, 1962.

ত্রিদিবনাথ রায়

নন্দনতত্ত্ব ‘নন্দনতত্ত্ব’ শব্দটি ইংরেজী অ্যাস্থেটিক্স (aesthetics) শব্দের প্রতিশব্দরূপে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। সৌন্দর্য-দর্শন বা সৌন্দর্যতত্ত্ব শব্দও ঐ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও পাশ্চাত্য মনীষীবর্গের মনে এইরূপ ধারণা ছিল যে, প্রাচীন ভারতে শিল্পসৌন্দর্যের স্বরূপ বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট উপলব্ধি বা তাহাকে ভিত্তি করিয়া কোনও তাত্ত্বিক আলোচনা প্রচলিত ছিল না। যে সকল মনীষীদের গবেষণার ফলে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে মুখ্যতঃ ই. বি. হ্যাভেল, ৎসিমর, আনন্দ কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্তেলা ক্রাম্‌রিশ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও সুশীল-কুমার দে -র নাম সবিশেষ স্মরণযোগ্য।

চিত্র, সংগীত, ভাস্কর্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিল্পগুলির যে পরস্পর প্রভেদ, তাহা প্রক্রিয়াভেদবশতঃই ঘটিয়া থাকে; নতুবা শিল্পীর মূল প্রেরণা এবং লক্ষ্য বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে এক এবং অভিন্নই। শুক্রাচার্য বলিয়াছেন: ‘পৃথক পৃথক ক্রিয়াভির্হি কলাভেদস্তু জায়তে’। এই সকল বিভিন্ন কলার ক্রিয়াকাণ্ড (বা টেক্‌নিক) প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন সাহিত্যবিচারের জন্য অলংকারশাস্ত্র, সেইরূপ সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য, অভিনয় প্রভৃতি কলাসমূহের বিচারাত্মক তত্তৎ শাস্ত্রও অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ‘শুক্রনীতিসার’, ‘শিল্পরত্ন’, ‘ঈশ্বরসংহিতা’, ‘অভিনয়দর্পণ’, ‘সমরাঙ্গণসূত্রধার’, ‘সংগীতরত্নাকর’, ‘মানসার’, ‘প্রতিমালক্ষণ’, ‘বিষ্ণুধর্মোত্তর’ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রধান প্রধান শিল্পের স্বরূপ, ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে অতি গম্ভীর তাত্ত্বিক (থিওরেটিক্যাল) আলোচনা বিস্তৃতভাবে নিবদ্ধ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শিল্পসমূহের মধ্যে তুলনা-মূলক কোনও আলোচনা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রাচীন ভারতে হইয়াছিল বলিয়া জানা নাই। বিভিন্ন শিল্পের তুলনামূলক সমীক্ষার উদ্ভব ও প্রসার আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য মহা-দেশেই ঘটে।

বিভিন্ন শিল্পের স্বরূপ এবং প্রকাশপদ্ধতিতে এই আপাতপার্থক্য সত্ত্বেও সৌন্দর্যানুভূতি এবং পার্যান্তিক লক্ষ্য বিষয়ে মৌলিক যে সুগভীর ঐক্য, তাহাই নন্দনতত্ত্বের

অন্যতম মুখ্য ভিত্তি ও আলোচ্য বিষয়। সাহিত্যবিচার বা অলংকারশাস্ত্রে কবিকর্ম বা বাঙ্ময়ের স্বরূপ, নির্মাণ-পদ্ধতি, লক্ষ্য, অলংকার, রীতি, গুণ, দোষ প্রভৃতি উপাদান সম্পর্কে যে-সকল সমীক্ষা লিপিবদ্ধ আছে, সেইগুলি যদি প্রকৃত শিল্পদৃষ্টি লইয়া পর্যালোচনা করা যায়, তবে সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিল্পসম্পর্কেও তাহাদের উপযোগিতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

যে কোনও শিল্পই হউক না কেন তাহার সৃষ্টির মূলে আছে শিল্পীর সমাধি ব্যাখ্যান বা যোগ। সেই সমাহিত অবস্থায় স্রষ্টা যে বস্তু বা ব্যক্তির রূপ আপন শিল্পের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চাহেন, তাহার সহিত সম্পূর্ণ অদাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সৃষ্টির মূলে এই যে স্রষ্টার প্রজ্ঞা, সে বিষয়ে ভারতীয়গণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। প্রজ্ঞালব্ধ বস্তুর রূপটিকে বিভিন্ন কলার উপযোগী প্রক্রিয়া বা টেক্‌নিকের সাহায্যে যথাযথভাবে প্রকাশ করাতেই শিল্পের সার্থকতা। তবে সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুর রূপকল্পনার সহিত শিল্পীর স্বকীয় অনুভূতি, আদর্শ, রসাস্বাদ প্রভৃতিও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে বলিয়া বস্তুটির চিত্রণ বাস্তবানুগ হইলেই চলে না, বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে তাহার বাহ্যরূপের সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হয়, যাহাতে শিল্পী-চিত্তের ভাব, আদর্শ প্রভৃতিও যথাযথভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। ইহার জন্য সাহিত্যে গুণ, রীতি, অলংকার প্রভৃতির সমাবেশ। এই সকল উপাদানের সময়োপযোগী গ্রহণ ও ত্যাগের ('কালে চ গ্রহণ-ত্যাগৌ') দ্বারা কবি আপন অন্তরের অনুভূতি প্রকাশে সমর্থ হন। অপররূপভাবে চিত্রকলায় রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ প্রভৃতি তত্ত্ব সম্পর্কে চিত্রকরের সম্যক জ্ঞান অপেক্ষিত। ভারতীয় আচার্যগণ একবাক্যে এই সিদ্ধান্তই ঘোষণা করিয়াছেন যে, শিল্পীর রসানুভূতি শিল্পসৃষ্টির মূল উৎস, আবার সহৃদয়ের রসাস্বাদই শিল্পের একমাত্র লক্ষ্য। যদি শিল্পীচিত্তের রসানুভূতি হইতে শিল্পের জন্ম না হয় এবং পরিণামে সহৃদয় শিল্পজ্ঞ চিত্তে যদি তাহা রসাস্বাদ উদ্বোধিত করিতে অক্ষম হয়, তবে তাহাতে যতই নির্মাণ-বৈদগ্ধ্য থাকুক না কেন, ক্রিয়াবিধিতে শিল্পীর যতই প্রাধান্য ও পারদর্শিতা লক্ষিত হউক না কেন, তাহা শিল্প হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ—তাহা সাহিত্যই হউক, সংগীতই হউক, চিত্রকলাই হউক বা ভাস্কর্যই হউক। সেইজন্যই ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে 'রস' কেন্দ্রীয় তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। রসই শিল্পের যথার্থ চারুতা বা সৌন্দর্যের নিদান।

কিন্তু যে সৌন্দর্য আমাদের চিত্তে প্রবৃত্তির উদ্রেক করে, যাহার দ্বারা আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে, সেইরূপ সৌন্দর্য-সৃষ্টি শিল্পীর লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়—ইহাই ভারতীয় শিল্পাচার্যগণের সুচিন্তিত নির্দেশ। সেইজন্যই বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষু ও শ্রমণগণ ঐন্দ্রিয়ক সৌন্দর্যবোধকে ধিক্কৃত করিয়াছেন। বৌদ্ধাচার্য বুদ্ধঘোষ-প্রণীত 'বিশুদ্ধিমগ্‌গ' গ্রন্থে চিত্রকর, সংগীতবিদ প্রভৃতি কলাবিদগণের নিন্দা এইপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। ব্রাহ্মণ্য আচার্যগণও মর্তবিশ্ব অপেক্ষা দেববিশ্ব নির্মাণকেই প্রশস্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে যে সকল মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত, যথা চেতন ও জড়ের মধ্যে অভেদ, ঐহিক ঐন্দ্রিয়ক-বিষয়সমূহের মায়িকতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব, মর্তসৌন্দর্য অপেক্ষা দিব্য ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি—প্রাচীন ভারতীয় শিল্পসৃষ্টিও সেই সকল উপলব্ধ সত্যকে যেন মূর্ত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র। সুতরাং ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শনকে নিছক শিল্প সমালোচনারূপে না দেখিয়া ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনারই পরিপূরক এবং তাহার সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারিলেই ইহার যথার্থ বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব।

দ্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, কলিকাতা, ১৯৪১; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৪৭; A. K. Coomaraswamy, *The Dance of Siva*, London, 1925; A. K. Coomaraswamy, *The Transformation of Nature in Art*, Harvard, 1934; M. Hiriyanna, *Art Experience*, Mysore, 1954; S. N. Dasgupta, *Fundamentals of Indian Art*, Bombay, 1960.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

নন্দবংশ মগধে শিশুনাগবংশের পরে নন্দবংশ রাজত্ব করে। পুরাণে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নামে অভিহিত; 'মহাবোধিবংশ' গ্রন্থে তাঁহার নাম উগ্রসেন। পুরাণ অনুসারে পূর্ববর্তী বংশের ক্ষত্রিয় রাজার ঔরসে শূদ্রানীর গর্ভে তাঁহার জন্ম, কিন্তু জৈন গ্রন্থে তাঁহাকে এক গণিকার গর্ভজাত ক্ষৌরকারপুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রীক লেখকেরাও আলেকজাণ্ডারের সম-সাময়িক নন্দরাজাকে ক্ষৌরকারপুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কয়েকখানি পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে মহাপদ্ম ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলি উচ্ছেদ করিয়া এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি প্রাচীন ভারতের ইক্ষ্বাকু,

পঞ্চাল, কাশী, হৈহয়, কলিঙ্গ, অশ্মক, কুরু, মৈথিল, শূরসেন, বীতিহোত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজ্যগুলিকে মিলিত করিয়া এক বিরাট শূদ্র-সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। এই সাম্রাজ্য যে খুব শক্তিশালী ছিল, গ্রীকগণের বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়। আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাব জয় করিয়া বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া শুনিতে পাইলেন যে ঐ নদীর অপর তীর হইতে গঙ্গা নদীর সাগরসঙ্গম পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর নন্দবংশীয় রাজার ২ লক্ষ পদাতিক, ২০ হাজার অশ্বারোহী, ৩ হাজার হস্তী এবং ২ হাজার রথ সর্বদাই তাঁহার রাজ্য রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে। এই সংবাদ শুনিয়া আলেকজাণ্ডারের সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। আলেকজাণ্ডার বিপাশার তীর হইতেই ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

মহাপদ্মের পরে তাঁহার ৮ পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহারা একসঙ্গে বা পর পর পৃথকভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। এই বংশের মোট রাজত্বকাল সম্বন্ধেও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। পুরাণে লিখিত আছে, এই বংশ মোট ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই বংশ ৩৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে রাজত্ব আরম্ভ করে। আনুমানিক ৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত শেষ নন্দরাজাকে পরাজিত করিয়া মৌর্য-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন।

দুইটি কারণে নন্দবংশ ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগে নন্দ-সাম্রাজ্যের মত বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষে ইহার পূর্বে আর কখনও হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ শূদ্রজাতির এত বড় রাজনৈতিক শক্তির পরিচয় ইহার পূর্বে আর পাওয়া যায় না।

নন্দদের বিপুল ধনৈশ্বর্যের কথা অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কথাসরিৎসাগরে এক নন্দরাজার ৯৯ কোটি স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে। অন্যান্য অনেক গ্রন্থে অনুরূপ উক্তি আছে।

দ্র H. C. Raychoudhuri, *Political History of Ancient India*, Calcutta, 1950; R.C, Majumdar, ed., *History and Culture of the Indian People*, vol. II, Bombay, 1951.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬ খ্রী) মুঙ্গের-খড়্গপুরে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ১৯ অগ্রহায়ণ নন্দলাল বসুর জন্ম। পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু। বসুপরিবারের আদি নিবাস তারকেশ্বরের নিকট জেজুর গ্রামে।

পিতার কর্মস্থল খড়্গপুরে ও দ্বারভাঙ্গার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষালাভ হয়। এই সময় হইতেই পুতুল ও দেবদেবী গড়া প্রভৃতি শিল্পকার্যে তাঁহার উৎসাহ দেখা যায়। বছর পনর বয়সে নন্দলাল কলিকাতায় আসেন। তিনি ২০ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উৎসাহের অভাবে দুইবার এফ. এ. পরীক্ষায় ফেল করার পর তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আর্ট স্কুলে দেখা করেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহাকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন। এই সময় নন্দলালের অন্যান্য শিক্ষাগুরু ছিলেন লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ, হরিনারায়ণবাবু এবং ই. বি. হ্যাভেল।

নন্দলাল আর্ট স্কুলে ছিলেন ৫ বৎসর ; এই সময়ের মধ্যে 'কর্ণের সূর্যস্তব', 'গরুড়স্তম্ভতলে শ্রীচৈতন্য', 'কৈকেয়ী', 'শিবসতী', 'নৌকাবিহার', 'ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা', 'দময়ন্তীস্বয়ংবর', 'শিবতাণ্ডব', 'জতুগৃহ দাহ', 'অন্নপূর্ণা', 'সতী', 'সুজাতা', 'জগাই-মাধাই', এইরূপ বিখ্যাত কতকগুলি ছবিতে স্বীয় প্রতিভার অতুলনীয় প্রকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করেন। 'শিবসতী' আঁকিয়া তিনি ভারতীয় প্রাচ্য কলামণ্ডলীর ১ম প্রদর্শনীতে ৫০০ টাকা পুরস্কার পান (১৯০৮ খ্রী) এবং প্রবীণ শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহের সাহচর্যে পাটনা, রাজগির, বুদ্ধগয়া, বারাণসী, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ পরিভ্রমণে উত্তর ভারতের ধারাবাহী শিল্প ও সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেন। অল্পকাল পরে তিনি অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পুরী হইতে কন্যাকুমারী অবধি দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ তীর্থনগরী (শিল্পনগরীও বটে) দেখিয়া আসেন ; ভগ্নশেষ কণারক মন্দিরের অপূর্ব স্থাপত্য ও মূর্তিকলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় আরও পরে।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে লেডি হেরিংহাম অজন্টা গুহাচিত্রের নকল লইতে আসেন এবং ভগিনী নিবেদিতার একান্ত আগ্রহে ও চেষ্টায় নন্দলাল প্রমুখ কয়েকজন তরুণ শিল্পী তাঁহার সহকারীরূপে তথায় প্রেরিত হন। নন্দলালের প্রতিভাবিকাশে ইহার অনুকূল প্রভাব দূরপ্রসারী। বহু বৎসর পরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতন হইতেই নন্দলাল বাঘ গুহার নষ্টপ্রায় ভিত্তিচিত্রাবলির প্রতিচিত্র প্রস্তুত করিতে গিয়াছিলেন।

নন্দলালের ছাত্র-অবস্থার শেষদিকে অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুল ছাড়িয়া আসেন এবং তাঁহার আহ্বানে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁহারই কাজে নন্দলাল যোগ দেন। এই সময়ে ভগিনী নিবেদিতার রচিত হিন্দু-বৌদ্ধ পুরাকথার বইখানির জন্য ছবি আঁকেন এবং ঠাকুর-শিল্পসংগ্রহের তালিকা-

প্রণয়নেও সাহায্য করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিচিত্রা ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে এবং নন্দলাল, অসিত হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর ও মুকুল দে তথায় শিল্প শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন। জাপানী আর্টিস্ট আরাইসান ভারতে আসিয়া বিচিত্রার অতিথিরূপে বাস করেন এবং নন্দলাল তাঁহার কাছে দূর প্রাচ্যের কালিতুলির নানা আঙ্গিক আয়ত্ত করিয়া লন।

নন্দলাল শান্তিনিকেতনে প্রথম আসেন ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে; ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গুরু অবনীন্দ্রনাথের অনুমোদনক্রমে স্থায়ীভাবে এখানে চলিয়া আসেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ চীন, জাপান, মালয় ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে নন্দলালকে সঙ্গে লইয়া যান। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কবির সঙ্গে সিংহলে যান। গান্ধীজীর আহ্বানে লখ্নৌ, ফৌজপুর ও হরিপুরায় (১৯৩৫-৩৭ খ্রী) কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে তিনি শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থাভার লন; অচিরস্থায়ী কংগ্রেস-নগরীর মঞ্চ ও তোরণ নির্মাণে, অলংকরণে ও অন্য নানাভাবে ব্যাবহারিক শিল্পের নব নব বিস্ময় সৃষ্টি করেন। শেষোক্ত অধিবেশনে ৮৩খানি চিত্রালংকার 'হরিপুরা পট' নামে খ্যাত; লোকচিত্রের ধারাবাহী হইয়াও সেগুলি যেমন প্রাণবন্ত তেমনি নূতন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এককালে তিনি দরিদ্র চাষী-মজুরের জন্য অল্পমূল্যের পট আঁকিয়াছিলেন কালীঘাট-পটুয়ার মত আর রামায়ণকথারও রূপ দেন রঙ্গীন পট-পরম্পরায় (১৯১২-১৩ খ্রী)। নন্দলাল পরিণত বয়সে (১৯৪৩ খ্রী) বরোদারাজের কীর্তিমন্দির চিত্রভূষিত করার দায়িত্ব লন। পরপর কয়েক বৎসরের গ্রীষ্মাবকাশে ইহার প্রশস্ত চারিটি দেয়ালে পুরাণ ইতিহাস কাব্যকাহিনীর বিচিত্র আলেখ্য আঁকিয়া দিয়া আসেন; কৃতী এবং শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রী সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কাজের অনুব্রতীরূপে শিক্ষালাভ করেন। ইতিপূর্বে শ্রীনিকেতনে (১৯৩০ খ্রী) ও শান্তিনিকেতনে (গ্রন্থাগার, ১৯৩২ খ্রী ও চীনাভবন, ১৯৪২ খ্রী) নন্দলাল কতকগুলি অপূর্ব ভিত্তিচিত্র অঙ্কন করেন।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান গ্রন্থ (সচিত্র সংস্করণ) নন্দলাল বসুর চিত্রে ও নির্দেশে অলংকৃত হয়।

প্রকরণ-পদ্ধতি ভাব-ভঙ্গী রূপরসের বৈচিত্র্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় যত, নন্দলালের শিল্পসৃষ্টিতে তাহা হইতে বেশি বই কম হইবে না। হ্যাভেল ভবিষ্যৎবাণী করেন, প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইলে নন্দলালের দ্রঢ়িষ্ঠ বিশাল রূপকল্পনার সম্যক ধারণা হইবে। পূর্বোক্ত ভিত্তিচিত্রালিতে এবং 'উমার ব্যথা' (১৯২১ খ্রী), 'উমার তপস্যা' (১৯২১ খ্রী), 'পোয়ে নৃত্য' (১৯২৪ খ্রী), 'পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান' (কালিতুলি : প্রাক-১৯৩০ খ্রী), 'নটীর পূজা' (জানুয়ারি, ১৯২৭ খ্রী), 'প্রত্যাবর্তন' (ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭ খ্রী), 'বৃহন্নলা' (১৯২৮ খ্রী) প্রভৃতির চিত্ররূপে এ কথা স্বতঃই প্রমাণিত হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন অসংখ্য কাজেও ঐ একই গুণ বা চরিত্র সূক্ষ্মদর্শী রসিকের অগোচর থাকে না। দীর্ঘ শিল্পীজীবনে আঁকা অজস্র স্কেচ ও চিত্রপত্রীগুলি নন্দলালের স্বতন্ত্র এক সৃষ্টি।

উত্তরজীবনে নন্দলাল কালিতুলির কাজে বিশেষ মন দেন, রং দিয়াও বহু ছাপছোপের কাজ করেন। চিত্রের বিষয়বস্তু তাঁহার সন্নিহিত দেশকাল, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃতি হইতেই আহৃত হয়।

অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল পরস্পরের পরিপূরক। অতিশয় সংক্ষেপে বলা যায়, পাশ্চাত্য চিত্ররীতির প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে প্রাচ্য রূপকলার সন্ধানে যাত্রা করেন অবনীন্দ্রনাথ; নন্দলাল যাত্রা করেন ভারতীয় ধ্রুবচিত্র-রীতির তথা মূর্তিকলার সহজ অধিকারের ক্ষেত্র হইতে। কালে চীনা, জাপানী, পাশ্চাত্য, মিশরীয়, প্রাগৈতিহাসিক, নানা জাতির নানা যুগের রীতিপদ্ধতির মর্মে প্রবেশ করেন এবং উপযোগী গুণগুলি আত্মসাৎ করেন। গুরুশিষ্য উভয়েরই প্রতিভাতে প্রাচ্যপাশ্চাত্যের মিলন ঘটিয়াছে ভিন্নভাবে। আপন আপন রূপকৃতিতে দেশ ও কালের খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতা উভয়েই পার হইয়া গিয়াছেন।

উত্তরকালে বহু বিশ্ববিদ্যালয়, বহু শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান নানা উপাধি দিয়া পদক দিয়া নানাভাবে তাঁহাকে সম্মানিত করেন। বিশ্বভারতী তাঁহাকে 'দেশিকোত্তম' রূপে বরণ করেন (১৯৫২ খ্রী) এবং ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দেন (১৯৫৪ খ্রী)। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল শান্তিনিকেতনে স্বগৃহে নন্দলালের মৃত্যু হয়।

দ্র নন্দলাল বসু, শিল্পকথা, কলিকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ; নন্দলাল বসু, রূপাবলী, ১ম-৩য় ভাগ, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ; নন্দলাল বসু, শিল্পচর্চা, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নন্দলাল বসু', বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৪০ বঙ্গাব্দ; কানাই সামন্ত, শ্রীনন্দলাল বসু, কলিকাতা, ১৯৬২; Biswarup Bose, *Nandalal Bose: Paintings*, 1949; Santiniketan Asramic Samgha, *An Album of Nandalal Bose*, Calcutta, 1956; R. S. Das, *Nandalal Bose and Indian Painting*, Calcutta, 1958.

কানাই সামন্ত

নন্দাদেবী কুমায়ুন হিমালয়ে ৩০° ২২′ ৩২″ উত্তর এবং ৭৯° ৫৮′ ২২″ পূর্বে অবস্থিত ভারতবর্ষের একটি সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ৭৮১৭ মিটার (২৫৬৪৫ ফুট) গাড়ওয়াল কুমায়ুনের অধিবাসীদের কাছে এই পর্বতশৃঙ্গটি অত্যন্ত পবিত্র। কথিত আছে, কুমায়ুনরাজের কন্যা নন্দাদেবীর পাণিপ্রার্থী রোহিলা-রাজকুমার প্রত্যাখ্যাত হইয়া অতর্কিতে কুমায়ুন রাজ্য আক্রমণ করেন। কুমায়ুনরাজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে নন্দাদেবী হিমালয়ের দুর্গম পর্বতশীর্ষে আশ্রয়গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম অনুসারেই পর্বতশৃঙ্গের নাম হয় নন্দাদেবী।

ধৌলিগঙ্গা ও গৌরীগঙ্গার মধ্যস্থলের এক গিরিশ্রেণীর উপর নন্দাদেবী অবস্থিত। নন্দাদেবীর পূর্বদিকে নন্দাকোট (৬৮৫৮ মিটার বা ২২৫০০ ফুট) নন্দাদেবীর সুরক্ষিত দুর্গ, পশ্চিমে নন্দাঘুন্টি (৬৩০৯ মিটার বা ২০৭০০ ফুট) নন্দাদেবীর বিশ্রামস্থল, দক্ষিণদিকে ত্রিশূল (৭১২০ মিটার বা ২৩৩৬০ ফুট) নন্দাদেবীর রক্ষাকারী অস্ত্রস্বরূপ—এগুলি প্রচলিত কাহিনী হইলেও নন্দাদেবী শৃঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

নন্দাদেবী ১১৩ কিলোমিটার (৭০ মাইল) পরিধি-বিশিষ্ট বৃত্তাকার গিরিশিরার দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই গিরিশিরা অনেকটা দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকারের মত নন্দাদেবীকে চারিপাশ হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। দুর্গপ্রাকারের ভিতরে প্রবেশ করিবার মত সহজসাধ্য প্রবেশদ্বার নাই। একমাত্র পশ্চিমদিকের দুর্গম ঋষিগঙ্গা গিরিখাত ব্যতীত গিরিশিরার অন্য কোথাও উন্মুক্ত নয়। এই ঋষিগঙ্গা গিরিখাত দিয়া নন্দাদেবীর হিমবাহ হইতে আনুমানিক ৬২২ বর্গ কিলোমিটার (২৪০ বর্গ মাইল)-পরিমিত তুষার ও বরফ নিয়ে ঋষিগঙ্গা নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাহাম প্রথম নন্দাদেবীর দুর্গপ্রাকারে প্রবেশপথের অনুসন্ধান করেন। তিনি ঋষিগঙ্গা গিরিখাত দিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লংগস্টাফ নন্দাদেবীর পাদদেশে প্রবেশের চেষ্টা করেন। তিনি গৌরীগঙ্গা উপত্যকা দিয়া নন্দাদেবী ও নন্দাদেবীর পূর্বশৃঙ্গের (৭৪০৭ মিটার বা ২৪৩০০ ফুট) সংলগ্ন গিরি-শিরায় আরোহণ করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাহাম ব্রাউনের নেতৃত্বে নন্দাদেবী অভিযান পরিচালিত হয় এবং ২৯ জুলাই টিল্‌ম্যান ও ওডেল নন্দাদেবীর শৃঙ্গ জয় করেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতীয় নন্দাদেবী অভিযান পরিচালিত হয় মেজর জয়ালের নেতৃত্বে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় অভিযাত্রী গুরুদয়াল সিংহ নন্দাদেবী অভিযান পরিচালনা করেন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় অভিযাত্রী কর্নেল নরেন্দ্রকুমার নন্দাদেবী অভিযান পরিচালনা করেন ; এই অভিযানে ২০ জুন নওয়াং গোম্বু ও দাওয়া নরবু নন্দাদেবী শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

দ্র Kenneth Mason, *Abode of Snow*, London, 1955 ; Anthony Huxley, ed., *Standard Encyclopaedia of the World's Mountains*, London, 1962.

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

নবকৃষ্ণ, মহারাজা (১৭৩৩-১৭৯৭ খ্রী) কলিকাতাস্থ শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। নবকৃষ্ণ নিজ অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে সামান্য অবস্থা হইতে বিরাট ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হন। নবকৃষ্ণ ইংরেজী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের সংশ্রবে আসিয়া খুবই বুদ্ধিমত্তা ও কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় দেন। কোম্পানির আমলে দেশীয়দের মধ্যে ব্রিটিশকে যাঁহারা নানা ভাবে সাহায্য করেন তাঁহাদের মধ্যে নবকৃষ্ণ অন্যতম। তিনি তৎকালে সমাজপতিরূপে বিভিন্ন সামাজিক কর্ম নিয়ন্ত্রণ করিতেন। তাঁহার সভা-পণ্ডিতরূপে সে যুগের বহু গণ্যমান্য সংস্কৃতবিদ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রধান। অপুত্রক অবস্থায় নবকৃষ্ণ গোপীমোহন দেবকে দত্তক গ্রহণ করেন। তিনি সুবিখ্যাত রাধাকান্ত দেবের পিতা। দত্তক গ্রহণের পর এক পত্নীর গর্ভে নবকৃষ্ণের পুত্রসন্তান জন্মে ; তাঁহার নাম রাজকৃষ্ণ। ইহার পুত্রগণের মধ্যে মহারাজা কালীকৃষ্ণ সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নবকৃষ্ণ সমাজের বিভিন্ন হিতকর্মে ব্রতী ছিলেন।

যোগেশচন্দ্র বাগল

নবগোপাল মিত্র (১৮৪০? -৯৪ খ্রী) মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের ভাবশিষ্য, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহাধ্যায়ী, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পরম অন্তরঙ্গ নবগোপাল মিত্র ছিলেন ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের এক মহান কর্মযোগী। হিন্দু তরুণদের শরীরচর্চা ও অশ্বচালনা শিক্ষণের ব্যবস্থাকল্পে তিনি নিজ গৃহে এক বহু-ব্যয়সাধ্য আয়োজন গড়িয়া তোলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য নবগোপাল মহর্ষির অর্থানুকূল্যে 'ন্যাশন্যাল পেপার' নামে জাতীয়তাপ্রসারক একটি ইংরেজী পত্রিকারও প্রচলন করেন (১৮৬৫ খ্রী)। 'হিন্দু, চৈত্র অথবা স্বদেশী -মেলা'র পত্তন (১২ এপ্রিল, ১৮৬৭ খ্রী) তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুর জাতীয় ভাবোদ্দীপক পরিকল্পনা' নবগোপালকে এপথে প্রথম অনুপ্রেরণা দেয় এবং মুখ্যতঃ গণেন্দ্রনাথ (সম্পাদক), দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত এই মহৎ সংগঠনে সহ-সম্পাদক নবগোপাল 'একাই ছিলেন একশ।' শরীরচর্চা, স্বদেশী কৃষি ও পণ্যের উন্নতি, সাহিত্য ও শিল্পকলার উদ্বোধন—শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতির সকল দিকে জাতিকে আত্মমর্যাদাশীল ও স্বয়ম্ভর করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার স্বপ্ন।

'ন্যাশন্যাল সোসাইটি' নবগোপালের আর এক স্মরণীয় কীর্তি। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজ ও অর্থনীতির বিচিত্র বিষয়ে মৌলিক চিন্তাপ্রসূ আলোচনায় এ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ইহা ছাড়া তিনি বাঙালীর জন্য সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা, শাসনকার্যে ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার, নির্বাচনপ্রথার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন পরিচালনা, দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতারক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছেন।

দ্র হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস ও বাংলা, কলিকাতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ ; যোগেশচন্দ্র বাগল, জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ ; শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ ; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস, কলিকাতা, ১৯১৫ খ্রী ; B. C. Pal, *Memories of My Life and Times*, vol. I, Calcutta, 1932 ; Nirmal Sinha, ed., *Freedom Movement in Bengal (1818-1904)*, Calcutta, 1968.

নির্মল সিংহ

নবদ্বীপ ২৩°২৪' উত্তর ও ৮৮°২৩' পূর্ব। পশ্চিম বঙ্গের নদিয়া জেলার একটি থানা এবং একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর। ইহা জলাঙ্গী ও ভাগীরথী সঙ্গমে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত। পূর্বে ইহা ভাগীরথীর পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ছিল। শহরটি কৃষ্ণনগরের সহিত খেয়া পারাপারে যুক্ত। হাওড়া হইতে রেলপথে নবদ্বীপ ১০৬ কিলোমিটার (৬৬ মাইল) দূরে অবস্থিত। ইহার আয়তন প্রায় ৯ বর্গ কিলোমিটার (সাড়ে ৩ বর্গ মাইল)। জনসংখ্যা ৭২৮৬১ (১৯৬১ খ্রী); তন্মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭২২৬ ও ৩৫৬৩৫।

নবদ্বীপের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি মত আছে। প্রথম মতানুসারে ইহা একটি নূতন দ্বীপের উপর অবস্থিত বলিয়া ইহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় মতানুসারে ইহা জনৈক সন্ন্যাসীর আবাসস্থল ছিল ; তিনি রাত্রিকালে নয়টি দীপ জ্বালাইয়া যোগসাধন করিতেন। নৌকার যাত্রীগণ আলো দেখিয়া চরটিকে নবদীপ বলিত। তৃতীয়তঃ অনেকে মনে করেন নদিয়া জেলা যে নয়টি দ্বীপের সমষ্টি হইতে সৃষ্ট নবদ্বীপ উহাদেরই একটির উপর অবস্থিত।

আদি নবদ্বীপের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন ভাগীরথীর গতি পরিবর্তনের জন্য আদি নবদ্বীপ লুপ্ত হয় এবং পশ্চিম তীরে বর্তমান নবদ্বীপের প্রতিষ্ঠা হয়, অনেকের মতে ভাগীরথীর পূর্ব তীরবর্তী মায়াপুরে আদি নবদ্বীপ অবস্থিত ছিল।

চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব হইতেই নবদ্বীপ এক বিশিষ্ট নগর বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। এই নগরেই সেনরাজাদের রাজধানী ছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পৌরশাসনের অধীনে আসে। শহরটির বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নহে; ইহা নদী-সমতলের নিম্নে অবস্থিত হওয়ায় নদীতে জলস্ফীতি হইলেই এখানে খুব বন্যা হয়।

পিতল ও কাঁসার বাসন প্রস্তুতই এখানকার প্রধান শিল্প। অতীতে শাঁখা তৈয়ারির জন্য খ্যাতি ছিল। এখানে তাঁতশিল্প ও মৃৎশিল্পের প্রসার আছে। নবদ্বীপে একটি সমবায় ঘড়ি নির্মাণ সমিতি আছে।

নবদ্বীপ অতি প্রাচীন কাল হইতে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। হিন্দু রাজগণের আনুকূল্যে এবং ভাগীরথীতীরে অবস্থানহেতু স্থানটি শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া ওঠে। দূর দেশান্তর হইতে এখানে বহু ছাত্র ও শিক্ষক সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হলায়ুধ, পশুপতি, শূলপানি উদয়নাচার্য, আন্বিহোধ যোগী ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। লক্ষ্মণসেনের আমলেই ইঁহাদের আগমন ঘটে। স্থানীয় পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বাগ্রে বাসুদেব সার্বভৌমের নাম করা যাইতে পারে। অন্যান্য পণ্ডিতগণের মধ্যে চিন্তামণি-দধিতির রচয়িতা ও গৌতমসূত্রের টীকাকার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মৃতিশাস্ত্রে পরম ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন রঘুনন্দন স্মার্ত ভট্টাচার্য, তন্ত্রশাস্ত্রে অবিসংবাদী খ্যাতিসম্পন্ন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতির নাম নবদ্বীপের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নবদ্বীপে বহুকাল হইতেই জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা হইয়া আসিতেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে নবদ্বীপের প্রখ্যাত পণ্ডিতগণের মধ্যে হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব, রামচন্দ্র বিদ্যানিধি, বিশ্বেশ্বর বাচস্পতি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

নানা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণের আবাসভূমির জন্য

প্রসিদ্ধ হইলেও নবদ্বীপের প্রধান গৌরব এই যে ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উদ্গাতা চৈতন্যদেবের জন্মভূমি। তাঁহার প্রেমধর্মের প্রভাবে নবদ্বীপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করে ও বৃন্দাবনের ন্যায় মহাতীর্থ বলিয়া গণ্য হয়। এই সময় হইতেই নবদ্বীপে বৈষ্ণব-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখনও তাহা অব্যাহত আছে।

সংস্কৃত শিক্ষার টোলগুলিই নবদ্বীপের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ কাওয়েল (Cowell) সাহেবের বিবরণ হইতে নদিয়ার টোল-ব্যবস্থা ও খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের বিশদ বিবরণ জানিতে পারা যায়। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে নবদ্বীপের প্রাচীন ধারার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে নাই। এখানে কীর্তন ও কথকতা শিক্ষাকেন্দ্র ও কুটিরশিল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী নবদ্বীপে শিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথাক্রমে ২৩৭০৪ ও ১৪২১৩ জন।

নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ, নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিদগ্ধ-জননী বা পোড়া-মা-তলা, সিদ্ধেশ্বরী কালী, সোনার গৌরাঙ্গ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য।

নবদ্বীপের উৎসবের মধ্যে বৈশাখে চন্দনযাত্রা, শ্রাবণে ঝুলন, ফাল্গুনে গৌরপূর্ণিমা বা দোলযাত্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাঘী শুক্লা একাদশী হইতে ১২ দিন ধরিয়া ধুলোটমেলায় বাংলার প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়াগণ সদলবলে মিলিত হন। কার্তিক পূর্ণিমাতে বৃহৎ কালীমূর্তি গড়িয়া পূজা হয় ও ২ দিনব্যাপী মেলা বসে।

দ্র J. H. E. Garrett, *Bengal District Gazetteers : Nadia*, Calcutta, 1910 ; A Mitra, *Census 1951 : West Bengal : District Handbooks : Nadia*, Calcutta, 1953.

মুক্তি দাশগুপ্ত

নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে প্রথম ৫০ বৎসরের ভিতর চারিটি দল হয় : ১. কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বা আদি ব্রাহ্মসমাজ ২. ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৩. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৪. নিরপেক্ষ ব্রাহ্মসমাজ।

কেশবচন্দ্র সেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ব্রাহ্মধর্মকে 'নববিধান' বলিয়া ঘোষণা করেন। বিভিন্ন ধর্ম জগতে উদ্ভূত হওয়া অবধি পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল। কেশবচন্দ্র বিধানের ভূমিতে তাহাদের বিরুদ্ধাংশ দূর করিয়া ঘনিষ্ঠতা দ্বারা তাহাদিগকে মিলিত করিলেন। ইহা ইক্লেক্টিসিজ্‌ম (eclecticism) নহে। নববিধান সকল বিধানকে রূপান্তরিত করিয়া, সকলের জীবনীরস আপনার ভিতর সংগ্রহ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নিজ নিজ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের ভার বিধাতার উপর সমর্পণ করিয়া, নূতন নূতন 'রিয়ালাইজেশন' (realization)-লব্ধ যে সুন্দর জীবন লাভ হয় তাহাই নববিধান। নববিধান একটি আদর্শ, একটি জীবন ও একটি ধর্মমণ্ডলী।

এই অভিনব স্বপ্রতিষ্ঠ আদর্শ দুই ধাপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ১৮৫৭-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' ও 'সংগতসভা'-র শিক্ষার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যুবকেরা প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি ও শাস্ত্রের মোহ ছিন্ন করিয়া বিবেকের চালনায় একেশ্বরবাদ সাধন করিতে থাকেন। সামাজিক জীবনে 'নরনারী সাধারণের সমান অধিকার ; যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার' আদর্শ তাঁহারা অনুসরণ করিতে থাকেন। তাঁহারা জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, পুরুষ ও নারীর অধিকারভেদ ভাঙিলেন, স্বদেশের এবং বিদেশের শিক্ষা, শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের সকল মনুষ্যের সাধারণ সম্পদরূপে জীবনে স্থান দিলেন। ভক্তির সঞ্চারে ব্রহ্মোপাসনা প্রাণপ্রদ হইল। ইহাই নববিধানের পথে প্রথম ধাপ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ রক্ষণশীল নেতারা এসকল পরিবর্তনসাধনে অস্বীকৃত হন। কেশবচন্দ্রের দ্বারা প্রবর্তিত আদর্শের উপর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হইল (১১ নবেম্বর, ১৮৬৬ খ্রী)। দেবেন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' -এর সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' -এর নাম দিলেন 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'।

১৮৬৬-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' -এ ব্রহ্মোপসনা, শ্রমজীবিশিক্ষা, নারীশিক্ষা, মাদকতানিবারণ, পত্রিকা-প্রচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে বর্তমান ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের ও অ্যালবার্টহলের প্রতিষ্ঠা এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার প্রকাশ উল্লেখযোগ্য। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের সমবেত উপাসনা, ধ্যানধারণা, প্রার্থনা ও কঠোর বৈরাগ্যসাধন ক্রমে যোগভক্তিকর্মজ্ঞানের সমন্বয় সাধনায় উপনীত হয়। তাঁহাদের নূতন উপলব্ধি হইল 'সকল ধর্ম সত্য'।

নববিধানের নূতন আদর্শ লইয়া 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' -এ সংঘর্ষ দেখা দিয়াছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহারই ফলস্বরূপ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হয়। নববিধান-

বিশ্বাসীগণ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' -এ যুক্ত থাকেন; সেইজন্য ইহা 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' নামে খ্যাত। নববিধান বিশ্বাসীগণকে 'নববিধান মণ্ডলী', 'নববিধান সমাজ', 'চার্চ অফ দি নিউ ডিস্‌পেন্‌সেশন' প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়।

কেশবচন্দ্র ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি সমগ্র পৃথিবীর ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা ও রাষ্ট্রপতিগণকে ভ্রাতৃত্বে মিলিত হইবার জন্য একটি লিপি প্রেরণ করেন। তাহাই নববিধানের স্বরূপ প্রকাশ করে। নববিধান ঘোষণার ১৩ বৎসরের ভিতর শিকাগো শহরে ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নববিধান-ব্যাখ্যাতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সেই সভায় উপস্থিত হইয়া জগৎবাসীকে নববিধানের বার্তা স্মরণ করাইয়া দেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে নববিধান সমাজ কর্তৃক ইংরেজী, বাংলা ও প্রাদেশিক ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলায় 'কোরান শরীফ', 'বেদান্ত সমন্বয়ভাষ্য', 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সমন্বয়ভাষ্য', 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম', 'শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব', 'নানক প্রকাশ', 'ঈশাচরিতামৃত', 'কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা ও উপদেশ', 'জীবনবেদ' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ। সংবাদপত্রের ভিতর 'লিবার্যাল অ্যাণ্ড দি নিউ ডিস্‌পেন্‌সেশন', 'সুলভ সমাচার', 'পরিচারিকা', 'বালকবন্ধু', 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'ইণ্ডিয়ান মিরর' উল্লেখযোগ্য পত্রিকার তালিকাভুক্ত।

দ্র কেশবচন্দ্র সেন, মাঘোৎসব, কলিকাতা, ১৮৫৬ শকাব্দ; সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমন্বয়মার্গ কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ; গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য্য কেশবচন্দ্র, ৪খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩৮-৪২; Keshubchunder Sen, *The New Samhita*, Calcutta, 1884; P. K. Sen, *Biography of a New Faith*, vols. I & II, Calcutta, 1950-54.

সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

নবান্ন নূতন ধানের চাল প্রথম ব্যবহার উপলক্ষে অনুষ্ঠান। সাধারণতঃ আমন ধানের চাল দিয়া অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসে এই অনুষ্ঠান করা হয়। পূর্বে ঘরে ঘরে এই অনুষ্ঠান ও আনুষঙ্গিক উৎসবের প্রচলন ছিল। অনুষ্ঠানের মুখ্য অঙ্গ ছিল নূতন চালে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করা (হৈমন্তিক শুভ নবান্নাগমন নিমিত্তক পার্বণবিধিক শ্রাদ্ধ)। দেবতা, অগ্নি, কাক, ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়স্বজনকে দিয়া গৃহকর্তা ও পরিবারবর্গ আনুষ্ঠানিকভাবে নূতন গুড়সহ নূতন অন্ন গ্রহণ করিতেন। পৌষ-সংক্রান্তির দিনও স্বতন্ত্রভাবে গৃহদেবতাকে নবান্ন নিবেদন করিবার প্রথা ছিল। অন্য অনেক অনুষ্ঠানের মত এখন এই সমস্ত অনুষ্ঠান লুপ্তপ্রায়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

নবী নবী শব্দটি আরবী, হিব্রু হইতে উদ্ভূত; ইহার অর্থ পয়গম্বর বা আল্লার প্রেরিত দূত। উক্ত আছে যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। প্রথম মানব হজরত আদম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম নবী এবং হজরত মহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সাল্লাম শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তৎপরে আর কোনও নবী আসিবেন না। কয়েকজন নবী অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, যেমন হজরত আদম, ইব্রাহিম, ইসমাইল, সোলায়মান, দাউদ, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, ইসা (আঃ) ও হজরত মহম্মদ (সঃ)। নবীগণ প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের কয়েকজন ঐশ্বরিক গ্রন্থ লাভ করিয়াছিলেন। ১০৪ খানি গ্রন্থ তাঁহাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে তওরাত, যবুর, ইনজিল ও কোরান সমধিক প্রসিদ্ধ। সর্বশেষে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপে আল্লার শেষ বাণী কোরান শরীফে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নবীদের আবির্ভাব ও তিরোধান দিবস পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়। নবীগণ তাঁহাদের উপরে আদিষ্ট সত্যধর্মের প্রচারে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করিয়া জীবন বিপন্ন করিয়া আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। অনেকে সশস্ত্র সংঘর্ষে আহত কিংবা নিহত হইয়াছিলেন। তবুও তাঁহারা সত্যধর্ম প্রচারে নিরস্ত হন নাই।

আব্দুস সোবহান

নবীনচন্দ্র দাস[১] (১৮৫৩ খ্রী-?) চট্টগ্রামের কবি, অনুবাদক ও পত্রিকা-সম্পাদক। তিনি পার্সিভ্যাল-এর সহাধ্যায়ী এবং প্রখ্যাত তিব্বতী ভাষাবিদ শরচ্চন্দ্র দাসের ভ্রাতা। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে আইনের অধ্যাপক ও পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সংস্কৃত কাব্যের বাংলা কাব্যানুবাদে কৃতিত্বের জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে 'কবিগুণাকর' উপাধি দেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'রঘুবংশ' (১৮৯১ খ্রী), 'শোকগীতি' (১৯০০ খ্রী), 'শিশুপালবধ' (আংশিক, ১৯০৩ খ্রী), 'কিরাতার্জুন' (১৯০৬ খ্রী), ক্ষেমেন্দ্রের 'চারুচর্যাশতক' (১৯১৩ খ্রী) ইত্যাদি।

কল্যাণী দত্ত

নবীনচন্দ্র দাস[২] কবি। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। তাঁহার রচিত গ্রন্থ: 'পিশাচোদ্ধার' (১২৭০

বঙ্গাব্দ), 'কালিদাসের বিদ্যালাভ' (১৮৭৬ খ্রী), 'আযোগ্যবিবাহ' (১৮৬৮ খ্রী) ও 'ব্রহ্মশক্তি-বিবরণ' (১২৯৬ বঙ্গাব্দ)।

কল্যাণী দত্ত

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯২২ খ্রী) জন্ম বর্ধমান জেলার বুড়ার গ্রামে। তাঁহার সাত বৎসর বয়সে পিতা ঠাকুরদাস স্বর্গত হন। বাল্যে তিনি কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, দাশরথি রায়ের কাব্য পড়েন ও দাশু রায়ের অনুকরণে পাঁচালী লেখেন। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত হয় মুর্শিদাবাদের নসিপুরে 'বিনোদিনী' মাসিক পত্রিকার প্রকাশে (১৮৭৫ খ্রী)। 'ভুবনমোহিনী দেবী' ছদ্মনামে নিজের এই পত্রিকা ছাড়াও 'সাধারণী' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তিনি কবিতা লেখেন। নারীর ছদ্মনাম গ্রহণের কারণ প্রকৃত নামে প্রেরিত কবিতা মুদ্রিত না হওয়া। তাঁহার 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' ১ম খণ্ড ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ও ২য় খণ্ড ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলে পাঠকসমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনায় 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' আলোচিত হয়। তাঁহার অন্যান্য রচনা 'আর্যসঙ্গীত' (১ম ও ২য় খণ্ড), 'দ্রৌপদীনিগ্রহ' ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ও উত্তর ভাগ 'জাতীয় নিগ্রহ' ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। তাঁহার 'সিন্ধুদূত' কাব্য (১৮৮৩ খ্রী) শেষ মুদ্রিত রচনা। 'শিবাজী-বিজয়' কাব্য পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৪৪, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯ খ্রী) বিখ্যাত কবি। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে জন্ম। পিতা গোপীমোহন সেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'জেনারাল অ্যাসেম্‌ব্লিজ় ইন্‌স্টিটিউশন' হইতে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পান এবং সেই সূত্রে বহুস্থানে বাস করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি চট্টগ্রামে নবীনচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

নবীনচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ হয় শৈশবে— 'আমার বয়স যখন ১০।১১ বৎসর, তখন হইতেই, গুপ্তরাজ (ঈশ্বর গুপ্ত) অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতাম'। ছাত্রাবস্থায় প্যারীচরণ সরকার -সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট'-এ নবীনচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হয়। দেশপ্রেম ও আত্মচিন্তা সম্বন্ধে লিখিত খণ্ডকবিতার সংকলন 'অবকাশরঞ্জিনী' (১ম ভাগ, ১৮৭১ খ্রী) নবীনচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ। 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫ খ্রী) নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক গাথাকাব্যে তাঁহার কবিখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

'রৈবতক' (১৮৮৭ খ্রী), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩ খ্রী), 'প্রভাস' (১৮৯৬ খ্রী)—এই কাব্যত্রয়ীতে নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। কাব্য তিনখানির নায়ক কৃষ্ণ। রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস যথাক্রমে কৃষ্ণের আদি, মধ্য ও অন্তলীলার কাহিনী; এই কাহিনীতে মহাভারত-বর্ণিত ঘটনার নবীনচন্দ্র-কৃত মৌলিক ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। নবীনচন্দ্রের কবিধর্ম গীতিকাব্য-জাতীয়; অথচ এই কাব্য তিনটি মহাকাব্যোচিত আখ্যায়িকাকাব্যের রূপে বিন্যস্ত। কাহিনী পরিকল্পনার বিশালতা এবং বহুমুখী বৈচিত্র্যের জন্য এই গ্রন্থত্রয়ীর কাব্যবন্ধ শিথিল ও দুর্বল।

নবীনচন্দ্রের অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭ খ্রী), 'রঙ্গমতী' (১৮৮০ খ্রী), 'খৃষ্ট' (১৮৯১ খ্রী), 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২ খ্রী), 'ভানুমতী' (১৯০০ খ্রী), 'অমিতাভ' (১৮৯৫ খ্রী) এবং 'অমৃতাভ' (অসম্পূর্ণ, ১৯০৯ খ্রী)। নবীনচন্দ্র মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-র (১৮৮৯ খ্রী ?) পদ্যানুবাদও করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র অপরূপ বর্ণনাশক্তির অধিকারী। অসংযত উদ্দাম ভাবাবেগ তাঁহার রচনার প্রধান লক্ষণ। তাঁহার কাব্য তাঁহার ভাবোন্মত্ত মনটিকে পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করিয়াছে।

তাঁহার আত্মজীবনী ৫ ভাগে সম্পূর্ণ 'আমার জীবন' গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। বইখানি উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৪২, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

নব্যন্যায় গৌতম ও কণাদের ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনকে অবলম্বন করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহামতি গঙ্গেশ নব্যন্যায় শাস্ত্রের প্রবর্তন করেন। ন্যায়শাস্ত্রে আলোচিত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের ফল মোক্ষ বা অপবর্গ। বাৎস্যায়ন, উদ্যোতকর, বাচস্পতিমিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট— ইঁহারা ন্যায়শাস্ত্রের প্রাচীন প্রবক্তা। প্রশস্তপাদ, ব্যোমশিবাচার্য, শ্রীধর, উদয়ন প্রমুখ বৈশেষিক আচার্যগণ দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থ স্বীকার করিয়া আত্মতত্ত্ব ও জড়তত্ত্বের জ্ঞানলাভের পর নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি মানিয়া লইয়াছেন।

গঙ্গেশ ষোড়শ পদার্থের মধ্যে কেবল প্রমাণকে মানিয়াছেন, কারণ প্রমাণকে অবলম্বন করিয়াই সকল পদার্থ ব্যবস্থিত হয়; অতএব বস্তুমাত্রেরই ব্যবস্থাপক যে প্রমাণ সেই প্রমাণচতুষ্টয়—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ লইয়াই তাঁহার চারিখণ্ড 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থ।

প্রাচীন ন্যায়ে আধ্যাত্মিক ভাবের কিঞ্চিৎ প্রাধান্য আছে; চিন্তামণিতে অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা নিতান্তই অল্প। তাহার আলোচ্য প্রমাণতত্ত্ব ও পদার্থতত্ত্ব, সেখানে তর্কের প্রাধান্য। এই শাস্ত্রে বাক্য লইয়া সূক্ষ্ম বিচার, লক্ষণ প্রভৃতির খণ্ডন, বিশেষণাদির প্রক্ষেপ, শঙ্কা-সমূহের উত্থাপন ও নিরাস করিতে যাইয়া অবচ্ছেদ্য-অবচ্ছেদক সম্বন্ধ, প্রতিযোগী-অনুযোগী সম্বন্ধ, কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি নানা নূতন ব্যাখ্যা ও বিচারের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ সম্বন্ধতত্ত্ব ন্যায়শাস্ত্রের জটিলতার একটি প্রধান হেতু।

গঙ্গেশের পর একে একে বর্ধমান, যজ্ঞপতি উপাধ্যায়, প্রগলভাচার্য, শ্রীনাথ, পক্ষধর মিশ্র, রুচিদত্ত, বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, গদাধর ভট্টাচার্য, জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি আচার্যগণ আবির্ভূত হইয়া নব্যন্যায় প্রস্থান সংস্থাপিত করিয়াছেন।

এই অত্যন্ত দুরূহ তর্কশাস্ত্রের পারিপাট্য ও সূক্ষ্মতা এবং বিচারশক্তির যোগ্যতা এতই অসাধারণ যে ইহার সহিত সিদ্ধান্তের যোগ না থাকিলেও অপরাপর দর্শন, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রের টীকাকারগণ সকলেই ইহার বিচারপন্থা ও স্বমতস্থাপনের পদ্ধতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং 'প্রদীপঃ সর্বশাস্ত্রাণাম্ উপায়ঃ সর্বকর্মণাম্' বচনটি এইভাবে সার্থক হইয়াছে। ন্যায়-দর্শনের আদিতে সূত্রযুগ, পরে ভাষ্যযুগ, তৎপরে বৌদ্ধজৈনাদি মতের সহিত সংঘর্ষের যুগ। চতুর্থ ও চরম যুগটি ন্যায়-দর্শনকে বস্তুতঃ তর্কবিদ্যায় রূপান্তরিত করিয়াছে। বর্তমানে গঙ্গেশের পূর্ববর্তী শাস্ত্র প্রাচীন ন্যায় নামে প্রচলিত।

'তত্ত্বচিন্তামণি'র চারিখণ্ডের মধ্যে অনুমানখণ্ডই প্রধান। অনুমানখণ্ডের প্রথম প্রকরণ অনুমিতি, দ্বিতীয় প্রকরণ ব্যাপ্তিবাদ। ব্যাপ্তিবাদের প্রথম পরিচ্ছেদ (২।২।১) ব্যাপ্তিপঞ্চক সমগ্র গ্রন্থমধ্যে কয়েকটি পঙ্ক্তিমাত্র হইলেও উহাই চিন্তামণির সার অংশ। গৌতম-কণাদের সূত্রে বা বাৎস্যায়ন ও প্রশস্তপাদের ভাষ্যে ব্যাপ্তির লক্ষণ নাই, বৌদ্ধগণ উহাকে 'অবিনাভাব' বলিয়াছেন। বর্তমানে ব্যাপ্তিপঞ্চক বলিতে মূল গ্রন্থ না বুঝাইয়া রঘুনাথের 'দীধিতি' এবং মথুরানাথের 'রহস্য' টীকাদ্বয়কেই বুঝায়। 'দীধিতি' ও 'রহস্য'-এর পর 'গাদাধরী' এবং 'জাগদীশী' লইয়াই বঙ্গদেশে নব্যন্যায়ের গৌরব। ইহাদের শত শত টীকা ও পাতড়া পাওয়া যায়।

গঙ্গেশের জন্মস্থান মিথিলা। একমাত্র মিথিলা দেশেই তৎকালে ন্যায় চর্চা হইত। প্রবাদ আছে, বাসুদেব সার্বভৌম সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। কানা রঘু অর্থাৎ রঘুনাথ শিরোমণি বাসুদেবের ছাত্র ছিলেন এবং বিচারে পক্ষধর মিশ্রকে পরাস্ত করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। রঘুনাথের পর হইতে নবদ্বীপ নব্যন্যায় চর্চার কেন্দ্ররূপে সর্বভারতীয় প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দ্র রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, নব্যন্যায় ব্যাপ্তিপঞ্চক, কলিকাতা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

কল্যাণী দত্ত

নভঃস্থানাঙ্ক নভঃস্থ জ্যোতিষ্কসকল একটি বৃহৎ গোলকের উপর রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই গোলককে খগোল বলে। দ্রষ্টা এই গোলকের কেন্দ্রে এবং ইহার ব্যাসার্ধ অসীম এরূপ ধরা হয়। এক সময়ে খগোলের অর্ধাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রষ্টার উল্লম্ব রেখা খগোলকে ঊর্ধ্বদিকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাহাকে খ-মধ্য বা সুবিন্দু এবং অধোদিকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাহাকে কুবিন্দু বলা হয়। খগোলের কেন্দ্রের ভিতর দিয়া উল্লম্বের লম্বভাবে একটি সমতল কল্পনা করিলে ইহা খগোলকে যে গুরুবৃত্তে ছেদ করে তাহাকে দিগন্ত বলে।

পৃথিবীর অক্ষরেখাকে বর্ধিত করিয়া দিলে উহা খগোলকে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করে; উত্তরদিকের বিন্দুটি ধ্রুব-বিন্দু বা সুমেরু, দক্ষিণদিকে কুমেরু। ধ্রুব-বিন্দুর উন্নতি দ্রষ্টার অক্ষাংশের সমান। যে কোনও তারা ধ্রুব-বিন্দু হইতে সর্বদা সমান দূরে থাকিয়া এক নাক্ষত্র দিনে খগোলের উপর পূর্ব হইতে পশ্চিমে বৃত্তপথে ঘুরিয়া আসে। খগোল যেন ধ্রুবাক্ষের উপর এক নাক্ষত্র দিনে একবার আবর্তন করে।

খগোলের কেন্দ্রের ভিতর দিয়া ধ্রুবাক্ষের লম্বভাবে একটি সমতল কল্পনা করিলে উহা খগোলকে যে গুরুবৃত্তে ছেদ করে তাহাকে খ-বিষুববৃত্ত বলে।

তারাদের সাপেক্ষে সূর্য খগোলের উপর এক গুরুবৃত্ত পথে ভ্রমণ করিয়া বৎসরান্তে যাত্রা স্থানে ফিরিয়া আসে; সূর্যের এই ভ্রমণপথকে ক্রান্তিবৃত্ত বলে।

খ-বিষুববৃত্ত এবং ক্রান্তিবৃত্তের ছেদবিন্দুদ্বয়ের একটির নাম বাসন্ত-বিষুববিন্দু, অপরটি শারদ-বিষুববিন্দু। সূর্য

দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাইবার সময় খ-বিষুববৃত্তকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাহা বাসন্ত-বিষুববিন্দু।

খ-গোলকের উপর কোনও জ্যোতিষ্ক বা অন্য বিন্দুর অবস্থান জানিবার জন্য নভঃস্থানাঙ্ক ব্যবহৃত হয়। নভঃ-স্থানাঙ্ক প্রয়োজনভেদে তিন প্রকার : ১. দিগংশ ও উন্নতি : নভঃস্থ কোনও বিন্দুর ভিতর দিয়া দিগন্তের উপর লম্ববৃত্ত অঙ্কন করিলে উত্তর বিন্দু হইতে পূর্ব বা পশ্চিমদিকে লম্ববৃত্ত পর্যন্ত দিগন্তের অংশকে বিন্দুটির দিগংশ বলে এবং দিগন্ত হইতে বিন্দুটির দূরত্বকে উহার উন্নতি বলে ২. বিষুবাংশ ও বিষুবলম্ব : কোনও বিন্দুর ভিতর দিয়া বিষুববৃত্তের উপর লম্ব গুরুবৃত্তাংশ অঙ্কন করিলে বাসন্ত-বিষুববিন্দু হইতে এই বৃত্ত পর্যন্ত বিষুবরেখার অংশকে ঐ বিন্দুর বিষুবাংশ বলে এবং বিষুবরেখা হইতে বিন্দুব দূরত্বকে উহার বিষুবলম্ব বলে ৩. ক্রান্ত্যংশ ও ক্রান্তিলম্ব বা বিক্ষেপ : কোনও বিন্দুর ভিতর দিয়া ক্রান্তিবৃত্তের উপর লম্ব গুরু-বৃত্তাংশ অঙ্কন করিলে বাসন্ত-বিষুববিন্দু হইতে এই বৃত্ত পর্যন্ত ক্রান্তিবৃত্তের অংশকে ঐ বিন্দুর ক্রান্ত্যংশ বলে এবং ক্রান্তিবৃত্ত হইতে বিন্দুর দূরত্বকে উহার ক্রান্তিলম্ব বা বিক্ষেপ বলে।

কামিনীকুমার দে

নয়পাল পালবংশের ১০ম নরপতি। পিতা প্রথম মহীপালের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন ও অন্ততঃ ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন (১০৩৮-৫৪ খ্রী)। তাঁহার রাজত্বকালে কলচুরিবংশীয় চেদিরাজ কর্ণ পাল-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রথমে জয়লাভ করেন, কিন্তু পরে পরাজিত হন। তিব্বতীয় গ্রন্থ অনুসারে বৌদ্ধাচার্য অতীশ দীপংকর নয়পালের গুরু ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় উভয় রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। তাঁহার রাজত্বের ১৫শ বৎসরে গয়ায় উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, বিশ্বরূপ নামে এক ব্যক্তি সুপ্রসিদ্ধ গদাধর মন্দির এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে গয়ায় খুব বেদের চর্চা এবং বৈদিক যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত। নয়পালের অনুরোধে অতীশ দীপংকর বিক্রমশীল মহাবিহারের প্রধানাচার্য হন। প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ চক্রপাণি দত্তের পিতা নয়পালের কর্মচারি ছিলেন।

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

নরক পাপভোগের স্থান। শাস্ত্রমতে অধর্মই নরকের হেতু। জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহ মৃত্যুর পর বিনষ্ট হইলে তাহার আকাশস্থ বায়ুভূত সূক্ষ্ম শরীর পাপভোগস্থানে বা নরকে যাইয়া কৃতকর্মের অনুরূপ যন্ত্রণাভোগ করে। জীবিতকালে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা এই ভোগের কথঞ্চিৎ বিনাশ হয়।

দক্ষিণদিকে ভূগর্ভের নিম্নে পিতৃগণের সহিত সূর্যপুত্র ধর্মরাজ যম বাস করেন। ইনি পাপপুণ্যের বিচারকারী, দণ্ডধর এবং মহিষবাহন। ‘পদ্মপুরাণ’-এর ক্রিয়াযোগসার-খণ্ডে চিত্রগুপ্তকে যমসভার লেখক বলা হইয়াছে। নরকের নদীর নাম বৈতরণী এবং অধিবাসীগণের নাম প্রেত।

বৈদিক সাহিত্যে যম, যমলোক, পিতৃযান এবং প্রেতের কথা বহুবার থাকিলেও নরকের বর্ণনা নাই। রামায়ণে যমলোকের উল্লেখ আছে। মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্বে যুধিষ্ঠির কর্তৃক দৃষ্ট নরক বালুকা, অস্থি ও কণ্টক -সংকুল, দুর্গন্ধযুক্ত ও যাতনাময়, প্রদীপ্ত অগ্নি ও জ্বলন্ত তৈল-কটাহে পূর্ণ এবং অসিপত্র ও শাল্মলীর বনে আকীর্ণ।

বিষ্ণুপুরাণের ২য় অংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে নরকের বিস্তৃত বর্ণনা সর্বপ্রথম দেখা যায়। পরবর্তীকালে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতায় (৫।২৬) তামিশ্র, রৌরবাদি ২১টি এবং ক্ষারকর্দম প্রভৃতি আরও ৭টি নরকের বিবরণ দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে (২৭ অ.) বিভিন্ন প্রকার পাপের জন্য নির্দিষ্ট বহ্নিকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড প্রভৃতি ৮৬টি ভয়াবহ কুণ্ডের বর্ণনা আছে। অন্যান্য পুরাণেও নরকের বিবরণ অল্প-বিস্তর দেখা যায়।

স্মৃতিশাস্ত্রে অতিপাতক মহাপাতকাদি ৪ প্রকার পাতক এবং ৫ প্রকার কুকর্মের যোগে ৯ প্রকার পাপ এবং তাহাদের প্রায়শ্চিত্তবিধান লইয়া নানা নিবন্ধ রচিত হইলেও নরকের বর্ণনা বিশেষ নাই। ঈশোপনিষদের ‘অসূর্যলোক’ উত্তররামচরিতে জনকের উক্তিতে প্রায় নরকের কল্পনায় পরিণত হইয়াছে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে ও সাহিত্যে নরকের বহু উল্লেখ আছে। সঞ্জীব, কালসূত্র প্রভৃতি ৭টি নরককে জৈনেরাও স্বীকার করিয়াছেন।

প্রাচীন খ্রীষ্টীয় মতে পাপমোচন এবং যন্ত্রণাভোগের স্থান হইল ‘হেল’ এবং ‘পারগেটরি’; মৃত আত্মা শেষ বিচারের প্রতীক্ষায় সেখানে থাকিয়া অগ্নিদাহ দংশন ও পীড়নাদি ভোগ করে। ভাতিকান নগরীতে সিস্‌টাইন চ্যাপেলের গাত্রে অঙ্কিত মাইকেল এঞ্জেলোর শেষ বিচারের দিনের (দি লাস্ট জাজ্‌মেণ্ট) চিত্র জগদ্‌বিখ্যাত। উহাতে পাপীদের যন্ত্রণা চিত্রিত হইয়াছে।

হোমারের ‘অডিসি’ গ্রন্থের ১০ম সর্গে ওডিসিয়স পরিদৃষ্ট ‘হাডেস’ বা নরকের বর্ণনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কবি দান্তের ‘ইন্‌ফার্নো’ এবং মিল্‌টনের ‘প্যারাডাইস

নরহরি চক্রবর্তী

লস্ট'-এর নরকবর্ণনা সাহিত্যে চিরন্তন খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

মুসলমান শাস্ত্রে নরকের নাম জাহান্নম এবং শেষ বিচারের দিন হইল কেয়ামত্‌। কোরান শরীফের বহু সুরায়, হদিসে ও তকসির হোসেনিতে নরক, নরকদণ্ড ও নরকবাসীর বর্ণনা আছে।

পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন ধর্মেই মৃত্যুর পর পুণ্য ও পাপের ফলে স্বর্গ ও নরকের অনুরূপ কল্পনা দেখা যায়।

দ্র তারানাথ তর্কবাচস্পতি, বাচস্পত্যম্‌, বারাণসী, ১৯৬২ খ্রী ; *Encyclopaedia of Religion & Ethics*, vol. IV, New York, 1959,

কল্যাণী দত্ত

নরহরি চক্রবর্তী, ঘনশ্যাম 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তম-বিলাস', 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। ইনি 'ভক্তিরত্নাকর'-এ লিখিয়াছেন—'নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। পূর্ব বাস গঙ্গাতীরে জানে সর্বজনে॥ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত। তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥ না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম। নরহরিদাস আর দাস ঘনশ্যাম॥" (পৃ ১০৬৮)। নরোত্তম ঠাকুরের বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হরিরাম আচার্য। তাঁহার বংশে জাত, রামনিধির পুত্র নৃসিংহ চক্রবর্তী নরহরি চক্রবর্তীর গুরু ('নরোত্তম-বিলাস', ১৩শ বিলাস)।

নরহরি চক্রবর্তী একাধারে কবি, গায়ক, ঐতিহাসিক, ভূগোল-বেত্তা, ছন্দশাস্ত্রে বিশারদ এবং রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এবং সাহিত্যের সর্বপ্রথম গবেষক হইতেছেন নরহরি চক্রবর্তী। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কবি বাসু ঘোষ, শিবানন্দ সেন, বসু রামানন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, গদাধর দাস-শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তী, নরহরি সরকার ঠাকুর এবং বলরাম দাসের পদ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার আলেখ্য অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি নরহরি ভণিতাযুক্ত 'গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে' ইত্যাদি পদটি তুলিয়া লিখিয়াছেন 'শ্রীনরহরি সরকার ঠক্কুরস্য গীতমিদং'। সেইরূপ শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতার শিষ্য যদুনন্দন দাস হইতে পার্থক্য দেখাইবার জন্য কয়েকটি পদ তুলিবার পূর্বে লিখিয়াছেন: 'তত্রাদৌ শ্রীদাস-গদাধর ঠক্কুরস্য শিষ্য শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্তী কৃত গীতে যথা' (পৃ ৯০৪)। এ কথা বলিয়া না দিলে যদুনন্দন ভণিতাযুক্ত ঐ পদ 'কৃষ্ণকর্ণামৃত', 'গোবিন্দলীলামৃত' প্রভৃতির সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক যদুনন্দন দাসের রচনা বলিয়া ধরা হইত।

নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকর'-এর কয়েক স্থলে 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' এবং এক স্থলে 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থের ঐ শ্লোক ছাড়া আর কিছুই এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। গোবিন্দদাস কবিরাজের 'সংগীতমাধব' নাটকও কেবলমাত্র নরহরির উদ্ধৃতিতে এখনও পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে ('ভক্তি-রত্নাকর', পৃ ১৭, ১৯, ২০, ৩৩)। 'ভক্তিরত্নাকর'-এর ৫ম তরঙ্গে ব্রজমণ্ডলের এবং ১২শ তরঙ্গে নবদ্বীপমণ্ডলের লীলা-পূত স্থানগুলির যে বিশদ বিবরণ দিয়াছেন তাহা আধুনিক গেজেটিয়রের লেখকদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

নরহরি 'ভক্তিরত্নাকর'-এ ঘনশ্যাম ভণিতায় ৪৫টি এবং নরহরি ভণিতায় ১৯৮টি পদ তুলিয়াছেন। তাঁহার 'গীতচন্দ্রোদয়'-এ ১১৭০টি পদ আছে, তন্মধ্যে স্বকৃত নরহরি ভণিতায় ৬৩২টি ও ঘনশ্যাম ভণিতায় ১৯৩টি পদ আছে। 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'-তে শুধু তাঁহারই ৩৭২টি পদ আছে ; অন্য কোনও কবির পদ নাই। ১৪৪০টি পদ এক দীন চণ্ডীদাস ছাড়া অন্য কোনও কবির পাওয়া যায় নাই। তবে নরহরির কবিত্বশক্তি উচ্চস্তরের নহে। তিনি বড় বড় পদ লিখিতে ভালবাসিতেন।

নরহরি 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'-তে তারা, কুমারী, রঙ্গিনী, দ্বিপথা, ত্বরিতগতি, কুন্দবল্লী, হেমদণ্ডক, কমলা, রঙ্গমালা, মাতঙ্গ প্রভৃতি ছন্দে পদরচনা করিয়াছেন। ঐ সব ছন্দের লক্ষণ কি তাহা হয়ত তাঁহার রচিত 'ছন্দসমুদ্র' গ্রন্থে পাওয়া যাইবে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার কৃত 'শ্রীনিবাস-চরিত্র', 'নামামৃতসমুদ্র', 'পদ্ধতি-প্রদীপ' এবং 'সংগীতসারসংগ্রহ' গ্রন্থও এপর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে।

শ্রীনিবাস-নরোত্তমের যুগের প্রায় ১০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হইলেও নরহরি চক্রবর্তী ঐ যুগের তথ্য সংগ্রহের জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত, অতি প্রাচীন লোকের উক্তি প্রভৃতি কিছু কিছু হয়ত বিশ্বাসের অযোগ্য প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

দ্র নরহরি চক্রবর্তী, ভক্তিরত্নাকর, বহরমপুর, ৪০২ চৈতন্যাব্দ ; হরিদাস দাস, গীতচন্দ্রোদয়, নবদ্বীপ, ? ; বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৬১ খ্রী।

বিমানবিহারী মজুমদার

নরহরি সরকার ঠাকুর চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সুবিখ্যাত পদকর্তা। বৃন্দাবনদাস 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-এ কোথাও নরহরির নাম করেন নাই, কিন্তু নরহরির শিষ্য লোচন বা ত্রিলোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ নরহরির কথা বিশদভাবে বলিয়াছেন। কবিকর্ণপুর 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা-এ (১৭৭) নরহরিকে ব্রজলীলার মধুমতীতত্ত্বরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর শিবানন্দ সেনের একটি পদে ('ভক্তিরত্নাকর', পৃ ৯৪৪) আছে: 'প্রভু ব্রজরায় গায়ত নরহরি সঙ্গে'। গোবিন্দ ঘোষের পদে আছে : 'বাসু ঘোষ রামানন্দ, শ্রীবাস জগদানন্দ, নাচে রঙ্গে নরহরি সঙ্গে' ('ভক্তিরত্নাকর', পৃ ৯১৯)। সুতরাং নরহরি যে নবদ্বীপলীলায় নিমাই পণ্ডিতের সহিত নাচিতেন গাহিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নরহরির বড় ভাই মুকুন্দ হুসেন শাহের রাজবৈদ্য ছিলেন। ইঁহাদের বাসস্থান কাটোয়ার নিকটে শ্রীখণ্ডে।

নরহরি সরকার শ্রীগৌরাঙ্গ অপেক্ষা ৫ বৎসরের বড় ছিলেন বলিয়া শ্রীখণ্ডে প্রবাদ আছে। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'-তে 'রঘুনন্দনের পিতা, মুকুন্দ তাহার ভ্রাতা, নাম যার নরহরি দাস' ইত্যাদি যে পদটি রায়শেখরের বলিয়া ধৃত হইয়াছে তাহাতে আছে যে নরহরি 'গৌরাঙ্গজন্মের আগে, বিবিধ রাগিণী রাগে ব্রজরায় করিলেন গান'। ৫ বৎসরের শিশু বিবিধ রাগিণীতে ব্রজরায় গান করিয়াছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। ঐ পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'রায়শেখরের পদাবলী'তে নাই। তবে নরহরি সরকার ঠাকুর ব্রজলীলা লইয়া যে অনেক সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার অনেক পদ এখন চণ্ডীদাসের ভনিতায় চলিতেছে।

চৈতন্যদেবের ভাবজীবন লইয়া নরহরি সরকার অনেকগুলি অনুপম পদ লিখিয়াছেন। ঐ সব পদের ছত্রে ছত্রে কবির প্রত্যক্ষ অনুভূতির সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। নরহরি সরকারের পদের রচনাভঙ্গী নরহরি চক্রবর্তীর রচনাশৈলী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নরহরি সরকার সহজ ভাষায় চণ্ডীদাসী রীতিতে ছোট ছোট পদ লিখিয়াছেন আর নরহরি চক্রবর্তী ব্রজবুলিতে আলংকারিক রীতিতে বড় বড় পদ রচনা করিয়াছেন।

নরহরি সরকার চৈতন্যদেবের তিরোভাবের অনেক পরে জীবিত ছিলেন। তাঁহারই আদেশে শ্রীনিবাস আচার্য বিবাহ করিতে সম্মত হন বলিয়া 'ভক্তিরত্নাকর'-এ উল্লেখ আছে। ঐ গ্রন্থে (৯৷৫১৩) লিখিত আছে যে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তাঁহার তিরোধান হয়। তিনি 'ভক্তিচন্দ্রিকাপটল' এবং 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' নামে গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের নাগরীভাবের উপাসনার অন্যতম প্রবর্তক। তিনি গৌরাঙ্গ-মন্ত্রে উপাসনা করিতেন এবং দীক্ষা দিতেন। শ্রীখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গের যে বিগ্রহ আছে তাহা নরহরি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

দ্র হরিদাস দাস, শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবজীবন, কলিকাতা, ৪৬৫ গৌরাব্দ; গৌরগণানন্দ ঠাকুর, শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, বর্ধমান, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ; বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, কলিকাতা, ১৯৩৯; বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৬১।

বিমানবিহারী মজুমদার

নরীসুন্দরী সুগায়িকা অভিনেত্রী। কলিকাতার বিভিন্ন সাধারণ রঙ্গালয়ে নরীসুন্দরী প্রধানতঃ সঙ্গীতপ্রধান স্ত্রী-ভূমিকায় বিশেষ সুনামের সহিত অভিনয় করেন (১৮৯৪-১৯১৭ খ্রী)। তাঁহার অভিনীত ভূমিকাগুলির মধ্যে দলনী (১৮৯৬ খ্রী), সূর্যমুখী (১৯০১ খ্রী), বিজয়া (প্রতাপাদিত্য, ১৯০৩ খ্রী), মেহের (১৯০৫ খ্রী), ছায়া (চন্দ্রগুপ্ত, ১৯১১ খ্রী) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'শ্রীদুর্গা' নাটকে ধরিত্রীর ভূমিকায় শেষ মঞ্চাবতরণ করেন। নরীসুন্দরীর কোমলা এবং সরলা নারীচরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করিবার একটি বিশেষ শক্তি ছিল। তাঁহার গানগুলিও একসময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

প্রবোধকুমার দাস

নরেন্দ্রমোহন সেন (১৮৯০-১৯৬১ খ্রী) ঢাকার বিখ্যাত সেনবংশে নরেন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। পিতা প্রভাতকুমার সেন বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ মেধাবী ও ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। ১৭ বৎসর বয়সে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে পাঠরত অবস্থায় তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং পুলিনবিহারীর নির্বাসনের অতি অল্পদিন পরেই (১৯১০ খ্রী) তাঁহার উপর সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। ইতিমধ্যে তিনি ২ বার ধৃত ও আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার পর পলাতক জীবন গ্রহণ করেন; সেই অবস্থায় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার গ্রীয়র পার্কে বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও

কয়েকজন সহকর্মীর সহিত গোপন আলোচনাবৈঠকের সময় পুলিশ অধিকর্তা লোম্যান পরিচালিত পুলিশ বাহিনীর সহিত সংঘর্ষের ফলে ধৃত হন। তিনি তাহার পর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ নং আইন অনুসারে বিভিন্ন জেলে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বন্দী থাকেন। তিনি ধৃত হইবার পূর্বেই সহকর্মী কেদারেশ্বর গুহকে জাপান ও সুদূর প্রাচ্যে ও মুক্তিলাভের পর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে রাশিয়াতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গণবিপ্লবের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া সমিতির সভ্যদের অনেককে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিবার নির্দেশ দেন এবং স্বয়ং ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী কংগ্রেসের সময় বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকে ধৃত হওয়ায় তিনি আত্মগোপন করেন এবং প্রায় ২ বৎসর কাল বিভিন্ন প্রদেশ এবং বিশেষ করিয়া বাংলা দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি পুনরায় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা শহরে ধৃত হন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আবদ্ধ থাকার সময় জেলপ্রাঙ্গণে পুলিশ কর্মচারি ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হত্যার ফলে নিরাপত্তার অজুহাতে তাঁহাকে ব্রহ্ম দেশের জেলে প্রেরণ করা হয়। ব্রহ্ম দেশে আটক থাকার সময়েই তাঁহার মনোভাব ও চিন্তাধারার পরিবর্তন হয় এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিলাভের পর তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। মিশন কর্তৃক রাঁচিতে যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য। আধ্যাত্মিক সাধনায় রত থাকা অবস্থায় ৭৩ বৎসর বয়সে কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয় (২৩ জানুয়ারি, ১৯৬১)।

মণীন্দ্রমোহন লাহিড়ী

নরেশচন্দ্র মিত্র (১৮৮৮-১৯৬৮ খ্রী) প্রখ্যাত অভিনেতা। জন্ম ত্রিপুরার আগরতলায়। পিতা বঙ্কুবিহারী মিত্র, মাতা অন্নদাসুন্দরী মিত্র। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে নরেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতায় প্রাথমিক পেশা ওকালতি হইলেও আবাল্য অভিনয়ের নেশাই বড় হইয়া দাঁড়ায়। তিনি মঞ্চাভিনয়ে নবযুগের প্রবর্তক শিশিরকুমার ভাদুড়ির প্রধান সহযোগী ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে নবীনচন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র' নাটকে শিশিরকুমার অভিমন্যু এবং নরেশচন্দ্র দুর্বাসার ভূমিকায় অভিনয় করেন। নরেশচন্দ্রের ইহাই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অভিনয়। অতঃপর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারে নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যালারামের স্বদেশিতা' নাটকে অভিনয় করিতে গিয়া নরেশচন্দ্র পরিপূর্ণরূপে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'কর্ণার্জুন' নাটকে শকুনির ভূমিকায় তিনি রাতারাতি প্রসিদ্ধ হন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে প্রথমে চাণক্যের ভূমিকা এবং পরে কাত্যায়নের ভূমিকা অভিনয়ে তিনি অতুলনীয় গৌরব অর্জন করেন। তৎকালে বহু নাটকই তাঁহার অভিনয়কীর্তিতে সমৃদ্ধ। চলচ্চিত্রের নির্বাকযুগে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'আঁধারে আলো' চিত্রে তাঁহার প্রথম আত্মপ্রকাশ। নরেশচন্দ্রের পরিচালিত ও অভিনীত নির্বাক চিত্রগুলির মধ্যে 'মানভঞ্জন', 'চন্দ্রনাথ', 'নৌকাডুবি' ও 'দেবদাস' উল্লেখযোগ্য। অনেকগুলি সবাক চিত্র তাঁহার পরিচালনা অথবা অভিনয়ে জনপ্রিয় হয়, তন্মধ্যে 'গোরা', 'বাংলার মেয়ে', 'স্বয়ংসিদ্ধা' ইত্যাদি উল্লেখ্য। তাঁহার শেষ অভিনীত চিত্র 'পরিশোধ'। দেহের খর্বতা ও কণ্ঠের মাধুর্যহীনতা তাঁহাকে অভিনয়জগতে কিন্তু খর্ব করিতে পারে নাই। বিদগ্ধ দর্শকসমাজ তাঁহাকে 'নটশেখর' উপাধিতে ভূষিত করেন। খলপ্রকৃতির এবং অদ্ভুত মনোবৃত্তির চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অপরাজেয়।

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের নাট্যশাখায় নরেশচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। ৮০ বৎসর বয়সেও তিনি বহু সম্মিলিত অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন; মৃত্যুর তিনদিন পূর্বেও মহাজাতি সদনে 'সোনাই দীঘি' ও 'বাঙালী' নামক দুইটি যাত্রা-নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় পরপর অভিনয় করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। হৃদ্‌রোগের আক্রমণে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সরল, সজ্জন এবং অমায়িক।

মন্মথ রায়

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪ খ্রী) খ্যাতনামা আইনবিদ ও সাহিত্যিক। নরেশচন্দ্র ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহেশচন্দ্র সেন, মাতা শরৎসুন্দরী দেবী। তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দর্শনে এম. এ. পাশ করেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন এবং কংগ্রেসের একজন সুপরিচিত কর্মী ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন ভারতের ব্যবহার ও সমাজনীতি বিষয়ে গবেষণা করিয়া ডি. এল.. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৭ হইতে ১৯২৪

খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালেই আইন-উপদেষ্টা হিসাবে তাঁহার যশ ছড়াইয়া পড়ে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় কলিকাতায় আইন-ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে নরেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক হন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইন-বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমন্ত্রিত হইয়া আমেরিকায় ইউনেস্কো-র এক অধিবেশনে যোগদান করেন এবং ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় আইন কমিশন-এর সদস্য হন। আইন-সংক্রান্ত নানা তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ ছাড়া তিনি 'শুভা', 'অভয়ের বিয়ে', 'তারপর', 'পাপের ছাপ' প্রভৃতি ৬০ খানি উপন্যাস ও নাটক রচনা করেন। তাঁহার প্রথম বই 'আনন্দ মন্দির' ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণা রায়চৌধুরী

নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি, কীর্তনগায়ক ও ধর্মপ্রচারক। ইহার 'প্রার্থনা' ও 'প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা' আজও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের ঘরে ঘরে নিত্য পঠিত হয়। ইনি চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর আবির্ভূত হন। রাজশাহী জেলার গোপালপুর পরগনার অধিপতি কৃষ্ণানন্দ দত্ত ইহার পিতা। মাতার নাম নারায়ণী দেবী। পিতৃবিয়োগের পর ইনি জ্যেষ্ঠতাতপুত্র সন্তোষ দত্তের উপর বিষয়সম্পত্তি দেখিবার ভার দিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর লোকনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন সনাতন ও রূপগোস্বামীর তিরোধান ঘটিয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট ইনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কোনও কোনও সুধী অনুমান করেন যে বৃন্দাবনে বাস করিবার সময়ে তিনি উচ্চাঙ্গের সংগীত অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং গৌড় বঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া 'গরাণহাটি' কীর্তনের প্রচার করেন। ষোড়শ শতাব্দীর অষ্টম দশকে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি এবং শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধামোহন ও শ্রীরাধাকান্ত মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে খেতুরিতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে এক বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করেন। সে-সময়ের বহু বিখ্যাত ভক্ত উহাতে যোগ দেন। গরাণহাটি কীর্তন এই উৎসবেই প্রথমে প্রচারিত হয়। সন্তোষ দত্ত উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। নরোত্তমের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ বৈষ্ণবদের পরিচর্যার ভার লইয়াছিলেন।

নরোত্তম আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন এই কথা গোবিন্দদাস তাঁহার 'সংগীতমাধব' নাটকে লিখিয়াছেন। 'পদকল্পতরু'-ধৃত (৩০৪৯) তাঁহার একটি প্রার্থনার পাঠ-'ধনজন-পুত্রদারে এ সব করিয়া দূরে, একান্ত করিয়া কবে যাব'। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুথিগুলিতে 'ধনজনপুত্রদারে' স্থলে 'ধনজনপরিবারে' পাঠ আছে। শেষোক্ত পাঠ গোবিন্দদাসের উক্তিকে সমর্থন করিতেছে।

ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ হইলেও বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া সমাজে কিছু আন্দোলন উঠিলেও পরিশেষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট নতিস্বীকার করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ 'জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদটিতে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। বল্লভ নামক কবি 'পদকল্পতরু'-ধৃত একটি পদের (১০২২) ভণিতায় লিখিয়াছেন, 'নরোত্তমদাস আশ চরণে রহু শ্রীবল্লভ-মন ভোর'। ঐ বল্লভ নরোত্তমদাস সম্বন্ধে অন্য একটি পদে ('গৌরপদতরঙ্গিণী', পৃ ৪৭৯, ১ম সং) লিখিয়াছেন :

'চন্দ্রিকা পঞ্চম সার, তিনমণি সারাৎসার, গুরুশিষ্য
সংবাদ পটল।
ত্রিভুবনে অনুপাম, প্রার্থনা গ্রন্থের নাম, হাটপত্তন
মধুর কেবল ॥
রচিল অসংখ্য পদ, হৈয়া ভাবে গদ গদ, কবিত্বের
সম্পদ সে সব।
যে বা শুনে, যে বা পড়ে, যে বা তাহা গান করে,
সেই জানে পদের গৌরব ॥'

জগদ্বন্ধু ভদ্রমহাশয় বলেন যে, ঐ পদে উল্লিখিত 'চন্দ্রিকা পঞ্চম সার' মানে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সিদ্ধপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, সাধনভক্তিচন্দ্রিকা এবং চমৎকারচন্দ্রিকা। আর 'তিনমণি সারাৎসার' মানে সূর্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তিচিন্তামণি। হাটপত্তন যে নরোত্তমের লেখা এ-কথা সকলে স্বীকার করেন না। সহজিয়ারা তাঁহার নামে 'অমৃতরসচন্দ্রিকা', 'সারাৎসার-কারিকা', 'রাগমালা', 'স্বরূপকল্পলতিকা', 'রসভক্তিচন্দ্রিকা', 'দেহকড়চা' প্রভৃতি গ্রন্থ আরোপ করেন।

দ্র নরহরি চক্রবর্তী, নরোত্তম বিলাস, কলিকাতা, ? ; শিশিরকুমার ঘোষ, শ্রীনরোত্তম-চরিত, কলিকাতা, ? ; বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৬১।

বিমানবিহারী মজুমদার

নর্মদা ভারতের একটি সুপ্রসিদ্ধ নদী। পুরাকালে এই নদী রেবা, সোমোদ্ভবা ও মেখলাসুতা নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন মেখল প্রদেশের মহাকাল (মৈকাল)

পর্বতের অমরকণ্টক (উচ্চতা ১০৬৫ মিটার বা ৩৪৯৩ ফুট) শৃঙ্গস্থিত এক কুণ্ড (২২°৪১´ উত্তর ও ৮১°৪৮´ পূর্ব) হইতে ইহার উৎপত্তি। আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র নদীর সহিত মান্দালা পর্বতের উপর মিলিত হইয়া নর্মদা মধ্য প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার প্রবাহিত হইয়া গুজরাত রাজ্যের ভৃগুকচ্ছের (বর্তমান ব্রোচ শহর) নিকট খম্বাত উপসাগরে পতিত হইয়াছে। পূর্বকালে ইহা খান্দেশের দক্ষিণপশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাপ্তীতে পতিত হইত।

নর্মদা উত্তরে বিন্ধ্য ও দক্ষিণে সাতপুরা পর্বতে অবস্থিত গ্রস্ত-উপত্যকা দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নর্মদা উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের সীমারেখাস্বরূপ। ইহার গতিপথ ও উপত্যকার প্রশস্ততা দক্ষিণপ্রান্তের চ্যুতিরেখা ও উত্তরপার্শ্বের বিভিন্ন স্তরের ক্ষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নদীর মধ্যবর্তী অংশের অসাধারণ ঋজু গতি হইতে ইহা সহজেই প্রমাণিত হয়।

বিন্ধ্য-সাতপুরার পার্বত্য অঞ্চল হইতে ইন্দোর জেলায় প্রবেশ করিবার পূর্বে ১৩টি ক্ষুদ্র নদী ইহাতে আসিয়া মিশিয়াছে। ইন্দোরে বামদিক হইতে ৩টি ও দক্ষিণদিক হইতে ৪টি উপনদী এই নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে। নর্মদার এই উপনদীগুলির মধ্যে হিরণ, অমরাবতী, কাবেরী, বানজার, তাওয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই নদীর স্থানে স্থানে কয়েকটি জলপ্রপাত আছে। ইহাদের মধ্যে জবলপুরের নিকট ভেরাঘাটের ধুয়াধার জলপ্রপাত প্রসিদ্ধ। এই জলপ্রপাতটি ১৫ মিটার উচ্চ। উহার নিম্নে ধোবিঘাট। ইহার পর নদীটি মার্বেল-পাহাড় ভেদ করিয়া নানা রং-এর মর্মর ও স্ফটিক শিলার প্রাচীরের মধ্য দিয়া বক্রগতিতে প্রবাহিত হইবার সময় একটি মনোরম গিরিখাত সৃষ্টি করে। মোহানার মুখে পলি-সঞ্চয়ের প্রতিকূল অবস্থা থাকায় নদীমুখে কোনও ব-দ্বীপ গঠিত হয় নাই।

নর্মদা নদীর পাললিক শিলায় গঠিত ধাপে (টেরাস) প্রস্তর যুগের মানুষের অস্ত্রশস্ত্র ও সেই যুগের গোরু, মহিষ, জলহস্তী প্রভৃতির প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। নদীতীরে ও হোসঙ্গাবাদ জেলায় অ্যামোনাইট ফসিল পাওয়া যায়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন, প্রাচীন টেথিস মহাসাগরের ২টি ক্ষুদ্র শাখা এইস্থানে প্রবেশ করিয়াছিল।

মধ্য প্রদেশের জবলপুরে নদীতীরে প্রাচীন গোণ্ড জাতি বাস করিত। এখনও বহু আদিবাসী এখানে বাস করে। নদীতীরে প্রধান শহরের মধ্যে জবলপুর, ব্রোচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জবলপুরের কিছু পশ্চিমে ঐতিহাসিক মহেশ্বর শহর অবস্থিত।

হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী এই নদী শিবের দেহ হইতে নির্গত, সুতরাং পবিত্রতার দিক দিয়া গঙ্গার পরেই নর্মদার স্থান। নদীর উভয় তীরে বহু তীর্থস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। শিবচতুর্দশী ও কার্তিকপূর্ণিমায় অমরকণ্টকের কুণ্ডে স্নান উপলক্ষে বহু লোকসমাগম হয়।

দ্র B. C. Law, *Rivers of India*, Calcutta, 1944 ; A. K. Dey, *Geology of India*, New Delhi, 1968.

কমলা মুখোপাধ্যায়
লীনা চট্টোপাধ্যায়

নল নিষধদেশের রাজা নল একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। বিদর্ভরাজ ভীম স্বীয় কন্যা দময়ন্তীর বিবাহের জন্য স্বয়ংবর-সভা আহ্বান করিলে দেবগণের অনুরোধে নল তাঁহাদের দূতরূপে অলক্ষ্যে দময়ন্তীগৃহে প্রবেশ করেন এবং দেবতাদের একজনকে বরণ করিতে অনুরোধ করেন; অথচ নল-দময়ন্তীর মধ্যে পূর্বেই প্রণয়সঞ্চার হইয়াছিল। দময়ন্তী কিন্তু স্বয়ংবরসভায় দেবগণের সমক্ষে নলরাজকে বরণ করেন। দেবগণের অপমানে কলি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নলের শরীরে প্রবেশ করেন এবং বিবিধ দুর্ভোগের দ্বারা তাঁহাকে ক্লিষ্ট করেন।

নলরাজা পাককর্মে নিপুণ ছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। নল-রচিত বলিয়া কথিত পাকশাস্ত্রের গ্রন্থ পাওয়া যায়।

দ্র মহাভারত, বনপর্ব, ৫২-৭২ অধ্যায়।

সীতানাথ গোস্বামী

নলকূপ ভূগর্ভে ইস্পাতের নল প্রোথিত করিয়া পাম্পের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জল তোলা যায়। তুষারপাত ও বৃষ্টিপাতের জল কিছুটা বায়ুমণ্ডলে উবিয়া যায়, কিছুটা নদীনালায় পড়ে, কিছুটা ভূগর্ভে প্রবেশ করে। আবার নদীনালার জলের কিছুটা চোঁয়াইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, তুষারপাতের ও বৃষ্টিপাতের জলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির ফোঁপরা প্রস্তর ও বালুময় স্তরের মধ্যে অন্তঃসলিল ও মন্থর জলপ্রবাহরূপে বর্তমান। ভূপৃষ্ঠের ও ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরে অসমানতার দরুন এই জলে অনেক ক্ষেত্রে গভীর চাপ পরিলক্ষিত হয়। তখন নল প্রোথিত করিলে এই জল উপরে উঠিয়া আসে এবং 'আর্টেসিয়ান কূপে' পরিণত হয়;

সম্পূর্ণ উপরে না উঠিয়া যদি ভূ-পৃষ্ঠের ৬-৯ মিটার নীচে পর্যন্ত ওঠে তাহা হইলেও সাধারণ পাম্পের সাহায্যেই সে জল তোলা যায়। তাহা না হইলে অন্যান্য বিশেষ ধরনের পাম্পের প্রয়োজন হয়।

ভূ-ত্বক নানাশ্রেণীর মৃত্তিকা, বালুকা ও প্রস্তরের স্তরে বিভক্ত। একের উপরে অন্য স্তর বসিয়া আছে। প্রতিটি স্তরের গভীরতা ও জলপ্রতিরোধের ক্ষমতাও বিভিন্ন; যেমন এঁটেল মাটির স্তর দিয়া অথবা কঠিন গ্র্যানিট, ব্যাসল্ট প্রভৃতি প্রস্তরের স্তর দিয়া জল চুঁয়াইতে পারে না, আবার বেলে-পাথর ও বালুকাস্তরে জল সহজেই চোঁয়ায়। নীচের কোনও স্তরে সঞ্চিত জলের উপরে যদি সেরূপ জলপ্রতিরোধক এঁটেল মাটি অথবা কঠিন প্রস্তরের স্তর থাকে, তাহা হইলে সেই সঞ্চিত জল পর্যন্ত প্রোথিত নলকূপকে গভীর নলকূপ বলে। এইরূপ গভীর নলকূপের জল সচরাচর ব্যাধিজীবাণুমুক্ত থাকে, যদিও সে জলে নানাজাতীয় ধাতব লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিতে পারে। অগভীর নলকূপের জল পরীক্ষা না করিয়া অথবা পরিস্রুত না করিয়া পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়; উহা সেচের কার্যে ব্যবহার করা যায়। গভীর নলকূপের জলকে দ্রবীভূত নানাজাতীয় ধাতব লবণ হইতে মুক্ত করার বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া আছে; কোক-কয়লার মধ্য দিয়া ছাঁকিলে অনেক লৌহ-লবণ পৃথক করা যায়। বায়ুর অক্সিজেন মিশাইলেও এই লৌহ-লবণ পৃথক হইয়া যায়। চুন মিশ্রিত করিলেও জলকে কোনও কোনও লবণ হইতে মুক্ত করা যায়। সর্বাধুনিক 'আয়ন-এক্‌স্‌চেঞ্জ' প্রক্রিয়ায় জলকে সম্পূর্ণ লবণমুক্ত করা যায়।

দেড় ইঞ্চি হইতে বারো ইঞ্চি পর্যন্ত ব্যাসের নলই সচরাচর নলকূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ভূগর্ভে ৬-৯ মিটার হইতে দুইশতাধিক মিটার পর্যন্ত প্রোথিত নলকূপই পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত আছে। মরুভূমি অঞ্চলে ৬০০-৯০০ মিটার নীচেও জল পাওয়া যাইতে পারে।

নলকূপের যে অংশ জলবাহী স্তরে থাকে, সেই অংশের নল ছিদ্রযুক্ত করিয়া বিশেষভাবে নির্মিত হয়। উহাকে স্ট্রেনার বলে। জলবাহী স্তরের গভীরতা অনুযায়ী স্ট্রেনারের দৈর্ঘ্য হয়। গভীর নলকূপে অনেক সময়ে ভূগর্ভের বিভিন্ন জলবাহী স্তরে স্ট্রেনার লাগানো থাকে।

জলবাহী স্তর হইতে যে গতিতে জল টানিয়া তোলা সম্ভব তাহা নির্ভর করে কি হারে স্ট্রেনারের কাছে জল জমা হইবে তাহার উপরে। অত্যধিক দ্রুতগতিতে জল টানিলে স্ট্রেনারে জল উঠিবে না এবং বালিতে ছিদ্রমুখগুলি আবদ্ধ হইয়া নলকূপটি নষ্ট হইবে। অনেক দিন ব্যবহারেও নলকূপে জলের উৎস শেষ হইয়া যাইতে পারে।

কপিল ভট্টাচার্য

নলিকাতরঙ্গ, নলতরঙ্গ জাইলোফোনের অনুরূপ বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ। জাইলোফোনের কাষ্ঠখণ্ডগুলির পরিবর্তে নলিকাতরঙ্গ ক্রমনির্দিষ্ট ধাতুনির্মিত নল বা পাইপ লইয়া গঠিত। বাদক দুইটি কাঠির সাহায্যে নলগুলিতে আঘাত করিয়া সুর সৃষ্টি করেন। নলতরঙ্গের ধ্বনি জাইলোফোন অপেক্ষা মিষ্টতর।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

নলিনী বাগচি (১৮৯৬?-১৯১৭ খ্রী) নদিয়ার শিকারপুরের ভুবনমোহন বাগচির পুত্র। জন্ম কাঞ্চনতলায়। শৈশবেই পিতৃহীন হন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়িবার কালে ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। সেখানে তাঁহার উপর পুলিশের নজর পড়িলে তিনি ভাগলপুর কলেজে পড়িতে যান এবং সেখান হইতে আই. এ. পাশ করেন। সেখানেও পুলিশের নজর পড়িলে তিনি পাটনার কলেজে যোগ দেন এবং দানাপুর সৈন্যনিবাসে বিপ্লব প্রচার করিতে থাকেন। পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিলে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন ও তাঁহাকে গৌহাটির গোপন আড্ডায় পাঠানো হয়। পুলিশ গৌহাটির আড্ডার খবর পায় এবং হঠাৎ একদিন রাত্রে সশস্ত্র পুলিশ ফৌজ গৌহাটির আড্ডা ঘিরিয়া ফেলে। পুলিশের সঙ্গে কিছুক্ষণ খণ্ডযুদ্ধের পর বিপ্লবীরা এক পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় লন। পুলিশ সে পাহাড়ও ঘিরিয়া ফেলে। তখন নেতা হিসাবে নলিনী ঘোষ কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া 'রিয়ার-গার্ড অ্যাক্‌শন' নীতিতে যুদ্ধ করিয়া আহত ও গ্রেপ্তার হন। নেতার আদেশে নলিনী বাগচি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া রুগ্ণদেহে কলিকাতায় আসিতে সক্ষম হন।

কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া আরোগ্য হওয়ার পর নলিনী ঢাকায় গিয়া কলতাবাজারে এক বাড়িতে আড্ডা করিয়া আবার দলের কাজে মন দিলেন; সঙ্গী ছিলেন তারিণী মজুমদার। কিছুদিনের মধ্যেই একদিন এক সশস্ত্র পুলিশ ফৌজ সে বাড়িতেও হানা দিল। দুই বন্ধুতে পুলিশের উপর গুলি চালাইতে শুরু করিলেন। তারিণীর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হইল। নলিনী মারাত্মকভাবে আহত হইয়া ধরা পড়িলেন। কিছু পরেই কোনও জবানবন্দী না দিয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭ খ্রী) প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্, ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ্। ইনি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি পূর্ব বঙ্গের মুন্সিগঞ্জ থানার নয়নানন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রোহিণীকান্ত। পিতৃপুরুষের আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত পাইকপাড়া গ্রামে।

চারি বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হইলে খুল্লতাত অক্ষয়চন্দ্র তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। কিছুদিন স্কুল-কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা মিউজিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক-পদে নিযুক্ত হন। আজীবন তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ঢাকা মিউজিয়ামটির প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। এই পদে থাকাকালীন তিনি কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের ছাত্রদিগের অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন। মুদ্রাতত্ত্ব (নুমিজ্‌ম্যাটিক্‌স) ও প্রত্নলিপি-বিদ্যায় (প্যালিওগ্রাফি) এবং মৌর্য ও গুপ্তবংশীয় ইতিহাসে তিনি গবেষণা করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। ভারতের বিশেষতঃ বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি অনেক গবেষণা করিয়া বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

কৈশোরে এবং যৌবনে তিনি অনেক কবিতা ও গল্পের বই লিখিয়াছিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার গল্পসংগ্রহ 'হাসি ও অশ্রু' নামে প্রকাশিত হয়। এই বইটি এবং বই-এর বিভিন্ন সংগ্রহ ভারতের অনেক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রচিত 'ক্রোনোলজি অফ আর্লি ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্‌ট সুলতান্‌স্ অফ বেংগল' নামক পুস্তকটির জন্য তাঁহাকে 'গ্রিফিথ প্রাইজ' দেওয়া হয়। এই গ্রন্থখানিতে তিনি রাজা গণেশের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

অশোকা সেনগুপ্ত

নলিনীরঞ্জন সরকার (১৮৮২-১৯৫৩ খ্রী) বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, অর্থনীতিজ্ঞ ও রাজনীতিক। ইনি ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত সাজিউরা গ্রামে ২০ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১২৮৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা চন্দ্রনাথ সরকার, মাতা প্রসন্নময়ী। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ সিটি স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া ঢাকা জগন্নাথ কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আসেন ; কিন্তু পিতা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হওয়ায় তাঁহার পড়াশুনায় বাধা উপস্থিত হয়। এই সময় তিনি কলিকাতায় আসেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগ দেন। তখন হইতেই উৎসাহী যুবক হিসাবে তৎকালীন নেতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৬-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বিপর্যয় ও অভাব-অনটনে দিন কাটে। অবশেষে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটিতে অতি অল্প বেতনে একটি সাধারণ চাকরির সংস্থান হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়, কিন্তু নলিনীরঞ্জনের কর্মশক্তি, ব্যবসাবুদ্ধি ও দৃঢ়তায় কোম্পানি বিপদ কাটাইয়া ওঠে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই কোম্পানির পূর্ণ কর্তৃত্ব তাঁহার হাতে আসিয়া পড়ে। ক্রমান্বয়ে তিনি কোম্পানির সহকারী-সচিব, কর্মাধ্যক্ষ ও প্রধান কর্মাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হইলেন। হিন্দুস্থানের কাজের মাধ্যমেই তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও সমকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বরাজ্য পার্টির সমর্থনে তিনি ময়মনসিংহ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন ; ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সভ্য ছিলেন। নির্বাচনের পরে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বরাজ্য পার্টির সভ্য হন ও শেষে পার্টির চিফ হুইপ ও কর্মসচিবও হইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা পাকা হইয়া যায়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে বিরাট কংগ্রেস প্রদর্শনী হয়, তিনি তাহার কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেয়র নির্বাচিত হন। রাজনীতির সহিত বিশেষভাবে জড়িত থাকিলেও প্রধানতঃ ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকৃতির সহিত তাঁহার মনের সংযোগ সুদৃঢ় ছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় জাতীয় বণিকসভার (বেংগল ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্স) সহ-সভাপতির পদে নির্বাচিত হন ; ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইহার সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব-ভারতীয় বণিক সভার (ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স্ অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইন্‌ডাস্ট্রিজ্) সভাপতি নির্বাচিত হন ও কালক্রমে ইহার একজন প্রধান হিসাবে পরিগণিত হন। ইহা ছাড়া তিনি বহু সভা, সমিতি ও সংস্থার সহিত কোনও না কোনও রূপে জড়িত ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত-কমিটি ও রেলওয়ে ছাঁটাই কমিটির সদস্য ছিলেন। কোম্পানি আইন সংশোধন কমিটির সদস্য হিসাবে ও নিখিল ভারত কারিগরি-শিক্ষা সংসদের (অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেক্‌নিক্যাল

এডুকেশন) সভাপতি হিসাবে তাঁহার কাজ উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক বিষয়ে তিনি বহু পুস্তক লিখিয়াছেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী ফজলুল হকের নেতৃত্বে যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় নলিনীরঞ্জন তাহাতে অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার বিশিষ্ট অবদান আটক রাজবন্দীদের মুক্তি ও তজ্জন্য গান্ধীজীর সহিত তদানীন্তন বাংলা সরকারের প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করা এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদের জন্য সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সমান চাকরির হার নির্দিষ্ট করা। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে তিনি বাংলা সরকারের যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মন্ত্রীপদ ত্যাগ করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বড়লাটের কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন ; ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাণিজ্য ও খাদ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরই মহাত্মা গান্ধীর অনশন সম্পর্কে সরকারের নীতির প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেন। বড়লাটের শাসন-পরিষদে থাকার সময় তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলার ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় শিল্প-মিশনের সভ্য হিসাবে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। বঙ্গ-বিভাগের সময়ে বিভাগ পরিষদের (পার্টিশন কমিটি) সভ্য নিযুক্ত হন। ভারতের সংবিধান রচনার সময়ে শাসনতন্ত্রের আর্থিক ধারাগুলি প্রণয়নের জন্য যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল নলিনীরঞ্জন সরকার তাহার সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি তিনি পশ্চিম বঙ্গ মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন ও ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হইয়া তিনি শাসনকার্য ও বিধানসভা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি তিনি দেহত্যাগ করেন।

সুধাংশুবিকাশ রায়চৌধুরী

নষ্টচন্দ্র ভাদ্র মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থীর চন্দ্র। এই চন্দ্রের দর্শন নিষিদ্ধ। দর্শন করিলে মিথ্যা অপবাদের পাত্র হইতে হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। নষ্টচন্দ্রের কিরণ-দর্শনের ফলেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি অপহরণের মিথ্যা অপযশের বেদনায় পীড়িত হইতে হইয়াছিল, পুরাণে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়। পুরাণের কাহিনী অনুসারে চন্দ্র এইদিন গুরু-পত্নীর উপর বলাৎকার করিয়া পাপভাগী হন, তাই তাঁহার দর্শনেও পাপ হয়। পশ্চিম ভারতে প্রচলিত কাহিনীর মতে, এইদিন গণেশচতুর্থী ; এতদুপলক্ষে ঘরে ঘরে গণেশের যে পূজা হয় তাহাতে একবার গণেশের আহার বেশি হইয়া যাওয়ার ফলে তিনি সন্ধ্যাকালে হেলিয়া দুলিয়া অস্বাভাবিকভাবে রাস্তা দিয়া যাইতে থাকেন, তাহাতে চন্দ্র আকাশ হইতে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া ফেলেন। ইহাতে গণেশ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে, এদিন কেহই তাঁহার মুখদর্শন করিবে না। মিথিলায় কিন্তু এইদিন সন্ধ্যায় সাড়ম্বরে চন্দ্রের পূজা করা হয়। বাংলা দেশে এইদিন রাত্রিতে চুরির উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। তরুণ-সম্প্রদায় চুরির আনন্দে মাতিয়া উঠিয়া প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে টুকিটাকি জিনিসপত্র ও ফলমূল চুরি করিত। গৃহস্থেরা এজন্য সতর্ক ও প্রস্তুত থাকিতেন। ৫০-৬০ বৎসর পূর্বেও গ্রামে গ্রামে এই কৌতুক প্রচলিত ছিল। এখনও কোথাও কোথাও ভূত-চতুর্দশী, কালীপূজা, শিবরাত্রি ও চৈত্র-সংক্রান্তির রাত্রিতে চুরি ও অন্য নানাভাবে গৃহস্থকে উদ্ব্যস্ত করিবার প্রথা দেখা যায়।

দ্র রঘুনন্দন, তিথিতত্ত্ব ; কমলাকর ভট্ট, নির্ণয়সিন্ধু ; ভট্টোজি দীক্ষিত, তিথিনির্ণয় ; রুদ্রধর, বর্ষকৃত্য।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

নসরৎ শাহ্ গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ্ সুলতান হন (১৫১৯ খ্রী)। তিনি চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত সদ্ব্যবহার করেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ত্রিহুত জয় করেন। স্টুয়ার্ট ও রিয়াজের অনুবাদকের মতে তিনি হাজিপুর জয় করেন। ত্রিপুরারাজের সহিতও নসরৎ শাহের সংঘর্ষ হয়, কিন্তু এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই জয়ের দাবি করেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট বাবর পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভের পর অনেক আফগান-নায়ক পলাইয়া আসিয়া নসরৎ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাবর কয়েকটি শর্তে নসরৎ শাহের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত ছিলেন। নসরৎ ইহাতে সম্মত না হওয়ায় বাবর ঘর্ঘরা নদী পার হইয়া যুদ্ধে বাংলার সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া সারনে উপস্থিত হইলে নসরৎ শাহ্ বাবরের সহিত সন্ধি করেন (১৫২৯ খ্রী)। বাংলার সৈন্যেরা খুব বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং বাবর তাহাদের কামান-চালনার দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছেন। 'অহোম বুরঞ্জী'তে আছে, ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বাংলা কর্তৃক আসাম আক্রান্ত হইয়াছিল। পর্তুগীজেরা নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বাংলায় ঘাঁটি স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করে। রিয়াজের মতে ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে,

কিন্তু সম্ভবতঃ ইহার কয়েক বৎসর পূর্বেই নসরৎ শাহ্ আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

নসরৎ শাহ্ গৌড়ে বারদুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন ও কদম রসুলের 'প্রকোষ্ঠে একটি মঞ্চ নির্মাণ করান এবং তাহার উপর হজরৎ মহম্মদের পদচিহ্ন-সংবলিত একটি কালো কারুকার্য-খচিত মর্মরবেদী বসান।' বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, পাঁচজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান নরপতি যাঁহাদের দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী ছিল তাঁহাদের মধ্যে নসরৎ শাহ্ অন্যতম।

দ্র রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, বাংলা দেশের ইতিহাস : মধ্যযুগ, কলিকাতা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ ; *Riyaz-us-salatin*, Maulavi Abdus Salam, tr., Calcutta, 1902 ; C. Stewart, *History of Bengal*, Calcutta, 1910.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

নস্য তামাকঘটিত মৃদু ক্লান্তিনিবারক পদার্থ। তামাক পাতার উপযুক্ত মাত্রায় সন্ধান (ফার্মেন্টেশন)-এর পর তাহাকে শুখাইয়া এবং চূর্ণ করিয়া নস্য তৈয়ারি করা হয়। ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা, তামিল নাড়ু, পশ্চিম বঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে নস্য উৎপন্ন হয়।

সিগারেট ও খইনির মত নস্যেরও প্রধান সক্রিয় উপাদান নিকোটিন নামক উপক্ষার বা অ্যাল্‌কালয়েড। নাসারন্ধ্রে নস্য প্রয়োগ করিলে নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে নস্যের নিকোটিন রক্তে বিশোষিত হয়। নিকোটিনের প্রভাবে নার্ভবাহিত আবেগ (ইম্‌পাল্‌স) সহজেই নার্ভগ্রন্থি অতিক্রম করিতে পারে এবং নার্ভের উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় ; ফলে সাময়িকভাবে তৎপরতা ও উদ্যম বাড়িয়া যায়। ক্রমাগত নস্য গ্রহণে নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও অন্যান্য অংশের প্রদাহ সৃষ্ট হইতে পারে। 'তামাক' দ্র।

দেবজ্যোতি দাশ

নহালী নহালদের ভাষা। মধ্য প্রদেশের নিমার জেলা, মহারাষ্ট্রের অমরাবতী ও বুলদানা জেলা এবং খান্দেশ অঞ্চলে নহালদের বসবাস। গ্রিয়ার্সন নহালীকে মুণ্ডা বা কোল ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত একটি মিশ্রিত ভাষা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, তাঁহার মতে নহালী মূলতঃ কুরকু ভাষার সহিত সংপৃক্ত। নহালীর মধ্যে দ্রাবিড় ভাষার বিশেষ করিয়া ভারতীয় আর্যভাষার অত্যধিক প্রভাব পড়িয়াছে। ভাষা হিসাবে বহুল প্রচলিত না হইলেও ভাষাতাত্ত্বিকদের নিকট নহালী একটি উল্লেখযোগ্য ও কৌতুহলোদ্দীপক ভাষা, কারণ নহালীর মধ্যে ভাষার উপাদানগত এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি ভারতবর্ষের অপরাপর ভাষা-গোষ্ঠীর (যথা ভারতীয় আর্য, দ্রাবিড়, মুণ্ডা বা কোল এবং ভোটবর্মী) মধ্যে পাওয়া যায় না। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মনে করেন, ভারতবর্ষে কোনও কালে অপর একটি ভাষা-গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল যাহা পরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং সেই ভাষা-গোষ্ঠীরই কিছু কিছু উপাদান নহালীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। নহালী সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা হইলে এই অনুমানের সত্যতা নির্ণীত হইবে।

দ্র G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. IV, Calcutta, 1906 ; Sudhibhushan Bhattacharya, 'Field-Notes on Nahali', *Indian Linguistics*, vol. XVII, 1957 ; F. B. J. Kuiper, *Nahali : A Comparative Study*, Amsterdam, 1962.

দীপংকর দাশগুপ্ত

নহুষ চন্দ্রবংশীয় রাজা, পুরুরবার পৌত্র, যযাতির পিতা। সত্যবল জিতেন্দ্রিয় দস্যুদমনকারী নহুষ ধর্মভাবে পৃথিবী পালন করিতেন (মহাভারত, পুনা সংস্করণ, ১।৭০।২৩-২৮)। একবার ইন্দ্রের অনুপস্থিতিতে স্বর্গে অশান্তি দেখা দিলে দেবগণ ও ঋষিগণ পুণ্যবান তেজস্বী নহুষকে স্বর্গাধিপতি করেন। ইন্দ্রত্বলাভে প্রমত্ত নহুষ শচীকে উপভোগ করিবার কামনায় শচীর নিকট উপস্থিত হন। ইন্দ্রের পরামর্শে শচী ঋষিবাহিত যানে নহুষকে তাঁহার নিকট আসিতে বলেন। ইহার ফলে ঋষিগণের অবমাননায় অতীব রুষ্ট অগস্ত্য মুনি শিবিকাবহনকালে নিজেও নহুষের পাদস্পৃষ্ট হওয়ায় রাজাকে সর্পাবস্থায় ভূমিতে পতিত হইবার অভিশাপ দেন (মহাভারত, ১২।৩২৯।২৯-৩৮)। দ্বৈতবনে অবস্থানকালে যুধিষ্ঠিরের সহিত সর্পরূপী নহুষের সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনা হয়, ফলে নহুষ শাপমুক্ত হইয়া দিব্যদেহে স্বর্গে গমন করেন (মহাভারত, ৩।১৭৫-১৭৮)। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও (৪।৫৯-৬০) ঐশ্বর্যগর্বিত নহুষের সর্পত্ব-প্রাপ্তির বিবরণ পাওয়া যায়। যযাতি কর্তৃক নরমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে নহুষের প্রেতত্ব মোচনের কাহিনী বাংলা দেশে প্রসিদ্ধ ছিল।

যূথিকা ঘোষ

নাইট্রোজেন বায়ু দ্র

নাইলন রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত কৃত্রিম তন্তুবিশেষ। ইহা সর্বপ্রথম তৈয়ারি করা হয় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। উচ্চ

চাপ ও তাপে অ্যাডিপিক অ্যাসিড এবং হেক্সামেথিলিন ডাই-অ্যামাইন নামক দুইটি রাসায়নিক পদার্থের বহু অণু পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নাইলনের অতিকায় অণুর সৃষ্টি করে। নাইলন রেশমের মত চাকচিক্যপূর্ণ, কিন্তু তদপেক্ষা বহুলাংশে দৃঢ়, ঘাতসহ, স্থিতিস্থাপক ও টেকসই। পরিধেয় বস্ত্র, প্যারাসুট, দড়ি, বুরুশ প্রভৃতি উৎপাদনে নাইলনের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানী ক্যারোথারস নাইলনের আবিষ্কর্তা। অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও হেক্সামেথিলিন ডাই-অ্যামাইন-এর বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট নাইলনকে টানিলে সূক্ষ্ম তন্তুর উদ্ভব হয়। তন্তু প্রস্তুত করিতে নাইলনকে বিদ্যুতের সাহায্যে গলাইয়া বহুছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রের ছিদ্রপথে বাহির করিলে উহা ঠাণ্ডায় জমিয়া বহু সূক্ষ্ম তন্তুর আকার প্রাপ্ত হয়। পরে রোলারের সাহায্যে টানিয়া পাক দিলে সুসম, মসৃণ, চিক্কণ ও স্বচ্ছ সুতা উৎপন্ন হয়। প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছভাব দূর করা, রং ফলানো বা কুঞ্চিত করা হয়।

নাইলনের কাপড় তুলার কাপড় অপেক্ষা হালকা (আপেক্ষিক গুরুত্ব- ১.১৪)। ইহা অল্পমাত্রায় (৩.৬%) জল ধারণ করে, অল্প সময়ে শুখায়, সহজে ভাঁজ হয় না, ঘর্ষণ সহ্য করে, জলে পচিয়া যায় না এবং ২৬৩° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গলিতে থাকে। নাইলনের কাপড়ে ইস্ত্রি করিতে হয় না। ইহা খুব শক্ত, অথচ টানিয়া ছাড়িয়া দিলে পূর্ব আকারে ফিরিয়া আসে। ইহা বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না।

শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাগপঞ্চমী শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী। এইদিন সর্পভয় নিবারণের জন্য মনসা দেবী ও নাগসমূহের (অনন্ত, বাসুকি, শঙ্খ, পদ্ম প্রভৃতি) পূজা প্রশস্ত। এই সময় দেবী সিজ বা মনসা গাছকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাই উঠানে সিজ গাছ পুঁতিয়া তাহার উপর পূজার বিধান। পোঁতা সিজের বা ঘরের দরজার দুইপাশে গোবর দিয়া সাপের মূর্তি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে। কোথাও কোথাও সাপের মূর্তি আঁকা বা মাটি দিয়া তৈয়ারি করা হয়। নাগপঞ্চমীর দিন ঘরে নিমপাতা খাইতে ও ব্রাহ্মণকে খাওয়াইতে হয়। ভারতের নানা অংশে এই সময় নানাভাবে নাগপূজার প্রচলন আছে। অনেক স্থলে শুক্লা পঞ্চমীতে এই অনুষ্ঠান হয়। অনন্তদেবের 'স্মৃতিকৌস্তুভ'-এ বলা হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যে অগ্রহায়ণের শুক্লা পঞ্চমীতে নাগপূজা প্রসিদ্ধ।

দ্র গোবিন্দানন্দ, বর্ষক্রিয়াকৌমুদী ; রঘুনন্দন, তিথিতত্ত্ব, কৃত্যতত্ত্ব ; রুদ্রধর, বর্ষকৃত্য ; অনন্তদেব, স্মৃতিকৌস্তুভ ; কমলাকর, নির্ণয়সিন্ধু ; P. V. Kane, *History of the Dharma Shastras*, vol. V, Part I, Poona, 1958.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

নাগপুর মহারাষ্ট্রের একটি জেলা, তালুক ও শহর। জেলাটি ২০°৩৫´ উত্তর হইতে ২১°৪৪´ উত্তর ও ৭৮°১৫´ পূর্ব হইতে ৭৯°৪০´ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। জেলাটির উত্তরে ছিন্দওয়ারা ও সেওনি জেলা, পূর্বে ভাণ্ডারা, উত্তরপশ্চিমে অমরাবতী, দক্ষিণ ও পশ্চিমে চান্দা ও ওয়ার্ধা জেলা।

নাগপুর পর্বত-অধ্যুষিত অঞ্চল। পর্বতগুলির উচ্চতা বেশি নহে ; সর্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গটির উচ্চতা ৬১০ মিটার (২০০০ ফুট)। উত্তরে সাতপুরা পর্বতের একটি অংশ বিদ্যমান। ইহারই ঠিক দক্ষিণে অম্বাগড় পর্বত অবস্থিত, উহারই শীর্ষে প্রসিদ্ধ রামটেকের মন্দির। নাগপুর শহরের নিকট বিখ্যাত সিতাবল্‌দি পাহাড়। নাগপুর জেলা সাধারণতঃ বালিপাথর দ্বারা গঠিত ; মধ্যে মধ্যে কাদাপাথর ও চুনাপাথর দেখা যায়। পশ্চিমদিকে বেলেপাথর ব্যাসল্ট দ্বারা আবৃত ; এইদিকে গ্র্যানিট শিলাও দেখা যায়।

নাগপুরের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ অত্যন্ত বেশি হয়। এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ উত্তাপ প্রায় ৪৭° সেন্টিগ্রেড (১১৬° ফারেনহাইট) ও শীতকালে গড় উত্তাপ প্রায় ৩২° সেন্টিগ্রেড (৯০° ফারেনহাইট) হয়।

নাগপুর জেলা মধ্যযুগে গোণ্ডরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মারাঠা অভ্যুদয়ের সময় ইহা ভোঁসলাদের অধিকারে আসে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ ইংরেজদের নিকট পরাজিত ও সিতাবল্‌দিতে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে এই অঞ্চল ইংরেজগণের দ্বারা অধিকৃত হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য প্রদেশ গঠিত হইবার পর ইহা ঐ প্রদেশের অন্তর্গত হয়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর রাজ্য-পুনর্গঠন আইন অনুসারে ইহা বর্তমানে মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে।

জেলার আয়তন ৯৬০৫ বর্গ কিলোমিটার (৩৮৪২ বর্গ মাইল)। জনসংখ্যা (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ) ১৫১২৮০৭ জন।

এই জেলায় বনজ সম্পদ প্রচুর রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সেগুন প্রধান। চন্দনকাঠও পাওয়া যায়। এই বনজ সম্পদের উপর ভিত্তি করিয়া নাগপুর শহরের অনতি-

দূরে নেপানগরের কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ-শিল্পের একটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

নাগপুর জেলায় কৃষির উন্নতি হইয়াছে। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশি ; তথাপি পুষ্করিণী ও কূপ দ্বারা সেচকার্য হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য ইক্ষু, ধান, যব, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি। এখানের কমলালেবুর খ্যাতি আছে ও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রপ্তানি করা হয়। আর্থিক ফসল হিসাবে তুলা প্রধান। এখানে মধ্যম আঁশযুক্ত তুলার চাষ হয়। বাদামতৈলের জন্য প্রচুর চীনাবাদামের চাষ হয়।

জেলার প্রধান শহর নাগপুর। ইহা নাগপুর জেলা ও তহশীলের প্রধান কার্যালয়। ইহার অবস্থান ২১°৯´উত্তর ও ৭৯°৭´ পূর্ব। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা এই শহর কলিকাতার সহিত ও মধ্য রেলপথ দ্বারা বোম্বাইয়ের সহিত যুক্ত।

নাগ নামক একটি ছোট নদীর উপর অবস্থিত বলিয়া এই শহরের নাম নাগপুর। ইহার অবস্থান একটি সমভূমির উপর। এই সমভূমির ঢাল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। উত্তর ও পশ্চিম দিকে ছোট ছোট ব্যাসল্ট পাথরের পাহাড় বা টিলার দ্বারা নাগপুর শহর বেষ্টিত। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে পৌর-সংস্থা স্থাপিত হয়। বর্তমানে নাগপুর ভারতবর্ষের একটি প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য -কেন্দ্র। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী নাগপুর শহরের জনসংখ্যা ছিল ৬৪৩৬৫৯। শিল্পকেন্দ্র হিসাবে নাগপুর বর্তমানে ভারতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। নাগপুরের প্রধান শিল্প হইল বস্ত্রশিল্প। নাগপুরে ফলসংরক্ষণশিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ্য দেওয়ায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রচুর উন্নতি হইয়াছে।

কৃষ্টি ও শিক্ষার দিক দিয়া নাগপুর সমৃদ্ধিশালী। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। সিতাবল্‌দি দুর্গ উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XVIII, Oxford, 1909.

লীনা চট্টোপাধ্যায়

নাগপুরিয়া ইহার নামান্তর ‘সদান’। বিহারের আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা ‘ভোজপুরী’-র একটি উপভাষা। ছোটনাগপুর অঞ্চলের নামানুসারে ইহার এই নামকরণ। রাঁচি ও পালামৌ -এর অনেকাংশে এবং যশপুরের একাংশে এই উপভাষা প্রচলিত। প্রধান বা স্ট্যাণ্ডার্ড ভোজপুরীর সহিত ইহার পার্থক্যের মূলে আছে বিহারের মগহী ও পূর্বী হিন্দীর অন্তর্গত ছত্তিশগঢ়ী ভাষার প্রভাব।

দ্র G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. V, Delhi, 1967.

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

নাগরকয়েল মাদ্রাজের একটি শহর। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কন্যাকুমারী জেলার দক্ষিণতম তালুক অগস্তীশ্বরম্‌-এ অবস্থিত (অক্ষাংশ ৮°১০′ উত্তর ; দ্রাঘিমা ৭৭°২৭′ পূর্ব)। ইহা ভারতের দক্ষিণতম প্রথম শ্রেণীর শহর। অতীতে কোনও এক সময় ইহা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ছিল। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের (১৯৫৬ খ্রী) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই শহরটি বর্তমানে মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কন্যাকুমারী জেলার ও অগস্তীশ্বরম্‌ তালুকের সদর কার্যালয় এই শহরে অবস্থিত।

মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রায় ৩০ মিটার (১০০ ফিট) উচ্চে পালায়ার নদীর পশ্চিমতীরে ইহা অবস্থিত। ইহার উত্তরে, উত্তরপশ্চিমে, পূর্বে আসিয়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালা শেষ হইয়াছে ; পশ্চিমে এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি। প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রশস্ত আরামবলী গিরিপথটি এই শহরের প্রায় ১১ কিলোমিটার (৭ মাইল) উত্তরপূর্বে অবস্থিত। বর্তমানে ইহার লোকসংখ্যা ১০৬২০৭ জন (১৯৬১ খ্রী) ; আয়তন প্রায় ১১ বর্গ কিলোমিটার (৮·৪০ বর্গ মাইল)। এই শহরে পৌরসভা আছে ; বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও জল-সরবরাহের ব্যবস্থাও রহিয়াছে।

এই শহরের মন্দিরগুলির মধ্যে নাগরাজের মন্দির ও কৃষ্ণের মন্দির দুইটি উল্লেখযোগ্য। নাগরকোভিল (নাগ-দেবতার মন্দির) হইতেই নাগরকয়েল নামের উৎপত্তি। একটি শিলালিপি (১৫২১ খ্রী) হইতে জানা যায় যে, পূর্বে এই মন্দিরটি জৈন-মন্দির ছিল। মণ্ডপের স্তম্ভের উপরে মহাবীর ও পার্শ্বনাথের মূর্তিসমূহও ইহাই প্রমাণ করে। নাগেশ্বর ও কৃষ্ণের মন্দিরদ্বয় যথাক্রমে শহরের পূর্ব ও উত্তরদিকে অবস্থিত।

শহরটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। শহরের উত্তরপূর্বদিকে অবস্থিত ভাডাসেরি ও পূর্বদিকে অবস্থিত কোট্টার অঞ্চলদ্বয় প্রাচীনকাল হইতেই বাণিজ্য ও কুটিরশিল্পের কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত। টলেমি (২য় শতাব্দী) কোট্টার অঞ্চলটিকে একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। রাজরাজ চোল (৯৮৫-১০১৪ খ্রী) কোট্টার অধিকার করিয়া তথায় চোল-সাম্রাজ্যের দক্ষিণতম সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহা একটি শিল্পপ্রধান শহর। বস্ত্রবয়নশিল্প, তৈল-কল, যানসম্পর্কিত শিল্প ও মুদ্রণ প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য। কুটিরশিল্পজাত সামগ্রীর মধ্যে লেস, তোয়ালে ও অন্যান্য তাঁতবস্ত্র, পিতল ও ব্রঞ্জের তৈয়ারি মূর্তি ও পাত্রসমূহ বহু দূরদেশেও প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

ত্রিবান্দ্রম হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত জাতীয় সড়কের উত্তরদিকে নাগরকয়েল অবস্থিত। কন্যাকুমারী জেলায় কোনও রেলপথ নাই। ত্রিবান্দ্রম, তিরুনেলভেলী ও পালায়ানকোট্টা পর্যন্ত রেলপথ রহিয়াছে। পথসংযোগ উন্নত হওয়ায় বাসে করিয়া নিকটবর্তী শহরগুলিতে যাতায়াত করা যায়। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বহুলোকের এখানে সমাগম হইয়া থাকে। ইহার নিকটেই রহিয়াছে নাগরকয়েল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণাগার (স্যাংচুয়ারি)। ভারত মহাসাগর, মুনিকোটা হ্রদ, পদ্মনাভপুর, উদয়গিরি, সুচিন্দ্রম, কন্যাকুমারী, কোলাচল, মুট্টামতুরা, কোডায়াম হ্রদ প্রভৃতি নাগরকয়েলের নিকটবর্তী দ্রষ্টব্যস্থান।

দ্র U. Sivavaman Nair, *Census of India 1951 : Travancore-Cochin, District Census Handbooks : Trivandrum*, Trivandrum, 1952.

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

নাগরী ব্রাহ্মীলিপি হইতে উদ্ভূত এবং উত্তর ভারতে ও মধ্যদেশে প্রচলিত লিপি। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম হইতে এই লিপিতে সংস্কৃত গ্রন্থের মুদ্রণ শুরু হয়। এখন ইহা সংস্কৃত ভাষার প্রধান লিপিরূপে (অনেক স্থানে একমাত্র) প্রচলিত। নামটি আসিয়াছে 'নাগরী-লিপি' অর্থাৎ নগর অক্ষর হইতে; অর্থ নাগরজনের, নগরবাসীর, পণ্ডিত ও শিষ্টব্যক্তির ব্যবহৃত ভাষা। সাধারণজনের, করণিক, ব্যবসাদার ও অল্পশিক্ষিত ব্যক্তির হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রাচিহ্নহীন অক্ষরের নাম ছিল 'কায়থী' অর্থাৎ কায়স্থ-লিপি। সংস্কৃতের বাহন এবং সংস্কৃত দেবভাষা— এই সূত্রে 'দেব' শব্দ যুক্ত হইয়া এখন লিপিটি 'দেবনাগরী' নামেই সমধিক পরিচিত।

সুকুমার সেন

নাগরীপ্রচারিণী সভা হিন্দী ভাষার উৎকর্ষসাধন ও প্রচারের বিশিষ্ট সংস্থা। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দী ভাষণে দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনটি ছাত্রের উৎসাহে বারাণসীতে ইহার জন্ম। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই সংস্থা পুথিসংগ্রহে যত্নশীল হয়। সংস্থার বিবরণী হইতে জানা যায়, ধর্ম, সম্প্রদায় ও রাজনীতি -নিরপেক্ষ ভাবে ইহা বিভিন্ন বিষয়ে ছয়শতাধিক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে ও ১০ হাজারের অধিক পুথি সংগ্রহ করিয়াছে। সংস্থার দাবি এই যে, দ্রুতলিপির (শর্টহ্যাণ্ড) নির্মাণ ও প্রশিক্ষণের প্রারম্ভ এই সভা হইতেই হইয়াছে। বর্তমানে হিন্দীর সুষ্ঠু প্রচারের জন্য সংস্থা কয়েকটি বিভাগের মাধ্যমে সচেষ্ট আছে : ১. প্রকাশিত হিন্দী পুস্তকের একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ২. কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা ৩. দ্রুতলিপি বিদ্যালয়; ৪. মুদ্রণ যন্ত্রাগার। ইহা ছাড়া এখানে কয়েকজন বিশিষ্ট কবির হস্তাক্ষরসংগ্রহ প্রদর্শনার্থে রক্ষিত আছে; মধ্যে মধ্যে সাহিত্যসম্মেলন ও পুরস্কারাদি দ্বারাও হিন্দীচর্চায় প্রোৎসাহ দেওয়া হয়। হিন্দী 'বিশ্বকোষ' এই সংস্থা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ১০ খণ্ডে পরিকল্পিত এই গ্রন্থের ৭ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৬৭ খ্রী)। মুদ্রিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'হিন্দী শব্দসাগর', 'হিন্দী বৈজ্ঞানিক পদাবলী', 'হিন্দী ব্যাকরণ', 'পৃথ্বিরাজ রাঁসো', 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস', 'তুলসী গ্রন্থাবলী', 'সুরসাগর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্র নাগরী দৈনন্দিনী, কাশী, ১৯৬৭ খ্রী।

রাধামাধব তর্কতীর্থ

নাগা মণিপুরের উত্তরে এবং আসামের দক্ষিণপূর্ব কোণে নাগাদের বাসভূমি। মণিপুরের উত্তরাঞ্চলে এবং ব্রহ্মদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও নাগা জাতি বাস করে। এই অঞ্চলে যে ১৫-১৬টি খণ্ডজাতি বাস করে আসাম বা মণিপুরের সাধারণ অধিবাসীগণ তাহাদিগকে সাধারণভাবে নাগা নামে অভিহিত করে। নাগা শব্দ 'নগ্ন' অথবা 'নাগ' শব্দ হইতে উৎপন্ন কিনা তাহা স্থিরভাবে বলা চলে না, কিন্তু ইহা পূর্বে ঘৃণাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হইত। যেসকল খণ্ডজাতি অপরের দ্বারা নাগা নামে অভিহিত হইত, তাহাদের কয়েকটির নাম প্রদত্ত হইল—অঙ্গামি, আও, সেমা, রেঙমা, লোহতা, সাংটাম, চাং, ইমচংগ্র, টাংকুল, জেমি, লিয়াঙসাই, কোইয়াঁক, চাখেসাং, কাবুঈ প্রভৃতি। ইহাদের প্রত্যেকের ভাষায় বৈশিষ্ট্য আছে; পরস্পরের ভাষা ইহারা বুঝিতেও পারে না। কোনও কোনও খণ্ডজাতির ভাষা বা সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য কম। সেইজন্য আজকাল দুই-তিনটি খণ্ডজাতির নাম সমাসবদ্ধ করিয়া উহারা নিজেদের নাম তৈয়ারি করিয়া লইতেছে, যথা জেমি ও লিয়াঙসাই মিলিয়া জেলিয়াং নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

ইহাদের অধিকাংশই জুম চাষ করিয়া থাকে ('কৃষি' দ্র)। তবে যেখানে জনসংখ্যা বেশি সেখানে পাহাড়ের

গায়ে ধাপ কাটিয়া সেচের দ্বারা উন্নত চাষের প্রচলন আছে। নাগা জাতিবৃন্দের মধ্যে শতকরা ৯৪ জন কৃষি-কার্যের উপরে নির্ভরশীল।

নাগাদের গ্রাম পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। কুটিরগুলি ঘনভাবে বিন্যস্ত এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য চারিদিকে কাঠের বেড়ার দ্বারা আবৃত থাকে। পানীয় জল বা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য গ্রামবাসীকে অনেক দূর পর্যন্ত যাইতে হয়। নাগা গ্রামে প্রত্যহ স্ত্রীলোক বা অল্পবয়স্ক যুবক-যুবতীদের বাঁশের চোঙ্গায় ভরিয়া দূর হইতে জল আনিতে দেখা যায়। চালই নাগাদের প্রধান খাদ্য, কিন্তু নানাবিধ ক্ষুদ্র শস্য ও তরিতরকারিও জুমের ক্ষেতে হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গড়গড় অথবা জোব্‌স্ টিয়ার্স (*Coix Lachryma-Jobi*) প্রধান। আজকাল শহরের কাছে আলুর চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নাগা-গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের মরাই গ্রামের একপ্রান্তে একত্র সন্নিবেশিত হয়। আগুনের ভয় নিবারণের জন্য এরূপ ব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। জীবজন্তুর মধ্যে শূকর, মিথান (একপ্রকার অর্ধবন্য গো-জাতীয় প্রাণী) এবং কুকুর ও মুরগি পোষার প্রচলন আছে। শূকর ও গোরুর মাংস ছাড়া বলি-দেওয়া কুকুরের মাংসও খাওয়া হইয়া থাকে। পানীয়ের মধ্যে পচাই প্রধান।

নাগাদের পোশাকপরিচ্ছদে জাতিতে জাতিতে যথেষ্ট ভেদ আছে। কোইয়াঁকদের কোনও কোনও শাখা আদৌ কাপড় পরে না। আবার আও বা অঙ্গামিদের মধ্যে তাঁতে বোনা সুন্দর চাদর ও ছোট কাপড় পরার প্রচলন আছে। রং-এর মধ্যে লাল, নীল, কালো রংই ইহারা পছন্দ করে। প্রতি জাতির মধ্যে চাদরের রং-এ বা রং-এর সংযোজনে তারতম্য আছে। মেয়েরা ছোট তাঁতে নিজেরাই কাপড় বা চাদর বুনিয়া লয়। নাগাদের বাঁশের কাজও খুব মিহি।

গ্রামের শাসন 'গাঁওবুড়া'-র হাতেই পূর্বে ন্যস্ত থাকিত। প্রতি গ্রামে যুবকদের জন্য স্বতন্ত্র একটি বাসগৃহ থাকে, তাহাকে 'মোরাং' বলে। ইহা শুধু যুবকদের মিলনস্থান নয়, ইহাকে গ্রামের মন্দির এবং অতিথিশালাও বলা চলে। মোরাং-এর স্তম্ভে বা প্রবেশদ্বারে কারুকার্য করা হয়।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নাগা খণ্ডজাতিবৃন্দ ইংরেজ-শাসনের অধীন হয়। শাসনকার্য সুচারুভাবে চালাইবার জন্য 'দোভাষী' বা 'পলিটিক্যাল ইন্টারপ্রেটার' নামে একজন কর্মচারী নিযুক্ত হয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হইতে 'এরিয়া', 'ভিলেজ', 'রিজিওন্যাল' ও 'ডিষ্ট্রিক্ট' কাউন্সিল স্থাপিত হইয়াছে। তাহার সদস্যগণ স্থানীয় লোকাচার অনুসারে নানাবিধ বিরোধের মীমাংসা করেন অথবা সরকারকে উন্নয়নকার্যে নানাবিধ পরামর্শ দিয়া থাকেন। তথাপি গ্রামে আজও গাঁওবুড়া এবং দো-ভাষীদের ক্ষমতা অল্প আছে। সাধারণ লোক বিরোধ-মীমাংসার জন্য তাহাদেরই কাছে গিয়া থাকে।

নাগা জাতিবৃন্দের মধ্যে অর্ধেকের কম লোক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত এবং অনেকাংশে পশ্চিমী ভাবাপন্ন। অর্ধেকের বেশি লোক জাতীয় লোকাচার পালন করিয়া থাকে। কাবুঈ বা জেলিয়াংদের মধ্যে কিছু লোক হিন্দু ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত।

এদেশে পথঘাটের বিস্তার হওয়ার ফলে পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষিত জনের মধ্যে ইংরেজী চলিলেও জনসাধারণের মধ্যে ভাঙ্গা অসমীয়ার চলন আছে। ইহার সহিত হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজী কিছু কিছু শব্দ মিশিয়া একটি ভাষা উত্তরোত্তর বেশি পরিমাণে চালু হইতেছে, তাহার নূতন নাম হইল 'নাগামীজ'।

পূর্বে বলা হইয়াছে, বাহিরের লোকে যাহাদের নাগা বলিয়া থাকে তাহারা বহু খণ্ডজাতিতে বিভক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই অঞ্চল কিছুদিন জাপানের অধিকার-ভুক্ত ছিল। তখন নেতাজী-প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ এতদঞ্চলে কর্মতৎপর ছিল ('আজাদ হিন্দ ফৌজ' দ্র)। তখন খণ্ডজাতীয় ফিজো জাতীয়তার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হন এবং বিভিন্ন খণ্ডজাতিকে সংঘবদ্ধ করিয়া অখণ্ড নাগা জাতি গঠন করিবার চেষ্টা করেন। সেই জাতীয়তাবোধের বৃদ্ধির সহিত নাগা শব্দ ঘৃণার্থে ব্যবহৃত না হইয়া নূতন এক অর্থে সমৃদ্ধ হইয়াছে। 'নাগাল্যাণ্ড' দ্র।

নির্মলকুমার বসু

নাগার্জুন মহাযানের দুইটি প্রধান শাখা মাধ্যমিক ও যোগাচার। মাধ্যমিকের প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠাতারূপে আচার্য নাগার্জুন বিখ্যাত। হিউএন্-ৎসাঙ লিখিয়াছেন, অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, আর্যদেব এবং কুমারলাত সমসাময়িক ছিলেন। কল্হণ ও তারনাথ তাঁহাকে কণিষ্কের সমসাময়িক বলিয়াছেন। সমস্ত সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণ বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, আচার্য নাগার্জুন খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন বিদর্ভের অধিবাসী এবং অন্ধ্রদেশের রাজা শাতবাহনের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

চীনা ভাষায় প্রাপ্ত আচার্য নাগার্জুনের জীবনী হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত এবং

ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে পারংগম ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবার পর ইনি বিশেষ নিষ্ঠার সহিত দাক্ষিণাত্যে তথাগতের বাণী প্রচার করেন। নাগার্জুন যে কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন তাহাই নহে। জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতিতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং জাদুবিদ্যায় নাকি তাঁহার খ্যাতি সুদূরবিস্তৃত ছিল। নাগার্জুন নামটিকে ঘিরিয়া বহু প্রবাদ বহু উপকথা প্রচলিত রহিয়াছে। এইগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে হয় যে নাগার্জুন নামে অন্ততঃ চার ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বর্তমান ছিলেন। একজন হইলেন দার্শনিক নাগার্জুন, একজন তন্ত্রশাস্ত্ররচয়িতা, একজন চিকিৎসাশাস্ত্রকর্তা ও আর একজন রসায়নশাস্ত্রবিদ্।

দার্শনিক নাগার্জুন তাঁহার মাধ্যমিক দর্শনের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল 'মাধ্যমিক-কারিকা'। ৪০০ কারিকার মাধ্যমে ইনি মহাযান সূত্রের শূন্যবাদ এই গ্রন্থে বিবৃত ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ২৭ পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই অমূল্য গ্রন্থের 'অকুতোভয়া' শীর্ষক একটি টীকাও তিনি রচনা করেন। এই টীকাটি মূল সংস্কৃতে না পাওয়া গেলেও ইহার তিব্বতী অনুবাদ বর্তমান। চন্দ্রকীর্তি-রচিত 'প্রসন্নপদা' মূল সংস্কৃতে প্রাপ্ত এই গ্রন্থের একমাত্র টীকা। আচার্য নাগার্জুনের দার্শনিক মতের মূলসূত্র হইল শূন্যতা। এই দার্শনিক মত স্থাপন করিতে গিয়া ইনি ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারধারা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার মতে অস্তি নাস্তি, নিত্য অনিত্য, আত্মা অনাত্মা, কোনও অন্তিম বাক্যকেই সত্য বলা যায় না। 'অস্তি' বলিলে বস্তুকে শাশ্বত স্বীকার করা হয়, 'নাস্তি' বলিলে উচ্ছেদবাদকে সমর্থন করা হয়। কিন্তু বুদ্ধবচনের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিলে ইহার কোনওটিই স্বীকার করা চলে না। বুদ্ধের তত্ত্ব শাশ্বতোচ্ছেদনির্মুক্ত। 'যুক্তিষষ্টিকা' ও 'শূন্যতাসপ্ততি' নামে দুইটি ক্ষুদ্র গ্রন্থেও নাগার্জুন এই শূন্যবাদের আলোচনা করিয়াছেন। দার্শনিক তত্ত্বকথা আলোচিত না হইলেও 'সুহৃল্লেখ' তাঁহার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। চীনাপরিব্রাজক ঈ-ৎসিঙ এই গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে সেই সময়ে ভারতবর্ষে এই গ্রন্থটির বহুল প্রচার ছিল। সুহৃৎ রাজা শাতবাহনকে সদুপদেশ দিবার জন্যই আচার্য নাগার্জুন এই গ্রন্থটি রচনা করেন। 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রশাস্ত্র', 'দশভূমিবিভাষাশাস্ত্র', 'বিগ্রহব্যবর্তনী', 'মহাযানবিংশক' প্রভৃতি গ্রন্থেও নাগার্জুন তাঁহার দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাগার্জুনকোণ্ডা ১৬°৩১´ উত্তর এবং ৭৯°১৪´ পূর্ব। অন্ধ্র প্রদেশের গুণ্টূর জেলার পালনাদ তালুকের অন্তর্গত একটি পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশস্থ প্রশস্ত উপত্যকাটিও এই নামে পরিচিত ছিল। মাচের্লা রেলস্টেশন হইতে উপত্যকাটির দূরত্ব ছিল প্রায় ২২ কিলোমিটার (১৪ মাইল)। কয়েক বৎসর পূর্বে জলসেচ পরিকল্পনায় কৃষ্ণা নদীর বক্ষে বাঁধ দেওয়া উপত্যকাটি একটি বিরাট জলাধারে এবং নাগার্জুনকোণ্ডা পাহাড়টি একটি দ্বীপে পর্যবসিত। মাচের্লা হইতে বাসে নাগার্জুন সাগর বাঁধের দক্ষিণতীরে গমন করিয়া লঞ্চের সাহায্যে নাগার্জুনকোণ্ডা পাহাড়ে যাইতে হয়।

প্রত্নকীর্তিসমৃদ্ধ নাগার্জুনকোণ্ডা উপত্যকাটি (আয়তন ২৩ বর্গকিলোমিটার) বহির্জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। ইহার তিনদিকে দুর্ভেদ্য গিরিশ্রেণী এবং চতুর্থদিকে কৃষ্ণা নদী। প্রাকৃতিক দুর্ভেদ্য অবস্থানের জন্য প্রাচীনকালে ইহা রাজধানী বিজয়পুরের (বিজয়পুরীর) স্থলরূপে নির্বাচিত হইয়াছিল।

নাগার্জুন সাগরের গভীরে চিরনিমজ্জনের হস্ত হইতে প্রত্নবস্তু ও প্রত্নকীর্তি রক্ষাকল্পে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উপত্যকাটিতে খননকার্য পরিচালনা করিয়া শতাধিক প্রত্নস্থল উৎঘাটন করা হইয়াছে। ইহার পূর্বেও ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানের বিভিন্ন অংশে ইতস্ততঃ খনন করিয়া অনেকগুলি বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত করা হইয়াছিল।

তেলুগুতে 'কোণ্ড'-এর অর্থ পাহাড়। তিব্বতীয় কাহিনী নির্ভরতায় অনেকের অনুমান খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের প্রখ্যাত বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুনের নামে এই স্থানের নামকরণ। তবে এই বিশিষ্ট আচার্যের সহিত এস্থলের সংযোগ প্রত্নতত্ত্বীয় আবিষ্কারের দ্বারা অদ্যাপি অসমর্থিত। ৩য়-৪র্থ শতকের লেখে উপত্যকাটির নাম বিজয়পুর বা বিজয়পুরী।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে নাগার্জুনকোণ্ডা উপত্যকাটি অধ্যুষিত। প্রচুর পরিমাণে প্রত্নাশ্মীয় (প্যালিওলিথিক), ক্ষুদ্রাশ্মীয় (মাইক্রোলিথিক) ও নবাশ্মীয় (নিওলিথিক) আয়ুধ, হাতিয়ার ও মৃৎপাত্র এখানে পাওয়া গিয়াছে।

নাগার্জুনকোণ্ডার লিখিত ইতিহাসের শুরু শাতবাহন রাজবংশের রাজত্বকালের শেষ আমলে। এই বংশের গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি, পুলুমাবি ও যজ্ঞ শাতকর্ণির মুদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত যে এই যুগেই হয় তাহার প্রমাণ গৌতমীপুত্র বিজয় শাতকর্ণির একটি স্তম্ভলেখ।

নাগার্জুনকোণ্ডার চরম সমৃদ্ধির যুগ ইক্ষ্বাকু রাজবংশের

রাজত্বকালে (খ্রীষ্টীয় ৩য়-৪র্থ শতক)। এই যুগের বহু লেখ এইস্থলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইক্ষ্বাকু-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাসিষ্ঠীপুত্র চান্তমূল শাতবাহন সাম্রাজ্যের এই অংশ দখল করিয়া বিজয়পুরীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই নৃপতির পুত্র মাঠরীপুত্র বীরপুরুষদত্ত, তৎপুত্র বাসিষ্ঠীপুত্র ইহুভূল চান্তমূল এবং শেষোক্ত জনের পুত্র রুদ্রপুরুষদত্তের রাজত্বকাল নাগার্জুনকোণ্ডার স্বর্ণযুগ। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি না থাকিলেও শত শত সৌধের ধ্বংসাবলী হইতে স্বতঃই ধারণা হয় যে এই রাজবংশের রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ই শান্তিময় ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মী হইলেও ইক্ষ্বাকু নৃপতিদের গোঁড়ামি ছিল না। তাই একদিকে বিষ্ণু, শিব, কার্তিকেয় প্রভৃতি হিন্দু দেবতার মন্দির, অন্যদিকে অতি সমৃদ্ধিশালী বৌদ্ধ সৌধরাজি পাওয়া যায়। সর্বদেবতাদের উদ্দেশে নির্মিত প্রাসাদোপম একটি মন্দির ইহুভূল চান্তমূলের রাজত্বে এখানে নির্মিত হইয়াছিল। তিরিশের অধিক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ এই উপত্যকার বিভিন্ন অংশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুদূর সিংহল হইতেও শ্রমণেরা এই স্থলে আসিতেন। বহির্দেশের তীর্থযাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস চৈত্যগৃহও গড়িয়া ওঠে। সৌধসংখ্যাও যেমন অনেক, তেমনি কারুকার্যখচিত সুন্দর প্রস্তরফলকও বিস্তর পাওয়া গিয়াছে। এই বৌদ্ধ সৌধাবলীর ধ্বংসাবশেষের জন্যই নাগার্জুনকোণ্ডা জগৎবিখ্যাত।

খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের প্রথমার্ধে ইক্ষ্বাকুদের পতনের অব্যবহিত পরেই যে অতি আকস্মিক ভাবেই এই স্থলের সৃজনশীল কার্যকলাপে ভাঁটা পড়ে তাহা বুঝিতে পারা যায় প্রত্নকীর্তি ও প্রত্নবস্তুর অভাবে। অনুমান করা হয়, পল্লব রাজবংশের উত্থানেই ইক্ষ্বাকুদের পতন ঘটে এবং রাজধানী বিজয়পুরী নগণ্য স্থানে পর্যবসিত হয়। ইহার কয়েক শতাব্দী পরে চালুক্য রাজবংশের আধিপত্যের সময়ে এখানে কয়েকটি অতি সাধারণ ইটের মন্দির নির্মিত হয়। চালুক্যযুগে কৃষ্ণার অপর পারে ইয়েল্লেশ্বরম খানিকটা প্রতিপত্তি লাভ করে এবং এই স্থানটি শৈব তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকে কোণ্ডাবীড়ুর রেড্ডি শাসকেরা (১৩২৮-১৪২৭ খ্রী) নাগার্জুনকোণ্ডা পাহাড়ের শীর্ষদেশ বেষ্টিত করিয়া একটি বিরাট দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গ বহুদিন গজপতিদের আয়ত্তে থাকে। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে গজপতি প্রতাপরুদ্রকে পরাজিত করিয়া বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় দুর্গটি অধিকার করেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাম রায় দুর্গটির সংস্কার সাধন করেন।

কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণতটে অন্তর্দুর্গটি বিজয়পুরীর ইক্ষ্বাকু নৃপতিদের নির্মিত। দুর্গমধ্যস্থ বসবাসের গৃহ, সৈনিকাবাস, আস্তাবল, স্নানাগার ইত্যাদি জীর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। দুর্গের বহির্ভাগে জনগণের বসবাসের গৃহাবলী ও দোকানঘরের কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। গৃহগুলি সাধারণতঃ মাটি ও অসমান পাথরে নির্মিত। অন্যান্য জাগতিক সৌধের মধ্যে একটি অদ্বিতীয় অনাচ্ছাদিত প্রেক্ষাসৌধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি আয়ত চত্বরের (১৬·৪৬ × ১৩·৭২ মিটার) চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া গ্যালারিগুলিতে প্রায় এক হাজার দর্শকের বসিবার স্থান। ইষ্টকনির্মিত গ্যালারিগুলির গাত্রদেশ প্রস্তরফলকে আচ্ছাদিত।

আমোদপ্রমোদ এবং পাশা ইত্যাদি খেলার জন্য ব্যবহৃত কতকগুলি মঞ্চের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গিয়াছে। শহরের বিভিন্ন অংশে বেশ কয়েকটি পান্থশালার নিদর্শন, বাপী, স্নানের চৌবাচ্চা, বাঁধানো পুষ্করিণী আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৃষ্ণাতটে ছিল শ্মশান এবং তৎসংলগ্ন সস্তম্ভ মণ্ডপ। এখানে ইক্ষ্বাকু আমলের সতীদাহের একটি উদ্গত চিত্র পাওয়া গিয়াছে; চিত্রের বিষয়বস্তু মই-এর উপর হইতে অগ্নিকুণ্ডে লম্ফোদ্যতা একটি স্ত্রী-মূর্তি। অপর একটি উদ্গত চিত্রে মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক নারীমূর্তি ক্ষোদিত।

প্রায় ২০টি ব্রাহ্মণ্যধর্মের মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দিরগুলি হয় দুর্গের নতুবা কৃষ্ণা নদীর তটের সমীপবর্তী। এগুলির মধ্যে অষ্টভুজস্বামী (বিষ্ণু) দেবায়তনের (আনুমানিক ২৭৮ খ্রী) বিগ্রহ ছিল দারুময়। এই দেবায়তনে দুইটি মন্দির (একটি আয়ত, অপরটি শূর্পাকার, উভয়েরই সম্মুখভাগে সস্তম্ভ মুখশালা) ও একটি ধ্বজস্তম্ভ ছিল।

শূর্পাকার পুষ্পভদ্রস্বামীর দেবকুল কৃষ্ণাতটস্থ পাথরে বাঁধানো ঘাটের সমীপবর্তী। এই মন্দিরটি বীরপুরুষদত্ত নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরটির সন্নিকটেই কার্তিকেয়র আয়ত মন্দির এবং একটি বাঁধানো পুষ্করিণী। ইহার নাতিদূরে ছিল সবদেবের প্রাসাদ। মন্দিরে স্তম্ভাবলীর গাত্রে নির্মাতা এলিগ্রীর নাম লেখা ছিল।

বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির সমৃদ্ধির সমাপ্তি ইক্ষ্বাকুদের পতনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের পরবর্তী কোনও বৌদ্ধভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। স্থাপত্যরূপরীতির বিশেষ কোনও লক্ষণীয় বিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে রহিয়াছে একটি উন্মুক্ত মুখ্য স্তূপ, একটি বা দুইটি

চৈত্যগৃহ, একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে মণ্ডপ, উক্ত প্রাঙ্গণের এক, দুই, তিন অথবা চারপার্শ্বে সারিবদ্ধ আবাসকক্ষ এবং আনুষঙ্গিক পাকঘর, ভাণ্ডার, স্নানাগার প্রভৃতি।

নদীতীর ব্যতীত উপত্যকার সমস্ত জায়গায় বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি ছড়ানো ছিল। বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বাস করিত। ইহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটিরই নাম লেখ মাধ্যমে জানা গিয়াছে, যথা অপর-মহাবিনসেলিয়, বহুশ্রুতীয়, মহীশাসক এবং মহাবিহার-বাসিন। চুলধর্মগিরিস্থ চৈত্যগৃহটি সিংহলের থেরদের একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য নির্মিত হইয়াছিল।

প্রতিষ্ঠানগুলির শতকরা ৯০ ভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণ। সংঘারাম হইতে বিচ্ছিন্ন স্তূপের সংখ্যা মাত্র ৫টি। বৃহত্তম ও প্রাচীনতম স্তূপটিকে লেখে মহাচৈত্য বলা হইয়াছে; ইহাতে বুদ্ধদেবের ধাতু পাওয়া গিয়াছে। এই স্তূপটি এবং ইহার সম্মুখস্থ শূর্পাকার চৈত্যগৃহ, ছত্রিশ স্তম্ভ-বিশিষ্ট মণ্ডপ ও মণ্ডপের তিনপার্শ্ববর্তী কক্ষাবলী বীরপুরুষ-দত্তের রাজত্বকালে তাঁহার পিতৃস্বসা ও শ্বশ্রূমাতা চান্তিসিরি অপর কতিপয় অন্তঃপুরিকার আর্থিক সহায়তায় নির্মাণ করাইয়া অপর-মহাবিনসেলিয় সম্প্রদায়কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান ছাড়া সর্বক্ষেত্রে মুখ্য স্তূপ শীর্ষভাগে। স্তূপ ও সংঘারামের অন্তর্বর্তী স্থলে কোথাও বা একটি, কোথাও বা দুইটি চৈত্যগৃহ (শেষোক্ত ক্ষেত্রে পরস্পর মুখোমুখি)। চৈত্যগৃহ সংঘারামের সন্নিকটে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংঘারামের পরিবেষ্টনীর মধ্যেই নির্মিত।

অধিকাংশ মুখ্য স্তূপের আয়ক-প্রলম্বন ছিল। আয়কের উপরকার স্তম্ভগুলির নিম্নভাগ চতুষ্কোণ এবং উপরিভাগ অষ্টকোণ। অষ্টকোণের ধারাগুলি উত্তল (কন্‌ভেক্‌স) শীর্ষদেশের কেন্দ্রস্থলে মিশিয়াছে। কয়েকটি স্তম্ভের চৌকোণা অংশে বুদ্ধমূর্তির উদ্গত চিত্র। যে দুইটি স্তূপের সহিত সিংহলীয় সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ ছিল সে দুইটি আয়কশূন্য। স্তূপগুলি ইষ্টক অথবা পাথরে নির্মিত। প্রথম শ্রেণীর স্তূপগুলি কখনও নিরেট নয় এবং তাহাদের অন্তরের নির্মাণ বিচিত্র। এই স্তূপগুলির অন্তরের নকশা চক্রাকার। চতুষ্কোণ বা বৃত্তাকার নিরেট কেন্দ্রীয় চক্রনাভি হইতে নিষ্ক্রান্ত ৪, ৬, ৮ বা ১০টি অর বেড়ের সঙ্গে মিশিয়াছে। অরগুলির মধ্যস্থ অংশ মাটি দিয়া ভরাট করা হইয়াছে। এজাতীয় নির্মাণপদ্ধতির উদ্দেশ্য ইটের ব্যয়সংকোচন। তিনটি স্তূপের নাভিকেন্দ্র স্বস্তিকের আকারে। কয়েকটি স্তূপের অন্তর পুরাপুরি প্রস্তরখণ্ডে নির্মিত। স্তূপগুলি চুনের প্রলেপে আবৃত করা হইত। চুনাপাথরের পাতলা মসৃণ ফলকে কতিপয় স্তূপ অলংকৃত ছিল। ফলকের উদ্গত চিত্রের বিষয়বস্তু ও শৈলী অমরাবতীর সর্বশেষ পর্যায়ের (খ্রীষ্টীয় ৩য়-৪র্থ শতক) অনুরূপ। উদ্গত চিত্রগুলিতে যথেষ্ট জৌলুস আছে; তবে ভাবভঙ্গীর আতিশয্য চোখে লাগে। মহাস্তূপের প্রদক্ষিণপথ ইষ্টকপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত, প্রাচীরে ৪টি প্রবেশপথ। মেধির তলে প্রশস্ত চতুষ্কোণ মঞ্চেরই প্রাধান্য এই কেন্দ্রে। মঞ্চের গাত্রদেশ অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তরফলকে আচ্ছাদিত। ফলকাচ্ছাদিত গাত্রদেশ কয়েক ক্ষেত্রে গাত্রস্তম্ভ ও ডৌলকর্মে সুশোভিত।

বেশ কয়েকটি স্তূপে শারীরিক ধাতু পাওয়া গিয়াছে। ধাতুসংরক্ষণে বিশেষ প্রযত্ন হইয়াছিল। মহাচৈত্যের অন্তরে প্রাপ্ত বুদ্ধদেবের ধাতু একটি স্বর্ণমঞ্জুষার মধ্যে ছিল। এই মঞ্জুষাটি আবার কতকগুলি স্বর্ণপুষ্প, মুক্তা, তামড়ি এবং স্ফটিকের টুকরার সহিত একটি স্তূপাকৃতি রৌপ্যাধারের মধ্যে ছিল। রৌপ্যাধারটিও আবার তিনটি স্ফটিকের বড় পুঁতি ও কর্ণভূষণসহ একটি পাত্রের মধ্যে ন্যস্ত ছিল। ধাতুসংরক্ষণের এতদপেক্ষাও অধিকতর প্রযত্নের দৃষ্টান্ত ৮ সংখ্যক স্তূপে পরিলক্ষিত হয়।

চেতিয় ঘর (চৈত্যগৃহ) নামধেয় মন্দিরগুলি (কোনওটির মধ্যে স্তূপ, আবার কোনওটির মধ্যে বুদ্ধপ্রতিমা) তিন আকারের: শূর্পাকার, বৃত্তাকার ও চতুষ্কোণ। প্রথমটির প্রচলন সর্বাধিক ছিল। ইষ্টকনির্মিত এই মন্দিরগুলিতে স্তম্ভের ব্যবহার নাই। ইহার চতুর্দিক বেষ্টনকারী মঞ্চটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শূর্পাকার। চৈত্যগৃহের একমাত্র অলংকরণ পাদভাগে একটি মোল্ডিং (শীর্ষভাগ গোলায়িত)। দেওয়ালের বহির্দেশের পাদভাগ কোথাও কোথাও প্রস্তরাচ্ছাদিত। চৈত্যগৃহের উপরিভাগ বিলুপ্ত। উদ্গত চিত্র এবং অনতিদূরবর্তী কপোতেশ্বরের মন্দির হইতে মনে হয়, ছাদ গজপৃষ্ঠাকৃতি ছিল। মেঝে কংক্রিট করা অথবা ইষ্টকে বা প্রস্তরফলকে আস্তৃত। বিগ্রহের শূর্পাকার বেদী চৈত্যগৃহের অন্তরের পশ্চাৎভাগ জুড়িয়া। অনেকগুলি চৈত্যগৃহের উপাস্যস্তূপ প্রস্তরাচ্ছাদিত এবং এই স্তূপগুলির তলভাগে পদ্মপাপড়ির অনুকৃতি ও তিনটি ক্রমহ্রাসমান মোল্ডিং। প্রধান প্রধান চৈত্যগৃহে প্রবেশের জন্য এক বা একাধিক সোপান। সোপানের দুইপার্শ্বস্থ দেওয়ালের প্রান্তটি মকরের সম্মুখভাগের অনুকৃতিতে গড়া হইয়াছে। সোপানের সম্মুখভাগে অর্ধবৃত্তাকার চন্দ্রশিলা। কয়েকটি চন্দ্রশিলা আবার ক্ষোদিত; ইহাদের মধ্যে

দুইটিতে গমনশীল জন্তুর সারি অনবদ্য। বৃত্তাকার চৈত্যগৃহ অপেক্ষাকৃত কম, চতুষ্কোণ আরও কম।

সংঘারামের পরিকল্পনা ৪ প্রকার। মণ্ডপ অথবা অঙ্গনের ১, ২, ৩ বা ৪ দিকে এক এক সারি কক্ষাবলী; তিনদিকে সারিবদ্ধ কক্ষাবলীর প্রচলন বেশি ছিল। প্রধান প্রধান সংঘারামগুলির রান্নাঘর, ভোজনকক্ষ, স্নানাগার প্রভৃতি স্বতন্ত্র ব্লকে নির্মিত হইলেও মুখ্য সৌধের সহিত দ্বারমাধ্যমে সংযুক্ত। কক্ষসমূহের প্রবেশিকার পার্শ্বদেশস্থ দেওয়ালে ঘটের উপরে দণ্ডায়মান গাত্রস্তম্ভাবলী।

কাঠের স্তম্ভবিশিষ্ট সাধারণ ধরনের মণ্ডপ এবং শিলাস্তম্ভযুক্ত সুবিন্যস্ত মণ্ডপ উভয়েরই প্রচলন ছিল। অনেক ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত শ্রেণীর মণ্ডপের উপরেই শেষোক্ত শ্রেণীর মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছে। স্তূপমঞ্চের মত মণ্ডপের নিম্নভাগের গাত্রদেশ কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রস্তরফলকে আচ্ছাদিত। সাধারণতঃ মণ্ডপের চতুর্দিক উন্মুক্ত এবং স্তম্ভাবলীই ইহার ছাদের অবলম্বন। ক্ষোদিত হউক আর না হউক, প্রস্তরের স্তম্ভরাজির নিম্নাংশ ও ঊর্ধ্বাংশ চতুষ্কোণ এবং মধ্যাংশ অষ্টকোণ। সন্ধিস্থলে চতুষ্কোণের কোণ মারিয়া গোলায়মান করা হইয়াছে। অষ্টকোণ অংশের অব্যবহিত উচ্চে ও নিম্নে কোনও কোনও স্তম্ভে পদ্মের অর্ধাংশ ক্ষোদিত; পদ্মের ঠিক নিম্নভাগেই লতাপাতা অথবা জীবজন্তুর এক সারি। গোলায়মান অংশে পদ্মের কুঁড়ি অথবা নীলপদ্মের অলংকরণ।

নাগার্জুনকোণ্ডা পাহাড়ে নির্মিত দুর্গমধ্যে তিনটি প্রস্তরের শাদামাঠা মন্দির। ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক গজপতি সর্দারের নির্মিত নাগেশ্বরলিঙ্গ মন্দিরটির শিখর ইষ্টকনির্মিত। বাকি দুইটি মন্দির বিষ্ণুর, যদিও মনে হয় পূর্বে মন্দিরের আরাধ্য দেবতা ছিলেন তীর্থংকর (দুইটি তীর্থংকরের মূর্তি এই মন্দিরদ্বয়ের প্রাঙ্গণে রহিয়াছে)। এই দুইটিরই অধিষ্ঠান ডৌলকর্মে শোভিত। ইহাদের মধ্যে একটি খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকে নির্মিত। প্রত্যেকটি মন্দিরের গর্ভগৃহের সম্মুখে অন্তরাল।

দ্র D. C. Sircar, *The Successors of the Satavahanas in Lower Deccan*, Calcutta, 1939; P. R. Ramachandra Rao, *The Art of Nagarjunakonda*, Madras, 1956; H. Sarkar, 'Some aspects of the Buddhist monuments at Nagarjunakonda', *Ancient India*, no. 16, New Delhi, 1962; H. Sarkar & B. N. Misra, *Nagarjunakonda*, New Delhi, 1966.

দেবলা মিত্র

নাগার্জুন সাগর ভারতের সুবৃহৎ বহুমুখী নদীপরিকল্পনার অন্যতম। নালকোণ্ডার শুষ্ক অঞ্চল সিঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। অন্ধ্র প্রদেশে নালকোণ্ডা জেলায় নন্দীকোণ্ডা গ্রামের নিকট কৃষ্ণা নদীর উপর ১২৩ মিটার (৪০৩ ফুট) উচ্চ বাঁধ দিয়া নাগার্জুন সাগর নামে বিরাট জলাশয়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে। জলাশয়টি প্রায় ১৯০০০ হেক্টর বিস্তৃত ও ৬৭০০ লক্ষ ঘনমিটারের মত জল ধরিয়া রাখে। জলাশয় হইতে বাঁধের উভয়পার্শ্বে ২১৬ ও ১৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ দুইটি খাল কাটা হইয়াছে। বাঁধটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪৬০ মিটার (৪৭৮০ ফুট)। পরিকল্পনাটি পূর্ণ রূপায়িত হইলে প্রায় ৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের জল ও ১ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাইবে। এই পরিকল্পনাটিতে মোট ব্যয় হইবে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা। বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত আচার্য নাগার্জুনের নামানুসারে এই পরিকল্পনাটির নামকরণ হইয়াছে।

দ্র Ministry of Information and Broadcasting, *Our River Valley Projects*, Faridabad, 1961.

অনিলকুমার কুণ্ডু

নাগাল্যাণ্ড ২৫°৫' হইতে ২৭°৪' উত্তর ৯৩°২০' হইতে ৯৫°১৫' পূর্বে অবস্থিত ভারতের অন্যতম রাজ্য। ইহার উত্তর ও উত্তরপশ্চিমে আসাম রাজ্য, দক্ষিণে মণিপুর রাজ্য, পূর্বে ব্রহ্মদেশ এবং উত্তরপূর্বে নীফা অঞ্চল। শাসনের সুবিধার জন্য ৫ জন সভ্য লইয়া একটি মন্ত্রিসভা আছে এবং ৪২ জন গণপ্রতিনিধি লইয়া রাজ্য বিধানসভা পরিচালিত হয়। আসামের রাজ্যপাল এই রাজ্যের রাজ্যপাল হিসাবে শাসনকার্য তদারক করেন। কোহিমা, মোকক্‌চং ও টুয়েন্‌সাং এই তিনটি জেলা লইয়া নাগাল্যাণ্ড গঠিত হইয়াছে। রাজ্যে ৪টি শহর ও ৮৬০টি গ্রাম আছে। কোহিমা এই রাজ্যের রাজধানী।

নাগাল্যাণ্ডের প্রায় সমস্ত অংশই পার্বত্য এবং গভীর অরণ্যে পূর্ণ। উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে কয়েকটি পর্বতশ্রেণী সমান্তরালভাবে প্রসারিত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নাগা পাহাড় সর্বোচ্চ। সমগ্র নাগাল্যাণ্ডের গড় উচ্চতা ২ হাজার মিটারের বেশি নহে। টুয়েন্‌সাং জেলায় অবস্থিত এই রাজ্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সবরমতীর উচ্চতা প্রায় ৩৮৪০ মিটার (১২৬০০ ফুট)। কোহিমা জেলায় জাপ্‌ভো, কাপু, পাওনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ। সমগ্র অঞ্চল খাড়া পাহাড় ও গভীর উপত্যকায় গঠিত।

পাহাড়ের ঢালগুলিতে সাধারণতঃ শেল বা কাদাপাথর বেশি; সামান্য বৃষ্টিতে পিচ্ছিল হইয়া যায়।

গভীর উপত্যকাগুলি দিয়া খরস্রোতা নদী প্রবাহিত হইতেছে। নদীর সংখ্যা কম নহে। প্রধান নদী ধনশিরি রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম দিকে প্রবাহিত। ডোইয়ং নদী মাও থানার নিকট হইতে শুরু করিয়া বক্রগতিতে উত্তরপশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। রেংমা পানি ইহার প্রধান উপনদী। দিশাই, মেখলা (ঝানঝি) প্রভৃতি নদী উত্তরের সমতল অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

শীতকালে উচ্চ এলাকায় ঠাণ্ডা বেশি এবং অনেক সময়ে তাপমাত্রা হিমাংকে নামে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ২৭° সেন্টিগ্রেডের বিশেষ উপরে যায় না; কিন্তু নিম্ন এলাকায় অথবা পর্বতের পাদদেশে তাপমাত্রা বেশি। গড় বৃষ্টিপাত বৎসরে ৮০ ইঞ্চি (২০৩ সেন্টিমিটার)। বেশি বৃষ্টির জন্য বায়ুর আর্দ্রতা অত্যন্ত বেশি এবং উপত্যকা ও নিম্ন অঞ্চলের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নয়।

এ অঞ্চলের বৃটিশ শাসনের পূর্বের ইতিহাস জানা যায় নাই। বৃটিশ রাজত্বের প্রথমদিকে নাগারা, বিশেষভাবে আও নাগারা মণিপুর ও কাছাড় জেলায় আসিয়া লুঠ-পাট ও নরহত্যা করিত। ১৮৩৯ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বৃটিশ সরকার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই অঞ্চলে কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন। কিছুদিন শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিদ্যমান থাকার পর পুনরায় বৃটিশ সামরিক অভিযান শুরু হয়। ফলে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোহিমা ও আরও অনেক নাগা গ্রাম বৃটিশের দখলে আসে। ইহার পর হইতে নাগা এলাকা ক্রমশঃ শান্ত হইয়া যায়, অবশ্য বৃটিশ সামরিক অভিযান মধ্যে মধ্যে চলিতে থাকে।

ভারত স্বাধীন হইবার পর কোহিমা ও মোককচং এই দুইটি মহকুমা লইয়া 'নাগা হিল্‌স' নামে একটি পৃথক জেলা তৈয়ারি হয়, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে নাগাদের একাংশ পৃথক স্বাধীন নাগারাজ্য দাবি করিতে থাকে। শত্রুভাবাপন্ন নাগাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আসামের 'নাগা হিল্‌স' জেলা ও নীফা-র টুয়েন্‌সাং এলাকা লইয়া 'নাগাল্যাণ্ড' নামে একটি পৃথক রাজ্য গঠন করা হয় এবং ইহা রাষ্ট্রপতির অধীনে থাকে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর 'নাগাল্যাণ্ড' ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় মর্যাদা পায়।

রাজ্যের আয়তন ১৬৪৮৮ বর্গকিলোমিটার (৬৩৬৬ বর্গমাইল) ও জনসংখ্যা ৩৬৯২০০ জন। প্রতি ১০০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৩৩ জন। মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮ জন শিক্ষিত। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে এই রাজ্যে ৪১১টি নিম্ন-প্রাথমিক ও ৪৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি টেক্‌নিক্যাল ও একটি শিক্ষকশিক্ষণ বিদ্যালয় আছে।

শতকরা ৯৪ জন মানুষের উপজীবিকা চাষবাস। সাধারণতঃ পাহাড়ের ঢালে জঙ্গল পোড়াইয়া জুম-প্রথায় চাষ করা হইত। এখন অনেক স্থানে একই জমিতে প্রতি বৎসর চাষ করার জন্য সম্প্রতি পাহাড়ের গায়ে 'ধাপ'-প্রথার প্রবর্তন হইয়াছে। ধানই প্রধান ফসল। ইহা ছাড়া ডাল, তৈলবীজ ও নানাবিধ সবজিও উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্তমানে ফলের চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে; চানকী ও বগলী উপত্যকা আনারস, কমলালেবু, প্রভৃতি ফলের জন্য বিখ্যাত।

পূর্বে নাগাল্যাণ্ড নিবিড় অরণ্যে পূর্ণ ছিল। জুম-প্রথায় চাষের জন্য অরণ্য কিছু নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বর্তমানে অরণ্যের পরিমাণ ৩৪২১ বর্গকিলোমিটার (১৩২১ বর্গ-মাইল) এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিমাণ ৩০০ বর্গ-কিলোমিটার (১২০ বর্গমাইল)।

নাগাল্যাণ্ড খনিজ-সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। অনেক স্থানে কাদাপাথরের মধ্যে চুনা পাথর পাওয়া যায়। নীচু গার্ডের কাছে লিগ্‌নাইট এবং মোককচং এলাকায় কয়লা, নিকৃষ্ট লৌহ ও খনিজ তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

শিল্পোন্নতির দিক দিয়া নাগা জাতি বেশি অগ্রসর নহে। কুটিরশিল্পের মধ্যে বয়নশিল্পের যথেষ্ট প্রসার আছে। এখানকার তাঁতের কাপড়, চাদর, শাল ইত্যাদি ভারতের অন্য স্থানেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে লোহার দা, বর্শা, চাষের যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও তৈয়ারি হয়। বাঁশ হইতে ঝুড়ি ও অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈয়ারি হয়। অধুনা অরণ্যের কাঠ কাগজের মণ্ড ও কাগজশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

প্রধানতঃ নাগা জাতিই এই অঞ্চলে বাস করে। নাগা শব্দের অর্থ মানুষ, আবার অনেকের মতে পর্বতবাসী। নাগাদের মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণী আছে। ইহাদের মধ্যে অঙ্গামি, আও, সেমা, লোটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া রেঙ্গমা, জেলিয়াং, জেমী, কনিয়াক, সাংটাম, ফোম, চাং, কাবুই ইত্যাদি শ্রেণীও আছে। ইহারা ছাড়া এই রাজ্যে কাছাড়ী ও কুকী সম্প্রদায়ের কিছু আদিবাসীও থাকে।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ইহাদের ভাষা তিব্বত-বর্মী ভাষার অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও নিজ নিজ ভাষার বৈশিষ্ট্যের জন্য পরস্পরের নিকট সহজবোধ্য নহে।

মিশনারিদের সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা অনেকে ইংরেজীর মাধ্যমে লেখাপড়া শেখে।

নাগাদের গ্রামগুলি সাধারণতঃ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। গ্রামগুলি আয়তনে ছোট নহে। পাহাড়ের ঢাল ও বেশি বৃষ্টিপাতের জন্য বাড়িগুলি মাচার উপর তৈয়ারি করা হয়। বাড়ি তৈয়ারির সামগ্রী সাধারণতঃ বাঁশ, গাছের পাতা, কাঠ ও খড়। নানা জাতির নাগাদের মধ্যে গ্রাম ও বাড়ির নকশার কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

ইহাদের প্রধান খাদ্য ভাত। ইহা ছাড়া সবজি ও মাংস এবং ভাত হইতে প্রস্তুত মদ খাওয়ার প্রচলন আছে। সাধারণতঃ গোরু ও শূকরের মাংসের চলন বেশি, তবে খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ বাছবিচার নাই। এখানে পানীয় জলের বড়ই অভাব।

জামাকাপড়ের ব্যবহারের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। উত্তরপূর্ব অঞ্চলে অনেকে নগ্ন অবস্থায় থাকে, আবার মধ্য অঞ্চল অথবা কোহিমার কাছে ভাল ভাল জামা-কাপড় ব্যবহার করে, শীতের জন্য সুন্দর শালও ব্যবহার করে। আজকাল অনেকে, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশী পোশাকের ব্যবহার শিখিয়াছে।

পূর্বে ইহাদের বিশেষ কোনও ধর্ম ছিল না এবং আপন আপন সংস্কার অনুযায়ী সমাজব্যবস্থা চলিত। বর্তমানে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রাজধানী কোহিমা সর্ববৃহৎ শহর, জনসংখ্যা ৭২৪৬ জন। এই রাজ্যের অন্য শহরের মধ্যে মোককচং-এ ৬১৫৮ জন ও ডিমাপুরে ৫৭৫৩ জন বাস করে।

নাগাল্যাণ্ডে পাকা রাস্তার সংখ্যা খুব কম। বর্তমানে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি হইতেছে। ৩৯ সংখ্যক জাতীয় সড়ক কোহিমা ও ডিমাপুরকে সংযুক্ত করিয়াছে। কোহিমা পাকা রাস্তা দ্বারা এবং ডিমাপুর রেললাইন ও পাকা রাস্তা দ্বারা আসামের সহিত যুক্ত।

নাগাল্যাণ্ডের বহু স্থান স্বাভাবিক সৌন্দর্যে পূর্ণ। ডিমাপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান ; এখানে মহাভারতের ভীম ও হিড়িম্বা বাস করিতেন বলিয়া কথিত আছে। নাগাদের সংগীত ও নৃত্য খুবই মনোরম।

দ্র *Statistical Handbook of Nagaland*, Kohima, 1965.

শরদিন্দু বসু
লীনা চট্টোপাধ্যায়

নাঙ্গা পর্বত কাশ্মীরের উত্তর সীমান্তে মধ্য এশিয়ার অন্যতম উচ্চ পর্বত। ইহার উচ্চতা ৮১১৪ মিটার ও অবস্থান পাঞ্জাব হিমালয়ের ৩৫°১৪′২১″ উত্তর এবং ৭৪°৩৫′২৪″ পূর্ব। সিন্ধু ও তাহার অন্যতম উপনদী আস্টর বিশালকায় নাঙ্গা পর্বতের গিরিশিরাগুলিকে যথাক্রমে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে কোণাকুণিভাবে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। নাঙ্গা পর্বতের উত্তরে সিন্ধুনদ ও সিন্‌কিয়াং প্রদেশ, পূর্বে আস্টর নদী ও তিব্বত, পশ্চিমে বুনাড়গড় সিন্ধুর অপর একটি উপনদী এবং দক্ষিণে রূপাল হিমবাহ হইতে নিঃসৃত রূপালগড় আস্টরের উপনদী।

রূপাল উপত্যকা হইতে গিরিশিরা সোজাসুজি খাড়া প্রাচীরের মত ৪৫৭২ মিটার উঠিয়া গিয়াছে। তাহারই সুউচ্চ অংশে নাঙ্গা পর্বত। পৃথিবীর অন্য কোনও পর্বতে এত খাড়া ঢাল আর নাই। নাঙ্গা পর্বতের উত্তরপশ্চিম গিরিশিরায় নাঙ্গা পর্বত দ্বিতীয় শৃঙ্গ ৭৭৯৪ মিটার ও গানালো শৃঙ্গ ৬৬০৮ মিটার। নাঙ্গা পর্বতের গিরিশিরা প্রাচীরের মত খাড়া বলিয়া সাধারণতঃ বরফাচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। ইহার জন্য গিরিশিরার প্রস্তরময় গাত্র বহুদূর হইতেই দেখা যায়। পর্বতের নামকরণের মূল সম্ভবতঃ এইটিই।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত পর্বতারোহী এ. এফ. মামারী ও তাঁহার গুর্খা সহযাত্রী রঘুবীর থাপ্পা সর্বপ্রথম নাঙ্গা পর্বত অভিযান করেন। মামারী এই অভিযানে প্রাণ হারান। ১৯৩২, ১৯৩৪, ১৯৩৭, ১৯৩৮, ১৯৩৯ ও ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের নাঙ্গা পর্বত অভিযানও ব্যর্থ হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল হের্‌লিগ্‌কফার নাঙ্গা পর্বতে অভিযান পরিচালনা করেন। এই দলের অষ্ট্রিয়ান পর্বতারোহী হের্‌মান বুল ৩ জুলাই একাকী নাঙ্গা পর্বতের শৃঙ্গ বিজয় করেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে হের্‌লিগ্‌কফার পুনর্বার ডায়ামি-র দিক হইতে শীর্ষে আরোহণের উদ্দেশ্যে নাঙ্গা পর্বতে অভিযান করেন ; কিন্তু এ অভিযান পরিত্যক্ত হইলে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্বার নাঙ্গা পর্বতে আসেন। ২৩ জুন বৈকাল পাঁচটায় লো, কিন্‌সোফার ও ম্যান্‌হার্ডট নাঙ্গা পর্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করেন। নাঙ্গা পর্বতে সর্বসমেত ১৫ জন পর্বতারোহী এবং ১৭ জন শেরপা প্রাণ হারান। পর্বতারোহীদের মধ্যে ১২ জনই জার্মান।

দ্র E. Knowlton, *The Naked Mountain*, London, 1933 ; K. M. Herrligkoffer, *Nanga Parbat*, London, 1954 ; K. Mason, *Abode of Snow*, London, 1955 ; Paul Baner, *The Siege of Nanga Parbat : 1856-1953*, London, 1956 ; Herman Bull, *Nanga Parbat Pilgrimage*, London, 1956.

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

নাঙ্গাল ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা দ্র

নাজিবুদ্দৌলা (? -১৭৭০ খ্রী) ওমরখেল বংশোদ্ভূত দরিদ্র নিরক্ষর ও নির্বান্ধব রুহেলা আফগান নাজিব খাঁ নিজের কর্মনৈপুণ্য, চরিত্রবল ও সুবিধাবাদের জোরে ১৮শ শতাব্দীর ৬ষ্ঠ দশকে দিল্লী সাম্রাজ্যের কর্ণধার হইয়াছিলেন ও আমীর উল্-উমারা (অর্থাৎ প্রধান আমির) উপাধিও পাইয়াছিলেন। ভারতে তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ হয় আলি মহম্মদ রুহেলার অধীনে। আহম্মদ শাহ্ আবদালীর ভারত আক্রমণের সময়ে (১৭৫৭ খ্রী) তিনি বিদেশী আক্রমণকারী আবদালীর সহিত যোগদান করেন এবং আবদালীর দক্ষিণ হস্তরূপে পরিগণিত হন। আবদালী নাজিবকে মীর বক্সী ও প্রত্যাবর্তনের পূর্বে দিল্লীতে তাঁহার সর্বোচ্চ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। নাজিব উত্তর ভারতে মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলশালী আমির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার একাধিপত্যে দিল্লীর সম্রাটের ক্ষমতা অত্যন্ত খর্ব হইয়া পড়ে।

নাজিবকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য দিল্লীর উজির ইমাদ মারাঠাদের সহিত সন্ধি করেন (আগস্ট, ১৭৫৭ খ্রী)। রঘুনাথ রাও-এর অধীনে মারাঠাগণ দিল্লী আক্রমণ ও বহু স্থান পুনরধিকার করিলে নাজিব সন্ধি করিতে বাধ্য হন। মারাঠাগণ আহমদ বঙ্গাশকে মীর বক্সী নিযুক্ত করেন। দত্তাজী সিন্ধিয়া ও নাজিবের সংঘর্ষে বিচক্ষণ নাজিব মারাঠাদের প্রতিরোধ করিবার জন্য এমন এক সুনিপুণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যে শুকরতলের অবরোধে ৫ মাসের মধ্যেও (জুলাই-নভেম্বর, ১৭৫৯ খ্রী) সংখ্যাগরিষ্ঠ মারাঠাগণ তাঁহাকে দমন করিতে পারে নাই।

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পর ১০ বৎসর (৭ এপ্রিল, ১৭৬১-৩১ অক্টোবর, ১৭৭০ খ্রী) নাজিবের জীবনের মধ্যাহ্নদীপ্তি। তিনি একাধারে মীর বক্সী, দিল্লী জেলার ফৌজদার ও সাম্রাজ্য-শাসনের মোক্তার অর্থাৎ তথাকথিত দিল্লী সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন। তিনি দিল্লী নগরীর উপরও নিজ পুত্র জবিতার মাধ্যমে পূর্ণ অধিকার বিস্তার করেন। শাহ্ আলম সম্রাট হইবার পর নাজিব শিখগণের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি নবজাগ্রত, সশস্ত্র ও সংহত জাতিকে প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই।

মারাঠাদের হিন্দুস্থান পুনরাক্রমণে (১৭৭০ খ্রী) উৎকণ্ঠিত নাজিব তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করার নিষ্ফল চেষ্টা করেন ; তবে তিনি জাঠ ও মারাঠাদের মধ্যে সন্ধির ব্যবস্থা করেন। ইহার কিছুকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় (৩১ অক্টোবর, ১৭৭০ খ্রী)।

নাজিব এক বাস্তববাদী রাজনীতিজ্ঞ ও রণকৌশলী সেনাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানী নাজিবাবাদ শহরের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন ও পাথরগড়ে এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন।

দ্র J. N. Sarkar, *Fall of the Mughal Empire*, vol. II, Calcutta, 1949.

জগদীশনারায়ণ সরকার

নাটক অনুমান করা যায়, নাটকের আদিকালে মঞ্চে পরিবেশন করিবার স্পষ্ট উদ্দেশ্যেই যাবতীয় নাটক রচিত হইয়াছে। নাটক পাঠ করিবার রেওয়াজ পরবর্তীকালের। আরও পরে অবশ্য এমন নাটকও রচিত হইয়াছে যাহা মঞ্চে পরিবেশন প্রায় অসম্ভব ; কেবল পাঠেই ইহার রসাস্বাদন সম্ভব। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, কোনও বিশেষ দেশকালের মঞ্চকলার বিশেষ রূপ ও রীতির সহিত নাটকের রূপ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর গ্রীসে প্রায় ২০ সহস্র দর্শক একত্রে প্রেক্ষালয়ে নাটক দর্শন করিতেন ; অভিনয়শালা বলিতে যাহা ছিল, তাহাতে উন্মুক্ত আকাশতলে সারি সারি আসন ও বিশাল মুক্ত মঞ্চের ব্যবস্থা ছিল ; সারাদিন ধরিয়া অভিনয় চলিত, দৃশ্যপট বা আলোকসম্পাতের বিশেষ সুযোগ ছিল না। ফলে মঞ্চে বাস্তব মোহরচনার চেষ্টা না করিয়া নাটককে বাস্তব জীবনের পরিবেশন হইতে ভিন্নতর পরিবেশের বস্তু বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। উক্ত পরিবেশে অভিনয়ের ধরন ও উচ্চারণও উচ্চগ্রামের হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাই গ্রীক নাটকের কাহিনী-পরিকল্পনা পুরাণ ও অতিকথা (মিথ)-নির্ভর চরিত্রগুলিও আবেগে-অনুভবে অতি-মানবিক। শেক্স্পিয়র ও তাঁহার কালের নাটকের স্বগতোক্তির গুরুত্ব লক্ষণীয়। তদানীন্তন রঙ্গালয়ে দর্শক-সাধারণ মঞ্চের এমনই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থান করিতেন যে, অভিনেতা স্বচ্ছন্দেই মঞ্চের কিনারে দাঁড়াইয়া স্বগতোক্তি উচ্চারণ করিতে পারিতেন, কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বোধ হইত না। আধুনিক নাটকে যে মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা লক্ষ্য করা যায়, তাহাও আধুনিক মঞ্চকলার সহিত সম্পর্কিত। বদ্ধ প্রেক্ষালয়, অন্ধকার ও মঞ্চের সীমিত আবদ্ধ আয়তক্ষেত্র অনিবার্যভাবেই তীব্র অভিনিবেশ ও আত্মজিজ্ঞাসার সহায়ক হয়।

নাটক ও রঙ্গালয়ের এই ঐতিহ্যগত ঘনিষ্ঠতা স্মরণ রাখিয়া নাট্যকারও নাটকরচনাকালে বহু প্রতিষ্ঠিত রীতি

মানিয়া লন। নাটক সাধারণভাবে অভিনয়ার্থ, একথা নাট্যকারও সাধারণতঃ বিস্মৃত হন না। তাই ৩ ঘণ্টা হইতে সাড়ে ৩ ঘণ্টার মধ্যে অভিনয় সমাধা হইতে পারে, সাধারণতঃ এমনভাবেই নাটক রচনা করা হয়। এই কালসীমার কঠোর শৃঙ্খলার শাসনে নাটকান্তর্গত সমুদয় উপকরণেরই অপরিহার্যতা বা অনিবার্যতা সম্পর্কে নাট্যকারকে নিঃসংশয় হইতে হয়। স্বভাবতঃই নাটকের এই নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে ঘটনা-পারম্পর্যের ঐক্য ও অন্তর্নিহিত যুক্তি রচনা করিতে গেলে সযত্নে বাহুল্য পরিহার করিতে হয়। আরিস্তোতল আদি নাট্যতাত্ত্বিকেরা ঘটনাপারম্পর্যের বা 'অ্যাকশন'-এর ঐক্যকেই নাটকের মুখ্য লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। কাহিনীবর্ণনায় উপন্যাসের স্বাধীন বিস্তারে নাট্যকারের অধিকার নাই। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মুখ্যতঃ দৃশ্যসমূহের বাহনেই ঘটনাপারম্পর্যের পরিবেশনের দায়ই নাট্যকারের দায়। ফলে নাটকের ভাষার প্রবণতাই কাব্যমুখীন, ব্যঞ্জনাবহ— স্বল্প পরিসরের মধ্যে সংলাপের সাহায্যে বহু তাৎপর্য আভাসিত করিবার স্বাভাবিক প্রয়োজনেই। নাটকে সংলাপের ভূমিকাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ: সংলাপে বিধৃত নানা ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া ঘটনার পূর্ববৃত্তান্ত প্রকাশ পায়: এক-একটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ভাষা ও শব্দব্যবহার বা বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়; সংলাপই নাটককে আগাইয়া লইয়া যায়, পরবর্তী ঘটনার প্রস্তুতি রচনা করে; আবার যেহেতু স্পষ্ট চরিত্র সম্পর্কে মত প্রকাশের সুযোগ নাট্যকারের প্রায় নাই বলিলেই চলে, অপর চরিত্রসমূহের কথায় একটি চরিত্রকে চিনিয়া লইতে হয়। চরিত্রসমূহের স্বাভাবিক কথোপকথনের উপর নির্ভর করিয়াও নাট্যকার প্রায়ই আরও সক্রিয় হইয়া পাঠকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন, ঘটনা বা চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার নিজের মূল্যায়ন পাঠকদের জানাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। গ্রীক নাটকে কোরাস নামে যে গোষ্ঠী মূল নাটকের এক একটি পর্বান্তে তাহার তাৎপর্য গানে প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদের বাণীর মধ্যে নাট্যকারের কথাও কখনও কখনও যেন শোনা যাইত। শেক্স্পিয়রের নাটকে বিদূষক-জাতীয় চরিত্র (ফূল) এই ভূমিকা পালন করিতেন। পরবর্তীকালেও নাট্যকারেরা প্রায়ই নাটকের মধ্যে এইরূপ কোনও চরিত্র বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। জার্মান নাট্যকার বেয়ার্টোল্ট্ ব্রেখ্ট (Bertolt Brecht, ১৮৯৮-১৯৫৬ খ্রী) অবশ্য আরও সুষ্ঠুভাবেই নাট্যকারের ভাষ্যকার-ভূমিকা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ব্রেখ্ট-পূর্ববর্তী নাট্যকারের চেষ্টা ছিল, নাট্যকারের সুখদুঃখ ব্যথাবেদনায় পাঠককে অভিভূত করিয়া দেওয়া, সমমর্মিতাবোধে তাঁহাকে সম্পূর্ণ আবিষ্ট করা। অথচ ব্রেখ্ট এই নূতন তত্ত্ব পরিবেশন করিলেন যে, পাঠকের চিন্তা তথা বুদ্ধিবৃত্তিকে সক্রিয় করিয়া তোলাই আধুনিক নাট্যকারের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া ব্রেখ্ট তাঁহার নাটকে গানের ব্যবহারে কাহিনীর অংশ হিসাবে নয়, কাহিনীর ভাষ্যরূপে এবং অন্যান্য উপায়ে পাঠকদের অন্ধ আবেগের হাত হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ইওরোপীয় নাট্যধারায় নাটকের যে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী-বিভাগ স্বীকৃত ছিল, তাহা ইদানীংকালে প্রায় অচল হইতে চলিয়াছে। ট্র্যাজেডি (বিয়োগান্তক বা দুঃখাত্মক নাটক), কমেডি (মিলনাত্মক বা মধুর-রসাত্মক নাটক), ফার্স (প্রহসন বা নাটকীয় অভিনয়াত্মক রসিকতার নাটক), মেলোড্রামা (ত্রাস ও করুণার উদ্রেকে সচেষ্ট অতিশয়িত বাণী ও ঘটনার নাটক) বা ট্র্যাজিকমেডি (ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা হইতে কমেডির পরিসমাপ্তিতে উত্তরণের নাটক) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের নাটক না লিখিয়া অধিকাংশ আধুনিক নাট্যকারই আজকাল যে নাটক লিখিয়া থাকেন, তাহাকে সাধারণভাবে প্রব্লেম প্লে বা সমস্যার নাটক বলিয়া বর্ণনা করাই সমীচীন। রাজনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার জটিলতার গভীরে প্রবেশ করিয়া সেই সমস্যায় পাঠককেও ভাবিত করিয়া তোলার দায়িত্বই আধুনিক নাট্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্যার সমাধান ধরাইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি পাঠককে গভীর ভাবনার বৃত্তে স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন। স্বভাবতঃই নাটকের চিরাচরিত সুগঠিত রূপ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। চলচ্চিত্রের বিপুল সম্ভাবনার উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নাটক যতই গতিময়তা (ডাইনামিজ্‌ম) লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে, নিশ্চিতির পরিবর্তে দ্বিধা ও সংশয়কেই তাহার ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছে; নাটকে ভাষার গুরুত্বও যেন কমিয়া আসিতেছে। আধুনিক নাটক প্রায়ই মঞ্চনির্দেশ ও অভিনয়নির্দেশের সমাহারে পরিণত হয়, কথার ভূমিকা তখন খুবই কম। এই নাটককে হয়তো নাটক না বলিয়া নাট্য বলাই সংগত হইবে।

দ্র Alan Reynolds Thompson, *The Anatomy of Drama*, California, 1942; Ronald Peacock, *The Art of Drama*, London, 1957; Cleanth Brooks & Robert B. Heilman, *Understanding*

Drama, New York, 1963; Eric Bentley, *The Life of the Drama*, London, 1965.

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক, বাংলা বাংলা নাটকের উদ্ভব একশত বৎসরের কিছু পূর্বে। পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বাংলা দেশে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইবার ফলেই নাটকের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই নাটক জন্মলাভ করে। যাত্রাভিনয় অবশ্য দীর্ঘকাল ধরিয়াই বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল এবং উহা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর নাটকের বিষয়, ভাব ও সংলাপের উপর কিছু কিছু প্রভাবও বিস্তার করে; কিন্তু একথা বলা চলে না যে, সেই যাত্রাভিনয়ের অনিবার্য পরিণতিরূপেই নাটকের উদ্ভব হইয়াছে। বাংলা নাটক প্রধানতঃ বিদেশী নাটকের মৌলধর্ম, শিল্পরূপ ও রসপরিণতি অবলম্বন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যাত্রা একটি স্বতন্ত্র রসধারারূপে আজও পর্যন্ত নাটকের পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের মধ্য দিয়াই বাংলা নাটকের সূচনা দেখা গিয়াছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশদেশবাসী লেবেডেফ বাংলা দেশে প্রথম যে নাট্যশালা স্থাপন করেন, তাহাতে অভিনয়ের জন্য তিনি তাঁহার ভাষাশিক্ষক গোলকনাথ দাসের দ্বারা 'লভ ইজ্ দি বেস্ট ডক্টর' ও 'ডিস্‌গাইস' নামক দুইখানি নাটক অনুবাদ করাইয়াছিলেন। 'ডিস্‌গাইস'-এর বাংলা অনুবাদ অভিনীতও হইয়াছিল (১৭৯৫ খ্রী)। লেবেডেফের অভিনয়ের পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর উদ্যোগে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় হয়। ইহার কিছু পরেই মৌলিক বাংলা নাটকের আবির্ভাব ঘটে।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম মৌলিক দুইখানি নাটক—'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' রচিত হয়। দুইখানি নাটকই প্রধানতঃ পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসরণ করিয়া লিখিত। 'কীর্তিবিলাস'-এর লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। ইহাই বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিষাদাত্মক নাটক। সপত্নীপুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচারকাহিনীই ইহার উপজীব্য। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'-এর পরিণতি মিলনান্তক। অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রাহরণই ইহার বর্ণনীয় বিষয়।

মৌলিক নাটক দুইখানির পূর্বে ও পরে অনেকগুলি অনুবাদনাটক রচিত হইয়াছিল। এই নাটকগুলির মধ্যে কিছু ইংরেজী নাটক হইতে লওয়া হইলেও অধিকাংশই ছিল সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। অনুবাদক নাট্যকারদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০ খ্রী) ও রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-৮৬ খ্রী) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩ খ্রী) ও 'চারুমুখ চিত্তহরা' (১৮৬৪ খ্রী) যথাক্রমে 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' ও 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট'-এর অনুবাদ। কালীপ্রসন্নের অনূদিত নাটক 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭ খ্রী) ও 'মালতী-মাধব' (১৮৫৯ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। অনুবাদে রামনারায়ণের কৃতিত্বও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি 'বেণীসংহার' (১৮৫৬ খ্রী), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮ খ্রী), 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' (১৮৬০ খ্রী), 'মালতীমাধব' (১৮৬৭ খ্রী) প্রভৃতি নাটক অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অনুবাদনাটকগুলির মধ্যে স্বভাবতঃই সংস্কৃত নাট্যরীতি প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ বাংলা নাটকের উন্মেষকালে পাশ্চাত্য নাট্যরীতি ও সংস্কৃত নাট্যরীতির মধ্যে যেন দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটক এই দুই রীতির কোনটি গ্রহণ করিবে তাহা যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্ন সর্বপ্রথম মৌলিক সমাজসমস্যামূলক নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' রচনা করেন। তাহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বহু নাটক লেখা হয়, যথা উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬ খ্রী), যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলাচিত্তচাপল্য' (১৮৫৭ খ্রী), শ্যামাচরণ শ্রীমাণীর 'বাল্যোদ্বাহ' (১৮৬০ খ্রী) ইত্যাদি। নাট্যরীতির দিক দিয়া তাঁহাদের রচনায় প্রধানতঃ সংস্কৃত নাটকের আদর্শই অনুসরণ করা হইয়াছিল।

রামনারায়ণ মধুসূদন ও দীনবন্ধুর পূর্বে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান নাট্যকার ছিলেন। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকখানির মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার দোষ প্রধানতঃ হাস্যরসাত্মক দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করা হইয়াছে। বহুবিবাহের অনিষ্টকারিতা দেখানো হইয়াছে 'নবনাটক'-এ (১৮৬৬ খ্রী)। লাম্পট্য ও সপত্নীসমস্যা লইয়া রামনারায়ণ তিনখানি ক্ষুদ্র প্রহসনও রচনা করিয়াছিলেন—'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (১৮৬৫ খ্রী), 'চক্ষুদান' (১৮৬৯ খ্রী) ও 'উভয়সঙ্কট' (১৮৬৯ খ্রী)।

সংস্কৃত নাটকের প্রভাব বর্জন করিয়া প্রধানতঃ পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুসরণে নাটক রচনা শুরু করেন মাইকেল মধুসূদন (১৮২৪-৭৩ খ্রী)। তাঁহার প্রথম নাটক

'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯ খ্রী) মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী'-র (১৮৬০ খ্রী) বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন গ্রীক পুরাণ হইতে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১ খ্রী) রাজপুত-ইতিহাসের একটি কাহিনী অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণ-কুমারী' জাতীয়ভাবাত্মক ঐতিহাসিক নাটকের পথিকৃৎ এবং বাংলা সাহিত্যের প্রধান ট্র্যাজেডিগুলির অন্যতম। মধুসূদন দুইখানি সার্থক প্রহসনও রচনা করিয়াছিলেন —'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০ খ্রী) এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০ খ্রী)। প্রথমখানিতে তৎকালীন ইংরেজীশিক্ষিত নব্য সমাজের বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে ; এবং দ্বিতীয়টিতে প্রাচীনপন্থী ধনবান জমিদারের চরিত্র-বিকৃতি ও দরিদ্র কৃষকজীবনের সুখদুঃখের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

মধুসূদনের পরেই দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-৭৩ খ্রী) নাম করিতে হয়। দীনবন্ধুই বাংলা নাটকের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও তাঁহার সূক্ষ্ম নাট্যশিল্পজ্ঞান বাংলা নাট্য-সাহিত্যে বিরল। হাস্য ও করুণ উভয় রসেই তাঁহার সমান দক্ষতা, তবে হাস্যরসেই বেশি। তাঁহার প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০ খ্রী) নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা আলোড়নসৃষ্টিকারী নাটক। ইহাতে নীলকর-পীড়িত প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার বাস্তব করুণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়াই সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। দীনবন্ধুর অপর দুইটি নাটক 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩ খ্রী) ও 'লীলাবতী' (১৮৬৭ খ্রী) প্রাচীন ও আধুনিক পরিবেশ অবলম্বনে লিখিত। তাঁহার শেষ নাটক 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩ খ্রী) ঐতিহাসিক ঘটনা আশ্রয় করিয়া লিখিত। তাঁহার 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬ খ্রী) বাংলার অন্যতম প্রধান নাটক এবং দীনবন্ধুর অক্ষয় কীর্তি। ইহাতে ইয়ং-বেঙ্গল সমাজের অধঃপতনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার নিমচাঁদ চরিত্র সুবিখ্যাত। 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো'-তে বিবাহবাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধের জব্দ হইবার কৌতুকরসাত্মক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। 'জামাই বারিক' (১৮৭২ খ্রী) ঘরজামাই ও দুই স্ত্রীর দ্বন্দ্বে বিড়ম্বিত স্বামীর দুর্দশার সরস ও উপভোগ্য চিত্র।

মধুসূদন ও দীনবন্ধু পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এই সময়ে আবির্ভূত হইলেও মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২ খ্রী) যাত্রার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নাটক রচনা শুরু করেন। মনোমোহন যে নূতন ধরনের নাট্যধারা প্রবর্তন করিলেন, তাহাকে অপেরা বা 'গীতাভিনয়' বলা যাইতে পারে। গীতাভিনয় খাঁটি নাটক ও যাত্রার মধ্যবর্তী রূপ। নাটকের গঠনরীতি এবং যাত্রার ভাবোচ্ছ্বাসের সমন্বয়ে ইহা গঠিত। 'রামাভিষেক' (১৮৬৭ খ্রী), 'সতী' (১৮৬৭ খ্রী), 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৫ খ্রী), 'পার্থপরাজয়' (১৮৮১ খ্রী) প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য গীতাভিনয়। মনোমোহনের পরে যাঁহারা গীতাভিনয় লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়া-ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কালিদাস সান্যাল, হরিমোহন কর্মকার, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য, মতিলাল রায় প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

বাংলা নাটকের দ্বিতীয় যুগে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই যুগের শেষদিকে কিছু সামাজিক নাটক রচিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেকগুলি জাতীয়ভাবাত্মক ঐতিহাসিক নাটকও লিখিত হয়। এই ঐতিহাসিক নাট্যপর্বের নেতা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫ খ্রী)। জোড়াসাঁকো নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা ব্যতীত বিভিন্ন ধরনের নাটক রচনা করিয়াও তিনি নাট্যসাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪ খ্রী) পুরু ও আলেক্‌সান্দরের সংগ্রামকাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'সরোজিনী' (১৮৭৫ খ্রী) ও 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯ খ্রী) স্বদেশীভাবরঞ্জিত রাজপুত-কাহিনী লইয়া লিখিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কয়েকখানি উপভোগ্য প্রহসনও রচনা করিয়াছিলেন, যথা 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২ খ্রী), 'এমন কর্ম আর করব না' (১৮৭৭ খ্রী), 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪ খ্রী), 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬ খ্রী) ও 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৯০২ খ্রী)। প্রহসনগুলি মলিয়েরের নাটকের অনুবাদ অথবা ভাব অবলম্বনে রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেক-গুলি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াও অনুবাদনাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার যুগে যাঁহারা জাতীয়ভাবাত্মক ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরলাল রায়, উমেশচন্দ্র গুপ্ত, প্রমথনাথ মিত্র প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ। উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫-১৩০২ বঙ্গাব্দ) জাতীয়ভাবাত্মক রোমান্টিক নাটক রচনা করিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪ খ্রী) ও 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' (১৮৭৫ খ্রী) তাঁহার প্রসিদ্ধ নাটক।

ঐতিহাসিক নাটকের যুগের পর দেখা দিল পৌরাণিক

নাটকের যুগ। এই যুগের নেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২ খ্রী)। গিরিশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান নাট্যকার। তাঁহার সময়েই নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয়ের প্রবলতম উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল। ধর্ম, প্রাচীন শাস্ত্রীয় আদর্শ এবং পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি সমগ্র জাতির চিত্তে তখন এক নবজাগ্রত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মলাভ করিয়াছিল। উহারই ফলস্বরূপ সেই সময়ে বহু পৌরাণিক নাটক রচিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের ধর্মমূলক নাটকের প্রথম পর্বে রচিত 'রাবণবধ' (১৮৮১ খ্রী) প্রভৃতি নাটকে পৌরাণিক কাহিনী যথাযথ অনুসরণ করা হইয়াছে। কিন্তু ধর্মমূলক নাটকের দ্বিতীয় পর্বে তাঁহার নিজস্ব ভক্তিরসাত্মক আদর্শই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এই পর্বের নাটকগুলির মধ্যে 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৬ খ্রী), 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৮ খ্রী), 'জনা' (১৮৯৪ খ্রী), 'পাণ্ডব-গৌরব' (১৯০০ খ্রী) প্রভৃতি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গিরিশচন্দ্র ১৯শ শতাব্দীর শেষ দশকে ও বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় কয়েকখানি সামাজিক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম সামাজিক সমস্যা-মূলক নাটক 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯ খ্রী) বহুদিন ধরিয়া বাঙ্গালী-চিত্তে করুণরসের সঞ্চার করিয়া আসিতেছে। 'হারানিধি' (১৮৯০ খ্রী), 'বলিদান' (১৯০৫ খ্রী) ও 'শাস্তি কি শান্তি' (১৯০৮ খ্রী) তাঁহার অন্যান্য প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক। গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি জাতীয়ভাবাত্মক ঐতিহাসিক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬ খ্রী) শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'মীরকাসিম' (১৯০৬ খ্রী), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭ খ্রী) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

গিরিশযুগে বহু প্রখ্যাত নাট্যকার অজস্র নাটক রচনা করিয়া নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। গীতাভিনয় ও পৌরাণিক নাটক লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪ খ্রী)। তাঁহার 'হরধনুর্ভঙ্গ' (১৮৮১ খ্রী), 'তরণীসেনবধ' (১৮৮৪ খ্রী) প্রভৃতি নাটক রঙ্গমঞ্চে যথেষ্ট সম্বর্ধিত হইয়াছিল। অপর খ্যাতিমান নাট্যকার হইলেন অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯ খ্রী)। তিনিই গিরিশযুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত প্রহসন-রচয়িতা। অমৃতলাল তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মধ্য দিয়া তৎকালীন জীবনের বিকৃতি, আতিশয্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, আদর্শহীনতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তাঁহার 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪ খ্রী), 'বাবু' (১৮৯৪ খ্রী), 'বৌমা' (১৮৯৭ খ্রী), 'তাজ্জব ব্যাপার' (১৮৯০ খ্রী) প্রভৃতি প্রহসন বিখ্যাত। তাঁহার 'খাসদখল' (১৯১২ খ্রী) ও 'নবযৌবন' (১৯১৪ খ্রী) রোমান্টিক কমেডিরূপে উল্লেখযোগ্য। এই যুগের অন্যান্য খ্যাতনামা পৌরাণিক নাটকরচয়িতাদের মধ্যে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অপরেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ-কাল হইতে বাংলা নাটকের তৃতীয় যুগ শুরু হইয়াছে বলা যায়। দৈবশক্তি অপেক্ষা মানবশক্তির প্রতি অধিকতর বিশ্বাস, সামাজিক নীতির নবমূল্যায়ন, মানবমনের দুর্জ্ঞেয় জটিলতার উপলব্ধি, বিশ্ব-মনের সহিত পরিচয়, রঙ্গমঞ্চ ও প্রয়োগরীতি সম্বন্ধে নূতন চেতনা প্রভৃতি এই যুগের নাটকে লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩ খ্রী) হইতেই এই যুগের সূচনা। দ্বিজেন্দ্রলালই ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্য দিয়া তিনি একইসঙ্গে সুগভীর স্বদেশপ্রীতি এবং উদার বিশ্বজনীন মানবতার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার 'মেবারপতন' (১৯০৮ খ্রী), 'সাজাহান' (১৯০৯ খ্রী), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১ খ্রী) প্রভৃতি নাটক আজ পর্যন্ত অটল জনপ্রিয়তার আসনে অধিষ্ঠিত। দ্বিজেন্দ্রলাল 'সমাজবিভ্রাট ও কল্কি অবতার' (১৮৯৫ খ্রী), 'পুনর্জন্ম' (১৯১১ খ্রী) প্রভৃতি কয়েকটি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। মানবিকতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া তিনি নূতন ধরনের কিছু পৌরাণিক নাটকও লিখিয়া-ছিলেন, যথা 'পাষাণী' (১৯০০ খ্রী), 'সীতা' (১৯০৮ খ্রী) ও 'ভীষ্ম' (১৯১৪ খ্রী)।

ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৮৬৩-১৯২৭ খ্রী) পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উভয়বিধ নাটক লিখিয়াই খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলি গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের আদর্শেই রচিত। উহাদের মধ্যে 'ভীষ্ম' (১৯১৩ খ্রী) ও 'নরনারায়ণ' (১৯২৬ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পদ্মিনী' (১৯০৬ খ্রী), 'বঙ্গে রাঠোর' (১৯১৭ খ্রী), 'আলমগীর' (১৯২১ খ্রী) প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় স্বদেশপ্রেমমূলক ভাবোচ্ছ্বাসের পরিচয় আছে। ক্ষীরোদ-প্রসাদ আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনেও 'আলিবাবা' (১৮৯৭ খ্রী) ইত্যাদি কয়েকখানি জনপ্রিয় গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথও (১৮৬১-১৯৪১ খ্রী) নাট্যরচনায় হাত দিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাটক বাংলা নাটকের ইতিহাসে একেবারেই স্বতন্ত্র। তাঁহার নাটকগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়, যথা গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য,

নাট্যকাব্য, কমেডি, সাঙ্কেতিক নাটক, সামাজিক নাটক ও নৃত্যনাট্য। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১ খ্রী), 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮ খ্রী) গীতিনাট্যের পর্যায়ে পড়ে। কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯ খ্রী), 'বিসর্জন' (১৮৯০ খ্রী) ও 'মালিনী' (১৮৯৬ খ্রী)। নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে 'বিদায়-অভিশাপ' (১৯১২ খ্রী), 'গান্ধারীর আবেদন', চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২ খ্রী) 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭ খ্রী), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬ খ্রী), ও 'শেষরক্ষা' (১৯২৮ খ্রী), এই তিনটি কমেডির মধ্যে পারিবারিক জীবনের স্নিগ্ধ রস পরিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার সাঙ্কেতিক নাটকের প্রথম পর্বে রচিত 'শারদোৎসব' (১৯০৮ খ্রী), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯ খ্রী), 'রাজা' (১৯১০ খ্রী), 'অচলায়তন' (১৯১২ খ্রী), 'ডাকঘর' (১৯১২ খ্রী) প্রভৃতি নাটকে রূপের মধ্য দিয়া রূপাতীতের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে রচিত 'ফাল্গুনী' (১৯১৬ খ্রী), 'মুক্তধারা' (১৯২২ খ্রী) ও 'রক্তকরবী' (১৯২৬ খ্রী) নাটকে বর্তমান জগতের বাস্তব সমস্যারই রূপায়ণ ঘটিয়াছে। সামাজিক নাটকগুলির অধিকাংশই পূর্বে লিখিত গল্পের নাট্যরূপ, যথা 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫ খ্রী), 'শোধবোধ' (১৯২৬ খ্রী) ইত্যাদি। মৌলিক সামাজিক নাটক 'বাঁশরী' (১৯৩৪ খ্রী)। শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকে অবলম্বন করিয়া নাট্যরস পরিবেশন করিতে চাহিয়াছিলেন। 'নটীর পূজা' (১৯২৬ খ্রী), 'তাসের দেশ' (১৯৩৩ খ্রী), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬ খ্রী), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৮ খ্রী), 'শ্যামা' (১৯৩৯ খ্রী) প্রভৃতি নৃত্যনাট্য তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক, তিন শ্রেণীর নাটকই লেখা হইয়াছে। পৌরাণিক নাটকের ধারা যদিও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, তবুও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে বাস্তব জগতের রস বহু নাটকেই পরিবেশন করা হইয়াছে। এই ধরনের পৌরাণিক নাটকের বিখ্যাত রচয়িতা হইলেন মন্মথ রায়। তাঁহার 'কারাগার', 'দেবাসুর', 'সাবিত্রী', 'চাঁদসদাগর' প্রভৃতি নাটকের কাহিনী পৌরাণিক হইলেও উহাতে মানবীয় দ্বন্দ্ব ও সুখদুঃখের সংঘাতই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বাংলায় একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক। দেশপ্রেমমূলক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়া বর্তমান কালে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা', 'গৈরিক পতাকা', 'রাষ্ট্রবিপ্লব', 'ধাত্রীপান্না' প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় আবেগকে আশ্রয় করিয়া এইরূপ অনেকেই ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহেন্দ্র গুপ্ত, নিশিকান্ত বসু রায়, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, রমেশ গোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে সামাজিক জীবনের নানা সমস্যা লইয়াও অনেক নাটক রচিত হইয়াছে। এই সকল সামাজিক নাটকের রচয়িতাদের মধ্যে বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, জলধর চট্টোপাধ্যায়, অয়স্কান্ত বক্সী, যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বিদ্রূপাত্মক নাটকরচনার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছেন প্রমথনাথ বিশী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা নাট্যজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। নূতন জীবনজিজ্ঞাসা ও নাট্যপ্রয়োগ-চেতনা লইয়া নবনাট্য-আন্দোলনের সূচনা হয়। অর্থনৈতিক জীবনদ্বন্দ্বই নাটকের প্রধান উপজীব্য হইয়া ওঠে। সাম্প্রতিক কালের এই সকল নাটকের রচয়িতাদের মধ্যে তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য ও সলিল সেন বিশেষ খ্যাতিমান। অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে কিরণ মৈত্র, বীরু মুখোপাধ্যায়, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় বৈরাগী, উৎপল দত্ত, উমানাথ ভট্টাচার্য, সুনীল দত্ত, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, গিরিশঙ্কর, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, রমেন লাহিড়ী, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৪৬; সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, দৃশ্যকাব্য পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৫০; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বর্ধমান, ১৯৫৬; আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬০।

অজিতকুমার ঘোষ

নাটক, সংস্কৃত সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে অবস্থাবিশেষের অনুকরণকে বলা হইয়াছে 'নাট্য'। এই অনুকরণ হয় অভিনয়ের দ্বারা। সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাদের প্রথমে থাকে একটি শ্লোক; ঐ শ্লোক দেব, দ্বিজ বা রাজার স্তুতিবিষয়ক অথবা শ্রোতৃবর্গের প্রতি আশীর্বাদযুক্ত। কখনও কখনও বর্ণনীয় বস্তুর সূচনা ইহাতে থাকে। তৎপর প্রস্তাবনা বা স্থাপনায় সাধারণতঃ গ্রন্থ ও রচয়িতার নাম এবং উহার রচনার বা অভিনয়ের উপলক্ষ্য প্রভৃতি লিপিবদ্ধ থাকে। গ্রন্থসমাপ্তি হয় ভরতবাক্য নামক

একটি শ্লোকের দ্বারা। গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের সাধারণতঃ ৫টি সন্ধি থাকে, যথা মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ, উপসংহৃতি। বিষয়বস্তু আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক -ভেদে দ্বিবিধ। দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, মৃত্যু, অভিশাপ প্রভৃতি কতকগুলি অপ্রীতিকর ব্যাপারের অভিনয় রঙ্গমঞ্চে নিষিদ্ধ বলিয়া এইগুলি বিষ্কম্ভকাদির সাহায্যে নাট্যগ্রন্থে সূচিত হইয়া থাকে। নাট্যশাস্ত্র ও তদনুসারি আলংকারিকগণের মতে নাট্যবস্তু বিয়োগান্তক হইতে পারে না। নাট্যগ্রন্থে সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর চরিত্রের ভাষা সংস্কৃত; নীচশ্রেণীর ব্যক্তি ও নারীগণ প্রাকৃতে কথা বলে।

ভারতবর্ষে নাট্য-সাহিত্যের উদ্ভব কবে কেমন করিয়া হইয়াছিল, এই সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত অদ্যাবধি হয় নাই। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'-এ এই সম্বন্ধে যে আখ্যান আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মা চতুর্বেদ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নাটক সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং শিবের তাণ্ডব ও পার্বতীর লাস্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। কোনও কোনও আধুনিক গবেষকের মতে, ঋগ্বেদের পুরূরবা-উর্বশী ও যম-যমী প্রভৃতি সংবাদসূক্ত দৃশ্যকাব্যের বা নাট্যগ্রন্থের অগ্রদূত। সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত পুতুলনাচই ছিল দৃশ্যকাব্যের মূল আদর্শ, পাশ্চাত্য পণ্ডিত পিশেলের এই মত। কাহারও কাহারও মতে, শীতের পরে প্রচলিত বসন্তোৎসব ছিল দৃশ্যকাব্যের আদর্শ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত রিজ্ওয়ে মনে করেন যে, পরলোকগত পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশে যে অনুষ্ঠান প্রাচীন-কালে বিহিত ছিল উহারই রূপান্তর দৃশ্যকাব্য। আবার কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন যে, বৈদিক যুগের মহাব্রত নামক অনুষ্ঠান নাট্যগ্রন্থরচনার প্রেরণা দান করিয়াছিল; এই অনুষ্ঠানের নাটকীয় অংশে আছে বৈশ্য ও শূদ্রের যুদ্ধ ও বৈশ্যের জয়লাভ এবং ব্রাহ্মণ ছাত্রের ও গণিকার অশ্রাব্য ভাষায় পারস্পরিক কটূক্তিপ্রয়োগ। ওইণ্ডিশ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ভারতীয় পণ্ডিতগণ গ্রীকগণের নিকট হইতে দৃশ্যকাব্যরচনার প্রেরণা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, আলেক্সান্দরের ভারত-অভিযানের পরে গ্রীক-শাসকগণের দরবারে যে নাটকের অভিনয় হইত, তদ্দৃষ্টে ভারতীয় পণ্ডিতগণ নাট্য-গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গ্রীকপ্রভাবের বিরুদ্ধবাদী-গণ এই মতের বিপক্ষে বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা রূপক ও উপরূপক। রূপক নামক প্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত গ্রন্থগুলি দশবিধ—নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন। অষ্টাদশবিধ নাট্যগ্রন্থ উপরূপকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; ইহাদের মধ্যে নাটিকা প্রধান। রূপকের মধ্যে নাটক, প্রকরণ ও ভাণ প্রধান। নাটকের অঙ্কসংখ্যা ৫ হইতে ১০; প্রকরণের অঙ্কসংখ্যা সাধারণতঃ ১০। নাটকের বস্তু বিখ্যাত বৃত্তান্ত, নেতা প্রখ্যাতবংশ রাজা অথবা দিব্য পুরুষ এবং রস প্রধানতঃ শৃঙ্গার বা বীর; প্রকরণের বস্তু লৌকিক বা কবিকল্পিত, নায়ক বিপ্র, অমাত্য বা বণিক, নায়িকা কুলবধূ বা বেশ্যা অথবা উভয়ই এবং প্রধান রস শৃঙ্গার। ভাণ একাঙ্ক; ইহাতে বিট একমাত্র চরিত্র। ইহার বিষয়বস্তু ধূর্ত নায়কের কার্যকলাপ এবং রস শৃঙ্গার ও বীর। নাটিকা চতুরঙ্ক। ইহার বিষয়বস্তু কাল্পনিক এবং নায়ক ধীরললিত রাজা। মহিষীর মান প্রভৃতি বাধা অতিক্রমপূর্বক নবানুরাগা নারীর সহিত রাজার বিবাহ ইহাতে বর্ণিত হয়।

পদ্যকাব্যের ন্যায় দৃশ্যকাব্যেও কালিদাস সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁহাকে কেন্দ্রস্বরূপ রাখিয়া দৃশ্যকাব্যের নিম্ন-লিখিত যুগবিভাগ করা যায়: ক. কালিদাসপূর্ব যুগ খ. কালিদাস যুগ গ. কালিদাসোত্তর যুগ ঘ. ক্ষয়িষ্ণু যুগ।

নাট্যগ্রন্থরচনার সূত্রপাত কোন সুদূর অতীতে হইয়া-ছিল তাহা বলা যায় না। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'-এ 'অমৃত-মন্থন' ও 'ত্রিপুরদাহ' নামক যে দুইটি দৃশ্যকাব্য ব্রহ্মা কর্তৃক রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহারা কোনও বিস্মৃত গ্রন্থকারের রচিত কিংবা কাল্পনিক নামমাত্র তাহা অনিশ্চিত। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে পাণিনি 'অষ্টা-ধ্যায়ী'তে (৪।৩।১১০) 'নটসূত্র'-এর উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ঐ শতকে রচিত কৌটিলীয় 'অর্থশাস্ত্র'-এ 'কুশীলব' শব্দটির প্রয়োগ আছে। সুতরাং মনে হয়, খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের পূর্বেই নাট্যগ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। পতঞ্জলির (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতক) 'মহাভাষ্য'-এ 'কংসবধ' ও 'বলিবন্ধ' নামক দুইখানি দৃশ্যকাব্যের উল্লেখ আছে। রামায়ণে নাটক শব্দটির উল্লেখ আছে। মহাভারতের অন্তর্গত 'হরিবংশ'-এ কৃষ্ণের বংশধরগণ কর্তৃক অভিনীত নাটকের কথা লিখিত আছে। আধুনিক কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের মতে, রামায়ণ ও মহাভারতের বর্তমান রূপ যথাক্রমে আনুমানিক ২য়-৩য় শতকে এবং ৪র্থ শতকে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু উহাদের আদিরূপের উৎপত্তি ও বর্তমানরূপে বিবর্তনের কাল অজ্ঞাত।

কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে সৌমিল্ল ও কবিপুত্র (পাঠান্তর সোমিল ও রামিল) নামে যে দুইজন নাট্য-কারের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের বা তাঁহাদের রচিত

গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। অশ্বঘোষ কালিদাসপূর্ব যুগের খ্যাতনামা নাট্যকার। তাঁহার 'শারিপুত্রপ্রকরণ' বা 'শারদ্বতীপুত্রপ্রকরণ' নামক নাট্যগ্রন্থের তালপত্রে লিখিত অংশমাত্র মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বুদ্ধ কর্তৃক শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষার বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থের রচনা সাবলীল ও সরস বলিয়া মনে হয় ('অশ্বঘোষ' দ্র)।

কালিদাস ভাসের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু ভাস তাঁহার কতকাল পূর্বেকার লেখক তাহা নির্ণীত হয় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতক হইতে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতক পর্যন্ত নানা কালই ভাসের কাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিত নির্দেশ করিয়াছেন। ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে গণপতি শাস্ত্রী ত্রিবান্দ্রম নামক স্থানে ১৩টি নাট্যগ্রন্থের একগুচ্ছ পুথি আবিষ্কার করেন। ইহাদের মধ্যে কোনওটিতেই নাট্যকারের নাম না থাকিলেও শাস্ত্রীমহাশয় নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া এইগুলি ভাস-রচিত বলিয়া ঘোষণা করেন। বিরুদ্ধবাদীগণ প্রতিকূল যুক্তির সাহায্যে এই মত স্বীকার করেন না। গ্রন্থগুলির নাম এইরূপ: ১. প্রতিমা ২. অভিষেক ৩. মধ্যমব্যায়োগ ৪. পঞ্চরাত্র ৫. দূতবাক্য ৬. দূতঘটোৎকচ ৭. কর্ণভার ৮. ঊরুভঙ্গ ৯. বালচরিত ১০. স্বপ্নবাসবদত্তা ১১. প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ১২. অবিমারক ১৩. চারুদত্ত। গ্রন্থগুলির ভাষা প্রাঞ্জল ও কবিত্বপূর্ণ; মাঝে মাঝে অপাণিনীয় প্রয়োগ বিদ্যমান।

কালিদাসের নাটক ৩টি: অভিজ্ঞানশকুন্তল, মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশী; তন্মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তল শ্রেষ্ঠ। কালিদাসের কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকিলেও অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিত তাঁহাকে গুপ্তযুগে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকের কাছাকাছি সময়ের লেখক বলিয়া মনে করেন ('কালিদাস' দ্র)। কালিদাসের চরিত্রচিত্রণ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, গতানুগতিক কাহিনীতে নবীনত্বসৃষ্টি প্রভৃতি সর্বজন-প্রশংসিত। তাঁহার রচনার স্বচ্ছন্দগতি ও উপমাপ্রয়োগ চিত্তাকর্ষক।

কালিদাসোত্তর যুগের অন্যতম নাট্যকার শূদ্রক। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত নানা কালই ইঁহার কাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিত নির্দেশ করিয়াছেন। ইঁহার 'মৃচ্ছকটিক' নামক প্রকরণের বিষয়বস্তু গণিকা বসন্তসেনা ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রেমের কাহিনী। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ইহা সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এই যুগের 'উভয়াভিসারিকা', 'পদ্মপ্রাভৃতক', 'ধূর্তবিটসংবাদ' ও 'পাদতাড়িতক' যথাক্রমে বররুচি, শূদ্রক, ঈশ্বরদত্ত ও শ্যামলিক -রচিত ভাণ। এই গ্রন্থগুলিতে তদানীন্তন সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে।

হর্ষের (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক) 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'রত্নাবলী' উদয়নের প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটিকা। তৎ-রচিত 'নাগানন্দ' নাটকের বিষয়বস্তু রাজকুমারী মলয়বতী ও বিদ্যাধরগণের যুবরাজ জীমূতবাহনের পারস্পরিক প্রেম।

বিশাখদত্তের (সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকের পূর্ববর্তী) 'মুদ্রারাক্ষস'-এর বিষয়বস্তু চন্দ্রগুপ্তমন্ত্রী চাণক্য কর্তৃক কূট রাজনীতির সাহায্যে উন্মূলিত নন্দরাজগণের মন্ত্রী রাক্ষসের স্বপক্ষে আনয়ন। রাজনীতি অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থ নাট্যসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী; ইহাতে নারী চরিত্র নাই বলিলেই চলে। চাণক্য ও রাক্ষসের বিপরীত-ধর্মী চরিত্রের বিশ্লেষণে নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচনা সরল ও স্বচ্ছন্দগতি।

ভীম কর্তৃক দুঃশাসন বধ, তাঁহার রক্তে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন এবং দুর্যোধনের নিধন, মহাভারতের এই আখ্যান অবলম্বনে ভট্টনারায়ণের (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৯ম শতক) 'বেণীসংহার' রচিত।

ভবভূতির (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৭ম-৮ম শতক) 'মহাবীরচরিত' ও 'উত্তররামচরিত' রামায়ণ অবলম্বনে রচিত। তাঁহার 'মালতীমাধব' নামক প্রকরণের বিষয়বস্তু মাধব নামক ছাত্রের সহিত মন্ত্রিকন্যা মালতীর প্রণয় এবং বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা কামন্দকীর কৌশলে প্রণয়ের সার্থকতা। ভবভূতির ভাষা স্থানে স্থানে দুরূহশব্দবহুল হইলেও তাঁহার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, চরিত্রচিত্রণ, বিশেষতঃ করুণরসের বিশ্লেষণ প্রশংসনীয়।

খ্রীষ্টীয় ৯ম শতক হইতে মোটামুটিভাবে ক্ষয়িষ্ণু যুগের প্রারম্ভ বলা যায়। এই যুগে রচিত গ্রন্থগুলি নাট্যশাস্ত্রের নিয়মে নিগড়িত, নাটক হিসাবে নগণ্য এবং অনেকক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের অনুকরণমাত্র। এই যুগের প্রধান কয়েকজন নাট্যকার হইলেন: কৃষ্ণমিশ্র, ক্ষেমীশ্বর, মুরারি ও রাজশেখর। ইহাদের উল্লেখযোগ্য নাটক যথাক্রমে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' (রূপক-নাট্য, ইহাতে অহঙ্কার, মোহ, কাম, ধর্ম প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে), 'চণ্ডকৌশিক' (হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে রচিত), 'অনর্ঘরাঘব' (রামায়ণের কাহিনী ইহার বিষয়বস্তু), 'বালরামায়ণ' (রামায়ণ অবলম্বনে রচিত), 'বালভারত' (মহাভারত অবলম্বনে রচিত), 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' (নাটিকা)।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যপ্রযোজনা মঞ্চে নাটক উপস্থাপনার জন্য যে সকল ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবস্থাপনা করিতে হয় তাহাকেই নাট্যপ্রযোজনা বলে। নাট্যপ্রযোজনার পিছনে বিভিন্ন কর্মসূচী থাকে। নাটকনির্বাচন, অভিনেতৃবর্গের সহিত চুক্তিপত্র সম্পাদন, অভিনয়কালে নেপথ্যবিধানের কর্মচারী নিয়োগ, নাটকের স্ক্রিপ্ট প্রস্তুত করানো, পরিচালকনিয়োগ এবং তাঁহার সহিত নাটকের প্রয়োজনীয় রূপপরিবর্তন, উপস্থাপনা ও ভূমিকার নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা ও স্থিরীকরণ, মঞ্চব্যবস্থা, দৃশ্য-অঙ্কন, আলোক ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা, আর্থিক বন্দোবস্ত, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, টিকিটবিক্রয় এবং অভিনয়ের শেষে দেনাপাওনা ওয়াসিল করা ও হিসাব প্রস্তুত করা প্রভৃতি নাট্যপ্রযোজনার বিভিন্ন অঙ্গ। ইহা ছাড়া নিয়মিত মহলার বন্দোবস্ত করা এবং নাট্যপ্রযোজনার বিভিন্ন বিভাগকে সুসংহত করিয়া নাটক অভিনয় করানো নাট্যপ্রযোজনার মূল লক্ষ্য। এই প্রযোজনা যিনি বা যাঁহারা করেন তিনি বা তাঁহারা সেই নাটকাভিনয়ের প্রযোজক।

আমেরিকাতে প্রযোজক নাটকের ধরন স্থির করিলেও তাঁহার দায়িত্ব কেবল আর্থিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ ; অন্যান্য সকল ভার তাঁহার নিযুক্ত পরিচালকের উপর ন্যস্ত। নাট্যপরিচালক প্রযোজকের নিকট সকল বিষয়ে জবাবদিহি করিবার জন্য দায়ী থাকেন। ইংল্যাণ্ড ও ইওরোপে কিন্তু সাধারণতঃ একই ব্যক্তি প্রযোজক ও পরিচালক হন। আর্থিক বিষয়ে দেখাশুনার ভার সচরাচর ব্যবসায়ী-ম্যানেজারের উপর অর্পিত হয়। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র-মতে মনে হয়, প্রাচীন ভারতবর্ষে পরিচালকই প্রযোজকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। তিনি অভিনেতা নির্বাচন করিয়া তাহাদের নাট্যশিক্ষা দিতেন এবং দেবতাগন্ধর্বাদির আরাধনা বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন। বর্তমানকালে ভারতবর্ষে আমেরিকার রীতি প্রচলিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রযোজক ও পরিচালক ভিন্ন ব্যক্তি হইয়াছেন। প্রযোজক সমগ্র নাট্যপ্রযোজনার আর্থিক দায়িত্ব এবং পরিচালক মঞ্চ ও অভিনয়সম্পর্কীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরিচালক সর্বদা প্রযোজকের অধীনে থাকেন।

বর্তমানে আর্থিক দিকগুলি বাদ দিলে নাট্যপ্রযোজনাকে দুইভাগে ভাগ করা চলেঃ অভিনয় ও নেপথ্যবিধান। অভিনয়কে সুষ্ঠু করিবার জন্য ভূমিকানির্বাচন, নিয়মিত মহলা, বাচন, অঙ্গসঞ্চালন ও মঞ্চে যাতায়াত, প্রতীক্ষা প্রভৃতি (মুভ্‌মেণ্ট) শিক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিয়মসঙ্গত ভাবব্যঞ্জনা এবং সুস্পষ্ট সংলাপ দর্শকগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য পরিশ্রম ও যত্নসহকারে নিয়মিত অভিনয় শিক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। নেপথ্যবিধানের মধ্যে প্রথমেই মঞ্চ, মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যপটের ব্যবস্থা করণীয়। বর্তমানে মঞ্চসজ্জা এবং দৃশ্যপট অপেক্ষা আলোকপাত এবং আলোকনিয়ন্ত্রণই প্রাধান্য পাইতেছে। নেপথ্যসংগীত, নেপথ্যশব্দ অথবা দৃশ্যের কোনও সংগীত, বাচন বা শব্দ নেপথ্য হইতে করা নাট্যপ্রযোজনার অঙ্গীভূত হইয়াছে।

নাট্যপ্রযোজনা বা প্রযোজক শব্দটি আধুনিক কালেরই সৃষ্ট। ১৯শ শতাব্দীর পূর্বে অ্যাক্টর-ম্যানেজার বা প্রধান অভিনেতা ও ম্যানেজার প্রভৃতি নামে আধুনিক প্রযোজক ও পরিচালকগণের পরিচয় হইত। বাংলার রঙ্গমঞ্চে 'মোশন-মাস্টার' বা ম্যানেজার বা শিক্ষক বা সম্পাদক অথবা স্বত্বাধিকারীরূপে প্রথম যুগে প্রযোজক ও পরিচালকগণ পরিচিত হইতেন।

বাংলা দেশের খ্যাতনামা পরিচালক বা প্রযোজকরূপে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর খ্যাতনামা প্রযোজক কন্‌স্তান্তীন স্তানিস্লাভ্‌স্কি, ডিউক অফ স্যাক্সে-মেনিনজেন, হেনরি আরভিং, জর্জ আলেকজাণ্ডার, এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ, রাইন্‌হার্ট, গ্র্যান্‌ভিল বার্‌কার, কোপো, মাইয়র্‌হোল্ট, কক্‌লাঁ, বের্য়াটোল্ট ব্রেখ্‌ট এবং বেলাস্‌কো অতীতদিনের বিখ্যাত প্রযোজকগণের অন্যতম।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৪৬; Phyllis Hartnoll, ed., *The Oxford Companion to the Theatre*, London, 1951; Manomohan Ghosh, *The Natyasastra*, vol. II, Calcutta, 1961.

সৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

নাট্যশাস্ত্র ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের প্রথম ও প্রধান প্রমাণমূলক গ্রন্থ হইল ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র'। ইহাতে নাটকের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রকার আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত বিষয়গুলি এইরূপ: ১. নাট্যের পৌরাণিক উদ্ভবকাহিনী ২. রঙ্গ (রঙ্গভূমি) সম্বন্ধে নির্মাণগত বিবরণ ও তাহার পূজাবিধি ৩. নাট্যপ্রদর্শন-বিষয়ে প্রারম্ভিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং নৃত্য, গীত ও বাদিত্র সহযোগে এই সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োগবিবরণ ৪. একতান সংগীতাদির প্রয়োগবিধি ৫. নানাভাবে অনুকৃতিবিদ্যার পরিচয় ৬. নাট্যালংকার ও নাট্যরস ৭. নাট্যের প্রয়োগে ভাষাগত, উপভাষাগত, ছন্দঃ-সম্পর্কিত ও আবৃত্তিবিষয়ক

আলোচনা ৮. নাট্যের বিভিন্ন প্রকার ও নাট্যগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ৯. নাটকীয় সজ্জা, পরিচ্ছদ ও অঙ্ক বিবর্তন-প্রণালী ইত্যাদির পরিচয় ১০. নাট্য-সংগীত বিষয়ে পূর্ণ আলোচনা ১১. নাটকীয় চরিত্র, বিদ্যা, গুণ, জাতি ইত্যাদি ভেদে বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা।

ভরতমুনি নাটকের বিস্তৃত লক্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, যে রসগুলি পূর্বস্থিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, নাটকগত চরিত্রগুলি অনুকরণকালে সেগুলির পুনরুৎপত্তি করিয়া থাকে। পুনরুৎপত্তির উপায়রূপে চারিটি প্রকারের উল্লেখ করা হয়, যথা আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। প্রথমটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন সঞ্চালনের ফলে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়টি মূল ভাবটির ভাষাগত অনুকৃতির ফলে দর্শকদের মনে সমান ভাবের উৎপত্তি-কারক। তৃতীয়টি রঙ্গভূমির সজ্জা, বর্ণসম্প্রয়োগ, বেশ-ভূষা প্রভৃতি সর্বপ্রকার বাহ্যিক উপকরণের যথাযথ আহরণে ও বিধানে উৎপন্ন হয়। চতুর্থটি নাটকীয় পাত্র কর্তৃক নানা শারীরিক অবস্থার অভিনয়ের দ্বারা উৎপন্ন হয়; যখন নাটকীয় পাত্রটি কোনও ভূমিকায় কাহারও অনুকরণ করেন, তখন সেই অনুক্রিয়মাণ ব্যক্তির সেই অবস্থায় যে ভাবাদির প্রকাশ হয়, তাহাই স্তম্ভ, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, রোমাঞ্চ, স্বরসাদ, মূর্ছা বা প্রলয়, এই আটটি সাত্ত্বিক অবস্থার দ্বারা পাত্রটির মধ্যে প্রতিফলিত হইলেই এই চতুর্থ উপায়টি কার্যসাধন করে।

নাট্যকে আবার 'রূপ' বা 'রূপক' নামেও অভিহিত করা হয়। যাহার দ্বারা কিছু রূপিত হইয়া নাটকীয় পাত্রগুলির মধ্যে নাট্যকারের নিপুণ হস্তে স্থানলাভ করে তাহাই 'রূপক'। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে এইরূপ দশটি 'রূপক' প্রসিদ্ধ ('দশরূপক', ১।৭ ; 'নাট্যশাস্ত্র', ১৮।২)। তাহাদের নাম নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, উৎসৃষ্টাঙ্ক, বীথী ও প্রহসন।

নাটক ইহাদের মধ্যে এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। নাটকের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করিলেই সকল প্রকারের রূপকের বিষয়ে অজ্ঞাত কিছু থাকিবে না, কারণ মুখ্যভাবে অঙ্কের সংখ্যায় বা কথাবস্তুর বিচিত্রতায় অন্যান্য শ্রেণীর রূপকগুলির নামকরণ ও বিষয়-নিরূপণ করা হইয়াছে। ভরতমুনির মতে নাটকটি হইবে সেইরূপ এক নায়ককে কেন্দ্র করিয়া যিনি প্রধানতঃ একজন 'প্রখ্যাত রাজর্ষি' ('নাট্যশাস্ত্র', ১৮।১০) অর্থাৎ ইতিহাস, রামায়ণ, মহাভারত অথবা শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি কাহিনীতে প্রসিদ্ধ কোনও চরিত্রই মুখ্যভাবে নাটকের নায়ক হইবে। ইহা ছাড়া ভরতমুনির মতে, নায়ককে 'উদাত্ত' ('নাট্যশাস্ত্র,' ১৮।১০)-রূপে চিত্রিত করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই উদাত্ত বিশেষণটি নায়কের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বোধক, কেবল পারিভাষিক 'উদাত্ত' অর্থে ব্যবহৃত হয় না। একদিকে উচ্চকুল-মর্যাদা আর অন্য দিকে চিত্তের ঔদার্য ও ক্রিয়ার বীর্য ওতপ্রোতভাবে নায়কের মধ্যে থাকিবে। ভরতমুনির মতে পারিভাষিকভাবে নায়ক চারিপ্রকারের 'প্রকৃতি' দ্বারা বিশেষিত হইতে পারেন, যথা 'উদাত্ত', 'উদ্ধত', 'ললিত' ও 'শান্ত' ('নাট্যশাস্ত্র', ২৪।১৭)। আবার কোনও বিশেষ বিশেষ চরিত্র বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির ('নাট্যশাস্ত্র', ২৪।১) দ্বারা যুক্ত হইতে পারেন।

নাটকের ফলরূপে প্রাচীন মতে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের প্রাপ্তিই উল্লিখিত হইয়াছিল। ভরতমুনি ইহাকেই 'বিভূতি' নামে অভিহিত করিয়াছেন ('নাট্য-শাস্ত্র', ১৮।১১)। পরবর্তীকালেও বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি আলংকারিকগণও ইহাদের স্বীকৃতি দিয়াছেন। তবে কখনও কখনও অর্থভেদ দেখা গিয়াছে। ভরতমুনির মতে এই 'বিভূতি'গুলি ঐহিক অভ্যুদয়কে সূচনা করে। এইরূপ অভ্যুদয়ের মধ্যে 'ঋদ্ধি' ও 'বিলাস' এই দুইটি অত্যন্ত বাস্তব ফলকে ভরতমুনির গ্রন্থে অন্তর্গত করা হইয়াছে।

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের আর একটি বিষয় হইল রস। ভরতমুনি নাটকে বহুবিধ রসের সমাবেশের উল্লেখ করিয়াছেন ('নাট্যশাস্ত্র', ১৮।১২)। যদি নাটকের প্রধান প্রয়োজন বলিয়া অর্থ ও কামকেই স্বীকৃতি দেওয়া হইয়া থাকে, তবে নাটকের মধ্যে দুইটি প্রধান 'রস'রূপে স্বীকৃত যে কোনওটি প্রমুখ হইয়া উঠিবে। এই দুইটি প্রধান 'রস'রূপে 'বীর' ও 'শৃঙ্গার'কেই গ্রহণ করা হইয়াছে ('সাহিত্যদর্পণ', ৬।১০ ; 'রসার্ণবসুধাকর', ৩।১৩১)। কিন্তু ভরতমুনির মতে 'রস'-রূপে স্বীকৃত যে কোনওটিই প্রধান হইতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন 'রস' ও 'ভাব' প্রয়োগ করিলে বিভিন্ন বৃত্তির উদ্বোধ হয় ও ইহাতে নাটকের পূর্ণাঙ্গতা হয়। এই 'বৃত্তি'গুলিকেই ভরতমুনি 'মাতৃকা' নামে অভিহিত করেন ('নাট্যশাস্ত্র', ১৮।৪); সমগ্র নাটকটির মধ্যে বিভিন্ন রসের সমাবেশ ঘটিলেই বিভিন্ন 'বৃত্তি'র উদয় হয় এবং এইগুলিই মাতৃকা বা মাতৃভাবে নাটকটিকে পরিপুষ্ট করে। এই দৃষ্টিতে পরবর্তী কোনও কোনও নাট্যবিচারক বলিয়াছেন যে, নাটকটি তখনই 'পূর্ণলক্ষণ' হয় যখন ইহাতে 'রস' ও অলংকার পূর্ণভাবে থাকে (শারদাতনয়-কৃত 'ভাবপ্রকাশ', ৮।১২)।

এই রসের সংজ্ঞা ও সংখ্যা পরবর্তীকালে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। রস-পদার্থ সর্বদাই বাচ্য-চমৎকার

অথবা ব্যঙ্গ-চমৎকার এই উভয়বিধ লৌকিক-চমৎকারকে অতিক্রম করিয়া এক অলৌকিক পর্যায়ে উপনীত হয়। অতএব 'ধ্বনি'র ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ-চমৎকৃতি প্রধান (অর্থাৎ 'গুণীভূত ব্যঙ্গ' স্থলেই কেবল বাচ্য-চমৎকৃতির প্রাধান্য থাকিতে পারে), কিন্তু 'রস' বস্তুটি 'স্থায়ি-ভাব'রূপে এই-রূপ লৌকিক-চমৎকৃতি উৎপন্ন না করিলেও অলৌকিক-ভাবে আস্বাদিত হয়। রস বস্তুটি স্থায়ি-ভাবরূপে অলৌকিক পর্যায়ে উন্নীত হইলেও ভরতমুনি অষ্টবিধ মানসিক ভাবের প্রয়োজনে ইহাকে অষ্ট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ('নাট্য-শাস্ত্র,' ৬।১৬)। রসের বিভাগ এইরূপ: ১. শৃঙ্গার ২. হাস্য ৩. করুণ ৪. রৌদ্র ৫. বীর ৬. ভয়ানক ৭. বীভৎস ৮. অদ্ভুত। এইগুলিকে উৎপন্ন করিবার মূলে আছে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব। ৩৩টি 'ব্যভিচারিভাব' ও ৮টি 'সাত্ত্বিকভাব' সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ ও বিবরণ রহিয়াছে ('নাট্যশাস্ত্র', ৭।৯৩-৯৪)। এই প্রসঙ্গে 'শান্ত' রসকে 'নবম রস' বলিয়া গ্রহণ করার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি আছে। প্রকৃতপক্ষে 'শান্ত' রস মোক্ষরূপ পুরুষার্থের জন্য যাহাদের মন উদ্‌গ্রীব তাহাদের জন্যই বিহিত।

ত্রতীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

নাড়ী প্রতিবার হৃৎস্পন্দনের সময়ে বাম নিলয়ের সংকোচনের ফলে রক্ত সহসা উৎক্ষিপ্ত হইয়া মহাধমনীতে প্রবেশ করিয়া মহাধমনীর প্রথমাংশে চাপ বৃদ্ধি করে। স্থিতিস্থাপক ধমনীগাত্রে এই চাপের প্রভাবে মহাধমনীর প্রথমাংশের ব্যাস সাময়িকভাবে বর্ধিত হয়। পরমুহূর্তেই এই পরিবর্তন মহাধমনীর পরবর্তী অংশে বিস্তৃত হয়। এভাবে ক্রমে ধমনীর ব্যাসের এই পরিবর্তন তরঙ্গের মত ধমনীর শেষ অংশ পর্যন্ত চলিয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ধমনীর এরূপ পরিবর্তনকে নাড়ী (পাল্‌স) বলে। ধমনী স্পর্শ করিলে নাড়ীর এই স্পন্দন অনুভব করা যায়। এভাবে নাড়ী পরীক্ষার দ্বারা হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর অবস্থা এবং হৃৎস্পন্দন সম্বন্ধে অনেক আভাস পাওয়া যায়; ইহার দ্বারা রোগনির্ণয়েরও সাহায্য হয়।

ধমনীগাত্র বাহিয়া নাড়ীর স্পন্দন সেকেণ্ডে প্রায় ৭ মিটার গতিতে আগাইয়া চলে। স্ফিগ্‌মোগ্র্যাফ নামক যন্ত্রের সাহায্যে ভুসা-লাগানো চলমান কাগজের উপর নাড়ীর স্পন্দনের লেখ লিপিবদ্ধ করা যায়।

মহাশিরাগুলি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দের সংলগ্ন বলিয়া হৃৎপিণ্ডে চাপের তারতম্যের ফলে মহাশিরাতেও নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যায়।

সুখময় লাহিড়ী

নাৎসীবাদ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে জার্মানীতে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদী সমাজবাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী মিত্রশক্তিবর্গের নির্দেশিত কঠোর ও অপমানসূচক সন্ধি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই সময়েই রাশিয়ার সার্থক বলশেভিক বিপ্লব জার্মানীতে শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রসারের পথ খুঁজিতেছিল। জনজীবনে সামূহিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে সমাজবাদী (সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট) নেতৃবৃন্দ ভার্সাই সন্ধি গ্রহণ ও কার্যকরী করায় জনচিত্ত আন্তর্জাতিক সমাজবাদকে জাতীয় দুর্বলতার এক প্রধান কারণ বলিয়া স্থির করে। তৎকালীন জার্মানীর তীব্র জাতীয়চেতনা সর্বপ্রকার আন্তর্জাতিকতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। জার্মানযোদ্ধগণ মর্মান্তিক গ্লানি বহন করিতেছিল। পরাভূত জার্মানীর দর্পিত বিক্ষুব্ধ আত্মা এমন এক মতবাদের প্রত্যাশী ছিল যাহা জার্মানীর জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক অথচ পরস্পরবিরোধী মতধারার মিলন সম্ভব করিয়া জার্মান জাতিকে এক আবেগপূর্ণ একতাসূত্রে গাঁথিতে পারে। এই বিচিত্র ভাবসংমিশ্রণের মূর্ত বিগ্রহ অ্যাডল্‌ফ হিটলার -এর মতবাদ নাৎসীবাদ বা 'ন্যাশন্যাল সোশ্যালিজ্‌ম' (জাতীয় সমাজবাদ) গ্রহণ করিয়া জার্মান জাতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে অভূতপূর্ব শক্তি ও সংহতি অর্জন করে।

নাৎসীবাদ হিটলারের মাধ্যমে পূর্ণ প্রকটিত হইলেও ইহার প্রধান সূত্রগুলি জার্মান জাতির ঐতিহ্য হইতে অনেকাংশে উদ্ধার করা যায়। বিশাল জার্মানী গঠনের স্বপ্ন, জার্মান জাতির বিশুদ্ধতা ও তাহার শ্রেষ্ঠতা, ইহুদী জাতির প্রতি ঘৃণা, ইহাদের সবকয়টিই নাৎসীবাদের মধ্যে থাকিলেও কোনওটিই হিটলারের আবিষ্কৃত নহে। সমাজবাদের বুলিও তদানীন্তন জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যেই প্রচারিত ছিল। হিটলারের কৃতিত্ব এই বিভিন্ন চিন্তাধারাকে একটি সরল আবেগময় রূপদান। হিটলারের প্রথম অভ্যুত্থানের (১৯২৩ খ্রী) প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত না হইলেও কিয়ৎকালের মধ্যেই মুদ্রাস্ফীতি-জনিত ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে অভিভূত জার্মান মধ্যবিত্ত সমাজ সাগ্রহে হিটলারের মতবাদ গ্রহণ করে এবং নাৎসীদল নির্বাচনের মাধ্যমেই দ্রুত শক্তিসঞ্চয় করে। সাংবিধানিক উপায়ে চ্যান্সেলার পদে বৃত হইবার (১৯৩৩ খ্রী) অল্পদিন পরেই হিটলার জাতির সর্বাধি-নায়কত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জার্মান জাতীয় জীবনকে কঠোর শৃঙ্খলায় পরিচালিত করেন। এ বিষয়ে ইটালীতে মুসোলিনির রাষ্ট্রসংগঠন (ফ্যাসিজ্‌ম) ও

বলশেভিক দলের সংগঠন, উভয় হইতেই হিটলার প্রচুর প্রেরণা পান। প্রাথমিক পর্যায়ে নাৎসীবাদের মধ্যে প্রচুর ধনতন্ত্রবিরোধী ভাবধারা থাকিলেও হিটলার সুকৌশলে সমাজবিপ্লববাদকে জাতীয় গৌরবাকাঙ্ক্ষা ও জিগীষার মধ্যে মিশাইয়া দিতে সক্ষম হন। নাৎসীবাদের চরম উৎকর্ষের সময়ে সমগ্র জার্মান জাতীয় জীবন রাষ্ট্রায়ত্ত হয়।

দ্র Adolf Hitler, *Mein Kampf*, vols. I & II, Munich, 1925-27; K. Heiden, *A History of National Socialism*, London, 1935; F. A. Hayek, *Road to Serfdom*, London, 1944.

সাধনা দাস

নাথধর্ম, নাথসাহিত্য নাথ-সম্প্রদায় নামে খ্যাত ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ যোগী-সম্প্রদায়ের ধর্মমত এবং সম্প্রদায়-ভুক্ত সিদ্ধযোগী ও তাঁহাদের রাজ-শিষ্যগণকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া-ওঠা কতকগুলি লৌকিক-অলৌকিক কাহিনী লইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাষায় অনেক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় যে-সব সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহাই বাংলা নাথসাহিত্য নামে খ্যাত।

'নাথ' কথাটি নাথ-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গুরুগণ বা সিদ্ধাচার্যগণের উপাধিরূপেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় ('নাথপন্থ' দ্র)। তত্ত্বদৃষ্টিতে 'নাথ' কথাটি একটি পরমার্থিক অবস্থার দ্যোতক। যোগীগণ যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপরে নাথত্ব বা প্রভুত্ব লাভ করেন এবং মৃত্যুঞ্জয় হইয়া প্রথমে সিদ্ধতনু এবং পরে দিব্যতনু বা প্রণবতনুতে ইচ্ছাময়রূপে অবস্থান করেন, তখনই তাঁহারা প্রকৃত 'নাথ' হন। মহাদেবই নাথগুরুগণের আরাধ্য বা আদর্শ; এবং সকল নাথশাস্ত্রকাহিনীতেই স্বয়ং মহাদেবকে এই সম্প্রদায়ের সিদ্ধগুরুগণের আদি, অর্থাৎ আদিনাথ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। নাথ-সম্প্রদায় শৈব-যোগী-সম্প্রদায়রূপেই খ্যাত।

নাথধর্মের প্রবর্তন-কাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক নিশ্চয়তা কিছুই নাই, যাহা কিছু তথ্য তাহা কাহিনী-কিংবদন্তী হইতেই সংগৃহীত। চৌরাশী সিদ্ধার তালিকা প্রবাদনির্ভর বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্য এবং নাথ-সিদ্ধাচার্যগণের নাম একসঙ্গে পাওয়া যায়। সেইজন্য মনে হয়, এই সকল সিদ্ধাচার্য সমসাময়িক ছিলেন; ইহারা খ্রীষ্টীয় ১০ম হইতে ১২শ শতকের মধ্যবর্তী বা তৎসন্নিহিত কালের লোক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে মুখ্যভাবে চারিজন নাথগুরুর কথাই পাওয়া যায়, ইহারা হইলেন মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ (কোনও কোনও মতে ইহারা দুই ব্যক্তি), গোরক্ষনাথ বা গোর্খনাথ (গোরখনাথ), জালন্ধরী-পা বা হাড়ি-সিদ্ধা এবং কানু-পা। উপাখ্যানের মধ্যে ইহাদের সহিত মানিকচন্দ্র রাজা, তাঁহার স্ত্রী রানী ময়নামতী এবং পুত্র গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকেও পাওয়া যায়।

বাংলা নাথসাহিত্যের উপজীব্য মুখ্যভাবে দুইটি কাহিনী। প্রথম কাহিনীটি হইল প্রধানভাবে গুরু মীননাথ ও তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথকে লইয়া। এই কাহিনীর প্রথমে আছে সৃষ্টিবর্ণনা; তাহার পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে আদিদেবতা নিরঞ্জনের বদন হইতে মস্তকে জটাধারী ও কর্ণে কুণ্ডলধারী আদিনাথ শিবের উৎপত্তি। নিরঞ্জনের হাড় হইতে জন্ম হইল হাড়ি-পার (জালন্ধরী-পা), কর্ণ হইতে কানু-পার, আর জটা হইতে কন্থা ও সিদ্ধঝুলিধারী গোরখনাথের। আদিনাথ শিব গৌরীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া মর্ত্যে আসিলেন এবং ক্ষীরোদসাগরের উপরে একটি টঙ্গি নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। একদিন গৌরী শিবকে যোগের মূল তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুহ্মি কেনে তর গোসাঞি আহ্মি কেনে মরি'। এখানে 'তুমি' শব্দের বাচ্য মৃত্যুঞ্জয় দিব্যতনু বা প্রণবতনু-স্থিত শিব, 'আমি' শব্দের বাচ্য মায়াধীন নিত্য পরিবর্তনশীল ক্ষয্য ও মর্ত্য জগৎ-প্রপঞ্চ। সকল পরিবর্তনশীলতা এবং বিনাশশীলতা অতিক্রম করিয়া কিভাবে দেহত্যাগ না করিয়া কায়-রূপান্তরের দ্বারা অবিনাশিত্ব লাভ করা যায় ও দিব্যতনুতে ইচ্ছাময় হইয়া থাকা যায়—গৌরীর মুখে নাথধর্মের এই মূল প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। উত্তরে যোগেশ্বর শিব জীবন্মুক্তির জন্য যোগের সর্বপ্রকার গুহ্য তত্ত্ব উপদেশ করিলেন, শুনিতে শুনিতে গৌরী ঘুমাইয়া পড়িলেন; কিন্তু সব শুনিয়া লইলেন মীননাথ, টঙ্গির নীচে জলের মধ্যে তিনি বোয়ালমৎস্যরূপে লুকাইয়া ছিলেন। তাঁহার মাধ্যমেই যোগতত্ত্বের মর্ত্যে প্রচার হইল। কিন্তু মহাদেব এই কথা জানিতে পারিয়া মীননাথকে শাপ দিলেন যে এক সময়ে তাঁহার এই যোগতত্ত্ব সব বিস্মরণ ঘটিবে।

ইহার পরে কৈলাসে দেবী একবার মহাদেবের নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে সিদ্ধগণ বিবাহ করিয়া গৃহী হউন। উত্তরে মহাদেব বলিলেন, তাহা সম্ভব নয়, কারণ সিদ্ধগণ জিতেন্দ্রিয়। কিন্তু দেবীর পরীক্ষায় এক গোরক্ষনাথ ব্যতীত সিদ্ধগণ সকলেই দেবীর 'ভোলে' পড়িলেন। ভোলে পড়িয়া মীননাথ গেলেন কদলী-রাজ্যে; হাড়ি-পা রানী ময়নামতীর দেশে গিয়া হাড়ির কার্য করিতে লাগিলেন; এবং কানু-পা চলিয়া গেলেন ডাহুকা নগরে।

নাথধর্ম, নাথসাহিত্য

কদলীর দেশে মহাযোগী মীননাথ রমণীগণের কুহকে পড়িলেন, যোগতত্ত্ব বিস্মৃত হইলেন, সাধারণ ভোগের জীবনেই দিন দিন আয়ু ক্ষীণ হইতে লাগিল। মীননাথ-শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুর এই দুর্দশার কথা জানিতে পারিয়া যোগবলে নর্তকীর বেশ ধারণ করিয়া কদলীর দেশে প্রবেশ করিলেন এবং রমণীপরিবেষ্টিত মীননাথকে নৃত্যগীতের দ্বারা পুনরায় যোগ-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিলেন। গোরক্ষনাথ যাহাতে রমণীরা না বুঝিতে পারে, অথচ গুরু বুঝিতে পারেন এইরূপ হেঁয়ালির ভাষায় যোগতত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দিলেন। ইহাকেই বলে 'গোরখ-ধাঁধা'। গোরক্ষ-নাথ কায়া-সাধনের কথা বলিলেন। মস্তকে আছে চন্দ্র, তাহাতে সঞ্চিত দেহের সকল অমৃত বা সুধা; ইহাই মহারস। নাভিদেশে আছে সূর্য, সে-ই কালাগ্নি। সাধারণ জীবনে চন্দ্রস্থ এই অমৃত নাভিস্থ সূর্যে বা কালাগ্নিতে পতিত হইয়া শোষিত হইয়া যায়; অমৃত বা মহারসের ক্ষয়ে দেহও ক্রমান্বয়ে বিনাশ লাভ করে। যোগের সাহায্যে যোগী চন্দ্রস্থ এই অমৃত বা মহারসকে রক্ষা করেন। মস্তকে অমৃতক্ষরণের একটি দ্বার আছে, তাহাকে বলে দশম দ্বার, সেই দ্বার হইতে একটি বঙ্কনালীতে মহারসকে প্রবাহিত করাইয়া যোগী তাহা পান করেন। মহারস সর্বদেশে সঞ্চারিত হইয়া দেহের ধাতু পরিবর্তিত করিয়া দেয় এবং দেহকে অজর অমর করিয়া তোলে। ইহাই যোগের 'পক্ক দেহ'। এই 'পক্ক দেহ' হইতেই সিদ্ধ দেহ এবং সিদ্ধ দেহ হইতে দিব্য দেহ লাভ হয়। যোগী তখন অষ্ট মহাসিদ্ধির অধিকারী হন। এই তত্ত্বের পুনর্ব্যাখ্যানের দ্বারাই গোরক্ষনাথ গুরুকে পুনরুদ্বোধিত করিয়া তোলেন। এই উপাখ্যানই 'মীন-চেতন' বা 'গোরক্ষ-বিজয়' নামে প্রসিদ্ধ।

অপর উপাখ্যানটি হইল মানিকচন্দ্র (বা মাণিক্যচন্দ্র) রাজা, তাঁহার স্ত্রী ময়নামতী ও পুত্র গোপীচাঁদ বা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে লইয়া। এই উপাখ্যানেরও মুখ্য প্রতিপাদ্য হইল যোগের সাহায্যে মৃত্যুর উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্বলাভ। মানিকচন্দ্র ছিলেন বাংলার একজন ধার্মিক রাজা। রাজার অনেক স্ত্রী; প্রধানা রানী ময়নামতী। 'কোন্দল' এড়াইবার জন্য ময়নামতী বাস করিতেন 'ফেরুসা নগরে'। তারপরে প্রজাদের ভাগ্যদোষে 'দক্ষিণ হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি'। তিনি দেওয়ান হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। বিক্ষুব্ধ প্রজারা রাজার মৃত্যুকামনা করিয়া ধর্ম-নিরঞ্জনের পূজা দিল। পূজার ফল ফলিল—যমদূত গোদাযমের উপরে ভার পড়িল রাজার প্রাণ লইয়া যাইবার। রানী ময়নামতী ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্যা; 'ধিয়ানেতে' সব জানিতে পারিয়া তিনি ফেরুসা হইতে ত্বরিত গতিতে আসিয়া মৃত্যু এড়াইবার জন্য রাজাকে তাঁহার নিকট হইতে 'মহাজ্ঞানে' দীক্ষা নিতে বলিলেন। রাজা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজার মৃত্যু হইল। যমদূতেরা তাঁহার প্রাণ লইয়া যমপুরী রওনা হইলে ময়না তাহাদিগকে ধাওয়া করিলেন এবং যমপুরীতে প্রবেশ করিয়া সকলকে ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। অবশেষে গুরু গোরখনাথের মধ্যস্থতায় স্থির হইল, মৃত রাজার প্রাণ আর ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না; কিন্তু ময়না একটি পুত্র লাভ করিবেন। মানিকচন্দ্রের দেহ দাহ করা হইল, ময়না সতী হইলেন, কিন্তু অগ্নিতে তাঁহার দেহ দগ্ধ হইল না। ময়না পুত্র লাভ করিলেন। এই পুত্রই গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র।

গোপীচাঁদ বড় হইলে হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা অদুনাকে বিবাহ করিলেন; সেই সঙ্গে পদুনাকে পাইলেন যৌতুক। ময়নামতী দিব্যজ্ঞানে জানিতেন যে হাড়ি-সিদ্ধার শিষ্য হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে পুত্রের মৃত্যু ঘটিবে। ময়না পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণের কথা বলিলেন। প্রথমে রাজাও স্বীকৃত হইলেন না, যুবতী রানীগণও বাধা দিলেন। পরে রাজা মা ময়নামতী ও গুরু হাড়ি-সিদ্ধার অনেক পরীক্ষা লইলেন। এই পরীক্ষায় মায়ের এবং হাড়ি-সিদ্ধার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি হাড়ি-পার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে স্বীকৃত হইলেন। নবযৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাজাকে অনেক দুঃখকষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইল, গণিকা হীরার ঘরে দাসজীবনও অতিবাহিত করিতে হইল। পরিশেষে গুরুকৃপায় বিপদ উত্তীর্ণ হইল, ১২ বৎসর পরে রাজা দেশে ফিরিলেন এবং সুখে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

এই কাহিনীটিই মানিকচন্দ্র রাজার গান, ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্র রাজার গান, গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস প্রভৃতি নানা নামে মৌখিক ও লিখিতরূপে পাওয়া গিয়াছে। উপরি-উক্ত দুইটি প্রধান কাহিনী ব্যতীত নাথসিদ্ধগণ সম্বন্ধে ছোটবড় আরো অনেক লৌকিক কাহিনী বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে। নাথসিদ্ধাদের গূঢ় সাধনতত্ত্ব লইয়া হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় রচিত অনেক ছড়া এবং গানও এদেশে প্রচলিত আছে।

নাথধর্ম একটি সর্বভারতীয় ধর্ম বলিয়া উপরি-উক্ত উপাখ্যানগুলি লইয়া হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী, পাঞ্জাবী, সিংহলী প্রভৃতি নানা ভাষায় বিবিধ সাহিত্যের সন্ধান মেলে। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কাহিনীর নাট্যরূপ দক্ষিণ

ভারতেও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে গোপীচন্দ্র রাজার কাহিনীর সহিত রাজা 'ভর্থরী' বা ভর্তৃহরির সন্ন্যাসের কাহিনী যুক্ত হইয়া নানা প্রকার সাহিত্যসৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে।

বাংলা নাথসাহিত্য অনেকখানি লোক-সাহিত্যের ধাঁচে রচিত, ইহার ভিতরে লিখিত রচনা ও মৌখিক রচনা উভয়ই স্থান পাইয়াছে। মূলতঃ ধর্মতত্ত্ব লইয়া রচিত হইলেও ঐতিহ্যাশ্রিত এবং কবিকল্পিত অনেক উপাখ্যান ও তাহার সরস বর্ণনা ইহাকে সাহিত্যগুণ দান করিয়াছে। স্থানে স্থানে চরিত্রাঙ্কনেরও নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়; অলৌকিকত্বের বর্ণনা সাধারণ কবিগণের কল্পনায় অনেক সময়ে চমৎকার হাস্যরসের উপাদান হইয়া উঠিয়াছে।

মীননাথ-গোরখনাথের কাহিনীটি প্রাচীন পুথি হইতে সংকলিত। নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রাচীন একখানিমাত্র পুথি অবলম্বন করিয়া 'মীন-চেতন' প্রকাশ করিয়াছিলেন। মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ একাধিক পুথি আলোচনা করিয়া 'গোরক্ষ-বিজয়' প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বভারতী হইতে আরও অধিকসংখ্যক পুথির সাহায্য লইয়া পঞ্চানন মণ্ডল 'গোর্খবিজয়' প্রকাশ করিয়াছেন। মূল কাহিনী একই; কিন্তু পুথিগুলিতে একাধিক লোকের ভণিতা লক্ষিত হয়; যথা ভীমদাস বা ভীমসেন রায়, শ্যামদাস সেন ও ফয়জুল্লা। কে আদি ও অকৃত্রিম কবি নিশ্চিতভাবে বলা শক্ত। এই তিনজনেই মূল রচয়িতা না হইয়া লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীর গায়ক-মাত্রও হইতে পারেন। ভণিতার বিরলতা সেই সত্যের দিকেই ইঙ্গিত করে। অপর কাহিনীটি প্রথমে মৌখিক সংগ্রহরূপেই প্রকাশিত হয়। 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' নামে কাহিনীটির যে-অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পুথি হইতে সংগৃহীত, রচয়িতা ভবানী দাস; 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'-ও পুথি হইতে প্রাপ্ত; রচয়িতা সুকুর মামুদ।

দ্র সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৮; দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৪৯; কল্যাণী মল্লিক, নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনা-প্রণালী, কলিকাতা, ১৯৫০; Shashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, Calcutta, 1962.

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

নাথপন্থ মধ্যযুগে তন্ত্র, হঠযোগ, সহজিয়া, শৈবাচার, ধর্মপূজা প্রভৃতির বিচিত্র প্রভাবে পূর্ব ভারতে উদ্ভূত এক বিশিষ্ট সাধনমার্গ। নাথযোগীদের আদিপুরুষ মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ (জন্ম সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে)। কথিত আছে, শিব যখন দুর্গাকে গুহ্য তত্ত্বের উপদেশ দিতেছিলেন তখন মীননাথ গোপনে তাহা শুনিয়াছিলেন। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ, গোরক্ষের শিষ্যা রানী ময়নামতী, রানীর পুত্র গোপীচন্দ্র—ইহাদের আখ্যায়িকা, যাত্রা গীতাবলী ও প্রহেলিকা বিলাস বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের একটি বিরাট পর্ব।

নাথযোগীর মাথায় জটা, সর্বাঙ্গে ছাই-ভস্ম, কানে কড়ি ও কুণ্ডল, গলায় সুতা বা সেলী, তাহাতে কাঠের নাদ গাঁথা, বাহুতে রুদ্রাক্ষ, হাতে ত্রিশূল, পায়ে নূপুর, কাঁধে ঝুলি ও কাঁথা। কুলবৃক্ষ বকুল, বিশিষ্ট আহার্য কচুশাক। অধিকাংশই জাতিতে যুগী, জীবিকা কাপড়-বোনা; কেহ কেহ কবিরাজ।

নাথযোগীগণকে তিন দিন দীক্ষা লইতে হয়। প্রথম দিন গুরু শিষ্যের চুল কাটিয়া দেন এবং দ্বিতীয় দিন তাহার কানে কুণ্ডল পরাইয়া দেন। তৃতীয় দীক্ষার নাম উপদেশী। প্রথমে হরপার্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও গণেশের পূজা, তাহার পর গোরক্ষনাথের পূজা ও শেষে ভাঙ ও মদ্যমাংসের সহিত আকাশভৈরবের পূজা হয়। সারারাত্রি দীপ জ্বলে ও বহুবিধ অনুষ্ঠান হয়, ইহার নাম 'জ্যোৎ-জাগান'।

ওড়িশা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত নাথযোগীদের আস্তান ও তীর্থক্ষেত্র বিস্তৃত। গোরক্ষনাথ গোর্খা জাতির তথা সমগ্র নেপাল রাজ্যের পূজনীয় ঈশ্বর। আধুনিক গোরখপুরে ইহাদের সর্বপ্রধান পীঠস্থান। সত্যনাথী, ধর্মনাথী, আইপন্থী, ধ্বজাপন্থী প্রভৃতি ১২টি শাখায় ইহারা বিভক্ত। কলিকাতার দমদম অঞ্চলে এবং হুগলির মহানাদে চৈত্র মাসে গাজনের সময় ইহাদের উৎসব হয়। 'গোরক্ষনাথ' দ্র।

দ্র অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগিরাজ গম্ভীরনাথ প্রসঙ্গ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ; পঞ্চানন মণ্ডল, গোর্খবিজয়, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড: অপরার্ধ, কলিকাতা, ১৯৬৫।

কল্যাণী দত্ত

নাদির শাহ্, নদর কুলি বেগ (১৬৮৮?-১৭৪৭ খ্রী) ইনি খোরাসান প্রদেশের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের অসাধারণ বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের ফলে ক্ষমতাশালী হন। পারস্যের সাফাভি বংশের দুর্বলতার সুযোগে আফগানগণ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ দেশ অধিকার করিলে নাদির তাহাদের বিতাড়িত করিয়া সাফাভি বংশের

অধিকার পুনরুদ্ধার করেন (১৭২৯ খ্রী)। ইহার ফলে তিনি রাজ্যের ভিতরে কার্যতঃ সর্বেসর্বা হন এবং ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ্ উপাধি গ্রহণ করিয়া পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আফগানদের শাস্তি দিবার জন্য তিনি আফগানিস্তান আক্রমণ করিয়া ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহার অধিকার করিলেন। পলায়মান আফগানগণ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। নাদির শাহ্ তিনবার মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকটে ইহার প্রতিবাদ জানাইলেও কোনও ফল হইল না, উপরন্তু তৃতীয় বারে পারস্য-দূতকে দিল্লীতে আটক রাখা হইল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ করিলেন। তিনি গজনি ও কাবুল অধিকারের পরে পাঞ্জাবে উপস্থিত হইয়া লাহোরও দখল করিলেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কর্ণালের নিকটে মহম্মদ শাহ্‌কে পরাস্ত করিয়া তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার দিল্লীতে অবস্থানকালে তৃতীয় দিবসে খাদ্যের মূল্য ইত্যাদি লইয়া দিল্লীবাসীদের সহিত ঝগড়ার ফলে তাঁহার কতিপয় অনুচর আক্রান্ত হয়। নাদিরের মৃত্যু হইয়াছে এই মিথ্যা সংবাদে দিল্লীবাসীগণ পারস্যের প্রায় ৯০০ সৈন্যকে হত্যা করে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পরদিন নাদির শাহ্ দিল্লীর নাগরিকদিগকে নির্বিচারে হত্যা করিবার জন্য নিজ সৈন্যদলকে আদেশ দিলেন এবং সকাল ৮টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও পৈশাচিক অত্যাচার চলিল। অবশেষে মহম্মদ শাহের অনুরোধে নাদির শাহ্ সৈন্যদের বিরত হইতে আদেশ দেন।

৫৮ দিন দিল্লীতে অবস্থান করিয়া ১৬ মে তিনি ময়ূর-সিংহাসন ও কোহিনূর-সহ বহু মণিমাণিক্য, প্রচুর অর্থ, মূল্যবান আসবাবপত্র, অনেক অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতি লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। মহম্মদ শাহ্ দিল্লীর বাদশাহ্ রহিলেন, কিন্তু কাবুল-সহ সিন্ধুনদের সমস্ত পশ্চিমাঞ্চল নাদির শাহ্‌কে ছাড়িয়া দিতে হইল। এই বৈদেশিক আক্রমণ পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিল।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বুখরা ও খিবার বিরুদ্ধে সফল আক্রমণ করেন এবং পারস্যকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেন। রাজত্বের শেষদিকে নাদির শাহ্ অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত ও খামখেয়ালি হইয়া পড়েন। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এক আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন।

দ্র L. Lockhart, *Nadir Shah*, London, 1938.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রী) লাহোরের ৫৬ কিলোমিটার (৩৫ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে তালওয়ান্দি (বর্তমান নাম নানকানা) গ্রামে গুরু নানক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কালু গ্রামের হিসাবরক্ষক ছিলেন। তালওয়ান্দির বিদ্যালয়ে নানক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। প্রথম হইতেই তাঁহার শিক্ষার প্রতি বিরাগ ছিল। তিনি নির্জনে ও সাধুসঙ্গে দিন যাপন করিতে চাহিতেন এবং ৯ বৎসর বয়সে পৈতাগ্রহণেও আপত্তি করিয়াছিলেন। ইহার পরে পিতা তাঁহাকে রুকন-উল-দীন নামক একজন মৌলবীর নিকট ফারসী শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। গ্রন্থসাহেবে অনেক ফার্সী কথা ও কবিতা তাঁহার ফারসী-জ্ঞানের পরিচায়ক। গুরুদাসপুর জেলার বাতালার অধিবাসী মুলার কন্যা সুলখনীর সহিত নানকের বিবাহ হয়। নানক লাহোরের শাসনকর্তা দৌলতখানের অধীনে সুলতানপুরের গুদামরক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুকাল পরে একদিন তিনি স্নানের পর বনে চলিয়া যান ও তথায় সমাধিমগ্ন অবস্থায় ভগবানের প্রত্যাদেশ শুনিতে পান, 'আমি ভগবান পরমব্রহ্ম ও তুমি ঈশ্বর-প্রেরিত গুরু'। ইহার পর তিনি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। ভ্রমণকালে তিনি পশ্চিমে মক্কা, মেদিনা, বাগদাদ, দক্ষিণে সিংহল ও ভারতবর্ষে কামরূপ, গয়া, কাশী, কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন ও দিল্লী গমন করেন। কেহ কেহ বলেন ভ্রমণের সময় ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহিত সন্ত্ কবীরের সাক্ষাৎ হয়। এই ভ্রমণের অধিকাংশ সময় মর্দানা নামক জনৈক রবাববাদক তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। ভ্রমণের শেষে গুরু কর্তারপুরে আসিয়া বসবাস করেন ও ধর্মপ্রচার ও দীক্ষায় মনোনিবেশ করেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি শিষ্য অঙ্গদকে পরবর্তী গুরু বলিয়া মনোনীত করেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কর্তারপুরে গুরু নানক স্বর্গত হন।

গুরু নানকের ধর্মের প্রধান শিক্ষা এক ঈশ্বর, গুরু ও নামজপ। এই এক ঈশ্বরের বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, তিনি সত্য, স্রষ্টা, নির্ভীক, বৈরলেশহীন, অমর, অজ, স্বয়ংপ্রকাশ, মহান ও দাতা; তাঁহার নাম জপ কর। গুরু সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, শিখগণ নদী ও গুরু সমুদ্র; শিষ্যেরা গুরুতে মিশিয়া তবে মহত্বলাভ করিতে পারে। নামজপ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, যাঁহারা নামজপ করেন পরলোকে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করা হইবে না; ধ্বজা উড়াইয়া বিজয়সাফল্যে তাঁহারা স্বর্গে যাইবেন। গুরু নানক স্বর্গ, নরক, কর্মফল ও ধর্মাচরণে পাপক্ষয় বিশ্বাস করিতেন। তিনি মূর্তিপূজার প্রশ্রয় দেন নাই। সত্যভাষণকে তিনি পশুবলি অপেক্ষা

মহত্তর এবং ভগবৎপ্রেমকে সকল তীর্থযাত্রা ও ধর্মাচরণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের ব্যাপারে অতিশয় আচারপ্রিয়তারও নিন্দা করেন। তিনি সর্বজনীন সহনশীলতার বাণী প্রচার করেন এবং হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মগত ও সামাজিক মিলনের চেষ্টা করেন। হিন্দু ও মুসলমান এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের লোকেই তাঁহার শিষ্য ছিল।

দ্র Max Arthur Macauliffe, *The Sikh Religion, its Gurus, Sacred Writings and Authors*, vol. I, Oxford, 1909; R. C. Majumdar, ed., *The History & Culture of the Indian People*, vol. VI, Bombay, 1967.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

নানা ফড়্নবিশ (১৭৪২-১৮০০ খ্রী) ১৮শ শতাব্দীতে মারাঠাদের প্রখ্যাত কূটনীতিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী। বালাজী জনার্দন বা নানা ফড়্নবিশ ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি পুণায় চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জনার্দন বাবা ও মাতার নাম রখমবাঈ। মাধব রাও ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া হইলে নানা ফড়্নবিশ তাঁহার ফড়্নিশ বা হিসাবরক্ষক হন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাধব রাও -এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হন, কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাওয়ের চক্রান্তে নিহত হন। রঘুনাথ বা রাঘোবা পেশোয়া হইলে প্রথম হইতেই নানা ফড়্নবিশ তাঁহার বিরুদ্ধতা করেন ও স্বর্গত পেশোয়ার পত্নীর একটি পুত্র হইলে সদ্যোজাত পুত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার বুদ্ধিকৌশল ও চক্রান্তের ফলে রাঘোবা বিপর্যস্ত হন ও ইংরেজের সাহায্য লইতে বাধ্য হন। সুরাটের সন্ধিতে (১৭৭৫ খ্রী) রাঘোবা সালসেট ও বেসিন ইংরেজ-হস্তে সমর্পণের শর্তে বোম্বাই সরকারের সাহায্য লাভ করেন ও অরাসের যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয়। কিন্তু কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কাউন্সিল সুরাটের সন্ধি বাতিল করিয়া পুরন্দরের সন্ধি করেন। এই সন্ধিতে রাঘোবাকে পেন্সন দিবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বোম্বাই সরকার সন্ধির শর্ত না মানিয়া রাঘোবাকে আশ্রয় দেন ও নানা ফড়্নবিশও শেভালিয়ে দ্য স্যাঁ লিব্যাঁ-এর সহিত যোগাযোগ করেন। কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স বোম্বাই সরকারকে সমর্থন করায় পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু ইংরেজগণ তেলগাঁওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ওয়াডগাঁওয়ে বিশেষ অসম্মানজনক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। হেস্টিংস এই সন্ধি না মানিয়া কর্নেল গডার্ডকে মহারাষ্ট্রে পাঠান ও তিনি আহ্মেদাবাদ ও বেসিন দখল করেন। কর্নেল পপ্হাম্ গোয়ালিয়র দখল করিলে মহাদ্জী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় সাল্বাইয়ের সন্ধি হয় (১৭ মে, ১৭৮২ খ্রী)। এই সন্ধিতে ইংরেজগণ সালসেট পান, রাঘোবাকে পেন্সন দিবার ব্যবস্থা করা হয় ও মাধব রাও নারায়ণ পেশোয়া বলিয়া স্বীকৃত হন। এই সময়ে মহাদ্জী সিন্ধিয়া ও নানা ফড়্নবিশ মারাঠাজগতে সর্বপ্রধান ছিলেন বলা চলে। মহাদ্জী সিন্ধিয়া ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে পুনায় নানা-র প্রতিপত্তি খর্ব করিতে যান, কিন্তু ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনায় তাঁহার মৃত্যু হইলে নানা ফড়্নবিশ সর্বেসর্বা হইয়া দক্ষিণ ভারতে টিপু সুলতানের নিকট হইতে মারাঠারাজ্য পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হন। সংঘর্ষের ফলে টিপু ৫ লক্ষ টাকা দিতে এবং বাদামি ও নরগুণ্ড জেলা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। কর্নওয়ালিসের সহিত যুদ্ধের সময় মারাঠারা টিপুর বিরুদ্ধে যোগ দেন ও ইহার ফলে মারাঠারাজ্যের সীমা তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহার কিছু পরে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজাম অসম্মানজনক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন (১৭৯৫ খ্রী), কিন্তু ইহাই নানা ফড়্নবিশের শেষ জয়লাভ। ইহার পরে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নানা-র কর্তৃত্বে অসন্তুষ্ট হইয়া যুবক পেশোয়া আত্মহত্যা করেন ও রাঘোবার পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়া হন। নানাবিধ চক্রান্তের ফলে নানা ফড়্নবিশ বন্দী হন। মুক্তির পরে তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন, কিন্তু ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ মার্চ তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র R. C. Majumdar, H. C. Ray Chaudhuri & Kalikinkar Dutta, *An Advanced History of India*, London, 1950.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

নানা সাহেব ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নেতা। ধুন্ধু পন্থ বনাম নানা সাহেব পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও পরলোকগমন করিলে তাঁহার উইল অনুসারে নানা সাহেব বাজীরাও-এর ৮ লক্ষ টাকা পেন্সন ও তাঁহার জায়গীর দাবি করেন। বড়লাট ড্যাল্হৌসি এই দাবি অগ্রাহ্য করিলে নানা সাহেব কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স-এর নিকট আপিল করিয়া ব্যর্থমনোরথ হন। পরবর্তী ৬ বৎসর নানা সাহেব সদাশয়তা ও আতিথ্য পালন করিয়া কানপুরের ইংরেজমহলের প্রীতিভাজন হন। মীরাটে সিপাহিদের বিদ্রোহ হইলে কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট নানাকে কোষাগার রক্ষার ভার

দেন। কিন্তু বিদ্রোহী সিপাহিরা কোষাগার ও অস্ত্রাগার দখল করিয়া দিল্লীর পথে কল্যাণপুরে যায় ও পরে তথা হইতে কানপুরে ফিরিয়া আসে। নানা সাহেব ইহাদের সঙ্গে ছিলেন। কেন নানা সাহেব বিদ্রোহিদের সঙ্গে যোগ দেন, এই বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। কেহ কেহ বলেন যে নানা সাহেব বহুদিন হইতেই গোপনে সিপাহিদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং ইংরেজদিগকে প্রতারণা করিবার জন্যই প্রথমে তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল মহারানী ভিক্টোরিয়ার নিকট দরখাস্তে নানা সাহেব বলিয়াছিলেন, তিনি 'অসহায় অবস্থায় পড়িয়া দায় ঠেকিয়া বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দেন'। তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর তাঁতিয়া তোপীও এই উক্তি সমর্থন করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, ইহাতে পুরাপুরি আস্থাস্থাপন করা যায় না। তিনি বলেন, নিশ্চিতভাবে শুধু এই কথা বলা যায় যে, নানা সাহেব ৫ জুন কল্যাণপুর হইতে প্রত্যাগত বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। কানপুরে যে গড়খাই দ্রুত নির্মাণ করিয়া ইংরেজগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ২৫ জুন পর্যন্ত তাহা দখল করিতে না পারায় সেনাপতি হিসাবে নানা সাহেবের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। ইহার পরে অবরুদ্ধ ইংরেজগণকে এলাহাবাদে পাঠাইবার সম্মতিদানের পর সতীচৌরাঘাটে তাহারা নৌকায় উঠিলে সিপাহিগণ তাহাদের প্রতি গুলিবর্ষণ করে; মাত্র চারজন রক্ষা পায় ও অবশিষ্ট সকলে নিহত বা বন্দী হয়। ইহাদের মধ্যে অনেক মহিলা ও শিশু ছিল। এই ঘটনার সময় নানা সাহেব নদীতীরে আদৌ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যে এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তাহারও সঠিক কোনও প্রমাণ নাই; কিন্তু সেনাপতি হিসাবে সিপাহিদের দুষ্কর্মের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যাইতে পারে। যাহা হউক, এই ব্যাপারের পরই ৩০ জুন নানা সাহেব নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার পরে হ্যাভ্‌লক কানপুর উদ্ধারে আসিয়া নানা সাহেবের সৈন্যদের পরাজিত করিলে কানপুর বিবিঘরে বন্দী ইংরেজ পুরুষ, নারী ও শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। নানা সাহেব পরে মহারানী, পার্লামেণ্ট, কোর্ট অফ ডিরেক্টর্‌স ও গভর্নর জেনারেলের নিকট যে ইস্তাহারনামা পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি এই দুষ্কর্মে তাঁহার কোনও হাত নাই বলিয়াছেন। এই ব্যাপারে নানা সাহেবের দোষ সম্বন্ধে বিশ্বাসজনক প্রমাণ নাই। ১৭ জুলাই হ্যাভ্‌লক কানপুর দখল করেন। ১৮ জুলাই নানা সাহেব বিঠুর ত্যাগ করিয়া ফতেপুর চৌরাসিতে গমন করেন। কলিন ক্যাম্প্‌বেল কানপুরে বিদ্রোহীদের পরাজিত করিবার কিছু পরে হোপ গ্র্যাণ্ট চৌরাসিতে পৌছান। কিন্তু ইহার পূর্বেই নানা সাহেব তথা হইতে চলিয়া যান। ইহার পর মহাবিদ্রোহের শেষদিকে নানা নেপালসীমান্তে উপস্থিত হন। সম্ভবতঃ নানা সাহেব ও অযোধ্যার বেগম হজরত মহল প্রথমে বহরাইচে ছিলেন ও পরে তথা হইতে নানা সাহেব রাপ্তির তীরে বাঁকিতে গমন করেন। কলিন ক্যাম্প্‌বেল প্রেরিত সৈন্যের সহিত বাঁকির যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজয় হয় ও নানা সাহেব নেপালে আশ্রয়গ্রহণ করেন। নানা সাহেবকে ধরাইয়া দিলে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে, ইহা ঘোষণা করা হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে ইংরেজ সরকারকে তিনি যে চিঠি লেখেন তাহাতে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিতমাত্র নাই ও গভর্নর জেনারেলের ঘোষণার পরও নানা সাহেব আত্মসমর্পণের কথা ভাবেন নাই। কিন্তু তিনি নিজেকে বিদ্রোহের ও কানপুরের বন্দী ইংরেজদের হত্যা করার অপরাধে নির্দোষী প্রতিপন্নের চেষ্টা করেন। সিপাহিরা জোর করিয়া তাঁহাকে দলভুক্ত করিয়াছিল, সুতরাং তিনি ইংরেজ সরকারের ক্ষমার যোগ্য—এই মর্মে তিনি আবেদন করেন। ইহার পর নানা সাহেব সম্বন্ধে আর কিছু সঠিকভাবে জানা যায় না। কোনও অজ্ঞাতস্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'তাঁতিয়া তোপী' দ্র।

দ্র S. N. Sen, *Eighteen Fifty-seven*, New Delhi, 1957; R. C. Majumdar, ed., *British Paramountcy and Indian Renaissance*, Part I, Bombay, 1963.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

নান্নুর বীরভূম জেলার সিউড়ি মহকুমার অন্তর্গত একটি থানা ও গ্রাম। ইহা বৈষ্ণবকবি দ্বিজ চণ্ডীদাসের বাসস্থান। এইজন্য বর্তমানে ইহার নাম চণ্ডীদাস-নান্নুর। এখানে কবির উপাস্য বাশুলী দেবীর মন্দিরে শায়িত দেবের নাভিদেশ হইতে উদ্গত কমলে দেবী ললিতাসনে আসীনা, চতুর্ভুজা, নিম্ন দক্ষিণ হস্তে জপমাল্যধৃতা, অপর তিন হস্তে বীণাবাদনরতা। দেবীমূর্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তরে উৎকীর্ণ, ইহাকে বাগীশ্বরী বলা হয়; কিন্তু বিশালাক্ষীর ধ্যানে দেবীর পূজা হয়। বাশুলী-মন্দিরের পাশে চণ্ডীদাসের ভিটা।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

নাম্‌চে বার্‌ওয়া আসাম-হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ। অবস্থান ২৯°৩৮ উত্তর ও ৯৫°৩´ পূর্ব। ইহার উচ্চতা ৭৭৫৬ মিটার। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ভিন্ন

সর্বদিকে ইহা সান্‌পো নদী দ্বারা বেষ্টিত। দুর্গম কঠিন খাড়া পর্বত ও অরণ্যাবৃত অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া নিকট হইতে ইহার জরীপ করা বহুদিন সম্ভব হয় নাই। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ওকস, ফিল্‌ড এবং মোরসেদ ইহার সঠিক অবস্থিতি ও উচ্চতা স্থির করেন। মোরসেদ ইহার ৫টি হিমবাহ আবিষ্কার করেন। উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সাঙ্‌লুঙ্‌ হিমবাহ।

দ্র Anthony Huxley, ed., *Standard Encyclopaedia of the World's Mountains*, London, 1962.

কমলা মুখোপাধ্যায়

নামদেব (১২৭০-১৩৫০ খ্রী ?) জ্ঞানদেবের সমসাময়িক নামদেব ঈশ্বরের প্রতি সরল ও অনন্যচিত্ত একাগ্রতার জন্য পূজার্হ। বহু ভক্তের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পন্‌ধারপুরের বিঠোবার প্রস্তরমূর্তি নামদেবের হাত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতেন।

সুপ্রাচীন পারিবারিক ধারা অনুযায়ী নামদেব শৈশব হইতেই সাধারণভাবে বিঠোবার ভক্ত ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ গাথা ছিল সরল এবং ভক্তিমূলক আবেদনে পূর্ণ।

কথিত আছে যে নামদেব সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনেক রচনা শিখদের আদিগ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহা অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে হয়। অন্য মতে কোনও কোনও গুজরাতী ধর্মীয় গ্রন্থে নামদেবের কিছু 'অভঙ্গ' পাওয়া যায়।

নিরক্ষর অথচ উচ্চশ্রেণীর ভক্ত হিসাবে নামদেব পন্‌ধারপুর ও তত্রস্থ বিঠোবাদেবের নাম জনসমাজে যেরূপ প্রচার করিয়াছিলেন এইরূপ আর কেহই করেন নাই। সেইজন্যই মহারাষ্ট্রের সন্ত্‌ কবিকুলের মধ্যে নামদেবের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার সমগ্র রচনা 'গাথা' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীপদ রামচন্দ্র টিকেকর

নামাজ নামাজ শব্দ পারসীক, আরবীতে বলা হয় সালাত; সালাত অর্থ আল্লার স্মরণ বা তাঁহার উপর একান্ত নির্ভরতা। কোরান শরীফে সালাত শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। ইসলামধর্ম যে পাঁচটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে নামাজই দ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। দিবারাত্রে নামাজ পাঁচবার অবশ্যকর্তব্যরূপে নির্ধারিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ কয়েকটি উপলক্ষ্যে নামাজ অবশ্যপালনীয়, যথা ঈদ ও বকরীদ। নামাজ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত ও নফল। হিজরী ৫ কিংবা ৬ সালে, (অন্যমতে ১২ সালে) নামাজের আদেশ বলবৎ হয়। একদা গভীর নিশীথে হজরত মহম্মদ আল্লার সকাশে নীত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে নামাজের আদেশ প্রদত্ত হয়। উক্ত রাত্রিকে মে'রাজ বলা হয়। সৃষ্টির আদি হইতেই নামাজ প্রচলিত ছিল, উহা বিভিন্ন পয়গম্বর ভিন্ন ভিন্ন রূপে পালন করিয়া গিয়াছেন। শেষ পয়গম্বরের সময়ে উহা নবরূপে প্রবর্তিত হয়। কোরান শরীফ ও হাদিশ শরীফে নামাজ সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশংসা বর্ণিত আছে। নামাজ সমস্ত রকমের অপকর্ম ও পাপ হইতে মানবকে রক্ষা করে। নামাজ আল্লার নৈকট্য-লাভের সহজতম সোপান। নামাজের মাধ্যমে প্রভু ও দাসের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কোনও অবস্থাতেই নামাজের মাফ নাই। দুর্বল ও মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য সহজ পন্থায় নামাজ পালনের আদেশ আছে।

আব্দুস সোব্‌হান

নায়কবংশ মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে রাজার সামন্ত বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগকে অনেক সময় নায়ক বলা হইত। বিজয়নগর আমলের লেখমালায় বহুসংখ্যক নায়কের উল্লেখ দেখা যায়। বিজয়নগর রাজ্যে যাঁহারা রাজকীয় জায়গীর ভোগের বিনিময়ে রাজাকে প্রয়োজনের সময় সৈন্যাদি দ্বারা সাহায্য করিতেন তাঁহারা অমরনায়ক নামে পরিচিত ছিলেন। এই শ্রেণীর নায়কেরা আবার আপনাদের জায়গীর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী সৃষ্টি করিতেন, তাঁহারা সময়মত নায়ককে সৈন্য সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকিতেন। বিভিন্ন শ্রেণীর সামন্ত রাজগণ বিপদের সময় চিরকালই অধিস্বামীকে সাহায্য করিতেন; কিন্তু বিজয়নগর রাজগণ প্রথাটিকে সুশৃঙ্খল ও বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ বিজয়নগরের অমরনায়ক প্রথার সহিত মধ্যযুগীয় ইংল্যাণ্ডের ফিউডাল ব্যবস্থার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু এই সাদৃশ্য গভীর নহে। কারণ অমরনায়ক ব্যতীত বিজয়নগর রাজগণের আরও বহু প্রকারের সামন্ত ছিলেন; আবার ভূস্বামীদিগের অধীন কৃষকেরা তাঁহাদের জমি ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না, ফিউডাল প্রথার এই ব্যবস্থা ভারতে প্রচলিত ছিল না।

বিজয়নগর রাজ্যের পতনের যুগে শক্তিশালী নায়করা স্বাধীনতাপ্রয়াসী হন। ইহারই ফলে মদুরা (মাদুরা), ইক্কেরি, তঞ্জবূর (তাঞ্জোর), বেল্লূর (ভেল্লোর), চেঞ্জি (Gingee) প্রভৃতি স্থানে নায়করাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী নায়ক উপাধিধারী শাসকগণের কথাপ্রসঙ্গে গোদাবরীর মোহানার নিকটস্থিত কোলনু রাজ্যের রাজাদিগের কথা মনে পড়ে। ইহারা ১০ম শতাব্দীর কাট বা কাটমনায়কের বংশধর। এই বংশের কোটপ্প (১১৩৪-৩৫ খ্রী) এবং কাট বা কাটম (১১৪৩ খ্রী) সংজ্ঞক নায়ক উপাধিধারী দুই ব্যক্তির লেখ পাওয়া গিয়াছে।

মদুরা : নায়কবংশ প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিজয়নগর রাজ্যের সামন্ত বা কর্মচারীরূপে বাণ-বংশীয়েরা মদুরা শাসন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নায়ক উপাধি দেখা যায়, যেমন নরসনায়ক (১৫০০ খ্রী), তেন্ননায়ক (১৫০০-১৫ খ্রী), তিম্মপ্পনায়ক (১৫১৯-২৪ খ্রী) এবং বৈয়প্পনায়ক (১৫৩০ খ্রী)।

অরবীডু-বংশীয় বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেবরায়ের (১৫০৯-২৯ খ্রী) সামন্ত নাগম্মনায়ক বিদ্রোহী হইলে নাগম্মের পুত্র বিশ্বনাথ বিদ্রোহ দমন করিতে সম্রাটকে সাহায্য করেন। সম্রাটের প্রসাদপুষ্ট বিশ্বনাথ নায়ক (১৫২৯-৬৪ খ্রী) মদুরা নগরী হইতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের দক্ষিণপ্রদেশ শাসন করিতেন। তিনি নিজেই শেষজীবনে প্রায় স্বাধীনভাবে মদুরা রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তলিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস হইলে বিশ্বনাথের বংশধরগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার মত কেহ রহিল না।

বিশ্বনাথের পুত্র কৃষ্ণপ্পর (১৫৬৪-৭২ খ্রী) মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র বীরপ্প ও দ্বিতীয় বিশ্বনাথ সংযুক্তভাবে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। তাহার পর ৬ বৎসর (১৫৯৫-১৬০১ খ্রী) লিঙ্গয্য ও তৃতীয় বিশ্বনাথ নামক বীরপ্পর পুত্রদ্বয় একযোগে রাজ্যাধিকারী ছিলেন। তৃতীয় বিশ্বনাথের পুত্র মুত্তু কৃষ্ণপ্প (১৬০১-০৯ খ্রী) রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র তিরুমল (১৬২৩-৫৭ খ্রী) পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তদীয় পৌত্র তৃতীয় বীরপ্পর (১৬৮২-৮৯ খ্রী) মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা মঙ্গম্মল ১৭ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। অতঃপর তৃতীয় বীরপ্পর পুত্র দ্বিতীয় চোক্কনাথ (১৭০৬-৩২ খ্রী) রাজা হন। অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার মহিষী মীনাক্ষী বহু কষ্টে ৪ বৎসর কাল রাজ্যের শাসনভার পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আর্কটের চান্দা-সাহেব মদুরা অধিকার করিলে রানী মীনাক্ষী আত্মহত্যা করেন।

ইক্কেরি : ইক্কেরির নায়কেরা কেলদি ও বেডনূরের নায়ক নামেও পরিচিত। মহীশূরের দক্ষিণ কানাড়া জেলা ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলে রাজ্যটি অবস্থিত ছিল এবং বেডনূরে ইহার রাজধানী ছিল। বসপ্প নামক কৃষকের পুত্র চৌড়প্পনায়ক ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে ইক্কেরিতে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সদাশিবনায়ক (১৫১৩-৬০ খ্রী) বিজয়নগররাজ সদাশিবরায়ের অনুগত সামন্ত ছিলেন। সদাশিবনায়কের পৌত্র প্রথম বেঙ্কটপ্প বা বেঙ্কটাদ্রি (১৫৯২-১৬২৯ খ্রী) স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তদীয় পৌত্র বীরভদ্র (১৬২৯-৪৫ খ্রী) অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে রাজ্যভার নায়কবংশের অন্য একটি শাখার হস্তগত হয়। রাজা সোমশেখরের রাজত্বকালে মারাঠারা কেলদি রাজ্যের আরবসাগরের তীরবর্তী নগরসমূহ বিধ্বস্ত করিয়াছিল। তাঁহার পর তদীয় মহিষী চেন্নমাজী (১৬৭১-৯৭ খ্রী) মোগলসেনা কর্তৃক পরাজিত শিবাজীপুত্র রামরাজকে আশ্রয় দেন এবং মহীশূরের সহিত সন্ধিবদ্ধ হন। রাজা দ্বিতীয় বসপ্প ((১৭৩৯-৫১ খ্রী) নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তাঁহার মহিষী বীরম্মাজী চেন্নবসবপ্পকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে স্থাপিত করেন; কিন্তু ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবীন নরপতিকে হত্যা করিয়া বীরম্মাজী স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূরপতি হায়দর আলী বীরম্মাজীর রাজধানী বেডনূর অধিকার করিয়া রানীকে বন্দী করেন।

তঞ্জবূর : সেবপ্পনায়ক (১৫৪৯-৭২ খ্রী) বিজয়নগররাজ অচ্যুতরায় কর্তৃক তঞ্জবূরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি অচ্যুতরায়ের মহিষীর ভগ্নীপতি ছিলেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পর তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাঁহার পুত্র অচ্যুতপ্প (১৫৭২-১৬১৪ খ্রী) এবং পৌত্র রঘুনাথ (১৬১৪-৪০ খ্রী)। রঘুনাথের পুত্র বিজয়রাঘব ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মদুরার চোক্কনাথনায়ক কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। চোক্কনাথ অলগিরিনায়ককে তঞ্জবূরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু বিজাপুর সুলতানের সেনাপতি মারাঠাবীর শিবাজীর ভ্রাতা এক্কোজী বা বেঙ্কাজী অবিলম্বে তঞ্জবূর অধিকার করিয়া বিজয়রাঘবের পুত্র চেঙ্গমলদাসকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। আবার ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দেই চেঙ্গমলদাসকে অপসারিত করিয়া এক্কোজী বা বেঙ্কাজী স্বয়ং তঞ্জবূরের রাজা হইলেন। মারাঠা-বংশের শেষ রাজা শিবাজী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করিলে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তঞ্জবূর ইংরেজ সরকারের অধিকারভুক্ত হয়।

বেল্লূর : অনুকূলগোত্রীয় বীরপ্পনায়কের পুত্র চিন্নবোম্ম বা বোম্মনায়ক (আনুমানিক ১৫৪৫-৭০ খ্রী) সুপ্রসিদ্ধ

পণ্ডিত অপ্পয়দীক্ষিতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার পুত্র লিঙ্গমনায়ক (আনুমানিক ১৫৭০-১৬০৫ খ্রী) বিজয়নগর রাজবংশীয় প্রথম বেঙ্কটপতির সামন্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। শীঘ্রই এই নায়করাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পায়।

চেঞ্জি: শোনা যায়, কৃষ্ণদেবরায়ের রাজত্বকালে কাবেরী উপত্যকায় বিজয়রাঘবনায়কের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ নায়করাষ্ট্রের উত্তরে ও দক্ষিণে যথাক্রমে চেঞ্জিতে তুবাকি কৃষ্ণপ্প এবং মদুরাতে বেঙ্কটপ্প অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। চেঞ্জির নায়কেরা তোণ্ডাইমণ্ডলম্ অর্থাৎ আধুনিক কোরো-মণ্ডল উপকূলে নেল্লোর হইতে কোলেরুন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রতীরবর্তী ভূভাগ শাসন করিতেন।

কথিত আছে, চেঞ্জিনায়ক-বংশের আদিপুরুষ একোজী; তাঁহার অধস্তন দ্বাদশপুরুষ শ্রীগিরি নাইডু (নায়ক) উত্তর ভারতের মণিনাগপুর হইতে আসিয়া বিজয়নগরে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর পেদ্দ কৃষ্ণপ্প-নায়ক প্রথম চেঞ্জিতে আসেন।

চেঞ্জির বৈয়প্পনায়ক (আনুমানিক ১৫২৬-৪১ খ্রী) বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেবরায় ও অচ্যুতরায়ের সামন্ত ছিলেন। ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দের একখানি লিপিতে তাঁহাকে অচ্যুতরায়ের 'মহানায়ক' বলা হইয়াছে। বৈয়প্পনায়কের অধীন নায়ক-গণের মধ্যে বেল্লুরের বোম্মুনায়ক অন্যতম ছিলেন। চেঞ্জির শূরপ্পনায়ক সদাশিবরায় ও রামরায়ের অনুগত সামন্ত ছিলেন। তাঁহাকে মণিনাগপুরবাসী কাশ্যপগোত্রীয় পেদ্দপ্প-নায়কের পুত্র বলা হইয়াছে। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সেনানী মারাঠা বীর শাহ্‌জী চেঞ্জি অধিকার করেন।

দ্র. R. Sathianathaier, *History of the Nayaks of Madura*, Madras, 1924; R. Sewell, *Historical Inscriptions of Southern India*, Madras, 1932; T. V. Mahalingam, *Administration and Social Life under Vijayanagar*, Madras, 1940; V. Vriddhagirisan, *The Nayaks of Tanjore*, Annamalainagar, 1942; C. S. Srinivasachari, *A History of Gingee and its Rulers*, Annamalainagar, 1943; K. D. Swaminathan, *The Nayaks of Ikkeri*, Madras, 1957; A. Krishnaswami, *The Tamil Country under Vijayanagar*, Annamalainagar, 1964.

দীনেশচন্দ্র সরকার

নায়নার সংস্কৃত 'ন্যায়' শব্দ হইতে আগত তামিল শব্দ। ইহা ন্যায় বা ধর্মের প্রতীক। শিবের ভক্ত ও উপাসক সম্প্রদায়কে 'নায়নার' নামে অভিহিত করা হয়। আনুমানিক ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৭২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত তামিল সাহিত্যে নায়নারদের অবলম্বন করিয়া নানাবিধ কাহিনী রচিত হয়। রচয়িতাদের উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যের মাধ্যমে শৈবধর্মের প্রচার। নায়নারদের ইতিহাস প্রধানতঃ 'তিরুত্তোন্দর' বা 'পেরিয়-পুরাণম্'-এ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তামিল 'তিরুবাচক', 'তিরুমন্দিরম', 'তিরুত্তয়েমপাবই', 'তিরুভররূপপাবন' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্মীয় সাহিত্যপুস্তকগুলি নায়নার কাহিনীর জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

নায়নারকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে: ১. শৈব সন্ত অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ মহাপুরুষ ২. শৈব সাধু অর্থাৎ সিদ্ধ মহাপুরুষদের যোগ্যতম শিষ্য ৩. শৈবধর্মের প্রচারক। এই ত্রিবিধ শ্রেণীর নায়নার ক্রমান্বয়ে ৬০ পুরুষ-ব্যাপী শৈবধর্মের উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। শৈব সন্তদের উপদেশাবলী মন্দিরগাত্রে খোদিত করা হইয়াছে। এই উপদেশকে বলা হয় 'অন্দর'। শৈব সন্তদের মধ্যে পেরাম ঝলাই কুরুমনায়নার, অপ্পুটিয়াকল নায়নার, মেয়প্পল নায়নার, রুদ্র পশুপতি নায়নার, নমিনন্তি অতিকাল নায়নার, তীরু নীলকণ্ঠ নায়নার, দণ্ডি অতিকাল নায়নার প্রভৃতি সমধিক খ্যাত। বর্তমান যুগেও তামিলনাদের প্রায় অধিকাংশ শিবের মন্দিরে বিভিন্ন নায়নারের প্রতিমূর্তি পূজিত হয়, উৎসবোপলক্ষে দেবতার প্রতিমূর্তির সহিত নায়নারদের প্রতিমূর্তিও শোভাযাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

অশোকা সেনগুপ্ত

নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে ইঁহার জন্ম। ইনি বেদবিৎ, ত্রিকালজ্ঞ ও হরিভক্তিপরায়ণ। সর্বলোকে সর্বত্র ইঁহার অবাধ গতিবিধি। নার শব্দের অর্থ জল; অনাবৃষ্টির পর ইঁহার জন্মকালে প্রভূত বর্ষণ হওয়ায় ইঁহার নাম হয় নারদ (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ২১।৭)। অদ্ভুত রামায়ণে নারদের সংগীতশিক্ষার বিবরণ পাওয়া যায়। বিবিধ ব্যাপারে নারদের সক্রিয় ভূমিকাগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। দেবসভায় আলোচিত কংসের বধোপায় নারদ কংসকে জানান (হরিবংশ, ৫৬ অধ্যায়)। বাণাসুরের হস্তে অনিরুদ্ধের বন্ধন-সংবাদ নারদ কৃষ্ণকে জানাইলে অনিরুদ্ধের মুক্তি সম্ভব হয় (হরিবংশ, ১৭৭ অধ্যায়)। হরপার্বতী ও নলদময়ন্তীর বিবাহ, ধ্রুবের মন্ত্রদীক্ষা, শিশুপালবধ এবং দক্ষের প্রজাসৃষ্টি ব্যাপারে নারদ জড়িত ছিলেন। নারদ কলহপ্রিয় এবং তাঁহার

বাহন ঢেঁকি, বাংলায় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। নানাবিষয়ক কিছু কিছু গ্রন্থের সঙ্গে নারদের নাম যুক্ত দেখা যায়: নারদস্মৃতি, নারদ-পঞ্চরাত্র, নারদীয় পুরাণ।

যূথিকা ঘোষ

নারায়ণদেব মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি। তিনি তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত আত্ম-বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, রাঢ় দেশ ত্যাগ করিয়া তিনি পূর্ববঙ্গের বোরগ্রাম নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বোরগ্রাম ময়মনসিংহ জেলার পূর্বপ্রান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। তিনি চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার রচিত মনসামঙ্গল আসামের ব্রহ্মপুত্র এবং সুরমা উপত্যকা, উভয় অঞ্চলেই ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে অসমীয়া ভাষায় তাঁহার গ্রন্থখানি আনুপূর্বিক পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, তাঁহাকে অসমীয়া ভাষার আদি কবির মর্যাদা দেওয়া হয়।

দ্র তমোনাশ দাশগুপ্ত -সম্পাদিত, নারায়ণদেবের পদ্ম-পুরাণ, কলিকাতা, ১৯৪১; আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৪।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

নারায়ণী চৈতন্যভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবনদাসের মাতা ও শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থমধ্যে মাতামহের নাম লেখেন নাই। প্রেমবিলাসের অপ্রামাণিক ত্রয়োবিংশ বিলাসে আছে যে, নারায়ণীর পিতা ছিলেন শ্রীবাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিত এবং নারায়ণী এক বৎসর বয়সে পিতামাতা উভয়কেই হারান। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে নিমাই পণ্ডিত যখন গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন আরম্ভ করেন, তখন নারায়ণীর বয়স ছিল ৪ বৎসর (চৈতন্যভাগবত, ২।২।৭০)। মুরারিগুপ্তের কড়চায় তাঁহাকে অভর্তৃকা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (২।৭।২৬)। পদকর্তা উদ্ধবদাসও তাঁহাকে 'শৈশবে বিধবা ধনী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃ ৩০৪-৫)। নারায়ণী নবদ্বীপের নিকটবর্তী মামগাছিতে বাস করিতেন বলিয়া প্রবাদ। জয়ানন্দের মতে চৈতন্যদেবের ধাত্রীমাতার নামও ছিল নারায়ণী।

বিমানবিহারী মজুমদার

নারিকেল একবীজপত্রী তালজাতীয় বৃক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত নাম কোকোস নুসিফেরা (*Cocos nucifera*); গোত্র-পাল্‌মী (Family-Palmæ)। সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে বেশ ভালভাবে জন্মায়। তবে সমুদ্র হইতে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরেও ভাল ফলন হইতে দেখা যায়। ভারতে মোট ৭৯৯০০০ হেক্টরে নারিকেলের চাষ হয়, বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ৪৭৩·৬ কোটি নারিকেল এবং হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৫৯২৭টি নারিকেল। নারিকেল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃক্ষ এবং এজন্য সমভাবাপন্ন আবহাওয়া, উজ্জ্বল সূর্যালোক, উচ্চ আর্দ্রতা এবং সুবিস্তৃত বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। বেলে দো-আঁশ মাটি ইহার চাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। চাষের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন, কাজেই যেখানে জলপীঠ উচ্চ অথচ মাটির উপর জল দাঁড়ায় না বা ঠাণ্ডায় মাটির জল জমিয়া যায় না এমন স্থানেই নারিকেল ভাল হয়। দীর্ঘজীবী বৃক্ষ হওয়ার দরুন গ্রীষ্মকালে মধ্যবয়স্ক সুস্থ সতেজ ও সুফলা জননী-বৃক্ষ হইতে বীজ-নারিকেল সংগ্রহ করিয়া ও তাহাতে জল আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া বর্ষার পূর্বেই বালুকাময় বীজতলায় বপন করিতে হয়। ৯-১২ মাস বয়স্ক সতেজ চারা বর্ষায় বাগানে আনিয়া রোপন করা উচিত। চারাগুলি ১৬-২০ হাত দূরে দূরে লাইন করিয়া চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ পদ্ধতিতে গর্তে রোপণ করিতে হইবে। প্রত্যেকটি গর্ত ২ হাত লম্বা, চওড়া এবং গভীর হইতে হইবে। উই-এর আক্রমণ রোধের জন্য গর্তের নীচে বালি দিয়া চারা বসাইতে হইবে এবং মাটি দিয়া নারিকেলটি সম্পূর্ণ ঢাকিয়া দিতে হইবে। গর্তের মধ্যে বর্ষার জল যাওয়া রোধ করার জন্য বাড়তি মাটি গর্তের মুখে আইলের মত করিয়া দিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে ২-৩ মাস চারায় জল দেওয়া প্রয়োজন। বাগান আগাছামুক্ত রাখিতে হইবে। বর্ষার পর সমস্ত জমি কোপাইয়া বা চাষ দিয়া দিতে হয়। প্রতি বৎসরই বর্ষার আগে ও পরে দুইবারে সার দিতে হইবে। মাটির গুণানুসারে প্রতি বৎসর গাছপ্রতি ৩৫০-৮০০ গ্রাম পটাশ, ২২৫-৪৫০ গ্রাম নাইট্রোজেন ও প্রায় ৪৫০ গ্রাম ফস্‌ফেট-ঘটিত সার দেওয়া উচিত। গণ্ডারে পোকা নারিকেল গাছের প্রধান শত্রু; ইহারা মাথার মাঝ-পাতা খাইয়া ডিম পাড়ে। শলাকার সাহায্যে পোকা বাহির করিয়া ও গ্যামাকৃসিন বা ডি. ডি. টি. প্রয়োগ করিয়া ইহাদের দমন করা যায়। ফুল ফোটা হইতে নারিকেল ঝুনা হওয়া পর্যন্ত প্রায় ১ বৎসর সময় লাগে। ৩-৪ মাস অন্তর ফল সংগ্রহ করা ভাল। পূর্ণতা পাওয়ার পর হইতে জীবিত কাল পর্যন্ত নারিকেল গাছে প্রতি মাসে একটি করিয়া পুষ্পমঞ্জরী অর্থাৎ কাঁদি বাহির হয়।

ভারতে লম্বা ও বেঁটে—দুই জাতের গাছ পরিচিত। দীর্ঘজীবী (৮০-৯০ বৎসর) লম্বা জাতের গাছ বহুল প্রচলিত, ফলন সাধারণতঃ ৭-৮ বৎসরে হয় এবং ইহার নারিকেল, শাঁস, তৈল ও ছোবড়া উৎকৃষ্ট। অনেক সময় স্পেদ হইতে রস সংগ্রহ করা হয় ও তাহা জাল দিয়া ভাল গুড় তৈয়ারি হয়। কোথাও কোথাও রস হইতে তাড়িও উৎপন্ন হয়। অপেক্ষাকৃত স্বল্পজীবী (৩০-৩৫ বৎসর) বেঁটে জাতের গাছের জন্য অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। ইহার ফলন ৪ বৎসরের মধ্যেই হয়। ফল অনেক সময় সোনালিবর্ণ হইয়া থাকে। কচি অবস্থায় ডাব উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর পানীয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। ডাবের জন্য ফল পাড়া হইলে নারিকেল শাঁস বা কপ্‌রার উৎপাদন কমিয়া যাইতে বাধ্য। বর্তমানে ভারতে প্রচুর পরিমাণে কপ্‌রা এবং তৈল বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ডাবের জন্য বেঁটে জাত অথবা অধুনা প্রচলিত লম্বা এবং বেঁটে জাতের সংকর চারা রোপণ করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। নারিকেল চারা ফল দিতে শুরু করার আগে বাগিচায় দানাশস্য, ডাল, আদা, হলুদ, কলা এবং সবজি চাষ করা যায়। গাছ বড় হইলেও কোনও কোনও অঞ্চলে আনারস ও শটির চাষ করা হয়।

নারিকেলের শাঁস মিষ্টান্ন এবং নানাপ্রকার তরকারিতে ব্যবহার করা হইলেও ইহা প্রধানতঃ কপ্‌রা উৎপাদন এবং তাহা হইতে তৈল উৎপাদন করিতেই ব্যবহৃত হয়। তৈল রান্নায় এবং বনস্পতি ও সাবান উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। শাঁসে তৈলের পরিমাণ শতকরা ৫০-৭৫ ভাগ। খোসা হইতে ছোবড়া বা 'কয়ার' পাওয়া যায় এবং তাহার দ্বারা দড়ি, গদি ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। মালা, পাতা, মধ্যশিরা, গাছের কাণ্ড ইত্যাদি সমস্তই কাজে লাগে; এইজন্যই নারিকেলকে 'কল্পবৃক্ষ' বলা হয়।

দ্র Indian Council of Agricultural Research, *Handbook of Agriculture*, New Delhi, 1966; Manager of Publications, Government of India, *Indian Agriculture in Brief*, Delhi, 1966.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

নারিকেল গাছের কাণ্ড শাখাবিহীন ও সুদীর্ঘ স্তম্ভের ন্যায়। ইহার শীর্ষে পক্ষবৎ অতিখণ্ডিত বৃহৎ পত্রগুলি গাছের শোভা বৃদ্ধি করে। নারিকেলের ফুল অনুজ্জ্বল, সমাঙ্গ ও একলিঙ্গ। পুষ্পপুট ফিকে হলুদ বর্ণের। ফুলে ৬টি পুংকেশর ও ৩টি গর্ভপত্র বর্তমান। পুষ্পবিন্যাস একটি কঠিন মঞ্জরীপত্র দ্বারা আবৃত থাকে। নারিকেলের উপ-জাতীয় ফলের বহির্ভাগ সবুজ ও সোনালি; ফল শুষ্ক হইলে ইহা ধূসর হইয়া যায়। ইহার ভিতরের অংশকে ছোবড়া ও তাহার ভিতরের কঠিন অংশকে মালা বলে। এই কঠিন আবরণের মধ্যে একটিমাত্র বীজ ও শাদা শাঁস থাকে; শাঁসই নারিকেলের শস্য (এণ্ডোস্পার্ম)। অপরিণত নারিকেল অর্থাৎ ডাবের জল সুস্বাদু পানীয়। নারিকেলের শাঁস পুষ্টিকর খাদ্য; উহাতে শর্করা, স্নেহপদার্থ ও ভিটামিন বর্তমান। রৌদ্রে বা উত্তাপে শাঁস শুখাইয়া কপ্‌রা উৎপন্ন হয়। এই কপ্‌রা হইতেই নারিকেল তৈল নিষ্কাশিত হয়। নারিকেলের ছোবড়া জলে ভিজাইয়া ও পরে কঠিন বস্তুর দ্বারা আঘাত করিয়া আঁশ বা 'কয়ার' পৃথক করা হয়। নারিকেলের মালা হইতে হুঁকার খোল, একপ্রকার উত্তম কাঠকয়লা প্রভৃতি, পাতার দ্বারা ঝুড়ি, টুপি ইত্যাদি, পাতার মধ্যশিরা হইতে ঝাঁটা এবং কাণ্ড হইতে খুঁটি প্রস্তুত করা হয়। নারিকেলের পাতা ঘর ছাওয়ার কাজেও লাগে। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপ্পীন, ভারত, সিংহল প্রভৃতি দেশে প্রচুর নারিকেল উৎপন্ন হয়। মেক্সিকো, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশেও ইহার চাষ হইয়া থাকে।

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

নার্ভ প্রাণিদেহের বার্তাবহ। উপযুক্ত উদ্দীপনার ফলে নার্ভ বাহিয়া ক্ষীণ তড়িত-প্রবাহ দেহের একাংশ হইতে অপরাংশে যায়, ইহাকেই আবেগ (নার্ভ ইম্‌পাল্‌স) বলে। নার্ভবাহিত এই আবেগ মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ড হইতে পেশী বা গ্রন্থিতে পৌঁছিয়া পেশীর সংকোচন বা গ্রন্থির রসক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহকযন্ত্র (রিসেপ্‌টর) হইতে মস্তিষ্কের বিভিন্ন সংজ্ঞাকেন্দ্রে (সেন্‌সরি সেন্‌টার) পৌঁছিয়া নানা অনুভূতির সৃষ্টি করে। প্রত্যেক নার্ভ বহু নার্ভতন্তুর (নার্ভ-ফাইবার) সমাহার।

নার্ভ নার্ভটিস্যুর অংশ। নার্ভটিস্যু প্রধানতঃ নার্ভকোষে গঠিত। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসরবর্ণ অংশে এবং উহাদের বাহিরে অবস্থিত নার্ভগ্রন্থিতে (নার্ভ-গ্যাংগ্লিয়ন) নার্ভকোষগুলি বর্তমান। নার্ভকোষের দেহ গোল, ত্রিকোণাকার, বহুভুজাকার, মূলকাকার, শিখরাকার বা কুপির মত আকৃতিবিশিষ্ট এবং মাত্র ৪ মাইক্রন হইতে ৮০ মাইক্রন পর্যন্ত ব্যাসবিশিষ্ট হইতে পারে (১ মাইক্রন $= \frac{1}{1000}$ মিলিমিটার)। কোষদেহে একটি নিউক্লিয়াস, এন্‌জাইমপূর্ণ বহু মাইটোকন্‌ড্রিয়া, গল্‌গি-জালক নামক জাল, নিউরোফাইব্রিল নামক সূক্ষ্ম তন্তু, নিসিল-বডি নামক কোণবিশিষ্ট দানা, এন্‌ডোপ্লাজ্‌মিক

রেটিকিউলাম নামক জটিল নালীসমষ্টি প্রভৃতি কোষাঙ্গক বর্তমান ('কোষ' দ্র)। কিন্তু নার্ভকোষে সেন্ট্রোজোম থাকে না এবং ইহার কোষবিভাজনের ক্ষমতা নাই। প্রত্যেক নার্ভকোষের এক বা একাধিক দীর্ঘ বা নাতিদীর্ঘ বাহু (প্রসেস) বর্তমান। কোষদেহসংলগ্ন যে বাহুটি বাহিয়া আবেগ কোষদেহ হইতে দূরে যায় তাহাকে 'অ্যাক্‌শন' এবং অন্য যে এক বা একাধিক বাহু বাহিয়া আবেগ দূর হইতে নার্ভকোষের দেহে আসে তাহাদের 'ডেন্‌ড্রাইট' বলে। নার্ভকোষের এরূপ এক-একটি দীর্ঘ বাহু লইয়াই নার্ভতন্তু গঠিত। নার্ভতন্তু দুইপ্রকার আবরণে আবৃত থাকে : ১. শোয়ান-কোষ নামক কোষ দ্বারা গঠিত বহিরাবরণী। ইহাকে 'নিউরিলেম্মা শীদ' বলে। নার্ভতন্তুর যে অংশ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের বাহিরে অবস্থিত কেবল সেটুকুই এই আবরণীর দ্বারা আচ্ছাদিত ২. 'মায়ালিন' নামক লিপিড-জাতীয় পদার্থে গঠিত ও নিয়মিত দূরত্বে খণ্ডিত মধ্যাবরণী। ইহাকে 'মায়ালিন শীদ' বা 'মেডালারি শীদ' বলে। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের শ্বেতবর্ণ অংশে ইহাই নার্ভতন্তুর একমাত্র আবরণী। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের বাহিরেও ইহা নিউরিলেম্মা শীদের নীচে বর্তমান; অবশ্য সকল নার্ভতন্তুর মেডালারি শীদ থাকে না, এরূপ নার্ভতন্তুকে নন-মেডালেটেড নার্ভ-ফাইবার এবং যাহাদের মেডালারি শীদ বর্তমান তাহাদের মেডালেটেড নার্ভ-ফাইবার বলে।

নার্ভটিস্যুতে নার্ভকোষ ব্যতীত নিউরোগ্লায়া কোষ বর্তমান। নিউরোগ্লায়া কোষগুলির বাহুসমষ্টির জালে নার্ভকোষ ও নার্ভতন্তুগুলি সঠিক স্থানে সুবিন্যস্ত থাকে।

যে-সকল নার্ভতন্তু বাহিয়া আবেগ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড হইতে দেহের অন্যান্য অঙ্গে যায় তাহাদের বহির্মুখ (ইফারেণ্ট) নার্ভতন্তু বলে; যে-সকল নার্ভতন্তু বাহিয়া আবেগ ইন্দ্রিয়, ত্বক প্রভৃতি হইতে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডে আসে তাহাদের অন্তর্মুখ (অ্যাফারেণ্ট) নার্ভতন্তু বলে। অন্তর্মুখ নার্ভতন্তু দিয়া গঠিত যে নার্ভ ইন্দ্রিয়াদি হইতে আবেগকে মস্তিষ্কে লইয়া গিয়া অনুভূতি জাগায়, তাহাকে সংজ্ঞাবহ (সেন্‌সরি) নার্ভ বলে। অন্যদিকে বহির্মুখ নার্ভতন্তু দিয়া গঠিত যে নার্ভ আবেগকে পেশী বা গ্রন্থিতে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদের ক্রিয়াসম্পাদনে উদ্দীপিত করে, তাহাকে চেষ্টীয় (মোটর) নার্ভ বলে। সংজ্ঞাবহ নার্ভের তন্তুগুলি ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহকযন্ত্র হইতে উৎপন্ন হয়; চেষ্টীয় নার্ভের তন্তুগুলি পেশী বা গ্রন্থির মধ্যে গিয়া সমাপ্ত হয়। অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ উভয়প্রকার নার্ভতন্তু দিয়া গঠিত নার্ভকে মিশ্রনার্ভ বলে।

নার্ভ বাহিয়া আবেগের গতি অনেকাংশে নার্ভতন্তুর ব্যাসের উপর নির্ভর করে। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম নার্ভতন্তু (ব্যাস প্রায় ১ মাইক্রন অর্থাৎ $\frac{১}{১০০০}$ মিলিমিটার) বাহিয়া আবেগের গতি সেকেণ্ডে মাত্র ১ মিটার, অথচ অপেক্ষাকৃত স্থূল নার্ভতন্তুতে (ব্যাস প্রায় ২০ মাইক্রন) আবেগের গতি সেকেণ্ডে প্রায় ১০০ মিটার পর্যন্ত হইতে পারে।

এক নার্ভকোষের অ্যাক্‌শন অনেক সময়েই দ্বিতীয় একটি নার্ভকোষের ডেন্‌ড্রাইটের সংস্পর্শে শেষ হয়; দুই নার্ভতন্তুর এই সন্ধিস্থল বা প্রান্তসন্নিকর্ষ (সাইন্যাপ্‌স) অতিক্রম করিয়াই আবেগকে এক নার্ভতন্তু হইতে পরবর্তী নার্ভতন্তুতে যাইতে হয়। প্রান্তসন্নিকর্ষের মধ্য দিয়া আবেগ কেবল একদিকেই, অর্থাৎ প্রথম কোষের অ্যাক্‌শন হইতে দ্বিতীয় কোষের ডেন্‌ড্রাইট অভিমুখে যাইতে পারে; বিপরীত মুখে ঐ সন্ধিস্থল অতিক্রম করা আবেগের পক্ষে অসম্ভব। ইহাকেই আবেগের একমুখী পরিবহণ বলে। আবেগ কোনও নার্ভতন্তুর প্রান্তে পৌঁছাইলে ঐস্থলে অ্যাসেটাইল কোলিন অথবা অ্যাড্রিন্যালিন নামক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়; এই রাসায়নিক পদার্থগুলিই পরবর্তী নার্ভতন্তুকে উদ্দীপিত করিয়া আবেগের অগ্রগতি সম্ভবপর করে অথবা পেশী বা গ্রন্থিকে উদ্দীপিত বা অবদমিত করিয়া অভীপ্সিত ক্রিয়াসম্পাদন করে। 'ইন্দ্রিয়', 'নার্ভতন্ত্র', 'মস্তিষ্ক' ও 'সুষুম্নাকাণ্ড' দ্র।

দ্র J. C. Eccles, *The Physiology of Nerve Cells*, Baltimore, 1957 ; J. C. Eccles, *The Physiology of Synapses*, New York, 1964.

নার্ভতন্ত্র নার্ভটিস্যুর দ্বারা গঠিত অঙ্গাদির সমাহার ('নার্ভ' দ্র)। নার্ভতন্ত্র ব্যতিরেকে অন্য সকল টিস্যুরই কার্য অসম্পূর্ণ থাকে। নার্ভতন্ত্রের সাহায্যেই দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, আস্বাদ, স্পর্শ, বেদনা, শীততাপ প্রভৃতির অনুভূতি জন্মায়, মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ প্রকাশিত হয়, এমন কি ইহারই পরোক্ষ প্রভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। নার্ভতন্ত্র দেহের মধ্যে সকল কাজ, চিন্তা ও দ্যোতনার সমন্বয় ও সমাকলন ঘটায়।

নার্ভতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে : মস্তিষ্কসুষুম্না (সেরিব্রোস্পাইন্যাল) নার্ভতন্ত্র এবং স্বতঃক্রিয় বা স্বতন্ত্র (অটোনমিক) নার্ভতন্ত্র। মস্তিষ্কসুষুম্না নার্ভতন্ত্রকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় : ১. কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র : ইহা মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড লইয়া গঠিত। মস্তিষ্ক করোটিক-গহ্বরে (ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি) এবং সুষুম্নাকাণ্ড মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ গহ্বরে বিন্যস্ত থাকে। গুরুমস্তিষ্ক (সেরিব্রাম),

লঘুমস্তিষ্ক (সেরিবেলাম), মধ্যমস্তিষ্ক (মিড্‌-ব্রেন), মস্তিষ্কযোজক (পন্‌স) ও সুষুম্নাশীর্ষক (মেডালা অব্‌লন্‌গাটা) লইয়া মস্তিষ্ক গঠিত। সুষুম্নাশীর্ষক ও সুষুম্নাকাণ্ড পরস্পরসংযুক্ত ২. প্রান্তীয় (পেরিফেরাল) নার্ভতন্ত্র: মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন ১২ জোড়া করোটিক নার্ভ এবং সুষুম্নাকাণ্ড হইতে উৎপন্ন ৩১ জোড়া সুষুম্নানার্ভ লইয়া ইহা গঠিত। প্রত্যেক নার্ভ বহু নার্ভতন্তুর সমাহার। কতকগুলি নার্ভতন্তু বহির্মুখ (ইফারেণ্ট) অর্থাৎ ইহারা কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে উদ্ভূত আবেগ (ইম্‌পাল্‌স) দেহের অন্যান্য অংশে বহিয়া লইয়া যায় এবং পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। আর কতকগুলি নার্ভতন্তু অন্তর্মুখ (অ্যাফারেণ্ট) অর্থাৎ ইহারা নানা ইন্দ্রিয়াদি হইতে আবেগকে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে বহিয়া আনে এবং অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব-বহির্ভূত নার্ভতন্ত্রকে স্বতঃক্রিয় বা স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র বলে। ইহা সমবেদী বা সমব্যথী (সিম্‌প্যাথিক) ও পরাসমবেদী বা পরাসমব্যথী (প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক) নার্ভতন্ত্র লইয়া সংগঠিত। ইহারা হৃৎপিণ্ডের গতি, শ্বসনের তাল, অন্ত্রের চালনা এবং রসের ক্ষরণে সাহায্য করে। পরোক্ষভাবে স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস ও গুরুমস্তিষ্কের 'লিম্বিক' পিণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

সমবেদী নার্ভতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ মেরুদণ্ডের প্রতিপার্শ্বে বহু পরস্পরযুক্ত নার্ভগ্রন্থির একাদিক্রম বিন্যাসে গঠিত একটি নার্ভ-রজ্জু (ল্যাটারাল সিম্‌প্যাথেটিক চেন)। সুষুম্নাকাণ্ডের বক্ষ (থোরাসিক) ও কটি (লাম্বার) অংশ হইতে উৎপন্ন কতকগুলি নার্ভতন্তু সুষুম্নাকাণ্ড ছাড়িয়া আসিয়া উপরি-উক্ত নার্ভ-রজ্জুর নার্ভগ্রন্থিগুলির ভিতর গিয়া শেষ হয়; ঐ নার্ভগ্রন্থিগুলির নার্ভকোষ হইতে উৎপন্ন নূতন নার্ভতন্তু নার্ভগ্রন্থি ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া নানা আভ্যন্তরীণ অঙ্গে যায়। অবশ্য উপরি-উক্ত নার্ভ-রজ্জু দুইটির বাহিরেও সমবেদী নার্ভতন্ত্রের কতিপয় নার্ভগ্রন্থি বর্তমান, ইহাদের মেরুপুরোবর্তী (প্রি-ভার্টিব্র্যাল) এবং প্রান্তীয় (টার্মিন্যাল) নার্ভগ্রন্থি বলে।

পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সংগঠিত নার্ভ-রজ্জুর অস্তিত্ব নাই; এক্ষেত্রে নার্ভগ্রন্থিগুলি পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ অঙ্গের সন্নিকটে বর্তমান। মধ্যমস্তিষ্ক, সুষুম্নাশীর্ষক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের বস্তি (স্যাক্রাম) অংশ হইতে নির্গত কতকগুলি নার্ভতন্তু কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র ছাড়িয়া আসিয়া শেষোক্ত নার্ভগ্রন্থিগুলিতে সমাপ্ত হয় এবং ঐসকল নার্ভগ্রন্থির নার্ভকোষ হইতে উৎপন্ন নার্ভতন্তু নিকটস্থ অঙ্গে যায়।

সমবেদী নার্ভতন্ত্র একত্রে ও ত্বরিতগতিতে উদ্দীপিত হয়। আকস্মিক বিপদ বা উত্তেজনার আশু জবাব দেওয়াই ইহার প্রধান কাজ। পক্ষান্তরে পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্র অযথা উদ্দীপিত হয় না এবং দেহে শক্তির অপচয় রোধ করে। বহুক্ষেত্রেই সমবেদী ও পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্রের বিপরীতমুখী ক্রিয়ার সুষ্ঠু সমন্বয়ে দেহের আভ্যন্তরীণ কার্য ও অবস্থার সমতা (হোমিওস্ট্যাসিস) রক্ষিত হয়। 'মস্তিষ্ক' ও 'সুষুম্নাকাণ্ড' দ্র।

দ্র C. H. Best & N. B. Taylor, *The Physiological Basis of Medical Practice*, Calcutta, 1967.

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

নার্সারি শিক্ষা প্রাক-প্রাথমিক শিশুশিক্ষা। ফ্রান্সের আল্‌সাস প্রদেশবাসী ধর্মযাজক য়োহান ফ্রিড্‌রিখ ওবের্‌লিন (১৭৪০-১৮২৬ খ্রী) ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে বিশ্বের প্রথম প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনে সমাজসেবী রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮ খ্রী)-এর উদ্যোগে কাপড়কল শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য শিশুশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মান শিক্ষাবিদ্‌ ফ্রিড্‌রিখ ফ্রোয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২ খ্রী) কিণ্ডারগার্টেন নামে এক শিশুশিক্ষাপদ্ধতির সূচনা করেন ('কিণ্ডারগার্টেন' দ্র)। ঐ শতাব্দীর শেষদিকে ইটালীয় মনোরোগবিশারদ মারিয়া মন্তেস্‌সরি (১৮৭০-১৯৫২ খ্রী) পূর্ব পদ্ধতির আংশিক পরিবর্তন করিয়া 'মন্তেস্‌সরি প্রণালী' নামে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে শিক্ষাসংস্কারক র‍্যাচেল ম্যাক্‌মিলান (১৮৫৯-১৯১৭ খ্রী) ও মার্গারেট ম্যাক্‌মিলান (১৮৬০-১৯৩১ খ্রী) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নার্সারি বিদ্যালয় ব্রিটেনে প্রচলিত নার্সারি শিক্ষার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক বলিয়া বিবেচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নার্সারি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক শহরে।

নার্সারি শিক্ষায় প্রথাগত কেতাবি শিক্ষার প্রয়োগ নাই। নার্সারি বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন উদ্যানে শিশুর পরিচিত পরিবেশ যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়া সুস্থ, সস্নেহ ও স্বচ্ছন্দ আবহাওয়ায় উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে ক্রীড়া, চিত্রাঙ্কণ, সংগীত প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

নার্সারি শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর দেহ ও মনের সুস্থ বিকাশ। নানাপ্রকার কাজ ও খেলার মাধ্যমে বস্তুজগতের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে শিশুর প্রাথমিক জ্ঞান জন্মায়, দেহের বিভিন্ন পেশীর ক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপিত হয়,

নূতন নূতন শব্দ-শিক্ষার দ্বারা ভাবপ্রকাশের শক্তি বৃদ্ধি পায়, আজ্ঞানুবর্তিতা সামাজিকতা পরিচ্ছন্নতা ন্যায়-অন্যায়-বোধ প্রভৃতির মনোভাব জাগ্রত হওয়ায় সমাজচেতনা ও সহজ নীতিবোধের উন্মেষ ঘটে, আত্মসংযম মনঃসংযোগ প্রভৃতির অভ্যাস সৃষ্ট হয় এবং শিক্ষয়িত্রী ও সমবয়স্কদের স্নেহ ও সঙ্গ এবং সৃজনধর্মী ক্রিয়াকলাপ আবেগের সুস্থ বিকাশে সাহায্য করে। কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেস্সরি প্রণালীতে কয়েক প্রকার বিশেষভাবে নির্মিত উপকরণ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইত; আধুনিক নার্সারি শিক্ষা ঐ দুই পদ্ধতির আদর্শের অনুসরণে গঠিত হইলেও এক্ষেত্রে ঐরূপ কৃত্রিম উপকরণের ব্যবহার আবশ্যিক বলিয়া বিবেচিত হয় না। সাধারণতঃ ২-৫ বৎসর বয়স্ক শিশুকে নার্সারি শিক্ষা দেওয়া হয়; কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেস্সরি প্রণালীর শিক্ষার ব্যবস্থা সাধারণতঃ যথাক্রমে ৪-৬ এবং ৩-৬ বৎসরের শিশুর জন্য।

ভারতে সার্জেণ্ট কমিশন (১৯৪৪ খ্রী) ৩-৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদের জন্য অবৈতনিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করেন। স্বাধীনতার পরে ভারতে নার্সারি শিক্ষা অল্পাধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পশ্চিম বঙ্গের আলিপুরে 'ইন্স্টিটিউট অফ এডুকেশন ফর উইমেন' এবং বাণীপুরে 'পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজ'-এর সহিত সংশ্লিষ্ট দুইটি সরকার-পরিচালিত নার্সারি বিদ্যালয় আছে। ভারতে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় জম্মু ও কাশ্মীরে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার অপেক্ষাকৃত অধিক। গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে অতি শৈশব হইতে ৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত পূর্ব-বুনিয়াদী বা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব আছে।

দ্র O. A. Wheeler & I. G. Earl, *Nursery School Education and the Reorganization of the Infant School*, London, 1939; J. C. Foster & M. L. Mattson, *Nursery School Education*, New York, 1939; K. H. Read, *The Nursery School: A Human Relationships Laboratory*, Philadelphia, 1955; J. E. Leavitt, ed., *Nursery-Kindergarten Education*, New York, 1958.

আরতি দাশ

নার্সিং শিশু, রোগী ও আতুরের শুশ্রূষা। পীড়িতকে তাহার হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ও স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে সাহায্য করাই নার্সিং-এর উদ্দেশ্য।

বেদে শুশ্রূষাকারীর অপরিহার্য গুণ সম্পর্কে কথিত আছে যে তাহাকে শান্ত ও প্রফুল্ল মনের অধিকারী হইতে হইবে; শারীরিক শক্তিতেও শক্তিমান হওয়া প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্মের আমলেও ভারতে এ ধরনের চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল। দরিদ্র এবং অসুস্থের সেবাশুশ্রূষা মানবতাবাদী বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান আদর্শরূপে পরিগণিত হইত। সম্রাট অশোক পীড়িতের শুশ্রূষাকল্পে প্রত্যেকটি নগরীতেই চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এইগুলিতে শুশ্রূষার জন্য তিনি সেবক নিযুক্ত করেন।

মাত্র আধুনিক কালেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে নার্সিং-এর অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষ বৃত্তিরূপে ইহাকে গ্রহণ করিবার প্রেরণাও নিতান্তই আধুনিক। আধুনিক নার্সিং-বিদ্যার প্রতিষ্ঠাত্রী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল।

রাজ্য সরকারের অনুমোদিত নার্সিং স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্সকে নাম রেজিস্ট্রি করাইতে হয় কিংবা কোনও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট কোনও নার্সিং-এর কলেজে ৪ বৎসরের জন্য নার্সিং-এ অনার্স লইয়া বি. এস্-সি. পাশ করিয়াও নার্স হিসাবে নাম রেজিস্ট্রি করানো যায়। এই বিষয়ে বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের জন্য স্নাতকোত্তর শিক্ষারও সুব্যবস্থা আছে। মানসিক শুশ্রূষা, শিশু-শুশ্রূষা, জনস্বাস্থ্য, শুশ্রূষা, শিল্পাঞ্চলীয় শুশ্রূষা প্রভৃতি নার্সিং-বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় শিক্ষালাভেরও সুযোগ আছে। বিশেষতঃ যাঁহারা নার্সিং-এর বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন কিংবা পরিচালনা করেন কিংবা যাঁহারা এই বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে এই সকল বিশিষ্ট শাখায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নার্সিং-এ ২ বৎসরের পাঠ্যক্রমে পাঠ শেষ করিয়া স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের ব্যবস্থা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নার্সিং-এ গবেষণার সুযোগও আছে।

উমা মিত্র

নালন্দা (২৫°৫' উত্তর ও ৮৫°২০' পূর্ব) বিহারের পাটনা জেলার অন্তর্গত বক্তিয়ারপুর-রাজগির রেললাইনের একটি ক্ষুদ্র স্টেশন। রাজগিরের প্রায় ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) উত্তরে ইহা অবস্থিত। প্রাচীন বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষের জন্য নালন্দার খ্যাতি। বস্তুতঃ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তির কিছুকালের মধ্যেই নালন্দা পরিত্যক্ত হয়। চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া আলেক্জাণ্ডার ক্যানিংহাম ১৯শ শতকের ৬ষ্ঠ দশকে বড়গাঁও গ্রামের পার্শ্ববর্তী প্রত্নস্থলে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ সনাক্ত করেন। পরবর্তী কালের ব্যাপক খননে ক্যানিং-

নালন্দা

হামের সনাক্তকরণ সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয়। খননের ফলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলি লইয়া একটি সংগ্রহশালা (মিউজিয়াম) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে এখানে নব-নালন্দা মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; উদ্দেশ্য বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা।

বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে জানা যায় যে বুদ্ধদেব কয়েকবার এইস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন; এখানকার পাবারিকের আম্রকুঞ্জ ছিল তাঁহার প্রিয় আবাস। বুদ্ধদেবের শিষ্য সারিপুত্রের জন্মস্থল বলিয়াও এই স্থানের মাহাত্ম্য। লামা তারনাথ লিখিয়াছিলেন, মৌর্য সম্রাট অশোক সারিপুত্রের চৈত্যে উপাসনা করিয়াছিলেন এবং এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই তিব্বতীয় ঐতিহাসিক আরও বলেন, নাগার্জুন (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ২য় শতক) ছিলেন নালন্দার প্রধান পণ্ডিত এবং তাঁহারই সময়ে সুবিষ্ণু এখানে ১০৮টি মন্দির নির্মাণ করেন। সংঘারাম সম্পর্কে ফা-হিয়েনের নীরবতায় তারনাথের এই উক্তির যাথার্থ্য সম্পর্কে অনেকে সন্দিহান। ফা-হিয়েন অবশ্য সারিপুত্রের স্তূপ দেখিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকে গুপ্ত-নৃপতিদের রাজত্বকালেই নালন্দার প্রকৃত গুরুত্বলাভের সূত্রপাত হয়। হিউএন্-ৎসাঙ -এর বিবরণী হইতে জানা যায়, এই রাজবংশের ৫জন নৃপতি ৫টি সংঘারামের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইঁহাদের মধ্যে বালাদিত্য সংঘারামাতিরিক্ত একটি সুউচ্চ মন্দিরও নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই যুগেই ৬ষ্ঠ সংঘারামটি মধ্যভারতের জনৈক শাসক প্রতিষ্ঠা করেন। নালন্দার গৌরববর্ধনে গুপ্ত-নৃপতিদের অবদান শুধু যে নরসিংহগুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের মুদ্রা ও সীলমোহর প্রাপ্তি হইতে প্রমাণিত হয় তাহা নহে, বালাদিত্য-নির্মিত মন্দিরে বুদ্ধদেবের বিগ্রহের উদ্দেশ্যে কতিপয় দানের উল্লেখযুক্ত যশোবর্মা-দেবের (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের প্রারম্ভ) একটি লেখও ইহার প্রমাণ।

বুদ্ধদেবের প্রায় ২৪ মিটার (৮০ ফিট) উচ্চ তাম্রমূর্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে পূর্ণবর্মনের নির্মিত ছয়তলা মন্দিরটিসহ আরও কয়েকটি অত্যুচ্চ বিরাট ও মনোরম মন্দিরের উল্লেখও হিউএন্-ৎসাঙ করিয়াছেন। কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ খ্রী) কর্তৃক নির্মীয়মাণ একটি ব্রঞ্জের বিহারও তিনি দেখিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই নালন্দা শিক্ষাকেন্দ্ররূপে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া সমগ্র বৌদ্ধ জগতে প্রখ্যাত হয়। এই খ্যাতি খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। স্বয়ং হিউএন্-ৎসাঙ খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের প্রথমার্ধে কিছুকাল এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছিলেন এবং তাঁহার অনুকরণে ৫০ বৎসরের মধ্যে ১১ জন চৈনিক ও কোরিয়াবাসী পণ্ডিত নালন্দা দর্শন করেন। হিউএন্-ৎসাঙ ও ঈৎসিং-এর অমূল্য বিবরণী হইতে এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদ পাওয়া যায়। নালন্দার বিশেষত্ব ছিল শিক্ষাবিষয়ের বৈচিত্র্য ও বিপুলত্ব। বস্তুতঃ জ্ঞানের অধিকাংশ শাখাই ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এমন কি হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও বেদের অনুশীলনেরও ব্যতিক্রম ছিল না।

শক্তিশালী পালরাজবংশের যুগে (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতক হইতে ১২শ শতক) নালন্দা অধিকতর সমৃদ্ধি ও খ্যাতি অর্জন করে। রাজন্যবর্গের অবাধ পৃষ্ঠপোষকতায় ও অমিত অর্থসাহায্যে ইহা মহাযান ও বজ্রযানের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এই ধর্ম এখানকার শ্রমণদের মাধ্যমে দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। নালন্দার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পদ্মসম্ভব তিব্বতে গমন করিয়া লামা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হন। ১সংখ্যক সংঘারামে প্রাপ্ত একটি তাম্র-শাসনে লিপিবদ্ধ আছে যে সুবর্ণ দ্বীপের (সুমাত্রা) নৃপতি বালপুত্রদেব এখানে একটি সংঘারাম নির্মাণ করাইয়া-ছিলেন।

১২শ শতকের শেষাংশে মুসলমান আক্রমণকারীদের বিধ্বংসী হস্তের কবলে পড়িয়া নালন্দার বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। ১২৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতীয় ধর্মস্বামী যখন নালন্দায় আসেন তখন নালন্দা অতীত গৌরবের ছায়ায় পর্যবসিত হইয়াছে। অত্যুচ্চ শিখরবিশিষ্ট বহুসংখ্যক ইষ্টকের মন্দির ও সংঘারাম তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল সত্য; কিন্তু তুরুস্কদের দ্বারা ইহাদের অনেকগুলি তখন বিধ্বস্ত হইয়াছিল। মন্দির ও সংঘারামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেহই ছিল না। ওদন্তপুরী বা বর্তমানে বিহার শরীফ হইতে একদল তুরুস্ক সৈন্য আসিয়া জ্ঞাননাথ মন্দিরের প্রস্তরসমূহ অপহৃত করে। দুইটিমাত্র সংঘারাম (ধ-ন-ব ও ঘু-ন-ব) মোটামুটি ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় ছিল। ক্ষয়ণ ধর্মস্বামী নালন্দায় গমন করেন। মাত্র ৭০ জন শ্রমণ এখানে অবস্থান করিয়া মঠাধ্যক্ষ মহাপণ্ডিত রাহুলশ্রীভদ্র ও অপর চারিজন পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া-ছিলেন। তুরুস্ক ইঁহাদের হত্যা করিতে কৃতসংকল্প জানিতে পারিয়া বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষ ও ধর্মস্বামী ব্যতীত সকলেই পলায়ন করেন। অনতিবিলম্বে ৩০০ তুরুস্ক সৈন্য প্রতিষ্ঠানটি আক্রমণ করে। ইতিপূর্বে ভগ্ন জ্ঞাননাথ মন্দিরে মঠাধ্যক্ষ ও ধর্মস্বামী আশ্রয় গ্রহণ করায় উঁহাদের না পাইয়া সৈন্যরা প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। এই

কঙ্কালসার প্রতিষ্ঠানের চরম বিলুপ্তি ঘটে অদূর ভবিষ্যতে। অবশ্য কোরিয়ার ১৪শ শতকের একটি লেখে উল্লেখ আছে যে মগধের অধিবাসী ধ্যানভদ্র সিংহলে গমন করিবার পূর্বে এখানে অধ্যয়ন করেন।

ধর্মস্বামীর অবস্থানকালে চারিটি বিগ্রহের বিশেষ মাহাত্ম্য ছিল: খসর্পণ লোকেশ্বরের শিলামূর্তি, মঞ্জুশ্রীর দারুময় বিগ্রহ, জ্ঞাননাথের প্রস্তরমূর্তি এবং তারার চিত্র। সম্বরের একটি মন্দির এ-সময়ে দণ্ডায়মান ছিল।

নালন্দায় ব্যাপকভাবে খননক্রিয়া পরিচালিত হইয়াছে। ইহার ফলে দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে বিস্তৃত বহুসংখ্যক সৌধাদি উদ্ঘাটিত হইয়াছে—একটি সুপ্রশস্ত চত্বরের পূর্বদিকে সারিবদ্ধ সংঘারাম এবং পশ্চিমদিকে ক্ষুদ্র আকারের স্তূপ পরিবেষ্টিত বড় বড় মন্দির। সৌধগুলির অধিকাংশ পালযুগের, যদিও ইহাদের বেশ কতকগুলির পত্তন হয় প্রাচীনতর যুগে।

সংঘারামগুলির মধ্যে ১১টি উন্মোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৯টি পশ্চিমাস্য, অপর ২টি দক্ষিণদিকে ইহাদের সহিত সমকোণে যুক্ত। সব সংঘারামই চতুঃশালা—মধ্যস্থলের উন্মুক্ত অঙ্গন পরিবেষ্টন করিয়া বারান্দা, বারান্দার পিছনে কক্ষাবলী। প্রত্যেকটি একাধিকবার পুনর্নির্মিত এবং জীর্ণোদ্ধৃত হয়। পুনর্নির্মাণকালে মূল পরিকল্পনা যথাসাধ্য অনুসৃত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ১ সংখ্যক সংঘারামে ৯টি বিভিন্ন বসবাসের স্তরের চিহ্ন সুস্পষ্ট। অধিকাংশ সংঘারামই দ্বিতল ছিল। সোপানে গবাক্ষের সহায়তায় আলোবাতাসের ব্যবস্থা ছিল। কূপ সাধারণত: অঙ্গনের মধ্যেই খনিত হইত। সংঘারামগুলি ইষ্টকনির্মিত ও চুনের পলস্তারায় আবৃত। বারান্দার স্তম্ভরাজি প্রস্তরের। আরাধনাকক্ষের বেদীতে ও প্রবেশিকা-কক্ষের দেওয়ালে ন্যস্ত মূর্তিগুলি পঙ্খ বা চুনবালির দ্বারা নির্মিত।

মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে ৩য় সংখ্যকটি। উপর্যুপরি ৬বার পুনর্নির্মাণের ফলে ইহা সর্বোচ্চ আকার ধারণ করে। প্রথম ৩ পর্যায়ে ইহার আয়তন ছিল পরিমিত। এই ৩ পর্যায় বর্তমানে দৃশ্য সৌধের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত। ৪র্থ পর্যায়ে ইহা আরও বৃহৎ আকার ধারণ করে। ৫ম এবং পরবর্তী ২ পর্যায়ে মন্দিরের গর্ভগৃহ (যাহার মধ্যে সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল) উচ্চ মঞ্চের বা বেদীর উপর নির্মিত হয়। ভূমি হইতে উচ্চ সোপান অবলম্বনে এই মঞ্চোপরি আরোহণ করিতে হইত। এই পর্যায়ের মন্দিরের ভগ্নাংশ পরবর্তী পর্যায়ের মঞ্চের ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার ফলে মন্দিরটির উচ্চতা ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে গর্ভগৃহের মেঝেরই উচ্চতা ভূমি হইতে ১৫ মিটারের ঊর্ধ্বে পৌঁছিয়াছে। মন্দিরটিকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল স্তূপ ও ক্ষুদ্রাকার মন্দির নির্মিত হইয়াছিল সেইগুলি মুখ্য মন্দিরের সম্প্রসারণের পর্বে পর্বে অংশতঃ কিংবা সম্পূর্ণভাবে ইষ্টক গাঁথুনির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। স্পষ্টতই এই মন্দিরটি বিশেষরূপে পূত-পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত।

মন্দিরের ৫ম পর্যায় খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে নির্মিত; এই পর্বের নিম্নভাগ উৎকৃষ্টরূপে সংরক্ষিত। ৪টি কোণে এক-একটি স্তূপসহ গর্ভগৃহটি একটি উচ্চ মঞ্চের উপর নির্মিত হইয়াছিল। মঞ্চের পূর্ব গাত্র সম্পূর্ণভাবে এবং উত্তর গাত্র (সোপানের একাংশ সহ) আংশিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। মঞ্চটির চতুষ্কোণই প্রলম্বনযুক্ত। এই প্রলম্বনগুলি তদুপরি স্তূপ সাহচর্যে অত্যুচ্চ স্তম্ভের বিভ্রম সৃষ্টি করে। এই স্তূপচতুষ্টয়, মঞ্চের গাত্রদেশ এবং সোপানের পার্শ্বদেশ চুনবালির বা পঙ্খ কাজের অলংকরণে সুশোভিত। অলংকরণের মুখ্য বিষয় হইল বিভিন্ন মুদ্রায় বুদ্ধ, পদ্মপাণি ও মৈত্রেয়ের মূর্তি। গাত্র-স্তম্ভ দ্বারা বিভক্ত আয়ত কুলুঙ্গি অথবা চৈত্য-গবাক্ষের অনুকৃতির অভ্যন্তরে মূর্তিগুলি গঠিত। মঞ্চের মধ্যস্থলে রচিত গর্ভগৃহের অবয়ব ও রূপকর্ম সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অনুমান করা হয় যে ইহা বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের অনুরূপ ছিল। এই প্রসঙ্গে নালন্দায় বালাদিত্যের নির্মিত প্রায় ১০০ মিটার উচ্চ মন্দিরটির সম্পর্কে হিউয়েন্-ৎসাঙ্-এর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য: 'আকারে, অলংকরণে এবং বুদ্ধ-বিগ্রহে এই মন্দিরটির সহিত বোধিবৃক্ষতলস্থ মন্দিরটির সাদৃশ্য আছে'। এই রীতির মন্দির যে এইস্থলে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ নালন্দার সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত দুইটি ক্ষুদ্রাকার প্রস্তরের অনুকৃতি এবং কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক।

অপর মন্দিরগুলির মধ্যে পশ্চিমপার্শ্বস্থ তিনটির (১২, ১৩ ও ১৪-সংখ্যক) কলেবর বিরাট। তিনটিই ইষ্টক-নির্মিত, মুখশালাযুক্ত এবং মঞ্চের উপরে প্রতিষ্ঠিত। মঞ্চগুলি ডৌলকর্ম (মোল্‌ডিংগ্‌স), গাত্রস্তম্ভ ইত্যাদিতে সুশোভিত। ১২-সংখ্যকটি আবার পঞ্চায়তন—মঞ্চের উপরে চারিকোণে এক-একটি অপেক্ষাকৃত ছোট মন্দির এবং মন্দিরসংলগ্ন এক-একটি সস্তম্ভ মুখশালা। ৪র্থ অপর একটি মন্দিরের (২-সংখ্যক) ধ্বংসাবশেষও উল্লেখ-যোগ্য। প্রস্তরনির্মিত এই মন্দিরটির মঞ্চ দুইশতাধিক ভাস্কর্যফলকে অলংকৃত ছিল। ইহাদের বিষয়বস্তু নানা-ধরনের—শিব, পার্বতী, কার্তিকেয়, গজলক্ষ্মী, অগ্নি,

কুবের প্রভৃতি দেবতার মূর্তি, কচ্ছপ জাতক, লিখনরত গৌতম, বিভিন্ন ভঙ্গিতে নরনারী, ঘরোয়া দৃশ্য, কিন্নর, মকর, সাপুড়ে, বিভিন্ন নকশা ইত্যাদি। ফলকগুলির বিষয়বস্তু ও বিন্যাস পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রের ফলকের অনুরূপ। এই ৪টি মন্দিরেরই উপরের অংশ নাই; তবে অনুমান করা যাইতে পারে, তদানীন্তন কালের স্থাপত্য রূপ-রীতি অনুসারে ইহাদের শিখর (বুদ্ধগয়ার মন্দিরের মত হওয়া বিচিত্র নয়) নির্মিত হইয়াছিল। ৪র্থ মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রস্তরনির্মিত ভূমি-আমলক এবং চৈত্য-গবাক্ষের অনুকৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সকল মন্দিরই বিভিন্ন আকারের স্তূপসমূহের দ্বারা পরিবৃত। স্তূপগুলির মধ্যে বৌদ্ধ গাথা অথবা ধারণী লিপিবদ্ধ ফলক কিংবা প্রতীত্যসমুৎপাদসূত্র-উৎকীর্ণ ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে।

খননকার্যের ফলে যে সকল প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশ বর্তমানে স্থানীয় সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। বৃহদাকার প্রস্তরের মূর্তি ধ্বংসাবশেষের তুলনায় কম; এখানে মূর্তিনির্মাণে চুনবালি অর্থাৎ পঙ্খের প্রচলনই সম্ভবতঃ ইহার কারণ। ব্রঞ্জ-নির্মিত মূর্তির সংখ্যা প্রচুর। অধিকাংশ ব্রঞ্জের মূর্তি ১ সংখ্যক সংঘারামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্পষ্টত, নালন্দা ধাতুঢালাই-এর অন্যতম মুখ্য কেন্দ্র ছিল।

মূর্তিগুলির অধিকাংশ বুদ্ধ ও মহাযান-বজ্রযান গোষ্ঠীর দেবদেবীর। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে অবলোকিতেশ্বরের বিভিন্ন রূপ, বজ্রপাণি, মঞ্জুশ্রী, জম্ভল, ত্রৈলোক্যবিজয়, যমান্তক, তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, মারীচী, হারিতী, অপরাজিতা ও মহা-মায়ূরী। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূর্তিও (যেমন বিষ্ণু, বলরাম, সূর্য, রেবন্ত ও গণেশ) কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে।

দ্র J. Legge, *A Record of Buddhistic Kingdoms being an account of the Chinese Monk Fa-Hien of his travels in India and Ceylon,* Oxford, 1886; S. Beal, *The Life of Hiuen-Tsiang,* London, 1888; J. Takakusu, *A Record of the Buddhist Religion (by I-tsing),* Oxford, 1896; Hirananda Sastri, 'Nalanda in ancient literature', *Proceedings and Transactions of* the *Fifth Indian Oriental Conference*: I, Lahore, 1930; A. T. Bernet Kempers, *The Bronzes of Nalanda and Hindu-Javanese Art,* Leiden, 1933; A. Ghosh, *Nalanda,* New Delhi, 1965;

দেবলা মিত্র

নাসিক মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত একটি জেলা, তালুক ও শহর। জেলাটি ১৯°৩৫′ হইতে ২০°৫৩′ উত্তর ও ৭৩°১৫′ হইতে ৭৪°৫৬′ পূর্বে অবস্থিত। ইহার উত্তর-পশ্চিমে দাংগ ও সুরাট জেলা, উত্তর-পূর্বে জলগাঁও, পূর্বে ঔরঙ্গাবাদ, দক্ষিণে আমেদনগর এবং পশ্চিমদিকে থানা জেলা।

পশ্চিমদিকের কতিপয় গ্রাম ব্যতীত সমগ্র জেলা একটি মালভূমির উপর অবস্থিত এবং সমুদ্র-সমতল হইতে উচ্চতা প্রায় ৪০-৬০ মিটার। পশ্চিমাংশকে দাংগ বলা হয়। এই অঞ্চল পর্বত দ্বারা বিভক্ত। দক্ষিণাংশকে দেশ বলা হয়। পশ্চিমঘাট পর্বত ব্যতীত অন্যান্য পর্বতগুলি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত এবং উচ্চাংশ পশ্চিমদিকেই অবস্থিত। সাতমালা বা চান্দোর পর্বতশ্রেণী এই জেলার জল-বিভাজিকা, ইহা গিরনা উপত্যকাকে গোদাবরী উপত্যকা হইতে পৃথক করিয়াছে। এই জলবিভাজিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ধোদাপ ১৪৩৪৭ মিটার।

চান্দোর পর্বতমালার দক্ষিণে জেলার প্রধান নদী গোদাবরী। অন্য নদীগুলি সমস্তই গোদাবরীর উপনদী। দরনা, কাডওয়া, দেও এবং মরালগিন ইহাদের মধ্যে প্রধান। উত্তরদিকে গিরনা ও তাহার উপনদী মোসাম প্রবাহিত হইয়া তাপ্তী নদীতে মিলিত হইয়াছে।

নাসিক জেলা সম্পূর্ণরূপে লাভার দ্বারা গঠিত পার্বত্য অঞ্চল। ক্ষয়ীভবনের ফলে ইহার উচ্চতা হ্রাস পাইয়াছে। জেলার নিম্নাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানের ব্যাসাল্ট ক্ষয়ীভূত হইয়া উর্বর কৃষ্ণ মৃত্তিকার সৃষ্টি করিয়াছে। লোহিত ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার দ্বারা সহ্যাদ্রি পর্বতমালার কোনও কোনও অংশ আবৃত, কিন্তু দক্ষিণে এই আবৃত অংশ প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

পশ্চিমঘাট পর্বত অরণ্যাবৃত, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের দিকে এই দেশ উদ্ভিদবিরল। আম, বাবুল ও সেগুন এই অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ।

জেলার পশ্চিমাংশের জলবায়ু দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মনোরম। সাধারণতঃ এই স্থানের পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা পূর্বদিকে গ্রীষ্ম ও শীতের প্রকোপ অধিক। জানুয়ারি মাসে প্রচণ্ড শীত এবং এপ্রিল মাসে প্রচণ্ড উত্তাপ লক্ষিত হয়; বৎসরের অন্য সময়ে উত্তাপ মোটামুটি সমান থাকে। বৃষ্টিপাত সর্বত্র সমান নহে। বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড়ে প্রায় ৭২৫ মিলিমিটার (২৯ ইঞ্চি)।

নাসিক জেলা হিন্দু রাজত্বের কালে বিভিন্ন সময়ে চালুক্য, রাঠোর, চান্দোর প্রভৃতি বংশের নৃপতিগণের এবং মুসলমান আমলে দৌলতাবাদের, গুলবার্গের বাহমনী

রাজ্যের, আহমদনগরের নিজামশাহী রাজ্যের শাসনকর্তাদের দ্বারা শাসিত হইত। মারাঠাগণের অভ্যুদয়ের সময়ে ইহা তাহাদের অধিকারে আসে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ শেষ পেশোয়াকে পরাস্ত করিয়া ইহাকে নিজেদের অধিকারে আনে। বহুদিন এই অঞ্চল আহমদনগর ও খান্দেশ জেলার অংশ ছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১১টি মহকুমা ও পিণ্ট রাজ্য লইয়া নাসিক জেলাটি গঠিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় রাজ্য সারগানা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ও মহকুমা (মহল) হিসাবে নাসিক জেলায় স্থান পায়। বর্তমানে নাসিক জেলায় ১১টি তালুক ও ২টি মহল রহিয়াছে।

এই জেলার আয়তন বর্তমানে প্রায় ১৫৫৯২ বর্গ-কিলোমিটার (৬০২০ বর্গমাইল)। শহরের সংখ্যা ১৫ ও লোকবসতিযুক্ত গ্রামের সংখ্যা ১৬৩২। লোকসংখ্যা ১৮৫৫২৪৬ (১৯৬১ খ্রী)। এই স্থানের ভাষা মারাঠী।

মারাঠা-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ এই অঞ্চলে বসবাস করিতে আগমন করেন। এই ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ 'দেশস্থ' এবং তাঁহারা নাসিক ও ত্রিম্বাক শহরের পুরোহিতশ্রেণী। মারাঠা ও মারাঠা-কুনবিস-শ্রেণী পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী। ইহারা কৃষিকর্মে পারদর্শী। ভীল, ভাঞ্জারী, মালি, ঠাকুর, ভারলি প্রভৃতি জাতি এখানে বাস করে। ভীল জাতি সাধারণতঃ দাংগ -এ যাযাবর জীবন যাপন করে অথবা 'দেশ'-এর উর্বর স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

বাজরা এই অঞ্চলের প্রধান খাদ্যশস্য। দেশের অভ্যন্তরে ও তালুকগুলিতে গমের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। অন্যান্য শস্যের মধ্যে ধান, জোয়ার, ডাল ও বিভিন্ন রকমের তৈলবীজ জন্মায়। কার্পাস চাষের জমির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, এই বিষয়ে মালিগাঁও-এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তামাক এই জেলার প্রায় সর্বত্রই চাষ করা হইয়া থাকে। আঙুর, পেয়ারা, আলু, বাদাম ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

এখানে খনিজ সম্পদ খুব কম। নাসিক জেলার শিল্পসমূহের মধ্যে কার্পাস বয়নশিল্প অন্যতম। ইয়োলায় কার্পাস ও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হয়। রেশমশিল্পে বহুসংখ্যক পরিবার নিযুক্ত আছে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের সুতা প্রস্তুত করিবার জন্য মালিগাঁও-এ বহু তাঁত আছে। নাসিক শহরে তামা, পিতল ও রৌপ্যের তৈজসপত্র প্রচুর পরিমাণে নির্মিত হইয়া থাকে। এখানকার ধাতুর কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাসিক, মালিগাঁও, ইয়লো, ইগতপুরী, মনমাদ, নন্দগাও, চান্দোর ও ত্রিম্বক এই জেলার প্রধান শহর। এই জেলার গুহামন্দিরগুলি দর্শনীয়। নাসিকের বৌদ্ধ গুহা ও চাম্বরের জৈন গুহা এবং ইগতপুরীর নিকট ট্রিংগালবাদির অংকাই গুহা এই জেলার প্রধান গুহা-মন্দির। ১৮শ শতাব্দীর বহুসংখ্যক মন্দির নাসিকে বর্তমান। এই স্থানের পর্বতদুর্গও উল্লেখযোগ্য। দুর্গগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। কিছুসংখ্যক দুর্গ দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত চান্দোর পর্বতে এবং অবশিষ্টগুলি পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত। মালভূমি ও বিচ্ছিন্ন পর্বতের উপর এই দুর্গগুলি নির্মিত হইয়াছিল।

জেলার প্রধান শহর নাসিক (১৯°৫৯´ উত্তর, ৭৩°৫০´ পূর্ব) গোদাবরীতীরে অবস্থিত, মিউনিসিপ্যালিটি-শাসিত এবং রাজপথে দিল্লী, বোম্বাই ও পুনা নগরীর সহিত যুক্ত। ইহার অদূরে নাসিক রোডের উপর দিয়া মধ্য রেলপথ দিল্লী ও বোম্বাই -এর সহিত এই অঞ্চলের যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে। এই শহরের লোকসংখ্যা ১৩১১০৩ (১৯৬১ খ্রী)। শহরের শিল্পসমূহের মধ্যে তাম্র ও পিতল -শিল্প, পুস্তকপ্রকাশনশিল্প, রৌপ্যালংকার-শিল্প ও বিড়িশিল্প উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া প্রচুর ধানকলও এখানে বিদ্যমান।

নাসিক হিন্দুদের নিকট পবিত্রস্থান বলিয়া পরিগণিত। কথিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার পত্নীসহ এইস্থানে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এইস্থানে ১২ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা হয়।

নাসিকে দশেরা ময়দান, তপোবন, গোবর্ধন, জৈন গুহা ও বৌদ্ধ গুহা দর্শনীয় বস্তু। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও আরামদায়ক। এখানে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, কারেন্সি নোট প্রেস ও পুলিশ ট্রেনিং কলেজ রহিয়াছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XVIII, Oxford, 1908 ; *Census of India : 1961 : District Census Handbook : Nasik*, *Bombay*, 1961.

অনিন্দ্যকুমার পাল
মুকুলকুমার বসু

মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার সদর শহর নাসিক গোদাবরী নদীর উভয় তটে অবস্থিত। নাসিক রোড রেলস্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল)। নাসিক শহরের তিনটি প্রধান বিভাগ। প্রাচীনতমটির নাম পঞ্চবটী—গোদাবরীর পূর্ব তটে ; কাহারও মতে এই পঞ্চবটীই রামায়ণে বর্ণিত পঞ্চবটী। মধ্যযুগের বিভাগটি মুসলিম নাসিক ; পূর্বে ইহার নাম

ছিল গুলশনাবাদ, বর্তমানে অংশটিকে জুনী গঢ়ী বলে। শহরের এই অঞ্চলটি পঞ্চবটীর দক্ষিণে গোদাবরীর দক্ষিণ তটে। মারাঠা বা আধুনিক বিভাগটি জুনী গঢ়ীর উত্তর-পশ্চিমভাগে। নাসিক পশ্চিম ভারতের অন্যতম তীর্থস্থান। এখানে গোদাবরীতে স্নান করিয়া পুণ্য অর্জনের জন্য বহুলোক সমাগম হয়। নাসিক হইতে ৯ কিলোমিটার পশ্চিমে গোবর্ধন পর্যন্ত অনেকগুলি পুণ্যস্নানের স্থান (স্থানীয় ভাষায় তীর্থ) ও কুণ্ড আছে। শহরের বিভিন্ন অংশে ৬০-এর অধিক মন্দির। বড় মন্দিরের অধিকাংশই পেশোয়াদের (১৭৬০-১৮১৮ খ্রী) সময়কার।

নাসিকের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। পতঞ্জলি নাসিক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতা, বায়ু পুরাণ, বরাহ-পুরাণ, অথর্বপরিশিষ্ট, নন্দিসূত্র ইত্যাদি বহু গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে ইহা ছিল বাণিজ্য-পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকের প্রারম্ভ হইতে প্রায় খ্রীষ্টীয় ৩য় শতকের শেষ পর্যন্ত এইস্থল ক্রমান্বয়ে শাতবাহন, শক ক্ষহরাত ক্ষত্রপ এবং আভীরদের শাসনাধীন থাকে। ক্ষত্রপ নহপান এবং শাতবাহন নৃপতিদের মুদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক হইতে ৮ম শতক পর্যন্ত এই স্থানের ইতিহাস খানিকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। রাষ্ট্রকূটদের রাজত্বে নাসিক আবার প্রাধান্য লাভ করে। এইস্থল তখন একটি বিষয়ের (বা দেশ) প্রধান শহরে পরিণত হয়। যাদবদের সময়ে আবার ইহার অবনতি হয়। নাসিক এবং ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরে বিভিন্ন মুসলমান রাজবংশের—দিল্লীর শাসকবর্গ (১৩১২-৪৭ খ্রী), বাহমনী বংশ (১৩৪৭-১৪৮৭ খ্রী), আহমদনগরের নিজাম-শাহী (১৪৮৭-১৬৩৭ খ্রী) এবং মোগল (১৬৩৭-১৭৬০ খ্রী) —শাসনাধীন থাকে। আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা এইস্থল অধিকার করিয়া শহরটির অনেক শ্রীবৃদ্ধি করেন। শহরের নূতন অংশ মারাঠা নাসিক।

জুনী গঢ়ীর অত্যুচ্চ ঢিপিতে সীমিত খননকার্যের ফলে সর্বনিম্নস্তরের তাম্রাশ্মীয় যুগের বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

নাসিকের প্রাচীন ঐতিহ্যের অনবদ্য নিদর্শন ইহার ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) দূরস্থ ২৪টি গুহাবলীতে। অতীতে ত্রি-রশ্মি নামে অভিহিত পাহাড়ের উত্তর গাত্রে লম্বা সারিতে এইগুলি খাত। স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট ইহারা পাণ্ডুলেন বা পাণ্ডবদের গুহা নামে পরিচিত। কেবল ইহাদের গাত্রস্থ শাতবাহন এবং শকবংশীয় ক্ষহরাত, এই দুই রাজবংশের ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ লেখগুলির জন্যই নহে, খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের শৈলখাত স্থাপত্যের একটি উজ্জ্বল ধারার নিদর্শনরূপেও এই গুহাসমষ্টির মূল্য। অধিকাংশ গুহার সৃষ্টি হয় খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে।

চৈত্যগৃহটি (১৮ সংখ্যক গুহা) সম্পূর্ণ হয় খ্রীষ্টীয় ১ম শতকে। প্রবেশদ্বারের বাজু ও উপরিভাগ চৈত্যগৃহের সম্মুখের অনুকৃতিতে অলংকৃত। বাজু দুইটিতে ফুল, জালি ইত্যাদির উদ্গত চিত্র। দ্বারের উপরে এবং অশ্বখুরাকৃতি চৈত্যগবাক্ষের নিম্নে অর্ধবৃত্তাকার স্থানের অলংকরণ সুদৃশ্য। দ্বারোপান্তে পুষ্পহস্তে দ্বারপাল। চৈত্যগবাক্ষের চতুষ্পার্শ্ব চৈত্যগৃহের সস্তম্ভ অন্তরের প্রতিকৃতিতে শোভিত। চৈত্যগৃহের অন্তর নিরলংকৃত। ক্রমক্ষীয়মাণ অষ্টকোণ ১৫টি স্তম্ভের মধ্যে ১০টির পাদপীঠ ঘটের আকারে। অর্ধ-বৃত্তাকার সিলিং-এর নিম্নাংশে কাঠের কড়ি-বরগা ব্যবহৃত হইয়াছিল। শৈলখাত আরাধ্য স্তূপটির উচ্চ মেধির শীর্ষে রেলিং। উল্টানো পিরামিডের ধরনে সম্প্রসারিত ইহার ধাপযুক্ত হর্মিকা যুগ্ম রেলিং-এ বেষ্টিত স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান।

চৈত্যগৃহটি এবং ইহার উভয় পার্শ্বস্থ বিহারদ্বয় (১৭ এবং ২০ সংখ্যক বিহার) একই পরিকল্পনাজাত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ২০ সংখ্যক বিহারটির খননের সূত্রপাতের বহুকাল পরে শাতবাহনবংশীয় যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণির (আনু-মানিক ১৭৪-২০২ খ্রী) রাজত্বের ৭ম বৎসরে এক মহা-সেনাপতির পত্নীর সৌজন্যে ইহার খনন সম্পূর্ণ হয়। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতকে এই বিহারের অভ্যন্তরভাগ যখন সম্প্রসারিত হয় তখন প্রকোষ্ঠগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল, অধিকন্তু একটি উপাসনাগার এবং তৎসম্মুখে একটি সস্তম্ভ অন্তরালের সৃষ্টি করা হয়। উপাসনাগারে পদ্মপাণি ও বজ্রপাণি সমভিব্যাহারে ভদ্রাসনে আসীন ধর্মচক্রপ্রবর্তনমুদ্রায় বুদ্ধদেবের বিরাট মূর্তি। অন্তরালের স্তম্ভ ও গাত্রস্তম্ভ তদানীন্তন যুগের রীতি-শৈলী অনুসারী (যে রীতি ও শৈলীর চরম অভিব্যক্তি অজণ্টায়)। ইহাদের নিম্নাংশ চতুষ্কোণ এবং উপরাংশ গোলাকার ও কারুকার্যখচিত বন্ধনীর দ্বারা অলংকৃত। শীর্ষদেশে পূর্ণঘট, ঘটের উপর চতুষ্কোণ ফলক এবং ফলকের উপর ব্র্যাকেটের আকারে শীর্ষফলক। প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে বোধিসত্ত্বের মূর্তি, দক্ষিণদিকের মূর্তিটির (পদ্মপাণি) পার্শ্বে একটি নারীর মূর্তি।

১৭ সংখ্যক গুহা ইন্দো-গ্রীকরাজ ডিমিট্রিয়াসের নামানুসারে অভিহিত দত্তামিত্রি শহরের জনৈক হিন্দু-ভাবাপন্ন যবনের দান। ইহার স্তম্ভ, গাত্রস্তম্ভ এবং

সম্মুখের অলংকরণের সহিত ১০ সংখ্যক গুহার সাদৃশ্য আছে।

১৯ সংখ্যক গুহাটি এই স্থলের প্রাচীনতম বিহারগুলির অন্যতম। নাসিকের এক শ্রমণ কর্তৃক শাতবাহন নৃপতি কৃষ্ণের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতক) ইহা নির্মিত হইয়াছিল। নিরলংকৃত এই গুহাটি এবং ইহার স্তম্ভাবলীর পরিকল্পনা গুহাস্থাপত্যের প্রাথমিক পর্যায়ের রীতি-অনুগ এবং এখানকার প্রচলিত রীতি হইতে পৃথক। ইহার বারান্দায় ২টি করিয়া স্তম্ভ এবং গাত্রস্তম্ভ এবং বামপার্শ্বে একটি বেঞ্চ। বারান্দার পিছনেই স্তম্ভহীন সমাবেশশালা এবং এই সমাবেশশালার ৩ দিকে ২টি করিয়া মোট ৬টি শয়নকক্ষ। কক্ষগুলির ৫টিতে শৈলখাত খাট বিদ্যমান। উচ্চ পাদপীঠের উপর স্তম্ভগুলির অধঃভাগ ও ঊর্ধ্বভাগ চতুষ্কোণ এবং মধ্যভাগ অষ্টকোণী। সন্ধিস্থলে চতুষ্কোণের ধার কাটিয়া গোলায়মান করা হইয়াছে এবং চতুর্দিকেই এক-একটি অর্ধপদ্মের অনুকৃতি করা হইয়াছে। দ্বারের পার্শ্ববর্তী জালির জানালার মাধ্যমে সমাবেশশালায় আলোকরশ্মির প্রবেশের ব্যবস্থা। শয়নকক্ষাবলীর দ্বারোপরি চৈত্যগবাক্ষ-খিলানের অনুকৃতি; ইহারা রেলিং (স্থানে স্থানে তরঙ্গায়িত) দ্বারা সংযুক্ত।

বিহারগুলির মধ্যে ৩ ও ১০ সংখ্যক গুহাদ্বয় আয়তনে, আকারে, রূপকল্পে এবং জাঁকজমকে অপরাপর বিহারগুলিকে ম্লান করিয়াছে। স্থাপত্য-উৎকর্ষ ও ভাস্কর্য অলংকরণের সুষম সমন্বয়ে এই বিহার দুইটি অনবদ্য। প্রাচীনতর ১০ সংখ্যক গুহাটি উভয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম অলংকৃত হইলেও সুষ্ঠুতর। হিন্দুধর্মে দীক্ষিত শক উষভদাত এবং তৎপত্নী দক্ষমিত্রার বদান্যতায় এই গুহাটির সৃষ্টি। এই বিহারে আছে একটি সস্তম্ভ বারান্দা ও একটি সুপ্রশস্ত স্তম্ভহীন সমাবেশশালার ৩ দিকে বিন্যস্ত ১৬টি শয়নপ্রকোষ্ঠ; প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেই শৈলখাত শয়নের খাট। বারান্দায় আরোহণ করিবার জন্য এক প্রস্থ সোপান; সোপানের দুই পার্শ্বে একটি করিয়া প্রকোষ্ঠ। ৩টি দ্বার ও ২টি প্রশস্ত গবাক্ষপথে সমাবেশশালায় আলোবাতাসের ব্যবস্থা। সমাবেশশালার পশ্চাৎ-দেওয়ালে কেন্দ্রীয় কক্ষদ্বয়ের দরজা দুইটির অন্তর্বর্তীস্থলে পার্শ্বে নারীমূর্তিসহ একটি স্তূপের উদ্গত চিত্র।

সুচারুরূপে পরিকল্পিত এবং কারুকার্যখচিত বারান্দার সম্মুখভাগের জন্যই এই গুহাটি আকর্ষণীয়। সধাপ পৃষ্ঠের উপর রচিত কুম্ভ হইতে উদ্ভূত স্তম্ভচতুষ্টয় এবং গাত্রস্তম্ভ দুইটি অষ্টকোণী। অষ্টকোণী অংশের শিরোভাগ ঘণ্টাকার, ইহার উপরে আয়ত কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ সংকুচিত আমলক। আমলকের উপরে লহরাকার ফলকের শীর্ষে আরোহীসহ ২ জোড়া পশুর (সিংহ, ষাঁড়, মেষ ও সংকর পশু) অনবদ্য প্রতিকৃতি; একজোড়া পশুর মুখ প্রাঙ্গণের দিকে, অপর জোড়ার বারান্দার দিকে। ২ জোড়ার মধ্যবর্তীস্থল দিয়া মুখ্য কড়িকাঠ (architrave) গিয়াছে এবং এই কড়িকাঠের উপর হইতে গুহার প্রলম্বিত চাল সম্মুখভাগে প্রসারিত হইয়াছে ঝুলবারান্দার ধরনে। প্রসারিত অংশটির নিম্নে বরগার এবং গাত্রদেশে রেলিং-এর অনুকৃতি।

১০ সংখ্যক গুহার অধিকতর অলংকৃত সংস্করণ ৩ সংখ্যক গুহা ক্ষহরাতবংশ নির্মূলকারী শাতবাহন নৃপতি গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির (আনুমানিক ১০৬-৩০ খ্রী) জননী গৌতমী বলশ্রীর দান। তাঁহার পুত্র পুলুমাবীর রাজত্বকালে (আনুমানিক ১৩০-৫৯ খ্রী) ইহা সম্পূর্ণ হয়। বিহারটির সম্মুখভাগে সুপ্রশস্ত অঙ্গন। অঙ্গনের বামভাগে শৈলখাত কূপ। এই বিহারে রহিয়াছে দুইপার্শ্বে প্রকোষ্ঠ-সহ একটি বারান্দা, বারান্দার পিছনে স্তম্ভহীন প্রশস্ত সমাবেশশালা এবং ১৮টি শয়নকক্ষ। কক্ষগুলির সম্মুখ-দেওয়ালের বহির্গাত্রে বেঞ্চ এবং মধ্যে শৈলখাত খাট। সমাবেশশালার পশ্চাৎ-দেওয়ালের কেন্দ্রস্থলে স্তূপের উদ্গত প্রতিকৃতি। বারান্দায় উঠিবার জন্য ৬ ধাপের সোপান। বারান্দার নিম্নাংশ ঝুলবারান্দার অনুকরণে সুন্দরভাবে অলংকৃত। যক্ষগণের দ্বারা ধৃত বরগাগুলির উপর সংযোগী-কড়ি এবং ইহার উপরকার প্যারাপেটে রেলিং-এর অনুকৃতি; রেলিং-এর পাদভাগে জীবজন্তুর সারি, সূচিতে পদ্ম এবং উষ্ণীষে অর্ধপদ্মের সারি। বেঞ্চের উপর রচিত বারান্দা-স্তম্ভগুলি ১০ সংখ্যক গুহার অনুরূপ, তবে ঘণ্টাকার প্রত্যঙ্গটি দেখিতে প্রায় উল্টানো ঘটের মত এবং লহরাকার ফলকগুলির কোনও কোনওটির অবলম্বনস্বরূপ গণ অথবা আরোহী। গাত্র-স্তম্ভদ্বয়ের অধোভাগে এবং ঊর্ধ্বভাগে অর্ধপদ্ম। মধ্যভাগে প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং অন্তর্বর্তীস্থলে তিনটি ধার। বারান্দার উপরিভাগে রেলিং এবং প্রতিকৃতি। কেন্দ্রীয় দ্বারবন্ধে তোরণের অনুকৃতি। তোরণ-স্তম্ভ-দ্বয়ের ভাগে ভাগে যক্ষ, মিথুন এবং নায়িকা। তোরণের শীর্ষদেশে ২টি পাট (ক্ষুদ্রাকার স্তম্ভ ও ফলকের অনু-কৃতিতে পরস্পরসংযুক্ত)। নীচের পাটের আবর্তিত প্রান্তভাগ লম্ফমান সিংহের উপর ন্যস্ত; এই পাটের বাকি অংশে তরঙ্গায়িত মাল্য, অর্ধপদ্ম ও নীল পদ্ম। দ্বারোপান্তে দ্বারপালের মূর্তি।

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের উদ্গত চিত্রের সর্বাপেক্ষা অধিক

সমাবেশ ২৩ সংখ্যক গুহায়। উদ্গত ভাস্কর্যকৃতির মধ্যে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের একটি মূর্তি এবং অনেকগুলি দেবী-মূর্তি বিদ্যমান। একাধিক গুহা এই অসমঞ্জস গুহাটির অন্তর্ভুক্ত; বিভাজনী প্রাচীরগুলির ধ্বংসপ্রাপ্তির ফলে সবগুলি এখন একাকার।

দ্র J. Fergusson and J. Burgess, *Cave Temples of India*, London, 1880; H. D. Sankalia & S. B. Deo, *Report on the Excavations at Nasik and Jorwe 1950-51*, Poona, 1955.

দেবলা মিত্র

নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। নাসিকার ঊর্ধ্বভাগের ঝিল্লীর মধ্যে ঘ্রাণের গ্রাহকযন্ত্র (রিসেপ্‌টার) বর্তমান। গন্ধ-দ্রব্য হইতে বহু অণু অবিরত বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় এবং নাসিকায় প্রবেশ করিয়া ঘ্রাণের গ্রাহকযন্ত্রগুলির সংস্পর্শে আসিয়া উপযুক্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা তাহাদের উদ্দীপিত করে। ফলে নাসিকা হইতে উদ্ভূত আবেগ (ইম্‌পাল্‌স) প্রথম করোটিক (ক্রেনিয়াল) নার্ভ বাহিয়া গুরুমস্তিষ্কের (সেরিব্রাম) ঘ্রাণকেন্দ্রে পৌঁছাইয়া ঘ্রাণের অনুভূতি জাগায়। বিভিন্ন গন্ধের তারতম্যও ঘ্রাণকেন্দ্রের সাহায্যেই উপলব্ধি করা যায়। ঘ্রাণের অনুভূতি বহুদিন স্মরণে থাকে এবং পূর্বপরিচিত গন্ধ পূর্বস্মৃতির উদ্রেক করে। ক্রমাগত ক্রিয়ায় ঘ্রাণ অনুভব করার শক্তি সাময়িকভাবে হ্রাস পায়, সেইজন্যই ক্রমশঃ গন্ধের অনুভূতি কমিয়া আসিয়া তীব্র দুর্গন্ধও সহ্য হইয়া যায়। ঘ্রাণ ও স্বাদের অনুভূতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

জোয়ার্ডেমেকর গন্ধকে মনোরম, মসলাগন্ধ, সুদেহগন্ধ, ঝাঁঝালো প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। উদ্বায়ী বস্তুর গন্ধ অপেক্ষাকৃত অধিক অনুভূত হয়, সেজন্যই তারপিন তৈল, গ্যাসোলিন ও গন্ধ তৈলের গন্ধ অপেক্ষাকৃত বেশি অনুভব করা যায়। ঘ্রাণ-পরিমাপক যন্ত্র বা অল্‌ফ্যাক্টোমিটার-এর সাহায্যে ঘ্রাণ অনুভূতির আপেক্ষিক তীব্রতা নির্ণয় করা যায়।

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

নাসিরুদ্দীন মামুদ (? -১২৬৬ খ্রী) ইল্‌তুৎমিসের পুত্র ও দিল্লীর তথাকথিত দাস-বংশের একজন সুলতান। তিনি ১২৪৬ হইতে ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি দয়াবান, ধর্মানুরাগী, ন্যায়পরায়ণ, দুর্বলচিত্ত ও শান্তিপ্রিয় এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার শ্বশুর ও মন্ত্রী গিয়াসুদ্দীন বলবনই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শাসনকালে অধিকাংশ সময়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিরাগত মঙ্গোলদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বলবনই প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ নাসিরুদ্দীনের অধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার প্রণীত বিখ্যাত ইতিহাস 'তবকৎ-ই-নাসিরী' এই সুলতানের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

ন্যাটো অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের উত্তর তীরবর্তী কতিপয় রাষ্ট্রের সহযোগিতায় স্থাপিত প্রতিরক্ষা-সংস্থা। ইংরেজীতে সম্পূর্ণ নাম নর্থ অ্যাটল্যান্টিক ট্রিটি অর্গ্যানাই-জেশন (সংক্ষেপে ন্যাটো, NATO)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী রাষ্ট্রসকল সহযোগিতার মাধ্যমে একই উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী ছিল। এই সময়ে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রসংঘ সংগঠিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পূর্ব ইওরোপে অনেকগুলি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র স্থাপিত হয় এবং তথাকথিত শীতল যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই অবস্থায় পাশ্চাত্য দেশসমূহ কমিউনিজ্‌মের সম্প্রসারণ রোধ করার জন্য একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এইরূপ আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংস্থা রাষ্ট্রসংঘ সনদের ৫১তম অনুচ্ছেদে অনুমোদিত।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিল ক্যানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অকমিউনিস্ট পশ্চিম ইওরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ ও অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের উত্তরাংশে অবস্থিত কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্মিলিত প্রতিরক্ষা সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ঐ বৎসর জুন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট ইহা অনুমোদন করে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল বেলজিয়াম, ক্যানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইস্‌ল্যাণ্ড, ইটালী, লুক্সেমবুর্ক, নেদারল্যাণ্ড্‌স, নরওয়ে, পর্তুগাল, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এই সংস্থা সর্বসম্মতিক্রমে অন্য ইওরোপীয় রাষ্ট্রকে সহযোগী করিতে পারে। এই নীতি অনুযায়ী ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে (কার্যকর ১৯৫২ খ্রী) গ্রীস ও তুরস্ক এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে (কার্যকর ১৯৫৫ খ্রী) পশ্চিম জার্মানী সভ্য হিসাবে গৃহীত হয়।

এই চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রই এক বা একাধিক সভ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণকে নিজ রাষ্ট্রের প্রতি

আক্রমণ বলিয়াই গণ্য করিবে এবং সর্বতোভাবে, প্রয়োজন-বোধে অস্ত্রপ্রয়োগের দ্বারাও অ্যাটল্যান্টিক এলাকায় (কর্কটক্রান্তির উত্তরে) শান্তিরক্ষায় তৎপর থাকিবে। এইপ্রকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদকে জানানো হইবে এবং স্বস্তি পরিষদ যথোপযুক্ত কার্যসূচী লইলে ইহারা শান্ত হইতে পারিবে।

ন্যাটো একটি কাউন্সিল অথবা সংসদ দ্বারা পরিচালিত এবং উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সভ্যগণের নিজ নিজ সেনা-বাহিনীর কিয়দংশ নির্বাচিত সর্বাধিনায়কের অধীনে উত্তর অ্যাটল্যান্টিক এলাকা ও পশ্চিম ইওরোপে সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

এই চুক্তি প্রাথমিক পর্যায়ে ২০ বৎসরের জন্য গ্রহণ করা হয়। অতএব ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নবীকৃত করা প্রয়োজন।

সাধনা দাস

ন্যাফ্‌থলিন শুভ্র উগ্রগন্ধ সহজদাহ্য ও কেলাসিত হাইড্রোকার্বন। রসায়নের দিক দিয়া ইহা গন্ধাদিবর্গের (অ্যারোম্যাটিক কম্‌পাউন্‌ড্‌স) অন্তর্গত। ইহা জলে অদ্রাব্য এবং সাধারণ তাপমাত্রায়ও কর্পূরের মত উবিয়া যায়। ইহার বাষ্প পতঙ্গাদির পক্ষে মারাত্মক। আলকাতরার পাতনের দ্বারা ন্যাফ্‌থলিন পৃথক করা হয়। বিভিন্ন রঞ্জক দ্রব্যের উৎপাদনে ন্যাফ্‌থলিনের বহুল ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। কীটঘ্ন গুণের জন্য পশমী পরিচ্ছদাদির সংরক্ষণে ইহার গোলক ব্যবহার করা হয়। দুর্গন্ধনাশক হিসাবে এরূপ গোলক শৌচাগারেও রক্ষিত হইয়া থাকে। সহজ-দাহ্য বলিয়া অগ্নিবর্ষী বোমায় ন্যাফ্‌থলিন ব্যবহৃত হয়। ন্যাফ্‌থলিনের জারণ (অক্সিডেশন)-এর ফলে উৎপন্ন টেরেফ্‌থ্যালিক অ্যাসিড হইতে টেরিলিন প্রস্তুত করা হয়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন বাংলা দেশে ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্ম ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মার্চ। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইবার পূর্বেই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য দেশের মনীষীগণ সচেষ্ট হইয়া ওঠেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতায় বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের দোতলায় যে 'ডন সোসাইটি' স্থাপন করেন, তাহাকে বাংলা দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রসারের এক বিশিষ্ট ধাপ বলিয়া চিহ্নিত করা চলে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্র-দলন ও ছাত্র-বহিষ্কারের সমস্যা উগ্র হইয়া ওঠে। ছাত্রদের সমস্যার সমাধানে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মার্চ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইল ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন (এন. সি. ই.) এবং ইহার নিয়ন্ত্রণাধীনে 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ'। বরোদা-প্রত্যাগত অরবিন্দ ঘোষ ইহার প্রথম অধ্যক্ষ হইলেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার প্রধান কর্মসচিব হইলেন। তাঁহার পরিচালনাধীনে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয়। এমন কি বাংলার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলি কলিকাতার মূল শিক্ষাসংস্থা ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিল।

এন. সি. ই.-তে পুঁথিগত সাহিত্যিক বিদ্যার পাশে সমান মর্যাদার সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষাদর্শ গৃহীত হইল। এই ত্রিমুখী শিক্ষানীতির আদর্শ গ্রহণ করিয়া ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন শিক্ষা-ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ স্থাপন করিল। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ মনীষী ছিলেন ইহার মূল কর্মকর্তা। জাতীয় কর্তৃত্বে এবং জাতীয় স্বার্থে শিক্ষা পরিচালনা হইল ইহার প্রাণ। কিন্তু এই বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ বাংলার যে সকল নরমপন্থী মনীষী সমর্থন করিতে পারিলেন না তাঁহারা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন 'সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অফ টেক্‌নিক্যাল এডু-কেশন' (এস. পি. টি. ই.) স্থাপন করিলেন। ইহার পরিচালনাধীনে প্রতিষ্ঠিত হইল 'দি বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনস্টিটিউট' (২৫ জুলাই ১৯০৬ খ্রী)। তারকনাথ পালিত ছিলেন টেক্‌নিক্যাল প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার এই দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের পর সরকারি নিষ্পেষণের ফলে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে ক্রমশঃ ভাঁটা পড়ে এবং সেইসঙ্গে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেও মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়; আর্থিক অনটনও প্রবল হইয়া দেখা দেয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ মে আনুষ্ঠানিক-ভাবে এন. সি. ই. এবং এস. পি. টি. ই.-র মিলনসাধন ঘটে। এস. পি. টি. ই. স্বতন্ত্র নামের অবলুপ্তি ঘটিল, ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন বা এন. সি. ই. হইল উভয় সংস্থার পরিচালকসমিতি। এন. সি. ই.-র অন্তর্ভুক্ত

দুইটি প্রতিষ্ঠানের নাম থাকিল যথাক্রমে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ ও বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের অঙ্গীভূত রহিল এন. সি. ই.-র কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ, আর বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের অঙ্গীভূত রহিল টেক্‌নিক্যাল বা কারিগরি ও ফলিত বিজ্ঞান বিভাগ। এই সময় এন. সি. ই.-র কার্যালয় বহুবাজার স্ট্রীট হইতে ৯২ আপার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত হইল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এন. সি. ই.-র আর্থিক দুর্যোগ দেখা দেয়। তারকনাথ পালিতের অর্থানুকূল্যের আশা ২ বৎসর আগে এন. সি. ই.-কে এস. পি. টি. ই.-র সঙ্গে মিলনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তারকনাথ পালিত সাড়ে ১৪ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি বিজ্ঞানশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিলে এন. সি. ই. আর্থিকভাবে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং বাধ্য হইয়া অবিলম্বে আপার সার্কুলার রোডের বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া মানিকতলায় এক ভাড়াবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন একটি ছাত্রও ভর্তি না হওয়ার দরুন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের অনিবার্য মৃত্যু ঘটিল, বাঁচিয়া রহিল কেবল এন. সি. ই.-র বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে টেক্‌নিসিয়ানের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্ররাও সেসময়ে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করিয়া ভাল চাকরি পাইতে থাকে এবং কতকটা এই কারণে কলেজের ছাত্রসংখ্যাও ক্রমশঃ বর্ধিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এন. সি. ই.-র ১৫ জন ছাত্র বিনয় সরকারের উদ্যোগে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও এঞ্জিনিয়ারিং -এর বিভিন্ন শাখায় উচ্চ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ইহাদের কেহ কেহ বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে অধ্যাপনার কাজে ব্রতী হন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এন. সি. ই. -র প্রথম সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার উইলে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করিলেন। এই অর্থানুকূল্যে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের সহৃদয়তায় যাদবপুরে ১০০ বিঘা জমি ৯৯ বৎসরের 'লিজ' নেওয়া হয়। (ইহার কিছুদিন পরে আরও ৯২ বিঘা সংলগ্ন জমি একই সর্তে 'লিজ' নেওয়া হইয়াছিল)। ঐ বৎসরই এন. সি. ই.-র জন্মদিবস ১১ মার্চ তারিখে প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন সভাপতি আশুতোষ চৌধুরী বর্তমান শ্রীঅরবিন্দ বিল্ডিংগ্‌স্‌-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের নাম পরিবর্তন করিয়া নূতন নামকরণ হয় 'কলেজ অফ এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজি, বেঙ্গল।' ইহার পর হইতে এই ঐতিহ্যপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি শুরু হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতালাভের পর এন. সি. ই. -প্রদত্ত ডিগ্রি সরকারি ও বেসরকারি মহলে পূর্ণ মর্যাদার অধিকারী হয়।

সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবর্জিত কেবল এঞ্জিনিয়ারিং বা কারিগরি শিক্ষাপ্রদান কোনও কালেই এন. সি. ই.-র আদর্শ ছিল না। তাই এই বিভাগগুলি পুনরায় খোলার প্রচেষ্টা অনেকদিন হইতেই চলিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উৎসাহে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যাদবপুরে ত্রিধারা শিক্ষাসূচী সমন্বিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পশ্চিম বঙ্গে আইন বিধিবদ্ধ হইল। তদনুসারে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কলেজ অফ এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজি তাহার স্বতন্ত্র সত্তা হারাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পরিণত হইল এবং সেইসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের পরেও কাউন্সিলের অবলুপ্তি ঘটে নাই।

দ্র Binaykumar Sarker, *Education for Industrialization*, Calcutta, 1946 ; *National Council of Education, Souvenir*, Calcutta, 1956 ; Haridas Mukhopadhyay & Uma Mukhopadhyay, *The Origins of the National Education Movement*, Calcutta, 1957.

হরিদাস মুখোপাধ্যায়
উমা মুখোপাধ্যায়

ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি জাতীয় রসায়ন প্রয়োগশালা। পুনায় অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি ভারত সরকারের অর্থে এবং 'কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' নামক সমিতির পরিচালনায় সংগঠিত অন্যতম জাতীয় গবেষণাগার। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি ভারতের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ইহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। রসায়ন সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ফলিত উভয়বিধ গবেষণাই এখানে হইয়া থাকে। কর্মপন্থা প্রণয়ন ও পরিচালনার সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠানটির ৯টি বিভাগ আছে, যথা জৈব রসায়ন, অজৈব রসায়ন, ভৌত রসায়ন জীবরসায়ন, তৈলসার রসায়ন, বৃহদণু রসায়ন, জৈবরঞ্জক

ও উপজাযী রসায়ন, রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ারিং এবং শিল্পসংক্রান্ত তথ্য ও আয়ব্যয় নিরীক্ষা বিভাগ। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রায় ৩০০ বিজ্ঞানী, প্রায় ১০০ অস্থায়ী শিক্ষার্থী (ফেলো) ও বিজ্ঞানী এবং প্রায় ৫০০ অন্যান্য কর্মী কাজ করেন। গবেষণাগারের বার্ষিক কর্মপন্থা আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি কার্যকরী পরিষদ আছে ; সংস্থার যাবতীয় প্রস্তাবই ইহার অনুমোদনসাপেক্ষ। রসায়ন সম্পর্কিত জ্ঞানের অগ্রগতি এবং শিল্প ও মানবকল্যাণে তাহার প্রয়োগে এই সংস্থার অবদান উল্লেখযোগ্য।

জগন্নাথ গুপ্ত

ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার। নূতন দিল্লীতে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি 'কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অন্যতম জাতীয় গবেষণাগার। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি জওহরলাল নেহরু এই গবেষণাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ; বল্লভভাই প্যাটেল ইহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি। কারিয়ামাণিক্যম শ্রীনিবাস কৃষ্ণন এই গবেষণাগারের প্রথম অধিকর্তা ছিলেন। পদার্থবিদ্যার বহুমুখী ও ব্যয়সাপেক্ষ গবেষণা-পরিকল্পনাগুলির ভার এই গবেষণাগারের বিজ্ঞান-কর্মীদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাকাশ-গবেষণা, আয়নমণ্ডলের অবস্থান গঠন ও দৈনন্দিন পরিবর্তনের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান, ইলেক্‌ট্রন ও পরমাণু-কেন্দ্রীয় চৌম্বক-অনুনাদ-সংঘটক পদার্থের অন্তর্নিহিত কেলাসজ বিন্যাসনির্ণয়, ট্রান্‌জিস্টার-এর উপযোগী অর্ধ-পরিবাহী বস্তুর কেলাসসৃষ্টি ও বিশুদ্ধীকরণ ইত্যাদি এই গবেষণাকেন্দ্রের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে বিকিরিত আল্‌ফা, বিটা ও গামা -রশ্মির সাহায্যে পারমাণবিক কেন্দ্রের উপস্কৃতি (ট্রান্‌স্‌মিউটেশন), বস্তুর তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপস্বরূপ তাহার অর্ধ-আয়ুষ্কালের (হাফ-লাইফ) মাত্রানির্ণয়, মাইক্রোতরঙ্গের সাহায্যে টেলিফোনে ও দূরেক্ষণে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সংকেত প্রেরণ ও গ্রহণ, সম-দশ (কোহেরেণ্ট) আলোক-রশ্মি লেজারের (Laser beam) সাহায্যে সংবাদ পরিবেশন ইত্যাদি কার্যক্রম এই গবেষণা-মন্দিরে পরিচালিত হইতেছে। নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রয়োগকৌশল উদ্ভাবন এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ ও যন্ত্রাংশের রূপদানের উদ্দেশ্যে এই গবেষণাগারে শব্দ, তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিক্‌স, বলবিদ্যা প্রভৃতি শাখায় ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণা চলিতেছে। বেতার গ্রাহকযন্ত্রে ব্যবহৃত ভাল্‌ভ, ডায়োড, ট্রান্‌জিস্টার ইত্যাদি সৃষ্টি, মাইক্রোতরঙ্গ ব্যবহারের উপযোগী ওয়েভ-গাইড, অ্যান্টেনা প্রভৃতির রূপায়ণ, ব্যাটারির ম্যাঙ্গানিজ্‌-ডাই-অক্সাইড বা পেন্সিলের সীসার গুণনির্ণয় প্রভৃতি এই গবেষণাগারের কর্মধারার অন্তর্গত। সংকোচনশীলতা, স্থিতিস্থাপকতা, অনুদৈর্ঘ্য-মোচড় বা আয়তন-পীড়নে বস্তুর দৃঢ়তা, তাপ প্রয়োগে বস্তুর প্রসারণ বা অবস্থান্তর, এক্‌স্‌-রে প্রয়োগে বস্তুর আভ্যন্তরীণ কেলাস-বিন্যাসে বিপর্যয় পরীক্ষা প্রভৃতি বহু প্রকল্প এই গবেষণামন্দিরে রূপ গ্রহণ করিতেছে। দৈর্ঘ্য, ভর ও বৈদ্যুতিক রোধের একক প্রমাণ-মাত্রা এই গবেষণাগারে সংরক্ষিত আছে। বেতারতরঙ্গের মাধ্যমে নির্ভুল সময়-সংকেত জ্ঞাপন, উষ্ণতাপরিমাপক যন্ত্রের ক্রমাংকন, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের কার্যকারিতা ও গুণবিনির্দেশ, ধাতব ও যৌগিক পদার্থের কেলাসসৃষ্টির কৌশল নিরূপণ, বর্ণালীবিশ্লেষণ ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে বস্তুর গঠনতত্ত্ব নির্ণয়, ইলেক্‌ট্রন-নির্ভর অণুবীক্ষণের সহযোগে জীবাণু ও পদার্থের সূক্ষ্মতম আকৃতির পরিচয়গ্রহণ প্রভৃতি গবেষণাও এখানে পরিচালিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ রায়

ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট, ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ কলিকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে অবস্থিত চিকিৎসাবিদ্যার কলেজ। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ এপ্রিল চিত্তরঞ্জন দাশের অনুপ্রেরণায় টিলক স্বরাজ ফাণ্ডের মাত্র ১৫০০০ টাকা দান সম্বল করিয়া ওয়েলিংটন স্কোয়্যারের ফর্‌বেস ম্যান্‌সন্‌-এ ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট স্থাপিত হয়। প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি, কুমুদশংকর রায় ও সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রথম যুগ্ম-সম্পাদক এবং সুন্দরীমোহন দাস প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ২৪ গোরাচাঁদ রোডের জমিতে নির্মিত গৃহে প্রতিষ্ঠানটি স্থানান্তরিত হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৩২ গোরাচাঁদ রোডে নির্মিত অট্টালিকায় অধ্যাপনা বিভাগ উঠিয়া আসে। ইতঃপূর্বেই ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আশুতোষ চৌধুরী, শরৎকুমার মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় ক্যালকাটা মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট স্থাপিত হইয়াছিল। ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা প্রথমযুগে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'এল. এম. এস. ন্যাশন্যাল' উপাধি পাইত, কিন্তু ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বাংলা সরকারের অনুমোদন লাভ করে নাই। বহু প্রচেষ্টার পরে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত

ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট ও ক্যালকাটা মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট বঙ্গদেশের স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইহাদের ছাত্ররা এল. এম. এফ. পরীক্ষাদানের ও পরীক্ষায় সফল হইলে সরকারি চিকিৎসালয়ে নিয়োগের সুযোগ পায়। প্রতি বৎসর প্রায় ২০০ ছাত্র এই দুই প্রতিষ্ঠানে এল. এম. এফ. পাঠক্রমে শিক্ষালাভ করিত। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ঐ দুই প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করিয়া ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন করা হয় এবং এখানে এম. বি. বি. এস. পাঠক্রমে শিক্ষাদানের অনুমোদন পাওয়া যায়। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনভার পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। বর্তমানে ইহার নাম হইয়াছে ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ।

এই কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য বর্তমানে প্রতি বৎসর ২০০ ছাত্রকে প্রাক-চিকিৎসা (প্রি-মেডিক্যাল) পাঠক্রমে ভর্তি করা হয়। কলেজ-সংলগ্ন চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগে যক্ষ্মাসহ সকল রোগেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শিশুচিকিৎসা বিভাগ, বিকলাঙ্গচিকিৎসা বিভাগ, বক্ষব্যাধি ও বক্ষশল্যচিকিৎসার জন্য রানী তীর্থময়ী চৌধুরাণী হাসপাতাল প্রভৃতি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা প্রায় ১ হাজার।

কামিনীকান্ত ভট্টাচার্য
কুমারনাথ বাগচী

ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি ন্যাশন্যাল লাইব্রেরির সংজ্ঞা এখন সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। তবে যে গ্রন্থাগারে দেশের সমগ্র লিপিবদ্ধ ধ্যানধারণার সংগ্রহ, সংরক্ষণ তথা ব্যবহারের আয়োজন করা হয় তাহাকে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি (জাতীয় গ্রন্থাগার) হিসাবে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ এই লাইব্রেরি সরকারি ব্যয় ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হইয়া থাকে। দেশে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকাদি সংগ্রহের নিমিত্ত প্রত্যেক মুদ্রক অথবা প্রকাশককে আইনতঃ প্রত্যেকটি পুস্তক তথা পত্র-পত্রিকার এক বা একাধিক খণ্ড বিনামূল্যে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে পাঠাইতে বাধ্য করা হয়। ইহা ছাড়া গ্রামোফোন রেকর্ড, ফিল্ম, পুঁথি, অনূদিত পাণ্ডুলিপি ও ব্যক্তিগত বিশেষ চিঠিপত্র ইত্যাদিও ইহাতে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে।

কেবলমাত্র স্বীয় দেশের পুস্তকাদি সংগ্রহের মধ্যে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরির উদ্যোগ সীমিত থাকিতে পারে না। উচ্চতম গবেষণা ও বিদ্যাচর্চার সহায়ক বলিয়া ইহার অন্যতম কর্তব্য হইল বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সর্ববিদ্যা-সংক্রান্ত সুনির্বাচিত উপকরণ সংগ্রহ করা এবং শুধু সংগ্রহ ও সংরক্ষণই নয়, এই জ্ঞানভাণ্ডার যাহাতে যথোপযুক্তভাবে সকলের ব্যবহারযোগ্য হইয়া ওঠে তাহার দায়িত্বও ইহাকে বহন করিতে হয়। এই দায়িত্ব যে সকল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পালিত হইতে পারে সেগুলি হইল: ১. ইহাতে বসিয়া পড়িবার জন্য বহু পাঠকের স্থান-সংকুলান করা ২. সমস্ত পুস্তকসংগ্রহের বিষয়ানুগ বর্গীকরণ ও সূচী প্রণয়ন ৩. জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলন ও তাহা নিয়মিত করা ৪. বিশেষ বিশেষ বিদ্যাসম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করা ৫. সাময়িক পত্র-পত্রিকার সূচী তথা বিষয়গত রচনাপঞ্জী প্রস্তুত করা ৬. দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহিত যোগসূত্র স্থাপন এবং এক গ্রন্থাগার হইতে অন্য গ্রন্থাগারে ঋণ হিসাবে পুস্তক লেনদেন ৭. বিদেশের গ্রন্থাগারের সঙ্গে পুস্তকাদি বিনিময়। উপরন্তু দেশের সর্বপ্রকার গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার সুনিয়ন্ত্রণ ও গ্রন্থাগার পরিচালনার বিজ্ঞানসম্মত বিধি ও কার্যসূচীর রূপায়ণও ন্যাশন্যাল লাইব্রেরির অন্যতম বিশিষ্ট কর্তব্য, কারণ আদর্শে ও স্থায়িত্বে ইহাই দেশের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার মধ্যমণি তথা নেতৃত্বের অধিকারী।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি হিসাবে ব্রিটেনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, ফ্রান্সের বিব্‌লিওথেক ন্যাশনেল এবং রাশিয়ার লেনিন লাইব্রেরির নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতের স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাস্থ প্রাক্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিকে ভারতের ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে পরিণত করা হইয়াছে।

দ্র Library Association, *National Libraries*, London, 1963.

আদিত্য ওহদেদার

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি নামে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়। কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের চেষ্টায় ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় ও মেট্‌কাফ হলে তাহার কার্যকলাপ চলিতে থাকে। ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে জমিয়া ওঠা বইপত্র একত্র করিয়া ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি আরম্ভ হয়। ভারত সরকারের রেকর্ডরক্ষকের হাতে এই লাইব্রেরির ভার ন্যস্ত ছিল; ইহার কর্মপদ্ধতি সীমাবদ্ধ ছিল উচ্চপদস্থ

সরকারি কর্মচারীর ব্যবহারের মধ্যে। বড়লাট লর্ড কার্জনের চেষ্টায় কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরি ও ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরি একত্রিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন এই দুই লাইব্রেরিকে একত্রিত করিয়া ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরি নামে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরির প্রথম গ্রন্থাগারিক ম্যাক্‌ফার্‌লেন ব্রিটিশ মিউ-জিয়ামের সহকারী গ্রন্থাগারিক ছিলেন। হরিনাথ দে ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরির প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগারিক (১৯০৭-১১ খ্রী)।

প্রথম ২০ বৎসর ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরির কার্যকলাপ মেট্‌কাফ হলেই চলিতে থাকে। তাহার পর এস্‌প্ল্যানেড ঈস্ট ও জবাকুসুম হাউসে কিছুদিন কার্যকলাপ চলিবার পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরি ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি নাম গ্রহণ করিয়া প্রাক্তন বড়লাট-প্রাসাদ বেলভিডিয়ারে চলিয়া আসে।

ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি কপিরাইট গ্রন্থাগার। ভারতে ছাপা সমস্ত বইপত্রের এক কপি এ-লাইব্রেরি পাইয়া থাকে।

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

নিউক্লিওপ্রোটিন জীবদেহের অপরিহার্য উপাদান। প্রত্যেক জীবকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজ্‌ম্-এ ইহা বর্তমান। ক্ষুদ্রতম জীব ভাইরাস ও ব্যাক্‌টিরিও-ফাজের দেহও মূলতঃ নিউক্লিওপ্রোটিনের অণু দিয়াই গঠিত।

নিউক্লিওপ্রোটিনের গঠন জটিল। ইহার অণুতে দুই অংশ—প্রোটিন ও নিউক্লিইক অ্যাসিড। প্রোটিন অংশে থাকে প্রোটামিন বা হিস্টোন-শ্রেণীর সরল প্রোটিন; নিউক্লিইক অ্যাসিড অংশটি বহু নিউক্লিওটাইড অণুর সমন্বয়। নিউক্লিওটাইড আবার ফস্‌ফরিক অ্যাসিড এবং কয়েকপ্রকার নিউক্লিওসাইড লইয়া গঠিত। শেষোক্ত পদার্থে থাকে পিউরিন বা পিরিমিডিন-জাতীয় ক্ষারক বস্তু এবং রাইবোজ় অথবা ডেস্‌অক্সিরাইবোজ় নামক সরল শর্করা।

কোষমধ্যে নিউক্লিওপ্রোটিন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোষের ক্রিয়ার উপযোগী প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশ লয়। কোষের নিউক্লিয়াসে ডি. এন. এ. (ডেস্‌অক্সিরাইবো-নিউক্লিইক অ্যাসিড) এবং আর. এন. এ. (রাইবোনিউ-ক্লিইক অ্যাসিড) নামক দুইপ্রকার নিউক্লিইক অ্যাসিড-যুক্ত দুইরকম নিউক্লিওপ্রোটিন পাওয়া যায়। নিউক্লিয়াসের ক্রোমসোমে ডি. এন. এ.-ঘটিত নিউক্লিওপ্রোটিন যথেষ্ট বর্তমান; প্রয়োজনমত উহারই আণবিক গঠনের ছাঁচে অন্যান্য নিউক্লিওপ্রোটিন অণু উৎপন্ন হয়। আর. এন. এ.-ঘটিত নিউক্লিওপ্রোটিন নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিওলাসে অল্প পরিমাণে এবং সাইটোপ্লাজ়্‌মে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। অবস্থাভেদে কোষে আর. এন. এ.-র পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয়; যথা, বৃদ্ধির সময় কোষের ভিতর প্রোটিন সংশ্লেষণ দ্রুততর হইলে সাইটোপ্লাজ়্‌মে আর. এন. এ.-র পরিমাণও বাড়িয়া যায়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ জীবের কোষে ক্রোমসোমের সংখ্যা যেমন নির্দিষ্ট, ডি. এন. এ.-র পরিমাণও সেইরূপ মোটামুটি নির্দিষ্ট। কোষবিভাজনের একটি পর্যায়ে ডি. এন. এ.-র পরিমাণ সাময়িকভাবে বাড়িলেও উহাতে টিস্যুর ডি. এন. এ.-র গড় পরিমাণের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। সুতরাং কোনও টিস্যুতে ডি. এন. এ.-র পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সেখানে কোষ-সংখ্যা বাড়িয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। যৌনকোষগুলিতে ডি. এন. এ.-র পরিমাণ ক্রোমসোমের পরিমাণের মতই সাধারণ দেহকোষের তুলনায় অর্ধেকমাত্র।

ডি. এন. এ.-র অণুগুলি দীর্ঘ এবং স্ক্রু-র প্যাঁচের মত জড়ানো। ইহাদের আণবিক গঠনের মেরুদণ্ডটি ডেস্‌-অক্সিরাইবোজ় ও ফস্‌ফরিক অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত এবং ইহার গায়ে পিউরিন ও পিরিমিডিন অণুগুলি নানা ক্রম ও অনুপাতে সংলগ্ন থাকে। এই আণবিক বিন্যাসের মধ্যেই বংশগত গুণাবলীর সংকেত বর্তমান। ডি. এন. এ. অণুগুলি কোষের প্রয়োজন মত প্রোটিন সংশ্লেষণের ক্ষমতাসম্পন্ন আর. এন. এ. অণু তৈয়ারি করে। ইহা ছাড়া কোষবিভাজনের সময় ডি. এন. এ. হইতেই অনুরূপ ডি. এন. এ. অণু উৎপন্ন হয়।

এ পর্যন্ত তিন শ্রেণীর আর. এন. এ. অণু সম্বন্ধে জানা গিয়াছে: ১. 'রাইবোসোম্যাল আর. এন. এ.' অণুগুলি কোষের এন্‌ডোপ্লাজ়মিক রেটিকিউলাম নামে কোষাঙ্গক (অর্গ্যানেল)-এর গাত্রে সংলগ্ন থাকে ও বৃহৎ প্রোটিন অণু সংশ্লেষণ করে ২. 'ট্রান্‌স্‌ফার আর. এন. এ.' পূর্বোক্ত আর. এন. এ.-র তুলনায় ক্ষুদ্রাকৃতি এবং ইহাদের গাত্রে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড সংলগ্ন হইতে পারে ৩. 'মেসেন্‌জার আর. এন. এ.'-র অণুতে বিভিন্ন পিউরিন ও পিরিমিডিনের ক্রম ও পরিমাণ অনুযায়ী বিশেষ প্রকার প্রোটিনে নানা অ্যামাইনো অ্যাসিডের ক্রম সম্বন্ধে সংকেত নিহিত থাকে। তদনুসারে মেসেন্‌জার আর. এন. এ. ট্রান্‌স্‌ফার আর. এন. এ.-র গাত্রসংলগ্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড-গুলি বাছিয়া লইয়া রাইবোসোম্যাল আর. এন. এ.-র সাহায্যে প্রোটিন অণুর যথাস্থানে সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড-

গুলি সন্নিবিষ্ট করে। এ ভাবেই কোষমধ্যে প্রোটিন উৎপন্ন হয়। মেসেন্‌জার আর. এন. এ.-র সহায়তা ব্যতীত ট্রান্‌স্‌ফার আর. এন. এ. এবং রাইবোসোম্যাল আর. এন. এ. সরাসরি প্রোটিন সংশ্লেষণ করিতে পারে না।

কোষের গ্রথনের অন্তর্ভুক্ত নিউক্লিওপ্রোটিন কিন্তু খাদ্য হইতে আহৃত নিউক্লিওপ্রোটিন নহে। কোষের নিউক্লিও-প্রোটিন প্রয়োজনমত দেহেই সংশ্লেষিত হয়।

মানবদেহে নিউক্লিওপ্রোটিনের বিপাকের (মেটাবলিজ্‌ম) ফলে পিউরিনের নাইট্রোজেন-ঘটিত অংশ হইতে প্রধানতঃ ইউরিক অ্যাসিড এবং পিরিমিডিনের নাইট্রোজেন-ঘটিত অংশ হইতে ইউরিয়া উৎপন্ন হয় এবং এগুলি মূত্রের সহিত নির্গত হয়। গেঁটে বাতের রোগীর রক্তে সাধারণতঃ ইউরিক অ্যাসিডের আধিক্য দেখা যায়।

পরিমলবিকাশ সেন

নিউক্লিয়ার ফিজিক্স কেন্দ্রকবিদ্যা দ্র

নিউটন, অ্যাইজ্যাক (১৬৪২-১৭২৭ খ্রী) ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিশারদ। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত উল্‌স্‌থর্প গ্রামের এক কৃষিজীবী পরিবারে নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের কিছু পূর্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। প্রাথমিক শিক্ষা হয় গ্রামের বিদ্যালয়ে ও নিকটস্থ গ্র্যান্থাম গ্রামার স্কুলে। পরে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। শৈশব ও কৈশোরে লেখাপড়ায় নিউটনের অসাধারণ প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায় নাই। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি.এ. উপাধি লাভ করেন। সেই বৎসরই প্লেগ মহামারীর প্রকোপে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যায় ও নিউটন উল্‌স্‌থর্প গ্রামে ফিরিয়া ২ বৎসর কাল নিজের পড়ায় মনোনিবেশ করেন। পরবর্তীকালে নিউটন বলিয়াছিলেন যে, এই সময়েই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে ও তাঁহার জীবনে অন্য কোনও সময়েই তিনি গণিত ও বিজ্ঞানে এমন গভীর মনোনিবেশ করেন নাই। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নিউটন কেম্ব্রিজে প্রত্যাবর্তন করেন ও ট্রিনিটি কলেজের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রথম বক্তৃতামালার বিষয় ছিল আলোকতত্ত্ব। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন ও ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত স্বীকৃতিরূপে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে 'ওয়ার্ডেন অফ দি মিন্ট' ও ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'মাস্টার অফ দি মিন্ট' পদে নিয়োগ করা হয়। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে 'নাইট' উপাধি দেওয়া হয়। নিউটন বিবাহ করেন নাই। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ তাঁহার মৃত্যু হয়।

গণিতশাস্ত্রে নিউটনের প্রধান অবদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাইনোমিয়্যাল থিয়োরেম (দ্বিপদ উপপাদ্য), ডিফারেন্‌শিয়্যাল ও ইন্‌টিগ্র্যাল ক্যাল্‌কুলাস (অন্তরকলন ও সমাকলন) এবং ক্যাল্‌কুলাস তত্ত্বের প্রধান সূত্র। পদার্থবিদ্যায় তাঁহার প্রধান অবদান বলবিদ্যা, মহাকর্ষতত্ত্ব ও আলোকতত্ত্ব। নিউটনের বলবিদ্যাকে সমগ্র বিজ্ঞানের ভিত্তি বলা চলে। প্রায় ২০০ বৎসর নিউটনের বলবিদ্যা ও মহাকর্ষতত্ত্ব নানা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। মাত্র ২০শ শতাব্দীতে এই দুই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। মহাকর্ষ ও বলবিদ্যা বিষয়ে তাঁহার গবেষণার ফলাফল বিখ্যাত 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থে (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালের দর্শন ও বিজ্ঞানচিন্তায় এই গ্রন্থ বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। নিউটনের অপর গ্রন্থ 'অপ্‌টিক্‌স' (Opticks) বা আলোকবিদ্যা ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আলোকবিদ্যায় বর্ণালী-সংক্রান্ত পরীক্ষা ও প্রতিফলন-নির্ভর দূরবীক্ষণ যন্ত্র (রিফ্লেক্‌টিং টেলিস্কোপ) আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোকবিদ্যায় তাঁহার মতামত আলোচনায় যখন প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয় তখন নিউটন তাঁহার মত সমর্থনে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করেন : 'তত্ত্ব আলোচনার শ্রেষ্ঠ ও নিরাপদ পদ্ধতি হইতেছে প্রথমে কোনও বিষয়ে বস্তুসমূহের গুণাগুণ বিষয়ে অনুসন্ধান করা ও পরীক্ষার সাহায্যে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া। পরে তাহাদের ব্যাখ্যার জন্য ধীরভাবে অনুমানের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত'। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা বর্তমান কালেও অপরিবর্তিত আছে।

দ্র David Brewster, *Memoirs of Sir Isaac Newton*, vols. I & II, London, 1855; L. T. More, *Isaac Newton*, London, 1934; E. N. da C. Andrade, *Sir Isaac Newton*, London, 1954.

শ্যামল সেনগুপ্ত

নিউট্রনবিদ্যা পারমাণবিক কেন্দ্রকের মধ্যে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে নিউট্রনকণা। মুক্ত অবস্থায় নিউট্রন পাওয়া যায় মহাজাগতিক রশ্মিতে এবং সৌরগাত্র হইতে উচ্ছ্বসিত কণিকাপ্রবাহে। গবেষণাগারে নিউট্রন আবিষ্কৃত হয় নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে। তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়াম হইতে

নিঃসৃত আল্‌ফা-কণা বেরিলিয়ামের উপর প্রযুক্ত হইলে দেখা যায় যে যথেষ্ট ভেদশক্তিসম্পন্ন একজাতীয় বিকিরণের উদ্গম হইতেছে ; ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে বোথে ও বেকার এবং পারীতে জ্যোলিও-কুরি এই নূতন বিকিরণের পরিচয় লাভ করেন। সেই সময়ে বিজ্ঞানীমহলে ধারণা ছিল, এই বিকিরণ ৫ কোটি ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট মাত্রার শক্তিবিশিষ্ট গামা-রশ্মি। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে চ্যাড্‌উইক প্রথমে প্রমাণ করেন বেরিলিয়াম-নিঃসৃত রশ্মি গামা-রশ্মি নহে। ইহা এক তেজস্ক্রিয় কণা, ইহার ভর প্রোটনের ভরের তুলনায় সামান্য অধিক—প্রোটনের ভর ১.৬৭২৩৯×১০^{-২৪} গ্রাম, নিউট্রনের ভর ১.৬৭৪৭০×১০^{-২৪} গ্রাম। এই ভেদশক্তিসম্পন্ন কণার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—প্রোটন বা ইলেক্‌ট্রনের মত এই কণা বিদ্যুৎ-আহিত নয়। চ্যাড্‌উইক এই বিদ্যুৎ-উদাসীন কণার নামকরণ করেন নিউট্রন।

পরমাণু-কেন্দ্রক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিবার জন্য ইতিপূর্বে উচ্চমাত্রার ত্বরণযুক্ত প্রোটনের ব্যবহার বহুল-প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রোটন-কণা ধনবিদ্যুৎ-আহিত, পরমাণু-কেন্দ্রকও ধনবিদ্যুতে আহিত ; এই কারণে প্রোটন পরমাণু-কেন্দ্রকের নিকটবর্তী হইলে তাহা কেন্দ্রকের বিকর্ষণী প্রভাবে পড়ে। অতিরিক্ত ত্বরণযুক্ত না হইলে প্রোটন কখনই কেন্দ্রকের সমীপবর্তী হইতে পারে না। অপরপক্ষে নিউট্রন বিদ্যুৎআধানবর্জিত ; অপেক্ষাকৃত কম গতিবেগসম্পন্ন নিউট্রন সহজেই কেন্দ্রকের নিকটবর্তী হইতে পারে, এমন কি পরমাণু-কেন্দ্রকে আঘাত করিয়া নিউট্রন কেন্দ্রকমধ্যে বিভিন্ন বিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। আধানবর্জিত নিউট্রন কেন্দ্রকের বিকর্ষণীক্ষেত্রের প্রভাবমুক্ত, ইহাই নিউট্রন-কণার অতুলনীয় ভেদক্ষমতার মূল কারণ ('কেন্দ্রকবিদ্যা' দ্র)।

প্রোটন বা ইলেক্‌ট্রনের মত নিউট্রন স্থায়ী কণা নয়। একমাত্র পরমাণু-কেন্দ্রকের অন্তস্তল ছাড়া মুক্ত অবস্থায় নিউট্রন তেজস্ক্রিয় ক্ষয়িষ্ণু বিক্রিয়ার অধীন। নিউট্রন আপন তেজস্ক্রিয়ায় ভাঙ্গিয়া প্রোটন, বিটা-কণা ও নিউট্রিনোতে পরিণত হয়। এই ক্ষয়িষ্ণু বিক্রিয়ার ফলে নিউট্রনের তেজস্ক্রিয় অর্ধ-আয়ুষ্কাল (হাফ-লাইফ) খুবই সীমিত হয়—মাত্র ১২.৮ মিনিট। কিন্তু পারমাণবিক কেন্দ্রকমধ্যে নিউট্রন আছে অটুটভাবে ; প্রত্যেকটি মৌলের (হাইড্রোজেন ছাড়া) কেন্দ্রকে নিউট্রন রহিয়াছে প্রোটনের প্রায় সমসংখ্যায়। কেন্দ্রকে নিউট্রন থাকায় কেন্দ্রকমধ্যে জাগে বন্ধনীশক্তি (বাইন্‌ডিং এনার্জি)। প্রোটন ও নিউট্রনের সমষ্টি দিয়া গড়া মৌল পরমাণুর কেন্দ্রক এই বন্ধনীশক্তিতে আবদ্ধ ; অধিকাংশ কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে এই বন্ধনীশক্তির মাত্রা প্রায় ৮০ লক্ষ ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট।

গবেষণাগারে নিউট্রনের উৎস সৃষ্টির জন্য সাধারণতঃ পোলোনিয়াম^{২১০} বা রেডিয়াম^{২২৬}-এর মত আল্‌ফা-রশ্মি উদ্গমকারী মৌল অথবা অ্যান্টিমনি^{১২৪}-এর মত গামা-রশ্মি উদ্গমক্ষম মৌল লওয়া হয়। এরূপ আল্‌ফা বা গামা -রশ্মির উৎসস্বরূপ মৌলের সঙ্গে বেরিলিয়ামের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ছোট ছোট দানার আকারে নিউট্রনের উৎসগুলি ধাতবপাত্রে রক্ষিত করা হয়। বেরিলিয়ামের সঙ্গে আল্‌ফা বা গামা -রশ্মির সংঘাতে নিউট্রন সৃষ্টি সম্ভব হয় নিম্নলিখিত কেন্দ্রক-বিক্রিয়ায় :

$$_4Be^9 + {}_2He^4 \rightarrow {}_0n^1 + {}_6C^{12}$$

(আল্‌ফা)

$$_4Be^9 + \gamma \rightarrow {}_0n^1 + {}_4Be^8$$

(গামা)
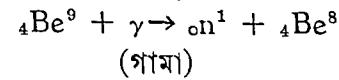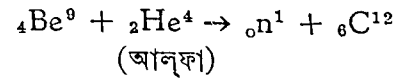
উপরি-উক্ত পদ্ধতি ছাড়া প্লুটোনিয়াম^{২৩৯}-এর অক্সাইড-চূর্ণ বেরিলিয়ামের সঙ্গে মিশাইয়া ১৩০০ সেন্টিগ্রেড উত্তাপে গলিত করিয়া প্লুটোনিয়াম-বেরিলিয়ামের ধাতু-সংকর সৃষ্টি করা যায়। ভারতবর্ষের ট্রম্বেতে ভাবা পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রে এই পদ্ধতিতে নিউট্রনের উৎস তৈয়ারি হইতেছে। প্লুটোনিয়াম^{২৩৯}-উদ্ভূত আল্‌ফা-কণা বেরিলিয়াম-কেন্দ্রকে আঘাত করিলে নিউট্রনের সৃষ্টি হয়।

প্রভূত ভেদক্ষমতাসম্পন্ন দ্রুতগতি নিউট্রন পাওয়া যায় সাইক্লোট্রন, কক্রফ্‌ট-ওয়াল্‌টন বা ভ্যান্‌-ডি-গ্র্যাফ্‌ নামক যন্ত্রে ত্বরণযুক্ত আহিত-কণিকা ও বিশেষ বস্তুর পরমাণু-কেন্দ্রকের সংঘাতবিক্রিয়ায়। গতিশীল যে-কোনও কণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে অধিষ্ঠিত থাকে তাহার তরঙ্গ প্রকৃতি ; কণার গতিশক্তির মাত্রার উপরে নির্ভর করে তাহার (ডি-ব্রগ্‌লি) তরঙ্গদৈর্ঘ্য। দ্রুতগতি নিউট্রনের শক্তিমাত্রা যদি ১০ লক্ষ ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট হয়, তজ্জনিত নিউট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হয় ২.৮৬×১০^{-১২} সেন্টিমিটার। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরমাণু-কেন্দ্রকের ব্যাসের সমতুল্য। এই কারণে উপরি-উক্ত যন্ত্রসমূহ হইতে নিঃসৃত শক্তিশালী নিউট্রন-রশ্মি কেন্দ্রকের আকৃতি ও তন্মধ্যে কেন্দ্রক-কণার বিন্যাস নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

অপেক্ষাকৃত কম ভেদক্ষমতাসম্পন্ন মন্থরগতি নিউট্রনের নামকরণ হইয়াছে কবোষ্ণ বা 'থার্মাল' নিউট্রন। এই কণার গতিশক্তি ০.০২৫ ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট হইলে নিউট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হয় ১.৮২ অ্যাংস্ট্রম (১ অ্যাংস্ট্রম $= ১ \times ১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার)। পরমাণুর ব্যাস প্রায় সমমাপের বলিয়া কবোষ্ণ নিউট্রনের সাহায্যে পদার্থের পারমাণবিক বিন্যাস বিষয়ে গবেষণা সম্ভব হইয়াছে। মন্থরগতি কবোষ্ণ নিউট্রনের

রশ্মি সাধারণতঃ পাওয়া যায় (ট্রম্বের) CIRUS অথবা APSARA-র মত রিঅ্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লি হইতে।

যে-কোনও কঠিন বা তরল বস্তুর মধ্যে পরমাণুবিন্যাস-বিষয়ক গবেষণা সাধারণতঃ এক্স-রের সাহায্যে করা হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুর মধ্যে হাইড্রোজেনের পরমাণু এক্স-রেকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না; অপরপক্ষে হাইড্রোজেনের পরমাণু-কেন্দ্রক— প্রোটন— নিউট্রনকে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করে। এই কারণে নিউট্রন-রশ্মির বিক্ষেপণ লক্ষ্য করিলে কেলাসিত কঠিন বস্তু বা যে-কোনও তরলের পারমাণবিক বিন্যাস, বিশেষতঃ অণুর মধ্যে প্রোটনের অবস্থান বিষয়ে সূক্ষ্ম ও সুষ্ঠু জ্ঞান অর্জন করা যায়। এতদ্ব্যতীত নিউট্রনের আর-একটি বৈশিষ্ট্য আছে— ইলেকট্রনের ন্যায় নিউট্রনেরও চৌম্বক ভ্রামক (মোমেণ্ট) আছে। কোনও চৌম্বকধর্মী বস্তুমধ্যে নিউট্রন প্রবেশ করিলে বস্তুর চৌম্বকধর্মী পরমাণু-কেন্দ্রকের সঙ্গে নিউট্রনের পারস্পরিক চৌম্বক-বিক্রিয়া ঘটে। এই কারণে চৌম্বকবস্তু হইতে বিক্ষিপ্ত নিউট্রন-রশ্মি বস্তুমধ্যে চৌম্বক পরমাণুর বিন্যাস ও অবস্থান নির্ণয়ে সাহায্য করে।

পরমাণু-কেন্দ্রকে নিউট্রন আঘাত করিলে মৌলের আইসোটোপ সৃষ্টি, এক মৌল হইতে অপর মৌলে উপস্থিতি (ট্রান্স্‌মিউটেশন), শৃঙ্খল-বিক্রিয়া ('কেন্দ্রক বিভাজন' দ্র) ইত্যাদি নানারূপ কেন্দ্রক-বিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় আগন্তুক নিউট্রনটি গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রকে প্রথমে নূতন আইসোটোপ সৃষ্টি হয়; প্রায়শঃই এই আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় ও ক্ষণস্থায়ী হয়। নূতন কেন্দ্রকটি তখন ভাঙ্গিয়া অপর কোনও মৌলের কেন্দ্রকে উপস্থিত হয়। কেন্দ্রক-বিক্রিয়ার ফলে প্রোটন, ইলেকট্রন, আল্‌ফা-কণা, পজিট্রন অথবা গামা-রশ্মি নির্গত হয় এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রকমধ্যস্থ শক্তির কিয়দংশ নিষ্কাশিত হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, লিথিয়াম, বোরোন, নাইট্রোজেন ও ক্লোরিনের কেন্দ্রকে নিউট্রনের অনুপ্রবেশের ফলে প্রথম দুইটির ক্ষেত্রে আল্‌ফা-কণা ও শেষ দুইটিতে প্রোটন-কণা নিষ্কাশিত হয় নিম্নলিখিত কেন্দ্রক-বিক্রিয়ায় :

$${}_3Li^6 + {}_0n^1 \rightarrow {}_1H^3 + {}_2He^4 + 4{\cdot}785\text{MeV}$$
(আল্‌ফা)

$${}_5B^{10} + {}_0n^1 \rightarrow {}_3Li^7 + {}_2He^4 + 2{\cdot}791\text{MeV}$$
(আল্‌ফা)

$${}_7N^{14} + {}_0n^1 \rightarrow {}_6C^{14} + {}_1H^1 + 0{\cdot}626\text{MeV}$$
(প্রোটন)

$${}_{17}Cl^{35} + {}_0n^1 \rightarrow {}_{16}S^{35} + {}_1H^1 + 0{\cdot}62\text{MeV}$$
(প্রোটন)
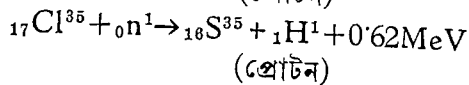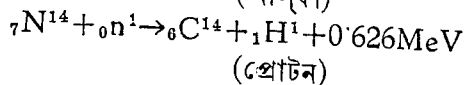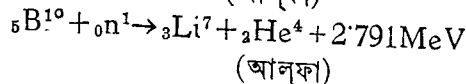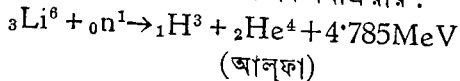
উপরি-উক্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রকের উপস্থিতি লক্ষণীয়। কেন্দ্রক-বিক্রিয়ার ফলে লিথিয়ামের কেন্দ্রক রূপান্তরিত হইয়াছে ট্রিটিয়ামে (${}_1H^3$), বোরোন হইয়াছে লিথিয়াম, নাইট্রোজেন পরিণত হইয়াছে কার্বনে, ক্লোরিন হইয়াছে গন্ধক।

আবার ইউরেনিয়াম ২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম ২৩৯-এর কেন্দ্রক কবোষ্ণ নিউট্রন গ্রহণ করিয়া দুই বা ততোধিক অসম খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই বিভাজন (ফিশন) বিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২ বা ৩টি নিউট্রনও কেন্দ্রক হইতে উদ্গত হয়। এরূপ বিভাজনসঞ্জাত নিউট্রন আবার ইউরেনিয়াম২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম২৩৯-এর কেন্দ্রককে বিভাজিত করে। কবোষ্ণ নিউট্রন সহযোগে এরূপ শৃঙ্খলবিক্রিয়া চলার সময়ে পারমাণবিক কেন্দ্রকশক্তি নির্গত হয়। এই কেন্দ্রকশক্তি অনিয়ন্ত্রিতভাবে মুক্ত হইলে হয় পারমাণবিক বিস্ফোরণ। আবার নিয়ন্ত্রিতভাবে শৃঙ্খলবিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিলে পারমাণবিক চুল্লি ক্রিয়াশীল করা যায় ও তৎসাহায্যে তাপবিদ্যুৎশক্তির সৃষ্টিকেন্দ্র পরিচালিত হয়।

দ্র L. F. Curtiss, *Introduction to Neutron Physics*, New York, 1959; W. D. Allen, *Neutron Detection*, London, 1960.

রবীন্দ্রনাথ রায়

নিউমোনিয়া ফুসফুসের রোগ। ইহার কারণ ও বিস্তার বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। ফুসফুসের ক্ষুদ্র একটি অংশে নিউমোনিয়ার আক্রমণ ঘটিলে তাহাকে 'ব্রংকো-নিউমোনিয়া' এবং ফুসফুসের সম্পূর্ণ একটি পিণ্ড (লোব) আক্রান্ত হইলে তাহাকে 'লোবার নিউমোনিয়া' বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিপ্‌লোকোকস প্নিউমোনিঈ (*Diplococcus pneumoniae*) নামক ব্যাক্‌টিরিয়ার আক্রমণই এ রোগের কারণ। রোগীর হাঁচি, কাশি প্রভৃতির মাধ্যমে সুস্থ দেহে রোগের সংক্রমণ ঘটিতে পারে। ইহা ছাড়া ভাইরাস-এর আক্রমণ, ক্লোরিন, সাল্‌ফার ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস ও নানা ঔষধাদির রাসায়নিক ক্রিয়া ইত্যাদি কারণেও নিউমোনিয়া হইতে পারে। নিউমোনিয়া রোগে জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, রক্তে অক্সিজেনের অভাব, ত্বক ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নীলাভ বর্ণ (সাইয়ানোসিস), আচ্ছন্ন বা অচেতন অবস্থা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লুরিসির উপসর্গও দেখা যায়। পূর্বে ব্যাক্‌টিরিয়া-ঘটিত নিউমোনিয়ার ঔষধের অভাব ছিল এবং হঠাৎ দেহতাপ নামিয়া গিয়া সংকটের (ক্রাইসিস) সৃষ্টি

হইত ; অধুনা সালফাবর্গীয় ঔষধ ও পেনিসিলিন ব্যবহারের ফলে নিউমোনিয়ার পূর্ববৎ ভয়াবহতা নাই।

অরুণকুমার শীল

নিকা, নিকাহ আরবী শব্দ। দুইটি শব্দই মুসলমান আইন অনুযায়ী বিবাহ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রীলোক অঙ্গীকার বা চুক্তি করিয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় ও দাম্পত্য সুখ-সুবিধার অধিকারী হয়। এই চুক্তি প্রথানুযায়ী দুইজন সুস্থ ও বয়স্ক পুরুষের অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের সম্মুখে একই স্থানে একই সময়ে বিবাহের একপক্ষকে প্রস্তাব করিতে হয় ও অপরপক্ষকে সম্মতি দিতে হয়। বিবাহের সকল আইনসঙ্গত শর্ত এই সময়ে প্রকাশ করিতে হয়। এই বিবাহের একটি প্রধান শর্ত হইল, একটি নির্দিষ্ট 'মোহর' (নির্দিষ্ট টাকা বা বিশেষ সম্পত্তি) সম্বন্ধে স্বামীকে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে হয়; এই টাকায় বা সম্পত্তিতে স্ত্রীর দাবি রহিবে এবং স্বামী স্ত্রীকে তাহা দিতে বাধ্য থাকিবে। সচরাচর পনর বৎসর বয়সের পুরুষ বা স্ত্রীলোক এইপ্রকার বিবাহচুক্তি করিতে পারে। অভিভাবক সম্মতি দিলে নাবালক বা উন্মাদ ব্যক্তির বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়। কোনও লিখিত দলিলপত্র বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সচরাচর প্রচলিত থাকিলেও আইনতঃ অনিবার্য নয়।

এস. এ. মাসুদ

নিকায় পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিভিন্ন অর্থে নিকায় (নি-কায়) শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ; যথা রাশি, সমষ্টি, শ্রেণী, দল, সংগ্রহ, ধর্মীয় গোষ্ঠী বা শাখা ইত্যাদি। কিন্তু প্রধানতঃ 'নিকায়' বলিতে পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্রপিটকের সমগ্র সুত্রসংগ্রহকে বুঝায়। এই নিকায় পাঁচভাগে বিভক্ত : দীঘনিকায়, মজ্‌ঝিমনিকায়, সংযুত্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় এবং খুদ্দকনিকায়। সংস্কৃত-বৌদ্ধশাস্ত্রে নিকায়গুলিকে 'আগম' বলা হইয়াছে ; যথা দীর্ঘাগম মধ্যমাগম ইত্যাদি।

বুদ্ধোপদিষ্ট দীর্ঘাকারের সুত্রসমূহ দীঘনিকায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া ইহার এই নাম। পর-মতবাদ খণ্ডন এবং বৌদ্ধধর্মবিষয়ক অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান ইত্যাদি ইহার বিষয়বস্তু। এই গ্রন্থ তিনটি 'বগ্‌গ' বা খণ্ডে বিভক্ত : সীলবগ্‌গ, মহাবগ্‌গ এবং পাটিকবগ্‌গ। ইহাতে সুদীর্ঘ ৩৪টি সুত্র আছে।

মজ্‌ঝিমনিকায়ের অধিকাংশ সুত্রই নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব। বুদ্ধানুশাসনের মূল বিষয়সমূহ জানিতে হইলে গ্রন্থখানি অপরিহার্য। ইহার ১৫টি বর্গে মোট ১৫২টি সুত্র আছে। এই সুত্রসমূহ তিনটি 'পন্নাসক' (পঞ্চাশ)-এ বিভক্ত : মূল, মজ্‌ঝিম ও উপরিপন্নাসক।

সংযুত্তনিকায়ে বিষয়বস্তুর দিকে সঙ্গতি রাখিয়া অধ্যায়সমূহকে ভাগ করা হইয়াছে বলিয়া ইহার এই নাম। ইহাতে বহু ব্যক্তি, দেব, মার, যক্ষ প্রভৃতির বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান আছে। ইহা ৫টি বর্গে বিভক্ত : সগাথক, নিদ্দেস, খন্ধক, সলায়তন এবং মোহবগ্‌গ।

অঙ্গুত্তরনিকায়ে (অঙ্গ+উত্তর+নিকায়) বুদ্ধোপদিষ্ট বিভিন্নবিষয়ক কথোপকথন ও উপদেশাবলী উত্তর-প্রত্যুত্তরক্রমে এবং এক-দুই-তিন ইত্যাদি আকারে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ইহার এই নাম। গ্রন্থখানিকে ত্রিপিটকের সারসংগ্রহ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার একাদশ নিপাত বা অধ্যায়ে মোট ৯৫৫৭টি সুত্র আছে।

খুদ্দকনিকায়ে ছোট ছোট সুত্র ও শ্লোকসমূহ একত্রে সংগৃহীত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া ইহার এই নাম। ইহার অধিকাংশই পদ্যে লিখিত। ইহাতে ১৫টি গ্রন্থ আছে ; যথা খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেশ, পটিসম্ভিদামগ্‌গ, অপদান, বুদ্ধবংস ও চরিয়াপিটক। পালি সাহিত্যের প্রাচীনত্ব ও তাহার কাব্যের দিক বিচার করিতে হইলে এই গ্রন্থগুলি অপরিহার্য।

সুকোমল চৌধুরী

নিকেল শুভ্র, উজ্জ্বল, কঠিন ধাতু। রাসায়নিক সংকেত Ni। নিকেলের পরমাণুক্রমাংক ২৮, পারমাণবিক গুরুত্ব ৫৮·৬৯, গলনাংক ১৪৪৫° সেন্টিগ্রেড এবং স্ফুটনাংক ২৯০০° সেন্টিগ্রেড। ইহা উত্তাপে নমনীয় ও প্রসার্য। লোহের মত ইহাও চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগে ইহার যোজ্যতা (ভ্যালেন্সি) ২ অথবা ৩। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা নিকেল আকরিকের প্রধান প্রাপ্তিস্থল। এ সকল আকরিকে নিকেল তামা, লৌহ এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ম্যাগনেসিয়াম ও গন্ধকের সহিত যুক্ত থাকে। নিকেল নিষ্কাশনপদ্ধতিতে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্রমে ক্রমে লৌহ, তাম্র ও গন্ধককে নিকেল হইতে মুক্ত করা হয় ; সর্বশেষে 'মন্ড পদ্ধতি' ও তাড়িত-রসায়ন পদ্ধতিতে অবিমিশ্র নিকেল উৎপাদন করা হয়।

বায়ু ও আর্দ্রতার জন্য সাধারণ উষ্ণতায় নিকেলের কোনও বিকৃতি ঘটে না, অর্থাৎ লোহার মত ইহাতে

মরিচা পড়ে না এবং তামা ও রুপার মত ইহা মলিন হয় না। নিকেল গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রাধাতু ('ধাতু' দ্র)। অধিকাংশ দেশে নিম্নমূল্যের ধাতুমুদ্রায় রুপার পরিবর্তে নিকেল, তাম্র ও দস্তার সংকর ধাতু (অ্যালয়) ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতে এক টাকা, ৫০ পয়সা, ২৫ পয়সা ও ১০ পয়সার মুদ্রায় নিকেল আছে। সেজন্য এই মুদ্রাগুলি চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। প্রলেপক ধাতুরূপেও নিকেলের গুরুত্ব আছে ('ধাতু' দ্র)। লৌহ বা তাম্রনির্মিত তৈজস-পত্রাদির উপর নিকেলের পাতলা প্রলেপ দিয়া বর্ণ বিকৃতি ও মরিচা রোধ করা হয়। নিকেলঘটিত সংকর ধাতুগুলির মধ্যে ছুরি, কাঁটাচামচ প্রভৃতির উপাদান জার্মান সিল্‌ভার (তামা ৫০%, নিকেল ২৫%, দস্তা ২৫%), তড়িৎ-চুল্লির তারের উপাদান নাইক্রোম (তামা ৪০%, নিকেল ৬০%), অলংকারাদিতে ব্যবহৃত 'হোয়াইট গোল্ড' (সোনা ও নিকেলের সংকর ধাতু), ঘাতসহ নিকেল-ইস্পাত (লৌহ ও নিকেলের সংকর ধাতু) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বহু রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনে নিকেল ধাতুর সূক্ষ্ম চূর্ণের বিশেষ প্রভাব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈলকে হাইড্রোজেন দ্বারা সম্পৃক্ত করিয়া 'বনস্পতি' উৎপাদনের কার্যে অনুঘটক হিসাবে নিকেলচূর্ণের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

নিকোবর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দ্র

নিকোবরী নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা।

নিকোবরী ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য থাকিলেও কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অষ্ট্রিক ভাষাগুলির মধ্যে ভারতের খাসিয়া ভাষাই ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। পুরোবিষ্ট (প্রেফিক্‌স), অন্তর্বিষ্ট (ইন্‌ফিক্‌স) ও পশ্চাদ্বিষ্ট (সাফিক্‌স) বহুবিচিত্র, ইহাদের ব্যবহারও বিচিত্র। উদাহরণস্বরূপ, কার নিং—'হোল্'-এর অর্থ 'সঙ্গে' এবং 'সঙ্গী,' 'হন্' অর্থ 'ইচ্ছা করা' এবং 'উদ্দেশ্যে,' 'ঙাইচ্'-এর অর্থ 'হ্যাঁ' এবং 'কার্যটি সম্পন্ন হইল' আবার 'আর, তারপর' এবং উহা ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া অর্থাভিঘাতও (এম্‌ফ্যাসিস) দেয়। 'কুইচ্'-এর প্রাথমিক অর্থ 'দা দিয়া আঁক কাটা', তাহা হইতে 'লেখা'; অতএব লেখক='কা মুইচ্'; লিখিত='কা হুইচ্'; কলম, পেনসিল='কা নুইচ্' ইত্যাদি। দিক হিসাবে ক্রিয়ার রূপবৈষম্য, যেমন 'যাওয়া' ও 'আসা' যথাক্রমে উত্তরে 'আফাল্' ও 'কাইলারে', দক্ষিণে 'আফাঙ্গ' ও 'কাইঙ্গারে', পূর্বে 'আফাহাৎ' ও 'কাইহারে', পশ্চিমে 'আফাইচ' ও 'কাইশিরে' (চ=শ)। -হ- বা -আ- সংযোগে নিজন্ত নামধাতু ও সকর্মক করা হয়। 'হয়' বা '-এর আছে' অর্থ বুঝাইতে বিশেষ্যের সঙ্গে উ, ব্, বো যুক্ত হয়। স্ত্রী-পুরুষবোধক কয়েকটি শব্দ আছে, পুং বা স্ত্রী-লিঙ্গ বুঝাইতে ঐগুলি যোগ করা হয়। একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন আছে, আবার সম্বোধিতকে লইয়া এবং বাদ দিয়া দুই রকম বহুবচন আছে। আরও তিনটি বিভাগ করা হয় প্রাণী বা বস্তুবাচক শব্দের— প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ এবং পূর্বে প্রত্যক্ষ এখন অপ্রত্যক্ষ। সর্বনামের তিনটি রূপ—কর্তৃবাচক, প্রশ্নবাচক ও কর্মসম্বন্ধবাচক। প্রশ্ন বুঝাইতে পুরোবিষ্ট হয় 'ক'-'কা'-'কন'; নঞর্থে পশ্চাদ্বিষ্ট হয় -'ত'। উদাহরণ 'ঐটি কি'—'কনে', 'তোমরা দুজন কে'—'কিঞ,' 'তোমরা কে'—'কিফে'। 'আমি'—'চুআ', 'তুমি'—'মেন্', 'সে, উহা'—'অন্ হ', 'আমরা দুইজন'—'হেন্, ছই', 'তোমরা দুইজন'—'ইঞ', 'তাহারা দুইজন',—'ওন', 'আমরা'—'হে, ছিত্তই', 'তোমরা'—'ইফে', 'তাহারা'—'ওকে'। ইহাদের নঞর্থক যথাক্রমে 'চিৎ', 'মেৎ', 'নেৎ' বা 'হৎ', 'হেন্‌হৎ', 'ইঞৎ', 'ওনৎ', 'হেৎ', 'ইফেৎ', 'ওফৎ'। 'তুমি কেমন আছ'—'মেৎ চই চক', 'তোমরা দুইজন কেমন আছ'—'ইঞৎ চই চক' ইত্যাদি। প্রধান বাক্যের পরে নির্ভরশীল অপ্রধান বাক্য বসে। 'আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ' দ্র।

দ্র George Whitehead, *In the Nicobar Islands*, London, 1924.

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

নিখিলনাথ রায় (১২৭২-১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। জানকীনাথ ও বসন্তকুমারীর পুত্র নিখিলনাথের পুঁড়া গ্রামে (বসিরহাট, চব্বিশ পরগনা জেলা) জন্ম। তাঁহাদের কৌলিক উপাধি 'গুহ'। দুই বৎসর বয়সে নিখিলনাথের পিতৃবিয়োগ হয়।

নিখিলনাথ বি. এ. (১৮৯২ খ্রী) ও বি. এল. (১৮৯৭ খ্রী) পাশ করিয়া বহরমপুরের আদালতে ও কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতি করেন; পরে কাশিমবাজারের মহারাজের নায়েবী করেন (১৩১৪-২৯ বঙ্গাব্দ)।

বাল্যকাল হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতে এবং ইতিহাস পড়িতে ও আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন।

কলেজে পড়িবার সময়ে ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' রচনা আরম্ভ করেন। তখন হইতেই তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি 'মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী' পত্রিকাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে। শশধর তর্কচূড়ামণি -প্রতিষ্ঠিত 'স্বনীতি সঞ্চারিণী সভা'র তিনি উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস', 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী', 'সোনার বাংলা', 'জগৎ শেঠ', 'প্রতাপাদিত্য', 'কবিকথা', ও 'ইতিকথা' তাঁহার স্বদেশ-প্রেম, গবেষণা, প্রগাঢ় জ্ঞান ও নিষ্ঠার পরিচয় বহন করিতেছে। 'অশ্রুহার', 'রাজপুত-কুসুম' এবং 'সমাধান' তাঁহার কাব্য-উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু কবিতা ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'উপাসনা', 'প্রবাসী', 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছে। তিনখানি সাময়িকপত্রও তিনি কৃতিত্বের সহিত সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'ঐতিহাসিক চিত্র' -এর পুনঃ-প্রকাশের বন্দোবস্ত তিনি করেন (১৩১১ বঙ্গাব্দ), পরে 'শাশ্বতী' নামক একখানি মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা আরম্ভ করেন (১৩২০ বঙ্গাব্দ)। বসিরহাটের 'পল্লীবাণী'রও তিনি দুই বৎসর সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুকালে (১৮ কার্তিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৭১, কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

শিবদাস চৌধুরী

নিগমানন্দ সরস্বতী (১২৮৭-১৩৪২ বঙ্গাব্দ) বাঙালী সন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রচারক। সম্পূর্ণ নাম স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস। পূর্বাশ্রমের নাম নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য)। জন্ম মেহেরপুরের সন্নিকটে স্বীয় মাতুলালয় রাধাকান্তপুরে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণী ঝুলন-পূর্ণিমা তিথিতে। দারিয়াপুর মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা সার্ভে স্কুলে কয়েক বৎসর পড়িয়া শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতেই ওভারসিয়ারের চাকরি প্রাপ্ত হন। পত্নী সুধাংশুবালার মৃত্যুর পর তাঁহার মনে পূর্বেকার নাস্তিক্যভাব তিরোহিত হয় ও পরলোকে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মায়। প্রথমে তিনি মাদ্রাজের অ্যাডায়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটির সহিত সংযুক্ত হন এবং পরে তারাপীঠ ভৈরব বামাক্ষ্যাপার শরণ গ্রহণ করেন। অতঃপর আজমীরে সাবিত্রী পাহাড়ের সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস লইয়া নিগমানন্দ নাম গ্রহণ করেন। যোগসাধনায় তাঁহার গুরু ছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের সুমেরদাসজী এবং প্রেমের সাধনায় গুরু ছিলেন মুসৌরি পাহাড়ের গৌরীদেবী।

তন্ত্র, জ্ঞানযোগ ও প্রেমের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি বাঙালী জাতিকে আধ্যাত্মিকতার পথে উন্নীত করিবার জন্য 'ব্রহ্মচর্যসাধন', 'জ্ঞানীগুরু', 'তান্ত্রিকগুরু' 'প্রেমিকগুরু' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং সনাতন ধর্মের মুখপত্ররূপে 'আর্যদর্পণ' মাসিক পত্রিকা প্রবর্তন করেন। তিনি আসামের কোকিলামুখে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ এবং অবিভক্ত বঙ্গের ৫টি বিভাগে ৫টি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার আশ্রমগুলিতে তিনি 'ঋষি-বিদ্যালয়' এবং কুতুবপুরে হাইস্কুল ও দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তিনি আদর্শ প্রচার করিলেন 'শংকরের মত আর গৌরাঙ্গের পথ', অর্থাৎ ভক্তিপথে অদ্বৈত জ্ঞানলাভ। সনাতন ধর্ম প্রচার, সৎশিক্ষার বিস্তার, নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবা, অসাম্প্রদায়িকভাবে ধর্মের বিস্তার, সর্বধর্মসমন্বয় —এই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। শেষজীবনে অধিকাংশ সময়ে তিনি পুরীধামে অবস্থান করিতেন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ১৩ অগ্রহায়ণ কলিকাতায় তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী

নিগ্রো 'কৃষ্ণ' অর্থে লাতিন 'নিগের'-এর সম্পর্কিত স্পেনীয় 'নেগ্রো' আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জাতির সাধারণ নামরূপে গৃহীত। সাহারার দক্ষিণ হইতে ইথিওপিয়ার পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ইহাদের আদিম বাস। সাধারণভাবে ইহারা দৃঢ়কায়, শক্তিমান, প্রশস্তস্কন্ধ ক্ষীণকটি, স্থূলোষ্ঠ, স্ফীতনাসারন্ধ্র, উচ্চহনু ও ঊর্ণকেশ (উলী হেয়ার্‌ড)। ক্রমশঃ জগতের নানাস্থানে ইহাদের বিস্তার ও জাতিগত এবং ভাষাগত মিশ্রণ ঘটিয়াছে। আন্দামানের আন্দামানী, মালয়ের সেমাং ও ফিলিপ্পীনের আএটা জাতিকে অনেকে নিগ্রোরই হ্রস্বীভূত রূপ মনে করেন।

আফ্রিকার নিগ্রো ভাষার ৪টি প্রধান বিভাগ: ১. বুশ্‌ম্যান-হটেন্‌টট ২. বান্‌টুগোষ্ঠী (বান্‌টু, দুআলা, কঙ্গোলী, হেরেরো, জুলু, সোয়াহিলি, রুয়াণ্ডা প্রভৃতি) ৩. সুদানীগোষ্ঠী (ভুলে, মানফু, ঙ্গোঙ্কে, কানুরী, নুবীয়-শিল্লুক-কোয়াফি, বান্‌টু কল্পভাষা ও হাউস্‌সা) ৪. হামীয় (হ্যামিটিক) -গোষ্ঠী (যেমন সাহারার দক্ষিণে 'তুআরেগ')। প্রথম গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নানা শীৎকারধ্বনি

(দন্ত্য, মূর্ধন্য, পার্শ্বিক, তালব্য, ওষ্ঠ্য), প্রাণী-অপ্রাণী ভেদ, বহুপ্রকারের বচনরূপ। দ্বিতীয় গোষ্ঠী প্রধানতঃ 'পুরোবিষ্ট-সংশ্লেষক' (প্রেফিক্স্-অ্যাগ্লুটিনেটিংগ) ভাষা হইলেও জুলু ও দক্ষিণ-পূর্ব ভাষায় প্রথম গোষ্ঠীর শীৎকারধ্বনি গৃহীত। তৃতীয় গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য এক-একটি একাক্ষর শব্দ (অনেক সময়ে ধ্বন্যাত্মক) শুধু পরপর বিন্যাসের দ্বারা অর্থ প্রকাশ। চতুর্থ গোষ্ঠী আবার বিপরীত। ইহাদের উপসর্গ-প্রত্যয়যোগ, ক্রিয়ার সম্পন্ন-অসম্পন্ন বিভাগ, অপ্রাকৃতিক লিঙ্গবিভেদ, বহুপ্রকারের বহুবচন এবং বচন-লিঙ্গে মেরুবিনিময় সূত্র (ল অফ পোলারিটি) বিশেষত্ব।

দ্র. Alice Werner, *The Language Families of Africa*, London, 1925.

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

নিঘণ্টু অর্থ শব্দসংগ্রহ। 'ধন্বন্তরিনিঘণ্টু' ও 'রাজনিঘণ্টু' দুইখানি ভেষজকোশ। সাধারণতঃ, নিঘণ্টু শব্দের অর্থ বৈদিক শব্দের সংগ্রহ, যাহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নিঘণ্টুর ব্যাখ্যা বা টীকার নাম 'নিরুক্ত'। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে বহু নিঘণ্টু সংকলিত হইয়াছিল এবং নিরুক্ত-কারগণ তদুপরি টীকাভাষ্যাদি রচনা করিয়াছিলেন। কালক্রমে এগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; একমাত্র যে নিঘণ্টুর উপর যাস্ক তাঁহার 'নিরুক্ত' রচনা করেন তাহাই পাওয়া গিয়াছে। এই নিঘণ্টুটি যাস্ক মুনিরই সংকলন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন (যথা সায়নাচার্য, মধুসূদন সরস্বতী, বেঙ্কট মাধব এবং কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত); অপরপক্ষে 'নিরুক্ত'-এর টীকাকার দুর্গাচার্য, স্কন্দস্বামী তথা রথ, ভিণ্টার্নিৎস (Winternitz) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন নিঘণ্টুটি পূর্বতন কোনও বেদবিদের রচিত। 'নিঘণ্টু' ৫ অধ্যায়ে বিভক্ত: প্রথম তিন অধ্যায়ে ১৫টি ক্রিয়াসহ গো প্রভৃতি ৬৯ শব্দের সর্বশুদ্ধ ২২৩৪টি প্রতিশব্দ (সিনোনিম) আছে ও এই তিন অধ্যায়ের নাম 'নৈঘণ্টুক'-কাণ্ড। চতুর্থ অধ্যায়ের নাম 'নৈগম'কাণ্ড; এই কাণ্ডে প্রধানতঃ অনেকার্থক কতকগুলি শব্দের সংগ্রহ করা হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায় 'দৈবত'কাণ্ড, ইহা বৈদিক দেবতাদের নামের সংগ্রহ। বেদের 'দেবতা' বৈদিক মন্ত্রের বিষয়বস্তু; সেজন্য অশ্ব, মণ্ডূক, ধনুঃ, উলূখল, বৃষভ, মুসল, বর্হিঃ, বনস্পতি ইহারাও 'দেবতা'। সম্ভবতঃ আদিতে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় নিঘণ্টুর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নিঘণ্টুর টীকাকারদের মধ্যে দেবযজ্বা প্রধান।

শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নিজামবংশ নিজাম-উল-মুল্‌ক আসফ জা হায়দরাবাদে নিজাম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ('চীন কিলীচ খাঁ' দ্র)। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় পুত্র নাসিরজঙ্গ নিজাম হন। কিন্তু ইহাতে নাসিরজঙ্গের সহিত তাঁহার ভাগিনেয় মুজফ্‌ফরজঙ্গের বিরোধ উপস্থিত হইলে মুজফ্‌ফর ফরাসীদের এবং নাসিরজঙ্গ ইংরেজগণের সাহায্য লাভ করেন। নাসির ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে মুজফ্‌ফর নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করেন, কিন্তু পরবর্তী বৎসর তিনিও আততায়ীর হস্তে নিহত হন। তৎপরে আসফ জার তৃতীয় পুত্র সলাবৎজঙ্গ নিজাম হইয়া (১৭৫১ খ্রী) ১০ বৎসর ঐ পদে ছিলেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা নিজাম আলী তাঁহাকে পদচ্যুত ও বন্দী করিয়া নিজামপদ অধিকার করেন।

মহীশূর রাজ্য ও মারাঠাদের ভয়ে নিজাম আলী সাধারণতঃ ইংরেজদের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতেন এবং বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য ভারতের বড়লাট ওয়েলেস্‌লির আমন্ত্রণে ইংরেজ সরকারের সহিত অধীনতা-মূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হন (১৭৯৮ খ্রী)। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে অপর একটি সন্ধিও হয়। ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম আলীর মৃত্যুর পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সিকন্দর নিজাম হন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর জার মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির-উদ্-দৌলা নিজাম হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে পুত্র আফজল-উদ্-দৌলা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং শেষোক্ত বৎসর হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আফজল-উদ্-দৌলার পুত্র মহবুব আলী নিজামপদ অলংকৃত করেন।

বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ সালারজঙ্গ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় ৩০ বৎসর হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রীরূপে রাজ্যের নানাবিধ মঙ্গলসাধনে এবং ইহাকে বিপন্মুক্ত রাখিতে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। নিজামের বেতনভুক্ আরবীয় সেনাবাহিনীকে নিয়মানুবর্তিতার বশবর্তী করিয়া স্বার্থপর অর্থলোলুপ শক্তিশালী ব্যক্তিদের এবং দস্যুদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন। হায়দরাবাদে বিচারালয় স্থাপন, সেচের উন্নতি সাধন এবং বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি অনেক জনকল্যাণকর কার্য তিনি করিয়াছেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মহাবিদ্রোহের সময়ে তিনি ইংরেজ সরকারের পক্ষে ছিলেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মহবুব আলীর পুত্র ওসমান আলী নিজাম হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায়

হায়দরাবাদে ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার রাজ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতালাভ আসন্ন দেখিয়া তিনি হায়দরাবাদে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় মজ্‌লিস-ই-ইত্তিহাদ-উল্‌-মুসলমান নামক প্রভাবশালী সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। ইহার সভাপতি কাশিম রেজভির নেতৃত্বে ইহার সেনাবাহিনী রাজাকরগণ হিন্দুদের উপরে নানাবিধ অত্যাচার করিতে থাকে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারত উপমহাদেশ ভারত ও পাকিস্তান এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইলে নিজাম হায়দরাবাদ রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিতে রাজী হইলেন না। ভারতের বিরুদ্ধে নিজামের নানা প্রচেষ্টা কিছুতেই বন্ধ করিতে না পারিয়া ভারত সরকার ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। ৪দিন পরে নিজাম আত্মসমর্পণ করেন এবং রাজাকরবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এইভাবে হায়দরাবাদ ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইল এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি নিজাম এই রাজ্যের রাজপ্রমুখ হইলেন।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর এই প্রাচীন রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটাইয়া ইহা অন্ধ্র, মহীশূর এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি ৮১ বৎসর বয়সে ওস্‌মান আলী পরলোক গমন করিলে তাঁহার পৌত্র মুখরাম জা তাঁহার শূন্য স্থানে আসীন হন।

দ্র H. G. Briggs, *The Nizam, His History and Relations with the British Government*, vol. I, London, 1861 ; K. M. Munshi, *The End of an Era : Hyderabad Memories*, Bombay, 1957.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ। ইহার শেষ শিষ্য বৃন্দাবনদাস 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-এ লিখিয়াছেন যে, ১২ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া ইনি ২০ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণপূর্বক নবদ্বীপে আগমন করেন। সেই সময়ে চৈতন্যদেব গয়া হইতে অপূর্ব ভাবসম্পদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া কীর্তনপ্রচারে উদ্যোগী হন। একবৎসর কীর্তন করিয়া তিনি ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ৮-৯ বৎসরের বড়। শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে; নিত্যানন্দের জন্ম ১৪৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হওয়া উচিত। 'অদ্বৈতবিলাস'-এ নিত্যানন্দের জন্ম ১৩৯৫ শক (১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিত আছে ; তাহা ঠিক নহে।

নিত্যানন্দের জন্ম বীরভূম জেলার একচাকা নামক গ্রামে মাঘী শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে। তাঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। ইনি খুব সম্ভব মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া প্রথমে গোপনে নন্দন আচার্যের গৃহে এবং পরে শ্রীবাসের গৃহে থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা ঘোষণা করিয়া মহাভিষেক করার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। জগাই ও মাধাই নামক দুইজন মদ্যপ কোতোয়ালকে উদ্ধার করিবার প্রধান কৃতিত্ব ছিল নিত্যানন্দের।

নিত্যানন্দ না থাকিলে সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব একা বৃন্দাবনে চলিয়া যাইতেন ; পুরীতে থাকিয়া লক্ষ লক্ষ ভক্তকে অনুপ্রেরণা দেওয়া তাহা হইলে সম্ভব হইত না। নিত্যানন্দই কোনও প্রকারে তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে আনয়ন করেন। সেখানে শচীমাতার ও অন্যান্য ভক্তদের আগ্রহে শ্রীচৈতন্য পুরীতে থাকিতে সম্মত হন। নিত্যানন্দও তাঁহার সহিত পুরীতে গিয়াছিলেন এবং পর পর কয়েক বৎসর ধরিয়া তথায় যাইতেন। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁহাকে গৌড় দেশেই ধর্মপ্রচারের জন্য অনুরোধ করিলেন। সেইজন্য নিত্যানন্দের প্রেমধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হইল বরাহনগর-আড়িয়াদহ হইতে আরম্ভ করিয়া নবদ্বীপ পর্যন্ত গঙ্গার উভয় তীরবর্তী গ্রামগুলি। অভিরাম, সুন্দরানন্দ, মীনকেতন রামদাস, গৌরীদাস প্রভৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গ সহচরবৃন্দ সখ্যরসের উপাসক ছিলেন। সপ্তগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বণিক উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দের চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

নিত্যানন্দ ছিলেন ভাবের মানুষ। তাঁহার প্রিয় বেশ ছিল মল্লবেশ। তিনি বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া, কদম্ব, চম্পক প্রভৃতির মাল্যধারণ করিয়া হাতে দণ্ড এবং পায়ে নূপুর দিয়া নাচিয়া গাহিয়া হরিনাম মহামন্ত্র বিলাইতেন। কখনও কখনও তিনি রত্নখচিত স্বর্ণ অলংকার এবং মস্তকে বিবিধ পট্টবাস ধারণ করিতেন। গোবিন্দ, মাধব ও বাসুঘোষ তিনভাই কীর্তন করিতেন আর নিত্যানন্দ নাচিতেন। অভিনয়েও তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ যেদিন রুক্মিণী-পরিণয় অভিনয় করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ সেদিন বড়াই সাজিয়াছিলেন। আড়িয়াদহের গদাধরদাসের গৃহে নিত্যানন্দ 'দানখণ্ড-নৃত্য প্রভু করে নিজ রঙ্গে'।

নিত্যানন্দ তাঁহার সহচর গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী

ও সূর্যদাস সারখেলের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করেন। জাহ্নবার কোনও সন্তান হয় নাই। বসুধার গর্ভে বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র ও গঙ্গাদেবীর উদ্ভব হয়। কেহ কেহ বলেন, বীরভদ্রকে বসুধাদেবী দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দের স্বাধীন আচার-ব্যবহার একশ্রেণীর ভক্তেরা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু নরোত্তমঠাকুর মহাশয় প্রচার করেন—'হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়'। শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত নিত্যানন্দের বিগ্রহ পূজা করিবার রীতি গৌরীদাস পণ্ডিতের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে গৌরচন্দ্রিকার সহিত নিত্যানন্দ-চন্দ্রিকাও কীর্তন করাইবার প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা এখন প্রচলিত নাই।

দ্র নরহরি চক্রবর্তী, ভক্তিরত্নাকর, বহরমপুর, ৪০২ চৈতন্যাব্দ; বৃন্দাবনদাস, শ্রীচৈতন্যভাগবত, কলিকাতা, ৪১০ চৈতন্যাব্দ।

বিমানবিহারী মজুমদার

নিধুবাবু, রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯ খ্রী) বাংলা দেশের টপ্পাসংগীতের প্রবর্তক বলিয়া খ্যাত। বর্গির হাঙ্গামার সময়ে ত্রিবেণীর নিকট চাঁপ্তা গ্রামে মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। হাঙ্গামার পর ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পিতা হরিনারায়ণ কবিরাজের সহিত কলিকাতার কুমারটুলিতে পৈত্রিক নিবাসে ফিরিয়া আসেন। এইখানেই তিনি বিদ্যাভ্যাস করেন। এই সময়ে জনৈক পাদ্রির নিকটে তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন।

নিধুবাবু কোম্পানির অধীনে চাকরি লইয়া ছিরণ-ছাপরায় যান (১৭৭৬ খ্রী)। সেখানে এক মুসলমান গায়কের নিকট হিন্দুস্থানী টপ্পা শিক্ষা করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া বাংলা টপ্পা গান রচনায় এবং সংগীত শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি সংগীতসমাজ স্থাপন করেন। কুলুইচন্দ্র সেন প্রবর্তিত আখড়াই গান সংশোধন করিয়া এখানে তিনি নূতন পদ্ধতিতে সংগীত শিখাইতেন।

বাংলার কাব্য ও সংগীতের ইতিহাসে নিধুবাবুর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি এদেশের প্রথম ইংরেজী-জানা কবি। তিনিই প্রথম স্বাদেশিক সংগীতের রচয়িতা। তাঁহার রচিত টপ্পাতেই আধুনিক বাংলা কাব্যের আত্মকেন্দ্রিক লৌকিক প্রণয়ের সুর প্রথম ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার কোনও কোনও টপ্পায় সংস্কৃত 'অমরুশতক'-এর ছায়া পরিলক্ষিত হয়। 'গীতরত্ন' নামক সংকলন গ্রন্থটি নিধুবাবুর জীবদ্দশায় ১২৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'টপ্পা' দ্র।

দ্র সুশীলকুমার দে, নানা নিবন্ধ, কলিকাতা, ১৯৫৪; ভবতোষ দত্ত -সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী, কলিকাতা, ১৯৫৮; Saroda Prasad Dey, 'Bengali Men of Letters: II. Ram Nidhi Gupta', *The Bengal Academy of Literature*, vol. I, No. 6, 1894.

ভবতোষ দত্ত

নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১ খ্রী) ভগিনী নিবেদিতার পূর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল্। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর আয়ার্ল্যাণ্ডের ডানগ্যানন শহরে মার্গারেট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্যামুয়েল ছিলেন ইংল্যাণ্ডে ওল্ড্‌হ্যামের ধর্মযাজক এবং জনসাধারণের নেতা। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালিফ্যাক্স স্কুলে পাঠ সমাপ্ত করিয়া মার্গারেট বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে থাকেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস ও রাশিয়ার বিপ্লব-কাহিনী অধ্যয়ন করিয়া এবং ক্রপট্‌কিন প্রভৃতি লাঞ্ছিত ও নির্বাসিত রুশনেতাদের সঙ্গে পরিচিত হইয়া তিনি বিপ্লবী চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হন। বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় বালক-বালিকাদের উদ্‌বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি উইম্ব্‌লডনে নিজের অধ্যক্ষতায় 'রাস্কিন স্কুল' নামে একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করেন (১৮৯২ খ্রী)।

ধর্ম ও গতানুগতিক অধ্যাপন-জীবন সম্বন্ধে নানা সংশয় যখন মার্গারেটের হৃদয়কে পীড়িত করিতেছিল সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত-প্রচারকার্যে ইংল্যাণ্ডে আসেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে একটি ঘরোয়া আলোচনাচক্রে বিবেকানন্দকে মার্গারেট প্রথম দেখেন। বিবেকানন্দের বাণী তাঁহার হৃদয়ে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। বিবেকানন্দের আহ্বানে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মার্গারেট ভারতবর্ষে আসেন এবং মার্চ মাসে সারদাদেবীর দর্শন লাভ করেন। ২৫ মার্চ তারিখে বিবেকানন্দ তাঁহাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহার নাম দেন 'নিবেদিতা'। ঐ বৎসর ও পরের বৎসর কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে; রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সেবকগণের সহিত নিবেদিতা প্লেগাক্রান্ত জনগণের সেবাকার্যে নিজেকে নিযুক্ত করেন। পরে তিনি বিবেকানন্দের সহিত আলমোড়ায় গমন করেন। এই সময়কার অভিজ্ঞতা তিনি তাঁহার 'নোট্স অফ সাম

ওয়ান্ডারিংগ্স উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের পরিকল্পনা অনুসারে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর কালীপূজার দিন সারদা-দেবীর আশীর্বাদ লইয়া ১৬ বোসপাড়া লেন, কলিকাতায় নিবেদিতা তাঁহার বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বর্তমানে ইহা 'রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে অভিহিত।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই তারিখে বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরই নিবেদিতা তাঁহার কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তিকেই তাঁহার জীবনের প্রথম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিলেন। চিত্রশিল্প, সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যার মাধ্যমেই ভারতের অখণ্ডত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ হইতে পারে, ইহাই ছিল নিবেদিতার দৃঢ় প্রতীতি। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতীয় কলাবিদ্যার মূলে আধ্যাত্মিকতার বীজ নিহিত আছে। সৌন্দর্যের বিশুদ্ধতা ও আধ্যাত্মিকতাই নিবেদিতাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পীদের মনে অসামান্য উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। তিনি সতীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'ডন সোসাইটি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী বাংলার যুবকদের চিত্তে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম জাগাইতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বরোদায় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে নিবেদিতার দেখা হয়। বাংলার বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবীদলকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য অরবিন্দ যে সমিতি গঠন করেন, সেই সমিতির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রমথ মিত্র এবং নিবেদিতা। বাংলার বহু বিপ্লবী সন্তান নিবেদিতার নিকট হইতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকিবার জন্য নিবেদিতাকে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হয়, কিন্তু তিনি সর্বদাই আত্মপরিচয় দিবার সময়ে লিখিতেন—'সিস্টার নিবেদিতা অফ রামকৃষ্ণ অ্যাণ্ড বিবেকানন্দ'।

নিবেদিতা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন। বারাণসীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯০৫ খ্রী) তিনি বিলাতি জিনিস বর্জনের জন্য সমাগত সদস্যদের সামনে যুক্তিপূর্ণ, উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিয়াছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থী উভয় দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। নিবেদিতার গৃহপ্রাঙ্গণ তৎকালীন বাংলার মনীষীগণের পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অখণ্ডতার উপর নিবেদিতা খুব বেশি জোর দিয়াছিলেন। এই ভৌগোলিক ঐক্যকে তিনি দুইদিক হইতে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন—একদিকে ভারতবর্ষ জাতির জননী, অন্যদিকে ভারতবর্ষই জাতির অনন্তশক্তির প্রকাশ। 'দি ওয়েব অফ ইণ্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখিয়াছেন: 'সমগ্র এশিয়াখণ্ডে অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এক অখণ্ড সভ্যতা বিরাজমান। এশিয়াখণ্ডের এই বিশেষ সভ্যতার উদ্ভবকেন্দ্র হইতেছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ হইতেই প্রাচীন এশিয়ার সব দেশে ধর্ম, সভ্যতা ও দার্শনিক চিন্তাধারা মরু, গিরি, কান্তার, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য রহিয়াছে, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের তাহাই মূল ভিত্তি।' নিবেদিতা ভারতের গ্রাম ও নগরকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া মহাভারত বা সমৃদ্ধ ভারতের গঠনে যুবকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করিতেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনাকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তিলাভই ছিল নিবেদিতার জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি তাঁহার মতে আত্মিক মুক্তির উপায়মাত্র, ইহা উপেয় নহে। বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত অদ্বৈতবাদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ অনুরাগ ছিল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের সূচনাতেই বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী অবলা বসুর আমন্ত্রণে বিশ্রামলাভের জন্য নিবেদিতা দার্জিলিং-এ 'রায় ভিলা'-য় বাস করেন। তিনি কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। ১৩ অক্টোবর তারিখে তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

নিবেদিতার লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'দি ওয়েব অফ ইণ্ডিয়ান লাইফ', 'কালী, দি মাদার', 'ক্র্যাড্‌ল টেল্‌স অফ হিন্দুইজ্‌ম', 'রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড ধর্ম', 'দি মাস্টার অ্যাজ্ আই স হিম,' 'নোট্‌স অফ সাম ওয়ান্ডারিংগ্স উইথ স্বামী বিবেকানন্দ', 'সিভিক অ্যাণ্ড ন্যাশন্যাল আই-ডিয়্যাল্‌স,' 'শিব অ্যাণ্ড বুদ্ধ', 'হিন্ট্‌স অন ন্যাশন্যাল এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া,' 'অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজ্‌ম'।

দ্র লিজেল রেমঁ, নিবেদিতা, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; স্বামী তেজসানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, কলিকাতা, ১৩৭০

বঙ্গাব্দ ; মণি বাগচি, নিবেদিতা, কলিকাতা, ১৯৫৫ ; প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ভগিনী নিবেদিতা, কলিকাতা, ১৯৫৯ ; গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী, ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ, কলিকাতা, ১৯৬০ ; B. Majumdar, *Militant Nationalism in India*, Calcutta, 1966 ; Prabrajika Atmaprana, *Sister Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda*, Calcutta. 1967 ; *Complete Works of Sister Nivedita*, vols. I-IV, Calcutta, 1968.

অমিয়কুমার মজুমদার

নিভেলী, নেভেলি মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্গত দক্ষিণ আরকট জেলার শহর। শহরটির অবস্থান ৭৯°২৬´ পূর্ব ও ১১°৩৬´ উত্তর। লোকসংখ্যা ১০২৯৬ ; তন্মধ্যে ৬১৩৮ জন পুরুষ ও ৪১৫৮ জন স্ত্রীলোক। এই অঞ্চলে যথেষ্ট লিগ্‌নাইট কয়লার স্তর থাকায় এখানে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নেভেলি লিগ্‌নাইট কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে ('কয়লা' দ্র)। সোভিয়েট সরকারের সহযোগিতায় একটি তাপ-বিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিম জার্মানী ও ইটালীর দুইটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এখানে একটি সার-কারখানাও নির্মিত হইতেছে।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

নিম মেহগনি গোত্রের (ফ্যামিলি-মেলিয়াসিঈ, Meliaceae) অন্তর্ভুক্ত বহুবর্ষজীবী ১০-১২ মিটার দীর্ঘ দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম আজাদিরাখ্‌তা ইন্দিকা (*Azadirachta indica*)। ভারতের সর্বত্রই নিম গাছ দেখা যায়। ইহার বহুশাখাযুক্ত কাণ্ড মোটামুটি ঋজু ও সরল। অচূড়পক্ষল (প্যারিপিনেট) যৌগ পত্র যুগ্মসংখ্যক বহু পত্রক দিয়া গঠিত। পত্র তীব্র তিক্ত-স্বাদবিশিষ্ট। নবীন পত্র রক্তাভবর্ণ, পুরাতন পত্র ঘোর সবুজ। বিশেষতঃ কচি নিমপাতা তিক্ত ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। শীতশেষে ও বসন্তে দীর্ঘ পুষ্পদণ্ডের উপর বহু ক্ষুদ্র সুগন্ধি ও শুভ্রবর্ণ ফুল ফোটে। বর্ষায় গাছে ফল ধরে। নিমফল মিষ্টস্বাদ। নিমের বাকল, পাতা, ফুল ও ফলের ভেষজগুণ আছে। বাকল বলকারক, বাকলের নির্যাস সবিরাম জ্বরে হিতকর, পাতার রস কৃমিনাশক ও জ্বর-নিবারক, পিষ্ট পাতার প্রলেপ স্ফোটক ও ব্রণে ফলপ্রদ, ফল কৃমি ও কুষ্ঠে হিতকর, ফুল মূত্রবর্ধক এবং পাতা ইত্যাদি হইতে নিষ্কাশিত নিমতৈল চর্মরোগ, কুষ্ঠ, কৃমি, বাত, ক্ষত প্রভৃতিতে সুফলপ্রসূ। নিমপাতার কীটঘ্ন গুণ আছে। হাম ও বসন্ত রোগের প্রতিষেধকরূপেও নিমপাতার প্রসিদ্ধি আছে। নিমতৈল সাবানশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫০।

বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

নিমাই চৈতন্যদেব দ্র

নিম্বার্ক নিম্বার্কের জীবনচরিত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য প্রায় কিছুই জানা নাই। তাঁহার যথার্থ আবির্ভাবকালও অজ্ঞাত। তবে তিনি যে শংকর-রামানুজের পরবর্তী ও খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, সাধারণতঃ এই মতবাদই গ্রহণ করা হয়।

কথিত আছে যে, নিম্বার্ক বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের অবতার। তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম ; পিতার নাম অরুণ এবং মাতার নাম জয়ন্তী। মতভেদে, পিতার নাম জগন্নাথ ও মাতার নাম সরস্বতী। নিম্বার্কের অপর নাম নিয়মানন্দ। তাঁহার 'নিম্বার্ক' (নিম্ব+অর্ক) নামটি সম্বন্ধে বহু আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। নিম্বার্ক মহর্ষি নারদের শিষ্য বলিয়া খ্যাত। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অপর নাম 'সনকাদি-সম্প্রদায়' অথবা 'হংস-সম্প্রদায়'।

নিম্বার্কের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা তাঁহার 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভ' নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি 'দশশ্লোকী', 'সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ' প্রমুখ কতিপয় গ্রন্থও রচনা করেন।

অন্যান্য বৈদান্তিকগণের ন্যায়, নিম্বার্ক-বেদান্তেও ব্রহ্মই মূলীভূত তত্ত্ব। তিনি ব্রহ্মকে 'পরমাত্মা', 'পুরুষোত্তম', 'রমাকান্ত', 'কৃষ্ণ', 'হরি', 'কেশব', 'মাধব' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। নিম্বার্কের মতে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এবং রমা ও রাধা অভিন্ন ও একার্থক ('রমাকান্ত-পুরুষোত্তম' ও 'রাধাবল্লভ-কৃষ্ণ' একই ব্রহ্মের দুইটি নাম মাত্র)।

এস্থলে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রামানুজের ন্যায় নিম্বার্কও দর্শন ও ধর্মকে সংমিশ্রিত করিয়া ফেলেন নাই। সেইজন্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে যখন তিনি দর্শনের দিক হইতে বিষয়টিকে আলোচনা করিয়াছেন, তখন তিনি 'ব্রহ্ম'কে কেবলমাত্র সাধারণ অর্থে 'পরমাত্মা' বা 'পুরুষোত্তম' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ধর্মতত্ত্বে এই 'ব্রহ্ম'-ই হইয়া দাঁড়াইয়াছেন 'বিষ্ণু', 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি।

অন্যান্য একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায় নিম্বার্কও

ত্রিতত্ত্ববাদী। তাঁহার মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, চিৎ বা জীব এবং অচিৎ, এই তিনটি তত্ত্ব।

নিম্বার্কের ব্রহ্মবাদ বহুলাংশে রামানুজীয় ব্রহ্মবাদের সমতুল। নিম্বার্কের মতেও ব্রহ্মই সর্বশক্তিমান, অনন্তচিন্ত্য শক্তিমান; এই সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র স্রষ্টা, পালক ও ধ্বংসকর্তা। তাঁহারই সুশাসনে ও পরিচালনায় পৃথিবীর সকল কিছুই সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সেইজন্যই তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' (কঠোপনিষদ্, ৬-২)—উদ্যত বজ্রের ন্যায় অতি ভয়জনক।

কিন্তু এরূপ সর্বশক্তিমত্তা ও ভীষণত্বই ব্রহ্মের একমাত্র লক্ষণ নয়। তিনি একাধারে ভীষণ ও মধুর। এরূপে, তিনি অশেষ সৌন্দর্য-মাধুর্য-কোমলতার আকর, আনন্দ ও রসস্বরূপ। তাঁহারই পরমানন্দের মূর্ত-বিকাশ এই জগৎ। তিনি ভক্তবৎসল ও মোক্ষদাতা।

ব্রহ্মের ভীষণ ও মধুর এই উভয় স্বরূপকেই সকল একেশ্বরবাদী বেদান্ত-সম্প্রদায়ই সাধারণভাবে স্বীকার করিয়া নিলেও ইহাদের মধ্যে কোনটি প্রধানতর, সেই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। এইরূপে, রামানুজ ও মধ্বের মতবাদে প্রথমটি এবং নিম্বার্ক ও বল্লভের মতবাদে দ্বিতীয়টির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, সগুণ, অর্থাৎ অনন্ত-কল্যাণগুণ-বিমণ্ডিত ও সকল হেয়গুণ-বিবর্জিত। তিনি নিষ্ক্রিয় নহেন, সক্রিয়। জীবের কর্মানুসারে সৃষ্টি ও জীবের সাধনানুসারে মুক্তি—এই হইল তাঁহার প্রধান কার্য।

তিনি নির্বিশেষও নহেন, সবিশেষ। চিৎ ও অচিৎ তাঁহার স্বগতভেদ, যদিও তাঁহার ক্ষেত্রে যে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ সম্ভবপরই নয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

রামানুজের ন্যায় নিম্বার্কের মতেও চিৎ বা জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অণু ও বহু। এই সকল জ্ঞাতৃত্বাদি গুণ জীবের প্রকৃত ও শাশ্বত গুণ, 'ঔপাধিক' ও মিথ্যা গুণ নয়।

নিম্বার্কের মতে অচিৎ তিন প্রকারের—প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ও কাল। 'প্রাকৃত' অর্থ প্রকৃতিজাত এই জগৎ। এই প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ ও ব্রহ্মের অচিৎ শক্তি।

'অপ্রাকৃত' রামানুজের 'শুদ্ধতত্ত্বে'র অনুরূপ। ইহা ব্রহ্ম ও মুক্তাত্মগণের অপার্থিব দেহ-ভূষণাদি এবং ব্রহ্মলোক ও তাহার দ্রব্যাদির উপাদান কারণ।

'কাল' নিত্য ও বিভু এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই কালেই সংঘটিত হয়।

সকল একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকের ন্যায় নিম্বার্কও পরিণামবাদী। অর্থাৎ তাঁহারও মতে, জীব-জগৎসংবলিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মেরই পরিণাম, বিকাশ বা কার্য। সেইজন্য ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্ম সম-সত্য ও সম-নিত্য এবং জীব তাঁহার চিৎ-শক্তির ও জগৎ তাঁহার অচিৎ-শক্তিরই বিকাশ মাত্র।

ব্রহ্ম-জীব-জগতের সম্বন্ধ বিষয়েই বেদান্ত-দর্শনে নিম্বার্কের মৌলিক দান। নিম্বার্কের মতে, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ স্বরূপতঃ ও গুণতঃ ভিন্নাভিন্ন; ব্রহ্ম কারণ, জীব-জগৎ কার্য; ব্রহ্ম শক্তিমান, জীব-জগৎ শক্তি; ব্রহ্ম অংশী, জীব-জগৎ অংশ; এবং কারণ-কার্য, শক্তিমান-শক্তি, অংশী-অংশ স্বরূপতঃ ও গুণতঃ ভিন্নাভিন্ন। কারণ ব্রহ্ম ও কার্য জীব-জগতের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই সমভাবে সত্য, নিত্য, স্বাভাবিক ও অবিরুদ্ধ এবং তাহাদের সহাবস্থিতিও অসমঞ্জস বা বিরোধদোষদুষ্ট নহে। সেইজন্য নিম্বার্কের মতবাদের নাম 'স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ'।

নিম্বার্কের মতে মোক্ষের দুইটি অবিচ্ছেদ্য অথবা সমার্থক অঙ্গ। আত্মস্বরূপোপলব্ধি ও ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধি। বস্তুতঃ আত্মস্বরূপোপলব্ধিই ব্রহ্মোপলব্ধি। মোক্ষকালে, জীবের স্বরূপ ও গুণের প্রকৃষ্টতম প্রকাশ হইলেই জীব ব্রহ্মসদৃশ হয়—ইহারই নাম 'ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধি' অথবা 'তদ্‌ভাবাপত্তিঃ'।

'ব্রহ্মসদৃশ' শব্দটির অর্থ এই যে, মুক্ত জীব অন্যান্য সকল বিষয়েই ব্রহ্মের সমতুল হন, কেবল দুইটি বিষয়ে ভিন্ন থাকেন—ব্রহ্ম বিভু ও মুক্তজীব অণু, ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা, মুক্তজীবের সেই শক্তি নাই। এইরূপে মুক্তজীবও ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, ব্রহ্মাধীন ও ব্রহ্মসেবক।

নিম্বার্ক বিদেহ মুক্তিবাদী, অর্থাৎ তাঁহার মতে, দেহ-ত্যাগের পরেই মোক্ষ সম্ভবপর, পূর্বে নয়। মোক্ষ কেবল দুঃখাভাবমাত্রই নয়, পরিপূর্ণ আনন্দঘন অবস্থা।

অন্যান্য বৈদান্তিকগণের ন্যায় নিম্বার্কও নিষ্কাম কর্মবাদী। তাঁহার মতেও, নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, তাহার পরেই জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হইতে পারে। এইভাবে কর্ম মোক্ষের গৌণ অথবা পরম্পরাগত উপায়, মুখ্য বা সাক্ষাৎ নহে।

জ্ঞানও মোক্ষের অন্যতম সাধন। এরূপে, কর্মযোগ অথবা নিষ্কাম-কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞান অথবা সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়; এবং তাহার দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া মোক্ষলাভ হয়।

জ্ঞানের ন্যায় ধ্যানও মোক্ষের সাক্ষাৎ উপায়। জ্ঞান হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে ধ্যানের উদয় হয়। সুতরাং, ভক্তি ও ধ্যান উভয়ই জ্ঞানমূলক।

ব্রহ্ম অথবা পরমেশ্বরের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের নাম 'প্রপত্তি'। যাঁহারা নিষ্কামকর্ম-জ্ঞান-ধ্যান-ভক্তিরূপ সুকঠিন সাধনাবলম্বনে অপারগ 'প্রপত্তি' তাঁহাদেরই জন্য বিশেষ উপযোগী। মাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল শিশুর কল্যাণের জন্য যেরূপ মাতা নিজেই সকল কিছুই সানন্দে করেন, সেরূপ পরম-করুণাময়, ভক্তবৎসল পরমেশ্বরও শরণাগত জনকে মোক্ষের পথে লইয়া যান।

আত্মসমর্পণ দুই প্রকারের হইতে পারে— ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও গুরুতে আত্মসমর্পণ। প্রথমটির নাম 'প্রপত্তি'; দ্বিতীয়টির নাম 'গুরূপসত্তি'। যাঁহারা জ্ঞান-ধ্যানের কঠিনতর পন্থানুসরণ করিতে পারেন না, তাঁহারা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন; যাঁহারা তাহা পর্যন্ত পারেন না তাঁহারা গুরুতেই আত্মসমর্পণ করেন এবং গুরুই পরিশেষে তাঁহাদের ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত করেন— যেরূপ যজ্ঞহবিঃ প্রথমে দর্বী বা 'হাতা'য় নিক্ষিপ্ত হয়, পরে তাহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়।

একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকগণ সকলেই ঈশ্বর-কৃপাবাদী। নিম্বার্কের মতেও ভগবদনুগ্রহই মোক্ষের চরম ও আশু সাধক; অর্থাৎ যে-কোনও মুমুক্ষু নিজের সামর্থ্যানুসারে যে-কোনও সাধনাবলম্বনে অতন্দ্রিত ও অকপটভাবে যথাসাধ্য মোক্ষলাভে প্রচেষ্টা করিলে ঈশ্বর-কৃপা লাভ করিয়া ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' ও নিম্বার্কের 'স্বাভাবিক-দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' বহুলাংশে এক। দর্শনের দিক হইতে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ভেদ ব্রহ্ম-জীব-জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে। উভয়েই অবশ্য ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে 'ভেদ' ও 'অভেদ' উভয়ই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটির আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। রামানুজের মতে, শেষ পর্যন্ত 'অভেদ'ই যেন উচ্চস্তরীয় এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের নামটিতে কেবল 'অদ্বৈত' শব্দটিই রহিয়াছে, 'দ্বৈত' শব্দটি নহে। অপরপক্ষে নিম্বার্কের মতে 'ভেদ' ও 'অভেদ' সমস্তরীয় এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের নামটিতে 'দ্বৈত' ও 'অদ্বৈত' উভয় শব্দই রহিয়াছে।

পুনরায়, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের সম্বন্ধ আলোচনাকালে, রামানুজ শরীরী অথবা আত্মা ও শরীর অথবা দেহ, এবং বিশেষ্য অথবা দ্রব্য ও বিশেষণ অথবা গুণের উপমা অথবা উদাহরণ দিয়াছেন, নিম্বার্ক নহে। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মতে, জীব-জগৎ ব্রহ্মের 'বিশেষণ' হইতে পারে না।

সর্বক্ষেত্রেই নিম্বার্ক সমন্বয়বাদী। এরূপে দর্শনের দিক হইতে তিনি 'ভেদ' ও 'অভেদ', ধর্মের দিক হইতে 'বিষ্ণু' ও 'কৃষ্ণ', নীতির দিক হইতে আন্তর পবিত্রতা ও বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান, সাধনের দিক হইতে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে অতি সুন্দরভাবে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীনিবাসাচার্য নিম্বার্কের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন ও তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের উপর 'বেদান্ত-কৌস্তুভ' নামক একটি সুললিত ভাষ্য রচনা করেন।

পুরুষোত্তমাচার্য-রচিত 'বেদান্ত-রত্নমঞ্জুষা' নামক নিম্বার্কের 'দশ-শ্লোকী'-র ভাষ্য নিম্বার্ক-বেদান্ত-সম্প্রদায়ের অতি মূল্যবান গ্রন্থ। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের তিনিই সর্বপ্রথম অদ্বৈত-বেদান্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করেন।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আর একজন সুবিখ্যাত আচার্য কেশবকাশ্মীরিভট্ট। ইনি নিম্বার্কের পরে ঊনত্রিংশৎ আচার্য। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বেদান্তকৌস্তুভ-প্রভা' নামক সুবৃহৎ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য। তিনি অদ্বৈত-বেদান্তের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

এইদিক হইতে অপর দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য— পুরুষোত্তমপ্রসাদ বৈষ্ণব ও মাধবমুকুন্দ। পুরুষোত্তমপ্রসাদ নিম্বার্কের পরবর্তী একত্রিংশৎ আচার্য। নিম্বার্কের সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণ-স্তবরাজের উপর 'শ্রুত্যন্ত কল্পবল্লী' নামক ভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং অদ্বৈতবাদ খণ্ডনে ব্রতী হন।

মাধবমুকুন্দের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'পরপক্ষ-গিরিবজ্র'। ইনিও অদ্বৈতবাদ খণ্ডনে বিশেষ ন্যায়-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন।

রমা চৌধুরী

নিয়ন নিষ্ক্রিয় গ্যাসীয় মৌলিক উপাদান। ইহার পরমাণু-ক্রমাংক ১০, পারমাণবিক গুরুত্ব ২০·১৮৩। তরলীকৃত বায়ুর আংশিক পাতনের সাহায্যে বায়ু হইতে নিয়নকে পৃথক করা হয়। ইহার কোনও স্বাদ, বর্ণ বা গন্ধ নাই। যোজ্যতা না থাকায় নিয়ন কোনও রাসায়নিক যৌগ সৃষ্টি করিতে পারে না। নিয়ন জলে অতি অল্প মাত্রায় দ্রবীভূত হয়।

বদ্ধ কাচনলের ভিতর নিম্নচাপে নিয়ন গ্যাস ভরিয়া উহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিলে কমলা বর্ণের আলোক উৎপন্ন হয়; নিয়নের সহিত কিছু পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশাইয়া লইলে উৎপন্ন আলোকের বর্ণ হয় শ্বেত। বিজ্ঞাপন, পথঘাট, কারখানা, বাসগৃহ প্রভৃতির আলোকসজ্জায় নিয়ন-বাতির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

নিয়া প্রাকৃত মধ্য এশিয়ায় খোতন দেশের সীমান্তে শানশান ('ক্রোরইন') অঞ্চল ও অন্যান্য স্থান হইতে আউরেল স্টাইন (১৮৬২-১৯৪৩ খ্রী) কর্তৃক প্রাপ্ত প্রত্নলিপিতে লব্ধ এক (আসলে একাধিক, তবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত) মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা। অধিকাংশ প্রত্নলিপি পাওয়া গিয়াছিল নিয়া (প্রাচীন 'চড়োত') নামক স্থানে। সেই হেতু ভাষাটির এই নাম। এ ভাষা ছিল সেদেশের শাসনকার্যের ভাষা; সম্ভবতঃ মূলে ছিল সেইস্থানের রাজবংশের ভাষা।

নিয়া প্রাকৃতের ভারতীয় জ্ঞাতি হইল অশোকের পরবর্তী কালের কাবুল-কান্দাহার-পেশোয়ারের ভাষা, খরোষ্ঠী ধম্মপদের ভাষা। এই অঞ্চলের বিশিষ্ট লিপি ছিল খরোষ্ঠী, নিয়া প্রত্নলিপিগুলিও প্রায় সবই খরোষ্ঠীতে লেখা, দুই-একটি মাত্র ব্রাহ্মীতে।

নিয়া প্রত্নলিপিগুলি খ্রীষ্টীয় ৩য়-শতাব্দীতে লেখা। এই প্রাকৃতে সেকালের কথ্য মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যে ছাপ আছে তাহার কিছু কিছু অপভ্রংশে পাওয়া গিয়াছে (যেমন কর্তা ও কর্ম একই রূপ এবং সব শব্দই অকারান্তবৎ রূপ হয়)। আবার কোনও কোনও বৈশিষ্ট্য কোনও প্রাকৃতেই মিলে নাই, কিন্তু পরবর্তী কালের ভাষায়, অর্থাৎ নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় সেগুলির যথোচিত প্রতিফলন আছে (যেমন নিষ্ঠান্তপদ অতীতকালের ক্রিয়াপদের মত রূপ)। ভারতে প্রাপ্ত কোনও প্রাকৃতে যাহার সাক্ষ্য মিলে নাই অথচ যাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া ভাষাবিজ্ঞানবিদেরা বিশ্বাস করিতেন, এমন ধ্বনি-পরিবর্তনের (—স্বরমধ্যবর্তী একক সঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির উষ্মত্বপ্রাপ্তি—) উদাহরণ নিয়া প্রাকৃতে প্রচুর মিলিয়াছে। অশোকের লিপির ভাষার মত নিয়া লিপিগুলির ভাষাও কথ্যভাষাশ্রিত সাধুভাষা।

সুকুমার সেন

নিরালম্ব স্বামী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্র

নিরুক্ত বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তিযোগে ব্যাখ্যা। দুরূহ বৈদিক শব্দের সংগ্রহের নাম 'নিঘণ্টু', নিরুক্ত নিঘণ্টুরই টীকা বা ভাষ্য। অনেক নিরুক্তকারের নাম জানা গেলেও কেবলমাত্র যাস্ক-প্রণীত 'নিরুক্ত'ই বর্তমান। দুর্গাচার্য ও স্কন্দস্বামী ইহার প্রসিদ্ধ টীকাকার। যাস্কের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীর পরে নহে। যাস্কের নিরুক্তে যে সকল প্রাচীন নিরুক্তকারগণের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ঔর্ণবাভ, শাকটায়ন, শাকপূণি, শাকল্য, গার্গ্য ইত্যাদি আছেন। যে নিঘণ্টুর উপর যাস্ক 'নিরুক্ত' রচনা করেন, তাহা তাঁহার স্বরচিত কিনা, সেসম্বন্ধে মতভেদ আছে ('নিঘণ্টু' দ্র)। নিরুক্তে নিঘণ্টুধৃত সমস্ত শব্দের ব্যাখ্যা নাই, কিন্তু উদাহরণস্বরূপ যে সকল বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সব মন্ত্রের প্রায় সব শব্দেরই ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ন্যূনাধিক ৬০০ বেদমন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রায় ২৫০ মন্ত্রের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সর্বসাকুল্যে নিরুক্তে প্রায় ২৫০০ বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে।

নিরুক্তে ১২টি অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টি পাদ আছে; প্রতি পাদ একাধিক 'খণ্ডে' বিভক্ত। তদুপরি একটি অধ্যায় পরিশিষ্টরূপে দেখা যায়; ইহার টীকা নাই।

'নিঘণ্টু'র মত 'নিরুক্ত'ও নৈঘণ্টুক, নৈগম ও দৈবত এই ৩ কাণ্ডে বিভক্ত। প্রথম কাণ্ডে ৩ অধ্যায়, দ্বিতীয় কাণ্ডে ৩ অধ্যায় ও দৈবত কাণ্ডে ৬ অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় 'উপোদ্ঘাত'; ইহাতে শব্দশাস্ত্রের কয়েকটি প্রধান বিষয়ের আলোচনা আছে। যাস্ক সমস্ত শব্দকে 'নাম আখ্যাত উপসর্গ ও নিপাত' এই ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্' ও 'সত্ত্ব-প্রধানানি নামানি'। উপোদ্ঘাতে শব্দের নিত্যত্ব সম্বন্ধে বিচার আছে, 'জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্ধতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি', বিকারের ষড়্‌রূপতা পরবর্তীকালে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। শাকটায়ন মুনির মতে সমস্ত শব্দই আখ্যাত হইতে প্রত্যয়যোগে ব্যুৎপন্ন; গার্গ্য মতে ডিথডবিথাদি শব্দের ব্যুৎপত্তির অন্বেষণ নিরর্থক; উপোদ্ঘাতে এই দুই মতের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

নিরুক্তকারগণের শব্দব্যুৎপত্তি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নহে; অনেকস্থলেই অত্যন্ত কষ্টকল্পনার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। শাকটায়ন নিজেও অনেকস্থলে অন্য নিরুক্ত-কারের ন্যায় একাধিক শব্দের অংশ একত্র করিয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। এইরূপ ব্যুৎপত্তি 'ব্রাহ্মণ'-এ পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ হইতে নিরুক্তকারগণের ব্যুৎপত্তির প্রণালী বুঝা যাইবে। 'মুষ্টির্মোচনাদ্বা মোষণাদ্বা মোহনাদ্বা' ৬।১; 'জূর্ণির্জবতের্বা দ্রবতের্বা দুনোতের্বা' ৬।১; 'অগ্নিঃ কস্মাৎ? অগ্রণীর্ভবতি…অঙ্গং নয়তি…অক্নোপনো ভবতি…ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিঃ এতেরকারমা-দত্তে, গকারমনক্তের্বাদহতের্বা নীঃ পরঃ' ৭।৪।

দৈবত কাণ্ডে বৈদিক 'দেবতা' সম্বন্ধে বহু বিষয়ের আলোচনা আছে। মন্ত্র ত্রিবিধ; যথা পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিক (৭।১); দেবতা মূলতঃ তিনটি; পৃথিবী-

স্থানে অগ্নি, অন্তরিক্ষস্থানে বায়ু বা ইন্দ্র এবং দ্যুস্থানে সূর্য। অন্য দেবতাগণ ইঁহাদেরই নামভেদ বা সহচর (৭।৩)। যাস্কের 'নিরুক্ত'-এর ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং রচনাশৈলী অতি চমৎকার।

শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১ খ্রী) বঙ্গসাহিত্যের প্রখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইঁহার জন্ম। পিতা নফরচন্দ্র ভট্ট বিচারবিভাগের কৃতী কর্মচারী ছিলেন। অকাল-বৈধব্যের পর তিনি সাহিত্য-সাধনাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। ভাগলপুরে অবস্থানকালে সেখানে ভ্রাতা বিভূতিভূষণ ভট্ট মারফত নিরুপমার সহিত শরৎচন্দ্রের সংযোগ ঘটে। শরৎচন্দ্রই তাঁহাকে গদ্য রচনায় উৎসাহিত করেন। গল্প রচনার প্রেরণা তিনি অনুরূপা দেবীর নিকট হইতেই লাভ করেন; নিরুপমা দেবীর লিখিত প্রথম উপন্যাসের নাম 'উচ্ছৃঙ্খল'। তাঁহার রচিত অন্যান্য প্রধান গ্রন্থঃ 'অন্নপূর্ণার মন্দির' (১৯১৩ খ্রী), 'দিদি' (১৯১৫ খ্রী), 'আলেয়া' (১৯১৭ খ্রী), 'বিধিলিপি' (১৯১৯ খ্রী), 'শ্যামলী' (১৯১৯ খ্রী), 'বন্ধু' (১৯২১ খ্রী), 'পরের ছেলে' (১৯২৪ খ্রী), 'আমার ডায়েরী' (১৯২৭ খ্রী), 'দেবত্র' (১৯২৭ খ্রী), 'যুগান্তরের কথা' (১৯৪০ খ্রী) এবং 'অনুকর্ষ' (১৯৪১ খ্রী)।

কলাকৌশল এবং মনোবিশ্লেষণে নিরুপমা দেবীর দক্ষতা স্বীকৃত। প্রেম এবং দাম্পত্য-জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁহার উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। উপন্যাসের সর্বস্তরে নিরুপমা সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। 'দিদি' লেখিকার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া বিবেচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক ও ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান করেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে বর্ধমান সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক তিনি সম্মানিত হন। শেষজীবনে তিনি বৈষ্ণবমতে দীক্ষা লইয়াছিলেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারি বৃন্দাবনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমীলা নাগ, নিরুপমা দেবী, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯৪, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলিকাতা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাচন ইংরেজী নাম ইলেকশন। ইহার অর্থ ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্ধারণ। ভোটদাতারা নিজ ইচ্ছানুযায়ী জাতীয় বিধানমণ্ডলীতে (পার্লামেন্ট, কংগ্রেস, ডায়েট ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত) এবং যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য বিধানমণ্ডলীতেও প্রতিনিধি প্রেরণ করে। পৌরসভা, গ্রাম-পঞ্চায়ত, জেলা পরিষদ প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিও নির্বাচনাধীন। সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিও নির্বাচিত হন।

পূর্বে ভোটদান-ক্ষমতার উপর সম্পত্তি, করদান, শিক্ষা প্রভৃতি নানা যোগ্যতামূলক শর্ত আরোপিত হইত; নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। ভারতে ব্রিটিশ আমলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আইনে জনসংখ্যার মাত্র ৩ শতাংশকে ও ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আইনে জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশকে ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমানে প্রায় সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহার বয়স ২১ বৎসরের কম নয় এমন প্রত্যেকটি নাগরিককে ভারতীয় সংবিধানে স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে ভোটদাতারূপে রেজিস্ট্রিভুক্ত হওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, যদি সে উন্মাদগ্রস্ততা, ফৌজদারী অপরাধ, বে-আইনি আচরণ ইত্যাদি কারণে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়। ভারতে নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ছিল সাড়ে ২১ কোটি—মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক।

ভারতের সংবিধান সভায় অনেকে আশংকা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কোটি কোটি অশিক্ষিত নাগরিককে ভোটের অধিকার দিলে দেশে বিপর্যয় ঘটিবে; চারিটি সাধারণ নির্বাচন এই ভয়কে অমূলক প্রতিপন্ন করিয়াছে। কিরূপ ও কতদূর শিক্ষা পাইলে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় ও প্রতিনিধি বাছাই করিবার ক্ষমতা জন্মায় ইহা অনধিগম্য। কোন দলের বা জোটের নেতারা দেশ শাসন করিবেন, ইহাই ভোটের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। এ ব্যাপারে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ, সকলেরই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং সকলেরই মত লওয়া উচিত।

'এক ব্যক্তি এক ভোট', ইহাই আধুনিক গণতন্ত্রের নীতি। ভারতে লোকসভার ও বিধানসভাগুলির নির্বাচনে এই নীতি অবলম্বিত; তবে বিধান পরিষদগুলির নির্বাচনে এক ব্যক্তির একাধিক ভোট দেখা যায়। ধনী ও শিক্ষিতের একাধিক ভোট না থাকিলে সার্বিক গণতন্ত্রে বিপদ ঘটিবে—গত যুগের এই ভয় ভিত্তিহীন।

প্রত্যেকটি ভোটের 'মূল্য' বা 'ওজন' যাহাতে সমান হয় তদুদ্দেশ্যে নির্বাচনকেন্দ্রগুলিকে এমনভাবে সীমিত করা উচিত যে, সকল কেন্দ্রের জনসংখ্যা (অর্থাৎ কার্যতঃ ভোটার-সংখ্যা) যথাসম্ভব সমান হয়। ভারতীয় সংবিধানের

৮১ ও ১৭০ ধারায় এই নীতি নির্দিষ্ট হইয়াছে। তথাপি ভারতের সংসদীয় নির্বাচনে কেন্দ্রগুলির ভোটার-সংখ্যার তারতম্য বহুক্ষেত্রে অত্যধিক।

ভারতে লোকসভা ও বিধানসভাগুলির সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন (নাগাল্যাণ্ড বিধানসভার কয়েকজন সদস্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত)। বিধান পরিষদগুলির সদস্যদের এক-ষষ্ঠাংশের নির্বাচন প্রত্যক্ষ, মনোনীত সদস্য বিনা অন্যান্যদের নির্বাচন পরোক্ষ। রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য বিনা অন্যান্য সকল সদস্যেরই নির্বাচন পরোক্ষ। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নির্বাচনপ্রথাই যথার্থ গণতান্ত্রিক বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা প্রতিনিধিদের সহিত জনসাধারণের সাক্ষাৎযোগসাধন করে এবং সরকারের উপর জনসাধারণের কর্তৃত্বকে বাস্তব ও কার্যকর করিয়া তোলে। পরোক্ষ নির্বাচনের সমর্থকেরা বলেন, ইহার দ্বারা সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একটি যোগসূত্র গ্রথিত হয় এবং অল্পসংখ্যক বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দ্বারা সংসদীয় সদস্যদের নির্বাচন সম্ভব হয়, কিন্তু নির্বাচকদের সংখ্যা যতই অল্প হয় ততই তাহাদিগকে অর্থের দ্বারা বা অন্য উপায়ে বশীভূত করা সহজ হইয়া পড়ে। গান্ধীজীর আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতে কেহ কেহ পঞ্চস্তরীয় পরোক্ষ নির্বাচনপ্রথার সুপারিশ করেন।

ভারতীয় সাংবিধানিক আইনে পূর্বে দ্বি-সদস্য কেন্দ্রের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'দি টু-মেম্বার কন্‌স্টিট্যুয়েন্সিজ (অ্যাবলিশন) অ্যাক্ট' পাস করিয়া এইগুলিকে রদ করা হইয়াছে। বর্তমানে লোকসভা ও বিধানসভাগুলির নির্বাচনে সকল কেন্দ্রই এক-সদস্য। বিধান পরিষদগুলির নির্বাচনে কয়েকটি দ্বি-সদস্য কেন্দ্র বর্তমান। এক-সদস্য কেন্দ্র ব্যবস্থায় ভোটের অপচয় ঘটে এবং দলগুলির ভোটলাভসংখ্যার অনুপাত ও বিজিত আসনসংখ্যার অনুপাত, উভয়ের মধ্যে গুরুতর অসাম্য দেখা দিতে পারে। কোনও দল হয়তো মোট প্রদত্ত ভোটের ৪০ শতাংশ পাইয়া মোট আসনসংখ্যার ৮০ শতাংশ লাভ করিতে পারে। ইহার প্রতিকারের জন্য বহু-সদস্য কেন্দ্রের ভিত্তিতে আনুপাতিক নির্বাচন-ব্যবস্থা ইওরোপের বিভিন্ন দেশে অবলম্বিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় দলগুলি নিজেদের শক্তি অনুযায়ী যথাযথ অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং বিধানমণ্ডলীটি হয় দেশের সর্বমতের ও সর্বদলের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, কিন্তু ইহা সরকারের স্থায়িত্বের প্রতিকূল বলিয়া বিবেচিত হয়। এক-সদস্য কেন্দ্র ও সংখ্যাধিক ভোটগণনা সমন্বিত ব্রিটিশ নির্বাচনী প্রথাই ভারতে গৃহীত হইয়াছে; তবে রাজ্যসভার ও বিধান পরিষদগুলির সদস্যদের এবং রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থিত। সংখ্যাগুরু ভোটের দ্বারা সদস্য নির্বাচনের জন্য দ্বিতীয় ব্যালটগ্রহণ-প্রথা ভারতে নাই।

বহু দেশেই দেখা যায়, ভোটারদের একটা বড় অংশ ভোট দেয় না। ভারতে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের লোকসভা নির্বাচনে ভোটদানবিরতদের সংখ্যা ছিল ৪৭·৪ শতাংশ। ভোটারগণকে ভোট দিতে বাধ্য করার জন্য অস্ট্রেলিয়া ও আরও কয়েকটি দেশে আইন আছে। ভারতে সপ্তনম কমিটি এইরূপ আইন পাশ করার স্বপক্ষে মতপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহার স্বপক্ষে যুক্তি এই যে, ভোটদান রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আবশ্যিক ও অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য। বিপক্ষে যুক্তি এই যে, ভোটদান নাগরিকের অধিকার—ভোট দেওয়ার অধিকারের মধ্যে ভোট না দেওয়ার অধিকারও অন্তর্নিহিত।

ভারতে ব্রিটিশ আমলে পৃথক পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও আসনসংরক্ষণের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহা জাতীয় ঐক্যের প্রতিবন্ধক ও গণতন্ত্রবিরোধী। স্বাধীন ভারতে ইহা রদ করা হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে একটি সাধারণ নির্বাচনী তালিকার ভিত্তিতে লোকসভা ও বিধানসভাগুলির নির্বাচন সাধিত হয়। নাগরিক ব্যক্তিরূপেই ভোট দেয়, কোনও সম্প্রদায়ের, সংস্থার বা শ্রেণীর সভ্যরূপে নয়। প্রথমে ১০ বৎসরের জন্য তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। তাহাদের জন্য আসনসংরক্ষণের মেয়াদ আরও ১০ বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠিত সরকারের হস্তক্ষেপ বিনা যাহাতে 'স্বাধীন ও অপক্ষপাতী নির্বাচন' সাধিত হয় তজ্জন্য ভারতীয় সংবিধানে নির্বাচনের তদারক ও নিয়ন্ত্রণের ভার একটি নির্বাচনী কমিশনের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। নির্বাচনী কমিশন এ পর্যন্ত শুধু প্রধান নির্বাচনী কমিশনারকে লইয়াই গঠিত, যদিও একাধিক নির্বাচনী কমিশনার নিযুক্ত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ নির্বাচনের সময়ে প্রধান নির্বাচনী কমিশনারকে সাহায্য করার জন্য একাধিক আঞ্চলিক কমিশনার বা ডেপুটি নির্বাচনী কমিশনার অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। প্রধান নির্বাচনী কমিশনার ৬ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহাকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের পদমর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। প্রতি রাজ্যে এক প্রধান নির্বাচনী অফিসার,

প্রতি কেন্দ্রে একজন নির্বাচনী রেজিস্ট্রেশন অফিসার, কোথাও কোথাও জেলা নির্বাচনী অফিসারও নিযুক্ত করার ব্যবস্থা আছে।

নির্বাচনী কমিশনের কর্তব্য বিগত আদমশুমার অনুযায়ী নির্বাচনী তালিকা (অর্থাৎ ভোটারতালিকা) রচনা; প্রতি বৎসর তাহার সংশোধন; নির্বাচন কেন্দ্রগুলির সীমানির্দেশ ও প্রার্থীর মনোনয়ন; দলীয় ও নির্দলীয় প্রার্থীদের প্রতীকচিহ্ন নির্ধারণ; নির্বাচনদিবস স্থিরীকরণ এবং নির্দিষ্ট দিনে ভোটদান সম্পর্কে সকল ব্যাপারের পরিচালনা। নির্বাচন-সংক্রান্ত আইন 'রিপ্রেজেন্টেশন অফ দি পিপ্‌ল অ্যাক্ট, ১৯৫০' এবং 'রিপ্রেজেন্টেশন অফ দি পিপ্‌ল অ্যাক্ট, ১৯৫১', এই দুইটি বিধির পরবর্তীকালের সংশোধনসহ ধারাগুলির দ্বারা বিহিত। প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র পেশ করার ও প্রত্যাহার করার তারিখ নির্বাচনী কমিশনের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। যাহার বয়স ২৫ বৎসরের কম নয় এমন যে কোনও ভারতীয় নাগরিক লোকসভার বা বিধানসভার কোনও নির্বাচনকেন্দ্রের একজন ভোটদাতার স্বাক্ষরসহ মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে পারে এবং তাহা মঞ্জুর হইলে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইতে পারে। প্রার্থীকে নির্বাচনকেন্দ্রের বাসিন্দা হইতে হইবে এরূপ কোনও আইন নাই। অ-নাগরিক, বিকৃতমস্তিষ্ক, অবিমুক্ত দেউলিয়া, সরকারের অধীনে লাভজনক পদধারক, সরকারী কণ্ট্রাক্টর—এই সকল শ্রেণীর ব্যক্তি প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য। লোকসভার প্রার্থীকে ৫০০ টাকা ও বিধানসভার প্রার্থীকে ২৫০ টাকা জামানত রাখিতে হয়। প্রার্থী মোট প্রদত্ত ভোটের এক-অষ্টমাংশের কম পাইলে তাহার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। আইনতঃ প্রার্থীর ব্যয়সীমা লোকসভা-কেন্দ্রে ২৫০০০ টাকা এবং বিধানসভা-কেন্দ্রে রাজ্যভেদে ৬০০০ হইতে ৯০০০ টাকা (পশ্চিম বঙ্গে ৭০০০ টাকা)। প্রতি কেন্দ্রের জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত হন। নির্বাচনদিবস ছুটির দিন বলিয়া ঘোষিত হয়। ভোটদাতা ঐ দিন তাহার জন্য নির্দিষ্ট পোলিং স্টেশনে ও পোলিং বুথে হাজির হইয়া সন্তোষজনকভাবে আত্মপরিচয় দেওয়ার পর পোলিং অফিসার তাহার হাতে বিভিন্ন প্রার্থীদের নাম ও প্রতীকচিহ্ন-সংবলিত একটি 'ব্যালট পেপার' বা নির্বাচনী কাগজ দেন। ভোটদাতা নিভৃত কক্ষে যাইয়া গোপনে ঈপ্সিত প্রার্থীর প্রতীকচিহ্নের উপর ছাপ মারিয়া দেয় এবং তাহার পর কাগজটি ভাঁজ করিয়া একটি সাধারণ ব্যালট বাক্সে ঢুকাইয়া দেয়। ভোটদানের অব্যবহিত পরেই শুরু হয় ভোটগণনা এবং তাহার পর ফলাফল ঘোষিত হয়। ভোটদানের ও ভোটগণনার সময়ে প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকেন।

ভোটদান হইতে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি বর্তমানে সারা ভারতে ৭-৮ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। এক কেন্দ্রের ফলাফলের ঘোষণা অন্য কেন্দ্রে ভোটদানকে প্রভাবিত করিবে এই সম্ভাবনা প্রায় দূরীভূত হইয়াছে। বিজয়ী প্রার্থী দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া বিবেচ্য আচরণ করিয়াছেন অথবা তাঁহার মনোনয়ন বিধিবহির্ভূতভাবে হইয়াছে, এই কারণ দেখাইয়া তাঁহার নির্বাচন নাকচ করিবার জন্য 'নির্বাচনী দরখাস্ত' পেশ করার ব্যবস্থা আছে। হাইকোর্টে ইহার বিচার হয় এবং সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার আপিল চলিতে পারে। উৎকোচদান, ভোটদাতাদের উপর অবৈধ প্রভাববিস্তার, জাতি, ধর্ম প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে ঘৃণার বা বৈরভাবের প্রচার, ভোটদাতাগণকে ভোটকেন্দ্রে লইয়া যাইবার গাড়িভাড়া বাবদ অর্থব্যয়, নির্বাচনী-ব্যয়ের সীমালঙ্ঘন ইত্যাদি ব্যাপার দুর্নীতিপরায়ণ আচরণ বলিয়া আইনতঃ বিবেচ্য।

দ্র M. V. Pylee, *Constitutional Government of India*, Calcutta 1960 ; *Manual of Election Law*, New Delhi, 1966.

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

নির্বাণ সমগ্র বৌদ্ধ-দর্শনের তিনটি প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর —অনিত্যম্, অনাত্মম্ ও নির্বাণ। তিনটির মধ্যে নির্বাণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাণ শব্দটি বুদ্ধের সমসাময়িক কাল হইতেই বহুল প্রচলিত হইয়াছে। প্রাক্-বুদ্ধকালে যে নির্বাণ শব্দটির উল্লেখ নাই তাহা নয়, কিন্তু সেই সময়ে এই অর্থবোধক ভাবকে ব্যক্ত করার জন্য মুক্তি শব্দটিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

ভারতীয় দর্শনে পরম তত্ত্ব অনুভূতিলব্ধ। নির্বাণও তাই। ইহা অবর্ণনীয়। গ্রীক রাজা মিলিন্দের প্রশ্নের উত্তরে নাগসেন এই কথাই বলিয়াছিলেন। পালি-বৌদ্ধ সাহিত্যে তথাগত ও তাঁহার শিষ্যগণ নির্বাণ সম্বন্ধে যে আলোচনা ও পর্যালোচনা করিয়াছেন তাহার একটা সংক্ষিপ্ত আভাস হইল—

১. 'ভবনিরোধো নিব্বানং।'—ভব অর্থাৎ পুনর্জন্মের নিরোধ হওয়াই নির্বাণ।

২. 'নিব্বানং ভগবা আহ সব্ব গন্থপ্পমোচনং।'—সর্ব প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভই নির্বাণ।

৩. 'তণ্হায় বিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি বুচ্চতি।'—তৃষ্ণার বিনাশই নির্বাণ এরূপ বলা হয়।

'তণ্হা কৃখয়োহি ··নিব্বানং।'—তৃষ্ণাক্ষয়ই নির্বাণ।

৪. 'ছন্দ-রাগ বিনোদনং নিব্বানং পদমচ্চুতং।'—বাসনা ও আসক্তির বিনাশই অচ্যুত নির্বাণ পদ।

৫. 'পঞ্চন্নং খন্ধানং নিরোধ···নিব্বানং।'—পঞ্চস্কন্ধের নিরোধই নির্বাণ।

৬. 'রাগকৃখয়ো দোসকৃখয়ো মোহকৃখয়ো নিব্বানং।'—রাগ, দ্বেষ ও মোহক্ষয়ই নির্বাণ।

অনেকেই নির্বাণকে নিষ্ক্রিয়তা বা শূন্যতা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা যে সত্য নয় তাহা বুদ্ধের ব্যক্তিগত জীবন হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধ ৩৫ বৎসর বয়সে নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াও পরবর্তী দীর্ঘ ৪৫ বৎসর কর্মবহুল জীবনের মধ্য দিয়াই দিনাতিপাত করিয়াছিলেন। কর্ম নির্বাণপ্রাপ্তির পরেও থাকে, তবে কৃতকর্মের মধ্যে লিপ্ত হইতে হয় না। ভর্জিত বীজ, ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত শর প্রভৃতি আস্তিক দর্শনে বহুল প্রচারিত উপমাগুলি এখানেও প্রযোজ্য। যে বীজ ভর্জিত তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপাদিত হয় না। যে শর ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা আর ফিরানো যায় না। সেইরূপ প্রারব্ধ কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তবে রাগ, দ্বেষ ও মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে নূতন বাসনার আর সৃষ্টি হয় না। সেক্ষেত্রে যে কর্ম করা হয় তাহা লোককল্যাণার্থে। বুদ্ধ বলিয়াছেন—'যে তরী দিয়া আমি নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা অন্য লোকের সাহায্যার্থে বিলাইয়া দিবার জন্যই আমি ধর্মপ্রচারে ব্রত হইয়াছি।' দেহের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এইগুলিরও পরিসমাপ্তি হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করিয়া নির্বাণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারা যায়। ১. উপাধিশেষ নির্বাণ ২. অনুপাধিশেষ নির্বাণ। নির্বাণপ্রাপ্তি হইতে মৃত্যুর পূর্ব অবস্থাকে বলে উপাধিশেষ নির্বাণ। নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাকে বলে অনুপাধিশেষ নির্বাণ। অনেক ক্ষেত্রে এই দুইটি শ্রেণীবিভাগকে নির্বাণ ও পরিনির্বাণও বলা হইয়া থাকে।

সদর্থক দৃষ্টি হইতে নির্বাণকে আনন্দময় বলা হয়। নঞর্থক দিক হইতে নির্বাণকে দীপের ন্যায় নিভিয়া যাওয়া ভাবা হয়—সব কিছুরই অভাব, জীবনের পরিসমাপ্তি। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। দীপের সঙ্গে এখানে দুঃখের পরিসমাপ্তির তুলনা করা হইয়াছে। দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি। নাগার্জুন বলিয়াছেন, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের অনুভব করেন কিন্তু ধীরগণ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের উপসমরূপ শ্রেয়ঃ উপলব্ধি করেন। শূন্যতা পদার্থ 'আছে' এরূপও বলা যায় না; 'নাই' এরূপও বলা যায় না। ধীর ব্যক্তিগণ এই পদার্থ (শূন্যতা) লাভ করিয়া 'আছে' ও 'নাই' এতদুভয় অতিক্রম করেন। মাক্সমূলর ও চিল্ডার্স-এর মতে নির্বাণ 'অ্যানিহিলেশন' (annihilation) নয়। প্রতীত্যসমুৎপাদের জ্ঞান হইলে অর্থাৎ দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের ক্রম বুঝিতে পারিলে অবিদ্যার বিনাশে বুদ্ধত্ব বা নির্বাণ লাভ হয়। ইহাই নির্বাণপ্রাপ্তির উপায়।

সদর্থক বা নঞর্থক যে কোনও বর্ণনাই দেওয়া হউক তাহা সম্পূর্ণ অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া। অবর্ণনীয়কে প্রকাশ করার প্রয়াস মাত্র। সম্পূর্ণ ঠিক এই কথা কোনও মতেই জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না। ইহা শুধু অনুভূতিলব্ধ। তবে এই একটি অবস্থা যাহা আছে, যেখানে হয় সকল দুঃখের অবসান, যাহা মানুষের জীবনকে কল্যাণ ও মঙ্গলে ভরিয়া দেয়, যাহা আনিয়া দেয় জীবনের চরম পরিপূর্ণতা।

সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী

নির্মলেন্দু লাহিড়ী (১৮৯১-১৯৫০ খ্রী) প্রখ্যাত অভিনেতা। রামতনু লাহিড়ীর বংশধর। কৃষ্ণনগরের নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ীর পুত্র ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাগিনেয় নির্মলেন্দু ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মাতুলালয় শান্তিপুরে বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনে আই. এ. পড়েন। ১৯১২ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশন প্রেসে চাকরি করেন। অল্পবয়স হইতেই গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের সংস্পর্শে নির্মলেন্দুর হৃদয়ে অভিনয়কলার প্রতি অনুরাগ জন্মে ও এ-বিষয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন। গিরিশচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসিয়া তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত হন। সংগীতেও তাঁহার অধিকার ছিল। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অমায়িক, মিষ্টভাষী ও বন্ধুবৎসল, অভিনেতারূপে ছিলেন যথাযথ ভাবাভিব্যক্তিতে সুনিপুণ, সুদর্শন ও সুকণ্ঠ। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যোগদানের পূর্বে তিনি 'ওল্ড ক্লাব' -এর বহু নাটকাভিনয়ে শিশিরকুমার এবং অন্যান্য বিখ্যাত অভিনেতার সঙ্গে মঞ্চাবতরণে প্রতিভাধর শিল্পীরূপে স্বীকৃতি পান। পেশাদার অভিনেতারূপে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ম্যাডান-এর বাংলা থিয়েটার-এ প্রথম অভিনয় করেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ নভেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য'

নাটকের নামভূমিকায়। 'পাপের পরিণাম' নামক নির্বাক চলচ্চিত্রে নায়কের ভূমিকায় তিনি অংশগ্রহণ করেন (১৯২৪ খ্রী)। নিউ মনোমোহন থিয়েটার নামে নিজস্ব একটি ভ্রাম্যমাণ থিয়েট্রিক্যাল পার্টি গঠন করিয়া তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানে ও রেঙ্গুনে অভিনয় প্রদর্শন করেন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে 'সারস্বত-মহামণ্ডল'-এর পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে 'বাণীবিনোদ' উপাধি দান করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি 'এই স্বাধীনতা' নাটকে দয়ালের ভূমিকায় অভিনয়ই তাঁহার শেষ অভিনয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্মলেন্দুর মৃত্যু হয়। তিনি রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে বহু চরিত্রে অভিনয় করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মঞ্চে 'বঙ্গে বর্গী'-তে ভাস্করপণ্ডিত, 'গৈরিক পতাকা'য় শিবাজী ও 'সিরাজদ্দৌলা'য় সিরাজ এবং চলচ্চিত্রে 'কণ্ঠহার' ছবিতে মধু চাকর তাঁহার স্মরণীয় অভিনয়।

দেবকুমার বসু

নিষাদ প্রাচীন ভারতের একটি বিশিষ্ট অনার্য জাতির আর্যজাতি-প্রদত্ত সংস্কৃত নাম। আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতে অন্ততঃ ৪টি বিভিন্ন ও বিশিষ্ট অনার্য-ভাষী জাতির অবস্থান ছিল। প্রাচীন ভারতীয় নাম ও আধুনিক আলোচকদের প্রদত্ত সংজ্ঞা মিলাইয়া ইহাদের বিভাগ ও নামকরণ এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে: ১. নেগ্রিটো (Negrito) বা নিগ্রোবটু অথবা নিগ্রয়েড (Negroid) বা নিগ্রো-আকারের: এই জাতির মানুষ ভারতে এখন অবলুপ্ত ২. অস্ট্রিক (Austric) বা দক্ষিণদেশীয়: এই জাতির প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন নাম আছে, যথা 'নিষাদ', 'পুলিন্দ', 'ভিল্ল', 'কোল্ল' (আধুনিক 'ভীল' ও 'কোল'), 'মুণ্ডা', 'খেরওয়াল', 'খাসিয়া', 'নিকোবরী' প্রভৃতি; ব্যাপকভাবে প্রাচীন ভারতীয় সংজ্ঞা 'নিষাদ' ইহাদের সম্পর্কেই এখন প্রযুক্ত হইতেছে ৩. মোঙ্গোলয়েড (Mongoloid) বা মোঙ্গোল জাতি: আধুনিক হিমালয়ের দক্ষিণ সানুদেশের অধিবাসী এবং উত্তর বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ ও আসামের জনসাধারণ প্রধানতঃ এই জাতির শাখা-প্রশাখা; ইহাদের সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত নাম 'কিরাত' এখন প্রযুক্ত হয় ৪. দ্রাবিড় জাতি: প্রাচীন ভারতে এই জাতির বিভিন্ন শাখার নানা নাম ছিল এবং মনে হয় সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত 'দাস', 'দস্যু', 'শূদ্র', 'অন্ধ্র', 'দ্রমিড়' ('দ্রবিড়' বা 'দ্রাবিড়') প্রভৃতি বহু নাম মুখ্যতঃ ইহাদের সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইত।

অনার্য বা প্রাগার্য জনসমূহের সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষায় যে-সব নাম ব্যবহৃত হইয়াছে সেগুলি বিশেষ করিয়া কোন কোন জাতির সম্পর্কে ব্যবহৃত হইত তাহা পুরাপুরি ধরা যায় না। সংস্কৃতের লেখকগণ কোন অনার্য জাতি কোন শ্রেণীর মানুষ ছিল সে-সম্বন্ধে বিশেষ খবর রাখিতেন না এবং নাম প্রয়োগের কালে অবহিত হইতেন না। সুতরাং এইসব নামের কোনটি কোনটি জাতিকে বুঝাইত তাহার নিশ্চয়তা নাই। তবে মোটামুটি এরূপ অনুমান করা যায় যে, মোঙ্গোল জাতির পীতবর্ণ মানুষকে সাধারণভাবে 'কিরাত' বলা হইত এবং দ্রাবিড় জাতির লোককে প্রাচীনকালে 'দাস' ও 'দস্যু', 'শূদ্র' ও 'দ্রমিড়' বা 'দ্রাবিড়' (ও ইহার বিভিন্ন শাখার লোককে 'অন্ধ্র', 'কর্ণাট', 'কেরল') প্রভৃতি নামে নির্দেশ করা হইত। কিন্তু বিভিন্ন জাতির মানুষের সম্বন্ধে একই নামের ব্যবহার খুবই সাধারণ। নিষাদ জাতির সম্বন্ধে বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে যে উক্তি পাওয়া যায় তাহা অনেকক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী হইলেও মোটামুটি দেখা যায় যে, নিষাদ জাতির অধিষ্ঠান-ভূমি ছিল রাজস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা দেশ পর্যন্ত মধ্য ভারতের অরণ্যময় ও পার্বত্য অঞ্চল। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ ছিল, মাথার চুলে পালক গুঁজিত, তীরধনুক ব্যবহার করিত। ইহাদের আজীবিকা ছিল প্রধানতঃ শিকারধরা ও মাছধরা। পাহাড়ে ও জঙ্গলেই ইহারা থাকিত। এইসব টুকরা-টুকরা বর্ণনা হইতে মনে হয়, প্রাচীন ভারতে নিষাদেরা ছিল, অস্ট্রিক বা কোল অথবা মুণ্ডা জাতির যে-সব শাখা অরণ্য-অঞ্চলে বাস করিত এবং আর্যভাষী হইয়া ক্রমবর্ধমান ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহাদেরই পূর্বপুরুষ। এই 'নিষাদ' নাম এখন সংস্কৃত হইতে গৃহীত সংজ্ঞারূপে ইংরেজী Austric (অস্ট্রিক) জাতির সমপর্যায়ের বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং ভারতে অস্ট্রিক জাতির দুই শাখা মুণ্ডা বা কোল এবং মোন্-খ্মের 'নিষাদ' পর্যায়েই পড়ে।

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রচলিত মত অনুসারে অস্ট্রিক বা নিষাদ জাতির মানুষ হইতেছে ভূমধ্যসাগরের পূর্বপ্রান্তবাসী জাতির এক অতি প্রাচীন শাখা হইতে উদ্ভূত। অতি প্রাচীনকালে দ্রাবিড়দের আগমনের পূর্বে ইহারা ভারতে আসে এবং ভারতের ভূমিতেই ইহারা জাতিগত ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য গড়িয়া তোলে। জাতি হিসাবে ইহারা ছিল নাতিদীর্ঘকায়, দীর্ঘকরোটি, ঋজু ও তনু-দেহ; ইহাদের মাথার কেশ ছিল দীর্ঘ ও কোমল, গায়ের রং কালো এবং নাক চ্যাপটা। ভারতবর্ষের কৃষিমূলক গ্রামীণ-সংস্কৃতি প্রধানতঃ ইহাদেরই দান। 'জুম'-চাষ অথবা বলদ দিয়া চাষের দ্বারা ধান উৎপাদন, মুরগি ও শূকর পালন এবং নানাবিধ শাকসবজি (যথা লাউ, বেগুন, কচু, মূলা,

প্রভৃতি) এবং হলুদ, আদা প্রভৃতি ওষধির উৎপাদন ইহাদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ইহারা সম্ভবতঃ প্রথম হাতিকে পোষ মানায়। ইহারা ইট বা পাথরের ইমারত-সমেত নগর বানাইত না ; কিন্তু ইহাদের গ্রাম্য জীবনের সুব্যবস্থা ছিল। আর্যদের আগমনের পরে, গঙ্গা প্রভৃতি বড় বড় নদীর সমতল অধিত্যকাভূমিতে যে নিষাদেরা বাস করিত, তাহারা আর্যভাষী হইয়া যায় এবং ক্রমে উত্তর ভারতের হিন্দু জাতির সংগঠনে ইহারা একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে।

আধুনিক কালে 'নিষাদ'গোষ্ঠীর এই কয়টি প্রধান ভাষার নাম করা যায় : সাঁওতালি, মুণ্ডারি, হো, ভূমিজ, কোর্‌কু, গদব এবং সোরা বা শবর এবং তদতিরিক্ত আসামের খাসিয়া ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভাষা। ভারতীয় আর্যভাষার বিকাশে 'নিষাদ' ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব দেখা যায়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

নিসার, মহম্মদ (১৯১০-৬৩ খ্রী) ক্রিকেট খেলোয়াড়। সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় ফাস্ট বোলার। তিনি আন্তঃরাজ্য ক্রিকেট বা রন্‌জি ট্রফিতে দক্ষিণ পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের এবং বিগত কালের প্রধান প্রতিযোগিতা চতুর্দলীয়-পঞ্চদলীয় ক্রিকেটে মুস্লিম দলের পক্ষে খেলিতেন। সর্বভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৩২ ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ড সফর করেন। সফরে প্রথমবার ৯৭টি ও দ্বিতীয়বার ৬৬টি উইকেট পান। লর্ড্‌স মাঠে জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচেই ৬টি উইকেট পাইয়াছিলেন ১৩৫ রানে। মোট ৬টি টেস্টে সংগ্রহ ২৫টি উইকেট ; গড় হিসাব ২৮.২৮।

তিনি দীর্ঘকায় বিরাট পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আচরণ প্রকৃত খেলোয়াড়োচিত ছিল। অবিভক্ত ভারতে তিনি পদস্থ রেল-কর্মচারী ছিলেন ; ভারতবিভাগের পর পাকিস্তানে চলিয়া যান।

অজয় বসু

নিহাল সিংহ (১৮২১-৪০ খ্রী) পাঞ্জাবের রাজা রঞ্জিৎ সিংহের পৌত্র ও খড়্গ সিংহের পুত্র নিহাল সিংহ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেনাপতি ভেন্‌চুরা ও কোর্টকে সঙ্গে লইয়া পেশোয়ার প্রদেশ জয় করেন এবং পরে ডেরা ইস্‌মাইল খাঁর শাসনকর্তা শাহ্‌ নওয়াজ খাঁকে পরাজিত করিয়া টংক দুর্গ জয় করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে খড়্গ সিংহ রাজ্যচ্যুত হইলে নিহাল সিংহ মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে সিংহাসনের অধিকারী হন। সাহসিকতা, বিচক্ষণতা এবং রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির বলে সিংহাসন অধিকার করার পর তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন। ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁহার বিরূপ মনোভাব ছিল। তিনি মণ্ডির রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং অচিরেই কমালগড় দুর্গ জয় করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর দাহকার্য সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনকালে রাজদ্বারের উপরিস্থিত খিলান মাথার উপরে ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অশোকা সেনগুপ্ত

নীট্‌শে, ফ্রেডারিক উইল্‌হেল্‌ম (১৮৪৪-১৯০০ খ্রী) প্রাসিয়াস্থিত রকেন গ্রামে পুরোহিত-বংশোদ্ভব এই জার্মান দার্শনিকের জন্ম ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ অক্টোবর এবং মৃত্যু ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ আগস্ট। নীট্‌শের দর্শন স্বাতন্ত্র্যবাদী, মহামানবে বিশ্বাসী, সাম্যবাদের বিরোধী ও খ্রীষ্টধর্মের পরিপন্থী। তাঁহার মতে যীশুই ছিলেন একমাত্র খ্রীষ্টান যাঁহাকে ক্রুশে হত্যা করা হয়। তাঁহার অন্যতম দর্শনগ্রন্থ : 'জরথুশ্‌ত্রের বাণী', 'ভালমন্দের অতীত', 'নীতির বিবর্তন' এবং 'খ্রীষ্টবিরোধী'।

প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়

নীফা ভারতের উত্তরপূর্ব প্রান্তে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। সম্পূর্ণ নাম নর্থ ঈস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি (N. E. F. A.)। ২৬°৪০´ উত্তর হইতে ২৯°৩০´ উত্তর এবং ৯১°৩৫´ পূর্ব হইতে ৯৭°২৫´ পূর্বে অবস্থিত। আয়তন প্রায় ৮১০০০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে চীন, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে ভুটান এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দ্বারা পরিবেষ্টিত এই রাজ্যের প্রায় সবটা হিমালয় পর্বতশ্রেণীর মধ্যে ; সমতলভূমির অংশ নগণ্য। দক্ষিণের সমতলভূমি হইতে উত্তরে ক্রমশঃ উচ্চতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং কয়েকটি গিরিপথ ছাড়া উত্তরের সীমানা অঞ্চল প্রায় ৪-৫ হাজার মিটারের অধিক উচ্চ। ডিহং, ডিবং, ভরেলী, বরনদী সুবনশিরি, মানস প্রভৃতি নদী এবং মিকির, মিশমি, ডাফলা, আবর প্রভৃতি পাহাড় এই অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। প্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়ী জলবায়ুর পরিবর্তন দেখা যায়। দক্ষিণের পাদদেশে যেখানে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করে সেখানে বৃষ্টিপাত বৎসরে ৫০০০ মিলিমিটারের অধিক, আবার মধ্য অথবা উত্তর অঞ্চলে যেখানে এই বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না সেখানে বৃষ্টিপাত বৎসরে মাত্র ৭৫০-৮০০ মিলিমিটার। দক্ষিণ

হইতে উত্তরে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রখরতাও বাড়ে ; উত্তরের কিছু অঞ্চল চিরতুষারময়।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিত। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশটি বৃটিশের দখলে আসে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শাসনের সুবিধার জন্য এই অঞ্চলকে বালিপাড়া ফ্রন্টিয়ার ট্র্যাক্ট ও সদিয়া ফ্রন্টিয়ার ট্র্যাক্ট নামে দুইটি বিভাগে ভাগ করা হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিরাপ অঞ্চলকে সদিয়া হইতে বাদ দেওয়া হয় এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বালিপাড়াকে শিলা ও সুবনশিরি নামে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সদিয়াকেও আবর- ও মিশমি নামে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে টুয়েনসাং নামে একটি বিভাগের সৃষ্টি করা হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলকে নূতনভাবে ৬টি বিভাগে ভাগ করা হয় ; কিন্তু ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে টুয়েনসাং বিভাগ নাগা- ল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়।

রাজনৈতিকভাবে নীফা আসামের অধীন। কিন্তু ভারতের পররাষ্ট্র-দপ্তর মারফৎ আসামের রাজ্যপাল এক উপদেষ্টা-মণ্ডলীর সাহায্যে এই অঞ্চলের শাসন পরিচালনা করেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য নীফা ৫টি সীমান্ত বিভাগে বিভক্ত, যেমন কামেঙ্, সুবনশিরি, সিয়াং, লুহিত ও তিরাপ ; ইহাদের সদর কার্যালয় যথাক্রমে বম্‌ডিলা, জিরো, আলং, তেজু ও খোন্‌সা। প্রত্যেক বিভাগের কার্য পরিচালনা করেন একজন করিয়া পলিটিক্যাল অফিসার।

নীফার জনসংখ্যা ৩৩৬৫৫৮ (১৯৬১ খ্রী)। এখানে নানা ভাষা-ভাষী আদিবাসীর বাস। কামেঙ্ অঞ্চলের উত্তর হইতে দক্ষিণে যথাক্রমে মনপা, সেরদুকপেন, বুগুন, আকা, সিজি ও দফলা জাতির বাস। সুবনশিরি অঞ্চলে উত্তর হইতে দক্ষিণে যথাক্রমে গালং, তাগিন, আপতানি দফলা ও মিরি জাতির বাস। সিয়াং অঞ্চলের প্রধান জাতি আদি। আদিরা পূর্বে আবর নামে পরিচিত ছিল ('আদি' দ্র)। ইহা ছাড়া উত্তরে মেমবা ও খামবা নামে দুইটি জাতি আছে। লুহিত অঞ্চলের প্রধান জাতি মিশমি। ইহা ছাড়া উত্তরদিকে খামটি ও সিংপো নামে দুইটি জাতি বাস করে। তিরাপ অঞ্চলে ওয়াংচু, নোকটে ও টাঙ্গাই প্রধান। উত্তরাঞ্চলে মনপা, সেরদুকপেন, খামবা, সিংপো, খামটি প্রভৃতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম বিরাজমান। বুগুন ও আকাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের এবং নোকটেদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব দেখা যায়। ইহা ছাড়া প্রায় সকল জাতি আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ভূতপ্রেত, অগ্নি, নদী ইত্যাদির উপাসনা করে।

প্রধানতঃ কৃষিকার্য এবং ইহা ছাড়া শিকার, পশুপালন তাঁতশিল্প এবং ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা অধিবাসীদের জীবিকানির্বাহ হয়। প্রধান কৃষিজ দ্রব্য ধান ; ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র শস্য, ভুট্টা, মিষ্ট আলু, কলা, কমলা, আদা, পেঁয়াজ, বেগুন, লংকা, কুমড়া, তুলা ইত্যাদিরও চাষ হয়।

মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে 'জুম'-প্রথায় চাষ করা হয় ('কৃষি' দ্র)। উত্তর অথবা মধ্য অঞ্চলের কম বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে অথবা মালভূমি অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির ন্যায় ধাপ কাটিয়া সমতল জমি তৈয়ারি করিয়া 'টেরাস'- প্রথায় প্রতি বৎসর চাষ করা হয়। যেখানে উন্নত 'টেরাস'- প্রথায় অথবা সেচ-প্রথায় চাষ হয় সেখানে চাষের জমিতে প্রত্যেকের নিজস্ব স্বত্ব আছে, কিন্তু জুম-চাষের জমি এবং পশুচারণ ভূমির মালিক গ্রামের সকলে। আদিদের মধ্যে অথবা অন্য অনেক স্থানে গ্রামের অবিবাহিত ছেলেদের জন্য একটি এবং অবিবাহিত মেয়েদের জন্য একটি করিয়া বড় বাড়ি থাকে ; ইহাকে বলা হয় খেবাং। ইহাতে গ্রামের অতিথি থাকিতে পারে এবং প্রয়োজনে গ্রাম- পঞ্চায়তের সভাসমিতি হইতে পারে। উত্তরদিকে শীতপ্রধান অঞ্চলে ঘরের জন্য পাথরের দেওয়াল গাঁথা হয় এবং পাথর অথবা কাঠ দিয়া চালা তৈয়ারি করা হয়। কিন্তু শীতপ্রধান অঞ্চল ছাড়া অন্যস্থানে বাঁশের মাচার উপর বাঁশের দেওয়াল এবং খড় অথবা পাতার চালা তৈয়ারি করা হয়।

চাল অথবা ক্ষুদ্র শস্য হইতে ভাত এবং কোনও সবজি সিদ্ধ ইহাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান খাদ্য। ইহা ছাড়া মৎস্য, মুরগি অথবা শূকরের মাংস প্রায়ই খাওয়া হয়। ইহারা প্রায়ই বনের মধু সংগ্রহ করে। কেবলমাত্র বৌদ্ধ- ধর্মীয়দের মধ্যে মাখন অথবা ঘি-এর প্রচলন আছে। নানাপ্রকার গাছের শিকড় ও ফলমূলের প্রচলন আছে। প্রায় সকল স্থানে মদের প্রচলন আছে এবং পূর্বদিকে তামাক অত্যন্ত জনপ্রিয়। এখানকার লোকের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল ; কিন্তু গলগণ্ড, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, চর্মরোগ, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগ দেখা যায়। সিয়াং-এর কিছু অঞ্চল এবং দফলাদের মধ্যে যদিও তুলার চাষ হয়, তথাপি তাঁতশিল্পের জন্য আসামের তুলার উপর নির্ভর করিতে হয়। পশমবস্ত্রের জন্য পূর্ব তিব্বতের উপর নির্ভর করা হইত। বর্তমানে উত্তরদিকে পশমের উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলিতেছে। নীফায় মেয়েরাই সাধারণতঃ তাঁত চালাইতে অভ্যস্ত এবং কাপড়-জামায় লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, কালো ইত্যাদি রং ব্যবহার করিতে পছন্দ করে। এই রং স্থানীয় গাছপালা হইতে প্রস্তুত করা হয়।

মৃৎশিল্পের বিশেষ প্রচলন নাই। বেত ও বাঁশের সাহায্যে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন হয়। আদিবাসীদের মধ্যে গহনার প্রচলন আছে; বাঁশ, বেত, কাঠ, পাথর, মাটি, পাখির ডানা ও পালক, পিতল, রুপা ইত্যাদির দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীরাই গহনা প্রস্তুত করে।

এই পর্বতসংকুল অঞ্চলে রাস্তাঘাট খুবই কম; পদব্রজে যাতায়াতেরই প্রচলন অধিক। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক বিভাগের কেন্দ্রস্থল রাস্তা ও বিমান অবতরণক্ষেত্রদ্বারা আসামের সঙ্গে যুক্ত।

শরদিন্দু বসু

নীলকণ্ঠ বিদর্ভের অন্তর্গত ধর্মপুর নামক স্থানের অধিবাসী অনন্ত দৈবজ্ঞের পুত্র। নীলকণ্ঠ মোগলসম্রাট আকবরের প্রধান দৈবজ্ঞ ছিলেন। নীলকণ্ঠের রচনায় আকবরের সভার উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায়। নীলকণ্ঠের পিতা অনন্ত দৈবজ্ঞ জাতক-পদ্ধতি ও পঞ্চাঙ্গ-সাধনোপযোগী 'কামধেনু' নামক গণিতের টীকা লিখিয়াছেন। নীলকণ্ঠ ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সংজ্ঞা বর্ষ ও প্রশ্নতন্ত্র নামক সুবিখ্যাত ত্রিস্কন্ধ তাজিকগ্রন্থ রচনা করেন। নীলকণ্ঠী তাজিকে প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে বর্ষপ্রবেশ গণনা করা হয়। নীলকণ্ঠ তাঁহার রচিত গ্রন্থে আরবী শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। নীলকণ্ঠের পৌত্র মাধব নীলকণ্ঠীর উপর 'শিশুবোধিনী' টীকা রচনা করেন। নীলকণ্ঠী তাজিকের প্রসিদ্ধি বর্তমান কালেও ম্লান হয় নাই।

ভবদেব ভট্টাচার্য

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২ খ্রী) বর্ধমান জেলার ধরণীগ্রামবাসী বিখ্যাত যাত্রাগায়ক। বিদ্যালয়ের লেখাপড়া বিশেষ হয় নাই; পরে স্বীয় চেষ্টায় তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে অভিজ্ঞ হন। অসাধারণ সংগীতপ্রীতির জন্য বাল্যকালেই তিনি গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার দলে যোগ দেন; পরে সম্পূর্ণ দলটির অধিকারী হন। এখানে অনুকূল অবস্থায় তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হয়। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদের গ্রামে গ্রামে তাঁহার কৃষ্ণযাত্রার খ্যাতির অবধি ছিল না। কৃষ্ণযাত্রায় দূতীর ভূমিকায় অভিনয় ও গান করিয়াই নীলকণ্ঠ যশস্বী হন। তিনি ছিলেন দাশরথি রায়ের ভাবশিষ্য। দাশরথির ভক্তি-উচ্ছ্বসিত পাঁচালি গানের প্রতিধ্বনি নীলকণ্ঠ-রচিত কৃষ্ণযাত্রার গানে শোনা যায়।

অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত

নীলগিরি মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটি জেলা ও পর্বত। পর্বতটির অবস্থান ১১°২৪′ উত্তর ও ৭৬°৪৭′ পূর্বে। জেলাটি দক্ষিণ ভারতের একটি সুন্দর পার্বত্য অঞ্চল। ইহার উত্তরপশ্চিমে সহ্যাদ্রি বা পশ্চিমঘাটের ওয়াইনাদ পর্বতমালা, উত্তরে মহীশূরের উচ্চভূমি, পশ্চিমে মালাবারের সমতলভূমি, পূর্বে কোঙ্গুনাদের উচ্চভূমি, দক্ষিণপূর্বে পালঘাট পর্বতমালা। দক্ষিণের পালঘাট পর্যন্ত নীলগিরিকে আন্নামালাই পর্বতমালা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। নীলগিরি পর্বতের উত্তরাংশ খাড়া ২০০০ মিটার উঠিয়া ঢেউয়ের ন্যায় দক্ষিণে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই অংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং কঠিন চার্নকাইট শিলা-দ্বারা গঠিত। সর্বোচ্চ শৃঙ্গদ্বয় ডোডাবেট্টা (২৬৩৭ মিটার) ও মুকুর্তি (২৫৫৬ মিটার) এই অংশেই অবস্থিত। দক্ষিণ-পশ্চিম অংশকে বলা হয় কুণ্ডা পর্বতমালা। নদীর মধ্যে ময়ার, ভবানী ও পাইকারা উল্লেখযোগ্য। সমগ্র নীলগিরি অঞ্চলটি বনময়। সর্বোচ্চ স্থানে ঘাস ও গুল্মলতার প্রাচুর্য; নিম্নভাগে শাল, সেগুন, ইউক্যালিপ্টাস ও বাঁশের বন; রডোডেনড্রন, স্ট্রবেরি ও নানা জাতীয় ফুলে সমাকীর্ণ। নীলগিরি চা ও কফির জন্য খ্যাত। ইহার অন্যান্য সম্পদের মধ্যে আছে নিকৃষ্ট কয়লা ও গৃহনির্মাণের উপযোগী পাথর। বন্য প্রাণীর মধ্যে হাতি, কালো চিতা, সাধারণ বাঘ, ভালুক, হরিণ, হায়েনা, বন্য মহিষ, থার ও নীলগিরি আইবেক্স উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা ১৪·৪° সেন্টিগ্রেড। বৃষ্টিপাত পূর্বাঞ্চলে কম— ১০০ হইতে ১৩০ সেন্টিমিটার। নীলগিরি জেলার প্রধান শহর উটকামণ্ড। 'উটকামণ্ড' দ্র।

২৯°৪৭′ উত্তর এবং ৭৯°৩৮′ পূর্বে চমোলী জেলার জোশীমঠ মহকুমায় নীলগিরি নামে আর একটি পর্বত ও গিরিশৃঙ্গ আছে। ইহার উচ্চতা ৬৭৮৬ মিটার (২২২৬৪ ফুট)। ইহার দক্ষিণগাত্র খাড়া; সেজন্য বরফহীন। তুষারের রাজ্যে সূর্যরশ্মির প্রতিফলনে কালো গ্র্যানিট শিলায় গঠিত পর্বতটিকে নীল বলিয়া ভ্রম হওয়ায় নাম হয় নীলগিরি। নীলগিরি শৃঙ্গটি নয়নাভিরাম ও ত্রিভুজাকৃতি। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক স্মাইম সর্বপ্রথম এই শিখরে আরোহণ করেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ অক্টোবর কলিকাতার হিমালয় অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠিত পর্বতারোহী দল অমূল্য সেনের নেতৃত্বে উত্তরপূর্ব দিক হইতে এই শীর্ষে আরোহণ করেন।

মধ্য নেপালে অন্নপূর্ণা ও ধৌলাগিরি পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অপর একটি নীলগিরি (২৮°২৪′ উত্তর ও ৮৩°৪৫′ পূর্ব)

পর্বত অবস্থিত। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার উত্তর শৃঙ্গটি (উচ্চতা ৭১৪৯ মিটার বা ২৩৪৫৬ ফুট) লায়ানেল টেরের নেতৃত্বে একটি ডাচদল কর্তৃক বিজিত হয়।

গৌহাটির ৭ কিলোমিটার দূরে ব্রহ্মপুত্র-বেষ্টিত কামাখ্যা পাহাড়েরও অপর নাম নীলগিরি।

দ্র শঙ্কু মহারাজ, নীলদুর্গম, কলিকাতা, ১৯৬৫; *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XIX, Oxford, 1908; Geological Survey of India, *On the Geological Structure of the Nilgiri Hills*, Madras, 1958; *National Atlas of India: Physical*, *Trivandrum Plate 37*, Calcutta, 1961; D. K. Biswas, ed., *The Himalayan Journals 1962-63*, vol. XXIV, Calcutta, 1964.

কমলকুমার গুহ
সুজয়া গুহ

নীলপূজা চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্বদিন রাত্রিতে অনুষ্ঠেয় চড়ক-উৎসবের অঙ্গ। এই উপলক্ষ্যে নীল বা নীলকণ্ঠ, নীলচণ্ডিকা, নীলপরমেশ্বরী, নীলা বা নীলাবতীর পূজা করা হয়। নীলাবতীর মাহাত্ম্যকাহিনী বৈচিত্র্যপূর্ণ। দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা-শ্রবণে ত্যক্তদেহা সতী অপূর্ব সুন্দরী শিশুকন্যারূপে নীলধ্বজ রাজার বিল্বদণ্ড রাজ্যে বিল্ববনে আত্মপ্রকাশ করিলে নীলধ্বজ তাঁহাকে নীলাবতী নামে নিজ কন্যার মত লালনপালন করিয়া শিবের সহিত বিবাহ দেন। বাসরঘরে নীলাবতী শিবকে মোহিত করেন ও মক্ষিকারূপ ধারণ করিয়া ফুলের সহিত জলে নিক্ষিপ্ত হন এবং মৃত্যু বরণ করেন। রাজা-রানীও শোকে প্রাণত্যাগ করেন। সন্তানবতী জননীরা এইদিন উপবাস করেন ও সন্ধ্যায় শিবপূজা করিয়া জলগ্রহণ করেন। 'চড়ক' দ্র।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

নীলবিদ্রোহ ঊনবিংশ শতাব্দীতে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকদের নীলচাষবিরোধী জোটবদ্ধ গণপ্রতিরোধ সংগ্রাম (১৮৫৯-৬০ খ্রী)। নদিয়া ও যশোহর জেলাই ছিল নীলবিদ্রোহের প্রধান রঙ্গভূমি।

নীলচাষ কৃষকদের পক্ষে লাভজনক ছিল না। নীলের 'নিজ' চাষ সামান্যই হইত, বেশির ভাগই ছিল রায়তী চাষ। ইহা ছিল দুই প্রকার। নীলচাষীরা নীলকরদের পত্তনী জমির প্রজা হইলে তাহাকে বলা হইত এলাকা চাষ; তাহারা অন্য জমিদারের প্রজা হইলে তাহাকে বলা হইত বে-এলাকা চাষ। রায়তদিগকে নীলের দাদন (বিঘা পিছু ২ টাকা) লইতে ও নীলচাষ করিতে বাধ্য করা হইত, কিন্তু তাহারা নীল গাছের উচিত মূল্য পাইত না। কৃষক নীলের দাদন একবার লইলে তাহা কখনও পরিশোধ হইত না, এমন কি উহার দায় তাহার পুত্রপৌত্রদের উপরও বর্তাইত। রায়তের জমিতে কুঠির ভৃত্যদের যথেচ্ছ প্রবেশ, কৃষকদের গোরুবাছুর আটকানো, তাহাদের উপর নীলকুঠির লাঠিয়ালদের হামলা, তাহাদের ঘরবাড়ি ও গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া, কৃষকবধূদের অপহরণ ও লাঞ্ছনা —এসব ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সমগ্র নীলচাষ-ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল ভূমিদাসত্ব ও বেগার শ্রম।

নীলবিদ্রোহের পূর্বে ৫০ বৎসর ধরিয়া নীলকরদের এই সকল অত্যাচার চলিয়া আসিতেছিল। ইহার বিরুদ্ধে কৃষকদের খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ বহুবার ঘটিয়াছিল।

সরকারি অনুমোদনই ছিল স্বেচ্ছাচারী নীলচাষ-ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বেন্টিঙ্কের পঞ্চম আইন (Regulation V) নীলচুক্তিভঙ্গকে ফৌজদারি অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই আইন রদ হইয়া যায়, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের প্রশ্রয় ও সহযোগিতার বলেই নীলকরদের বে-আইনি কার্যকলাপ চলিতে থাকে।

বাংলার প্রথম ছোটলাট হ্যালিডের শাসনকালে (১৮৫৪-৫৯ খ্রী) কলারোয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ (১৮৫৪ খ্রী) ও বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট জে. এইচ. ম্যাঙ্‌গ্‌ল্‌স (১৮৫৫ খ্রী) নীলকরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া রায়তদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাশ্‌লি ইডেন নীলবপনে অনিচ্ছুক কৃষকদের উপর সরকারি চাপ দিতে অস্বীকার করিয়া এই মর্মে এক 'রোবকারি' জারি করেন যে, জমিতে নীল বোনা না বোনা রায়তের ইচ্ছাধীন। বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির ম্যানেজার ও মোল্লাহাটি সদর কুঠির কর্তা আর. টি. লারমুর ইডেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে নদিয়ার কমিশনার আর্থার গ্রোট লারমুরের পক্ষ নেন। জন পিটার গ্র্যান্ট বাংলার দ্বিতীয় ছোটলাট নিযুক্ত হইয়া গ্রোটের মত অগ্রাহ্য করিলেন এবং ইডেনকে সমর্থন করিলেন। ফলে রায়তদের মনে জাগিল নীল-দাসত্ব হইতে মুক্তির আসন্ন সম্ভাবনা। ইডেনের 'রোবকারি'-র নকল কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইল। বিভিন্ন গ্রামের কৃষকেরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে গোপনে জোটবদ্ধ হইয়া শপথ গ্রহণ করিল, প্রাণ থাকিতে নীল বুনিবে না। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে কৃষ্ণনগরের নিকটে কাঠগড়া কন্‌সারনের

নীলবিদ্রোহ

অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চলেই নীলবিদ্রোহ প্রথম শুরু হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে বিদ্রোহের আগুন নদিয়া, যশোহর, বারাসত, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, ফরিদপুর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। প্রায় ৫০ লক্ষ কৃষক এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। নীলচাষের বিরুদ্ধে কৃষকদের সমবেত প্রতিরোধটি ছিল মূলতঃ শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, কিন্তু নীলকরেরা প্রথম হইতেই এই প্রতিরোধকে দমন করার জন্য আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের আশ্রয় নেয়। কৃষকেরাও আত্মরক্ষার জন্য লাঠি, সড়কি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হয়। হামলাদার নীলকর বাহিনীর সঙ্গে কৃষকদের সশস্ত্র সংঘর্ষ অসংখ্য জায়গায় ঘটিয়াছিল। এক গ্রাম আক্রান্ত হইলে ঢাক পিটানো বা দুন্দুভি বাজানো হইত এবং বহু গ্রামের লোক জড় হইয়া একযোগে প্রতিরোধ করিত। কোথাও কোথাও কৃষক-নারীরাও লড়াইয়ে যোগ দেয়। কৃষকেরা অনেক নীলকুঠি আক্রমণ ও ধ্বংস করিয়াছিল।

নীলকরদের বে-আইনি জুলুমের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল সরকারের আইনি জুলুম। কৃষকদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য মফঃস্বল অঞ্চলে ৪ ব্যাটেলিয়ন মিলিটারি পুলিশ পাঠানো হইল। ৬ মাসের জন্য একাদশ আইন (Act XI, এপ্রিল ১৮৬০ খ্রী) পাশ হইল। তাহাতে বলা হইল, নগদে বা বীজে দাদন লইয়াছে এইরূপ রায়ত নীলচাষ না করিলে তাহাকে বিঘা পিছু ১০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং তাহার অনধিক ৩ মাস কারাদণ্ড হইবে। একাদশ আইনের বেড়াজালে পড়িয়া শত শত কৃষক সর্বস্বান্ত হইয়া জেলে গেল।

নীলবিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে পোড়াগাছার (অপর মতে, চৌগাছার) দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইঁহারা বরিশাল হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া প্রতিরোধবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন এবং কৃষকদের সাহায্যার্থে ১৭০০০ টাকা ব্যয় করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়ের নায়েব মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং জয়রামপুরের তালুকদার রামরতন মল্লিক ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় রামমোহন মল্লিক ও গিরিশ মল্লিক, ইঁহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে যে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে গ্র্যান্টের পাবনা সফরকালে হাজার হাজার কৃষকদের যে বিক্ষোভ-প্রদর্শন ঘটিয়াছিল, মহেশচন্দ্রই ছিলেন তাহার সংগঠক। রামরতন মল্লিককে বলা হইত 'বাংলার নানাসাহেব'। জমিদারেরা সাধারণভাবে কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন; তবে তাঁহাদের অনেকেই জমির পত্তনী ইজারার জন্য নীলকরদের নিকট হইতে আরও চড়া দাম ও মোটা সেলামি আদায়ের উদ্দেশ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাইতেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের সহানুভূতি পুরামাত্রায় বিদ্রোহী কৃষকদের সপক্ষে ছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দেই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয় এবং তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করিয়া পাদ্রি জেম্‌স লং একমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ করার ব্যাপারে নীলবিদ্রোহ একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করিয়াছিল। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' কাগজে কৃষকদের উপর নীলকরদের ও সরকারের অত্যাচারের কাহিনীকে দিনের পর দিন নির্ভীকভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যেভাবে নীলচাষীদের সপক্ষে একাকী আন্দোলন চালাইয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি চিরস্মরণীয়। তরুণবয়স্ক শিশিরকুমার ঘোষ 'M. L. L.' নামে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' কাগজে নীলবিদ্রোহের ঘটনা সম্বন্ধে বহু পত্র লিখিয়াছিলেন। বিদ্রোহী কৃষকদের সহিত তাঁহার গুপ্ত যোগাযোগ ছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রিদের অনেকেরই নৈতিক সহানুভূতি কৃষকদের দিকে ছিল। কিন্তু বাহির হইতে কেহই নীলবিদ্রোহকে নেতৃত্ব দেয় নাই। কৃষক মোড়ল ও সর্দারেরাই ছিল নীলবিদ্রোহের প্রকৃত নেতা। ইঁহাদের দুই-একজনের নামমাত্রই ইতিহাসের পাতায় বাঁচিয়া আছে, যথা সেখাই সর্দার, বৈদ্যনাথ সর্দার ও বিশ্বনাথ সর্দার। আসাননগরে বিশ্বনাথ সর্দারের ফাঁসি হইয়াছিল।

একাদশ আইন অনুযায়ী নিযুক্ত অনুসন্ধানী নীল কমিশনের রিপোর্টে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত নীলচাষ ব্যবস্থাটিকে বলা হইল 'নীতিগতভাবে দূষণীয়, কার্যতঃ ক্ষতিকর এবং একান্তই রুগ্‌ণ'। কমিশন কোনও পক্ষাবলম্বন করে নাই, কিন্তু নীলচাষ সম্বন্ধে সত্যোদ্‌ঘাটন করিয়া কমিশন ফলতঃ নীলবিদ্রোহের সাফল্যে সহায়তা করিয়াছিল। একাদশ আইনের অবসানান্তে জরুরি আইন এবং স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের অবৈধ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বলপ্রয়োগের দ্বারা নীলচাষ করানো নীলকরদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দেই বে-এলাকা নীলচাষ প্রায় নির্মূল হইয়া যায়। এলাকার নিজ প্রজাদিগকে নীলচাষে বাধ্য করার জন্য নীলকরেরা অন্য পন্থা অবলম্বন করে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের দশম আইনের ('রেণ্ট অ্যাক্ট') সুযোগ লইয়া নীলকর সাহেবেরা প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি করিয়া দেয়; ইহার প্রতিরোধে কৃষকেরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে। ১৮৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে যে-সকল হাঙ্গামা ঘটিয়াছিল সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে ছিল খাজনা-

বন্ধঘটিত, যদিও মূলতঃ তাহারা ছিল নীলবিদ্রোহেরই দ্বিতীয় পর্যায়।

দ্র সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬০; প্রমোদ সেনগুপ্ত, নীলবিদ্রোহ, কলিকাতা ১৯৬০; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. IX, Bombay, 1960; Blair B. Kling, *The Blue Mutiny*, Philadelphia, 1966.

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

নীলমণি ঠাকুর (?-১৭৯১ খ্রী) ঠাকুরবংশের জোড়াসাঁকো-শাখার প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহারই ভ্রাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরবংশের পাথুরিয়াঘাটা-শাখার প্রতিষ্ঠাতা। পিতা জয়রাম। পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজরা জয়রামের গড়ের মাঠ এলাকার বসতবাটী ও বাগানবাড়ি ক্রয় করিয়া লইলে নীলমণি ভ্রাতা-সহ পাথুরিয়াঘাটায় বসতি স্থাপন করেন (১৭৬৪ খ্রী)। পরবৎসর ইনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কালেক্টরের সেরেস্তাদারি লইয়া ওড়িশায় গমন করেন; এই কাজে প্রচুর ধনাগম হয়। উপার্জিত অর্থ ভ্রাতা দর্পনারায়ণকে পাঠাইয়া দিতেন। দেশে ফিরিয়া অর্থ লইয়া ভ্রাতার সহিত মনোমালিন্য হয়, কিন্তু পরে ইহার মীমাংসা হইলে নীলমণি এক লক্ষ টাকা পান ও পাথুরিয়াঘাটা ত্যাগ করেন। জোড়াবাগানের বৈষ্ণবচরণ শেঠের নিকট হইতে এক বিঘা জমি পাইয়া জোড়াসাঁকোয় বসবাস আরম্ভ করেন (১৭৮৪ খ্রী)। ইনি প্রচুর ধনের অধিকারী ছিলেন; সদাচারীরূপেও ইঁহার খ্যাতি ছিল। দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এই বংশেরই সন্তান।

সুশীল রায়

নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩ খ্রী) প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ। জন্ম ডায়মণ্ডহারবারের নিকট নেত্রা (Netra) গ্রামে। পিতা নন্দলাল সরকার। ক্যাম্প্‌বেল মেডিক্যাল স্কুলে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন -এর পদে কর্মজীবন শুরু করেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্যও করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইয়া তিনি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ক্রমে এম. এ. এবং এম. ডি. উপাধিও লাভ করেন। প্রথম ভারতীয় উপদেষ্টা চিকিৎসকরূপে চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়া নীলরতন অসামান্য সাফল্য লাভ করেন ও সুচিকিৎসকরূপে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। রাধাগোবিন্দ কর ও সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সহিত মিলিত হইয়া নীলরতন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ (বর্তমান আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) নামক প্রথম বেসরকারি চিকিৎসাবিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল (বর্তমান কুমুদশংকর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহার উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে তিনি উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটির এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাব, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। নীলরতন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স এবং ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন -এর ডীন এবং স্নাতকোত্তর কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগের সভাপতিও ছিলেন। ১৯১৯-২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নীলরতন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে লণ্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্মেলনে যোগদান করেন।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদকরূপে নীলরতন এদেশে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থারও অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল স্কুল, যাদবপুর কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিকাশে তাঁহার অবদান কম নয়। বঙ্গ দেশে ছাত্র-কল্যাণ আন্দোলনে এবং শিল্পের প্রসারেও তাঁহার উদ্যোগের উল্লেখ করিতে হয়।

নীলরতন কিছুকাল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস -এর সদস্য ছিলেন, কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন। ১৯১২-২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

কনকশংকর রায়

নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ কলিকাতার শিয়ালদহ অঞ্চলে অবস্থিত চিকিৎসাবিদ্যার কলেজ। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসাবিদ্যার লাইসেন্‌সিয়েটশিপ পরীক্ষার জন্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ক্যাম্প্‌বেল মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বেই ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই কলিকাতা শহরের 'জাস্টিস অফ পীস' পদাধিকারীগণ ক্যাম্প্‌বেল হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন; ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর হাসপাতালটি

মেডিক্যাল স্কুলের সহিত যুক্ত হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্কুলটিকে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়; তখন হইতে ক্যাম্প্‌বেল মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যার স্নাতক (এম. বি. বি. এস.) পর্যায়ের জন্য শিক্ষাদান আরম্ভ হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ আগস্ট ক্যাম্প্‌বেল মেডিক্যাল স্কুলের প্রাক্তন প্রখ্যাত ছাত্র নীলরতন সরকারের স্মৃতিতে কলেজ ও হাসপাতালের নাম যথাক্রমে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও নীলরতন সরকার হাসপাতাল রাখা হয়। বর্তমানে প্রতি বৎসর কলেজটির প্রথম বার্ষিক চিকিৎসা (এম. বি. বি. এস.) শ্রেণীতে ১৩৫ জন ও প্রাক্‌-চিকিৎসা (প্রি-মেডিক্যাল) শ্রেণীতে ১২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রবেশলাভ করে। হাসপাতালটিতে বর্তমানে ১০০০ শয্যার ব্যবস্থা আছে; তন্মধ্যে চিকিৎসা বিভাগে (মেডিসিন) ৩৬৮, শল্যচিকিৎসা বিভাগে (সার্জারি) ৪০০, স্ত্রীরোগ বিভাগে (অব্‌স্টেট্রিক্স অ্যাণ্ড গাইনেকোলজি) ১৮৫ ও চক্ষু বিভাগে ৪৭টি শয্যা বর্তমান। হাসপাতালের বহির্বিভাগে গড়ে ২১০০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। বহির্বিভাগে পরিবার-পরিকল্পনার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

হীরালাল সাহা

নীহারবালা (?-১৯৫৫ খ্রী) নৃত্য-গীতে দক্ষ বিখ্যাত অভিনেত্রী। আনুমানিক ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রঙ্গালয়ে যোগ দেন। কয়েকটি ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয়ের পর আর্ট থিয়েটারের অধীনস্থ ষ্টার থিয়েটারে 'কর্ণার্জুন' নাটকে নিয়তির ভূমিকায় অভিনয় এবং গান করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার অভিনীত অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: নাহের ('বন্দিনী', ১৯২৪ খ্রী), নীরবালা (১৯২৪ খ্রী), সুদন্তা ('ঋষির মেয়ে', ১৯২৪ খ্রী), হিমি (১৯২৪ খ্রী), রামী (১৯২৬ খ্রী), বীরাবাই (১৯৩০ খ্রী), চন্দনা ('কারাগার', ১৯৩০ খ্রী), ব্রজরানী ('মা', ১৯৩৩ খ্রী) এবং আলেয়া (১৯৩৮) খ্রী)। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পণ্ডিচেরিতে নীহারবালার মৃত্যু হয়।

প্রবোধকুমার দাস

নীহারিকা, নেবিউলা শব্দটির দুইটি অর্থ—একটি ব্যাপক, অন্যটি অপেক্ষাকৃত সংকুচিত। ব্যাপক অর্থটি প্রাচীনতর। ঐ অর্থে দূর আকাশে পরিদৃষ্ট, মেঘ নয় অথচ পাতলা, ছোট মেঘের মত দেখায় এমন যে কোনও বস্তুই নীহারিকা। বর্তমানকালে কিন্তু উচ্চশক্তিসম্পন্ন দূরবীনগুলির আনুকূল্যে, বর্ণালী-বিশ্লেষ (স্পেকট্রোস্কোপিক অ্যানালিসিস) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ সত্য নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে মেঘ-সদৃশ ঐ বস্তুগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ দুই শ্রেণীর জোতিষ্ক আছে। একটি শ্রেণীতে আছে লঘু চাপের গ্যাস-সমষ্টি। আধুনিক নামকরণে বিশেষভাবে এই শ্রেণীটিকে বুঝাইতেই নীহারিকা শব্দটি ব্যবহার করা হয়, প্রাচীন অর্থের জের টানিয়া কেহ কেহ অবশ্য গ্যাসীয় (গেসিয়াস) বা ব্রহ্মাণ্ডভুক্ত (গ্যালাক্টিক) নীহারিকাও বলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মেঘসদৃশ বস্তুগুলিকে কখনও কখনও নক্ষত্র (স্টেলার) বা ব্রহ্মাণ্ড বহির্ভূত (এক্স্‌ট্রা গ্যালাক্টিক) নীহারিকা বলা হয়, যদিও আধুনিক ধ্যান-ধারণা অনুসারে নীহারিকা শব্দটি এক্ষেত্রে ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ। এগুলি আসলে এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড (গ্যালাক্সি)—ইহাদের প্রত্যেকটিতে আছে কোটি কোটি নক্ষত্র বা তারা, হয়ত বা কোনও কোনও নক্ষত্রের চারি পাশে সূর্যের মত গ্রহ-উপগ্রহ আছে, আর আছে গ্যাসীয় নীহারিকা। এগুলি সবই, বলাই বাহুল্য, 'আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে'র বাহিরে অবস্থিত।

কালপুরুষ (ওরায়ন) মণ্ডলের মধ্যে দুইটি (গ্যাসীয়) নীহারিকা আছে—বৃহৎ (গ্রেট) নীহারিকা ও অশ্বমুণ্ড (হর্স হেড) নীহারিকা; দেবযানী (আন্‌ড্রোমিডা) মণ্ডলের মধ্যে পরিদৃষ্ট সুপরিচিত মেঘ-সদৃশ জ্যোতিষ্কটি একটি নক্ষত্র নীহারিকা বা ব্রহ্মাণ্ড।

নীহারিকা বা গ্যাসীয় নীহারিকা দুই প্রকারের—উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল। কালপুরুষের অন্তর্গত বৃহৎ নীহারিকা উজ্জ্বল, অশ্বমুণ্ড নীহারিকা অনুজ্জ্বল। উজ্জ্বল নীহারিকাকে সরাসরি দেখা যায়, অনুজ্জ্বল নীহারিকা দেখা যায় পরোক্ষভাবে—দৃষ্টিপথের বাধা হিসাবে।

উজ্জ্বল নীহারিকার বর্ণালীতে অত্যুজ্জ্বল বিচ্ছুরণ রেখা (ব্রাইট এমিশন লাইন্‌স) থাকে, কালো বিশেষণ রেখা (ডার্ক অ্যাব্‌জরপ্‌শন লাইন্‌স) থাকে না। ব্রহ্মাণ্ড বা নক্ষত্র প্রধান নীহারিকা হইতে ইহাই উজ্জ্বল নীহারিকার দৃশ্যগত পার্থক্য।

দ্র Edwin P. Hubble, *The Realm of the Nebulae*, Oxford, 1936; Edward Arthur Fath, *The Elements of Astronomy*, New York, 1955; Robert H. Baker, *Astronomy*, Princeton, 1964.

রমাতোষ সরকার

নূরজাহান (১৫৭৭-১৬৪৫ খ্রী) পূর্ব নাম মেহেরউন্নিসা। তিনি মীর্জা গিয়াস বেগ নামক জনৈক ইরানীর কন্যা।

পিতার ভাগ্যানুসন্ধানে ভারতে আসার পথে কান্দাহারে তাঁহার জন্ম হয়। গিয়াস বেগ পরবর্তীকালে মোগল সরকারে উচ্চ পদাধিকারী হইয়াছিলেন এবং ইতিমাদ-উদ্দৌলা উপাধিতে ভূষিত হন। মেহেরউন্নিসা ছিলেন অসামান্যা রূপবতী। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে সম্রাট আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু আকবরের চেষ্টায় ১৭ বৎসর বয়সে আলী কুলী নামে এক ইরানীয় যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। একাকী একটি ব্যাঘ্র হত্যা করায় আলী কুলী 'শের আফগান' উপাধিতে ভূষিত হন। বিবাহের পর শের আফগান বর্ধমানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর সম্রাট হইলে বঙ্গ দেশের শাসনকর্তার সহিত সাক্ষাৎকালে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে শের আফগান নিহত হন এবং মেহেরউন্নিসা ও তাঁহার কন্যা রাজধানীতে মোগল রাজপ্রাসাদে নীত হন। শের আফগানের মৃত্যুতে জাহাঙ্গীরের কোনও হাত ছিল কিনা সেই সম্বন্ধে সমসাময়িক অকাট্য প্রমাণ না থাকিলেও কতকগুলি পারিপার্শ্বিক ঘটনা তাঁহার উপরে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে। মেহেরউন্নিসার প্রতি জাহাঙ্গীরের পূর্বরাগ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে কিন্তু এই সমুদয়, এমন কি তাঁহার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কিছুই সম্রাট আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন নাই। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ করেন। মেহেরউন্নিসা ঐ বৎসর 'নূরমহল' এবং ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'নূরজাহান' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা এবং কবিতা, সংগীত ও চিত্রশিল্পে অনুরাগী। ফারসী ভাষায় তিনি কবিতা রচনা করিয়াছেন। সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় তিনি প্রবল প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহার কার্যের মধ্যে অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহার ক্ষমতালিপ্সা ও স্বার্থান্ধতার জন্য প্রথমে শাহ্‌জাহান ও পরে সেনাপতি মহবৎ খাঁ বিদ্রোহ করেন। কিন্তু এই সকল বিদ্রোহ-দমনে নূরজাহান সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহান সম্রাট হইলে রাজ্যশাসনে নূরজাহানের আর কোনও ক্ষমতা রহিল না। শাহ্‌জাহান ভরণপোষণের জন্য নূরজাহানকে বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন এবং নূরজাহান কন্যাসহ সাধারণতঃ লাহোরে বাস করেন। আগ্রায় তিনি পিতা ইতিমাদউদ্দৌলার ও লাহোরের সন্নিকটে শাহ্‌দারাতে জাহাঙ্গীরের সমাধিসৌধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

নৃতত্ত্ব মানুষের দেহ, মন, আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতি লইয়া বহুকাল যাবৎ নানা শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, যথা আয়ুর্বেদ, মনোবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি। মানববিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী এবং তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতিতে কিন্তু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ১৯শ শতাব্দীতে ইওরোপে বিজ্ঞানের যে উন্মেষ ঘটে তাহার ফলে উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানবজাতির বিষয়ে নূতন কৌতূহলের উদ্রেক হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিরীক্ষা ও পরীক্ষার দ্বারা মানুষের দেহ এবং জীবনধারণের পদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়া যে নূতন বিদ্যা গড়িয়া উঠিল, তাহাকে বাংলা ভাষায় মানববিজ্ঞান, নৃবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, নরতত্ত্ব বা নরদেহতত্ত্ব আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

ইহার মোটামুটি দুই শাখা; একটি কায়বিষয়ক, অপরটি সংস্কৃতিবিষয়ক। সমগ্র পৃথিবীতে কত প্রকারের মানুষ আছে, তাহাদের দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপাত, রক্তাদি অথবা শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া একই প্রকারের না স্বতন্ত্র, কালবশে ইহাদের বিবর্তন কেমনভাবে ঘটিয়াছে, এইগুলি হইল মানববিজ্ঞানের অন্তর্গত এক শাখার আলোচনার বিষয়। ইহাকে কায়বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। ইংরেজী ভাষায় ইহাকে 'ফিজিক্যাল অ্যান্থ্রোপলজি' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

অপরাপর জীবজন্তুর মত মানুষও বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনে খাওয়া পরা, ঘর বাঁধা অথবা সমাজনিয়ন্ত্রণের নানাবিধ ব্যবস্থা রচনা করিয়াছে। ইতরজাতীয় প্রাণীর জীবনযাত্রাপ্রণালী সহজাত প্রবৃত্তিনিচয়ের দ্বারাই প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়। পাখির ছানা মাকে দেখিয়া কিছু কিছু শিখিলেও তাহার খাওয়ার ধরনধারণ, গান গাওয়া, বাসা বাঁধা প্রভৃতি কার্য জন্মলব্ধ প্রবৃত্তির দ্বারাই সমধিক পরিচালিত হয় বলিয়া প্রাণিবিদ্‌গণ মনে করেন; কিন্তু মানুষের বেলায় শিক্ষা বা অনুকরণের প্রভাব সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাব অপেক্ষা যেন বেশি বলিয়া মনে হয়। হয়তো অনুকরণের তাগিদ জন্মগত প্রবৃত্তির বশে দেখা দেয়। শিক্ষার বা পার্শ্ববর্তী মানুষের আচরণের প্রভাবে মানুষের আচরণে জন্মলব্ধ প্রবৃত্তির প্রভাব সহজে চোখে পড়ে না। মানববিজ্ঞানের যে শাখায় এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে গবেষণা হয়, তাহাকে সংস্কৃতিবিজ্ঞান (কাল্‌চারাল অ্যান্থ্রোপলজি) আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

মানুষ একা থাকে না। মৌমাছি, পিপীলিকা বা উই-এর মত মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। বহু মানুষ নানাভাবে মিলিত হইয়া স্বীয় জৈব প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার প্রয়াস

করে। পরিবার, গোষ্ঠী, গোত্র, জাতিব্যবস্থা, পঞ্চায়ত, রাষ্ট্র প্রভৃতি বিবিধ সামাজিক সংগঠন নানাভাবে মানব-জীবনের প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে সহায়তা করে। মানববিজ্ঞানের এক শাখা, অথবা সংস্কৃতিবিজ্ঞানের এক উপশাখায় বিশেষভাবে ইহারই চর্চা হইয়া থাকে। সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকিলেও এই শাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহাকে এক স্বতন্ত্র শাখারূপে গণ্য করা চলে।

শেষোক্ত দুই শাখার সহিত মানববিজ্ঞানের অপর এক উপশাখার উল্লেখও এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। পশুপক্ষী মায়ের কাছে কিছু শিখিবার সময়ে মায়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনার অনুকরণ করে। মানবশিশুর অবস্থাও কতকটা এইরূপ। কিন্তু যতই সে বড় হয়, বাহ্য দৈহিক ক্রিয়ার সদ্য সদ্য অনুকরণ না করিয়া তাহার অন্তর্বর্তী গুণ, ভাব বা যুক্তিকে আশ্রয় করিবার চেষ্টা করে। ঘটনানিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিবার শক্তি বোধ হয় প্রাণিজগতে শুধু মানুষের মধ্যেই বর্তমান। এইরূপ ঘটনানিরপেক্ষ চিন্তা মানুষ ভাষার সহায়তায় বা শব্দের আশ্রয়ে সম্পন্ন করিয়া থাকে। মানববিজ্ঞানের যে উপশাখায় ইহার বিজ্ঞানসিদ্ধ আলোচনা হয়, তাহা সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী স্বতন্ত্র শাখার মর্যাদালাভের যোগ্য।

কায়বিজ্ঞান: যে-কোনও লোকের দৃষ্টিতে ইহা সহজেই ধরা পড়িবে যে, সকল দেশের মানুষের গায়ের রং, মুখের গড়ন বা শরীরের পরিমাপ এক রকমের নয়। কেহ রক্তাভ, কেহ বা পীতবর্ণ। কাহারও শরীর দীর্ঘায়ত, কেহ বা খর্বাকৃতি। কাহারও চুলের পরিমাণ দেহে বা মাথায় বেশি, কাহারও কম। কোনও চুল কোঁকড়ানো, কোনওটি ঢেউ-খেলানো অথবা সোজা। নরদেহবিজ্ঞানী সূক্ষ্মভাবে ইহাদের প্রকারভেদকে শুধু নিরীক্ষণ করেন না, সম্ভব হইলে সেগুলিকে মাপিবার চেষ্টা করেন। দেহের এই ধরনের লক্ষণগুলি রৌদ্র-বৃষ্টি বা অপরাপর প্রাকৃতিক পরিবেশের আঘাতে অথবা খাদ্যের তারতম্য অনুসারে পরিবর্তিত হয় কিনা, মানববিজ্ঞানী ইহা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন। যে-সকল শারীরিক লক্ষণ বাহিরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় না অথবা অত্যল্পমাত্রায় পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ যেগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে এক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বংশানুক্রমে রহিয়া যায়, তিনি সেগুলিকে বাছিয়া লন এবং সেই সকল লক্ষণের সাহায্যে মানব-পরিবারকে বিভিন্ন জাতি বা রেসে (race) বিভক্ত করিবার চেষ্টা করেন। এইরূপে চুলের ধরন ও পরিমাণ, করোটির আকৃতি, নাকের গড়ন, শরীরের দৈর্ঘ্য বা গায়ের রং প্রভৃতি জাতিবিভাগের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কায়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোনও একটি বিশেষ লক্ষণকে একান্তভাবে আশ্রয় করা চলে না। সেইজন্য পর পর কয়েকটি লক্ষণের সমাবেশের উপরে সমধিক নির্ভর করিতে হয়।

কয়েক বৎসর যাবৎ জাতি বিচারের জন্য অপর এক লক্ষণের ব্যবহার বেশি মাত্রায় হইতেছে। মানুষের করতলে বা আঙুলের অগ্রভাগে চর্মের উপরে যে সূক্ষ্ম দাগ থাকে তাহার সমাবেশে নানাবিধ নকশা রচিত হয়। ইহাদের প্রকারভেদ আছে। এক এক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ নকশার কমবেশি দেখা যায়। কোনও মানবগোষ্ঠীর মধ্যে শুধু একপ্রকারই থাকিবে, অপরটি থাকিবে না, এরূপ হয় না। যদি দুই বিভিন্ন মানবদলের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যায় নমুনা লওয়া যায় এবং যদি উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন নকশার অনুপাতে সমতা থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে জাতিগত কোনও সম্পর্ক বর্তমান, ইহা যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে।

এই লক্ষণটির বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা বাহ্য প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না এবং পুরুষানুক্রমে এক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ইহার অনুপাতের স্থিরতা দেখা যায়। নরদেহ-বিজ্ঞানীগণ শরীরের এইরূপ আরও কোনও লক্ষণ আছে কিনা, সতত তাহার সন্ধানে নিরত আছেন।

কয়েক বৎসর হইল, রক্তের মধ্যে অবস্থিত কতকগুলি যৌগিক পদার্থের গুণানুযায়ী রক্তকে এ, বি, এবি প্রভৃতি শ্রেণীতে (ব্লাড-গ্রুপ) বিভক্ত করা হইয়াছে। অস্ট্রেলীয়, মঙ্গোলীয় বা ভারতীয় মানবগোষ্ঠীতে এই সকল রক্তশ্রেণীর অনুপাত কমবেশি পরিমাণে বর্তমান। কোনও জাতির মধ্যে বি-এর প্রাধান্য দেখা যায় কোথাও বা অপরটির। ইহার সহায়তায়ও মানুষের জাতিবিভাগের চেষ্টা চলিতেছে। রক্তশ্রেণীর (ব্লাড-গ্রুপ) সম্বন্ধে কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। হাতের তালুর নকশার অনুপাত যেমন বাহ্য কারণে পরিবর্তিত হয় না, রক্তশ্রেণীর বেলায় কিন্তু তাহা ঠিক বলা চলে না। এ-বিষয়ে গবেষণা এখনও চলিতেছে। কিন্তু এখন মনে হইতেছে যে, মানবশরীরে আভ্যন্তরীণ কোনও প্রয়োজনের বশে পুরুষানুক্রমে ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হয়; রক্তশ্রেণীর অনুপাতে ভিন্নতা হয়তো আসিয়া পড়ে।

সংস্কৃতিবিজ্ঞান: কোনও এক পরিবারে মৃত্যু ঘটিলে সকলে শোকার্ত হয়। সকল দেশেই মানুষ যাহাকে

ভালবাসে বা শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাকে হারাইলে কাতর হয়; কিন্তু বিভিন্ন সমাজে শোকের প্রকাশ বিভিন্ন প্রকারে ঘটিয়া থাকে। ক্ষুধা, পিপাসা, কামনা, প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা সকল মানুষের মধ্যেই বর্তমান। কিন্তু সমাজে সমাজে তাহার প্রকাশে অথবা পরিতৃপ্তির জন্য কর্মব্যবস্থায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। সমাজে স্বীকৃত যে যে উপায়ে মানুষ বাসনা পরিপূরণ করে বা অন্তঃস্থিত ভাবের প্রকাশসাধন করে সংস্কৃতিবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেই বিষয়ে গবেষণা করা হইয়া থাকে।

মানুষের বাসনাদিকে মূলতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে। সেগুলি অর্থ, কাম অথবা মোক্ষের চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত। অর্থ বা শরীরধারণের প্রয়োজনবশে, কামনার পরিতৃপ্তির জন্য অথবা মোক্ষের অনুসন্ধানে মানুষ অনেক কিছু করিয়া থাকে। জীবনের এই বহিঃপ্রকাশকে আবার চারি স্তরে বিভক্ত করা যায়, যথা বস্তু, ক্রিয়া, সংস্থান ও তত্ত্ব।

আহারের সন্ধানে মানুষ চাষ করে। চাষের জন্য লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে ইত্যাদি নির্মাণ করিতে হয়। এগুলি 'বস্তু'-শাখার অধীন। লাঙ্গল কিভাবে চালাইতে হয়, বীজ কিভাবে বপন করিতে হয়, ঢেঁকি বা উদুখলের ব্যবহার কেমন, এই সকল বিদ্যা মানুষ পুরুষানুক্রমে একে অপরকে শিখাইয়া আসিতেছে। এগুলি 'ক্রিয়া'-শাখার অধীন। জমিকে আশ্রয় করিয়া যাহারা কাজ করে, তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য কামার, কুমার প্রভৃতি কারিগর, জ্যোতিষী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ, এমন কি আইনকানুন-প্রণেতা রাজকর্মচারী এবং শাসনব্যবস্থারও প্রয়োজন হয়। এগুলি 'সংস্থান'-শাখার অন্তর্ভুক্ত। এ সকলের পিছনেই কিন্তু তত্ত্ব বর্তমান। চাষী অভিজ্ঞতা-প্রসূত বহুবিধ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকে। বস্তু, ক্রিয়া ও সংস্থানের মত এই তত্ত্বও সমাজে পুরুষানুক্রমে ধৃত হইয়া থাকে।

এই তত্ত্ব দুইপ্রকার—বিচারমূলক ও বিশ্বাসমূলক। নূতন অভিজ্ঞতার বশে, বিচারের দ্বারা তত্ত্বের কিয়দংশ ক্রমাগত রূপান্তরিত ও সমৃদ্ধ হয়। আবার কিছু অংশ, যাহা বিশ্বাসমূলক, তাহা অনেক সময়ে অবিকৃত থাকিয়া যায়। কোনও চাষী যদি বিশ্বাস করে, অম্বুবাচীর সময়ে পৃথিবী রজস্বলা হন এবং সেই সময়ে হলকর্ষণ করিতে নাই, তবে বিশ্বাসমূলক তত্ত্বের এই অংশ বিচারে না টিকিলেও ফেলিয়া দিবার জিনিস নয়, কারণ এই বিশ্বাসের বশে চাষীর ক্রিয়াকলাপ কিয়দ্দূর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

সংস্কৃতিবিজ্ঞানী যেমন বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার এবং জীবনযাত্রা-প্রণালীকে নিরীক্ষণ করিয়া শ্রেণীবিভাগ করেন ও পরস্পরের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন, তেমনই কালের বশে এই সকল বিষয়ের কিরূপ পরিণতি ঘটে তাহাও বুঝিবার চেষ্টা করেন।

সমাজবিজ্ঞান: ইংরেজীতে এই অংশকে সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপলজি আখ্যা দেওয়া হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, স্বীয় জৈব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য মানুষ নানাবিধ সংস্থা রচনা করিয়াছে। তাহার মধ্যে কোনওটি আকারে ছোট, কোনওটি বড়। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে লইয়া মানবের পরিবার রচিত হয়। যে-কোনও মানুষের জ্ঞাতি এবং কুটুম্ব বলিতে আরও কয়েকজন মানুষকে বুঝায়। তাহার মধ্যে কাহারও সহিত বংশগত সম্পর্ক এবং কাহারও সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক বর্তমান। প্রতি সংস্থার অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের মধ্যে নানাবিধ আদানপ্রদানের সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে। তাহারা পরস্পরের প্রতি কর্তব্যের বন্ধনেও আবদ্ধ থাকে। মানুষ এইভাবে সহযোগিতার সূত্রে পরস্পরকে বাঁধিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার চেষ্টা করে।

বংশগত এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও মানুষ পরস্পরের সহিত সহযোগিতার সূত্রে বাঁধা পড়ে। অসম্পর্কিত কয়েকটি পরিবার পাশাপাশি বসবাস করিলে সুখদুঃখের জালে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরে। একত্র বাস করা, একই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা, পরস্পরের স্বার্থপোষণের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা, এইরূপ নানাবিধ কারণে মানুষ সংস্থা রচনা করিয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কোনও সংস্থাই নিছক একটি প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। পরিবারের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ কেবলমাত্র ভালবাসাপ্রসূত নয়। উভয়ে অন্নের বন্ধনে পরস্পরের সহিত জড়িত; পুত্রকন্যার লালনপালনের ভার উভয়ের উপর ন্যস্ত। রাজনৈতিক সংস্থা শুধু মানুষকে ক্ষমতার অংশীদার করে না, আর্থিক জীবনের সহিতও রাষ্ট্রশক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কামনার পরিতৃপ্তিও মানুষ অনিয়ন্ত্রিতভাবে করিতে পারে না। পরিবার, গোষ্ঠী, গোত্র, জাতি, বর্ণ, রাষ্ট্র—সকল সংস্থাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের অন্নচেষ্টা ও কামচেষ্টাকে সংকুচিত অথবা বিশেষ পথে পরিচালিত করে।

সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন সংস্থার শ্রেণীবিভাগ করিবার

সময়ে তাহারা কোন কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে সে বিষয়ে বিবেচনা করেন। মানুষের জীবন যেমন সচল, সংস্থাসমূহের চরিত্রও তদ্রূপ। তাহারাও স্থিতিশীল নয়। তাহাদের বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ রূপে নদীর জলস্রোতের মত নিয়ত পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। আজ যে নদী বহিয়া চলিয়াছে, কাল তাহার সেই জল আর নাই, অথচ আপাতদৃষ্টিতে নদী তেমনই রহিয়াছে। মানুষের সংস্থার মধ্যেও অনুরূপ পরিবর্তন কেমন ভাবে ঘটে, ইহা কোনও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন কিনা— বিজ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন অনুসন্ধানকারী অবিরত তাহারই সন্ধানে লিপ্ত রহিয়াছেন।

মোট কথা, মানববিজ্ঞানী মানুষের শরীর, সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থাদির মধ্যে এবং তাহাদের বিবর্তনে প্রাকৃতিক নিয়মের কোনও প্রভাব দেখা যায় কিনা তাহার অনুসন্ধান করেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসিদ্ধ নিরীক্ষা ও পরীক্ষার পদ্ধতিকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন।

দ্র Edward B. Tylor, *Anthropology*, London, 1924; Franz Boas, ed., *General Anthropology*, New York, 1938; A. L. Kroeber, *Anthropology*, London, 1948; T. K. Penniman, *A Hundred Years of Anthropology*, London, 1952; Nirmal Kumar Bose, *Cultural Anthropology and Other Essays*, Calcutta, 1953.

নির্মলকুমার বসু

নৃত্য প্রাচীন ভারতে চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মতই নৃত্যকলাকেও যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থেও তাহার যথোচিত উল্লেখ আছে। ঋগ্‌বেদে বিবাহ, ফসলকাটা ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে নৃত্যের উল্লেখ আছে। নর্তকী বলিয়া উষসের বর্ণনা আছে। ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারেরাও নৃত্যে অভিজ্ঞ। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে 'ইয়াতি' অর্থে আবৃত্তিসহ নাচ বোঝায়।

রামায়ণ-মহাভারতের কালে সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল নাচ। অর্জুন দক্ষ নৃত্যশিল্পী ছিলেন। ভাগবত-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনীদের রাসনৃত্যের অপূর্ব বর্ণনা আছে। কবি কালিদাস নানা উপলক্ষে নাচের উল্লেখ করিয়াছেন। উমা ও শিবের লাস্য ও তাণ্ডবনৃত্যের মিলিতরূপ তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রমের নায়িকার মধ্যে দেখাইয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা নৃত্যকলার একান্ত অনুরক্ত। কয়েকটি দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যগ্রন্থে নাচের কথা বারবার উল্লিখিত হইয়াছে। সেগুলিতে নাচের মঞ্চসজ্জা ও বেশভূষা সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। মন্দিরের সেবায় রাজা ও রানীরা নৃত্যকুশলী মেয়েদের উৎসর্গ করিতেন।

সাঁচি, অমরাবতী, কণারক, খজুরাহো, অজন্টা, এলোরা প্রভৃতি অনেক স্থানে বহু প্রাচীন মন্দির-গাত্রে নাচের ভঙ্গীর ছবি ও মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল তাণ্ডবনৃত্যরত নটরাজ শিবের মূর্তি। চিদাম্বরম মন্দিরের গোপুরমের গায়ে পাথরে খোদাই করা ১০৮টি নৃত্যরত মূর্তি আছে। এই মূর্তিগুলি ভরত-রচিত নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্রের উদাহরণস্বরূপে গঠিত।

ক্রমে ক্রমে নৃত্যচর্চায় নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল এবং ১৯শ শতাব্দীতে তাহা ধনীদের অবসর-বিনোদনের উপায় হইয়া পড়িল। বর্তমানে নৃত্যকলার পুনর্জন্ম হইয়াছে, সাংস্কৃতিক জীবনে তাহার একটি বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে নৃত্যের ৪টি প্রধান ধারা আছে: ভরতনাট্যম, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী। উপরন্তু আরও বহু ধরনের নাচ সারা ভারতে ছড়াইয়া আছে, যেমন ওড়িশার ওড়িশী নাচ, অন্ধ্রের কুচুপুড়ি, কেরলের মোহিনী অট্টম, তামিলনাদের ভাগবত-মেলা, গুজরাতের গরবা ও রাস, পাঞ্জাবের ভাঙ্গড়া ইত্যাদি।

ভরতনাট্যম প্রাচীন নৃত্যরীতির সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রূপ, দক্ষিণ ভারতের 'সাদির' বা 'দাসী অট্টম' বর্তমানে এই নামে প্রচলিত। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে তাঞ্জোরের 'নটবান'-দের হস্তে এই নাচের বর্তমান রূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল। আলারিপ্পু নামে উদ্বোধনী নাচের পর এক-একটি নাচে যেন পদ্মের পাপড়িগুলি খুলিতে থাকে— 'যতিস্বরম্', 'শব্দম্', 'বর্ণম্', 'অভিনয়ম্' শেষ করিয়া আসে 'তিল্লানা'—নাচের শেষ চূড়ান্ত পর্যায়। এই নাচ আঙ্গিক ও রসের বিচারে একান্তভাবে মেয়েদের কামনা, আনন্দ ও বিচ্ছেদ-সংবলিত শৃঙ্গার রসের নাচ; মূল চরিত্র কৃষ্ণ, কিন্তু শিব ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেও নাচ আছে। এই নাচের সঙ্গে গান হয়, আর বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, এখন বাঁশি ও বেহালাও বাজানো হয়। মীনাক্ষীসুন্দরম পিল্লাই এই নাচের শ্রেষ্ঠ গুরু ছিলেন। বর্তমানে ইহার শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম বাল-সরস্বতী। পায়জামার উপর শাড়িটাকে অর্ধেক ধুতির ছাঁদে বাঁধিয়া এই নাচের বেশ তৈয়ারি হয়।

কথক উত্তর ভারতের ধ্রুপদী নৃত্যকলা। লখনৌ আর জয়পুর ইহার প্রধান চর্চাকেন্দ্র। ভরতনাট্যমের

মত নাচের তিনটি উপাদানই ইহাতে আছে— নৃত্ত অর্থাৎ বিশুদ্ধ ছন্দভিত্তিক নাচ, নৃত্য অর্থাৎ রসপ্রকাশের উপযোগী নাচ, নাট্য বা অভিনয়সমৃদ্ধ নাচ। কথক প্রধানতঃ 'নৃত্ত', মুদ্রার ব্যবহার ইহাতে খুবই কম। সূক্ষ্ম, তীব্র পায়ের কাজই এই নাচের প্রাণ। শিল্পীরা কখনও কখনও এত নৈপুণ্য লাভ করেন যে জলভরা থালার কাণায় তবলার বোলের সঙ্গে নাচেন, কিন্তু এক ফোঁটা জলও বাহিরে পড়ে না। কিছুকাল আগেও এই নাচ কেবল বাইজীরা নাচিত। লখনৌর বৃন্দাদীন মহারাজ এই ঘরানার শ্রেষ্ঠ নাম। ইহা ছাড়া অচ্ছান মহারাজ, লচ্ছু মহারাজ, শম্ভু মহারাজ এবং বির্জু মহারাজ এই নাচের প্রখ্যাত শিল্পী। এই নাচের সঙ্গে ক্রমাগত সারেঙ্গীতে গৎ বাজানো হয়, আর বাজে তবলা।

মালাবারের কথাকলিতে ভরত-নির্দেশিত রসোদ্রেক-কারী নাট্যীয় উপাদানকে রক্ষা করা হইয়াছে। এই মূক নৃত্যকলায় অঙ্গ-ভঙ্গী, মুদ্রা ও মুখের অভিনয়ের দ্বারা রামায়ণ-মহাভারতের গল্পাংশকে ফুটাইয়া তোলা হয়। কথাকলি কেবল ছেলেদের নাচ; কঠিন অনুশীলনসাপেক্ষ। ছেলেরাই মেয়েচরিত্রের ভূমিকা লয়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিনটি বিশেষণে কথাকলির তিনটি ধারাকে চিহ্নিত করা যায়। নাচের প্রসাধন অত্যন্ত জটিল— সাত্ত্বিক চরিত্রের জন্য সবুজ রঙের 'আচ্ছা', রাজসিকের জন্য 'কট্টি' বা লাল, ঋষি ও নারীদের জন্য 'মিনুক'। হাতওয়ালা জামা, শক্ত মাড় দেওয়া ঝালর দেওয়া ঘাঘরা, প্রচুর অলংকার, একটি বড় মুকুট এই নাচের বেশ। চরিত্রগুলিকে এই সাজে মহাকাব্যের অঙ্গ বলিয়া মনে হয়। খোলা জায়গায় বড় বড় পিতলের প্রদীপ জ্বালাইয়া এই নাচের আয়োজন হয়। মাদল, চাণ্ডা, নাগশরম এই নাচের বাজনা। কেরলের কবি ভাল্লাথোল এই নাচকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে মণিপুরের নাচ তাহাদের ধর্মোপাসনার ও সামাজিক জীবনের অঙ্গ। পুরাতন মণিপুরী নাচ শিব-পার্বতীর সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু বৈষ্ণবতার আবির্ভাবের পর মণিপুরী নাচ ও রাসলীলা প্রায় সমার্থক হইয়া গিয়াছে। মণিপুরী নাচের প্রধান চারিটি ভাগ হইল— লাইহারওবা, অস্ত্রবিদ্যা, চলনগঠন এবং রাসলীলা।

শিবপার্বতীর অবতার খাম্বা ও থাইবির প্রেম-কাহিনীকে ঘিরিয়া একক, দ্বৈত বা সমবেত নাচের নাম লাইহারওবা— মণিপুরের প্রাচীনতম নৃত্যভঙ্গী। সরল ছন্দোময় ভঙ্গীতে বহু লোকের সমবেত এই নৃত্য-পদ্ধতি অত্যন্ত সুন্দর। প্রতি চৈত্র ও বৈশাখে মইরং গ্রামে দেবমন্দিরের সামনে এই নাচের আয়োজন হয়।

অস্ত্রবিদ্যা—তরোয়াল, বর্শা ইত্যাদি লইয়া দৈহিক ক্রীড়া কৌশলের নাচ। সুদীর্ঘ অনুশীলনে এই নাচের উপযোগী তীক্ষ্ণতা ও শক্তি সঞ্চয় করা যায়। দুর্গাপূজার সময়ে 'কাক থাম্বা' উপলক্ষে এই নাচের বিশেষ অনুষ্ঠান হয়।

চলনগঠন—মণিপুরের বৈষ্ণবতার আবির্ভাবের সঙ্গে জড়িত। মঞ্জীর, করতাল, খোল, মৃদঙ্গ প্রভৃতির সঙ্গে এই নাচটিকে কীর্তন নাচ বলা যাইতে পারে। মঞ্জীর করতালসহ অর্ধবৃত্তাকারে নর্তকেরা দাঁড়ায়, শেষ দুই প্রান্তে খোলবাদক দুইজন দাঁড়ায়। প্রথমে মন্দিরার সঙ্গে ধীর গতিতে ছন্দোময় নাচ চলে, পরে খোলবাদকেরা নাচকে দ্রুত গতিতে আগাইয়া লইয়া যায়। প্রচণ্ড উদ্যমে দুলিয়া লাফাইয়া পাক খাইয়া নাচকে উত্তেজনার চরম শিখরে লইয়া যায়।

বৈষ্ণব মণিপুরের নৃত্যসাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ রাসলীলা। শ্রীকৃষ্ণের জীবনটিকে তাঁহারা নাচে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন। রাসকে নাটক বলিয়া বর্ণনা করা হইলেও নাচ ও গানেরই এখানে প্রাধান্য। ধাপে ধাপে নাচের ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়া চূড়ান্ত মিলনের মহারাস অগ্রসর হইয়া আসে। ঐ পাঁচটি ধাপ হইল ভাঙ্গি পারেং, খুরুম পারেং, বৃন্নাং পারেং, গোষ্ঠ পারেং আর গোষ্ঠ বৃন্নাং পারেং। প্রথম তিনটি মেয়েদের লাস্যনৃত্য, পরের দুইটি ছেলেদের তাণ্ডবনৃত্য। রাসনৃত্যে মেয়েদের পোশাক শক্ত ঘেরওয়ালা সাটিংয়ের ঘাঘরা ও তাহাতে কাচ, জরি ইত্যাদি বসানো, মুখঢাকা একটি ওড়না, পুরুষদের পাগড়ি ও কোমরবন্ধ। কৃষ্ণের সজ্জা পীতবর্ণের ধুতি, অলংকার ও মুকুট। সঙ্গে গীতগোবিন্দের কীর্তন আর খোলমৃদঙ্গের বাদ্যধ্বনি।

শ্রীমতী ঠাকুর

নৃত্যনাট্য নাটকের পরিধির মধ্যে নৃত্যনাট্যের প্রবেশ বর্তমান যুগের ঘটনা। 'নৃত্যনাট্য' নামটিও আধুনিক। লৌকিক এবং ধ্রুপদী (ক্লাসিক্যাল) আদর্শের ভারতীয় নাটকে গানের ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য। আবার স্থান-বিশেষে গানের সঙ্গে নাচের ব্যবহার না করিলে যেন ভাবরসের অপূর্ণতা থাকিয়া যায়। ভারতীয় সাহিত্যে কথার নাটকে গান এবং গানের সঙ্গে ভাবনৃত্যের অনুপ্রবেশ অতি স্বাভাবিকভাবেই ঘটিয়াছে। বোধ হয় একারণেই নৃত্যবহুল নাটকেরও 'নৃত্যনাট্য'রূপে স্বতন্ত্র নামকরণের প্রয়োজন হয় নাই।

নৃত্যনাট্য অপেক্ষা গীতিনাট্য কথাটির সহিত আমরা সমধিক পরিচিত। গীতিনাট্যকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা'। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া বলা চলে, নৃত্যনাট্য নাট্যের সূত্রে নৃত্যের মালা। যে নাট্যের আদ্যোপান্ত সব পাত্র-পাত্রীর দ্বারা নৃত্যে অভিনীত হয়, তাহকেই যথার্থ নৃত্যনাট্য বলা যায়।

নৃত্যের ভাষায় নাটক রচনা পূর্বে এদেশে বিরল ছিল। শুধু ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বর্তমান কেরলের 'কথাকলি' নৃত্যে অভিনয় অংশের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এই নৃত্যকে সমালোচকেরা আখ্যান-নৃত্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অঙ্গভঙ্গীর বিভিন্ন মুদ্রার সাহায্যে এই নৃত্যাভিনয় পরিবেশিত হয়। মূকাভিনয়ের পরিমার্জিত রূপের সঙ্গে দেহভঙ্গীর সুষমা এবং সংগীতের মাধুর্যের সংমিশ্রণে এই নৃত্যপদ্ধতি একটি পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর অঞ্চলেও যে নৃত্যপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার সাহায্যে কৃষ্ণলীলার পালা অভিনীত হয়। কিন্তু কথাকলি হইতে তাহার রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। মণিপুরী নৃত্যে একটি বিশেষ ভঙ্গীর পুনঃপুনঃ অনুবৃত্তির দ্বারা হৃদয়াবেগের প্রকাশ হয়। কথাকলির মত প্রত্যক্ষ অভিনয়ের প্রচেষ্টা না থাকিলেও মণিপুরী নৃত্যে অভিনয়ের আভাস আছে। কীর্তনাঙ্গ গানও ইহার বিশেষ অঙ্গ।

বাংলা দেশে অবশ্য কোনও আঙ্গিকভিত্তিক বা আঙ্গিকসর্বস্ব নাচ ছিল না। এখানে প্রচলিত নৃত্য হইল বাউলদের বা কীর্তনীয়াদের নৃত্য। অন্যান্য অপ্রধান নৃত্যপদ্ধতি মোটামুটি ইহাদের অনুসরণ করিয়াছে। এই নৃত্য শুধু ভাবপ্রকাশের বাহন বা সংগীতের তাল ও লয়ের প্রত্যক্ষগোচর লীলা। নৃত্য এই সব স্থলে অন্তরালবর্তী, সংগীতই মুখ্য। বোধ হয়, এইজন্যই বাংলা দেশে গীতিনাট্যেরই প্রচলন বেশি ছিল। গীতিনাট্যের নানা প্রকারভেদও আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে নাট্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে সুরে কথা বলিতে হয়, আবার কোনও ক্ষেত্রে গানের সঙ্গে নৃত্যভঙ্গীও আসিয়া পড়ে। এই সংগীত এবং নৃত্য ঘটনাস্রোতের উপর নির্ভর করে না, ঘটনাস্রোতকে আগাইয়াও লইয়া যায় না, শুধু পাত্র-পাত্রীর তৎকালীন হৃদয়াবেগকেই বিচিত্র বর্ণে এবং গভীরতায় প্রকাশ করে। কীর্তনের পালাগান, যাত্রাভিনয় এই শ্রেণীরই নৃত্যসম্বলিত গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' বা 'তাসের দেশ' এই শ্রেণীরই পরিচ্ছন্ন আধুনিক রূপ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "অভিনয় জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে বেশি ঝোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিক পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতরের দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে" (অন্তর বাহির, 'সংগীতচিন্তা', পৃ ৩৪)। উল্লিখিত গীতিনাট্যগুলিতে লীলাপ্রকাশের বাহনরূপেই সংগীত এবং স্বল্প পরিমাণে নৃত্যের ব্যবহার আছে। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গীতিনাট্যের পরিশুদ্ধ রূপই আধুনিক গীতিনাট্য। কিন্তু নৃত্যনাট্য রবীন্দ্রপ্রতিভারই বিশেষ দান। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে আঙ্গিকের সীমানা ছাড়াইয়া নৃত্যকে চলমান শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প জাগ্রত হয়। তাঁহার রচিত নৃত্যনাট্যগুলি ('চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা') সেই সংকল্পেরই ফল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "মানুষের জীবন বিপদ-সম্পদ-সুখ-দুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলছে ; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সে একটা বিচিত্র সংগীত হয়ে ওঠে ; তেমনি আর-সমস্ত ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সেটা হয় নাচ" ('জাভা-যাত্রীর পত্র', ১৯৬১ খ্রী, পৃ ৯৬)। জাপানে নৃত্য দেখিয়া তাহাকে তিনি 'দেহভঙ্গীর সংগীত' বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন।

এই দেহভঙ্গীর সংগীতকে অভিনয়ে ব্যবহার করিয়া নৃত্যনাট্যগুলি রচিত হইয়াছে। জীবনের প্রায় শেষপর্বে তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভার সৃষ্টি 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা'তে ভারতীয় নৃত্যের ভাষাকে তিনি নাট্যসৃষ্টির কাজে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন আঙ্গিকের নৃত্যকেও তিনি ব্যবহার করিয়াছেন ; কিন্তু সে ব্যবহার আঙ্গিকের দিক হইতে নয়, প্রেরণার দিক হইতে। ইহার অপেক্ষা বড় কথা এই যে, যদিও এই নূতন নাট্যসৃষ্টির নাম নৃত্যনাট্য তবু সংগীতের প্রাধান্য ইহাতে বিন্দুমাত্রও উপেক্ষিত হয় নাই। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে আছে, "সুরের বোঝাই করা তিনটে নাটিকার মাঝিগিরি শেষ করা গেল।...গানে আমি রচনা করেছি 'শ্যামা', রচনা করেছি 'চণ্ডালিকা'" ('সংগীতচিন্তা', পৃ ২০৬)। অথচ এই নাটিকাগুলির নৃত্যনাট্য নামকরণ তাঁহারই কৃত। ইহা হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত নৃত্যনাট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

নৃসিংহ বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে চতুর্থ। তাঁহার দেহের ঊর্ধ্বভাগ সিংহাকার ও নিম্নভাগ নরাকার।

বিষ্ণুবিরোধী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুভক্ত স্বপুত্র প্রহ্লাদের বিনাশের জন্য বিষপ্রয়োগ, অগ্নিদাহ প্রভৃতি বহু উপায় অবলম্বন করেন; কিন্তু বিষ্ণুভক্তির প্রভাবে প্রহ্লাদ অক্ষত ও সুস্থ থাকিয়া যান (বিষ্ণুপুরাণ, ১৮শ ও ১৯শ অধ্যায়)। অবশেষে বিষ্ণু নৃসিংহমূর্তি অবলম্বন করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন (বিষ্ণুপুরাণ, ২০।৩২)।

সীতানাথ গোস্বামী

নেওয়ারী চীনা ভাষা-গোষ্ঠীর ভোট-বর্মী শাখার ভোট-হিমালয় উপশাখার ভাষা। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-ধর্মাবলম্বী নেপালীভাষী গোর্খাদের বিজয়ের পূর্বে ইহা নেপালের রাজ ও সরকারী ভাষা ছিল। নেপাল ছাড়া ভারত ও সিকিমে নেওয়ারীভাষীদের বাস। নেওয়ারী একটি অসার্বনামিক ভাষা। এডওয়ার্ড গেট-এর মতে 'নেওয়ার' 'নেপাল'-এর রূপান্তর মাত্র। অতএব নেওয়ারীর অর্থ হইল নেপালের ভাষা। নেপালী ব্যতীত নেপালের অধিকাংশ ভাষা নেওয়ারীর সহিত সম্পৃক্ত। নেওয়ারী ভাষায় লিখিত সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ১৪শ শতাব্দীতে লিখিত ১০৫৬-১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দের নেপালের ঘটনাবলী, ইতিহাস ও রাজবংশাবলী। নেওয়ারী ভাষা প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি হইতে বিকশিত লিপিতে লিখিত হয়। এই ভাষায় প্রাকৃতিক লিঙ্গেরই প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মুণ্ডা ভাষার মত এই ভাষায় চেতন ও অচেতন সংজ্ঞায় লিঙ্গভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্র B. H. Hodgson, *Essays on the Languages, Literature and Religion of Nepal and Tibet*, London, 1874; G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. III, Pt., I, Delhi, 1967.

রামঅধার সিংহ

নেকড়ে বাঘ মাংসাশী প্রাণীবর্গের (অর্ডার-কার্নিভোরা, Order-Carnivora) অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। ইহারা শৃগাল ও কুকুরের সমগোত্রীয় (ফ্যামিলি-কানিদী, Family-Canidae) এবং কুকুরের সহিত একই গণ (জেনাস-কানিস, Genus-Canis)-এর অন্তর্গত। কুকুরের সহিত ইহার সামান্য বৈসাদৃশ্য দেখা যায়—ইহার দাঁত কুকুরের তুলনায় মোটা, চক্ষু নাকের অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থিত এবং গলার উপরের লোম শক্ত ও বড়। নেকড়ের সর্বাপেক্ষা পরিচিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাতিটির বিজ্ঞানসম্মত নাম কানিস লুপস (*Canis lupus*)। ইহার সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ১৫০ সেন্টিমিটার, লেজ ৪০-৪২ সেন্টিমিটার, উচ্চতা ৯০ সেন্টিমিটার এবং ওজন প্রায় ৪৫ কিলোগ্রাম। শরীরের রং সাধারণতঃ পীতাভ বাদামি। নেকড়ে জোড়ায় অথবা দলবদ্ধভাবে থাকে এবং ছাগল, ভেড়া, মানবশিশু, হরিণ, এমন কি বৃহৎ গোজাতীয় প্রাণীও শিকার করিতে পারে। নেকড়ে ঘাসবন, ঝোপ বা গহ্বরে বাস করে এবং সাধারণতঃ নিশাচর। তুন্দ্রা অঞ্চলে নেকড়ের দলবদ্ধ আক্রমণের কথা শোনা যায়। কয়েকদিনের মধ্যে ইহারা ৩০-৯০ কিলোমিটার ব্যাস-বিশিষ্ট এলাকায় ঘুরিতে পারে। ২-৩ বৎসর বয়সে নেকড়ে প্রজননক্ষম হয়; স্ত্রী নেকড়ে বৎসরে একবার, বসন্ত হইতে গ্রীষ্মের প্রারম্ভের মধ্যে ৬৩ দিন গর্ভধারণের পর ৪-৮টি শাবকের জন্ম দেয়। সাধারণতঃ নেকড়ে ১২-১৫ বৎসর বাঁচে।

অসীমকুমার চক্রবর্তী

নেপচুন সৌরজগতের অন্যতম গ্রহ। ইহা অষ্টম প্রভার জ্যোতিষ্ক, সুতরাং খালি চোখে দৃষ্টিগোচর নহে; দুই ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীনে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য হইতে দূরত্ব অনুসারে ইহা অষ্টম স্থানীয়। ইহার দূরত্ব সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের ৩০ গুণ। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে ইহার ১৬৪.৮ বৎসর সময় লাগে। ইহা ১৫.৮ ঘণ্টায় একবার আপন মেরুদণ্ডের উপর আবর্তন করে। ইহার ভর পৃথিবীর ভরের ১৭.২ গুণ। ইহার পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা কম, প্রায় -২০৫° সেন্টিগ্রেড। ইহা বিস্তৃত আবহমণ্ডল দ্বারা পরিবৃত, সেখানে মিথেন গ্যাসও আছে। নেপচুন আবিষ্কৃত হয় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর।

নেপচুনের দুইটি উপগ্রহ আছে। বৃহত্তর উপগ্রহটি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর আবিষ্কৃত হয়। ইহার ভর চন্দ্রের ১.৮ গুণ। গ্রহসকল এবং উপগ্রহগুলিও সাধারণতঃ পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘোরে, কিন্তু নেপচুনের এই উপগ্রহটি বিপরীত মুখে অর্থাৎ পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে ঘোরে। দ্বিতীয় উপগ্রহটি অনেক ছোট এবং নেপচুন হইতে অনেক দূরে অবস্থিত; ইহা আবিষ্কৃত হয় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার ভ্রমণপথের উৎকেন্দ্রতা (০.৭৬) যত উপগ্রহ জানা আছে সকলের চেয়ে বেশি।

কামিনীকুমার দে

নেপাল ৮০°১৫′ হইতে ৮৮°১৫′ উত্তর ও ২৬°২০′ হইতে ৩০°১০′ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত তিব্বত ও ভারতের মধ্যবর্তী একটি স্বাধীন রাজ্য। ইহার পূর্বে পশ্চিম

বঙ্গ ও সিকিম, দক্ষিণে ও পশ্চিমে যথাক্রমে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ, উত্তরে তিব্বত। নেপাল রাজ্যটির আয়তন প্রায় ১৪০৭৯৮ বর্গকিলোমিটার (৫৪৩৬২ বর্গমাইল)। অতীতে নেপাল রাজ্য পশ্চিমে পাঞ্জাব ও পূর্বে সিকিম অবধি বিস্তৃত ছিল। ইংরেজদের সহিত সগৌলীর চুক্তির ফলে নৈনীতাল, আলমোড়া, গাঢ়ওয়াল, দেরাদুন ও সিমলা ইংরেজ সরকারের অধীনে আসে। ইহা ভিন্ন নেপালের পূর্বদিকের কিছু অঞ্চল সিকিমের সহিত যুক্ত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধের পরে গোর্খা রাজাদের সাহায্যের বিনিময়ে ইংরেজরা তরাই-এর কিছু অংশ ছাড়িয়া দেন। গোর্খা রাজাদের তিব্বত-বিজয়ের ফলে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি তিব্বত নেপালকে কর প্রদান করিত। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত তথা চীনের সহিত নেপালের ছোট সংঘর্ষ হয়। ফলে উভয় দেশের সংযুক্ত কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক সীমানা-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এভারেস্ট শৃঙ্গ উভয় দেশের সীমান্তে স্থিত বলিয়া পূর্বের ন্যায় স্বীকৃত হয়।

প্রাচীন নে মুনির নাম হইতে নেপাল শব্দটি আসিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। আবার প্রাচীন জাতি নেওয়ারদের বাসস্থান হিসাবেও শব্দটি আসিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। 'নেওয়ার' শব্দটির অর্থ পবিত্র স্থানের অধিবাসী।

নেপালের উত্তরে ১৩০০ কিলোমিটার জুড়িয়া পর্বত-শ্রেণী অবস্থিত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ ১২টি শৃঙ্গের ৭টিই এখানে অবস্থিত। ইহার সবগুলিরই উচ্চতা ৭৬০০ মিটারের অধিক। নেপালকে প্রধানতঃ ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তর হইতে দক্ষিণে এই বিভাগগুলি : মহান হিমালয়, অন্তর্হিমালয় ও মধ্যাঞ্চল এবং তরাই অঞ্চল। মহান হিমালয়ের শিলা কেলাসিত ও গ্রানিট ও নীস দ্বারা গঠিত। ইহার গড় উচ্চতা ৫০০০ মিটারের অধিক। প্রধান পর্বতশ্রেণী দেশের উত্তর-পশ্চিম হইতে শুরু হইয়া সিকিম পর্যন্ত বিস্তৃত। মহান হিমালয় কতকগুলি উচ্চ পর্বত ও বিচ্ছিন্ন শৃঙ্গে বিভক্ত। অনেক বেগবতী নদী তিব্বতে উৎপন্ন হইয়া হিমালয় ভেদ করিয়া গভীর গিরি-বর্ত্মের সৃষ্টি করিয়াছে। কালীগণ্ডকী নদী পশ্চিমে ধবল-গিরি ও পূর্বে অন্নপূর্ণা শৃঙ্গের মধ্যে গভীর গিরিবর্ত্ম কাটিয়া অবতরণ করিয়াছে। পশ্চিমে কালীগণ্ডকী হইতে পূর্বে ত্রিশূলীগণ্ডকী অবধি বিস্তৃত স্থানে হিমালয়ের বিখ্যাত শৃঙ্গ অন্নপূর্ণা (৮০৭৮ মিটার), মানসালু (৮১৫৬ মিটার), হিমালচুল্লী (৭৮৬৪ মিটার), গণেশহিমাল ও গোঁসাইথান শৃঙ্গ অবস্থিত। শেষোক্ত পর্বতদ্বয়ের মধ্যের গিরিখাত ছেদ করিয়া ত্রিশূলীগণ্ডকী নামিয়াছে। ইহার উৎসমুখ ধরিয়া কাইরং গিরিপথ দিয়া তিব্বতে যাওয়া যায়।

পূর্বদিকের কোশী অঞ্চলের প্রধান পর্বতশ্রেণী মহালাঙ্গুর-হিমাল। ইহার সর্বোচ্চ বিন্দু এভারেস্ট (৮৮৪৮ মিটার), মধ্যস্থলে লোৎসে এবং উভয় পার্শ্বে মাকালু ও চৌ-ইয়ু প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান। এখানকার উচ্চ উপত্যকাগুলি অভ্রংলিহ পর্বত ও অত্যুঙ্গ শৃঙ্গদ্বারা বেষ্টিত।

নেপালের মধ্যাঞ্চল বা অন্তর্হিমালয় অঞ্চলের উত্তরে মহান হিমালয়। দক্ষিণভাগে চুড়িয়া বা শিবালিক পর্বত ইহাকে তরাই অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। মহাভারত-লেখ পর্বতশ্রেণী পশ্চিমে মহাকালী নদী হইতে পূর্বে কোশীর অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তরাঞ্চলের ঢাল দক্ষিণাংশের খাড়া অত্যুচ্চ ঢাল হইতে অপেক্ষাকৃত সমভাবাপন্ন। উত্তরাংশ তুষারাবৃত ও ঘন বনাঞ্চলে আবৃত; কিন্তু দক্ষিণভাগ নগ্ন ও রুক্ষ, বৃক্ষবিহীন অনুর্বর অঞ্চল। নেপালের শিবালিক অঞ্চল এইখানেই স্থিত। এখানকার শিলা কেলাসিত ও গ্রানিট প্রস্তরযুক্ত। কয়েকটি আড়াআড়ি গিরিবর্ত্ম দিয়া নদীগুলি ভারতের সমভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। কার্ণালি, গণ্ডকী ও কোশী এই তিনটি প্রধান নদীর বহুবিধ স্রোতধারা তিব্বতে উৎপন্ন হইয়া হিমালয়ের গিরিবর্ত্ম ভেদ করিয়া মহাভারত-লেখের উত্তরে মিলিত হইয়া ঐ পর্বত ভেদ করিয়া একক নদী হিসাবে পশ্চিম হইতে পূর্বে যথাক্রমে ঘর্ঘরা, সপ্তগণ্ডকী ও সপ্তকোশী নামে ভারতে প্রবেশ করিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

মধ্যাঞ্চলের প্রধান দুইটি অঞ্চল উর্বর কাঠমন্ডু উপত্যকা ও পোখরার সমভূমি (কাঠমন্ডু দ্র)। পোখরা অঞ্চলের উচ্চতা ৭৫০ হইতে ১০৫০ মিটার। এই অঞ্চলে তিনটি বিশাল হ্রদ বা 'পোখর' আছে। ইহা চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত ও উর্বর অঞ্চল; দৃশ্য অতীব মনোহর।

এই অঞ্চলের দক্ষিণেই তরাই অঞ্চল ঘন জঙ্গলে সমাকীর্ণ ও নেপালের এক-চতুর্থাংশ। সমগ্র লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এখানেই বাস করে। ইহা অস্বাস্থ্যকর, আর্দ্র ও ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত। এখানে চাষযোগ্য জমিও প্রচুর। বর্ষায় নেপালের খাস অধিবাসীরা এস্থলে আসে না। শীতকালে ক্ষেতের ফসল লইয়া কেনাবেচা করিতে ইহারা ভারতের সীমান্তে আসে।

তরাই-এর উত্তরে চুড়িয়া পর্বত শিবালিক পর্বতের অংশবিশেষ। পর্বতাঞ্চল লম্বা ঘাস ও মূল্যবান বৃক্ষের জঙ্গল দ্বারা আবৃত। এস্থলে লম্বিত উপত্যকা বেশি। পর্বতের গাত্র ক্ষয় করিয়া উৎপন্ন প্রচুর বালিমাটি ও

প্রস্তরযুক্ত ঢালু মাটিকে এ অঞ্চলে 'ভাবর' বলে। এই মৃত্তিকা ছিদ্রযুক্ত।

বিভিন্ন রকমের উচ্চতা হওয়াতে তাপক্রম ও বৃষ্টিপাতও বিভিন্ন ধরনের। উত্তরে হিমালয় থাকায় দক্ষিণ দিক হইতে বাষ্পীয় হাওয়া ইহার দক্ষিণ ঢালে প্রবাহিত হয়। ঋতুগুলি ৩ প্রকার: শুষ্ক ঋতু, বর্ষাকাল ও শীত। বৃষ্টিপাত এপ্রিল-মে মাসে কালবৈশাখী ধরনের হয়; বর্ষায় বজ্রপাত হয়। মৌসুমী বর্ষা মে মাসের শেষে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে আসে; দক্ষিণেই ইহার প্রভাব বেশি। মধ্য নেপালে জুন হইতে সেপ্টেম্বরের শেষ অবধি বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে উচ্চতার জন্য তাপক্রম ৩২° সেন্টিগ্রেডের বেশি হয় না। প্রায় ৪২০০ মিটার-এর উচ্চতায় তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী, দীর্ঘ শীতঋতু ও কঠিন শীত। বৃষ্টিপাত পূর্ব তরাই-এ ২০০ সেন্টিমিটার, পশ্চিমে ১০০ সেন্টিমিটার। পর্বতবেষ্টিত উপত্যকা শুষ্ক। নিম্ন ও মধ্যাঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপ ৩৭° সেন্টিগ্রেড ও সর্বনিম্ন ২·৮° সেন্টিগ্রেড। তরাই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল। নেপালের পূর্বে তরাই-এর জঙ্গল খুবই ঘন। পশ্চিমে নিতি গিরিপথ অবধি দেবদারু বৃক্ষ দেখা যায়। তরাই-এর উত্তরে আর্দ্র অঞ্চলে সাভানা বা লম্বা ঘাসের জঙ্গল; ইহার উত্তরে দেখা যায় পর্ণমোচী বৃক্ষের বন। নাতিশীতোষ্ণ পার্বত্য অঞ্চলে ১২০০-১৫০০ মিটারের মধ্যে ওক, ম্যাপ্‌ল ও পাইন এবং আরও উত্তরে ফার, সাইপ্রেস ও লার্চজাতীয় কোণাকৃতি বৃক্ষ দেখা যায়। প্রায় ৩০০০ মিটারের উপর জুনিপার, রডোডেনড্রন গাছ এবং বার্চ বা ভূর্জপত্রের বনাঞ্চল। ত্রিশূলীগণ্ডকীর পাশে ল্যাংটাং-হিমালে চীর, উইলো ও চিরহরিৎ ওক বৃক্ষ দেখা যায়। পুষ্পবৈচিত্র্যেও নেপাল অতুলনীয়। নীল পপি, লাল এনিমন, বিভিন্ন ধরনের অর্কিড, গোলাপী ও শাদা গোলাপ, পাহাড়ী শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ৫১০০ মিটার অবধি ফুলের দেখা পাওয়া যায়।

বন্যপ্রাণীর মধ্যে তরাই-এ কৃষ্ণকায় ভল্লুক, চিতাবাঘ, বনবিড়াল, গণ্ডার, হস্তী, নেকড়ে, হায়েনা, মহিষ, বাঁদর ও শিয়াল প্রধান। নদীগুলি কুমিরে পরিপূর্ণ। সাপ ও জোঁকের প্রাধান্য খুব। ইয়াক, বন্যছাগল, কস্তুরী মৃগ ও কালো মাকড়সা দেখা যায়। পক্ষীকুলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বর্ণাভ ঈগল, লেজঝোলা, গন্ধগোকুল, রেডস্টার্ট, ফিঙ্গে, দোয়েল, বুলবুল, কাঠঠোকরা, ফিন্‌চ, পায়রা ও পাহাড়ী চটক।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ছিল ৯৪১২৯৯৬। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৭১ ভাগ উচ্চভূমিতে ও ২৯ ভাগ তরাই বা নিম্নাঞ্চলে বাস করে। কাঠমন্ডুতে লোকসংখ্যা ১২২৫১০ জন, পাটনে ৪৮৫৮০ ও ভাতগাঁওতে ৩৭০৮০ জন। ইহা ভিন্ন ভারত-সীমান্তের শহর বিরাটনগর, নেপালগঞ্জ ও বীরগঞ্জের লোকসংখ্যা ১০০০০-এর উপর। পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক।

উত্তরাঞ্চলে প্রধানতঃ তিব্বতী-মঙ্গোলীয়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ইন্দো-আর্যগোষ্ঠী ও মধ্যাঞ্চলে মিশ্রিত জাতিগোষ্ঠী বাস করে।

জাতিগোষ্ঠীগুলিকে বর্তমানে তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে: ১. প্রাচীন তিব্বতী-নেপালী গোষ্ঠী ২. ইন্দো-নেপালী গোষ্ঠী ৩. মঙ্গোলীয় গোষ্ঠী। প্রাচীন তিব্বতী-নেপালী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নেওয়ার গোষ্ঠী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নেওয়াররা শারীরিক গঠনের দিক দিয়া তিব্বত-বর্মীয় বা তিব্বত-মঙ্গোলীয়। প্রথম দিকে ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল, কিন্তু ১৪শ শতাব্দী হইতে ইহাদের উপর হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতির চাপ পড়ে। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধমার্গী ও শৈবমার্গী দুই সম্প্রদায়ই দেখা যায়। স্থাপত্যে, ধাতুশিল্পে; অলংকরণে, গৃহসজ্জায় ও দারুশিল্পে ইহাদের নৈপুণ্য অতুলনীয়। অনেক স্থাপত্যবিদের মতে বৌদ্ধ প্যাগোডা ধরনের মন্দির-স্থাপত্য বৌদ্ধ চৈত্য হইতে নেওয়াররাই সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাদের শিল্পকলা অতি সূক্ষ্ম। অসংখ্য দেবালয়, স্তম্ভ ও হর্ম্যাবলী ইহাদের শিল্পকলার প্রমাণ বহন করিতেছে। ইহাদের ভাষা ও সাহিত্যও যথেষ্ট উন্নত। অকৃত্রিম নেওয়ার জাতির দেখা পাওয়া যায় না। ইহাদের বংশধরেরা কাঠমন্ডুর আশেপাশেই বাস করে। কাঠমন্ডুর বাহিরে ইহারা ব্যবসায়ী ও দোকানদার হিসাবে কাজ করে; ইহা ভিন্ন কারিগর ও কৃষিজীবীও হইয়া থাকে। গোর্খা সমাজের অপেক্ষা ইহাদের মেয়েদের স্বাধীনতা অধিক। মেয়েদের শিশুকালেই বেলের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, ফলে পরে স্বামী মরিলেও ইহারা বিধবা হয় না।

নেপালের আর একটি প্রধান গোষ্ঠী গুরুঙ্। ইহারা প্রধানতঃ মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। অন্নপূর্ণা শৃঙ্গের দক্ষিণ ঢালে, পূর্বে মারস্যুয়ান্দী ও পশ্চিমে কালীগণ্ডকীর মধ্যাঞ্চলে ইহারা বাস করে। ইহারা নিজ বাসস্থান হইতে নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের প্রধান গৃহপালিত পশু মহিষ। গ্রীষ্মকালে ইহারা ঐগুলি লইয়া অন্নপূর্ণার দক্ষিণ ঢালে ৩৪০০ মিটার অবধি আরোহণ করে। গৃহগুলি দ্বিতল, চতুর্দিকের দেওয়াল শুষ্ক প্রস্তরে নির্মিত। ছাদ শ্লেট পাথরে ছাওয়া, গৃহভিত্তি সাধারণতঃ আয়তাকার;

বৃষ্টির জন্য পোখরার পশ্চিমে কখনও কখনও ডিম্বাকৃতি ও কোণাকৃতি খড়ের ছাদযুক্ত গৃহও দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা বৌদ্ধ ও লামা -তন্ত্রে বিশ্বাসী। ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রভাবে সামাজিক বিভেদ দেখা গেলেও পূজাপার্বণে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা লামাদের প্রতাপই বেশি।

গুরুঙ্‌রা হ্রস্বকায়, ঈষৎ পীতাভ, মঙ্গোলীয়; ইহাদের চোখ বাদাম-আকৃতির। ইহাদের মেয়েরা দেখিতে খুব সুন্দর, সোনা ও পিতলের গহনা পরিতে ভালবাসে। ইহাদের ভাষা তিব্বতী।

নেপালে শতকরা ৯০ ভাগ লোকের পেশা কৃষি। জমি বেশির ভাগই জমিদারদের দখলে। সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও নিষ্কর জমি উঠাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে। ধানই নেপালের প্রধান ফসল। শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ জমিতে ধান চাষ হয়। ইহা ছাড়া কৃষিভূমির শতকরা ২০ ভাগ জমিতে ভুট্টা, জোয়ার ও বাজরা এবং ১০ ভাগ জমিতে গমের চাষ করা হয়। আলু, তৈলবীজ, পাট ও তামাকের চাষও হইয়া থাকে। উত্তরের উপত্যকাগুলিতে পাহাড়ী ঝরনার সাহায্যে চাষ হয়। মধ্যভাগের উপত্যকাতে জলসেচের সাহায্যে চাষ হয়; সেখানে গম, যব, ছোলা, জোয়ার, বাজরা, ডাল, কুরু (নিকৃষ্ট বার্লি) আলু, লংকা, আখ, তরমুজ, পেঁয়াজ প্রভৃতি শস্য জন্মায়। দক্ষিণের উষ্ণ অঞ্চলে চা, তুলা, কলা, বাদাম, তেঁতুল, আম, জাম ও তামাক উৎপন্ন হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আপেল, ডালিম, আখরোট ও কুল হয়। পোখরা উপত্যকাতেও প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়। মৌমাছিপালন একটি প্রধান কুটিরশিল্প। গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও কম নয়; কৃষিকার্য, ভারবহন প্রভৃতি বহু কার্যে ইহাদের ব্যবহার হয়। ইহাদের মাংসও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং মূল্যবান পশমও পাওয়া যায়। ঘৃত ও মাখন নেপালের অন্যতম রপ্তানিদ্রব্য।

নেপালের একতৃতীয়াংশ বনাঞ্চল। তরাই অঞ্চলে শাল, সেগুন প্রভৃতি এবং উত্তরাঞ্চলে চীর, পাইন, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষ পাওয়া যায়।

বেরিলিয়াম, কয়লা, কোবাল্ট, তামা, ডলোমাইট, সীসা, চুনাপাথর, অভ্র, গন্ধক, দস্তা, শাদা বালি ও নদীগর্ভে বালিমিশ্রিত স্বর্ণ প্রধান খনিজ দ্রব্য। ইহার মধ্যে রাগীমাতাতে বালি, সালিয়ানাতে সোনা, ডলোমাইট ও কোবাল্ট, উত্তর ত্রিশূলীতে দস্তা, দক্ষিণ ত্রিশূলীতে তামা, কোশীর উত্তরাঞ্চলে অভ্র, গুলমিতে সোনা, তামা ও কোবাল্ট আছে। মারসুয়ান্দী নদীর ধারে অনেক স্থানে লবণ পাওয়া যায়।

নেপালে কাঠমন্ডু, বিরাটনগর, বীরগঞ্জ প্রভৃতি শহরে বহু শিল্পকারখানা আছে। শিল্পগুলির মধ্যে চটকল, খাদ্যশিল্প, বস্ত্রশিল্প, প্লাইউড ও আসবাবশিল্প, সিগারেট, অভ্রনিষ্কাশন ও রাসায়নিকশিল্প উল্লেখযোগ্য।

ভারত হইতে নেপাল লবণ, লোহা, ইস্পাত, তামা, সিমেন্ট, সিগারেট, চা, জুতা, কেরোসিন, কাগজ প্রভৃতি আমদানি করে। ভারতে নেপাল চাল, তৈলবীজ, তামাক, ঘি, শন, পাট, কমলালেবু, আলু, কাঠ, শাল, গোরু, চামড়া প্রভৃতি রপ্তানি করে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে শিল্প উন্নয়ন সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপালী বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি সিগাৎসী, কাইরং, লাসা, ন্যায়ালম ও গিয়াংসিতে স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুসারে তিব্বতে তীর্থ-যাত্রী ও বণিকদের যাতায়াতের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

নেপালে দুরূহ পার্বত্য অঞ্চলের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ কঠিন ছিল। পূর্বে বহু গিরিপথ দিয়া উত্তরে তিব্বত ও পার্বত্য দেশ হইতে লোকজনের যাতায়াত ও বাণিজ্য হইত। বর্তমানে তিব্বতের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এই স্বাভাবিক গিরিপথগুলি দিয়া যাতায়াত কম হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাঠমন্ডুর সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সুষ্ঠু সংযোগ ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বৎসরের সর্বসময়ে উন্মুক্ত ত্রিভুবন রাজপথ ভারত-কাঠমন্ডুকে যুক্ত করিয়াছে। ভারত সরকার ইহা নির্মাণে সাহায্য করিয়াছেন। লাসা-কাঠমন্ডু পথ বা রাজা মহেন্দ্র পথ লাসার সহিত কাঠমন্ডুকে যুক্ত করিয়াছে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে গৌচরে বিমানঘাঁটি স্থাপিত হওয়ায় পাটনা, কলিকাতা, দিল্লী, লখনৌ পর্যন্ত প্রত্যহ বিমানপোত যাতায়াত করে। ইহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে মুস্তং প্রভৃতি স্থানে বিমান অবতরণের ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছে।

ত্রিভুবন শাহ্ নেপালের রাজা হওয়ার পর হইতেই রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিমানঘাঁটি নির্মাণ প্রভৃতি শুরু হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শিল্প উন্নয়ন শুরু হয় ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পঞ্চবার্ষিকী ও ত্রৈবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে কার্যক্রম শুরু করা স্থির হয়।

নেপালে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িতেছে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২১৫০০০ জন বালক-বালিকা প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা পাইত। এখানে প্রায় ৩৩টি কলেজ আছে, ইহার মধ্যে ত্রিচন্দ্র কলেজ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে ৫০ শয্যাযুক্ত একটি হাসপাতাল নির্মিত হইয়াছে এবং আমেরিকার সাহায্যে ১৫০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মিত হইতেছে।

কাঠমন্ডুতে রানা ও কয়েকজন বিশেষ অবস্থাপন্ন লোকের ও বিদেশী মিশন ভিন্ন পাকা বাড়ি নাই। কাঠমন্ডুর অন্যত্র গৃহগুলি প্রায়শঃই প্রস্তর ও কাঁচা-ইট নির্মিত। বেশির ভাগ বাড়ি দোতলা। বহুস্থানে বাঁশ ও বেত দিয়াও গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

নেপালে বহু তীর্থস্থান, যথা গোঁসাইকুণ্ড ও মুক্তিনাম, বুঢ়ানীলকণ্ঠ ও চন্দ্রগিরির প্রাচীন মন্দির হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারা পূজা পাইয়া আসিতেছে। নেপালে প্রথমে তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন ছিল। পরবর্তী কালে দক্ষিণ হইতে হিন্দু ধর্মের আগমনে এই মিশ্রণ সংঘটিত হইয়াছে।

কাঠমন্ডু উপত্যকার মন্দিরগুলির মধ্যে পশুপতিনাথ, স্বয়ম্ভূনাথ, বোধনাথ, গোরখনাথ ও মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দির বিখ্যাত। শিল্পকলায় পিতল ও তামার পাত্রে, মূর্তিতে, প্রার্থনাচক্রে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মিশ্রণের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্তিশিল্প ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত। উত্তরাঞ্চলের গুম্ফাগুলিতে ভ্রাম্যমাণ লামারা দেওয়ালচিত্র বা ফ্রেস্কো অঙ্কিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কিছু কিছু প্রাচীন চিত্রশোভিত পুঁথিও নেপালে পাওয়া যায়। এগুলির সহিত বঙ্গদেশে প্রাপ্ত পালযুগীয় পুঁথির চিত্রকলার নিকট-সাদৃশ্য আছে।

নেপালের ইতিহাস বলিতে (গোর্খা রাজবংশের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত) শুধু কাঠমন্ডু উপত্যকার ইতিহাসই ছিল। অতীত যুগের ইতিহাস কাহিনীমাত্র। খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দে গোপালক বা আহির জাতির কেহ রাজা হয়। পরে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল হইতে কিরান্তী জাতি আসিয়া তাহাদের হঠাইয়া রাজত্ব করিতে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দে অশোক বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যানে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া শিলালিপি উৎকীর্ণ করেন। কিরান্তীরা প্রায় ১০০০ বৎসর রাজত্ব করে। নেওয়ার জাতি ইহাদেরই সমসাময়িক মঙ্গোলীয় জাতি। ইহার পর লিচ্ছবীবংশীয় নৃপতিগণ কয়েক শতাব্দী এখানে রাজত্ব করেন। ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে হিউ-এন্-ৎসাঙের আগমন হয়। তাঁহার বিবরণীতে নেপালীদের স্থাপত্য ও কলাচাতুর্যের কথা ও পরধর্মে সহিষ্ণুতার বিষয় উল্লেখ আছে।

ঠাকুরী বংশের রাজারা ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নেপালে রাজত্ব করেন। এই সময়ে চীন ও নেপালের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু হয়। ৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল নামটির প্রচলন হয়।

ঠাকুরী বংশের পর ১৩শ শতাব্দী হইতে মল্লবংশের রাজত্ব শুরু হয়। মল্লরা ৩০০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। এই যুগকে সংস্কৃতির দিক দিয়া স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। মল্লবংশীয় যক্ষমল্ল ৫০ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্ব ৪জন উত্তরাধিকারীর মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। এই ৪টি রাজত্ব ছিল কাঠমন্ডু, ললিতপুর (পাটন), বানেপা ও ভাতগাঁও। গোর্খা রাজদের আক্রমণ পর্যন্ত মল্লবংশীয়েরা রাজত্ব করেন। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে মল্লরাজদের সময়ে রাজপুত রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহ্ কাঠমন্ডু আক্রমণ ও ১১ বৎসর পর অধিকার করেন। এই রাজবংশ নেওয়ারী ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিষিদ্ধ করিয়া হিন্দীলিপি-সংবলিত গোর্খালী বা নেপালী ভাষা প্রচলন করেন। পৃথ্বীনারায়ণ কুমায়ুন, গাঢ়ওয়াল, সিকিম ও অন্তর্হিমালয়ের বহু রাজ্য জয় করেন। তরাই আক্রমণের সময়ে ইংরেজদের সহিত গোর্খাদের বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলে। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে পৃথ্বীনারায়ণ শাহ্-এর মৃত্যু হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে সগৌলীতে সন্ধি হয়। বহুবিবাহের ফলে নেপালে রাজসিংহাসন লইয়া বহু ষড়যন্ত্র হয় এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজবংশ বাধ্য হইয়া মন্ত্রী জঙ্গবাহাদুরকেই সর্বক্ষমতা দেন ও নিজেরা ক্ষমতাহীন হইয়া থাকেন। ১০০ বৎসর রানা মন্ত্রীদের হাতে সর্বক্ষমতা থাকার পরে প্রজাদের দাবিতে পুনরায় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ত্রিভুবন শাহ্ ক্ষমতা ফিরিয়া পান।

দ্র Percy Brown, *Picturesque Nepal*, London, 1912; P. Landon, *Nepal*, vols. I & II, London, 1928; D. R, Regmi, *Ancient Nepal*, Calcutta, 1960; P. Karan, *Nepal—A Cultural & Physical Geography*, Kentucky, 1960.

কমলা মুখোপাধ্যায়

নেপালী[১] নেপালের অধিবাসী। নেপালীরা প্রধানতঃ গোর্খা ও নেওয়ার এই ২ ভাগে বিভক্ত। নেপাল রাজ্য তিনটি প্রাকৃতিক ভাগে বিভক্ত: ১. তরাই-এর নিম্নাঞ্চল ২. নেপাল উপত্যকা ৩. তিব্বত প্রান্তের গিরিশ্রেণী। গোর্খারা প্রধানতঃ প্রথম ও তৃতীয় অঞ্চলে বসবাস করে। নেওয়ারেরা নেপাল উপত্যকার অধিবাসী। নেওয়ারদের, বিশেষতঃ গোর্খাদের শারীরিক অবয়বে যেমন চোখ, রং ও নাকের গঠনে মঙ্গোলীয় প্রভাব দেখা যায়। আবার কিছু নেওয়ারদের মধ্যে ককেশীয় ভাব প্রকট। গোর্খারা

প্রধানতঃ যোদ্ধা ও বর্তমানে নেপালের শাসক। নেওয়ারদের উপজীবিকা প্রধানতঃ চাষ-আবাদ, ধাতুশিল্প, চিত্রকলা, স্থাপত্যশিল্প ও সাহিত্যচর্চা।

নেওয়ারেরা দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত: বৌদ্ধমার্গী ও শিবমার্গী। শিবমার্গীরা হিন্দু। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা রহিয়াছে ও উচ্চ জাতিরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে পরিচিত। ক্ষত্রিয় জাতির একটি শাখার নাম 'শ্রেষ্ঠ'। বৈশ্যরা যোশী ও আচার এই দুই শাখায় বিভক্ত। জ্যোতিষচর্চা হইল যোশীদের প্রধান কাজ; আর আচারেরা স্থানীয় লৌকিক দেব-দেবীর পুরোহিত। অন্যান্য জাতির মধ্যে 'গোয়া' বা নন্দ গোয়ারা গোপালক; 'কৌউ'-এরা কর্মকার, 'নউ'-এরা ক্ষৌরকার, 'কাথা' ও তাঁতীরা বস্ত্রশিল্পী। ইহারা ছাড়া বহু নীচু জাতিও শিবমার্গীদের মধ্যে আছে। বৌদ্ধমার্গীদের মধ্যে ৩টি শ্রেণী দেখা যায়। সর্বোচ্চ শ্রেণীর নাম 'বন্দ্য' বা বনারস। ইহারা বৌদ্ধধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকে। মধ্যম শ্রেণীর নাম 'উদাস'। ইহারা ব্যবসায়ী। তৃতীয় শ্রেণীটি 'জায়পু' নামে পরিচিত। অধিকাংশ বৌদ্ধমার্গীই এই শ্রেণীভুক্ত। কৃষি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহা ছাড়া জায়পু-রা মাটির পাত্র গড়া, কাঠের কাজ ও তৈলনিষ্কাশনের কাজও করিয়া থাকে।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপালী[২] আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার পাহাড়ীগোষ্ঠীর পূর্ব-পাহাড়ী ভাষা। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে ভারতে ১০২১১০২ জন নেপালীভাষী ছিলেন। ভারতের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাতেই অধিকাংশ ভারতীয় নেপালীভাষীর বাস। সিকিমের অধিকাংশ অধিবাসী নেপালীভাষী। নেপালের অর্ধেকের অধিক লোক এই ভাষাভাষী। গ্রিয়ার্সন ইহাকে রাজস্থানীর সহিত সম্পৃক্ত মনে করেন। ইহার অন্য নাম গোর্খালী, কারণ ইহা গোর্খা শাসকদের ভাষা; নেপালীকে খসকুরা অর্থাৎ 'খস'দের ভাষাও বলা হয়। পার্বত্যদেশের ভাষা বলিয়া ইহাকে পর্বতিয়াও বলা হয়। নেপালে বিভিন্ন ভোট-বর্মীভাষীর বাস থাকায় ভোট-বর্মীর প্রভাব নেপালীর উপর পড়িয়াছে। নেপালী ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ১৩৫৯ শকাব্দের রাজা পুণ্যমল্ল-এর তাম্রশাসনলিপি। নেপালী ভাষা নাগরী লিপিতে লিখিত হয়। ইহার প্রধান কথ্য ভাষা 'পল্লা' ভারতের কুমায়ুনী ভাষার দ্বারা প্রভাবিত। এই ভাষায় প্রচলিত লিঙ্গ ২টি প্রাকৃতিক (ব্যাকরণগত নহে)। নেপালীতে 'হরু' বা 'হেরু' দিয়া বহুবচন করা হয়। ও-কারান্ত ব্যতীত অপর সংজ্ঞাপদে তির্যক ও কর্তায় কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। সহায়ক ক্রিয়া 'ছ' এবং 'হো' দিয়া গঠিত হয়। ভাববাচক আদরার্থক ক্রিয়াপদগুলিতে ভোটগোষ্ঠীর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালীর প্রথম ব্যাকরণ-রচয়িতা জনৈক ইওরোপীয়; আলেক্‌জাণ্ডার আয়টন ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে নেপালীর প্রথম ব্যাকরণ প্রকাশ করেন।

নেপালী সাহিত্য তেমন প্রাচীন নয়। ইহার প্রথম কবি উদয়ানন্দ অর্জ্যাল ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। ভানুভক্ত অধ্যাত্ম রামায়ণের ভিত্তিতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে নেপালী ভাষায় তাঁহার রামায়ণ রচনা করেন।

নেপালী নেপালের সরকারী ভাষা। এই ভাষা ও সাহিত্যের উপর বর্তমানে হিন্দীর প্রভাব লক্ষণীয়।

দ্র G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. IV, Calcutta, 1906.

রামঅধার সিংহ

নেমিনাথ, অরিষ্টনেমি ২৪ জন জৈন তীর্থংকরের মধ্যে ২২শ তীর্থংকর। জন্মস্থান মথুরার নিকটবর্তী শৌরিপুর। পিতার নাম সমুদ্রবিজয়, মাতার নাম শিবা, গৌতমগোত্রীয় ক্ষত্রিয়, বৃষ্ণি-কুলোদ্ভব বলিয়া বৃষ্ণিপুঙ্গবও বলা হয়। নেমিনাথ ছোটবেলা হইতেই সংসারে উদাসীন ছিলেন, কিন্তু খুল্লতাত-পুত্র শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহে ভোজরাজ উগ্রসেনের কন্যা রাজীমতীকে বিবাহ করিতে সম্মত হন। কথিত আছে, বিবাহের শোভাযাত্রা উগ্রসেনের প্রাসাদের কাছাকাছি উপস্থিত হইলে তিনি অদূরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুদের আর্তনাদে বিচলিত হন। পশুগুলিকে বিবাহের ভোজের জন্য আবদ্ধ করা হইয়াছে শুনিয়া তখনই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন ও সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিরনারে আরোহণ করেন। এই সংবাদ রাজীমতীর নিকট পৌছিলে তিনিও সংসার পরিত্যাগ করিয়া নেমিনাথের অনুবর্তিনী হন। গিরনারেই নেমিনাথ কেবলজ্ঞান লাভ করেন ও নির্বাণপ্রাপ্ত হন। নেমিনাথের লাঞ্ছন শঙ্খ, চৈত্যবৃক্ষ বেতস, শাসনদেব গোমেধ যক্ষ ও শাসনদেবী অম্বিকা।

গণেশ লালওয়ানী

নেরিয়ামঙ্গলম প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেরল রাজ্যে নেরিয়ামঙ্গলম জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রটি স্থাপিত হয়; প্রথম দুইটি ইউনিটের প্রাথমিক বিদ্যুৎ উৎপাদন-শক্তি ৩০ মেগাওয়াট ছিল। পন্নিয়ার ও শোলেয়র

পরিকল্পনা দুইটি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত পর্যাপ্ত জল-সরবরাহের অভাবে নেরিয়ামঙ্গলম পরিকল্পনার যান্ত্রিক কার্য ব্যাহত হয়। পরিকল্পনাটি সমাপ্ত হইলে ৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিবে।

মঞ্জুশ্রী বসু

নেল্লূরু, নেল্লূর অন্ধ্রপ্রদেশের জেলা ও শহর। দক্ষিণ ভারতের করমণ্ডল উপকূলে ১৩°২৯′ হইতে ১৬°১′ উত্তর এবং ৭৯°৫′ হইতে ৮০°১৬′ পূর্বে জেলাটি অবস্থিত। ইহার পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে পূর্বঘাট পর্বতমালা, উত্তরে গুন্টূর জেলা ও দক্ষিণে চিত্তূর জেলা।

জেলার অধিকাংশ স্থানই প্রস্তরময় এবং গুল্মাবৃত। পুলিকট হ্রদ এই স্থানের পূর্ব দিকে অবস্থিত। দেশের অভ্যন্তরভাগ বন্ধুর নয়। জেলার প্রধান নদীগুলি পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। নদীগুলি বৎসরের অধিকাংশ সময়ে শুষ্ক থাকে; বর্ষাকালে প্রচুর জল বহিয়া বন্যার সৃষ্টি করে। ইহারা নাব্য নহে। পেন্নার এখানকার প্রধান নদী।

জেলার অভ্যন্তরভাগ আর্কিয়ান যুগের অভ্র ও হর্নব্লেণ্ড শিস্ট শিলার দ্বারা গঠিত। এই অংশের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নিস ও গ্র্যানিট শিলা দেখা যায়; এই স্থানেই কাডাপ্পা যুগের অপ্রস্তরীভূত পাললিক শিলা পাওয়া যায়। তেঁতুল ও কণ্টকবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। নারিকেল অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। পাহাড় অঞ্চলে ভালুক, বাঘ, চিতাবাঘ, সম্বর, হরিণ প্রভৃতি প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়।

নেল্লূরুর জলবায়ু শুষ্ক। বৎসরের ২-৩ মাস অত্যধিক উত্তাপ থাকে। এই সময়ে উত্তপ্ত পশ্চিমবায়ু প্রবাহিত হয়। সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে দেশের অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষা উপকূলভাগ শীতলতর। দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু নেল্লূরুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। দেশের অভ্যন্তর-ভাগ অপেক্ষা উপকূলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক।

জেলার জনসংখ্যা ২০৩৩৬৭৯ (১৯৬১ খ্রী) ও আয়তন ২০৬৫৩ বর্গকিলোমিটার (৭৯৭৪ বর্গমাইল)। শিক্ষিত জনসংখ্যা হাজারে ২১১ জন। তেলুগু এই জেলার প্রধান ভাষা।

এই অঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অনুর্বর। পশ্চিম-দিকে প্রস্তরময় মৃত্তিকা এবং সমুদ্রোপকূলের নিকট দো-আঁশ ও কাদামাটি দেখা যায়; কিন্তু নদী-উপত্যকায় পলিমৃত্তিকাই প্রধান। ধান এই জেলার প্রধান শস্য। এখানে রাগি, নানারকম ডাল ও তামাকের চাষ করা হয়। উত্তরাঞ্চলের তালুকে কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে। কূপের সাহায্যে সেচকার্য করা হয়।

খনিজ সম্পদের মধ্যে অভ্রই প্রধান। আকরিক লৌহ, জিপ্‌সাম, বেলে পাথর, গ্রীনস্টোন প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

এক সময়ে নেল্লূরু শহর কার্পাসবস্ত্র ও সুতার জন্য বিখ্যাত ছিল। জেলার বহুস্থানে পিতল ও তামার তৈজসপত্র নির্মিত হয়।

দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। জেলার প্রধান শহর নেল্লূরু পেন্নার নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। মাদ্রাজ শহর হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব ৩৭ কিলোমিটার। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৯১২ মিলিমিটার (৩৬ ইঞ্চি); গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ প্রায় ৪৪° সেন্টিগ্রেড (১১২° ফারেনহাইট)। লোকসংখ্যা ১০৬৭৭৬ জন (১৯৬১ খ্রী)।

The Imperial Gazetteer of India, vol. XIX, London, 1908; *Census of India, 1961*, Delhi, 1962.

অনিন্দ্যকুমার পাল

নেহরু, জওহরলাল (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রী) ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ। ১৪ নভেম্বর, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। মোতীলাল নেহরু ও স্বরূপরানী নেহরুর একমাত্র পুত্র। বাল্যে গৃহ-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিনি লেখাপড়া করেন। ১৫ বৎসর বয়সে বিলাতে যাইয়া তিনি হ্যারো স্কুলে ২ বৎসর পড়েন। পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিনিটি কলেজে ৩ বৎসর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ট্রিপোস অধ্যয়ন করিয়া ডিগ্রিলাভ করেন। সেখান হইতে ইনার টেম্পল্‌-এ প্রবেশ করিয়া ব্যারিস্টার হন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি পেশায় প্রবৃত্ত হন।

বিলাতে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি টিলকপন্থী অর্থাৎ চরম-পন্থী হইয়া পড়েন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে তিনি অ্যানি বেসান্টের ও টিলকের হোম রুল লীগ দুইটিতে যোগ দেন। ১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ কর্মপন্থা গ্রহণ করিলে (‘কংগ্রেস’ ও ‘অসহযোগ আন্দোলন’ দ্র) জওহরলাল এই আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় হইতেই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রকৃত আরম্ভ। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই যুক্তপ্রদেশের কৃষক আন্দোলনের সহিত তাঁহার যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

১৯২১ ও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ

হন। চৌরিচৌরা ঘটনার (৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ খ্রী) ফলে গান্ধীজী আইন অমান্য স্থগিত রাখিলে তিনি বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কারামুক্ত হইয়া তিনি এলাহাবাদ পৌরসভার সভাপতির কাজে ও কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে ব্যাপৃত থাকেন। স্বরাজ্য পার্টির সহিত কাউন্সিলবর্জনকামীদের বিবাদে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন ('কংগ্রেস' ও 'স্বরাজ্য পার্টি' দ্র)।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পত্নী কমলা নেহরুর চিকিৎসার্থে ইওরোপ যাত্রা করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাস্‌ল্‌জ (ব্রুসেল্‌স)-এ নিপীড়িত জাতিদের সম্মেলনে যোগ দেন এবং 'লীগ এগেন্‌স্ট ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌' -এর অন্তর্ভুক্ত হন। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে তিনি ও তাঁহার পিতা মস্‌ক্‌ভা (মস্কো) পরিদর্শনে যান। সোভিয়েট মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজ্‌ম্‌ জওহরলালকে আকৃষ্ট করে।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে তাঁহার উদ্যোগে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়; ইহা গান্ধীজীর মনঃপুত হয় নাই। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন উপলক্ষ্যে জওহরলাল পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে গান্ধীজী প্রস্তাব করেন যে, ব্রিটিশ সরকার ১ বৎসরের মধ্যে সর্বদলীয় কমিটি কর্তৃক ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস -এর ভিত্তিতে রচিত ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ না করিলে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ফিরিয়া যাইবে ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিবে। বিষয়নির্বাচনী সভায় 'ইণ্ডিপেণ্ডন্‌স ফর ইণ্ডিয়া লীগ' -এর তরফে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই এই প্রস্তাবের সংশোধনকল্পে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রকাশ্য সভায় সুভাষচন্দ্র পুনরায় এই দাবি তোলেন এবং জওহরলাল তাঁহাকে সমর্থন করেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে (৩১ অক্টোবর) বড়লাট আরুইন ভারতকে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' দান সম্পর্কে এক ঘোষণা করেন। তদুত্তরে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' -এর ভিত্তিতে ভারতের সংবিধান রচনার জন্য অবিলম্বে কংগ্রেস প্রাধান্যে এক সম্মেলন আহূত হউক, এই মর্মে ভারতীয় নেতারা যে 'দিল্লী ইস্তাহার' জারি করিয়াছিলেন, জওহরলাল তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে গান্ধীজী সভাপতিত্ব করিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে জওহরলাল সভাপতি নির্বাচিত হন। ইহাই কংগ্রেসে তাঁহার প্রথম সভাপতিত্ব। 'চরমপত্র'-এর মেয়াদ ফুরাইয়া যাওয়ায় ঐ অধিবেশনে নির্ধারিত হয় যে, অতঃপর পূর্ণ স্বাধীনতাই হইবে ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হইলে জওহরলাল দুইবার কারারুদ্ধ হন (এপ্রিল ও অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রী)। পর বৎসর জানুয়ারি মাসে তিনি মুক্তি পান। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটে এবং গান্ধীজী বড়লাট আরুইনের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। গান্ধী-আরুইন চুক্তি (৫ মার্চ, ১৯৩১ খ্রী) পাঠ করিয়া জওহরলাল অন্তরে বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। করাচি কংগ্রেসে (১৯৩১ খ্রী) তাঁহারই উদ্যোগে মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী-সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। গোলটেবিল বৈঠক ('গোলটেবিল বৈঠক' দ্র) ব্যর্থ হওয়ার পর আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হওয়ার পূর্বাহ্ণেই জওহরলাল গ্রেফতার হন (২৬ ডিসেম্বর, ১৯৩১ খ্রী) এবং ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট তিনি মাতার অসুস্থতার কারণে জেল হইতে মুক্তি পান। সাড়ে ৫ মাস পরে পুনরায় কলিকাতায় তাঁহার ২ বৎসর কারাদণ্ড হয় (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪ খ্রী)। আলিপুর জেলে অবস্থানকালেই তিনি শুনিতে পান গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিয়াছেন। এই সংবাদে তিনি অন্তরে বিষাদ ও শূন্যতা অনুভব করেন।

কমলা নেহরুর গুরুতর অসুস্থতার কারণে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জওহরলাল আলমোড়া জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ইওরোপে যান। পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি উপর্যুপরি ২ বৎসর লখনৌ অধিবেশনে (১৯৩৬ খ্রী) ও ফৈজপুর অধিবেশনে (১৯৩৭ খ্রী) কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার অভিভাষণ দুইটি ছিল ভ্রাম্যমাণ। বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামকে অভিনন্দন-জ্ঞাপন, সমাজতন্ত্রকে ভারতীয় সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ বলিয়া মতপ্রকাশ, 'সংগঠিত হিংসা' -র সমর্থন, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কৃতিত্বের সুখ্যাতি, গণসংগ্রামের দ্বারা প্রকৃত সাংবিধানিক পরিষদ স্থাপনের লক্ষ্যনির্দেশ ইত্যাদি নানা কথা তিনি বলিয়াছিলেন। ইহার অনেক পূর্বে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বহুলাংশে জওহরলালের প্রভাবেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রবলতর হয়। এই সময়ে কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থী নেতাদের সহিত জওহরলালের মতভেদ তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে। লখনৌ কংগ্রেসের পর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী প্রমুখ ৭ জন দক্ষিণপন্থী নেতা

নেহরু, জওহরলাল

জওহরলালের ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করেন। গান্ধীজী এই বিবাদের মিটমাট করিয়া দেন। এই উপলক্ষ্যে গান্ধীজী জওহরলালের হাকিমি চাল, অসৌজন্য ও অভ্রান্তমন্যতার নিন্দা করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ প্রথম হইতে গান্ধীজীর স্নেহ ও সুদৃঢ় সমর্থন লাভ করিয়া এবং সংকটময় মুহূর্তে তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইয়াই জওহরলাল কংগ্রেসে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। জীবনদর্শন, পুরুষার্থবোধ, ধর্মদৃষ্টি, অর্থনৈতিক চিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা ও গণ-আন্দোলনের প্রকৃতি ও ধারা—সকল দিক হইতেই উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ ছিল। গান্ধীজীর অহিংসা নীতিকে তিনি সমর্থন করিতেন অংশতঃ মাঙ্গল্য-বিবেচনায়, মূলতঃ রাজনৈতিক সুবিধা বিবেচনায়। 'বাপুজী'র নেতৃত্ব বিনা ভারতে কোনও গণ-আন্দোলন সম্ভব নয়, এই সুদৃঢ় উপলব্ধির বশেই তিনি গান্ধীজীর রাজনৈতিক নেতৃত্বকে স্বীকার করিতেন এবং তাঁহাকে আনুগত্য দান করিতেন। দৃষ্টিভঙ্গীর ঐকান্তিক ভেদ সত্ত্বেও গান্ধীজী জওহরলালকেই নিজ উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিয়াছিলেন।

জওহরলালের সভাপতিত্বকালেই কংগ্রেস ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনে বিপুল জয়লাভ করিয়া প্রথমে ছয়টি ও পরে আটটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিল। যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রীসভায় ২জন মুসলিম লীগ সদস্যকে লওয়ার জন্য স্থানীয় লীগ নেতারা অনুরোধ করিলে জওহরলাল তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। মওলানা আজাদের মতে, এই প্রত্যাখ্যানের ফলে যুক্ত প্রদেশে লীগ নবজীবন ('a new lease of life') লাভ করে এবং জিন্নাহ্ এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ লইয়া যে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেন তাহারই ফলে অবশেষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শুধু ইহারই ফলে পাকিস্তান অবশ্যম্ভাবী হইয়া ওঠে, এই মত গ্রহণযোগ্য নয়।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র একটি জাতীয় প্ল্যানিং কমিটি গঠন করেন এবং জওহরলালকে তাহার সভাপতি করিয়া দেন। ঐ বৎসর জওহরলাল ইওরোপ যাত্রা করেন ও স্পেনের বার্সিলোনা শহরে ফ্যাসিস্ত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুধ্যমান 'ইন্টার-ন্যাশন্যাল ব্রিগেড'-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের (১৯৩৯ খ্রী) পর সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব হইতে অপসারণ করার চেষ্টাকে জওহরলাল সমর্থন করেন নাই, কিন্তু ১২জন দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতা ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করিলে জওহরলালও একটি স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়া পদত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত সুভাষচন্দ্রের যে পত্রবিনিময় হয় তাহা উভয়ের চরিত্রের ও রাজনীতির উপর বিশেষ আলোকপাত করে।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল কয়েকদিনের জন্য চীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিং-এ যাইয়া চিয়াং কাইশেক ও মাদাম চিয়াং-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিলে ভারতবাসীর সম্মতি বিনা ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত করার প্রতিবাদে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজাগোপালাচারীর পরামর্শে কংগ্রেস কয়েকটি শর্তে যুদ্ধে সহযোগিতা করার প্রস্তাব করে। জওহরলাল এই প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন। গান্ধীজীর ইহাতে মত ছিল না এবং ব্রিটিশ সরকারও ইহাতে সাড়া দেন নাই। ইহার পর গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করিলে জওহরলাল দ্বিতীয় স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে ইহাতে যোগ দিয়া ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পার্ল হারবার ঘটনার পর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ও অন্যান্য কংগ্রেসনেতারা মুক্তি পান। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মার্চ চার্চিল কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ ভারতে আসেন এবং যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা লাভের জন্য ভারতীয় নেতাদের কাছে কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব উপস্থিত করেন, যেগুলি যুদ্ধাবসানে কার্যকর হইবে। নেহরু প্রস্তাবগুলিকে অপমানজনক বিবেচনা করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, উভয়েই ক্রিপ্স্-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে।

জওহরলাল ও মওলানা আজাদ প্রমুখ নেতারা যুদ্ধ-কালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন না। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর নেহরু লখনৌ প্রেস সম্মেলনে বলিয়াছিলেন: 'আমি মনে করি, পৃথিবীর প্রগতিশীল শক্তিগুলি রাশিয়া, চীন, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড, ইহাদের সঙ্গেই সম্মিলিত'। কিন্তু রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ ভারতবাসী নিষ্ক্রিয়-ভাবে জাপানের জয় দেখিয়া উল্লসিত হইলে ভারতের আত্মাবমাননা ও মানসিক অপমান ঘটিবে, এই যুক্তির বলে গান্ধীজী জওহরলালকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে রাজি করান। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগস্ট এই আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করার পরমুহূর্তেই গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেসনেতাদের সঙ্গে জওহরলালও গ্রেফতার হন (৯ আগস্ট, ১৯৪২ খ্রী) এবং আহ্মদনগর কেল্লায় কারারুদ্ধ থাকেন। এই তাঁহার শেষ কারাবাস।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুন নেহরু ও অন্যান্য কংগ্রেস-নেতারা মুক্তি পান। ব্রিটেনের নূতন প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি-র

ঘোষণা (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ খ্রী) অনুযায়ী পেথিক লরেন্স্‌- এর নেতৃত্বে এক ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসিয়া ভারতীয় নেতাদের সহিত কথাবার্তা চালান ('ক্যাবিনেট মিশন' দ্র)। আলোচনাবৈঠকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতৈক্য না হওয়ায় ক্যাবিনেট মিশন নিজেই ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রগঠনের এক ত্রিস্তরীয় পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার গ্রুপিং-সংক্রান্ত দ্বিতীয় স্তরটি রচিত হয় মুসলিম লীগকে পাকিস্তানের সারপদার্থ দেওয়ার জন্য। সকল দলই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে, কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা পরিকল্পনাটির উপর এই ব্যাখ্যা স্থাপন করেন যে, আদি গ্রুপিং স্বেচ্ছামূলক হইবে। ইহা অবশ্য ক্যাবিনেট মিশনের নিজ ব্যাখ্যার বিরোধী ছিল। জওহরলাল বরাবরই স্বাধীনতা বলিতে বুঝিতেন এই যে, গণপরিষদে (কন্‌স্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্ব্লি) ভারত অবাধে নিজেই নিজের সংবিধান রচনা করিবে। কংগ্রেসের নূতন সভাপতিরূপে নেহরু ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুলাই এই বিবৃতি দেন যে, গণপরিষদে প্রবেশ ব্যতীত কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার আর কোনও কিছু গ্রহণ করে নাই। জিন্নাহ্‌ ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুলাই তাঁহার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ পরিষদ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিল এবং 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' (ডিরেক্‌ট অ্যাক্‌শন)- এর ডাক দিল।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর বড়লাট ওয়েভেলের আমন্ত্রণে জওহরলাল কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ অক্টোবর লিয়াকৎ আলী খান ও আরও ৪ জন লীগনেতা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেন। গভর্নর জেনারেলের কার্যনির্বাহক পরিষদের (এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল) সহ-সভাপতিরূপে নেহরু কার্যতঃ ছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তাঁহার প্রাধান্য লীগমন্ত্রীরা মানিতেন না। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। ১৩ ডিসেম্বর তারিখে সংবিধানের উদ্দেশ্য ঘোষণা সম্পর্কে প্রধান প্রস্তাবটি নেহরু আনয়ন করেন। লীগসভ্যেরা গণপরিষদে যোগ দিতে অস্বীকৃত হন।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা বানচাল হওয়ায় এট্‌লি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে বিবৃতি দিলেন তাহাতেই ভারতবিভাগের ও পাকিস্তান-গঠনের আভাস পাওয়া গিয়াছিল। বড়লাটের পদ হইতে ওয়েভেল অপসারিত হইলেন এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মাউণ্টব্যাটেন ভারতের নূতন বড়লাট হইয়া আসিলেন। অবশেষে জওহরলাল পাকিস্তানকে মানিয়া লইলেন। মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত-বিভাগ হইল এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্ট হইল।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট হইতে মৃত্যুর দিবস পর্যন্ত জওহরলাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই ১৭ বৎসর ধরিয়া তিনি ভারতের বৈদেশিক ব্যাপারকে যে ভাবে পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহার ফলে ভারত বিশ্বসভায় একটি সম্মানের আসন লাভ করে। তাঁহারই উদ্যোগে নয়া দিল্লীতে দ্বিতীয় এশীয় সম্মেলন (জানুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রী) ইন্দোনেশিয়াকে পূর্ণ সার্বভৌমতা প্রদানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তিপরিষদের কাছে সুপারিশ করে। তাঁহার নেতৃত্বে কোরিয়া, সুয়েজ খাল অঞ্চল, কঙ্গো, লাওস ইত্যাদি স্থানে শান্তিপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভারত বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে জোটনিরপেক্ষ শান্তিনীতির স্রষ্টা ও প্রধান প্রবক্তা। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির স্বাধীনতা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ঐক্য তাঁহার বৈদেশিক নীতির একটি মূল লক্ষ্য ছিল। বান্দুং সম্মেলনই (১৯৫৫ খ্রী) ছিল সম্ভবতঃ তাঁহার বৈদেশিক নীতির সাফল্যের সর্বোচ্চ পর্যায়। নেহরুর বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে ; কিন্তু মূলতঃ ভারতের জাতীয় স্বার্থেই এই নীতি রচিত হইয়াছিল, নেহরুর এই উক্তি ভিত্তিহীন নয়।

কমিউনিস্ট চীনকে সর্বপ্রথম যাঁহারা স্বীকৃতি দিয়াছিলেন জওহরলাল তাঁহাদের অন্যতম। তিব্বতে চীনের ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের কার্যকলাপে অসুখী বোধ করিলেও তিনি তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া চীনের সহিত পঞ্চশীল চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন (১৯৫৪ খ্রী)। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে চীন সহসা ভারতীয় সীমান্ত আক্রমণ করিলে জওহরলালের চীননীতি বিফল হইয়া যায়।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল মাউণ্টব্যাটেনের পরামর্শে কাশ্মীরসমস্যাকে রাষ্ট্রসংঘের হাতে তুলিয়া দেন। পাকিস্তানের সহিত সকল বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধানই ছিল নেহরুর নীতি। এই নীতি এ পর্যন্ত সাফল্যলাভ করে নাই বলিয়াই ভুল, ইহা সঠিক যুক্তি নয়।

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জওহরলালের লক্ষ্য ছিল ভারতকে একটি সংহত জাতি, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র ও শিল্পায়িত দেশরূপে গড়িয়া তোলা। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ-গঠন সম্বন্ধে কংগ্রেসের ঘোষিত নীতিকে কার্যকর

করিতে তাঁহার দ্বিধাগ্রস্ততা দেশে গুরুতর অশান্তি ঘটাইয়াছিল। ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাব পোষণ করিতেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারত ও পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের উপশমের জন্য লিয়াকৎ আলী খানের সহিত একটি চুক্তি করিয়াছিলেন। তিনি প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতি ছিলেন এবং ভারতের দ্রুত শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক যোজনা চালু করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় যোজনা তাঁহার জীবিতকালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। তৃতীয় যোজনার শেষ তিনি দেখিয়া যান নাই। নেহরু-পরিকল্পিত পঞ্চবার্ষিক যোজনা সম্বন্ধে নানা মত অবশ্য আছে। তবে ভারতের কর্ণধাররূপে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে ইতিহাসের গতির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭মে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

শিশুরা জওহরলালের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাহারা তাঁহাকে 'চাচা নেহরু' উপাধি দিয়াছিল। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থ কারাগারেই লিখিত। তাঁহার কয়েকটি প্রধান প্রধান গ্রন্থের ও বক্তৃতাবলীর নাম 'সোভিয়েট রাশিয়া' (১৯২৯ খ্রী), 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি' (১৯৩৬ খ্রী), 'গ্লিম্প্‌সেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্টরি' (১৯৪৫ খ্রী), 'দি ডিস্‌কভারি অফ ইণ্ডিয়া' (১৯৪৬ খ্রী), 'টুওয়ার্ডস ফ্রিডম' (১৯৪৯ খ্রী), 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্‌স অ্যাণ্ড আফ্‌টার' (১৯৪৯ খ্রী) ইত্যাদি।

দ্র Frank Moraes, *Jawaharlal Nehru*, New York, 1956 ; *A Bunch of Old Letters*, Bombay, 1958 ; Michael Brecher, *Nehru, A Political Biography*, London, 1959 ; B. R. Nanda, *The Nehrus, Motilal and Jawaharlal*, London, 1962 ; Selig S. Harrison, *India : The Most Dangerous Decades*, London, 1959 ; Hiren Mukherjee, *The Gentle Collossus*, Calcutta, 1964 ; Dorothy Norman, ed., *Jawaharlal Nehru, The First Sixty Years*, vols. I-III, Bombay, 1965 ; Geoffrey Tyson, *Nehru, The Years of Power*, Delhi, 1966,

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

নেহরু, মোতীলাল (১৮৬১-১৯৩১ খ্রী) রাজনৈতিক নেতা, প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী জওহরলাল নেহরুর পিতা। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মে আগ্রায় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণপরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম গঙ্গাধর কাউল-নেহরু। মোতীলাল অগ্রজদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে কানপুর হাইস্কুলে ও এলাহাবাদের মুইর কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং 'ভকিল' পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। এলাহাবাদে হাইকোর্টের শীর্ষস্থানীয় ব্যবহারজীবীরূপে তিনি প্রচুর ধন ও যশ অর্জন করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদের ১ চার্চ রোডে তাঁহার বাসভবন নির্মাণ করেন ও তাহার নাম দেন 'আনন্দ ভবন'।

মোতীলাল প্রথম কংগ্রেসে যোগ দেন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। গোড়ার দিকে কংগ্রেসের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিল ক্ষীণ ও ক্ষণিক; তাঁহার সহানুভূতি ছিল নরমপন্থীদের প্রতি। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদে 'ইণ্ডিপেন্‌ডেন্ট' নামে একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পাঞ্জাব অত্যাচার ('কংগ্রেস' দ্র) সম্বন্ধে কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটির সদস্যরূপে তিনি প্রথম গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসেন (১৯১৯ খ্রী)। এই সময় হইতেই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রকৃত আরম্ভ। কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন (১৯১৯ খ্রী)। পুত্রের অনুসরণ করিয়া তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তাঁহার জীবনের মোড় ফিরিয়া যায়। কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (১৯২০ খ্রী) তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করেন। ইহার পর তিনি যুক্তপ্রদেশ কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করেন ও আইনজীবীর পেশা পরিহার করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌-এর ভারত আগমনের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপলক্ষ্যে তাঁহার জেল হয়। স্বরাজ্য পার্টি গঠনে তিনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রধান সহায়ক ('স্বরাজ্য পার্টি' দ্র)। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬ বৎসর তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে সব দলীয় সম্মেলন কর্তৃক ভারতীয় সংবিধানের এক রূপরেখা রচনার জন্য যে সাব-কমিটি নিযুক্ত হয় মোতীলাল তাহার সভাপতি নিযুক্ত হন। এই কমিটি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস-এর ভিত্তিতে এক সংবিধান সুপারিশ করে। পিতাপুত্রে ইহা লইয়া বিরোধ বাধে এবং তাহা মোতীলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে (১৯২৮ খ্রী) প্রকট হয়।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হইলে জওহরলাল কারারুদ্ধ হওয়ার পর মোতীলাল পুত্র কর্তৃক কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি মনোনীত হন। এই সময়ে গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। ঐ বৎসর তিনি জুন মাসে কারারুদ্ধ হইয়া অস্বাস্থ্যের কারণে সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পান। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

দ্র B. R. Nanda, *The Nehrus, Motilal and Jawaharlal*, London, 1962.

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

নৈনীতাল উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন বিভাগের জেলা ও শহর। জেলাটি ২৮°৫১′ হইতে ২৯°৩৭′ উত্তর এবং ৭৮°৪৩′ হইতে ৮০°৫′ পূর্বে অবস্থিত। আয়তন ৬২৬৭ বর্গকিলোমিটার। মোট ৮টি শহর এবং ১৭২৯টি গ্রাম এই জেলার অন্তর্গত। উত্তর রেলপথের রোহিলখণ্ড-কুমায়ুন শাখা এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

জেলার ⅔ অংশ বহির্হিমালয় পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত। উচ্চতা গড়ে প্রায় ১৮০০-২১০০ মিটার (৬০০০-৭০০০ ফুট)। অধিকাংশ অঞ্চলই ঘন অরণ্যে পূর্ণ। পাহাড়ী অঞ্চলের পাদদেশে ঘন অরণ্যময় অঞ্চলের স্থানীয় নাম 'ভাবর'। পাহাড়ী নদীগুলি বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বাকী অঞ্চল আর্দ্র তরাই সমভূমি। অধিকাংশ এলাকা নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। সারদা, কোশী, গোলা, নান্দোর প্রভৃতি নদী অবশেষে রামগঙ্গা নদীতে পতিত হইয়াছে। নৈনীতাল, ভীমতাল প্রভৃতি হ্রদ এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা বর্ধন করিয়াছে। বেলেপাথর, স্লেট, কোয়ার্ট্‌জাইট, চুনাপাথর, গ্র্যানিট প্রভৃতি শিলার দ্বারা এই অঞ্চল গঠিত। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে জমির ঢাল বেশি এবং প্রতি বৎসর বর্ষার সময়ে ধস নামে। জেলায় গৃহনির্মাণের প্রস্তর, চুণ, তামা, গন্ধক ও জিপ্‌সাম পাওয়া যায়।

দক্ষিণের সমভূমি ও পাদদেশের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর; পার্বত্য অঞ্চলের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা প্রায় ৩০° সেন্টিগ্রেড (৮৫° ফারেনহাইট, জুন); শীতে -৩° সেন্টিগ্রেডে (২৬° ফারেনহাইট, জানুয়ারি) নামে ও বরফ পড়ে। নৈনীতাল শহরে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় ২৩১৩ মিলিমিটার (৯৫ ইঞ্চি); দক্ষিণে বৃষ্টিপাত হ্রাস পায়।

পার্বত্য অঞ্চলের পাইন ও ওক এবং ভাবর অঞ্চলের শালবন হইতে কাঠ ও নানাপ্রকার বনজ সম্পদ আহরণ করা হয়। অরণ্যে নানাপ্রকার পশু, সরীসৃপ ও পাখি দেখা যায়। হ্রদগুলিতে মৎস্যের চাষ হয়।

জেলার মোট লোকসংখ্যা ৫৭৪৩২০ (১৯৬১ খ্রী)। শিক্ষিতের সংখ্যা হাজারে ২৭৪ জন। জেলার প্রধান ভাষা হিন্দী।

কৃষিই জনগণের প্রধান উপজীবিকা। পাহাড়ের ঢালে, ভাবর এলাকায় জলসেচের সাহায্যে গম, ধান, যব, আলু, ছোলা, তৈলবীজ, ইক্ষু এবং ফলের চাষ হয়। তরাই ও ভাবর অঞ্চলে গবাদি পশুচারণ করা হয়। যশপুর কার্পাসবস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। কুটিরশিল্প হিসাবে দড়ির কারখানাও বর্তমান।

নৈনীতাল (২৯°২৪′ উত্তর এবং ৭৯°২৮′ পূর্ব) জেলার প্রধান শহর ও শাসনকেন্দ্র। পাশে সামরিক এলাকাও রহিয়াছে। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে শহরের পরিচালনভার ন্যস্ত। শৈলাবাস হিসাবে ইহার খ্যাতি আছে। উচ্চতম শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২৬০৪ মিটার উচ্চ। পাহাড়ের পাদদেশে ১৯৩৬ মিটার উচ্চে অবস্থিত একটি বৃহৎ ও গভীর হ্রদ মৎস্যশিকার ও প্রমোদ ভ্রমণের জন্য প্রসিদ্ধ। নৈনীতাল পাহাড়ী অঞ্চলের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র। শহরের আয়তন ১৪.৩২ বর্গকিলোমিটার ও জনসংখ্যা ১৬০৮০ (১৯৬১ খ্রী)। এখানে উত্তরপ্রদেশ সরকারের একটি মানমন্দির আছে।

দ্র *The Inperial Gazetteer of India*, vol. XVIII, London, 1908, *Census of India*, vol. XV, Part IIA, Delhi, 1964.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

নৈরাজ্যবাদ সমাজ পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্র বা দণ্ডশক্তির প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র স্বীকৃত হইলেও কোনও কোনও মুনির মতানুসারে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্ফুরণের পথে বাহিরের শাসনমাত্রই অন্তরায়স্বরূপ। যাঁহারা এই কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত শাসনব্যবস্থার নিরাকরণের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করেন তাঁহাদিগকে নৈরাজ্যবাদী বলা হয়। নৈরাজ্যবাদের ভাবনা বহু ধারায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্নকালে প্রবাহিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে এই সম্পর্কে এক বিচিত্র যৌথব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ব্যক্তি যতদিন সংসারের দায়িত্ব লইয়া আছেন, ততদিন তাহার বৃত্তি, দায়, স্বামিত্ব ও আহারবিহার পর্যন্ত একান্তভাবে সমাজ ও দণ্ডশক্তির অধীনে থাকিবে। কিন্তু অধ্যাত্মমুক্তির তাগিদে যখন তিনি সংসারের আশ্রয়

পরিহার করিতে প্রস্তুত তখন বিরজা হোম অনুষ্ঠানের পর তাঁহাকে নিরগ্নি অনিকেতন পরিব্রাজকরূপে গণ্য করিয়া সমাজ বা রাষ্ট্রের শাসন-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বৈদান্তিক হইলে তিনি স্বারাজ্যসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেন।

মানুষের পূর্ণতম বিকাশের পথে দণ্ডশক্তি যেমন অন্তরায় হইতে পারে ফরাসী লেখক প্রুধোঁ (১৮০৯-৬৫ খ্রী) তেমনই মনে করিতেন সম্পত্তির উপর ব্যক্তির স্বামিত্ব সমাজে অনৈক্য, শোষণ ও বিকাশের পথে নানা বাধার সৃষ্টি করে। ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম গড্উইন (১৭৫৬-১৮৩৬ খ্রী) নৈরাজ্যবাদের তত্ত্ব সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার জামাতা কবি শেলি-ও (১৭৯২-১৮২২ খ্রী) ঐ মতের পোষক ছিলেন। রুশবিপ্লবী বাকুনিন (১৮১৪-৭৬ খ্রী) মনে করিতেন, নৈরাজ্যবাদের সিদ্ধির জন্য রাষ্ট্রশক্তি এবং ব্যক্তিবিশেষের স্বামিত্বের ভাবকে সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা নির্মূল করিতে হইবে। তাহার পর মানবচরিত্রের স্বাভাবিক সাধুতা এবং সহযোগিতার প্রবৃত্তি অনুযায়ী সমাজের যাবতীয় কার্য স্বেচ্ছাধীন সংঘের দ্বারা পরিচালিত হইবে। প্রথম ইণ্টারন্যাশন্যাল প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বাকুনিন ও কার্ল মার্ক্স-এর (১৮১৮-৮৭ খ্রী) মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায়। মার্ক্স নৈরাজ্যবাদী ছিলেন না। কিন্তু তিনি মনে করিতেন, সর্বহারাদের কল্যাণার্থ রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিপ্লবের দ্বারা করায়ত্ত করার পর তাহার সকল শক্তিকে একান্তভাবে পুঞ্জীভূত করিয়া বিরুদ্ধ যাবতীয় শক্তিকে ধ্বংস করিতে হইবে। তখন সমাজের কার্য স্বেচ্ছাবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বশে আসিবে এবং ক্রমে রাষ্ট্র বা দণ্ডশক্তির প্রয়োজনীয়তা মিটিয়া রাষ্ট্রবিহীন সমাজব্যবস্থা প্রচলিত হইবে। বাকুনিন কিন্তু সাময়িকভাবেও রাষ্ট্রশক্তির উপযোগিতা স্বীকার করিতেন না। বাকুনিনের শেষ বয়সে অপর এক বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরবাদকেও মানবসমাজ হইতে মুছিয়া ফেলা আবশ্যক। ইহা ভেদ ও শোষণকে চিরস্থায়ী রাখার কৌশলমাত্র। বিখ্যাত লেখক তল্স্তয়-ও (১৮২৮-১৯১০ খ্রী) নৈরাজ্যবাদী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মতে মানুষ প্রকৃত ঈশ্বরানুবর্তিতা হইতে ভ্রষ্ট হওয়ার কারণেই সংসারে ভেদনীতি ও শোষণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইনের পরিবর্তে ঈশ্বরের শাসনকেই মানিয়া চলিতে হইবে। রাষ্ট্রের দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের জন্য হিংসাত্মক বিপ্লবের প্রয়োজন নাই; তাহার দ্বারা শুধু নূতন শৃঙ্খলের রচনাই হইবে। ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নম্রভাবে রাষ্ট্রের সহিত অসহযোগিতা করাই যথেষ্ট। রুশ বিপ্লবী ক্রপট্কিন (১৮৪২-১৯২১ খ্রী) গড্উইন বা বাকুনিনের মত নৈরাজ্যবাদের এক বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থা এবং আর্থিক ও সামাজিক সংগঠনবিষয়ে তাঁহার চিন্তা মৌলিকতাগুণে সমৃদ্ধ।

গান্ধীজী নৈরাজ্যবাদের বিষয়ে তল্স্তয় ও ইংরেজ লেখক রাস্কিনের (১৮১৯-১৯০০ খ্রী) আদর্শের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। অহিংস অসহযোগ এবং গঠনকর্মের সহায়তায় নূতন সমাজস্থাপনা সম্ভব বলিয়া তিনি মনে করিতেন; তবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে মানবসমাজে রাজশক্তির প্রয়োজন সর্বকালেই থাকিবে, কিন্তু মানুষের মুক্তির জন্য উত্তরোত্তর রাষ্ট্রের উপর নির্ভর না করিয়া স্বেচ্ছাবদ্ধ সংঘশক্তির উপরেই অধিকতর নির্ভর করা উচিত এবং এই পরিবর্তন আনয়নের জন্য বুদ্ধিযুক্ত গঠনকর্ম এবং সবিনয় আইন-অমান্যই যথেষ্ট। উক্ত ক্ষেত্রে তাঁহার মত নৈরাজ্যবাদী আমেরিকান লেখক থোরোর (১৮১৭-৬২ খ্রী) অনুরূপ ছিল। শিক্ষা বিষয়ে গান্ধীজীর মত অনেকাংশে ক্রপট্কিনের অনুরূপ হইলেও তিনি ক্রপট্কিনের লেখার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন কিনা সঠিক জানা যায় না। 'গান্ধীবাদ' দ্র।

দ্র অতীন্দ্রনাথ বসু, নৈরাজ্যবাদ, কলিকাতা, ১৯৬৩; P. Kropotkin, *Memoirs of a Revolutionist*, Boston, 1899; L. Tolstoy, *The Slavery of Our Times*, London, 1900; M. K. Gandhi, *Indian Home Rule*, Madras, 1922; George Woodcock, *Anarchism*, London, 1963.

নির্মলকুমার বসু

নৈহাটি (২২°৫৪′ উত্তর ও ৮৮°২৫′ পূর্ব) চব্বিশ পরগনা জেলার শহর। ইহা কলিকাতা হইতে মাত্র ৩৯ কিলোমিটার উত্তরে ব্যারাকপুর মহকুমায় হুগলি নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। বর্তমানে ইহার আয়তন ৪·৩৫ বর্গকিলোমিটার ও জনসংখ্যা (১৯৬১ খ্রী) ৫৮৪৫৭ জন। নৈহাটির পূর্বদিকে রেললাইনের অপর পারে দেউলপাড়া নামক স্থানে একটি পৌর-অঞ্চল বহির্ভূত শহর (জনসংখ্যা ১৭৭৯৭) গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্ব রেলপথের একটি শাখা নৈহাটি হইতে জুবিলি রেলব্রিজ দিয়া হুগলি নদী পার হইয়া ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত গিয়াছে।

এখানে একটি তাপবিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র আছে। উহা প্রায় ২১৬০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন করে।

প্রাচীন কাল হইতেই নৈহাটির কাঁঠালপাড়া অঞ্চল সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। এইস্থানে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ঋষি বঙ্কিম কলেজ ও বঙ্কিম পাঠাগার তাঁহার বাসভবনের নিকটেই স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর মদনমোহনের রাসযাত্রার সময়ে কাঁঠালপাড়ায় একটি বিরাট মেলা বসে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নৈহাটির অধিবাসী ছিলেন।

মুক্তারপুরের খাল ভাটপাড়াকে নৈহাটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

দ্র A. Mitra, *District Handbook : 24 Parganas, 1951*, Calcutta, 1954.

অনিলকুমার কুণ্ডু

নো জাপানী নাট্যকলার প্রধান তিন বাহন বা মাধ্যমের অন্যতম। অপর দুইটির নাম 'লিঙ্গো-শিবাই' এবং 'কাবুকি'। প্রত্যেকটির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে; আবার তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগও স্পষ্ট।

নো-নাটক কাব্যাশ্রয়ী। এই শিল্পের জন্ম ১৩শ কিংবা ১৪শ শতকে। মুদ্রিত নো-রচনা অবশ্য প্রথম দেখা যায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। ততদিনে তাহার ভাষা ও প্রকাশরীতি বেশ পরিণত। ১৭শ শতকের পর এই শিল্পের আঙ্গিকে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় নাই।

মন্দিরের আনুষ্ঠানিক নৃত্য, লোকনৃত্য, বৌদ্ধধর্ম-কাহিনী, চীনা ও জাপানী কবিতা, লোকগাথা প্রভৃতি হইতে নো-শিল্প তাহার বিষয় আহরণ করে; তাহার রূপরীতিও ওই সবের দ্বারা প্রভাবিত। প্রথম হইতেই এই শিল্পের রসগ্রাহী প্রধানতঃ অভিজাত সমাজ। ১৯শ শতকে সামন্ততন্ত্রের বিলোপের পর নো-কলাও বিলুপ্ত হইতে বসে। সেই সংকট অবশেষে দূর হয়; কিন্তু নো-শিল্প এখনও জনসাধারণের শিল্পে পরিণত হয় নাই। এখনও সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রমোদমাধ্যম হিসাবেই তাহা গণ্য।

মাটি হইতে প্রায় ৯০ সেন্টিমিটার (৩ ফুট) উচ্চে অবস্থিত মসৃণ কাঠের মঞ্চে (বা প্রায় ৫½×৫½ মিটার ১৮×১৮ ফুট) ইহার অভিনয় হয়। দর্শক-শ্রোতারা মঞ্চের দুই পাশে থাকেন। দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয় না, তবে মঞ্চসজ্জায় চিত্রকলার প্রয়োগ দেখা যায়। মঞ্চোপকরণ প্রতীকী ধরনের। পোশাক-পরিচ্ছদ সাড়ম্বর। প্রধান অভিনেতা দুইজন—বলা হয়, প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনেতা; তাঁহাদের অবশ্য সঙ্গী থাকিতে পারে। একসঙ্গে ১০ জন পর্যন্ত শিল্পীর মঞ্চে অবস্থান সম্ভব। নৃত্য ও সংগীত নো-অভিনয়ের দুইটি বিশিষ্ট উপকরণ। নাটকের ২য় পর্বে প্রথম অভিনেতার নৃত্যে নাট্যের বক্তব্য বস্তু প্রকাশ পায়। তখন ঐ অভিনেতা মুখোশ পরে। মুখোশের ব্যবহার মাত্র ঐ এক জায়গায়। একটি পূর্ণাঙ্গ নো-অনুষ্ঠানের প্রদর্শনকাল ৬-৭ ঘণ্টা।

জ্যোতির্ময় বসুরায়

নোবেল, আল্‌ফ্রেড বের্ন্‌হার্ড (১৮৩৩-৯৬ খ্রী) সুইডিশ রসায়নবিদ ও উদ্ভাবক। জন্ম স্টক্‌হোল্‌ম শহরে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর। তিনি প্রধানতঃ গৃহ-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে স্বগৃহে শিক্ষালাভ করেন। নোবেল অল্প বয়সেই রসায়নে পারদর্শিতা অর্জন করেন। সেন্ট-পিটার্সবুর্গে পিতা ইমানুয়েল নোবেলের নিকট তিনি টর্পেডো ও মাইন নির্মাণ শিক্ষা করেন। নোবেল-পরিবার সুইডেনে প্রত্যাবর্তন করিলে অধ্যাপক জিনিন-এর পরামর্শে আল্‌ফ্রেড নাইট্রোগ্লিসারিন নামক বিস্ফোরক সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুষ্ঠুভাবে বিস্ফোরণ ঘটাইবার একটি কৌশল (ডিটোনেটর) উদ্ভাবন করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নাইট্রোগ্লিসারিনের এক উন্নত রূপ, নিরাপদে ব্যবহারযোগ্য বিস্ফোরক 'ডিনামাইট' তাঁহার নামে পেটেন্ট হয়। বিস্ফোরক উৎপাদনের বিশ্ব-ব্যাপী ব্যবসায়ে অচিরেই তিনি বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হন। মানবহিতার্থে নোবেল বহু অর্থ দান করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার -সংক্রান্ত উইল রচনা করেন। ('নোবেল পুরস্কার' দ্র)। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর সান রেমো নামক স্থানে আল্‌ফ্রেড নোবেলের মৃত্যু হয়।

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

নোবেল পুরস্কার মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক পুরস্কার। আল্‌ফ্রেড নোবেল -এর তহবিল হইতে প্রতি বৎসর ৫টি বিষয়ে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর পারী শহরে নোবেল কর্তৃক সম্পাদিত উইলের দ্বারা তহবিলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উইলের শর্ত অনুসারে তহবিলের সুদ হইতে প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান আবিষ্কার, উদ্ভাবন বা কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়; পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাবিদ্যা, সাহিত্য ও বিশ্বশান্তি।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পুরস্কার দুইটি সুইডিশ বিজ্ঞান আকাডেমি কর্তৃক প্রদত্ত হয়; শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসা-

বিত্থার পুরস্কার স্টক্‌হোল্‌মের কারোলিন মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত হয় সাহিত্যবিষয়ক পুরস্কার স্টক্‌হোল্‌ম সাহিত্য অকাডেমি কর্তৃক প্রদত্ত হয় এবং শান্তিবিষয়ক পুরস্কারটি নরওয়েজিয়ান স্টরটিং (পার্লামেণ্ট) কর্তৃক নির্বাচিত কমিটির দ্বারা প্রদত্ত হয়। নোবেল পুরস্কার পৃথিবীর যে কোনও জাতির মানুষ পাইতে পারে।

অধুনা প্রতি বিষয়ে পুরস্কারের মূল্য প্রায় ১৬৫০০০ ক্রোনর। প্রথম পুরস্কার বিতরণ করা হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে (প্রতি বিষয়ে ১৫০৮০০ ক্রোনর)। প্রথম বৎসর পুরস্কার প্রাপ্ত হন পদার্থবিত্থায় রয়েণ্ট্‌গেন (জার্মানী), রসায়নে ভাণ্ট হফ্‌ (হল্যাণ্ড), শারীরবিত্থা বা চিকিৎসাবিত্থায় ফন বেরিং (জার্মানী) ও সাহিত্যে স্থলি প্রুধোম (ফ্রান্স); শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত হন সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ডুনাণ্ট ও ফ্রান্সের পাসি। এক বিষয়ের পুরস্কার একাধিক ব্যক্তিকে ভাগ করিয়া দেওয়ার রীতি আছে। যদিও নোবেল-এর উইলে কেবলমাত্র পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যের কথা উল্লেখ আছে, পরবর্তী কালে ঐ ব্যাপারে কোনও বিশেষ নিয়ম পালিত হয় নাই। এ পর্যন্ত একই বিষয়ে একই ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার পুরস্কার দেওয়ার নজির নাই। দুইটি বিষয়ে পুরস্কার লাভ করিয়াছেন একমাত্র মারী কুরি ('কুরি, মারিয়া স্ক্লোডোভ্‌স্কা' দ্র)। ভারতবাসীদের মধ্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৩ খ্রী) ও পদার্থবিত্থায় চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন (১৯৩০ খ্রী); আরও একজন ভারতীয়, হরগোবিন্দ খোরান্না (বর্তমানে মার্কিন নাগরিক), শারীরবিত্থায় নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন (১৯৬৮ খ্রী)।

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

নোভা তারা দ্র

নোয়াখালি পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলা। অবস্থান ১২°১০´ হইতে ২৩°১৮´ উত্তর ও ৯০°৪০´ হইতে ৯১°৩৫´ পূর্ব। ইহার আয়তন প্রায় ৪২৯৪ বর্গকিলোমিটার (১৬৫৮ বর্গমাইল)। ইহার উত্তরে কুমিল্লা জেলা ও ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বদিকে চট্টগ্রাম জেলা ও সন্দীপ খাল, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে মেঘনার মোহানা। জেলাটি মূল-ভূখণ্ড ও মেঘনার মোহানায় অবস্থিত বহু-সংখ্যক দ্বীপ লইয়া গঠিত। দ্বীপগুলির মধ্যে সন্দীপ ও হাতিয়া বৃহত্তম। অন্যান্য দ্বীপের মধ্যে নলচীরা, কিং, যাবর, বেলে, বেহারী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জেলার উত্তর-পূর্ব কোণের পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া সর্বত্র পাললিক মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। পশ্চিমদিকে মেঘনা নদী দ্রুত বিস্তারশীল মোহানা মূল-ভূখণ্ডকে দ্বীপ অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই জেলায় প্রায়ই মেঘনার মোহানার প্রবল জোয়ারের ফলে বন্যা দেখা দেয়।

মেঘনার দুইটি উপনদী, ফেনী ও ছোট ফেনী বৎসরের সকল সময়েই নৌবহনযোগ্য থাকে। এই নদীদ্বয় ত্রিপুরা রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। মেঘনার পলিমাটি জমিয়া সমুদ্রোপকূল দ্রুত দক্ষিণদিকে বিস্তারলাভ করিতেছে; অপরপক্ষে সমুদ্র মূল-ভূখণ্ডের কতকাংশ ও সন্দীপ দ্বীপকে গ্রাস করিতেছে।

জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সুপারি বৃক্ষের জন্য বিখ্যাত। উত্তর-পূর্বাংশের পার্বত্য দেশে শাল, চপলাস, জারুল ও গর্জন বৃক্ষ জন্মায়। উপকূলের নিকট নারিকেল গাছের আধিক্য দেখা যায়। পার্বত্য অঞ্চলে বাঘ, চিতাবাঘ ও হরিণ দেখা যায়। কুমির ও অজগরও দেখিতে পাওয়া যায়। নোয়াখালির উত্তাপ মাঝামাঝি। সর্বোচ্চ গড় উত্তাপ ৩২° সেন্টিগ্রেড (৮৯° ফারেনহাইট)-এর অধিক হয় না। সর্বনিম্ন গড় উত্তাপ সাধারণতঃ প্রায় ১৩° সেন্টিগ্রেড (৫৫° ফারেনহাইট)-এর নীচে থাকে। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ২৯২১ মিলিমিটারের (১১৫ ইঞ্চি) কম নহে।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জেলাটি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। পরবর্তী কালে ত্রিপুরা ও নোয়াখালিকে যুক্ত করিয়া একটি রেভেনিউ অঞ্চলরূপে গণ্য করা হয়; তখন ইহার নাম হয় 'ভুলুয়া'। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা হইতে নোয়াখালিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত করা হয়।

নোয়াখালির মোট জনসংখ্যা ২২৭৬২৮৩ (১৯৫১ খ্রী); তন্মধ্যে শহরে ২১৬২৮ জন বাস করে।

এই জেলায় ধান, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ ও কিছু তামাকও উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে নারিকেল তৈল, বাঁশের বাক্স ও মাদুর, জাল, চাষের যন্ত্রপাতি প্রধান। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রশিল্পপ্রতিষ্ঠানও আছে। প্রধান রপ্তানিদ্রব্য ধান, সুপারি, নারিকেল, তিসি, পেঁয়াজ, চর্ম ও ডিম এবং প্রধান আমদানিদ্রব্য লবণ, কেরোসিন তৈল, সরিষার তৈল, তামাক, পার্বত্য বাঁশ ও পান।

বর্তমানে এখানে পাকা রাস্তা বৃদ্ধি পাইতেছে। চট্টগ্রাম ট্রাংক রোড জেলার পূর্বাঞ্চলের মধ্য দিয়া ঢাকায় গিয়াছে। অন্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি মাজদি শহরের সঙ্গে ফেনী,

কুমিল্লা ও জেলার পশ্চিমাঞ্চলকে যুক্ত করিয়াছে। বর্ষাকালে প্রায় সর্বত্র খালের সাহায্যে জলপথে যাতায়াত করা হয়। সন্দীপ ও হাতিয়া দ্বীপের সঙ্গে মূল-ভূভাগের ফেরির দ্বারা যোগাযোগ আছে। ফেনীতে একটি বিমান-অবতরণক্ষেত্র আছে। মাজদি এই জেলার প্রধান শাসনকেন্দ্র।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XIX, Lodon, 1908; Nafis Ahmed, *An Economic Geography of East Pakistan*, London, 1958.

অনিন্দ্যকুমার পাল

নৌকা দাঁড়, পাল বা এঞ্জিনের দ্বারা চালিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের জলযান। নৌকার নির্মাণে কাঠ, ইস্পাত, হালকা ধাতু অথবা প্ল্যাস্টিক জাতীয় বস্তু ব্যবহার করা হয়। ক্যান্‌ভাস অথবা ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে প্রচলিত রবারের দ্বারা নির্মিত বায়ুপূর্ণ নৌকাও অধুনা বিশেষ জনপ্রিয়। নৌকার প্রাচীনতম ইতিহাস সম্বন্ধে অনুমেয় যে, জলে চলাফেরার জন্য গাছের গুঁড়ি কুঁদিয়া অথবা কাষ্ঠখণ্ড একত্র বাঁধিয়া মানুষ প্রথম জলযান প্রস্তুত করিয়াছিল। পার্শ্বিক গতির জন্য হাল ধরার কার্য সর্বপ্রথম নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে দাঁড়ের সাহায্যে সম্পন্ন করা হইত। পরে অবশ্য পশ্চাতের একটি এবং সম্মুখভাগের একটি দাঁড় অথবা পশ্চাদ্‌ভাগের দুইটি দাঁড় বা বৈঠা নৌচালনায় ব্যবহার করা হইত। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ১০০০ বৎসরেরও আগে নৌকার হাল ঘুরানোর হাতলের সহিত বৈঠার যোগাযোগ এবং বিভিন্ন তলে অবস্থিত একাধিক দাঁড় বা পালের সাহায্যে নৌচালনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতীতে মিশর, ভারতবর্ষ, মালয়, আরব এবং ফিনিশীয়ার অধিবাসীরা নৌকার ব্যবহারে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিল। মহেঞ্জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষে অজন্টার গুহামন্দিরে এবং সাঁচির স্তূপগাত্রে নৌকার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। ভারতের বাহিরে জাভার বোরোবুদুর মন্দিরে পাল তোলা ভারতীয় নৌকার রূপায়ণ দেখা যায়। প্রাচীন ভারতে নৌকা-নির্মাণের উপাদান, আকৃতি অনুসারে নৌকার শ্রেণী বিভাগ, নৌকার অলংকরণ এবং যাত্রীদের সুখ-সুবিধা বিধানের বিস্তারিত বিবরণ 'যুক্তি-কল্পতরু' এবং 'বৃক্ষ আয়ুর্বেদ' নামক দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

গঠন-প্রণালী অনুসারে আধুনিক নৌকা সাধারণতঃ দুই প্রকারের: প্রথম প্রকার নৌকার কাঠামো বা খোলের বহির্দেশ সম্পূর্ণ মসৃণ; দ্বিতীয় প্রকার নৌকার অবয়ব টালির ছাদের মত একটি তক্তার উপর অপর তক্তার সন্নিবেশে নির্মিত এবং অমসৃণ। নৌকা অধিকতর মজবুত করার জন্য অনেক সময়ে কাঠের খোলে ধাতুনির্মিত ফ্রেম ব্যবহার করা হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দ্রুতগামী, স্থানবহুল, প্রমোদ-ভ্রমণোপযোগী, রুক্ষ জলবায়ু সহনক্ষম প্রভৃতি নানা গুণযুক্ত নানা ধরনের ও আকৃতির নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়। পলিনেশিয়া অঞ্চলের দ্বি-নৌকা, প্রায় ৫০ জন আরোহীর দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার উপযোগী ফিজি দ্বীপপুঞ্জের পালযুক্ত শালতি-নৌকা, চীনের 'জাংক', ইন্দোনেশিয়ার 'প্রোয়া', মালয়েশিয়ার 'কোলেক্', তামিলনাড়ুর 'কাটামারান' অথবা এস্কিমোদের চর্মনির্মিত হালকা 'কায়াক' ইহার দৃষ্টান্ত।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা চুক্তি অনুসারে বাণিজ্য ও যাত্রী-জাহাজের আরোহীদের জন্য জাহাজডুবির ক্ষেত্রে ব্যবহারার্থ নৌকার ব্যবস্থা রাখিতে হয়। অভ্যন্তরদেশে বায়ুপূর্ণ আধার সন্নিবেশিত থাকায় এই সকল নৌকা কখনও ডুবে না।

দ্র রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ভারতের নৌ-শিল্প, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ; K. A. Coles, *Sailing Days*, London, 1944.

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

নৌ-নির্মাণবিদ্যা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত নৌ-নির্মাণবিদ্যার বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বর্তমান নৌ-নির্মাণ পদ্ধতির খুঁটিনাটি বিশেষ জটিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পক্ষেত্রে নৌ-নির্মাণ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে।

জাহাজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা, ওজন, গতিবেগ, এঞ্জিনের প্রকৃতিভেদ, যাত্রী ও নাবিকের সংখ্যা, বহনযোগ্য মালের প্রকৃতি, ওজন ও প্রয়োজনীয় স্থান-সংস্থান এবং অবশ্যগ্রাহ্য আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাজন সংস্থার নিয়মাবলী জাহাজ নির্মাণের পূর্বে বিবেচনা করা হয়। নৌ-নির্মাণের প্রারম্ভিক কার্যাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে নৌ-এঞ্জিন অর্থাৎ বাষ্পীয় টার্‌বাইন অথবা ডিজেল কিংবা পারমাণবিকশক্তি-চালিত এঞ্জিন ইত্যাদির নিরূপণ। এঞ্জিনের আয়তন ও ওজন, জ্বালানির ওজন ও অনায়াসলভ্যতা, গতিবেগ অনুসারে অর্থনৈতিক সাফল্য এবং নৌচালনায় নির্ভরযোগ্যতা, এই সকল বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন প্রকারের এঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। নৌযানের প্লবতা ও ভারসাম্য, জলের ভিতর দিয়া চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট রোধশক্তি (যাহা এঞ্জিনের শক্তি নির্দিষ্ট করে),

জলচাকার সাহায্যে নৌ-চালনা, সমুদ্রে ঝড়ো আবহাওয়ার পক্ষে জাহাজের উপযোগিতা ও কৌশলী নৌ-চালনা, নৌযানের কম্পন, সর্বপ্রকার অবস্থার উপযোগী মজবুত কাঠামো নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। নৌ-শিল্পী প্রারম্ভিক গণনাকার্যের সাহায্যে জাহাজের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য স্থির করেন। নৌ-শিল্পীর অস্থায়ী নকশার সাহায্যে কাঠ বা মোমের একাধিক মডেল তৈয়ারি করা হয়, বিশেষ জলাশয়ে ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মডেলগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং আহরিত তথ্যের দ্বারা পুরাপুরি জাহাজের গুণাবলী নির্ণয় করা হয়।

জাহাজের কাঠামো ও তাহার বিভিন্ন অংশ যথোপযুক্ত মজবুত কিনা, তাহা নির্ধারণের জন্য দুইটি চরম অবস্থা বিবেচনা করা হয়—জাহাজের সমান দৈর্ঘ্যের তরঙ্গশীর্ষে এবং দুই তরঙ্গশীর্ষের মধ্যবর্তী নীচু স্থানে জাহাজের অবস্থান। এই উভয় অবস্থায় জাহাজের প্রান্তভাগ হয় নিম্নদিকে অথবা উর্ধ্বাভিমুখে বিশেষভাবে বাঁকিয়া যায়। সমুদ্রে চলাচলকালে সীমাহীন ঢেউয়ের মধ্যে নৌযান ক্রমাগত এই অবস্থায় পড়ে এবং সমগ্র জাহাজ একবার উর্ধ্বাভিমুখে এবং তাহার পরে আবার বিপরীত দিকে বাঁকিয়া যায়। দীর্ঘকাল এই ধরনের বক্রতা যে কোনও অবয়বের উপর বিশেষ পীড়নের সৃষ্টি করে; এজন্য নৌযানের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ গঠনপ্রণালী বা বিশেষ ধাতু ব্যবহার করা হয়।

জাহাজের কাঠামো নির্মাণের নিয়মাবলী লণ্ডনের লয়েড্‌স রেজিস্টার অফ শিপিং, পারীর ব্যুরো ভেরিটাস, নিউ ইয়র্কের আমেরিকান ব্যুরো অফ শিপিং, হামবুর্গের গেয়ারমানিশ্যার লয়েড্‌স, টোকিওর তাইকোকু কাইজি কিওকাই, মস্কভার সোভিয়েট রেজিস্ট্রি অফ শিপিং প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। উপরি-উক্ত সমিতিগুলি জাহাজের গমনপথ ও ঋতু অনুযায়ী মালরেখা পর্যন্ত মালবোঝাই করার বাধ্যতামূলক আইন-কানুনও বলবৎ করে।

জলের তীরবর্তী নৌ-নির্মাণ কারখানার বিশেষ এক মজবুত ও ক্রমনিম্ন স্থানে জাহাজ তৈয়ারি করা হয়। জলাশয় বিশেষ চওড়া না হইলে অনেক সময়ে জলাশয়ের সমান্তরালে জাহাজ নির্মাণ করা হইয়া থাকে এবং আড়া-আড়িভাবে জাহাজ জলে ভাসাইবার জন্য বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা হয়। বিশালাকৃতি নৌযান সাধারণতঃ শুষ্ক ডকে (ড্রাই ডক) নির্মাণ করা হয়; পরে ডকটি জলপূর্ণ করিলে জাহাজ সহজেই জলের উপর ভাসিয়া ওঠে।

ভারতবর্ষে অবস্থিত নৌ-নির্মাণ কারখানাগুলির মধ্যে বিশাখপট্টনম শহরের 'হিন্দুস্থান শিপ্‌ইয়ার্ড' বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির শিক্ষাকেন্দ্রে নৌ-নির্মাণবিদ্যা শিক্ষাদান করা হয়।

দ্র E. L. Atwood, *Theoretical Naval Architecture*, London, 1953; D. Arnott, *Design and Construction of Steel Merchant Ships*, New York, 1955.

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

ন্যাবা রক্তে বিলিরুবিন নামক রঙ্গকদ্রব্যের (পিগ্‌মেণ্ট) আধিক্যঘটিত রোগ। লোহিত রক্তকণিকাগুলির ধ্বংসের সময়ে তাহাদের অভ্যন্তরস্থ রঙ্গকদ্রব্য হিমোগ্লোবিন ভাঙিয়া পীতবর্ণ বিলিরুবিন সৃষ্ট হয়, যকৃতের কোষগুলি রক্ত হইতে ঐ বিলিরুবিন অপসারণ করিয়া উহাকে পিত্তের সহিত অন্ত্রে ক্ষরণ করে এবং মলের সহিত উহা দেহ হইতে নির্গত হয়; কিন্তু কোনও কারণে প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ২ মিলিগ্রামের অধিক বিলিরুবিন জমিয়া গেলে ন্যাবা হয়। এ রোগে রক্তে বিলিরুবিনের আধিক্য ঘটে বলিয়া ত্বক, নেত্রবর্ত্ম-কলা এবং মুখবিবরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী পীতাভ দেখায় ও মূত্র পীতবর্ণ ধারণ করে। ন্যাবা তিনপ্রকার: ১. বাধাজনিত ন্যাবা (অব্‌স্ট্রাক্টিভ জন্‌ডিস): পিত্তবাহের প্রদাহ, পাথুরি অথবা অন্য কোনও রোগে পিত্তবাহে পিত্তসঞ্চালন বাধা-প্রাপ্ত হইলে পিত্তের মাধ্যমে বিলিরুবিনের রেচন (এক্‌স্‌-ক্রিশন) ব্যাহত হয়, ফলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া ন্যাবা হয়। এরূপ ন্যাবায় মূত্র গভীর পীতবর্ণ ও মল পাংশুবর্ণ হইয়া থাকে। অস্ত্রোপচারই এ রোগের বাঞ্ছনীয় চিকিৎসা ২. রক্তনাশজনিত ন্যাবা (হিমো-লাইটিক জন্‌ডিস): হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, পার্‌নিশি-য়াস অ্যানিমিয়া, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে অত্যধিক লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস হওয়ায় রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রাধিক্য ঘটে ও ন্যাবা হয়। এ রোগে মল ও মূত্র উভয়ই বিলিরুবিনের আধিক্যবশতঃ গভীর পীতবর্ণ ধারণ করে। স্টেরয়েড-জাতীয় ঔষধ দেওয়া ও মূল রোগের চিকিৎসা করা কর্তব্য ৩. সংক্রামক বা অধিবিষঘটিত ন্যাবা (ইন্‌ফেক্‌টিভ বা টক্‌সিক জন্‌ডিস): যকৃতের সংক্রামক প্রদাহ, পীতজ্বর, ক্লোরোফর্ম-জাতীয় রাসায়নিক পদার্থের বিষক্রিয়া, কয়েকটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের অভাব প্রভৃতি কারণে যকৃতের কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উহারা রক্ত হইতে যথেষ্ট পরিমাণে বিলিরুবিন অপসারণ করিতে

পারে না, ফলে ন্যাবা হয়। মলমূত্রের পীতবর্ণ ধারণ, জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য, নাড়ীর ধীর গতি, রোগীর চেতনালোপ প্রভৃতি এ রোগের উপসর্গ। যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা-জাতীয় খাদ্য, ভিটামিন বি-কম্‌প্লেক্‌স, অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্টেরয়েড-জাতীয় ঔষধ ও বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রদান করা বিধেয়।

কমলকুমার মল্লিক

ন্যায়, পাশ্চাত্য পাশ্চাত্য ন্যায় (লজিক) -এর আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল সাধারণভাবে 'চিন্তা'। চিন্তা শব্দটির ব্যবহার অতি ব্যাপক; যেমন প্রত্যক্ষ (পার্‌সেপ্‌শন), স্মরণ (মেমরি), কল্পনা (ইম্যাজিনেশন), সামান্যীকরণ (কন্‌সেপ্‌শন), বিধান (জাজ্‌মেন্ট) ও অনুমান (ইন্‌ফারেন্স)—ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি পাশ্চাত্য ন্যায় বা লজিক -এর আলোচনার অন্তর্গত।

যে চিন্তা ভাষায় ব্যক্ত হয় নাই তাহা লজিক-এর আলোচনার মধ্যে পড়ে না। চিন্তা ও ভাষা একান্ত সম্পর্কিত। লজিক শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে ইহার নির্দেশ পাওয়া যায়। ইংরেজী লজিক শব্দটি ফরাসী লজিক (logique) শব্দ হইতে আসিয়াছে। এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিতে আছে গ্রীক শব্দ লজিক (logike), যাহার মূলে আছে লোগোস (logos)—লোগোস শব্দটির অর্থ হইল চিন্তা ও শব্দ। ভাষায় প্রকাশিত ধারণাকে পদ (টার্ম), বিধানকে বচন (প্রোপোজিশন) ও যুক্তিকে অনুমান (ইন্‌ফারেন্স) বলা হয়।

কোনও বিষয় সম্পর্কে যথার্থ ও অসন্দিগ্ধ মানসিক বৃত্তি অথবা বিষয় ও মানস বৃত্তির সঙ্গতি সম্পর্কে অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস সাধারণার্থে জ্ঞানপদবাচ্য। সেই জ্ঞানলাভের উপায় হইল সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ (টেস্‌টিমনি); কেহ কেহ (রীড, হ্যামিল্‌টন প্রভৃতি) জ্ঞানলাভের উপায় সম্পর্কে ইন্‌টুইশন নামক একটি চতুর্থ উপায়ের কথা বলেন। তাঁহাদের মতে লজিকের 'মূল সূত্রাবলী', 'কার্যকারণতত্ত্ব' প্রভৃতি সম্পর্কে ইন্‌টুইশন্‌-এর মাধ্যমে সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়াদি তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ের সহিত যুক্ত হইলে সেই সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়—ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয় সম্পর্কীয় জ্ঞান হইল ঐন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ। অনুমানের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান হইল পরোক্ষ জ্ঞান। শব্দজাত জ্ঞানও পরোক্ষ জ্ঞানের অন্তর্ভূত।

কোনও কোনও পাশ্চাত্য তর্কবিদের (মিল, বেগ প্রভৃতি) মতে চিন্তার আকারগত সঙ্গতি ছাড়াও চিন্তার বাস্তব যাথার্থ্যের একটা দিক আছে; লজিক হইল আকারগত সঙ্গতি ও চিন্তার বাস্তব যাথার্থ্য ও অযাথার্থ্য নির্ধারণ সম্পর্কীয় বিদ্যা। প্রত্যক্ষ সম্পর্কে যাথার্থ্য অযাথার্থ্যের প্রশ্ন ওঠে না; যাহা প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই (পরোক্ষ) সেই সম্পর্কেই যাথার্থ্য ও অযাথার্থ্যের প্রশ্ন ওঠে। জ্ঞাত বিষয়ের ভিত্তিতে জ্ঞাত বিষয় কর্তৃক সমর্থিত কোনও অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান হইল আনুমানিক জ্ঞান। অনুমান-রূপ চিন্তাই তর্কবিদ্যার মুখ্য আলোচ্য বিষয়। কাহারও কাহারও মতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার জ্ঞানই তর্কবিদ্যায় আলোচিত হয়। চিন্তার নিয়ামক বিধিসকলের বিজ্ঞান হইল লজিক।

চিন্তার পদ্ধতি বা ধারা হইল চিন্তার আকার (ফর্ম্‌স অফ থট) এবং চিন্তনীয় বিষয় হইল চিন্তার অর্থ বা বস্তুর দিক। চিন্তার মূল সূত্রসকল যেমন 'তাদাত্ম্যসূত্র', 'বিরোধবাধকসূত্র', 'কার্যকারণসূত্র' (Laws of Indentity, contradiction, cause & Effect Relationship) প্রভৃতির দ্বারা চিন্তার আকার নির্ধারিত হয়। অনুমানক্ষেত্রে চিন্তার আকারগত ঐক্য থাকিলেও অর্থ বা বস্তুগত পার্থক্য থাকিতে পারে, আবার অর্থগত ঐক্য থাকিলেও আকারগত পার্থক্য থাকিতে পারে।

চিন্তার আকারগত সামঞ্জস্য (ফর্ম্যাল কন্‌সিস্‌টেন্সি) ও বাস্তব যাথার্থ্য (মেটিরিয়াল ভ্যালিডিটি) নির্ধারণ করা লজিকের উদ্দেশ্য। চিন্তার বিভিন্ন আকারের মধ্যে সংগতি বা সামঞ্জস্য হইল চিন্তার আকারগত সামঞ্জস্য এবং চিন্তার সহিত চিন্তনীয় অর্থ বা বস্তুর মিল হইল বস্তুগত যাথার্থ্য। অনুমান বা যুক্তির ক্ষেত্রেও আকারগত সংগতি এবং বাস্তব যাথার্থ্য থাকিতে পারে। কোনও অনুমান বা যুক্তির সিদ্ধান্ত যদি অনুমানে ব্যবহৃত বচন বা বচনসকল (প্রেমিসেস) হইতে নিয়মানুগভাবে নিঃসৃত হয় তবে সেই যৌক্তিক অনুমানের আকারগত সংগতি আছে বলা যায়। তবে আকারগত সংগতি থাকিলেও বস্তুগত যাথার্থ্য নাও থাকিতে পারে। অনুমান বস্তুর দিক দিয়া যথার্থ হইতে হইলে প্রথমতঃ অনুমানের সিদ্ধান্তটি নিয়মানুগভাবে নিঃসৃত হইতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ অনুমানে ব্যবহৃত বচনকে অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। কোনও অনুমান আকার ও বস্তু উভয় দিক দিয়া অসংগত অযথার্থ হইতে পারে আবার উভয় দিক দিয়া সংগত ও যথার্থও হইতে পারে।

পাশ্চাত্য তর্কবিদ্যাকেও বস্তু ও আকারের দিক দিয়া ভাগ করা যায়। আকারিক ন্যায়ে অনুমানে ব্যবহৃত

ন্যায়, পাশ্চাত্য

বচনসকলকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং স্বীকৃত বচনসকল হইতে সংগতভাবে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় কিনা, তাহাই বিচার করা হয়। তাই আকারিক ন্যায়কে (ফর্ম্যাল লজিক), সংগতিবিষয়ক তর্কবিদ্যা (লজিক অফ কন্‌সিস্‌টেন্সি) বা শুদ্ধ ন্যায় (পিওর লজিক) বলা হয়। পক্ষান্তরে বচনের যাথার্থ্য ও অযাথার্থ্য নির্ধারণের দিক দিয়া তর্কবিদ্যাকে প্রায়োগিক তর্কবিদ্যা (অ্যাপ্লায়েড লজিক) বা বস্তুগত তর্কবিদ্যা (মেটিরিয়্যাল লজিক) বলা হয়।

পাশ্চাত্য ন্যায়ের লক্ষ্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতের উল্লেখ দেখা যায়। কোনও কোনও তর্কবিদের (হ্যামিল্‌টন, ম্যান্‌সেল, হোয়েট্‌লি প্রভৃতি) মতে আকারিক সংগতি বা সামঞ্জস্য তর্কবিদ্যার লক্ষ্য, অর্থাৎ কি কি বিধি অনুসরণ করিলে অনুমান আকারগত দিক হইতে সংগত হয় তাহা নির্ধারণ করা তর্কবিদ্যার কাজ। অনুমানে ব্যবহৃত বচনসকলের বাস্তব যাথার্থ্য আছে কিনা তাহা নির্ধারণ করা জড়বিজ্ঞানের লক্ষ্য। আবার কাহারও কাহারও (মিল, বেন প্রভৃতি) মতে আকারগত সংগতির সহিত বাস্তব যাথার্থ্যও নির্ধারণ করাই লজিকের লক্ষ্য।

অনুমান একদিক দিয়া মানসিক ক্রিয়া, অর্থাৎ যাহার সাহায্যে এক বা একাধিক বচন হইতে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। অন্যদিক দিয়া অনুমান মানসিক ক্রিয়ার ফল বা পরিণতি অর্থাৎ সিদ্ধান্ত যাহা এক বা একাধিক বচন হইতে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। এই দ্বিতীয় অর্থেই অনুমান বা যুক্তি তর্কবিদ্যায় আলোচিত হইয়া থাকে। তবে মানসিক ক্রিয়ারূপ অনুমান ইহার সিদ্ধান্ত বা ফলের সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

জ্ঞান দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। পরোক্ষ জ্ঞান হইল অনুমান। অনুমান দ্বিবিধ : ১. অমাধ্যম বা প্রত্যক্ষ (ইমিডিয়েট ইন্‌ফারেন্স) ২. সমাধ্যম বা পরোক্ষ (মেডিয়েট ইন্‌ফারেন্স)। সমাধ্যম বা পরোক্ষ অনুমান আবার আকারিক ও বস্তুগত হইতে পারে। আকারিক অমাধ্যম বা প্রত্যক্ষ অনুমানে সিদ্ধান্ত একটি মাত্র বচন হইতে নিঃসৃত হয় এবং আকারিক পরোক্ষ অনুমানে সিদ্ধান্ত একাধিক বচন হইতে নিঃসৃত হয়, কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত বচন বা বচনসকল হইতে অধিকতর ব্যাপক হইতে পারে না ; সম বা অনধিক হইতে পারে। বস্তুগত সমাধ্যম অনুমানে সিদ্ধান্ত একাধিক দৃষ্টান্ত হইতে নিঃসৃত হয় এবং সিদ্ধান্ত বচনসকল হইতে অবশ্যই ব্যাপকতর হইবে। তর্কবিদ্যায় পরোক্ষ বা সমাধ্যম অনুমান কখনও কখনও ন্যায় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তর্কবিদ্যার লক্ষ্যবস্তুর দিক দিয়া 'লজিক', 'পাশ্চাত্য ন্যায়', 'তর্কবিদ্যা' প্রভৃতি শব্দ বহুলাংশে সমার্থবোধক। আকারিক সমাধ্যম ন্যায়ে তিনটি পদ 'উদ্দেশ্য', 'বিধেয়' ও 'সংযোজক' (copula) এবং তিনটি বচন (প্রোপোজ়িশন) 'মেজর', 'মাইনর' ও 'সিদ্ধান্ত' থাকে। সিদ্ধান্তটি বচনদ্বয় হইতে মিলিতভাবে নিঃসৃত হয়। সিদ্ধান্তের বাস্তব যাথার্থ্য বচনসকলের বাস্তব যাথার্থ্যগত।

আরিস্তোতল (৩৮৫-৩২২ খ্রীষ্টপূর্ব)-এর আকারনিষ্ঠ চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করিয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহে ন্যায় আলোচনার ইতিহাসে যৌক্তিক চিন্তার বিভিন্নমুখী বিস্তার ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। আরিস্তোতলের ন্যায় বা লজিক 'আকারিক ন্যায়' (ফর্ম্যাল লজিক) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক হইতে প্রায় খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল পাশ্চাত্য জগতে সাধারণভাবে 'আকারিক ন্যায়' -এর অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। ১৯শ শতাব্দীর ১ম দশকে হেগেল (১৭৭০-১৮৩১ খ্রী)-এর যৌক্তিক চিন্তাক্ষেত্রে এক নূতন ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। চিন্তার বিভিন্ন স্তরের বিবর্তনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন যৌক্তিক আকারের (ফর্ম) বাস্তব উন্মেষের সম্ভাব্যতা বিচার করিবার প্রচেষ্টা উক্ত 'লজিক'-এ লক্ষিত হয়। পরবর্তী কালে ব্র্যাড্‌লি (১৮৪৬-১৯২৪ খ্রী), বোজ়ান্‌কিট (১৮৪৮-১৯২৩ খ্রী) প্রভৃতি তর্কবিদ্‌গণ হেগেলীয় পরম্পরা অনুসরণ করিয়া বিধান (জাজ্‌মেণ্ট)-এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন। চিন্তার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে যৌক্তিক আকারসকল যে অভিব্যক্ত হয়, 'আইডিয়ালিস্ট লজিক' -এ তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বোজ়ান্‌কিট লজিককে 'মর্ফোলজি অফ থট' বলিয়াছেন। হেগেলীয় লজিক-এর আবির্ভাবের অল্পকাল পরে ১৯শ শতাব্দীর ৪র্থ দশকে মিল (১৮০৬-১৮৭৩ খ্রী)-এর 'এম্‌পিরিক্যাল লজিক' গড়িয়া ওঠে। মিল চিন্তার আকারিক সংগতিকে অস্বীকার না করিয়া সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর লজিক-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। হেগেলীয় লজিক ও মিলের 'এম্‌পিরিক্যাল লজিক'-এ স্বীকৃত চিন্তার বাস্তব যাথার্থ্যের দিক হইতে বিচার করিলে আরিস্তোতলের 'আকারিক ন্যায়'কে একদেশিক বলা যায়।

১৯শ শতাব্দীর শেষের দিকে ও ২০শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইওরোপ ও আমেরিকায় আরও দুইটি চিন্তাধারার প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়—পিয়ার্স (১৮৩৯-১৯১৪ খ্রী)-প্রবর্তিত যাথার্থ্য (ট্রুথ)-এর মূল্য-নির্ধারক,

ব্যবহারসাপেক্ষ 'প্রাগ্‌ম্যাটিস্ট'দের প্রায়োগিক ন্যায় এবং বুল (১৮১৫-১৮৬৪ খ্রী)-প্রবর্তিত গণিতভিত্তিক, প্রতীকানুগ (সিম্‌বলিক) আকারিক ন্যায়। এই শেষোক্তটি আরিস্তোতলের আকারিক ন্যায়ের বিস্তারিত রূপ। গাণিতিক প্রভাব, আকারিক পদ্ধতি, সম্বন্ধের দিক দিয়া বচন ও তাহার তাৎপর্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রভৃতি এই ন্যায়-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ২০শ শতাব্দীর ৩য়-৪র্থ দশকে 'সায়েন্স অফ মেথডোলজি' হিসাবে নূতন-ভাবে লজিক দেখা দিয়াছে। ইহার প্রভাবও অনস্বীকার্য। গাণিতিক তর্কবিদেরা বিধান ও বচনের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে কোনও কিছুকে স্বীকার বা অস্বীকার করিবার মননক্রিয়া হইল বিধান। বিধানে যাহা স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয় তাহাই বচন।

প্রতীকানুগ গাণিতিক নব্য আকারিক ন্যায় আকার-সম্মত অনুমানের গঠন সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। ইহার পদ্ধতি হইল আলোচ্য বচনের অর্থাংশ হইতে মৌল উপাত বিশ্লিষ্ট করা ও ন্যায়ের আকারে সাজানো। প্রকাশিত বচনের আকার ও অর্থাংশকে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ করা যাইতে পারে কোনও বিশেষ ধরনের ভাষা ও প্রতীকের মাধ্যমে। ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, আকারিক পদ্ধতি (ফর্ম্যাল মেথড) ব্যাকরণের বাক্যকে নৈর্বক্তিকরূপী বিশিষ্ট বচনে প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টা এবং সেই প্রকাশিত বচনের বিশ্লেষণের মধ্যে অনুমানের যাথার্থ্য ও তাৎপর্য বস্তুগত দিক দিয়া অন্বেষণ করা। বাস্তব ঘটনাকে এইভাবে বিধিবদ্ধ করিবার পশ্চাতে প্রতীকানুগ বিশেষ ধরনের ভাষা নির্বাচনের প্রয়োজন আছে। সেই ভাষা অবশ্যই ন্যায়সম্মত, যথাযথ, সর্বপ্রকার অস্পষ্টতা ও অনিয়ম হইতে মুক্ত হইবে। বিভিন্ন তর্কবিদেরা প্রতীকের মাধ্যমে বচনের বিভিন্ন আকারকে সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ অর্থের দিক দিয়া বচন তাহা হইলে অনেকখানি অস্পষ্টতা-মুক্ত হইবে এবং সমান্তরাল ধারায় বাক্যের বাস্তব রূপ ও বচন পাশাপাশি চলিবে।

২০শ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে দ্রুত প্রসার, বিশেষভাবে বহু গাণিতিক বচনকে আরিস্তোতলের চিন্তার আকারে প্রকাশ করিবার যোগ্যতার অভাবের জন্যই উক্ত 'আকারিক ন্যায়' -এর বিস্তারিত নবরূপায়ণ -এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। নব্য আকারিক ন্যায়-এর মাধ্যমে বর্তমান ইওরোপ ও আমেরিকার যৌক্তিক চিন্তাক্ষেত্রে এক নবযুগ রচনার প্রচেষ্টা চলিতেছে। বর্তমানে ইওরোপ ও আমেরিকার যৌক্তিক চিন্তাক্ষেত্রে 'প্রতীকানুগ গাণিতিক ন্যায়' বা 'আকারিক ন্যায়'-এর বিস্তারিত রূপেরই প্রাধান্য।

দ্র G. W. F. Hegel, *Wissenschaft der Logik*, Berlin, 1812-16 ; J. S. Mill, *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive*, London, 1843 ; F. H. Bradley, *The Principles of Logic*, Oxford, 1883 ; B. Bosanquet, *Logic or Morphology of Thought*, London, 1888 , A. N. Whitehead & B. Russel, *Principia Mathematica*, vols. I-III, Cambridge, 1910-13 ; W. V. Quine *Mathematical Logic*, Massachusetts, 1940.

মনোরঞ্জন বসু

ন্যায়, ভারতীয় 'নীয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিরনেন' — যদ্দ্বারা বাদীর বিবক্ষিত অর্থের সিদ্ধি বা নিশ্চয়কে লাভ করা যায় তাহাই ন্যায়। পরার্থ অনুমান ও তদুদ্দেশ্যে প্রযোজ্য প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যই ন্যায়; সেই পঞ্চাবয়ব-বিশিষ্ট বাক্যসকল হইল যথাক্রমে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। সেই ন্যায়প্রতিপাদক শাস্ত্রও ন্যায় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ন্যায়ের প্রতিপাদ্য প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ; যেমন ১. প্রমাণ ২. প্রমেয় ৩. সংশয় ৪. প্রয়োজন ৫. দৃষ্টান্ত ৬. সিদ্ধান্ত ৭. অবয়ব ৮. তর্ক ৯. নির্ণয় ১০. বাদ ১১. জল্প ১২. বিতণ্ডা ১৩. হেত্বাভাস ১৪. ছল ১৫. জাতি ও ১৬. নিগ্রহ স্থান।

প্রত্যক্ষ ও আগম অবিরুদ্ধ অনুমান অর্থাৎ প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ও শাস্ত্রোক্ত তত্ত্ব শ্রবণের পর অনুমান, প্রমাণ ও যুক্তিসাপেক্ষ মননই 'অন্বীক্ষা'। সেই 'অন্বীক্ষা' সম্পাদনের জন্য যে শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে—এই অর্থে অন্বীক্ষা শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'আন্বীক্ষিকী' শব্দের ন্যায়শাস্ত্র। ন্যায় মতে প্রমেয় পদার্থ দ্বাদশটি, যেমন ১. আত্মা ২. শরীর ৩. ইন্দ্রিয় ৪. অর্থ ৫. বুদ্ধি ৬. মন ৭. প্রবৃত্তি ৮. দোষ ৯. প্রেত্যভাব ১০. ফল ১১. দুঃখ ১২. অপবর্গ।

মহর্ষি গৌতমোক্ত 'ন্যায়সূত্র' ও বাৎস্যায়নাদি আচার্য-গণের ভাষ্য-টীকাদি প্রাচীন ন্যায় বলিয়া অভিহিত। সেই ন্যায়সূত্রের কিয়দংশ অবলম্বনে রচিত গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'তত্ত্বচিন্তামণি' একখানি প্রকরণ-গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে প্রধানতঃ গৌতমোক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দপ্রমাণ, এই চতুর্বিধ প্রমাণ পদার্থের অতি সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ এবং আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পূর্বোক্ত অনেক পদার্থের বিচার আছে। গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রবর্তিত

ন্যায়, ভারতীয়

ও পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি আচার্যগণের রচনায় সমৃদ্ধ ন্যায় নব্য ন্যায় বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন ও নব্য ন্যায় উভয়ই ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত।

আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি প্রাচীন ন্যায় মতে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি, নব্যদের মতে ইহাই চরম পুরুষার্থ।

ন্যায়শাস্ত্র প্রমাণশাস্ত্র বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। ন্যায় মতে জ্ঞান দ্বিবিধ—অনুভূতি ও স্মৃতি। স্মৃতিজ্ঞান ন্যায় মতে প্রমা বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত নয়। অনুভূতি হইল প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা প্রমা। প্রমাণ শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃষ্ট অনুভূতির করণ অর্থাৎ যদ্দ্বারা যে বিষয়ের যথার্থ অনুভূতি জন্মে তাহাই সেই বিষয়ের প্রমাণ পদার্থ। যথার্থ অনুভূতির করণত্বই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ। গৌতমের মতে অনুভূতি চারপ্রকার: ১. প্রত্যক্ষ ২. অনুমিতি ৩. উপমিতি ৪. শাব্দবোধ। শেষোক্ত তিনটি প্রমাণ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষে যে যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ শব্দের অন্তর্ভুক্ত 'অক্ষ' শব্দের অর্থ 'ইন্দ্রিয়'; ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান, সেই জ্ঞানের বিষয় এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ—এই তিন অর্থেই প্রত্যক্ষ শব্দের প্রয়োগ করা হয়।

'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্'—ইন্দ্রিয় বলিতে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন—অর্থ হইল সেই সব ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিভিন্ন বিষয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার গ্রাহক ইন্দ্রিয়-বিশেষের যে সন্নিকর্ষ তাহাই ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ। অব্যভিচারী অর্থাৎ যথার্থ— সুতরাং ইন্দ্রিয়াদি সন্নিকর্ষের জন্য যে যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাহারই নাম প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষের যাহা করণ তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। লৌকিক ও অলৌকিক সন্নিকর্ষভেদে প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ— লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ। উদ্যোতকর লৌকিক সন্নিকর্ষকে ছয়প্রকার বলিয়াছেন ১. সংযোগ ২. সংযুক্ত সমবায় ৩. সংযুক্ত সমবেত সমবায় ৪. সমবায় ৫. সমবেতসমবায় ৬. বিশেষণতা। অলৌকিক সন্নিকর্ষজন্য যে প্রত্যক্ষ তাহার নাম অলৌকিক প্রত্যক্ষ। সেই অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিনপ্রকার: ১. সামান্য-লক্ষণ সন্নিকর্ষ ২. জ্ঞান-লক্ষণ সন্নিকর্ষ ৩. যোগজ সন্নিকর্ষ। কোনও পদার্থের (গো) সামান্যধর্মবিষয়ক (গোত্ব) সন্নিকর্ষ সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ — উক্ত সন্নিকর্ষজনিত অন্যান্য সমস্ত (গোর) অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। জ্ঞান-লক্ষণ সন্নিকর্ষ 'জ্ঞান লক্ষণা প্রত্যাসত্তি' নামেও কথিত হইয়া থাকে। 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' এই ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লক্ষণ সন্নিকর্ষজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ বিশেষ। 'সামান্য লক্ষণা' সামান্যাশ্রয়ের জ্ঞানের জনক; জ্ঞান-লক্ষণা যদ্বিষয়ে জ্ঞান হয় তাহার জ্ঞানের জনক। জ্ঞান-লক্ষণ সন্নিকর্ষ ভিন্ন বাহ্য পদার্থ বিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষরূপ অনুব্যবসায় সম্ভব হয় না। তৃতীয় প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষের নাম 'যোগজ'— যোগীর সমাধিবিশেষরূপ যোগজন্য সন্নিকর্ষ যোগজ সন্নিকর্ষ। এইরূপ স্থলে অনাগত ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষীভূত হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বিবিধ : ১. নির্বিকল্পক ২. সবিকল্পক। কোনও মতে 'অব্যপদেশ্যং' পদের অর্থ নির্বিকল্পক— এই প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত পদার্থে বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব থাকে না— কোনও মতে 'ব্যবসায়াত্মক' পদের অর্থ সবিকল্পক— এই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত পদার্থে বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব থাকে।

অনুমানের হেতুপদার্থ হইল লিঙ্গ, যেমন ধুম দেখিয়া বহ্নির অনুমান ক্ষেত্রে ধুম হইল লিঙ্গ এবং তদ্দ্বারা অনুমেয় পদার্থ হইল লিঙ্গী—উক্ত ক্ষেত্রে 'বহ্নি' হইল লিঙ্গী। লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ হইল 'ব্যাপ্য-ব্যাপক' সম্বন্ধ। ব্যাপ্য থাকিলেই সেখানে তাহার ব্যাপক পদার্থ থাকিবেই। ব্যাপ্য পদার্থ দ্বারা ব্যাপক পদার্থের অনুমিতি হওয়ায় ব্যাপ্য পদার্থ হইল লিঙ্গ বা হেতু এবং ব্যাপক পদার্থ হইল লিঙ্গী। যে ধর্মীতে সেই লিঙ্গীর অনুমিতি হয় সেই ধর্মী পক্ষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোনও স্থানে ধুম দর্শনের পর অপর কোনও স্থানে যখন দ্বিতীয়বার ধুম দর্শন হয় তজ্জন্য ধুম-বহ্নির ব্যাপ্তি স্মরণের পরে বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধুমের যে পুনর্দর্শন উহা তৃতীয় লিঙ্গদর্শন বা তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শ বা কেবল পরামর্শ নামে কথিত হইয়া থাকে—লিঙ্গ-পরামর্শরূপ জ্ঞানজন্য যে পরোক্ষ অনুভূতি তাহাই অনুমিতি এবং যথার্থ অনুমিতির কারণই অনুমান প্রমাণ। নব্য-নৈয়ায়িকদিগের মতে লিঙ্গ-পরামর্শের জনক পূর্বোৎপন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির করণ।

অনুমান প্রমাণ ত্রিবিধ: ১. পূর্ববৎ ২. শেষবৎ ৩. সামান্যতোদৃষ্ট। কারণ ও কার্যের মধ্যে কারণটি পূর্ব এবং কার্যটি শেষ বা উত্তর। কারণের দ্বারা কার্যের অনুমিতি হইলে সেই অনুমানের নাম 'পূর্ববৎ' এবং কার্যের দ্বারা কারণের অনুমিতি হইলে সেই অনুমান 'শেষবৎ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে লিঙ্গ বা হেতু অনুমেয় পদার্থের কারণও নয় কার্যও নয়, এমন লিঙ্গের দ্বারা অনুমিতি হইলে সেই অনুমান প্রমাণের নাম সামান্যতোদৃষ্ট। এই ত্রিবিধ অনুমানের স্বরূপ সম্বন্ধে অন্যরূপ মতও আছে। উদ্যোতকর উক্ত ত্রিবিধ অনুমান যথাক্রমে 'অন্বয়ী', 'ব্যতিরেকী' ও 'অন্বয়-ব্যতিরেকী', এই নামত্রয়ে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

'গবয়ো গবয় পদবাচ্যঃ'; গো-সদৃশকে গবয় বলা হয়

—এই কথা শুনিবার পর বনে গবয় দেখিয়া 'গো-সদৃশ'-রূপ সাদৃশ্য জ্ঞানের পর অতিদেশ বাক্যার্থের স্মরণজনিত 'গবয় পদে গবয়কেই বুঝায়'—এই জ্ঞান হইল উপমিতি জ্ঞান; উপমিতির করণ হইল উপমান। যদ্দ্বারা অতীন্দ্রিয় সাধ্য পদার্থের যথার্থ অনুভূতি জন্মে তাহাই উপমান প্রমাণ।

'আপ্তোপদেশ শব্দ'—আপ্তব্যক্তির উপদেশ বা বাক্য হইল শব্দপ্রমাণ। নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের স্মরণাত্মক জ্ঞানই শাব্দবোধের করণ এবং সেই জ্ঞানজনিত পদার্থের স্মরণাত্মক জ্ঞান ঐ করণের ব্যাপার। সুতরাং পদসমূহের সেই স্মরণাত্মক জ্ঞান হইল শব্দ প্রমাণ।

প্রমাণ ভিন্ন যদি কিছুই সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রমাণ-পদার্থের প্রামাণ্য নিরূপণের প্রয়োজন আছে। প্রমাণ যদি আবার দ্বিতীয় প্রমাণের বিষয় হয় তাহা হইলে তখন উহা আর প্রমাণ পদবাচ্য থাকে না, প্রমেয় পদবাচ্য হয়। ন্যায় মতে সামান্যতঃ প্রমেয়ত্ব সকল পদার্থেই আছে। প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব কালভেদে বিভিন্ন হয় না।

প্রমাণ দ্বারা যথার্থ জ্ঞান জন্মিলেও কোনও কোনও স্থানে সেইরূপ জ্ঞান যথার্থ কিনা এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। প্রমাজ্ঞান জন্মিলেই সেই জ্ঞানের বোধক যে সকল কারণ তাহা দ্বারা যদি সেই জ্ঞানের প্রমাত্ব নিশ্চয় জন্মে তাহা হইলে সেই মতকে 'স্বতঃ-প্রামাণ্য'বাদ বলা হইয়া থাকে। ন্যায় মতে কোনও বিষয়ে প্রমাজ্ঞান জন্মিলে যদি কখনও সন্দেহের অবকাশ হয় তখন সেই প্রমাজ্ঞানের বোধক কারণ দ্বারাই তাহার প্রমাত্ব নিশ্চয় জন্মে একথা বলা যায় না। নৈয়ায়িক সম্প্রদায় প্রমাণের প্রামাণ্য নিরূপণে পরতঃ প্রামাণ্যবাদী। নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'তত্ত্বচিন্তামণি'-র 'প্রামাণ্যবাদ' খণ্ডে নূতনভাবে এই প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। 'গঙ্গেশ উপাধ্যায়', 'নব্যন্যায়' দ্র।

দ্র ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত, ন্যায়দর্শন, কলিকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

মনোরঞ্জন বসু

ন্যাস, ট্রাস্ট সাধারণভাবে বলিতে গেলে যখন কোনও ব্যক্তি এমন অবস্থায় কোনও সম্পত্তির মালিক হয় বা কোনও সম্পত্তিতে কোনও স্বত্ব অর্জন করে যে সে সেই সম্পত্তি বা স্বত্ব অন্য কোনও ব্যক্তির উপকারার্থে বা কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনার্থে প্রয়োগ করিতে বাধ্য থাকে, তখন ন্যাসের উৎপত্তি হয়। 'ভারতীয় ন্যাস আইন, ১৮৮২' (ইণ্ডিয়ান ট্রাস্ট অ্যাক্ট, ১৮৮২ খ্রী) ন্যাসের যে সংজ্ঞা দিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত অর্থ হইল, ন্যাস (ট্রাস্ট) সম্পত্তির মালিকানা সংশ্লিষ্ট দায়িত্ববিশেষ। এই দায়িত্বের উদ্ভব হয় তখন, যখন মালিক তাহার উপর ন্যস্ত বিশ্বাস অঙ্গীকার করিয়া কোনও সম্পত্তি অপর কোনও ব্যক্তির বা উদ্দেশ্যের স্বার্থে দখল করিতে স্বীকৃত হয়; অবশ্য মালিক নিজেই তাহার কোনও সম্পত্তি কোনও ব্যক্তির বা উদ্দেশ্যের হিতার্থে প্রয়োগ করিবে এইরূপ ঘোষণা ও অঙ্গীকার করিয়া ন্যাসের সৃষ্টি করিতে পারে। সাধারণতঃ, যখন কেহ কোনও আস্থাভাজন ব্যক্তির হস্তে এই বিশ্বাস লইয়া নিজ সম্পত্তি অর্পণ করে যে সম্পত্তি-গ্রহীতা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির বা সমষ্টির উপকারার্থে বা কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পালনার্থে সম্পত্তির উপস্বত্ব বিনিয়োগ করিবে এবং সম্পত্তি-গ্রহীতাও সেই বিশ্বাস অনুযায়ী সম্পত্তি দখল করিতে স্বীকৃত হয়, তখন ন্যাসের উৎপত্তি হয়। যে সম্পত্তি অর্পণ করে তাকে ন্যাস-কর্তা বলা যায়, যে ন্যস্ত বিশ্বাস অনুসারে সম্পত্তি প্রয়োগ করার দায়িত্বে সম্পত্তি গ্রহণ করে তাহাকে ন্যাসরক্ষক বলা যায় এবং যাহার স্বার্থে বা উপকারার্থে ন্যাসরক্ষক মালিকানা গ্রহণ করে তাহাকে স্বত্বভোগী বলা যায়।

বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রচলিত ন্যাস-সংক্রান্ত বিধিসমষ্টি বহুলাংশেই ইংরেজী ট্রাস্ট-বিধির অনুরূপ। ১৩শ শতাব্দীতে তৎকালীন সামাজিক ও ভূমিস্বত্বের কঠোর বিধানগুলি এড়াইয়া সম্পত্তি সংরক্ষণ করিবার চেষ্টায় ইংল্যাণ্ডে ট্রাস্টের প্রথম উদ্ভব হয়। ক্রমে চ্যান্সারি আদালতের তত্ত্বাবধানে ট্রাস্ট-বিধি বহু শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হইয়া ওঠে। 'ভারতীয় ন্যাস আইন, ১৮৮২,' ইংরেজী ট্রাস্ট-বিধির মূল সূত্রগুলি এদেশের উপযোগী করিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছে। উক্ত আইনে ন্যাসসৃষ্টির প্রণালী, ন্যাসরক্ষণের কর্তব্য ও দায়িতা, ন্যাসরক্ষকের ক্ষমতা, স্বত্বভোগীর অধিকার ও দায়িতা, ন্যাসরক্ষকের পদত্যাগ, ন্যাসের অবসান প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বিধান আছে।

ন্যাস সৃষ্টি করিবার প্রধান কারণ হইল কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্পত্তি সংরক্ষণ করা। সর্বকালেই সকল সভ্য-সমাজে এই কারণ বর্তমান থাকায় কোনও-না কোনও রূপে ন্যাসের প্রচলন সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমদেশে দেবতার উদ্দেশে সম্পত্তি উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে নানাবিধ ইষ্ট ও পূর্ত কর্মের জন্য সম্পত্তি উৎসর্গ করিবার রীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। এই রীতিকে মূলতঃ ন্যাস বলা যায়,

যদিও ন্যাস এই শব্দটির প্রচলন কোথাও দেখা যায় না। উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ বিধান স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায় না, যদিও অনুমান করা যায় রাজার বা সমাজের শাসন প্রবল থাকায় ধর্মীয় বা দাতব্য কর্মের জন্য উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি আত্মসাৎ করা বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলিত না। কালক্রমে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দানকৃত সম্পত্তি বিপুল আকার ধারণ করে এবং স্থানে স্থানে তাহার অসঙ্গত ব্যবহারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। ব্রিটিশ আমলে এই প্রকার সম্পত্তির ব্যবহার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়, ফলে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ধর্মীয় উৎসর্জন আইন' (রিলিজিয়াস এণ্ডাওমেণ্ট্‌স অ্যাক্‌ট, ১৮৬৩ খ্রী) প্রণয়ন করা হয়। পরে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'দাতব্য উৎসর্জন আইন' (চ্যারিটেব্‌ল এণ্ডাওমেণ্ট্‌স অ্যাক্‌ট, ১৮৯০ খ্রী) প্রণীত হয়। মুসলমানসমাজে ওয়াক্‌ফ্‌ সৃষ্টির দ্বারা সম্পত্তি সংরক্ষণের প্রথা বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। সম্প্রতি কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য ওয়াক্‌ফ্‌ সংক্রান্ত আইন রচনা করিয়া ওয়াক্‌ফ্‌ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। হিন্দু আইনের ধর্মীয় বা দাতব্য উৎসর্জন অথবা মুসলমান আইনের ওয়াক্‌ফ্‌ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় ন্যাস আইনের আওতার বাহিরে। হিন্দু আইনের সেবাইত বা মোহন্ত এবং মুসলমান আইনের মাতোয়ালি ভারতীয় ন্যাস আইনের ন্যাসরক্ষক নহে; কিন্তু তাহারা ন্যাসরক্ষকের লক্ষণাক্রান্ত এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পত্তি উৎসর্গ করা হয় শুধু সেই উদ্দেশ্যেই সম্পত্তি ব্যবহার করার দায়িত্ব তাহাদের পূর্ণভাবে আছে।

কামাখ্যাকুমার চক্রবর্তী

ন্যাসতরঙ্গ ভারতীয় সংগীতের একটি অনন্য বাদ্যযন্ত্র। দুইটি বাঁশির ন্যায় যন্ত্র লইয়া ন্যাসতরঙ্গ বাজাইতে হয়। বাঁশির মত দেখিতে হইলেও ইহারমধ্যে বাঁশির ছিদ্র নাই। যন্ত্র দুইটি ধাতুর তৈয়ারি, লম্বায় প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার এবং দুইটি মুখ ব্যতীত আগাগোড়া নিশ্ছিদ্র। এই যন্ত্র ফুঁ দিয়া বাজাইবার নয়। যন্ত্রের যে মুখটি বেশি সরু সেইটি গলার দুইপাশে কণ্ঠতন্ত্রীর ধারে চাপিয়া রাখিয়া বাদক বাজান। সেই সরু মুখের নলের মধ্যে একটি ঝিল্লিময় সূক্ষ্ম অংশ থাকে। ইহাই যন্ত্রটির আসল অংশ। বাদক তাঁহার গলার তন্ত্রীতে শ্বাসপ্রশ্বাসের আশ্চর্য কৌশলে চাপ দেওয়ার ফলে ঐ ঝিল্লিময় অংশে বায়ুতরঙ্গ আন্দোলিত হয় ও সুরবৈচিত্র্য সৃষ্ট হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের অতি কঠিন ও কষ্টকর প্রক্রিয়া ভিন্ন ন্যাসতরঙ্গ বাদন সম্ভব নয়। ১৯শ শতাব্দীতে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই যন্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ছিলেন। বর্তমানে ইহার প্রচলন নাই।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ন্যাসবাদ গান্ধীবাদী সমাজদর্শনের একটি প্রধান সূত্র। মানবসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য শান্তিপূর্ণ ও সুস্থ জীবন-যাত্রার একটি প্রধান অন্তরায়, তাহা অধিকাংশ মনীষীই স্বীকার করেন। এই সমস্যার প্রতিকার হিসাবে সম্পত্তি-প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ কেহ কেহ প্রয়োজন মনে করেন। এই মতবাদের বিকল্পরূপে অন্য একটি ধারণাও নানা সময়ে উদ্ভূত হইয়াছে। সম্পত্তির ভাগ্যবান অধিকারী এই সম্পত্তিকে নিজস্ব জ্ঞান করিবেন না, পরন্তু আপনাকে এই সম্পত্তির (যাহা বস্তুতঃ জনসাধারণের) ন্যাসাধিকারী (অথবা ট্রাস্টি)-রূপে গণ্য করিবেন। এই পন্থায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও জনহিতার্থে সমাজে সঞ্চিত পুঁজি অথবা সম্পত্তির সদ্ব্যবহার হইবে। এই ন্যাসবাদের মূল তত্ত্বটি র‍্যাস্‌কিন্‌, তল্‌স্তয়, ফুরিয়ে প্রমুখ মনীষীগণের চিন্তায় পাওয়া গেলেও গান্ধীজীর সমাজচিন্তায় অধিকতর সংগঠিত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। গান্ধীজী এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় ছিলেন যে ধনীসম্প্রদায়, যদি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ধনের উপর সাধারণের অধিকার স্বীকার না করেন তবে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব অনিবার্য। এই মনোভাব ধনিকের পক্ষে সহজসাধ্য নহে তাহা তিনি জানিতেন; কিন্তু ইহার চর্চা একেবারে অসম্ভব তাহাও মনে করিতেন না। প্রকৃতপক্ষে অহিংসা ও সত্যাগ্রহের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে আর্থিক সাম্য স্থাপন করা সমাজের একটি প্রধান কর্তব্য, ইহাই তাঁহার সমাজচিন্তার মূলসূত্র। ধনী স্বেচ্ছায় ন্যাসবাদ গ্রহণ না করিলে রাষ্ট্রের পক্ষে সেই সম্পত্তি জনস্বার্থে পরিচালনা করা প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়াও তিনি মনে করিতেন। তবে বলপ্রয়োগ দ্বারা এই সমস্যার সমাধান গান্ধীজীর মনঃপূত ছিল না।

সাধনা দাস

পওহারী বাবা (১৮৪০-৯৮ খ্রী) জৌনপুর জেলার প্রেমাপুর গ্রামে রামানুজীয় বড়গল সম্প্রদায়ে ইঁহার জন্ম। পিতা অযোধ্যানাথ এবং পূর্বনাম হরভজন ও শুক্রাচার্য। শৈশবেই ইঁহার এক চক্ষু নষ্ট হয়; তৎপরে ইনি জ্যেষ্ঠতাত সাধু লছমীনারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হইয়া গাজীপুরের নিকটে আশ্রমবাস ও শাস্ত্রচর্চা করিতে থাকেন। ক্রমে নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া গিরনার পর্বতে যোগাভ্যাস করেন। ভূগর্ভের একটি গুহায় ধ্যানমগ্ন হইয়া দীর্ঘকাল

যাপন করিতেন বলিয়া তিনি পবন আহারী বা পওহারী আখ্যা লাভ করেন। এই যোগী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হোমাগ্নিতে নিজ দেহ আহুতি দান করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

দ্র 'পওহারী বাবা', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

কল্যাণী দত্ত

পক প্রণালী বঙ্গোপসাগর ও পক উপসাগরের মধ্যে অবস্থিত প্রণালী। ইহা ভারত ও সিংহলের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। প্রণালীটির উত্তর-পশ্চিমে তামিলনাড়ুতে অবস্থিত পয়েন্ট ক্যালিমেয়র ও দক্ষিণে সিংহলে অবস্থিত পয়েন্ট পেড্রো। সমুদ্রে নিমগ্ন শিলা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল দ্বীপ, অগভীর সমুদ্র প্রভৃতির জন্য এই প্রণালীর ভিতর দিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল সহজ নহে।

চিত্রা সেন

পক্ষধর মিশ্র (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী) নব্যন্যায়ের প্রবর্তক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পরবর্তী মিথিলার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। ইঁহার প্রকৃত নাম জয়দেব। বিচার-কালে ইনি যে পক্ষ আশ্রয় করিতেন সেই পক্ষই রক্ষিত হইত বলিয়া তাঁহার পক্ষধর নাম প্রচলিত হয়। গঙ্গেশের 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থের 'আলোক' টীকা রচনা ইঁহার চির-স্মরণীয় কীর্তি। গঙ্গেশ-পুত্র বর্ধমানের 'দ্রব্যকিরণাবলী-প্রকাশ'- এর উপর 'দ্রব্যপদার্থ' টীকা এবং 'ন্যায়-লীলাবতীপ্রকাশ'- এর উপর 'লীলাবতীবিবেক' টীকাও তাঁহার রচনা। যজ্ঞপতি উপাধ্যায় এবং হরি মিশ্র ইঁহার গুরু এবং প্রসিদ্ধ টীকাকার রুচিদত্ত ইঁহার ছাত্র।

বাসুদেব সার্বভৌম পক্ষধরের ছাত্র ছিলেন ইহা কিংবদন্তী বিশেষ। বঙ্গদেশের রঘুনাথ পঠদ্দশায় সামান্য-লক্ষণা ঘটিত বিচারে পক্ষধরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধিও কিংবদন্তী মাত্র।

দ্র রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, নব্যন্যায় ব্যাপ্তিপঞ্চক, কলিকাতা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ; ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায় পরিচয়, কলিকাতা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ; দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

কল্যাণী দত্ত

পক্ষীতীর্থ, তিরুক্কলিক্কুন্‌রম (১২°৩৬′ উত্তর ও ৮০°৩′ পূর্ব) তামিলনাড়ু রাজ্যের চিংলেপুট জেলার একটি বিখ্যাত তীর্থ। রেলপথে মাদ্রাজ হইতে চিংলেপুট ৫৬ কিলোমিটার; সেখান হইতে বাসযোগে ১৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এই তীর্থ। প্রায় ৫০০ ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া ১৫২ মিটার উচ্চ বেদগিরি পর্বতশীর্ষে পৌঁছানো যায়। পর্বতশীর্ষে স্বয়ম্ভু শিবের মন্দির। সামান্য নীচে গুহা-মধ্যে পার্বতী মূর্তি। পাশেই একটি বিশাল শিলার উপর প্রতিদিন ১০টা হইতে ২টার মধ্যে দুইটি শ্বেতপক্ষী একসঙ্গে বা পৃথকভাবে মন্দিরের পূজারীর হাত হইতে আহার্য গ্রহণ করে; কখনও কখনও শুধু একটি পক্ষী আসে। প্রবাদ আছে যে, পক্ষী দুইটি শাপভ্রষ্ট ঋষিভ্রাতা অথি ও শম্ভু, কাশী হইতে রামেশ্বরমের পথে প্রত্যহ এইখানে বিশ্রাম করেন। তাঁহারা যথাক্রমে শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে কে বড় ইহা মীমাংসার জন্য শিবের শরণাপন্ন হন। শিব বলেন উভয়েই সমান, কিন্তু ইহা ভক্তদের মনঃপূত হয় না। ক্রুদ্ধ শিবের শাপে তখন ইঁহারা পক্ষীতে পরিণত হন। আবার কেহ কেহ বলেন, পক্ষী দুইটি হর-পার্বতী।

এখানকার বাজারের একপাশে শঙ্খতীর্থ সরোবর। ১২ বৎসর অন্তর এইখানে পুষ্কর মহোৎসব হয়। এখানকার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বিশাল শিবমন্দির (বিগ্রহ রুদ্রকোটিলিঙ্গ), মুভরকোইল মন্দির এবং মুভরকোইল মন্দিরের মধ্যে নন্দীতীর্থম সরোবর। কথিত আছে, গরুড়কে আঘাত করার পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য নন্দী এইখানে তপস্যা করেন।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XXIII Oxford, 1908.

কমলকুমার গুহ

পঙ্গপাল সন্ধিপদ গোষ্ঠীর (ফাইলাম-আর্থ্রোপোদা) অন্তর্ভুক্ত গঙ্গাফড়িং-জাতীয় পতঙ্গ। প্রতি পঙ্গপালের জীবনচক্র তিনটি দশায় বিভক্ত। ১. ডিম্ব দশা: স্ত্রী-পঙ্গপাল আর্দ্র বালুকায় ৭-১৫ সেন্টিমিটার গভীরে একত্রে ৫০-১০০টি চালের দানার মত ডিম পাড়ে এবং ১২-১৩ দিন পরে ডিম ফুটিয়া অপরিণত দশার পতঙ্গ জন্মায় ২. অপরিণত দশা (হপার স্টেজ): ইহা প্রায় ৩৫ দিবস-ব্যাপী এবং এই সময়ে ৪-৬ বার খোলস বদলাইয়া পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে রূপান্তরণ ঘটে ৩. পূর্ণাঙ্গ দশা: সদ্যপরিণত পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ আরক্তিম; ১ মাস পরে ইহা ধূসর ও অবশেষে পীত বর্ণ ধারণ করে।

পঙ্গপালের প্রত্যেক প্রজাতি চারণাবস্থা ও এককাবস্থা —এই দুই প্রধান অবস্থার যে কোনও এক অবস্থায়

থাকিতে পারে ; উহাদের মধ্যবর্তী একটি অবস্থার পঙ্গপালও দেখা যায়। চারণাবস্থার অপরিণত প্রাণীর দেহ কাল, হলুদ বা কমলা রং-এ রঞ্জিত ; পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের বক্ষঃদেশের অগ্রভাগ হ্রস্ব ও ঘোড়ার জিনের আকৃতিবিশিষ্ট এবং পশ্চাতের পদযুগলের প্রথমাংশও হ্রস্ব। এককাবস্থার অপরিণত প্রাণীর দেহের বর্ণ সবুজ, ধূসর বা বাদামী ; পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের বক্ষঃদেশের অগ্রভাগ দীর্ঘ ও চূড়াযুক্ত এবং পশ্চাতের পদযুগলের প্রথমাংশও দীর্ঘ। এককাবস্থার পঙ্গপালের জীবনচক্র ৬-৯ মাস ও চারণাবস্থার পঙ্গপালের জীবনচক্র ৩-৬ মাস ধরিয়া চলে। চারণাবস্থার পঙ্গপাল তুলনায় অধিক কর্মতৎপর—এ অবস্থার অপরিণত প্রাণীগুলি বড় দল বাঁধিয়া থাকে ও দিনের উষ্ণতম সময়ে ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করে এবং পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া দূরদূরান্তে পাড়ি দেয় ও তাপমাত্রা হ্রাস পাইলে মাটিতে নামে। ঝাঁকবদ্ধ পঙ্গপাল ৫-১০ দিনে ১৬০০-৩২০০ কিলোমিটার উড়িয়া যাইতে পারে। ১ হেক্টর-ব্যাপী ঝাঁকে প্রায় ২ লক্ষ পতঙ্গ থাকে। কোনও পঙ্গপাল প্রজাতির সদ্যোজাত অপরিণত প্রাণীগুলিকে এককভাবে পালন করিলে উহারা এককাবস্থার পঙ্গপালে পরিণত হয় ; পক্ষান্তরে বহু অপরিণত প্রাণীকে একত্রে পালন করিলে উহারা কর্মতৎপর চারণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ বর্ষণের তারতম্যে পঙ্গপালের থাকিবার স্থান সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িলে উহারা দলবদ্ধ হইয়া পরিণামে চারণাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ভারতে মরু পঙ্গপাল (ডেজার্ট লোকাস্ট), বোম্বাই পঙ্গপাল (বম্বে লোকাস্ট) ও পরিযায়ী পঙ্গপাল (মাইগ্রেটরি লোকাস্ট)—এই তিন প্রজাতি দেখা যায় ; তন্মধ্যে প্রথমটিই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। ঝাঁকবদ্ধ অবস্থায় দেশদেশান্তরে গিয়া উদ্ভিজ্জ সম্পদের ক্ষতি করে বলিয়া পঙ্গপাল দমনের জন্য বিভিন্ন দেশে সংস্থা বর্তমান। এ সকল সংস্থা আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে। বি. এইচ. সি., অ্যালড্রিন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ পঙ্গপালদমনে ব্যবহৃত হয়।

জাপান, ফিলিপ্পীন, আরব রাষ্ট্রসমূহ, মেক্সিকো প্রভৃতি অঞ্চলে পঙ্গপাল আহার্যরূপে গৃহীত হয়। হাঁসমুরগির খাদ্য ও মাছের টোপ হিসাবেও ইহার ব্যবহার আছে।

দ্র B. P. Uvarov, *Locusts and Grasshoppers*, London, 1928 ; V. Ramachandra Rao, *The Desert Locust in India*, New Delhi, 1960.

সুজিতকুমার দাশগুপ্ত

পঞ্চতন্ত্র পশুপাখিতে মানুষের আচার-ব্যবহার আরোপিত করিয়া প্রাচীন ভারতে একপ্রকার গল্প রচিত হইয়াছিল। 'পঞ্চতন্ত্র' এইরূপ গল্পের সমষ্টি। 'পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্' হইতে জানা যায় যে, সুকুমারমতি রাজপুত্রগণকে চিত্তাকর্ষকভাবে নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। পঞ্চতন্ত্রে ৫টি প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে, যথা মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, সন্ধি-বিগ্রহ, লব্ধনাশ ও অপরীক্ষিতকারিত্ব। প্রসঙ্গগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হইলেও একটি কাঠামোর অন্তর্গত। প্রতিটি প্রসঙ্গে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প একটি প্রধান গল্পের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলি গদ্যে রচিত হইলেও স্থানে স্থানে নীতিগর্ভ শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল পঞ্চতন্ত্র লুপ্ত ; বর্তমানে উহার অন্য কয়েকটি রূপ বিদ্যমান। এই রূপগুলিকে চারিটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়। পহ্লবী ভাষার অধুনালুপ্ত রূপটি ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভূত হইয়াছিল ; এই রূপের মাধ্যমে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি ইওরোপের ফেব্‌ল সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছিল। কাশ্মীরী রূপটির নাম 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' ; ইহাকে প্রাচীনতম সংস্কৃত রূপ বলিয়া মনে করা হয়। বাংলা দেশের রূপটির নাম 'হিতোপদেশ'।

পহ্লবী রূপটির উদ্ভব হইয়াছিল ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে ; সুতরাং মূল পঞ্চতন্ত্র এই কালসীমার পূর্ববর্তী। ইহার রচয়িতা অজ্ঞাত। 'পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্'-এ ইহার প্রণেতা হিসাবে যে বিষ্ণুশর্মার নাম পাওয়া যায়, আধুনিক পণ্ডিতদের অনেকের মতে তাহা কাল্পনিক।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চনদ পাঁচটি নদীর মিলিতধারা। নদী পাঁচটির নাম : বিতস্তা (ঝিলাম), চন্দ্রভাগা (চেনাব), ইরাবতী (রাভি), বিপাশা (বিয়াস) ও শতদ্রু (সাট্‌লেজ)। প্রত্যেকটির উৎসভূমি কাশ্মীর-হিমালয়। সর্বাপেক্ষা পশ্চিমের নদী বিতস্তা তাহার পূর্বে অবস্থিত নদী চন্দ্রভাগার সহিত জং-এর নিকট মিলিত হইয়াছে। ইরাবতী উহাদের পূর্বে অবস্থিত। ইহা সরাই-সিধুর কিছু পশ্চিমে চন্দ্রভাগায় মিলিয়াছে। ইহার পূর্বে অবস্থিত নদী বিপাশা ফিরোজপুরের কিছু উত্তরে শতদ্রুর সহিত মিলিয়াছে, মিলিত ধারা আলিপুরের নিকট চন্দ্রভাগায় মিশিয়াছে এবং চন্দ্রভাগা আরও প্রায় ৫০ কিলোমিটার বহিয়া সিন্ধু নদে লীন হইয়াছে। মূল অববাহিকা অঞ্চল বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। বৈদিকযুগে এই অঞ্চল 'সপ্ত সিন্ধবঃ' নামে পরিচিত ছিল।

সলিলকুমার চৌধুরী

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোনও বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য পূর্ব হইতে কার্যক্রমের যে সুচিন্তিত ছক তৈয়ারি করা হয় তাহার নাম পরিকল্পনা। অবাধ উদ্যোগের দ্বারা পরিচালিত অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেও প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আগাগোড়া পরিকল্পিত হয়, কিন্তু অর্থনীতিতে পরিকল্পনা বলিতে বুঝায় জাতির সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশের উদ্দেশ্যে গৃহীত ও পরিচালিত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ক্রমোন্নত 'টেক্‌নোলজি'-র ভিত্তিতে দ্রুত সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ও যৌথ কৃষিকর্মের দ্বারা সাম্যবাদী সমাজের দিকে অগ্রগতি।

বর্তমান শতাব্দীর ৪র্থ দশকের মহামন্দার ফলে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেও একপ্রকার রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দেখা দিয়াছে যাহার প্রধান লক্ষ্য হইল বাণিজ্যচক্রের নিরোধ ও পূর্ণ কর্মসংস্থান।

পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভূত হয়। দীর্ঘকালব্যাপী ঔপনিবেশিক শোষণ, জমিদারি প্রথা ও অন্যান্য কারণে অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক জীবন দুষ্টবৃত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাতীয় উৎপাদনের এক অতি নিম্ন স্তরে আবর্তিত। ইহাদের মাথাপিছু আয় অত্যল্প। দরিদ্র বলিয়াই ইহাদের সঞ্চয়ের হার কম; ইহাদের সীমাবদ্ধ বাজারে লগ্নীকরণের প্ররোচক শক্তিও দুর্বল; এই দুই কারণে অনুন্নত বা অর্ধোন্নত দেশে মূলধন নির্মাণের হার অত্যন্ত কম। ইহাদের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি, প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের পরিমাণ বিপুল, প্রাকৃতিক সম্বলের বিশাল অংশ অব্যবহৃত। অবদমিত ও বিলম্বিত শিল্পবিপ্লব ও কৃষিবিপ্লবকে অল্পকালের মধ্যে সমাপ্ত করিয়া ইহারা তাড়াতাড়ি সমৃদ্ধ, স্বয়ম্ভর ও শক্তিমান দেশে পরিণত হইতে চায়।

অনুন্নত দেশকে অর্থনৈতিক স্থাণুত্ব (স্ট্যাগ্‌নেশন) হইতে উত্তোলন করিয়া তাহার অর্থনৈতিক জীবনকে ক্রমাগত বৃদ্ধিশীল করিতে হইলে যথেষ্ট পরিমাণ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ (এন্টারপ্রাইজ্) এবং সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের উপর স্থাপিত রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক। এবিষয়ে আর দ্বিমত নাই বলিলেই চলে। পরিবহণ-ব্যবস্থা, শক্তি-উৎপাদন, সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি যে সকল ব্যবস্থার প্রসার নানা শিল্পসহায়ক বহিরাগত সুবিধার সৃষ্টি করে, সেগুলির জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ অপরিহার্য। দ্রুত শিল্পায়নের জন্য ভোগব্যয়ের বৃদ্ধিকে যথাসম্ভব সংকুচিত করিয়া প্রথমেই উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদনকে যথেষ্ট বাড়াইতে হইবে এবং ভোগ্যদ্রব্যশিল্পের চেয়ে মূল ও ভারী শিল্পগুলিকে অনেক দ্রুততর হারে বিকশিত করিতে হইবে। ইহার জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োগ (করস্থাপন, লাইসেন্‌সিং, ইত্যাদি), রাষ্ট্রীয় উদ্যম ও রাষ্ট্রীয় লগ্নীকরণ প্রয়োজনীয়। কেবল অনিয়ন্ত্রিত বাজারের শক্তিগুলির উপর এবং অবাধ উদ্যমের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে অনুন্নত দেশের কোনও উল্লেখযোগ্য আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর নয়।

বিকাশমূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মূলতঃ হইল আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করিয়া দেশের অন্তর্নিহিত সকল মানবিক ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলির যুক্তিসঙ্গত ও অধিকতর উৎপাদনজনক ব্যবহারের দ্বারা কয়েকটি অর্থপূর্ণ লক্ষ্যে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে উপনীত হওয়ার চেষ্টা। লক্ষ্যগুলি কি হইবে, তাহাদিগের উপর কিরূপ আপেক্ষিক গুরুত্ব আরোপিত হইবে, ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য বর্তমানে কতটা ত্যাগস্বীকার বাঞ্ছনীয়, এক বিশেষ দ্রব্যসমষ্টির সহিত অন্য এক বিশেষ দ্রব্যসমষ্টির সমীকরণ কি বিবেচনার দ্বারা নির্ধারিত হইবে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সহিত রাষ্ট্রবহির্ভূত ক্ষেত্রের সম্পর্ক এবং পরস্পরের অধিকার কিরূপ হইবে—এইগুলি মূল্যবোধের দ্বারা নিরূপিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এইসকল 'পলিসি'-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পরিকল্পনাকে একটি বিশেষ চরিত্র দান করে এবং কাম্য বৃদ্ধিহারকে প্রভাবিত করে। যে সকল প্রতিষ্ঠানগত, মনস্তাত্ত্বিক ও মতাদর্শগত শক্তি অতীতে অর্থনৈতিক জীবনকে পশ্চাৎপদ করিয়া রাখিয়াছিল তাহারা কাম্য বৃদ্ধিহারকে বিঘ্নিত করিতে পারে। যদি তাহা না হয় তবে একটি বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আর্থিক উন্নয়নের পরিমাণ নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর: ১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২. জাতীয় আয়ের কত শতাংশ লগ্নীকৃত হইতেছে ৩. বৃদ্ধিগত মূলধন-উৎপাদন অনুপাত (ICOR)। উৎপাদনের বিভিন্ন বৃত্তাংশে (সেক্‌টর) অবলম্বিত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে কত মূলধনের প্রয়োগে কত আয় হইতেছে, তাহা আন্দাজ করিয়া সামগ্রিক ICOR অনুমিত হয়। ইহা এবং অপর দুইটি বিষয় নির্ধারণ করে ৫ বৎসরে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় কত শতাংশ বাড়িবে।

কোনও পরিকল্পনাই বিচ্ছিন্নভাবে রচিত হয় না। একটি দূরগামী পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনার (পার্‌স্পেক্‌টিভ প্ল্যানিং) অঙ্গরূপে একটি বিশেষ পরিকল্পনা রচিত হয়।

ভারতে প্রথম পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিত ছিল ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকৃত মাথাপিছু আয় দ্বিগুণিত হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আর একটু আশাবাদী মনোভাব লইয়া বলা হয়, ১৯৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় আয় এবং ১৯৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণিত হইবে। একটি বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা 'সম্ভাব্যতা'-র সীমার মধ্যে থাকা উচিত একথা সত্য, কিন্তু তাহা নির্ণয় করার কোনও সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি নাই। 'সম্ভাব্যতা'-র সীমা নানা অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি-বহির্ভূত কারণের উপর নির্ভর করে; যথা জাতীয় আয়ের পূর্বপরিমাণ, স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়ের হার, রাষ্ট্রীয় সঞ্চয়ের সম্ভাব্যতার পরিমাণ, সম্ভাব্য বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ, পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে উৎসাহের মাত্রা, তাহাদের পরিকল্পনা মানসিকতা (প্ল্যান-মাইণ্ডেড্-নেস), দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাহারা কতটা কৃচ্ছ্রসাধনে ও পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত, রাষ্ট্রের চরিত্র, পরিকল্পনার মূল প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শাসকদলের সহিত বিরোধী দলগুলির মতৈক্য, প্রচলিত সমাজের শ্রেণীচরিত্র ও স্তরকাঠিন্য, আয়বৈষম্য ও ধনবৈষম্যের মাত্রা ইত্যাদি। এই সকল নানা বাস্তব ও বহু অচিন্তনীয় কারণের দ্বারা প্রভাবিত সীমার মধ্যে জাতীয় আয়ের যত বেশি শতাংশ লগ্নীকৃত হইবে, যত বেশি মূলধন সৃষ্ট হইবে ও যত উন্নততর 'টেক্‌নলজি' অবলম্বিত হইবে ততই দ্রুততর হারে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটিবে।

পাঁচ বৎসরে কি পরিমাণ অর্থ বা প্রকৃত সম্বল ব্যয়িত হইবে তাহা স্থির করার পর এক অগ্রাধিকার ক্রমানুযায়ী বিভিন্ন দফায় সম্বলগুলিকে বণ্টন করা হয়। ইহার আসল লক্ষ্য হইল সমতামূলক বা যথানুপাতিক বিকাশ। অবশ্য সমতার অর্থ ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির সাম্যাবস্থা নয়। অর্থনৈতিক বিকাশ-প্রক্রিয়ায় সাম্যাবস্থা সর্বদাই বিচ্যুত হয়, আবার সর্বদাই তাহাকে উচ্চতর স্তরে পুনঃস্থাপিত করিতে হয়। সাম্যাবস্থা ও অসাম্যাবস্থা, এই দুই বিপরীত জিনিসের ঐক্যের ভিতর দিয়াই অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটিতে থাকে। পূর্ববর্তী পরিকল্পনার উত্তরাধিকার গ্রহণ করিয়া ও পরবর্তী পরিকল্পনার সকল আবশ্যকতা মনে রাখিয়া একটি বিশেষ পরিকল্পনা রচিত হয়।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, ভারত গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার পথ ধরিয়াছে এবং সেইজন্য তাহার পক্ষে 'টোটালিটারিয়ান' রাষ্ট্রের ন্যায় দ্রুতগতিতে বিকাশের চেষ্টা সম্ভব নয়। প্রথমে বিদেশ হইতে মূলধনী দ্রব্যের আমদানি, বৈদেশিক সাহায্যের বলে ঘরোয়া সঞ্চয়ের হারের চেয়ে অধিকতর হারে লগ্নীকরণ, বর্ধিত জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশকে রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে সঞ্চয় করিয়া ঘরোয়া সঞ্চয়ের হারের ক্রমাগত বৃদ্ধিসাধন, ক্রমে ক্রমে রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি বদলির দ্বারা ভারতকে স্বয়ংপুষ্ট ও স্বয়ম্ভর অর্থনৈতিক বৃদ্ধির স্তরে উপনীত করা—ইহাই ভারতীয় পরিকল্পকদের মৌল কৌশল।

সোভিয়েট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রভাব ভারতে শীঘ্রই অনুভূত হয়। আর্থিক পরিকল্পনার দ্বারা ভারতের দারিদ্র্যসমস্যা দূর করার কথা প্রথম বলেন এম. বিশ্বেশ্বরায়া তাঁহার 'অ্যান ইকনমিক প্ল্যান ফর ইণ্ডিয়া' (১৯৩৪ খ্রী) গ্রন্থে। ইহার পর মেঘনাদ সাহা নানা লেখায় ও ভাষণে আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশবাসীকে ও দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সচেতন করিয়া তোলার চেষ্টা করেন। এসম্পর্কে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার আলোচনা ও ভাষণ উল্লেখযোগ্য (১৯৩৮ খ্রী)। কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে (১৯৩৮ খ্রী) সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বিজ্ঞানভিত্তিক ও সমাজতান্ত্রিক আর্থিক পরিকল্পনার আবশ্যকতা বিশদভাবে আলোচনা করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে কংগ্রেস একটি জাতীয় প্ল্যানিং কমিটি গঠন করে। জওহরলাল নেহরু তাহার সভাপতি হন। কে. টি. শাহ ছিলেন তাহার কর্মসচিব। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় এবং কংগ্রেসনেতারা জেলে যাওয়ায় কমিটির কাজে বাধা পড়ে; তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ৮ জন প্রধান শিল্পপতি ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। ইহা 'বোম্বাই পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। ইহার কিছু পরে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'জনগণের পরিকল্পনা' এবং শ্রীমান নারায়ণ আগরওয়ালের 'গান্ধীবাদী পরিকল্পনা' প্রকাশিত হয়।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে গণপরিষদ কর্তৃক ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর ভারত সরকার সংবিধানের নির্দেশক নীতিকে কার্যকর করার জন্য একটি প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেন। জনকল্যাণ, জনসাধারণের জীবনধারণ মানের উন্নয়ন, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে উৎপাদনের উপায়গুলির ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের নিবারণ প্রভৃতি যে সকল উদ্দেশ্য ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-গুলিতে বারংবার ঘোষিত হইয়াছে সেগুলি সংবিধানের নির্দেশক নীতিসমূহেই বিবৃত। উক্ত প্ল্যানিং কমিশনই ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬ খ্রী) রচনা করে। ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ও দেশবিভাগ-

জনিত কাঁচামালের, খাদ্যশস্যের ও অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্যের দারুণ অপ্রাচুর্য দূর করিয়া এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইয়া দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করা। এই পরিকল্পনায় মোট ব্যয় ধার্য হয় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ২০৬৯ কোটি টাকা (পরে একটু বাড়ানো হয়) এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে ১৫০০ কোটি টাকা। সরকারি ব্যয় মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে বিভিন্ন দফায় নিম্নলিখিত ভাবে বণ্টিত হইয়াছিল: কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন ১৭.৫; সেচ ৮.১; সর্বার্থসাধক সেচ ও বিদ্যুৎপ্রকল্প ১২.৯; শক্তি ৬; শিল্প ৮.৪; পরিবহণ ও যোগাযোগ ২৪.০; সমাজসেবা ১৬.৪ ইত্যাদি। জাতীয় আয়কে ১১ শতাংশ বাড়ানোই ছিল লক্ষ্য।

এই পরিকল্পনার ফলে মোট ৩০০০ কোটি টাকা লগ্নী করিয়া জাতীয় আয় ১৫৫০ কোটি টাকা (১৮.৪ শতাংশ) বাড়ে, ICOR দাঁড়ায় প্রায় ২ : ১, মাথাপিছু আয় ১১ শতাংশ বাড়ে, মূল্যস্তর ১৩ শতাংশ কমে, শিল্পজ উৎপাদন বাড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ এবং কৃষিজ উৎপাদন বাড়ে প্রায় ২০ শতাংশ। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৫৪০ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া দাঁড়ায় ৬৫০ লক্ষ টন। পাট, তুলা প্রভৃতি কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা প্রশমিত হয়। ঘরোয়া সঞ্চয়ের হার জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ হইতে বাড়িয়া হয় ৭ শতাংশ এবং লগ্নীকরণের হারও দাঁড়ায় জাতীয় আয়ের প্রায় ৭ শতাংশ।

প্রথম পরিকল্পনার অপ্রত্যাশিত সাফল্যের ফলে দ্রুত বিকাশের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, এই আশাবাদী মনোভাব লইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ১. মূল ও ভারী শিল্পের উপর বিশেষ জোর দিয়া দেশের দ্রুত শিল্পায়ন; ২. জীবনধারণ-মানের উন্নতির জন্য জাতীয় আয়ের যথেষ্ট বৃদ্ধি (২৫ শতাংশ) ইহাতে মোট ব্যয় ধার্য হয় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকা। সরকারি ব্যয় বিভিন্ন দফায় মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে নিম্নলিখিত ভাবে বণ্টিত হয়; কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন, সেচ ও বিদ্যুৎ-প্রকল্প ৩০.৮; পরিবহণ ও যোগাযোগ ২৮.৮; জনকল্যাণমূলক কার্য ১৯.৭; শিল্প ও খনিজ দ্রব্য ১৪.৪ ইত্যাদি। পূর্বের তুলনায় কৃষির উপর কিছু কম এবং শিল্পের উপর অনেক বেশি জোর দেওয়া হইয়াছিল। সরকারি ব্যয় সংস্থানের জন্য ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের সিদ্ধান্ত ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজগঠন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা উর্ধ্বমুখী প্রচণ্ড অভিঘাতের দ্বারা দেশকে আধুনিক শিল্পায়নের দিকে আগাইয়া দিয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু প্রায় সকল দিক হইতেই ইহার কৃতিত্ব বর্ধিত শতাংশের হিসাবে পূর্বস্থাপিত লক্ষ্যের (ব্রাকেট-চিহ্নিত) নীচে থাকিয়া যায়, যথা: শিল্পজ উৎপাদন ৩৯ (৫০); কৃষিজ উৎপাদন ১৬ (২৭); জাতীয় আয় ২০ (২৫); মাথাপিছু আয় ৮ (১৮); মাথাপিছু ভোগ ৬.৫ (১৫) ইত্যাদি। কর্মসংস্থান হয় ১১০ লক্ষের পরিবর্তে ৬৫ লক্ষ। মূল্যস্তর বাড়ে ৩০ শতাংশ। গ্রামশিল্প মারফত ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিয়া মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যাইবে, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কর্তৃক রচিত পরিকল্পনার এই অংশ সফল হয় নাই। খাদ্যোৎপাদন ৮ কোটি টনের (সংশোধিত লক্ষ্য) জায়গায় দাঁড়ায় ৭.৬ কোটি টন। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং পুনরায় ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্যোৎপাদন পূর্ব বৎসরের তুলনায় কমিয়া যায়। খাদ্যাভাব এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি দেশের গুরুতর অশান্তি সৃষ্টি করে। ভারতে খাদ্যশস্য সমস্যার সমাধান হইয়াছে, সরকারি মহলের এই আত্মসন্তুষ্টি ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি হইতেই ভারত খাদ্যের জন্য বিদেশের উপর বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্য-আমদানি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ১৪ লক্ষ টন এবং ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাড়িয়া হয় ৬০ লক্ষ টন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘরোয়া সঞ্চয় দাঁড়ায় জাতীয় আয়ের ৮.৫ শতাংশ (লক্ষ্য : ৯.৭ শতাংশ) এবং লগ্নীকরণ দাঁড়ায় জাতীয় আয়ের ১১.৫ শতাংশ। উভয়ের ফাঁকটুকু পূরণ করা হয় বিদেশী সাহায্যের দ্বারা এবং ভারতের বৈদেশিক বিনিময় তহবিলকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া ৫ বৎসরে বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি অনুমিত ১১০০ কোটি টাকার জায়গায় দাঁড়ায় ২০৫৯ কোটি টাকা। মোট ৬৭৫০ কোটি টাকা লগ্নীকরণ করিয়া জাতীয় আয় বাড়ে ২২৫০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ICOR দাঁড়ায় ৩ : ১, কিন্তু তাহাকে ধরা হইয়াছিল ২.৩ : ১, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ও ICOR-কে কম আন্দাজ করা পরিকল্পনাটির প্রধান ত্রুটিগুলির মধ্যে গণ্য। উগ্র বৈদেশিক লেনদেন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া শেষ দিকে পরিকল্পনাটির 'কঠিন মর্মস্থল'-কে (ইস্পাত-প্রকল্প প্রভৃতি) বজায় রাখিয়া বাকী অংশের কাটছাঁট করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬৬ খ্রী) উদ্দেশ্যরূপে ঘোষিত হয় যে ভারত দশ বৎসরে 'প্রাক্ উড্ডয়ন

(টেক্-অফ পিরিয়ড) সমাপ্ত করিয়া স্বয়ংপুষ্ট অর্থনৈতিক বৃদ্ধির যুগে প্রবেশ করিবে; বৎসরে ৬ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বর্ধিত হইবে; ১০ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করিয়া ভারত খাদ্যে স্বয়ম্ভর হইবে; মূল্যস্তরকে বাড়িতে দেওয়া হইবে না ইত্যাদি।

মোট ব্যয় ধার্য হয় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ৭৫০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে ৪১০০ কোটি টাকা। লগ্নীব্যয় ধার্য ১০৪০০ কোটি টাকা। সরকারি খাতে ব্যয় মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে নিম্নলিখিত ভাবে বন্টিত হয় কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন ও সেচ ২৩; শক্তি ১৩; শিল্প ও খনিজ দ্রব্য ২০; পরিবহণ ও যোগাযোগ ২০; সমাজকল্যাণ ১৭ ইত্যাদি। 'কৃষিফ্রন্ট'-এ ব্যূহভেদ করিয়া আগুয়ান না হইতে পারিলে স্বয়ংপুষ্ট বৃদ্ধির স্তরে উপনীত হওয়া যাইবে না, এই উপলব্ধির বশে কৃষির উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়। সরকারি ক্ষেত্রের ব্যয় সংস্থান ব্যবস্থায় ঘাটতি ব্যয়কে কমাইয়া ৫৫০ কোটি টাকা ধার্য হয় এবং বৈদেশিক সাহায্যের চাহিদা বাড়িয়া হয় ২২০০ কোটি টাকা।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-চীন ও ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-পাক যুদ্ধের ফলে ও অন্যান্য কারণে তৃতীয় পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়। জাতীয় আয় মাত্র ১৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় মাত্র ১ শতাংশ বাড়ে। প্রথম তিন বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৮ কোটি টনের কাছাকাছি বদ্ধাবস্থায় থাকে। চতুর্থ বৎসরে তাহা বাড়িয়া হয় ৮৮৪ লক্ষ টন এবং পঞ্চম বৎসরে তাহা গুরুতররূপে কমিয়া হয় ৭২০ লক্ষ টন। মূল্যস্তর দ্রুত বাড়িতে থাকে। পাইকারি মূল্যের সূচক পরিকল্পনার গোড়াতে ছিল ১২৭ এবং ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দাঁড়ায় ১৭০। ঘাটতি ব্যয় হয় প্রায় ১১৫০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনার চেয়ে কার্যতঃ বেশি। মুদ্রাস্ফীতির ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে এবং বিদেশী বাজারে ভারতের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় ভারতের রপ্তানি বাড়ার পরিবর্তে কমার দিকে যায়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম খসড়া তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পূর্বেই রচিত হয়, কিন্তু তাহা কার্যে প্রযুক্ত হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার পরবর্তী, তিন বৎসর 'বাৎসরিক পরিকল্পনা' চলিতে থাকে। বর্তমান বৎসরে (১৯৬৯ খ্রী) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করা হইবে, এই সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে এবং ইহার একটি নূতন খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার মোট ব্যয় ২৪৪০০ কোটি টাকা (রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ১৪৪০০ কোটি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে ১০০০০ কোটি টাকা)। শিল্পজ উৎপাদনকে বৎসরে ৮ হইতে ১০ শতাংশ হারে বর্ধিত করা এবং খাদ্যোৎপাদনকে বৎসরে ৫ শতাংশ হারে বর্ধিত করা ইহার লক্ষ্য। ইহার শেষ রূপ এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই।

গত ১৭ বৎসরে পরিকল্পনার ফলাফল পর্যালোচনা করিলে ইহার সার্থকতা ও অসার্থকতা, দুই দিকই চোখে পড়ে। ভারত শিল্পায়নে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বর্তমানে ইস্পাত, সিমেন্ট, কাগজ, বস্ত্র, চা, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি বহু শিল্পের সমগ্র 'প্ল্যান্ট' অঙ্কিত, নির্মিত ও সজ্জিত করিতে পারে। ১৯৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্যোৎপাদন দাঁড়ায় ৯৬০ লক্ষ টন। অধিকতর ফলপ্রসূ বীজ, রাসায়নিক সার ও কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের ফলে ভারতে একটি 'সবুজ বিপ্লব' বা কৃষিবিপ্লবের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অন্যদিকে দেখি যে, উচ্চাশা ও ইচ্ছাপূরক চিন্তার প্রভাবে বারংবার সাধ্যাতীত পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। মাথাপিছু আয় অতি সামান্যই বাড়িয়াছে। মাথাপিছু খাদ্যের ভোগ এখনও পুষ্টিমানের নীচে এবং মাথাপিছু বস্ত্রের ভোগও যথাযোগ্য মানের নীচে। পরিকল্পনার সামাজিক উদ্দেশ্য-গুলি সফল হয় নাই। আয়বৈষম্য, ধনবৈষম্য ও অর্থ-নৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ক্রমশঃ বাড়িয়াছে। বেকারত্ব ক্রমশঃই বাড়িয়াছে। বিপুল বৈদেশিক ঋণের বোঝা ভারতের পক্ষে দুঃসহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদেশী ঋণ পরিশোধ করার জন্যই পুনঃ পুনঃ বিপুলতর পরিমাণে বিদেশ হইতে ঋণ লওয়া হইতেছে। উন্নত দেশগুলি ভারতীয় রপ্তানির পথে বাধা সৃষ্টি করায় অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হইয়া পড়িতেছে।

দ্র *First Five-Year Plan*, Delhi, 1952; *Second Five-Year Plan*, Delhi, 1956; Bhabatosh Datta, *The Economics of Industrialisation*, Calcutta, 1960; W. A. Lewis, *The Theory of Economic Growth*, London, 1960; *Third Five-Year Plan*, Delhi, 1961.

পঞ্চরাত্র প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। পঞ্চরাত্র আগম বিশাল ও তত্ত্বপূর্ণ। শব্দটির নানারূপ ব্যুৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। যথা পঞ্চ মুখ্য শাস্ত্র ইহার নিকট রাত্রি বা অন্ধকার তুল্য, তাই ইহার নাম পঞ্চরাত্র। পঞ্চবিধ জ্ঞান ইহাতে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া ইহা পঞ্চরাত্র। সপ্তবিধ পঞ্চরাত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেতর

দেব-দেবীর সম্পর্কেও পঞ্চরাত্র নাম পাওয়া যায়, যথা শিব পঞ্চরাত্র, দেবী পঞ্চরাত্র, গণেশ পঞ্চরাত্র, ব্রহ্ম পঞ্চ-রাত্র, মহাকাল পঞ্চরাত্র ইত্যাদি। শিবরাত্রি ব্রতকথায় পঞ্চরাত্র বিধানে শিবপূজার ব্যবস্থা আছে। সপ্তরাত্র শব্দেরও উল্লেখ আছে।

দ্র Otto Schrader, *Introduction to the Pancaratra & the Ahirbudhnya Samhita*, Adyar, 1916; Chintaharan Chakrabarti, *Tantras: Studies on their Religion & Literature*, Calcutta, 1963.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পঞ্চশীল শব্দটি বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্তর্গত। বুদ্ধদেব সাধারণ গৃহস্থ বা উপাসক-উপাসিকাদের নিত্য প্রতিপাল্য যে ৫টি শীল বা শিষ্টাচারের বিধান করিয়াছেন তাহাই সাধারণতঃ পঞ্চশীল নামে অভিহিত হয়, যথা ১. প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি ২. অদত্তাদান (বা চৌর্যবৃত্তি) হইতে বিরতি ৩. ব্যভিচার (বা অবৈধ কামসম্ভোগ) হইতে বিরতি ৪. মিথ্যাভাষণ হইতে বিরতি ৫. নেশাদ্রব্যসেবন হইতে বিরতি।

বৌদ্ধশাস্ত্রে 'শীল' শব্দটি গভীর ও বহুবিধ অর্থব্যঞ্জক। শীলের অর্থ সমাধান বা কায়-বাক্-মনঃসংযম। ইহাকে সমস্ত কুশলধর্মের (আত্মমুক্তি লাভের উপায়গুলির) প্রতিষ্ঠা বা আধার বলা হয়। প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, মিথ্যা-ভাষণ হইতে বিরতি ইত্যাদি সাধারণ নীতিবাক্য মাত্র। তবে কায়-বাক্-মনঃসংযমের দ্বারা সমস্ত সদ্‌গুণ আয়ত্ত করা এবং তদ্দ্বারা মানবচরিত্রের উৎকর্ষসাধন করার ব্যাপারে এই নীতিসমূহই সহায়তা করে বলিয়া এইগুলির নাম 'শীল'।

প্রাণিহত্যা, অদত্তাদান প্রভৃতি ৫ প্রকার পাপকর্মই ৩টি উপায়ে সম্পাদিত হইতে পারে, যথা নিজে করা, অন্যকে দিয়া করানো অথবা অন্যকে করার জন্য অনুমতি দেওয়া। এই ৩টির কোনও একটি উপায়ের দ্বারা উপরি-উক্ত পঞ্চবিধ পাপকর্মের কোনওটিই সম্পাদিত না করাই পঞ্চশীল বা পঞ্চশীলপালনের মর্মার্থ। তাহা ছাড়া এইসকল পাপকর্মের গুরু-লঘু ভেদ আছে। অতএব পঞ্চশীলের কোনও শীল ভঙ্গ হইলে ইহার পাপফলও কর্মানুসারে গুরু-লঘু হইবে। আবার শীলপালনকারীর পুণ্যফলও কর্মানুসারে গুরু-লঘু হইবে।

দ্র মিলিন্দপঞ্‌হো; দীঘনিকায়ো; মজ্‌ঝিমনিকায়ো; খুদ্দকপাঠো; সুমঙ্গলবিলাসিনী।

সুকোমল চৌধুরী

পঞ্চানন কর্মকার (? -১৮০২ খ্রী) ভারতীয় মুদ্রণের বিশেষ করিয়া বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে পঞ্চানন কর্মকারের নাম ভারতীয় মুদ্রণের জনক চার্ল্‌স উইল্‌কিন্‌সের নামের সহিত চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। পঞ্চাননের জন্ম হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্ল্‌স উইল্‌-কিন্‌স হুগলিতে হ্যাল্‌হেডের ব্যাকরণ ছাপিবার জন্য বাংলা অক্ষর প্রস্তুতের প্রচেষ্টায় পঞ্চাননের সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উইল্‌কিন্‌সের পরিচালনা-ধীনে এবং তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের উৎসাহে কলিকাতায় কোম্পানির প্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলে উইল্‌কিন্‌স পঞ্চাননকে কলিকাতায় লইয়া যান।

হরফ নির্মাণের প্রয়োজনীয় কলাকৌশল পঞ্চানন সুচারুরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ১৮শ শতাব্দীর শেষ-দিকে পঞ্চাননের সহিত উইলিয়াম কেরির যোগাযোগ হয়। পঞ্চানন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মিশনের প্রেসে যোগদান করেন। একটি পুরাতন প্রেস এবং পঞ্চাননকে লইয়া শ্রীরামপুরের মিশন ছাপাখানার পত্তন হয়। কাল-ক্রমে ইহাই এশিয়ার বৃহত্তম অক্ষর তৈয়ারির কারখানায় পরিণত হয়। পঞ্চাননের তৈয়ারি হরফে কেরির নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ (১৮০১ খ্রী) মুদ্রিত হয়। ইহা ছাড়া পঞ্চানন কেরির সংস্কৃত ব্যাকরণের জন্য এক সাঁট নাগরী হরফ নির্মাণ করেন। ভারতবর্ষে নাগরী ভাষায় হরফ নির্মাণ ইহাই প্রথম। ইহার পরে পঞ্চানন বাংলা ভাষায় আরও ছোট এবং সুন্দরতর এক সাঁট বাংলা হরফ তৈয়ারি করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত পঞ্চাননের প্রস্তুত হরফের ব্যবহার ছিল।

পঞ্চানন তাঁহার জামাতা মনোহরকে হরফ নির্মাণের কলাকৌশল শিখাইয়া দিয়া যান, মনোহর আবার কয়েক-জন শিল্পীকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়া তৈয়ারি করিয়া লন, এইভাবে শ্রীরামপুরে একদল সুদক্ষ অক্ষরনির্মাতা গড়িয়া ওঠে।

দ্র J. C. Marshman, *Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, vols. I & II, London, 1859.

শিবনাথ রায়

পঞ্চানন তর্করত্ন (১৮৬৬-১৯৪০ খ্রী) জাতীয়তাবাদী পণ্ডিত। ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ৯ ভাদ্র ভাটপাড়ার এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম নন্দলাল বিদ্যারত্ন। ইনি ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া

গুরু কর্তৃক প্রদত্ত 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সপ্তশতী (দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডী) ও বেদান্তসূত্রের শক্তিভাষ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ভাষ্য শাক্তদর্শন বা শাক্তবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থকারের মতে শাক্তবাদ বেদানুমোদিত সরূপাদ্বৈতবাদ। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন; তবে কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দুর সমাজরীতিবিরোধী সর্দা আইন প্রবর্তনের প্রতিবাদে তিনি এই উপাধি ত্যাগ করেন। দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। বর্ণাশ্রমমূলক জাতীয়তা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ১৪শ অধিবেশনে দর্শনশাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৩৩২-৩৬ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ২৫ আশ্বিন তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত, বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পঞ্চানন্দ গ্রাম্য দেবতা 'পঞ্চানন্দ', 'পঞ্চানন', 'পাঁচু-ঠাকুর', 'বাবাঠাকুর' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ইনি অভিহিত হন। শিশুরক্ষক দেবতা বলিয়াই ইহার প্রসিদ্ধি; কিন্তু বহু বন্ধ্যা নারী সন্তানকামনায়, গৃহস্থেরা পালিত পশুপক্ষীর মঙ্গলার্থে এবং স্থানবিশেষে শ্মশানদেবতা-বিশ্বাসে ইহার পূজা করেন।

পৌরাণিক না হইলেও বহুক্ষেত্রে ইনি শাস্ত্রীয় দেবতার মর্যাদা পান।

পঞ্চানন্দের মূর্তি মহাদেবের অনুরূপ, কিন্তু বর্ণ লোহিত এবং আকৃতি আদিমভাবাপন্ন। ইহার বাহন বিভিন্ন—অশ্ব, বৃষ, মৃগ, ভল্লুক, বামন, গোভূত ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার পূজায় ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করেন। তাঁহারা পূজায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধ্যান-মন্ত্র ব্যবহার করেন। কিন্তু পূজাচারে শাস্ত্রীয় ও লোকায়ত মিশ্রিত বিধান অনুসৃত হয়; বিশেষ পূজায় ছাগবলি আবশ্যিক।

পঞ্চানন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে: ইনি শিবের আকৃতিভেদ, শিবপুত্র, ভৈরব; নাথযোগীরা ধারণা করেন, পঞ্চানন্দ ও ধর্মঠাকুর অভিন্ন; গবেষকরা মনে করেন, ইনি মিশ্র-দেবতা—শিব ও আর্যেতর কোনও রক্ত-মূর্তি দেবতার সমাহার, আর্য-স্বীকৃতির পূর্বের শিব বা রুদ্র দেবতা, দ্রাবিড় দেবতাও হইতে পারেন; তামিল-তেলুগু জাতির পূজ্য 'তীরু-বয়র' দেবতার সহিত সাদৃশ্য আছে।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

পঞ্চায়ত পাঁচজন 'জ্যেষ্ঠ'কে লইয়া গঠিত গ্রাম্য পরিষদ। ইহার প্রধান কাজ একটি বিশেষ জাতির (caste) বা কুলের বা শ্রেণীর (ট্রেডার্স গিল্ড) অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিবাদের বিচার ও নিষ্পত্তি। এইরূপ বিচারব্যবস্থা ভারতে অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। গ্রামে চিরায়ত (ট্রাডিশন্যাল) পঞ্চায়ত একটি নয়, অনেকগুলি। প্রতিটি জাতির, বিশেষতঃ নিম্নস্থানীয় জাতির একটি করিয়া নিজস্ব গ্রামপঞ্চায়ত আছে। জাতির ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, বিবাহ, সম্পত্তি, জাতিগত পেশা, জাতিচ্যুতি প্রভৃতি বিষয়ে জাতির আচারগত নিয়মাবলী জাতিভুক্ত কেহ লঙ্ঘন করিলে পঞ্চায়ত তাহার বিচার করে। দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলা সচরাচর সরকারি আদালতেই সরাসরি যায়। পঞ্চায়তের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি মোড়ল (মণ্ডল), প্রধান, গ্রামীণ, ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত। তিনিই পঞ্চায়তের আহ্বায়ক ও কর্মকর্তা। পঞ্চায়তী বিচারে মূল তত্ত্ব এই যে, পঞ্চজনের কণ্ঠই ঈশ্বরের কণ্ঠ। মহারাষ্ট্রের লোকেরা পঞ্চায়তকে বলিত 'পঞ্চ-পরমেশ্বর'। বিচারকালে কোনও পক্ষই উকিল বা মোক্তার নিযুক্ত করিতে পারে না। বাদী ও প্রতিবাদী নিজেদের বক্তব্য নিজেরাই বলে অথবা তাহাদের হইয়া তাহাদের কোনও আত্মীয় কথা বলে। রাজশক্তির প্রতীকস্বরূপ কাষ্ঠদণ্ড ও জাতির নিজস্ব দেববিগ্রহ পঞ্চায়তের বিচারকে বৃহত্তর মান্যতা দান করে। (ওড়িশায় তেলি জাতির পঞ্চায়তী সভাগুলির এলাকা 'রাজ্য' নামে অভিহিত হয়।) সাক্ষী ডাকা হয় এবং তাহারা সাক্ষ্য দান করে। আপস নিষ্পত্তির চেষ্টা পঞ্চায়তী বিচারের একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব। আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল পঞ্চায়তের একমত হওয়ার নীতি। ন্যায় বিচারের কাঠিন্যকে দয়া বা মানবিক বিবেচনার দ্বারা মৃদুতর করার চেষ্টাও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। দোষ সাব্যস্ত হইলে দোষীকে জরিমানা করা হয় অথবা জাতিচ্যুত বা 'একঘরে' করা হয়। শেষোক্ত শাস্তিই চরম। নিম্নতর পঞ্চায়তের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর পঞ্চায়তে আপিল চলে। অবস্থাবিশেষে রাজার আদালতেও আপিল চলে, যদিও তাহা বিরল।

স্বাধীন ভারতে আইনের দ্বারা গ্রামাঞ্চলে যে 'পঞ্চায়তী রাজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সহিত চিরায়ত পঞ্চায়তী ব্যবস্থার কিছু কিছু মিল থাকিলেও উভয়ের চরিত্র ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ পৃথক। বৃটিশ আমলে ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় চিরায়ত গ্রাম পঞ্চায়তের অবক্ষয় ঘটে, যদিও তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতীয় সংবিধানের ৪০ ধারার নির্দেশ অনুসারে অঙ্গরাজ্যগুলিতে রাজ্য-আইনের বলে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থারূপে নূতন গ্রাম পঞ্চায়তগুলি স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ পঞ্চায়ত আইন পাশ হয় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। নূতন পঞ্চায়তী ব্যবস্থায় জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বিধানসভায় ভোটদানের অধিকারী সকল ব্যক্তিকে লইয়া গ্রাম-সভা গঠিত হয়। গ্রাম-সভার কার্যনির্বাহের ভার গ্রাম-পঞ্চায়তের উপর ন্যস্ত। গ্রাম-পঞ্চায়তের সভ্যগণ ৪ বৎসরের জন্য গ্রাম-সভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়; গ্রাম-পঞ্চায়তের কিছু সভ্য সরকারের দ্বারা মনোনীত। গ্রাম-পঞ্চায়ত তাহার প্রথম অধিবেশনে ৪ বৎসরের জন্য একজন অধ্যক্ষ ও একজন উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করে। কয়েকটি সংলগ্ন গ্রাম-সভা লইয়া একটি অঞ্চল-পঞ্চায়ত গঠিত হয়। ইহার সভ্যগণ সংশ্লিষ্ট গ্রাম-পঞ্চায়তগুলির দ্বারা ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত; প্রতিটি গ্রাম-সভার প্রত্যেক ২৫০ জন সভ্যপিছু একজন করিয়া অঞ্চল-পঞ্চায়তের সভ্য নির্বাচিত হয়। অঞ্চল-পঞ্চায়ত তাহার প্রথম অধিবেশনে ৪ বৎসরের জন্য একজন প্রধান ও একজন উপপ্রধান নির্বাচিত করে। অঞ্চল-পঞ্চায়ত তাহার অধিকার-ক্ষেত্রের অন্তর্গত গ্রাম-সভার সভ্যগণের মধ্য হইতে ৫ জন সভ্য নির্বাচন করিয়া একটি ন্যায়-পঞ্চায়ত গঠন করে। ন্যায়-পঞ্চায়ত তাহার সভ্যগণের মধ্য হইতে একজনকে প্রধান বিচারকরূপে নির্বাচিত করে।

গ্রাম-পঞ্চায়তের কৃত্যসমূহ এইরূপ: অনাময় ব্যবস্থা; মহামারীর প্রতিরোধ; পানীয় জল সরবরাহ; জনপথের রক্ষণাবেক্ষণ; পুষ্করিণী, গো-চারণভূমি, শ্মশানঘাট ও কবরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ; সমাজসেবা ও স্বেচ্ছাশ্রম-সংগঠন ইত্যাদি। উপরন্তু রাজ্য সরকার কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হইলে গ্রাম-পঞ্চায়ত নিম্নলিখিত কৃত্যসমূহও সম্পাদন করিবে: প্রাথমিক, সামাজিক, কারিগরী অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষা; গ্রাম্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রসূতিসদন ও শিশুমঙ্গলকেন্দ্র; জলসেচ; 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন; অক্ষম ও নিঃস্বের রক্ষণাবেক্ষণ; বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন; পতিত অনাবাদী জমির চাষ; সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামের জমি পরিচালনা; ভূমি-প্রথার সংস্কারে সহায়তা; রাজ্য সরকার কর্তৃক নিবন্ধীকৃত পরিকল্পনা-সমূহের কার্যনির্বাহ। এইগুলি ব্যতীত আরও অসংখ্য জনকল্যাণ কার্য স্বেচ্ছামূলকভাবে করণীয়।

অঞ্চল-পঞ্চায়তের কার্য শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ এবং নির্দিষ্ট নিয়মাবলী সাপেক্ষে করধার্যকরণ। ন্যায়-পঞ্চায়তের ফৌজদারি অধিকারক্ষেত্র ক্ষুদ্র চৌর্যাপরাধ ইত্যাদি এবং দেওয়ানী অধিকারক্ষেত্র এমন মামলা যাহার দাবির মূল্য একশত টাকার অনূর্ধ্ব। ন্যায়-পঞ্চায়ত কারাদণ্ড দিতে পারে না; দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে অনধিক ৫০ টাকা জরিমানা করিতে পারে। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপিল করিতে পারিবে না; তবে জেলা-শাসক বা মহকুমা-শাসক ন্যায়-পঞ্চায়তের রায় নাকচ বা পরিবর্তন করিতে পারেন অথবা কোনও অধস্তন আদালত কর্তৃক মামলাটির পুনর্বিচারের নির্দেশ দিতে পারেন।

দ্র মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, কলিকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ; N. K. Bose, ed. *Data on Caste in Orissa*, Calcutta, 1960; S. K. Dey, *Panchayati Raj*, Bombay, 1961, N. K. Bose, *Studies in Gandhism*, Calcutta, 1962; The Ramakrishna Mission Institute of Culture, *The Cultural Heritage of India*, vol. II. Calcutta, 1962.

পঞ্চাল প্রাচীনকালে পঞ্চালদেশ বলিতে বরেলী (বেরিলী), ফরুকাবাদ, বদায়ূঁ প্রভৃতি কতিপয় জেলা ও উত্তর প্রদেশের মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল বুঝাইত। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে ইহা 'কুরুক্ষেত্রের উত্তরে এবং কুরুক্ষেত্র ও কুরুদেশের পশ্চিমে পশ্চিম পাঞ্জাব ও দক্ষিণ কাশ্মীর অঞ্চলে অবস্থিত।' বৈদিক যুগে উত্তর ও দক্ষিণ পঞ্চাল এই বিভাগ ছিল না। কিন্তু সংহিতোপনিষদ-ব্রাহ্মণে প্রাচ্য পঞ্চালের উল্লেখ আছে। যজুর্বেদসংহিতার 'কাম্পিলবাসিনী' হইতে ভেবর্ (Weber) ও ৎসিম্মার (Zimmer) এই কাম্পিলকে পরবর্তীকালের কাম্পিল্য বলিয়া মনে করেন। শতপথব্রাহ্মণে পঞ্চালের পরিচক্রা-নগরীর উল্লেখ আছে। ইহা মহাভারতের একচক্রা নগরী। পরবর্তী যুগে মহাভারত, জাতক ও দিব্যাবদান অনুসারে পঞ্চালদেশ উত্তর ও দক্ষিণ পঞ্চালে বিভক্ত ছিল ও গঙ্গানদী এই দুই দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করিত। উত্তর

পঞ্চালের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র। ইহা বরেলী জেলার বর্তমান রামনগর। দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য। ইহা বর্তমান কাম্পিল এবং ফরুখাবাদ জেলার ফতেগড় শহরের ৪৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। রামায়ণ অনুসারে পঞ্চালগণ কান্যকুব্জ নগরী স্থাপন করেন। সৃঞ্জয়, ক্রিবি, তুর্বশ, কেশী ও সোমক এই ৫টি জাতি লইয়া বৈদিক পঞ্চাল জাতি গঠিত হয়। বৈদিক যুগের পঞ্চাল রাজগণের মধ্যে কেশিন দাল্‌ভ্য ও প্রবাহন জৈবলি সমধিক বিখ্যাত। শেষোক্ত রাজা রাজর্ষি জনকের সমসাময়িক ছিলেন ও আরুণি, শ্বেতকেতু প্রভৃতি ঋষিদের সহিত দার্শনিক তত্ত্বালোচনা করিতেন বলিয়া উপনিষদে খ্যাত ছিলেন। মহাভারতের সময়ে দ্রোণাচার্য কুরুরাজপুত্রগণের সহায়তায় পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে পরাজিত করিয়া উত্তর পঞ্চাল দখল করিয়া লন। প্রবাহন জৈবলি হইতে বিম্বিসারের রাজত্বকালের মধ্যে দুর্মুখ ও চূলনি ব্রহ্মদত্ত এই দুইজন দিগ্বিজয়ী রাজার নাম পাওয়া যায়। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে উল্লেখিত সঞ্জয় নামে একজন কাম্পিল-রাজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া জিনগণের ধর্ম গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে পঞ্চালগণ রাজশব্দোপজীবী সংঘ গঠন করে। ইহার পরে পঞ্চাল রাজ্য মহাপদ্ম-নন্দের সময়ে মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দ্র দীনেশচন্দ্র সরকার, 'পঞ্চাল দেশ', ইতিহাস (নবপর্যায়), ৩য় সংখ্যা, কলিকাতা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ; H. C. Raychaudhuri, *Political History of Ancient India*, Calcutta, 1950; A. A. Macdonell & A. B. Keith, *Vedic Index of Names and Subjects*, vol. I, Banaras, 1958.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

পঞ্জিকা পঞ্জী বা পাঁজি, যে পুস্তকে বৎসরের প্রতিদিনের তারিখ, তিথি, পর্বদিন, শুভ দিন ইত্যাদি থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যে এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ইহা 'পঞ্চাঙ্গ' নামে অভিহিত। বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ এই পঞ্চ অঙ্গবিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে পঞ্চাঙ্গ বলে।

সভ্যতাবিকাশের প্রথম যুগেই মানবসমাজে কাল-বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। তদনুসারে কালগণনার জন্য বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বৎসর, মাস ও দিন গণনার প্রথার উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষে লৌকিক প্রয়োজনের অপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠানের কালনির্ণয়ই উক্তরূপ কালবিভাগ বা বর্ষপঞ্জী রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বৈদিক ঋষিরা বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। সেইজন্য বৎসরের ঋতুবিভাগ সুষ্ঠুরূপে করা তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা সায়ন বা ঋতুনিষ্ঠ বৎসর গণনা করিতেন এবং বৎসরকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন। তখন কোনও গণনাপদ্ধতির উদ্ভব হয় নাই, রবির উত্তর এবং দক্ষিণ গতি পর্যবেক্ষণ করিয়াই অয়নবিভাগ করা হইত। তাঁহারা বৎসরকে তপঃ, তপস্যা, মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভস্‌, নভস্য, ইষ, উর্জ, সহস্‌ ও সহস্য এই ১২টি মাসেও ভাগ করিয়াছিলেন। তপঃ হইতে শুচি পর্যন্ত উত্তরায়ণের অন্তর্গত এবং নভস্‌ হইতে সহস্য পর্যন্ত দক্ষিণায়নের অন্তর্গত। এইপ্রকার কালবিভাগ যজুর্বেদের কালে প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত হইয়াছিল। তৎকালে তিথির ব্যবহার ছিল না; মাত্র পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টকা ব্যবহৃত হইত। নক্ষত্রবিভাগ ছিল; কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে গণনা করিয়া ২৭টি বা ২৮টি নক্ষত্রে ভ-চক্রকে বিভক্ত করা হইত। ইহাই ভারতে পঞ্জিকাগণনাপদ্ধতির আদিযুগ। তৎকালে চান্দ্রমাস গণনার উল্লেখও কিছু কিছু পাওয়া যায়। ফাল্গুনী পূর্ণিমা প্রভৃতির উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে আছে। সুতরাং মনে হয় তৎকালে যে চান্দ্রমাস প্রচলিত ছিল তাহা পূর্ণিমান্ত মাস।

বেদাঙ্গজ্যোতিষকালে (১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সন্নিহিত) অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পঞ্জিকাগণনা প্রবর্তিত হয়। এই পঞ্জিকার বৎসর আরম্ভ হইত উত্তরায়ণ দিবস হইতে এবং উহাতে ১২টি অমান্ত চান্দ্রমাস ব্যবহৃত হইত। উহাতে ৩০টি তিথি এবং ২৭টি নক্ষত্রগণনার ব্যবস্থাও ছিল এবং প্রতি ৫ বৎসরের এক যুগের পর এই পঞ্জিকার গণনা আবর্তিত হইত। তখনও সূক্ষ্ম তিথ্যন্ত প্রভৃতি কালগণনার আবিষ্কার হয় নাই, মাত্র মধ্যমমানে প্রতিদিন এক তিথি এক নক্ষত্র এই হিসাবে তিথ্যাদি নিরূপিত হইত এবং মধ্যে মধ্যে এক-একটি তিথি হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইত। পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ ব্যতীত কোনও অব্দগণনার প্রথা তখনও প্রবর্তিত হয় নাই। এই বেদাঙ্গজ্যোতিষ পঞ্জিকার দ্বারাই প্রায় ১৫০০ বৎসর ধরিয়া ভারতে কালগণনা ও যজ্ঞাদির কালনির্ণয়-প্রয়োজন সাধিত হইয়াছিল। মহাভারতে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত-বাসের সময়পূর্তির হিসাব করিবার সময়েও এই বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ পঞ্জিকার গণনাপদ্ধতিই গ্রহণ করা হইয়াছিল।

তৎপরে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতকে ভারতে সূক্ষ্ম গণনাপদ্ধতির অভ্যুদয় হয়। ক্রমে আর্যভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্‌ এই পদ্ধতিকে জ্যোতির্বিদ্যার

ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিথ্যাদির সূক্ষ্ম কাল-গণনার সূত্রাদির দ্বারা প্রতিদিনের তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতির পূর্তিকাল পঞ্জিকামধ্যে সন্নিবেশের ব্যবস্থা করেন। এবিষয়ে 'সূর্যসিদ্ধান্ত' জ্যোতির্বিদ্যার একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এই সূর্যসিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই অতঃপর এদেশে পঞ্জিকা গণিত হইতে থাকে। দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে জ্যোতির্বিদ্‌গণ সূর্যসিদ্ধান্তের পদ্ধতিতে গণনা করিয়া বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণযুক্ত প্রতিদিনের পঞ্চাঙ্গ তালপত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া বৎসর আরম্ভের পূর্বেই গ্রামে গ্রামে যাইয়া শুনাইয়া আসিতেন এবং কোথাও কোথাও বা উহার অনুলিপি রাখিয়া আসিতেন। উহার দ্বারাই গ্রামের ধর্মকৃত্য-সাধনের কালনির্ণয় হইত। এই পঞ্চাঙ্গের লিখনপদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

৭	২	১
৪	১৬	৫৫
১৩	২৭	২৭
৯	৭	৮

ইহার প্রথম অঙ্ক বার— এক্ষেত্রে ৭ অর্থে শনিবার। তন্নিম্নে ৪ অর্থাৎ চতুর্থী তিথি দং ১৩।৯ পল পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তম্ভে ২ অর্থে ভরণী নক্ষত্র দং ১৬।২৭ পল পর্যন্ত। তন্নিম্নে ৭ অর্থে বিষ্টিকরণ। তৃতীয় স্তম্ভে ১ অর্থে বিষ্কুম্ভ-যোগ দং ৫৫।২৭ পল পর্যন্ত এবং তন্নিম্নে ৮ অর্থে মাসের তারিখ সংখ্যা। (এই পঞ্চাঙ্গের অঙ্কগুলি ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ৮ চৈত্র তারিখের 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' হইতে উদ্ধৃত)। যদিও বর্তমানে পঞ্জিকায় তিথ্যাদির নাম ও তাহার পূর্তি-কাল দণ্ড পল এবং ঘণ্টা মিনিটে স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে, তথাপি প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষা করিবার জন্য এই প্রকার সাংকেতিক নিয়মে পঞ্চাঙ্গ উল্লেখের প্রথা বজায় রাখা হইয়াছে। প্রতি পঞ্জিকার বামদেশেই এই অঙ্কগুলি দেখা যাইবে।

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্ভবের পূর্বে পঞ্জিকায় গ্রহাবস্থান দেওয়া হইত না, কেননা তখনও এদেশে গ্রহগতিসম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই। পরবর্তী-কালে পঞ্চাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহসঞ্চারকালও প্রদত্ত হইতে থাকে। বিগত ১০০ বৎসরেরও অধিককাল হইতে বাংলা দেশে পঞ্জিকা মুদ্রিত হইতেছে। মুদ্রণের সুযোগ লাভের পরে পঞ্জিকায় ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়া আরও অনেক বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। আদিতে পঞ্জিকা ছিল জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ। উহাতে রবি, চন্দ্র ও গ্রহাদির খ-গোলস্থ প্রকৃত অবস্থান গণনার দ্বারা নির্ণয় করিয়া তদনুসারে যজ্ঞাদি ও ধর্মকার্যের কালনির্দেশ দেওয়াই প্রধান বিষয় ছিল। বর্তমানে কিন্তু পঞ্জিকায় ফলিত জ্যোতিষ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, পঞ্জিকায় বর্ষফল, মাসফল, রাষ্ট্রফল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাংলা দেশে পঞ্জিকাগণনার ইতিহাস অতি প্রাচীন। এসম্বন্ধে 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা'-র নাম জানিতে পারা যায়। মনে হয়, স্মার্ত রঘুনন্দন প্রথম উহার গণনা আরম্ভ করেন। তৎপরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে রামরুদ্র বিদ্যানিধি নামক এক পণ্ডিত এই পঞ্জিকার গণনাকার্য সম্পাদন করিতে থাকেন। তৎপরে বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব এই কার্যভার গ্রহণ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই এই 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা' বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে ইংরেজ আমলে কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন সমাহর্তার চেষ্টায় বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব পঞ্জিকার প্রণয়নকার্য চালাইয়া যাইতে থাকেন। এই সকল পঞ্জিকা পুথির আকারে লিখিত হইত এবং কয়েকটি অনুলিপিও প্রস্তুত হইত। এই পঞ্জিকা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয় এবং উহা এখন 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা' নামে প্রচলিত। ইহার অল্পকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাগণনার প্রয়োজনীয়তা পণ্ডিতসমাজ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। ফলে ১২৯৭ বঙ্গাব্দ হইতে 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'-র প্রকাশনা আরম্ভ হয়। এই পঞ্জিকা প্রকাশের পর হইতে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও বিশেষ করিয়া বোম্বাই ও পুনায় পঞ্জিকা সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং কিছু কিছু বিশুদ্ধ পঞ্জিকা সেসকল স্থান হইতেও প্রকাশিত হইতে থাকে। পরিশেষে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার এদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে একটি পঞ্চাঙ্গশোধন সমিতি (ক্যালেণ্ডার রিফর্ম কমিটি) গঠন করিয়া প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির গণনাপদ্ধতির নিরীক্ষা ও প্রয়োজনবোধে তাহার সংস্কারসাধনের সুপারিশ করিতে বলেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে তৎপরে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা প্রকাশনার ভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। বর্তমানে উহা ১২টি ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল আন্দোলনের ফলে এখন ভারতের প্রায় প্রতি রাজ্য হইতেই ২-৪খানি করিয়া বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে। শুদ্ধগণনাযুক্ত পঞ্জিকা-গণনা পদ্ধতির প্রচলন ছাড়াও রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হইল সর্বভারতে একই রকম একটি বর্ষপঞ্জী (ক্যালেণ্ডার) গণনাপদ্ধতির প্রচলন যাহা ভারতীয় ঐতিহ্যের বাহক ও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক

হইবে। শকাব্দযুক্ত এইরূপ এক বর্ষপঞ্জী এখন সর্বভারতে প্রচলিত।

নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী

পট পট দুই প্রকারের, জড়ানো পট (স্ক্রল) এবং চৌকো পট। পটচিত্রের শিল্পীদের চিত্রকর এবং চলতি ভাষায় পটুয়া বা 'পোটো' বলা হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে পটের সাহায্যে জনশিক্ষার কাজ হইত। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্', 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্', 'উত্তররামচরিতম্', 'হর্ষ-চরিতম্' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে ইহাদের উল্লেখ রহিয়াছে।

চিত্রকরদের মধ্যে জাদু-পটুয়া, বেদিয়া প্রভৃতি শ্রেণীর শিল্পীগণকে হিন্দু ও মুসলমানের আচারাদি দুই-ই পালন করিতে দেখা যায়। মুসলমান কাজী তাহাদের বিবাহ দেন, আবার বিবাহিতা রমণী শাঁখা-সিঁদুর পরেন। চিত্রকরদের সম্পর্কে শোনা যায় যে, বিশ্বকর্মা ও অপ্সরা ঘৃতাচীর মিলনে এই সম্প্রদায়ের জন্ম। পুরাণের মতে (১২শ শতকে) তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করার শাস্তি হিসাবে জাতিচ্যুত হয়। সামাজিক অবস্থা যাহাই হউক, চিত্রকরদের সমাজবন্ধনী খুবই কড়া। পশ্চিম বঙ্গে মোটামুটি দুই ঘরোয়ানায় কাজ দেখা যায়: ১. তমলুক-কালীঘাট-ত্রিবেণী ২. বীরভূম-কান্দী-কাটোয়া-বাঁকুড়া। ইহা ব্যতীত বহরমপুর-মুর্শিদাবাদে একটি ঘরোয়ানার কথা শোনা যায়; ইহা 'মুর্শিদাবাদ কলম' নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদ কলমের উৎকৃষ্ট কাজগুলি লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও অ্যাল্‌বার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। পূর্ব বঙ্গে ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে গাজীর পট নামে এক শ্রেণীর পট দেখা যায়।

পটের বিষয়বস্তু বেশির ভাগই ছিল ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত; যেমন শিবপার্বতীলীলা, মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, গাজীর পট (হজরত মহম্মদের জীবনী ও অন্যান্য বিষয় অবলম্বনে রচিত), গোঁসাই পট (বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারালেখ্য) ইত্যাদি। দুর্গা, বাসন্তী, কালী, মনসা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিকেয়, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর ছবির সহিত মুখে মুখে জনশিক্ষার কাজ চলিত এই পটের সাহায্যে। সিন্ধুবধ, রামের বনবাস, সীতাহরণ, রাবণবধ, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি কাহিনীও পটের মাধ্যমে প্রচারিত হইত। এমন কি সাহেব পট (মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত এবং সাহেব বা ইওরোপীয়ানদের লইয়া অঙ্কিত), ডাকাতের পট ইত্যাদিরও চলন ছিল। ইহা ছাড়াও উপজাতীয়দের মধ্যে সৃষ্টি-সম্পর্কিত পট (জন্ম-পট) দেখা যায়। মৃত ব্যক্তির চিত্রাঙ্কন করিত যম-পটুয়ারা। ছবি আঁকা হইলে চক্ষুদানের জন্য পটুয়াকে অর্থাদি দান করিলে তবেই সে মৃতব্যক্তির পটচিত্রে চক্ষুদান করিত; ইহাকে পার-লৌকিক চিত্র বা চক্ষুদান চিত্রাবলী বলা হয়। বাণভট্টের রচিত 'হর্ষচরিত'-এ যমপটব্যবসায়ী পটপ্রদর্শকের উল্লেখ আছে।

জড়ানো বা দীঘল পট লম্বায় ১০-১২ ফুট (প্রায় ৩-৩½ মিটার) হইতে ২২-২৩ ফুট (প্রায় ৬½-৭ মিটার) অবধি হইত; তাহার পরিধি ছিল ১ ফুট (প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার) হইতে ২½ ফুট (প্রায় ৭৫ সেন্টিমিটার) অবধি। অবশ্য ইহার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। এই পটগুলির জন্য শিল্পীরা সাধারণতঃ শাদা খড়ি, হরিতাল, কাজল, সবুজ রং, লাল সিঁদুর ও মেটে সিঁদুর, দেশীয় কাগজ ও সাধারণ কাপড় ব্যবহার করিতেন। জড়ানো পটগুলিতে একটির নীচে অপরটি এই প্রকারে ১৪-১৫টি ভাগে পৃথকভাবে বর্ণিত কাহিনীর দৃশ্যাবলী আঁকা হইত।

দক্ষিণ বাংলার বাদা অঞ্চলের গাজীর পটে গাজীর সহিত সুন্দরবনের রাজার লড়াই ও ব্যাঘ্রের উৎপাত (পটে ব্যাঘ্রের ছবি আঁকা থাকিত), এইসব বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হইয়াছে। নাট্যমঞ্চের দৃশ্যপটের মত এই দীর্ঘ পটগুলিকে দুই প্রান্তে দুইটি লাঠির সাহায্যে জড়াইয়া রাখা হইত। প্রয়োজন মত এই পট জনসমক্ষে খুলিয়া চিত্রকর তাঁহার বর্ণিত আখ্যানভাগকে সচিত্র বুঝাইতেন।

পট আঁকার কাজে আলতা, নিমগাছের গঁদ, তেঁতুলের কাই, ডিমের খোল, বেলের আঠা, ধুনা, চাঁচগালা, কাঠকয়লা, তুঁত, মিনা ইত্যাদিরও প্রয়োজন হইত। কক্কির ডগায় পশুর গায়ের লোম দিয়া তুলি বানানো হইত। চৌকো পট ছিল ছোট ছোট চৌকো কাগজের উপর অঙ্কিত। সাধারণতঃ চিত্রকরগণ তাহা মেলায় তীর্থযাত্রীদের নিকট বিক্রয় করিতেন। এই পটগুলি গৃহে রাখিয়া নিয়মিত পূজা করা হইত। চৌকো পটের শেষ নিদর্শন হিসাবে কালীঘাটের পটের উল্লেখ করা যাইতে পারে; তবে কালীঘাটের পটের শিল্পরীতি একই প্রকারের নহে। তীর্থ হিসাবে কালীঘাটের খ্যাতিই এইস্থানে পটচিত্রশিল্পের বিস্তারে সহায়ক হইয়াছিল। দেবদেবীর চিত্র অঙ্কনের সহিত নানারূপ সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রও আঁকা হইতে লাগিল এবং এই সমুদয় চিত্র পৃথকভাবে কালীঘাট চিত্রাবলী নামে খ্যাত হইল। কালীঘাটের পট বাংলার প্রবহমান চিত্রধারার শেষ প্রবাহ। পটচিত্রশিল্প এখন প্রায় মৃত।

পটচিত্র ভারতের অন্যত্রও দেখা যায়। গুজরাত অঞ্চলে দীঘল পট আঁকিত 'চিত্রকথী'-রা। দক্ষিণ ভারতে ও ওড়িশার রঘুরাজপুর (পুরী) অঞ্চলে এখনও পট আঁকা হইয়া থাকে।

দ্র কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার লোকশিল্প, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ ; A. Mitra, *The Tribes and Castes of West Bengal*, Calcutta, 1953.

আশীষ বসু

পটল কুমড়া গোত্রের (ফ্যামিলি-কুকুর্বিতাসিঈ, Family Cucurbitaceae) দ্বিবীজপত্রী আরোহী বীরুৎজাতীয় (হার্ব) উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ত্রিকোসান্থেস দিওইকা (*Trichosanthes dioica*)। পটলের একলিঙ্গবিশিষ্ট, সমাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ, বৃন্তযুক্ত একক পুষ্প হইয়া থাকে। বৃত্যংশ ৫টি, বৃত্যংশের তলদেশ যুক্ত, পুং-পুষ্পে বৃত্যংশগুলি সরু ও লম্বা এবং স্ত্রী-পুষ্পে পাতার মত। দলমণ্ডলে ৫টি শাদা পাপড়ি থাকে ; ইহা ঘণ্টাকৃতি। পুং-পুষ্পে পুংস্তবক তিনটি ও পুংকেশর বিদ্যমান। স্ত্রী-পুষ্পে তিনটি যুক্ত গর্ভপত্র থাকে। তিনটি ক্ষুদ্র ও দ্বিধাবিভক্ত গর্ভদণ্ড বর্তমান। পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ হাওড়া ও হুগলির স্থানে স্থানে পটলের চাষ উল্লেখযোগ্য। বেলে দোআঁশ মাটিতে চাষ ভাল হয়। মূল বা কাণ্ড হইতে পটলের বংশবিস্তার করানো হয় ; বীজ হইতে উৎপন্ন গাছে ফল হয় না। পটলের কচি পাতা (পলতা) ও ফল (পটল) উভয়ই সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পলতা পিত্তনাশক।

দ্র D. Prain, *Bengal Plants*, vol. I, Calcutta, 1963.

বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

পটাসিয়াম সোডিয়াম দ্র

পট্টদকল (১৫°৫৫´ উত্তর এবং ৭৫°৪৫´ পূর্ব) মহীশূর রাজ্যের বিজাপুর জেলার বাদামি তালুকের অন্তর্গত ক্ষুদ্র গ্রাম। বাদামি রেল-স্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার (১০ মাইল)। গ্রামটির প্রাচীন নাম পট্টদ-কিসুবোলল বা কিসুবোলল। মালপ্রভা নদীর বামতটে গ্রামটি অবস্থিত। এখানকার সঙ্গমেশ্বর মন্দিরের এক শিলালেখে কিসুবোললকে দক্ষিণের কাশী বলা হইয়াছে। চালুক্য ও অন্যান্য রাজবংশীয় নৃপতিদের রাজ্যাভিষেক এই স্থলে হইত।

বাদামির চালুক্যবংশের রাজত্বকাল পট্টদকলের ইতিহাসে স্বর্ণময় যুগ। চালুক্য সাম্রাজ্যের এই পুণ্যক্ষেত্রে রাজা বিজয়াদিত্য (৬৯৬-৭৩৩ খ্রী) বিজয়েশ্বর শিবের উদ্দেশ্যে একটি মন্দির (বর্তমানে সঙ্গমেশ্বর মন্দির নামে অভিহিত) নির্মাণ করেন। বিজয়াদিত্যের পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের (৭৩৩-৪৫ খ্রী) দুই মহিষী লোকমহাদেবী ও ত্রৈলোক্যমহাদেবী লোকেশ্বর (বর্তমানে বিরূপাক্ষ মন্দির নামে পরিচিত) এবং ত্রৈলোক্যেশ্বর মন্দির (বর্তমানে মল্লিকার্জুন মন্দির নামে অভিহিত) নির্মাণ করেন।

বাদামির চালুক্যদের পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রকূট নৃপতিরা এই অঞ্চল অধিকার করেন। এই রাজবংশের কলিবল্লভ-ধ্রুবের (৭৮০-৯২ খ্রী) একটি লেখ বিরূপাক্ষ মন্দিরে রহিয়াছে। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে প্রাচীন জৈন মন্দিরটি রাষ্ট্রকূটদের আমলেই নির্মিত হইয়াছিল।

চালুক্যবংশের রাজত্বকাল হইতেই এই স্থলে বহু মন্দির নির্মিত হয়। ইহাদের মধ্যে ১০টি এখনও বিদ্যমান ; তন্মধ্যে ৯টিই—পাপনাথ, বিরূপাক্ষ, মল্লিকার্জুন, কাশী-বিশ্বেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, চন্দ্রশেখর, জম্বুলিঙ্গ, গলগনাথ এবং কাড়সিদ্ধেশ্বর—মালপ্রভার বামতটে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ হইতে উত্তরে অবস্থিত। জৈন মন্দিরটি গ্রাম হইতে দেড় ফার্লং দূরে এবং বাদামি-পট্টদকল রাস্তার সন্নিকটে অবস্থিত। মন্দির-স্থাপত্যধারার ইতিহাসে স্থানীয় বেলেপাথরে নির্মিত এই মন্দিরগুলির স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় রীতি-অনুগ মন্দিরাবলীর অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের উৎকৃষ্ট উদাহরণ যেমন সঙ্গমেশ্বর, বিরূপাক্ষ, মল্লিকার্জুন এবং জৈন মন্দিরটিতে পাওয়া যায়, তেমনি পাপনাথ, গলগনাথ, কাশীবিশ্বেশ্বর, জম্বুলিঙ্গ এবং কাড়সিদ্ধেশ্বর উত্তরভারতীয় শিখরের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। মন্দিরগাত্র ও স্তম্ভাবলী ভাস্কর্য ও কারুকার্যে অলংকৃত। অধিকাংশ মূর্তি অপরূপ। মন্দিরগুলি গুণ্ড, রেবড়ি ও বজ্জ প্রমুখ স্থপতি এবং চেঙ্গম্ম, পুলপ্পন নৃম্মাণদেব, বলদেবয্য, দেব-আর্য প্রমুখ ভাস্করদের কীর্তিস্তম্ভ।

দক্ষিণী রীতি-অনুগ মন্দিরচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বোত্তম হইতেছে বিরূপাক্ষ মন্দির। ইহার পূর্ব গোপুরের একটি লেখ হইতে জানা যায়, দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (৭৩৩-৪৫ খ্রী) কর্তৃক তিনবার কাঞ্চীবিজয়ের স্মারক এই মন্দিরটি মহাদেবী লোকমহাদেবী সূত্রধার গুণ্ড ও অন্যান্য স্থপতি ও ভাস্করবৃন্দের (সর্বসিদ্ধি আচারি, বলদেব, চেঙ্গম্ম, পুলপ্পন প্রভৃতি) সহায়তায় নির্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরটির

আদর্শ কাঞ্চীর রাজসিংহেশ্বর বা কৈলাসনাথ মন্দির। চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরটিতে রহিয়াছে গর্ভগৃহ, গর্ভগৃহপরিবেষ্টক আচ্ছাদিত প্রদক্ষিণপথ, সস্তম্ভ মণ্ডপ ও তিনটি অর্ধমণ্ডপ। প্রদক্ষিণপথের প্রবেশমুখেই দুইটি ক্ষুদ্রাকার দেবায়তন। মুখ্য (পূর্ব) অর্ধমণ্ডপের সম্মুখে স্বতন্ত্র নন্দিমণ্ডপ। প্রাচীরের দুইটি গোপুর—একটি পূর্বদিকে, অপরটি পশ্চিমে। প্রাচীরের অন্তর্দেওয়ালসংলগ্ন পরিবারদেবতালয়গুলিতে পূর্বে দেবদেবীর মূর্তি সন্নিবেশিত ছিল। গর্ভগৃহ ত্রিরথ। রাহায় অবস্থিত পার্শ্বদেবতার মূর্তি অবলুপ্ত। গম্ভীরায় লিঙ্গরূপী বিরূপাক্ষ। প্রদক্ষিণপথের ছাদের উপর দৃষ্ট গর্ভগৃহের ক্রমক্ষীয়মাণ বিমান ত্রিতল। প্রত্যেক তলার বরণ্ড-কান্টি প্রভৃতি গাত্রস্তম্ভের উপর ন্যস্ত। সর্বোচ্চ তলার উপর স্তূপির আকৃতিতে মস্তক। মস্তকের শীর্ষদেশে খপুরি ও তাহার উপরে কলস। পূর্বদিকে প্রলম্বিত শুকনাসিকা। মহামণ্ডপের সমান্তরাল ছাদ ৪শ্রেণীতে বিভক্ত ১৮টি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত। চতুষ্কোণ একশিলার স্তম্ভগুলির শীর্ষে লহরাকার ব্র্যাকেট। গাত্রস্তম্ভ ও স্তম্ভগুলির গাত্রদেশে ফুল, লতাপাতা, কীর্তিমুখ, মিথুন, কন্যা এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির উপাখ্যান ক্ষোদিত।

মহামণ্ডপ ও প্রদক্ষিণপথের অন্তরে আলোবাতাসের জন্য ইহাদের বহির্দেওয়ালে অনেকগুলি জালি-বাতায়ন ক্ষোদিত হইয়াছে। মহামণ্ডপ ও প্রদক্ষিণপথের বহির্গাত্রের অলংকরণ সুরুচিপূর্ণ। পাদভাগে ও বরণ্ডে কারুকার্যখচিত ভৌলকর্ম। সুউচ্চ জাজ্যের স্থানে স্থানে গাত্রস্তম্ভ। ইহাদের ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘ গাত্র-প্রকোষ্ঠগুলির মূর্তিগুলি অতীব সুন্দর। মূর্তিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লিঙ্গোদ্ভবমূর্তি, নটরাজ, শিবের শান্তমূর্তি, অর্ধনারীশ্বর, উমাসহিত শিব, বিষ্ণু, লকুলীশ ও জটায়ুর যুদ্ধ। অর্ধমণ্ডপগুলির স্তম্ভ, গাত্রস্তম্ভ এবং ছাদের ভিতর দিককার মূর্তিগুলিও সুন্দরভাবে পরিকল্পিত। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে দর্শনীয় পূর্বমণ্ডপের মিথুন, দ্বারপাল, পদ্মনিধি, শঙ্খনিধি ও সূর্যমূর্তি ; দক্ষিণমণ্ডপের নরসিংহ, দ্বারপাল ও রাবণানুগ্রহমূর্তি ও উত্তরমণ্ডপের নটরাজ, মিথুন এবং গজেন্দ্রমোক্ষ।

চন্দ্রশেখর মন্দিরটির শিখর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাশীবিশ্বেশ্বর, গলগনাথ, জম্বুলিঙ্গ, পাপনাথ ও কাড়-সিদ্ধেশ্বরের গর্ভগৃহের শিখর উত্তর ভারতীয় মন্দিরের আদর্শে রচিত। ক্রমক্ষীয়মাণ গণ্ডীর কাটেনী বরণ্ড (বা কান্টির) উপর হইতেই আরম্ভ হইয়াছে চৈত্যগবাক্ষানু-কৃতিতে সুসজ্জিত রাহা। কনিকপগ কতিপয় ভূমিতে বিভক্ত ; প্রতি ভূমিতে একাধিক ভূমি-বরণ্ডী ও একটি ভূমি-আমলক। বিসমের উপর বেকি। অধিকাংশ মন্দিরের মস্তকভাগ অবলুপ্ত। গলগনাথ মন্দিরের মস্তকের আমলকটি আয়তনের তুলনায় উচ্চ। কয়েকটি মন্দিরে গর্ভগৃহের চতুর্দিকে আচ্ছাদিত প্রদক্ষিণপথ। কাড়সিদ্ধেশ্বর ও জম্বুলিঙ্গ মন্দির নিরন্ধারা। গর্ভগৃহের সম্মুখে মণ্ডপ। সান্ধারা পাপনাথ মন্দিরের সস্তম্ভ মণ্ডপের সম্মুখে বিরাটাকার সস্তম্ভ মহামণ্ডপ ; মহামণ্ডপের সম্মুখে আবার অর্ধমণ্ডপ। মন্দিরগুলির অধিকাংশ মূর্তিবহুল। মণ্ডপের স্তম্ভাবলীতে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনীর উদ্গত চিত্র।

দ্র J. Fergusson, *History of Indian and Eastern Architecture*, vols. I & II, London, 1910; A. M. Annigeri, *A Guide to the* Pattadakal Temples, Dharwar, 1961; Percy Brown, *Indian Architecture (Buddhist and Hindu periods)*, Bombay, 1965.

দেবলা মিত্র

পণি বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত পণিগণ অর্ধ-পৌরাণিক অর্ধ-ঐতিহাসিক কোনও জাতি। ইহারা দেবতাদের শত্রু। একটি প্রসিদ্ধ আখ্যানে পাওয়া যায় যে, পণিগণ দেবগণের গোরু চুরি করিলে ইন্দ্রের কথায় সরমা হৃতধনের সন্ধান দেন এবং ইন্দ্র তাহাদের উদ্ধার করেন। পণিদের পরাভবকারীরূপে অঙ্গিরার নামও পাওয়া যায়। পুরাণে এই আখ্যান হইতে পণিদের নামটি বাদ পড়িয়াছে। একটি মতে পণিগণ ও ঐতিহাসিক পাণিয়গণ অভিন্ন। পণিগণ যজ্ঞবিদ্বেষী, ধনশালী ও কৃপণ। প্রায় সর্বত্রই ইহাদের গোসম্পদের কথা পাওয়া যায়। ইহাদের 'বেকনাট' এই বিশেষণের অর্থ মনে হয় 'কুসীদজীবী'।

দ্র A. B. Keith, *The Religion and Philosophy of the Vedas and Upanisads*, Cambridge: Massachusets, 1925; H. L. Hariyappa, *Rigvedic Legend through the Ages*, Poona, 1953.

দীপক ভট্টাচার্য

পণ্ডিচেরী ভারতের কেন্দ্রশাসিত রাজ্য। এই রাজ্যটি ৪টি বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র অঞ্চল লইয়া গঠিত। ইহাদের মধ্যে করমণ্ডল উপকূলে পণ্ডিচেরী ও কারিকল, কেরলের উপকূলে মাহে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে ইয়ানাম অঞ্চল অবস্থিত। মোট আয়তন (১৯৬১ খ্রী) ২৭৯ বর্গকিলো

মিটার (১৮৫ বর্গমাইল)। মোট জনসংখ্যা ৩৬৯০৭৯ (পুরুষ ১৮৩৩৪৭, নারী ১৮৫৭৩২)। রাজ্যে মোট ৫টি শহর (পণ্ডিচেরী, কারিকল, মুথিয়াল পেট, মাহে ও ইয়ানাম) এবং ৩৮৮টি গ্রাম আছে। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৮৮ (প্রতি বর্গমাইলে ২০৪০); শহরাঞ্চলে ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩৭৯২ (প্রতি বর্গমাইলে ৯৮২৩)। পণ্ডিচেরী এই রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান শহর। রাজ্যে হিন্দু, রোম্যান ক্যাথলিক, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণ বাস করে। তামিল, মালয়ালম ও তেলুগু প্রধান ভাষাগুলির অন্যতম। এই রাজ্যে ভারতীয় এবং ফরাসী-সংস্কৃতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। রাজ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য জলপথে পণ্ডিচেরী এবং কারিকল বন্দরের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। প্রধান আমদানিদ্রব্যের মধ্যে চাল, চিনি, সুপারি, তামাক, কাঠ, মদ, জ্বালানি তেল, সিমেন্ট, রাসায়নিক পদার্থ, সুতা, চট ইত্যাদি প্রধান ; রপ্তানিদ্রব্যের মধ্যে চর্ম, বস্ত্র, পেঁয়াজ ও চীনাবাদাম উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিচেরী অঞ্চল করমণ্ডল উপকূলে (১১°৫´- ১২°৩০´ উত্তর এবং ৭৮°৩৭´- ৮০° পূর্ব) পোন্নাইয়ার নদীর উত্তরে অবস্থিত। অপর নাম পুড়ুচেরী বা পুলচেরী। আয়তন (১৯৬১ খ্রী) ২৯৪ বর্গকিলোমিটার (১১৩ বর্গমাইল); জনসংখ্যা ২৫৮৫৬১।

১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গিঞ্জির রাজার নিকট হইতে ফ্রাংকো মার্টিন কর্তৃক ক্রীত পণ্ডিচেরীতেই প্রথম ফরাসী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজরা এই অঞ্চল অধিকার করে। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রিস্‌উইকের সন্ধির দ্বারা পুনরায় এই অঞ্চল ফরাসী অধিকারে আসে। পরবর্তী কালে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে ৪ বার এই শহর ইংরেজগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় এই অঞ্চলে ফরাসী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতালাভের পর বস্তুতপক্ষে ফরাসী শাসনের অবসান হয় এবং ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর ইহা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই এখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র পণ্ডিচেরী রাজ্যের শতকরা ৬৩ ভাগ এলাকা এবং জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ পণ্ডিচেরী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

পণ্ডিচেরী অঞ্চল মূল ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া গঠিত। কেবলমাত্র পূর্ব দিকে সমুদ্র ব্যতীত অপর তিন দিকে তামিলনাড়ু রাজ্যের দক্ষিণ আর্কট জেলা দ্বারা পরিবেষ্টিত। তটভাগ সমান এবং বালুকাময়। অধিকাংশ অঞ্চলই অত্যন্ত নীচু। গিঞ্জি এবং পোন্নিয়ার প্রধান নদী। নদীগুলি বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে প্রায়ই শুষ্ক থাকে। নদী হইতে খাল খনন করিয়া পার্শ্ববর্তী জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। সমুদ্র-তীরভাগে ৬৭টি লবণাক্ত হ্রদ আছে, উহাদিগের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলে ওস্‌তু হ্রদই বৃহত্তম। জলবায়ু প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ, স্বাস্থ্যকর ও মনোরম। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় ১২৩·৭ সেন্টিমিটার (৪৮·৭ ইঞ্চি)। গ্রীষ্মে গড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৩৭° সেন্টিগ্রেড এবং শীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১° সেন্টিগ্রেড। সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে ২০০৪৮ হেক্টর এলাকায় চাষবাস করা হয়। নানাপ্রকার ফল, ধান, চীনাবাদাম, আখ, তাল, কলা, নারিকেল, তেঁতুল, শাক-সবজি, গবাদি পশুর খাদ্য প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। নীলচাষ এই এলাকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পুষ্করিণী, ঝর্ণা, নলকূপ, খাল, আর্টেজীও কূপ প্রভৃতির দ্বারা জলসেচ করা হয়। বস্ত্রবয়ন এই অঞ্চলের বৃহত্তম শিল্প।

পণ্ডিচেরী ও মুথিয়াল পেট পণ্ডিচেরী অঞ্চলের শহর। তামিল প্রধান ভাষা। সমগ্র ভারতের শিক্ষিতের হার (২৪·০২%) অপেক্ষা এই স্থানে শিক্ষিতের হার (৩৫·২৩%) অধিক। ফরাসী কলেজ, ফরাসী ইন্‌স্টিটিউট, পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত। রেলপথ, সড়ক ও জলপথে সুষ্ঠু যোগাযোগব্যবস্থা বর্তমান।

পণ্ডিচেরী (১১° ৫৫´ উত্তর এবং ৭৯° পূর্ব) রাজ্যের প্রধান শহর ও শাসনকেন্দ্র। শহরের আয়তন ২·১২ বর্গকিলোমিটার (০·৮২ বর্গমাইল)। জনসংখ্যা (১৯৬১খ্রী) ৪০৪২১। সমুদ্রের নিকটে পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি নদীর মোহানায় শহরের অবস্থান। পণ্ডিচেরী শহরে হিন্দু জনসংখ্যাই সর্বাধিক এবং উহারা ভন্নিয়ার, শালার, ভেল্লালার, কাম্মার, যাদব প্রভৃতি জাতিতে বিভক্ত। শহরে ডুপ্লেক্স-এর মর্মরমূর্তি, ঝর্ণা, চিড়িয়াখানা, উদ্ভিদ-উদ্যান, গির্জা, লাইটহাউস প্রভৃতি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। কার্পাসবস্ত্র বয়নের ও নীল প্রস্তুতের কারখানা ব্যতীত আরও নানাপ্রকার কারখানা এই শহরে দেখা যায়। সড়ক ও রেলপথই (দক্ষিণ রেলপথের মিটারগেজ শাখা) প্রধান যোগাযোগরক্ষাকারী।

কারিকল অঞ্চলটি (১০°৫১´-১১° উত্তর এবং ৭৯° ৪৩´-৭৯° ৫২´ পূর্ব) পণ্ডিচেরীর ১৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। আয়তন ১৪৯·২ বর্গকিলোমিটার (৫৭·৬ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা (১৯৬১ খ্রী) ৮৪০০১। কারিকল এই অঞ্চলের একমাত্র শহর ও শাসনকেন্দ্র।

পূর্ব সীমানা বঙ্গোপসাগর; অপর তিনদিক তামিলনাড়ু রাজ্যের থানজাভূর জেলার দ্বারা বেষ্টিত। জলবায়ু মনোরম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রার গড় ৩৮° সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় ২৪° সেন্টিগ্রেড। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় ১১৪·৩ সেন্টিমিটার (৪৫ ইঞ্চি)। জুলাই হইতে নভেম্বর পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। গাছের মধ্যে তেঁতুল, কলা, আম, নারিকেল, পান, ট্যাপিয়োকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মৃত্তিকা পলিমাটি হইলেও বালুকণাও দেখা যায়। ধান প্রধান শস্য। ১০৯৮৩ হেক্টর জমিতে কৃষিকার্য হয়। তামিল এখানকার প্রধান ভাষা। কারিকল শহর (১১° ৫৫′ উত্তর এবং ৭৯° ৫০′ পূর্ব) আরাসালার নদীর মোহানা হইতে ২·৪ কিলোমিটার (১·৫ মাইল) ভিতরে নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। শহরের আয়তন ০·৮০ বর্গকিলোমিটার (০·৩১ বর্গমাইল) এবং জনসংখ্যা ২২২৫২। নারিকেল তৈল ও মৎস্যের ব্যবসায় প্রসিদ্ধ; নৌকানির্মাণও উল্লেখযোগ্য শিল্প।

মাহে অঞ্চল মালাবার উপকূলে ১১° ৪২′ উত্তর এবং ৭৫° ৩৪′ পূর্বে ও তেল্লিচেরির ৬·৪ কিলোমিটার (৪ মাইল) দক্ষিণে মাহে নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই উপনিবেশ স্থাপিত হয়। আয়তন ৮·৩ বর্গকিলোমিটার (৩·২ বর্গমাইল)। জনসংখ্যা ১৯৪৮৫ (১৯৬১ খ্রী)। মাহে একমাত্র শহর ও শাসনকেন্দ্র। শহরের লোকসংখ্যা ৭৯৫১। শহরের আয়তন ১·৪০ বর্গকিলোমিটার (০·৫৪ বর্গমাইল)। শহরটি মাহে নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত; নদীর মোহানায় পাহাড়ের উপর অবস্থিত বলিয়া সৌন্দর্যে মনোরম। আবহাওয়া মনোরম; বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় ৩৮৮·৯ সেন্টিমিটার (১৫৩·১ ইঞ্চি)। জুন হইতে অক্টোবর পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। তাপমাত্রা ১৮°-৩৮° সেন্টিগ্রেড। বনভূমি নাই; তেঁতুল, সুপারি, কলা, কাজুবাদাম, আম, ট্যাপিয়োকা প্রধান উদ্ভিদ। কৃষি প্রধান উপজীবিকা; মৃত্তিকা উর্বর। ৭৩৮ হেক্টর জমিতে চাষ হয় (নারিকেলচাষ ৪৯৮ হেক্টর জমিতে)। ধান, মরিচ ও ডাল প্রধান শস্য। জলসেচের প্রয়োজন হয় না।

ইয়ানাম অঞ্চল পূর্ব উপকূলে ১৬°৪৩′ উত্তর এবং ৮২°১৩′ পূর্বে অবস্থিত। ইয়ানাম একমাত্র শহর ও শাসনকেন্দ্র; শহরটি গোদাবরী নদীর পূর্ব শাখার বাম তীরে অবস্থিত। আয়তন ১৭·৪ বর্গকিলোমিটার (৬·৭ বর্গমাইল); জনসংখ্যা ৭০৩২ (১৯৬১ খ্রী)। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় ১২৪·৭ সেন্টিমিটার (৪৯·১ ইঞ্চি)। জুন হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিক বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০° সেন্টিগ্রেড ও মে-জুন মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৪° সেন্টিগ্রেড। ৮৪৫ হেক্টর এলাকায় ধান, ভুট্টা, ডাল, ছোলা, লংকা ইত্যাদির চাষ হয়। নদী ও খালের দ্বারা ২২৮ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়। তেলুগু প্রধান ভাষা। বস্ত্রবয়ন ও মৎস্যশিল্পই প্রধান শিল্প। ইয়ানাম শহর এই অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র। কোরিংগা নদী শহরটিকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে।

পণ্ডিচেরী ও কারিকলে তামিল সংস্কৃতি, মাহেতে মালয়ালম ও ইয়ানাম অঞ্চলে তেলুগু সংস্কৃতির সুস্পষ্ট প্রভাব নজরে পড়ে।

দ্র *A Gazetteer of Southern India*, Madras, 1855; *The Imperial Gazetteer of India, Provincial series, Madras*, vol. II, Madras, 1908; *Census of India: Paper No. I of 1962*, New Delhi, 1962; *Census of India 1961*, vol. XXV, Parts I and II, Madras, 1964.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

পতঙ্গ সন্ধিপদ গোষ্ঠীর (ফাইলাম-আর্থ্রোপোদা) অন্তর্ভুক্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণী। পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীগুলিকে ন্যূনপক্ষে ২৯টি বর্গে (অর্ডার) বিভক্ত করা যায়। প্রাণীকুলের সকল জ্ঞাত প্রজাতির শতকরা ৭০টি বিভিন্ন পতঙ্গ-প্রজাতি। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের একটি হিসাব অনুযায়ী পতঙ্গের প্রায় ৭ লক্ষ প্রজাতি বর্ণিত হইয়াছে। অনধিক ০·২৫ মিলিমিটার হইতে ২৬ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের পতঙ্গ দেখা যায়। পতঙ্গের প্রাচীনতম জীবাশ্ম প্রায় ২৭ কোটি বৎসর পূর্বের কার্বনিফেরাস কল্পের শিলায় পাওয়া গিয়াছে। সর্বাধিক প্রচলিত মতবাদ অনুযায়ী পতঙ্গের বিবর্তন হইয়াছে মিরিয়াপোদা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সিম্‌ফিলা (Symphyla)-সদৃশ প্রাণীকুল হইতে। মৌমাছি, উই, পিপীলিকা প্রভৃতি বহু পতঙ্গ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে।

পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের দেহ শির, বক্ষ ও উদর ইত্যাদিতে বিভক্ত। অখণ্ডিত শিরোদেশে একজোড়া সংবেদনশীল শুঙ্গ (অ্যান্টেনা), ভোজন-সহায়ক কতিপয় উপাঙ্গ (অ্যাপেন্‌ডেজ) ও এক জোড়া পুঞ্জাক্ষি (কম্পাউন্ড আই) থাকে ('চক্ষু' দ্র)। তিন খণ্ডে বিভক্ত বক্ষোদেশের প্রতি খণ্ড একজোড়া সন্ধিল (জয়েন্টেড) পদযুক্ত এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রত্যেকটিতে প্রায়ই কৃত্তিকা (কিউটিক্‌ল) দিয়া তৈয়ারি একজোড়া পক্ষ থাকে। ৭-১১ খণ্ডে বিভক্ত উদর সাধারণতঃ উপাঙ্গবিহীন। যকৃৎ নাই। পৌষ্টিক নালীর সহিত সংশ্লিষ্ট সরু সরু নল (ম্যাল্‌পিঘিয়ান টিবিউল) বর্জ্য

পদার্থের রেচন (এক্স্‌ক্রিশন) সম্পন্ন করে। নলীর মত লম্বাটে হৃৎপিণ্ড ৮ বা ততোধিক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। শ্বাস-যন্ত্র দেহময় সুবিস্তৃত জটিল শ্বাসনালীর (ট্র্যাকিয়াল টিউব) সমষ্টিমাত্র; শ্বাসকার্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বায়ুস্থিত অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। পতঙ্গ একলিঙ্গ প্রাণী; ইহার ভ্রূণোত্তর পরিণতি অল্পাধিক রূপান্তরের (মেটামর্‌ফোসিস) মাধ্যমে সাধিত হইয়া থাকে। এ সকল বৈশিষ্ট্য ব্যতীত সন্ধিপদ গোষ্ঠীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহও পতঙ্গে বর্তমান।

মৌমাছি, রেশমকীট, লাক্ষাকীট প্রভৃতি পতঙ্গ প্রাচীন-কাল হইতেই মানবসমাজকে ভোগ্যসামগ্রী জোগাইতেছে। উদ্ভিদের পরাগযোগেও পতঙ্গের সহায়তা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বহু পতঙ্গই নানা রোগজীবাণুর বাহক। খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, পুস্তক, উদ্ভিদ প্রভৃতি বিনষ্টকারী পতঙ্গের সংখ্যাও বহু। ক্ষতিকর পতঙ্গনিয়ন্ত্রণে নানা প্রকার কীটঘ্ন পদার্থের ব্যবহার, উন্নত কৃষি ও সংরক্ষণপদ্ধতির প্রয়োগ, আমদানি-কৃত পণ্যাদির সঙ্গরোধ (করান্টিন, quarantine) বিধি প্রভৃতি ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। 'পঙ্গপাল', 'পিপীলিকা', 'প্রজাপতি', 'মশা', 'মাছি', 'মৌমাছি', ও 'রেশম' দ্র। দ্র A. D. Imms, *A General Textbook of Entomology*, London, 1953.

সুজিতকুমার দাশগুপ্ত

পতঙ্গভুক উদ্ভিদ মাংসাশী প্রাণীর ন্যায় পতঙ্গভুক উদ্ভিদ কীটপতঙ্গের মাংস ভক্ষণ করিয়া তাহাদের দেহের প্রোটিনের সাহায্যে নিজদেহের পুষ্টিসাধন করে। তবে অন্যান্য সবুজ উদ্ভিদের ন্যায় পতঙ্গভুক উদ্ভিদও সূর্যালোকের সহায়তায় নিজের অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেই তৈয়ারি করিতে পারে। পতঙ্গ ধরিবার জন্য এরূপ উদ্ভিদের দেহে এক-একটি বিশেষ কৌশল এবং প্রোটিন পরিপাকের জন্য কয়েকটি পাচকরসনিঃস্রাবী গ্রন্থি বর্তমান। পৃথিবীতে প্রায় ৪০০ এবং ভারতে প্রায় ৩০ জাতের পতঙ্গভুক উদ্ভিদের দেখা পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত পতঙ্গভুক উদ্ভিদগুলি বিশেষ পরিচিত: ১. ঘটপত্রী বা কলসপত্র বা পিচার প্ল্যান্ট: নেপেন্‌থাসিঈ (Nepenthaceae) গোত্রের নেপেন্‌থেস গণভুক্ত ঘন সবুজবর্ণ বীরুৎজাতীয় এই উদ্ভিদ-গুলিকে আসামের গারো, খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ের জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। দীর্ঘ ফলকের ন্যায় পাতার দড়ির মত অগ্রভাগ হইতে ১০-২০ সেন্টিমিটার লম্বা কলস ঝুলিতে দেখা যায়। প্রতিটি কলসের মুখে একটি গোলাপী বা লাল আভাযুক্ত ঢাকনি থাকে। রংএর আকর্ষণে পতঙ্গ কলসের ভিতর প্রবেশ করে। কলসের মুখ খুব পিচ্ছিল এবং সেখানে অসংখ্য সূক্ষ্ম নিম্নমুখী রোম থাকে। এগুলিতে বাধা পাইয়া পতঙ্গ আর কলস হইতে বাহিরে আসিতে পারে না। কলসের নীচের দিকে অবস্থিত পাচনগ্রন্থিগুলি হইতে পেপ্‌সিন এবং হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড ক্ষরিত হয়। উহাদের সাহায্যে মৃত পতঙ্গের দেহের প্রোটিনের পরিপাক সম্পন্ন হয় ২. সূর্য-শিশির বা পানের পিক: ড্রোসেরাসিঈ গোত্রের (Family-Droseraceae) ড্রোসেরা গণভুক্ত এই বীরুৎজাতীয় গাছগুলিকে পশ্চিম বঙ্গের বহু স্থানেই দেখা যায়। চামচের ন্যায় গোলাকার পাতার ফলকে অবস্থিত অসংখ্য সূক্ষ্ম শুঁয়ার আগায় আঠালো রসের নিঃসরণে শুঁয়াগুলি সূর্যালোকে শিশিরের ন্যায় ঝলমল করে, তাই ইহাদের এক নাম সূর্যশিশির। অপরদিকে ইহাদের রং লাল হওয়ায় দূর হইতে ছড়ানো পানের পিকের মত দেখায়, তাই ইহাদের অন্য নাম পানের পিক। পতঙ্গ পাতার উপর বসিলেই সংবেদনশীল শুঁয়াগুলি পতঙ্গকে জড়াইয়া ধরে ও গ্রন্থিনিঃসৃত পাচক-রসের সাহায্যে তাহার দেহকে পরিপাক করিয়া ফেলে; পরে শুঁয়াগুলি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া গিয়া পুনর্বার শিকারের প্রতীক্ষা করে ৩. মালাক্কা ঝাঁজি বা আলড্রোভান্দা: ড্রোসেরাসিঈ গোত্রভুক্ত এই ভ্রাম্যমাণ জলজ উদ্ভিদগুলি বেশ বড় বড় শিকার ধরিতে পারে ('ঝাঁজি' দ্র) ৪. পাতা ঝাঁজি বা ব্লাডারওয়ার্ট: লেন্‌তিবুলারিয়াসিঈ গোত্রের (Family-Lentibulariaceae) অন্তর্ভুক্ত উত্রিকুলারিয়া গণের এই জলজ উদ্ভিদগুলিকে বাংলা দেশের জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ('ঝাঁজি' দ্র)।

এসকল উদ্ভিদ ব্যতীত গিরিশচন্দ্র বসুর মতে লাল ভেরেণ্ডা ও তামাকগাছের অসংখ্য চট্‌চটে ত্বক-রোমের দ্বারাও খুবসম্ভব ছোট ছোট পতঙ্গ শিকার করা যাইতে পারে। ইহাদের ইওরোপ ও আফ্রিকার মাছি-ধরা গাছগুলির ভারতীয় নিদর্শন বলিলেও চলে।

দ্র G. C. Bose, *A Manual of Indian Botany*, Calcutta.

সন্তোষকুমার পাইন

পতঞ্জলি পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্যকার। তাঁহাকে গোণিকাপুত্র, গোনর্দীয় এবং চূর্ণিকৃৎ ও বলা হয়। গোনর্দ (সম্ভবত: আধুনিক উত্তর প্রদেশের গোণ্ডা) নামক স্থানে খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে পতঞ্জলির আবির্ভাব। বৈয়াকরণ পতঞ্জলির কালনির্ণয়বিষয়ে পণ্ডিতগণ মোটামুটিভাবে একটি সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। পতঞ্জলি-রচিত 'মহাভাষ্য'-এ 'পুষ্যমিত্রসভা,

চন্দ্রগুপ্তসভা' ('পাণিনিসূত্র' ১. ১. ৬৮), 'অনুশোণং পাটলিপুত্রম্' ('পাণিনিসূত্র' ২.১.১৫), 'ইহ পুষ্যমিত্রং যাজয়ামঃ' ('পাণিনিসূত্র' ৩. ২. ১২৩), 'অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্, অরুণদ্ যবনো মাধ্যমিকাম্' ('পাণিনিসূত্র' ৩. ২. ১১১), 'মৌর্যৈর্হিরণ্যার্থিভির্রর্চাঃ প্রকল্পিতাঃ' ('পাণিনিসূত্র' ৫. ৩. ৯৯) প্রভৃতি উল্লেখ হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, পতঞ্জলি মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত বৃষল-বংশীয় রাজগণের রাজত্বের অবসানে শুঙ্গ-বংশীয় পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন এবং তিনি পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে ঋত্বিকরূপে বৃত হইয়াছিলেন। যবনরাজ (মিলিন্দ, Menander?) কর্তৃক সাকেত (অযোধ্যা) ও মাধ্যমিকা আক্রমণের উল্লেখও এরূপ অনুমানকেই সমর্থন করে। সুতরাং মহর্ষি পতঞ্জলির আবির্ভাবকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগ।

পতঞ্জলি অনন্তনাগের অবতার বলিয়া কথিত হন। এইহেতু তাঁহার রচিত ভাষ্যের অপর নাম 'ফণিভাষ্য'। পাণিনির সূত্র ও কাত্যায়নের বার্তিক বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার নিমিত্ত পতঞ্জলি অপূর্ব সরল ভাষায় ভাষ্য রচনা করেন। এই মহাভাষ্যটি পতঞ্জলির অসাধারণ কীর্তি। শুধু 'মহাভাষ্য' বলিলে এই ভাষ্যকেই বুঝায়। 'যোগদর্শন'-রচয়িতা পতঞ্জলি হইতে ইনি ভিন্ন ব্যক্তি কিনা, এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নিসংশয় হওয়া যায় না।

'যোগসূত্র'-এর বৃত্তিকার ভোজদেব, 'বাক্যপদীয়'-টীকাকার পুণ্যরাজ, 'চরক'টীকা-প্রণেতা চক্রপাণি প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের মতে মহর্ষি পতঞ্জলিই যোগশাস্ত্র শব্দশাস্ত্র এবং বৈদ্যকশাস্ত্র প্রণয়নের দ্বারা মানুষের চিত্তের, বাক্যের এবং শরীরের ত্রিবিধ মল দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
সুখময় ভট্টাচার্য

পতৌদির নবাব, ইফতিকার আলী (১৯১০-৫২ খ্রী) ভারতের অন্যতম প্রথিতযশা ক্রিকেট-খেলোয়াড়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও উর্স্টার কাউন্টি দলে তাঁহার ক্রীড়াকুশলতার স্ফুরণ হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরপর ৪টি খেলায় সেঞ্চুরি করার এবং কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান (অপরাজিত ২৩৮ রান) করার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড দলে তিনি স্থানলাভ করেন। সিডনি-র ক্রিকেট-মাঠে প্রথম আবির্ভাবেই ১০২ রান করিয়া তিনি কৃতী ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সম্মান পান। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের অধিনায়কতা করেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

শঙ্করবিজয় মিত্র

পদাবলী দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে (১।৩) 'পদাবলী' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, যদি হরিস্মরণে মনকে সরস করিবার ইচ্ছা থাকে, যদি তাঁহার লীলাবিলাস জানিতে কৌতূহল জাগে, তাহা হইলে জয়দেবের বাণী এই মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী শোন। পদাবলী বলিতে সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের লীলাকথা লইয়া গান করিবার জন্য রচিত কমনীয় কবিতা বুঝায়। দাক্ষিণাত্যে ও মিথিলায় শিবকে লইয়া ও বাংলাদেশে উমাকে লইয়াও কিছু পদ রচিত হইয়াছে।

পদাবলী একাধারে সাহিত্য এবং সাধনার অবলম্বন। উপনিষদে যে ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলা হইয়াছে এবং প্রিয়রূপে উপাসনা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করিবার ও করাইবার জন্য পদাবলী রচিত হইয়াছে। পদাবলীর রচয়িতারা মহাজন আখ্যায় সম্মানিত; কীর্তনীয়া যখন পদের শেষে ভণিতায় কবির নাম উচ্চারণ করেন তখন শ্রোতারা মাথা নত করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন জানান। জয়দেব বহু পদের শেষে 'ভণিতম্' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতেই ভণিতা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন যে, জয়দেব প্রথমে প্রাকৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন ও পরে উহা সংস্কৃতে অনূদিত হয়। এই মতবাদ সত্য হউক বা না হউক, একথা মানিতেই হইবে যে প্রাকৃত ভাষায় অনেক সুন্দর সুন্দর পদ রচিত হইয়াছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস তাঁহাদের পদাবলীর ভাব ও বিষয়বস্তুর জন্য প্রাকৃতভাষার কবিদের নিকট ঋণী। ঐ কবিদের নাম জানা যায় না, কাল নির্ণয় করাও কঠিন। তবু তাঁহারা এত খ্যাতিমান ছিলেন যে ১৪শ শতাব্দীর প্রথম পাদে 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' এবং ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিকর্ণপুরের 'অলংকার-কৌস্তভ'-এ তাঁহাদের পদ ধৃত হইয়াছে। 'ফুল্লা নীবা ভব ভমরা, দিট্টা মেহা জলসমলা। নচ্চে বিজ্জু পিঅ-সহিআ আবে কন্তা কহু কহিআ।' —'পৈঙ্গল'-এর এই রসঘন পদটি বৈষ্ণব কবিদের অগ্রদূত। নৌকাবিলাসের

কথা কোনও পুরাণাদিতে নাই, তবে 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' (৯)-এ আছে। বংশীর প্রতি আক্ষেপের কথা 'অলংকার-কৌস্তভ'-এর তৃতীয় কিরণে ধৃত একটি প্রাকৃত পদে দেখা যায়।

প্রাক্-চৈতন্যযুগে পদাবলীর দুইটি ধারা দেখা যায়—একটি বিদ্যাপতির, অপরটি চণ্ডীদাসের। বিদ্যাপতির পদ, রাজরানীর মত অলংকারভূষিতা, উহা মস্তিষ্কের আলোড়ন ঘটাইয়া হৃদয়ে পৌঁছে। চণ্ডীদাসের পদ সহজ, সরল, অলংকারবিবর্জিত, 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশিবার জন্য লেখা। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবিরা সাধারণতঃ চণ্ডীদাসের ধারায় নিজেদের উদ্বেল ভাবাবেগ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছেন নরহরি সরকার, গোবিন্দ আচার্য, মুরারি গুপ্ত, বলরাম দাস, বংশীবদন, গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব ঘোষ তিন ভাই এবং রামানন্দ বসু। শ্রীচৈতন্য রাধাভাবে ভাবিত থাকিতেন। তাঁহার অলৌকিক প্রেম দেখিয়া পদকর্তারা শ্রীরাধার ভাবধারা অংকন করিবার অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর ১৬শ শতাব্দীতে যে সকল পদকর্তা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন জ্ঞানদাস, রায়শেখর, লোচন, গোবিন্দদাস কবিরাজ ও নরোত্তম ঠাকুর। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ধারায় আলংকারিক রীতিতে পদ রচনা করেন। ১৭শ ও ১৮শ শতকে এই রীতি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। 'কবি-নৃপ-বংশজ' অর্থাৎ গোবিন্দদাসের বংশে জাত ঘনশ্যাম ও বলরাম কবিরাজ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও রাধামোহন ঠাকুর শেষার্ধে ব্রজবুলিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ পদ লেখেন। কিন্তু ১৭শ শতাব্দীতে চণ্ডীদাসী ধারা লোপ পায় নাই। গোপাল দাস বা রামগোপাল দাস শাদামাঠা প্রাণস্পর্শী ভাষায় পদরচনায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ১৮শ শতাব্দীতে ও তাহার পরে আর কোনও প্রথম শ্রেণীর পদকর্তার সাক্ষাৎ মেলে না। নরহরি চক্রবর্তী ও দীন চণ্ডীদাস সর্বাপেক্ষা বেশিসংখ্যক পদ লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের পদ যতটা ভারে কাটে, ততটা ধারে নহে। দীনবন্ধু দাস ইহাদের অপেক্ষা অনেক কম পদ লিখিলেও তাঁহার কবিপ্রতিভা অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের। ১৯শ শতাব্দীর পদকর্তাদের মধ্যে রঘুনন্দন গোস্বামীর খ্যাতি সকলের অপেক্ষা বেশি। গত শতকের শেষের দিকে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, শিশিরকুমার ঘোষ ও প্রভু জগদ্বন্ধু পদাবলী রচনার ধারা অব্যাহত রাখেন। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথও পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত 'সদুক্তি-কর্ণামৃত'-এ নায়িকার ৮ প্রকারের ভাব সম্বন্ধে অনেকগুলি শ্লোক ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে নায়িকাকে অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা এই ৮ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিরাও শ্রীরাধার এই ৮ প্রকারের ভাব ও লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ১৭শ শতাব্দীতে পীতাম্বর দাস, 'রসমঞ্জরী'তে ৮ প্রকার নায়িকার আট-আটটি করিয়া ভাবের কথা বলিয়াছেন, যেমন অভিসারিকার সম্বন্ধে—জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষা, দিবা-অভিসার এবং কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা ও সঞ্চরা। এইরূপ বিভাগ হইতে ৬৪ রসের কীর্তনের কথা প্রচলিত হইয়াছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী 'গীতাবলী'তে জন্মোৎসব, দোললীলা, বসন্তোৎসব, উত্তরগোষ্ঠ, পূর্বরাগ, দানলীলা, ভাবোল্লাস প্রভৃতি বিষয় লইয়া চল্লিশটি পদ সংস্কৃতে রচনা করিয়াছেন। উহার প্রত্যেকটিতে তিনি সনাতনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পদগুলি বাংলার পদাবলীসাহিত্যের অন্যতম উৎস।

পদাবলীর কয়েকখানি সংকলনগ্রন্থ আছে। তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি'। ইহা ১৭শ শতকের শেষভাগে সংকলিত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসী পর্যন্ত ৩০টি ক্ষণদা বা রাত্রিতে গান করিবার উপযুক্ত ৩১৫টি পদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে ৭টি পদ ২ বার ধরা হইয়াছে। তিনি মহেশ বসু, শংকর ঘোষ, বাসুদেব দত্ত, গঙ্গারাম, গিরিধর দাস, দামোদর, বিদ্যাবল্লভ প্রভৃতি মহাজনের পদ স্বীয় গ্রন্থে ধরিয়াছেন বলিয়াই ঐ সব কবি বিস্মৃতির গর্ভে লীন হন নাই। তিনি ৪৮ জন কবির ভণিতাযুক্ত ২৯৩টি ও ভণিতাহীন ২২টি পদ গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার এই সংগ্রহে দেখা যায় যে প্রত্যেক রাত্রিতে প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা, পরে নিত্যানন্দচন্দ্রিকা গাহিয়া কৃষ্ণলীলা আরম্ভ করা হইত। অন্য কোনও সংকলনে নিত্যানন্দচন্দ্রিকা গাহিবার রীতি দেখা যায় না।

দ্বিতীয় সংকলন হইতেছে রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত-সমুদ্র'। ইহাতে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বা হরিবল্লভের কোনও পদ নাই। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ৭৪৬টি পদের মধ্যে ২৭০টি গোবিন্দদাসের এবং ২২৮টি নিজের রচনা। রাধামোহন নিজে প্রতিভাবান কবি ছিলেন। রসশাস্ত্র অনুসারে যে যে পর্যায়ের পদ থাকা উচিত ছিল অথচ তিনি পান নাই, সেই সেই ভাব লইয়া তিনি পদ রচনা করিয়াছেন।

তৃতীয় সংকলন গ্রন্থ হইতেছে 'গীতচন্দ্রোদয়'। সংকলয়িতা নরহরি চক্রবর্তী ওরফে ঘনশ্যাম। তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্নাথের পুত্র। তাঁহার 'গীতচন্দ্রোদয়'-এর কেবলমাত্র পূর্বরাগবিষয়ক ১১৭০টি পদ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে ৮২৮টি পদই তাঁহার নিজের রচনা।

দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্তনামৃত' সম্ভবতঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই সংকলিত হইয়াছিল। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিপি-করা ঐ গ্রন্থের এক পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে ৪৯৪টি পদ আছে, তন্মধ্যে দীনবন্ধুর নিজের রচনা ২০৭টি পদ।

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌরসুন্দর দাস ১১১৯টি পদযুক্ত 'কীর্তনানন্দ' সংকলন করেন। ইহার মধ্যে মাত্র ৬০০ আন্দাজ পদ বনোয়ারীলাল গোস্বামী কোনও খণ্ডিত পুথি হইতে লইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮০০ এবং ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ইহার দুইখানি সম্পূর্ণ পুথি বরানগর পাট-বাড়িতে আছে।

পদাবলীর বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচারিত সংকলনগ্রন্থ হইতেছে বৈষ্ণবদাস ওরফে গোকুলানন্দ সেনের 'পদকল্পতরু'। ইহাতে ৩১০১টি পদ আছে; তন্মধ্যে সংকলয়িতার রচনা মাত্র ২৬টি। গোবিন্দদাসের ৪৬০টি, জ্ঞানদাসের ১৮৬টি ও রাধামোহন ঠাকুরের ১৮২টি পদও ইহাতে ধৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবদাস বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া পদগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও একজন সুগায়ক ছিলেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার সিউর গ্রামবাসী কমলাকান্ত দাস ৪৩টি তরঙ্গে ১৩৫৮টি পদ সংগ্রহ করিয়া 'পদরত্নাকর' সংকলন করেন। তাঁহার কিছু পূর্বে বা পরে নিমানন্দ দাস ২৭০০ পদ লইয়া 'পদরসসার' সংকলন করেন। ইহাতে এমন ৬৫০টি পদ আছে, যাহা 'পদকল্পতরু'তে পাওয়া যায় না। শিবরতন মিত্র মহাশয় প্রায় ১৪০০ পদের সংগ্রহগ্রন্থ 'পদমেরু' জোগাড় করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীমোহন দাস ৩৫১টি পদ লইয়া 'পদকল্পলতিকা' প্রকাশ করেন। ইহাতে শশিশেখর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি এমন কয়েকজন কবির পদও ধরা হইয়াছে যাঁহাদের রচনা 'পদকল্পতরু'তে স্থান পায় নাই। ১২৯২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় 'পদরত্নাবলী' সংকলন করেন। উহাতে ১১০টি অতি উৎকৃষ্ট পদ সংগৃহীত হইয়াছে। নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র ২৩৫৬টি পদ 'পদামৃত মাধুরী'তে সন্নিবিষ্ট করেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৬০০০ বৈষ্ণব পদ ছাপা হইয়াছে; কিন্তু বিভিন্ন পুথিশালায় আরও ৫-৬ হাজার পদ অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে।

দ্র সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত, শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ; মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত, শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী, কলিকাতা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা, ১৯৬১; বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৬১; Sukumar Sen, *A History of Brajabuli Literature*, Calcutta, 1935.

বিমানবিহারী মজুমদার

পদার্থবিদ্যা পুরাতন নাম 'প্রাকৃতিক দর্শন'। জড়-জগতের যে অংশ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা জানা যায়, প্রাকৃতিক দর্শনে তাহার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়াস এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-লব্ধ তথ্যগুলি গাণিতিক নিয়মে রূপায়িত ও বিধিবদ্ধ করিবার সুষ্ঠু প্রচেষ্টা দেখা যায়।

গণিতের নিয়মকানুন জড়পদার্থের গতিবিধিতে সর্বপ্রথম যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রী)। বহির্জগতে যে বিভিন্ন জড়পদার্থের সমাবেশ দেখা যায়, তাহাদের অবস্থান, গতিবেগের পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাকিলে ভবিষ্যতে তাহাদের অবস্থান ও গতিবেগ কি হইবে, নিউটনের গতিবিদ্যায় এ-প্রশ্নের মীমাংসা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে নিউটনের পূর্বেকার জ্যোতির্বিদ কেপ্‌লের (১৫৭১-১৬৩০ খ্রী) ও ইটালীর প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী গালিলেও (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রী)-র নাম স্মরণীয়। জড়পদার্থের তিনপ্রকার অবস্থা (যথা কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়), তাহাদের গুণাগুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জড়-পদার্থের সঞ্চলন শুধু নয়, তাহার কম্পনও প্রাকৃতিক দর্শনের আলোচ্য বিষয়। জড়পদার্থের কম্পাঙ্ক যখন সেকেণ্ডে প্রায় ৩০-২০০০০ হয়, তখন মানুষের কানে শব্দরূপে প্রকাশ পায়। পদার্থের প্রাথমিক কণা সম্বন্ধেও প্রাকৃতিক দর্শনে অনেক পরিকল্পনা দেখা যায়। আবার তাপ ও আলোক সম্বন্ধে অনুশীলন ও অনুসন্ধানের ফলে এক তরঙ্গবাদের প্রবর্তন হয়।

পদার্থবিদ্যার ইংরেজী প্রতিশব্দ ফিজিক্‌স। জড়-পদার্থের গুণাগুণ এবং জড় ও শক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ—এই বিষয়ের পরীক্ষালব্ধ ও যুক্তিমূলক যথাযথ অনুশীলন পদার্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। পদার্থবিদ্যা হইতে গতিবিদ্যা ও বলবিদ্যাকে (মেকানিক্‌স) বাদ দেওয়া যায় না, কারণ জড়পদার্থের গতিবিধি ও শক্তির আদানপ্রদান গতিবিদ্যা ও বলবিদ্যার দ্বারাই নিরূপিত হয়। এস্থলে বলা

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে জ্যোতির্বিদ্যাকে পদার্থবিদ্যার মধ্যে ধরা হয় না, যদিও একথা সত্য যে আকাশে জ্যোতিষ্করাজির উপর গতি ও বলবিদ্যার প্রয়োগে আশ্চর্য ফল পাওয়া গিয়াছিল।

পদার্থবিদ্যাকে মোটামুটি ৭টি বিভাগে ভাগ করা যায়: ১. গতিবিদ্যা ও বলবিদ্যা এবং পদার্থের সাধারণ ধর্মসম্বন্ধীয় বিদ্যা ২. শব্দবিজ্ঞান ৩. তাপবিদ্যা ৪. আলোক-বিজ্ঞান ৫. চুম্বকবিজ্ঞান ৬. তড়িৎবিজ্ঞান ৭. তড়িৎ-চৌম্বকবিজ্ঞান। আধুনিক কালে আরও কতকগুলি বিষয় পদার্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে: ৮. পদার্থের গঠনতত্ত্ব ৯. আপেক্ষিকবাদ ১০. কেন্দ্রকবিদ্যা ১১. কঠিন অবস্থা সম্পর্কিত পদার্থবিদ্যা ১২. 'প্লাজ্‌মা' (Plasma)-সংক্রান্ত পদার্থবিদ্যা।

পদার্থবিদ্যার প্রথম বিভাগে গতি ও বলবিদ্যা আলোচিত হয় এবং জড়পদার্থের বিভিন্ন গুণাগুণ ও ধর্ম, যথা বস্তুমান বা ভর, জাড্য (ইনার্শিয়া), স্থিতিস্থাপকতা, আসঞ্জন (অ্যাঢেশন), সংসক্তি (কোহেশন), সান্দ্রতা (ভিস্‌কোসিটি) প্রভৃতি গুণাগুণের অনুশীলন করা হয়। জড়পদার্থের কম্পনে শব্দের উৎপত্তি এবং জড়পদার্থের মাধ্যমেই শব্দতরঙ্গের সংক্রমণ। শ্রাব্য স্পন্দনাঙ্ক অপেক্ষা অধিক স্পন্দনাঙ্কের কম্পন মানুষের শ্রুতিগ্রাহ্য নয়। ইংরেজীতে এই 'না-শোনা' শব্দকে 'আলট্রাসনিক্‌স' বলা হয়। শব্দবিজ্ঞানে শব্দের ও 'না-শোনা' শব্দের কম্পন এবং তজ্জনিত শক্তির সঞ্চরণ প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়। পদার্থের অণু-পরমাণুর ইতস্ততঃ সঞ্চলনের ফলে যে চলৎ-শক্তি (কাইনেটিক এনার্জি) উৎপন্ন হয়, তাহা তাপশক্তিতে রূপান্বিত হয়; পদার্থবিদ্যার তৃতীয় বিভাগে এই তাপশক্তির পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণের বিশেষ চর্চা করা হয়। আলোকবিজ্ঞানে আলোকতত্ত্ব এবং আলোকের বিভিন্ন ব্যবহার, যথা সরল-রৈখিক গতি, প্রতিফলন, প্রতিসরণ, প্রতিকিরণ (স্ক্যাটারিং), ব্যতিচার (ইণ্টারফেরেন্স), বিচ্ছুরণ (ডিস্‌পার্শন) অপবর্তন বা ব্যবর্তন (ডিফ্র্যাক্‌শন), সমবর্তন (পোলারিজেশন) প্রভৃতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। নিউটন আলোককে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বেগবান (গতিবেগ শূন্যে বা বায়ুতে ৩×১০⁸ মিটার) কণার সমষ্টি বলিয়া মনে করিতেন। এই কণাবাদে আলোকের কতকগুলি কার্যকলাপের ব্যাখ্যা হইলেও আলোকের অন্যান্য ব্যবহার, যেমন ব্যতিচার, অপবর্তন ও সমবর্তনের ব্যাখ্যা কণাবাদের সাহায্যে করা যায় না। প্রতিকিরণ ও বিচ্ছুরণের ব্যাখ্যাতেও কণাবাদ অচল। হল্যাণ্ডদেশীয় বিজ্ঞানী হাইজেন্‌স (১৬২৯-৯৫ খ্রী), ইংরেজ বিজ্ঞানী ইয়াংগ (১৭৭৩-১৮২৯ খ্রী) ও ফরাসী বিজ্ঞানী ফ্রেনেল (১৭৮৮-১৮২৭ খ্রী) আলোকবিজ্ঞানে তরঙ্গবাদের প্রবর্তন করেন। ইঁহাদের মতে কাল্পনিক 'ঈথার'-এর মাধ্যমে তাপ ও আলোকের তরঙ্গ উৎস হইতে বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হয়। এই তরঙ্গবাদের সাহায্যে তখনকার মত তাপ ও আলোকের সকল কার্যবৈশিষ্ট্যই সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। কিন্তু 'ঈথার' সত্য সত্যই কাল্পনিক; ইহার বাস্তব সত্তার সন্ধান সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

পদার্থবিদ্যার পঞ্চম বিভাগ, চুম্বকবিজ্ঞানের সূচনা হয় ৭০০ বৎসর পূর্বে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম গিলবার্ট এবিষয়ে অনেক গবেষণা করেন। পদার্থবিদ্যার ষষ্ঠ বিভাগ—তড়িৎ বিজ্ঞানের প্রধানতঃ দুইটি উপবিভাগ—স্থির-বিদ্যুৎবিজ্ঞান ও চল-বিদ্যুৎবিজ্ঞান। নিউটনের বলবিদ্যা ও গাণিতিক বিধিনিয়ম তড়িৎবিজ্ঞানে প্রয়োগ করেন বিজ্ঞানী কুলম্ব। তখন হইতেই তড়িৎ-বিজ্ঞানে সূক্ষ্মতত্ত্বীয় বিদ্যায় পর্যবসিত হয়। মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭ খ্রী) তড়িৎবিজ্ঞানে বহু যুগান্তকারী গবেষণা করেন। পদার্থবিদ্যার সপ্তম বিভাগ তড়িৎ-চৌম্বকবিজ্ঞান। ফরাসী বিজ্ঞানী আঁদ্রে মারি আঁপেয়ার (Andre Marie Ampere, ১৭৭৫-১৮৩৬ খ্রী) এই তড়িৎ-চৌম্বকবিজ্ঞানের প্রবর্তক। বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে চৌম্বক বলের সৃষ্টি—বিজ্ঞানী ওএরস্টেড (Oersted)-এর এই আবিষ্কারেই তড়িৎ-চৌম্বক-বিজ্ঞানের সূচনা। চল-বিদ্যুতের প্রভাবে চৌম্বক বলের প্রকাশ এবং চৌম্বক বলের প্রভাবে চলমান তারের 'কয়েল'-এ বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎপত্তি—তড়িৎ ও চুম্বকত্বের এইরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধই এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

ইংরেজ পদার্থবিদ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-৭৯ খ্রী) তড়িৎ-চৌম্বকবিজ্ঞানে গণিতের সাহায্যে এক অভিনব তত্ত্বের অবতারণা করেন। ইহারই নাম তড়িৎ-চৌম্বকতত্ত্ব (ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেটিক থিয়োরি)। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, যখনই কোনও বৈদ্যুতিক আধান (চার্জ) ত্বরান্বিত হয় তখনই এক তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং এই তরঙ্গের গতিবেগ আলোকের গতিবেগের সমান। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী হাইন্‌রিখ হার্ৎজ সত্য সত্যই তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া ম্যাক্সওয়েলের গাণিতিক সিদ্ধান্তকে বাস্তবে পরিণত করেন। হার্ৎজ-এর প্রদর্শিত তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গই বেতারতরঙ্গ। এ কথা আজ সর্ববাদিসম্মত যে

বেতারতরঙ্গ, তাপতরঙ্গ, আলোকতরঙ্গ, এক্‌স-রে, গামা-রশ্মি এসকলই তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ, কেবল ইহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা স্পন্দনাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন। এই নূতন তরঙ্গবাদে ইথারের বস্তুগত সত্তা স্বীকারের কোনও প্রয়োজন নাই; কেবল তাহার জ্যামিতিক সত্তাকে স্বীকার করিয়া ম্যাক্স-ওয়েল তাঁহার তড়িৎচৌম্বক তত্ত্বের কতকগুলি নিয়মসূত্র প্রবর্তিত করেন।

১৯শ শতকের শেষভাগে ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী জে. জে. টম্‌সন কর্তৃক পদার্থের সূক্ষ্মতম ঋণ-বিদ্যুতের কণা আবিষ্কৃত হয়। হল্যাণ্ডের বিখ্যাত পদার্থবিদ লোরেন্‌জ (১৮৫৩-১৯২৮ খ্রী) তাঁহার ইলেক্‌ট্রন-তত্ত্বে পূর্বোক্ত ম্যাক্সওয়েলের নিয়মসূত্রগুলির যথোপযোগী পরিবর্তন করেন। সমবেগ-সম্পন্ন সকল ক্ষেত্রেই ম্যাক্সওয়েল-লোরেন্‌জের নিয়মসূত্র-গুলির স্বরূপ সমতুল্য থাকে, লোরেন্‌জ তাহা প্রমাণ করেন। আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫ খ্রী) তাঁহার আপেক্ষিকবাদে এই একই সিদ্ধান্তের ভিন্ন প্রমাণ দিয়াছিলেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যার চিন্তাধারায় সংশয় ও সংকট উপস্থিত হয়। আলোকতরঙ্গের সহিত বস্তুর পরমাণুগুলির ঘাত-সংঘাতের ফলে নিউটনের গতি ও বলবিদ্যার এবং ম্যাক্সওয়েল-লোরেন্‌জের তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের বিধি-নিয়মগুলি হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, পরীক্ষায় দেখা যায় তাহার বিপরীত। এই সংকটেই প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী মাক্স প্লাঙ্ক (১৮৫৮-১৯৪৭ খ্রী) তাঁহার কণাতমতত্ত্ব (কোয়াণ্টাম থিয়োরি) প্রচার করেন। আলোক বিজ্ঞানের অনেক তথ্য তরঙ্গবাদের অনুকূলে হইলেও, যখনই আলোক ও পরমাণুর সঙ্গে শক্তির আদানপ্রদান হয় তখন তরঙ্গবাদের সাহায্যে পরীক্ষিত সত্যের কোনও মীমাংসাই হয় না। আলোককে তখন শক্তিকণার সমষ্টিরূপে কল্পনা করিবার প্রয়োজন হয়। প্লাঙ্কের কণাতমতত্ত্ব দীপ্যমান বিভিন্ন বস্তু হইতে উৎসারিত আলোকের বর্ণালী সম্বন্ধে বহু অমীমাংসিত তথ্যের সমাধানসাধনে সমর্থ হয়। কণাতমতত্ত্ব প্রচলিত হইলেও আলোকের ব্যতিচার, অপবর্তন, সমবর্তন প্রভৃতির সুষ্ঠু ব্যাখ্যার জন্য একই সঙ্গে তরঙ্গবাদকেও মানিতে হইয়াছিল। পরে যখন টম্‌সন, ডেভিসন, গার্মার প্রভৃতি পদার্থবিদ্‌গণ তাঁহাদের পরীক্ষায় গতিবান ইলেক্‌ট্রনকে তরঙ্গধর্মী বলিয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করিলেন, তখন তত্ত্বের দিক দিয়া ১৯২২-২৬ খ্রীষ্টাব্দে লুই দ্য ব্রোগ্‌লি, হাইসেন্‌বের্গ, ডিরাক্‌ প্রভৃতি তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের প্রবর্তিত তরঙ্গ ও কণাতম বলবিদ্যায় (ওয়েভ অ্যাণ্ড কোয়াণ্টাম্‌ মেকানিক্‌স) কণা ও তরঙ্গকে একীভূত করিয়া দেখিলেন। এই নূতন কণাতরঙ্গবাদে পূর্বতন পদার্থবিদ্‌গণের কার্যকারণসম্বন্ধ, হেতুবাদ অথবা নির্দেশবাদের স্থান নাই। সমষ্টিগত বিচার ও সম্ভাব্যতা এই নূতন মতবাদের প্রধান কথা।

আধুনিক পদার্থবিদ্যায় পদার্থের গঠনতত্ত্ব বিজ্ঞানী জে. জে. টম্‌সন, রাদারফোর্ড (১৮৭১-১৯৩৭ খ্রী), নীল্‌স বোর (১৮৮৫-১৯৬২ খ্রী) প্রভৃতি পদার্থবিদ্‌গণের গবেষণার ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরমাণু সম্বন্ধে রাদারফোর্ড-বোরের পরিকল্পনায় অনেক তথ্যের মীমাংসা পাওয়া যায়। ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে নিঃসৃত আল্‌ফা ও বিটা কণা এবং গামারশ্মি বহু পূর্বেই আবিষ্কৃত হয়। ক্রমে অন্যান্য অনেক প্রাথমিক কণার সন্ধান পাওয়া যায়, যথা নিউট্রন, পজিট্রন, মেসন প্রভৃতি। পরমাণুর গঠনতত্ত্ব পদার্থবিদ্যার একটি বিশেষ অধ্যায়।

১৯০৫ হইতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই আল্‌বার্ট আইন-স্টাইন তাঁহার বিশিষ্ট ও সাধারণ আপেক্ষিকবাদ প্রচার করিয়া বিজ্ঞানজগতে এক নূতন যুগ আনয়ন করেন। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ লইয়া যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ত্রৈমানিক জগৎ, আইনস্টাইনের বিশিষ্ট আপেক্ষিকবাদে সেইরূপ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ ও সময় লইয়া চাতুর্মানিক জগৎ। সাধারণ আপেক্ষিকবাদে মহাকর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন পরিকল্পনায় অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা পাওয়া যায়। পরীক্ষামূলক কয়েকটি সিদ্ধান্ত আইনস্টাইনের তত্ত্বকে সমর্থন করে। আপেক্ষিকবাদে জড় ও শক্তির সমতুল্যতা প্রমাণিত হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারী পরমাণু-কেন্দ্রকের বিভাজন অটো হান ও স্ট্রাস্‌মান-এর পরীক্ষায় বাস্তবে পরিণত হয়, তখন আইনস্টাইনের জড় ও শক্তির সমতুল্যতাসূচক সূত্রটির প্রয়োগে পরমাণুকেন্দ্রক হইতে প্রচণ্ড শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছিল।

পরমাণুকেন্দ্রকের গঠনতত্ত্ব ও আনুষঙ্গিক বহু বিষয় আধুনিক পদার্থবিদ্যার এক বিশেষ অধ্যায়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী অ্যাস্টন আইসোটোপ আবিষ্কার করেন; পরে বিভিন্ন পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ বৎসরেই রাদারফোর্ড সি. টি. আর. উইল্‌সন-এর মেঘ-প্রকোষ্ঠে সর্বপ্রথম পদার্থের রূপান্তর প্রদর্শন করেন। পরে যখন লরেন্স-এর সাইক্লোট্রন যন্ত্র, ককরফ্‌ট ও ওয়াল্‌টন-এর ত্বরণ যন্ত্র এবং বেভাট্রন প্রভৃতি শক্তিশালী যন্ত্র নির্মিত হয়, তখন ইহাদের সাহায্যে পরমাণুকেন্দ্রক চূর্ণ করিয়া পদার্থের বিভিন্ন রূপান্তর সম্ভব হয়। ইরেন জোলিও-কুরি ও তাঁহার স্বামী ফ্রেদেরিক জোলিও-কুরি এই সময়ে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার

করেন। অটো হান্ ও স্ট্রাস্‌মান কর্তৃক ভারী পরমাণু-কেন্দ্রকের বিভাজন পারমাণবিক বোমার সৃষ্টি করিল। কেন্দ্রক-বিভাজন এবং কেন্দ্রক-সংযোজন ক্রিয়ায় অধিকতর শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমাও তৈয়ারি করা সম্ভব হইল। এতদ্ব্যতীত বহু সৃজনমূলক কাজও সম্ভব হইয়াছে। পরমাণুকেন্দ্রকের শক্তি হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। জলযান, ট্রেন ও বিমানের এঞ্জিনেও এই শক্তি ব্যাপক ব্যবহারের আশা আছে।

আধুনিক পদার্থবিদ্যার আরও দুইটি শাখা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—কঠিনাবস্থা-সংক্রান্ত পদার্থবিদ্যা ও 'প্লাজ্‌মা'-সম্পর্কিত পদার্থবিদ্যা। পদার্থের কঠিন অবস্থার নানা তথ্য ও তত্ত্ব লইয়া প্রথম শাখাটি অতি দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। 'প্লাজ্‌মা' বিজ্ঞানে সম্প্রতি বহু তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক গবেষণার সূচনা হইয়াছে। যদি কোনও গ্যাসীয় পদার্থকে আংশিকভাবেও আয়নিত করা যায়, তবে এই গ্যাসে সমান সংখ্যায় ধন ও ঋণ-আত্মক বিদ্যুৎযুক্ত আয়নের সৃষ্টি হয়। ফলে সমষ্টিগতভাবে এই গ্যাসে কোনও বিদ্যুতের লক্ষণ থাকে না। এইরূপ শূন্য বৈদ্যুতিক আধানের আয়নিত গ্যাসকেই মোটামুটিভাবে বলা হয় 'প্লাজ্‌মা'। ইহাকে কখনও কখনও পদার্থের চতুর্থ অবস্থাও বলে।

এই প্রবন্ধে বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যার কথাই সংক্ষেপে বলা হইল। ভারতে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন শব্দ ও আলোক-বিজ্ঞানে বহু মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। 'রমন-এফেক্ট' আবিষ্কারের জন্য তাঁহাকে 'নোবেল' পুরস্কার দেওয়া হয়। জ্যোতিষ্ক-সংক্রান্ত পদার্থবিদ্যায় মেঘনাদ সাহার নাম সর্বজনবিদিত। তাঁহার তাপ-আয়নন তত্ত্ব পদার্থ-বিদ্যায় নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। আমেরিকাপ্রবাসী অধ্যাপক এস. চন্দ্রশেখরের নামও জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিসংখ্যানবিজ্ঞানে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদান প্রথম শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইয়াছে; আধুনিক তত্ত্বীয় বিজ্ঞানে তাঁহার গবেষণা গভীর রেখাপাত করিয়াছে। মহাজাগতিক রশ্মির 'বর্ষণ' সম্বন্ধে হোমি ভাবা বহু তত্ত্বীয় গবেষণা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; পরমাণু ও তাহার কেন্দ্রক-সম্পর্কিত গবেষণার সঙ্গে তাঁহার সক্রিয় যোগ ছিল। চুম্বক-বিজ্ঞানে কারিয়ামাণিক্যম শ্রীনিবাস কৃষ্ণন -এর অবদান বিশেষ সমাদর লাভ করে। শিশিরকুমার মিত্র বেতারবিজ্ঞানে আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। পরমাণু ও পদার্থের প্রাথমিক কণার বিষয়ে দেবেন্দ্রমোহন বসুর গবেষণাও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

পদ্ম নিম্‌ফীয়াসিঈ গোত্রের (Family-Nymphaeaceae) অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম নেলম্‌বিয়ম স্পেসিও-সম (*Nelumbium speciosum*)। পদ্ম জলে হয়। ইহার রাইজোম-জাতীয় কাণ্ড মাটির নীচে থাকে। এই রাইজোম হইতে দীর্ঘ বৃন্তযুক্ত পাতা ও ফুল বাহির হইয়া জলের উপর ভাসে। পাতা বৃহৎ ও গোলাকৃতি। ফুল বৃহৎ এবং বহু পাপড়িযুক্ত। ফুলের রং লাল, গোলাপী বা শাদা হইয়া থাকে। পাতা ও ফুলের বৃন্তে একপ্রকার তন্তু বর্তমান।

পদ্মের মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফুলের বৃন্ত এবং বীজ ভারতের নানা অঞ্চলে খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। পদ্মের ফুল হিন্দুর নিকট পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। ইহা ভারতের জাতীয় পুষ্প হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। পাতা ও ফুলের বৃন্ত হইতে লব্ধ তন্তুর দ্বারা বহু হিন্দু মন্দিরে প্রদীপের সলিতা তৈয়ারি হয়। গাছের রস সেবনে বসন্ত, ঘাম প্রভৃতি রোগে আরাম হয়। বমি বন্ধ করিবার জন্য বীজ ব্যবহৃত হয়। মূলের রস চর্মরোগের ঔষধরূপে পরিচিত। দগ্ধ অঙ্গে অথবা ফোড়া প্রভৃতি হইতে রক্তপাত বন্ধ করিতে পাতা ও ফুলের বৃন্ত থেঁতলাইয়া লাগানো হয়।

তারাপদ চট্টোপাধ্যায়

পদ্মনাভ[১] ভারতীয় গণিতবিদ্। ইনি একখানি বীজ-গণিত গ্রন্থের প্রণেতা। সম্ভবতঃ ইনি খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার প্রণীত বীজগণিত এখন পাওয়া যায় না। ইনি দ্বিঘাত সমীকরণের দুইটি বীজের অস্তিত্ব অবগত ছিলেন। ভাস্করাচার্য তৎপূর্ববর্তী পদ্মনাভের প্রদত্ত দ্বিঘাত সমীকরণের দুইটি বীজ নির্ণয়-প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন।

কামিনীকুমার দে

পদ্মনাভ[২] সনাতন ও রূপ গোস্বামীর প্রপিতামহ। ইঁহারা ছিলেন কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞের বংশ। ছোট ভাই হরিহর পিতৃসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করায় রূপেশ্বর সস্ত্রীক গৌড়দেশে চলিয়া আসেন এবং স্থানীয় ভূস্বামীর কাছে পঞ্চগ্রাম ব্রহ্মত্র পাইয়া শিখরভূমিতে (পঞ্চকোট অঞ্চলে) নিবাস করেন। সেইখানে পুত্র পদ্মনাভের জন্ম হয়। পদ্মনাভ জগন্নাথের ভক্ত ছিলেন। পরে শিখরভূমি ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে কাটোয়ার উত্তরে ও ঝামটপুরের অদূরে 'নবহট্টক' (নৈহাটি) গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পদ্ম-নাভের চতুর্থ পুত্র কুমার 'নবহট্টক' ছাড়িয়া আসিয়া আধুনিক নৈহাটির সন্নিকটে কুমারহট্টে বাস করিতে

থাকেন। কুমারের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সনাতন, চতুর্থ রূপ এবং কনিষ্ঠ বল্লভ (নামান্তর অনুপম)। বল্লভের পুত্র জীব গোস্বামীই ভাগবতের টীকায় এই বংশ-পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

দ্র সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড : পূর্বার্ধ, কলিকাতা, ১৯৬৩।

সুকুমার সেন

পদ্মপুরাণ পুরাণ দ্র

পদ্মসম্ভব খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের ভারতীয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য এবং তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মূলতঃ তিব্বতীয় সূত্র হইতেই পদ্মসম্ভবের ইতিহাস সংগৃহীত। আচার্য শান্তরক্ষিতের পরামর্শে তিব্বতের রাজা ঠী-স্রোং-দে-চাঙ্ মন্ত্রী সাল নাং-কে প্রেরণ করিয়া মহাতান্ত্রিক গুরু পদ্মসম্ভবকে নেপাল হইতে তিব্বতে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন। তিনি অবিলম্বে স্বীয় অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রয়োগে প্রতিপক্ষীয় যক্ষ-রক্ষ-গোষ্ঠীকে পর্যুদস্ত করিয়া তাহাদের বৌদ্ধধর্মের বশংবদ করেন।

তান্ত্রিক মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও তিব্বতের পুরাতন 'পোঙ্'ধর্মের সমন্বয়ে পদ্মসম্ভব যে বৌদ্ধ লামাধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তীকালে তিব্বতে 'ঞীং-মা-পা' শাখায় তাহা রূপান্তরিত হয়। এই ধর্মাবলম্বীদের নিকট পদ্মসম্ভব স্বয়ং বুদ্ধের সমপর্যায়ভুক্ত ও সমপূজ্য।

তিব্বতীয় বিবরণ অনুসারে, পদ্মসম্ভব প্রখ্যাত তন্ত্রাচার্য 'উ-জাঙ্' রাজ ইন্দ্রভূতির পুত্র। সেই দেশের এক পুণ্য সরোবরে পদ্মপত্রে আসীন এই দেবোপম অষ্টমবর্ষবয়স্ক বালকটিকে ইন্দ্রভূতি অলৌকিক উপায়ে প্রাপ্ত হন, সেই কারণেই তাঁহার নাম হয় পদ্মসম্ভব।

তিব্বতের প্রথম ঐতিহাসিক বৌদ্ধবিহার 'সাম্-য়াই'-এর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পদ্মসম্ভবের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠকীর্তি। প্রচলিত কাহিনীমতে শান্তরক্ষিত ভারতীয় বৌদ্ধবিহার ওদন্তপুরীর অনুকরণে 'সাম্-য়াই' বিহার পরিকল্পনা করেন। উভয় গুরুর যুক্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এই বিহার বস্তুতঃ তিব্বতে প্রথম বৌদ্ধদীক্ষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র-অনুবাদের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

পদ্মসম্ভবের রচিত গ্রন্থাবলী : তান-জুর সংগ্রহে পদ্মসম্ভবের নামে প্রায় ২০টি গ্রন্থ আছে।

দ্র E. Obermiller, *A History of Buddhism—Buston*, parts I & II, Heidelberg, 1931-32 ; G. N. Roerich, *The Blue Annals*, vols. I & II, Calcutta, 1949 & 1953.

অলকা চট্টোপাধ্যায়

পদ্মা ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের নদী। রাজমহলের নিকট (২৪°৩৫´ উত্তর ও ৮৮°৫´ পূর্ব) গঙ্গা দ্বিধাবিভক্ত হয় ও উহার একটি প্রবাহ পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। ইহাই পদ্মানদী। রেনেল ও কৃত্তিবাস ইহাকেই গঙ্গা বলিয়াছেন। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতক হইতে এই পদ্মা নদীর সূত্রপাত। সিহাবুদ্দিন তালিস ও মির্জা নাথন গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলকে পদ্মার শেষবিন্দু বলিয়া মনে করেন। আবুলফজলের মতে কাজিহাটার কাছে গঙ্গা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পদ্মাবতী নামে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। পদ্মা রাজশাহী ও পাবনা জেলার দক্ষিণ দিয়া উভয় বঙ্গের সীমা নির্দেশ করিয়া প্রবাহিত হয়। কুষ্টিয়ার নিকট এই নদী পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। পদ্মা এখন অনেকটা দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত প্রবাহ এখন পূর্বাপেক্ষা আরও দক্ষিণ-পূর্বে গিয়া চাঁদপুরের অদূরে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজমহল হইতে মেঘনা পর্যন্ত পদ্মার দৈর্ঘ্য ৩৬০ কিলোমিটার।

দ্র S. C. Majumdar, *Rivers of Bengal Delta*, Calcutta, 1942.

অনিন্দ্যকুমার পাল

পদ্মিনী মেবারের অধিপতি রাওয়ল রতনসিংহের রানী। প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী অনুসারে আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে পদ্মিনীর অনন্য-সাধারণ রূপের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্যই দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন। কিন্তু কোনও কোনও ঐতিহাসিক পদ্মিনী-সংক্রান্ত এই কাহিনীটি বিশ্বাস করেন না, কারণ তাঁহাদের মতে কোনও সমসাময়িক লেখক এইরূপ কাহিনীর উল্লেখ করেন নাই এবং ইহার প্রথম উল্লেখ দেখা যায় পরবর্তীকালে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে মালেক মহম্মদ জায়সীর রচিত 'পদুমাবৎ'-এ ; কিন্তু ইহা ইতিহাস নয়, উপাখ্যানমাত্র।

রাজপুত চারণগণের মতে পদ্মিনীর জন্যই আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ; আবুল ফজল, ফেরিশ্‌তা, নৈন্‌সি এবং হাজি-উদ্-দবিরের মত পরবর্তী লেখকগণও এই মতের

সমর্থক। এই মতের সপক্ষে বিশ্বস্ত কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান না থাকিলেও সমসাময়িক কালের অন্ততঃ একটি লেখার মধ্যে যে পদ্মিনী-উপাখ্যানের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ইহা অস্বীকার করা কঠিন। কবি ও ঐতিহাসিক আমীর খুসরৌ চিতোর অভিযানে আলাউদ্দীনের সহিত ছিলেন। তাঁহার রচিত খজাইন্-উল্-ফতুতে আলাউদ্দীনের সহিত ইথিওপিয়ার রাজা সলোমনের তুলনায় এবং রানী সেবা-র উল্লেখ হইতে পদ্মিনীর উপাখ্যানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহম্মদ জায়সী ইহা হইতে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রায় ৭ মাস অদম্য বীরত্বে রাজপুতগণ চিতোর দুর্গ রক্ষা করেন। পরাজয় আসন্ন দেখিয়া রাজপুত রমণীগণ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দেন এবং আলাউদ্দীন চিতোর অধিকার করেন (আগস্ট, ১৩০৩ খ্রী)।

দ্র গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা, রাজপুতানেকা ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আজমীর, ১৯৩১ ; J. Tod, *Annals and Antiquities of Rajasthan*, vol. 1, Calcutta, 1877; M. Nainsi, *Khyat*, vol. I, J. Briggs, tr. *History of the Rise of the Mohamedan Power in India*, vol. I, Calcutta, 1966.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

পনজী, পান্‌জিম (১৫°৩০′ উত্তর ও ৭৩°৫৭′ পূর্ব) কেন্দ্রশাসিত গোয়া, দমান ও দীউ অঞ্চলের রাজধানী। বর্তমান আয়তন প্রায় ৪.২ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৩৫৪৬৮ (১৯৬০ খ্রী)। গোয়া দ্বীপের পশ্চিমাংশে মাণ্ডভি নদীর দক্ষিণ তীরে সমতলভূমিতে নয়নাভিরাম পনজী শহরটি অবস্থিত। পশ্চিমে আগুয়াদা উপসাগর। শহরটি পৌরশাসনের অন্তর্গত। পুরাতন দুর্গে অবস্থিত গভর্নরের প্রাসাদ, হাইকোর্ট প্রভৃতি দর্শনীয়। পার্শ্বে অবস্থিত গ্যাস্পারডিয়াস সমুদ্রসৈকত, প্রায় ১৩ কিলোমিটার দূরবর্তী বিখ্যাত বোম জেসাস্-এর ব্যাসিলিকা নামক গির্জা এবং প্রায় ১৬ কিলোমিটার দূরবর্তী শ্রীমঙ্গেশের মন্দির প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। 'গোয়া, দমান, দীউ' দ্র।

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

পন্থ, গোবিন্দবল্লভ (১৮৮৭-১৯৬০ খ্রী) উত্তর প্রদেশের অন্যতম প্রধান কংগ্রেসনেতা। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশের আলমোড়া জেলায় তাঁহার জন্ম। এলাহাবাদের মুর সেন্ট্রাল কলেজ ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে আইন-পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি নৈনীতালে আইন-ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পন্থ কুমায়ুন পরিষদগঠনে অংশগ্রহণ করেন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনের সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুক্তপ্রদেশের বিধান পরিষদের সভ্যপদে বৃত হন এবং ১৯২৩ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুক্তপ্রদেশ বিধান পরিষদে তিনি স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন ও সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলনে পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতররূপে আহত হন। ১৯৩০ হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনে যুক্ত থাকায় পন্থ দুইবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পন্থ কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস দলের সহকারী নেতা হন। ১৯৩৭-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পন্থ যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সংক্রান্ত বিষয়ে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে কংগ্রেসের মতপার্থক্য হইলে পদত্যাগ করেন। ১৯৪০ ও ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে পন্থ দুইবার দেশের জন্য কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গণপরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন। পন্থ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় একাদিক্রমে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যপদে আসীন থাকেন। স্বাধীনতার পর তিনি পুনরায় যুক্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন। যুক্তপ্রদেশে জমিদারিপ্রথা-উচ্ছেদ ও ভূমিসংস্কার-মূলক আইন প্রণয়নে তিনি সময়োচিত নেতৃত্ব দান করেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত অবস্থায় দিল্লীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অশোক মুস্তাফি

পরকীয়াতত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে পরকীয়াতত্ত্বের কথা বলেন, তাহা কৃষ্ণের সহিত রাধার সম্বন্ধ লইয়া; তাঁহারা কখনও পরস্ত্রী লইয়া সাধনা করার কথা বলেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, 'পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥' ('চৈতন্যচরিতামৃত', ১।৪)। বামাচারী তান্ত্রিকেরা, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়ারা ও বাউলেরা পরস্ত্রীকে উত্তরসাধিকা করিয়া সাধনা করেন। কেহ কেহ বলেন যে, পরকীয়াবাদের মূল ছান্দোগ্যোপনিষদের (২।১৩) বামদেব্য সামোপাসনার মধ্যে পাওয়া যায়।

রূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি'-তে (১।১৯-২১) লিখিয়াছেন যে উপপতিরূপেই শৃঙ্গাররসের শ্রেষ্ঠ

অভিব্যক্তি। তিনি ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যে রতির জন্য লোকতঃ ও ধর্মতঃ বহু নিবারণ, যে রতিতে পরস্পরের প্রচ্ছন্ন-কামুকতা এবং পরস্পরের দর্শন-স্পর্শন ও সম্ভাষণাদি বিষয়ে দুর্লভতা থাকে, তাহাই পরমা রতি। তিনি আরও বলেন যে, রসশাস্ত্রে যে উপপতির ভাবের নিন্দা দেখা যায় তাহা সাধারণ প্রাকৃত নায়ক বিষয়ে প্রযোজ্য, পরতত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নহে। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও বৃহৎ বামনপুরাণে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া সম্বন্ধের কথা লেখা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার সহিত কৃষ্ণের বিবাহের বর্ণনা আছে। বোপদেব 'মুক্তাফল'-এ গোপীভাব জারসম্বন্ধীয় বলিয়া উহাকে উচ্চস্থান দেন নাই। জীব গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি'র টীকায় স্বকীয়াবাদের ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পরকীয়াবাদের কথা বলিয়াছেন। জীব গোস্বামী বলেন যে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-দাম্পত্য সম্বন্ধ। তিনি 'গৌতমীয়তন্ত্র, ও 'গোপালতাপনী হইতে শ্লোক তুলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের পতি। নিত্যলীলায় রাধাকৃষ্ণ দম্পতী; প্রকটলীলায় যে রাধার পরকীয়াত্ব দেখা যায়, তাহা যোগমায়ার কার্য। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি গোপীদের স্বামী হইতেন, তাহা হইলে রাজা পরীক্ষিৎ ভাগবতে 'পরদারাভিমর্ষণের' প্রশ্ন তুলিতেন না।

দ্র উজ্জ্বলনীলমণি; বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান; কলিকাতা, ১৯৫৯।

বিমানবিহারী মজুমদার

পরজীবী উদ্ভিদ অন্য জীবিত উদ্ভিদ হইতে খাদ্য গ্রহণকারী উদ্ভিদ। কোনও কোনও উদ্ভিদ সম্পূর্ণরূপে পরজীবী। ইহাদের সালোকসংশ্লেষ (ফোটোসিন্‌থেসিস) দ্বারা খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা নাই; ইহারা খাদ্যের জন্য অন্য উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। স্বর্ণলতা বা আলোকলতা সম্পূর্ণভাবে পরজীবী। ইহার পত্রবিহীন, শীর্ণ স্বর্ণাভ শাখাপ্রশাখা আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের দেহ বেষ্টন করিয়া থাকে এবং শোষকমূলের সাহায্যে তাহার দেহ হইতে খাদ্যরস শোষণ করে, ফলে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদটি ক্রমে দুর্বল হইয়া মরিয়া যায়। আন্দালাস (সুমাত্রা) দ্বীপের উদ্ভিদ রাফ্‌ক্লেসিয়া আরনোল্‌দি *(Rafflesia Arnoldi)* আর একটি সম্পূর্ণ পরজীবী উদ্ভিদ। ইহার পত্রহীন সূক্ষ্ম শাখা অন্য উদ্ভিদের মূল হইতে খাদ্য শোষণ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইহার ফুল অতি বৃহৎ—ব্যাস ৪৫-৯০ সেন্টিমিটার ও ওজন প্রায় ৯ কিলোগ্রাম।

কতকগুলি উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ দ্বারা যে খাদ্য উৎপাদন করে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কম; অন্য উদ্ভিদের উপর পরজীবী হইয়া তাহাদের এই অভাব পূরণ করিতে হয়। এরূপ আংশিক পরজীবী উদ্ভিদের অন্যতম দৃষ্টান্ত শ্বেতচন্দন গাছ ('চন্দন' দ্র)। শ্বেতচন্দন গাছ মূলের সাহায্যে মাটি হইতে খাদ্যগ্রহণ করে, আবার শোষকমূল দ্বারা অন্য উদ্ভিদের মূল হইতেও রস শোষণ করে। আম ও অন্যান্য গাছের উপর লোরান্‌থস নামে একটি আংশিক পরজীবী উদ্ভিদ জন্মায়। সবুজ পাতার সাহায্যে ইহা নিজ খাদ্য প্রস্তুত করে, আবার শোষকমূলের সাহায্যে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের দেহ হইতেও খাদ্যরস শোষণ করে।

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

পরভোজী উদ্ভিদ যেসকল উদ্ভিদ নিজ খাদ্য উৎপাদন করিতে পারে না তাহাদের পরভোজী উদ্ভিদ (হেটেরো-ফাইট) বলা হয়। খাদ্যের জন্য ইহাদের অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। যেসকল পরভোজী উদ্ভিদ অন্য জীবিত উদ্ভিদ হইতে খাদ্য শোষণ করে, তাহাদের পরজীবী উদ্ভিদ বলে ('পরজীবী উদ্ভিদ' দ্র)। ছত্রাক ও অন্যান্য যেসকল পরভোজী উদ্ভিদ পচনশীল জৈব পদার্থ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, তাহাদের মৃতজীবী উদ্ভিদ বলা হয় ('ছত্রাক' দ্র)। কোনও কোনও পরভোজী উদ্ভিদ ক্ষুদ্র পতঙ্গ ধরিয়া আহার করে, ইহাদের পতঙ্গভুক উদ্ভিদ বলে ('পতঙ্গভুক উদ্ভিদ' দ্র)। কোনও কোনও উদ্ভিদ আবার মিথোজীবিতা (সিম্‌বায়োসিস) দ্বারা প্রাণধারণ করে। এক্ষেত্রে দুইটি উদ্ভিদ পরস্পরকে সাহায্য করিয়া একত্রে বাস করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—ছোলা, মটর প্রভৃতি গাছের মূলে একজাতীয় জীবাণু বাস করে, এই জীবাণু ছোলা, মটর প্রভৃতি গাছ হইতে কার্বো-হাইড্রেট গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে এবং শেষোক্ত গাছগুলি জীবাণু হইতে নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য সংগ্রহ করে।

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

পরমাণু অ্যাটম। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ বিশ্বের উপাদান লইয়া বহু চিন্তা করিয়াছিলেন। আরিস্তোতল (৩৮৫-৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)-এর মত ছিল, পার্থিব বস্তু অগ্নি, বায়ু, মাটি ও জল এই চারিটি মূল বস্তুদ্বারা গঠিত। প্রাচীন হিন্দু

দর্শনের পঞ্চভূতের উল্লেখও করা যাইতে পারে। গ্রীক ডেমোক্রিটাস ও বহু পরে রোমক লুক্রেশিয়াস এক ধরনের কণাবাদ প্রচলিত করেন। লুক্রেশিয়াসের রচনায় পদার্থের ক্ষুদ্রতম, অবিভাজ্য অংশ হিসাবে অ্যাটমের কথা বলা হয়। ডেমোক্রিটাসের প্রাচীনতর রচনাতেও অনুরূপ মতবাদ ছিল। প্রাচীন দার্শনিক চিন্তাধারার যুগ পরিবর্তিত হইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক যুগে জন ডাল্টন (১৭৬৬-১৮৪৪ খ্রী)-এর পরমাণুবাদ (অ্যাটমিক থিয়োরি) প্রতিষ্ঠা পাইল ১৮শ শতকের শেষভাগে। ঐ পরমাণুবাদের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক রসায়নশাস্ত্র গড়িয়া উঠিল। পদার্থের ক্ষুদ্রতম, অবিভাজ্য মৌলিক কণা হিসাবে পরমাণুর পরিচিতি স্বীকৃত হইল। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন গঠনের, ডাল্টনের এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন গবেষকের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল যে পরমাণুও অবিভাজ্য নয়। ক্যাথোড রশ্মি-সংক্রান্ত গবেষণার ফলে পরমাণুর মধ্যে পজ়িটিভ ও নেগেটিভ আধান (চার্জ)-যুক্ত ক্ষুদ্রতর মৌলিক কণার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল। ক্রুক্‌স ও টম্‌সনের (১৮৫৬-১৯৪০ খ্রী) গবেষণায় ইলেক্‌ট্রন আবিষ্কৃত হইল। পরমাণুর মধ্যে পজ়িটিভ আধানযুক্ত অংশ এবং অতিশয় ক্ষুদ্র, প্রায় ভরহীন, নেগেটিভ আধানযুক্ত পরস্পর অভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির কণা ইলেক্‌ট্রন রহিয়াছে, জানা গেল। টম্‌সন এ সময়ে পরমাণুর গঠনের একটি মোটামুটি প্রকল্প প্রচার করেন। তাঁহার মতে, পরমাণুর পজ়িটিভ আধান একটি ক্ষুদ্র গোলকের মত সর্বত্র সমান ঘনত্ব বিশিষ্ট বস্তুতে রহিয়াছে এবং ইলেক্‌ট্রনগুলি যেন তাহার গায়ে বিভিন্ন স্থানে লাগিয়া আছে। কিন্তু পরবর্তী কালে রাদার্‌ফোর্ডের (১৮৭১-১৯৩৭ খ্রী) বিখ্যাত আল্‌ফাকণা বিচ্ছুরণের পরীক্ষার ফলে ঐ বিশ্বাস পরিবর্তিত হইয়াছে। রাদার্‌ফোর্ডের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল যে পরমাণুর পজ়িটিভ আধান অতিশয় ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তাহার বেশ কিছু দূরে ইলেক্‌ট্রনগুলি অবস্থান করিতেছে। ইহাই রাদার্‌ফোর্ডের 'নিউক্লিয়াস' বা কেন্দ্রক-যুক্ত পরমাণুর চিত্র নামে প্রচলিত। এই কেন্দ্রক-সমন্বিত পরমাণুর চিত্র গৃহীত হইবার ফলে পদার্থের ধর্মের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ পৃথক দুইভাগে ভাগ করা গেল: ১. পদার্থের সাধারণ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গুণাগুণ নির্ভর করে পরমাণুর বহির্ভাগের ইলেক্‌ট্রনগুলির গুণাগুণের উপর ২. পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা, পরমাণুর বিভাজন প্রভৃতি ধর্ম এবং পরমাণুর বিভিন্ন ভর ও পজ়িটিভ আধানের পরিমাণ নির্ভর করিতেছে ক্ষুদ্র কেন্দ্রকটির উপর।

এখানে পরমাণুর ইলেক্‌ট্রন-সজ্জার উপর নির্ভরশীল গুণাগুণ ও ব্যাখ্যাতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকিবে। মেণ্ডেলিয়েফ দেখাইয়াছিলেন যে মৌলিক পদার্থগুলিকে তাহাদের পারমাণবিক ভর অনুযায়ী ক্রমিক সজ্জায় সাজাইলে তাহাদের প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গুণাবলীর মধ্যে এক বিশেষ ধরনের পুনরাবৃত্তির পৌনঃপুনিকতা দেখা যায়; ইহাই 'পিরিয়ডিক টেব্‌ল' বা মৌলসমূহের পর্যায়-সারণী নামে পরিচিত। পরে দেখা গিয়াছে, রাসায়নিক ধর্মের ঐ পুনরাবৃত্তি পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রে নিবদ্ধ ভরের উপর নির্ভর করে না, বরং বহির্দেশের ইলেক্‌ট্রনের সজ্জার পুনরাবৃত্তির উপর নির্ভর করে।

বিভিন্ন পদার্থ হইতে (উত্তাপের ফলে) বিভিন্ন তরঙ্গের আলোক বিকিরণের ব্যাখ্যার ফলে পরমাণুর ইলেক্‌ট্রন-সমন্বিত বিশেষ গঠন বর্তমানে নির্দিষ্ট ও গ্রাহ্য হইয়াছে। ইহা পরীক্ষিত সত্য যে বিভিন্ন পদার্থ হইতে নিঃসৃত আলোকের বর্ণালী পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা গিয়াছিল যে যেহেতু বিভিন্ন মৌলের পরমাণু বিভিন্ন, বিকিরণের সহিত পরমাণুর প্রকৃতির সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহা প্রমাণ করা গিয়াছিল যে আলোক বিকিরণের জন্য ইলেক্‌ট্রন দায়ী। লোরেন্ট্‌স-এর তত্ত্ব প্রমাণ করিয়াছিল যে, কম্পমান ইলেক্‌ট্রন আলোক বিকিরণ করে। রাদার্‌ফোর্ডের নিউক্লিয়াস-যুক্ত পরমাণুতে কেন্দ্রের বাহিরে ইলেক্‌ট্রনের অবস্থিতি তখনই সম্ভব, যখন ইলেক্‌ট্রন কেন্দ্রের বাহিরে চক্রাকারে ঘুরিবে। এই অবস্থায় ইলেক্‌ট্রনের গতি যদি কম-বেশি হয় বা ত্বরণযুক্ত হয়, তবে ঐ পরমাণু হইতে আলোক বিকিরিত হইবে।

কিন্তু কেন্দ্র ও ইলেক্‌ট্রনের মধ্যে বৈদ্যুতিক আকর্ষণের ফলে ইলেক্‌ট্রনের গতি ত্বরণযুক্ত হইলে বলবিদ্যা অনুযায়ী উহা ক্রমাগতই আকর্ষিত হইয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বৃত্ত রচনা করিয়া অবশেষে কেন্দ্রে পতিত হইবে। তাহা হইলে বিকিরণকারী পরমাণুর স্থায়িত্ব কোথায়? আর ক্রমাগত ত্বরণশীল ইলেক্‌ট্রন কল্পনা করা যায় না, কারণ তাহা হইতে পরমাণুর বিশেষ ধরনের রেখ-বর্ণালীর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

ডেনমার্কের বিজ্ঞানী নীল্‌স বোর ('বোর, নীল্‌স' দ্র) লোরেন্ট্‌স-এর বিকিরণকারী ইলেক্‌ট্রনের গতির ব্যাখ্যায় প্লাঙ্ক-এর প্রবর্তিত কোয়ান্টামতত্ত্ব ব্যবহার করিলেন। ইহার পূর্বে নাগাওকা ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে

নিউক্লিয়াস-সমন্বিত পরমাণুকে সৌরজগতের সহিত তুলনা করেন ; ভারি নিউক্লিয়াস যেন সূর্য ও ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন গ্রহ। নীল্‌স বোর ঐ চিত্রকে কাজে লাগাইলেন। তিনি বলিলেন, ইলেকট্রনের কতকগুলি নির্দিষ্ট ব্যাস-যুক্ত কক্ষপথ আছে। পরমাণু তখনই আলোকের আকারে শক্তি বিকিরণ করিবে, যখন ইলেকট্রন একটি নির্দিষ্ট কক্ষ হইতে অন্য নির্দিষ্ট কক্ষে যাইবে। এই কক্ষপথ পরিবর্তনের মধ্যকালীন ব্যবস্থা বলিয়া কিছু নাই, কোয়াণ্টামতত্ত্বে ইহাই সমর্থিত হইয়াছে। প্রতিটি কক্ষ ইলেকট্রনের একটি নির্দিষ্ট শক্তি নির্ধারণ করিতেছে। সুতরাং কক্ষপথ পরিবর্তন ইলেকট্রনের একটি নির্দিষ্ট মানের শক্তিক্ষয় হিসাবে ধর্তব্য। ইহাই পরমাণুর আলোক বিকিরণের রেখ-বর্ণালীর জন্ম দেয়।

বোরের এই তত্ত্ব বর্ণালী বিকিরণের সমুদয় গ্রহণীয় তথ্যকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইল। বর্ণালীর তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যার বিভিন্ন বিন্যাসের ব্যাখ্যা ও 'রিডবার্গ-ধ্রুবক'-এর ব্যাখ্যা, সকলই ইলেকট্রনের ভর, আধান ও গতির কৌণিক ভরবেগ দ্বারা বুঝা গেল।

পরে সোমারফেল্ড প্রমাণ করেন যে বোরের প্রকল্পিত ইলেকট্রনের কক্ষপথ ঠিক বৃত্তাকার নয়, বরং উহা বৃত্তাভাস। আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৫ খ্রী) আপেক্ষিকবাদ অনুসারে ঐ পথের 'অয়নচলন'-ও আছে। ফলে কল্পনা করা যায় যে ঐ কক্ষপথ কেন্দ্রককে নাভিতে রাখিয়া একটি 'রোসেট' বৃত্ত (Rosette curve) করিয়া ঘুরিতেছে।

পরবর্তী কালে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার প্রচলন হওয়ায় বোর-প্রবর্তিত নির্দিষ্ট কক্ষের চিত্রের অনুমান পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। হাইসেনবার্গ-প্রবর্তিত অনির্দেশ্যবাদ অনুযায়ী বুঝা যায় যে নির্দিষ্ট শক্তির ইলেকট্রনকে নির্দিষ্ট একটি কক্ষে কোনও মতেই চিহ্নিত করা যায় না। এইটুকু মাত্র বলা যায় যে ইলেকট্রনের 'সর্বাধিক-সম্ভাব্য' উপস্থিতির হিসাব করিলে উহা বোরের হিসাবলব্ধ কক্ষের সহিত মিলিয়া যায়। কিন্তু ঐ কক্ষের বাহিরে তাহারা কোনও মতেই অবস্থান করিবে না, কোয়াণ্টামতত্ত্ব তাহা স্বীকার করে না। তথাপি নীল্‌স বোর -প্রবর্তিত পরমাণুর চিত্র—অর্থাৎ কেন্দ্রে ক্ষুদ্র ভারি নিউক্লিয়াস ও দূরে দূরে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যাসের কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রন—এই চিত্রকে তত্ত্বের জগতে সসম্মানে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে।

ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট কক্ষপথের চিত্রটি কোয়াণ্টাম বলবিদ্যায় সঠিকভাবে গৃহীত না হইলেও ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট শক্তিস্তরের প্রকল্প কোয়াণ্টাম বলবিদ্যায় সমর্থিত হইয়াছে। পরমাণুর মধ্যে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের যে একটি নির্দিষ্ট শক্তি আছে তাহা ফ্রাঙ্ক ও হার্ৎজ্ (১৯১৪ খ্রী) এবং পরে অন্যান্যদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে।

জীম্যান, স্টার্ন-গারল্যাক ও স্টার্কের পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইলেকট্রনের কক্ষপথকে অন্ততঃ ৪টি বিভিন্ন সংখ্যা (যাহাকে কোয়াণ্টাম-সংখ্যা বলে) দ্বারা প্রকাশ করিতে হয় ; ১. 'l' : ইহা ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগকে নির্দিষ্ট করে ২. 'm' : ইহাকে চৌম্বক কোয়াণ্টাম-সংখ্যা বলা হয় এবং ইহা কক্ষতলকে শূন্যে নির্দিষ্ট অবস্থানে চিহ্নিত করে ৩. ঘূর্ণন বা স্পিন কোয়াণ্টাম-সংখ্যা 's' : ইহার মাত্র দুইটি নির্দিষ্ট মান আছে— +½ ও -½ ৪. মূল কোয়াণ্টাম-সংখ্যা 'n' : ইহা সরাসরি বোরের হিসাবলব্ধ বিভিন্ন কক্ষের ব্যাস নির্দিষ্ট করিতেছে। ঐ ৪টি কোয়াণ্টাম-সংখ্যার যে কোনওটির পরিবর্তন ইলেকট্রনের শক্তির পরিবর্তন বুঝায়। বোরের নির্দিষ্ট কক্ষে একাধিক ইলেকট্রন থাকিতে পারে, যাহাদের অন্যান্য কোয়াণ্টাম-সংখ্যা বিভিন্ন। সুতরাং কল্পনা করা যাইতে পারে, বোরের নির্দিষ্ট প্রতিটি অক্ষপথ যেন বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভক্ত, অর্থাৎ সামান্য শক্তি-পার্থক্যে চিহ্নিত কয়েকটি কক্ষপথ লইয়া যেন বোরের নির্দিষ্ট একটি কক্ষ।

কোন শক্তিস্তরে কতগুলি ইলেকট্রন থাকিতে পারে তাহা নির্দিষ্ট করিতেছে পাউলি-র বিখ্যাত সূত্র। পাউলি-র সূত্র বলিতেছে, কোনও পরমাণুর যে কোনও দুইটি ইলেকট্রনের সবকয়টি কোয়াণ্টাম-সংখ্যা এক হইবে না ; অর্থাৎ পরমাণুতে একাধিক ইলেকট্রন থাকিলেও তাহারা প্রত্যেকে বিভিন্ন শক্তির।

হাইড্রোজেন হইতে শুরু করিয়া অন্যান্য ভারি পদার্থের পরমাণুতে ক্রমশঃ ইলেকট্রন-সংখ্যা বাড়িয়াছে। পাউলি ও বোরের হিসাব মানিয়া এখন তাহাদের প্রত্যেকটির শক্তি নির্দিষ্ট করা যায়। হাইড্রোজেন-পরবর্তী পরমাণুগুলিতে ঐ নিয়ম মানিয়া পরপর ইলেকট্রন সাজাইয়া গেলে মেণ্ডেলিয়েফ-কৃত পর্যায়-সারণীর পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তির কারণও বুঝা যায়।

বিমলেন্দু মিত্র

পরমাণুবাদ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুবাদ গৃহীত হইয়াছে। এই মতবাদকে আরম্ভবাদ এবং অসৎকার্যবাদও বলা হয়। উদয়নাচার্য বলিয়াছেন যে, এই পরমাণুবাদের

মূল রহিয়াছে শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে (৩।৩)। তাহাতে যে 'পতত্র' শব্দ রহিয়াছে, তাহাই পরমাণু। মহর্ষি কণাদ পরমাণুবাদের আবিষ্কর্তা বা সমর্থক। ন্যায়-বৈশেষিক-মতে আকাশ, কাল, দিক ও আত্মা সর্বব্যাপী ও নিত্যদ্রব্য। মন নিত্য হইলেও অণুপরিমাণবিশিষ্ট। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যের পরমাণু নিত্য। তদ্ব্যতীত অপর পৃথিব্যাদি সকল দ্রব্যই অনিত্য। পরমাণু অতিশয় সূক্ষ্ম এবং সর্বপ্রকার উৎপত্তিশীল দ্রব্যের উপাদান-কারণ। প্রত্যেক উৎপত্তিশীল সাবয়ব দ্রব্যের বিভাগ করিতে করিতে সর্বশেষে যে অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অংশ অবশিষ্ট থাকিবে, সেই নিরবয়ব অংশই পরমাণু নামে কথিত হয়। সাবয়ব দ্রব্যগুলিকে বিভাগ করিতে করিতে বিভাগের সমাপ্তি ঘটে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। এইরূপ সিদ্ধান্তে হিমালয় পর্বত এবং একটি ধূলিকণাকেও সমান বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। এই প্রকার ভুল সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে হিমালয়ের গুরুত্ব (ওজন) ও পরিমাণের সহিত একটি ধূলিকণার গুরুত্ব ও পরিমাণকে সমান বলিতে হয়।

বস্তুর সূক্ষ্মতম অবয়বরূপ পরমাণুর সংখ্যার বহুত্ব ও অল্পত্বের বিচার করিয়া সাবয়ব দ্রব্যের গুরুত্ব ও পরিমাণ স্থির করিতে হয়। এইহেতু অবশ্যই পরমাণু স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই প্রথমতঃ দুইটি পরমাণুর সংযোগ ঘটে। সেই সংযোগ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের নাম 'দ্ব্যণুক'। তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 'ত্রসরেণু'। 'ত্রস' শব্দের অর্থ গতিশীল। ত্রসরেণুর অপর নাম 'ত্রুটি'। ঘরের জানালা দিয়া প্রবিষ্ট সূর্যরশ্মিতে যে সূক্ষ্ম ধূলিকণা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাই পার্থিব ত্রসরেণু। পরমাণু ও দ্ব্যণুক প্রত্যক্ষযোগ্য নহে।

পরমাণু নিরবয়ব। অতএব দুইটি পরমাণুর সংযোগ কিরূপে সম্ভবপর? পরমাণুবাদে এই অসঙ্গতি অনেক আচার্যই প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য শংকর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এই অসঙ্গতি প্রদর্শনপূর্বক পরমাণুবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনের অভিমত এই যে, নিরবয়ব দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগ হইতে কোনও বাধা নাই। মন পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু মনের সহিত আত্মার সংযোগ তো স্বীকৃত হয়। নিরবয়ব আকাশের সহিত নিরবয়ব আত্মার সংযোগ মহর্ষি কণাদ ও গৌতমের সম্মত। অতএব সাবয়ব দ্রব্যের অংশ-বিশেষেই সংযোগ হইবে, এরূপ নিয়ম তাঁহারা মানেন নাই।

উপাদান-কারণের বহুত্বসংখ্যা অথবা মহৎপরিমাণই উৎপন্নদ্রব্যের মহৎপরিমাণের কারণ। দ্ব্যণুকের উপাদান-কারণস্বরূপ পরমাণুদ্বয়ে বহুত্বসংখ্যাও নাই এবং মহৎ-পরিমাণও নাই। এইহেতু দ্ব্যণুকে মহৎপরিমাণ জন্মিতে পারে না, দ্ব্যণুকও পরমাণুর ন্যায় অণুপরিমাণবিশিষ্ট। দ্ব্যণুকের পরিমাণ পরমাণুদ্বয়ের দ্বিত্ব-সংখ্যা হইতে উৎপন্ন। তিনটি দ্ব্যণুকের ত্রিত্বসংখ্যা অর্থাৎ বহুত্বসংখ্যাই ত্রসরেণুর মহৎপরিমাণ বা স্থূলত্বের হেতু।

পরমাণুর নিত্যত্ব স্বীকার করায় বোঝা যায় যে, আরম্ভবাদই কণাদ ও গোতমের অভিপ্রেত। পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুক হইতে ত্রসরেণু, আর ত্রসরেণু হইতে ক্রমে এই স্থূল বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে এই একই মত গৃহীত হইয়াছে, তথাপি আচার্য শংকর এই আরম্ভবাদকে কণাদসিদ্ধান্ত বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন।

পরমাণুবাদিগণের মতে সৃষ্টির পূর্বে কোনও বস্তুই প্রত্যক্ষ গোচর নহে। এক-একটি খণ্ড প্রলয়ের পর ঈশ্বর পুনরায় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হন। তখন জীবগণের অদৃষ্টবশতঃ প্রথমে পরমাণুতেই সংযোগানুকূল স্পন্দন উৎপন্ন হয়। পরমাণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে স্থূল বিশ্বরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। খণ্ডপ্রলয়কালে ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ পরমাণুগুলি পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

পার্থিব পরমাণু হইতে স্থূল পৃথিবী, জলীয় পরমাণু হইতে স্থূল জল, তৈজস পরমাণু হইতে স্থূল তেজ এবং বায়বীয় পরমাণু হইতে স্থূল বায়ু উৎপন্ন হয়। পরমাণুগুলি অচেতন হইলেও ঈশ্বরের অধিষ্ঠানবশতঃ সেইগুলিতে ক্রিয়া বা স্পন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সুখময় ভট্টাচার্য

পরমানন্দ অধিকারী (১১৪০? -১২৩০? বঙ্গাব্দ) কৃষ্ণযাত্রার পদকর্তা, গায়ক ও অধিকারীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রাচীনতম বলিয়া অনুমিত। জন-শ্রুতি ছাড়া ইঁহার সম্বন্ধে কোনও খাঁটি খবর নাই। সে জনশ্রুতিও ক্ষীণ—দুই কারণে। প্রথম কারণ কালের দূরত্ব, দ্বিতীয় কারণ অধিকারচ্যুতি। পরমানন্দের সব গানে ভণিতা থাকিত বলিয়া মনে হয় না এবং সেই কারণে তাঁহার গানে পরবর্তী অধিকারীর নামপাঞ্জা পড়িয়া গিয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ও ১৯শ শতাব্দীর আদি পাদে ইনি বর্তমান ছিলেন এ অনুমান সঙ্গত। মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী-সম্পাদিত ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সংকলিত 'বীরভূম-বিবরণ' (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)-এর ৩য় খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে: 'অনুমান ১১৪০ সালে ইঁহার

জন্ম এবং ১২৩০ সালে ইহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে' —এ অনুমান খুব অসঙ্গত নয়। এক জনশ্রুতি বলে পরমানন্দের জন্মভূমি বীরভূম; আর এক জনশ্রুতি বলে তাঁহার জন্মস্থান 'রামটবাটী'। এ নামে কোনও গ্রাম বীরভূমে পাওয়া যায় নাই।

পরমানন্দ গোবিন্দ অধিকারীর বৃত্তিগুরু ছিলেন, এ জনশ্রুতি অযথার্থ নয় বলিয়াই মনে হয়। পরমানন্দের যাত্রারীতির বিশিষ্টতা ছিল দূতীয়ালিতে। সে রীতি গোবিন্দ অধিকারীর কণ্ঠে আরও বিশিষ্টতা পায় এবং গোবিন্দের বৃত্তিশিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের গুণপনায় পরিণতি লাভ করে।

সুকুমার সেন

পরমানন্দ, ভাই (১৮৭৫-১৯৪৫? খ্রী) প্রখ্যাত রাজনৈতিক ও সমাজকর্মী। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর উপাধি গ্রহণপূর্বক তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ডি. এ. ভি. কলেজে শিক্ষাদানের কার্য গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই তিনি রাজনৈতিক জীবনে জড়িত হইয়া পড়েন। ভাই পরমানন্দ আর্য-সমাজে যোগদান করেন ও সমাজের প্রচারকার্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকায় যান। সেখানে তিনি গদর পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর গদর পার্টিভুক্ত সন্দেহে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে বন্দী করে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি আন্দামানে প্রেরিত হন। দুই মাস ক্রমান্বয়ে অনশনের পরে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। পরে তিনি লাহোর ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত হন এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি পাঞ্জাব বিদ্যাপীঠের চ্যান্সেলারের পদেও নির্বাচিত হন। ১৯৩১ এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের সহিত মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় তিনি কংগ্রেস দল পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু মহাসভাতে যোগদান করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত হন।

অশোকা সেনগুপ্ত

পরমারবংশ পরমারগণ পঁবার রাজপুত নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, পরমারদিগের আদি পুরুষ সিরোহীর নিকটবর্তী আবুপর্বতে বসিষ্ঠমুনির যজ্ঞকুণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। কাহিনীটি দক্ষিণ ভারতীয় কোনও রাজবংশের উৎপত্তিমূলক কিংবদন্তী হইতে কল্পিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পরমারগণ প্রথমে গুজরাতের মহীনদী-বিধৌত অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা মান্যখেটের রাষ্ট্রকূটবংশীয় সম্রাটগণের সামন্ত ছিলেন। হিউএন্-ৎসাঙের বিবরণে এই জনপদকে মালব বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ৯ম শতাব্দীর শেষদিকে লাটের সামন্তবংশীয় রাষ্ট্রকূটগণের অবনতির পর ঐ অঞ্চলে পরমারদিগের অভ্যুদয় হয়।

১০ম শতাব্দীর ২য় পাদে পরমাররাজ বৈরিসিংহ ধারা-নগরী অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র সীয়ক (আনুমানিক ৯৪৮-৭৪ খ্রী) রাষ্ট্রকূট রাজধানী মান্যখেট নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। সীয়কের স্বকীয় তাম্রশাসনে তাঁহার সামন্তত্বসূচক উপাধি দেখা যায়; কিন্তু তদীয় পুত্রের শাসনে সীয়ক এবং তাঁহার পূর্বপুরুষগণের সম্রাট-সুলভ উপাধি দেখিতে পাই। সীয়কের পুত্র বাক্‌পতি মুঞ্জ বা উৎপল (আনুমানিক ৯৭৪- ৯৬ খ্রী) উজ্জয়িনী অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে ক্রমশঃ পরমারগণ উজ্জয়িনী, ধারা এবং মণ্ডপিকা (মাণ্ডু) নগরীর অধীশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। বাক্‌পতি মুঞ্জ তাঁহার পরাক্রম, বিদ্যাবত্তা এবং বিদ্যোৎসাহের জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। পদ্মগুপ্ত, ধনঞ্জয়, ধনিক, হলায়ুধ প্রভৃতি কবি ও পণ্ডিতবর্গ তাঁহার সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। কর্ণাটের অধিপতি চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় তৈলের সহিত বাক্‌পতির দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। তৈল লাটদেশ অর্থাৎ গুজরাতের দক্ষিণাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। কথিত আছে, তিনি বহুবার বাক্‌পতির হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন; কিন্তু শেষবার পরমাররাজ গোদাবরী নদীর দক্ষিণে তৈলের রাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়া শত্রুহস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। কিছুকাল মান্যখেট নগরে বন্দী অবস্থায় কাটাইবার পর বাক্‌পতিকে হত্যা করা হইয়াছিল।

বাক্‌পতির পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিন্ধুরাজ (৯৯৬-১০০০ খ্রী) পরমার-সিংহাসন লাভ করেন। তিনি নবসাহসাঙ্ক (নূতন বিক্রমাদিত্য) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাকবি পদ্মগুপ্ত 'নবসাহসাঙ্ক-চরিত' নামক ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। সিন্ধু-রাজের পুত্র ভোজ (১০০০-৫৫ খ্রী) জ্যেষ্ঠতাতের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শৌর্য, বিদ্যাবত্তা ও বিদ্যোৎসাহ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে পরমাররাজ ভোজকে অগণিত গ্রন্থের রচয়িতৃরূপে উল্লেখ করা হয়।

রাজা ভোজ কলচুরি গাঙ্গেয়দেব এবং চোলবংশীয় প্রথম রাজেন্দ্রের সহিত মৈত্রীবদ্ধ হন এবং কর্ণাটরাজ জয়সিংহকে পরাজিত করিয়া কিছুকালের জন্য কোঙ্কণ দেশ অধিকার করেন; কিন্তু পরে তিনি চৌলুক্য এবং কর্ণাটগণের সহিত মিত্রতাবদ্ধ কলচুরিরাজ কর্ণ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। ভোজের পুত্র জয়সিংহ (আনুমানিক ১০৫৫-৬০ খ্রী) সম্ভবতঃ কর্ণাটরাজের লঘুমিত্র ছিলেন। অতঃপর জয়সিংহের পিতৃব্য উদয়াদিত্য (আনুমানিক ১০৬০-৮৭ খ্রী) পরমার বংশের গৌরব কিয়ৎপরিমাণে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মদেব (আনুমানিক ১০৮৭-৯৭ খ্রী) এবং নরবর্মা (আনুমানিক ১০৯৭-১১১১ খ্রী)।

পরে দক্ষিণের যাদব, পশ্চিমের চৌলুক্য, উত্তরের চাহমান প্রভৃতি শক্তির সহিত সংঘর্ষের ফলে পরমার রাজশক্তি ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়ে। ১৩শ শতাব্দীর সূচনায় দিল্লীতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পরমাররাজ্য কয়েকবার মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর (১২৯৬-১৩১৬ খ্রী) শাসনকালে রাজ্যটি সম্পূর্ণরূপে দিল্লীরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

পরমারবংশের উল্লিখিত প্রধান শাখা ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ছিল। ঐ শাখাগুলি আবু-চন্দ্রাবতী অঞ্চল, বাগড় (বান্‌স্‌ওয়াড়া-ডুঙ্গরপুর), জাবালিপুর (জালোর) ও কিরাতকূপ (কিরাড়ু) প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিত। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র আবু-চন্দ্রাবতীর পরমাররাজ্য আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকাল পর্যন্ত টিকিয়াছিল; অপরগুলি ইতিপূর্বেই ধ্বংস হয়।

দ্র D. C. Ganguly, *History of the Paramara Dynasty*, Dacca, 1933; H. C. Ray, *Dynastic History of Northern India*, vol. II, Calcutta, 1936; D. C. Sircar, *Ancient Malwa and the Vikramaditya Tradition*, Delhi, 1969.

দীনেশচন্দ্র সরকার

পরলোক পরলোক সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ থাকিলেও যাঁহারা পরলোকে বিশ্বাসী তাঁহারা সকলেই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ বা চেতনধর্মী। আত্মার চৈতন্যই দেহকে সংবেদনশীল করে। মৃতদেহে চৈতন্য থাকে না, কারণ আত্মা মৃতদেহে অবস্থান করে না।

ভারতীয় দর্শনে চার্বাকগণ দেহাতিরিক্ত আত্মা ও পরকাল মানেন না। বৌদ্ধগণ পরলোক মানেন, কিন্তু নিত্য আত্মা মানেন না। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানধারাই আত্মা। কর্ম, পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক ও মোক্ষ চার্বাকগণ ব্যতীত ভারতীয় সকল দর্শনই মানেন।

জীব কর্ম অনুসারে স্বর্গ ও নরক ভোগ করে, অথবা এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে। পুণ্য কর্মের ফল স্বর্গ। পুণ্যক্ষয়ে আবার এই পৃথিবীতে জন্ম হয়। সেইরূপ নরক ভোগের পরও এই মর্তধামে জীব জন্মগ্রহণ করে।

পরম ধার্মিকগণ দেবযান পথে স্বর্গে গমন করে। এই পথে বিভিন্ন বর্ণের জ্যোতিতে আলোকিত অগ্নিলোক, বায়ুলোক, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক এবং প্রজাপতিলোক বিরাজমান। ভক্তগণ এই দেবযান পথে ভগবদ্ধামে গমন করেন ও সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য বা সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। সালোক্য অর্থে শ্রীভগবানের সঙ্গে একই লোকে বাস, সারূপ্য অর্থে ভগবান যে রূপে লীলা করেন, সেই রূপ লাভ, সামীপ্য অর্থে ভগবানের সমীপে বাস এবং সাযুজ্য অর্থে শ্রীভগবানের সহিত একত্ব।

ভারতীয় দার্শনিকগণ স্বর্গলাভ অপেক্ষা মোক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন। পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে মর্ত্যধামে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু মোক্ষে দুঃখ ও জন্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। আত্মার স্বরূপজ্ঞান বা সাক্ষাৎ-জ্ঞানে মুক্তিলাভ হয়। সাধনার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয়। এই মিথ্যাজ্ঞান দূর হইলেই আত্মার মুক্তি হয়।

মুক্ত আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ন্যায়-বৈশেষিকের মতে মুক্ত অবস্থায় আত্মার দুঃখ ও সুখ কোনওটিই থাকে না। আত্মা অনাদি ও অনন্ত। আত্মার মৃত্যু নাই। জীব রাগ ও দ্বেষ-বশতঃ সকাম কর্ম করে এবং কর্মফল ভোগের জন্য জন্মান্তর লাভ করে। আত্মা যতকাল মোক্ষলাভ না করে, ততকাল পর্যন্ত স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করে। এই দেহী আত্মাই চেতন। চৈতন্য এই দেহী আত্মার গুণ। বিদেহ মুক্তি লাভ করিলে আত্মার চৈতন্য থাকে না এবং সুখ বা দুঃখও থাকে না। যাঁহারা সংসারে বিরক্ত তাঁহারাই মোক্ষার্থী হন। বিরক্ত পুরুষের দুঃখনিবৃত্তিই প্রিয়। সুখের কামনা করিলে তিনি বিরক্ত নহেন। সুতরাং মুক্ত অবস্থায় আত্মা সুখ এবং দুঃখের অতীত হয়।

সাংখ্যমতে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ এবং অনেক। যত জীব তত আত্মা। আত্মা বা পুরুষ অজ্ঞানবশতঃ প্রকৃতির জালে বদ্ধ হয়। যোগাভ্যাসের দ্বারা আত্মা বা পুরুষ মুক্তি লাভ করে। মুক্ত অবস্থায় আত্মার দুঃখ থাকে না এবং সুখও থাকে না। কিন্তু মুক্ত আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। সাংখ্যদর্শন বেদে বিশ্বাসী, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্যলোক স্বর্গের বিভিন্ন স্তর এবং এই সমস্ত লোকে বিভিন্ন স্তরের দেবতা আছেন। কিন্তু বিশ্বের স্রষ্টা এক ঈশ্বর নাই। প্রলয়ের শেষে প্রকৃতি যখন পুরুষের নিকটবর্তী হয়, তখন প্রকৃতির পরিণাম আরম্ভ হয়। জগৎ এই প্রকৃতির পরিণাম। পুরুষ অনাদি অবিদ্যাবশে প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া আবদ্ধ হয়। সাধনার দ্বারা পুরুষ উপলব্ধি করে যে, সে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, নিত্য, বুদ্ধ, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ।

অদ্বৈতবেদান্তমতে এক ব্রহ্ম নামরূপউপাধিভেদে বিভিন্ন জীবরূপে প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ আত্মা এক, অব্যয়, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দময়, নিত্য, বুদ্ধ এবং শুদ্ধ। অনাদি অবিদ্যাবশে জীব আপনাকে ব্রহ্ম ও অপরাপর জীব হইতে ভিন্ন মনে করে। এই জগৎ মায়ার বিক্ষেপ, অতএব মিথ্যা, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ। জগৎ আছে বলা যায় না, যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জগৎ থাকে না। কিন্তু জগৎ নাই একথাও বলা যায় না, যেহেতু জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। সুতরাং জগৎ সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ। নেতি নেতি বিচার এবং 'আমি ব্রহ্ম' এই ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মানুভূতি হয়। এই ব্রহ্মানুভূতিই মোক্ষ। মোক্ষে কেবলমাত্র যে দুঃখ থাকে না, তাহা নহে। পরন্তু মোক্ষাবস্থা পরমানন্দের অবস্থা।

বিশিষ্টাদ্বৈতমতে জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশ এবং চৈতন্য-স্বরূপ এবং চৈতন্যগুণক। অজ্ঞানবশতঃ জীব আপনাকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র মনে করে। নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ ও শরণাগতি দ্বারা ঈশ্বরের কৃপা হইলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হয় ও জীব মুক্ত হয়। মুক্ত জীব দেহপতনের পরে বৈকুণ্ঠে ভগবান নারায়ণের নিত্যদাসরূপে অবস্থান করে।

তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য

পরশুরাম জমদগ্নি ও রেণুকার ধনুর্বিদ্যাপারদর্শী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, দাম্ভিক, ক্রোধী কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বিষ্ণুর অন্যতম অবতার। মহাদেবের নিকট হইতে তেজোময় পরশু অস্ত্র লাভ করায় ইহার নাম পরশুরাম। একবার স্ত্রীর সহিত জলকেলিরত গন্ধর্বরাজ চিত্ররথকে দেখিয়া রেণুকা কামার্ত হন। গৃহাগত রেণুকার ভাববিকার দেখিয়া জমদগ্নি ক্রোধে পুত্রদিগকে মাতৃবধের আদেশ দেন। পরশুরাম পরশুর দ্বারা মাতৃমস্তক ছিন্ন করেন। হৈহয়াধিপতি কার্তবীর্য জমদগ্নির হোমধেনুর বৎস হরণ করিলে ক্রুদ্ধ পরশুরাম তাঁহার সহস্রবাহু ছেদন করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। কার্তবীর্যের কুপিত পুত্রগণ জমদগ্নির প্রাণনাশ করেন, ইহাতে কোপাবিষ্ট পরশুরাম কার্তবীর্যের পুত্রদের বিনাশ করিয়া ক্ষত্রিয়নিধনে প্রবৃত্ত হন এবং ২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন।

নববধূ সীতাকে লইয়া রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন-কালে ঘোরদর্শন পরশুরাম পথ রোধ করেন। রাম কর্তৃক হরধনুভঙ্গের সংবাদে বিক্ষুব্ধ পরশুরাম রামচন্দ্রকে প্রথমে নিজের বৈষ্ণব ধনু ভঙ্গ করিতে বলেন এবং পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। নিমেষে তীরনিক্ষেপ করিয়া রামচন্দ্র পরশুরামের তপোর্জিত সমস্ত লোক রুদ্ধ করিলে তিনি রামচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে প্রস্থান করেন (রামায়ণ, ১।৭৪-৭৬)।

যূথিকা ঘোষ

পরশুরাম চক্রবর্তী 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা। ঐ কাব্যের একখানি সম্পূর্ণ পুথি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পাইয়াছিলেন (বিচিত্রা ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬৮৮)। ঐ পুথির অন্তর্গত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের প্রতিলিপি বরাহ-নগর পাটবাড়িতে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। ইনি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-এর মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, সনাতন গোস্বামী, দামোদর, হরিদাস, নরহরি সরকার এবং অভিরাম দাসকে বন্দনা করিয়াছেন। কবির জীবনকাল হয় ১৬শ শতাব্দীর শেষে অথবা ১৭শ শতাব্দীতে। 'মাধবসংগীত'-রচয়িতা মধুসূদন রায়ের পুত্র পরশুরাম সম্ভবতঃ পরশুরাম চক্রবর্তী হইতে পৃথক ব্যক্তি।

বিমানবিহারী মজুমদার

পরাগযোগ বীজ উৎপাদনের জন্য ফুলের পুংকেশরের পরাগরেণু সমজাতীয় ফুলের গর্ভমুণ্ডে পৌঁছানো প্রয়োজন ; পরাগরেণুর গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরণকে পরাগযোগ বলে। পরাগরেণু একই ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়িলে তাহাকে স্ব-পরাগযোগ এবং সমজাতীয় অন্য ফুলের বা অন্য গাছের ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়িলে তাহাকে ইতরপরাগযোগ (ক্রস-পলিনেশন) বলে। বিজ্ঞানীদের মতে, শেষোক্ত পন্থায়

স্বষ্ট বীজের গাছ অনেক বেশি সতেজ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়। পরাগযোগ সম্পাদনের জন্য ফুলকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। বাতাস, পতঙ্গ, জল, পাখি, কাঠবিড়াল, বাদুড়, শামুক ইত্যাদির সাহায্যে পরাগযোগ ঘটে। পরাগকোষ হইতে মুক্ত পরাগরেণু কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক দিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকিতে পারে। এই সময়ের মধ্যে পরাগরেণু উপরি-উক্ত বাহকগুলির সাহায্যে গর্ভমুণ্ডে পৌঁছাইলে ফুল ফোটার উদ্দেশ্য সফল হয় এবং পুংজননকোষ ও স্ত্রীজননকোষের মিলনে ফুল হইতে ফলের সৃষ্টি হইতে পারে। কেবলমাত্র সমজাতীয় ফুলের ক্ষেত্রেই পরাগযোগের দ্বারা ফুল হইতে ফলের উৎপত্তি সম্ভবপর; বিষম ফুলে পরাগরেণু পড়িলেও ফলোৎপাদন অসম্ভব। পরাগযোগের পন্থা অনুযায়ী ফুলকে বায়ু-পরাগী, পতঙ্গ-পরাগী, জল-পরাগী, পাখি-পরাগী, প্রাণী-পরাগী প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। পরাগরেণুর বাহক অনুসারে ফুলে নানাবিধ বৈশিষ্ট্যেরও সৃষ্টি হয়। বায়ু-পরাগী ফুলগুলি খুব ছোট, ইহাদের উজ্জ্বল রং বা গন্ধ থাকে না এবং ইহাদের পরাগরেণু ধূলিকণার ন্যায় ক্ষুদ্র, হালকা ও বহুসংখ্যক হইয়া থাকে; ফুলের গর্ভমুণ্ড বড়, চটচটে এবং অনেক সময়েই পাখির পালকের ন্যায় বিস্তৃত হয়। পতঙ্গ আকর্ষণের জন্য পতঙ্গ-পরাগী ফুল সাধারণতঃ বর্ণে ও গন্ধে মনোরম এবং প্রায়ই মধুকোষবিশিষ্ট। নিশাচর পতঙ্গকে আকৃষ্ট করিবার জন্য রাত্রে ফোটা পতঙ্গ-পরাগী ফুল শ্বেতবর্ণ হয়। পাতা-শ্যাওলা প্রভৃতি জল-পরাগী ফুলের ক্ষেত্রে পরিণত হালকা পুং-পুষ্প বৃন্তচ্যুত হইয়া জলের উপর ভাসে। স্ত্রী-পুষ্পের বৃন্তটিও সম্প্রসারিত হইয়া জলের উপরিভাগে ভাসিতে থাকে। জলস্রোতে উভয় পুষ্পের সংস্পর্শ ঘটিলে পরাগযোগ সাধিত হয়। প্রাণী-পরাগী ও পাখি-পরাগী ফুলগুলিরও নানা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

সন্তোষকুমার পাইন

পরাগল খান সুলতান হোসেন শাহের (রাজ্যকাল ১৪৯৩-১৫১৮ খ্রী) চাটিগ্রামস্থ শাসনকর্তা লস্কর (অর্থাৎ সেনানায়ক)। পরাগল খানের সন্ধান তাঁহার কর্মচারী 'কবীন্দ্র' পরমেশ্বর দাসের রচিত 'পাণ্ডববিজয়' কাব্যেই মিলিয়াছে। ইহার পিতার নাম রাস্তি খান (ইনিও একদা চাটিগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন); পুত্রের নাম নসরৎ খান। পরমেশ্বরের রচনায় নসরৎ খানের উল্লেখ আছে 'ছুটি খান' অর্থাৎ ছোট সাহেব বলিয়া। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চাটিগ্রামবাসী কবি মোহাম্মদ খান আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে যে বংশ-তালিকা দিয়াছেন তাহা হইতে অনুমান হয় যে, পরাগল খানের আসল নাম ছিল মিনা খান; 'পরাগল' নামটির অর্থ নির্ধারিত হয় নাই। 'ছুটি খাঁ' দ্র।

দ্র সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পূর্বার্ধ), কলিকাতা, ১৯৬৩।

সুকুমার সেন

পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ অন্য উদ্ভিদের উপর আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্ভিদ। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ আপন খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে এবং আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ হইতে কোনও খাদ্যরস শোষণ করে না। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ হইতে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের কোনও ক্ষতি হয় না। আম ও অন্যান্য গাছের উপর পরাশ্রয়ী অর্কিড দেখা যায়। অর্কিডের কতকগুলি মূল আশ্রয়দাতা গাছকে জড়াইয়া থাকে এবং কতকগুলি অপেক্ষাকৃত বড় বায়বীয় মূল শূন্যে ঝুলিয়া থাকে। বায়বীয় মূলগুলির 'ভেলামেন' নামক আবরণ সহজেই বৃষ্টির জল ও জলীয় বাষ্প শোষণ করিতে পারে। শুষ্ক অবস্থায় বায়বীয় মূলকে কাগজের মত দেখায়; জলের সংস্পর্শে আসিলে জল শোষণ করিয়া ইহা সবুজ হইয়া যায়। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের কৃত্তিক (কিউটিক্‌ল), পাতা ও শাখা সাধারণতঃ পুরু হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাতার আকৃতি বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার উপযোগী। অনেক ফার্ন ও কচু গাছ পরাশ্রয়ী হইয়া থাকে।

দ্র A.B. Rendle, *The Classification of Flowering Plants,* vol. I, London, 1959.

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

পরিণামবাদ সৃষ্টির কারণ এবং সেই কারণ হইতে কার্যোৎপত্তির রীতির প্রসঙ্গে ভারতীয় দার্শনিকগণ অবতারণা করিয়াছেন দুইটি দার্শনিক মতবাদের— পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ।

পরিণামবাদ নামটি হইতেই ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বের বিষয় স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। এই মতানুসারে কারণ দুই প্রকারের—উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। যথা, কারণ মৃৎপিণ্ড হইতে যখন কার্য মৃন্ময় ঘটের উৎপত্তি হয়, তখন মৃৎপিণ্ডকে বলা হয় 'উপাদান কারণ'; ঘট নির্মাণের জন্য বিশেষ বিশেষ বাহ্যিক উপকরণ যন্ত্রাদি ও আন্তর শক্তিসম্পন্ন কুম্ভকারই হইলেন 'নিমিত্ত কারণ'। এস্থলে নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার

উপাদান কারণ মৃৎপিণ্ডকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাহ্যিক যন্ত্র, উপকরণ প্রভৃতি এবং আন্তর ঘটনির্মাণের শক্তির দ্বারা তাহা হইতে পরিশেষে একটি মৃন্ময় ঘটের সৃষ্টি করেন। এইভাবে একটি কার্যের উদ্ভব হয় এই দ্বিবিধ কারণে, অর্থাৎ উপাদান ও নিমিত্ত কারণের মিলিত সহায়তায়।

এইরূপ কার্যসৃষ্টির রীতির নামই 'পরিণাম', অর্থাৎ যখন বলা হয় কারণ কার্য সৃষ্টি করিতেছে, তখন তাহার অর্থ স্বয়ং কারণ কার্যে পরিণত হইতেছে। এইরূপে উপাদান কারণ মৃৎপিণ্ড কার্য মৃন্ময় ঘটে পরিণত হয়। ইহাই ভারতীয় দর্শনের সুবিখ্যাত 'পরিণামবাদ'। এইরূপ পরিণামবাদের মূল ভিত্তি হইল ভারতীয় দর্শনের অন্য এক মূলীভূত তত্ত্ব অর্থাৎ সৎকার্যবাদ। এই মতানুসারে সৃষ্টির পূর্বে ও প্রলয়ের পরে কার্য অব্যক্ত ও অজ্ঞাতভাবে কারণে তাহার শক্তিরূপে নিহিত হইয়া থাকে এবং পরে সৃষ্টিকালে সেই অন্তর্নিহিত অব্যক্ত শক্তিরূপী কার্য ব্যক্ত হইয়া বর্তমান প্রকৃত কার্যটির রূপ পরিগ্রহ করে। যথা, দুগ্ধকে একটি বিশেষ প্রকারে মন্থন করিলে পরিশেষে দুগ্ধ হইতে ননি পাওয়া যায়, কারণ দুগ্ধে পূর্ব হইতেই অব্যক্তভাবে ননি নিহিত রহিয়াছে এবং সেইজন্যই কেবল দুগ্ধ হইতেই ননি পাওয়া যায়, অন্যান্য বস্তু হইতে নয়।

পরিণামবাদের স্বভাবতঃই একটি সিদ্ধান্ত হইল যে, কারণ এবং কার্য কেবল সমজাতীয় নয় সেই সঙ্গে সমান সত্যও, অর্থাৎ এস্থলে কারণ মৃৎপিণ্ড যেমন সত্য, ঠিক তেমনই সত্য তাহার সাক্ষাৎ পরিণাম বা শক্তিবিক্ষেপ মৃন্ময় ঘট।

পরিণামবাদের বিপরীত মতবাদ হইল 'বিবর্তবাদ'। এই মতানুসারে তথাকথিত কারণ হইতে যে কার্যের উদ্ভব হয় তাহা সত্য নয়, মিথ্যাই মাত্র, যেহেতু এস্থলে অন্য কোনও দ্বিতীয় বস্তু বা কার্যের একেবারেই উদ্ভব হইতেছে না। এরূপ বিবর্তবাদের সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ হইল রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জুর স্থলে সর্প প্রত্যক্ষ করিলেও সর্পটি মিথ্যাই মাত্র, অজ্ঞানের ফলই মাত্র, সত্য কদাপি নয়।

বেদান্তদর্শনের ক্ষেত্রে বিবর্তবাদ শংকর প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীগণের এবং পরিণামবাদ রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদীগণের মতবাদ। বৈদান্তিক মতানুযায়ী না হইলেও সাংখ্য-যোগদর্শনও পরিণামবাদী।

পরিণাম ও বিবর্তবাদ কেবল পার্থিব কার্যোৎপত্তির ক্ষেত্রেই নয়, জগদ্রূপ কার্যোৎপত্তির ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। এরূপে বিবর্তবাদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; ব্রহ্ম হইতে সত্যই জীবজগতের সৃষ্টি হয় নাই; তথাকথিত জীবজগৎ মিথ্যাই মাত্র। কিন্তু পরিণামবাদের মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে সত্যই জীবজগতের সৃষ্টি হয়, ব্রহ্ম সত্যই জীবজগতে পরিণত হন; জীবজগৎ সত্যই ব্রহ্মের গুণ বা শক্তি যাহা সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মে অব্যক্তভাবে, অজ্ঞাতভাবে, অপরিণতভাবে নিহিত হইয়া থাকে; সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম হইতে পরিণত হইয়া বর্তমানে জীবজগতের ব্যক্ত রূপ, জ্ঞাতরূপ ধারণ করে; প্রলয়কালে পুনরায় ব্রহ্মে অব্যক্ত, অজ্ঞাত ও অপরিণতভাবে বিলীন হইয়া যায়।

বলা বাহুল্য যে, কোনও দার্শনিক মতবাদই সম্পূর্ণ দোষশূন্য নয়। সেইজন্য বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আজও সমানে চলিয়াছে। পরিণামবাদানুসারে স্বয়ং ব্রহ্মই ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইতেছেন আক্ষরিক অর্থে, পরিপূর্ণ অর্থে, প্রকৃত অর্থে। সেইজন্যই সত্যই বলিতে পারা যায়—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩।১৪।১)—'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম'। 'ব্রহ্মেদং সর্বম্' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৫।১)—'ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড'। সেজন্য আপাতদৃষ্টিতে এই সংসার 'সর্বং দুঃখং দুঃখম্', অর্থাৎ আদ্যোপান্ত দুঃখদৈন্য-দলিত বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতকল্পে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পরিণাম এই ব্রহ্মাণ্ড দুঃখপূর্ণ নয়, ক্ষণস্থায়ী নয়, শূন্যগর্ভও নয়; যেহেতু তাহার সর্বত্র স্বয়ং ব্রহ্ম বিরাজিত। অজ্ঞানবশতঃ এই মহাসত্যটি উপলব্ধি করিতে পারা যায় না; মোক্ষসাধনার মূল কথাই হইল এইরূপ অজ্ঞানাবরণ অপসৃত করিয়া নিজের ও বিশ্বের ব্রহ্মস্বরূপত্ব উপলব্ধি করা।

রমা চৌধুরী

পরিপাক জটিল খাদ্যদ্রব্যকে বিশোষণযোগ্য সরলতর অণুতে পরিণত করিবার পদ্ধতি। খাদ্যে বর্তমান প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ পদার্থের অধিকাংশ অণুই জটিল এবং দেহে গ্রহণ ও আত্তীকরণের (অ্যাসিমিলেশন) অনুপযোগী। এসকল জটিল যৌগকে দেহে বিশোষণযোগ্য ও কার্যোপযোগী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ ও গ্রন্থির সমাহারকেই পাচনতন্ত্র বলা হয়। পৌষ্টিক নালী ও কতিপয় পরিপাক-সহায়ক গ্রন্থি লইয়া পাচনতন্ত্র সংগঠিত। পৌষ্টিক নালী মুখবিবর, খাদ্যনালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রে বিভক্ত; খাদ্য মুখবিবর দিয়া পৌষ্টিক নালীতে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ বৃহদন্ত্রের দিকে চালিত হয়। পৌষ্টিক নালীতে বিভিন্ন

পরিপাক-সহায়ক গ্রন্থির রস আসিয়া ঐ খাদ্যকে পরিপাক করে। যেটুকু খাদ্যের পরিপাক সুসম্পন্ন হয় তাহা পৌষ্টিক নালী হইতে রক্তে বিশোষিত হইয়া যায়; খাদ্যের অবশিষ্ট অপাচ্য অংশ মলের সহিত বর্জিত হয়। পরিপাক-সহায়ক গ্রন্থিগুলির রস খাদ্যের বিশেষ বিশেষ অণুকে ভাঙ্গিয়া সরল অণুতে পরিণত করে। এরূপ গ্রন্থির মধ্যে অগ্ন্যাশয়, যকৃত ও লালাগ্রন্থি উল্লেখযোগ্য; এতদ্ব্যতীত পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশের গাত্রেও পরিপাক-সহায়ক গ্রন্থি থাকে। এসকল গ্রন্থির অধিকাংশেরই রসে নানাপ্রকার এন্‌জাইম বর্তমান। 'অগ্ন্যাশয়', 'অন্ত্র', 'এন্‌জাইম', 'গ্রন্থি', 'পাকস্থলী', 'পিত্ত', 'পিত্তস্থলী', 'যকৃত' ও 'লালা' দ্র।

অজিতকুমার চৌধুরী

পরিবর্ধক সাধারণভাবে তড়িৎ-চাপ, তড়িৎ-প্রবাহ বা শক্তির মান বহুগুণ বর্ধিত করিবার যন্ত্র বা যন্ত্রসমষ্টি। পরিবর্ধক বর্তনীতে থার্মিয়নিক ভাল্‌ভ বা ট্রান্‌জিস্‌টর ব্যবহৃত হয়। পরিবর্ধকের মান নির্দিষ্ট হয় পরিবর্ধক গুণাংক-এর দ্বারা। নির্গত তড়িৎ-চাপ, তড়িৎ-প্রবাহ বা শক্তির সহিত আগত চাপ, প্রবাহ ও শক্তির অনুপাতকে পরিবর্ধক গুণাংক বলে। ইহা বর্তনী ও স্পন্দসংখ্যা ব্যতীত ব্যবহৃত ভাল্‌ভ বা ট্রান্‌জিস্‌টরের গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল ও ইহার মাত্রা শতাধিক পর্যন্ত হইতে পারে। ব্যবহার ও গুণ অনুসারে পরিবর্ধককে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সাধারণ বেতার গ্রাহকযন্ত্রে উচ্চ স্পন্দসংখ্যা ও শ্রাব্যস্পন্দসংখ্যায় তড়িৎ-চাপ পরিবর্ধক ও লাউড্‌স্পিকারের সহিত শক্তি-পরিবর্ধক ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বেতার-প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র ব্যতীত বহুবিধ আধুনিক যন্ত্রশিল্পেও পরিবর্ধকের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে।

অসিতকুমার দত্ত

পরিবহণ ও যোগাযোগ অর্থনৈতিক বিকাশের মূলে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। অনুন্নত অর্থনীতির উন্নয়নের পক্ষে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হইল শিল্পসমূহের বাজারের সীমাবদ্ধতা। পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এই অবস্থার বহুলাংশে প্রতিকার ঘটাইতে পারে। তাই সুষ্ঠু পরিবহণ ও যোগাযোগ পরিকল্পনা সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ। প্রশাসন, জাতীয় সংহতি, দেশরক্ষা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ইত্যাদি দিক হইতেও পরিবহণ ও যোগাযোগের গুরুত্ব সমধিক। ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার এই সামগ্রিক গুরুত্ববোধ সুস্বীকৃত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারি উদ্যোগে পরিকল্পিত মোট ব্যয়ের শতকরা ২৪ ভাগ অর্থাৎ ৫৭১ কোটি টাকা পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (সংশোধিত হিসাব) এইখাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ২৮·১ ভাগ অর্থাৎ ১২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার জন্য ১৪৮৬ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও রেলপথগুলি প্রধানতঃ বেসরকারি পরিচালনাধীনে পরিচালিত হইত। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতীয় রেলপথগুলি ক্রমান্বয়ে সরকারি মালিকানায় লইয়া আসা হইতেছে। বর্তমানে রেলপরিবহণ ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই রাষ্ট্রায়ত্ত। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রেলপথের বিস্তৃতি ছিল মাত্র ৩২ কিলোমিটার; ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ তাহা ৫৯০৭৫ কিলোমিটার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রেলপথে যাত্রীবহনের সংখ্যা ছিল ২১১ কোটি ১২ লক্ষ এবং পণ্যবহনের পরিমাণ ছিল ২০২৭ লক্ষ মেট্রিক টন। আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন রেলপথের পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে রূপায়িত হয়। বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত রেলপথগুলি দক্ষিণ রেলপথ, পশ্চিম রেলপথ, মধ্য রেলপথ, উত্তর রেলপথ, উত্তর-পূর্ব রেলপথ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ, পূর্ব রেলপথ ও দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ এই নয়টি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত।

সুষ্ঠু পথনির্মাণ পরিকল্পনা মূলধনসৃজন ও লোকনিয়োগ উভয় দিক হইতেই অনুন্নত অর্থনীতির পক্ষে কল্যাণপ্রদ। ভারতে দীর্ঘ মেয়াদী পথ পরিবহণ পরিকল্পনার প্রারম্ভ ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। নাগপুরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে পথসমূহকে জাতীয় সড়ক (ন্যাশন্যাল হাইওয়ে), রাজ্য সড়ক (স্টেট হাইওয়ে), জেলা সড়ক ও গ্রাম্য পথ, এই ৪ ভাগে ভাগ করিয়া তাহাদের সুষ্ঠু উন্নয়ন ও বিকাশের পরিকল্পনা লওয়া হয়। ইহাতে স্থির হয় যে উন্নত কৃষি-অঞ্চলে কোনও গ্রাম প্রধান পথ হইতে ৫ মাইল (প্রায় ৮ কিলোমিটার) ও অন্যান্য অঞ্চলে ২০ মাইলের (প্রায় ৩২ কিলোমিটার) বেশি দূরে থাকিবে না। স্বাধীন ভারতে এই নীতি মোটামুটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে

মোট ৯৭৫০০ মাইল (প্রায় ১৫৬০০০ কিলোমিটার) দীর্ঘ আচ্ছাদিত পথ (সার্ফেস্‌ড রোড) ছিল; ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ তাহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৮৩৬৮০ কিলোমিটার (১৭৭৩০০ মাইল) হইয়া দাঁড়ায়। ওই তারিখে অনাচ্ছাদিত রাস্তা দৈর্ঘ্যে ছিল ৬৭৪২৪০ কিলোমিটার (৪২১৪০০ মাইল)। পথপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা গঠিত হইয়াছে। তাহাদের চেষ্টায় যাত্রীপরিবহণ ব্যবস্থার কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় সড়কগুলির মোট দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ২৩৮১০ কিলোমিটার (১৪৮৮০ মাইল)।

স্বাধীনতার পূর্বে অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতীয় নৌযানের স্থান ছিল অতি সামান্য। স্বাধীনতার পরে ভারতীয় উপকূলে বাণিজ্যিক পরিবহণ মূলতঃ ভারতীয় পোতপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য সংরক্ষিত করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যেও ভারতীয় পোতপ্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। অবশ্য এখনও পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা মাত্র ১২-১৫ ভাগ পরিবহণের ভার ভারতীয় পোত-প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে আছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় পোতশিল্পের মোট পরিবহণমান (টনেজ) ৫ হইতে ৭ বৎসরের মধ্যেই প্রায় ২০ লক্ষ মেট্রিক টন করার সংকল্প লওয়া হয়। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহা দাঁড়ায় প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

ভারতে বিমান পরিবহণের সূত্রপাত প্রকৃতপক্ষে ২০শ শতাব্দীর ২য় দশকে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইহার দ্রুত উন্নতি ঘটে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিমানক্ষেত্রে ৯টি এবং বৈদেশিক বিমান পরিবহণের জন্য একটি কোম্পানি ছিল। সেই বৎসর বিমান পরিবহণ-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া আভ্যন্তরীণ পরিবহণের জন্য 'ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌স কর্পোরেশন' এবং বৈদেশিক পরিবহণের জন্য 'এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশন্যাল কর্পোরেশন' (বর্তমানে 'এয়ার ইণ্ডিয়া' নামে অভিহিত) নামে দুইটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গঠিত হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিমানপথে যাত্রীপরিবহণের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ এবং পরিভ্রমণের বিস্তৃতি ছিল ১৯২ লক্ষ মাইল (প্রায় ৩০৭ লক্ষ কিলোমিটার); ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৬'৩ লক্ষ যাত্রী এবং ৫৫৮ লক্ষ কিলোমিটার পরিভ্রমণপথ হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে সান্তা ক্রুজ, পালাম, দমদম প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিমান-বন্দরগুলি আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সংস্কৃত ও নবীকৃত হয়। ইহা ছাড়া 'ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌স কর্পোরেশন' এবং 'এয়ার ইণ্ডিয়া' আধুনিক বিমানপোত ক্রয় করিয়া নিজ-নিজ পোতবহনকে আন্তর্জাতিক মানের উপযোগী করিয়াছেন।

বিভিন্ন পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থার নিজস্ব এলাকা স্থিরীকরণ ও পারস্পরিক সহযোগের ব্যবস্থা করা হইতেছে। পথপরিবহণ ও রেলপথের মধ্যে প্রতিযোগিতা পরিহারের জন্য স্থলপথ-গুলিকে রেলপথের সমান্তরাল না করিয়া যথা সম্ভব উর্ধ্বাধঃ (ভার্টিক্যাল) করার নীতি গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এইরূপ পরিপূরক নীতি গৃহীত হইতেছে।

ডাক, তার, বেতার ও টেলিফোন, যোগাযোগের এই চারিটি প্রধান ব্যবস্থাই ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত। ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৩৬০০০ ডাকঘর, ৩৬০০ তার কার্যালয় এবং ১৬৮০০০ টেলিফোনসংযোগ ছিল। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বাড়িয়া যথাক্রমে দাঁড়ায় ৯৭০০০ ডাকঘর, প্রায় ১২০০০ টেলিগ্রাফ অফিস ও ৯৫১০০০ টেলিফোন-সংযোগ। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের অন্তে টেলিপ্রিণ্টারের সংখ্যা ছিল ৫৩১৪। বেতারকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়া ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হয় ২২৪। প্রতিটি ভারতীয় ভাষা-এলাকায় অন্ততঃ একটি বেতারকেন্দ্র স্থাপনের নীতি গৃহীত হইয়াছে।

দ্র M. R. Bonavia, *Economics of Transport*, Cambridge, 1957; Planning Commission, *Third Five-year Plan*, Delhi, 1961; *India : Committee on Transport Policy and Coordination Final Report*, Delhi, 1966.

সুব্রতেশ ঘোষ

পরিবার পরিকল্পনা সুপরিকল্পিত প্রজনন। পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সমার্থক শব্দ নহে; জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিমাত্র। দেহ, মন ও সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অপরিহার্য। প্রতি বৎসর শতকরা ১ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাইলে জনসংখ্যা ৭০ বৎসরে দ্বিগুণ হইয়া যায়; ভারতে জনসংখ্যা বৎসরে শতকরা ২'৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়, এই হারে ৩০ বৎসরেরও কম সময়ে জনসংখ্যা দ্বিগুণে পরিণত হইতে পারে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি খাদ্যসমস্যার সৃষ্টি করে; জন্মনিয়ন্ত্রণ না করিয়া কেবল খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব, কারণ পৃথিবীতে কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ সীমিত। অতএব জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ না করিলে বিপদ

অনিবার্য। জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনাই ইহার একমাত্র সমাধান।

বিশ্বের প্রথম পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুক্‌লিন শহরে মার্গারেট সিংগার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের সন্তোষজনক পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য, সুপ্রযোজ্য, স্বল্পব্যয়সাধ্য এবং দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়া নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন। এ পর্যন্ত সকল দিক দিয়া সুবিধাজনক কোনও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই, প্রত্যেক প্রচলিত পদ্ধতিরই কোনও না কোনও অসুবিধা আছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের সুপ্রাচীন ও সর্বাধিক প্রচলিত 'ব্যাহত-সংগম' (কয়টাস ইন্‌টেরাপ্‌টাস, Coitus interruptus) পদ্ধতিতে শুক্র নির্গত হইবার পূর্বেই সংগম ব্যাহত করা হয়, ফলে গর্ভ নিবারিত হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি সকল সময়ে সফল হয় না; তাহা ছাড়া এরূপ ক্রিয়ার ফলে পূর্ণ যৌনতৃপ্তিও ব্যাহত হয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণের অপর এক পদ্ধতিকে 'নিরাপদ কাল' (সেফ পিরিয়ড) পদ্ধতি বলা চলে। সাধারণতঃ নারীর ঋতুচক্রের ১৪শ হইতে ১৬শ দিবসের মধ্যে ডিম্বাশয় হইতে ডিম্বাণু নির্গত হয় ('ঋতু[২]' ও 'ডিম্বাশয়' দ্র); ডিম্বাণু ডিম্বাশয় হইতে বাহির হওয়া মাত্র ২-৩ দিনের মধ্যেই উহার সহিত শুক্রাণুর মিলন সম্ভব। অতএব ঋতুচক্রের ১০ম হইতে ১৭শ দিবস পর্যন্ত সময়টিতে সংগম বন্ধ রাখিলে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু ডিম্বাশয় হইতে ডিম্বাণুর নির্গমন-কাল সকল সময়ে সুনির্দিষ্ট থাকে না; সহজে ঐ সময় নির্দেশ করাও সম্ভব নয়। সেজন্যই এই পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য নহে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্যতম পদ্ধতিতে সংগমকালে পুরুষকে রবারের পাতলা আস্তরণ (কন্‌ডোম) ব্যবহার করিতে হয়, ফলে স্ত্রীর জননতন্ত্রে শুক্র প্রবেশ না করায় গর্ভের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু আস্তরণের ব্যয়, আস্তরণ-পরিধানে অনুভূতির হ্রাস এবং কখনও কখনও আস্তরণটি ছিঁড়িয়া গিয়া পদ্ধতির অসাফল্য এই পদ্ধতির কয়েকটি অসুবিধা। বর্তমানে ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে 'নিরোধ' নামক রবারের আস্তরণ স্বল্পব্যয়ে লভ্য হইয়াছে।

অপর এক পদ্ধতিতে সংগমের পূর্বে স্ত্রীর জরায়ুর মুখের নিকটে রবারের পরদার মত বস্তু (যথা ডায়াফ্রাম) প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়; শুক্রাণু জরায়ুর দিকে যাইতে ঐ পরদায় বাধা পায়, ফলে ডিম্বাণুর সহিত শুক্রাণুর মিলন ঘটিতে পারে না। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় তাহা নানা মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে।

সংগমের অনতিপূর্বে শুক্রাণু নাশ করিবার উপযোগী রাসায়নিক জেলি স্ত্রীর যোনিপথে প্রবেশ করাইয়া দিলে শুক্র যোনিতে আসিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়; ইহাও জন্মনিয়ন্ত্রণের অপর এক পদ্ধতি। এ পদ্ধতি কখনও কখনও সফল হয় না।

বিভিন্ন হর্মোন স্ত্রীর ডিম্বাশয় হইতে ডিম্বাণুর নির্গমন রোধ করিতে পারে। এরূপ হর্মোন-ঘটিত ঔষধ ঋতুচক্রের নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে খাইলে গর্ভসঞ্চার রোধ করা যায়। কখনও কখনও এই পদ্ধতির প্রয়োগে শারীরিক প্রতিক্রিয়া ঘটিবার সম্ভাবনা থাকায় চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত এই পদ্ধতি ব্যবহার করা অনুচিত।

স্ত্রীর জরায়ুর মধ্যে প্ল্যাস্টিকনির্মিত 'লুপ' নামক বস্তু প্রবেশ করাইয়া দিলে গর্ভধারণ নিবারিত হয়। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতির মুখ্য অসুবিধাগুলির মধ্যে অত্যধিক ঋতুস্রাব ও জরায়ুর জীবাণুসংক্রমণ উল্লেখযোগ্য।

স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য হইল 'নির্বীজন' (স্টেরিলাইজেশন) পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে স্ত্রীর জরায়ুনালী (ফ্যালোপিয়ান টিউব) অথবা পুরুষের শুক্রনালী (ভাস ডেফারেন্স) বাঁধিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। প্রথম ক্ষেত্রে ডিম্বাশয় হইতে নির্গত ডিম্বাণু জরায়ুনালীতে প্রবেশ করিতে না পারায় শুক্রাণুর সংস্পর্শে আসিতে পারে না; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পুরুষের শুক্রাণু শুক্রনালী দিয়া আসিতে না পারায় শুক্রে শুক্রাণু থাকে না; উভয় ক্ষেত্রেই গর্ভসঞ্চার অসম্ভব হয়।

ভারতে ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬৫ লক্ষ টাকা, ২য় পরিকল্পনায় ৪৯৭ লক্ষ টাকা, ৩য় পরিকল্পনায় ২৭ কোটি টাকা এবং ৪র্থ পরিকল্পনায় ৯৫ কোটি টাকা পরিবার পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। ভারতে জন্মহার কমাইয়া প্রতি হাজারে ২৫ করাই বর্তমান পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন শহরে ১৮৭৯টি এবং গ্রামে ২৪৩৬৬টি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপিত হয়, প্রায় ৯০০০ চিকিৎসালয় ও হাসপাতালেও পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচী পরিচালিত হয়, ৪৬১৩৭৬০ ব্যক্তিকে নির্বীজন করা হয় এবং ২৫২৩৩৯৬ নারীর জরায়ুতে লুপ প্রবেশ করানো হয়।

দ্র R. L. Day, *Fertility Control*, New York; Government of India, *Swasth Hind : Family Planning No.*, December 1966; Government

of India, *Family Planning News*, vol. *IX*, no. 11, 1968.

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

পরিমিতি ক্ষেত্রতত্ত্ব। গণিতের যে বিভাগ দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল এবং ঘনফলের পরিমাপ লইয়া আলোচনা করে তাহার নাম পরিমিতি। পরিমাপের সূত্রসমূহের প্রমাণ জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি এবং সমাকলন শাস্ত্রে আলোচিত হয়।

প্রাথমিক সামতলিক ক্ষেত্রফল ও দৈর্ঘ্য: প্রথমে দৈর্ঘ্যের একক মনোনয়ন করা হয় (ফুট, গজ, মাইল ইত্যাদি অথবা সেন্টিমিটার, মিটার, কিলোমিটার)। যে বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহু একক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তাহার ক্ষেত্রফলকে ক্ষেত্রফল পরিমাপের জন্য একক গ্রহণ করা হয় (বর্গফুট, বর্গমিটার ইত্যাদি)।

ঘনফল পরিমাপের একক: যে ঘনকের প্রত্যেক বাহু একক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ প্রত্যেকেই একক দৈর্ঘ্যের) তাহার ঘনফলকে একক গ্রহণ করা হয়।

১. আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ ;

$$\text{কর্ণের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{\text{দৈর্ঘ্য}^2 + \text{প্রস্থ}^2}\ ;$$

সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল = ভূমি × উচ্চতা ;

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}$ (ভূমি × উচ্চতা) ;

ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য ক, খ, গ এবং পরিসীমার অর্ধেক প হইলে, ক্ষেত্রফল

$$\triangle = \sqrt{\text{প}(\text{প}-\text{ক})(\text{প}-\text{খ})(\text{প}-\text{গ})}\ ;$$

বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল: চারিবাহুর দৈর্ঘ্য ক, খ, গ, ঘ এবং পরিসীমার অর্ধেক প হইলে

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \sqrt{(\text{প}-\text{ক})(\text{প}-\text{খ})(\text{প}-\text{গ})(\text{প}-\text{ঘ})}$$

(ব্রহ্মগুপ্তের সূত্র)।

ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2}$ সমান্তর বাহুদ্বয়ের সমষ্টি × উচ্চতা।

২. বৃত্ত:

যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ r তাহার ক্ষেত্রফল πr^2 এবং পরিধি $2\pi r$ [π = ৩.১৪১৬ (আসন্ন মান)] ;

উপবৃত্ত: অর্ধ-পরাক্ষ a এবং অর্ধ-উপাক্ষ b হইলে ক্ষেত্রফল πab।

৩. $y=F(x)$ যদি কোনও রেখা নির্দেশ করে, তাহা হইলে $y=F(x)$, $x=a$, $x=b$ এবং x অক্ষ $(y=0)$ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল (সমাকলন শাস্ত্রে)

$$\int_a^b F(x)\,dx$$

৪. আয়তঘন (সমকোণী চৌপল): a, b, c যথাক্রমে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ হইলে

ঘনফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × বেধ = abc ;

তলদেশের ক্ষেত্রফল = $2(ab+ac+bc)$;

কর্ণের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{(a^2+b^2+c^2)}$.

প্রিজ্‌ম্:

ঘনফল = ভূমি × উচ্চতা ;

শিখর বা পিরামিড এবং চতুস্তলক:

ঘনফল = $\frac{1}{3}$ ভূমি × উচ্চতা

৫. স্তম্ভক:

ঘনফল = ভূমি × উচ্চতা ;

লম্ববৃত্তাকার স্তম্ভকের ভূমির ব্যাসার্ধ r এবং উচ্চতা h হইলে ঘনফল $\pi r^2 h$;

বক্রপৃষ্ঠতল = ভূমির পরিধি × উচ্চতা = $2\pi rh$;

শঙ্কু (মোচক): ঘনফল = $\frac{1}{3}$ ভূমি × উচ্চতা

লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর ভূমির ব্যাসার্ধ r এবং উচ্চতা h হইলে ঘনফল $\frac{1}{3}\pi r^2 h$,

বক্রপৃষ্ঠতল = $\frac{1}{2}$ ভূমির পরিধি × হেলান উচ্চতা

$$= \pi r\sqrt{h^2+r^2}.$$

গোলক: গোলকের ব্যাসার্ধ r হইলে ঘনফল $\frac{4}{3}\pi r^3$ এবং পৃষ্ঠতল $4\pi r^2$।

কামিনীকুমার দে

পরিসংখ্যান স্ট্যাটিস্‌টিক্স। পরিসংখ্যান বা রাশি-বিজ্ঞান বিষয়ে পঠনপাঠন ও গবেষণা এদেশে খুবই নূতন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও তাঁহার কতিপয় সহকর্মীর প্রচেষ্টায় ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন (১৯৩১ খ্রী) এদেশে এই বিষয়ে সম্যক আলোচনার সূত্রপাত বলা চলে। অবশ্য এমন কি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এবং আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী-তে আকবরের শাসনকালে পরিসংখ্যান তথ্যের ব্যবহারের নজির রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে পরি-সংখ্যানতত্ত্বের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত নূতন। যদিও লা-প্লাস্ (১৭৪৯-১৮২৭ খ্রী) ও গাউস্-এর (১৭৭৭-১৮৫৫ খ্রী) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীতে ইহার মূলসূত্র পাওয়া যায়, তথাপি ১৯শ শতাব্দীর শেষ-চতুর্থাংশেই ইহার সম্যক বিকাশ ঘটে। ইংল্যাণ্ডে কার্ল পিয়ার্সনের (১৮৫৭-১৯৩৬ খ্রী) প্রভাবেই পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটে।

পরবর্তীকালে এই বিজ্ঞানের বিকাশসাধনে ডব্লিউ. এস. গসেট (১৮৭৬-১৯৩৭ খ্রী), আর. এ. ফিশার (১৮৯০-১৯৬০ খ্রী), জে. নেম্যান, ই. এস. পিয়ার্সন এবং এ. ওয়াল্ড (১৯০২-৫০ খ্রী)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কার্ল পিয়ার্সন পরিসংখ্যান পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহার জৈব বৈজ্ঞানিক পরিমাপসমূহের সম্যক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিসংখ্যান পদ্ধতিসমূহের ব্যবহার নানা বিষয়ে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। অর্থনীতিতে প্রতীকসংখ্যা (ইন্‌ডেক্স নাম্বার) নির্ধারণ, পূর্বাভাষ নির্ণয়, চাহিদা ও সরবরাহ বিশ্লেষণ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিরূপ (মডেল) বিশ্লেষণ ইত্যাদিতে পরিসংখ্যানের ব্যবহার সুবিদিত। ইহা ছাড়া জনস্বাস্থ্য, মনোবিদ্যা ও জীববিদ্যায় পরিসংখ্যানের নিত্য নূতন ব্যবহার হইতেছে। এমন কি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নেও বর্তমানে পরিসংখ্যানের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শিল্পেও গুণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির (কোয়ালিটি কন্ট্রোল) সাহায্যে ত্রুটিহীন শিল্পবস্তুর উৎপাদনের দ্বারা অপচয় বন্ধ করা সম্ভব। কৃষিক্ষেত্রে পরিসংখ্যান-সম্মত বিভিন্ন পরীক্ষা-পদ্ধতির ব্যবহারের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

উপরে আলোচিত ফলিত পরিসংখ্যান ছাড়া বর্তমান শতাব্দীতে বিশ্লেষণী পরিসংখ্যানেরও (অ্যানালিটিক্যাল স্ট্যাটিস্‌টিক্স) প্রভূত উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। পরিসংখ্যানের সাহায্যে কোনও প্রশ্নের সমাধানের জন্য কোনও সমগ্র জিনিস বা সমগ্রক ('পপুলেশন' বা 'কালেক্‌টিভ') সম্বন্ধে জানিতে হইলে ঐ সমগ্রক হইতে গৃহীত একটি নমুনা (স্যাম্প্‌ল) লইয়া অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়। অর্থ ও সময়ের সীমাবদ্ধতা ও অন্যান্য বাস্তব কারণে বহুক্ষেত্রে এইরূপ নমুনা লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। যে নমুনা গ্রহণ করা হয় তাহা হইতে রাশিতথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি নমুনাঙ্ক পাওয়া যায়। সেইগুলি হইতে পূর্ণাঙ্ক সম্বন্ধে অনুমান করা হয়। এই পূর্ণাঙ্কগুলি হইতেই সমগ্রককে জানা যায়। নমুনা লওয়া, রাশিতথ্য বিশ্লেষণ করিয়া নমুনাঙ্ক নির্ণয় করা ও নমুনাঙ্ক হইতে পূর্ণাঙ্ক সম্বন্ধে অনুমান করা—সবগুলিই বিশ্লেষণী পরিসংখ্যানের বিষয়বস্তু। স্বভাবতঃই এই অনুমান তত্ত্বের সাহায্যে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেগুলি সঠিক হইতে পারে না; ইহাতে কিছুটা সংশয়মাত্রা থাকিয়া যায়। এই সংশয়বিচার (টেস্ট অফ সিগ্‌নিফিক্যান্স) সম্ভাব্যবাদের (থিয়োরি অফ প্রব্যাবিলিটি) মূল সূত্রগুলির উপরে নির্ভরশীল। তাই বিশ্লেষণী পরিসংখ্যান সম্ভাব্যবাদের মূল সূত্রগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত ও ইহার সাহায্যে নমুনাঙ্ক হইতে পূর্ণাঙ্ক সম্বন্ধে অনুমান করিতে পারা যায়।

এই প্রসঙ্গে সম্ভাব্যবাদের সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। ১৮শ শতাব্দীতে বিখ্যাত ফরাসী জুয়াড়ি শেভালিয়ে দ্য মেরে গণিতজ্ঞ পাস্‌কাল (১৬২৩-৬২ খ্রী)-কে জুয়াখেলায় যুক্তি ও অভিজ্ঞতায় অসাম্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করেন ও উহাদের সমাধান চাহেন। ইহা লইয়া পাস্‌কাল ও ফের্মা (১৬০১-৬৫ খ্রী)-র সঙ্গে যে পত্রবিনিময় হয় তাহাই সম্ভাব্যবাদের মূলভিত্তি। হাইজেন্স (১৬২৯-৯৫ খ্রী) পরে এই পত্রগুলি সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হন ও সম্ভাব্যবাদের উপরে প্রথম পুস্তক রচনা করেন। পরবর্তীকালে যাঁহারা বিষয়টির বিকাশসাধনে বিশেষ সহায়তা করেন তাঁহাদের মধ্যে জেকব বের্নুলি (১৬৫৪-১৭০৫ খ্রী), আব্রাআম দ্য মোয়াভ্‌র্, লা-প্লাস, চেবিশেভ্ (১৮২১-৯৪খ্রী), মার্কভ্ (১৮৫৬-১৯২২ খ্রী) ও কল্‌মোগোরভের নাম উল্লেখযোগ্য।

সম্ভাবনার সংজ্ঞা কালক্রমে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহার প্রাচীনতম সংজ্ঞা নিম্নরূপ: কোনও বিশেষ ঘটনার গাণিতিক সম্ভাবনা নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ স্থির করিতে হইবে কি ধরনের পরীক্ষার ফলে ঐ বিশেষ ঘটনাটি ঘটিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ঐ পরীক্ষার ফলে কি কি সম-আশংসিত (ইকুয়ালি লাইক্‌লি) ঘটনা ঘটিতে পারে দেখিতে হইবে। তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে ঐ সম-আশংসিত ঘটনাগুলির মধ্যে কতগুলি ঐ বিশেষ ঘটনার পক্ষে সহায়ক। তাহা হইলে ঐ বিশেষ ঘটনার গাণিতিক সম্ভাবনা হইল:

$$\text{গাণিতিক সম্ভাবনা} = \frac{\text{সম-আশংসিত ঘটনাসমূহের যতগুলি ঐ বিশেষ ঘটনার সহায়ক}}{\text{সম-আশংসিত ঘটনাসমূহের মোট সংখ্যা}}$$

উদাহরণস্বরূপ একটি ছক্কা নিক্ষেপ করিলে জোড়-সংখ্যা উঠিবার গাণিতিক সম্ভাবনা নির্ণয় করা যাইতে পারে। একটি ছক্কা নিক্ষেপ করিলে ১ হইতে ৬ এই ছয়টি সংখ্যা উঠিতে পারে এবং ধরিয়া লইতে পারা যায় যে এইগুলি সম-আশংসিত। ইহাদের মধ্যে তিনটি সংখ্যা জোড়। সুতরাং একটি ছক্কা নিক্ষেপ করিলে জোড় সংখ্যা উঠিবার গাণিতিক সম্ভাবনা হইল $\frac{৩}{৬}$ বা $\frac{১}{২}$। স্বভাবতঃ গাণিতিক সম্ভাবনা ০ হইতে ১-এর মধ্যে থাকিবে। কোনও ঘটনার গাণিতিক সম্ভাবনা ০ হইলে বুঝিতে

হইবে ঘটনাটি অসম্ভব এবং ১ হইলে বুঝিতে হইবে ঘটনাটি অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু ঐ সংজ্ঞার অসুবিধা হইল এই যে, সব সময়ে পরীক্ষার ফলে যে ঘটনাগুলি ঘটে তাহারা সম-আশংসিত না হইতে পারে। ছক্কার একটি দিক যদি ভারী হয় তাহা হইলে ১ হইতে ৬ সংখ্যাগুলি সম-আশংসিত হইবে না। ফলে গাণিতিক সম্ভাবনায় পরিসংখ্যা মতবাদের (ফ্রিকোয়েন্সি থিয়োরি) সৃষ্টি হইল। এই মতবাদ অনুসারে কোনও ঘটনার গাণিতিক সম্ভাবনা নির্ণয় করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাটি অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি করিলে ঐ ঘটনাটি যে অনুপাতে ঘটিবে তাহাই হইবে উহার গাণিতিক সম্ভাবনা। এই মতবাদ অনুসারে সম্ভাবনা একটি বিশেষ ধরনের গাণিতিক সীমা (লিমিট)।

কিন্তু এই সংজ্ঞারও অনেক অসুবিধা রহিয়াছে। এমন অনেক ঘটনা রহিয়াছে যাহার সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করা যায় না। যেমন, আগামী কল্য বৃষ্টি হইবে ইহার গাণিতিক সম্ভাবনা ঐভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই সম্ভাব্যবাদের আধুনিক মতবাদ কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ অনুসারে সম্ভাবনা একটি সংখ্যা, যাহা কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সূত্র মানিয়া চলে। তবে সম্ভাবনার সংজ্ঞা যে ভাবেই করা হউক না কেন, সম্ভাব্যবাদের মূল সূত্রগুলি একই এবং বিশ্লেষণী পরিসংখ্যানের মূল ভিত্তি এই সম্ভাবনা তত্ত্বের মূল সূত্রগুলি। বিশ্লেষণী পরিসংখ্যানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল, নমুনা বিশ্লেষণ করিয়া সমগ্রকের বিভিন্ন পূর্ণাঙ্ক সম্পর্কে অনুমান করা। ইহা দুইভাবে করা যাইতে পারে: ১. নমুনাঙ্কের সাহায্যে পূর্ণাঙ্ক পরিমাপ করা (এস্‌টিমেশন) ২. নমুনাঙ্কের সাহায্যে পূর্ণাঙ্ক সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্প বিচার (টেস্টিং অফ হাইপোথেসিস) করিয়া তাহাদের গ্রহণ অথবা বর্জন। এই দুইটি বিষয়ই অনুমানতত্ত্বের অন্তর্গত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমগ্রক সম্বন্ধে জানিতে হইলে নমুনার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এই নমুনা কিভাবে চয়ন করিতে হইবে, কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় নমুনা চয়ন করিলে সমপরিমাণ অর্থব্যয়ে পূর্ণাঙ্ক সম্বন্ধে সর্বাধিক নির্ভুল পরিমাপ করা যায় তাহাও বিচার করিতে হইবে। পরিসংখ্যানের যে বিশেষ শাখা এই আলোচনায় ব্যাপৃত তাহাকে বলা হয় নমুনা-সমীক্ষার পরিকল্পনা (ডিজ়াইন অফ স্যাম্প্‌ল্ সার্ভেজ়)। অন্য বহুক্ষেত্রে দেখা যায় সমগ্রক সম্বন্ধে অনুমান করিতে হইলে এইভাবে নমুনা চয়ন করা সম্ভব নয়। সেসকল ক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষাকার্য চালাইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধানের ১০ প্রকার বীজের মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা ফলনক্ষম জানিতে হইলে বিভিন্ন প্রকার মাটিতে বিভিন্ন প্রকার বীজ বপন করিয়া তাহাদের ফলন পরীক্ষার দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। এ ক্ষেত্রেও কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষাকার্য চালাইলে গৃহীত সিদ্ধান্ত সর্বাপেক্ষা নির্ভুল হইবে তাহা বিচার করিতে হইবে। পরিসংখ্যানের এই বিশেষ শাখাটির নাম পরীক্ষণের পরিকল্পনা (ডিজ়াইন অফ এক্সপেরিমেন্ট্‌স)। কৃষি, চিকিৎসা, জীববিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে যেখানেই পরীক্ষার সাহায্যে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় সেখানেই সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য পরীক্ষার পূর্বে পরীক্ষণের পরিকল্পনা বাঞ্ছনীয়।

দ্র পূর্ণেন্দুকুমার বসু, রাশিবিজ্ঞানের কথা, কলিকাতা, ১৯৫৬ ; J. V. Uspensky, *Introduction to Mathematical Probability*, New York, 1937 ; P. C. Mahalanobis, *Why Statistics ?* Sankhya, vol. X, Part III, 1950 ; G. Yule & M. G. Kendall, *An Introduction to the Theory of Statistics*, London, 1953.

ভাগবত দাশগুপ্ত

পরীক্ষা অধীত বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান বা প্রার্থিত কর্ম সম্বন্ধে প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ণয়ের পদ্ধতি। পরীক্ষা প্রধানতঃ তিনপ্রকার—লিখিত, মৌখিক ও প্রয়োগধর্মী (প্র্যাক্টিক্যাল)।

লিখিত পরীক্ষা মুখ্যতঃ দুইপ্রকার—প্রবন্ধধর্মী (এসে টাইপ) এবং বিষয়মুখী (অব্‌জেক্টিভ)। তন্মধ্যে প্রবন্ধধর্মী পরীক্ষা যুগানুক্রমে প্রচলিত এবং এদেশে ইহারই প্রয়োগ সর্বাধিক।

প্রবন্ধধর্মী পরীক্ষায় অধীত বিষয় সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন চয়ন করিয়া প্রশ্নপত্র রচনা করা হয় ; পরীক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রবন্ধের আকারে উত্তর লিখিতে হয়। ইহাতে অধীত বিষয় সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞান, সমস্যা-সমাধানের উপযোগী চিন্তাশক্তির সংগঠন, ভাব-প্রকাশের সামর্থ্য, ভাষার সৌকর্য প্রভৃতি পরীক্ষিত হয়। কিন্তু উত্তরগুলি প্রবন্ধের আকারে লিখিত হওয়ায় আদর্শ উত্তর নির্দেশ করা কঠিন, তাই বিভিন্ন পরীক্ষকের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন সময়ে একই পরীক্ষকের ক্ষেত্রে পরীক্ষার মানের যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। ভাষার দৈন্যও

পরীক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞান ব্যক্ত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। প্রশ্নের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় এবং বিকল্প প্রশ্নেরও ব্যবস্থা থাকায় পাঠ্য বিষয়ের সকল প্রসঙ্গ সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীর জ্ঞান নির্ণয় করা যায় না; মাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্বন্ধেই আহৃত জ্ঞানের পরীক্ষা সম্ভব হয়। ক্রমে অধিকাংশ প্রশ্নই এরূপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অধ্যায় হইতে নির্বাচিত হইতে থাকে, ফলে অধ্যায় ও প্রশ্ন বাছিয়া পড়ার ও পড়ানোর অভ্যাস বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষা ব্যাহত হয়।

বিষয়মুখী পরীক্ষায় শতাধিক প্রশ্ন উদ্ভাবন করিয়া প্রশ্নপত্র রচনা করা হয়। সাধারণতঃ প্রশ্নপত্রেই প্রত্যেক প্রশ্নের কয়েকটি সম্ভাব্য ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া থাকে এবং সেগুলি হইতে সঠিক উত্তরটির নির্বাচনই পরীক্ষার্থীর দায়িত্ব। কোনও কোনও ক্ষেত্রে উত্তর দেওয়া থাকে না; পরীক্ষার্থীকে উত্তরটি অতি সংক্ষেপে লিখিয়া দিতে হয়। এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা শ্রম ও সময়সাপেক্ষ, কিন্তু আদর্শ উত্তর সংক্ষিপ্ত ও পূর্বনির্দিষ্ট হওয়ায় উত্তর-পত্রের মূল্যায়নে পরীক্ষক বা সময়-ভেদে পার্থক্যের সম্ভাবনা নাই এবং উত্তরপত্র পরীক্ষার সময়ে বিচারশক্তি ও পারিশ্রমিক খুব কম ব্যয় করিতে হয়। পরীক্ষকের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এরূপ পরীক্ষায় উত্তরপত্রের মূল্যায়নকে প্রভাবিত করিতে পারে না। বহুসংখ্যক প্রশ্ন থাকায় অধীত বিষয়ের সকল অধ্যায় সম্বন্ধেই পরীক্ষার্থীর সূক্ষ্ম জ্ঞানের বিচার সম্ভবপর হয়। প্রকাশ-ভঙ্গীর দৌর্বল্য উত্তরদানে বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এ পরীক্ষা প্রধানতঃ তথ্যনির্ভর বিষয় সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; ইহার দ্বারা চিন্তার সংগঠন, ভাবপ্রকাশের শক্তি, তত্ত্ব বা মতবাদের আলোচনা, বিষয় সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞান প্রভৃতির বিচার সম্ভব নয়। এজন্য বিশেষতঃ উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগের যৌক্তিকতা তর্কসাপেক্ষ। তাহা ছাড়া বিষয়মুখী পরীক্ষায় কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সঠিক উত্তর লিখিবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট।

মৌখিক পরীক্ষা প্রধানতঃ ক্লাসে শিক্ষার্থীর দৈনিক অগ্রগতি বিচারের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানসম্পর্কিত বিষয়গুলির উচ্চতর শিক্ষায় প্রয়োগধর্মী পরীক্ষার সময়ে মৌখিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা থাকে। এরূপ পরীক্ষায় প্রশ্নের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং তাহা কোনও রীতি বা পদ্ধতির উপর বিশেষ নির্ভর করে না। প্রশ্নের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হওয়ায় বিষয় সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীর সামগ্রিক জ্ঞান নির্ণয় করা অসম্ভব; অপরিচিত পরীক্ষকের উপস্থিতি-জনিত উদ্বেগ পরীক্ষার্থীর সুচিন্তিত উত্তরদানে ব্যাঘাত ঘটায়। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তরের মূল্যায়ন সম্পূর্ণভাবেই পরীক্ষকের ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর নির্ভর করে এবং পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী-ভেদে পরীক্ষার মানের গুরুতর তারতম্য ঘটে। এসকল কারণে মৌখিক পরীক্ষা বিজ্ঞান-সম্মত বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

উচ্চতর শিক্ষায় বিজ্ঞানবিষয়ে প্রয়োগধর্মী পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানশিক্ষার্থীর অভ্যাস, সামর্থ্য ও জ্ঞান অবশ্যই নির্ণয় করা প্রয়োজন; কিন্তু এদেশে প্রচলিত প্রয়োগধর্মী পরীক্ষায় স্বল্প সময়ে এবং স্বল্পসংখ্যক কার্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ঐ সকল গুণের সঠিক বিচার দুঃসাধ্য। পরীক্ষা-কালীন উদ্বেগ ও অন্যান্য নানা কারণে এরূপ পরীক্ষায় সাফল্য ব্যাহত হইতে পারে।

প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতিগুলির অল্পাধিক ত্রুটি থাকিলেও পরীক্ষার উপযোগিতা অনস্বীকার্য; আগামী পরীক্ষার সম্ভাবনাই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যথাসাধ্য প্রয়াসকে সুনিশ্চিত করে।

দ্র G. M. Ruch, *The Improvement of the Written Examination*, Chicago, 1924; P. Sandiford, *Educational Psychology*, New York, 1939; S. N. Mukherjee, *Evaluating Pupil Progress*, Baroda, 1963; H. J. Taylor, *Three Studies in Examination Technique*, New Delhi, 1964.

আরতি দাশ

পরীক্ষিৎ অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রস্থানের পূর্বে যুধিষ্ঠির পরীক্ষিৎকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং কৃপাচার্যের উপর তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। মৃগয়াকালে একটি মৃগকে শরবিদ্ধ করিয়া তাহার অন্বেষণপ্রসঙ্গে পরীক্ষিৎ শমীকমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। মৌনী শমীকের নিকট মৃগের সম্বন্ধে কোনও উত্তর না পাইয়া তাঁহার গলায় একটি মৃত সর্প ঝুলাইয়া দেন। মুনি রাজাকে ক্ষমা করিলেও মুনিপুত্র শৃঙ্গী শাপ দেন যে, ৭ দিনের মধ্যে রাজা তক্ষকদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। একটি ফলের মধ্য হইতে নির্গত তক্ষক পরীক্ষিৎকে দংশন করিলে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয় সর্পকুলকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে সর্পযজ্ঞে প্রবৃত্ত হন।

সীতানাথ গোস্বামী

পরেশনাথ বিহারের হাজারিবাগ জেলায় অবস্থিত পাহাড় ও জৈনতীর্থ। পরেশনাথ পাহাড়ের প্রাচীন নাম সম্মেতশিখর। জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের নাম অনুসারে বর্তমান নামকরণ। পাহাড়টি বিন্ধ্য, সাতপুরা প্রভৃতি পর্বতমালারই অংশ। ইহার উচ্চতা ১৩৬৬ মিটার। পার্শ্বনাথসহ ২০জন তীর্থংকর ঐ পর্বতে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। পর্বতের শিখরে পার্শ্বনাথের মন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তরে পার্শ্বনাথের এবং অন্য ৪টি মূর্তি আছে। প্রত্যেক মূর্তির পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, জগৎশেঠ সুগলচাঁদ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মূর্তিগুলি স্থাপিত করেন। পর্বতের পাদদেশে মধুবন নামক স্থানে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় জৈনদের মেলা বসে।

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

পর্তুগীজ, ভারতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে পর্তুগীজরা ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহার পূর্বেও ভারতীয় মশলা ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে ইওরোপের অধিবাসীদের পরিচয় ছিল। দারুচিনি, লবঙ্গ, রেশম ও অন্যান্য পণ্য কাবুল ও সমরখন্দ হইয়া ইওরোপে পৌঁছাইত এবং ইটালীর বণিকদের হাত হইতে ইওরোপের অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়িত। ১৫শ শতাব্দীতে ইওরোপের কোনও কোনও দেশে ভারতবর্ষে আসিবার জলপথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। পর্তুগালের রাজা জনের পুত্র রাজকুমার হেনরীর কথা এই সূত্রে স্মরণীয়। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বার্থলমিও ডায়াজ উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভাস্কো-ডা-গামা লিজবোয়া (লিস্‌বন) হইতে যাত্রা করিয়া পরের বৎসর ১৭ মে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে কপ্পাট গ্রামে আসিয়া নোঙ্গর করেন। কপ্পাট গ্রাম মালাবারের রাজধানী কালিকটের ১৬-১৯ কিলোমিটার (১০-১২ মাইল) দক্ষিণে।

মালাবারের রাজাকে জ়ামোরিন বলা হইত। জ়ামোরিন বিদেশীদের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু পর্তুগীজেরা সঙ্গে করিয়া যে সব পণ্যদ্রব্য আনিয়াছিলেন, ভারতবাসীরা তাহার প্রতি বিশেষ ঔৎসুক্য দেখান নাই। ভাস্কো-ডা-গামা নিজে খুব অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের লোক ছিলেন। ৩ মাস পরে আগস্ট মাসের শেষে তিনি দেশে ফিরিয়া যান। যাইবার সময় তিনি কয়েকজন ভারতবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

ভাস্কো-ডা-গামা অল্পদিন এদেশে ছিলেন এবং এদেশের বেশি খোঁজখবরও রাখিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল ভারতবর্ষের বেশির ভাগ লোকই মুসলমান; যাহারা মুসলমান নহে তাহারা সকলেই খ্রীষ্টান। হিন্দুদের কথা তিনি জানিতেন না। একটি হিন্দু মন্দিরের দেবীমূর্তিকে মেরীর মূর্তি মনে করিয়া তিনি পূজা করিয়াছিলেন।

ভাস্কো-ডা-গামা ফিরিয়া গেলে পর্তুগালে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য আরও বৃদ্ধি পায়। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে পেড্রো আল্‌ভারেজ কাব্রাল ১৩টি জাহাজ ও ১২০০ লোক লইয়া ভারতবর্ষ যাত্রা করেন। তাঁহার দলে বার্থলমিও ডায়াজ ও ভাস্কো-ডা-গামার সহচর নিকোলাস কোয়েল্‌হো ছিলেন। এই যাত্রায় পর্তুগীজদের অনেক দুর্ভোগ সহিতে হইয়াছে। পথে নানাপ্রকার বিপদের পর কাব্রাল মোটে ৬টি জাহাজ লইয়া কালিকটে আসিয়া পৌঁছান। জ়ামোরিনের সহিত তাঁহার বেশিদিন সদ্ভাব থাকে নাই। পরের বৎসর জানুয়ারি মাসে জ়ামোরিনের যুদ্ধজাহাজের তাড়া খাইয়া কাব্রাল পলাইয়া আসেন। আসিবার সময় তাড়াতাড়িতে দলের অন্ততঃ ৩০ জনকে ফেলিয়া আসিতে হয়। ফিরিবার পথে কালিকটের দক্ষিণে কোচিনের রাজার সহিত কাব্রালের মিত্রতা হইয়াছিল। কোচিনের রাজা জ়ামোরিনের শত্রু ছিলেন। কাব্রাল তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপকার পাইয়াছিলেন।

১৬শ শতাব্দীর প্রথম হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে কিছু বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্‌কো-ডা-আল্‌মিডা ৩ বৎসরের জন্য পর্তুগালের রাজার প্রতিনিধি হইয়া এদেশে আসেন। মুসলমান বণিকদের বাধা দিবার জন্য তিনি অঞ্জদিব, কানানোর প্রভৃতি জায়গায় দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান বণিকদের ব্যবসায়ে ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া মিশরের সুলতান পর্তুগীজদের ক্ষমতা ধ্বংস করিবার জন্য একটি নৌবাহিনী পাঠাইয়া দেন। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের নিকট চৌলে এক নৌযুদ্ধে পর্তুগীজরা পরাজিত হয়। কিন্তু পরের বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে তাহারা মিশরের নৌবাহিনীকে পরাস্ত করে।

এদেশে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় প্রকৃতপক্ষে আল্‌মিডার পরবর্তী রাজপ্রতিনিধি আল্‌বুকের্ক-এর সময় হইতে। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম উপকূলে বিভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবেন। পর্তুগাল হইতে কয়েক বৎসর পর পর নৌবাহিনী আনিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। সেইজন্য তিনি পর্তুগীজদের সহিত ভারতীয়দের বিবাহে উৎসাহ দিতেন। আলবুকের্ক

চাহিয়াছিলেন, এইভাবে ভারতে পর্তুগীজ বসতি গড়িয়া উঠুক। তাহাতে সাম্রাজ্যরক্ষার সুবিধা হইবে। তিনি হিন্দুরাজাদের সহিত মোটামুটি সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে চাহিতেন। তাঁহার জীবিতকালে এদেশে পর্তুগীজরা খুব পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এদেশে আসিবার অল্প পরে তিনি কালিকট আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গোয়া অধিকার করেন। পরে গোয়া পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের রাজধানী হইয়াছিল। পশ্চিম উপকূলে গোয়া ব্যতীত দীউ, দমান, সাল্‌সেট, বেসিন, চৌল ও বোম্বাই এবং পূর্ব উপকূলে শান্ থমে পর্তুগীজদের হাতে আসিয়াছিল। ১৬শ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের বাণিজ্য খুব প্রসার লাভ করে। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে পর্তুগীজদের সহিত বাংলা দেশের পরিচয় হইয়াছিল। তখন নুনো-ডা-কুন্‌হা এদেশে পর্তুগালের রাজপ্রতিনিধি (১৫২৯-৩৮ খ্রী)। শতাব্দীর প্রথম দিকেই পর্তুগীজ জাহাজ চট্টগ্রামের বন্দরে আসিত; কিন্তু চট্টগ্রামের শাসকদের সহিত বন্ধুত্ব বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গে বাকলার রাজা পরমানন্দ রায়ের সঙ্গে পর্তুগীজদের এক সন্ধি হইয়াছিল, ইহার ফলে পরমানন্দ রায় বাকলা ও অন্যান্য বন্দরে পর্তুগীজদের ব্যবসা করিবার সুবিধা দিয়াছিলেন। বাকলার রাজাও গোয়া, ওরমুজ ও মালাক্কায় প্রতিবৎসর ৪টি করিয়া জাহাজ পাঠাইবেন এরূপ স্থির হইয়াছিল। বাংলা দেশে পর্তুগীজদের প্রথম ঘাঁটি ছিল সপ্তগ্রামে (১৫৩৭-৩৮ খ্রী)। কিন্তু নদীর জল কমিয়া যাওয়ায় বড় জাহাজের আসিতে অসুবিধা হইত বলিয়া ক্রমশঃ হুগলি তাহাদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে এই অঞ্চলে পর্তুগীজদের আধিপত্যের অবসান হয়। পর্তুগীজরা একাধিক কারণে সম্রাটের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতীয় বণিকদের উপর বেশি কর আদায় করিতেন, হিন্দু ও মুসলমান বালক-বালিকাদের ধরিয়া নিয়া গিয়া খ্রীষ্টান করিতেন। একবার তাঁহারা শাহ্‌জাহানের মহিষী মমতাজ মহলের ২ জন বাঁদীকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহার ফলে শাহ্‌জাহান হুগলির সুবেদার কাশিম আলি খাঁকে হুগলি আক্রমণ করিতে আদেশ করেন। ৩ মাস অবরোধের পর হুগলি মোগলদের অধিকারে আসে (১৬৩২ খ্রী)। হুগলির পতনের সঙ্গে বাংলা দেশে পর্তুগীজদের পতন আরম্ভ হয়। পূর্ব হইতেই কয়েকজন পর্তুগীজ বাংলা দেশে বারভুঁইয়াদের অধীনে সেনাপতি ছিলেন। কোয়েল্‌হো, গঞ্জালিস প্রভৃতি নাম বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে পরিচিত। বাংলা দেশে সুদিন শেষ হইয়া যাইবার পর পর্তুগীজরা বহু কাল পর্যন্ত আরাকানী ও মগদের মত দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেন। জলপথেও তাঁহাদের উৎপাতের শেষ ছিল না। বাংলা দেশের উপকূলে 'হার্মাদ' অর্থাৎ ফিরিঙ্গি জলদস্যুর ভয়ে দ্রুত নৌকা বাহিয়া যাইবার কথা সাহিত্যে পাওয়া যায়।

পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজদের ক্ষমতা আরও ১০০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। মারাঠাদের সহিত তাঁহাদের বিরোধিতার কারণ ছিল। পর্তুগীজরা দাবি করিতেন ভারত মহাসাগর তাঁহাদের এলাকা; এখানে যাতায়াত করিতে হইলে জাহাজগুলিকে টাকা দিয়া অনুমতি পত্র লইতে হইবে। শিবাজীর সহিত তাহাদের মতান্তর ছিল, কিন্তু কোনও উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ হয় নাই। শিবাজীর মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে মারাঠা সৈন্যরা গোয়া পর্যন্ত আসিয়া লুটপাট করে। প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের কিছু কিছু অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র পেশোয়া প্রথম বাজীরাওয়ের সহিত কলহে পর্তুগীজদের সর্বনাশ হয়। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মারাঠাদের সহিত পর্তুগীজদের বিবাদ চলিতেছিল। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ঠানা অঞ্চল, ধরাবী ও বোম্বাইয়ের নিকট সান্টাক্রুজ মারাঠারা কাড়িয়া লন। ২ বৎসর পরে মাহিম ও বেসিনও পেশোয়াদের হস্তগত হয়। গোয়া, দমান ও দীউ শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজদের অধীনে ছিল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই অঞ্চলগুলিও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দস্যুবৃত্তি ও ধর্মবিষয়ে অসহিষ্ণুতার জন্য পর্তুগীজরা এদেশে সুনাম অর্জন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বহুকাল একসঙ্গে বসবাস করায় ভারতীয় জীবনে তাঁহারা কিছু কিছু চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে তাঁহাদের ঋণ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। প্রথম বাংলা গদ্যের বই ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন পর্তুগীজ লিজভোয়া (লিস্‌বন) শহর হইতে রোমান হরফে ছাপাইয়া বাহির করিয়াছিলেন। প্রথম বাংলা শব্দকোষ ও ব্যাকরণ ঐ সময়ে রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়া লিজভোয়া হইতে বাহির হয়। অনেক পর্তুগীজ শব্দ (যেমন মেজ, কেদারা, আলপিন, পেরেক, সাবান) বাংলায় ব্যবহৃত হইয়াছে; এখন আর তাহাদের বিদেশী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। পর্তুগীজরাই এদেশে তামাকচাষের প্রচলন করিয়াছিলেন, আলু ও কাজুবাদামের চাষও প্রথমে তাঁহারাই আরম্ভ করেন।

দ্র H. M. Stephens, *Albuquerque*, Oxford, 1892; *The Imperial Gazetteer of India*, vol. II,

Oxford, 1909 ; F. C. Danvers, *The Portuguese in India*, London, 1894 ; J. J. A. Campos, *History of the Portuguese in Bengal*, Calcutta, 1919, J. Sarkar. ed., *History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1948 ; R. S. Whiteway, *The Rise of the Portuguese Power in India, London*, 1967.

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

পর্তুগীজ ভাষা মূল ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার অন্যতম শাখা ইতালিক বা লাতিন হইতে জাত। ইহা ফরাসী, স্পেনীয়, রুমানীয় ও আধুনিক-ইটালীয় ভাষার সহোদরা। রাজনৈতিক কারণে পর্তুগীজ ভাষার উপর ফরাসী ভাষার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী হইতে পর্তুগীজ ভাষায় রচিত সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। পর্তুগাল ছাড়াও ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পেড্রো আল্ভারেজ কাব্রাল হইতে এর স্থত্রে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে, উপকূলবর্তী পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার স্থানে স্থানে, ভাস্কো-ডা-গামা-র সূত্রে ভারতবর্ষের গোয়া ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে পর্তুগীজ ভাষার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশের স্থানবিশেষে স্থানীয় ভাষার সহিত পর্তুগীজ ভাষার মিশ্রণে কয়েকটি মিশ্র বা সংকর ভাষার (jargon বা mixed language) সৃষ্টি হইয়াছে।

পর্তুগীজ ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের প্রধান বিশেষত্ব অনুনাসিক স্বরধ্বনির (nasal vowel) প্রচুর ব্যবহার। পর্তুগীজ ভাষায় ৫টি এই প্রকার অনুনাসিক স্বরধ্বনি ব্যতীত কয়েকটি অনুনাসিক দ্বিস্বরধ্বনি (nasal diphthong) আছে। ঝোঁক (stress)-বিবর্জিত পদান্ত স্বরধ্বনির উচ্চারণ ক্ষীণ অথবা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। ব্যঞ্জনধ্বনির অব্যবহিত পূর্বের দন্ত 'স' কারের (S) উচ্চারণ-বিবর্তন>'শ' (S) জ 'ঝ' (ʒ) ; দুই স্বরধ্বনির মধ্যস্থিত স-কারের উচ্চারণ ঘোষবৎ জ় (Z)। দুই স্বরধ্বনির মধ্যস্থিত ল (*l*) বা ন (n)-এর লোপ হয়। স্বরমধ্যস্থিত ন-কারের বিলোপবশতঃ পূর্ববর্তী স্বরের নাসিক্যীভবন হয়। স্পেনীয় ভাষার ন্যায় পর্তুগীজ ভাষায় লাতিনের এ (e) ও (o) দ্বিস্বরত্ব পায় নাই এবং পদাদিস্থিত ফ (f) লুপ্ত হয় নাই:—পর্তুগীজ terra : স্পেনীয় tierra ; পর্তুগীজ fitho : স্পেনীয় hijo।

রূপতত্ত্বে পর্তুগীজ ভাষার প্রধান বিশেষত্ব 'দুই' অর্থবোধক শব্দটির লিঙ্গানুযায়ী রূপভেদ—পুংলিঙ্গে does, স্ত্রীলিঙ্গে duas। লাতিন পুরাঘটিত অতীত (Pluperfect) কালের ব্যবহার পর্তুগীজের লক্ষণীয় বিশেষত্ব। ক্রিয়ার রূপতত্ত্বে পর্তুগীজ ও স্পেনীয় ভাষার বিভিন্নতা প্রকট।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী হইতে বাণিজ্য ও মিশনারীদের কার্যকলাপ সূত্রে বহু পর্তুগীজ শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল। কালক্রমে এমন অনেক পর্তুগীজ শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব হইয়া গিয়াছে। নোনা, আতা, জানালা, মিস্ত্রি প্রভৃতি শব্দ বলিয়া না দিলে আগন্তুক পর্তুগীজ শব্দ বলিয়া চেনা যায় না।

সুভদ্রকুমার সেন

পর্বত উৎপত্তির কারণ অনুসারে পর্বতের ৪টি শ্রেণীবিভাগ করা যায় : ১. ভঙ্গিল পর্বত ২. চ্যুতি বা স্তূপ পর্বত ৩. সঞ্চয়জাত পর্বত ৪. ক্ষয়জাত পর্বত। পৃথিবীর অধিকাংশ পর্বতমালাই ভঙ্গিল পর্বতের অন্তর্গত। সমুদ্রের নীচে কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া পাললিক শিলার চাপে জিওসিন্ক্লাইন নামক অঞ্চলসমূহ ক্রমশঃ ভূ-পৃষ্ঠের নীচে নামিয়া যায়। তবে এই ধরনের নিম্নগতি কোনও বিশেষ সময়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ শক্তিসমূহের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। উপরন্তু ভূ-অভ্যন্তরস্থ শক্তির ঊর্ধ্বচাপের ফলে জমাট-বাঁধা পাললিক শিলাস্তরগুলি উপরের দিকে উঠিয়া আসিতে থাকে ; ফলে পার্শ্ববর্তী চাপ অথবা টানের (টেন্‌শন) জন্য পাললিক শিলাসমূহ বড় বড় ভাঁজে রূপান্তরিত হইয়া ভঙ্গিল পর্বতমালার সৃষ্টি করে ; যথা আল্‌প্‌স, হিমালয়, রকি ও অ্যাণ্ডিস্।

আলোড়ন ও কম্পনে ভূত্বকের কোনও কোনও অংশে শিলাচ্যুতির জন্য যে অবনমিত অংশের সৃষ্টি হয় তাহাকে গ্রস্থ উপত্যকা বলে, দুই গ্রস্থ উপত্যকার মধ্যে উচ্চ অংশকে চ্যুতি পর্বত বলে। ভারতের সাতপুরা এইরূপ চ্যুতি পর্বত।

ভূগর্ভের উত্তপ্ত শিলা প্রভৃতি প্রবলবেগে ভূ-ত্বকের ছিদ্রপথে বাহিরে আসিয়া কঠিন ও জমাট বাঁধিয়া পর্বতের আকার ধারণ করে। এইরূপ আগ্নেয়শিলায় গঠিত পর্বতসমূহকে আগ্নেয়পর্বত বলা হইয়া থাকে ; যথা জাপানের ফুজিয়ামা।

রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা পূর্ববর্তী যে কোনও পর্বত ক্ষয় হইয়া উঁচু অঞ্চল গঠিত হয়, তাহাকে ক্ষয়পর্বত বলা হয় ; যথা ভারতবর্ষের পূর্বঘাট পর্বতমালা, আরাবল্লী পর্বতমালা প্রভৃতি।

প্রদীপকুমার দাশগুপ্ত
লতা চট্টোপাধ্যায়

পর্বতারোহণ পর্বতারোহণ প্রচেষ্টা পাশ্চাত্য দেশেই প্রথম লক্ষ করা যায়। ১৬শ শতাব্দীতে জুরিখ শহরে প্রথম সুব্যবস্থিতভাবে পর্বতারোহণ-সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বহুখ্যাত অ্যাল্পাইন ক্লাব। এই সময় হইতেই পর্বতারোহণ প্রকৃত ক্রীড়া হিসাবে প্রচলিত হয়। সুসংগঠিতভাবে অভিযান সর্বপ্রথম শুরু হয় নরওয়ে ও কর্সিকার পর্বতে এবং ককেশাস পর্বতমালায়। পরে এই অভিযান এশিয়া ও আমেরিকার উচ্চ পর্বতমালায় প্রসারিত হয়।

পর্বতারোহণে সাফল্যের জন্য আরোহণকারীর উপস্থিত-বুদ্ধি, স্থির মস্তিষ্ক, দৈহিক বল ও সর্বোপরি শারীরিক যোগ্যতা থাকা একান্ত আবশ্যক। 'যাহা নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিবে না সেই বিষয়ে কখনও চেষ্টা করিও না'—এই মূলতত্ত্বটি তাঁহাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পর্বতারোহণ দুইভাগে বিভক্ত; শৈলারোহণ ও বরফারোহণ। প্রকৃত আরোহণকারীকে উভয় বিষয়েই সুদক্ষ হইতে হয়।

শৈলারোহণে খুব অল্প সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন, যেমন একগাছি নাইলনের দড়ি ও একজোড়া মজবুত আরোহণের জুতা। শৈলারোহণে অমিত শক্তির প্রয়োজন হয় না, আরোহণে বেশির ভাগ কাজ করে পাদদ্বয় ও পায়ের পাতা। তবে ভালো ভারসাম্য থাকা দরকার। হস্ত ও বাহুর ব্যবহার হয় আরোহণে স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা ও ভারসাম্য রাখিবার প্রয়োজনে। সুদক্ষ পায়ের কার্য এবং নিশ্চিন্ত স্থান বাছিয়া পদস্থাপন ও হস্তস্থাপন উত্তম ও নিরাপদ শৈলারোহণকারীর লক্ষণ।

দড়ি আরোহণকারীদের সাংঘাতিকভাবে পড়িয়া যাওয়ার হাত হইতে রক্ষা করে। ২ জন আরোহণকারীর জন্য ১৮ মিটার (৬০ ফুট) ও ৩ জন আরোহীর জন্য ৩০ মিটার হইতে ৩৬ মিটার (১০০ হইতে ১২০ ফুট) দড়ির প্রয়োজন। দড়ির শেষে সব সময়ে বাওলাইন গ্রন্থি বাঁধা থাকা দরকার এবং ৩ জনের দলের মধ্যবর্তীকে মিড্‌ল্‌ম্যান গ্রন্থি ব্যবহার করিতে হইবে।

দড়ি অত্যন্ত খাড়া পর্বতারোহণে খুব সাহায্য করে না। সেখানে বিভিন্নপ্রকার কলা-কৌশলের উপর বেশি নির্ভর করিতে হয়। প্রথম দৃষ্টিতে অনেক সময়ে পর্বতগাত্রকে মসৃণ মনে হয়। কিন্তু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে তাহাতে বিভিন্ন স্থানে ধরিবার উপযুক্ত নানা ধরনের উঁচু পাথর ও খাঁজ (ledge) দেখা যায়। দুই খাঁজের মধ্যবর্তী স্থানে প্রসারিত প্রস্তর থাকে, ইহাকে আরোহীরা 'পিচ' বলে। এমনও পিচ আছে যেখানে অভিজ্ঞ পর্বতারোহীরাও একটির বেশি হস্ত বা পদ-স্থাপনের স্থান খুঁজিয়া পায় না। তাহারা সর্বপ্রথমে হস্ত ও পদস্থাপনের এরূপ নিরাপদ স্থান নির্বাচন করে, যে স্থলে তাহারা ভারসাম্যের সহিত দাঁড়াইতে পারিবে। ভারসাম্যের যোগ্য ঐ স্থানগুলিকে 'স্ট্যান্‌স' বলে। আরোহী আরোহণ করিবার পথ ঠিক করিবার পর সমতালে ও সহজে পিচ-এ আরোহণ করিতে আরম্ভ করে। স্ট্যান্‌সে পৌঁছানোর পর আরোহী নোঙ্গর বিলে করিবার স্থান নির্বাচিত করে। শক্ত বড় গজাল বা পাথরের খাঁজের সাহায্যে কিংবা কোনও ফাটলের মধ্যে টুকরা পাথর আটকাইয়া সচরাচর কাঁধ সমান উচ্চ দৃঢ় স্থানে এইরূপ নোঙ্গর বিলে করা হয়। নেতা অর্থাৎ প্রধান আরোহী নিজেকে নোঙ্গরের সহিত বাঁধিয়া নিরাপদ করিয়া যে আল্‌গা দড়ি দ্বিতীয় আরোহীর দিকে আছে সেই দড়িকে নিজের বাহিরের হাতের নীচ দিয়া চালিত করিয়া দ্বিতীয় আরোহীকে পিচ-এ আরোহণ করিতে বলিবে। এই দড়ি ভিতরের কাঁধের ও পিঠের উপর দিয়া যাইবে; ফলে যদি কেহ পিছলাইয়া পড়িয়া যায় তবে দড়ির প্রচণ্ড চাপ নেতার হাতে না পড়িয়া কাঁধ ও পিঠের উপর পড়িবে; ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। এইভাবে দড়ির সাহায্যে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা ও পরস্পরকে আরোহণ করিতে সাহায্য করাকে বিলে করা বলে। দ্বিতীয় আরোহী আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলে নেতা আল্‌গাভাবে দড়ি গুটাইয়া লইতে থাকিবে। অতঃপর স্ট্যান্‌সে আরোহীরা স্থান পরিবর্তন করিবে। নেতা নোঙ্গর বিলে খুলিয়া ফেলিবে ও দ্বিতীয় আরোহী নোঙ্গরের সহিত নিজেকে বিলে করিবে। তৃতীয় কেহ না থাকিলে নেতা পুনরায় পরবর্তী পিচ-এ উঠিতে আরম্ভ করিবে।

একটি পিচ-এ বহুরকম সমস্যা থাকিতে পারে। আরোহণের কোনও অংশে খুব খাড়া চড়াই-এর মধ্যে চওড়া ফাটল (চিমনী) থাকিলে আরোহীরা একদিকে হাঁটু পা অন্যদিকে পিঠ বা একদিকে বাঁ হাত-পা অন্য-দিকে ডান হাত-পা রাখিয়া হাত ও পায়ের চাপের পরিবর্তনে সহজে উঠিতে পারে।

বরফারোহণের সময় দড়ির ব্যবহার একই প্রকারের, কিন্তু এই আরোহণে বরফ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং কতকগুলি বাড়তি সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। বরফারোহণে সর্বাধিক প্রয়োজন হয়

বরফ-কুঠার (আইস অ্যাক্স) বা বরফ-গাঁইতির। ইহার মাথার এক প্রান্ত তীক্ষ্ণ ও সুঁচালো, অন্য প্রান্তটি চ্যাপ্‌টা হওয়া প্রয়োজন। আরোহীরা শক্ত বরফে চলিবার সময়ে ইস্পাতের কাঁটা জুতার সহিত বাঁধিয়া লয়।

হিমরেখার উপর পর্বতারোহণে গেলে সর্বদাই আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। বরফ কখনও গভীর শুষ্ক ধূলির মত থাকে, কখনও বা এত কঠিন থাকে যে বরফ-গাঁইতি দিয়া ধাপ কাটিয়া উঠিতে হয়। দুই দেওয়ালের মধ্যের স্থানের ফাটল এবং নালায় ঠুনকো বরফ থাকিতে পারে। হঠাৎ তাপমাত্রা বাড়িয়া গেলে বরফ বিপজ্জনক হইয়া যাইতে পারে, বিশেষ করিয়া যদি খাড়া শক্ত পুরানো বরফস্তরের উপর নূতন বরফের স্তর থাকে। বরফের এইরূপ অবস্থা প্রত্যেক আরোহীরই চেনা প্রয়োজন।

বরফ-গাঁইতিকে বহুরকমে ব্যবহার করা হয়। গভীর বরফের ঢালে দৃঢ়বদ্ধভাবে দড়িকে আটকাইয়া রাখার জন্য বরফের মধ্যে এই বরফ-গাঁইতির মাথা পর্যন্ত প্রবেশ করাইয়া নোঙ্গরের মত ব্যবহার করা হয়। বরফ-ঢাকা পিচ-এ বরফ-গাঁইতির সরু সুঁচালো দিকটি শক্ত করিয়া গাঁথিয়া ইহার মাথাকে নোঙ্গর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বরফ-গাঁইতির সুঁচালো দিক সাধারণ বরফের ঢালে এবং চ্যাপ্টা দিকটা ধাপ কাটার জন্য ও কখনও বা হস্তস্থাপনের জায়গা করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

উপরে উল্লেখিত অত্যাবশ্যক বস্তুগুলি ছাড়াও বিশেষ তাঁবু, পরিচ্ছদ, উচ্চতা মাপিবার যন্ত্র, চিকিৎসার সরঞ্জাম, মানচিত্র, অক্সিজেন সিলিণ্ডার ইত্যাদি বহুবিধ জিনিসের প্রয়োজন হয়। ঠিকভাবে নিয়ম মানিয়া চলিলে পর্বতারোহণের দুর্ঘটনা খুব কম হয়। উচ্চ পর্বতে একক বা দলগতভাবে আরোহণের চেষ্টায় বিপদের সম্ভাবনা থাকে। পরিষ্কার আবহাওয়ার রৌদ্রস্নাত পর্বতের রূপে মুগ্ধ হইয়া ভুল পথ গ্রহণ করিলে হঠাৎ কুয়াশা, বাতাস ও হিম নামিয়া বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে। অনভিজ্ঞ আরোহীর কখনও একা আরোহণ করা উচিত নয়।

দ্র Showell Styles, *Modern Mountaineering*, London, 1964.

নিতাই রায়

পলাশির যুদ্ধ বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলার প্রবল বিরোধী কলিকাতার ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী (ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী) এবং নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী অমাত্যদের মধ্যে যে গোপন-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ চুক্তির প্রধান শর্ত হইল, ইংরেজরা সিরাজুদ্দৌলাকে অপসারিত করিয়া ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা মীর জাফর আলী খানকে নবাব করিবে এবং তাহার বিনিময়ে তাহারা বাণিজ্যের ব্যাপারে নানারূপ সুযোগসুবিধা লাভ করিবে, নবাবের দরবারে তাহাদের একজন পূর্ণমর্যাদাসম্পন্ন দূত উপস্থিত থাকিবে, ইংরেজদের অধীন এলাকা সম্প্রসারিত হইবে, তাহারা সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবে, নবাবকে সৈন্যসাহায্যদানে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া তাহার মূল্যস্বরূপ তাহারা অর্থ ও জমি পাইবে, সিরাজের কলিকাতা অধিকারে তাহাদের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার জন্য অর্থ পাইবে, নবাব হুগলির দক্ষিণে কোনও নূতন দুর্গ নির্মাণ করিতে পারিবেন না ও ইংরেজদের শত্রু ফরাসীদিগকে বাংলা দেশ হইতে বিতাড়িত করা হইবে।

সম্ভবতঃ নবাব কিছুদিনের মধ্যেই এই ষড়যন্ত্রের আভাষ পাইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। মীর জাফরকে বধ করিবার সুযোগ পাইয়াও তিনি বধ না করিয়া তাঁহার সহিত আপোস করিলেন। এদিকে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স সপরিজনে কলিকাতায় পলাইয়া গেলেন।

ক্লাইভ তখন নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সিরাজুদ্দৌলা ৫০০০০ পদাতিক ও ১৮০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ও ৫০টি কামান লইয়া তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। ক্লাইভের সঙ্গে মাত্র ৩০০০ সৈন্য ও ৮-১০টি কামান ছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন ভাগীরথীতীরে পলাশির প্রান্তরে উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইল। পরদিন উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। ঐদিন সকালে নবাবের অধীনস্থ ফরাসী সেনাধ্যক্ষ সিনফ্রেঁ প্রথমে গোলাবর্ষণ করেন। নবাবের অপর দুই বিশ্বস্ত সেনানায়ক মীর মদন ও মোহনলালও ইংরেজদিগকে আক্রমণ করেন। ইংরেজরা আম্রকাননের অন্তরালে আশ্রয় লয়। নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর ও অপর দুই সেনানায়ক ইয়ার লতিফ ও রায়দুর্লভের পরিচালনাধীনে যে তিনটি বৃহৎ সৈন্যবাহিনী ছিল তাহারা যুদ্ধে যোগ দিল না, ক্রমশঃ যুদ্ধস্থল হইতে দূরে সরিতে লাগিল। সিনফ্রেঁ, মীর মদন ও মোহনলাল বীরবিক্রমে আক্রমণ করিয়া ইংরেজদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি গোলার আঘাতে মীর মদনের মৃত্যু হইল। তখন নবাব বিচলিত হইয়া মীর জাফরকে শিবিরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীর জাফর নবাবকে বলিলেন, সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ রাখা

হউক, পরদিন তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। নবাব তখন মোহনলালকে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দিলেন। মোহনলাল প্রথমে ইহা অমান্য করেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐরূপ আদেশের ফলে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। ইহার ফলে নবাবের সৈন্যেরা তাহাদের পরাজয় হইয়াছে ভাবিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল এবং ইংরেজ-বাহিনী তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। সিনফ্রেঁ ও মোহনলাল বেলা ৫টা অবধি তাহাদের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। ইংরেজরা এই যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করিল। নবাব ইতিপূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। ক্লাইভের ২৩ জন সৈন্য হত ও ৪৯ জন আহত হইয়াছিল। নবাব-সৈন্যের প্রায় ৫০০ নিহত হইয়াছিল। আহতের সংখ্যা জানা নাই। এই যুদ্ধের কয়েকদিন পরেই মীর জাফর বাংলার নবাব হইলেন এবং সিরাজকে হত্যা করা হইল। যুদ্ধ হিসাবে পলাশির যুদ্ধ খুব নগণ্য হইলেও ইহার ফলেই ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের সূচনা হয়।

দ্র রমেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত, বাংলা দেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), কলিকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ; V. A. Smith, *The Oxford History of India*, Oxford, 1919 ; Jadunath Sarkar, ed. *The History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1948.

সুখময় মুখোপাধ্যায়

পলিনেশীয় ভাষা পলিনেশীয় ভাষা ওশিয়ানীয় ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী ১০০০০০০ লোকের ভাষা। প্রধান পলিনেশীয় ভাষা ১. সামোআ ২. মাওরি ৩. তাহিতী ৪. হাওয়াই ৫. তোঙ্গা ৬. মাঙ্গারেবা ৭. নুকুহিবা ও ৮. পৌমতু দ্বীপপুঞ্জের ভাষা। এই ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য, স্বরধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রা ছাড়াও বহু বৈচিত্র্য বর্তমান। সাধারণ ব্যঞ্জনধ্বনি 'ক', 'ত', 'প', 'স', 'ল', 'ঙ', 'ন', 'ম', 'ফ্'। কোনও কোনও ভাষায় 'ব', 'ভ', 'হ' পাওয়া যায়। প্রতি অক্ষরই স্বরান্ত। দ্বিস্বর (ডিফ্‌থংগ) প্রকৃতপক্ষে নাই। স্বরলোপ হয় না এবং প্রত্যেক অক্ষরই উচ্চারিত হয়। কিন্তু ব্যঞ্জনের লোপ হইয়া থাকে ; ফলে সমরূপক (হোমোনিম, Homonym) শব্দ বহু পাওয়া যায়। যেমন নুকুহিবার ভাষায় 'বৃষ্টি', 'দুই', 'তপ্ত করা' ও 'চিংড়ি' অর্থে যথাক্রমে 'উস', 'রুথ' 'উর' ও 'উক' হইতে উদ্ভূত একই শব্দ 'উঅ'।

পূর্ণ অথবা আংশিক আম্রেড়ন (রিডুপ্লিকেশন) এই ভাষাগুলির উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। মাওরিতে 'হাএরে'—'যাওয়া', 'হাএরে হাএরে'—'ঘুরিয়া বেড়ানো' ইত্যাদি। অনির্দেশক (ইন্‌ডেফিনিট আর্টিক্‌ল) অর্থে 'এক' বাচক শব্দ—'স' বা 'সে' এবং নির্দেশক (ডেফিনিট আর্টিক্‌ল) একবচনে 'তে' ও বহুবচনে 'ঙ' ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন কারক বুঝাইতে পুরঃসর্গ (প্রেফিক্‌স) ব্যবহৃত হয়, কার্যসম্পাদক (এজেণ্ট নাউন) অর্থে 'কো', সম্প্রদানে 'কি', কর্মে 'ই' বা 'ইঅ', সম্বোধনে 'এ' এবং সম্বন্ধপদ শব্দের অবস্থান দিয়াই বুঝানো হয়, কখনও 'ন' 'অ' 'নো' বা 'ও' পুরঃসর্গযোগে। সর্বনামে তিন পুরুষে একবচন ছাড়া দ্বিবচন ও বহুবচনের দুইটি করিয়া (আমি-সহ এবং আমি-ব্যতীত) রূপভেদ আছে। ক্রিয়াপদেও কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্য করা হয় 'ইঅ', 'হিঅ', 'লিঅ' 'কিঅ' 'মিঅ' পুরঃসর্গযোগে। 'ফ' 'অ' পুরঃসর্গে হয় ণিজন্ত (কজেটিভ) 'ফিঅ'-যোগে হয় সনন্ত (ডেমিডারেটিভ) 'অকি'-যোগে হয় ব্যতীহার (রেসিপ্রোক্যাল)। নির্দেশক বর্তমান বুঝাইতে পরে 'এ' বা 'তে'-যোগ, ভবিষ্যৎ বুঝাইতে 'অ'-যোগ, অতীত বুঝাইতে 'ন'-যোগ। সংখ্যা শব্দের মধ্যে 'পাঁচ' বুঝাইতে হস্ত শব্দের সমার্থক এবং 'দশ' বুঝাইতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা মালয় ভাষা হইতে গৃহীত এবং ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ পূর্বে নির্দেশক যোগ করিয়াই বুঝানো হয়।

দ্র I. J. S. Taraporewala, *Elements of the Science of Language, Calcutta*, 1951.

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

পল্লববংশ আনুমানিক ২২৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণা নদীর মোহানার নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে শাতবাহন-অধিকার বিলুপ্ত হয়। এই সময় হইতে বিজয়পুরীর ইক্ষ্বাকুবংশ এবং কাঞ্চীর পল্লববংশ শক্তিশালী হইয়া ওঠে। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর ২য় পাদে পল্লবরাজ সিংহবর্মা ইক্ষ্বাকুরাজ্য ধ্বংস করেন। এই সময়ে উত্তর-পূর্বে কৃষ্ণা ও গুণ্টূর জেলায় এবং উত্তর-পশ্চিমে বনবাসী অঞ্চলে পল্লব-অধিকার প্রসারিত হয়। শীঘ্রই কদম্বেরা বনবাসীকে কেন্দ্র করিয়া একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ; তাঁহারা অনেক সময়ে পল্লবরাজগণের লঘুমিত্ররূপে গণ্য হইতেন। সিংহবর্মার পর শিবস্কন্দবর্মা, স্কন্দবর্মা এবং বিষ্ণুগোপ কাঞ্চীর পল্লবসিংহাসন অধিকার করেন। শিবস্কন্দবর্মা অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুগোপের সময়ে পাটলিপুত্ররাজ সমুদ্রগুপ্ত (আনুমানিক ৩৩৫-৭৬ খ্রী)

কাঞ্চী আক্রমণ করেন। ৫ম শতাব্দীর প্রথম দিকে নেল্লোর-গুণ্টূর অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র পল্লবরাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষাংশে কাঞ্চীরাজ সিংহবিষ্ণু ও তৎপুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মা (আনুমানিক ৬০০-৩০ খ্রী) উত্তরে গুণ্টূর জেলা হইতে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। এই সময়ে চোল, পাণ্ড্য ও কেরল দেশের নরপতিগণ পল্লবরাজের লঘুমিত্র ছিলেন। মহেন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়া বাদামির চালুক্যবংশীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৪২ খ্রী) কিছুকালের জন্য পল্লবরাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু মহেন্দ্রবর্মার পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মা (আনুমানিক ৬৩০-৬৮ খ্রী) পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ লন। তিনি পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাজধানী বাদামিসহ চালুক্য-সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশ অধিকার করেন। দীর্ঘ ১৩ বর্ষ পরে পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পিতৃরাজ্য শত্রু-কবলমুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম মহেন্দ্রবর্মা ও প্রথম নরসিংহবর্মার সময়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়। মামল্লপুরের শিল্পীরা এইযুগে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল। সিংহলের রাজপুত্র মানবর্মা নরসিংহবর্মার সহায়তায় রাজ্যোদ্ধার করিতে সমর্থ হন। পিতা পুলকেশীর ন্যায় চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্যও কিছুকালের জন্য পল্লবসাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে প্রথম নরসিংহবর্মার পৌত্র প্রথম পরমেশ্বর-বর্মা (আনুমানিক ৬৬৯-৭০০ খ্রী) বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি শত্রু-রাজধানী বাদামি নগরী পর্যন্ত অগ্রসর হন। প্রথম পরমেশ্বরবর্মার পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহবর্মা রাজসিংহ (আনুমানিক ৭০০-৭২৫ খ্রী) কাঞ্চীর কৈলাসনাথ বা রাজসিংহেশ্বর মন্দির প্রভৃতি দেবালয় নির্মাণ করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে মহাকবি দণ্ডী তাঁহার সভা-কবি ছিলেন। ৭২০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় নরসিংহবর্মা চীন-সম্রাটের রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়া তিব্বতীয় ও আরবগণের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্বেষভাব ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় নরসিংহবর্মার পুত্র দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মা (আনুমানিক ৭২৫-৩০ খ্রী) চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। পরে গঙ্গরাজ শ্রীপুরুষ তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। অতঃপর অমাত্য এবং মূলপ্রকৃতিবর্গ হিরণ্যবর্মার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র দ্বিতীয় নন্দিবর্মা পল্লবমল্লকে রাজা নির্বাচিত করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে (আনু-মানিক ৭৩০-৯৪ খ্রী) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (৭৩৩-৪৫ খ্রী) পল্লব-রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী পল্লব-চালুক্য বিরোধের ফলে উভয় রাজবংশই হীনবল হইয়া পড়ে। তাই সহজেই রাষ্ট্রকূট-বংশীয় দন্তিদুর্গ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মাকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পল্লবরাজ নন্দিবর্মা তাঁহার লঘুমিত্রে পরিণত হন। ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজয়ালয়ের নায়কতায় পল্লবরাজের সামন্ত বা লঘুমিত্র চোলবংশীয়েরা পরাক্রান্ত হইয়া ওঠে। পল্লবরাজ অপরাজিত চোলরাজ আদিত্য এবং গঙ্গবংশীয় পৃথ্বীপতির সাহায্যে পাণ্ড্যরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের কিয়ৎকাল পূর্বে আদিত্য চোল তদীয় প্রভু অপরাজিতকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তোণ্ডৈমণ্ডলম্ অর্থাৎ কাঞ্চীরাজ্য অধিকার করেন। ইহার পর পল্লববংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় নরপতির নাম জানা যায়। ইহারা সাধারণতঃ কাডব বা কাডুবেত্তি নামে পরিচিত ছিলেন। ১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কাডব কোপ্পেরুঞ্জিঙ্গ চোলরাজ তৃতীয় রাজরাজকে পরাজিত করেন। ৮ম হইতে ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত পল্লববংশীয় ক্ষুদ্র রাজগণ নোলম্ববাডি দেশ অর্থাৎ মহীশূরের চিত্র-দুর্গ জেলা ও নিকটবর্তী অঞ্চল শাসন করিতেন। ইহারা নোলম্বপল্লব নামে পরিচিত।

দ্র R. Gopalan, *History of the Pallavas of Kanchi*, Madras, 1928; D. C. Sircar, *The Early Pallavas*, Lahore, 1935; D. C. Sircar, *The Successors of the Satavahanas in the Lower Deccan*, Calcutta, 1939; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vols. III & IV, Bombay, 1954 & 1955.

দীনেশচন্দ্র সরকার

পশতো (পশ্‌তো) ভাষা আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কতক অংশ, বেলুচিস্তানের এবং পাঞ্জাবের অংশবিশেষে প্রচলিত। ৪০ লক্ষ লোক পশ্‌তো ভাষাভাষী।

পশতোর উৎপত্তি ইরানীয় ভাষা হইতে, যদিও ইন্দো-এরিয়ান ভাষা ইহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইরানীয় ভাষার সাধারণ ধ্বনিগুলি (sounds) পশতোতে পাওয়া যায়। আদিতে বোধ হয় ইহা একটি শক উপভাষা ছিল। ধ্বনি পরিবর্তন, বিশেষ ব্যঞ্জন-

বর্ণের সমীকরণ ও ক্ষীণকরণের ফলে ইহার ইরানীয় রূপ অদৃশ্যপ্রায়। পশতো ভাষায় এমন কতকগুলি স্বনিম (Phoneme) দেখা দিয়াছে, যাহা ইরানীয় ভাষায় পাওয়া যায় না।

পশতোর কয়েকটি রূপতত্ত্বগত (মর্ফোলজিক্যাল) লক্ষণ: ১. দুই লিঙ্গভেদ, স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ২. নানা প্রকারের শব্দরূপ (ডিক্লেন্‌শন) এবং বিভক্তির (কেস্ ইনফ্লেক্‌শন) চিহ্ন ৩. তৃতীয় পুরুষের একবচন ও বহুবচনের ভেদ নাই ৪. সকর্মক ক্রিয়ার অতীতকালগুলির কর্মবাচ্যে প্রকাশ।

দ্র H. G. Raverty, *Pastu Grammar*, London, 1867; G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. x, Calcutta, 1924.

রাম আধার সিংহ।

পশতো সাহিত্য সুপ্রাচীন পশতো সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। শেখ মালির (Shaikh Mali) ইউসফজাইদের সোয়াট (Swat) বিজয়কাহিনী পশতো ভাষার প্রথম পুস্তক বলিয়া উল্লিখিত হয়। মালি এই অভিযানের (১৪১৩-২৪ খ্রী) নেতা ছিলেন। যে দুইটি প্রাচীন গ্রন্থের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় তাহা খৈরুল বয়ান (Khairul-bayan ১৫৮৫ খ্রী) এবং খোর্-পান (Khorpan—আলোকের প্রভু)। দুইটি গ্রন্থই আকবরের রাজত্বকালে বায়াজিদ আন্‌সরী (Bayazid Ansari) কর্তৃক রচিত। ইনি ছিলেন এক বিধর্মী দলের প্রবর্তক, দলের লোক ইহাকে পীর-ই-রোশন (Pir-i-Roshan—আলোকের পীর) বলিত; শত্রুপক্ষ বলিত পীর-ই-তারিক (Pir-i-Tarik—অন্ধকারের পীর)। ইনি ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। গ্রন্থ দুইটি বর্তমানে লুপ্ত হইলেও তাঁহার লেখার নিদর্শন তাঁহার শত্রুপক্ষের বিখ্যাত নেতা অখান দরওয়াজা-র (Akhan Darwaza) রচনায় পাওয়া যায়। অখান-এর বিখ্যাত রচনা মখ্‌জান-এ-ইস্‌লাম (Makhzan-e-Islam)-এ বায়াজিদের বিধর্মী মতবাদের নির্মম কটূক্তিপূর্ণ সমালোচনা আছে। তাঁহার প্রায় পঞ্চাশটি অন্য গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা মখ্‌জান-এ-আফগানি (Mokhzan-e-Afghani) সুপ্রাচীনকাল হইতে আফগানিস্তানের ইতিহাস।

কবিতা ও লোকগাথাই পশতোর প্রকৃত সম্পদ। প্রথম কবিতাপুস্তক যাহা পাওয়া যায়, তাহা মীর্জা আন্‌সরীর লেখা। ইনি মীর্জা বায়াজিদের প্রপৌত্র এবং মরমীয়া কবি; তাঁহার প্রভাব পরবর্তী ধর্মমূলক কবিতায় স্পষ্ট। ঔরঙ্গজেবের (১৬১৮-১৭০৭ খ্রী) সমসাময়িক যুদ্ধপ্রিয় খট্টক (Khattak)-দের নেতা কুশল খানের কবিতা সর্বজনপ্রিয়।

পরবর্তী কালে আফজল খান-রচিত তরিখ্-এ-মুরস্‌সা আফগানিস্তানের ইতিহাস। আব্‌দুর রহমান ও আব্‌দুল হামিদ পেশাদার গীতিকার; ইহারা 'ডুম্‌স' (dums) নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে ইহারা আফগানিস্তানবাসী ভারতীয়। মঃ দারমেস্‌তেরে (M. Darmesterer) তাঁহার *Chants Populaires* গ্রন্থে ইহাদের রচনা সংগ্রহ করিয়াছেন।

এখন কাবুলের আফগান অ্যাকাদেমী পশতো গ্রন্থের প্রচারভার গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকগীতির সংগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্র H. G. Raverty, *Selections from the Poetry of the Afghans*, London, 1864; T. P. Hughes, *Kalid-i-Afghani*, Peshawar, 1872; J. Darmesterer, *Chants Populaires des Afghans*, Paris, 1888-90; Malyon, *Some Current Pashto Folk Stories*, Calcutta, 1902.

পশম ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীর একজাতীয় লোম। শীত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সভ্যতাবিকাশের পূর্ব হইতেই মানুষ উট, ছাগল বা ভেড়ার লোম ব্যবহার করিত; সে তুলনায় কার্পাসবস্ত্র অতি আধুনিক উপকরণ।

পৃথিবীতে পশম-উৎপাদনের তালিকায় অস্ট্রেলিয়া শীর্ষস্থানের অধিকারী। ভারতে পশম-উৎপাদন বিশ্বের মোট উৎপাদনের শতকরা ১ ভাগও নহে, তবে রাজস্থান ও উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে সম্প্রতি পশম-উৎপাদনের কার্যসূচীর উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। পশমের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রধান উপায় মেষপালনের উন্নতি। সাধারণতঃ বিশেষ ধরনের পশমের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে মেষের লোম ছাঁটাই করিতে হয়। একবার ছাঁটিলে মেষপ্রতি ১-৪ কিলোগ্রাম অপরিষ্কার পশম পাওয়া যায়। অবস্থা বিশেষে মৃত ভেড়ার ছাল হইতে লোম তুলিয়া লওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

লোমের গোড়ার যে অংশ ত্বকের ভিতর থাকে তাহাকে রোমস্থলী (ফলিক্‌ল) বলে; অবশিষ্টাংশের নাম তন্তু (ফাইবার)। তন্তুর ডগার দিক সরু। তন্তুর বাহিরে কৃত্তিক (কিউটিক্‌ল)-এর শক্ত পর্দার মত স্তর, তাহার ভিতরে কর্টেক্‌স বা বহিরাংশের স্তর এবং

তাহারও ভিতরে অর্থাৎ তন্তুর কেন্দ্রস্থলে মেডালা বা কেন্দ্রীয় অংশ। পশম-তন্তুর পৃষ্ঠদেশ মৎস্যপৃষ্ঠের ন্যায় আঁশের দ্বারা আবৃত। প্রতি সেন্টিমিটারে আঁশের সংখ্যা ৪০০-৮০০ হইতে পারে; সূক্ষ্ম পশমে এই সংখ্যা আরও বেশি হয়। আঁশগুলি ডগার দিকে বাহির হইয়া থাকে, ফলে পশম-তন্তুকে গোড়ার দিকে যেমন সহজে টানা যায় ডগার দিকে তেমন যায় না। তন্তুর সহজ গতিবিধিতে এরূপ বাধা সৃষ্ট হওয়ায় পশমী দ্রব্য আর্দ্রতা, তাপ ও চাপের তারতম্যে ঘন জটার মত হইতে পারে। সকল পশমই অল্পাধিক কুঞ্চিত; বক্রতা অর্থাৎ সেন্টিমিটার প্রতি ঢেউ বা বেঁক-এর সংখ্যা ২-১২ হইতে পারে। তন্তুর বক্রতা বা কুঞ্চিত' আকৃতিই পশমবস্ত্রকে শীতনিবারণক্ষম করে। এই কুঞ্চন বায়ু-চলাচলে বাধা সৃষ্টি করিয়া বস্ত্রটিকে যেন স্থির বায়ুস্তরে পরিণত করে, ফলে উহার তাপ-পরিবহণের শক্তি প্রায় থাকে না।

পশম-তন্তুর ব্যাস ও দৈর্ঘ্য অনুসারে উহার পর্যায় (গ্রেড) নিরূপিত হয়, কারণ সূতা তৈয়ারির জন্য এই দুই গুণই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ পশমের তন্তু তুলা বা রেশমের তন্তু অপেক্ষা মোটা এবং পাটের তন্তু হইতে সূক্ষ্ম। পশম-তন্তুর ব্যাস সাধারণত: ১৫ মাইক্রন (১ মাইক্রন $=\frac{১}{১০০০}$ মিলিমিটার) পর্যন্ত হয়; কার্পেটের উপযোগী মোটা পশমের তন্তুর ব্যাস ৫০ মাইক্রনও হইতে পারে। দৈর্ঘ্যে পশম-তন্তু ২-৩০ সেন্টিমিটার হইতে দেখা যায়। উচ্চ পর্যায়ের পশমের দৈর্ঘ্য অধিক; লিংকন পশম এ বিষয়ে সেরা।

অধিক ভারে পশম-তন্তুর দৈর্ঘ্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; ভার-অপসারণের পর তাহা অনেকাংশেই পূর্ব পর্যায়ে ফিরিয়া আসে না। এজন্যই পশমী জামা বহুদিন ব্যবহারে লম্বা হইয়া যায়; অবশ্য জলে ভিজাইয়া বিনা ভারে শুখাইলে আবার পূর্বাকৃতি প্রাপ্ত হয়।

পশম কেরাটিনজাতীয় প্রোটিন দিয়া গঠিত। পশমের কেরাটিনে ১৮-১৯টি অ্যামাইনো অ্যাসিডে গঠিত পলিপেপ্‌টাইডের দুইটি দীর্ঘ অণু মই-এর ধাপের মত মাঝে মাঝে সিস্‌টাইন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং লবণজাতীয় সেতুর দ্বারা যুক্ত হইয়া থাকে।

পশম আর্দ্র বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করে। সাধারণ আর্দ্রতায় পশমে তুলার তুলনায় প্রায় ২ গুণ জল থাকে। জলে পশম-তন্তু স্ফীত হয়। অধিক গরম জল, গরম ও ঘন অ্যাসিড এবং সামান্য ক্ষার-জাতীয় পদার্থে পশম নষ্ট হইয়া যায়। সামান্য ভিজা অবস্থায় পশম সহজেই জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়; সাবান, ঘাম প্রভৃতির সংযোগে ইহা বৃদ্ধি পায়।

কুটিরশিল্পে মোটা পশমে কম্বল ও সরু পশমে শাল প্রস্তুত হয়। যান্ত্রিক পশমশিল্প তন্তুর দৈর্ঘ্য অনুযায়ী দুইপ্রকার। 'ওর্স্টেড' পদ্ধতিতে লম্বা তন্তুর পশম বারংবার আঁচড়ানোর পর সূতা পাকানো হয়, ফলে বিজাতীয় দ্রব্য ও ছোট তন্তু বাদ গিয়া লম্বা তন্তুগুলি পরস্পর সমান্তরাল থাকিয়া সূতার আকৃতি সুসম ও মসৃণ করে। উৎকৃষ্ট পোশাকাদির জন্য সাধারণতঃ এরূপ সূতা ব্যবহৃত হয়। 'উলেন' পদ্ধতিতে পশমকে আঁচড়াইবার ব্যবস্থার অভাব আছে। এই পদ্ধতিতে ছোট তন্তু হইলেই চলে। ইহাতে প্রথম পদ্ধতিতে বর্জিত ছোট তন্তুও ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে উৎপন্ন সূতায় তন্তুগুলি সমান্তরাল না হওয়ায় সূতা তেমন মসৃণ নহে। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কাপড়জামায় এই সূতাই চলে।

দ্র W. J. Onions, *Wool*, London, 1962.

শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশুপতি শিব দ্র

পশুপতিনাথ বিখ্যাত শিবের মন্দির। মন্দিরটি নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডু হইতে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে বাগমতী নদীর তীরে অবস্থিত। মন্দিরের চূড়া তাম্রনির্মিত, উপরে স্বর্ণের পালিশ করা এবং দরজাগুলি রৌপ্যমণ্ডিত। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে তাম্রময় বলীবর্দরূপী নন্দীমূর্তি, অন্য তিন দিকে গণেশ, ভৈরব ও ভৃঙ্গীর মূর্তি। শিবচতুর্দশীর সময়ে এই মন্দিরে ভারত হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। মন্দিরের ভিতরে ২হাত পরিমাণ উচ্চে শিবলিঙ্গের উপর চতুর্মুখ মূর্তি বা শিবের পঞ্চানন মূর্তি। পঞ্চভূত বা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চশক্তির প্রতীক হিসাবে পঞ্চানন মূর্তিকে কল্পনা করা হইয়াছে। পশুপতিনাথ নেপালের রাজবংশের দেবতা এবং ইহা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম।

খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে রাজা জয়সিংহরামদেবের আমলে বর্তমান বহিরঙ্গ মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাগমতীর অপর তীরে একটি সিঁড়ি নামিয়া গুহ্যেশ্বরীর মন্দিরে গিয়াছে। ইহা ৫২ পীঠের অন্যতম পীঠ। ভিতরে কোনও মূর্তি নাই শুধু একটি কুণ্ড আছে। অন্যদিকে একটি সিঁড়ি গোরক্ষনাথের মন্দিরে গিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর পূর্বে ইহা বৌদ্ধদের তীর্থস্থান ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। মন্দিরের গঠনশৈলী বৌদ্ধযুগীয় প্যাগোডা-ধরনের ; নেওয়ারী শিল্পীদের দ্বারা ইহা নির্মিত হইয়াছে।

দ্র Percy Brown, *Picturesque Nepal*, London, 1912 ; P. Landon, *Nepal*, vols. I & II, London, 1928.

কমলা মুখোপাধ্যায়

পশুপালন প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই মানুষ কোনও কোনও বন্য প্রাণীকে পালন করিয়া আসিতেছে। প্রথমে ইহার উদ্দেশ্য ছিল আহার্য মাংস সংগ্রহ করা। ক্রমে গৃহপালিত প্রাণীগুলির অন্য কার্যকারিতাও মানুষ বুঝিতে পারে—কোনওটির দুগ্ধ মিষ্ট ও সুস্বাদু, কোনওটি ভারবহনে সক্ষম, আবার কাহারও বা মাংস কোমল ও সুপাচ্য। তদনুসারে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিপালন প্রচলিত হয়। বর্তমানে যেসকল গৃহপালিত প্রাণী দেখা যায় তাহারা প্রাচীন যুগের বিভিন্ন বন্য প্রাণীরই বংশোদ্ভূত। অবশ্য বিশেষ বিশেষ গুণবৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত উন্নততর প্রাণীর নির্বাচন, উন্নততর প্রাণীর সাহায্যে প্রজনন প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় মানুষ ঐ সকল প্রাণীর উপযোগিতা যথেষ্ট বর্ধিত করিয়াছে।

পশুপালনের পক্ষে প্রজননের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। গাভী তাহার দুগ্ধদানশক্তি বংশানুক্রমিকভাবে লাভ করে। উন্নত দুধেল জাতের ষণ্ডের সহিত গাভীর প্রজননের ফলে উৎপন্ন শাবকের দুগ্ধদানশক্তি মাতার তুলনায় অধিক হইবার সম্ভাবনা থাকে। শুধু গাভীর ক্ষেত্রেই নহে, অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীর ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। এজন্যই পশুপালন ব্যবস্থায় বিজ্ঞানসম্মত প্রজনন আবশ্যিক বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রজননের জন্য পুং-প্রাণী নির্বাচনের সময়ে তাহার আকৃতি, জাতি, প্রকৃতি, বংশপরিচয় (পেডিগ্রি), স্বাস্থ্য, পূর্বজাত শাবকদের গুণাবলী প্রভৃতি বিবেচনা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই প্রজননের জন্য কৃত্রিম গর্ভাধান (আর্টিফিশিয়াল ইন্‌সেমিনেশন) পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে পুং-প্রাণীর শুক্র সংগ্রহ করিয়া ও তাহা যৌনসংগম ব্যতীতই নালিকার (সিরিঞ্জ) সাহায্যে স্ত্রী-প্রাণীর জননপ্রণালীতে প্রবিষ্ট করাইয়া গর্ভসঞ্চার করা হয়। একটি ষণ্ড যৌনসংগমের দ্বারা বৎসরে ৫০টি ও কৃত্রিম গর্ভাধানপদ্ধতির সাহায্যে বৎসরে অন্ততঃ ৫০০টি গোবৎসের জনক হইতে পারে।

গৃহপালিত প্রাণীর দেহধারণ, বৃদ্ধি, শ্রমশক্তি এবং দুধ, ডিম, পশম প্রভৃতির উৎপাদন খাদ্যের উপরই নির্ভর করে। সকল গৃহপালিত প্রাণীরই কিছু কিছু দানাশস্য, শস্যজাত দ্রব্য, তৈলসার, শুষ্ক বা সরস ঘাসপাতা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় ; উত্তম পশুচারণক্ষেত্রে চরিতে দিলে দানাশস্য প্রভৃতি না দিলেও চলে। বহু প্রাণীকে একত্র শেডের মধ্যে রাখিয়া চৌবাচ্চায় বা পাত্রে করিয়া খাদ্য দিলে অপচয় নিরোধ হয়। উপযুক্ত পরিমাণে সোডিয়াম-ঘটিত লবণের জন্য সকল গৃহপালিত প্রাণীকেই কিছু লবণ আহার করিতে দিতে হয়। সুপেয় নির্মল জলও অত্যাবশ্যক।

শুষ্ক পশুখাদ্যগুলির মধ্যে 'হে' এবং সংরক্ষিত পশুখাদ্যগুলির মধ্যে 'সাইলেজ' উল্লেখযোগ্য। যখন সবেমাত্র শস্য জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই ঘাসপাতা ইত্যাদি কাটিয়া শুখাইয়া লইলে 'হে' উৎপন্ন হয়। 'হে' ও খড়ের মধ্যে পার্থক্য আছে—শস্য পাকিলে গাছ হইতে শস্য পৃথক করিয়া লওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই খড়। খড়ও শুষ্ক পশুখাদ্য, কিন্তু 'হে' খড় অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। 'সাইলেজ' প্রস্তুত করা হয় সবুজ ঘাস, সবুজ জোয়ার, ভুট্টা গাছ প্রভৃতি হইতে। সাধারণভাবে সবুজ ঘাসপাতা কাটিয়া জমাইয়া রাখিলে কয়েকদিনেই নষ্ট হইয়া যায় ; সবুজ ঘাসপাতাকে 'সাইলেজ'-এ পরিণত করিলে তাহা বহু মাস অবিকৃত ও আহারোপযোগী থাকে। যেসময়ে সবুজ ঘাসপাতার অভাব থাকে, তখন এই 'সাইলেজ' গবাদি প্রাণীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 'সাইলেজ'-উৎপাদনের সরলতম প্রক্রিয়ায় সবুজ ঘাসপাতা ৫-৭ সেন্টিমিটার দীর্ঘ খণ্ডে কাটিয়া মাটিতে গর্তের মধ্যে যথাসম্ভব জমাট করিয়া এমনভাবে রাখিয়া দেওয়া হয় যেন মাটির উপরেও কিছু পরিমাণ ঘাসপাতা স্তূপীকৃত হইয়া থাকে। ইহার উপর প্রথমে এক স্তর শুষ্ক ঘাস ও তদুপরি এক স্তর মাটি দিয়া স্তূপটিকে ঢাকিয়া রাখা হয়। ক্রমে জীবাণুর ক্রিয়ার ফলে সবুজ ঘাসপাতার কার্বোহাইড্রেট হইতে অ্যাসিড উৎপন্ন হইতে এবং উত্তাপ বাড়িতে থাকে। উত্তাপ ও অ্যাসিডের ক্রিয়ায় খাদ্যনাশক জীবাণুগুলি ধ্বংস হইয়া ঘাসপাতা সংরক্ষিত হয়।

স্বাস্থ্যসম্মত পশুশালা পশুপালনের সহায়ক। পশুশালায় প্রত্যেক প্রাণীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ স্থান, আর্দ্রতা-নিরোধক ও পিচ্ছিলতাবিহীন মেঝে, বায়ুচলাচলের জন্য যথেষ্ট জানালা-দরজা, মূত্র ও জল-নির্গমনের প্রণালী, খাদ্য দিবার চৌবাচ্চা, গবাদি প্রাণী বাঁধিবার ব্যবস্থা

প্রভৃতির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্রত্যহ পশু-শালা পরিষ্কার করা এবং বিষ্ঠা ও আবর্জনা দূরে সরাইয়া লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। খড়ের সাহায্যে গবাদি প্রাণীর দেহ মার্জনা করিয়া ধূলি ও শুষ্ক মল দূর করা এবং মাঝে মাঝে উহাদের স্নানের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। গো-মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীকে দৈনিক চারণক্ষেত্রে চরিতে দেওয়া উচিত; চারণক্ষেত্রের অভাবে দৈহিক ব্যায়ামের জন্য তাহাদের প্রত্যহ ৩-৪ ঘণ্টা মাঠে ছাড়িয়া দিতে হয়। শীতকালে শুইবার জন্য মাটিতে খড় বিছাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। খাদ্যদান ও দোহনের সময় নিয়মিত হওয়া উচিত।

সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং ঐ সকল রোগের চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত পশু-চিকিৎসার ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। গবাদি প্রাণীর রিণ্ডার্-পেস্ট, অ্যান্থ্রাক্স, গোবসন্ত প্রভৃতি এবং হাঁসমুরগির কুক্কুটবসন্ত, রানীক্ষেত রোগ প্রভৃতি অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি এবং অনেক সময়ে মহামারীর আকার ধারণ করে; ফলে বহু গৃহপালিত প্রাণীর মৃত্যু ঘটে অথবা তাহারা কার্য ও উৎপাদনের অযোগ্য হইয়া যায়। পশুশালায় নিয়মিত জীবাণুনাশ, রোগাক্রান্ত কক্ষের প্রাণীকে সুস্থ প্রাণীর সহিত মিশিতে না দেওয়া, সদ্যক্রীত প্রাণীকে অন্ততঃ ২ সপ্তাহ পৃথক রাখিয়া সম্ভাব্য রোগ সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ, রোগের প্রকোপের সময়ে উপযুক্ত টিকাদান, সংক্রামক রোগে মৃত প্রাণীর দেহ পোড়াইয়া পুঁতিয়া ফেলা প্রভৃতি পদ্ধতির দ্বারা রোগনিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রাণীজ দ্রব্যের উপযুক্ত বিপণন ব্যবস্থা পশুপালনের অপরিহার্য অঙ্গ। গৃহপালিত প্রাণী ও প্রাণীজ দ্রব্যের বিপণনের জন্য অগ্রসর দেশগুলিতে পশুমেলার আয়োজন করা হয়। এসকল মেলায় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী ও প্রাণীজ দ্রব্যের জন্য পুরস্কার প্রদান, গুণাগুণ অনুসারে মূল্য নির্ধারণ এবং মেলার শেষে নিলামের দ্বারা গৃহপালিত প্রাণীর ক্রয়বিক্রয় সমাধা হয়। ভারতের বিখ্যাত পশুমেলা বিহারের শোনপুরে হরিহর ছত্রের মেলা।

বিভিন্ন জাতের গৃহপালিত প্রাণীর সংরক্ষণ ও ক্রমোন্নয়ন, প্রজননের জন্য কৃত্রিম গর্ভাধানের সুযোগদান, জনসাধারণকে পশুপালনের আধুনিক পদ্ধতি প্রদর্শন, গোপ্রজননশালায় উন্নত জাতের বিদেশী বা দেশীয় ষণ্ডের সাহায্যে গাভীর দুগ্ধদানশক্তির উন্নতিবিধান, ব্যাপক টিকাদান, গ্রাম ও ব্লকে পশুচিকিৎসালয় স্থাপন, পশু-পালন ও পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজ পরিচালনা প্রভৃতি কার্যসূচীর দ্বারা রাজ্যসরকারগুলি ভারতে পশুপালনের উন্নতির প্রয়াস করিতেছে। ইজ্জতনগর, মথুরা, পাটনা প্রভৃতি স্থানের পশুচিকিৎসা কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। ইজ্জতনগর, পাটনা প্রভৃতি স্থানে পশু-পালন ও পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে উন্নত পর্যায়ের গবেষণার জন্য গবেষণাগারও বর্তমান।

কৃষিপ্রধান ভারতের অর্থনীতিতে পশুপালনের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের পশুগণনা অনুযায়ী ভারতে প্রায় ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ বলদ ও ষাঁড়, ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ গাভী, ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ গোবৎস, ৫৮ লক্ষ পুং-মহিষ, ২ কোটি ৪ লক্ষ স্ত্রী-মহিষ, ১ কোটি ৫৩ লক্ষ মহিষবৎস, ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ভেড়া, ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ছাগল এবং ৩৭ লক্ষ শূকর ছিল। উপরি-উক্ত পশুগণনা অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গে প্রায় ১ কোটি ৪ লক্ষ গোরু, ৬ লক্ষ মহিষ, ৫ লক্ষ ভেড়া এবং ৯৩ লক্ষ হাঁসমুরগি ছিল। ঐ সময়ে পশ্চিম বঙ্গে প্রায় ২৯ লক্ষ দুধেল গাভী ও ১ লক্ষ দুধেল মহিষ ছিল এবং ইহাদের দুধের মোট বার্ষিক পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩৯ লক্ষ মন ও ১৬ লক্ষ মন। সারা ভারতে সে সময়ে বার্ষিক প্রায় ১৮৩৬ লক্ষ মন দুধ, ৩৭০ লক্ষ মন পশুচর্ম, ৭ লক্ষ মন পশম, ১০৮৫২ লক্ষ মুরগির ডিম এবং ২৫৬০ লক্ষ হাঁসের ডিম উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতে প্রায় ৩৭ কোটি একর চাষের জমি বলদের দ্বারা কর্ষিত হয় এবং শস্যোৎপাদনের মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ বলদের শ্রমের দ্বারা নির্বাহিত হয়; সে হিসাবে বলদের বার্ষিক শ্রমের মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। এতদ্ব্যতীত ভারতে গোদুগ্ধ হইতে বার্ষিক ৬০০ কোটি টাকা, গোচর্ম হইতে বার্ষিক ২০ কোটি টাকা, গোমাংস হইতে বার্ষিক ৩১ কোটি টাকা, রপ্তানিকৃত গোরু হইতে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা, অস্থি হইতে বার্ষিক ১৪ কোটি টাকা এবং গবাদি প্রাণী হইতে উৎপন্ন সার হিসাবে বার্ষিক ৫৪০ কোটি টাকা আয় হয়। 'অশ্ব' 'গর্দভ', 'গোরু', 'ছাগল,' 'ডেয়ারি', 'ভেড়া,' 'মুরগি', 'শূকর' ও 'হাঁস' দ্র।

অমলচন্দ্র চৌধুরী

আধুনিকতম হিসাব (১৯৬৬ খ্রী) অনুযায়ী ভারতে মোট গৃহপালিত পশুর সংখ্যা প্রায় ৩৫ কোটি। তন্মধ্যে প্রায় ১৭ কোটি গোরু, ৫ কোটি ৩০ লক্ষ মহিষ, ৬ কোটি ৪০ লক্ষ ছাগল, ৪ কোটি ২০ লক্ষ ভেড়া, ১১ লক্ষ ঘোড়া, ১০ লক্ষ গাধা, ১০ লক্ষ উট এবং ৬০ হাজার খচ্চর উল্লেখ-যোগ্য। গবাদি পশুর মধ্যে প্রায় ৭ কোটি বলদ ও ৭০ লক্ষ পুং-মহিষ গাড়ি টানা, হলকর্ষণ, ভারবহন প্রভৃতি

কার্যে নিয়োজিত হয়; দুধেল গাভী ও মহিষের সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ২ কোটি ও ১ কোটি ২০ লক্ষ। ১৯৬১ হইতে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৫ বৎসরে ভারতে ঘোড়ার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, গাধার সংখ্যাও কিছু কমিয়াছে; পক্ষান্তরে উটের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, খচ্চরের সংখ্যাবৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্য, গো-মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতির সংখ্যাও অল্পস্বল্প বাড়িয়াছে।

পশুশালা বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী প্রতিপালন ও প্রদর্শনের প্রতিষ্ঠান। আধুনিক প্রাণীবিদ্যায় বিজ্ঞানসম্মত পশুশালার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। বর্তমানে প্রত্যেক উন্নত দেশেই বৈজ্ঞানিক ধারায় পশুশালা সংগঠিত হইয়াছে।

পশুশালায় নানা উল্লেখযোগ্য প্রজাতির পশুপক্ষী পালন করা হয়। ইহাদের অধিকাংশই ক্রয় বা বিনিময়ের দ্বারা সংগৃহীত হয়; কিছু প্রজনের মাধ্যমে পশুশালাতেই উৎপন্ন হয়। আবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিলে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট ঋতুতে বহু যাযাবর বিহঙ্গ পশুশালার উদ্যান ও সরোবরে অতিথি হইয়া আসে। অতীতের পশুপালন ও প্রজনন পদ্ধতির বর্তমানে বহু উন্নতি হইয়াছে। আবদ্ধ কক্ষ ও অপরিসর অঙ্গনের পরিবর্তে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কৃত্রিম শৈল, সবুজ জলাশয় ও শ্যামল বিটপীর ছায়াঘন পরিবেশে বন্য প্রাণী পালনের ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। পালিত প্রাণীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার জন্য আধুনিক পশুশালায় সুপরিকল্পিত ও সুসজ্জিত পশুচিকিৎসালয় সংগঠিত হইয়াছে। সংক্রমণ নিবারণের জন্য বিদেশ হইতে সংগৃহীত প্রাণীকে নির্দিষ্ট কাল পৃথক-করণের (করান্টিন, quarantine) এবং রোগ-প্রতিষেধক টিকাদানের নিয়মও পালিত হইতেছে। বিজ্ঞানসম্মত পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন, প্রাণীকক্ষে যথোপযুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুচলাচল ও সূর্যালোক প্রবেশের সুযোগ, শীতে কৃত্রিম উত্তাপ ও গ্রীষ্মে তাপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রভৃতিও আধুনিক পশুশালায় যথাযথভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পশুশালা লোকরঞ্জনের এক অনুপম প্রতিষ্ঠান। ইহার মোহন পরিবেশের আকর্ষণে আবালবৃদ্ধবনিতা এখানে অবসর বিনোদনে আসে, যান্ত্রিক নগরজীবনের ক্ষণেক বিরতি খোঁজে। পশুশালায় নানা গোষ্ঠী, শ্রেণী, গোত্র, বর্গ ও প্রজাতির বন্য প্রাণী সংরক্ষিত হওয়ায় প্রাণীদের অভিব্যক্তি (ইভলিউশন), অভিযোজন (অ্যাডাপ্টেশন), আকৃতিপ্রকৃতি, আহারবিহার, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে লোকশিক্ষার সুযোগ থাকে। লোকশিক্ষায় সহায়তার জন্য আধুনিক পশুশালায় 'অডিয়-ভিজুয়াল' কেন্দ্র থাকে; সেখানে লোকরঞ্জক বক্তৃতা ও চিত্তাকর্ষক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রাণীজীবন সম্বন্ধে শিক্ষার প্রয়াস করা হয়। অনেক পশুশালায় জলচর প্রাণী পালন ও প্রদর্শনের সৌকর্যার্থে জলচরাগার (অ্যাকোয়া-রিয়াম) নির্মিত হইয়াছে। পশুশালায় প্রত্যেক প্রজাতির জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ বা প্রাঙ্গণের নিকটেই তৎসম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী সংক্ষেপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। পশুশালাকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় করিবার জন্য বর্তমানে বহুস্থানেই শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র পশুশালার পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে; ইহার তৃণা-স্তীর্ণ অঙ্গনে মুখর মানবশিশু ও মূক পশুশাবকের মধ্যে পরিচয় ও প্রীতির সেতু রচিত হয়, পাখির কাকলিতে ভাষার স্পর্শ লাগে, কথামালা ও উপকথার জগৎ যেন মূর্ত হইয়া ওঠে।

পশুশালার অন্যতম প্রধান কার্য হইল সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বন্য প্রাণীর জীবনধারা, প্রকৃতি, রোগ, প্রজনন, খাদ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে দীর্ঘস্থায়ী অনুসন্ধান ও গবেষণায় সহায়তা করা। এ উদ্দেশ্যে প্রায় সকল আধুনিক পশুশালাতেই প্রাণীবিদ্যা ও পশুপালন সম্বন্ধীয় গ্রন্থাগার এবং অনেক স্থলে বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রসজ্জিত গবেষণাগারও সংযোজিত হইয়াছে; কোথাও কোথাও অনুসন্ধিৎসু কিশোরদের জন্য পৃথক গ্রন্থাগারেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্বদেশের প্রাণী বিদেশে রপ্তানি করিতে সহায়তা করিয়া পশুশালা একদিকে দেশান্তরে নূতন প্রাণীর প্রসারে অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করে।

যে সকল বন্য প্রাণীর সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে, তাহাদের সংরক্ষণের কাজেও পশুশালার গুরুত্ব আছে। দুর্লভ বন্য প্রাণীর প্রজনের দ্বারা তাহাদের বংশরক্ষার চেষ্টাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য; দৃষ্টান্তস্বরূপ শাদা বাঘের প্রজন ঘটাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধির প্রয়াসের উল্লেখ করা যায়। ভিন্নদেশীয় এবং ভিন্ন জলবায়ুতে অভ্যস্ত প্রাণী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্বাভাবিক অভ্যাসের অনুকূল কৃত্রিম পরিবেশে তাহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থাও পশুশালায় করা হয়; কলিকাতার চিড়িয়াখানায় শ্বেতভল্লুক ও স্যালাম্যাণ্ডার পালনের প্রচেষ্টা ইহারই উদাহরণ।

খ্রীষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্বেই মিশর, চীন, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশে পশুশালার অস্তিত্ব ছিল।

প্রাচীনকালে গ্রীস ও রোমেও বন্য পশুপক্ষী পালনের প্রথা ছিল। মোঙ্গল-সম্রাট কুবলাই খানের রাজোদ্যানে, ভ্যাটিকানে পোপের প্রাসাদে এবং ব্রিটেনের টাওয়ার অফ লণ্ডনেও পশুশালার অস্তিত্ব জানা যায়।

ভারতের কলিকাতা, দিল্লী, ত্রিচুর, লখনৌ, দার্জিলিং, উদয়পুর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি নানা শহরে পশুশালা আছে। তন্মধ্যে কলিকাতার পশুশালাটির (চিড়িয়াখানা) গুরুত্ব সমধিক। ভারতের বাহিরে লণ্ডন, এডিনবরো, ডাবলিন, জুরিখ, মস্কভা, রোমা, মুন্‌শেন্‌, বার্সেলোনা, লিজভোয়া, কাইরো, খার্টুম, প্রিটোরিয়া, হাভানা, টরণ্টো, নিউইয়র্ক, শিকাগো, ডেট্রয়েট, মেলবোর্ন, সিডনি, ওয়েলিংটন, করাচি প্রভৃতি বহু নগরে উল্লেখযোগ্য পশুশালা বর্তমান। 'চিড়িয়াখানা' দ্র।

দেবজ্যোতি দাশ

পশ্চিমঘাট পর্বতমালা (১২° হইতে ২১° উত্তর এবং ৭৪° ১১´ হইতে ৭৪° ৫০´ পূর্ব) ভারতের অন্যতম পর্বতমালা। রামায়ণে ইহা সহ্যাদ্রি নামে বর্ণিত আছে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পশ্চিম উপকূলে তাপ্তী উপত্যকা হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ১৬০০ কিলোমিটার (১০০০ মাইল) বিস্তৃত এই পর্বতমালা গড়ে ১০৭০ হইতে ১২২০ মিটার (৩৫০০ হইতে ৪০০০ ফুট) পর্যন্ত উঁচু। ইহাতে প্রায় ২৭০০ মিটার উচ্চ শৃঙ্গও আছে, যথা নীলগিরি পর্বতমালায় মাকুর্তি (২৫৫৪ মিটার) ও দোদ্দাবেট্টা (২৬৩৬ মিটার) এবং আনাইমালাই পর্বতমালার আনাইমুদি (২৭০৩ মিটার) প্রভৃতি। নীলগিরি হইতে আনাইমালাই পর্বতমালার মধ্যে পশ্চিমঘাটের ভিতর পালঘাট গিরিবর্ত্মটি একমাত্র ফাঁকা। সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে আরব সাগরের দিকে নামিয়া গিয়াছে বলিয়া ঘাট কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পর্বতমালা রত্নগিরি ও ধারোয়ার পর্যন্ত ডেকান ট্র্যাপের আগ্নেয়শিলার জমাট-বাঁধা স্রোতের দ্বারা গঠিত। অবশিষ্ট দক্ষিণাংশ আরকিয়ান নীস এবং চার্ণকাইট শিলায় গঠিত হইয়াছে। ভূতাত্ত্বিকগণের মতে সহ্যাদ্রি পর্বতমালা দাক্ষিণাত্য মালভূমির হেলানো পশ্চিমপ্রান্ত ব্যতীত অপর কিছু নহে।

প্রদীপকুমার দাশগুপ্ত

পশ্চিম দিনাজপুর ২৫° ১০´ ৫৫´´ হইতে ২৬° ৩৫´ ১৫´´ উত্তর এবং ৮৭° ৪৮´ ৫৭´´ হইতে ৮৯° ০´ ৬৭´´ পূর্ব। পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বঙ্গবিভাগের সময়ে দিনাজপুর জেলাও দ্বিধা বিভক্ত হয়। দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁ মহকুমা এবং বালুরঘাট মহকুমার ৪টি থানা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। বালুরঘাট মহকুমার বাকী অংশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পশ্চিম দিনাজপুর ভাঙ্গিয়া দুইটি মহকুমার সৃষ্টি করা হয়—বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পূর্বাংশ পশ্চিম দিনাজপুরের সহিত যুক্ত করিয়া উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা হয়। বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা তিনটি মহকুমায় বিভক্ত—সদর বা বালুরঘাট, রায়গঞ্জ ও ইস্‌লামপুর।

জেলার উত্তরে দার্জিলিং জেলা, পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর ও বগুড়া জেলা, দক্ষিণে মালদহ ও পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে মালদহ ও পশ্চিমে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা। জেলার আয়তন সার্ভেয়ার জেনারেলের রিপোর্ট অনুসারে ৫৩১৪ বর্গ-কিলোমিটার (২০৫২ বর্গমাইল)। ভূপ্রকৃতি সমতল। প্রায় সমগ্র অঞ্চল পলির দ্বারা গঠিত। উত্তর-পশ্চিমে ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়। জেলার দক্ষিণ দিকের উচ্চ অঞ্চল বারিন্দ নামে পরিচিত। ইহার গড় উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার (১০০ ফুট)। নদীগুলি উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। নদীখাত গভীর। জেলার প্রধান নদী মহানন্দা ও তাহার উপনদী নাগর জেলার পশ্চিম দিকে পূর্ণিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সীমা দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পুনর্ভবা ও তঙ্গন মহানন্দার অপর দুইটি উল্লেখযোগ্য উপনদী। তিস্তার একটি ধারা আত্রাই জেলার পূর্ব দিক দিয়া প্রবাহিত। জলবায়ু বহুলাংশে বিহারের মত অর্থাৎ কিছু চরম-ভাবাপন্ন। মার্চ হইতে জুন গ্রীষ্মকাল। এই সময়ে উত্তপ্ত পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়। গড় উত্তাপ ৩৭° সেন্টিগ্রেড। মে মাসে প্রচণ্ড কালবৈশাখী দেখা দেয়। জুন হইতে সেপ্টেম্বর বর্ষাকাল। গড় বৃষ্টিপাত ১৬৩৪.৮ মিলিমিটার। বর্ষাকাল খুব অস্বাস্থ্যকর সময়। অক্টোবর হইতে শীতকাল শুরু হয়। জানুয়ারিতে তাপমাত্রা ৪°-৫° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত নামিয়া যায়। ফলে শীতের তীব্রতা এই অঞ্চলে খুব বেশি।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমার অনুযায়ী জেলার মোট জনসংখ্যা ১৩২৩৭৯৭। তন্মধ্যে শহরবাসী ৯৮৯৬৯ ও গ্রামবাসী ১২২৪৮২৮ জন। ১০০০ পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯০৬ জন। জেলার মিউনিসিপ্যাল শহর রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট। অন্যান্য ছোট শহর কালিয়াগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, ইস্‌লামপুর ও হিলি।

শিক্ষায় এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় অনগ্রসর। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমার অনুযায়ী পশ্চিম দিনাজপুরে শিক্ষিতের হার শতকরা ১৭.০৬। শতকরা ৭২.০২ লোকের মাতৃভাষা বাংলা, শতকরা ১০.১৪ লোকের মাতৃভাষা উর্দু, শতকরা ৯.২৯ লোকের মাতৃভাষা সাঁওতালী ও শতকরা ৫.৩৮ লোকের মাতৃভাষা হিন্দী। ইসলামপুরে উর্দুভাষী ও বালুরঘাটে সাঁওতালীভাষীর সংখ্যা বেশি।

দিনাজপুর কৃষিপ্রধান জেলা। যদিও পূর্ব দিনাজপুর হইতে পশ্চিম দিনাজপুর বহুলাংশে অনুর্বর, তথাপি পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে উন্নত যন্ত্রপাতি ও সেচব্যবস্থায় এই জেলা প্রচুর ফসল উৎপাদন করিতেছে। জেলার প্রধান ফসল আমন ধান, ভাদই ধান, পাট, তিসি, সরিষা, আখ, ডাল, তামাক ও লংকা। পূর্বে পেঁয়াজ ও লংকা ছিল প্রধান বাণিজ্যিক ফসল, বর্তমানে পাট সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, আনারস ও কলা প্রসিদ্ধ।

জেলায় বহু বড় বড় দীঘি আছে। পূর্বের হিন্দু ও মুসলমান শাসকগণ এই সকল দীঘি খনন করিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য দীঘিগুলির নাম আলতাদীঘি, মাল্যনদীঘি, গৌরদীঘি, মহীপালদীঘি, ঢলদীঘি, কালাদীঘি, প্রাণসাগর ও তপনদীঘি।

পশ্চিম দিনাজপুর শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে রেজিষ্ট্রিকৃত ফ্যাক্টরীর সংখ্যা ছিল ৩৪, তন্মধ্যে ৩২টিই ধানকল।

পশ্চিম দিনাজপুরে রেলপথ সামান্য। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ মাত্র রায়গঞ্জ হইতে রাধিকাপুর (৩২ কিলোমিটার) ও ডলখোলা হইতে ইস্‌লামপুর (৬৪ কিলোমিটার) পর্যন্ত বিস্তৃত। শুধু কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর শহর রেলপথ দ্বারা যুক্ত। জেলার সদর বালুরঘাটের নিকটতম রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জ ৯৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সড়ক পরিবহনই চলাচলের প্রধান ব্যবস্থা। ৩৪ নং জাতীয় সড়ক (কলিকাতা-শিলিগুড়ি) এই জেলার প্রধান সড়ক। নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন সার্ভিস জেলার সর্বত্রই বাস চালাইতেছে। বালুরঘাটে একটি ছোট বিমান-অবতরণক্ষেত্র আছে।

লোক-সংগীত, কথকতা, যাত্রাগান প্রভৃতি অধিবাসীদের বিশেষ প্রিয়। জেলায় ২৬টি মেলা বসে, তন্মধ্যে ইস্‌লামমেলা দুইমাস স্থায়ী।

জেলায় বহু স্থাপত্যকলার প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই জেলায় এককালে যে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহারও বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

দ্র J. C. Sengupta, *West Bengal District Gazetteers: West Dinajpur*, Calcutta, 1965; B. Roy, *Census of India; 1961: District Handbook: West Dinajpur*, Calcutta, 1966.

সলিলকুমার চৌধুরী

পশ্চিম পাকিস্তান, পাকিস্তান দ্র।

পশ্চিমবঙ্গ ২১°৩৮´ হইতে ২৭°১০ উত্তর ও ৮৫°৫০ হইতে ৮৯°৫০´ পূর্বে অবস্থিত ভারত ইউনিয়নের একটি রাজ্য। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবিভাগের ফলে বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। পশ্চিমভাগ পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতের মধ্যে রহিল এবং পূর্বভাগ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহার পরে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্যে কিছু ভূমিসংক্রান্ত পরিবর্তন দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গ উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রহিয়াছে বিহার ও ওড়িশা, উত্তর-পূর্ব প্রান্তে আসাম, উত্তর সীমান্তে নেপাল, ভূটান ও সিকিম এবং পূর্ব দিকে পূর্ব পাকিস্তান।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৭৬১৭ বর্গকিলোমিটার (৩৩৮২৯ বর্গমাইল)। পশ্চিমবঙ্গে ৩টি বিভাগ ও ১৬টি জেলা আছে ('জেলা' দ্র)।

এই রাজ্যের পশ্চিম দিকে অবস্থিত বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলাগুলিতে আর্কিয়ান যুগের বহু পুরাতন শিলা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ গ্র্যানিট ও নীস শিলার দ্বারা এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি গঠিত। গণ্ডোয়ানা পর্যায়ের শিলাস্তর অজয় নদের উত্তরে বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে বর্ধমান জেলার আসানসোল ও রানীগঞ্জ সহ বাঁকুড়ার উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যে মৃত্তিকাপ্রস্তর, বেলে পাথর ও কয়লাস্তর রহিয়াছে। উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা টার্শিয়ারি যুগে উত্থিত হইয়াছিল। এই পর্বতমালা বহু পুরাতন গ্র্যানিট ও মাইকাশিষ্ট দ্বারা গঠিত।

ইহা ছাড়া টার্শিয়ারি যুগের অর্ধরূপান্তরিত বেলে পাথর, বেলে পাথর, শেল ও মিশ্রিত শিলা দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে যে বিস্তৃত সমভূমি রহিয়াছে, উহা পলিমাটির দ্বারা গঠিত। গঠনানুসারে পশ্চিমবঙ্গের সমতলের পলিমাটিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়;

প্লাইস্টোসিন যুগের পুরাতন পলিমাটি মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও উত্তরবঙ্গের কিছু অংশে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বাকি সমতলভূমি প্রায় নূতন পলিমাটিতে গঠিত।

উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ও পশ্চিম প্রান্তে ক্ষয়প্রাপ্ত ছোটনাগপুর মালভূমির প্রলম্বিত অংশ ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে একটানা সমতলভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমভূমিতে অসংখ্য নদ-নদী ও তাহাদের শাখা-প্রশাখা ইহাকে নদীমাতৃক করিয়া তুলিয়াছে। মহানন্দা, তিস্তা, জলঢাকা এবং তোরসা নদী সিকিম হিমালয় হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। মহানন্দা গঙ্গায় মিশিয়াছে, কিন্তু তিস্তা, জলঢাকা ও তোরসা দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া পদ্মা অথবা ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। গঙ্গার একটি ধারা ভাগীরথীর দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ব দিক হইতে জলাঙ্গি ও চূর্ণী নদী ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। পশ্চিম দিক হইতে দ্বারকা, ময়ূরাক্ষী, দামোদর, শিলাই, কাঁসাই ও স্বর্ণরেখা নদী ভাগীরথী, হুগলি অথবা বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

উত্তরে হিমালয়-অঞ্চল ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ সাধারণতঃ ক্রান্তীয় জলবায়ুর অন্তর্গত। মার্চ হইতে অক্টোবর পর্যন্ত বাতাসের উত্তাপ ও আর্দ্রতা বেশি থাকে। এই ঋতুর প্রথমাংশ প্রায় শুষ্ক থাকে, কিন্তু জুন মাস হইতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত জলবায়ু শুষ্ক থাকে। সমভূমিতে গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ প্রায় ২৭° সেন্টিগ্রেড হইতে প্রায় ৪৩° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সমুদ্রের প্রভাবের জন্য উত্তাপ কখনও চরমে যায় না। পশ্চিমবঙ্গে গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১৯০৫ মিলিমিটার (৭৫ ইঞ্চি); সর্বাপেক্ষা বেশি বৃষ্টিপাত উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে হয়।

পৌরাণিক উপাখ্যানে আছে, একদা চন্দ্রবংশীয় রাজা বালীর অন্যতম পুত্র বঙ্গ পদ্মা নদীর দক্ষিণ ভাগ এবং ভাগীরথী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ অঞ্চল অধিকার করেন। ইনি পরে মধ্যম পাণ্ডব ভীম এবং রাজা রঘুর হস্তে পরাজিত হন। 'রঘুবংশে' এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বর্ণনায় আছে যে তাহারা নৌকায় বসবাস করিত এবং প্রধান খাদ্য হিসাবে রোপণকরা ধান চাষ করিত।

গুপ্তযুগে বঙ্গদেশের অধিকাংশ গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল ('গৌড়' দ্র)। খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে পালবংশ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং ক্রমশঃ তাহারা বিহারে ও উত্তরবঙ্গে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইহাদিগকে বিজয় সেন নামে এক রাজা বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। ক্রমশঃ বঙ্গদেশে বিজয় সেনের রাজত্ব পশ্চিমে মহানন্দা ও ভাগীরথী নদী হইতে পূর্বে করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বল্লাল সেনের সময়ে ভাগীরথীর ঠিক পূর্বে অবস্থিত অঞ্চল 'রাঢ়' নামে পরিচিত ছিল। প্রাকৃত ভাষায় 'রাঢ়'কে 'লাল' বলা হইত। তখন বঙ্গদেশ নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত ছিল—রাঢ় অঞ্চল কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলের সহিত মিলিত হইয়াছিল, বারেন্দ্র পুণ্ড্ররাজ্যে, বাগরী দক্ষিণবঙ্গে; এবং বঙ্গ পূর্ববঙ্গ নামে পরিচিত হইয়াছিল।

১২০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে যখন বখ্‌তিয়ার খল্‌জী বিহার জয় করিয়াছিলেন তখন সেনবংশ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে বখ্‌তিয়ার খল্‌জি গৌড় ও নবদ্বীপ অধিকার করেন। ক্রমশঃ বঙ্গদেশের অধিকাংশ মুসলমান সুলতানদের অধীনে চলিয়া গেল। দিল্লীর সম্রাটদের সহিত সামান্য যোগাযোগ রক্ষা করিয়া মুসলমান সুলতানরা বঙ্গদেশে গৌড় অথবা লখনাওতীতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ১৩৩৮ হইতে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে বিভিন্ন স্বাধীন রাজা রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। ইহারা প্রধানতঃ পাঠান অথবা তুর্কী-বংশোদ্ভূত ছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে মোগল সম্রাটের অধিকার প্রবর্তিত হইল। পরবর্তীকালে পাঠানরা ও হিন্দু জমিদারগণ বিদ্রোহ করিলে মানসিংহ ও পরে ইসলাম খান তাহাদের দমন করেন। এই সময়ে আরাকান রাজ্য হইতে মগদের এবং দক্ষিণের দ্বীপপুঞ্জ হইতে মেঘনা নদীর মোহানা অঞ্চলে পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ বঙ্গদেশে ভয়ের কারণ ছিল। সাধারণতঃ বঙ্গদেশে পাণ্ডুয়া, গৌড় অথবা রাজমহলে রাজধানী স্থাপিত হইত, কিন্তু ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী ঢাকায় সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহার ১০০ বৎসর পরে মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মোগল সম্রাটদের ক্ষমতা খুব কম ছিল।

মুসলমানদের রাজত্বকালে শাসনব্যবস্থা রাজার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী পরিবর্তিত হইত। কিন্তু যতক্ষণ নিয়মিত রাজস্ব এবং সময়োপযোগী সৈন্য সরবরাহ করা হইত, ততক্ষণ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করিত না। সেইজন্য কয়েকজন স্থানীয় শক্তিশালী হিন্দু এবং মুসলমান নিজেরাই ছোট ছোট রাজ্য পরিচালনা করিতেন। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় শাসকের প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও কয়েকজন ক্রমশঃ প্রচুর ক্ষমতা অর্জন

করিয়াছিলেন। বর্ধমানের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজকার্যে নিযুক্ত একজন পাঞ্জাবী ক্ষত্রী।

ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত ঘটে বাণিজ্যের মাধ্যমে। ইংরেজ বণিকরা প্রথমে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের অনুকরণে ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভাগীরথী ও হুগলি নদীর ধারে তাহাদের বাণিজ্য-উপনিবেশগুলি স্থাপন করে। অতঃপর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে ইংরেজদের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল গড়িয়া উঠে। ইহার পর বঙ্গদেশে ওয়ারেন হেষ্টিংস স্থায়ী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। বঙ্গদেশের জেলাগুলিতে ইওরোপীয় শুল্কসংগ্রাহক নিযুক্ত করা হয়; তাঁহারা দেওয়ানি আদালতে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আদালতে স্থানীয় কর্মচারীরা শুল্ক-সংগ্রাহকদের নিজেদের মতামত জানাইয়া শাসনকার্যে সাহায্য করিতেন। ফৌজদারি আদালতে মুসলমান কর্মচারীরা সভাপতিত্ব করিতেন; কিন্তু যথার্থ বিচারের জন্য জেলা-অধিকর্তা দায়ী ছিলেন। ইহার পর ইওরোপীয় শুল্ক-সংগ্রাহকদের পরিবর্তে দেশীয় ব্যক্তিদের হস্তে আদালতের বিচারভার ন্যস্ত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের রাজধানী ছিল। ইহার পর দিল্লী ভারতের রাজধানী হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। তদবধি পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি রাজ্যে পরিণত হয়।

ভারতে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় ঘন-বসতিপূর্ণ রাজ্য। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনায় এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল ৩৪৯২৬২৭৯; ইহার মধ্যে ১৮৫৯৯১৪৪ জন পুরুষ ও ১৬৩২৭১৩৫ জন নারী। গড়পড়তা প্রতি বর্গ-কিলোমিটারের ঘনত্ব হইতেছে ৩৯৪ জন। গ্রাম-এলাকায় ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩০৪ জন; শহরাঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০২ জন। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় ঘনত্ব কম। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, ও ২৪ পরগনা জেলায় ঘনত্ব বেশি। পুরুষ ও নারীর অনুপাত হইল প্রতি ১০০ জন পুরুষে ৮৭ জন নারী। অন্যান্য রাজ্য হইতে বহু পুরুষ পশ্চিমবঙ্গে চাকুরিতে নিযুক্ত হইয়া আছে; এজন্য মহিলার অনুপাতে পুরুষের সংখ্যা বেশি। মোট লোকসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ শহরাঞ্চলে আছে। শহরবাসীর শতকরা ৫৪ ভাগ কলিকাতা এবং হুগলি নদীর নিকটবর্তী শহরাঞ্চলে বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৮৪টি শহর ও ৩৮৪৬৫টি গ্রাম আছে।

আসানসোল এবং হুগলি-তীরবর্তী শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় বিশেষতঃ বিহার ও মধ্যপ্রদেশ হইতে প্রচুর লোকের সমাগম হইতেছে। দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির চা-বাগানগুলিতে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও তামিলনাডুর শ্রমিক দেখা যায়।

বাঙালীদের শরীরের গঠন দেখিয়া মনে হয় যে উহারা তিনটি বিভিন্ন জাত হইতে উদ্ভূত—দ্রাবিড়, মঙ্গোল ও আর্য। ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বঙ্গদেশেও ভাষার মধ্যে দ্রাবিড়ের প্রভাব দেখা যায়। বঙ্গদেশে উত্তর-পূর্ব দিক হইতে উপজাতিদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ইহাদের মধ্যে বর্তমানে ছোটনাগপুর অঞ্চলে অধ্যুষিত মুণ্ডারী উপজাতিকে কেবল দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে উত্তর-পূর্ব দিক হইতে তিব্বতী ও বর্মীদের আগমন ঘটে। লেপচা, তিব্বতী, ভুটিয়া এবং নেপালীরা বঙ্গদেশের উত্তরাংশে বসবাস করে। ইহারা বৌদ্ধ। ইহা ছাড়া পশ্চিম দিকে সাঁওতালদের দেখা যায়। এই পার্শ্ববর্তী দলগুলিকে বাদ দিলে দেখা যায় যে বাঙালীরা বেশির ভাগ হিন্দু অথবা মুসলমান।

কৃষিকার্য পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উপজীবিকা। শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ জমি কৃষির অন্তর্গত। হুগলি, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং বীরভূম জেলায় শতকরা ৭০ ভাগের বেশি জমিতে কৃষিকার্য হয়; কিন্তু জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় যথাক্রমে শতকরা মাত্র ৪৩ এবং ২৮ ভাগ জমি কৃষির অন্তর্ভুক্ত। নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় দ্বিফসলের জন্য যথাক্রমে শতকরা ৫২ এবং ৪৩ ভাগ জমি ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য জেলায় এই হার সাধারণতঃ হ্রাস-বৃদ্ধি পায়, যথা বাঁকুড়ায় উহা শতকরা ৬ ভাগ এবং মালদহে ২২ ভাগ।

পশ্চিমবঙ্গে ধানই প্রধান শস্য এবং শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ কৃষিজমিতে উহার ফলন হয়। অন্যান্য প্রধান কৃষি-দ্রব্যের মধ্যে রহিয়াছে পাট, চা এবং কিছু ডাল, তৈলবীজ ও তামাক। পাট সাধারণতঃ হুগলি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, কুচবিহারে এবং জলপাইগুড়ি জেলায় উৎপন্ন হয়।

১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ১১·৩ লক্ষ হেক্টর (২৮ লক্ষ একর) জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে জলসেচব্যবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ময়ূরাক্ষী এবং দামোদর নদের বৃহৎ পরিকল্পনা ব্যতীত ছোট নদীর প্রকল্পের কাজও শুরু হইয়াছে। এইগুলির

মধ্যে হিংলাপ্রকল্প, কংসাবতীপরিকল্পনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পুরাতন সেচব্যবস্থায় খাল পুষ্করিণী ব্যবহৃত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ১৩.৯ ভাগ জমি বনভূমির অন্তর্গত; বনভূমি শতকরা ২০.৮ ভাগ পার্বত্য অঞ্চলে এবং ১১.৫ ভাগ সমভূমিতে। সমগ্র বনভূমিকে মোটামুটি ৪ ভাগে বিভক্ত করা যায়: ক. সুন্দরবন অঞ্চলের উপকূলীয় অরণ্যে সুন্দরী বৃক্ষই প্রধান বৃক্ষ খ. পশ্চিম দিকের মালভূমিতে শুষ্ক অরণ্য আছে, এখানে শাল প্রধান বৃক্ষ গ. হিমালয়ের পাদদেশে ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে এবং নিম্ন ও শুষ্ক গিরিশাখায় শাল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ছাড়া ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন নদীর ধারে যে পাথরের স্তর দেখা যায় তাহাতে শিশু ও খয়ের বৃক্ষ জন্মে ঘ. পার্বত্য অঞ্চলে সাধারণতঃ ওক, ম্যাগ্‌নোলিয়া ও রডোডেনড্রন বৃক্ষ দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ খনিজ পদার্থের উৎপাদনে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। এই রাজ্যের খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা প্রধান। পশ্চিমবঙ্গের কয়লা প্রধানতঃ বিটুমিনাস। জলপাইগুড়ি জেলায় কিছু অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট খনিজ দ্রব্যের মধ্যে চীনামাটি, চুনা পাথর ও উলফ্রাম উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি খনিজ দ্রব্য এখনও ব্যবসায়িকভাবে খনন করা হয় নাই; যথা তামা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকা এবং বেলে পাথর। রানীগঞ্জ ও বরাকরের কয়লাখনিগুলিতে উচ্চ-শ্রেণীর কোক-কয়লা পাওয়া যায়। দার্জিলিং অঞ্চলে কিছু নিম্নশ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়।

সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে বহুবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নানা ধরণের শিল্প বিশেষতঃ ধাতুময়, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক ও বয়নশিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে সাধারণতঃ খনিজশিল্প এবং লৌহশিল্পই প্রধান। উত্তরে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে চা-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যত্র বৃহৎ শিল্পের অভাব সুস্পষ্ট।

পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্পের স্থান প্রথম। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মোট ১১২টি পাটকলের মধ্যে ১০১টিই পশ্চিমবঙ্গে ছিল। পশ্চিমবঙ্গে কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের শতকরা ৫১.২ ভাগ পাটশিল্পে নিযুক্ত আছে এবং শিল্পজাত দ্রব্যমূল্যের শতকরা ৩৪.৩ ভাগ পাট হইতে পাওয়া যায়। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী হিসাবে পাটশিল্প ভারতের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

পশ্চিমবঙ্গে কার্পাসশিল্প ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পর উন্নতি লাভ করে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রদেশে ৫১টি কাপড়ের কল ছিল এবং শ্রমিকসংখ্যা ছিল ৪৩২২১। কার্পাস-শিল্পও হুগলি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। চা-শিল্পও পাটশিল্পের ন্যায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে সাহায্য করে বলিয়া অর্থনীতিতে উহার বিশিষ্ট স্থান আছে। গত ১০ বৎসরে রূপনারায়ণপুরে বৈদ্যুতিক তার-কারখানা, কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কারখানা, চিত্তরঞ্জনে রেলযানের কারখানা এবং দুর্গাপুরে লৌহশিল্পের ও খনিযন্ত্রের কারখানা সংগঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর ক্ষুদ্রশিল্প রহিয়াছে, যথা ধানকল, তেলকল ও হাল্কা ধরণের এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প।

হস্তশিল্পগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার রেশমশিল্প বিখ্যাত। কৃষিযন্ত্রের উৎপাদন ও মেরামতের কাজে নিযুক্ত কর্মকার প্রায় সর্বত্রই আছে। মৃৎশিল্পের কাজ সর্বত্র হয়; কৃষ্ণনগরের মৃৎ-ভাস্কর্য বিখ্যাত।

পশ্চিমবঙ্গে তিনটি আঞ্চলিক রেলপথ রহিয়াছে: পূর্ব রেলপথ, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ও উত্তর-পূর্ব রেলপথ। ইহা ছাড়া সীমান্ত রেলপথ ও ছোট লাইনের রেলপথও রহিয়াছে। সর্বসমেত প্রায় ৩৪০০ কিলোমিটার রেলপথ আছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৈদ্যুতিক রেলচলাচলেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া কতকগুলি ছোট রেলপথ স্থানীয় পরিবহনে সাহায্য করে। দার্জিলিং পাহাড়ের মধ্য দিয়া দার্জিলিং-হিমালয় রেলপথ গিয়াছে। ইহা ছাড়া হাওড়া-শিয়াখালা, হাওড়া-আমতা ও আহমদপুর-কাটোয়া রেলপথ আছে। চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত-বসিরহাটের ছোট রেলপথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং উহার পরিবর্তে ইছামতী নদীর পশ্চিম তীরে বারাসত হইতে হাসনাবাদ পর্যন্ত চওড়া গেজের রেলপথ স্থাপন করা হইয়াছে।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম্য পথ ছাড়া মোট প্রায় ২৩০০০ কিলোমিটার রাস্তা ও প্রায় ১১০০ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক ছিল। কলিকাতা ও কুচবিহারে যাত্রীদের পরিবহনব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়করণ করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মোট প্রায় ২৬৬০ কিলোমিটার জলপথের মধ্যে প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার নাব্য নদী ও অবশিষ্টাংশ খাল। গঙ্গা এই রাজ্যের প্রধান নাব্য নদী; উহার নাব্য শাখানদীর মধ্যে জলাঙ্গি, ভৈরব ও ইছামতী প্রধান। উত্তরবঙ্গের নদীর মধ্যে তিস্তা, তোরসা ও মহানন্দা নাব্য। মালদহের পাট ও ধান মহানন্দা নদী দিয়া গঙ্গার তীরে রাজমহল অথবা ধুমুখিয়া ঘাটে আনা হয়। সুন্দরবনের উপকূল হইতে নদিয়া পর্যন্ত হুগলি, ইছামতী ও চূর্ণী নদীতে জোয়ার-ভাঁটার প্রবাহ দেখা যায়। কলিকাতা হইতে

পূর্ব পাকিস্তান ও আসামে যাইতে এই নদীগুলি খুব সুবিধাজনক। রূপনারায়ণ ও হলদী নদী সারা বৎসর নাব্য থাকে।

ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে মোট ১০টি নাব্য খাল আছে। মেদিনীপুর খাল সর্বাপেক্ষা বড়; হিজলি খালের দৈর্ঘ্য উহার পরে। ওড়িশা খাল পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াইয়া ওড়িশার বালেশ্বর জেলার চাঁদবালি পর্যন্ত বিস্তৃত। কলিকাতার পার্শ্বে কয়েকটি খাল আছে, যথা সার্কুলার খাল, বেলিয়াঘাটা খাল ও নিউ-কাট খাল। এই খালগুলি কলিকাতার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে পরিবহনের সুবিধা দান করে। ইহা ছাড়া কলিকাতার শহরতলিতে ৪টি খাল আছে; যথা কৃষ্টপুর খাল (১৬ কিলোমিটার), ভাঙ্গর খাল (২২ কিলোমিটার), বক্সিগাইঘাটা খাল (১০ কিলোমিটার) এবং উষ্টি-নারায়ণ খাল (১৯ কিলোমিটার)।

প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর কলিকাতার দমদমে অবস্থিত।

কলিকাতা-বন্দর হইতে পরিবহনের মাধ্যমে চা, তুলা, কার্পাসবস্ত্র, চর্ম, বনস্পতি, ঘি, কাচ, তামাক ও পাটজাত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের অন্যান্য বন্দর অপেক্ষা কলিকাতায় সর্বাপেক্ষা বেশি জাহাজের মাল ওঠা-নামা করিয়াছে; এখনও পর্যন্ত কলিকাতা বন্দর রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতের রপ্তানির প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ কলিকাতা বন্দর বহন করে।

দ্র W. W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, London, 1868; H. H. Risely, *Tribes and Castes of Bengal*, Calcutta, 1891; C. R. Wilson, *Early Annals of the English in Bengal*, vols, I & II, London, 1895 & 1900; A. Mitra, *Census of India: West Bengal, Sikkim & Chandernagor*, Calcutta, 1951; *Techno-Economic Survey of West Bengal*, New Delhi, 1962.

মীরা গুহ

পহলগাঁও, পহলগাম জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের একটি ছোট শহর। শহরটি শ্রীনগর হইতে ৯৬ কিলোমিটার পূর্বে জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় 'লিডার বা লিড্ডর নদীর তীরে অবস্থিত। উচ্চতা প্রায় ২২০০ মিটার। আয়তন প্রায় ২১ বর্গকিলোমিটার। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে জনসংখ্যা ছিল ১৯২০। ইহাকে কাশ্মীরের বিশ্রামের শহর বলা হয়। এখান হইতে হাঁটাপথ অমরনাথ, লদাখ, তিব্বত, পামির ও সিন্ধুউপত্যকায় গিয়াছে ('অমরনাথ' দ্র)। হোটেল-ব্যবসায় অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। কাঠের কারখানাও আছে। এখানকার হস্তশিল্প ও সূচীশিল্প প্রসিদ্ধ। লিড্ডর নদী পহলগাঁও-এর বিশেষ আকর্ষণ।

দ্র নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশ্মীর, কলিকাতা, ১৯৫৮; ধীরেন্দ্রলাল ধর, কাশ্মীর, কলিকাতা, ১৯৬৪।

সলিলকুমার চৌধুরী

পহ্লব ভারতে যে পহ্লব-বংশীয় রাজারা রাজত্ব করেন, তাঁহারা বোধ হয় প্রথমে পার্থিয়া বা পারদ সাম্রাজ্যের সামন্তরাজ হিসাবে দক্ষিণ আফগানিস্তানে সীস্তান প্রদেশ শাসন করিতেন ও পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মনে হয়, শক 'রাজাতিরাজ' অয় ও অয়িলিশ যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধীশ্বর, তখন পহ্লব-বংশীয় অর্থগ্ন (Orthagnes) 'রাজাতিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া সীস্তানে রাজত্ব শুরু করেন। তাঁহার অধীনে গুদুফর (Gondophares) ও গুডনের (Gudana) সহিত কান্দাহার শাসন করিতেন। অচিরে গুদুফর বোধ হয় দ্বিতীয় অয়ের রাজ্যের কিছুটা অধিকার করিয়া 'মহারাজ ত্রাণকর্তা' উপাধি লইয়া নিজনামে মুদ্রাংকন করেন এবং সেই সময়ে গুডন একাকী কান্দাহার শাসন করেন। কিয়ৎকালমধ্যে গুদুফর শুধু অর্থগ্নেরই নয়, দ্বিতীয় অয়ের রাজ্যেরও অধিকার লাভ করেন। এই সময়কার পার্থীয় প্রথার একটি মুদ্রালেখে তাঁহাকে 'রাজাতিরাজ' ও 'একরাট' (Autocrator) উপাধি লইতে দেখা যায়। গুডনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অবদগস (Abdagases) বোধ হয় তাঁহার অধীনে কান্দাহার শাসন করেন।

কোনও অলিখিত অব্দের (সম্ভবতঃ বিক্রমাব্দের) ১০৩ বর্ষে লিখিত মর্দান জেলার তখ্‌তিবাহীতে প্রাপ্ত একটি শিলালেখ হইতে জানা যায় যে, গুদুফর অন্ততঃ ২৬ বৎসর রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টীয় কিংবদন্তিতে কথিত আছে যে, গুদুফর ও গুডন ধর্মপ্রচারক টমাস কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন।

শক-পহ্লব শাসনব্যবস্থায় সময়ে সময়ে তাঁহাদের 'স্ত্রতেগরা' (Strategos, সেনাপতি) তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। মুদ্রালেখ হইতে জানা যায় যে,

পহ্লৱী ভাষা

'ইন্দ্রবর্মপুত্র' অস্পবর্মন প্রথমে শকরাজ দ্বিতীয় অয়ের ও পরে গুডুফরের স্ত্রতেগ ছিলেন। সেইরূপ অস্পের ভ্রাতুষ্পুত্র সস ও প্রথমে কিছুদিন গুডুফরের সহিত ও পরে পকুরের (Pakores) সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গুডুফরের উত্তরাধিকারী ছিলেন পকুর। পকুর 'রাজাতিরাজ' উপাধি লইয়া রাজত্ব করিলেও তাঁহার রাজ্য গুডুফরের তুলনায় খুবই ছোট ছিল।

তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত দুইপ্রকার রৌপ্যমুদ্রার মুখ্য দিকে গুডুফরের মস্তক ও গৌণ দিকে যথাক্রমে তাঁহার নামেমাত্র অধীন শাসনকর্তা 'রাজরাজ' উপাধিধারী সপেদন ও সতবস্ত্রের নাম দৃষ্টে বেশ বোঝা যায় যে, গুডুফরের সময়েই ভারতের পহ্লব-সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে। এই দুইপ্রকার মুদ্রার সহিত অনুরূপ আরও একপ্রকার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহা জনৈক 'মহারাজ রাজাতিরাজ কুষণ যবুগের' মুদ্রা। প্রথম কদ্‌ফিসের (Kadphises I) মুদ্রালেখে তাঁহার 'কুষণ যবুগ' উপাধি দেখিয়া মনে হয়, শেষোক্তপ্রকার মুদ্রা তিনিই প্রবর্তন করেন এবং ভারতে পহ্লবশাসনের অবসান ঘটান।

অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

পহ্লৱী ভাষা অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, 'পহ্লব' শব্দটি 'পর্থব' শব্দের পরিবর্তিত রূপ। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ-৫ম শতকে ইরাণের হখামনীষীয় সম্রাটদের শিলালিপিতে 'পর্থব' শব্দটি সাম্রাজ্যের অন্তঃপাতী বিশেষ একটি জনপদের, ইরানের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রীক সম্রাট আলেক্‌সান্দরের বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকিলে খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকে পর্থব বা পহ্লবজনদের বাসভূমি 'পার্থিয়া'র অর্সাক-(Arsak) বংশীয়েরা ইরানের শাসনক্ষমতা অধিকার করে এবং প্রায় ৫০০ বৎসরকাল রাজত্ব করে (খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় ৩য় শতক)। পহ্লব সম্রাটদের আমলে প্রচলিত সমগ্র ইরানের সাধারণ ভাষাকে বলা হয় 'পহ্লবী' (পহ্লবদের ভাষা বলিয়া এইরূপ নামকরণ নহে)।

হখামনীষীয় সম্রাটদের আমলে সমগ্র ইরানের রাজভাষারূপে প্রচলিত (যাহার নিদর্শন মেলে সম্রাটদের শিলালিপি ও ধাতুলিপিতে) 'প্রাচীন পারসিক' কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে যে রূপ গ্রহণ করে, তাহাকে বলা হয় 'মধ্য পারসিক'। এই 'মধ্য পারসিক'ই ছিল পহ্লব রাজত্বে ইরানের ভাষা—পহ্লৱী অর্থে বুঝায় এই মধ্য পারসিক। কিন্তু কয়েকটি ক্ষোদিত লিপির বাহিরে পহ্লব আমলে পহ্লৱীর সাহিত্যিক নিদর্শন মেলে না। প্রকৃতপক্ষে পহ্লৱীর সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় পহ্লবরাজত্বের অবসানের পরে, খ্রীষ্টীয় ৩য় শতক হইতে সাসানবংশীয়দের রাজত্বে। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের শেষার্ধে আরবীয়েরা ইরান অধিকার করিয়া লইলে ইরানের প্রাচীন ধর্মের স্থানে বহিরাগত নূতন ধর্ম ইসলামের প্রতিষ্ঠা হয়। সাসানীয় রাজত্বের বিলোপের পরেও, এবং 'মধ্য পারসিকে'র বিবর্তনে ৮ম শতকে 'নব্য পারসিক' বা ফার্সীর উদ্ভবের পরেও, ইরানের জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্মের পুরোহিতেরা প্রায় ১০ম শতক পর্যন্ত পহ্লৱীর চর্চা চালাইয়া যান। খ্রীষ্টীয় ৩য় শতক হইতে ১০ম শতক পর্যন্ত প্রায় ৭০০ বৎসর ধরা হইয়া থাকে পহ্লৱীদের কাল।

আরামীয় বর্ণমালা কিছুটা কাটছাঁট করিয়া তাহার সাহায্যে পহ্লৱী লেখা হইত। লেখাতে আরামীয় ভাবলিপিও ব্যবহার করা হইত। পড়িবার সময়ে এই প্রতীকগুলিকে আরামীয় শব্দরূপে না ধরিয়া তাহার পহ্লৱী প্রতিশব্দরূপে ধরা হইত; যেমন—M N, এই চিহ্নটি আরামীয় ভাষায় পড়া হইত min (অর্থ 'হইতে') কিন্তু পহ্লৱীতে এই চিহ্নটিই পড়া হইত hac 'হচ্' (আরামীয় min-এর ইরানী প্রতিশব্দ বৈদিক সংস্কৃতের 'সচা')। তুলনীয় *i. e*=লাতিনে id est কিন্তু ইংরেজীতে *that is*। পহ্লৱীর এইরূপ লিখন ও পঠন পদ্ধতিকে বলা হইত *uzvarishn* উজ্‌ৱারিশ্‌ন্ অর্থাৎ 'ব্যাখ্যা'।

খোদিত লিপি, অবেস্তার অনুবাদ, টীকা, ভাষ্য এবং অন্যান্য কিছু রচনা লইয়া পহ্লৱীর সাহিত্যভাণ্ডার গঠিত। লিপিগুলির মধ্যে সম্রাট প্রথম শাহ্‌পুহ্‌র ও সম্রাট অর্দশীরের শিলালিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবেস্তার সটীক অনুবাদ ও ভাষ্য ('জ়ন্দ্‌-অবেস্তা') ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: Bundahishn (বুন্দাহিশ্‌ন্) ইরানীয় সৃষ্টিতত্ত্বের কথা; Dinkart (দীন্‌কর্ত্) ধর্ম-প্রসঙ্গ; Dabi'stan-i Dinik (দাবিস্তান্-ই দীনিক্), ধর্মীয় আলোচনা; Mainog-i khiradz (মৈনোগ্-ই খিরদ্) ধর্ম-শিক্ষা; Arda-i Viraf Nâmak (অর্দি-ই বীরাফ্ নামক্) রহস্য বিদ্যা ইত্যাদি। এই সমস্ত ধর্মসাহিত্য ছাড়াও, পহ্লৱীতে ইতিহাস, আখ্যান, কথা ও কবিতাও রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়, কিন্তু সেইরূপ রচনার কোনও নিদর্শন রক্ষিত হয় নাই। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ভারতে উপনিবিষ্ট পারসী

সম্প্রদায়ের নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টাতেই পহ্লবী সাহিত্যের নিদর্শন রক্ষা পাইয়াছে।

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

পাইন সরল-গোত্রের (ফ্যামিলি-পিনাসিঈ, Family-Pinaceae) অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তবীজী (জিম্নোস্পার্ম) বৃক্ষ। পাইন গাছগুলির পিনস্-গণের (Genus-Pinus) অন্তর্গত। সাধারণতঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাহিরে উত্তর ভূখণ্ডের সর্বত্র প্রচুর পাইন গাছ দেখা যায়। ভারতবর্ষে পাইন সাধারণতঃ ৪৬০-৩৮০০ মিটার উচ্চতায় দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদবিজ্ঞানী হুকারের মতে, ভারতের নিজস্ব পাইন গাছের মাত্র ৪টি প্রজাতি আছে। ইহাদের অধিকাংশই পশ্চিম হিমালয়ে দৃষ্ট হয়; 'পিনস খাসিয়া' প্রজাতির গাছ খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়েও দেখা যায়।

পাইনের দেহ খুব দীর্ঘ ও ঋজু হয়। প্রধান কাণ্ড হইতে নির্গত দীর্ঘ শাখাগুলি এমনভাবে চারিদিকে সজ্জিত থাকে যে গাছটিকে পিরামিডের ন্যায় দেখায়। প্রধান কাণ্ড হইতে দীর্ঘাকৃতি ও হ্রস্বাকৃতি দুই প্রকার শাখা বাহির হয়। দীর্ঘ শাখাগুলিতে থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্কপত্র (স্কেল লিফ) এবং হ্রস্বাকৃতি শাখায় থাকে দুই বা ততোধিক সূচাকৃতি চিরহরিৎ পাতার মনোরম গুচ্ছ। একই গাছে পুং ও স্ত্রী উভয় প্রকার 'কোন' জন্মায়। পাইনের পরাগরেণুতে দুইটি হালকা ডানার মত অঙ্গ থাকে; এই ডানায় ভর করিয়া বাতাসের সাহায্যে পরাগযোগ (পলিনেশন) সাধিত হয়।

পাইনের কাঠ বেশ হালকা, দীর্ঘস্থায়ী ও শাদা হইতে বাদামী বর্ণের হয়। এই কাঠকে ভালোভাবে 'সিজ্‌ন' করা যায়। ইহাতে সুন্দর পালিশ ধরে। এ সকল কারণে আসবাবপত্র নির্মাণে ইহার বহুল ব্যবহার আছে। কুলু ও কাংড়া উপত্যকায় পাইন কাঠ হইতে চায়ের বাক্সও তৈয়ারি হয়। পাইন গাছ হইতে রজন, তার্পিন এবং পিচ উৎপন্ন হয়।

দ্র C. J. Chamberlain, *Gymnosperms-Structure and Evolution*, New York, 1961.

সন্তোষকুমার পাইন

পাইরোমিটার থার্মোমিটার দ্র

পাওয়াপুরী বিহারের পাটনা জেলার একটি জৈনতীর্থ। ইহা বিহার শরীফ স্টেশন হইতে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ইহার অন্য নাম পাবা বা অপাপপুরী। এইখানে জৈন তীর্থংকর মহাবীর ৪৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নির্বাণ লাভ করেন। এখানকার প্রধান আকর্ষণ দুইটি শ্বেত-পাথরের মন্দির—জলে জলমন্দির, স্থলে থলমন্দির। থল-মন্দিরটি প্রাচীনতর। শ্বেতপাথরের জলমন্দিরে (৯·৬৭ বর্গমিটার) মহাবীর, গৌতমস্বামী ও সুধর্মস্বামীর চরণ-চিহ্ন রক্ষিত আছে। এই স্থানেই মহাবীরের শেষকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই দুই মন্দিরের মাঝখানে সমোসরণ মন্দির। এখানেও মহাবীরের একটি পদচিহ্ন আছে। এইখানে একটি বেদীর উপর বসিয়া মহাবীর ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া বাজারের মধ্যে একটি শ্বেতাম্বর জৈন-মন্দির এবং শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরদের দুইটি ধর্মশালা আছে। দেওয়ালির সময়ে প্রতি বৎসর এখানে জৈনদের ধর্মীয় মহাসম্মেলন হয় এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বহু তীর্থযাত্রী আসেন।

এখানে ১৪শ শতাব্দীর একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, সেকালে জৈনধর্ম এ অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল এবং রাজভক্তি ও শান্তিপ্রিয়তার জন্য জৈনদের প্রতি মুসলমান শাসকরাও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

জৈনকল্পসূত্রে যে পাওয়া-র উল্লেখ আছে তাহা উত্তর প্রদেশে অবস্থিত; বিবিধতীর্থকল্পে সর্বপ্রথম বিহারের অন্তর্গত অপাপপুরীর উল্লেখ দেখা যায়।

দ্র R. R. Diwakar, ed., *Bihar through the Ages*, Calcutta, 1958.

কমলকুমার গুহ
ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

পাকশাস্ত্র প্রাচীন কালে রন্ধননৈপুণ্য উচ্চনীচ স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে একটি মহৎ গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজরাজড়াদের মধ্যেও ইহার বিশেষ সমাদর ছিল। অজ্ঞাতবাসকালে ভীমসেন বিরাট রাজার সভায় এবং নলরাজা ঋতুপর্ণ রাজার সভায় নিজেদের অনান্য গুণের মধ্যে রন্ধনজ্ঞানের উল্লেখ করেন ও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ভীম রন্ধনশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। নল ঋতুপর্ণের সারথ্য ও ভোজনব্যাপারে বৃত হন। ঐতিহাসিক যুগে চক্রপাণি দত্ত পালরাজা নয়পালদেবের রন্ধনশালাধ্যক্ষ ছিলেন, একথা তিনি সগর্বে তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ইহারা সকলেই পাকশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মনে হয়। নলরাজার নামে বিভিন্ন খাদ্য-দ্রব্যের বর্ণনাত্মক পাকশাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

উহার নাম ‘পাকদর্পণ’। প্রসিদ্ধ দার্শনিক মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার ‘প্রস্থানভেদ’ পুস্তকে অর্থশাস্ত্রের প্রকারভেদ হিসাবে সূপকারশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পাকস্থলী পাচনতন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ। ইহা পৌষ্টিক নালীর অংশবিশেষ। চর্বিত খাদ্য গিলিয়া ফেলিলে তাহা অন্ননালী (ইসোফেগাস) দিয়া পাকস্থলীতে আসে। পাকস্থলীতে ক্ষরিত পাচকরসের রাসায়নিক ক্রিয়ায় এবং পাকস্থলীর আলোড়নের ফলে আংশিক পরিপাকের পর এই খাদ্য অন্ত্রে চলিয়া যায়। পাকস্থলীর গাত্রে দেহকলা বা টিস্যুর ৪টি প্রধান স্তর বর্তমান। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভিতরের বিবর-সন্নিহিত স্তরটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী; ইহাতে বহু ভাঁজ দেখা যায় এবং ইহার মধ্যে নানা প্রকার গ্রন্থি-কোষ বর্তমান। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বাহিরে পেশীর তিনটি স্তরে অনৈচ্ছিক পেশীতন্তুগুলি পর্যায়ক্রমে বৃত্তাকারে কোণাকুণি-ভাবে এবং লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত থাকে। বৃত্তাকারে সজ্জিত পেশীতন্তুগুলি পাকস্থলী ও অন্ননালীর এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের সংযোগস্থলে বিশেষ সুগঠিত হইয়া এই দুই স্থানে বন্ধনীর (স্ফিংক্টার) সৃষ্টি করে। প্রথমোক্ত স্থানের বন্ধনীটি একমাত্র বমন ব্যতীত অন্য সময়ে সাধারণতঃ খাদ্যকে পাকস্থলী হইতে অন্ননালীতে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়। পক্ষান্তরে পাকস্থলী ও অন্ত্রের সংযোগস্থানের বন্ধনীটি নিয়মিত সময়ে উন্মুক্ত হইয়া খাদ্যকে পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে যাইতে দেয়। পাকস্থলীগাত্রের পেশীগুলির সংকোচনের ফলে খাদ্য পাচকরসের সহিত মিশ্রিত হয় এবং অন্ত্রের দিকে আগাইয়া চলে।

পাকস্থলীর অন্ননালী-সন্নিহিত অংশের শৈষ্মিক ঝিল্লীর গ্রন্থি-কোষগুলি মুখ্যতঃ শ্লেষ্মা ক্ষরণ করে; মধ্যভাগের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর গ্রন্থি-কোষগুলি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং পেপ্‌সিন নামক একটি এন্‌জাইম ক্ষরণ করে। ইহা ছাড়া পাকস্থলীর গ্রন্থি-কোষ হইতে রিনিন নামক অপর একটি এন্‌জাইমও ক্ষরিত হয়। এ সকল ক্ষরিত রসের মিশ্রণকেই পাকস্থলীর পাচকরস বলে; ইহা বর্ণহীন, অত্যন্ত অম্লধর্মী, ১০০২ হইতে ১০০৪ পর্যন্ত আপেক্ষিক গুরুত্ব-বিশিষ্ট এবং পরিমাণে ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ২-৩ লিটার। ইহাতে বর্তমান পেপ্‌সিন ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে প্রোটিনের অণুর পরিপাকের ফলে পেপ্‌টোন, উৎপন্ন হয়; পক্ষান্তরে রিনিন দুধের প্রোটিন কেসিনকে তঞ্চিত করিয়া দুধকে ছানায় পরিণত করে।

তিনটি পর্যায়ে পাকস্থলীর পাচকরসের ক্ষরণ ঘটিয়া থাকে। প্রথমে খাদ্যগ্রহণের সময়ে আহার্যের স্বাদ, গন্ধ প্রভৃতির ফলে নার্ভের উদ্দীপনা ঘটিয়া কিছুটা পাচকরস ক্ষরিত হয়। ইহার পরে খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে পাকস্থলীগাত্রের সহিত তাহার স্পর্শে এবং পাকস্থলীগাত্র হইতে রক্তে নিঃসৃত হর্মোনের প্রভাবে দ্বিতীয়বার পাচক-রসের ক্ষরণ ঘটে। অবশেষে খাদ্য অন্ত্রে প্রবেশ করিলে অন্ত্র হইতে রক্তে নিঃসৃত হর্মোনের প্রভাবে তৃতীয়বার পাচকরস ক্ষরিত হয়। ‘হর্মোন’ দ্র।

অজিতকুমার চৌধুরী

পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান (২৩° ৩০′ উত্তর হইতে ৩৭° ৩০′ উত্তর ও ৬৪° পূর্ব হইতে ৭৫° পূর্ব) এবং পূর্ব পাকিস্তান (২০° ১০′ উত্তর হইতে ২৬° ২৫′ উত্তর ও ৮৮° ৩′ পূর্ব হইতে ৯২° ২১′ পূর্ব) লইয়া গঠিত রাষ্ট্র। পাকিস্তানের আয়তন ৯৪৬৭২০ বর্গকিলোমিটার (৩৬৫৫২৯ বর্গমাইল)। করাচিসহ পশ্চিম পাকিস্তান ৮০৩৯৪৪ বর্গ-কিলোমিটার (৩১০৪০৩ বর্গমাইল) ও পূর্ব পাকিস্তান ১৪২৭৭৬ বর্গকিলোমিটার (৫৫১২৬ বর্গমাইল)। ইহাদের একটি অপরটি হইতে ১৭৬০ কিলোমিটার (১১০০ মাইল) দূরে অবস্থিত। পশ্চিম পাকিস্তানের পশ্চিমে আফগানিস্তান ও ইরাণ, পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণে আরবসাগর। পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর ও পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, পূর্বে আসাম রাজ্য, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্মদেশ। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণরশাসিত প্রদেশ। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয়সরকার-শাসিত করাচি অঞ্চল ব্যতীত ৪টি প্রদেশ ও ১০টি দেশীয় রাজ্য একত্রিত করিয়া পশ্চিম পাকিস্তান ১০টি কমিশনারের শাসনবিভাগে বিভক্ত হয়। ঐ সময় হইতে পশ্চিম পাকিস্তান এক ‘ইউনিট’ (একক প্রদেশ) হইয়াছে ও তাহার বিভিন্ন প্রদেশগুলির পৃথক সত্তা লুপ্ত হইয়াছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১২টি বিভাগের সৃষ্টি হয়; যথা— ১. পেশোয়ার ২. ডেরা ইসমাইল খাঁ ৩. রাওয়লপিণ্ডি ৪. মুলতান ৫. লাহোর ৬. বাহাওয়ালপুর ৭. খয়েরপুর ৮. হায়দরাবাদ ৯. কোয়েটা ১০. কালাত ১১. সারগোদা খাঁ ১২. করাচি। পূর্ব পাকিস্তান ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী এই তিনটি বিভাগ লইয়া গঠিত। পাকিস্তানের রাজধানী প্রথমে ছিল করাচি, পরে রাওয়লপিণ্ডি, বর্তমানে ইসলামাবাদ।

পাকিস্তান কয়েকটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত।

পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে অরণ্যাবৃত পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চলের উত্তর দিয়া হিন্দুকুশ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আছে। ইহার দক্ষিণ দিকে সফেদকোহ্; পূর্ব দিক দিয়া সুলেমান ও খিরথর পর্বত উত্তর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা প্রায় ১৮৩০ মিটার (৬০০০ ফুট)। খাইবার, বোলান, গোমল প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গিরিপথ। পশ্চিম পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমে পর্বতবেষ্টিত শুষ্ক মালভূমি। সিন্ধু নদের পশ্চিমে হায়দরাবাদ বিভাগের কিয়দংশ, কালাত ও ডেরা ইসমাইল খাঁর কিয়দংশ এই মালভূমির অন্তর্গত। ইহা প্রকৃতপক্ষে ইরান মালভূমির বিস্তার। এইস্থানে হেলমন্দ মরুভূমি অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে লবণ পর্ব্বত অবস্থিত। পাঞ্জাবের দক্ষিণাংশ ও সিন্ধুর দক্ষিণাংশ সিন্ধু নদের পলিমাটির দ্বারা গঠিত সমভূমি অঞ্চল। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব্ব দিকে লুসাই ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল। ইহা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র অংশ পলিমাটির দ্বারা গঠিত।

পশ্চিম পাকিস্তানের উপকূল অল্প ও অভগ্ন। পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল অপেক্ষাকৃত ভগ্ন ও দীর্ঘ। এই উপকূলে হাতিয়া, সন্দীপ, ভোলা, সাহাবাজপুর, কুতুবদিয়া, মহেশখালি প্রভৃতি দ্বীপ অবস্থিত।

সিন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান নদী। এই নদীর মোহানা হইতে আটক পর্যন্ত ১৫০০ কিলোমিটার (৯৪০ মাইল) নাব্য। পূর্ব পাকিস্তানে গঙ্গার পূর্বধারা পদ্মা রাজশাহী ও পাবনা জেলার কিছু দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অন্যান্য নদীর মধ্যে যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, কর্ণফুলি, তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই প্রভৃতি প্রধান।

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে বাড়বাকুণ্ড নামে উষ্ণ প্রস্রবণ বিখ্যাত।

পাকিস্তানের দুই অংশে জলবায়ু দুইপ্রকার। সমুদ্র হইতে দূরে এবং মৌসুমী বায়ুর প্রভাবের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের জলবায়ু মোটামুটি শুষ্ক ও চরমভাবাপন্ন; উত্তরাংশে হিমালয় ও অবহিমালয়ে উচ্চতার জন্য উষ্ণতা কম। শীত ও গ্রীষ্ম দুইই চরম। জাকোবাবাদ শহরে গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ উষ্ণতা প্রায় ৫৩° সেন্টিগ্রেড (১২৭° ফারেনহাইট)। পশ্চিম পাকিস্তানে গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রার গড় প্রায় ৪৩° সেন্টিগ্রেড (১১০° ফারেনহাইট) ও শীতকালীন গড় ০° সেন্টিগ্রেড (৩২° ফারেনহাইট)। বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় প্রায় ৫০০ মিলিমিটার (২০ ইঞ্চি)। পূর্ব পাকিস্তানে মৌসুমী বায়ু ও সমুদ্রের প্রভাবে জলবায়ু সমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা প্রায় ২৮° সেন্টিগ্রেড (৮২° ফারেনহাইট) এবং শীতকালীন গড় ১৭° সেন্টিগ্রেড (৬২° ফারেনহাইট)। বার্ষিক বৃষ্টিপাত কোনও অঞ্চলেই ১৯০০ মিলিমিটারের (৭৫ ইঞ্চি) কম নহে। গ্রীষ্মে ও শরতে ঘূর্ণিবাত দেখা যায়।

পাকিস্তান ভূখণ্ডের ইতিহাস বহু প্রাচীন। খ্রীষ্ট-জন্মের ৩০০০ বৎসর পূর্বে সিন্ধুর তীরে মহেঞ্জো-দড়ো নামক স্থানে এবং মুলতানের হরপ্পায় এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। পর পর হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ অধিকারের পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হইয়াছে। পাকিস্তান নামের অর্থ 'পবিত্র দেশ'। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রহমৎ আলী পাঞ্জাবের p, আফগান (পাঠান)-এর a, কাশ্মীরের k, সিন্ধু প্রদেশের i এবং বেলুচিস্তানের (s) tan, এই-গুলিকে জোড়া দিয়া Pakistan নামটি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

পাকিস্তান ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এই স্বাধীন রাষ্ট্র এখন কমনওয়েলথের সদস্য।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারির আদমশুমার অনুসারে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ৯৩৪৩১৯৮২। ইহার মধ্যে ৫০৪৫৩৭২১ জন পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৪২৯৭৮২৬১ জন পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাস করে। সমগ্র পাকিস্তানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১০০ জন; পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৩৫৬ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫৩ জন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০·৪ ভাগ শহরাঞ্চলে বাস করিত। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৮·১ ভাগ মুসলমান, ১০·৭ ভাগ হিন্দু ও ১·২ ভাগ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

পাকিস্তান কৃষিপ্রধান দেশ। মোট জমির (৬৩০০০০০০ হেক্টর) মধ্যে কৃষিজমি হইল ২৫০০০০০০ হেক্টর; ইহার মধ্যে নীট আবাদী জমির পরিমাণ ২১০০০০০০ হেক্টর। খাদ্য-শস্যের মধ্যে ধান ও গম প্রধান। ধান ৯৯২৯০০০ হেক্টরে এবং গম ৪৩১০০০০ হেক্টরে উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া ৩৪৫২০০০ হেক্টরে জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, রাগি, বার্লি প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। নগদী শস্যের মধ্যে তুলা ও পাট প্রধান। পূর্ববঙ্গে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ পৃথিবীর সমগ্র উৎপন্ন পাটের শতকরা ৫৫ ভাগ। এই পাট অতি উৎকৃষ্ট। চা ও তামাক-উৎপাদনের পরিমাণ কম নহে। পাকিস্তানে আপেল, পীচ, খোবানি,

কমলালেবু প্রভৃতি প্রচুর ফল জন্মায়। বৎসরে প্রায় ৩০৪৮০০০ মেট্রিকটন ফল পাওয়া যায়।

পশ্চিম পাকিস্তানে উত্তম সেচপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে। এখানে বহু খাল আছে। পাঞ্জাবের উচ্চ ও নিম্ন চন্দ্রভাগা খাল চন্দ্রভাগা হইতে জল লইয়া যথাক্রমে চন্দ্রভাগা ও ইরাবতীর মধ্যে দোয়াব অঞ্চল এবং লায়ালপুর অঞ্চল সিঞ্চিত করে এবং উচ্চ ও নিম্ন বিতস্তা খাল বিতস্তা নদী হইতে জল লইয়া যথাক্রমে বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী স্থানে এবং লাহোরের পশ্চিমাংশে জলসেচ করে। উচ্চ বিতস্তা খালের সহিত নিম্ন চন্দ্রভাগা খালের এবং উচ্চ চন্দ্রভাগা খালের সহিত নিম্ন বারি দোয়াব খালের সংযোগসাধন পাঞ্জাবে 'ত্রয়ী পরিকল্পনা' নামে অভিহিত।

ইহা ছাড়া হায়দরাবাদ বিভাগের সুক্কুরের নিকট সিন্ধু নদের তীরে লয়েড ব্যারাজ হইতে খাল দিয়া ১৩০০ বর্গকিলোমিটার জমিতে জল সরবরাহ হয়। শতদ্রু নদীর উপর ৪টি বাঁধ দ্বারা শতদ্রু উপত্যকার বিরাট অঞ্চলের জলসেচব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। সিন্ধু ও দাউদখাল নদীর জলনিয়ন্ত্রণের জন্য জিন্নাহ্ বাঁধ নির্মিত হইয়াছে; ইহার ফলে ২০০০০০০ হেক্টরে জলসেচ হইতেছে।

কালাত বিভাগের শুষ্ক অঞ্চলে খালের জল শুখাইয়া যাইবার আশংকায় পাহাড়ের পাদদেশে সুড়ঙ্গ (ক্যারেজ) কাটিয়া বৃষ্টির জল শস্যক্ষেত্রে লওয়া হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানে গোরু, মহিষ ও ছাগল উল্লেখ্য পশুসম্পদ। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র পাকিস্তানে গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল ৩১০৬০০০০। পাকিস্তান হইতে বৎসরে ৫৫০০০০০ ছাগচর্ম, ৪৫০০০০০ গোচর্ম, ২২০০০০০ ভেড়ার চর্ম, ১০০০০০০ মহিষচর্ম এবং ২২০০০০০ অন্যান্য চর্ম ও পশুলোম (ফার) সংগৃহীত হইয়া থাকে। তিন-চতুর্থাংশ চর্ম বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পাকিস্তানে ১৫২০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলে মোট প্রায় ৩০৪৮০০ মেট্রিক টন মৎস্য ধরা হয়।

পাকিস্তানের শতকরা প্রায় ৪ ভাগ জমি অর্থাৎ ২৪২৮০০০ হেক্টর অরণ্যাবৃত। এই বনভূমি হইতে ৭৬৯৯০০ মেট্রিক টন কাঠ, ১০৪৩৮১৩ মেট্রিক টন জ্বালানি কাঠ ২০৪২৬০০০০ মেট্রিক টন বাঁশ ৩৭৩৪০০০ টন বেত পাওয়া যায়। প্রায় ৩০০ মেট্রিক টন মধু এবং ২৬৪১৬০ মেট্রিক টন অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগৃহীত হয়।

পাকিস্তানের খনিজ সম্পদ নগণ্য বলিলেই চলে; তন্মধ্যে খনিজ তৈল ও খনিজ লবণই প্রধান। খনিজ তৈল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র আটক। লবণ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় লবণ পর্বতের খেওড়া খনিতে। পাকিস্তানে কয়লা খুবই অপ্রচুর। বেলুচিস্তানের খোস্ত ও ম্যাচ নামক স্থানে, পেশোয়ার জেলার মানকিশরীফ ও চট্টগ্রামের নিকট কয়লার খনি পাওয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন অ্যান্টিমনি পাওয়া যায় চিত্রলে; কালাতে ক্রোমাইট, জিপ্সাম ও সাল্ফার পাওয়া যায়; সিন্ধু ও পূর্ব পাকিস্তানের শ্রীহট্টে চুনা পাথর এবং বেলুচিস্তানে তামা পাওয়া যায়।

পাট ও তুলার প্রাচুর্য থাকায় পাকিস্তানে বয়নশিল্প প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। করাচি, লাহোর, লায়ালপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে ২৯টি কাপড়ের কল আছে। নারায়ণগঞ্জে পাটের কল আছে। সিন্ধু প্রদেশ, করাচি, পশ্চিম পাঞ্জাব, বান্নু ও বেলুচিস্তানে রেশম ও পশমশিল্পের কয়েকটি কারখানা আছে। রাওয়লপিণ্ডি, এবটাবাদ, মার্দান, দর্শনা, গোপালপুর, সেতাবগঞ্জ, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও দিনাজপুরে ২২টি চিনির কল আছে। ইহা ছাড়া পাকিস্তানের নানা স্থানে চালকল, চায়ের কারখানা, রসায়নশিল্পের কারখানা, দিয়াশলাইকারখানা, তেলকল, রং ও সাবানের কারখানা, রবারশিল্পের কারখানা, কাগজকল, সিমেন্টের কারখানা, কাচশিল্পের কারখানা, করাতকল, চর্মশিল্পের কারখানা, চটকল, পাট গাঁইট করিবার কারখানা ইত্যাদি আছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরাঞ্চলে প্রায় ৮০টি এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে। ইহা ভিন্ন ঢাকা, করাচি ও লাহোরে অস্ত্র তৈয়ারির কারখানা আছে। করাচিতে বড় জাহাজনির্মাণের ও মেরামতের কারখানা আছে। লাহোর, শিয়ালকোট ও ঢাকায় রেলের এঞ্জিন ইত্যাদি মেরামতের কারখানা আছে।

পাকিস্তানের কুটিরশিল্প বিশ্ববিখ্যাত। ঢাকা, ফেণী, বাগেরহাটের তাঁতের কাপড়, ইসলামপুরের কাঁসা ও পিতলের বাসন, যশোহরের হাড়ের জিনিস, চিরুনি প্রভৃতি বিখ্যাত। রংপুর ও লাহোরের কার্পেট, শিয়ালকোটের খেলনার সাজসরঞ্জাম, ঢাকার শাঁখা, হাতির দাঁতের ও রুপার তারের সূক্ষ্ম কাজ প্রসিদ্ধ।

পাকিস্তানের রপ্তানিদ্রব্যের মধ্যে আছে তুলা, গম, বার্লি, পশুচর্ম, পশম, তৈলবীজ, পাট, চা, মাছ, শাল, কার্পেট ইত্যাদি। চিনি, কাপড়, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রাদি, সাইকেল, মোটরগাড়ি, কয়লা, লৌহ প্রভৃতি পাকিস্তানের আমদানিদ্রব্য। ১৯৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের মোট রপ্তানি ছিল প্রায় ১৮০ কোটি টাকার এবং মোট আমদানি ছিল প্রায় ৪৪২ কোটি টাকার।

পাকিস্তানের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬৫-৭০ খ্রী) সফল হইলে পাকিস্তানের কৃষি, শিল্প, খনিজ-উৎপাদন, যোগাযোগ, পরিবহন ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সম্ভব হইবে।

পাকিস্তানে মোট ১১২০০ কিলোমিটার রেলপথ আছে— পশ্চিম পাকিস্তানে ৮৪৮০ কিলোমিটার এবং পূর্ব পাকিস্তানে ২৭২০ কিলোমিটার। পাকিস্তানে রাস্তার দৈর্ঘ্য ১০২৯৯৮ কিলোমিটার, তন্মধ্যে ভাল রাস্তার দৈর্ঘ্য ১১২০০ কিলোমিটার। ভাল রাস্তার বেশির ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানের পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা নদী দিয়া বহু নৌকা ও স্টিমার যাতায়াত করে। সিরাজগঞ্জ, গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ, ঝালকাটি, বরিশাল, শ্রীহট্ট প্রভৃতি নদী-বন্দর। এখানকার ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজ ও পাক এয়ারওয়েজ সার্ভিসেসের বিমানপোত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে যাতায়াত করে। পাকিস্তান ইণ্টারন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজের বিমান আন্তর্জাতিক বিমানপথে যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন ১৯টি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের বিমানপোতের যাতায়াত আছে। লাহোর, পেশোয়ার, কোয়েটা, মুলতান, হায়দরাবাদ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, যশোহর প্রভৃতি স্থানে বিমানপোতের যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। পাকিস্তানের প্রধান বন্দর করাচি পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু নদের মোহানার প্রায় ১৬০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি কৃত্রিম পোতাশ্রয়; সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান ইহার পশ্চাদভূমি। পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র চট্টগ্রাম বন্দর উল্লেখযোগ্য। এই বন্দর কর্ণফুলি নদীর মোহানা হইতে ১৬ কিলোমিটার অভ্যন্তরে নদীর উপরে অবস্থিত। খুলনা জেলার চালনাতে একটি নূতন বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ও বাংলা। পেশোয়ার বিভাগে পশতো; কালাতে বেলুচ্ ও ব্রাহুই ভাষা; লাহোর, রাওয়লপিণ্ডি ও মুলতান বিভাগে পাঞ্জাবী; হায়দরাবাদ বিভাগে ও খয়েরপুরে সিন্ধি এবং পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানে শিক্ষিতের সংখ্যা ২৩২৫০০০০ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ। পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যার শতকরা ২৮·২ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যার শতকরা ২৩·২ ভাগ শিক্ষিত। পাকিস্তানে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। লাহোরের ইসলামীয় সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চার প্রতিষ্ঠান, করাচির ইক্‌বাল অ্যাকাদেমী ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণাপ্রতিষ্ঠান, ঢাকার বাংলা অ্যাকাদেমী ও এশিয়াটিক সোসাইটি বিখ্যাত। লায়ালপুর ও ময়মনসিংহে একটি করিয়া কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানে বালুচিরা ১২টি প্রধান উপজাতিতে বিভক্ত এবং ইহারা আরববংশোদ্ভূত বলিয়া অনুমান। সিন্ধু নদের নিম্নগতিতে ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে সিন্ধি উপজাতিরা কৃষিজীবী। ইহাদের উত্তরে ব্রাহুই দ্রাবিড়জাতি হইতে উদ্ভূত। মধ্য-পূর্বের রাজপুতরা ও জাঠেরা আর্যবংশোদ্ভূত। ইহারা বহু বৎসর পূর্বেই মুসলমানধর্মাবলম্বী হইয়াছে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে কষ্টসহিষ্ণু, যোদ্ধা ও যাযাবর এবং প্রায়-যাযাবর পাঠান উপজাতির বসবাস। রাজবংশী ও সাঁওতালরা দিনাজপুর, শ্রীহট্ট ও রাজশাহী অঞ্চলে বসবাস করে। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মোরাং, টিপরা, চাক্‌মা, মগ, কুকী, কোমী, লুসাই, খয়াং, বন, দাঙ্কু, তান্‌চা ও রিয়াং প্রভৃতি উপজাতির বসবাস।

পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর দিকের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত রাওয়লপিণ্ডি (৩৩° ২৭′ উত্তর ৭৩° ৬′ পূর্ব) বিখ্যাত শৈলনিবাস। ইহার লোকসংখ্যা ৩৪০১৭৫। নিকটেই তক্ষশিলায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত লাহোরের (৩১° ৩৭′ উত্তর ৭৪° ২৬′ পূর্ব) জনসংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ। ইহা লাহোর বিভাগের সর্বপ্রধান নগর ও শিল্পকেন্দ্র। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে রেচনা দোয়াব অঞ্চলে লায়ালপুর (৩১° ৪৪′ উত্তর ৭৩° ৫′ পূর্ব) কার্পাসব্যবসায়ের কেন্দ্র। পশ্চিম দিকে কাবুল নদীর তীরে অবস্থিত পেশোয়ার (৩৪° ২′ উত্তর ৭৩° ৩৭′ পূর্ব) পেশোয়ার বিভাগের প্রধান নগর। ডেরা ইসমাইল খাঁ (৩১° ৪৯′ উত্তর ৭০° ৫৫′ পূর্ব) ডেরা ইসমাইল খাঁ বিভাগের প্রধান শহর। মালভূমিতে অবস্থিত কোয়েটা (৩০° ১২′ উত্তর ৬৭° পূর্ব) কোয়েটা বিভাগের প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। বিখ্যাত শৈলনিবাস মুরি (৩৩° ৫৫′ উত্তর ৭৩° ২৭′ পূর্ব) লাহোর বিভাগে অবস্থিত। মুলতান বিভাগের প্রধান শহর মুলতান (৩০° ১২′ উত্তর ৭১° ৩১′ পূর্ব) একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সারগোদা (৩২° ২′ উত্তর ৭৪° ২০′ পূর্ব) শহর ও সামরিক বিমান-কেন্দ্র কোয়েটা বিভাগে অবস্থিত। হায়দরাবাদ (২৫° ২৫′ উত্তর ৬৮° ৩৮′ পূর্ব) বাণিজ্যকেন্দ্র ও রেলকেন্দ্র; ইহা হায়দরাবাদ বিভাগের রাজধানী ও সিন্ধুতীরে অবস্থিত। ইহার নিকটে অমরকোট আকবরের সমাধিস্থান। মণ্ট-গোমারী (৩০° ৫৮′ উত্তর ৭৩° ২১′ পূর্ব) মুলতান

বিভাগে প্রসিদ্ধ সৈন্যনিবাস। মুলতান হইতে মণ্টগোমারী যাইবার পথে হরপ্পা প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার চিহ্ন বহন করে। খয়েরপুর (২৭° ২৮´ উত্তর ৬৮° ৪৪´ পূর্ব) খয়েরপুর বিভাগের প্রধান শহর। করাচি পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান নগর ও প্রধান বন্দর। লারকানা স্টেশনের নিকট মহেঞ্জো-দড়ো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের জন্য খ্যাত। করাচি বিভাগে হিংলাজ হিন্দুদের তীর্থস্থান।

ঢাকা (২৩° ৪০´ উত্তর ৯০° ২৬´ পূর্ব) পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ও প্রধান শহর। চট্টগ্রাম (২২° ২১´ উত্তর ৯১° ৫০´ পূর্ব) প্রধান বন্দর। খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্র। 'গৌড়' ও 'পশ্চিমবঙ্গ' দ্র।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Eastern Bengal & Assam*, Calcutta, 1909; H. H. Nomani, *Census of Pakistan 1951*, Vols. I, II, III, IV & VIII, Dacca, 1955; Nafis Ahmed, *Economic Geography of East Pakistan*, London, 1958; Govt. of Pakistan, *Outline of the Third Five Year Plan (1965-70)*, Karachi, 1964.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পাখি পালকাবৃত উষ্ণশোণিতবিশিষ্ট, দ্বিপদ, মেরুদণ্ডী প্রাণী। ইহার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি উড্ডয়ন-অভিযোজনের পরিণাম। সেইজন্য পাখি অন্যান্য প্রাণী হইতে বিশেষ রকমে পৃথক। কিন্তু স্তন্যপায়ী ইত্যাদি প্রাণীর তুলনায় ইহাদের নিজেদের মধ্যে খুব বেশি গঠনগত পার্থক্য হয় নাই। অঙ্গগঠনাদির পরিবর্তনের মধ্যে পালক, ডানা ও দন্তহীনতা প্রধান।

পালক পাখির বহিরাবরণ। আর কোনও প্রাণীর পালক নাই। পাখির দেহে বিভিন্ন প্রকার পালকের সংস্থান ও বর্ণবিন্যাস রূপদান ব্যতীত দেহতাপ রক্ষায়ও সহায়তা করে। ডানা উড়িতে সাহায্য করে। পালক-গঠিত পুচ্ছ পথপরিদর্শক (রাডার) ও গতিনিরোধকের কার্য করে। শাদা, কালো, পিঙ্গল প্রভৃতি একবর্ণ পাখি আছে, নয়নাভিরাম বহুবর্ণবিশিষ্ট পাখিরও অভাব নাই। পালকের বর্ণ অনেক ক্ষেত্রে রঙ্গক (পিগ্‌মেণ্ট) পদার্থের জন্য, অনেক সময়ে আবার গঠনবৈচিত্র্যের জন্য।

পাখির স্বরধ্বনি কখনও কর্কশ কলরব, কখনও অনুনাদী, কখনও বা কর্ণতৃপ্তিদায়ক ও সুমধুর। পাহাড়ী ময়না, ভৃঙ্গরাজ, কাকাতুয়া, টিয়া প্রভৃতি মানুষ ও অন্য প্রাণীর স্বরের অনুকরণে সক্ষম। আবার কয়েক জাতির পাখি মুখ্যতঃ মূক। স্বররজ্জুর (ভোক্যাল কর্ড) অভাবে পাখির স্বরযন্ত্র (লারিংগ্‌স) স্বরহীন; পাখির স্বর আসে ক্লোমনালী (ট্র্যাকিয়া) ও ক্লোমশাখার (ব্রংকাস) সংযোগস্থলে অবস্থিত নিম্নস্বরযন্ত্র বা সিরিংস নামক অঙ্গ হইতে। এই অঙ্গ আর কোনও প্রাণীর নাই।

পাখি উষ্ণ শোণিতের অধিকারী ('দেহতাপ' দ্র)। উচ্চ বিপাক-হার ও উষ্ণ শোণিতের জন্যই পাখি নানা পরিবেশে অতি সক্রিয় জীবনযাপনে সক্ষম।

মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীশ্রেণী অপেক্ষা পাখির সংখ্যা ও প্রজাতি অনেক বেশি। নিজেদের মধ্যে গঠনগত অনেক সাদৃশ্য সত্ত্বেও পাখির বাস্তুসংস্থানে (ইকোলজি) যথেষ্ট বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই—মেরুদেশে, মরুভূমিতে, পর্বতে, সমভূমিতে, অরণ্যে, শহরে, এমন কি মহাসাগরেও ইহার বসবাস।

নানা উদ্ভিদ ও প্রাণীজ পদার্থ পাখির খাদ্য। পাখির আচরণ বহুবিধ। ইহারা উড়িয়া বেড়ায়, দৌড়ায়, সন্তরণ করে, অবগাহন করে। অনেকেই বহু পরিবেশে আত্ম-গোপনে সফলকাম। কেহ বেশি সময় জলে থাকিতে পারে; কেহ উন্মুক্তস্থানচারী, কেহ বা ঊর্ধ্বগগনচারী। কেহ নিঃসঙ্গ, কেহ বা যূথচারী। পালকের গঠন ও বর্ণসম্ভারের সাহায্যে অনেকে আড়ম্বর প্রদর্শন করে। কেহ কেহ সংবৎসর একই স্থানে স্থিতিশীল, কাহারও গতিবিধি সীমিত, কেহ বা ঋতুভেদে দূরদূরান্তরে প্রব্রজনশীল (মাইগ্রেটরি)।

বিভিন্ন পরিবেশে ও আচরণে অভিযোজনের ফলে পাখির গঠনাদিও বিভিন্ন রকমের। উটপাখি, রিয়া প্রভৃতি পাখি উড়িতে অক্ষম। মাংস-ভক্ষণের সুবিধার্থে চিল, শকুনি, পেচক প্রভৃতি পাখির ঊর্ধ্বচঞ্চু বক্র ও তীক্ষ্ণ এবং নিম্নচঞ্চু ধারাল। ছোট শক্ত বীজ ভাঙ্গিবার জন্য বাবুই, ফিঞ্চ প্রভৃতি পাখির চঞ্চু দৃঢ় ও ত্রিকোণাকার। বৃক্ষ ঠুকরাইয়া পতঙ্গ সংগ্রহের জন্য কাঠঠোকরার চঞ্চু বাটালির মত এবং জিহ্বা লম্বা ও আঠালো। কর্দম হইতে কীটপতঙ্গ আহরণার্থে কাদাখোঁচার চঞ্চু দীর্ঘ ও সরু। ফুলের মধু শোষণের জন্য দুর্গা-টুনটুনির সরু চঞ্চু দীর্ঘ ও ঈষৎ বক্র এবং জিহ্বা নলাকার। সন্তরণ-সহায়ক জালপাদ জলচারী পাখির বৈশিষ্ট্য। জীবন্ত শিকার ধরিবার ও আয়ত্তে রাখিবার জন্য বাজ, পেচক প্রভৃতি শিকারী পাখির নখর তীক্ষ্ণ ও বক্র। স্বচ্ছন্দে বৃক্ষে বিচরণ বা অবস্থানের জন্য পদাঙ্গুলীর বিন্যাস ধারণ-সহায়ক। যে পাখি বেশিক্ষণ ঊর্ধ্বে উড়িয়া বেড়ায়

তাহার ডানা প্রশস্ত (চিল, শকুনি) অথবা অপ্রশস্ত ও দীর্ঘ (আল্‌ব্যাট্রস)।

পাখির ঘ্রাণ ও স্বাদবোধ ক্ষীণ; শ্রবণ ও বিশেষতঃ দৃষ্টিশক্তি প্রখর। দেহের তথা মস্তকের অনুপাতে চক্ষু-গোলক বেশ বড়, দৃষ্টিও বিশেষ ধরনের। পেচক প্রভৃতি কয়েকটি পাখি ব্যতীত সকলেরই দৃষ্টি একনেত্রিক (মনোকিউলার) ও দ্বিনেত্রিক (বাইনোকিউলার) অর্থাৎ দুই চক্ষুতে সাধারণতঃ পৃথকভাবে দেখিতে পায়; কিন্তু প্রয়োজনবোধে দুই চক্ষুতে একই বস্তু দেখিবার ক্ষমতাও আছে। অধিকন্তু পাখির চক্ষু একাধারে দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের কার্য করে; গঠনবৈশিষ্ট্যের জন্য প্রায় সকলেই বেশ দূরের বস্তু দেখিতে পায়, আবার প্রয়োজনে খুব নিকটের ক্ষুদ্র বস্তুর বর্ধিত প্রতিরূপ দেখিতে সক্ষম।

ভূমির সুড়ঙ্গ হইতে অত্যুচ্চ বৃক্ষচূড়া পর্যন্ত সকল পরিবেশেই পাখি প্রজনন করে। ইহাদের প্রায় সকলেই ডিম ও শাবকের নিরাপত্তার জন্য নীড় রচনা করে। পাখি মুখ্যতঃ নিজ দেহতাপে ডিম ফোটায়। নীড় রচনা, ডিমে তা দেওয়া ও শাবক প্রতিপালন কোনও কোনও পাখির কেবল স্ত্রী, কখনও স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে, কখনও বা কেবল পুরুষই করে। পাপিয়া, বৌ-কথা-কও, কোকিল প্রভৃতি পাখি নীড় রচনা না করিয়া কাক বা অন্যান্য পাখির নীড়ে ডিম পাড়িয়া থাকে; ইহাদের শাবক অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত হয় বলিয়া ইহাদের পরভৃত বলে।

বৈচিত্র্যময় বৃত্তি ও বাস্তুসংস্থানের অভিযোজনে পাখির অনেক রকমভেদ হইয়াছে। বর্তমানে জীবিত পাখিদের ২৭টি বর্গে (অর্ডার) ও ১৫৪টি গোত্রে (ফ্যামিলি) ভাগ করা হয়। পৃথিবীতে জীবিত পাখির প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৮৬০০; ভারত ও পাকিস্তান উপমহাদেশে প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১২০০ এবং প্রজাতি ও উপজাতির মিলিত সংখ্যা কমবেশি ২১০০।

প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বে মানুষ বনমুরগিকে ও পরে পায়রা, হাঁস প্রভৃতিকে গৃহপালিত করিয়াছে। সকল-প্রকার গৃহপালিত পাখিই বন্য পাখির বংশোদ্ভূত। বর্তমানে ডিম ও মাংসের জন্য পক্ষীপালন করা হয়। শস্যধ্বংসকারী পতঙ্গ ও ইঁদুর খাইয়া বহু পাখি শস্যোৎ-পাদনের সহায়ক; অনেক পাখি মৃত পশু ও আবর্জনা ভক্ষণ করিয়া জনস্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক; পুষ্পমধুপানকারী বা পতঙ্গভুক পাখি পরাগযোগ এবং ফলাহারী পাখি বীজবিস্তার করে; সামুদ্রিক পাখির 'গুয়ানো' নামে পুরীষ জমির উৎকৃষ্ট সার। অন্যদিকে পানকৌড়ি, গগনবেড় প্রভৃতি পাখি মৎস্য ধ্বংস করে; কয়েক প্রজাতির বাজ গৃহপালিত পাখি শিকার করে; টিয়া প্রভৃতি শস্য নষ্ট করে, কয়েকটি পাখির এঁটেলি ও উকুন একস্থান হইতে অন্যস্থানে রোগজীবাণু ছড়ায়।

আনুমানিক ১৫ কোটি বৎসর পূর্বে সরীসৃপ হইতে পাখির উৎপত্তি। আবিষ্কৃত জীবাশ্মীভূত পাখির মধ্যে জার্মানীতে প্রাপ্ত আর্কেওপ্‌টেরিক্‌স্ লিথোগ্রাফিকা (*Archeopteryx lithographica*) সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহা প্রায় ১৩ কোটি বৎসর পূর্বে জুরাসিক যুগে জীবাশ্মীভূত হইয়াছিল। সরীসৃপশ্রেণীর সহিত পক্ষি-শ্রেণীর গঠনগত বহু মিল আছে; সরীসৃপ-পাখি আর্কিও-প্‌টেরিক্‌স্‌কে সেই মিলন-সূত্রের আদিম-পাখি বলিয়া অভিহিত করা হয়। ক্রিটেসিয়াস যুগের হেস্‌পের্‌ওর্নিস (Hesperornis) ও ইক্‌থিওর্নিস (Ichthyornis) পাখির জীবাশ্মও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এসকল আদি-পাখির চঞ্চু দন্তশোভিত ছিল। ইহাদের প্রত্যক্ষ বংশ লুপ্ত। আধুনিক পাখির পূর্বপুরুষদের উৎপত্তি হয় আনু-মানিক ৩৬০-৬৩০ লক্ষ বৎসর পূর্বে। ১৩০-৩৬০ লক্ষ বৎসর পূর্বে ওলিগোসিন ও মাইওসিন যুগেই শ্রেণী হিসাবে পাখি বেশ স্থিতিলাভ করিয়াছিল।

বিশ্বময় বিশ্বাস

পাখোয়াজ কাষ্ঠনির্মিত চর্মবাদ্য। আকৃতিতে বৃহৎ হরীতকীর ন্যায়; মধ্যস্থল ফাঁপা, দুইটি মুখ চর্মদ্বারা আবৃত। ইহার চারিদিকে চামড়ার পাত টানা থাকে এবং বাদ্যপৃষ্ঠ ও টানার মধ্যবর্তী কয়েকটি কাঠের গুটিদ্বারা স্বর উঠানো-নামানো হয়। ইহার আওয়াজ গম্ভীর এবং ধ্রুপদ-ধামারের সহিত সঙ্গতের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। মোগল যুগে ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের সংগীতাধ্যায়ে এবং ফকীরুল্লাহ-রচিত 'রাগদর্পণ' নামক ফার্সী গ্রন্থে এই যন্ত্রের বর্ণনা আছে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩ খ্রী) সাংবাদিক ও গ্রন্থকার। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার জন্ম। পিতা হালিশহরনিবাসী বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় যখন চাকুরিসূত্রে ভাগলপুরে ছিলেন, সেই সময়ে পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান পাঁচকড়ির জন্ম হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুর জেলা স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায়, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে

পাটনা কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় এবং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত অনার্সসহ দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি হিন্দী, উর্দু, ফারসী, ইংরেজী প্রভৃতি বহুভাষাবিদ্ ছিলেন।

ইনি সরকারি চাকুরি, অধ্যাপনা এবং পরে সংবাদ-পত্রসেবা করেন। একাধারে ব্যঙ্গরচনায় ও গাম্ভীর্যপূর্ণ রচনায় তাঁহার দক্ষতা ছিল। তাঁহার রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ : 'আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী' (১৯০০ খ্রী), 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (১৯০০ খ্রী), 'উমা' (১৯০১ খ্রী), 'রূপলহরী বা রূপের কথা' (১৯০২ খ্রী), 'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস', ১ম খণ্ড (১৯০৯ খ্রী), 'বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়', ১ম খণ্ড (১৯১৫ খ্রী), 'সাধের বউ' (উপন্যাস, ১৯১৯ খ্রী), 'দরিয়া' (উপন্যাস, ১৯২০ খ্রী), 'ভিক্টোরিয়া চরিত', 'সম্রাট ঔরঙ্গজেব'। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই পত্রপত্রিকায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাহার কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 'পাঁচকড়ি রচনাবলী' ২খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পাদক হিসাবে ও নানাভাবে তিনি নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলির সহিত যুক্ত ছিলেন : 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'বসুমতী', দৈনিক 'নায়ক', 'রঙ্গালয়', 'সাহিত্য', 'বাঙ্গালী', 'স্বরাজ', 'সন্ধ্যা', সাপ্তাহিক 'প্রবাহিনী', দৈনিক 'চন্দ্রিকা', 'নারায়ণ', 'বিজয়া', 'বেদব্যাস', 'ধর্ম-প্রচারক', 'জন্মভূমি', 'অনুসন্ধান', 'বঙ্গবাণী', 'ধ্রুব', 'কলিকাতা সমাচার' (হিন্দী), হিন্দী দৈনিক 'ভারত মিত্র' প্রভৃতি। শশধর তর্কচূড়ামণিকে হিন্দুধর্ম-প্রচারে সহায়তা করিয়া তিনি বক্তারূপেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুধাংশুশেখর চক্রবর্তী
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

পাচনতন্ত্র খাদ্যবস্তুর বৃহৎ অণুগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেহে আত্তীকরণের (অ্যাসিমিলেশন) উপযোগী ক্ষুদ্রতর অণুতে পরিণত করার নামই পরিপাক। খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও কার্বোহাইড্রেটজাতীয় উপাদান যে অবস্থায় থাকে সে অবস্থায় তাহারা দেহে আত্তীকরণের উপযোগী নহে। এজন্য দেহের কোনও কোনও অঙ্গ ও গ্রন্থি এ সকল খাদ্যবস্তুকে আত্তীকরণের উপযোগী করিবার কার্যে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে; ইহাদের লইয়াই পাচন-তন্ত্র গঠিত। মুখবিবর, গ্রাসনালী, পাকস্থলী, অন্ত্র ও মলনালী লইয়া গঠিত একটি পৌষ্টিক নালী এবং লালা-গ্রন্থী, অগ্ন্যাশয়, যকৃত প্রভৃতি পাচনগ্রন্থি—এগুলিই পাচনতন্ত্রের প্রধান অংশ। শেষোক্ত গ্রন্থিগুলি ব্যতীত পৌষ্টিক নালীর গাত্রেও বিভিন্ন পাচনরস-স্রাবী গ্রন্থি বর্তমান। এ সকল গ্রন্থির ক্ষরিত রস বিশেষ বিশেষ খাদ্যের জটিল অণুকে ভাঙ্গিয়া দেহের গ্রহণযোগ্য সরলতর অণুতে পরিণত করে।

খাদ্য মুখে প্রবেশ করিবার পর পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন কক্ষ অতিক্রম করিয়া যায়। ঐ সকল কক্ষে পাচনগ্রন্থিগুলির রসপ্রভাবে উপযুক্ত মাত্রায় পরিপাকের পর সেই খাদ্য দেহে গৃহীত হয়। খাদ্যের দুষ্পাচ্য অংশ মলনালী দিয়া মলের আকারে বর্জিত হয়। 'অন্ত্র', 'অগ্ন্যাশয়', 'পাকস্থলী', 'পিত্ত', 'পিত্তস্থলী', 'যকৃত' ও 'লালা' দ্র।

অজিতকুমার চৌধুরী

পাঁচমঢ়ী (২২° ২৮′ উত্তর এবং ৭৮° ২৬′ পূর্ব) মধ্য-প্রদেশ রাজ্যের হোসঙ্গাবাদ জেলার সোহাগপুর তহশিলে সাতপুরা মালভূমির মহাদেব পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত শৈলাবাস। পিপারিয়া রেলস্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব ৫১ কিলোমিটার। ইহা মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। পাঁচমঢ়ীর গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ৩০° সেন্টিগ্রেড ও শীতকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ২১° সেন্টিগ্রেড; বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৯২৫ মিলিমিটার। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচমঢ়ী পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়। ইহার লোকসংখ্যা ৬১৪২ (১৯৬১ খ্রী)।

বহুবর্ষ পূর্বে এই অঞ্চলটি সমুদ্রগর্ভে ছিল। প্রাচীন নর্মদাখণ্ডে পাঁচমঢ়ীর অবস্থান। পাঁচমঢ়ী নামটি পঞ্চমঠি নামক পাঁচটি গুহার নামানুসারে হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্গণের মতে এই গুহাগুলি বৌদ্ধবিহার। শহরটি ১০৬৬ মিটার উচ্চ সমতল মালভূমির উপর অবস্থিত, এবং চতুর্দিকে পর্বতমালার দ্বারা বেষ্টিত।

১৩৫০ মিটার উচ্চ ধূপগড় সাতপুরা পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এখানে যাইবার পথ এবং এই স্থানে একটি সুন্দর বিশ্রামগৃহও নির্মিত হইয়াছে। পাঁচমঢ়ীর মধ্যস্থলে অবস্থিত হাণ্ডিখোর খাদের ভিতর একটি নদী প্রবাহিত হইয়াছে। শহরের মন্দিরগুলির মধ্যে মহাদেও মন্দির প্রধান। ছোট মহাদেও মন্দির-এর জটাশংকর মন্দিরও বিখ্যাত।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XIX, Oxford, 1908.

উমা ঘোষ

পাঁচালী[১] পাঁচালী শব্দটি পঞ্চাল (পাঞ্চাল) শব্দের সহিত সম্পর্কিত। ইহার ব্যুৎপত্তি পঞ্চালিকা হইতে. পঞ্চালিকা> পঞ্চালিআ>পাঞ্চালী>পাঁচালী। পাঞ্চালী পাঞ্চালদেশীয় কবিগণের রীতি এই অর্থে-ও সিদ্ধ। পাঁচালী শব্দটির উদ্ভব ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অন্যবিধ বহু আলোচনাও হইয়াছে: যথা ১. পাঁচমিশালী অর্থে [পাঁচ (<পঞ্চ)+আলি] ২. বারোয়ারী বা পঞ্চায়েত অর্থে [পাঁচ+অলি (মাতব্বর)] ৩. পদচারণা অর্থে [পা+চালি] ৪. গান, বাজনা, ছড়া কাটা, গানের লড়াই ও নাচ এই পাঁচ অঙ্গ থাকার দরুণ ৫. এক ধরণের গীতিপদ্ধতি; রীতিবিশেষ সুরের নাম ['পাঁচালীর ছন্দে', 'পাঁচালী প্রবন্ধে', 'পাঁচালীর গাথা' ইত্যাদি]। সব ব্যাখ্যাই যুক্তিসহ নহে। কোনও কোনওটি নিছক শাব্দিক ও অর্বাচীন এবং পাঁচালীর ধারাবাহিক পরিণতির ইতিবৃত্ত ইহাতে পাওয়া যায় না। বলবত্তর অনুমান এই যে, পূর্বে মুখ্যতঃ কাহিনীমূলক গানের সহিত পুতুল (পঞ্চালিকা)-নাচ দেখাইবার প্রথা ছিল বলিয়া এই গীতকে পঞ্চালী বলা হইত। (যমপটাদি দেখাইয়া গীতিপদ্ধতির মধ্যে এখনও এইরূপ গীতের রেশ পাওয়া যায়)। পরে দেবমন্দিরে গাহনা চালু হওয়ায় পঞ্চালিকাপ্রদর্শন প্রথাটি লুপ্ত হয় এবং পুত্তলিকা হয়ত পূজার ঘটে সিন্দুর-চিত্রিত পুত্তলের মধ্যে আত্মগোপন করে। কিন্তু পাঞ্চালী নামটি থাকিয়া যায়। মূল গায়ন স্বয়ং তখন পায়ে নূপুর, বাম হস্তে চামর ও দক্ষিণ হস্তে মন্দিরা লইয়া নাচিতে আরম্ভ করেন। এই আখ্যায়িকা বা কাহিনীপ্রধান সংগীতধারাটি পাঁচালী নামে প্রসিদ্ধ হয়।

দ্র হরিপদ চক্রবর্তী, দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী, কলিকাতা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ; সুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৬; কুমুদবন্ধু সেন, গিরিশচন্দ্র, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, কলিকাতা, ১৯৬৩; D. C. Sen, *History of Bengali Language and Literature*, Calcutta, 1954; S. K. De, *Bengali Literature in the 19th Century*, Calcutta, 1962.

হরিপদ চক্রবর্তী

পূর্বে মঙ্গলকাব্যই পাঁচালী বা পাঁচালীপ্রবন্ধ বলিয়া অভিহিত হইত। অতঃপর দীর্ঘ কাহিনীমূলক কাব্যই পাঁচালী নামে পরিচিত হইয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষে পাঁচালী শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হইল। এই সময়ে এক মিশ্র সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল; ইহাতে আখ্যান রহিল, কবিগানের ছড়াকাটান রহিল, অঙ্গভঙ্গী ও অভিনয়ও যুক্ত হইল। পাঁচালীতে পৌরাণিক, লৌকিক অথবা সমসাময়িক যে কোনও বিষয় উপজীব্য হইতে পারিত। ইহাতে গায়েন থাকিত একজন। সে নাটকীয় ভঙ্গিতে আবৃত্তি, ছড়া ও গীত দ্বারা মূল কাহিনী বিবৃত করিত। গানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গায়ক থাকিত। পাঁচালীর পালাতেও ঢোল, কাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল। নূতন পদ্ধতির পাঁচালীতে ছড়া প্রধান স্থান লইল। পাঁচালীর শ্রেষ্ঠ কবি দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৬ খ্রী) প্রথমে কবিওয়ালাই ছিলেন। দাশরথির পূর্বে পাঁচালীর নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায় না। কিংবদন্তি এই যে, গঙ্গানারায়ণ (অথবা গঙ্গারাম) নস্কর এই নূতন ধরণের পাঁচালীর প্রবর্তক।

দাশরথি রায়ের পাঁচালী সাধারণের মধ্যে লোকশিক্ষা, সাহিত্যবোধ, ধর্মবোধ এবং সমাজচেতনা জাগাইয়া দিয়াছে।

দাশরথির পরে পাঁচালীর পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল। মনোমোহন বসু 'গীতাবলী'তে (১৮৮৭খ্রী) পাঁচালীর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা পূর্বতন পাঁচালী হইতে পৃথক। এ পাঁচালী কবি-গানের রূপ ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে; ইহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। দাশরথির পরে পাঁচালীকাররূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ঠাকুরদাস দত্ত (১৮০১-৭৬ খ্রী) রসিক রায় (১৮২০-৯২ খ্রী), ব্রজমোহন রায় (১৮৩১-৭৬ খ্রী) প্রভৃতি।

ভবতোষ দত্ত

পাঁচালী[২] পঞ্চালী বা পঞ্চালিকা, যাহা বর্তমানে পাঁচালী আখ্যায় প্রচলিত, তাহা একপ্রকার প্রবন্ধগীতের অন্তর্ভুক্ত। নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাস তাঁহার 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে ইহাকে একপ্রকার ক্ষুদ্রগীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার 'সংগীত সারসংগ্রহ' নামক সংস্কৃত সংকলনগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, পাঁচালী অতি-বিস্তীর্ণ পদযুক্ত গীত ছিল এবং তাহা ধ্রুবযোগে বা ধ্রুব-রহিতভাবে গাওয়া হইত। সাধারণতঃ বৃহৎ পদযুক্ত মঙ্গলকাব্য, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের পঠনে অথবা কথকতা, ছড়া ইত্যাদিতে যে একটি বিশেষ সুর এবং ভঙ্গীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে পাঁচালীগায়ন বলা হয়। ১৮শ শতাব্দীতে ও ১৯শ শতকের প্রথম দিকে পাঁচালী-গায়ক পায়ে নূপুর পরিত এবং হাতে চামর দোলাইত বা মন্দিরা বাজাইত। পরবর্তী কালে ইহাতে টপ্পা এবং বিভিন্ন ধরনের গানের

প্রবেশ ঘটে। দাশরথি রায়ের পাঁচালী এইরূপ গানের জন্য বিখ্যাত।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

পাঞ্চেন লামা, পনছেন লামা ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভের অবতার। ইনি দালই লামার আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা এবং পরাক্রমশালী পীত দল (ইয়োলো সেক্ট)-এ তাঁহার স্থান দালই লামার পরেই। পাঞ্চেন লামার প্রথম সূত্রপাত প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং বর্তমান পাঞ্চেন লামা (জন্ম ১৯৩৮ খ্রী) তাঁহারই সপ্তম উত্তরাধিকারী। তাঁহার নাম ছো-কি-গ্যাল্‌ছেন (ছোস-কি-র্‌গ্যাল-ম্‌তছ্‌ন); ইহার অর্থ ধর্মধ্বজ। দালই লামার অপেক্ষা তিনি চীনাদের সহিত অধিক সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

পাঞ্চেন শব্দটি সংস্কৃত ভাষার 'পণ্ডিত' এবং তিব্বতীয় ভাষার 'চেন্‌পো' (মহৎ)-এর সংমিশ্রণ; ইহার অর্থ মহাপণ্ডিত।

শিগাৎসে-র নিকটবর্তী তাশি ল্‌হুম্‌পো মঠে থাকিতেন বলিয়া পাঞ্চেন লামার অপর নাম তাশিলামা। হিমালয় অঞ্চলে, বিশেষতঃ নেপাল, ভুটান ও সিকিমে তাশিলামা নাম প্রচলিত। মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও চীনে পাঞ্চেন এর্‌তেনি নামই প্রচলিত; 'এর্‌তেনি' সংস্কৃত 'রত্ন' শব্দের মঙ্গোল পরিভাষা।

নির্মলচন্দ্র সিংহ

পাঞ্জাব (২৯° ৩০´ হইতে ৩২° ৩৬´ উত্তর ও ৭৩° ৫০´ হইতে ৭৬° ৫৬´ পূর্ব) ভারতের একটি রাজ্য।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবিভাগের ফলে পাকিস্তানের সহিত পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ এবং পূর্ব অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'পেপসু' রাজ্য পাঞ্জাবের অঙ্গীভূত হয়। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবীভাষী ও হিন্দীভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার হিসাবে ইহা যথাক্রমে পাঞ্জাবীসুবা ও হরিয়ানা এই দুইটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে। বর্তমান পাঞ্জাবে অমৃতসর, কপূরথালা, জলন্ধর, ফিরোজপুর, ভাতিণ্ডা, পাতিয়ালা, লুধিয়ানা, সাংগ্রুর, রূপার, হোসিয়ারপুর ও গুরুদাসপুর এই ১১টি জেলা আছে। বর্তমানে এই রাজ্যের আয়তন ৫৫৯৪৪ বর্গ কিলোমিটার। রাজ্যের রাজধানী চণ্ডীগড়। রাজ্যটির উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীর, পূর্বে হিমাচলপ্রদেশ, দক্ষিণে হরিয়ানা ও রাজস্থান, এবং পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান।

প্রাকৃতিক গঠন হিসাবে পাঞ্জাবকে কয়েকটি প্রধান-ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তরে শিবালিক পর্বতের পাদদেশীয় পার্বত্য অঞ্চল। ইহার উচ্চতা ১৮০০ মিটারের অধিক। ইহার দক্ষিণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে সমাকীর্ণ অঞ্চল। ইহার উচ্চতা ৯০০-১৮০০ মিটারের মধ্যে। এই অঞ্চলের দক্ষিণে পলিগঠিত সমতল ভূমি। পাঞ্জাবের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বালিয়াড়ীতে পূর্ণ। বিপাশা ও শতদ্রু নদী এই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত। ইরাবতী এবং চন্দ্রভাগার কিছু অংশ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

পাঞ্জাবের সমভূমি সিন্ধু-গঙ্গার পলিদ্বারা গঠিত। উত্তর-পূর্বে শ্লেট, চুনা পাথর ও কোয়ার্টজাইট শিলা দেখা যায়। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল টার্শিয়ারি যুগের শিলার দ্বারা গঠিত।

এই রাজ্যের জলবায়ু গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ু ও শীতকালীন ঘূর্ণিবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত। গ্রীষ্মকালে গড় উত্তাপ ৩৫°-৪০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে। শীতকালে ১০°-১৫° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়। জুন মাসে পাঞ্জাব অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় ও নিম্ন বায়ুচাপের সৃষ্টি হয়। জুলাই হইতে মৌসুমী বায়ুর দ্বারা বৃষ্টিপাত হয়। জুলাই-সেপ্টেম্বরে বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ৬০-৮৫ সেন্টিমিটারের মধ্যে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উত্তর-পূর্ব দিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ কমিয়া যায়। রাজস্থান-সীমান্তে বৃষ্টির পরিমাণ মাত্র ২৫ সেন্টিমিটার। ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই অঞ্চলে ঘূর্ণিবায়ুর প্রাবল্য দেখা যায়। শীতকালীন বৃষ্টিপাত ১০-১২ সেন্টিমিটার। শীতকালে কখনও কখনও হিমালয় হইতে শীতল বাতাস আসায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হইয়া থাকে।

বর্তমানের পাঞ্জাব রাজ্য প্রাচীন পাঞ্জাব বা পঞ্চনদ দেশের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন কালে এই অঞ্চল বৈদিক আর্যগণের লীলাক্ষেত্র ছিল।

ভারতবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত, বিশেষতঃ মুসলমান-রাজত্বকালে, ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে ইহা ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। স্বাধীন শিখরাজা রনজিৎ সিংহ পাঞ্জাবেই তাঁহার রাজত্ব স্থাপনা করেন।

পাঞ্জাবের জলসেচ-ব্যবস্থা বিখ্যাত। স্বাধীনতার সময়ে ইহা দ্বিখণ্ডিত হইলে ইহার সুপ্রসিদ্ধ খালগুলির অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাঞ্জাবের দক্ষিণ অংশ সিরহিন্দ খাল ও উত্তর-পূর্ব অংশ বারি দোয়াব খালদ্বারা সিঞ্চিত হয়। ভাকরা খাল পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পূর্ব অংশকে সিঞ্চিত করে। এখানকার বারি দোয়াব ও জলন্ধর দোয়াবের সেচব্যবস্থা উৎকৃষ্ট। এই রাজ্যের

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে শতদ্রু নদীর উপর নাঙ্গাল বাঁধটি অবস্থিত।

পাঞ্জাব কৃষিকার্যে অত্যন্ত উন্নত। সমস্ত জমির প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়। রবিশস্যের মধ্যে গম, ছোলা ও বার্লি প্রধান। গম-উৎপাদনে পাঞ্জাব ভারতের মধ্যে দ্বিতীয়। খরিফ শস্যের মধ্যে ভুট্টা ও জোয়ার প্রধান। হোসিয়ারপুর ও কপূরথালা জেলায় বাজরা ও কিছু ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। জোয়ার প্রায় সর্বত্র হয়। অন্যান্য ফসলের মধ্যে ডাল, তৈলবীজ, ইক্ষু ও তুলা উল্লেখযোগ্য। জলন্ধর, হোসিয়ারপুর ও অমৃতসর ইক্ষুর জন্য প্রসিদ্ধ। পার্বত্য অঞ্চলের অনেক-স্থানে পপি ও তামাকের চাষ হইয়া থাকে। আলু ও নানাবিধ সবজি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

পাঞ্জাব খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধিশালী নয়। ইহার উল্লেখযোগ্য খনিজ পদার্থের মধ্যে চুন, কংকর, মার্বেল ও শ্লেট প্রধান; কিছু লৌহও পাওয়া যায়। বেশির ভাগ খনিজ পদার্থ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পাওয়া যায়। অধিকাংশ কুটিরশিল্প কৃষিজাত দ্রব্য-অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প ও পশমশিল্প প্রধান। অমৃতসর, লুধিয়ানা ও ধারিওয়াল বহু দিন হইতেই শাল, কার্পেট প্রভৃতি নানাবিধ পশমশিল্পের জন্য বিখ্যাত। ফাগওয়াড়া, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানের বৃহৎ বস্ত্রশিল্প এবং অমৃতসর, লুধিয়ানা, জলন্ধর প্রভৃতি স্থানের তাঁত-শিল্প উল্লেখযোগ্য। লুধিয়ানা ও অমৃতসর, হোসিয়ারি শিল্পের কেন্দ্র। লুধিয়ানা, কপূরথালা, অমৃতসর, ফিরোজপুর প্রভৃতি স্থানে সাইকেলের এবং অমৃতসর, লুধিয়ানা ও জলন্ধরে সেলাইকলের কারখানা প্রধান। জলন্ধর ও বাটালে নানাবিধ ক্রীড়ার উপকরণ তৈয়ারি হয়। ভোগপুর, ফাগওয়াড়া প্রভৃতি স্থানে চিনিকল আছে।

ভাকরা-নাঙ্গালপ্রকল্প পাঞ্জাবের একমাত্র বহুমুখী পরিকল্পনা। এই প্রকল্পের লক্ষ্য, ২৩০০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন।

পাঞ্জাবের যাতায়াত-ব্যবস্থা উন্নত। গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়া ইহাকে উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিয়াছে। ১নং জাতীয় সড়ক (৪০০ কিলোমিটার) দিল্লী হইতে অমৃতসর হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানের সীমা পর্যন্ত গিয়াছে। উত্তর রেল-পথ ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। অমৃতসরে একটি বিমান-বন্দর আছে। পাঞ্জাবের লোকসংখ্যা ১১৪০০০০০। লোকবসতির ঘনত্ব ১ বর্গকিলোমিটারে প্রায় ২২১ জন। শিবালিক পর্বতের পাদদেশে রাজপুত আদিবাসীর মধ্যে কানেত, ঘিরত প্রভৃতিরা চাষবাস করে। গুজর ও গেড্ডিসরা যাযাবর; পশুচারণ উহাদের প্রধান বৃত্তি।

পাঞ্জাবে শিক্ষিতের সংখ্যা হাজারে প্রায় ২৫০ জন (১৯৬১ খ্রী)। প্রধান ভাষা পাঞ্জাবী। পাতিয়ালায় ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই রাজ্যের নানা উৎসবের মধ্যে শিবরাত্রি ও দশেরা উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাবীদের গ্রাম্য নৃত্য, শীতকালে আগুন জ্বালাইয়া নৃত্য ও বৈশাখী উৎসবে বনজার নৃত্য খুব মনোরম।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XX, Oxford, 1908; National Council of Applied Economics and Research, *Techno-Economic Survey of Punjab*, New Delhi, 1962.

শম্ভুদয়াল কৌশিক

পাঞ্জাবী ভাষা পূর্ব পাঞ্জাবের ভাষাকে পাঞ্জাবী আর পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাষাকে লইঁদা বলা হয়। পাঞ্জাবীদের তৃতীয় উপভাষা ডোগরী জম্মু-কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে এবং কাংড়ার আশে-পাশে ব্যবহৃত হয়। সাহিত্যে মধ্যযুগে 'লইঁদা'র মুলতানীরূপ আর আধুনিক যুগে অমৃতসর এবং তাহার আশে-পাশে প্রচলিত পূর্ব পাঞ্জাবের 'মাঝি'রূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মিশনারিরা লুধিয়ানা-পাতিয়ালার 'মালবাই' ভাষাকে 'আদর্শ' (standard) হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলে 'মালবাই' ভাষার প্রভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু আদর্শ সাহিত্যিক ভাষার রূপের মধ্যে 'মাঝি'ই সর্বমান্য হইয়া আছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাষার মধ্যে 'মুলতানী', 'ডেরাওয়ালী' আর 'পোঠোহারী' এবং পূর্ব পাঞ্জাবের ভাষার মধ্যে 'পাহাড়ী', 'মাঝি', 'দুআবী', 'মালবাই' ও 'রাঠী' প্রসিদ্ধ।

১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে কবি হাফিজ বরখরদার প্রথম তাঁহার রচনায় পাঞ্জাবী শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে ফারসী এবং ইংরেজী শব্দা-বলীর প্রয়োগকে গ্রহণ করা হইয়াছিল। এখন হিন্দীতে প্রযুক্ত সংস্কৃত শব্দাবলী আসিতেছে।

পাঞ্জাবীতে 'নে', 'নু', 'থোঁ', 'ইয়া', 'ওঁ', 'দা', 'দে', 'দী', 'বিচ্' প্রভৃতি কারকচিহ্ন ব্যবহার করা হয়। পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে বহুবচনে 'আঁ' হয়; যেমন বাতাঁ, কুড়িয়াঁ ইত্যাদি।

ধ্বনিবিকাশের দৃষ্টিতে পাঞ্জাবী এখন পর্যন্ত নিজের প্রাকৃত অবস্থা হইতে খুব উন্নত হয় নাই। পূর্ব পাঞ্জাবে সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি (ঘ, ঝ, ঢ়, ধ, ভ) অঘোষ

আরোহী স্বর করিয়া বলা হয়। পাঞ্জাবী ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি।

রামঅধার সিংহ

পাঞ্জাবী সাহিত্য আদি ও মধ্যযুগ: পাঞ্জাবী ভাষায় লিখিত সাহিত্য। লিপি 'গুরমুখী'; তবে ফার্সী ও নাগরী লিপিতেও পাঞ্জাবী ভাষায় কিছু কিছু লেখা রচিত হইয়াছে। পাঞ্জাবী ভারতের প্রায় দেড় কোটি লোকের মাতৃভাষা। পাঞ্জাবী সাহিত্যকে মোটামুটি তিন যুগে বিভক্ত করা যায়: ১. আদিযুগ (১৫০০-১৬০০ খ্রী) ২. মধ্যযুগ (১৬০০-১৮৫০ খ্রী) ৩. আধুনিক যুগ (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে)।

গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রী) কর্তৃক রচিত এবং 'আদি গ্রন্থ' অথবা 'গ্রন্থসাহেব'-এ সংকলিত স্তবগুলি পাঞ্জাবী সাহিত্যের প্রথম রচনা বলিয়া বিবেচিত হয়। নানকের ও অন্যান্য শিখগুরুদের স্তবগীতিসমূহ যদিও গুরমুখী লিপিতে, কিন্তু প্রাচীন হিন্দীতেই লিখিত; নানকের 'জনমসাখী' নামক জীবনী গ্রন্থগুলির প্রথম দুইটি পাঞ্জাবী গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রথমটি রচনা করেন, নানকের জীবনসঙ্গী বালা (১৫৩৫ খ্রী)। দ্বিতীয়টির রচয়িতা সেবা সিংহ (১৫৮৮ খ্রী)। গুরুগোবিন্দ সিংহের (১৬৬৬-১৭০৮ খ্রী) 'দশম গ্রন্থ' বিশুদ্ধ হিন্দীতেই লিখিত, তবে তাঁহার 'চণ্ডী দী বার' নামক পাঞ্জাবী ভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থ আছে।

মধ্যযুগের পাঞ্জাবী সাহিত্যে লোকপ্রচলিত প্রেমকথা লইয়া বহু গাথাকাব্য রচিত হয়। প্রেমকাহিনীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল হীর-রঞ্জা (বা হীর-রান্‌ঝা) কাহিনী। ইহা লইয়া সর্বপ্রথম লেখেন ঝঙ্গ-এর দামোদর (আকবরের সমকালীন); তাহার পর লেখেন অন্ধ কবি মুক্‌বিল (১৭৫০ খ্রী) এবং ওয়ারিস শাহ্ (১৭৬৬ খ্রী)। ওয়ারিস শাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ পাঞ্জাবী কবি বলিয়া বিবেচিত হন। সোহনী-মহীবাল ও শশী-পন্‌হোর প্রেমকথা লইয়া ফজল শাহ্ ও অন্যান্য বহু কবি গাথা রচনা করেন। প্রেমকথাগুলি সবই রোমান্টিক ও শোকাবহ। লব-কুশ উপাখ্যান লইয়া কাব্য লেখেন যশোদানন্দন (১৬৫০ খ্রী)। সুফী কবি বুল্লাহ শাহ্ (১৬৮০-১৭৫৮ খ্রী) শতাধিক 'কাফি' (ছোট কবিতা) রচনা করেন। অন্য এক সুফী কবি আলী হাইদার 'সীহরফী' কাব্যমালা রচনা করেন। বাইবেল গ্রন্থের পাঞ্জাবী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮১০-১৫ খ্রীষ্টাব্দে।

পাঞ্জাবী সাহিত্য আধুনিক যুগ: পাঞ্জাবী সাহিত্যের আধুনিক যুগ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবী ভাষা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজপাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহারই ফলে ইওরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বীর সিংহ (১৮৭২-১৯৫৭ খ্রী) আধুনিক পাঞ্জাবী কাব্যের পথিকৃৎ। তাঁহার রচিত 'রাণা সুরত সিংহ' (১৯০৫ খ্রী) সুবৃহৎ রূপক-কাব্য, সুফী ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত। পাঞ্জাবী কাব্যে যুগান্তর আনেন পূরণ সিংহ (১৮৮২-১৯৩২ খ্রী)। তিনি পুরাতন ছন্দ বর্জন করেন। উদ্দাম মানবহৃদয়ের আবেগ, বেদনা, যন্ত্রণা তাঁহার কাব্যে প্রকাশ পায়। তাঁহার অনেক কবিতা ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। তাঁহাকে অনেকে বলেন 'পাঞ্জাবের টেগোর'।

পাঞ্জাবী নাটকের সূত্রপাত হয় হিন্দী ও ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়া। ইহার আধুনিক রূপের মূলে আছে ইংরেজী নাটকের প্রভাব। প্রথম দিকে প্রধানতঃ ব্যঙ্গ্যাত্মক নাটকই রচিত হইত। নাটকে আধুনিক আঙ্গিকের প্রবর্তক আই. সি. নন্দ; তাঁহার 'সুভদ্রা' নাটক (১৯২০ খ্রী) পুরাতন আচার ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। গুরবক্‌স সিংহ যুবকদের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার কুপ্রভাব সম্বন্ধে দুইটি ব্যঙ্গ্যনাট্য লেখেন: 'পূরব তে পচ্ছম' (পূর্ব ও পশ্চিম) ও 'নওয়া ছানন' (নূতন আলোক)। কিরপা সাগরের 'রণজিৎ সিংহ' (১৯২৩ খ্রী) ঐতিহাসিক নাটক।

প্রথম উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা বীর সিংহের 'সুন্দরী' (১৮৯৭ খ্রী), শিখ-বীরত্বের মর্মন্তুদ কাহিনী। প্রথম প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে পূরণ সিংহ, গুরবক্‌স সিংহ ও তেজা সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। কাহন সিংহ 'গুরু সবদ রত্নাকর মহাকোষ' নামে একটি শিখসাহিত্যের কোষগ্রন্থ রচনা করেন।

নানক সিংহ পাঞ্জাবী ভাষায় সর্বপ্রথম ছোট গল্প লেখেন। তিনি সর্বাধিক গল্প ও উপন্যাস রচনা করিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। তিনি কোনও বিশেষ মতাদর্শে আবদ্ধ নন; কিন্তু সমসাময়িক জীবন ও তাহার সমস্যা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন নাই। 'চিত্ত লহু' (১৯৩২ খ্রী) ও 'গরীব দী দুনিয়া' (১৯৩৯ খ্রী) এই দুইটি উপন্যাসে তিনি উচ্চ ও নিম্নবর্ণের (জাতির) মানুষের এবং ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষকে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি নাটক ও কবিতাও লিখিয়াছেন।

আধুনিক পাঞ্জাবী উপন্যাসে বুদ্ধিবৃত্তি ও বাস্তববাদের যে সর্বময় প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাহার নায়ক সন্ত সিং সেখন। তাঁহার ছোট গল্পগুলি জীবনের নিখুঁত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুচিত্রণ ; তাহাদের সামাজিক অন্তর্বস্তু (social content) ও মনস্তাত্ত্বিক মনোজ্ঞতা লক্ষণীয়। তাঁহার 'লহূ মিট্টি' (রক্ত ও মাটি) উপন্যাস এক পাঞ্জাবী কৃষকের জীবনকাহিনী।

পাঞ্জাবী সাহিত্যের নূতন গতিপ্রকৃতি তন্নিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়াছেন সুরিন্দর সিং নরুলা। তাঁহার 'পিও পিওর' (পিতা ও পুত্র) একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তাঁহার অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাসের নাম 'রঙ-মহল', 'নীলি বার' (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ও 'লোক-দুষমন'। শেষোক্ত উপন্যাসের বিষয়বস্তু জমিদার-কৃষকসংঘর্ষ। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নরিন্দর পাল সিংহ ও যশোবন্ত সিং কানবাল উল্লেখযোগ্য।

হরচরণ সিংহ হইতে পাঞ্জাবী নাটকের আধুনিক যুগের প্রারম্ভ। তাঁহার নাটকের উদ্দেশ্য সমাজসংস্কার। বর্তমানে বলবন্ত্ গার্গীই পাঞ্জাবের সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল নাট্যকার। নাটকরচনার সময়ে রঙ্গমঞ্চের দিকেই তাঁহার চক্ষু নিবদ্ধ থাকে। পাঞ্জাবের অন্যান্য কয়েকজন প্রসিদ্ধ নাট্যকারের নাম রোশনলাল আহুজা, অমৃক সিংহ ও গুরুদিয়াল সিং ফুল। রোশনলাল আহুজা ঐতিহাসিক নাটকেই সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। অমৃক সিংহের নাটকগুলি প্রগতিশীল সামাজিক বিবেকের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ছোটগল্পলেখক কর্তার সিং ডুগালও কয়েকটি প্রাণচঞ্চল নাটক লিখিয়াছেন। মোটের উপর সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় পাঞ্জাবী নাটক এখনও অপরিণত অবস্থায় আছে।

পাঞ্জাবের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে অমৃত প্রীতম খ্যাতনাম্নী। তিনি তাঁহার 'সুনেহরে' (বাণী) কাব্যগ্রন্থটির জন্য ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্য অকাদেমীর পুরস্কার পাইয়াছিলেন। পাঞ্জাববিভাগের পর তিনি পাঞ্জাবের অপমানিতা, লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা নারীদের দুঃখ ও বেদনা লইয়া কবিতা লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। ওয়ারিস শাহের উদ্দেশে রচিত প্রশস্তিতে তাঁহার হৃদয়বেদনা সম্যকভাবে প্রকাশিত। তিনি যে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নাই তাহার পরিচয় পাই তাঁহার 'ডাক্তারদেব' ও 'পিঞ্জর' নামক উপন্যাসদুইটিতে।

কবি মোহন সিংহ আজিকার পাঞ্জাবী সাহিত্যের মধ্যমণি। তাঁহাকে তাঁহার 'কাচ-সাচ' (Illusion and Reality) কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য অকাদেমীর পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সায়েপত্তর' ('সবুজ পত্র', ১৯৩৬ খ্রী) দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে পুরাতনী। তাহার পর ঘটিয়াছে তাঁহার আত্মিক ও বুদ্ধিজাগতিক পুনর্জন্ম। ইহার পশ্চাতে আছে কংগ্রেস-আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতালাভ, দেশবিভাগ ইত্যাদি। তরুণ পাঞ্জাবী কবিরাও এই পুনরুজ্জীবনের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন। পাঞ্জাবী সাহিত্যে প্রীতম সিং শফীরের কাব্যের তাৎপর্য অনন্যসাধারণ। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী দার্শনিক। তবে তাঁহার 'হস্তিনাপুর' কাব্যে তিনি সেই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের আভাস দিয়াছেন, যাহা কুঁড়েঘরকে আলোকিত করিবে।

দ্র গোপাল হালদার, ভারতের ভাষা, কলিকাতা, ১৯৬৭ ; Mohan Singh, *A History of Punjabi Literature*, Lahore, 1934 ; J. T. Shipley, ed., *Encylopaedia of Literature*, New York, 1946 ; Suniti Kumar Chatterjee, *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta, 1963.

হরবন্‌স সিংহ

পাট তিলিয়াসিঈ গোত্রের (Family-Tiliaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বর্ষজীবী উদ্ভিদ। এদেশে পাটের দুইটি প্রজাতির চাষ করা হয়—তিতা পাট অর্থাৎ কোর্খোরস কাপ্‌সুলারিস (*Corchorus capsularis*) এবং মিঠা বা দেশী পাট অর্থাৎ কোর্খোরস ওলিতোরিয়স (*C. olitorius*)। পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তানে যথেষ্ট পাট উৎপন্ন হয়। সরস, প্রচুর জলধারণক্ষম দো-আঁশ মাটি পাটচাষের পক্ষে উপযোগী। ৫-৬ বার হাল, মই ও আঁচড়ার সাহায্যে ভালভাবে মাটি তৈয়ারি করা প্রয়োজন ; জমিতে মোটেই ঢেলা থাকা উচিত নয়। বর্ষার বৃষ্টি এবং ভাপসা গরম পাটচাষের খুব উপযোগী। বোনার মাসে ২৫-৭৫ মিলিমিটার এবং বোনার পর ১ সপ্তাহ অন্তর ২৫-৭৫ মিলিমিটার বৃষ্টি চাষের অনুকূল। বপনের জন্য কেবল তাজা বীজই ব্যবহার করা উচিত। সারিতে বপনে তিতা পাটে হেক্টর প্রতি ৫/৬ কিলোগ্রাম এবং মিঠা পাটে ৩/৪ কিলোগ্রাম বীজ লাগে, কিন্তু ছিটাইয়া বোনায় বীজের পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে দ্বিগুণ প্রয়োজন হয়। বীজের পরিমাণ, বোনার খরচ, নিড়ানি এবং ফসল-কাটার খরচ সারিতে চাষের ক্ষেত্রে অনেক কম পড়ে বলিয়া সারিতে চাষই অধুনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সারির সর্বোচ্চ ব্যবধান ২৫-৩০ সেন্টিমিটার। দূরত্ব বেশি হইলে গাছের শাখা বিস্তারের ফলে পাট নিম্ন মানের হইয়া যায়। তিতা পাট

ডাঙ্গা এবং নীচু জমিতে চাষ করা চলে; দেশী পাট ডাঙ্গা জমিতেই চাষ করা যায়। জমির অবস্থা অনুযায়ী চৈত্র হইতে আষাঢ় পর্যন্ত বীজ বপন করা চলে; মাটিতে রস না থাকিলে বপন করা অনুচিত। পলিপড়া জমিতে জৈব সার না দিলেও চলে; অন্যান্য সকল জমিতেই হেক্টর প্রতি ২-৩ মেট্রিক টন আবর্জনা সার দিলে ভালো হয়। হেক্টর প্রতি ৪৫ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াম সালফেট-রূপে প্রয়োগে অধিকাংশ অঞ্চলেই সুফল পাওয়া যায়। পটাশ এবং প্রয়োজনমত ফস্‌ফেট-সহ নাইট্রোজেনপ্রয়োগে রোগপ্রতিরোধ এবং ফলনবৃদ্ধি করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে হেক্টর প্রতি ৪৫ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন, ২৫ কিলোগ্রাম ফস্‌ফেট এবং ২৫-৪৫ কিলোগ্রাম পটাশপ্রয়োগ অনুমোদন করা হয়। পাতার উপর ইউরিয়ার ১% জলীয় দ্রবণ ১৬·৮ কিলোগ্রাম সিঞ্চন করিলে প্রায় ৪৫ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন মাটিতে প্রয়োগের সমতুল্য ফল পাওয়া যায়, অপচয় ও অর্থব্যয় ইত্যাদি কম হয়। ইউরিয়ার সঙ্গে কীটনাশকও প্রয়োগ করিলে সিঞ্চনের ব্যয়সংকোচ করা যায়। কেবলমাত্র ইউরিয়া সিঞ্চনেই হেক্টর প্রতি ২·২৫ কুইন্টাল বেশি ফলন পাওয়া যাইতে পারে। সুবিধা থাকিলে সময়মত সেচের সাহায্যে বীজবপন করা যায়, বৃষ্টির ভরসায় থাকার প্রয়োজন হয় না। পাটচাষে আগাছা-নিয়ন্ত্রণ একটি প্রধান সমস্যা। সারিতে বীজবপন করিলে চক্রবিদার সাহায্যে অতি অল্প সময়ে ও ব্যয়ে নিড়ানির কাজ সমাধা হয়। এক হেক্টরে প্রায় ১১০০০০-১২০০০০ পাটগাছ হইতে প্রায় ২৮ কুইন্টাল তন্তু বা আঁশ পাওয়া যায়।

ফুল ফুটিবার পরই পাট কাটিবার উপযুক্ত সময়। বীজ পাকিবার পর কাটিলে পাটের তন্তু মোটা ও নীরস হইয়া যায়। চৈত্রে বোনা পাট আষাঢ়ে কাটার উপযুক্ত হয়। সাধারণতঃ শ্রাবণ-আশ্বিন পাট কাটার প্রধান সময়। কাটিবার পর পাটের গুচ্ছ পরিষ্কার অল্প স্রোতের জলে ডুবাইয়া রাখা (জাঁক দেওয়া) প্রয়োজন। অল্প এবং ময়লা জলে বেশি পাট জাঁক দিলে ভাল তন্তু পাওয়া যায় না। পাটের গোছা ১ বিঘতের বেশি পুরু করা উচিত নয় এবং জলের ১ বিঘত নিচে এবং মাটি হইতে হাত দুই উপরে ভাসাইয়া রাখিতে হয়। জলজ উদ্ভিদ চাপা দিয়া পাট ডুবানো উচিত, কারণ মাটি বা কলাগাছ ইত্যাদি দিয়া চাপান দিলে পাটের রং ময়লা হইতে পারে। জাঁক দিবার পর মাঝে মাঝে আঁশ ছাড়ানোর সময় হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। গোছা করিয়া আঁশ না ছাড়াইয়া এক-একটি ছাড়াইলে ভাল ফল পাওয়া যায়। জাঁক দেওয়া পাট আছড়াইয়া আঁশ ছাড়াইয়া ভালভাবে ধুইয়া ক্রমাগত ২-৩ দিন রৌদ্রে শুখাইলে স্বর্ণাভ বর্ণ হইবে।

খাদ্যশস্য ও পাটের ফসলের লাভ প্রায় সমানুপাতিক হওয়ার দরুন পাটচাষের পরিবর্তে ধান ইত্যাদি চাষের দিকে বর্তমানে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। উচ্চ ফলনশীল বেঁটে জাতের ধান এই সমস্যাসমাধানে সহায়ক। যে সব অঞ্চলে সেচব্যবস্থা আছে সেখানে ফাল্গুনে তিতা পাট লাগাইয়া ১১০-১২০ দিন পরে জ্যৈষ্ঠের শেষে কাটা যায় এবং ইতিমধ্যে বীজ ফেলিয়া আষাঢ়ের শুরুতে 'আই. আর. ৮' ধানের রোয়া বসাইলে তাহা ১৩০-১৪০ দিনে অর্থাৎ কার্তিকে কাটা যায়। ধান কাটার পরেও রবি ফসল জন্মানো যায়।

পাটের প্রধান রোগ গোড়াপচা; শোধন করা বীজ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। রসচোষা, মাকড়সা, বিছাপোকা এবং ঘোড়াপোকাই বেশি ক্ষতি করে; ফলিডল প্রভৃতি কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার ফলপ্রদ।

মুরারিপ্রসাদ গুহ

পাটনা বিহার রাজ্যের জেলা ও শহর। জেলাটি ২৪° ৫৭′ হইতে ২৫° ৪৪′ উত্তর ও ৮৪° ৪২′ হইতে ৮৬° ৪′ পূর্বে অবস্থিত।

জেলার উত্তর সীমা দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া জেলাটিকে সারন, মুজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা হইতে পৃথক করিয়াছে। জেলার দক্ষিণে গয়া ও মুঙ্গের এবং পশ্চিমে সাহাবাদ জেলা। দক্ষিণে রাজগির পাহাড়-অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র জেলাটি গঙ্গার পলিদ্বারা গঠিত সমতলভূমি। জেলার দক্ষিণে রাজগির পাহাড় দুইটি সমান্তরাল শ্রেণীরূপে অবস্থিত। ইহাদের উচ্চতা ৩০০ মিটারের বেশি নহে।

জেলার নদীগুলির মধ্যে উত্তরে গঙ্গা ও পশ্চিমে শোন প্রধান। অন্যান্য নদীর মধ্যে পুনপুন, পঞ্চান ও ফল্গু উল্লেখযোগ্য।

জেলার গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ৩১° সেন্টিগ্রেড ও শীতকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ১৬° সেন্টিগ্রেড।

পাটনা জেলা প্রাচীনকালে মগধ রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল। বর্তমানে জেলার আয়তন ৫৬০৫ বর্গকিলোমিটার; শহরের সংখ্যা ৮, লোকসংখ্যা ২৯৪৯৭৪৬ (১৯৬১ খ্রী), জেলার প্রায় সকল স্থান পলিগঠিত ও উর্বর। কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধান প্রধান; নানাবিধ সবজিও প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শহরে ও গ্রামে কৃষিজ শিল্পই প্রধান। বস্ত্রশিল্প, সতরঞ্চ, দড়ির কার্পেট, মৃন্ময় পাত্র ও খেলনা তৈয়ারির জন্য জেলার খ্যাতি আছে।

পাটনা শহর বিহার রাজ্যের রাজধানী। ইহা গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ২৫° ৩৭' উত্তর এবং ৮৫° ১০' পূর্বে অবস্থিত। এই শহরের সামান্য পশ্চিমে গঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমস্থল; পূর্বে গঙ্গা ও গণ্ডকের সঙ্গমস্থল। শহরের বর্তমান আয়তন প্রায় ৫৭·৮৩ বর্গকিলোমিটার; পাটনা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও পাটলিপুত্র হাউসিং কলোনি এই আয়তনের অন্তর্ভুক্ত। এই শহরের নামানুসারেই সমগ্র জেলা ও পাটনাবিভাগের নামকরণ হইয়াছে। শহরটি সুপ্রাচীন পাটলিপুত্র নগরের ধ্বংসাবশেষের উপর অবস্থিত ('পাটলিপুত্র' দ্র)।

পাটলিপুত্রের ধ্বংসস্তূপের উপর ক্ষুদ্র জনপদ পাটনা বহুদিন অখ্যাত শহর ছিল। ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহ্ গঙ্গাতীরে পাটনাতে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তথায় একটি সুদৃঢ় দুর্গনির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শেরশাহ্-এর প্রতিষ্ঠিত গঙ্গাতীরের দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া অচিরে তথায় এক বৃহৎ শহর গড়িয়া ওঠে। যাতায়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগের ফলে ইহাই হইল রাজ্যের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে বঙ্গদেশ ও অন্যান্য পূর্বাঞ্চলে এবং নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের সহিত বাণিজ্য চলিতে থাকে।

মোগল যুগে পাটনা শহরের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। তখন দিল্লীর অধীনস্থ রাজকর্মচারীদের বসবাসের উদ্দেশ্যে এখানে নির্মিত হইল দেওয়ান-মহল, উর্ধ্বতন কর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের জন্য প্রস্তুত হইল মহল কাইওয়ান শেকোহ্ নামে প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্‌শান্ পূর্বাঞ্চলে রাজপ্রতিনিধি থাকাকালে ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজ নামানুসারে পাটনার নামকরণ করিয়াছিলেন আজিমাবাদ।

আধুনিক পাটনা শহরের লোকসংখ্যা ৩৬৪৫৯৪ (১৯৬১ খ্রী)। অধিবাসীগণের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। এখানকার অধিবাসীগণের প্রধান ভাষা বিহারী হিন্দী (মাগধী) তাহা অল্প শিক্ষিতদের দ্বারা এখনও কাইথী অক্ষরে লিখিত হয়। তবে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবনাগরী লিপিই প্রচলিত।

এখানে আধুনিক বৃহৎ শিল্প ও প্রকাণ্ড কলকারখানার অভাব, তবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র কৃষিজাত ও উটজ শিল্প অনেক আছে। ইহাদের মধ্যে আফিম তৈয়ারি, মহুয়া ও গুড় হইতে সুরাসার পরিস্রবণ, বস্ত্রশিল্প, সূচিশিল্প, মৃৎ-শিল্প, কাঁসা-পিতলের বাসন, সোনারুপার অলংকার, কাঠ ও পাথরের কাজ প্রভৃতি প্রধান।

নদীপথে যাতায়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ খুব বেশি। দেশীয় নৌকা ভিন্ন যন্ত্রচালিত জলযানও এখানে প্রচুর পরিমাণে যাতায়াত করে। শোন নদের খালের সহিত সংযুক্ত পাটনা-গয়া খালও যাতায়াতের পক্ষে সহায়ক। পাটনা শহর পূর্ব রেলপথের মেন লাইনে অবস্থিত। দক্ষিণে গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের সহিত এখানকার যোগাযোগ আছে। সম্প্রতি ৩০নং জাতীয় সড়কের সাহায্যে একদিকে ৩নং জাতীয় সড়কের সহিত ও অন্যদিকে বখ্‌তিয়ারপুর ও অন্যান্য স্থানের সহিত যোগাযোগের সুব্যবস্থা হইয়াছে। পাটনায় একটি মধ্যম শ্রেণীর বিমানঘাটি অবস্থিত।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথক বিহার প্রদেশ সৃষ্টির পর সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। এই শহরের উচ্চশিক্ষা-সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান পাটনা কলেজ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে বি. এন. কলেজও প্রসিদ্ধ। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই শহরে পৃথক আইন কলেজ স্থাপিত হয়। ঐ বৎসর বিহার স্কুল অফ এঞ্জিনিয়ারিং পৃথক অস্তিত্ব লাভ করে এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহা কলেজে পরিণত হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে শহরে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হয়। এই শহরে একটি বড় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল আছে। এখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'খোদা বখ্‌স ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি'-র মর্যাদা অতুলনীয়। আরবী ও ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে এইরূপ গ্রন্থ-সংগ্রহ বিরল। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ভারত, মিশর ও ইওরোপের বিভিন্ন অংশ হইতে বহু গ্রন্থ ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছে। বহু গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপিতে বিখ্যাত উলেমা ও নৃপতিগণের দস্তখত বা সিল আছে। এই নগরের 'কে. পি. জয়সওয়াল রিসার্চ ইনিষ্টিটিউট'-এর খ্যাতিও সুদূরপ্রসারী। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস, বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি সম্পর্কে এখানে মূল্যবান গবেষণাকার্য হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে পাটনা শহরের ৫১% লোক সাক্ষর।

প্রাচীন মগধের এবং মধ্যযুগের মুসলমানগণের বহু কীর্তিচিহ্ন জেলার বহুস্থানে দেখা যায়। বড়গাঁও গ্রামে প্রসিদ্ধ নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আছে। রাজগিরে বৌদ্ধযুগের রাজগণের বহু চিহ্ন বর্তমান। শহরের

সুলতানগঞ্জে জাহাঙ্গীরের পুত্র পরভেজশাহ্ কর্তৃক নির্মিত পথর কা মসজিদ অবস্থিত। শিকারপুরে শহরের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম মসজিদটি শেরশাহ্ তৈয়ারি করাইয়াছিলেন (১৫৪০-৪৫ খ্রী)। মন্দিরের মধ্যে মহারাজগঞ্জের বড় পটনদেবী (কালী) ও হরমন্দির লেনের ছোট পটন-দেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ। শহরে শিখসম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধ গুরুদ্বার আছে। দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন (১৬৬০ খ্রী) এই শহরে চকের পাশে একটি বাড়িতে। সেইস্থানে নির্মিত হরমন্দিরে সযত্নে তাঁহার ব্যবহৃত দোলনা, পাদুকা এবং গ্রন্থসাহেব রক্ষিত আছে। গির্জাগুলির মধ্যে 'চার্চ অফ ব্লেসেড ভার্জিন মেরী' অন্যতম। ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত গোল-ঘরটি দর্শনীয় বস্তু। এই বিরাট ভাণ্ডারগৃহটি দুর্ভিক্ষ-মোচনের জন্য ধান্যসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। আধুনিক পাটনার একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং বহু দেশ-নায়কের স্মৃতিবিজড়িত সদাকত আশ্রম। বিধানসভার পূর্বে অবস্থিত স্বাধীনতাসংগ্রামের শহীদস্মারকটির ভাস্কর্য উল্লেখযোগ্য।

দ্র L.S.S. O' Malley, *Bengal District Gazetteers: Patna*, Calcutta, 1907; R. C. Majumdar, *Ancient India*, Banaras, 1952; R. R. Diwakar, *Bihar through the Ages*, Calcutta, 1958.

লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী

পাটলিপুত্র বর্তমান বিহার রাজ্যের পাটনা শহর ও ইহার নিকটবর্তী অঞ্চল প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরীর অবস্থান নির্দেশ করে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। ইহার সন্নিহিত গঙ্গা নদীর উত্তর তীরে গণতন্ত্রশাসিত লিচ্ছবিরা প্রবল পরাক্রান্ত ছিল। তাহাদিগের সহিত শত্রুতার সম্ভাবনায় অথবা তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধের জীবিতকালে মগধরাজ অজাত-শত্রু গঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমস্থলে পাটলিগ্রাম নামক স্থানে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেন। কথিত আছে, তখন বুদ্ধদেব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে এইখানে এক বিশাল নগরী গড়িয়া উঠিবে এবং ইহা বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির কেন্দ্র এবং আর্য-ভারতের প্রধান নগরী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবে। তাঁহার বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। অজাতশত্রুর পুত্র অথবা পৌত্র উদয় বর্ধন রাজা হইয়া মগধের পুরাতন রাজধানী রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পাটলিগ্রামে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই পরে পাটলিপুত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইহা প্রায় সহস্র বৎসর কাল মগধের রাজধানী ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মেগাস্থিনিস গ্রীকদূত-রূপে রাজধানী পাটলিপুত্রেই অবস্থান করিতেন। মেগাস্থিনিস বলেন পাটলিপুত্র দৈর্ঘ্যে ৯ মাইল (প্রায় ১৪ কিলোমিটার) এবং প্রস্থে দেড় মাইলের বেশি (প্রায় ২½ কিলোমিটার) ছিল। এই নগরী ৬০০ ফিট প্রস্থ (প্রায় ১৮০ মিটার) ও ৬০ ফিট (প্রায় ১৮ মিটার) গভীর এক পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। পরিখার পাশেপাশে সুদৃঢ় ও সুউচ্চ শালকাঠের প্রাচীরদ্বারা নগররক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই কাষ্ঠবেষ্টনীর মধ্যে স্থানে স্থানে ছিদ্র থাকিত; সেই ছিদ্র দিয়া ধনুর্বিদ যোদ্ধারা বাণ ছুড়িতে পারিতেন। নগরপ্রাচীরে ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০টি উচ্চ স্তম্ভ ছিল। বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে ইহা নানাবিধ সুন্দর সুন্দর হর্ম্যে শোভিত ছিল। গ্রীক লেখকগণ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসিয়া পাটলিপুত্র পরিদর্শন করেন। তিনি মৌর্যযুগের পুরাতন বিশাল প্রস্তরনির্মিত প্রাসাদগুলি দেখিয়া বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন যে এগুলি মনুষ্য নির্মিত নহে; অতিকায় দানবেরা ইহা নির্মাণ করিয়াছে। দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত'-এ পাটলিপুত্র মণিমুক্তায় সমৃদ্ধ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী বলিয়া বর্ণিত আছে। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্‌ৎ-সাঙ্ খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে পাটলিপুত্র পরিদর্শন করিয়া বর্ণনা করেন যে প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরী গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ ইহা অরণ্য-সঙ্কুল। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে হুণ বা অন্য কোনও বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণের ফলে ইহার এইরূপ দুরবস্থা হয়। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীতে পালবংশীয় সম্রাট ধর্মপালের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রের লুপ্ত গৌরবের কতকটা পুনরুদ্ধার হয় এবং ঐখানে তাঁহার জয়স্কন্ধাবার ছিল বলিয়া খালিমপুর তাম্রশাসনে উল্লেখ দেখা যায়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া-র খননের ফলে বর্তমান পাটনা শহরের উপকণ্ঠে বুলন্দীবাগ, কুম্রাহার প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরীর হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধযুগের বহু পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দ্র V. A. Smith, *Early History of India*, Oxford, 1904; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. II, Bombay, 1960.

কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী

পাটশিল্প কাঁচা পাটকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যন্ত্রের সাহায্যে পাটজাত দ্রব্যে পরিণত করার প্রযুক্তিবিদ্যাকে জুটটেকনোলজি বলা হয়। এই যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিকে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হইয়াছে : ১. ব্যাচিং ও সফ্‌টনিং ২. কার্ডিং (ধোলাই) ৩. ড্রইং ৪. স্পিনিং (সুতা কাটা) ৫. ওয়াইণ্ডিং (সুতা জড়ানো) ৬. বিমিং (টানার সুতাকে বিমে জড়ানো) ৭. উইভিং (কাপড় বোনা) ও ৮. ফিনিসিং।

কাঁচা পাটকে সুতা কাটার উপযোগী করার আগে বিভিন্ন ধরনের সুতার জন্য এক বা একাধিক শ্রেণীর পাট গুণানুযায়ী উপযুক্ত অনুপাতে মিলের ব্যাচিং বিভাগের প্রয়োজনমত মেশানো হয়। একই গাঁটের পাটের বিভিন্ন মোড়ার মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে বলিয়া প্রতিটি মোড়া বাছাই করা প্রয়োজন। বাছাই-করা পাট সফ্‌টনার যন্ত্রে দুই থাক 'ফ্লুটেড' রোলারের ভিতর পেষণ করা হয়। এই যন্ত্রের উপর তেল ও জলের মিশ্রণে তৈয়ারি ইমাল্‌শনের প্রয়োগে পাটের আঁশগুলিকে নরম করিয়া সুতাকাটার উপযোগী করিয়া তোলা হয়। নরম-করা পাটের মোড়াগুলি হইতে গোড়ার দিকের অংশ, যেখানে সাধারণতঃ শক্ত ছালের আবরণ থাকে, সেগুলিকে কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। এই গোড়ার অংশগুলি পরে আরও নরম করার জন্য আবার সফ্‌টনার যন্ত্রে পাঠানো হয় ও তাহার পর কিছুদিন স্তূপীকৃত (পাইলিং) করিয়া রাখা হয়। এগুলি খুব মোটা ধরনের সুতা তৈয়ারির কাজেই কেবল লাগানো যাইতে পারে। গোড়া কাটিয়া বাদ দেওয়ার পর মোড়ার অবশিষ্ট অংশগুলিকে ব্রেকার কার্ডে প্রাথমিক কার্ডিং-এর জন্য পাঠানো হয়। কার্ডিং মেশিনের সিলিণ্ডার ও রোলারের গায়ে বিভিন্ন আয়তন ও ঘনত্বের পিন সাজানো থাকে। এই পিনগুলির সাহায্যে রোলার ও সিলিণ্ডারের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাটের মোড়াগুলি হইতে আঁশগুলিকে জট ছাড়াইয়া আলাদা করা হয়। ব্রেকার কার্ড হইতে পাটের আঁশগুলি পরিষ্কার ও মোটামুটি সমান্তরালভাবে ১০ হইতে ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া ফিতার (স্লাইভার) আকারে বাহির হইয়া আসে। ব্রেকার কার্ডের সঙ্গে যুক্ত রোল ফর্মারে এই ফিতাগুলিকে চাক্তির আকারে (রোল) পরিবর্তিত করা হয়। ইহার পর ফিনিশার কার্ড যন্ত্রে এই ফিতার আকারে পাটের আঁশ-গুলিকে দ্বিতীয়বার কার্ডিং করা হয়। সাধারণতঃ এই দ্বিতীয় কার্ডিং-এর পিনগুলি আরও পাতলা ও আরও ঘন-সন্নিবদ্ধ থাকে যাহার ফলে পাটের আঁশগুলি আরও বেশি পরিষ্কারভাবে জটমুক্ত এবং সমান্তরাল হয়। সাধারণতঃ একসঙ্গে ১০টি বা ১১টি রোল ফিনিশার কার্ডে ঢোকানো হয় এবং কার্ডের ভিতর এইগুলি মিশ্রিত হইয়া একটি ফিতার আকারে বাহির হইয়া আসে। শাদা, তোষা, মেস্‌তা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের পাট ব্রেকার কার্ডে আলাদা-আলাদাভাবে ফিতার আকারে পরিণত হইয়া এই ফিনিশার কার্ডে নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে মিশ্রিত হয়।

দুইবার কার্ডিং করার পর পাটের আঁশগুলিকে দুই বা তিন প্রস্থ ড্রইং মেশিনের সাহায্যে আরও পরিষ্কার ও সমান্তরাল করা হয়। প্রতি ক্ষেত্রে দুইটি, তিনটি বা চারটি ফিতা এই যন্ত্রের সাহায্যে একটি ফিতায় পরিণত করা হয়। প্রতি মেশিনেই এই ফিতাগুলিকে দৈর্ঘ্যে বাড়াইয়া একত্রিত ফিতাটিকে ওজনে লঘু করা হয়। ইহাকে ড্রাফ্‌টিং বলা হয়।

ড্রইং-এর পর ফিতাগুলি আগের মত 'রোভিং' যন্ত্রে না গিয়া বর্তমানে সরাসরি যায় আধুনিক সুতাকাটা যন্ত্রে। সুতাকাটার যন্ত্রে সুতাকাটার পর সেগুলি দুদিকে চাকতি লাগানো ববিনে জড়ানো হয়।

যে কোনও কাপড় বোনার উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ টানা ও পোড়েনের জন্য দুই ধরনের সুতার দরকার হয়। টানার সুতাতে মাড় লাগাইবার প্রয়োজন হয়। মাড় লাগাইবার বিশেষ যন্ত্রে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য টানার সুতাকে একটি সুতা জড়ানো যন্ত্রে কাঠের নলের (লাটিম বা স্পুল) উপর জড়ানো হয়। স্পুলের সুতাগুলি 'প্রিবিমার' যন্ত্রের বিম্-এর গায়ে জড়ানো হয়। সাধারণতঃ এইরকম কয়েকটি বিম্-এর সুতাকে মাড় লাগানো যন্ত্রের সাহায্যে একত্রিত করিয়া একটি তাঁতে ব্যবহারের উপযোগী বিমে জড়ানো হয়। প্রিবিমার বিম্‌গুলির সমস্ত সুতাগুলি একত্রে পাশাপাশি যাইবার পথে মাড়ের আধার হইতে মাড় সংগ্রহ করিয়া লইবার পর বড় বড় কয়েকটি সিলিণ্ডারের উপর দিয়া গিয়া একটি বিম্-এর গায়ে জড়াইয়া যায়। এই সিলিণ্ডারগুলিকে বাষ্পের সাহায্যে উত্তপ্ত রাখার ফলে মাড়ের জলীয় অংশ বাষ্পে পরিণত হয় এবং সুতার গায়ে শুষ্ক মাড়ের প্রলেপ লাগিয়া থাকে।

পোড়েনের সুতা, তাঁতের মাকুতে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য সুতাকাটার যন্ত্র হইতে আর একটি সুতা-জড়ানোর যন্ত্রে পাঠানো হয়। এই যন্ত্রে পোড়েনের সুতাকে 'ফুকানলি'তে (কপ) পরিণত করা হয়।

ভারতীয় চটকলগুলিতে ব্যবহৃত তাঁত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব প্রাচীন ধরনের। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই তাঁতের সঙ্গে মাকুতে সুতা ভরার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাংশ লাগানো হইয়াছে। এখন পর্যন্ত এরূপ যন্ত্র শুধুমাত্র থলের

কাপড় বানানোর উপযোগী স্যাকিং তাঁতেই ব্যবহৃত হয়। হেসিয়ান বা অপেক্ষাকৃত মিহি চটের ক্ষেত্রে এই যন্ত্রাংশকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে হইলে এই যন্ত্রটির আরও উন্নতি সাধন করা দরকার। সম্প্রতি এই ধরনের প্রায় স্বয়ংক্রিয় তাঁতের প্রবর্তন হইয়াছে, যাহার ফলে একজন তাঁতীর পক্ষে ছয়খানি তাঁত সহজেই একযোগে চালানো সম্ভব।

তাঁত হইতে বাহির হইয়া আসার পর কাপড়গুলিকে ড্যাম্পিং মেশিনে সামান্য জলের ছিটা দিয়া ভিজাইয়া পরে চেষ্টিং ও ক্যালেণ্ডারিং মেশিনে উত্তাপ ও বড় বড় রোলারের চাপের সাহায্যে ইস্ত্রি করা হয়। কোনও কোনও বিশেষ ধরনের কাপড়ের জন্য ক্রপিং মেশিনের সাহায্যে কাপড়ের গা হইতে প্রসারিত আঁশ ছাঁটিয়া পরিষ্কার করা হয় এবং ম্যাংগ্লিং মেশিনে ভারি রোলারের চাপে পালিশ করিয়া ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো হয়। বেশির ভাগ হেসিয়ান কাপড় ভাঁজ করিয়া প্যাক করা হয় এবং বেশির ভাগ স্যাকিং কাপড় থলে-কাটার যন্ত্রে প্রয়োজনীয় মাপে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া সেলাই করিয়া থলে তৈয়ারি করা হয়।

চটের কাপড় ও থলে দূরদেশে রপ্তানির উপযোগী করার জন্য শক্তিশালী হাইড্রলিক প্রেসে চাপ দিয়া চটের কাপড়ে মুড়িয়া এবং ষ্টিলের বানপাত (হুপ্‌স) দিয়া বাঁধিয়া শক্ত গাঁটে পরিণত করা হয়।

পৃথিবীব্যাপী পণ্যসম্ভার পরিবহণের কাজে প্রয়োজনীয় আধার ও আচ্ছাদনদ্রব্য হিসাবে পাটজাত বস্তু এখনও সবচেয়ে সস্তা ও সহজলভ্য। এ ছাড়া পাটজাত কাপড় হইতে আধুনিক কালে কার্পেট তৈয়ারির জন্য টাফ্‌টিং যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে কার্পেটের বুনিয়াদ হিসাবে চটের কাপড়ের ব্যবহার বিশেষ করিয়া উত্তর আমেরিকায় বাড়িয়া গিয়াছে। এইসব কার্পেটের জন্য ৩ মিটারের উপর চওড়া কাপড়ের প্রয়োজন হয় এবং এজন্য বিশেষ আয়তনের তাঁতের প্রচলন বাড়িতেছে। সাধারণ প্রস্থের তাঁতেও এই ধরনের উচ্চমানের কার্পেটের কাপড় মোটর গাড়ির গদির আচ্ছাদন ও আভ্যন্তরীণ সজ্জার জন্য তৈয়ারি হয়। চটের কাপড়ের উপর PVC-জাতীয় প্লাষ্টিকের আবরণ দিয়া দেয়ালের আচ্ছাদন, পার্টিশন ও অন্যান্য গৃহসজ্জার উপাদানে ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি চটের কাপড়কে ধোলাই ও পাকা রং করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহারের নূতন নূতন সম্ভাবনা দেখা দিতেছে।

পাটশিল্পসংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষালাভের জন্য ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান জুট মিল্‌স অ্যাসোসিয়েশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় কলিকাতায় ইন্‌ষ্টিটিউট অফ জুট টেক্‌নোলজি স্থাপন করেন, ফলে এদেশের শিক্ষার্থীদের বিলাতে ডাণ্ডি টেক্‌নিক্যাল কলেজে যাওয়ার প্রয়োজন রহিত হইয়াছে।

পাট ও পাটশিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকারের গবেষণার জন্য এদেশে প্রধান তিনটি সংস্থা আছে: ১. ইণ্ডিয়ান জুট ইণ্ডাষ্ট্রিজ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন; ইহা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার গবেষণায় লিপ্ত আছে। এই সংস্থা ভারতীয় মানক-সংস্থার হইয়া রপ্তানিযোগ্য পাটজাত দ্রব্যের গুণগত মান পরীক্ষা করে। ২. নীলগঞ্জে জুট অ্যাগ্রিকাল্‌চারাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরি; এখানে পাটের কৃষিবিষয়ক গবেষণার জন্য একটি খামার আছে ৩. কলিকাতায় টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরি; ইহার গবেষণাগারে একটি পরীক্ষামূলক মিল আছে এবং সেখানে নানাজাতীয় পাটের উপযোগিতা ও নূতন ধরনের ব্যবহারের গবেষণা করা হয়।

দ্র S. K. Paul, *A Practical Treatise on Jute Cultivation & Jute Weaving*, Parts I & II, Calcutta, 1952; S. N. Kar, *An Introduction to Jute Spinning*, Calcutta, 1961; S. K. Paul, *Comprehensive Study in Modern Jute Technology*, Calcutta, 1961; R. R. Atkinson, *Jute—Fibre to Yarn*, Bombay, 1965.

কমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পাটীগণিত সংখ্যার ব্যবহার-সংক্রান্ত বিজ্ঞানই পাটীগণিত। যাহার অংশ সম্পূর্ণের সহিত সমধর্মী তাহাই রাশি। সমজাতীয় রাশির তুলনার জন্য ক্ষুদ্রতর যে রাশি ব্যবহার করা হয় তাহাকে একক বলে। এককের পরিপ্রেক্ষিতে যাহার দ্বারা কোনও রাশির মান নির্ণয় করা যায় তাহাই সাধারণভাবে সংখ্যা। সংখ্যা খণ্ড অথবা অখণ্ড বা পূর্ণ হইতে পারে। বস্তুর সহিত সম্পর্কযুক্ত সংখ্যাকে বদ্ধ সংখ্যা এবং বস্তু-সম্পর্কিত না হইলে ঐ সংখ্যাকে শুদ্ধ সংখ্যা বলা হয়। পাটীগণিতে আলোচিত সমস্ত সংখ্যাই ধনাত্মক।

পাটীগণিতের প্রথম প্রচলন সম্ভবত: মানবসভ্যতার শুরুতেই। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪০০ অব্দের মিশরীয় প্যাপিরাসে গণিতের উল্লেখ পাওয়া যায়। চীন, মিশর, ব্যাবিলন,

রোম প্রভৃতি দেশের মনীষীরা সেই সুপ্রাচীন যুগেই পাটীগণিতের অন্তর্গত বহু তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। 'দশমিক পদ্ধতিতে অঙ্কপাতন'-এর উদ্ভব ভারতবর্ষেই। পাটীগণিতের বহু বিষয়, যথা—উদ্‌ঘাতন, অবঘাতন, ত্রৈরাশিক, সুদকষা, সম্ভূয়-সমুত্থান, সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণী, বিন্যাস, সমবায় ইত্যাদি আমাদের আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, ভাস্করাচার্য প্রমুখ প্রাচীন ঋষিদের গবেষণা-তথ্যে সমৃদ্ধ। ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' পাটীগণিতের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। পাটীগণিতে গ্রীসের দান অনন্যসাধারণ—পিথাগোরাস-দর্শনের মূলে পাটীগণিত।

নয়টি সার্থক চিহ্ন এবং ০ দ্বারা দশমিক অঙ্কপাতন পদ্ধতিতে পাটীগণিতের সংখ্যাগুলি লিখিত হয়। সংখ্যালিখনের কয়েকটি অপ্রচলিত পদ্ধতি হইল রোমক পদ্ধতি, ষষ্ঠিক পদ্ধতি, বিংশিক পদ্ধতি ইত্যাদি। যোগ (+), বিয়োগ (−), গুণ (×) এবং ভাগ (÷) এই চারিটি প্রক্রিয়া গণিতের মূলসূত্র। গণিতে $>$, $<$ এবং $=$ এই চিহ্নগুলির দ্বারা যথাক্রমে বৃহত্তর, ক্ষুদ্রতর এবং সমতা সূচিত হয়। পাটীগণিতের সংখ্যাসমূহ নিম্নলিখিত নিয়মসমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত : a, b, c...... দ্বারা সংখ্যা নির্দিষ্ট হইলে, ১. $a-b+c+d=a+c-b+d=a+d+c-b$ হইবে ; ইহা বিনিময় নিয়ম ২. $a-(b-c)=a-b+c$; $a-b+c+d+e-f=a-(b-c)+(d+e-f)$ হইবে ; ইহা যোগ ও বিয়োগের সংযোগ নিয়ম ৩. $a\div(b\div c)=a\div b\times c$; $a\div b\times c\times d\times e\div f=a\div(b\div c)\times(d\times e\div f)$ হইবে ; ইহা গুণ ও ভাগের সংযোগ নিয়ম ৪. $m\times(a+b-c)=m\times a+m\times b-m\times c$; $(a+b-c)\div n=(a\div n)+(b\div n)-(c\div n)$ হইবে ; ইহা বিচ্ছেদ নিয়ম ৫. $a=b$, $b=c$ হইলে, $a=c$ হইবে ৬. $a \gtreqless b$ হইলে, $a\pm x \gtreqless b\pm x$; $ma \gtreqless mb$ এবং $(a\div m) \gtreqless (b\div m)$ হইবে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাটীগণিতের ব্যবহার। ইহা শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

দ্র G. R. Kaye, *Indian Mathematics*, Calcutta, 1915 ; F. Cajori, *A History of Mathematics* London, 1919 ; B. B. Datta and A.N. Singh, *History of Hindu Mathematics*, Bombay, 1962.

নলিনীকান্ত চক্রবর্তী

পাণিনি সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত ব্যাকরণরচয়িতা। ইঁহার রচিত ব্যাকরণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া তাহার নাম 'অষ্টাধ্যায়ী'। এ যাবৎ পৃথিবীর কোনও ভাষাতেই অষ্টাধ্যায়ীর ন্যায় সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ ব্যাকরণ রচিত হয় নাই।

পাণিনির পূর্বেও বহু ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর আবির্ভাবে সেগুলি সমস্তই অপ্রচলিত ও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীতে গার্গ্য, গালব, শাকল্য, শাকটায়ন প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণের নাম আছে।

পাণিনির কাল লইয়া গুরুতর মতভেদ আছে। গোল্ডস্টুকর ও ভাণ্ডারকর প্রভৃতির মতে তাঁহার কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতক ; রায়চৌধুরীর মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম ও ৪র্থ শতক ; বোতলিঙ্-এর মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের মধ্যভাগ ; ওয়েবারের মতে ঐ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। বাসুদেবশরণ আগরওয়াল সমস্ত প্রমাণ বিবেচনা করিয়া তাঁহার কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০ স্থির করিয়াছেন।

পাণিনির নিবাস ছিল অধুনা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত আটক শহরের নিকট শালাতুর গ্রামে। (বর্তমান নাম লাহুর)। প্রসিদ্ধ চীনা পরিব্রাজক হিউএন্-ৎসাঙ্-এর সময়েও শালাতুর গ্রাম বর্তমান ছিল। 'কথাসরিৎসাগর' হইতে জানা যায়, পাণিনি পাটলিপুত্রে বাস করিতেন এবং মহারাজ নন্দের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল।

বার্তিক, ভাষ্য, বৃত্তি ও টীকা প্রভৃতিসমৃদ্ধ পাণিনি-ব্যাকরণের পঠন পাঠন ও জনপ্রিয়তা সারা ভারতে আজ পর্যন্ত অব্যাহত। মধ্যযুগে হেমচন্দ্র (সিদ্ধ হেমশব্দানুশাসন), বোপদেব (মুগ্ধবোধ), চান্দ্র (চান্দ্র ব্যাকরণ), পদ্মনাভ (সুপদ্ম), ক্রমদীশ্বর (সংক্ষিপ্তসার) প্রভৃতি বহু ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই প্রায় সর্বাংশে অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র উপজীব্য। ইহাদের প্রচলন সীমাবদ্ধ।

শৈলেন সেনগুপ্ত

পাণিপথ (২৯°২৩′ উত্তর এবং ৭৭°১′১০″ পূর্ব) প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর। দিল্লী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তর-উত্তরপশ্চিমে। হরিয়ানা রাজ্যের কর্নাল জেলায় পানিপথ তহশীল এবং শহর অবস্থিত।

পাণিপথের প্রসিদ্ধি সন্নিকটস্থ প্রান্তরে ভারতের ভাগ্য নির্ধারণকারী ৩টি যুদ্ধের জন্য। প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল দিল্লী ও আগ্রার সুলতান ইব্রাহিম লোদী এবং কাবুলের অধিপতি বাবরের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত হন

এবং বিজয়ী বাবর অচিরে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া ভারতে মোগলশাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর আগ্রা ও দিল্লীর অধিপতি হিমু এবং আকবর ও বৈরাম খাঁর সঙ্গে হইয়াছিল। হিমু ছিলেন মহম্মদ আদিল শাহের প্রধানমন্ত্রী এবং মোগল অধিকার হইতে আগ্রা ও দিল্লী দখল করার পরে বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আকবর ও বৈরাম খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং পাণিপথের প্রান্তরে তাঁহাদের সহিত হিমুর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। পরাজিত হিমু নিহত হইলেন। বিজয়ী মোগলসেনা দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করে। হিমুর পরাজয়ে আফগানদের হিন্দুস্তানে প্রভুত্ব লাভের আশা অস্তমিত হয়।

পাণিপথে তৃতীয় যুদ্ধ ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি আফগানিস্তানের আহমদ শাহ্ দুরানী এবং মারাঠাদের মধ্যে সংঘটিত হয়। মারাঠাগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। সমগ্র ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তারের যে আশা মারাঠারা এতদিন পোষণ করিত তাহা এই পরাজয়ে বিলীন হইল।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

পাণ্ডুয়া[১] (২৫° ৮′ উত্তর এবং ৮৮° ১০′ পূর্ব) পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। জেলার সদর মালদহ হইতে প্রায় ১৬ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া হইতে পৃথক করিবার জন্য ইহাকে অনেক সময়ে 'হজরত পাণ্ডুয়া' বলা হয়। মুসলিম আমলে ইহার নামকরণ হইয়াছিল ফিরোজাবাদ। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল (১৩৪২-৫৭ খ্রী) হইতে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজত্বের (১৪১৫-৩১ খ্রী) প্রারম্ভ পর্যন্ত পাণ্ডুয়া উত্তরবঙ্গের রাজধানী ছিল। অনেকের মতে রাজধানী লখনৌতি (গৌড়) হইতে এই স্থলে স্থানান্তরিত হয় ইলিয়াস শাহের ঠিক পূর্ববর্তী আলাউদ্দীন আলী শাহের আমলে (১৩৩৯-৪২ খ্রী), কেননা এই সুলতানের কোনও কোনও মুদ্রায় ফিরোজাবাদের নাম লেখা আছে।

পাণ্ডুয়া পাণ্ডুনগরের অপভ্রংশ, কেননা দনুজমর্দনদেবের এবং মহেন্দ্রদেবের ১৪১৭ এবং ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রায় পাণ্ডুনগর লেখা আছে। পাণ্ডবরাজার দালান প্রভৃতি নাম হইতে এবং এখানকার মুসলিম সৌধে ব্যবহৃত মন্দিরের ক্ষোদিত প্রস্তর ও স্তম্ভাবলী হইতে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এই স্থল হিন্দুযুগেও সমৃদ্ধ ছিল। পাণ্ডুভূমি নামধেয় প্রখ্যাত বৌদ্ধ বিহারটির অবস্থিতি এই স্থলে থাকা বিচিত্র নয়।

মুসলিম যুগের সদর রাস্তা, ক্ষুদ্রাকার সেতু ও দালান-বাড়ির নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। রাজপ্রাসাদ বর্তমানে অবলুপ্ত। সম্ভবতঃ এইটি ছিল সাতাইশ-ঘর নামক দিঘির সংলগ্ন। এই স্থলে হামামের ধ্বংসাবশেষ ও কিছু কিছু দালানের চিহ্ন বিদ্যমান। এই এলাকার চারিদিকে প্রাচীন বপ্র ও পরিখার নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

এখানকার প্রত্নকীর্তিরাজির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য 'আদিনা' নামে প্রখ্যাত জামি মসজিদ, একলাখী সমাধিসৌধ এবং কুতুবশাহী মসজিদ। ইলিয়াস শাহের পুত্র সুলতান সিকন্দর শাহ কর্তৃক সম্ভবতঃ ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত আদিনা বাংলাদেশের বৃহত্তম মসজিদ। দামাস্কাসের প্রখ্যাত উমইয়্যাদ খলিফা আল-ওয়ালিদের মসজিদের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। আদিনা মসজিদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫৫ মিটার (৫০৭ ফুট) এবং প্রস্থে প্রায় ৮৭ মিটার (২৮৫ ফুট)। মসজিদপরিকল্পনার চিরাচরিত প্রথানুযায়ী মধ্যভাগে উন্মুক্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ (১২১ মিটার × ৪৮ মিটার)। প্রাঙ্গণের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের লিওয়ান দুইসারি প্রস্তরের স্তম্ভাবলীর মাধ্যমে তিনভাগে বিভক্ত। স্তম্ভ, বাতায়ন-সংবলিত পশ্চাতের দেওয়াল এবং খিলানযুক্ত মকস্যুরার উপর ন্যস্ত ছাদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্বুজে বিভক্ত। গম্বুজের সংখ্যা পূর্বদিকে ১০৮, উত্তরদিকে ৩৯ এবং দক্ষিণদিকে ৫১। পশ্চিম-দিকের মধ্যভাগে প্রধান প্রার্থনাগৃহ। ইহার পশ্চাতের দেওয়ালে দুইটি মিহরাব। প্রধান মিহরাবের উত্তরদিকে মিম্বর—ইমামের জন্য নির্দিষ্ট সসোপান প্রস্তরের বেদী। প্রার্থনাগৃহের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বলগ্ন লিওয়ান ও প্রার্থনা-স্থল। উভয় ভাগেই চারিসারি করিয়া পশ্চাৎ-স্তম্ভ এবং পশ্চাতের দেওয়ালে মিহরাবের সারি। উভয়ভাগেরই আচ্ছাদন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্বুজের বিন্যাসে। দক্ষিণ অংশে অষ্টাদশ মিহরাব; এই অংশটি জনসাধারণের জন্য। উত্তরাংশে স্তম্ভাবলীর উপর আরোপিত বাদশাহ্-কা-তখ্‌ত নামে একটি কালো পাথরের মঞ্চ আছে—এইটি ছিল পর্দানশীন রাজান্তঃপুরবাসিনীদের প্রার্থনাস্থল। মিহরাবগুলির গাত্রদেশ কারুকার্যমণ্ডিত; তোরণের সমাবেশে এগুলির সম্মুখভাগের শোভাবর্ধন করা হইয়াছে; তোরণের স্তম্ভে ও উপরিভাগে সুন্দর ক্ষোদিত অলংকরণ। মসজিদের পশ্চিম দেওয়াল প্রায় ৪ মিটার (১২ ফুট) পর্যন্ত পাথরের; প্রস্তরাংশের বহির্ভাগ ডৌলকর্মে বিলসিত। বাকি অংশ এবং গম্বুজ-সমৃদ্ধ ছাদ

ইষ্টকের। দেওয়ালের ইষ্টকনির্মিত অংশেও সূক্ষ্ম কারু-কার্যের প্রাচুর্য। পূর্ব-লিওয়ানের মধ্যভাগে অবস্থিত মসজিদের মুখ্য প্রবেশিকা অতি সাধারণ এবং এই বিশাল মসজিদের অনুপযুক্ত। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রবেশিকা আছে। পশ্চিমদিকের প্রবেশিকার প্রস্তরের চৌকাঠের অলংকরণ সুরুচিপূর্ণ। মসজিদের প্রতিকোণে একটি করিয়া গাত্রমিনার। মসজিদটি নির্মাণের জন্য যে বেশ কয়েকটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংস সাধন করা হইয়াছিল সে সাক্ষ্য প্রদান করে মসজিদের বহু ক্ষোদিত প্রস্তর ও স্তম্ভ। মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালের পশ্চাদ্গাত্রলগ্ন সিকন্দর শাহের সমাধিসৌধ বাদশাহ-কা-তখ্‌তের সহিত সম্পর্কিত প্রবেশিকার মাধ্যমে।

একলাখী সমাধি সৌধের অভ্যন্তরে তিনটি কবর আছে। 'রিয়াজ-উস-সালাতীন'-এ উক্ত হইয়াছে, এই তিনটি কবর রাজা কংসের (রাজা গণেশ) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত পুত্র সুলতান যদু-জলালুদ্দীন ও তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রের। কথিত আছে, সৌধটির নির্মাণে একলক্ষ টাকা খরচ হয়। মোটা দেওয়ালবিশিষ্ট ইষ্টকনির্মিত সৌধটি এক গম্বুজের। বহির্ভাগ চতুষ্কোণ, ২৪ মিটার × ২৩ মিটার (৭৮½ ফুট × ৭৪½ ফুট)। অষ্টকোণী অন্তর্দেওয়ালের উপর অর্ধবর্তুলাকার গম্বুজ। চারিটি দেওয়ালের মধ্যভাগে একটি করিয়া সখিলান প্রবেশ-দ্বার। দ্বারের প্রস্তরনির্মিত চৌকাঠ হিন্দুসৌধ হইতে অপহৃত। চারিটি কোণে, দেওয়ালের অভ্যন্তরে, একটি করিয়া প্রকোষ্ঠ। ডৌলকর্ম, পুষ্পপত্র এবং মিনা-করা টালিতে অলংকৃত বহির্ভাগের প্রতিকোণে একটি উপ-মিনার। দেওয়ালের বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে মাঝে মাঝে অনতিপ্রলম্বিত আয়কের মাধ্যমে। কার্নিস ধনুকের মত বাঁকান। সৌধটিতে বাংলা-চালাঘরের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে মখদুম শেখ (নূর কুতব আলমের বংশধর) নির্মিত কুতুবশাহী মসজিদের (সোনা মসজিদ নামেও পরিচিত) নিম্নাংশ প্রস্তরের এবং উপরাংশ ইষ্টকের। যে দশটি গম্বুজের সমাবেশে ইহা আচ্ছাদিত হইয়াছিল, তাহার একটিও আজ অবশিষ্ট নাই। ভিত্তি নকশা আয়ত। সম্মুখভাগে পাঁচটি সখিলান দরজা, উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুইটি করিয়া জালিবাতায়ন এবং চারিকোণে আটকোণা উপস্তম্ভ। পশ্চিমদিকের অন্ত-র্দেওয়ালে চারিটি মিহরাব ও একটি মিম্বর। অভ্যন্তরে একসারি প্রস্তরের স্তম্ভ।

এখানকার বড়ী দরগা এবং ছোটী দরগা মুসলমানদের নিকট পবিত্র স্থান। বড়ী দরগার অন্তর্গত জামি মসজিদ, ভাণ্ডারখানা, লখনসেনী দালান, তনুরখানা ও অন্যান্য সৌধ হজরৎশাহ জালাল ও তাব্রেজীর (১৪শ শতক) নামে উৎসর্গীকৃত। তাব্রেজীর আস্তানার সূত্রপাত করেন সম্ভবতঃ আলাউদ্দীন আলী শাহ। ছোটী দরগা হজরৎনূর কুত্‌বুল আলমের (১৫শ শতকের ১ম পাদ) নামে। ইহার প্রাঙ্গণেও বিভিন্ন সময়কার কয়েকটি সৌধ বিদ্যমান। এই দুই শেখেরই মৃত্যুদিবস প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে মেলায় বহু জনসমাগম হয়।

দ্র A. Cunningham, *Archaeological Survey of India Report*, vol. XV, Calcutta, 1882; M. Abid Ali Khan, *Memoirs of Gaur and Pandua*, Calcutta, 1931; J. N. Sarkar, ed., *The History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1948; A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Dacca, 1961.

দেবলা মিত্র

পাণ্ডুয়া[২] (২৫°৫´ উত্তর এবং ৮৮°১৭´ পূর্ব) পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার অন্তর্গত গ্রাম ও রেল স্টেশন। গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডের উপর অবস্থিত এই স্থানটি হুগলি শহর হইতে ২২½ কিলোমিটার দূরে। গ্রাম হইলেও পাণ্ডুয়ায় থানা, ডাকঘর, সাবরেজেষ্ট্রি অফিস প্রভৃতি আছে। সুন্নি সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল এই স্থানে অনেক অভিজাত মুসলমানের বসবাস। প্রতি বৎসর মাঘ ও বৈশাখ মাসে এখানে বড় মেলা বসে।

ত্রয়োদশ শতকের শেষে যখন সেনাপতি জাফর খাঁ গাজি ত্রিবেণী অধিকার করেন, তখনই পাণ্ডুয়া ও সপ্তগ্রাম মুসলমানদের আয়ত্তে আসে। এই অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম-প্রসারে অগ্রণী হন জাফর খাঁরই সমসাময়িক শাহ্‌ সফিউদ্দীন।

পাণ্ডুয়ার মুসলিম প্রত্নকীর্তির মধ্যে প্রাচীনতম সম্ভবতঃ এখানকার অত্যুচ্চ মিনারটি। সম্ভবতঃ এইটি নির্মিত হয় মুসলিম অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই। অনেকের মতে মিনারটি বিজয়স্তম্ভ, তবে কেহ কেহ অনুমান করেন এইটি মুয়াজ্জনা। ইষ্টকনির্মিত এবং চুনবালির পলস্তারে আবৃত ইহার বাস্তু-নকশা বৃত্তাকার। ক্রমক্ষীয়মাণ পাঁচটি তলায় ইহা বিভক্ত। সর্বনিম্নতলার ব্যাস প্রায় ১৮ মিটার এবং সর্বোচ্চ তলার ব্যাস প্রায় ৫ মিটার; মোট উচ্চতা ছিল প্রায় ৩৮ মিটার। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পে ইহার সর্বোচ্চ

তলাটি ভাঙ্গিয়া যায়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই তলাটি এবং ইহার উপরাংশ পুনর্নির্মিত হয়। তলাগুলির বহির্গাত্র উত্তল পলতোলা। প্রত্যেক তলায় মাথায় গোলাকার বারজা; আরোহণের নিমিত্ত আবর্তিত সোপান। প্রবেশ-দ্বারের প্রস্তর নির্মিত চৌকাঠটি হিন্দু মন্দির হইতে অপহৃত।

মিনারটির পশ্চিমদিকে আয়ত বড়ী মসজিদ (৭০ মিটার × ১৩ মিটার) বর্তমানে ভগ্নদশাগ্রস্ত। দুইসারি প্রস্তর স্তম্ভদ্বারা মসজিদের অন্তর তিনভাগে বিভক্ত। স্তম্ভগুলি হিন্দু সৌধ হইতে গৃহীত। কতকগুলি স্তম্ভে ঘণ্টা, মাল্য, কীর্তিমুখ ইত্যাদির প্রতিকৃতি। দেওয়াল ও ছাদ ইটের। সম্মুখ দেওয়ালে ২১টি এবং পার্শ্ব দেওয়াল দুইটিতে ৩টি করিয়া ৬টি খিলানযুক্ত প্রবেশিকা। এই দেওয়ালটির ইট কারুকার্যমণ্ডিত ছিল। ৬৩ গম্বুজের সমাবেশে মসজিদটির ছাদ। গম্বুজের নিম্নস্থ খিলানগুলি স্তম্ভগুলির উপর ন্যস্ত। পশ্চাৎ (পশ্চিম) দেওয়ালে ২১টি মিহরাব। মিহরাবের গাত্র ফুল, জালি ইত্যাদিতে অলংকৃত। বেদীর উপর নির্মিত মিম্বরটিতে আরোহণের জন্য ৭টি সিঁড়ি। মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে উচ্চ মঞ্চের উপর একটি কক্ষ—প্রবাদ এইটি ছিল শাহ্ সফিউদ্দীনের চিল্লাহ্-খানা; তবে অনেকের মতে এইটি মহিলাদের নমাজগৃহ।

মিনারটির দক্ষিণ-দিকে প্রাচীরবেষ্টিত শাহ্ সফি-উদ্দীনের আস্তানা। শাহ্ সফিউদ্দীনের সমাধিসৌধের মঞ্চের ৪ কোণে একটি করিয়া ক্ষুদ্রাকার স্তম্ভ, স্তম্ভের উপরে চৌচালা ছত্রি। সৌধটির বাস্তনকশা চতুষ্কোণ। ছাদের একটিমাত্র গম্বুজ। কার্নিস ধনুকের মত বক্র। দেওয়াল পলস্তারে আবৃত। বর্তমান সৌধটি মোগল আমলের। ইহার অন্তরস্থ স্তম্ভগুলি কিন্তু প্রাক-মোগল।

সমাধিসৌধটির পশ্চিমদিকে ইষ্টকের মসজিদটিও চতুষ্কোণ এবং এক গম্বুজবিশিষ্ট। সম্মুখ দেওয়ালে তিনটি এবং দুই পার্শ্বের দেওয়ালে একটি করিয়া সখিলান প্রবেশিকা। পশ্চাতের দেওয়ালে তিনটি মিহরাব। সৌধটির প্রতি কোণে উপমিনার। সৌধটিতে কয়েকটি সলেখ ফলক আছে। ইহাদের একটি হইতে জানা যায়, বাংলার সুলতান ইউসুফ শাহের সময়ে ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মজলিস আজম এইটি নির্মাণ করেন। আর একটিতে উক্ত হইয়াছে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লাল কুনওয়ার নাথ নামে জনৈক হিন্দু ইহার সংস্কার সাধন করেন।

পাণ্ডুয়ার উত্তর অংশে পীরপোখর নামে একটি গভীর ও বিরাট প্রাচীন পুষ্করিণী আছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কুতব সাহেব মসজিদটি মুহম্মদ শাহের রাজত্বে ১৭২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফতে খাঁ নামক একজন আফগান কর্তৃক নির্মিত হয়।

দ্র H. Blochmann, 'Notes on Arabic and Persian Inscriptions in the Hugli District', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol. XXXIX, part I, 1870; A. Cunningham, *Archaeological Survey of India Report*, vol. XV, Calcutta, 1882; L. S. S. O' Malley and M. Chakravarti, *Bengal District Gazetteers: Hooghly*, Calcutta, 1912; Percy Brown, *Indian Architecture: The Islamic Period*, Bombay, 1942; A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Dacca, 1961.

দেবলা মিত্র

পাণ্ডুরাজার ঢিবি বর্ধমান জেলার উপর সীমায় প্রবাহিত অজয় নদের দক্ষিণে অবস্থিত।

স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট ইহা 'রাজাপোতার ডাঙ্গা' অথবা 'রাজার ঢিবি' নামে পরিচিত। এই স্থানটি কিংবদন্তি অনুসারে পাণ্ডু নামে কোনও অজ্ঞাত রাজার স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত। এখানে কয়েকটি তাম্রাশ্মীয় মৃৎপাত্রের অংশ এবং ক্ষুদ্রাশ্মর ও নবাশ্মর আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়। এই আবিষ্কারের পর বারংবার উৎখননাদির ফলে এই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের চিত্র অনেকটা রচিত হইয়াছে।

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে খনন-কার্য অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬২-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢিবির উচ্চ এবং নিম্নাংশে শ্রেণীবদ্ধভাবে পরিখা রচনা করিয়া। এই পরিখাগুলি খননের ফলে প্রধানতঃ চারিটি যুগের পরিচয় পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে প্রথম তিনটিই প্রাগৈতিহাসিক কালের অন্তর্ভুক্ত এবং শেষ যুগটি ঐতিহাসিক পর্বের পরিচয় বহন করে।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি অতি প্রাচীন যুগের। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বি-সহস্রকে এখানকার প্রথম অধিবসতি। এই যুগের নিদর্শনাবলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'মুরাম' অথবা লাল কাঁকরপেটা বিভিন্ন গৃহতল, দুইটি মানব-সমাধি এবং কিছুসংখ্যক ক্ষুদ্রাশ্মর (মাইক্রোলিথিক) শল্ক (ফ্লেক) ও আয়ুধ এবং হাড়ের হাতিয়ার। বাঁশ কিংবা কাঠের খুঁটির চিহ্নযুক্ত গৃহতলগুলির আকৃতি দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, এইগুলি সম্ভবতঃ এক শ্রেণীর ছোট ধরনের ও গোলাকার কুটিরের ধ্বংসাবশেষ। এই সময়ে ব্যবহৃত

কৌলালসমূহের মধ্যে উল্লেখনীয় কুম্ভকারের চক্রে নির্মিত 'লাল-কালো' ও বাদামী মৃৎপাত্র এবং ধান্যের খোসা ও শীষ মেশানো হাতে তৈরি ধূসর মৃৎপাত্রাদি। এই সব আবিষ্কারের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম যুগে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বি-সহস্রকে অজয় উপত্যকায় ধানচাষের প্রচলন ছিল।

প্রথম যুগের পর পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে এক দীর্ঘস্থায়ী প্লাবনের চিহ্ন হিসাবে মূল বালুকার স্তর দেখা যায়। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, প্লাবনের পর এই স্থানটি সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয়। এই স্তরগুলির মধ্যে নিহিত মৃৎপাত্র, ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধ, হাড়ের অস্ত্রাদি ও তাম্রনিদর্শনগুলির বেশির ভাগই দ্বিতীয় যুগের অধিবসতির সাক্ষ্য দেয়, যাহার প্রথম অবস্থান এই পাললিক বালুকা-রাশির উপর।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় যুগে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার এক পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা দেয়। দ্বিতীয় যুগের গৃহগুলি একান্ত পারস্পরিক সান্নিধ্যে গড়িয়া ওঠে। গোলাকৃতি অথবা লম্বাকৃতি এই গৃহ অথবা কুটিরগুলি পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় নির্মিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইগুলির মেঝে মাকড়া-দানা পেটাই করিয়া নির্মিত, যদিও খনন-কালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে চুন-লেপা মসৃণ গৃহতল অথবা পোড়ামাটি জমানো চাতাল অথবা মেঝে অনাবৃত হইয়াছে। এই কুটিরগুলির দেয়াল ছিল প্রথম যুগের মত কাঠ, ছেঁচা বাঁশ ইত্যাদির উপর পুরু মৃন্ময় আস্তরণ দেওয়া। দ্বিতীয় যুগে একাধিকবার অগ্নিকাণ্ডের নিদর্শন পাওয়া যায়। একটি দগ্ধ গৃহতলে দেখা যায় মেঝে গাঁথা একটি 'লাল-কালো' মৃৎভাণ্ড ও একটি শূকরের চোয়াল। অপরাপর সম্ভাবনাকে বাদ দিলে অনুমান করা যায় যে, এখানে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বি-সহস্রকে গৃহপালিত শূকরের এক আচ্ছাদনগৃহ ছিল যাহা আকস্মিকভাবে অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় যুগে অধিবসতির প্রাবল্য প্রমাণিত হয় বিভিন্ন অংশে উপর্যুপরি রচিত ৭টি কিংবা ৮টি মেঝের দ্বারা, যাহাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা মৃৎপাত্রের নিদর্শন ও উল্লেখনীয় পুরাবস্তু। ১৯৬২-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উৎখননের ফলে এই যুগের স্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে ১৩টি মানবসমাধি, সেগুলির অধিকাংশ প্রথম যুগের মতই পূর্ব-পশ্চিমে শায়িত। দ্বিতীয় যুগের এই সমাধি-গুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য একটি পূর্ণাঙ্গ মানবের কঙ্কাল। এইটির শিরোদেশ ও পদযুগলের সান্নিধ্যে দেখা যায়, ২টি সমাধি-জ্ঞাপক মৃৎকুম্ভ যাহাদের মধ্যে পূর্বদিকের দৃষ্টান্তটি ছিল একটি উল্টানো 'লাল-কালো' মৃৎপাত্রের দ্বারা ঢাকা।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় যুগের স্তরসমূহে আবিষ্কৃত হইয়াছে মৃৎপাত্রের নিদর্শন। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত লোহিতোজ্জ্বল মৃৎপাত্র ও 'লাল-কালো' শ্রেণীর কোশীপাত্র এবং অপরাপর সুদৃশ্য কলস, ভাণ্ড ও তৈজসপত্রাদি। এই যুগের চিত্রিত লোহিতোজ্জ্বল মৃৎপাত্রের নিদর্শনগুলি ইতিহাস-পূর্বকালের সুচারু শিল্পমানসের সাক্ষ্য দেয় এবং প্রকৃতপক্ষে প্রতি-ফলিত করে নগরভিত্তিক এক অনুপম সভ্যতা ও সংস্কৃতির রুচি, বৈশিষ্ট্য ও অনুভূতিকে। এই সৌন্দর্য-মানসে স্বভাবতঃই নিহিত আছে তাম্রাশ্মীয় পর্বের বিস্মৃত অনুষ্ঠান-বোধ। শ্বেতাভ বর্ণমিশ্রিত কালো রঙে অথবা নিবিড় কৃষ্ণবর্ণে রচিত চিত্রণগুলির অধিকাংশই কারুকার্য-মূলক অথবা প্রতীকধর্মী। এইগুলির মধ্যে গোলাকার বেষ্টন-রেখা, ভরাট ত্রিভুজ-চিহ্ন, জালি, বিন্দুশ্রেণী, কৌণিক রেখা, দাঁড়ি, বরফি, বিচ্ছুরিত রেখা এবং তারকা ও বিহঙ্গের সম্ভাব্য প্রতীকচিত্র ইত্যাদি বিশেষ-ভাবে উল্লেখনীয়। এই শ্রেণীর মৃৎপাত্র ছাড়া শাদা রঙে চিত্রিত উজ্জ্বল খয়েরী কৌলাল (পটারি) এবং বাসন্তী রঙে আঁকা সুমসৃণ কৃষ্ণবর্ণের মৃৎপাত্রও দেখা যায়। এই কালে ব্যবহৃত 'লাল-কালো' মৃদ্ভাণ্ডগুলির কৃষ্ণোজ্জ্বল অভ্যন্তর-ভাগেও শ্বেতাভ চিত্রণ দেখা যায়। অজ্ঞাত প্রতীকধর্মী এই কারুকার্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে বিদ্যমান কৌণিক রেখা, দাঁড়ি, বিন্দু ও আঁকড়ি এবং অপরাপর চিহ্ন। 'লাল-কালো' মৃৎপাত্রের প্রবাহনালীযুক্ত ভাণ্ড (কোশী-পাত্র) ও চিত্রিত নিদর্শনগুলি নর্মদা-উপত্যকা (নাভ্দা টোলি), রাজস্থান (আহাড়), মধ্যপ্রদেশ (এরণ) ও মহারাষ্ট্রের (বাহাল) অনুরূপ বিভিন্ন কৌলাল-শ্রেণীর সঙ্গে তুলনীয়। দ্বিতীয় যুগের সংস্তরে আবিষ্কৃত অন্যান্য পুরাবস্তুগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমান্তরাল দুইধার বিশিষ্ট এবং চূড়াযুক্ত ক্ষুদ্রাশ্মর ছুরিকা, হাড়ের আয়ুধ, তামার অলংকার, পোড়ামাটির তকলি এবং শিমুলতুলা হইতে বোনা চিকন ও শুভ্র বস্ত্রের নিদর্শন। এ ছাড়া এই যুগের অন্যতম নিদর্শন অতীতের কোনও জলহস্তীর একটি সচ্ছিদ্র দন্ত (কবচ-জ্ঞাপক?) যাহা আজ হইতে আনুমানিক ৩ সহস্রাধিক বৎসর আগে আফ্রিকা কিংবা মাদাগাস্কার হইতে আনীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুগের স্তরে প্রাপ্ত কিছুপরিমাণ কাঠকয়লা-কার্বন ১৪ (C_{14}) পরীক্ষার দ্বারা খ্রীষ্টপূর্ব ১০১২±১২০ বছরের পুরাতন বলিয়া জানা যায়।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির তৃতীয় যুগে ব্যবহৃত হয় নবাশ্মর কুঠার, অঙ্গার-মিশ্রিত লোহার অস্ত্র এবং কালো রঙের মসৃণ মৃৎপাত্র। অবশ্য এই কালে ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধ এবং চিত্রিত লোহিতোজ্জ্বল ও 'লাল-কালো' মৃৎপাত্রের প্রচলন অব্যাহত থাকে। এই তৃতীয় যুগের উচ্চতম সংস্তরে আবিষ্কৃত এক সারি চুল্লির সঙ্গে দেখা যায় অঙ্গারমিশ্রিত ভস্মরাশি এবং ভগ্ন লৌহ অস্ত্র ও পিণ্ড। স্বভাবতঃই অনুমান করা সঙ্গত যে, এই চুল্লিগুলি একদা লৌহ দ্রবীকরণের জন্য ব্যবহৃত হইত।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির তৃতীয় যুগে ব্যবহৃত কোশীপত্রের মুখগুলি পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃততর ও কিছুটা খর্বাকৃতি এবং এই যুগে নির্মিত কৃষ্ণবর্ণের মসৃণ মৃৎপাত্রের গায়ে উপস্থিতি ঘটে খোদাই চিত্রের। এতদ্‌ভিন্ন, এই সময়ের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন একই কৃষ্ণবর্ণের মসৃণ কৌলালের 'সস্তম্ভ' থালি (ডিশ্‌-অন্‌-স্ট্যাণ্ড) যাহার সংখ্যাপ্রাচুর্য এই কালের বিবর্তিত সভ্যতাকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করে।

ধারাবাহিক খননকার্যের ফলে প্রতিভাত হইয়াছে যে, কোনও এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলেই তৃতীয় যুগের জীবনযাত্রার সমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় যুগের পর পাণ্ডুরাজার ঢিবি পরিত্যক্ত থাকে বহুদিন। ইহার প্রমাণ এখানকার বিচ্ছিন্ন স্তরপরম্পরা। পরে আদি ঐতিহাসিক যুগে মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষাণকালে এখানে পুনর্বার অধিবসতি স্থাপিত হয়। তখন এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে উত্তরদেশীয় কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল (নর্দার্ন ব্ল্যাক পলিশড ওয়্যার), লোহিতাভ তৈজসপত্র, ছাপযুক্ত মৃৎপাত্র ও অপরাপর নিদর্শন। সাম্প্রতিক-কালে পাণ্ডুরাজার ঢিবির সন্নিহিত অঙ্গে প্রসারিত ক্ষয়প্রাপ্ত ঢাল হইতে সম্রাট কণিষ্কের একটি স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির চতুর্থ যুগের উচ্চতর সংস্তরে পোড়া ইটে নির্মিত গৃহাদি ও প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রমাণ-দৃষ্টে মনে হয় কাল এইগুলির নির্মাণকাল গুপ্তযুগ ও তৎপরবর্তী।

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

পাণ্ড্য দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন দেশ। কাত্যায়নের বার্তিকে, মেগাস্থিনিসের বিবরণে, অশোকানুশাসনে, টলেমির ভূগোলে, কাব্যমীমাংসায়, রামায়ণে ও মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। পাণ্ড্যরাজ্য কাবেরী নদীর ব-দ্বীপের দক্ষিণে মাদুরাই, তিন্নেভেল্লি জেলা, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ও কোয়েম্বাটোর ও কোচিনের অংশবিশেষ লইয়া গঠিত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল মাদুরাই ও বন্দর ছিল কোরকাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও হিউএন্‌-ৎসাঙের বর্ণনায় পাণ্ড্যরাজ্যে প্রভূত মুক্তা পাওয়া যায় বলা হইয়াছে। হিউএন্‌-ৎসাঙ্‌ এই রাজ্যের অধিবাসীদের কৃষ্ণবর্ণ, বিভিন্নধর্মী, সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন, কিন্তু বাণিজ্যে সুদক্ষ বলিয়াছেন। স্ট্রাবোর মতে খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতকে পাণ্ড্যরাজ রোমক সম্রাট অগাস্টাসের নিকট দূত প্রেরণ করেন। পাণ্ড্যরাজ্য একসময়ে কলভ্রগণের দখলে আসে। কডুঙ্গোন ও তাঁহার উত্তরাধিকারী কলভ্রগণকে বিতাড়িত করেন। অরিকেশরী পরাঙ্কুশ মারবর্মন ও প্রথম রাজসিংহ পল্লব ও চালুক্যগণকে পরাজিত করেন।

প্রথম জটিলবর্মন (৭৬৫-৮১৫ খ্রী) প্রথম পাণ্ড্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি পল্লব ও চেরগণকে পরাজিত করেন এবং তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপল্লী, সালেম, কোয়েম্বাটোর জেলা ও দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুর দখল করেন। পরবর্তী রাজা শ্রীমার শ্রীবল্লভ কুম্ভকোনমে গঙ্গ, পল্লব, চোল, কলিঙ্গ ও মগধগণের সংযুক্ত সৈন্যদলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তেল্লাড় ও অরিচিতের যুদ্ধে পল্লবগণের নিকট পরাজিত হন। পরবর্তী পাণ্ড্যরাজ বরগুণ (৮৬২-৬৮ খ্রী) শ্রীপুড়ম্বিয়মে পল্লবগণের হস্তে পরাজিত হন। চোলরাজ ১ম পরান্তকের নিকট পাণ্ড্যরাজ ২য় রাজসিংহ দারুণভাবে পরাজিত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া সিংহলে আশ্রয় লন। ইহার পর পাণ্ড্যরাজ্য চোলরাজ ১ম রাজরাজের দখলে আসে (তাঞ্জোরলিপি)।

মারবর্মন সুন্দর পাণ্ড্য (১২১৬-৩৮ খ্রী) দ্বিতীয় পাণ্ড্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। জাতবর্মন সুন্দর পাণ্ড্য (১২৫১-৬৮ খ্রী) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি চের, হয়সাল, চোল, কাডব ও সিংহল রাজগণকে পরাজিত করেন ও তাঁহার সাম্রাজ্য সিংহল হইতে নেল্লোর ও কুদ্দাপা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ইহার পরবর্তী পাণ্ড্য-রাজ মারবর্মন কুলশেখর (১২৬৮-১৩১০ খ্রী)। বিদেশীয় পর্যটক মার্কো পোলো ও মুসলমান ঐতিহাসিক ওয়াসফ তাঁহার ক্ষমতা ও বিপুল ঐশ্বর্যের বর্ণনা করিয়াছেন। কুলশেখরের পরে গৃহবিবাদ দেখা দেয় ও আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি কাফুর পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন (১৩১২ খ্রী)।

পাণ্ড্যরাজগণ সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনটি সঙ্গম বা বিদ্বজ্জনসভা পাণ্ড্যরাজ্যেই হয়। প্রথম সঙ্গমের ৭ জন পাণ্ড্যরাজ সুকবি ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

পাতা উদ্ভিদের অঙ্গবিশেষ। অপুষ্পক উদ্ভিদশ্রেণীর মধ্যে থ্যালোফাইটার দেহে পত্রের বিকাশ ঘটে নাই; অন্যান্য অপুষ্পক উদ্ভিদ এবং সকল সপুষ্পক উদ্ভিদের দেহেই পাতা থাকে।

কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখার প্রত্যেক পর্বে এক বা একাধিক পাতা থাকে। ('কাণ্ড' দ্র)। পর্বে পত্রের বিন্যাস নানাপ্রকার হইতে পারে। একই পর্বে দুই বা ততোধিক পত্র কাণ্ডকে ঘিরিয়া সজ্জিত থাকিলে তাহাকে আবর্ত পত্রবিন্যাস বলে। প্রত্যেক পর্বে পরস্পরের বিপরীত মুখে দুইটি পত্র থাকিলে তাহাকে অভিমুখ পত্র-বিন্যাস বলে। প্রতি পর্বে একটি করিয়া পাতা তাহার পরবর্তী পর্বের পাতাটির তুলনায় ভিন্নমুখে সজ্জিত থাকিলে তাহাকে একান্তর পত্রবিন্যাস বলে।

সাধারণভাবে পাতা হরিদ্বর্ণ, পাতলা ও প্রশস্ত হইয়া থাকে। পাতার সবুজ প্রশস্ত অংশটিকে ফলক বলে। পাতার অপর দুই অংশ বৃন্ত ও পত্রমূল। ফলকটি বিভিন্ন আকৃতির ও তাহার প্রান্ত সরল বা নানাভাবে খণ্ডিত হইতে পারে। কোনও কোনও পত্রের বৃন্ত থাকে না (অবৃন্তক পত্র), যথা—আকন্দ। কোনও কোনও পত্রের ফলকের প্রায় অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অথচ তাহার বৃন্তটি প্রশস্ত ফলকের মত বিকশিত হইয়া ওঠে; এরূপ বৃন্তকে পর্ণবৃন্ত বলে, যথা—বাবলাজাতীয় কোনও কোনও গাছের পাতা। অনেক সময়ে পত্রমূলে দুইটি ক্ষুদ্র পত্রাকৃতি বা অন্য আকৃতির অংশ যুক্ত থাকে; ইহাদের উপপত্র বলে এবং এরূপ পাতাকে সোপপত্রিক বলে, যথা—জবার পাতা।

অবস্থা ও কার্যভেদে পাতার আকৃতিভেদ ঘটে। উদ্ভিদের বীজে ভ্রূণসংলগ্ন পাণ্ডুবর্ণ বীজপত্র, আদা বা পিঁয়াজের কন্দে বাদামিবর্ণ শল্কপত্র, ফুলের দল, বৃত্যংশ, পুংকেশর, গর্ভপত্র প্রভৃতি অংশ এবং মঞ্জরীপত্র পাতার এরূপ আকৃতিভেদের উদাহরণ।

নানাপ্রকার পরিবর্তিত পত্র ভিন্নভিন্ন কার্যে সহায়তা করে। ফণিমনসার কাঁটা ('কাঁটা' দ্র), মটরের আকর্ষ, ঘটপত্রীর পতঙ্গশিকারের কলস ('পতঙ্গভুক উদ্ভিদ' দ্র) প্রভৃতি অঙ্গ পাতারই পরিবর্তিত আকার। যথাক্রমে আত্মরক্ষায়, আরোহণে ও খাদ্যসংগ্রহে ইহাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

যে পাতার একটিমাত্র ফলক তাহাকে সরলপত্র এবং যাহার ফলক দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত তাহাকে যৌগপত্র বলে।

যৌগপত্রের ফলকের প্রতি খণ্ড পত্রক নামে অভিহিত হয়। পত্রকগুলি বৃন্তের একই স্থল হইতে উৎপন্ন হইয়া করতলের আকারে চারিদিকে সজ্জিত থাকিলে সেরূপ যৌগপত্রকে করতলাকার যৌগপত্র বলে, যথা—শিমুলের পাতা। পত্রকগুলি বৃন্তের উভয় পার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একের পর এক পাখির পালকের মত সজ্জিত থাকিলে তাহাকে পক্ষল যৌগপত্র বলে, যথা—তেঁতুলের পাতা।

পাতার বিশেষতঃ নিম্নপৃষ্ঠে পত্ররন্ধ্র নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বর্তমান। এগুলির মধ্য দিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন ও জলীয়বাষ্প পত্র হইতে বহির্বায়ুতে নিষ্ক্রান্ত হয় অথবা বায়ু হইতে পাতায় প্রবেশ করে। ইহার ফলেই সালোকসংশ্লেষ (ফোটোসিন্‌থেসিস), বাষ্পমোচন (ট্রান্‌স্‌পিরেশন), শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি সংঘটিত হয়। ('গাছ' দ্র)। পাতায় ক্লোরোফিল নামক যে সবুজ রঙ্গক দ্রব্য বর্তমান, সূর্যালোকে তাহার সাহায্যে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয় ('ক্লোরোফিল' ও 'সালোকসংশ্লেষ' দ্র)।

উপরি-উক্ত কার্যগুলি ব্যতীত অঙ্গজজনন ('পাথরকুচি' দ্র), পতঙ্গশিকার ('পতঙ্গভুক উদ্ভিদ' দ্র), খাদ্যসঞ্চয় ('পিঁয়াজ' দ্র) প্রভৃতি কার্যেও পাতা অংশগ্রহণ করিয়া থাকে।

জল, খাদ্যরস প্রভৃতি বহনের জন্য যে সকল নালিকা কাণ্ড হইতে বৃন্তের মধ্য দিয়া পাতায় গিয়া ফলকের নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাদেরই পাতায় শিরার আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। পাতায় শিরাগুলির বিন্যাস সমান্তরাল বা জালের মত জটিল হইতে পারে।

পাতাবাহার এরণ্ডগোত্রের (ফ্যামিলি-এউফোরবিয়াসিঈ, Family-Euphorbiaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম কোদীয়ম ভারিয়েগাতম (*Codaeum Variegatum*)। পাতাবাহার গাছ নানা প্রকারের (ভ্যারাইটি) হয়। পাতার বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ণ পাতাবাহারের বৈশিষ্ট্য। পাতার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পরিমাণে ক্লোরোফিল, ক্যারোটিন, জ্যান্‌থোফিল, অ্যান্‌থোসায়ানিন প্রভৃতি রঙ্গক পদার্থ (পিগ্‌মেণ্ট) থাকার জন্যই পাতায় সবুজ, লাল, হলুদ প্রভৃতি বর্ণের সমাবেশ দেখা যায়। পাতার আকৃতিও বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন রকমের হয়। শিশুদিগের মূত্রাশয়ের পীড়া-জনিত পেটের যন্ত্রনায় পাতাবাহার পাতার পুলটিস লাগানো হয়।

তারাপদ চট্টোপাধ্যায়

পাতিমোক্‌খ, প্রাতিমোক্ষ বৌদ্ধধর্মের শীলবিষয়ক শিক্ষা আমরা বিনয়পিটকে পাই। এই শীল সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের প্রধান অংশগুলি পাতিমোক্‌খে আছে। পাতিমোক্‌খ বৌদ্ধসঙ্ঘের দণ্ডবিধি (Penal code) এবং বিনয়পিটকের সারাংশস্বরূপ।

এই মূল্যবান সংকলনটি বিনয়পিটকের সুত্তবিভঙ্গ নামক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। বিনয়পিটকের ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ।

পাতিমোক্‌খ মোট ৮টি বিভাগে বিভক্ত। ইহাতে মোট ২২৭টি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রম-অনুসারে এই ৮টি বিভাগ হইল :

১. পারাজিক—সঙ্ঘের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ৪টি বিষয়ে ৪টি নিয়ম এই অংশে আছে; যথা মৈথুন, চৌর্য, প্রাণিহত্যা এবং নিজের উপর অলৌকিক ক্ষমতার আরোপ। যে কোনও একটিকে লঙ্ঘন করিলেই অপরাধী ভিক্ষুকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করা হয় ২. সঙ্ঘাদিসেস (সঙ্ঘাদিশেষ)—ইহাতে নিয়মের সংখ্যা মোট ১৩টি। এই অপরাধে অপরাধী ভিক্ষু কয়েকটি অধিকার হারায়। কিছুদিন পৃথক্‌ভাবে থাকিবার পর আবার তাহাকে সঙ্ঘে গ্রহণ করা হয়। এই অপরাধ হইতে মুক্তির জন্য আদিতে ও শেষে সঙ্ঘের উপর নির্ভর করিতে হয় ৩. অনিয়ত—২টি নিয়ম ইহার অন্তর্গত। অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া এই বিধির প্রয়োগ করা হয় ৪. নিস্‌সগ্‌গিয় পাচিত্তিয় (নৈসর্গিক প্রায়শ্চিত্তিক)—ইহাতে নিয়মের সংখ্যা মোট ৩০টি। যাহার জন্য অপরাধ তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ৫. পাচিত্তিয় (প্রায়শ্চিত্তিক)—অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তযোগ্য অপরাধ। ৯২টি নিয়ম ইহার অন্তর্গত ৬. পাটিদেসনিয় (প্রতিদেশনীয়)—অর্থাৎ স্বীকরণীয় অপরাধ। এই বিভাগে ৪টি নিয়ম আছে ৭. সেখিয় (শৈক্ষ্য)—শিক্ষণীয় সদাচারবিষয়ক ৭৫টি নিয়ম এই অংশে উল্লিখিত ৮. অধিকরণসমথ—ভিক্ষুসঙ্ঘে বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইলে কিরূপে তাহার মীমাংসা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক ৭টি বিধান এই অংশে বলা হইয়াছে।

সকল দেশের সকল বৌদ্ধসমাজেই পাতিমোক্‌খের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। প্রতি মাসে দুইবার, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়, ভিক্ষুসঙ্ঘের 'উপসথ'-দিনে পাতিমোক্‌খ আবৃত্তি করিতে হয়। উপস্থিত ভিক্ষুদের মধ্যে যদি কেহ কোনও অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন, তবে তাহাকে বিধি অনুসারে শাস্তি গ্রহণ করিয়া পাপমুক্ত হইতে হয়। ভিক্‌খুনীদের জন্য নির্দিষ্ট আছে ভিক্‌খুনী-পাতিমোক্‌খ।

দ্র বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ভিক্‌খুপাতিমোক্‌খ, কলিকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ ; Nalinaksha Dutt, *Early Buddhist Monachism*, London, 1924 ; M. Winternitz, *A History of Indian Literature*, vol. II, Calcutta, 1933 ; D. Bhagavat, *Early Buddhist Jurisprudence*, Poona, 1939.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাতিয়ালা পাঞ্জাব রাজ্যের উত্তর-পূর্বে শিবালিক পাহাড়ের সীমানায় অবস্থিত একটি জেলা। ইহার বর্তমান (১৯৬১ খ্রী) আয়তন প্রায় ৫৮৫৬ বর্গকিলোমিটার। এই জেলার উত্তর-পূর্বে ও পূর্বে হরিয়ানা রাজ্যের অম্বালা জেলা, দক্ষিণে হরিয়ানা রাজ্যের কর্নাল, পশ্চিমে এবং উত্তর-পশ্চিমে লুধিয়ানা জেলা অবস্থিত।

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে জেলাটিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়: ১. হিমালয় এবং সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমির মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চল ২. পাঞ্জাবের পূর্ব সমভূমির ব্যাপক অঞ্চল—জেলার অধিকাংশ এলাকাই এই অংশের অন্তর্গত। পাহাড়ী অঞ্চলের নদী-উপত্যকার স্থানীয় নাম 'দুন'।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিখাত এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। শিবালিক পর্বতের এই উপত্যকা ও পার্শ্ববর্তী অধিকাংশ অঞ্চলই অ্যাজোয়িক যুগের রূপান্তরিত শিলাদ্বারা গঠিত। ইহা ব্যতীত সমগ্র অঞ্চলই সিন্ধু-গঙ্গা অববাহিকার অন্যান্য নদীগুলির দ্বারা বাহিত পললমৃত্তিকা-গঠিত সমভূমি। পাহাড়ী অংশের কোথাও কোথাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আকারে টার্‌শিয়ারি ও উচ্চ টার্‌শিয়ারি যুগের সঞ্চিত শিলাস্তর দেখা যায়। এই জেলার মধ্য দিয়া বৃহৎ কোনও নদী প্রবাহিত হয় নাই ; দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত ঘর্ঘর এই জেলার প্রধান নদী। বৃষ্টিপাত বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম ; পাহাড়ী এলাকার বার্ষিক গড় ১৫২৪-১৭৭৮ মিলিমিটার, পাদদেশে ১০১৬ মিলিমিটার এবং পাতিয়ালা শহরে ৬৩৫ মিলিমিটার। দক্ষিণ-পশ্চিমে বৃষ্টিপাত কম। পাহাড়ী এলাকার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে, যেখানে বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য আছে ও উচ্চতা আছে, সেইস্থানে পর্ণমোচী ও মিশ্র বনভূমি দেখা যায়। উচ্চ অংশে দেবদারু, ওক, পাইন এবং নিম্ন অংশে চেরি, পিপুল, নিম ও বাঁশ উল্লেখযোগ্য। বনভূমি হইতে কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ করা হয়। জঙ্গলে হরিণ, চিতাবাঘ, নেকড়ে, শৃগাল, নানাপ্রকার পাখি ও সর্পাদি দেখা যায়।

পাহাড়ী অঞ্চলের শ্লেট জেলার অন্যতম প্রধান খনিজ সম্পদ। তামা, চুনা পাথর, বেলে পাথর, কঙ্কর, সীসা, অভ্র প্রভৃতির সন্ধানও জেলার বিভিন্ন অংশে পাওয়া গিয়াছে।

জেলাটির প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিখ-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য এই অঞ্চলে প্রবল ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে শিখ-মহারাজা সৈন্য দিয়া তদানীন্তন ইংরেজ শাসকদিগকে সহায়তা দান করিয়াছিলেন; পরিবর্তে ইংরেজগণ মহারাজাকে জমি দান করিয়াছিলেন। মহারাজা রাজ্যটিকে স্থানীয় রাজ্যের পর্যায়ে উন্নীত করেন। দেশবিভাগের পরবর্তী কালে ইহা পাঞ্জাব রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

জেলার জনসংখ্যা (১৯৬১ খ্রী) ১০৪৮৭৭৮। পাতিয়ালা, ভাতিণ্ডা, নরনেউল ও বাসী প্রধান শহর। গুরুমুখী বা পাঞ্জাবী প্রধান ভাষা। অন্যান্য ভাষার মধ্যে উর্দু ও পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ী ভাষার প্রচলন আছে।

সমগ্র রাজ্যে যেসকল উৎকৃষ্ট কৃষিক্ষেত্র আছে এই জেলা তাহার মধ্যে অন্যতম।

বৃষ্টিপাত পশ্চিমাংশে স্বল্প হওয়ার জন্য ঐ স্থানে সেচ-প্রকল্পের গুরুত্ব সমধিক। পশ্চিম যমুনাখাল, সিরহিন্দখাল ব্যতীত পারসীক চক্রের সাহায্যেও জমিতে জল সেচ করা হয়। পাহাড়ী অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য ভূমিক্ষয় সমস্যা প্রবল। প্রধান শস্য গম, বাজরা, যব, ছোলা, ভুট্টা ও ধান এবং অন্যান্য ফসলের মধ্যে তুলা ও ইক্ষু প্রধান। তৈলবীজের চাষ ব্যাপক। উন্নত সমবায়ব্যবস্থা কৃষিব্যবস্থা, বিক্রয়ব্যবস্থা ও যাতায়াতব্যবস্থার জন্য কৃষিজ পণ্যাদির ব্যবসায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জেলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে কৃষিজ পণ্য অগ্রগণ্য। অপর দ্রব্যের মধ্যে ঘি ও চুনা পাথর প্রধান।

আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কলকব্জা, জ্বালানি তৈল ও যন্ত্রপাতি প্রধান।

জেলার শিল্পপ্রকল্পগুলির মধ্যে কৃষিজ কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল শিল্পই প্রধান। ইহা ব্যতীত সোনা-রুপার কাজ, জরির কাজ, হাতের নকশার কাজ, বস্ত্রবয়ন, রেশমের কাজ, পিতল-কাঁসার কাজ, ধাতুর কাজ উল্লেখযোগ্য। ইদানীন্তন সরকারি বাস্তুশিল্প (কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক্‌স) ব্যাপক বিস্তারলাভ করিয়াছে, ছাপাখানার সংখ্যাও প্রচুর।

ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পগুলির মধ্যে বস্ত্রবয়ন, মৃৎশিল্প, চর্মশিল্প, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিজলীর প্রয়োগ ব্যাপক হওয়ায় কুটিরশিল্পে বিদ্যুতের প্রয়োগে শিল্পসম্ভাবনা প্রচুর।

যোগাযোগ ব্যবস্থাও সুষ্ঠু। রাজ্যের রাজধানী চণ্ডীগড় হইতে সড়কপথে পাতিয়ালা শহরের দূরত্ব মাত্র ৫৪ কিলোমিটার।

পাতিয়ালা (৩০°২০′ উত্তর এবং ৭৬°২৮′ পূর্ব) জেলার প্রধান শহর ও শাসনকেন্দ্র পাতিয়ালা নদীর পশ্চিম তীরে নিম্নভূমির মধ্যে অবস্থিত। আম্বালা শহর হইতে দূরত্ব ৫৪ কিলোমিটার; অন্যান্য অংশের সহিত সড়কপথে যোগাযোগ আছে। পাতিয়ালার নৃপতিদিগের রাজধানী হিসাবে শহরটির খ্যাতি আছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনসংখ্যা ১২৫২৩৪।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে ১১শ শতাব্দীর প্রাচীন কারুকার্যমণ্ডিত শিবমন্দির, প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, কবরখানা, মন্দির, বরাদারী উদ্যান প্রভৃতি জেলার উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য। শহরের মধ্যভাগে প্রাচীন প্রাসাদটি অবস্থিত। ইহা ব্যতীত মধ্যযুগীয় দুর্গ ও গুরুদ্বার বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। মোতীবাগ প্রাসাদের কারুকার্য, সংগ্রহশালা ও শিখযুদ্ধের অস্ত্রসম্ভার দর্শকদের মন সহজেই জয় করে।

জেলার বিভিন্ন অংশে গো-মহিষের মেলা ও ১ বৈশাখের সংগতপুরা-গুরুদ্বারের মেলা উল্লেখযোগ্য।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Punjab*, vol. II, Calcutta, 1908.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

পাথরকুচি ক্রাসুলাসিঈ গোত্রের (Family-Crassulaceae) অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৩০-১০০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ব্রিয়োফিল্লম কালিকিনম (*Bryophyllum Calycinum*)। পাথরকুচি গাছ সাধারণতঃ উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে জন্মায়। রোমশ কাণ্ডের গাত্র হইতে ডিম্বাকৃতি, খাঁজকাটা প্রান্তযুক্ত, প্রায় ৫-১৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ ও পুরু পাতা বাহির হয়। মাটিতে রাখিলে পত্রপ্রান্ত হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয় এবং অঙ্গজ-জনন পদ্ধতির সাহায্যে নূতন গাছ উৎপন্ন হয়। শীতকালে প্রায় ৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ রক্তবর্ণ ফুল ধরে। গ্রীষ্মে শুঁটির মত বহুবীজযুক্ত ফল ধরে। ক্ষতস্থানে অগ্নিদগ্ধ পাতা প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫০।

পাথুরি রোগ দেহের নানা জৈব বা অজৈব রাসায়নিক পদার্থ রোগজনিত কারণে জমাট বাঁধিয়া পাথরের ন্যায় কঠিন পিণ্ডে পরিণত হইতে পারে, ইহাকেই পাথুরি রোগ বলে। শরীরের সর্বত্রই পাথুরি হইতে পারে, তবে পিত্তস্থলী, পিত্তনালী, বৃক্ক, গবিনী, মূত্রাশয়, মূত্রনালী, লালানালী, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি অঙ্গেই ইহার প্রাদুর্ভাব সমধিক। পিত্তস্থলী ও তৎসংশ্লিষ্ট অঙ্গাদির পাথুরিতে উদরের দক্ষিণ পার্শ্বের ঊর্ধ্বভাগে অসহ্য যাতনা হয় এবং রোগীর রক্ত পিত্তদুষ্ট হওয়ায় ন্যাবা হয়। বৃক্ক ও আনুষঙ্গিক অঙ্গাদির পাথুরিতে কোমরের উপর হইতে অসহ্য বেদনা উৎপন্ন হইয়া তলপেট বা জননেন্দ্রিয় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়, সময়ে সময়ে রক্তপ্রস্রাবও (হিমাচুরিয়া) হয়। লালানালীতে পাথুরি হইলে লালা-নির্গমনে ব্যাঘাত ঘটিয়া লালাগ্রন্থিটি ফুলিয়া ওঠে ও খাদ্যচর্বণের সময়ে বেদনা হয়। অনেক ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসার দ্বারা ক্লিষ্ট অঙ্গাংশ বা পাথুরি অপসারণ করিয়া পাথুরি রোগের চিকিৎসা করা যায়।

অশোক বাগচী

পান গোলমরিচ গোত্রের (ফ্যামিলি-পিপেরাসিঈ, Family-Piperaceae) অন্তর্ভুক্ত লতাজাতীয় দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম পিপের বেৎলে *(Piper betle)*। ভারতের উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চল, সিংহল ও মালয়েশিয়া প্রভৃতি স্থানে ইহার চাষ হয়। ছাঁচ, মিঠে, বাংলা, দেশী, মজাল, কড়ুই প্রভৃতি নানা জাতের পান আছে। অঙ্গজ-জনন (ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকৃশন) পদ্ধতিতে পানের বংশবৃদ্ধি হয়। উদ্ভিদটির কাণ্ডের গ্রন্থিতে অস্থানিক মূল (অ্যাড্‌ভেন্‌টিশিয়াস রুট) জন্মায়। গ্রন্থির অস্থানিক মূল ও পাতাসহ কাণ্ডের কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া আলগা মাটিতে পুঁতিয়া দিলে ইহা হইতেই নূতন শাখাপ্রশাখা বাহির হইয়া গাছ বাড়িয়া চলে। ছায়ায় পানগাছের লতানে স্বভাব বৃদ্ধি পায়।

পানের পাতা চুন, খয়ের, সুপারি ও অন্যান্য মশলা-সহযোগে চর্বণের রীতি ভারতে সুপ্রচলিত। পানের রস পরিপাক কার্যের সহায়ক, উত্তেজক ও ধারক। ফোড়া, স্তনস্ফীতি প্রভৃতিতে পান দিলে সুফল পাওয়া যায়।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫২ ; J. D. Hooker, *Flora of British India*, vol. V, England, 1885.

কালীপদ সরকার

পান মাঙ্গলিক বস্তুরূপে পরিগণিত। আদর-আপ্যায়নের উপকরণ হিসাবেও বহুল ব্যবহৃত। অতিথি-অভ্যাগত, বিশেষ করিয়া সধবা মহিলাদিগকে পান দিয়া অভ্যর্থনা করার রীতি পূর্বে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। ভোজনান্তে অতিথিকে পান দেওয়ার প্রথা আছে। পান সাজা মেয়েদের কর্তব্যকর্মের মধ্যে একটি। অতিথিকে সাজা পান দেওয়ার নিয়ম সর্বত্র ছিল না, অতিথিরা নিজেরাই পান সাজিয়া লইতেন। পান সাজার সরঞ্জাম প্রতি গৃহস্থের ঘরে থাকিত। আধুনিক সমাজে পানের ব্যবহার কমিয়া যাইতেছে। শাস্ত্রমতে পান আমিষ, তাই বিধবাদের পক্ষে পানের ব্যবহার নিষিদ্ধ ; তবে অনেকের মধ্যে ইহার ব্যবহার প্রচলিত। দেবপূজার উপকরণের মধ্যে পান অন্যতম। দেবপূজায় পানের সহিত খয়ের ও চুন ব্যবহৃত হয় না।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পানা জলজ গুল্ম। কচুরিপানা, টোকাপানা, ক্ষুদিপানা, ইঁদুরকানিপানা প্রভৃতি নানা জাতের পানা আছে। অঙ্গজ বৃদ্ধির ফলে ভাসমান পানাগুলি দ্রুত জলাশয় ঢাকিয়া ফেলে।

কচুরিপানা পোন্‌তেদেরিয়াসিঈ গোত্রের (Family-Pontederiaceae) অন্তর্ভুক্ত একবীজপত্রী উদ্ভিদ। বিজ্ঞান-সম্মত নাম ইকোর্‌নিয়া ক্রাসিপিস। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল ইহার আদি জন্মভূমি। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র খাল, বিল, নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের মিষ্ট জলে ইহার প্রকোপ আছে। বাংলা ও আসামের প্রায় প্রত্যেক জলাশয়েই কচুরিপানা দেখা যায়। কচুরিপানা অচিরেই জলাশয়ের উপরিভাগ ঢাকিয়া ফেলিয়া অপেক্ষাকৃত ছোট গাছের মৃত্যু ঘটায়, মৎস্যচাষ এবং নৌকাচালনাও অসম্ভব করিয়া তোলে। ভাসমান কাণ্ডের পর্ব হইতে উপরের দিকে গুচ্ছাকারে বড় বড় সবুজ পাতা এবং নীচের দিকে কেশগুচ্ছের ন্যায় অস্থানিক মূল বাহির হয়। পাতার বৃন্ত ও কাণ্ড বায়ুপূর্ণ বলিয়া গাছগুলি সহজে ভাসিতে পারে। ফুলের ১৫-২০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ মঞ্জরীতে ৮-৩৫টি ফিকা নীল-রক্তিমাভ নয়নমনোহর ফুল হয়। পরাগসংযোগ ও নিষিক্তকরণ সমাপ্ত হইলেই পাপড়ি ঝরিয়া পড়ে। কেবল যেসকল মঞ্জরীর দণ্ড নিষিক্তকরণের পর জলমধ্যে নুইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যেই বীজ হয়। জুন-জুলাইয়ে বীজ হইতে

অঙ্কুরোদ্‌গম ও উদ্ভিদের বিস্তারলাভ ঘটে ; ৩-৪ মাস পরে পুষ্পোদ্‌গম হয়।

টোকাপানা ওল গোত্রের (ফ্যামিলি-আরাসিঈ, Family-Araceae) অন্তর্ভুক্ত একবীজপত্রী উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম পিস্‌তিয়া স্ত্রাতিয়োতেস (*Pistia stratiotes*)। একা বা কচুরিপানার সহিত নানা জলাশয়ে ইহাকে দেখা যায়। আকারে কচুরিপানা অপেক্ষা অনেক ছোট। পাতা, মূল ও কাণ্ডের গঠনে কচুরিপানার সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে। গ্রীষ্মের শুরু হইতে ফুল ফোটে এবং বর্ষার পর গাছে ফল ধরে। ঔষধ হিসাবে টোকাপানার বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

ক্ষুদিপানা লেম্‌নাসিঈ গোত্রের (Family-Lemnaceae) অন্তর্ভুক্ত একবীজপত্রী উদ্ভিদ। অতিক্ষুদ্র ক্ষুদিপানার ২-৭ মিলিমিটার দীর্ঘ পাতা ও একটিমাত্র ছোট মূল থাকে। মে হইতে জানুয়ারির মধ্যেই ইহার ফুল ফোটে ও ফল ধরে। ভারতের সর্বত্র ইহাকে দেখা যায়। সমগোত্রীয় মূলহীন উল্‌ফিয়া গাছকেও সময়ে সময়ে ক্ষুদিপানার সহিত ভাসিতে দেখা যায়।

ইঁদুরকানিপানা সাল্‌ভিনিয়াসিঈ গোত্রের (Family-Salviniaceae) অন্তর্ভুক্ত জলজ ফার্ন। বিজ্ঞান-সম্মত নাম সাল্‌ভিনিয়া কুকুল্লাতা (*Salvinia cucullata*)। মূলহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপুষ্পক গাছগুলিকে জলাশয়ে প্রচুর দেখা যায়। সমগোত্রীয় আজোল্লা পিন্নাতা (*Azolla pinnata*) নামে জলজ ফার্নকেও বহু জলাশয়ে ঘনভাবে ভাসিতে দেখা যায়।

দ্র K. Subramanyam, *Aquatic Angiosperms*, New Delhi, 1961.

সন্তোষকুমার পাইন

পানিহাটী (২২°৪২′ উত্তর ৮৮°২২′ পূর্ব) চব্বিশ পরগনা জেলার একটি শহর। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর একটি কারখানা এই স্থানে আছে। বর্তমানে শহরটি পৌরশাসনের অন্তর্গত। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে শহরের জনসংখ্যা ছিল ৯৩৭৪৯।

পানিহাটী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অতি পবিত্র তীর্থ। ইহা চৈতন্যদেবের পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট নামে খ্যাত। রাঘব পণ্ডিতের পূজিত মদনমোহন বিগ্রহ এখানে নিত্য পূজিত হয়। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ এখানে গঙ্গার তীরে একটি ঘাটে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া নিকটবর্তী প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করেন। সেই প্রাচীন ঘাটটি আজও বর্তমান আছে। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এখানে 'দণ্ড মহোৎসব' অনুষ্ঠিত হয়।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

পান্না, ধাত্রী রাজপুতানার সম্রান্ত খিচি-বংশীয় পান্না রানা সংগ্রামসিংহের শিশু-পুত্র উদয়সিংহের ধাত্রীপদে নিয়োজিত হন। উদয় ৫ বৎসর বয়সে পিতৃহারা হন। সর্দারগণ অপ্রাপ্তবয়স্ক উদয়ের অছি হিসাবে রাজ্যশাসন পরিচালনা করিবার নিমিত্ত পৃথ্বীরাজের পুত্র বনবীরকে চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। রানা হইবার পর বনবীর সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে দূর করিয়া নিজে রাজা হইবার জন্য কৃতসংকল্প হন। ধাত্রী পান্না উদয়ের বিপদ উপলব্ধি করিলেন। একটি ঝুড়ির মধ্যে বন্যবৃক্ষ-পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া নিদ্রিত শিশু উদয়কে নাপিতের সাহায্যে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহিরে পাঠাইলেন এবং উদয়ের পরিত্যক্ত শয্যায় আপন শিশুপুত্রকে রাখিয়া দিলেন। বনবীর উদয়সিংহ ভাবিয়া পান্নার সন্তানকে হত্যা করেন।

পান্না ক্ষৌরকারের নিকট হইতে উদয়সিংহকে লইয়া কমলমীরের শাসনকর্তা আশা-শার হস্তে রাজকুমারকে অর্পণ করিয়া উদয়সিংহের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ধাত্রী পান্না নিজের সন্তানের প্রাণ বিনিময়ে প্রভুর পুত্রকে রক্ষা করিয়া যে অপূর্ব ত্যাগ ও কর্তব্যের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

অশোকা সেনগুপ্ত

পাবনা (২৩° ৪৯′-২৪° ৪৫′ উত্তর ও ৮৯°১′-৮৯° ৫৩′ পূর্ব) পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের রাজশাহী বিভাগের জেলা। ইহার আয়তন ৪৮৬১ বর্গকিলোমিটার (১৮৭৭ বর্গমাইল)। জেলাটির দক্ষিণে কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর, উত্তরে বগুড়া, পূর্বে ময়মনসিংহ ও ঢাকা এবং পশ্চিমে রাজশাহী জেলা অবস্থিত।

সমগ্র জেলাটি পলিমাটিগঠিত একটি নিম্ন সমভূমির অন্তর্গত। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে নদীগুলি মজিয়া জলাভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। সিরাজগঞ্জ মহকুমায় নদীগুলি অপেক্ষাকৃত নবীন। জেলার প্রধান নদী পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা। পদ্মার প্রধান শাখানদী ইছামতী পাবনা শহরের পার্শ্ব দিয়া হুড়াসাগর নদীতে পড়িতেছে। অন্যান্য নদীর মধ্যে করতোয়া ও বড়াল উল্লেখযোগ্য। পূর্ব দিকে

যমুনা নদী ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলার সীমা দিয়া ও পদ্মা নদী পাবনার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পাবনা জেলার নদীগুলি ক্রমাগত গতি-পরিবর্তন করায় জেলার বহু অংশে হ্রদ বা বিলের সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন রায়গঞ্জ ও চাটমোহর থানায় অবস্থিত ও ৩২ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত বিখ্যাত 'চলন বিল'। বড়া, ঘুঘুদহ ইত্যাদি অন্যান্য বিল উল্লেখযোগ্য।

জেলার জলবায়ু অনেকটা সমভাবাপন্ন। বার্ষিক গড় উত্তাপ ২৫° সেন্টিগ্রেড।

কানিংহামের অনুমান প্রাচীন রাজ্য 'পৌণ্ড্র' বা 'পৌণ্ড-বর্ধন' নাম হইতেই পাবনা নাম হইয়াছে।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই জেলা রাজশাহী জেলা হইতে পৃথক হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে সিরাজগঞ্জ মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জ মহকুমার ইউসুফশাহী পরগনার জমিদারগণের খাজনাবৃদ্ধি ও কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রজারা বিদ্রোহ করে। তাহাদের নেতা ঈশান রায় বিদ্রোহীর রাজা নামে অভিহিত হয়। এই আন্দোলন ক্রমে পাবনা জেলার অন্যত্র এবং পার্শ্ববর্তী জেলায় ছড়াইয়া পড়ে। গভর্নমেন্টের মধ্যস্থতায় ১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইলে ইহা পূর্ব-পাকিস্তানের রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে জেলার লোকসংখ্যা ১৯৫৯০০০। লোকসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৪০৩।

মোট কৃষিজমির পরিমাণ ৩২৫২৮৯ হেক্টর। প্রধান খাদ্যশস্য ধান। পাট প্রধান নগদী ফসল; ইক্ষু, তামাক, তৈলবীজ, ডাল ও ছোলা, গম ও বার্লি, এখানকার উল্লেখযোগ্য কৃষিজাত দ্রব্য। জেলার বনভূমির পরিমাণ ১৫২ বর্গকিলোমিটার।

জেলার প্রধান শিল্পাঞ্চল পাবনা শহর। জেলায় চর্মশিল্প, হোসিয়ারী শিল্প, রবারশিল্প, ঔষধ তৈয়ারির কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিংশিল্প, ছাপাখানা ইত্যাদি প্রধান। কুটিরশিল্পের মধ্যে তাঁতের কাপড় সূক্ষ্ম বুননের জন্য খ্যাত। ঘাস হইতে শীতল পাটি প্রস্তুত হয়। শাঁখা, মৃৎপাত্র এবং পিতল ও কাংস্যের নির্মিত পাত্র অল্পস্বল্প তৈয়ারি হয়।

জেলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বেরা, উল্লাপাড়া। প্রধান রপ্তানিদ্রব্য ধান, পাট, ডাল, সরিষা ও মৎস্য। প্রধান আমদানিদ্রব্য কেরোসিন তৈল, কার্পাসজাত দ্রব্য, কয়লা, যন্ত্রাদি, ঔষধপত্র ইত্যাদি।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে জেলার ২৪০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা এবং ৩৮৪৮ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা ছিল। রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৬২ কিলোমিটার। প্রধান রেলকেন্দ্র সিরাজগঞ্জ, উল্লাপাড়া, দিলপসার, ভাঙ্গুরিয়া ও চাট-মোহর। পাবনা শহর জেলার অন্যান্য প্রধান শহর-গুলির সহিত পাকা রাস্তার দ্বারা যুক্ত। পদ্মা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র জেলার প্রধান জলপথ। বড়াল ও হুড়াসাগর নদী জলপথে বাণিজ্যের সহায়ক।

জেলার মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ২৭০৮০২। শিক্ষিতের হার শতকরা ১৪ জন। জেলায় ২টি কলেজ, ৫৬০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৯৮২ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ২১৬৭টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। পাবনা শহরে এড-ওয়ার্ড কলেজ ও টেক্‌নিক্যাল স্কুল বিখ্যাত।

জেলার প্রধান শহর পাবনা (২৪°১´ উত্তর ও ৮৯°১৬´ পূর্ব) পদ্মার শাখা ইচ্ছামতী নদীর তীরে অবস্থিত।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পৌরশাসনের অধীনে আসে। ভাঙ্গুরিয়া মৎস্য ও পাট রপ্তানির কেন্দ্র। উল্লাপাড়া ফুলঝুর নদীর তীরে অবস্থিত পাটব্যবসায়ের কেন্দ্র।

শাহজাদপুর হুড়াসাগরতীরে পুরাতন নগর। এখানে আরব দেশের মখদুম শাহ ও অন্যান্য দরবেশের সমাধিতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় অর্ঘ দেন। অনুমান মখদুম শাহদৌলা আরব দেশের রাজপুত্র বা শাহজাদা ছিলেন বলিয়া স্থানটির নাম শাহজাদাপুর হইয়াছে। শাহজাদার প্রতিষ্ঠিত মসজিদে ৮টি কালো পাথরের থাম আছে। বৈশাখের মেলায় টাট্টু ঘোড়া বিক্রয় হয়।

পোতাজিয়া গ্রামে একটি পুরাতন ও ভগ্নপ্রায় নবরত্ন মন্দির আছে।

ইছামতী, বড়াল ও হুড়াসাগরের সঙ্গমস্থলে মথুরা থানার অন্তর্গত পাবনার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র বেরা অবস্থিত। ইহা পাটব্যবসায়ের প্রসিদ্ধ গঞ্জ। সিরাজ-গঞ্জ যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রের কূলে মহকুমা ও প্রধান বন্দর।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India; Provincial series of Eastern Bengal & Assam*, Calcutta, 1909; H. H. Nomani, *Census of Pakistan 1951*, Dacca, 1955; Nafis Ahmed, *An Economic Geography of East Pakistan*, London, 1958.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পাব্‌লিক সার্‌ভিস কমিশন সরকারি কর্মচারী নিয়োগ আয়োগ। প্রাচীনকালে সর্বপ্রথম চীন দেশে

উচ্চবর্গের রাজকর্মচারী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করা হইত। কিন্তু তখন সেখানে বা পৃথিবীর অন্যত্র সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিয়োগ এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও স্থায়ী নিরপেক্ষ আয়োগ ছিল না। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডে সিভিল সার্‌ভিস কমিশন নামে এইপ্রকার আয়োগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান কালে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেই অনুরূপ ব্যবস্থা আছে।

ভারতবর্ষে পাব্‌লিক সার্‌ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় বৃটিশসরকার কর্তৃক ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতশাসন আইন প্রবর্তনের ফলস্বরূপ। উক্ত আইনের ৩৮ ধারাতে এবিষয়ে বিধান আছে। কিন্তু উহার দায়িত্ব ও ক্ষমতা খুব সীমিত ছিল; নিয়োগের জন্য পরীক্ষা পরিচালনা করা ব্যতীত উহার উল্লেখযোগ্য অন্য কোনও দায়িত্ব বা ক্ষমতা ছিল না এবং উহা কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত যুক্ত ছিল। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্‌ভিস, ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্‌ভিস, ইণ্ডিয়ান অডিট ও অ্যাকাউণ্ট সার্‌ভিস প্রভৃতি কতিপয় সর্বোচ্চ সর্বভারতীয় বা কেন্দ্রীয় কৃত্যকে নিয়োগের জন্য উহা পরীক্ষা পরিচালনা করিত। প্রাদেশিক ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনও আয়োগ ছিল না। প্রাদেশিক ক্ষেত্রে পাব্‌লিক সার্‌ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন প্রবর্তনের সঙ্গে, উক্ত আইনের ২৬৪-২৬৮ ধারা অনুসারে। ঐ ধারাগুলিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পাব্‌লিক সার্‌ভিস কমিশন গঠনের নিয়মাবলী এবং তাহাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। স্বাধীনতালাভের পর ভারতের সংবিধানের ৩১৫-৩২৩ অনুচ্ছেদে সেগুলি কিঞ্চিৎ সংবর্ধিতাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পাব্‌লিক সার্‌ভিস কমিশন বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত সাময়িক আয়োগ হইতে স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় উহা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, যদিও ইহাদের সদস্যগণের কার্যকাল সংবিধানের দ্বারা সীমিত এবং তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সরকার তাহাদের অন্য কোনও পদে স্থানান্তরিত বা ঐ কর্ম হইতে অবসরান্তে অন্য কোনও বৈতনিক কর্মে নিযুক্ত করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ইহা একটি উপদেষ্টা আয়োগ হইলেও সংবিধান অনুসারে সরকার যথেষ্ট সন্তোষজনক কারণ ব্যতিরেকে উহার কোনও উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারে না। কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে ঐরূপ করা হইলে উহা আয়োগের বাৎসরিক কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত হয় এবং সেই বিবরণী লোকসভায় (ইউনিয়ন পাব্‌লিক সার্‌ভিস কমিশনের ক্ষেত্রে) বা বিধানসভায় (রাজ্য পাব্‌লিক সার্‌ভিস কমিশনের ক্ষেত্রে) আলোচনাকালে সরকারকে তাহার স্বপক্ষে উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে হয়। তৃতীয়তঃ দলীয় প্রভাব হইতে এই আয়োগকে মুক্ত রাখিবার জন্য সংবিধান অনুসারে এই আয়োগের যাবতীয় ব্যয় সরকারি বাজেটের ভোটবহির্ভূত তহবিল হইতে বরাদ্দ করা হয়।

কালীপদ সেন

পাভ্‌লভ, ইভান পেত্রোভিচ (১৮৪৯-১৯৩৬ খ্রী) প্রখ্যাত রুশ শারীরবিজ্ঞানী। রাশিয়ার রিয়াজান শহরে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পাভ্‌লভ চিকিৎসা-বিদ্যায় স্নাতক হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বত্‌কিন-এর পরীক্ষাগারে গবেষণার সুযোগ পাওয়ায় তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ইহার পর ৫ বৎসরের জন্য তিনি সামরিক চিকিৎসাবিদ্যা আকাদমির ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন; পরে ঐ আকাদমির শারীরবিদ্যার অধ্যাপকপদে তিনি ৩০ বৎসর কার্য করেন। তিনি প্রয়োগাত্মক চিকিৎসাবিদ্যা সংস্থার অধিকর্তার পদও অলংকৃত করেন। পাচনতন্ত্রের গ্রন্থি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিজ্ঞানের সংস্কারমুক্ত প্রগতির সমর্থক হওয়ায় তাঁহাকে জার-আমলে বহুবার প্রতিক্রিয়াপন্থী আমলাদের বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; সোভিয়েট সরকারের প্রতিষ্ঠার পর তাঁহার গবেষণাকার্যে সাহায্য ও উৎসাহের অভাব হয় নাই। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পাভ্‌লভ উচ্চতর নার্ভনির্ভর ক্রিয়ার শারীরবিদ্যা ও নিদানতত্ত্ব সম্পর্কীয় সংস্থার অধিকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁহারই উদ্যোগে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনগ্রাদ ও মস্কোভায় ১৫শ আন্তর্জাতিক শারীরবিদ্যা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রথমদিকে (১৮৭৪-৮৯ খ্রী) পাভ্‌লভ প্রধানতঃ হৃৎপিণ্ড ও রক্তসঞ্চালনের নার্ভঘটিত নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এবং পরবর্তী কালে (১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় ১০ বৎসর) পরিপাক সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। ইহার পরে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অভ্যাসলব্ধ প্রতিবর্ত্য ক্রিয়া (কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স) সম্বন্ধে গবেষণায় রত ছিলেন। তাঁহার পরীক্ষাপদ্ধতি শারীরবিদ্যার গবেষণায় যুগান্তকারী বলিয়া গণ্য। অস্ত্রোপচারের সাহায্যে দেহে গবাক্ষ উন্মোচনপূর্বক তিনি সুস্থ প্রাণীর অঙ্গবিশেষের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, প্রাণীদেহ হইতে খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন কোনও অঙ্গ বা

টিস্থ লইয়া গবেষণা তাঁহার মতবিরুদ্ধ ছিল; জীবিত ও পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর উপর পরীক্ষাই তিনি অনুমোদন করিতেন। অভ্যাসলব্ধ প্রতিবর্ত্য ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁহারই গবেষণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া মস্তিষ্কনির্ভর মনোবিদ্যা গড়িয়া ওঠে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন সমৃদ্ধ হয় এবং মানসিক ব্যাধির বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার পথ সুগম হয়। পাভ্‌লভীয় মনোবিদ্যা অনুসারে মানবচৈতন্যসহ যাবতীয় মননক্রিয়া মস্তিষ্কের উপর বহির্জগতের প্রতিফলন। ওয়াট্‌সন-প্রবর্তিত ব্যবহারবাদ অথবা যান্ত্রিক জড়বাদের সহিত পাভ্‌লভ-বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নাই।

দ্র I. P. Pavlov, *The Work of the Digestive Glands*, Philadelphia, 1910; I. P. Pavlov, *Conditioned Reflexes*, Oxford, 1927; I. P. Pavlov, *Lectures on Conditioned Reflexes*, New York, 1928; I. P. Pavlov, *Selected Works*, Moscow, 1955.

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পাম খেজুর, গোলপাতা, তাল, নারিকেল, বেত, সাগু, সুপারি প্রভৃতি গুপ্তবীজী (অ্যান্‌জিওস্পার্ম) গাছকে সাধারণভাবে পাম বলা হয় এবং ইহাদের তাল-গোত্রের (ফ্যামিলি-পাল্‌মী, Family-Palmae) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই গোত্রে প্রায় ১২০০ জাতের পাম গাছ আছে। আকৃতির সামঞ্জস্যহেতু ব্যক্তবীজী (জিম্‌নো-স্পার্ম) 'সাইকাস' গাছকেও সাধারণ লোকে পাম বলে। তাই সাইকাসের বাংলা নাম 'বিলাতি খেজুর'। ভারতের নানাস্থানে ৬ প্রজাতির সাইকাস দেখা যায়। পাতার অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য অনেক বাগানে সাইকাস গাছ রোপণ করা হয়।

পামের ঋজু দেহের শীর্ষদেশে গুচ্ছাকারে গাছের বর্ণ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বেশ কয়েকটি বড় পাতা থাকে। ফুলগুলি সরল বা যৌগিক ধরনের সুবৃহৎ মঞ্জরীতে স্তবকে স্তবকে ফোটে। 'খেজুর', 'তাল' ও 'নারিকেল' দ্র।

দ্র A. B. Rendle, *The Classification of Flowering Plants*, vol. 1, Cambridge, 1952.

সন্তোষকুমার পাইন

পাম্প তরল বা বায়বীয় পদার্থকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে অথবা ভিন্ন উচ্চতায় লইয়া যাইবার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র। কার্যভেদে বিভিন্নপ্রকার পাম্পের ব্যবহার হয়, যথা—সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প, পিস্টন পাম্প, ঘূর্ণ (রোটারি) পাম্প, এয়ার-লিফ্‌ট পাম্প, জেট পাম্প ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত পাম্পের ব্যবহারই সর্বাধিক।

অধিক পরিমাণ তরলকে অল্প উচ্চতায় অথবা অল্প চাপের বিরুদ্ধে স্থানান্তরে প্রেরণের জন্যই সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ এই পাম্পের দুইটি অংশ থাকে; ১. ঘূর্ণমান 'ইম্পেলার' ২. ইহার ঢাকনি (কেসিংগ)। একটি চক্রের চারিপাশে সমবক্রতা-সম্পন্ন কতকগুলি পাত লাগাইয়া ইম্পেলারটি তৈয়ারি হয়। ঘূর্ণমান ইম্পেলারটির ঠিক মধ্যস্থলে জল বা যে কোনও তরল সরবরাহ করা হয়। ঘূর্ণনের জন্য সৃষ্ট অপকেন্দ্র (সেন্ট্রিফিউগাল) বলের দ্বারা তরলের চাপ ও গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। এই উচ্চচাপ ও গতিশক্তি-সম্পন্ন তরল পাম্পের কিনারা দিয়া বাহির হয় ও নলবাহিত হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে যায়। এই পাম্পের কার্যকরিতা বৃদ্ধির জন্য ইম্পেলার হইতে নির্গত তরলের গতিশক্তিকে চাপশক্তিতে পরিণত করার জন্য 'ভল্ট্‌ চেম্বার' অথবা 'গাইড ভেন'-এর সাহায্য লওয়া হয়। সাধারণতঃ এই পাম্প বেশি চাপের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে না, কিন্তু বর্তমানে মাল্টিস্টেজ সেন্টিফিউগাল পাম্প অত্যন্ত উচ্চ-চাপের বিরুদ্ধেও কাজ করিতে পারে।

সুধেন্দুপ্রসাদ বসু

পায়রা কোলম্বিফোর্মেস বর্গের (order-columbiformes) অন্তর্গত কোলম্বিদী গোত্রের (Family-Columbidae) পাখির সাধারণ নাম। হরিয়াল, তুষল, ঘুঘু প্রভৃতিও এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের সংহত দেহ বহুবর্ণ, কোমল ও ঘন পালকে মণ্ডিত। অনেকেরই স্ত্রীপুরুষের বাহ্যলক্ষণে পার্থক্য নাই। পায়রা ১৫-৮৪ সেন্টিমিটার (৬-৩৩ ইঞ্চি) লম্বা হয়।

বন্য পাহাড়ী পায়রা গৃহপালিত পায়রার পূর্বপুরুষ। প্রায় ২৯০ প্রজাতির পায়রা আছে; তাহার অর্ধেকেরও বেশি ইন্দো-মালয় ও অস্ট্রেলেশিয়া অঞ্চলে পাওয়া যায়। মেরু অঞ্চল ও কয়েকটি সামুদ্রিক দ্বীপ ব্যতীত সর্বত্রই পায়রার বসবাস। অনেকেই প্রব্রজক (মাইগ্রেটরি)।

কয়েক প্রজাতির পায়রা নিঃসঙ্গ হইলেও অনেক প্রজাতিই যূথচারী; কেহ ভূচর, কেহ বা বৃক্ষবাসী। কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর কুজন হইতে গুরুগম্ভীর নিনাদ। চুষিয়া জলপান করা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শস্য, ফল, বীজ ও কুঁড়ি এবং কখনও বা পতঙ্গ ও শামুক ইহাদের খাদ্য।

প্রজন-ঋতুতে এক বা বহু জোড়া অথবা দলবদ্ধ পায়রা ভূমি, বৃক্ষ এবং পাহাড় বা গৃহের আলিসায় নীড় রচনা করে। পায়রা এক নীড়ে সাধারণতঃ ২টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিতে ১৪-১৯ দিন লাগে। নীড়-রচনা, ডিমে তা দেওয়া এবং শাবক প্রতিপালন স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলিয়া করে; উভয়েরই গলস্থলী (ক্রপ) হইতে উৎপন্ন শ্বেতবর্ণ অর্ধতরল পদার্থ (পায়রার দুধ) নবজাত শাবকের প্রথম কয়েকদিনের পুষ্টিকর ও একমাত্র খাদ্য।

দ্র E. T. Gilliard, *Living Birds of the World*, London, 1962.

শীলা-চট্টোপাধ্যায়

পারদ উজ্জ্বল রজতশুভ্র ধাতু। সাধারণ উষ্ণতায় ইহা তরল। ইহা অপেক্ষা গুরুভার আর কোনও তরল পদার্থ সাধারণ উষ্ণতায় নাই। বায়ুর সংস্পর্শে ইহা রজতের মত মলিন হয় না, অমলিন ভাস্বর থাকে। মাটিতে পড়িয়া গেলে জলের মত ঢালু পথে গড়াইয়া যায়। কাচ বা লোহার পাত্রে ইহাকে রাখিতে হয়; অধিকাংশ অপর ধাতুকে ইহা দ্রবীভূত করে, তাই তামা, অ্যালুমিনিয়াম বা রুপার পাত্রে ইহাকে রাখা হয় না।

পারদের পরমাণুক্রমাঙ্ক ৮০ এবং মৌলদিগের পর্যায় সারণীতে ইহার স্থান স্বর্ণের (পরমাণুক্রমাঙ্ক ৭৯) অব্যবহিত পরে। পারদের পরমাণুতে একটি প্রোটনকণা কোনও প্রকারে কমাইতে পারিলে উহা স্বর্ণপরমাণু হইয়া যাইবে। এই পরিবর্তনসাধনের জন্য তন্ত্র, মন্ত্র ও অ্যাল্‌কেমির যুগ হইতে আজিকার পারমাণবিক যুগেও চেষ্টা চলিতেছে।

পারদের পারমাণবিক ওজন ২০০·৬১, স্ফুটনাঙ্ক ৩৫৭° সেন্টিগ্রেড, ০° সেন্টিগ্রেডে আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৩·৬। ইহা তাপ ও বিদ্যুতের উত্তম পরিবাহী। পারদ আকরিক অল্প দেশেই আছে। গান্ধার দেশের (আফগানিস্তান) উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ইউনানের পশ্চিমে কিছু আকরিক হিঙ্গুল সংগৃহীত হয়। হিঙ্গুল পারদ-গন্ধকের যৌগ; ইংরেজী নাম Cinnabar। ইহা পাহাড়ের পাথরের ভাঁজে ভাঁজে থাকে। পারদ ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন যুগ হইতেই পরিচিত; কেননা পারদভস্ম, মকরধ্বজ, রসকর্পূর, পর্পটি ইত্যাদি ঔষধের প্রস্তুতি ও বিশুদ্ধীকরণপ্রণালী আধুনিক বিজ্ঞানের বিবেচনাতেও বহু পরিশীলিত বলিয়াই মনে হয়।

পারদ অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। চাপমান (ব্যারোমিটার) ও তাপমিতি (থার্মোমিটার) যন্ত্রে, বায়ুনিষ্কাশক যন্ত্রে (ভ্যাকুয়াম পাম্প) এবং বহুবিধ পরীক্ষাগারের যন্ত্রে ইহার প্রয়োজন হয়। পারদঘটিত বহুসংখ্যক ঔষধ আছে। তাহার মধ্যে কিছু সেবনীয়, কিছু চর্মরোগের মলমরূপে ব্যবহার্য, কিছু বা ইন্‌জেক্‌শনের জন্য। টিন ও পারদ-সংকর দিয়া আরশি তৈয়ারি হয়। পারদ-বাষ্পপূর্ণ একপ্রকার বৈদ্যুতিক বাতি অধুনা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

'রসসার' পুস্তকে ১৮ প্রকার পারদযোগ প্রস্তুতের বিবরণী আছে। নাগার্জুনের 'রসরত্নাকর', শৈবতন্ত্রের 'রসার্ণব', 'রসরত্ন-সমুচ্চয়' ইত্যাদি প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার 'হিস্টরি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি ইন অ্যান্‌শিয়েন্ট অ্যাণ্ড মিডিয়েভ্যাল ইণ্ডিয়া'-তে আলোচনা করিয়াছেন।

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

পারমাণবিক বোমা পরমাণুর কেন্দ্রক বিভাজিত হইবার সময় উদ্ভূত শক্তির সাহায্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সৃষ্টিকারী বোমাকে পারমাণবিক বোমা বলা হয়। ইহাকে 'প্লুটোনিয়াম বোমা' বা 'নিউক্লিয়ার বোমা'ও বলা হইয়া থাকে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুলাই সকাল ৫.৩০ টায় অ্যালামোগর্ডো বিমানক্ষেত্রের একটি স্থানে সর্বপ্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হয়। ইহার পর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোসিমার উপর যুক্তরাষ্ট্রের একটি বোমারু বিমান হইতে একটি পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ২০০০০ টন টি. এন. টি.-র শক্তিসম্পন্ন এই বোমাটির বিস্ফোরণে শহরের মধ্য-স্থলে ৪ বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, ৩৪৩০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৬৬০০০ জন নিহত এবং ৬৯০০০ জন আহত হয়। ঐ বৎসরের ৯ আগস্ট পুনরায় জাপানের নাগাসাকি শহরে দ্বিতীয় বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার ফলে ৩৯০০০ লোক নিহত হয়; আহতের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫০০০। ইহার পরে অবশ্য পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে আরও বহুগুণ শক্তিশালী বোমা নির্মিত হইয়াছে, যদিও সেগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড আল্‌ফা কণিকার আঘাতে নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক হইতে হাইড্রোজেন কেন্দ্রক অর্থাৎ প্রোটন কণিকা বহিষ্কারে সক্ষম হন। ইহাই হইল পরমাণু ভাঙিবার প্রথম সফল প্রচেষ্টা। এই ধরনের পরীক্ষার জন্য তখন

স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে নির্গত আঘাতকারী কণিকা ছাড়া অন্য কোনও ব্যবস্থা জানা ছিল না। তড়িৎ-বিভবযুক্ত এই আঘাতকারী কণিকার গতিবেগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নানা উপায় উদ্ভাবিত হইলেও তাহা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বেরিলিয়ামকে আল্‌ফা কণার সাহায্যে আঘাত করিয়া জেম্‌স্ চ্যাড্‌উইক নিউট্রন কণিকা আবিষ্কার করেন। নিউট্রনের কোনও তড়িৎ-আধান নাই; সেজন্য পরমাণুর অভ্যন্তরের তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলিকে অতিক্রম করিবার সময়ে ইহা পথভ্রষ্ট হয় না। অতএব এই কণিকার সাহায্যে অনায়াসেই পরমাণু-কেন্দ্রকে বিক্রিয়া সৃষ্টি করা যাইতে পারে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ফের্মি উচ্চগতি নিউট্রনকে জল অথবা প্যারাফিনের ভিতর দিয়া চালিত করিয়া তাহার গতিবেগ মন্দীভূত করেন এবং এই মন্দগতি নিউট্রনের সাহায্যে ইউরেনিয়ামকে আঘাত করিয়া নূতন একটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পান।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অটো হান ও স্ট্র্যাস্‌মান ইউরেনিয়ামকে নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করিয়া তাহা হইতে মাঝারি ওজনের একটি মৌলিক পদার্থ বেরিয়াম উৎপাদনের সন্ধান পান। ইউরেনিয়াম ভাঙ্গিবার ফলে বেরিয়াম পাইবার অর্থই হইল, ইউরেনিয়ামের পরমাণু-কেন্দ্রক দুই অসমান অংশে বিভাজিত হইয়াছে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করিয়া দেখিলেন, এইরূপ বিভাজনে স্বাভাবিক ক্ষয়ের ফলে উৎপন্ন শক্তি হইতে প্রায় শতগুণ বেশি শক্তি পাওয়া যাইতে পারে। ফের্মি হিসাব করিয়া বলিলেন, এই বিভাজনের সময়ে ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রক হইতে নিউট্রনও নির্গত হইবে। যদি তাহাই হয় এবং একাধিক নিউট্রন নির্গত হয়, তাহা হইলে কতক নিউট্রন বিক্ষিপ্ত বা পথভ্রষ্ট হইলেও অবশিষ্ট নিউট্রনের সাহায্যে অন্য একটি কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটিবে এবং এইভাবে 'চেন রিয়্যাক্‌শন' বা শৃঙ্খল-বিক্রিয়া সৃষ্টির ফলে শক্তি নির্গত হইবে। পরীক্ষায়ও ইহা প্রমাণিত হইল। বোর ও হুইলার হিসাব করিয়া দেখিলেন, সাধারণ ইউরেনিয়ামে যে বিভাজন দেখা গিয়াছে, তাহা সহজলভ্য সাধারণ ইউরেনিয়াম-২৩৮-এ ঘটে নাই, ঘটিয়াছে ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর কেন্দ্রকে, যাহা সাধারণ ইউরেনিয়ামের ১৪০ ভাগের মধ্যে মাত্র এক ভাগ পাওয়া যায়। পরীক্ষার ফলেও ইহা সমর্থিত হইল।

বিশুদ্ধ সাধারণ ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর সাহায্যে 'চেন রিয়্যাক্‌শন' সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এজন্য ফের্মির উদ্ভাবিত পন্থায় নিউট্রনের গতিবেগ মন্দীভূত করিয়া প্রয়োগের উপায়টি অবলম্বিত হইল। বিশেষভাবে বিশুদ্ধ-কৃত গ্র্যাফাইট নিউট্রনের গতিবেগ মন্থর করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই গ্র্যাফাইটের দ্বারা নির্মিত ইটের স্তূপের মধ্যে খণ্ড খণ্ড ইউরেনিয়াম রাখিয়া ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক চুল্লি অর্থাৎ রিয়্যাক্টর নির্মিত হইল। এইরূপ রিয়্যাক্টর হইতে একই সঙ্গে শক্তি ও নূতন পদার্থ প্লুটোনিয়াম-২৩৯ পাওয়া সম্ভব হইল। প্লুটোনিয়াম পরমাণুও ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুর মত সহজেই বিভাজিত হয়।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন রকম পরীক্ষার ফলাফল বিচার করিয়া দেখা গেল, ১০০ পাউণ্ডেরও কম বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম-২৩৫ অথবা প্লুটোনিয়াম-২৩৯-কে অতি-বিস্ফোরক পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করিলে ২০০০০ টন টি. এন. টি. বিস্ফোরণের সমান শক্তি মুক্ত করিতে পারে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্জ বি. পেগ্রাম সর্বপ্রথম এই সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহিত যোগাযোগ করেন এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ফের্মি ও নৌবাহিনীর অফিসারদের একটি কন্‌ফারেন্সের ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পরে জিলার্ড, উইগ্‌নার এবং আইনস্টাইনের সমর্থনে আলেক্‌জাণ্ডার স্যাক্‌স বিষয়টি প্রেসিডেন্ট রুজ্‌ভেল্টের নিকট উপস্থাপিত করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কন্যাণ্ট, ব্রিগ্‌স্, পেগ্রাম, কম্পটন, লরেন্স, উরে, মারফি, ওয়েনসেল, অ্যালিসন, বিম্‌স্, ব্রেইট, কণ্ডন এবং স্মিথ প্রভৃতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে এই বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা হয় এবং ক্রমে বৃটেন ও ক্যানাডার বিজ্ঞানীরা এই বোমা তৈয়ারির পরিকল্পনায় যোগদান করেন।

পারমাণবিক বোমার জন্য বিস্ফোরক পদার্থের ব্যবস্থা করা হইল এই সংস্থার প্রথম কাজ। ইউরেনিয়াম-২৩৫ হইল ইহার বিস্ফোরক পদার্থ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর সহিত অতি সামান্য পরিমাণে ইউরেনিয়াম-২৩৫ থাকে। ইহাকে পৃথক করা অতি দুরূহ ব্যাপার। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লস অ্যালামোসে ওপেনহাইমারের তত্ত্বাবধানে বিস্ফোরক পদার্থের প্রয়োজনানুরূপ ধাতব রূপ প্রদান করা, বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত করিবার পূর্বেই নির্দিষ্ট উচ্চতায় বোমা বিস্ফোরিত হইবার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ চলিতে লাগিল। সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ও কার্যতৎপরতার ফলে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই পারমাণবিক বোমার নির্মাণকার্য শেষ হইল।

মোটের উপর, ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণুগুলিকে অতি ব্যয়সাধ্য জটিল প্রক্রিয়ায় পৃথক করিবার পর একত্রিত করা হয়। এক টুকরা ইউরেনিয়ামে কেবলমাত্র সহজ বিস্ফোরণক্ষম পরমাণু থাকিলেই তাহা বিস্ফোরিত হইবে না—কোনও কিছুই তাহাতে বিস্ফোরণ ঘটাইতে পারে না; কারণ বিভাজনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিউট্রনগুলি বাতাসের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। ইউরেনিয়াম যদি সন্ধিপরিমাণের কম হয়, তবে পারমাণবিক চুল্লি অর্থাৎ রিয়্যাক্টর বা পারমাণবিক বোমা কোনও-টাকেই কার্যকরী করা সম্ভব নয়। ইউরেনিয়ামের টুকরাটি যদি যথেষ্ট বড় হয় অর্থাৎ দুই পাউণ্ডের বেশি হয়, তবে বিস্ফোরণ অনিবার্য। পারমাণবিক বোমার ভিতরে বিভাজনক্ষম ইউরেনিয়ামের টুকরাগুলি ছোট ছোট খণ্ডে এমনভাবে সজ্জিত থাকে যে তাহাতে বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে না। কিন্তু বোমা নিক্ষিপ্ত হইবার সময়ে যান্ত্রিক কৌশলে নির্দিষ্ট সময়ে ছোট টুকরাগুলি একত্রিত হইয়া বিস্ফোরণের উপযোগী একটা বড় টুকরায় পরিণত হয়।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

পারাদ্বীপ ভারতের একটি প্রধান বন্দর ও পোতাশ্রয় মহানদীর মোহানা হইতে ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। কটক হইতে ইহার দূরত্ব ৯৬ কিলোমিটার।

ওড়িশায় আকরিক লৌহ বাহিরে রপ্তানী করিবার জন্যই রাজ্য সরকার এই বন্দরের পরিকল্পনা করে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে একটি যুগোশ্লাভ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ইহার প্রাথমিক কার্য সমাপ্ত হয়। ইহার ডকে প্রায় ৬০৯৬০ মেট্রিকটন জাহাজ থাকিতে পারে। লৌহ-আকরিক আনয়ন ও অপসারণ ইত্যাদি যাবতীয় কার্য আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে হইয়া থাকে। এই বন্দর সর্বঋতুর উপযোগী এবং ভারতের বন্দরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীর। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা 'উন্মুক্ত' বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

চিত্রা সেন

পারেতো, ভিল্‌ফ্রেডো (১৮৪৮-১৯২৩ খ্রী) ইটালীর প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পলিটিক্যাল ইকনমি'-র প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

পারেতো তাঁহার আয়বণ্টনের সূত্রটির জন্য বিখ্যাত। তাঁহার মতে আয়বণ্টনের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে; তাহা দেশকালনিরপেক্ষ এবং সহজে পরিবর্তনীয় নহে। এই সূত্রটি সম্বন্ধে পরবর্তী কালে অনেক বিতর্ক ঘটিয়াছে ও বহু সংশয় প্রকাশিত হইয়াছে।

ন্থ্যালরাসের সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্ব সম্পর্কে পারেতোর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূল্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় এজওয়ার্থ-প্রবর্তিত সম-উপযোগরেখার (indifference curve) ব্যবহার পারেতোই প্রথম করেন।

কল্যাণকর অর্থনীতির আলোচনায় পারেতো বিভিন্ন ব্যক্তির উপযোগকে তুলনা করার বিরোধী। সমাজতত্ত্বে পারেতোর প্রধান বক্তব্য এই যে, সমাজের বিবর্তন সর্বদাই চক্রাকারে ঘটে।

জবা গুহ

পার্জিটার, ফ্রেডেরিক ইডেন (১৮৫২-১৯২৭ খ্রী) ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্বে সুপ্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ। জন্মসূত্রে ইংরেজ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন ও তথা হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে মনোনীত হন। চাকুরি উপলক্ষে বঙ্গদেশে নিযুক্ত হইয়া তিনি সুদীর্ঘ একত্রিশ বৎসরকাল এখানে অতিবাহিত করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তদানীন্তন বঙ্গীয় শাসন-বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারি, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জেলা ও দায়রা বিচারক ও ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিপদ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি অক্সফোর্ডে বসবাস করিয়াছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিতেই তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে উত্তর জীবনে যখন কর্মোপলক্ষে ভারতবর্ষে অবস্থানহেতু সংস্কৃত ও ভারতীয় পুরাতত্ত্বচর্চার বৃহত্তর সুযোগ ও বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তাহার সদ্ব্যবহার করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল। ভারতে তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মজীবন ও ইংল্যাণ্ডে অবসরপ্রাপ্ত জীবন নিরবচ্ছিন্ন ভারততত্ত্ব অনুশীলনের ইতিহাস। ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ও ১৯০৩-০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হন। ইহা ভিন্ন ১৯০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে ইংল্যাণ্ডে বাসকালে তিনি তত্রস্থ 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'র

সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

পার্জিটারের ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিষয়ক গবেষণাকে সাধারণভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রথমতঃ সংস্কৃত মহাকাব্যপুরাণাদিতে নিহিত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যের বিশ্লেষণ ও নির্ণয়; দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন ক্ষোদিত লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা। সংক্ষেপে এ কথা বলা যাইতে পারে; মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণাদিতে বর্ণিত বিভিন্ন জাতি ও জনপদসমূহের যথার্থ ভৌগোলিক অবস্থান-নির্ণয়ে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই বিষয়ে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে (১৮৯৫ ও ১৮৯৭ খ্রী) ও ইংল্যাণ্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে (১৮৯৪ ও ১৯০৮ খ্রী) প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি এযাবৎ প্রামাণ্য বিবেচিত হয়। গবেষণার এই বিশেষধারায় তাঁহার চূড়ান্ত সাফল্যের নিদর্শন,—বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি-প্রকাশিত 'বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত বিস্তারিত টীকা-টিপ্পনীসংযুক্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণের ইংরেজী অনুবাদ (১৮৮৮-১৯০৫ খ্রী)। অনুবাদ হিসাবে এই গ্রন্থ সর্বাংশে ত্রুটিহীন না হইলেও, ইহাতে পার্জিটার যে বিস্তারিত ভূমিকা ও ঐতিহাসিক মন্তব্যসমূহ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস ও ভূগোলসম্পর্কে অনুসন্ধিৎসুগণের নিকট সেগুলি অপরিহার্য। পুরাণের ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে পার্জিটারের গবেষণা আরও অগ্রসর হইয়াছে তাঁহার 'পুরাণ-টেক্সট্স অফ দি ডাইনেস্টিজ্ অফ দি কলি এজ্' গ্রন্থে (১৯১৩ খ্রী)। কতগুলি প্রধান পুরাণগ্রন্থে (মৎস্য, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, ভাগবত, গরুড় ও ভবিষ্য) কলিযুগের রাজবংশাবলীর যে ধারাবাহিক তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহারই তুলনামূলক সুনিপুণ পাঠনির্ণয় ও ইংরেজী অনুবাদ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে ও পুরাণোক্ত বংশতালিকায় কাল্পনিক বর্ণনার সহিত যে পরিমাণ ঐতিহাসিক উপাদান মিশ্রিত আছে, প্রসঙ্গতঃ তাহাও অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। নয় বৎসর পরে প্রকাশিত পুরাণের ঐতিহাসিক কিংবদন্তিসম্পর্কিত পার্জিটারের গ্রন্থকে (এন্সেন্ট্ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল ট্র্যাডিশন, ১৯২২ খ্রী) তাঁহার পুরাণ-গবেষণার চূড়ান্ত ফল বিবেচনা করা যাইতে পারে। পুরাণে যে রাজবংশাবলীর বর্ণনা দেওয়া আছে, বহু ভ্রান্তি সত্ত্বেও তাহা আদ্যোপান্ত এক প্রকৃত ঐতিহাসিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত ও ঐতিহাসিক স্মৃতির ধারক ও বাহক, এই গ্রন্থে ইহাই পার্জিটারের প্রতিপাদ্য; এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাজবংশের এক আনুমানিক কালক্রমনির্দেশের প্রচেষ্টাও তিনি করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি পরবর্তী পণ্ডিতগণ সকলে গ্রহণ না করিলেও তাঁহার এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা যে সর্বাংশে অভিনন্দনযোগ্য ইহা অবশ্যস্বীকার্য।

প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী ক্ষোদিত লিপির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যাতেও পার্জিটার প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত ও প্রকাশিত লিপিসমূহের মধ্যে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া ও ঘুগ্রাহাটিতে আবিষ্কৃত খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের তিন নরপতি-ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেবের ৪ খানি তাম্রশাসন ও কুষাণরাজ হুবিষ্কের ওয়ার্‌দক্ (আফগানিস্তান) ব্রোঞ্জপাত্রলিপি উল্লেখযোগ্য।

বাংলা দেশে কর্মরত থাকাকালীন পার্জিটার বাংলা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত কথ্য ভাষা সম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৬৫ হইতে ১৮৭০ পর্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের রাজস্বসংক্রান্ত ইতিহাসও তাঁহার একটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু। এতদ্ব্যতীত অরেল্-স্টাইন কর্তৃক মধ্য এশিয়া হইতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতার সংস্কৃত অংশের সম্পাদনও তাঁহার আর এক কীর্তি। হোর্ণ্‌লে সংকলিত 'ম্যানাস্ক্রিপ্ট্ রিমেইন্‌স্ অফ্ বুদ্ধিস্ট্ লিটারেচার ফাউণ্ড ইন্ ঈস্টার্ণ তুর্কিস্থান' (১৯১৬ খ্রী) গ্রন্থে ইহা স্থান পাইয়াছে।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

পার্বত্য চট্টগ্রাম (২১°১১'-২৩°৪৭' উত্তর ও ৯১°৪১'-৯২°৪২' পূর্ব) পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা। আয়তন ১৩১৯০ বর্গকিলোমিটার। ইহার উত্তরে ত্রিপুরা, পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা, দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্মদেশের আরাকান পর্বত অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বে আসামের মিজো হিল্‌স জেলা। পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩টি মহকুমা—রাঙামাটি, বান্দরবন, রামগড়।

জেলাটি পর্বত ও গিরিখাতসঙ্কুল অঞ্চল। এখানে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ১০টি পর্বতশ্রেণী ও তাহাদের সমান্তরাল নদী-উপত্যকা অবস্থিত। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কেওক্রাদঙ্গ (১২৩০ মিটার) এবং অপর শৃঙ্গ পিরামিড হিল (৯১৯ মিটার) দক্ষিণ-পূর্বের শেষ সীমায় অবস্থিত। মিজো হিল্‌স জেলার নিকট লুসাই

পার্বত্য অঞ্চলে ও আরাকান পর্বতের নিকট ছাড়া পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা কোথাও ৬১০ মিটার-এর বেশি নহে।

এই জেলায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী কর্ণফুলি, ফেনি, মাতামুহরী এবং সাঙ্গুতে আসিয়া পড়িতেছে। কর্ণফুলি এবং ফেনি আড়াআড়িভাবে পর্বতশ্রেণীগুলিকে অতিক্রম করিতেছে; সাঙ্গু ও মাতামুহরী পর্বতশ্রেণীগুলির সহিত সমান্তরালভাবে প্রবাহিত। কর্ণফুলি ব্যতীত অন্য কোনও নদী নাব্য নহে। সকল নদীই বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে।

জেলার শিলাগুলি অধিকাংশ টার্শিয়ারি যুগের বেলে পাথরে গঠিত। ইহা ছাড়া শেল ও বালুমিশ্রিত কর্দমজাত শিলা দেখা যায়। লিগ্‌নাইট ও কয়লা সাঙ্গু, মাতামুহরী ও ফেনি নদীর উপত্যকায় পাওয়া যায়। নিকৃষ্ট চুনা পাথরও পাওয়া গিয়াছে।

জেলার জলবায়ুতে পার্বত্য প্রভাব দেখা যায়। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৩৫০ মিলিমিটার। গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ২৩° সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালীন গড় ১৬° সেন্টিগ্রেড।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাটি গঠিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের একটি জেলায় পরিণত হয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে জেলার লোকসংখ্যা ৩৮৫০০০ এবং লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২৯ জন।

কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। কৃষিকার্য প্রায় ক্ষেত্রে 'ঝুম' প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হয়। জেলার প্রধান উৎপন্নদ্রব্য ধান, পাট, আখ, তামাক, তৈলবীজ ইত্যাদি। কিছু ডাল, গম, বার্লি ও চাও উৎপন্ন হয়।

জেলার শতকরা প্রায় ৮৯ ভাগ অরণ্য। এই সকল অরণ্যে জারুল, চাপলাস, গর্জন, পাইন ইত্যাদি বৃক্ষ এবং বাঁশ ও বেত জন্মে।

জেলাটি শিল্পে অনগ্রসর। কুটিরশিল্পের মধ্যে পাহাড়ী মেয়েরা নিজেদের জন্য বস্ত্রবয়ন করে। বনাঞ্চলের সংগৃহীত কাষ্ঠ বালাম নৌকা নির্মাণের জন্য নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে প্রেরিত হয়।

জেলার যোগাযোগব্যবস্থা প্রধানতঃ রাস্তা ও নদীপথ দ্বারা গঠিত। জেলায় রেলপথ নাই। প্রধান সড়ক রাঙামাটি হইতে চট্টগ্রাম গিয়াছে। কর্ণফুলি নদী চন্দ্রঘোনা হইতে রাঙামাটি পর্যন্ত নাব্য। রাঙামাটিতে বিমান অবতরণের ক্ষেত্র আছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে জেলায় শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল ৪৩৭৩৩ জন পুরুষ এবং ৫৫৪৭ জন স্ত্রীলোক।

জেলার উপজাতিদের মধ্যে চাক্‌মা, মগ, কুকি, লুসাই, বনজোগী, মোরাং, টিপরা, কুমী, খিয়াং প্রধান। চাক্‌মা উপজাতি জেলার মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে বাস করে। এখন ইহারা বাংলা ভাষাতেই কথা বলে। মগেরা দক্ষিণাঞ্চলে বাস করে। ইহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। টিপরা উপজাতি ত্রিপুরা রাজ্য হইতে আসিয়াছে। ইহারা ধর্মতঃ হিন্দু হইলেও কিছু পার্বত্য আচার ও প্রথা ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। নৃত্যপারদর্শী মোরাং উপজাতি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ইহাদের বসবাস বান্দরবন মহকুমায়।

কর্ণফুলি নদীতীরে অবস্থিত রাঙামাটি জেলার ও মহকুমার প্রধান শহর ও কার্যালয়। বান্দরবন, রামগড়, বড়কল, মহলছড়ী, মোহনচন্দ্রপুর, পানছড়িবাজার ইত্যাদি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহর।

দ্র H. H. Nomani, *Census of Pakistan: 1951*, vol. III & VIII, Dacca, 1951; Nafis Ahmed, *An Economic Geography of East Pakistan*, London, 1958.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পার্শী, ভারতে আধুনিক ইরানের পার্‌স্ প্রদেশের নাম হইতে পার্শী শব্দ। আধুনিক নাম 'ইরান' পূর্বে ছিল 'এরান্' (মধ্যযুগের ফারসী) এবং ইহার প্রাচীন রূপ হইতেছে Airyanam বা Ariyanam: 'ঐর্যানাম' বা 'আরিয়ানাম', অর্থাৎ 'আর্যানাম্' বা আর্যদের (দেশ)। এই ইরানের মধ্যে পার্‌স্, পার্স বা পারসীকরা স্থানীয় আর্যজাতির একটি শাখামাত্র ছিল। মহাভারতের যুদ্ধে পারসীক উপজাতির লোক অংশগ্রহণ করিয়াছিল। পারস্যের সম্রাট দারেইওস পাঞ্জাব জয় করিয়াছিলেন। পশ্চিম ভারতে পরবর্তী কালের ইরানীয় জাতির সাসানীয় ও শক রাজ্যপাল ছিলেন। শক পুরোহিতমণ্ডলী পরে ব্রহ্মক্ষত্রিয় হন এবং কোনও কোনও মতে এই ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতি হইতে বঙ্গদেশের সেন-রাজবংশের উদ্ভব হয়। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে আরবগণ ইরান জয় করিলে ইরানীয়গণকে হয় মৃত্যুবরণ নচেৎ ধর্মান্তর গ্রহণের আশংকায় শতাব্দের অধিককাল ধরিয়া কোহিস্তানের পর্বতকন্দরাদিতে আত্মরক্ষা করিয়া অবস্থান করিতে হয়। তাহার পর দুঃসাহসী কয়েকটি ইরানীয় দল, যাঁহারা কিছুতেই পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিতে চাহেন নাই, ৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হোর্‌মুজ্‌ বন্দরে নৌকারোহণ করিয়া স্বদেশ

হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। নৌকাযোগে তাঁহারা কাথিয়াওয়াড়ে দীউ নামক স্থানে পৌছান। এই জর-থুষ্‌ত্রীয় নেতৃবর্গের পরিচালনায় ইরানীগণ বোম্বাই নগরের ১৩০ কিলোমিটার উত্তরে গুজরাতের উপকূলে আসিয়া উপনীত হন (৭৮৫ খ্রী)। রানা জয়দেব তাঁহাদের বসবাসের জন্য ভূমি দান করেন। 'কিস্‌সে-ই-সন্‌জান্‌' গ্রন্থে এই দাতার নাম অমর হইয়া আছে। ভূমিদানের শর্ত ছিল যে, নবাগতেরা অস্ত্রশস্ত্র বর্জন করিবেন এবং গুজরাতের লোকাচারসমূহ মান্য করিয়া চলিবেন। নূতন উপনিবেশ গড়িয়া উঠিল এবং উহার নামকরণ হইল 'হন্‌জমন্‌' (='মিলিত হইবার স্থান', সংস্কৃত 'সং-গমন', আধুনিক ফারসী 'অন্‌জুমন্‌') সমুদ্রোপকূলে 'সন্‌জান' নামে এই স্থান আজিও বর্তমান। 'ইরান্‌-শাহ্‌' নামে প্রথম অগ্নিমন্দিরটি ৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। সেই সুবিখ্যাত 'ইরান্‌-শাহ্‌' এখনও উদ্‌বাড়া নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ স্থান এক্ষণে ভারতে পার্শীগণের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। পুরুষানুক্রমে নূতন নূতন আগন্তুকদল আসিতে থাকায় ভারতে পার্শীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং তাঁহাদের বসতি প্রসারলাভ করিয়া ব্রোচ, খম্বাত বা ক্যাম্বে, নওসারী, সুরাট প্রভৃতি স্থানে এবং সম্প্রতি বোম্বাই, পুনা, করাচি, কলিকাতা ও জামসেদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। প্রথম ৭০০ বৎসর পার্শীগণ শান্তিতে বসবাস করেন, কৃষি ও বস্ত্রবয়নবৃত্তি গ্রহণ করেন, হিন্দুদের পরিচ্ছদ ধুতি ও পাগড়ি গ্রহণ করেন, পহ্লবী এবং ফারসী ভাষার পরিবর্তে গুজরাতী ভাষা শিক্ষা করেন। 'অন্‌জুমান' অর্থাৎ পারসী-সমিতিসমূহ তাহাদের বৈষয়িক হিতার্থে পথনির্দেশ করেন, এবং 'অথোর্‌নান' অর্থাৎ পুরোহিত ও ধর্মগুরুগণ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে সাহায্য করিয়া থাকেন। পার্শীদের সর্বপ্রথম খ্যাতনামা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নওসারীর চংগা আশা (১৪৫০ খ্রী)। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে মাহ্‌মুদ বেগড়া কর্তৃক গুজরাত অঞ্চল আক্রান্ত হইলে হিন্দুরাজার পক্ষে ১৪০০ সহযোগী লইয়া মহাবীর আর্দেশীর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অজার কৈরান (১৫২৯ খ্রী) পাটনায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ব্যাখ্যানাদি দান করেন। সুরাটের সন্নিকটে আকবর বাদশাহের সহিত পার্শীগণের সাক্ষাৎ হয়। তিনি দস্তুর মেহেরজী রানাকে ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় আমন্ত্রণ করেন এবং পবিত্র অগ্নিদেবতার প্রতি তাঁহার সম্ভ্রম ঘোষণা করেন, পার্শীপোশাক এবং পবিত্র যজ্ঞসূত্র ও উত্তরীয় ('কুস্তী' ও 'সদরা') ধারণ করেন এবং পার্শী বর্ষপঞ্জী ও 'নওরোজ' (নববর্ষদিবস) পালনপ্রথা গ্রহণ করেন। পার্শীদিগের বিপদ-আপদও দেখা দেয়: ইব্রাহিম গজ্‌নভী (১০৭৯ খ্রী) এবং তৈমুর (১৩৯৮ খ্রী) কর্তৃক ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, ক্যাম্বে (১৬০০ খ্রী) এবং রারিয়র-এ শোচনীয় ঘটনাবলী (সন অজ্ঞাত), পর্তুগীজগণ কর্তৃক সন্‌জান শহরে লুণ্ঠন ও অত্যাচার (১৫৬০ খ্রী), মারাঠাগণ কর্তৃক সুরাট শহরে হানা এবং লুটপাট (১৬৬৪ খ্রী)—এই সকল অঘটন ঘটে। পার্শীসম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বও সময়ে সময়ে দেখা দিয়াছিল, যথা ভগর এবং সন্‌জান-এর পুরোহিতগণের মধ্যে দ্বন্দ্বকলহ (১৬৮৬ খ্রী) এবং বর্ষপঞ্জী লইয়া তীব্র মতবিরোধ (১৭২০ খ্রী)। পার্শী-গণের সততা, শ্রমশীলতা, অবস্থানুসারে সামঞ্জস্যপরায়ণতা, ফারসী ও গুজরাতী উভয় ভাষায় জ্ঞান এবং জাতিভেদের অভাব সুরাটের ইওরোপীয় বণিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বণিকদিগের পক্ষ হইতে একটি দৌত্যকার্য (মিশন) লইয়া বোস্তম মানেক সম্রাট ঔরঙ্গজেব সকাশে গমন করেন। পরে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পর্তুগীজদিগের এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান মুৎসুদ্দি নিযুক্ত হন। পর্তুগীজদের আমলে দোরাবজী নানাভাই ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বোম্বাই-এর 'প্যাটেল' বা প্রধান নিযুক্ত হন এবং ইহার পর ইংরেজ আমলেও প্যাটেল-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রুস্তমজী ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে সীদীদিগের আক্রমণের সময়ে বোম্বাই শহরের রক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। তদবধি বোম্বাইয়ের শ্রীবৃদ্ধিতে পার্শীসম্প্রদায়ের অবদান উল্লেখযোগ্য। বাণিজ্যে, শিক্ষায়, নারীপ্রগতিতে, দাতব্য-কার্যে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত মিলিতভাবে জনসেবায় এই সম্প্রদায়ের অবদান আরও উল্লেখযোগ্য। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে জাহাজ-নির্মাণের ক্ষেত্রে ওয়াডিয়া, দাতব্যের ক্ষেত্রে জামসেদজী জীজীভাই, বাণিজ্যে শিল্প-সাম্রাজ্য-স্রষ্টিকর্তা জামসেদজী টাটা, কলিকাতার কর্মবীর "বাবু" রুস্তমজী কাওয়াসজী, নারীশিক্ষায় সোরাবজী বঙ্গালী, সেবাসদন-এর বাইরামজী মালাবারী, দাতব্য-ক্ষেত্রে লেডী অরনবাই এবং লেডী জাহাঙ্গীর, সংবাদপত্র-সেবায় ফরদূনজী মার্জ্‌বান, ভারতবিদ্যায় জীবনজী মোদী, গান্ধীযুগের কবি ও সংস্কৃতভাষাবিদ্‌ এ. এফ. খবারকর, ভারতবিদ্যা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আইরাচ জাহাঙ্গীর সোরাবজী তারাপুরওয়ালা, জাতীয়তার সেবাক্ষেত্রে দাদাভাই নওরোজী, দীন্‌সা ওয়াচা এবং ফিরোজশাহ্‌ মেহতা প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। নিজস্ব সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের দাবি কোনও দিন উত্থাপন না করিয়াও এই

ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইতে বহু ব্যক্তি দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহে নির্বাচিত হইয়াছেন। লৌহ, বস্ত্র, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন ইত্যাদি দেশীয় মুখ্য-শিল্পপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পারসীগণ পথিকৃতের কাজ করিয়াছেন।

পারসীগণ বা জরথুষ্ট্র ধর্মাবলম্বীগণ সংখ্যায় ভারতে মাত্র ১২০০০০, ইরানে ১০০০০ এবং অন্যান্য দেশে প্রায় ২০০০০। ভিন্নধর্মীয়দিগকে ধর্মান্তরিত করিয়া লোক-সংগ্রহের প্রথা পার্শীগণ বর্জন করিয়া চলিয়াছেন। নিজস্ব ধর্ম আচরণ করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সংরক্ষণই পার্শীগণের মুখ্য সমস্যা। ভবিষ্যতে পার্শীসম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ডুবিয়া বিলীন হইয়া যাইতে পারে, এই আশংকায় পার্শীগণ ভিন্নধর্মীয়দের সহিত বিবাহাদি এড়াইয়া চলিয়াছেন।

আর্দেশীর দীনশা

পার্শ্বনাথ জৈনদের ২৩শ তীর্থংকর। ২৪শ ও শেষ তীর্থংকর মহাবীরের ২৫০ বৎসর পূর্বে (খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতক) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। গৃহস্থাশ্রমে ইনি বারাণসীর রাজপুত্র ছিলেন। পিতার নাম অশ্বসেন। মায়ের নাম বামা। কুশস্থলের রাজা প্রসেনজিতের কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। ৩০ বৎসর বয়সে পার্শ্ব সংসার ত্যাগ করেন। দীক্ষাগ্রহণের ৮৪ দিন পরে ইঁহার কেবলজ্ঞান লাভ হয়। তাহার পর ৭০ বৎসর তিনি ধর্মপ্রচারে রত থাকেন। ১০০ বৎসর বয়সে সম্মেত-শিখরে (পরেশনাথ পাহাড়) ইনি নির্বাণলাভ করেন। ইঁহার গায়ের রঙ্ নীল; লাঞ্ছন সর্প; চৈত্যবৃক্ষ ধাতকী; শাসনদেব পার্শ্বযক্ষ; শাসনদেবী পদ্মাবতী। পার্শ্বনাথ-সম্প্রদায়ের শ্রমণেরা ব্রহ্মচর্য ব্রতকে অপরিগ্রহ ব্রতের অন্তর্গত করিয়া ৪টি মহাব্রত পালন করিতেন বলিয়া পার্শ্বনাথ-প্রবর্তিত ধর্মকে চাতুর্যাম ধর্মও বলা হয়। পার্শ্বনাথ-পরম্পরার চতুর্থ পট্টধর কেশীকুমারের সহিত মহাবীরশিষ্য গৌতম গণধরের আলোচনার ফলে পার্শ্ব-নাথের শ্রমণ-সম্প্রদায় মহাবীরের শ্রমণ-সম্প্রদায়ে মিলিত হন।

দ্র বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত কল্পসূত্র, কলিকাতা, ১৯৩৩; পুরণচাঁদ শ্যামসুখা ও অজিতরঞ্জন ভট্টাচার্য-কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, কলিকাতা, ১৯৬০।

গণেশ লালওয়ানী

পালবংশ খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে শশাঙ্ক নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি পশ্চিমে কান্যকুব্জ (বর্তমান কনৌজ) ও দক্ষিণে গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইতিহাসে ইহাই বাঙ্গালীর প্রথম সাম্রাজ্য ('শশাঙ্ক' দ্র)।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ৭ম শতাব্দীর ৩য় বা ৪র্থ দশকে হর্ষবর্ধন ও কামরূপের অধিপতি ভাস্করবর্মনের আক্রমণের ফলে এই সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। তাহার পর প্রায় এক শতাব্দীকাল বাংলাদেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যের অভ্যুদয় হয় এবং ইহাদের পরস্পর আত্মকলহের ফলে বাংলার রাজতন্ত্র ধ্বংসপ্রায় হয়। তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে ৮০০ বৎসর পরে তিব্বতীয় বৌদ্ধ লামা তারনাথ লিখিয়াছেন: "সমগ্র দেশের কোনও রাজা ছিল না। প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ, বণিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করিতেন। ফলে সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না।" তারনাথের বিবরণ যে মোটামুটি সত্য, সমসাময়িক একখানি তাম্রশাসনে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শাসনে উল্লিখিত হইয়াছে যে বাংলায় "মাৎস্যন্যায়ের প্রাদুর্ভাব হইলে তাহা দূর করিবার জন্য প্রজাপুঞ্জ গোপালনামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে বরণ করে।" পূর্বোক্ত তাম্র-শাসনের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, অরাজকতার ফলে দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিলে ইহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য দেশের গণ্যমান্য ও শক্তিশালী নেতৃবৃন্দ গোপালনামক ব্যক্তিকে রাজপদে নির্বাচন করিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার হস্তে সমুদয় ক্ষমতা ছাড়িয়া দিলেন এবং প্রজাপুঞ্জ সানন্দে ইহা স্বীকার করিল। বিবাদরত নেতৃবৃন্দ এইরূপে যে রাজনৈতিক বিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিলেন, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল।

গোপাল বাংলাদেশের উত্তর ভাগে বরেন্দ্রভূমিতে এক বৌদ্ধপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ দয়িতবিষ্ণু বিদ্বান ছিলেন এবং পিতা বপ্যট যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন গোপালের বংশপরিচয় আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, গোপাল নিজেও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন এবং অন্যান্য অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন; নচেৎ দেশের মহাদুর্দিনে ঘোরতর অরাজকতার ফলে জনসাধারণ তাঁহাকে রাজপদে নির্বাচিত করিত না। গোপালের বংশধরগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

গোপাল রাজপদ লাভ করিয়া দেশের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করিলেন এবং সমস্ত বাংলা দেশকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ৭৫০ হইতে ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গোপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ধর্মপাল রাজা হন। ধর্মপাল ও তাঁহার পুত্র দেবপাল দুইজনেই দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন এবং এই সময়ের মধ্যে (৭৭০-৮৫০ খ্রী) আর্যাবর্ত অর্থাৎ হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিকাংশই তাঁহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ('ধর্মপাল' ও 'দেবপাল' দ্র)।

দেবপালের মৃত্যুর পরই পালসাম্রাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয়। দেবপালের পর বিগ্রহপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সহিত দেবপালের সম্বন্ধ সঠিক জানা যায় না। খুব সম্ভবতঃ ধর্মপালের ভ্রাতা বাকপালের পুত্র জয়পাল বিগ্রহপালের পিতা ছিলেন। জয়পাল পালরাজ্যের সেনাপতি ছিলেন। অসম্ভব নহে যে, দেবপালের মৃত্যুর পর অনুগত সৈন্যবলের সাহায্যে বৃদ্ধ সেনাপতি তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন এবং এই গৃহবিবাদই পালসাম্রাজ্যধ্বংসের অন্যতম কারণ।

বিগ্রহপাল শান্তিপ্রিয় ও সংসারবিরাগী ছিলেন এবং অল্পকাল রাজত্ব করিয়াই পুত্র নারায়ণপালের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। নারায়ণপালও পিতার অনুরূপ শান্তিপ্রিয় ছিলেন এবং অন্ততঃ ৫৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (৮৫৪-৯০৮ খ্রী)। এই সময়ে পশ্চিমে প্রতীহাররাজ ভোজ ও তৎপুত্র মহেন্দ্রপাল ধর্মপাল ও দেবপালের ন্যায় প্রবল শক্তিশালী হইয়া সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। সুযোগ পাইয়া রাষ্ট্রকূটরাজও পালরাজ্য আক্রমণ করেন এবং কামরূপ ও উৎকল রাজ্যও প্রবল হইয়া ওঠে। ফলে পালসাম্রাজ্য ধ্বংস হয় এবং বাংলা দেশের এক অংশও প্রতীহাররাজের অধীন হয়। কিন্তু নারায়ণপাল শেষ জীবনে প্রতীহাররাজের আধিপত্য দূর করিয়া বিহার ও সমগ্র বাংলায় স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করেন।

নারায়ণপালের পর যথাক্রমে তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল (আনুমানিক ৯০৮-৪০ খ্রী), তৎপুত্র দ্বিতীয় গোপাল (আনুমানিক ৯৪০-৬০ খ্রী) ও তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (আনুমানিক ৯৬০-৮৮ খ্রী) রাজত্ব করেন। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন নূতন রাজবংশের অভ্যুদয় হয় এবং বাংলা দেশেও কয়েকটি স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গের চন্দ্ররাজবংশ বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া ওঠে ও পালরাজ্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে কাম্বোজজাতীয় এক রাজবংশ আধিপত্য স্থাপন করে। এইরূপে ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে পালরাজগণ অতিশয় হীনবল হইয়া পড়েন এবং বঙ্গদেশের অধিকাংশই তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল পালবংশের লুপ্ত গৌরব ও শক্তি কতক পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। তিনি বাংলা দেশের পূর্ব সীমান্ত হইতে পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ এবং মিথিলাদেশ পালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দ্বিতীয় পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে তিনি "অনধিকৃত-বিলুপ্ত" পৈত্রিক রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পালবংশের দুর্দিনে বাংলায় যে সকল নূতন নূতন খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা পুনরায় পালরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এই দাবি যে অন্ততঃ কতক পরিমাণে সত্য পূর্ব বঙ্গে, উত্তর ও দক্ষিণ বিহারে ও কাশীর নিকটবর্তী সারনাথে প্রাপ্ত তাঁহার রাজ্যকালের লিপি হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। ইহা ছাড়াও তৎকালীন দুইটি প্রবল শক্তির সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বঙ্গদেশজয় সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই দক্ষিণ ভারতের রাজা পরাক্রান্ত রাজেন্দ্রচোলের সেনাপতি বাংলা দেশ আক্রমণ করেন এবং মহীপাল ও বাংলা দেশের অন্য কয়েকজন রাজাকে পরাজিত করেন। কিন্তু বাংলা দেশে চোলরাজ কোনও স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। আর এক পরাক্রান্ত বীর দিগ্বিজয়ী কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবও মহীপালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া বারাণসী অঞ্চলে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল (৯৮৮-১০৩৮ খ্রী) রাজত্ব করিয়া মহীপাল পরলোকগমন করিলে যথাক্রমে তাঁহার পুত্র নয়পাল (আনুমানিক ১০৩৮-৫৪ খ্রী) এবং তৎপুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৫৪-৭৪ খ্রী) রাজত্ব করেন। এই দুই রাজার রাজ্যকালে গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণ একাধিকবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। ফলে পালসাম্রাজ্য ধ্বংস হয় এবং বঙ্গদেশেও আবার কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপালের রাজ্যকালে সামন্তগণের এক বিদ্রোহের ফলে তিনি পরাজিত ও নিহত হন এবং কৈবর্তজাতীয় দিব্য উত্তর বাংলায় রাজা হন। মহীপাল তাঁহার দুই কনিষ্ঠ

ভ্রাতা রামপাল ও শূরপালকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহের সুযোগে তাঁহারা বিহারে পলাইয়া যান। উত্তর বঙ্গের কৈবর্ত-রাজা ও পূর্ব বঙ্গের বর্মবংশীয় রাজার মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। দিব্য পরাজিত হইলেও স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন এবং রামপাল প্রথমে বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার হস্ত হইতে পিতৃরাজ্য বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার করিতে পারেন নাই। দিব্যের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রুদোক এবং তৎপুত্র ভীম বরেন্দ্রের রাজা হন। বহু আয়াসসহকারে পালরাজগণের ভূতপূর্ব অনেক সামন্তরাজার সাহায্যে রামপাল ভীমকে পরাজিত ও বধ করিয়া পিতৃরাজ্য পুনরায় উদ্ধার করেন। সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিত কাব্যে বাংলাদেশের এই বিদ্রোহ, কৈবর্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও ধ্বংস এবং রামপালের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রামপাল সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহারে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং দ্বিতীয়বার পালরাজ্যের হৃত গৌরব ও শক্তি কতকটা ফিরাইয়া আনেন। তাঁহার ৫৩ রাজ্যসংবৎসরের লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কুমারপাল, তৎপুত্র তৃতীয় গোপাল ও রামপালের অপর পুত্র মদনপাল যথাক্রমে রাজা হন। মদনপাল ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে (১০৬৬ শকে) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্ততঃ ১৮ বৎসর রাজত্ব করেন। এই তিনজন রাজার রাজত্বকালে অন্তর্বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণের ফলে পালরাজ্য ধ্বংস হয়। দক্ষিণ বঙ্গে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে পালরাজ্যের প্রধান অমাত্য বৈদ্যদেব নৌযুদ্ধে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার পরে কামরূপরাজ বিদ্রোহ করিলে বৈদ্যদেব তাঁহাকে পরাজিত করিয়া নিজেই সেই রাজ্যের রাজা হন। কর্ণাটবংশীয় নান্যদেব মিথিলায় ও বিজয়সেন রাঢ়দেশে পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ চালুক্য-বংশীয় রাজপুত্র ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের বিজয়অভিযানের ফলেই এই দুই রাজশক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। পূর্ব বঙ্গে বর্মবংশ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ও ওড়িশার রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গদেব মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া গঙ্গাতীরবর্তী মন্দার প্রদেশ জয় করেন। গাহড়বালরাজগণও দক্ষিণ বিহার আক্রমণ করিয়া পাটনা পর্যন্ত অধিকার করেন।

মদনপাল বহু যুদ্ধ করিয়াও রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। সেনবংশীয় বিজয়সেন রাঢ়দেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিবার পরেও মদনপাল কিছুকাল উত্তর বঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু বিজয়সেন উত্তর বঙ্গ অধিকার করায় বঙ্গদেশে পালরাজত্বের অবসান হইল।

মদনপাল বিহারে ১১৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পর গোবিন্দপাল নামে একজন রাজা রাজত্ব করেন। কিন্তু পালরাজবংশের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ ছিল কিনা, জানা যায় না। কেহ কেহ পলপাল নামক এক রাজার নাম একখানি লিপিতে পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু এই পাঠসম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না এবং পলপাল-নামক কোনও রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহার সহিত পালবংশের কোনও সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না। সুতরাং নূতন কোনও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, মদনপালই গোপালদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের শেষ রাজা এবং ৪০০ বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করিবার পর (আনুমানিক ৭৫০-১১৬১ খ্রী) বাংলার এই প্রসিদ্ধ রাজবংশের বিলোপ হয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

পালযুগ পালযুগের প্রধানতম গুরুত্ব হইল বহির্বিশ্বের সঙ্গে পূর্বভারত তথা বাংলা দেশের বিস্তৃত যোগাযোগ এবং বাঙালীর শিল্প-সাহিত্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ। পাল-সম্রাটগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে বৌদ্ধ-ধর্মের পুনরুত্থান ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সহিত পূর্বভারতের এক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কেলুরক-লেখ হইতে জানা যায় যে, যবদ্বীপের (বর্তমান জাভা) শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের গুরু কুমারঘোষ ছিলেন গৌড়ের অধিবাসী এবং ৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মঞ্জুশ্রীর একটি মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। নালন্দা তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব তৎ-কর্তৃক নালন্দায় নির্মিত একটি বিহারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পালসম্রাট দেবপালের নিকট হইতে পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়া লইয়াছিলেন। এই নিবিড় সাংস্কৃতিক যোগা-যোগই যবদ্বীপে পালযুগের শিল্পের প্রভাব ব্যাখ্যা করে। ব্রহ্মদেশের কয়েকটি মন্দিরগোষ্ঠীর বিশিষ্ট স্থাপত্যশৈলীও বাংলা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের স্থাপত্যরীতির পরিচয় বহন করে বলিয়া মনে হয়। জাভায় আবিষ্কৃত কয়েকটি মূর্তির উপর ক্ষোদিত লিপির সহিত গৌড়ীয় লিপির সাদৃশ্যও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পালসাম্রাজ্য হইতে যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের একটি তালিকা তিব্বতী গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-ধর্মানুরাগী খ্রী-স্রঙ্‌-ল্দে-বত্‌সন শান্তিরক্ষিতকে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসারের জন্য তিব্বতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। ইহার পর পদ্মসম্ভবও তিব্বতে গিয়াছিলেন। যে সকল ভারতীয় তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নামই সর্বাধিক বিখ্যাত। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে তিনি সেখানে মহাযান মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।

ওদন্তপুরী, সোমপুর এবং বিক্রমশীলা বৌদ্ধবিহার পালযুগের আদি পর্বেই নির্মিত হইয়াছিল ('ওদন্তপুরী', 'পাহাড়পুর' ও 'বিক্রমশীলা' দ্র)। পালযুগে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বিহারগুলির মধ্যে ত্রৈকূটক, দেবীকোট, পণ্ডিত, সন্নগর, ফুল্লহরি, পট্টিকেরক, বিক্রমপুরী এবং জগদ্দল বিহারের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পালযুগে রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে মনে হয়, তখনকার বৌদ্ধধর্মের তিনটি সম্প্রদায় ছিল—বজ্রযান, সহজযান এবং কালচক্রযান। পক্ষান্তরে মাধ্যমিক, যোগাচার প্রভৃতি প্রাচীন মতবাদগুলির কেবলমাত্র নামেই অস্তিত্ব ছিল। অন্যদিকে শক্তিতন্ত্রের সহিত নূতন বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণের ফলে একটি নূতন শাক্তসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। এবং কয়েকটি লৌকিক ধর্মীয় সম্প্রদায়েরও উৎপত্তি হইয়াছিল। নূতন শক্তিতন্ত্রকে বলা হয় 'কৌল'।

বৈষ্ণবধর্ম সে সময়ে বাংলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। পাহাড়পুরের ভাস্কর্য হইতে মনে হয় যে, কৃষ্ণকাহিনী বৈষ্ণবধর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। খুব সম্ভব, পালযুগের শেষ অধ্যায়েই রাধা-কৃষ্ণ-কাহিনীর উদ্ভব হয়; কারণ দেখা যায় যে, ১২শ শতকের শেষের দিকে জয়দেবের রচনাকালে ইহা সু-প্রতিষ্ঠিত ছিল।

পালযুগের লেখমালায় শিব-উপাসনার খুব বেশি উল্লেখ নাই। কিন্তু ধর্মপালের রাজত্বকালে একটি চতুর্মুখ শিবমূর্তির প্রতিষ্ঠা এবং নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্র-শাসনে শিবভট্টারক এবং পাশুপতদের উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শেষোক্তটি পালযুগে শৈবধর্মের পাশুপত-সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রমাণিত করে। পালযুগের বহু সূর্য-মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। এ যুগের আবিষ্কৃত অন্যান্য মূর্তিও ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলির অস্তিত্ব বহন করে।

ভাষার গঠন এবং সাহিত্যের বিকাশের দিক হইতে বিবেচনা করিলে পালযুগকে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন হিসাবে ধরা যায়। মাগধী প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ হইতে একটি সঙ্গতিপূর্ণ প্রাচীন বাংলা ভাষা বিকাশ লাভ করে। এই ভাষার নিদর্শন হইল, মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত 'বৌদ্ধগান ও দোহা'। এই চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ১০ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত ('চর্যাগীত' দ্র)।

পালযুগের বিভিন্ন লেখমালা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তৃত চর্চার পরিচয় বহন করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ পালযুগের রচিত এযাবৎ প্রাপ্ত রচনাবলী খুবই সীমিত। রামচরিতপ্রণেতা কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামপালের সমসাময়িক ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চর্চাও পালযুগে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

পালযুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিশেষ বিকাশ ঘটিয়াছিল। পাহাড়পুরে যে বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীসরসী-কুমার সরস্বতী ইহাকে 'সর্বতোভদ্র' গঠনরীতির মন্দির বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহত্তর ভারতের, বিশেষতঃ ব্রহ্ম এবং যবদ্বীপের স্থাপত্যরীতির উপর ইহার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। পালযুগে লিখিত কতকগুলি পুঁথিতে যে সমুদয় চিত্র আছে, তাহা প্রাচীন বাংলার চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দ্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা, রাজশাহী, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ; নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ; রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, কলিকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ; R. C. Majumdar, ed., *History of Bengal*, Vol. 1, Dacca, 1943.

অমিতাভ ভট্টাচার্য

পালাগান সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'পর্যায়' শব্দ হইতে বাংলা পালা শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে। বিভিন্ন অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যেমন, মঙ্গলগানের এক-একটি অংশকে পালা বলা হইত। মঙ্গলবারে দিনের বেলায় যে অংশ গাওয়া হইত, তাহা মঙ্গলবারের দিবাপালা এবং রাত্রে যে অংশ গাওয়া হইত, তাহাকে মঙ্গলবারের নিশাপালা বলা হইত। যাত্রাভিনয়ের সম্পূর্ণ একটি বিষয়কেও পালা বলিত; যেমন তরণীসেনবধপালা, জয়দ্রথবধপালা ইত্যাদি। পূর্ববাংলা, প্রধানতঃ পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত গীতিকাগুলিকে (ballad) সাধারণভাবে পালা বা পালাগান বলা হয়;

যেমন চন্দ্রাবতীর পালাগান, বাত্মানী (মহুয়া)-র পালাগান ইত্যাদি।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

পালি ভাষা বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রধান ভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্যের প্রথম স্তরের সর্বভারতীয় সাধুভাষা। অশোকের গির্ণার শিলালেখের ভাষার সঙ্গে পালি ভাষার বিশেষ মিল আছে। কিন্তু পালি কোনও অঞ্চলের বা প্রদেশের ভাষা ছিল না। পালির উৎপত্তি লইয়া পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন। এখন মোটামুটি সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উজ্জয়িনী অঞ্চলের ভাষাই পালি ভাষার বীজ। বৌদ্ধ-ধর্মের (হীনযান মতের) কেন্দ্র যখন উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণে সরিয়া আসে, তখন হইতেই উজ্জয়িনী অঞ্চলে উদ্ভূত সার্বজনিক ভাষা (lingua franca) অবলম্বনে বৌদ্ধশাস্ত্র লিপিবদ্ধ ও বিরচিত হইতে থাকে। হীনযান মতের বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে হটিতে হটিতে সিংহলে চলিয়া যায় এবং সিংহল এই ভাষার ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রের চর্চার প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। 'পালি ভাষা' নামটি সিংহলের পণ্ডিত বুদ্ধঘোষেরই দেওয়া (খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী)। সংস্কৃত 'পারিভাষিক' ও 'পরিভাষা' মিলিত হইয়া সম্ভবতঃ পালিতে 'পারিভাসা' তাহা হইতে 'পালি ভাষা' (অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের ভাষা) হয়। এই শব্দটি বিশ্লিষ্ট হইয়া 'পালি ভাসা' বা 'পালি ভাষা' হইয়াছে।

পালি ভাষায় বিরাট সাহিত্য রচিত হইয়াছে। ধর্মমূলক হইলেও এ সাহিত্যে কাব্যের অর্থাৎ বিশুদ্ধ সাহিত্যের উপাদান যথেষ্ট আছে। 'জাতক' নামক কাহিনীগুলিতে প্রাচীন ভারতের লোকপ্রচলিত গল্পকথার ভাণ্ডার নিহিত। পালি সাহিত্যের কোনও কোনও পুরানো সংকলন গ্রন্থে—যেমন 'সুত্তনিপাত' 'থেরগাথা' 'থেরীগাথা' ইত্যাদিতে ভালো কবিতা যথেষ্ট আছে। 'ধম্মপদ' পালির সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত গ্রন্থ, ধর্ম ও নীতিশিক্ষার শ্লোকসংগ্রহ, পৃথিবীর সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই। ভারতীয় সাহিত্যে 'ধম্মপদে'র স্থান 'ভগবদ্গীতা'র পাশেই।

পালি ভাষা সংস্কৃত ভাষা ও প্রাকৃত ভাষার মধ্যবর্তী। প্রাকৃতের অপেক্ষা সংস্কৃতের সঙ্গেই ইহার মিল বেশি। সংস্কৃতের স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি প্রায় সবই পালিতে আছে। নাই ঋ (৯), ঐ, ঔ, শ, ষ, ঃ। দৈবাৎ র-ফলা ও ব-ফলা ব্যতীত কোনও সংযুক্ত (বিষম) ব্যঞ্জনধ্বনি পালিতে নাই ; হয় সেগুলি সমীভূত হইয়াছে, নয় পদের আদিতে থাকিলে একটি ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। যেমন —সংস্কৃত 'শ্রেষ্ঠ' : পালি 'সেট্‌ঠ'। 'ঋ' সাধারণতঃ অ-কার, ই-কার অথবা উ-কার হইয়াছে। যেমন—সংস্কৃত 'কৃষি, ঋষি, বৃদ্ধ' : পালি 'কসি, ইসি, বুড্‌ঢ'। ঐ, ঔ যথাক্রমে এ, ও হইয়াছে। যেমন—সংস্কৃত 'বৈর, সৌম্য' : পালি 'বের, সোম্ম'। পদান্তে কোনও একক ব্যঞ্জনধ্বনি পালিতে নাই, কেবল 'ম্' অনুস্বার হইয়া থাকে। যেমন, সংস্কৃত 'সরিৎ, অগ্নিঃ, নরম্' : পালি 'সরি, অগ্‌গি (অগ্‌গী), নরং। পদান্তে অ-কারের পর বিসর্গ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয়। সংস্কৃত 'মনঃ' : পালি 'মনো'। যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্ববর্তী দীর্ঘ স্বর পালিতে হ্রস্ব হয় ; যেমন, সংস্কৃত 'কার্য, দ্যুতি' : পালি 'কজ্জ, জুস্‌সতি'।

পালি ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃতের তুলনায় অনেকটা সহজ। শব্দরূপে স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দে পার্থক্য নাই। দ্বিবচন লুপ্ত। একবচনে তৃতীয়া ও পঞ্চমী প্রায়ই অভিন্ন এবং অ-কারান্ত শব্দ ছাড়া অন্যত্র চতুর্থীর একবচনের স্থানে ষষ্ঠীর একবচন ব্যবহৃত। বহুবচনে দ্বিতীয়া অন্য-রকম, তৃতীয়া-চতুর্থী-পঞ্চমী একরকম। কোনও কোনও পদে পুরানো বিভক্তি আছে বটে, তবে তাহা বৈদিক ভাষার, সংস্কৃতের নয়। যেমন, বৈদিক 'নরেভি' : সংস্কৃতে 'নরৈঃ' : পালি 'নরেভি, নরেহি'। পঞ্চমী ও সপ্তমীর একবচনে পুরানো বিভক্তি দেখা যায় এবং সর্বনাম পদ হইতে গৃহীত নূতন বিভক্তিও পাই। যেমন, সপ্তমী সংস্কৃত 'নরে' : পালি 'নরে, নরস্মিং (নরস্মি)'।

ক্রিয়ারূপে সরলতা আরও বেশি। দ্বিবচন, আত্মনে-পদ এবং লিট্ বিলুপ্ত। ভাববাচ্যে ও কর্মবাচ্যেও পরস্মৈপদ ধাতুর ব্যবহার হয়। লঙ্ ও লুঙ্ এক হইয়া গিয়াছে। ধাতুরূপে দশটি গণের মধ্যে দুইটি মাত্র আছে— ভ্বাদি (তুদাদি) এবং চুরাদি। একটি বিষয়ে পালির বৈচিত্র্য সংস্কৃতের তুলনায় বেশি। তাহা হইল অসমাপিকাপদ।

সুকুমার সেন

পালি সাহিত্য পালি ভাষা বুদ্ধের প্রাদুর্ভাবকালে বা তাহার কিছু পরে প্রচলিত ছিল ('পালি ভাষা' দ্র)। এই ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রচারিত হয়। অনেকে বলেন, পালি ভাষা থেরবাদী ভিক্ষুসমাজের ব্যবহারের উপযোগী এক কৃত্রিম ভাষা। পালি সাহিত্যে যেসকল গ্রন্থ পাওয়া যায় সেগুলি এক প্রাচীন (বৌদ্ধ) প্রাকৃত সাহিত্যে রচিত গ্রন্থের অনুবাদমাত্র। পালি সাহিত্যলিখনের প্রাচীনতম কাল প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী। সিংহলের

রাজা বত্তগামিনির (খ্রীষ্টপূর্ব ৮৮-৭৬) নির্দেশে পালি-ভাষায় বৌদ্ধ ত্রিপিটক (সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম পিটক) সিংহলে প্রথম লেখা হয়। ভারত, সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রের থেরবাদী বৌদ্ধদের শাস্ত্র এবং তাহার ভাষ্যাদি পালি ভাষায় লেখা। বৌদ্ধ শাস্ত্র ব্যতীত ইতিহাস, চরিতকাব্য, নীতিকাব্য, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ছন্দোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় লইয়া এক বিস্তৃত পরিধির সাহিত্য এই ভাষায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব যুগের শেষ ২-৩ শতক হইতে খ্রীষ্টোত্তর যুগের ২-৩ শতক পর্যন্ত ভারতে এই ভাষা সাধারণের সহজবোধ্য ছিল। তবে সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন রাষ্ট্রে ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দী, এমন কি বর্তমানকাল পর্যন্ত কোথাও কোথাও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে ঐ ভাষার বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

সুত্তপিটকে বৌদ্ধতত্ত্ব, বিনয়পিটকে ভিক্ষুদের শীল বা আচরণ ও সংঘের সংবিধান এবং অভিধম্মপিটকে তত্ত্ব-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানসম্পর্কে আলোচনা আছে। পিটকগুলি ছোটবড় বিভিন্ন গ্রন্থের সংকলন। সুত্তপিটকে ১৯খানি, বিনয়পিটকে ৪খানি ও অভিধম্ম-পিটকে ৭খানি গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে (‘পিটক’ ও ‘ত্রিপিটক’ দ্র)। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, অভিধম্মপিটক অপর দুই পিটকের তুলনায় পরবর্তী কালের রচনা। ভারতের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের মত পালি ত্রিপিটকে অর্বাচীন সংযোজনের অভাব নাই। তবে ত্রিপিটক শাস্ত্রের মূল অংশ সম্ভবতঃ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে সংকলিত হইয়াছিল।

ত্রিপিটক ছাড়া পালি সাহিত্যে তত্ত্বমূলক গ্রন্থের ভিতর মহাকচ্চায়নের ‘নেত্তিপকরণ’ এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহা বৈভাষিক বৌদ্ধদের জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্রের মতই থেরবাদীদের এক অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। ‘মিলিন্দ-পণ্‌হ’ও প্রাচীন পালি সাহিত্যের এক অভিনব গ্রন্থ। ভিক্ষু নাগসেন ও গ্রীক-রাজা মিলিন্দের (মেনেণ্ডার) কথোপকথন-ধারায় এই গ্রন্থ রচিত। প্রাচীন ভারতের সূক্ষ্মদর্শনচিন্তায় সমৃদ্ধ গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। এইসকল গ্রন্থের সঠিক সন-তারিখ লইয়া পণ্ডিতেরা একমত নহেন। সম্ভবতঃ এইগুলি খ্রীষ্টপূর্ব যুগের রচনা।

খ্রীষ্টোত্তর যুগের বৌদ্ধ মনীষীরা পালি ত্রিপিটকের বহু ভাষ্য ও টীকাটিপ্পনী রচনায় মন দেন। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকের পূর্বেকার প্রাচীন টীকা বা অট্‌ঠকথার (অর্থকথা) ভিতর মহা-অট্‌ঠকথা, মহাপচ্চরিয় আগম-অট্‌ঠকথা ও জাতক-অট্‌ঠকথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসকল গ্রন্থের লেখক ও রচনাকাল অজ্ঞাত। তবে বুদ্ধঘোষ (খ্রীষ্টীয় ৫ম শতক) তাঁহার রচিত টীকায় এইসকল গ্রন্থের সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী কালের রচিত টীকা-গ্রন্থের ভিতর বুদ্ধসীহের (আনুমানিক ৪র্থ শতক) বিনয়বিনিচ্ছয়, আনন্দের অভিধম্মটীকা, বুদ্ধদত্তের উত্তর-বিনিচ্ছয়, অভি-ধম্মাবতার, রূপারূপবিভাগ, বুদ্ধঘোষের (খ্রীষ্টীয় ৫ম শতক) সমন্তপাসাদিকা, কঙ্খাবিতরণী, ধম্মসঙ্গনী, ধম্মপালের (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক) নেত্তিপকরণ-অট্‌ঠকথা, উদান-অট্‌ঠকথা ইত্যাদি বিশেষ পরিচিত গ্রন্থ। এই যুগের তত্ত্বমূলক স্বতন্ত্র রচনার মধ্যে অনিরুদ্ধের অভিধম্ম-অথসংগহ’ খেমাচরিয়ের সুত্তসংগহ, পরিত্ত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

খ্রীষ্টীয় ১ম শতক হইতে পালি ভাষায় চরিতকাব্য লিখিত হইতে থাকে। ঐগুলির ভিতরে যে কেবল বুদ্ধ বা তাঁহার প্রিয় শিষ্যদের চরিত-কথা আছে এমন নয়, বৌদ্ধতত্ত্বের দুর্বোধ্য ভাবধারাকে সরস ও সাবলীল ছন্দের ভিতর দিয়া প্রকাশের চেষ্টাও ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। ‘জিনচরিত’ সেই দিক দিয়া পালি সাহিত্যের এক রসসমৃদ্ধ জীবনীকাব্য। সুমেধা ব্রাহ্মণে ও দীপঙ্কর বুদ্ধের কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া গৌতমবুদ্ধের অন্তিম জীবন পর্যন্ত এই কাব্যে ৪৭০ শ্লোকে চমৎকারভাবে বর্ণিত। মহাভারত, এমন কি কালিদাসের কাব্যের প্রভাব ইহার স্থানে স্থানে লক্ষিত হয়। মেত্তেয় (মৈত্রেয় বা ভবিষ্য) বুদ্ধের চরিত-কথা অনাগতবংস নামক কাব্যে ১৪২ শ্লোকে বিবৃত। রাজা কালানিতিস্‌সের (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৬-২০৭ অব্দ) জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত ৯৮টি গাথাসমন্বিত অজ্ঞাত লেখকের ‘তেলকটাহগাথা’ পালি চরিতকাব্য সাহিত্যের গৌরব বাড়াইয়া তুলিয়াছে। বুদ্ধপ্পিয়ের পজ্জমধু (১১০০ খ্রী), থেরবেদেহের রসবাহিনীও (খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতক) উল্লেখযোগ্য রচনা। বিখ্যাত টীকা-কার বুদ্ধঘোষের জীবনকথা অবলম্বনে পরবর্তী কালে ‘বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি’ চরিতকাব্য লেখা হয়।

পালি সাহিত্যে ইতিহাস ও বর্ণনামূলক রচনার মধ্যে লঙ্কাদ্বীপে বৌদ্ধধর্মপ্রচারের ইতিহাস ‘দীপবংস’ (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের পূর্ব ?) ও মহানামনের (খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের সিংহলরাজ ধাতুসেনের সমকালীন) ‘মহাবংস’ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। উপতিস্‌সের (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক) ‘মহাবোধি-বংস’, ‘গন্ধবংস’, ‘চুলবংশ’ সিংহলের বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ। ‘থূপবংস’ ও ‘দাঠাবংস’ প্রভৃতি গ্রন্থ মূলতঃ বৌদ্ধস্তূপাদির বর্ণনামূলক হইলেও প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ।

পালি ব্যাকরণ এবং তাহার টীকা, অভিধান, ছন্দ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণাদির প্রভাব লক্ষিত হয়। কচ্চায়ন (খ্রীষ্টীয় ৫ম শতক ?) ও মোগ্গলান পালি ভাষার প্রধান ব্যাকরণকার; ধম্মকীত্তির 'বালাবতার', 'রূপসিদ্ধি', 'মহানিরুত্তি', 'পয়োগসিদ্ধি' ইত্যাদিও পালিভাষার প্রসিদ্ধ ব্যাকরণগ্রন্থ। অভিধান, ছন্দ ও অলঙ্কার বিষয়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নাম করা যাইতে পারে। মোগ্গলানের 'অভিধানপ্পদীপিকা', থেরসজ্ঝরক্খিতের 'বুত্তোদয়' ও 'সুবোধালঙ্কার', 'কামন্দকী', 'ছন্দোবিচিতি', 'কবিসারপকরণ' ও 'কবিসারটীকানিস্সয়'।

সুনীতিকুমার পাঠক

পালুস্কর, দত্তাত্রেয় বিষ্ণু (১৯২১-৫৫ খ্রী) সংগীত-জগতে ডি. ভি. পালুস্কর নামে সুপরিচিত এবং অসামান্য কণ্ঠমাধুর্যের অধিকারী গায়ক। তিনি সংগীতাচার্য বিষ্ণু দিগম্বর পালুস্করের পুত্র। আট বৎসর বয়স হইতে পিতার শিক্ষাধীনে তিনি সংগীতচর্চা আরম্ভ করেন। দশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পরে পিতার শিষ্যদ্বয় বিনায়করাও পটবর্ধন ও নারায়ণরাও ব্যাসের নিকটেও সংগীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। সর্বসমক্ষে দত্তাত্রেয় সংগীতপ্রতিভার প্রথম পরিচয় দেন জলন্ধর সংগীত সম্মেলনে (১৯৩৫ খ্রী)। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই বেতারকেন্দ্রে কণ্ঠসংগীতের শিল্পীরূপে যোগদান করেন। ক্রমে ভারতের প্রায় সর্বস্থানের সংগীতসম্মেলনে আমন্ত্রিত হইয়া খেয়াল ও ভজনগানে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। ইনি ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের গায়ক-সদস্যরূপে চীনে গমন করিয়াছিলেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে ইহার অকালমৃত্যু হয়।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

পাল্লার দক্ষিণ ভারতীয় পূর্বগামী নদী। নদীটি মহীশূর উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর অববাহিকাদ্বয়ের মধ্য দিয়া বহিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। কাঞ্জিভরম ও ভেল্লোর শহর এই নদীর অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত।

সান্ত্বনা দাস

পাশা ক্রীড়াবিশেষ। প্রাচীন অক্ষক্রীড়ার পরবর্তী রূপ। বৈদিকযুগে বিভীতক বা বহেড়া হইতে অক্ষ নির্মিত হইত। মহেঞ্জো-দড়োর উৎখননে অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকা-নির্মিত ঘণকাকার অক্ষ পাওয়া গিয়াছে। দীর্ঘ চতুরস্র হস্তিদন্ত, রজত বা স্বর্ণনির্মিত শলাকাকে পাশক বলা হইত। আইন-ই-আকবরীতে যে পাশা খেলার বর্ণনা আছে, তাহাই বর্তমান কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। চারিজন বা দুইজন খেলোয়াড় লইয়া ইহা খেলা হয়। চারিজনের খেলাকে চৌপড় ও দুইজনের খেলাকে রঙ্ খেলা বলে। আকবর ১৬ জনের এক খেলা আবিষ্কার করেন, তাহার নাম 'চন্দেল মন্দেল'। তিনটি চতুরস্র হস্তিদন্তনির্মিত শলাকাবৎ অক্ষের প্রত্যেকটিতে চারিপলে যথাক্রমে ১, ২, ৬ ও ৫ টি বিন্দু থাকে। বিপরীত দিকের বিন্দুগুলির যোগফল হয় ৭। বর্তমানে প্রস্থে সাড়ে চার ইঞ্চি ও দৈর্ঘ্যে দুই ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি দুইটি বস্ত্রখণ্ডকে সমবাহুযুক্ত ক্রসের আকারে একটির উপর অপরটিকে সেলাই করা হয়। চারিটি বাহুর প্রত্যেকটিতে সমান তিন পংক্তি করিয়া (৩×৮) ২৪টি সমচতুষ্কোণ ঘর কাটিয়া লইতে হয়। এই ক্রসের মধ্যস্থলে অবস্থিত সমচতুষ্কোণ ঘরটি ছকের কেন্দ্র। প্রতি বাহুর মধ্যম পংক্তির শেষ ঘর এবং উভয় পার্শ্বের পংক্তির কেন্দ্র হইতে চতুর্থ ঘর × চিহ্নিত করিতে হয়। পেস্ট বোর্ড বা কাঠের উপরও এইরূপ ছক আঁকিয়া লওয়া হইয়া থাকে। গম্বুজাকৃতি চারিটি বিভিন্ন রঙ্-এর চারিটি করিয়া কাঠের ঘুঁটি ঐ ছকের উপর দিয়া চালাইয়া স্বক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিতে পারিলে জয় হয়। "ছয় তিন—নয়" "দশ ছয়—ষোল" "বারো পঞ্জা—সতেরো", এই তিনটি দানের যে কোনওটি পড়িলে হাত খোলে। 'অক্ষক্রীড়া' দ্র।

ত্রিদিবনাথ রায়

পাস্কাল, ব্লেইজ (১৬২৩-৬২ খ্রী) ফরাসী গণিতবিদ্, বিজ্ঞানী ও ধর্মীয় লেখক। বহুমুখী প্রতিভা ইহাকে আধুনিক যুগের চিন্তানায়কদের মধ্যে অত্যুচ্চ স্থানের অধিকারী করিয়াছে। ইনি ২০ বৎসর বয়সে হিসাব করিবার এক গাণিতিক যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৬৫১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গভীর মনোযোগের সহিত কাজ করিয়াছিলেন। উদস্থিতিবিদ্যায় 'পাস্কালের সূত্র' প্রসিদ্ধ। রাশিবিজ্ঞানের ভিত্তি সম্ভাবনাগণিতের তিনি জনক।

পাস্কালের রচিত 'লে প্রভিন্সিয়েল্‌স' (*Les Provinciales*) ১৯খানি পত্রসম্বলিত প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইহা 'জেস্যুইট' সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়া লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে পাস্কাল আধুনিক ফরাসী গদ্য সৃষ্টি করেন। অ্যাপোলজি (*Apologie*) গ্রন্থে ইহার গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, সত্যানুরাগ

ও ভগবৎপ্রেম ব্যতীত মুক্তি সম্ভব নয়। শেষের দিকে তিনি দরিদ্রের সাহায্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

কামিনীকুমার দে

পাসপোর্ট, ছাড়পত্র বিশেষ ধরনের দলিল যাহা ব্যতীত বৈধভাবে বিদেশভ্রমণ অসম্ভব। এই দলিলে উহার মালিকের নাগরিকত্ব ও ব্যক্তিগত পরিচিতি লিপিবদ্ধ থাকে। ইহার সাহায্যেই ভ্রাম্যমাণ নাগরিকের পক্ষে নিরাপদে বিদেশভ্রমণ সম্ভবপর হইয়া থাকে।

পাসপোর্টের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইনের কোনও নির্দিষ্ট বিধান নাই; ইহা বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সাধারণতঃ নিজস্ব নাগরিকদের পাসপোর্ট দেওয়া হয়; তবে অন্যদেশের নাগরিককেও পাসপোর্ট দেওয়ায় কোনও আইনগত বাধা নাই। জাতিসংঘ এবং রাষ্ট্র-সংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শরণার্থীদের জন্য বিশেষ ধরনের পাসপোর্ট ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ইহার ফলে শরণার্থীর পক্ষে অন্ততঃ রাষ্ট্রহীনতা-জনিত অসুবিধা কিছু পরিমাণে লাঘব হইয়াছে।

পাসপোর্টের জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দরখাস্ত পেশ করিতে হয়। দরখাস্তের সঙ্গে আবেদনকারীর অন্ততঃ দুইটি সাম্প্রতিক ছবি দাখিল করিতে হয়। ইহার একটি ছবি পাসপোর্টে সংলগ্ন করিতে হয়। দরখাস্তকারীর প্রদত্ত তথ্যাদি অনুসন্ধান করিয়া পাসপোর্ট দেওয়া হয় এবং তাহার জন্য একটি নির্দিষ্ট অর্থ আদায় করা হয়। পাসপোর্টটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (২ বা ৩ বৎসর) দেওয়া হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর পাসপোর্টধারক আবেদন করিলে মাত্র একবার উক্ত সময়ের জন্য পাসপোর্ট পুনঃপ্রদত্ত (renewed) হইতে পারে। তাহার পর উহা আপনা হইতেই বাতিল হইয়া যায়। যে দেশ পরিভ্রমণের জন্য পাসপোর্ট দেওয়া হয়, সেখানে যাইতে হইলে সেই দেশের কূটনৈতিক কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এই অনুমোদন 'ভিসা' নামে পরিচিত।

পাসপোর্ট পাওয়া ব্যক্তিগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইহা দেওয়া না দেওয়া অথবা বাতিল করিয়া দেওয়া সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

যদিও পাসপোর্ট-প্রথার বর্তমান রূপ প্রধানতঃ ১৬শ এবং ১৭শ শতাব্দী হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তথাপি এই প্রথার এক সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই প্রথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে পাসপোর্ট বা ছাড়পত্রকে 'মুদ্রা' নামে অভিহিত করা হইত এবং শান্তি ও যুদ্ধের সময়ে ইহার প্রচলন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে বাধ্যতামূলকভাবে পাসপোর্টব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যান্য বহু রাষ্ট্রে পাসপোর্টের শর্ত ও নিয়মাবলী পূর্বের চেয়ে কঠোরতর হইয়াছে।

রঘুবীর চক্রবর্তী

পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউট, কলিকাতা জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধকল্পে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনকল্যাণমূলক এক প্রতিষ্ঠান। এখানে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিরোধক টিকা (ভ্যাক্‌সিন) উৎপন্ন হয় ও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কেন্দ্রে এই টিকা প্রেরিত হয়। এখান হইতে জলাতঙ্ক রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের নির্দেশ দেওয়া হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের বহির্বিভাগে বৎসরে প্রায় ৮০০০ রোগীর চিকিৎসা হয়।

গণেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

পাস্তুর, লুই (১৮২২-৯৫ খ্রী) ভুয়োদর্শী ও মনস্বী ফরাসী বিজ্ঞানী। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর পূর্ব ফ্রান্সের ক্ষুদ্র দোল (Dole) শহরে এক চর্মব্যবসায়ীর পুত্ররূপে তাঁহার জন্ম হয়। বেজ়াঁস (Besancon) ও পারী শহরের শিক্ষায়তনে শিক্ষাসমাপ্তির পর পাস্তুর ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নে মৌলিক গবেষণার জন্য 'দক্ত্যর্-এস্-সিআঁস' উপাধি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন সময়ে দিজঁ, লিল্, সর্‌বন্, স্ত্রাস্‌বুর্গ প্রভৃতি প্রখ্যাত ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। কিছুকাল তিনি লিল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ফ্যাকাল্‌টির ডীন এবং একোল নর্মাল-এর বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের অধিকর্তাও ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জলাতঙ্ক রোগ সম্বন্ধে গবেষণা ও তাহার টিকা উৎপাদনের জন্য তাঁহার উদ্যোগে পারী শহরে 'ইন্‌স্টিটিউট পাস্তুর' নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়।

কর্মজীবনের প্রারম্ভে পাস্তুরের গবেষণা মুখ্যতঃ জৈব রসায়নেই সীমাবদ্ধ ছিল; সেই সময়ে রেসিমিক অ্যাসিড সম্বন্ধে তাঁহার মৌলিক গবেষণার ফলে লিভোটার্টারিক অ্যাসিড আবিষ্কৃত হয়। ক্রমে সন্ধান (ফার্মেণ্টেশন) সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয় যে আণু-বীক্ষণিক জীবের ক্রিয়াই বিভিন্ন প্রকার সন্ধানের মূল

কারণ। উত্তাপের দ্বারা জীবাণু নাশ করিয়া খাদ্যকে বায়ুহীন আধারে সংরক্ষণ করিলে জীবাণুর সংক্রমণ ও তজ্জনিত সন্ধান রোধ করা যায়, পাস্তুরের এই আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিয়াই খাদ্যসংরক্ষণের 'প্যাস্টেরাইজেশন' নামক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। অজৈব পদার্থ হইতে আপনাআপনিই জীবের জন্ম (স্বতঃজনন বা স্পণ্ট্যানিয়াস জেনারেশন) যে অসম্ভব এবং জীব হইতেই যে জীবের জন্ম হয়, পাস্তুর ইহা প্রমাণ করেন; ফলে জীবাণুবাদ বা জার্ম থিওরী প্রতিষ্ঠালাভ করে।

মদ্যের পচনের কারণ নির্ণয় করিয়া তিনি মদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। দক্ষিণ ফ্রান্সে রেশমকীটের মহামারী প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবনের জন্য আহূত হইয়া পাস্তুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঐ রোগের জীবাণু ও রোগপ্রতিষেধের উপায় আবিষ্কার করেন। মুরগির কলেরা রোগের জীবাণু এবং রোগনিবারক টিকাও তাঁহারই আবিষ্কার। গবাদি পশুর মারাত্মক অ্যানথ্রাক্স রোগ সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার ফলে ঐ রোগের টিকাও উদ্ভাবিত হয়।

মানবচিকিৎসায় ও পশুপালনে পাস্তুরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান মারাত্মক জলাতঙ্ক রোগ সম্বন্ধে গবেষণা ও তাহার প্রতিষেধক টিকা উদ্ভাবন ('জলাতঙ্ক' দ্র)।

নিরভিমানী ও নিরলস বিজ্ঞানসাধক পাস্তুর ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি, ফ্রান্সের চিকিৎসাবিদ্যা আকাদমি, বিজ্ঞান আকাদমি, ফরাসী আকাদমি প্রভৃতি নানা বিদ্বৎসভার সদস্যপদে বৃত হন।

লুই পাস্তুর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন।

পাহাড়পুর (২৫° ২´ উত্তর ও ৮৯° ৩´ পূর্ব) পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত একটি গ্রাম। জামালগঞ্জ রেলস্টেশনের ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। সমতল ভূমির উপর স্থিত এই গ্রামের পরিপার্শ্বে কোনও পাহাড় নাই। উত্তর পার্শ্বস্থ ৭০-৮০ ফুট উচ্চ টিপিটির জন্যই সম্ভবতঃ গ্রামটির এই নামকরণ। পালরাজবংশের আমলে এই স্থানের নাম ছিল সোমপুর। প্রাক্-পালযুগে টিপিটির পার্শ্ববর্তী স্থানের নাম ছিল বটগোহালী; এখানকার প্রাচীনতম নিদর্শন হইতেছে ১৫৯ গুপ্তাব্দের (৪৭৯ খ্রী) একটি তাম্রপট্ট। ইহার লেখ হইতে জানা যায়, এক ব্রাহ্মণদম্পতি বটগোহালীতে নির্গ্রন্থ শ্রমণাচার্য গুহনন্দীর শিষ্যপ্রশিষ্যাধিষ্ঠিত বিহারে অর্হৎদের গন্ধ-ধূপ-দীপ-ফুল দ্বারা পূজার জন্য এবং তলবাটকের জন্য এক কুল্যবাপ ও চার দ্রোণবাপ জমি দান করিয়াছিলেন। কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান তীর্থঙ্করের একটি ব্রোঞ্জমূর্তি ব্যতীত বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য জৈন প্রত্নবস্তু পাওয়া যায় নাই।

গুপ্তোত্তর যুগে এখানে একটি সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ্য দেবায়তন ছিল। এই দেবায়তনটির অধিকাংশ প্রস্তরের মূর্তি পরে মূল বৌদ্ধ মন্দিরে ব্যবহৃত হইয়াছিল। শিব, বিভিন্ন লীলায় কৃষ্ণ, দিক্‌পাল, গ্রহদেবতা, বলরাম, যমুনা, অন্নপূর্ণার নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী শিব, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবী-রূপায়িত এই মূর্তিগুলির ভাস্কর্যশৈলী অনবদ্য।

এখানে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয় পালবংশীয় ধর্মপালের (আনুমানিক ৭৭০-৮১০ খ্রী) সময়ে। এই বৌদ্ধ নৃপতি এই স্থলে এক বিরাট বৌদ্ধ সংঘারাম ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সোমপুরে শ্রীধর্মপালদেব মহাবিহার বলিয়া প্রসিদ্ধ এই সংঘারামটি ভারতবর্ষে অদ্যাপি আবিষ্কৃত সংঘারামগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

পালবংশ কর্তৃক সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটির ভাগ্যও এই রাজবংশের সমৃদ্ধি ও বিপত্তির সঙ্গে বহুলাংশে জড়িত। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শেষপাদে প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপাল পালরাজ্যের খানিকটা অংশ সাময়িকভাবে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই মহেন্দ্রপালের পঞ্চম সংবৎসরে উৎকীর্ণ এবং ভিক্ষু অজয়গর্ভ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সলেখ স্তম্ভ মুখ্য মন্দিরের দ্বিতলের উত্তর মণ্ডপে পাওয়া গিয়াছে। পালরাজ প্রথম মহীপাল (আনুমানিক ৯৮৮-১০৩৮ খ্রী) পালসাম্রাজ্যের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সোমপুরের প্রতিষ্ঠানেরও সমৃদ্ধি বর্ধিত হয়। এই সময়ে মুখ্য মন্দির ও সংঘারামের জীর্ণোদ্ধার হয় এবং অনেক ক্ষুদ্রাকার সৌধ ও স্তূপ নির্মিত হয়। বিপুলশ্রীমিত্রের নালন্দালেখ (১২শ শতকের প্রথমার্ধ) হইতে জানা যায়, বঙ্গাল সৈন্য কর্তৃক সোমপুর বিহার দগ্ধ হয় এবং এই অগ্নিতে করুণাশ্রীমিত্র (ইঁহার শিষ্যের প্রশিষ্য বিপুলশ্রীমিত্র) দেহত্যাগ করেন। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই ১১শ শতকের শেষভাগে রামপালের (আনুমানিক ১০৭৭-১১২০ খ্রী) রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠানটির সমৃদ্ধি পুনরায় ফিরিয়া আসে। উপরি-উক্ত নালন্দালেখ হইতে জানা যায়, বিপুলশ্রীমিত্র নিজেও সোমপুরের চতুঃশালা সংঘারামের সংস্কার সাধন করেন এবং অষ্টমহাভয়তারিণী তারার মন্দির নির্মাণ করেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্মী সেনরাজবংশের আমলে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি রাজপোষকতা হইতে বঞ্চিত হয় এবং মুসলমান আমলে প্রতিষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

তিব্বতীয় গ্রন্থাবলীতে সোমপুর মহাবিহারের খ্যাতি প্রচুর। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ (১১শ শতক) এই সংঘারামে দীর্ঘকাল যাপন করেন। অতীশের গুরু রত্নাকর শান্তি এই বিহারের স্থবির ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৯ম শতক হইতে ১২শ শতক পর্যন্ত বহু তিব্বতীয় ভিক্ষু সোমপুর-তীর্থে আসেন।

সুউচ্চ ঢিপি হইতে উদ্ঘাটিত ধর্মপালদেবের মহা-বিহারটি আয়তনে ও পরিকল্পনায় বলিতে গেলে অদ্বিতীয়। চতুঃশালা ইষ্টকের সংঘারামটির প্রতিপার্শ্বের দৈর্ঘ্য ৮২২ ফুট। একটি বিরাট অঙ্গনের চতুর্দিক ঘিরিয়া ১৭৭টি আবাসকক্ষ। উত্তর পার্শ্বের মধ্যভাগে প্রবেশিকা মণ্ডপ ও সোপান; বাকি তিন দিকের মধ্যভাগে বিশেষ ধরনের প্রকোষ্ঠসমষ্টি। কক্ষাবলীর সম্মুখে টানা বারান্দা। পরবর্তী কালে অনেকগুলি কক্ষে মূর্তিপূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; মূর্তিগুলির বেদিই কেবল পাওয়া গিয়াছে।

অঙ্গনের মধ্যভাগে প্রাচীরপরিবেষ্টিত ও ইষ্টকনির্মিত মুখ্য দেবায়তন। এইটি ক্রমক্ষীয়মাণ ত্রিতল। সর্বোচ্চ তল বর্গাকার। ইহার সামান্য অংশই বিদ্যমান। অনেকে মনে করেন এই তলে ছিল মুখ্য মন্দির। আবার অনেকের ধারণা এই তলে ছিল স্তূপ এবং বিদ্যমান বর্গাকার অংশ স্তূপটির বেদি; কেননা এই তলে জনসাধারণের আরোহণের জন্য কোনও সোপানের ব্যবস্থা নাই। বর্গাকার অংশের নীচের দিকের প্রতি পার্শ্বের মধ্যভাগে একটি করিয়া আয়ত প্রলম্বন, তাই দ্বিতলের বাস্তনকশা ত্রিরথ। প্রতি প্রলম্বনে একটি করিয়া মন্দির ও তৎসম্মুখে সস্তম্ভ মণ্ডপ। মন্দিরে সম্ভবতঃ বুদ্ধমূর্তি ছিল। দ্বিতলের প্রান্তদেশে ৯ ফুট চওড়া প্রদক্ষিণপথ। প্রদক্ষিণপথের বহির্দিকে প্রশস্ত বাতায়নযুক্ত দেওয়াল। সর্বনিম্নতলের বাস্তনকশা পঞ্চরথ। ইহারও প্রান্তে প্রদক্ষিণপথ। নিম্নতলের সু-উচ্চ বেদি তিন দিকে পঞ্চরথ। উত্তর দিকে এইটি সপ্তরথ; কেননা এই দিকে সোপান রহিয়াছে। এই বেদিটি উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬ ফুট ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৪ ফুট ৩ ইঞ্চি। বেদি ও প্রদক্ষিণপথের দেওয়ালগাত্রের অলংকরণ অপরূপ। বিচিত্র নকশায় ক্ষোদিত পোড়ামাটির ফলকে গাত্রদেশ সুসজ্জিত। অলংকরণের বিষয়বস্তুও ব্যাপক—বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর মূর্তি; বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, নাগ; বিভিন্ন কার্যকলাপে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, জলচর জীব, ফুল, বৃক্ষ, শঙ্খ, চক্র, পুথি, জলপাত্র ইত্যাদি। বেদির গাত্রে এইসব পোড়ামাটির ফলক ছাড়াও ৬৩টি প্রস্তরের মূর্তি। কুলুঙ্গির মধ্যে সন্নিবেশিত মূর্তিগুলির অধিকাংশই ব্রাহ্মণ্যধর্মী। কতকগুলির বিষয়বস্তু কৃষ্ণ ও রামের জীবনী, কতকগুলিতে শিব, বলরাম, দিক্‌পাল, গ্রহদেবতা, যমুনা ইত্যাদি দেব-দেবীর রূপ। এই মূর্তিগুলির অধিকাংশই প্রাচীনতর কোনও এক ব্রাহ্মণ্যমন্দির হইতে সংগৃহীত।

অঙ্গনটিতে মুখ্য মন্দির অতিরিক্ত বেশ কয়েকটি স্তূপ ও ক্ষুদ্রাকার সৌধের অবশেষ বিদ্যমান। এইগুলির অধিকাংশই পরবর্তী কালের। উদ্ঘাটিত বস্তুরাজির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বুদ্ধ ও জন্তুলের ব্রোঞ্জ-মূর্তি; সুধাকর্মের (স্টাকো) কয়েকটি মূর্তির মস্তকভাগ এবং প্রস্তরের হেবজমূর্তি। শেষোক্ত মূর্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে, শেষ আমলে সোমপুর বা মহাবিহারবাসী ভিক্ষুগণ বজ্র-যানপন্থী হইয়াছিলেন। উমা, মহেশ্বর ও গণেশের মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে।

সংঘারামটির প্রায় ৩০০ গজ পূর্বে সত্যপীরের ভিটা নামক অনুচ্চ ঢিপিটি খননের ফলে একটি ইটের মন্দিরের নিম্নাংশ অনাবৃত হইয়াছে। মন্দিরটির গর্ভগৃহের সম্মুখে একটি সস্তম্ভ মণ্ডপ। মণ্ডপ ও গর্ভগৃহকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণপথ। প্রদক্ষিণপথের দক্ষিণ দিকে প্রবেশিকা মণ্ডপ। গর্ভগৃহে বিগ্রহ পাওয়া যায় নাই। তবে মন্দিরের অঙ্গনে প্রাপ্ত প্রায় পঞ্চাশটি পোড়ামাটির ফলকে অষ্টভুজা তারামূর্তি বিদ্যমান; ফলকগাত্রে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের হরফে লেখা বৌদ্ধধর্ম-সারগাথা আছে। এই ফলকগুলি হইতে অনুমান করা হয়, মন্দিরটি ছিল অষ্টমহাভয়তারিণী তারার এবং এই তারার মন্দিরটিই বিপুলশ্রীমিত্র ১২শ শতকে পুনর্নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দির-চত্বর হইতে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর মধ্যে তিনটি পোড়ামাটির ফলক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের গাত্রে ধ্যান-মুদ্রায় বুদ্ধদেবের মূর্তি। ইহাদের একটি পৃষ্ঠদেশের গর্তে আবার ২টি গোলাকার চাকতি; এই চাকতিদ্বয়ে ধারণী উৎকীর্ণ। মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষের উপরে মুসলমানযুগের একটি ইষ্টকের পাকাঘরের নিম্নাংশ পাওয়া গিয়াছে।

দ্র A. Cunningham, *Archaeological Survey of India Report*, vol. XV, Calcutta, 1882; K. N. Dikshit, *Excavations at Paharpur, Bengal, Memoirs of the Archaeological Survey of India*, no. 55, Delhi, 1938.

দেবলা মিত্র

পাহাড়ী হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণবর্তী ভূ-ভাগে কাশ্মীরের পূর্ব দিক হইতে নেপাল পর্যন্ত পাহাড়ী ভাষার প্রচলন। 'গ্রিয়র্সন' পাহাড়ী ভাষাগুলিকে একটি স্বতন্ত্র

সমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এগুলিকে পৈশাচী 'দরদ' অথবা 'খস' প্রাকৃতের উপর ভিত্তি করিয়া মধ্যযুগে ইহার উপর রাজস্থানের প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষাগুলির প্রভাব ঘোষণা করিয়াছেন। পাহাড়ী ভাষাগুলির উপর 'দরদ' ভাষাগুলির কিছু ধ্বন্যাত্মক বিশেষত্ব দেখা যায়। যেমন ঘোষ প্রাণের জায়গায় অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি হইয়া যায়।

পাহাড়ী ভাষাগুলি ৩টি ভাগে বিভক্ত: ১. পূর্ব পাহাড়ী—নেপালী, খসকুরা, গোর্খালী ভাষা ২. মধ্য পাহাড়ী—কুমায়ুন এবং গাড়োয়ালী ভাষা, উত্তর প্রদেশের সাতটি জেলাতে ১৬ লক্ষ লোক এই ভাষা ব্যবহার করে। কুমায়ুনদের আবার ৮টি এবং গাড়োয়ালীদের ৯টি উপভাষা আছে ৩. পশ্চিম পাহাড়ী—একটি সামূহিক নাম; জৌনসার, বাবর ও হিমাচল প্রদেশে প্রচলিত। ইহার ভাষাভাষীর সংখ্যা ১০ লক্ষ।

রামঅধার সিংহ

পাহাড়ী চিত্রকলা পাহাড়ী কলম (সম্প্রদায়)—গাড়-ওয়ালের চিত্রকলা। ১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জম্মু হইতে গাড়ওয়ালের পূর্ব পর্যন্ত হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকায় যে চিত্রকলার উদ্ভব হয়, তাহাই কাংড়া অথবা পাহাড়ী কলম বলিয়া খ্যাত। ইহার মূলে মোগল ও রাজপুত চিত্রশিল্পীদের খানিকটা প্রভাব দৃষ্ট হয়। গাড়ওয়ালের চিত্রাবলী পাহাড়ী কলমের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহার মৌলিকতা সর্বজনস্বীকৃত। এখানকার উল্লেখযোগ্য শিল্পী মোলা রাম (১৭৬০-১৮৩৩ খ্রী) চিত্রাঙ্কণের নূতন একটি রীতির প্রবর্তক। নরনারীর প্রতিমূর্তি, জীবজন্তুর ছবি, পর্বত, বনানী এবং পল্লী-জীবনের দৃশ্য গাড়ওয়ালের চিত্রা-বলীর লক্ষণীয় বিষয়। এই সঙ্গে রেখার নৈপুণ্য ও রঙের বৈচিত্র্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'চিত্রকলা' দ্র।

বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

প্যারাস্যুট প্যারাস্যুট শব্দটির অর্থ পতননিরোধক। কোনও উচ্চস্থান হইতে ছাড়িয়া দিলে বাতাসের সংস্পর্শে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা ছত্রাকার ধারণ করে এবং বাতাসের উর্ধ্বচাপের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ইহার পতন বিলম্বিত হয়। ক্যাপ্টেন বেরী ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম উড়োজাহাজ হইতে প্যারাস্যুটের সাহায্যে অবতরণ করেন।

একটি প্যারাস্যুটের মোটামুটি পাঁচটি অংশ থাকে: ১. ছত্রাক (ক্যানোপি) ২. ছত্রাকের বিভিন্ন দড়িদড়া (শ্রাউড লাইন্‌স), ৩. পাইলট স্যুট ৪. ছত্রাকের আধার (কন্‌টেনার) ৫. জোয়াল (হার্‌নেস)।

প্যারাস্যুটের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ছত্রাকই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইহা খুব শক্ত কাপড়ের ছোট ছোট খণ্ডের দ্বারা তৈয়ারি এবং সাধারণতঃ ২২-২৪ ফুট ব্যাসের হয়। বহনকারীর সুবিধার জন্য প্যারাস্যুটকে বিভিন্নভাবে বহন করিবার প্রথা আছে; যথা—সিট প্যাক, বেলুন প্যাক ইত্যাদি।

বিমানপোত হইতে প্যারাস্যুটের সাহায্যে অবতরণের জন্য সাধারণতঃ লাফাইয়া পড়ার পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়।

এই শতাব্দীর গোড়ায় দিকে প্রধানত: বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করিবার জন্যই প্যারাস্যুটের ব্যবহার হইলেও বর্তমানে দুর্গমস্থানে মানুষ বা রসদ নামাইবার জন্যও ইহা বহুল ব্যবহৃত হয়।

সুধেন্দুপ্রসাদ বসু

পিগু, আর্থার সিসিল (১৮৭৭-১৯৫৯ খ্রী) একজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্। আলফ্রেড মার্শালের পর ১৯০৮ হইতে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল ইকনমির প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। কল্যাণ অর্থনীতিতে (welfare economics) তাঁহার বিশেষ অবদান আছে। পিগু বলেন যে, সমাজের অভীষ্ট সম্পদ নয়, কল্যাণের সর্বাধিককরণ। সমাজের কল্যাণ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—জাতীয় আয়ের পরিমাণ, তাহার বণ্টন ও তাহার স্থিরতা।

নিয়োগ ও উৎপাদনতত্ত্বে পিগুর চিন্তাধারা ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌দের মত। তিনি শ্রমের পূর্ণনিয়োগ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে জন কেইন্স-এর সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘ বিতর্ক হয় এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'পিগু প্রভাব' ('পিগু এফেক্ট') প্রবর্তন করিয়া পূর্ণ-নিয়োগতত্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন।

পিগু ব্যবসায়-বাণিজ্যের চক্রাকার উত্থান-পতনের বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং উহা নিয়ন্ত্রণের কতকগুলি উপায় নির্দেশ করেন। তাঁহার মতে ব্যবসায়ীদের লাভ-ক্ষতিসংক্রান্ত আশা-আশঙ্কাই অর্থ-নৈতিক স্থিতির অভাবের জন্য দায়ী।

পিগুর রচিত পুস্তকগুলি হইল 'ওয়েল্‌থ অ্যাণ্ড ওয়েল্‌-ফেয়ার' (১৯১২ খ্রী—পরে 'দি ইকনমিক্‌স অফ ওয়েল্‌-ফেয়ার, ১৯২৯ খ্রী), 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফ্লাক্‌চুয়েশান্স'

(১৯২৭ খ্রী), 'এ স্টাডি ইন পাব্‌লিক ফাইনান্স' (১৯২৮ খ্রী), 'দি থিওরি অফ আনএম্প্লয়মেণ্ট (১৯৩৩ খ্রী), 'এম্প্লয়মেণ্ট অ্যাণ্ড ইকুইলিব্রিয়াম' (১৯৪১ খ্রী), 'ল্যাপ্সেস ফ্রম ফুল এম্প্লয়মেণ্ট' (১৯৪৫ খ্রী)।
দ্র Colin Clark, 'On Pigu', *The Development Economic Thought*, H. W. Spiegel, ed. London, 1952.

জবা গুহ

পিঙ্গল নব্য ভারতীয় আর্যভাষা সাহিত্যের ব্যবহারে প্রচলিত হইবার পরেও অনেক কাল ধরিয়া উত্তর ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে অবহট্‌ঠ ভাষায় ও ছন্দে কবিতা এবং গান রচিত হইত। রাজস্থানে এ ব্যাপার আরও বেশি দিন পর্যন্ত চলিয়াছিল। সেখানে কথ্য ভাষার (অর্থাৎ স্থানীয় নব্য ভারতীয় আর্যভাষা—রাজস্থানী) সঙ্গে অবহট্‌ঠ রচনার পার্থক্য বুঝাইতে দুইটি নাম চলিত হইয়াছিল। অবহট্‌ঠ রচনার (ও সে রচনার ভাষার) নাম ছিল 'পিঙ্গল'। আর দেশী ভাষার তদাশ্রিত রচনার নাম ছিল 'ডিঙ্গল'। 'পিঙ্গল' নামটি আসিয়াছে, প্রাকৃত ও অবহট্‌ঠের ছন্দঃশাস্ত্রকার 'পিঙ্গল' হইতে। পুরানো বাংলা সাহিত্যে ভাটদের ভাষা বলিয়া পিঙ্গল 'ভট্টভাষা' নামেও উল্লেখিত। 'ডিঙ্গল' মানে গ্রাম্য লোকের ভাষা।

সুকুমার সেন

পিঞ্জোর পাঞ্জাব রাজ্যের রাজধানী চণ্ডীগড়ের সন্নিকটে (৩০° ৪৮′ উত্তর ও ৭৬° ৫৯′ পূর্ব) পিঞ্জোর তহসিলের প্রধান কেন্দ্র। চণ্ডীগড় হইতে সড়কপথে ইহার দূরত্ব মাত্র ২১ কিলোমিটার। মহাভারতে এই স্থানের উল্লেখ আছে। অনুমান, পাণ্ডবেরা তাঁহাদের দ্বাদশ বর্ষ নির্বাসন ভোগ করিবার সময়ে এই স্থানে আসেন। পিঞ্জোরে বহু প্রাচীন হিন্দুযুগের ধ্বংসাবশেষ আছে ও সংস্কৃতে লেখা একটি প্রাচীন শিলালিপির অংশবিশেষ রক্ষিত আছে। এখানকার ধারামণ্ডল নামে পুষ্করিণীটি পবিত্রতার জন্য খ্যাত।

এখানে একটি মনোরম উদ্যান আছে। ১৭শ শতাব্দীতে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের অধিনায়ক ফাদাই খান এই বিখ্যাত উদ্যানের পরিকল্পনাটি রূপায়িত করেন।

পাঞ্জাব সরকারের সহায়তায় পিঞ্জোরে অত্যাধুনিক হালকা যন্ত্রপাতির নির্মাণকারখানা—হিন্দুস্থান মেসিন টুল্‌স স্থাপিত হইয়াছে।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

পিটক পিটক শব্দের অর্থ ঝুড়ি, ভাণ্ড বা মঞ্জুষা। মতান্তরে বৌদ্ধ ভাবধারা। পারিভাষিক অর্থ 'পরিয়ত্তি ভাজন' অর্থাৎ গ্রন্থাধার বা পালি ত্রিপিটক। সুত্র বিনয় এবং অভিধর্মের তিনটি পিটকে অর্থাৎ ব্যবহার, আজ্ঞা ও প্রজ্ঞাদেশনায় বুদ্ধ, সঙ্ঘ এবং সদ্ধর্ম-কথা উপদিষ্ট হইয়াছে ভারহুত স্তূপে পিটকে যাহার অধিকার আছে এই অর্থে "পৈটকী" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

সম্প্রদায়ভেদে পিটকসমূহের বিভিন্ন আকার ও নানা ভেদ বর্তমান; সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র পিটক এবং অনুপিটক দুই ভাগে বিভক্ত। 'ত্রিপিটক' দ্র।
দ্র বেণীমাধব বড়ুয়া, বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ, কলিকাতা, ১৯৩৬।

পিণ্ডারী অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত মধ্যভারতের এক কুখ্যাত লুণ্ঠনকারী দস্যুদল। কথিত আছে, 'পিণ্ড' নামক একপ্রকার মদ্যের প্রতি ইহাদিগের অত্যধিক আসক্তির জন্যই তাহারা ইতিহাসে পিণ্ডারী নামে পরিচিত হইয়াছে। পিণ্ডারীগণ আদৌ মারাঠা সৈন্যবাহিনীর সহিত অবৈতনিক খণ্ডযোদ্ধা ও লুঠেরা হিসাবে যুক্ত ছিল; সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল-মারাঠা সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাদের নাম প্রথম শ্রুত হওয়া যায়। ১৮শ শতাব্দীর সর্বাঙ্গীণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে তাহারা ক্রমশঃ স্বতন্ত্রভাবে দলবদ্ধ হয় ও দস্যুতা ও লুণ্ঠনকার্যকে একমাত্র পেশারূপে গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়গণ প্রায় সকলেই পাঠানজাতীয় হইলেও তৎকালীন সর্বজাতীয় বেপরোয়া, লুণ্ঠনলিপ্সু লোকই এই দলে যোগ দিয়াছিল। দলের সর্দারগণের মধ্যে করিম খাঁ, ওয়াসিল মুহম্মদ, হিরু, বুরণ, চিতু, দোস্ত্ মুহম্মদ, নাম্‌দার খাঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮শ শতাব্দীতে পিণ্ডারীগণ তাহাদের সামরিক দক্ষতার জন্য মারাঠাপ্রধানদ্বয় সিন্ধিয়া ও হোলকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়া মালোয়া অঞ্চলে নর্মদা নদীর উপকণ্ঠে ইহাদিগকে বসবাস করিবার অনুমতি দেন। ক্রমশঃ এই স্থান হইতে চতুঃপার্শ্বস্থ অঞ্চলে তাহারা ব্যাপকভাবে আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালাইতে থাকে। মালোয়া, রাজপুতানা ও বেরার ইহাদিগের পুনঃপুনঃ আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। পেশোয়া ও নিজামের এলাকায় ইহারা প্রায় প্রতিবৎসর হানা দিত। যতদিন না ইহারা ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ আক্রমণ করিয়া তাহাদের প্রজাবর্গের ক্ষতিসাধন না করিয়াছিল, ততদিন ইংরেজগণ পিণ্ডারী-উপদ্রবকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়

নাই। কিন্তু ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের অধীনস্থ মীর্জাপুর ও শাহাবাদ জিলাদ্বয় আক্রান্ত হইলে ও ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে পিণ্ডারীগণ উত্তরাঞ্চলে ইংরেজ-অধিকারভুক্ত অঞ্চলসমূহ (নর্দার্ন সর্‌কার্‌স) আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিলে গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস আর নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া একলক্ষ ২০ হাজার সৈন্য ও ৩০০ কামানের এক বিরাট বাহিনী পিণ্ডারীদমনের উদ্দেশ্যে সমবেত করেন। ১৮১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বয়ং এবং স্যার জন ম্যাল্‌কমের সহযোগিতায় টমাস হিস্‌লপ দুই ভাগে এই বাহিনীকে পরিচালিত করিয়া পিণ্ডারীগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও উৎখাত করেন। পিণ্ডারীনায়কগণের মধ্যে করিম খাঁ আত্মসমর্পণের মূল্যস্বরূপ যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গাওয়াসপুর নামক এক ক্ষুদ্র রাজ্য লাভ করে। বন্দীদশায় ওয়াসিল মুহম্মদের ও অরণ্যে পলাতক অবস্থায় ব্যাঘ্রের কবলে চিতুর মৃত্যু হয়। সমসাময়িক পাঠানসর্দার ও রণনায়ক আমীর খাঁ পিণ্ডারীগণের বিশেষ মান্য ছিলেন ও বিভিন্ন সময়ে ইহাদের অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পূর্বেই তিনি সন্ধির প্রস্তাব করেন। তাঁহাকে রাজপুতানার টংক্‌-রাজ্যের নবাব করা হয়।

ভারতবর্ষে মোগলশাসনের অবসানের পরে ও ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে যে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়াছিল পিণ্ডারী-উপদ্রবের মধ্যে তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে। এই দস্যুদলের দেশপ্রেম দূরে থাক, জাতি, ধর্ম বা আঞ্চলিক প্রীতির কোনও বন্ধনও ছিল না। দস্যুতা, লুণ্ঠন ও সেই সূত্রে জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার ইহাই তাহাদের একপ্রকার নিত্যকর্ম ছিল। বিবেকহীন, বেকার, অনিয়ন্ত্রিত কতকগুলি যুদ্ধব্যবসায়ী নিয়মিত লুঠতরাজের জন্য একত্র হইলে রাষ্ট্র, সমাজ ও জনজীবনের পক্ষে তাহারা কতখানি বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইতে পারে ভারতবর্ষের ইতিহাসে পিণ্ডারীগণের আবির্ভাব তাহাই প্রমাণ করিয়াছে।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

পিত্ত যকৃত হইতে ক্ষরিত পাচকরস। পূর্ণবয়স্ক মানবের দেহে দৈনিক ৬-৮ শত মিলিলিটার পিত্ত ক্ষরিত হয়। যকৃত হইতে অবিরাম ক্ষরিত এই পিত্ত সাধারণতঃ পিত্তস্থলীতে সঞ্চিত থাকে এবং অন্ত্রে খাদ্যবস্তুর পাচনের সময়ে পিত্তস্থলীর সংকোচনের ফলে পিত্তনালী দিয়া অন্ত্রে বাহির হইয়া আসে। পিত্ত ক্ষারধর্মী এবং সবুজাভ বা স্বর্ণাভ বর্ণের রস। পিত্তে জল ও অজৈব লবণ ব্যতীত সোডিয়াম টওরোকোলেট ও সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট নামে দুইটি জৈব পদার্থ (পিত্ত-লবণ, বাইল-সল্ট) এবং বিলিরুবিন প্রভৃতি রঙ্গক পদার্থ (পিত্ত-রঙ্গক, বাইল-পিগ্‌মেণ্ট) বর্তমান। পিত্ত পাকস্থলী হইতে আগত খাদ্যপিণ্ডের অম্লত্ব নিবারণ করে, খাদ্যের স্নেহপদার্থকে অবদ্রবে (ইমাল্‌শন) পরিণত করে এবং তাহার পাচন ও বিশোষণে সহায়তা করে। পিত্ত-রঙ্গক, কোলেস্টেরল প্রভৃতি পদার্থ পিত্তের সহিত অন্ত্রে আসিয়া মলের সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। পিত্ত অন্ত্র হইতে ভিটামিন ডি. কে. প্রভৃতির বিশোষণেও সাহায্য করে।

অজিতকুমার চৌধুরী

পিত্তস্থলী গল-ব্লাডার। ইহা উদরে যকৃতের নিকটে অবস্থিত ও পিত্তনালীর সহিত সংযুক্ত ফাঁপা অঙ্গ। অধিকাংশ প্রজাতির প্রাণীরই পিত্তস্থলী থাকে, তবে ঘোড়া, হরিণ, ইঁদুর ও কতকগুলি জিরাফের ইহা নাই। যকৃত হইতে ক্ষরিত পিত্ত পিত্তনালী দিয়া আসিয়া পিত্তস্থলীতে সঞ্চিত থাকে। মানুষের পিত্তস্থলী ৫০-৭৫ মিলিলিটার পিত্ত সঞ্চয় করিতে পারে। পিত্তস্থলী সঞ্চিত পিত্ত হইতে জল বিশোষণ করিয়া ঐ পিত্তকে ১০-১২ গুণ ঘন করিয়া দেয়। পিত্তস্থলী পিত্তে কিছু শ্লেষ্মাও যোগ করে। অন্ত্রে খাদ্য প্রবেশ করিলে আন্ত্রিক ঝিল্লী হইতে রক্তে 'কোলেসিস্টোকাইনিন' নামক একটি হর্মোন ক্ষরিত হয়; এই হর্মোনটি পিত্তস্থলীতে পৌঁছিয়া তাহার গাত্রস্থ অনৈচ্ছিক পেশীগুলিকে সংকুচিত করে, ফলে সঞ্চিত পিত্ত পিত্তস্থলী হইতে পিত্তনালী বাহিয়া অন্ত্রে প্রবেশ করে। 'পিত্ত' দ্র।

অজিতকুমার চৌধুরী

পিথাগোরাস (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮০-৫০০ অব্দ) বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। আত্মার দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে, এই মতবাদ ইনি পোষণ করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পিথাগোরীয় সম্প্রদায় দর্শন, গণিত ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পিথাগোরাস গণিতকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন। জ্যামিতির ন্যায় তিনি পাটিগণিতকেও উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণের বর্গ অপর দুই বাহুর বর্গসমষ্টির সমান, জ্যামিতির এই উপপাদ্য পিথাগোরাসের নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টিবিষয়ক প্রতিজ্ঞাও পিথাগোরীয় সম্প্রদায় প্রমাণ

করিয়াছিল। এই সম্প্রদায় জ্যামিতির প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিল।

পিথাগোরাস কোনও গাণিতিক গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই। ঘাতকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র F. Cajori, *A History of Mathematics*, London, 1919.

কামিনীকুমার দে

পিপীলিকা সন্ধিপদ গোষ্ঠীর (ফাইলাম-আরথ্রোপোদা) অন্তর্ভুক্ত পতঙ্গশ্রেণীর প্রাণী। সম্ভবতঃ ২০ কোটি বৎসর পূর্বে ট্রায়াসিক যুগে এবং উত্তর গোলার্ধে পিপীলিকার উদ্ভব ঘটিয়াছে। মাটিতে বাসা বানায় এমন কোনও বোলতার মত পতঙ্গ হইতেই বোধ হয় ইহার বিবর্তন ঘটিয়াছে। সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর ও নিম্নপর্যায়ের পিপীলিকার প্রজাতিগুলি মাংসাশী। অন্যান্য প্রজাতিগুলি মুখ্যতঃ বহুভোজী, কিন্তু সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। পিপীলিকা সমাজবদ্ধ প্রাণী। সমাজস্তরের প্রথম ধাপের অন্তর্গত প্রজাতিগুলি শিকারজীবী। সমাজস্তরের দ্বিতীয় ধাপের প্রজাতিগুলি চারণজীবী; এই পর্যায়ের হনি-অ্যান্ট্স প্রভৃতি কোনও কোনও প্রজাতির কিছুসংখ্যক প্রাণী স্বীয় স্ফীতিশীল উদরে ভবিষ্যতের জন্য মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে ও প্রয়োজনমত উহা উদ্গীরণ করিয়া অন্যদের বিতরণ করে। সমাজের পরবর্তী ধাপের প্রজাতিগুলি কৃষিজীবী এবং ইহাদের অনেকে বিভিন্ন ছত্রাকের উপরে নির্ভরশীল। সমাজস্তরের সর্বশেষ ধাপ যেসকল প্রজাতি লইয়া গঠিত তাহারা পরজীবী অথবা দাসজীবী, কিংবা নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জভোজী পতঙ্গের উপর নির্ভরশীল। শেষোক্ত পতঙ্গগুলির দেহনিঃসৃত রস এ স্তরের পিপীলিকাগুলির প্রিয় খাদ্য এবং এসকল পতঙ্গকে পিপীলিকাধেনু (অ্যান্ট্-কাউ) বলা হয়।

পিপীলিকা মুখ্যতঃ স্থলচর প্রাণী। কোনও কোনও প্রজাতি বৃক্ষে বাস করে। অধিকাংশ প্রজাতিতে তিনটি জাত বর্তমান; পক্ষযুক্ত বা পক্ষবিহীন বৃহদাকার স্ত্রী, পক্ষযুক্ত ক্ষুদ্রকায় পুরুষ এবং পক্ষবিহীন ক্ষুদ্রকায় শ্রমিক। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভারি চোয়াল ও বিশাল মস্তকবিশিষ্ট শ্রমিক-পিপীলিকাগুলিকে পৃথক সৈনিক জাত হিসাবে ধরা হয়। স্ত্রী ও পুং-পিপীলিকা বংশরক্ষার কাজ করে। সৈনিক-পিপীলিকা মুখ্যতঃ যুদ্ধবিগ্রহদ্বারা বাসস্থান রক্ষা করে। শ্রমিক-পিপীলিকা বহুমুখী কর্মে রত থাকে। সাধারণতঃ স্ত্রী-পিপীলিকার ডিম অনিষিক্ত বা নিষিক্ত দুই প্রকার হয়। অনিষিক্ত ডিম হইতে পুং-পিপীলিকার জন্ম হয়। নিষিক্ত ডিম হইতে জাত পিপীলিকা অপরিণত অবস্থায় উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে সম্পূর্ণ স্ত্রী-পিপীলিকায় রূপান্তরিত হয়, নচেৎ উহা শ্রমিক-পিপীলিকায় পরিণত হয়। সম্পূর্ণ প্রজননতন্ত্রের অধিকারী না হইলেও অবস্থাভেদে শ্রমিক-পিপীলিকাও ডিম পাড়ে; এ সকল অনিষিক্ত ডিম হইতে কেবল শ্রমিক-পিপীলিকারই জন্ম হয়।

পিপীলিকার জীবনচক্র ডিম, শূককীট, মূককীট ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থা এই চারি ভাগে বিভক্ত। ডিম অনধিক ০.৫ মিলিমিটার দীর্ঘ ও লম্বাটে উপবৃত্তাকার। শূককীট পদবিহীন এবং উহার দেহ রোমাবৃত ও খণ্ডে বিভক্ত। মূককীট অধিকাংশ ক্ষেত্রে খোলকহীন ও উন্মুক্ত, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে গুটিবদ্ধ। অবস্থাগুলির স্থায়িত্বকাল তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। পিপীলিকার ডিম অবস্থা ১৫-২৩ দিন, শূককীট অবস্থা ৩২-৪৯ দিন ও মূককীট অবস্থা ১৫-২১ দিন স্থায়ী বলিয়া ধরা হয়। পূর্ণাঙ্গ পুং-পিপীলিকা স্বল্পায়ু, কয়েক মাস হইতে ১ বৎসর পর্যন্ত ইহার জীবন। শ্রমিক ৫-৬ বৎসর ও স্ত্রী-পিপীলিকা প্রায় ১৫ বৎসর বাঁচে।

পিপীলিকার তিন খণ্ডে বিভক্ত বক্ষোদেশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রত্যেকটিতে স্ত্রী ও পুং-পিপীলিকার ক্ষেত্রে, একজোড়া পাতলা পক্ষ বা ডানা অন্ততঃ যৌনমিলনকাল পর্যন্ত থাকে; অবশ্য কোনও কোনও প্রজাতির স্ত্রী বা পুং-পিপীলিকা শ্রমিকের ন্যায়ই পক্ষবিহীন হয়। উদর ৭ বা ৮ খণ্ডে বিভক্ত এবং ইহার শেষাংশে তিনজোড়া উপাঙ্গ দিয়া গঠিত একটি হুল স্ত্রী ও শ্রমিক পিপীলিকায় বর্তমান। হুল-সংশ্লিষ্ট বিষযন্ত্রে একজোড়া অম্লস্রাবী গ্রন্থি থাকে। হুলযুক্ত পিপীলিকা হুলের সাহায্যে সরাসরি বিষ ঢালিয়া দেয়; হুলবিহীন পিপীলিকা শক্ত দাঁতের সাহায্যে ক্ষত সৃষ্টি করিয়া উহাতে বিষ ঢালিয়া দেয়। বিষের প্রধান উপাদান প্রোটিনজাতীয় পদার্থ এবং এন্‌জ়াইম; কম্পোনোতিনী উপগোত্রের পিপীলিকার বিষে ফর্মিক অ্যাসিড থাকে।

প্রজাতি ও পরিবেশভেদে পিপীলিকার বাসস্থানের পার্থক্য ঘটে। পিপীলিকার বাসা পরিবেশগত অভিযোজন ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সাধারণভাবে বাসা পরস্পর-সংযুক্ত প্রকোষ্ঠের সমষ্টি এবং ইহার এক বা একাধিক নির্গমনপথ বর্তমান। প্রায়ই মাটি খুঁড়িয়া অথবা সংগৃহীত মৃত্তিকাকণা, পরিত্যক্ত উদ্ভিদংশ প্রভৃতির সাহায্যে ঢিবির মত গড়িয়া বাসা বানানো হয়। গাছের স্বাভাবিক অথবা স্বীয় প্রচেষ্টায় নির্মিত ফাঁপা জায়গায় বাসা নির্মাণ

করিতেও দেখা যায়। দোরিলিনী (Dorylinae) উপগোত্রীয় পিপীলিকার স্থায়ী বাসস্থান নাই ; প্রস্তরাদির অন্তরালে বা অন্য পিপীলিকার বাসায় ইহারা সাময়িক আশ্রয় লয়। কাম্পোনোতিনী ও মির্মিসিনী উপগোত্রীয় কোনও কোনও প্রজাতির পিপীলিকা স্বীয় শূককীট-নিঃসৃত সূত্রের দ্বারা বৃক্ষপত্র জুড়িয়া বাসা বানায়।

পিপীলিকার বাসায় অন্যান্য বহু সহবাসী পতঙ্গ দেখা যায়। একটি সম্পূর্ণ বাসায় সাধারণতঃ কয়েক ডজন হইতে আধ কোটি পর্যন্ত পিপীলিকা থাকে এবং স্ত্রী, পুরুষ ও শ্রমিক-পিপীলিকাদের মধ্যে যে কোনও জাতের সংখ্যাধিক্য থাকে।

স্ত্রী বা পুং-পিপীলিকা আজন্ম পক্ষহীন হইলে উহাদের যৌনসঙ্গম মাটিতেই সম্পন্ন হয়। উভয় জাতই পক্ষযুক্ত হইলে যৌনসঙ্গম হয় আকাশবিহারের মাধ্যমে। কোনও অঞ্চলের একই প্রজাতির বিভিন্ন বাসস্থান হইতে একই সময়ে পুরুষ ও স্ত্রী-পিপীলিকারা ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়িতে থাকে। শ্রমিক-পিপীলিকা আবহাওয়ার গতি-বিধি ও অন্যান্য বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া এই আকাশবিহার নিয়ন্ত্রণ করে। এ সময়ে প্রতিকূল আবহাওয়া এবং পক্ষী ও অন্যান্য খাদক প্রাণী কর্তৃক বহু পিপীলিকা বিনষ্ট হয়; অবশিষ্টগুলি মাটিতে নামে। কোনও স্ত্রী-পিপীলিকার গতিবেগের সহিত সামঞ্জস্যরক্ষাকারী সর্বশেষ পুং-পিপীলিকাই যৌনমিলন লাভে সমর্থ হয়। মাটিতে নামার পর কেবল স্ত্রী-পিপীলিকাই কোনও বাসায় আশ্রয় পায় অথবা স্বীয় প্রচেষ্টায় নূতন বাসার পত্তন করে। মাটিতে নামিয়া স্ত্রী-পিপীলিকা প্রথমেই পক্ষদ্বয় কোনও কঠিন পদার্থের সহিত ঘষিয়া পরিত্যাগ করে। উহার প্রদত্ত ডিম হইতে প্রথমে কেবল শ্রমিক-পিপীলিকারই জন্ম হয় এবং ইহাদের কর্মতৎপরতায় বাসা পরিবর্ধিত ও সম্পূর্ণ হয়। প্রায় ৩-৬ বৎসরের শেষে স্ত্রী-পিপীলিকার ডিম হইতে প্রথম দলের পূর্ণাঙ্গ পুরুষ ও স্ত্রী-পিপীলিকা জন্মায়।

পিপীলিকাদের পারস্পরিক পরিচিতি ও যোগাযোগ রক্ষা প্রধানতঃ স্পর্শ ও গন্ধের উপর নির্ভরশীল। এক-একটি বাসার পিপীলিকার এক-এক প্রকার বিশেষ গন্ধ থাকে। এই গন্ধের প্রধান উৎস দেহের বহিঃত্বকের গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত রাসায়নিক পদার্থ। যাতায়াতের পথে এই পদার্থটি ঢালিয়া দিয়াই পরপর বহু পিপীলিকার একই পথে যাত্রা সম্ভবপর করা হয়।

খাদ্যের অপচয়, উদ্ভিদ ও ঘরবাড়ির ক্ষতিসাধন, বিষাক্ত দংশন প্রভৃতি কার্যের জন্য পিপীলিকা অবাঞ্ছিত। কিন্তু ক্ষতিকর পতঙ্গ, ইঁদুর প্রভৃতির দমনে, ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডী প্রাণীর কঙ্কালাংশ প্রস্তুতে এবং ভূগর্ভ হইতে স্তন্যপায়ীর জীবাশ্মের অংশবিশেষ-উত্তোলনে মাংসাশী পিপীলিকাকে কখনও কখনও কাজে লাগানো হইয়াছে। মাছের খাদ্য হিসাবে পিপীলিকার ডিম ও অপরিণত অবস্থার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। কেঁচোর ন্যায় মাটিতে বাসা করিয়া পিপীলিকা জমির বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ঘটায়। উদ্ভিদংশ সংগ্রহ করিয়া দূরে লইয়া গিয়া পিপীলিকা নূতন পরিবেশে উদ্ভিদের প্রসার ঘটায়। 'পতঙ্গ' দ্র।

দ্র J. Huxley, *Ants*, London, 1930.

সুজিতকুমার দাশগুপ্ত

পিয়াজ লিলি গোত্রের (ফ্যামিলি-লিলিয়াসিঈ, Family-Liliaceae) অন্তর্ভুক্ত একবীজপত্রী উদ্ভিদ। বিজ্ঞান-সম্মত নাম আল্লিয়ম সেপা (*Allium cepa*)। ইহার ভূনিম্নস্থ কন্দ (বাল্ব)-জাতীয় চক্রাকৃতি কাণ্ডের নিম্নাংশ হইতে অনেক অস্থানিক মূল এবং ঊর্ধ্বাংশ হইতে বহু শল্কপত্র (স্কেলী লিফ) বাহির হয়। শুষ্ক শল্কপত্রে গঠিত বহিরাবরণ দিয়া ভিতরের রসাল শল্কপত্রগুলি আবৃত থাকে। কাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত অগ্রমুকুল হইতে নিয়মিত সময়ে বহির্গত শাখাহীন পুষ্পবৃন্তগুলি শীর্ষদেশে ছত্রাকার পুষ্পগুচ্ছ ধারণ করে। শল্কপত্রগুলির কক্ষে উদ্ভূত কক্ষমুকুল বৃদ্ধি পাইয়া অপত্য কন্দ তৈয়ারি করে। রসাল শল্কপত্রসহ কন্দ ও পুষ্পবৃন্তগুলি খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। পিয়াজের রস কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

তারাপদ চট্টোপাধ্যায়

পিয়ানো সুপরিচিত ইওরোপীয় বাদ্যযন্ত্র। সম্পূর্ণ কথাটি পিয়ানোফোর্টে। এই ইটালীয় শব্দের অর্থ হইল —কোমল উচ্চ। বাদ্যযন্ত্রটির ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের জন্য উক্ত নাম প্রচলিত হইয়া যায়। পিয়ানোফোর্টে-র প্রাথমিক আকার-প্রকারও গঠিত হয় ইটালীতে, ১৮শ শতকের প্রথম ভাগে।

ইওরোপের প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র হার্পসিকর্ড-ই পিয়ানো-ফোর্টে রূপান্তরিত হয় বার্টোলোমিও ক্রিস্টোফার দ্বারা ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে। কাঠের ফ্রেমে ক্রমসন্নিবিষ্ট তন্ত্রীশ্রেণীর উপর বাদকের দুই হস্তস্থিত ক্ষুদ্র হাতুড়ির আঘাতে হার্পসিকর্ড বাজানো হইত। পিয়ানোফোর্টে যন্ত্রের অভ্যন্তরেও কাঠের ফ্রেমে অনুরূপ ক্রমিক পর্যায়ে সারিবদ্ধ তন্ত্রী থাকে। উপরস্থ চাবি বা রীড গুলিতে বাদ্যকরের অঙ্গুলিচালনার ফলে ভিতরে সন্নিবদ্ধ হাতুড়িগুলির

সম্পর্কিত তারে টাইপ কলের (টাইপরাইটার) পদ্ধতিতে আঘাত করে এবং ধ্বনিতরঙ্গ উৎপন্ন হয়।

নূতন বাদ্যযন্ত্রটির বহুগুণ অধিক ও অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক ধ্বনিমাধুর্যের জন্য বীঠোফেন, মোজার্ট প্রভৃতি রোম্যান্টিক সুরকারগণ পিয়ানোফোর্টে যন্ত্রকে স্বীকৃতি দেন। পরবর্তী কালে এই যন্ত্রে ধ্বনির গুণ ও পরিমাণ, পরিধির বিস্তার এবং বাদনক্রিয়ার নানা উন্নতি ইটালী অপেক্ষা জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকাতেই সমধিক হইয়াছিল।

বর্তমানে প্রচলিত গ্র্যাণ্ড ও কটেজ পিয়ানোর মধ্যে পার্থক্য প্রধানতঃ আকারগত। দুই-এর সাতটি অকটেভ (স্বরসপ্তক) এবং ৮৫টি চাবি বা রীড আছে। কটেজ পিয়ানোর অভ্যন্তরস্থ কর্ড বা তন্ত্রীশ্রেণী দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখার জন্য ইহার আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। অপরপক্ষে, গ্র্যাণ্ড পিয়ানোর মধ্যে কর্ড শায়িতভাবে থাকে বলিয়া ইহার আকার বৃহত্তর এবং স্বরধ্বনির ঐশ্বর্য, গুণ, রেশ ইত্যাদি কটেজ পিয়ানোর তুলনায় অনেক অধিক।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

পিয়ার্সন, উইলিয়াম উইনস্ট্যান্‌লি (১৮৮১-১৯২৪ খ্রী) ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মে ইংল্যাণ্ডের বনেদী হুগোনট পরিবারে ভারতবন্ধু পিয়ার্সন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মযাজক। কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যথাক্রমে বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করেন, ছাত্রজীবন শেষ করিয়া লণ্ডন মিশন সোসাইটির সদস্য হন এবং কলিকাতার লণ্ডন মিশনারী কলেজে উদ্ভিদতত্ত্বের অধ্যাপকের কাজ লইয়া এদেশে আসেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন।

কলিকাতার মিশনারি সমাজের কর্তৃপক্ষের খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান ভেদাভেদে অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি কলেজের কাজে ইস্তফা দেন এবং এক ধনীপরিবারে গৃহশিক্ষকতার কাজ লইয়া দিল্লী চলিয়া যান। সি. এফ. এণ্ড্রুজ তাঁহার বন্ধু ছিলেন। সেইসূত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও শিক্ষাদর্শের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর পিয়ার্সন মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে এণ্ড্রুজসহ দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। সেখানে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের পর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শান্তিনিকেতন আশ্রমের কাজে যোগ দেন। এখানকার ছাত্র, শিক্ষক ও অধিবাসী, সকলেরই তিনি মন জয় করিয়াছিলেন। বেশ-ভূষায়, আচারে-ব্যবহারে তিনি বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। আশ্রমের চারি পাশের সাঁওতাল গ্রামগুলিতে তাঁহার কর্মক্ষেত্র বিস্তার লাভ করে। আজিও শান্তিনিকেতনের 'পিয়ার্সন পল্লী' তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জাপান ভ্রমণে পিয়ার্সন তাঁহার সঙ্গী হন। পিয়ার্সন কবির সঙ্গে ভারতে প্রত্যাবর্তন না করিয়া চীন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে থাকিয়া যান। ঐ সময়ে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইংরেজ সরকার বইটি নিষিদ্ধ করেন। পিয়ার্সন চীনে গিয়া ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ইংরেজ সরকার পিয়ার্সনকে পিকিং-এ বন্দী করিয়া ইংল্যাণ্ডে লইয়া যান এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বগৃহে অন্তরীণ করিয়া রাখেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পিয়ার্সন রবীন্দ্রনাথের ইওরোপ ও আমেরিকাভ্রমণের সঙ্গী হন এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় শান্তিনিকেতনের কাজে যোগদান করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বাস্থ্যের কারণে ইওরোপে যান। ওই বৎসর ২৪ সেপ্টেম্বর ইটালী ভ্রমণের সময়ে পড়িয়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পিয়ার্সন রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাহা ছাড়া তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতারও অনুবাদ করেন। জাপানে থাকার কালে 'শান্তি-নিকেতনস্মৃতি' নামে একটি বই লিখিয়াছিলেন। পৃথিবীর বহু ভাষায় বইটি অনূদিত হইয়াছে।

দ্র উইলিয়াম পিয়ার্সন, শান্তিনিকেতনস্মৃতি, অমিয়কুমার সেন-অনূদিত, কলিকাতা, ১৯৬৫; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ১ম-৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৩-৫৯ বঙ্গাব্দ।

বিনয় ভট্টাচার্য

পিয়ালী চব্বিশ পরগনা জেলার একটি নদী। ইহা ক্যানিং থানার নারায়ণপুর গ্রামের নিকট বিদ্যাধরী হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া দক্ষিণে কুলতলার নিকট মাতলার সহিত মিলিয়াছে। বিদ্যাধরী মজিয়া যাইবার পর এই নদীই চব্বিশ পরগনার একটি বৃহৎ অংশের প্রধান জল-নিকাশী খাল হিসাবে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু ইহাও ধীরে ধীরে শুখাইয়া যাইতে থাকে। উত্তর ভাগ গ্রাম পর্যন্ত এই নদীটির শুষ্ক গতিপথ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা প্রায় ২মিটার উঁচু হইয়া গিয়াছে। এই শুষ্ক গতিপথ এখন স্থানীয় চাষীদের চাষের ক্ষেত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

S. C. Majumdar, *Rivers of the Bengal Delta*, Calcutta, 1942.

রেবা দে

পিরালী পিরালী শব্দটির অভিধানগত অর্থ হইল মুসলমানের অন্নগ্রহণরূপ দোষযুক্ত ব্রাহ্মণশ্রেণী-বিশেষ। শব্দটির উৎপত্তি নবদ্বীপের নিকটস্থ পিরল্যা গ্রামের অধিবাসী তাহের নামক জনৈক মুসলমানের নাম হইতে। ইনি হিন্দুসন্তান, পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। লোকে তাঁহাকে পিরল্যা খাঁ (বা পীর আলি) বলিত।

তুর্কী-রাজত্বকালে খান জাহান আলী নামক এক ব্যক্তি উপনিবেশস্থাপনের হুকুমনামা লইয়া যশোহরে আসেন এবং চেঙ্গুটিয়া পরগনার অধিকার পান। ইহার সঙ্গে তাহেরও আসেন। খান জাহান আলী তাঁহাকে দেওয়ানের পদ দেন। তাহেরের প্রধান কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হন দক্ষিণানাথ নামক ব্রাহ্মণের দুই পুত্র কামদেব ও জয়দেব। কথিত হয়, একদিন রোজার সময়ে তাহের লেবুর ঘ্রাণ লইতেছিলেন এমন সময়ে তাঁহার প্রধান কর্মচারী কামদেব ঠাট্টা করিয়া বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে ঘ্রাণে অর্ধ-ভোজন হইয়া যায়, সুতরাং রোজা পণ্ড হইল। তাহের এ বিদ্রূপ বুঝিতে পারিলেন। পরে একদিন এক জলসায় তিনি ব্রাহ্মণাদি সমস্ত লোককে নিমন্ত্রণ করিলেন। এমন সময়ে কাছেই মুসলমানী খানার গন্ধ নির্গত হয়। অনেকেই নাকে কাপড় চাপা দিয়া উঠিয়া পড়েন। তাহের তখন কামদেব ও তাঁহার ভাই জয়দেবকে ধরিয়া বলেন যে, ঘ্রাণে যখন অর্ধ-ভোজন হয়, তখন এই গোমাংসের ঘ্রাণে তোমাদের জাত গিয়াছে। ভ্রাতৃদ্বয় পলায়নের চেষ্টা করেন, তাহের জোর করিয়া তাঁহাদের মুখে এই মাংস দিয়া দেন। এইভাবে তাঁহাদের জাত যায়। উক্ত জলসায় কামদেবের অন্যান্য যেসকল আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে 'পিরালী' অপবাদ দেওয়া হইল এবং তাঁহারাও জাতিচ্যুত হইলেন। যাঁহারা জাতে উঠিতে পারিলেন না, তাঁহারা 'পিরালী ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হইয়া সমাজে অচল রহিলেন। কামদেবের ভ্রাতা শুকদেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়া পিঠাভোগের জমিদার জগন্নাথ কুশারি 'পতিত' হন এবং তাঁহার বংশও পিরালী ব্রাহ্মণের পর্যায়ভুক্ত হয়।

জগন্নাথের প্রপৌত্রের প্রপৌত্র মহেশ্বর ও তাঁহার ভাই শুকদেব নিজগ্রাম বারোপাড়া হইতে কলিকাতার দক্ষিণে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। ইংরেজরাও প্রায় এই সময়ে কলিকাতায় আসে। মহেশ্বরের পুত্র পঞ্চানন ও তাঁহার খুল্লতাত শুকদেব আসিয়া আদিগঙ্গার তীরে বাস করেন এবং জাহাজী কারবারে যোগ দেন। এখানে বেশির ভাগ ছিল কৈবর্তের বাস। আর ছিল পুণ্ড্র-বণিক। ইহাদের মধ্যে পঞ্চাননেরাই একঘর ব্রাহ্মণ। সকলে তাঁহাদের তাই খাতির করিয়া 'ঠাকুরমশাই' বলিয়া ডাকিত। এমন কি, বিদেশী বণিক ও কাপ্তেনরাও ইহাদিগকে ঠাকুর বলিয়া ডাকিতেন, কিন্তু তাহার উচ্চারণ ছিল একটু ভিন্ন রকমের—'Taguore', ক্রমে তাহা হইয়া যায় 'Tagore'। ক্রমশঃ কুশারী পদবী মুছিয়া যায়। শেষে সকলেই বলিতে লাগিল পঞ্চানন ঠাকুর। এইভাবে এই বংশে 'ঠাকুর' পদবী প্রচলিত হয়। দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এই পিরালী ব্রাহ্মণবংশের সন্তান।

সুশীল রায়

পিলানি রাজস্থান রাজ্যের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ঝুনঝুনু জেলার শহর। বিড়লা-বংশীয়দের সহায়তায় শহরের অনতিদূরে বিদ্যাবিহার নামক স্থানে উচ্চতর শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। শহরটির আয়তন ১৪ বর্গকিলোমিটার, পরিচালনার ভার নগরপালিকার উপর ন্যস্ত। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা মোট ১১৫৬৫। অধুনা সরকারি উদ্যোগ ও সহায়তায় পিলানিতে টেলিভিশন-যন্ত্রনির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

পিল্লৈ, চম্পক রামন প্রাক্তন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের এক দরিদ্র সম্ভ্রান্তপরিবারে তাঁহার জন্ম। ভারতীয় বিপ্লবের সপক্ষে বক্তৃতা করায় তিনি গভর্নমেণ্টের বিরাগভাজন হন এবং কিশোর বয়সেই আত্মরক্ষার্থে দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন (১৯০৮ খ্রী)। ইটালী ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জার্মানীতে যান এবং সেখানেই প্রায় বিশ বৎসর বাস করেন।

ইওরোপে তিনি শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রমুখ ভারতীয় এবং ফরিদ বে, মনসুর রিফাত প্রমুখ আরব বিপ্লবী নেতাগণের সংস্পর্শে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধারম্ভের কিছুদিন পূর্বে তিনি ও পদ্মনাভম পিল্লৈ জুরিক শহরে 'প্রো-ইণ্ডিয়া' নামক একটি বিপ্লবীসমিতি এবং তাহার মুখপত্রস্বরূপ ঐ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। যুদ্ধারম্ভের পরই জার্মান পররাষ্ট্রদপ্তরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বেলিনে আসিয়া তথাকার সদ্যঃ

প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় স্বাধীনতাসংঘে যোগদান করেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি জার্মান নৌ-বাহিনীতে যোগদান করেন এবং কেহ কেহ বলেন যে এমডেন নামে যে জার্মান ডুবো জাহাজ ভারতসমুদ্রে ইংরেজের জাহাজ ডুবায় ও ভারত উপকূলে গোলাবর্ষণ করে, তিনি তাহার কর্মচারী ছিলেন। ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্য দিয়া ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য সাহায্যপ্রেরণে নানা গুরুত্বপূর্ণ কার্যে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধশেষ পর্যন্ত তিনি বের্লিন কমিটির অন্যতম প্রধান ছিলেন।

সন্ধিস্থাপনার পর তিনি জার্মানীতেই বসবাস করেন ও যতদূর জানা যায় আন্দাজ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, vol. II, Calcutta, 1963.

অরুণচন্দ্র বসু

পিল্লৈ, চিদম্বরম (১৮৭২-১৯৩৬ খ্রী) দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক ও জাহাজব্যবসায়ী। জন্ম ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তুতিকোরিনে তিনি ওকালতি শুরু করেন। সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে। বিবেকানন্দ-প্রেরিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বা শশী মহারাজের প্রেরণায় চিদম্বরম তুতিকোরিন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েল্‌ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও 'ধর্মসংঘম' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ১০লক্ষ টাকা মূলধন তুলিয়া এক জাহাজ-কোম্পানি স্থাপন করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি তাহার একচেটিয়া ব্যবসায় বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই ভারতীয় জাহাজকোম্পানিকে উচ্ছেদ করার জন্য সরকারি সমর্থনে সর্বপ্রকার অপচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়।

রাজনীতিতে চিদম্বরম ছিলেন উগ্রপন্থী। তিনি বাল-গঙ্গাধর টিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের বিশ্বস্ত সহকর্মী ছিলেন। সুব্রহ্মণ্য ভারতী ও সুব্রহ্মণ্য শিব প্রভৃতি ছিলেন তাঁহার সহায়ক। তারকনাথ দাসের প্রেরণায় তিনি মাদ্রাজ প্রদেশে একটি বিপ্লবীদলও গড়িয়া তোলেন। খুব বড় এক দল লইয়া চিদম্বরম সুরাট কংগ্রেসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তদানীন্তন শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থক ও সহায়ক ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জেল হইতে বিপিনচন্দ্র পালের চুক্তির দিনকে (৮ মার্চ) 'স্বরাজদিবস' পালন করার আন্দোলন দমন করার জন্য পিল্লৈকে জেলে আটক করা হয়। ইহাতে জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া সরকারি অফিসে আগুন ধরাইয়া দিলে তাহাদের উপর গুলি চালানো হয়। চিদম্বরম ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

তাঁহার কারাবাসকালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জাহাজ-কোম্পানিকে বিদেশী কোম্পানী কিনিয়া লয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি গান্ধীজীর বিরুদ্ধতা করেন। ইহার পর তিনি রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করিয়া সাহিত্যচর্চায় মন দেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তাঁহার বাসগৃহ জাতীয় মনুমেণ্ট বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। রাজা-গোপালাচারি ভারতের গভর্নর-জেনারেল হিসাবে তুতিকোরিন-কলম্বোগামী একখানি জাহাজের নামকরণ করেন 'চিদম্বরম'।

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

পিশেল, কার্ল রিচার্ড (১৮৪৯-১৯০৮ খ্রী) ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি ব্রেসলাউ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রেসলাউ, বের্লিন, লণ্ডন ও অক্সফোর্ড প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা লাভ করেন ও পরবর্তী জীবনে সংস্কৃত ও তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে হালে ও বের্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিয়োজিত ছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলার বাংলা দেশে প্রাপ্ত পাঠ-এর সম্পাদনা ব্রেসলাউ-এ তাঁহার ডক্টরেটের থিসিস ছিল। হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ (১৮৭৭-৮০ খ্রী) রচনাটি প্রাকৃত ভাষাশিক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান গ্রন্থ। হেমচন্দ্রের দেশিনামমালা (১৮৮০ খ্রী), থেরীগাথা (১৮৮৩ খ্রী) এবং গেল্ডনারের সহিত রচিত বৈদিক আলোচনা (*Vedische Studien*, ১৮৮৯-১৯০১ খ্রী) তাঁহার মূল্যবান গ্রন্থ। বিদেশে সমকালীন সংস্কৃত-চর্চারত পণ্ডিতদের মধ্যে সকলেই তাঁহার সম্মান করিতেন। প্রাকৃত ভাষার আলোচনায় তিনি বিস্তর সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার ধারণা ছিল কেবল ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে বেদের ভাষা, ধর্ম, নৈতিক ধারণা কিছুরই বিশেষ অর্থবোধ হইবে না। বেদের পরবর্তী সাহিত্যের বিশ্লেষণমূলক আলোচনার দ্বারাই ইহার মর্মোদ্ধার হইবে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের নিকট প্রাকৃত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান জানান। এই আমন্ত্রণ রক্ষাকল্পে ভারতে আসিলে মাদ্রাজ শহরে (১৯০৮ খ্রী) তাঁহার মৃত্যু হয়।

পীঠস্থান 'পীঠ' বা 'পীঠিকা' শব্দের অর্থ আসন'। কোনও মহাপুরুষ যে আসনে বসিয়া তপস্যাদ্বারা সিদ্ধি

লাভ করিতেন, সেই আসন বা স্থানটি তদীয় অনুবর্তীদিগের নিকট পুণ্যক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইত। ভগবান বুদ্ধের বোধিলাভের শিলাসন এবং ক্ষেত্র বৌদ্ধগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। ক্রমে যে কোনও দেবতা বা সিদ্ধাচার্যের মন্দির বা আবাস বুঝাইতেও পীঠ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মধ্যযুগের তন্ত্রসমূহে কতকগুলি শাক্ত-শৈব তীর্থকে পীঠস্থান বলা হইয়াছে। কিন্তু এগুলির সংখ্যা ও নামের তালিকা সর্বত্র একরূপ নহে। পরিশেষে পীঠস্থানের তালিকার সহিত বিষ্ণুকর্তৃক শিবের স্কন্ধস্থিত সতীর শবদেহ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবার কাহিনী জড়িত হইয়া যায়। যেথানে সতীর অঙ্গবিশেষ পড়ে, তাহা দেবী ও তাঁহার ভৈরবের একটি পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল, এইরূপ বিশ্বাস গড়িয়া ওঠে। ভগের অন্ধত্ব এবং পূষার দন্তহীনতার সুপ্রাচীন কাহিনী পরবর্তীকালে শিব কর্তৃক দক্ষযজ্ঞধ্বংসের গল্পে আত্মপ্রকাশ করে ('দক্ষ' দ্র)। মহাভারতে যোনিকুণ্ড ও স্তনকুণ্ড-সংজ্ঞক তীর্থাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যোনিকুণ্ড যোন্যাকার জলাশয় এবং স্তনকুণ্ড স্তনাকার শৈলদ্বয়ের উপরিস্থিত জলাশয় বলিয়া মনে হয়। এইগুলি জগজ্জননীর অঙ্গবিশেষের সহিত সম্পর্কিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আদি-মধ্যযুগের পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থে অনেক সময়ে চারিটি মাত্র পীঠস্থানের নামোল্লেখ দেখা যায়—জালন্ধর, উড্ডিয়ান, পূর্ণগিরি ও কামরূপ; অথবা উড্ডিয়ান, পূর্ণগিরি, কামরূপ ও শ্রীহট্ট। কিন্তু আইন-ই-আকবরীতে চারিজন পীঠদেবীর নাম দেওয়া হইয়াছে—কাশ্মীর দেশে শারদা, বিজাপুর রাজ্যে তুলজা ভবানী, কামরূপে কামাখ্যা এবং পাঞ্জাবে জালন্ধরী। কালিকাপুরাণের একস্থলে পীঠদেবীর নামসহ সাতটি পীঠস্থান এবং তত্তৎস্থলে পতিত সতীর অঙ্গবিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায়—দেবীকূটে চরণদ্বয়, দেবী মহাভাগা; উড্ডিয়ানে উরুদ্বয়, দেবী কাত্যায়নী; কামরূপে কামগিরিতে যোনিদেশ, দেবী কামাখ্যা; জালন্ধরে স্তনদ্বয়, দেবী চণ্ডী; পূর্ণগিরিতে স্কন্ধদ্বয় ও কণ্ঠ, দেবী পূর্ণেশ্বরী ইত্যাদি। কিন্তু উত্তর-মধ্যযুগের পীঠতালিকার বিবরণ ভিন্নরূপ।

রুদ্রযামল তন্ত্রে ১৮টি পীঠের এবং ১০টি প্রধান পীঠের দুইটি তালিকা আছে। কুব্জিকাতন্ত্রে ৪২টি এবং জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে ৫০টি পীঠের তালিকা পাওয়া যায়। ১৭শ শতাব্দীতে রচিত তন্ত্রসারে জ্ঞানার্ণবের তালিকাটি গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু মেরুগিরি পীঠের স্থলে মেরুপীঠ এবং গিরিপীঠ পাঠ করায় তন্ত্রসারের তালিকায় ৫১টি পীঠের নাম দেখিতে পাই। কোনও কোনও গ্রন্থে ১০৮টি পীঠস্থানের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও পীঠনির্ণয় বা মহাপীঠনিরূপণ-সংজ্ঞক জনপ্রিয় অর্বাচীন পুস্তকে পীঠের সংখ্যা ৫১ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শিবচরিত-সংজ্ঞক অপর একখানি গ্রন্থে এইরূপ ৫১টি পীঠ এবং ২৬টি উপপীঠের তালিকা দেখা যায়। উক্ত গ্রন্থগুলি বাংলা দেশে রচিত হইয়াছিল। এই ৫১ পীঠের বর্ণনার সহিত অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীন পীঠতালিকার বর্ণনার সামঞ্জস্য নাই। পীঠস্থানের সংখ্যা এবং বর্ণনার ব্যাপারে ঐকমত্যের অভাবই ইহার কারণ। যে ৫১টি স্থান বর্তমানে দেবীপীঠ বলিয়া স্বীকৃত হয়, উহার অনেকগুলি বাংলা দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীর্থস্থান; যেমন চট্টল, ত্রিপুরা, কালীঘাট, যশোহর ইত্যাদি। আদি-মধ্যযুগের গ্রন্থাদিতে এইসকল তীর্থস্থানের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

দ্র D. C. Sircar, *The Sakta Pithas*, Calcutta, 1948.

দীনেশচন্দ্র সরকার

পীতাম্বর দাস সুপ্রসিদ্ধ রসকল্পবল্লীর লেখক রামগোপালদাসের পুত্র। শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য চক্রপাণি পুরীতে যান। চক্রপাণির পুত্র নিত্যানন্দ হইতেছেন রামগোপালের প্রপিতামহ। সুতরাং রামগোপাল শ্রীচৈতন্যের প্রায় একশত বৎসর পরের লোক। পীতাম্বর দাস রসমঞ্জরী নামক গ্রন্থের লেখক। ঐ গ্রন্থে অনেকগুলি পদ ধৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে যশোরাজ খানের "এক পয়োধর চন্দনলেপিত" ইত্যাদি 'পদটিতে "শ্রীযুত হসন জগৎভূষণ"-এর নাম পাওয়া যায়। 'চরণনখর-মনিরঞ্জন' পদটি যে বিদ্যাপতির নহে কবিরঞ্জনের, তাহা এই গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয়। 'উলসিত মঝু হিয়া' ইত্যাদি পদটি 'পদকল্পতরু'তে (১৭০৪) গোবিন্দদাস-ভণিতায় দেখা যায়, কিন্তু রসমঞ্জরীতে উহার ভণিতায় মাধবঘোষের নাম পাওয়া যায়। পীতাম্বরের পিতা রামগোপাল গোপালদাস-ভণিতায় অনেকগুলি সুন্দর পদ রচনা করেন। তাহার মধ্যে কয়েকটি চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলিতেছে। রসমঞ্জরী হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঐগুলি গোপালদাসেরই রচনা। পীতাম্বর নিজেও একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার "ছটপট কুসুমশয়ানে। হরি হরি করয়ে স্মরণে॥" ইত্যাদি পদটি রসমঞ্জরীতে (পৃঃ ১৭) আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৯সংখ্যক 'রসমঞ্জরী'র পুথিখানির লিপিকাল দেওয়া আছে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। পীতাম্বর শচীনন্দন ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন।

ইনি সংস্কৃতে 'শ্রীমন্নরহরিশাখা-নির্ণয়' নামে একখানি পুস্তিকাও লিখিয়াছিলেন।
দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

বিমানবিহারী মজুমদার

পীর 'পীর' ফারসী শব্দ। আরবী শব্দ 'মুর্শেদ'। পীরের আক্ষরিক অর্থ বৃদ্ধ, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ পথপ্রদর্শক। ইসলাম ধর্মে পীরের স্থান অতি উচ্চে। 'কোরান শরীফ' ও 'হাদিস শরীফে' পীরগ্রহণের তাগিদ আছে। মানবজীবনে সুফল প্রাপ্ত হইতে হইলে পীরগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। পীরতালিকার শ্রেষ্ঠতম মহাত্মা বেলায়েত সম্রাট হযরত আলী আলায়হিস সালাম, সাধুরাজ্যের পথিকৃৎ। তাঁহার অধঃস্তন বংশধর, কাদেরিয়া পথের প্রবর্তক হযরত মওলানা শেখ আব্দুল কাদের জিলানী পীরজগতের পথ-প্রদর্শক। তিনি 'গওসুল আজম' বা 'বড়পীর' নামে বিশ্বে খ্যাত। প্রকৃত ও তত্ত্বজ্ঞানী পীর শরীয়ত, তরিকত, মারেফাৎ ও হকিকতের পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। পীর কতকগুলি মৌলিক গুণে ভূষিত; যথা—খাঁটি বিদ্যা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পূর্ণ অনুরাগ, কৌলিন্য, আদবকায়দা, সচ্চরিত্র, সুশ্রী, বাহ্যিক ধীরতা, আন্তরিক ধৈর্য, বাকপটুতা, দরিদ্রতা ও পরিতোষ-ধন, খোদা-অনুসন্ধানের আকর্ষণ শক্তি ও শিষ্যের প্রবৃত্তির সংস্কার-শক্তি। তাঁহারা সর্বরকম পাপ হইতে এবং পার্থিব কোনও বস্তুর আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত থাকেন, সর্বক্ষণ আল্লার উপাসনায় ও প্রেমে নিজেদের ডুবাইয়া রাখেন; পুণ্যবানদের সহিত ভালবাসা ও ভ্রাতৃভাব বজায় রাখেন, সৃষ্টির মঙ্গলকামনায় নিজেদের লিপ্ত রাখেন এবং আল্লার নৈকট্যলাভে শিষ্যদের সাহায্য করেন। পীর-তরিকা বহু শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে কাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া, নকশেবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া বহুল প্রচলিত।

আব্দুস সোবহান

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীচৈতন্যের পরমগুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এবং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর দীক্ষাদাতা গুরু। ইঁহার নিবাস ছিল চট্টগ্রামে। ইনি বাহিরে বিশাল ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করিতেন, কিন্তু অন্তরে ছিলেন পরম প্রেমিক ভক্ত। শ্রীচৈতন্য ইঁহাকে প্রেমনিধি বলিতেন। স্বরূপ দামোদরের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। ইনি মাঝে মাঝে পুরীতে শ্রীচৈতন্যকে ও জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে যাইতেন। কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ইঁহাকে শ্রীরাধার পিতা বৃষভানুর তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

বিমানবিহারী মজুমদার

পুতুল সাধারণ অর্থে ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিকেই আমরা পুতুল বলি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পুতুল রহিয়াছে। সামাজিক বিবর্তনের সহিত তাল রাখিয়া যুগে যুগে পৃথিবীতে পুতুলের ব্যবহার ক্ষেত্র, উপকরণ, গঠনশৈলী, আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন হইয়াছে। বিশেষ করিয়া গত ৩০-৪০ বৎসরের মধ্যে গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে পুতুল-ব্যবহারের ফলে এই শিল্পে বিরাট পরিবর্তন দেখা গিয়াছে।

আদিম মানুষ স্বভাবতই জীবজন্তুকে ভয় করিত। তাহাদের এই ভীতিই ক্ষুদ্রায়তন জীবজন্তু নির্মাণ ও কালক্রমে তাহার পূজা, পূজার উপহার হিসাবে তাহার ব্যবহার ইত্যাদি প্রথা চালু করাইয়াছেন। দেবদেবীর পূজাপ্রচলনের ফলে তাঁহাদের ক্ষুদ্রাকার মূর্তি নির্মিত হইয়াছে। ষষ্ঠী এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন নারীমূর্তির পুতুল আমরা হামেশাই পাইয়া থাকি।

পুতুলনির্মাণের উপকরণ হিসাবে মাটিই প্রধান। তবে কাঠের পুতুলের চাহিদাও কম নহে। বাংলা দেশে পিতল প্রভৃতি নানারূপ ধাতুর পুতুল, কাপড়ের পুতুল, ঘাসের পুতুল, শোলার পুতুল, কাগজের ও কাগজমণ্ডের পুতুল, পাথরের পুতুল, পিটুলীর পুতুল, সরের পুতুল, সন্দেশের মত ছাঁচের পুতুল, এমন কি গোবরের পুতুলেরও প্রচলন ছিল। ননীর ও পিটুলীর পুতুল বাংলা দেশের নানাব্রত উপলক্ষ্যে তৈয়ারি করার রেওয়াজ আছে। পোড়ামাটির তৈরি ঘোড়া, হাতি, বাঘ ইত্যাদি পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ষষ্ঠীতলা, মাদারের হাট বা পীরের সমাধিতে রাখা হয়। এমন কি গাছের নীচে এই পুতুলের প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করারও রীতি আছে। আদিবাসীদের মধ্যে যে বোঙ্গার পুতুল বা মূর্তির পূজা হয় তাহাও পোড়ামাটিরই।

ভারতে পুতুলনির্মাণের শিল্পটি অতি পুরাতন। উত্তর-পশ্চিমে বেলুচিস্থান এবং মহেঞ্জো-দড়ো ইত্যাদি অঞ্চলে অসংখ্য মাটির তৈয়ারি পুতুল পাওয়া গিয়াছে। বাংলা দেশে তমলুক (পুরাতন তাম্রলিপ্ত) বাঁকুড়ার পোখরানা (প্রাচীন পুষ্করনা) প্রভৃতি স্থানেও অনেক প্রাচীন পুতুল পাওয়া যায়। দিনাজপুরের বাণগড় ও চব্বিশ পরগনার চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলেও খননকার্যের সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ অনেক পুতুল পাইয়াছেন।

পশ্চিম বাংলাসহ ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই আজিও নানাধরনের পুতুল তৈয়ারি হইয়া থাকে। পশ্চিম বাংলায় মোটামুটি ছয় প্রকারের পুতুল পাই: যথা ১. ক্ষুদ্রায়তন

দেবমূর্তি—যেমন কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, মহাদেব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, গৌর-নিতাই, আদি-কালী ইত্যাদি ২. মনুষ্য-মূর্তি যথা আহ্লাদী, মা ও শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বেহাই-বেয়ান ইত্যাদি ৩. পশুমূর্তি—নানারূপ পশু ও পাখির ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিসমূহ ৪. যো-পুতুল—মানুষের মূর্তি কিন্তু বিশেষ আকৃতির, নীচের অংশ পরিস্ফুট নয় (কেশবপুর কেন্দ্রে এই জাতীয় পুতুল তৈয়ারি হয়) ৫. নাচিয়ে পুতুল— মাথা নাড়ানো বুড়ো ইত্যাদি। ৬. গৃহসজ্জার পুতুল— যথা হরিণের মস্তক, বাঘের মস্তক ইত্যাদি যাহা সাধারণতঃ বসিবার ঘরে রাখা হয়।

সাধারণতঃ চিত্রকর সম্প্রদায়ের শিল্পীরাই মাটির পুতুল তৈয়ারি করিয়া থাকেন, তবে চলতি বাংলায় ইঁহাদের 'কুচো-পটুয়া' বলা হয়। মহিলা শিল্পীগণ মেলা বা কোনও উৎসব উপলক্ষ্যেই বেশি পুতুল তৈয়ারি করিয়া থাকেন। মাটির পুতুল হাতে ও ছাঁচে উভয় প্রকারেই তৈয়ারি করা হইয়া থাকে। পুতুলের গায়ে রং দেওয়া হয়। প্রয়োজন মতো 'চাক'ও ব্যবহার করা হয়।

পশ্চিম বাংলার নানাস্থানে পুতুল তৈয়ারি হয়; তবে নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের পুতুল ও বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া, হাতি, বাঘ, রেলপুতুল, ষষ্ঠীপুতুল ইত্যাদির চাহিদা বর্তমানে বিদেশের বাজারেও অনুভূত হইয়াছে। নাড়াজোল, জয়নগর-মজিলপুর, বীরভূমের রাজনগর প্রভৃতি স্থানের মাটির পুতুলেরও বেশ চাহিদা আছে। কাঠের পুতুল তৈয়ারি হয় বর্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপে, নতুনগ্রামে ও পাটুলীতে, দাঁইহাট অঞ্চলে। কালীঘাটের পুতুল এই অঞ্চলেই তৈয়ারি হয়। কাঠের পুতুল তৈয়ারি করেন সূত্রধরেরা। মুর্শিদাবাদের কাটালিয়াতে পোড়ামাটির একশ্রেণীর পুতুল তৈয়ারি হয়, যাহাতে অভ্রের রং লাগানো হইয়া থাকে। বীরভূমের ইলামবাজারে গালার পুতুল তৈয়ারি হইত।

প্রাচীন পুতুলগুলি অধিকাংশই কাদামাটি হইতে আঙুলে টিপিয়া তৈয়ারি করা হইত। এইসব পুতুলের নাকের দুইদিক চাপা, মুখ বড় একটা নির্দিষ্ট নাই। অধিকাংশ পুতুলের গাত্র নিরাভরণ, বস্ত্রহীন; তবে মাটির তারের মত পাকাইয়া অঙ্গসজ্জার রেওয়াজ ছিল। ঢোকরা কামারেরা তাহাদের গলানো পিতলের পুতুলে এইভাবেই নক্সা তুলিয়া থাকে। পুতুলের চোখ, বুক ইত্যাদি অংশগুলি প্রায়ই পৃথকভাবে তৈয়ারি হইত ও পরে মূল পুতুলে সংযোজিত হইত। চাচর দিয়াও চোখ-মুখ আঁকার রেওয়াজ ছিল। পাঁচমুড়ার ঘোড়ার চারিখানি পা আলাদাভাবে কুমারের চাকে তৈয়ারি হয় ও পরে মূল দেহের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ছাঁচে যে পুতুল গড়া হয় তাহার নির্মাণকৌশল ভিন্ন। পোড়ামাটির ছাঁচের মধ্যে কাদামাটির প্রলেপ টানা হয় হাতের সাহায্যে এবং প্রয়োজনীয় মূর্তিটির আদল এইভাবে আনা হয়। অনেকাংশ হাতেও গড়া হয় ও পরে ছাঁচে তৈয়ারি অংশের সঙ্গে লাগাইয়া পোড়ানো হয়।

কাঠের পুতুল বাটালীর দ্বারা কাঠের অংশ বিশেষকে চাঁচিয়া তৈয়ারি করা হয়। কাপড়ের পুতুলের মধ্যে তুলা লাগে ও তাহা ছুঁচের সাহায্যে সেলাই করার প্রয়োজন হয়। হাতির দাঁতের পুতুল তৈয়ারি হয় বহরমপুর ও জিয়াগঞ্জ অঞ্চলে, মুর্শিদাবাদে শোলার কদম, শোলার ইন্দ্রজাল। নানা পশুপাখির মূর্তি ইত্যাদি তৈয়ারি হয় বাংলা দেশের নানা জায়গায়।

আজকাল বাজারে প্লাস্টিক, সেলুলয়েড, চীনে মাটি ও কাচের নানাশ্রেণীর পুতুল পাওয়া যায়। এইসব পুতুল কারখানায় তৈয়ারি হয় এবং সস্তাদরে পাওয়া যায়। মৃত পশুর চামড়ার সাহায্যেও নানারূপ পুতুল তৈয়ারি হয়।

পূর্ব বাংলাতে বিশেষ করিয়া সন্তোষ (টাঙ্গাইল), রাজবাড়ি (ফরিদপুর) ও চট্টগ্রামের পোড়ামাটির পুতুল খুবই বিখ্যাত।

মাটির পুতুল যে কে, কবে ও কোথায় তৈয়ারি করিয়াছিল তাহা গবেষণার বস্তু। বাংলা দেশে ছাঁচের পুতুলের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন আনুমানিক শুঙ্গ আমলের তৈয়ারি পোখরানাতে (বাঁকুড়া) প্রাপ্ত নারীমূর্তিটি। ইহা দৈর্ঘ্যে পাঁচ ইঞ্চি, প্রস্থে আড়াই ইঞ্চির মত। মূর্তির বামহস্তে একটি শুকপাখি, কোনও যক্ষিণী বা নায়িকামূর্তির মত।

দ্র কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার কারুশিল্প, কলিকাতা, ১৯৬১; Sheila Auden, 'Dolls and Toys', *Art In Industry*, vol II, No. 2, Calcutta, 1951; Ajit Mukherji, *Folk Toys of India*, Oxford, 1956.

আশীষ বসু

পুথি হাতে লেখা পুরানো ধরনের বই। ছাপার চলন হইবার পূর্বে পুথির সাহায্যেই পড়াশুনার কাজ চলিত। ছাপা বইয়ের সচ্ছলতার অভাববশতঃই হউক বা পুথির প্রতি শ্রদ্ধার আধিক্যবশতঃই হউক, ছাপা আরম্ভ হওয়ার প্রথম দিকে ছাপা বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুথির ব্যবহারও যথেষ্ট ছিল। বস্তুতঃ এখন পর্যন্ত ধর্মবিষয়ক গ্রন্থসম্পর্কে

পুথির বা পুথির আকারে কাগজে বা তালপাতায় ছাপা বইয়ের আদর আছে। পুথির পাতাগুলি আলগাভাবে আড় করিয়া সাজানো হইত। আলগা পাতাগুলি দুইখানি কাঠের তক্তা বা পাটার মধ্যে রাখিয়া কাপড়ের টুকরা ও দড়ি দিয়া বাঁধা হইত। তালপাতার পুথিতে তালপাতায় বোনা শক্ত আবরণ থাকিত। পাতাগুলির মাঝখানে একটু জায়গা ফাঁক থাকিত। সেখানে ফুটা করিয়া তাহার মধ্যে সুতা বা পাতলা দড়ি ঢুকাইয়া উহা দিয়া পুথিখানি বাঁধিয়া রাখা হইত। পুথিকে পুত্রের মত আদর করিতে ও শত্রুর মত বাঁধিতে হইবে ইহাই ছিল নিয়ম। তালপাতা, তেরেটপাতা (তালপাতার চেয়ে লম্বা), ভোজপাতা, গাছের বাকল, সোলার শাঁস, কাগজ প্রভৃতি নানা জিনিসের উপর বই লেখা হইত। এই সমস্ত জিনিসকে লেখার উপযুক্ত ও টেঁকসই করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইত। ভিজাইয়া, পচাইয়া, গোবর ও তেঁতুলের বিচির ক্বাথ লাগাইয়া তালপাতাকে মজবুত করা হইত। হাতে তৈয়ারি কাগজেও নানা জিনিস মাখাইয়া উহা পোকার আক্রমণ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। পরিমাণ মত নানা রকম গাছের ছাল জলের সঙ্গে জাল দিয়া প্রদীপের ভূষার সঙ্গে মিশাইয়া কালি তৈয়ারি করা হইত। বাঁশের কঞ্চি, খাগ, পাখির পালক কাটিয়া মনোমত কলম প্রস্তুত হইত। আগাগোড়া একই রকম গোটা গোটা অক্ষরে লেখা হইত। কোথাও ব্যস্ততা বা বিরক্তির চিহ্ন দেখা যাইত না। ওড়িশায় ও দক্ষিণ ভারতে তালপাতার পুথি কালি দিয়া না লিখিয়া লোহার শলা দিয়া আঁক কাটিয়া লেখার নিয়ম। উহার উপর ভূষা কালি ঘষিয়া পড়িতে হয়।

পুথি লেখা ও পুথি দান করা পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। তবে অনেকে পুথি লিখিয়া অর্থোপার্জনও করিতেন। কোনও কোনও পুথির শেষে এ সম্বন্ধে কৌতুককর বিবরণ পাওয়া যায়। পুথির উপর জনসাধারণের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। অনেক পুথির শেষে লিপিকরের ত্রুটি স্বীকার, পুথির সংরক্ষণ ও দীর্ঘজীবন কামনা, পুথি অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপবর্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে এই শ্রদ্ধার নিদর্শন পাওয়া যায়।

অনেকের ঘরে প্রাচীন পুথি আজ অযত্নে নষ্ট হইতেছে। সরকারি বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠান প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত এই সমস্ত পুথি সংগ্রহ ও আলোচনার ব্যবস্থা করিতেছেন। ফলে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব প্রভৃতি ইতিহাসের বিভিন্নদিক সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। আবিষ্কৃত পুথির সাহায্যে অনেক অজ্ঞাত, অল্পজ্ঞাত, লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের প্রচার ও প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের পুথির সহায়তায় রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় সুপরিচিত অথচ পাঠ বিকৃতি ও প্রক্ষেপে ভারাক্রান্ত গ্রন্থের যথাসম্ভব বিশুদ্ধপাঠ-পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশের প্রয়াস সম্ভবপর হইয়াছে।

দ্র চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ; Chintaharan Chakravarti, *Study of Manuscripts*, Poona, 1941; *Value and Importance of Manuscripts in Olden Times*, Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, 1950.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পুনর্জীবন জীবদেহে নষ্ট অঙ্গের পুনর্গঠন। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই এ ক্ষমতা বিদ্যমান। মেরুদণ্ডী অপেক্ষা অমেরুদণ্ডী প্রাণীরই পুনর্জীবন ক্ষমতা অধিক। এককোষী প্রাণীর বংশবৃদ্ধির সময় দেহটি ভাঙ্গিয়া দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হয় এবং প্রতিটি অংশ হইতে অবশিষ্ট দেহাংশ পুনর্জীবিত হয়। হাইড্রা, প্ল্যানেরিয়া প্রভৃতি প্রাণীর দেহের একপঞ্চমাংশ হইতে সম্পূর্ণ দেহ পুনর্জীবিত হয়। ছিদ্রালী প্রাণী ও তারামাছের পুনর্জীবনক্ষমতাও উল্লেখযোগ্য ('ছিদ্রালী প্রাণী' ও 'তারামাছ' দ্র)। পতঙ্গ ও শামুকের ক্ষেত্রে কেবল দেহের কোনও উপাঙ্গ বিনষ্ট হইলে পুনর্জীবিত হয়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে উভচরের লেজ ও পদচতুষ্টয়, মাছের পাখনা ও শুঁড়, সরীসৃপের লেজ এবং পাখির পালক পুনর্জীবিত হইতে পারে। স্তন্যপায়ীর দেহে পুনর্জীবনক্ষমতা আহত অঙ্গের নিরাময়েই সীমাবদ্ধ; হরিণের বিনষ্ট শৃঙ্গের পুনর্জীবন হইতে দেখা যায়।

পুনর্জীবনকালে প্রথমতঃ ক্ষতস্থানের কোষগুলি উদ্দীপিত হইয়া ক্ষতস্থান নিরাময় করে। তাহার পর ঐস্থানে দেহের অন্যান্য স্থান হইতে প্রচুর বিশেষপ্রকার কোষ আসিয়া জমা হয়; কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির পর স্থানটিকে 'ব্লাস্টেমা' বলে। অতঃপর সমাগত কোষগুলি বিনষ্ট অঙ্গের টিসুর সংগঠনের অনুরূপ রূপান্তরিত হয়; এই রূপান্তরের সময়ে একই আকৃতির কোষ হইতে বিভিন্ন প্রকারের কোষ সৃষ্ট হয়।

পুনর্জীবনক্ষমতা নির্ভর করে দেহে বিশেষ এক ধরনের কোষের অবস্থিতির উপর। পুনর্জীবন এবং ভ্রূণ হইতে পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্তি একই প্রকারের ঘটনা। উভয় ক্ষেত্রেই

প্রারম্ভে একই রকমের প্রাথমিক কোষ থাকে এবং এই কোষগুলি ক্রমে বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়। উচ্চস্তরের প্রাণীর দেহে সকল প্রাথমিক কোষই বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হয় এবং একবার রূপান্তরিত কোষের আর কোনও পরিবর্তনের ক্ষমতা না থাকায় ঐসকল প্রাণীর পুনর্জীবনক্ষমতা সীমিত হইয়া থাকে। নিম্নস্তরের প্রাণীর দেহে কিছু প্রাথমিক কোষ থাকিয়া যাওয়ায় তাহাদের পুনর্জীবনক্ষমতা অধিক। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, রূপান্তরিত কোষ পরিবর্তিত হইয়া প্রাথমিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে।

বঙ্কুবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়

পুনর্ভবা মহানন্দার উপনদী। পুনর্ভবা পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমায় আত্রেয়ী নদী হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহা দিনাজপুর ও মালদহ জেলার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া মোকরামপুর গ্রামে মহানন্দায় মিলিত হইয়াছে। রেনেলের সময়ে (১৭৮৭ খ্রী) পুনর্ভবা ছিল তিস্তার শাখা নদী ; তখন তিস্তা আত্রাই নদীর খাতে পদ্মায় পড়িত। ইহা অগভীর, খরস্রোতা, বর্ষায় নাব্য ; দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র ভারতের অন্তর্ভুক্ত।

দ্র S. C Majumder, *Rivers of the Bengal Delta*, Calcutta, 1942.

সলিল চৌধুরী

পুনা ১৭°৫৪′ হইতে ১৯°২৪′ উত্তর এবং ৭৩°৫৬′ হইতে ৭৫°৫২′ পূর্বে অবস্থিত। পুনা মহারাষ্ট্র রাজ্যের তৎপূর্বে বোম্বাই রাজ্যের পুনা বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা ও শহর। জেলাটির বর্তমান আয়তন ১৫৬১০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে আহমদনগর জেলা, পূর্বে আহমদনগর ও শোলাপুর, দক্ষিণে শোলাপুর ও সাতরা এবং পশ্চিমে আলীবাগ (কোলাবা) ও থানা জেলা। জেলাটির পশ্চিম দিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা (সহ্যাদ্রি), উত্তর-দক্ষিণে ১১৭ কিলোমিটার (৭৩ মাইল) ব্যাপিয়া দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় অবস্থিত। হরিশ্চন্দ্রগড় উচ্চতম শৃঙ্গ। ভোরঘাট এখানকার বিখ্যাত গিরিপথ। পশ্চিমঘাটের কয়েকটি সমান্তরাল শাখাগিরিশ্রেণী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ধীরে ধীরে সমভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই গিরিশ্রেণীর গাত্রদেশ উত্তুঙ্গ, উপরিভাগ সমতল এবং তাহার উপরে মন্দির ও দুর্গাদি আছে।

প্রধান নদী ভীমা ১৬১ কিলোমিটার ব্যাপিয়া জেলার পূর্ব সীমান্ত হিসাবে পরিগণিত। নীরা দক্ষিণ সীমান্ত হিসাবে চিহ্নিত। ভীমার প্রধান উপনদীগুলির মধ্যে ভেল, ঘেরা, ভীমা, ইন্দ্রযানী, মূলা, মুথা ও নীরা উল্লেখযোগ্য।

জেলাটির প্রায় অধিকাংশই স্তরীভূত ডেকান ট্র্যাপ শিলাদ্বারা গঠিত। ব্যাসল্ট প্রধান শিলা। মাঝে মাঝে চুনা পাথরের স্তর দেখা যায়। মাঝে মাঝে ডাইক এবং ল্যাটেরাইট শিলাও পাওয়া যায়।

গ্রীষ্মে (মে মাসে) সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৪২° সেন্টিগ্রেড ও শীতে (নভেম্বর মাস) সর্বনিম্ন তাপমাত্র ৯° সেন্টিগ্রেড। আবহাওয়া শুষ্ক ও স্বাস্থ্যপ্রদ। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড়মাত্রা পশ্চিমে ৪৫০০ মিলিমিটার এবং পূর্বে ৫০০ মিলিমিটার।

পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় ১৫৩৩ বর্গকিলোমিটার চিরহরিৎ, মিশ্র পর্ণমোচী ও ঝোপঝাড় এই তিন প্রকার বনভূমি দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য খনিজসম্পদ এই জেলায় নাই বলিলেই চলে। ডেকান ট্র্যাপের ব্যাসল্ট প্রস্তর গৃহ ও সড়কনির্মাণে ব্যবহৃত হয়। পূর্বাংশে কঙ্কর ও জিপসাম পাওয়া যায়। লৌহ, চুনা পাথর, লবণ ও স্ফটিকের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে।

ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই অঞ্চলটি দণ্ডকারণ্যের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রাচীন শিলালিপি হইতে জানা যায় যে এই অংশটি বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চল বলিয়াও বিবেচিত হইত। খ্রীষ্টজন্মের এক শতাব্দী পূর্বে অন্ধ্র-নরপতিগণ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। বেদশার গুহার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, এইস্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কালে চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও যাদববংশীয় নরপতিগণের পর ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন তোগলক স্থানটির কর্তৃত্ব লাভ করেন। ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনী-রাজগণ এই অঞ্চলের অধীশ্বর হন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পুনা মারাঠা পেশোয়াদের করতলগত হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনায় মারাঠা-শাসনের অবসান ও ব্রিটিশ-শাসনের প্রবর্তন হয়।

প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে জুন্নার গুহার শিলালিপি এবং নানা গিরিপথের শিলালিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধযুগীয় গুহা কার্লা, ভাজা ও বেদশা অঞ্চলে দেখা যায়। ইহা ব্যতীত শৈবায়ত মন্দির, প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি দর্শনীয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী জেলার জনসংখ্যা ২৪৬৬৮৮০। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৫৮·৩ (প্রতি বর্গমাইলে ৪১০ জন)। জেলার শতকরা ৮৫ জনই মারাঠী ভাষাভাষী। মোট জনগণের শতকরা

৩৪·৩১ শিক্ষিত। জেলায় ২২টি শহর ও ১৪৯৮টি গ্রাম আছে। শহরের মধ্যে পুনা, কিরকী, জুন্নার, বরামতী, শিরুর, খেড়, ইন্দাপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কৃষি-মহাবিদ্যালয়, কারিগরী মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রভৃতি এই জেলায় আছে। উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা-কেন্দ্র হিসাবে পুনা বিশ্ববিদ্যালয়, ডেকান কলেজ, গোখলে ইন্স্টিটিউট অফ পলিটিক্স অ্যাণ্ড ইকনমিক্স এবং ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্স্টিটিউট-এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। সব কয়টিই পুনা শহরে অবস্থিত। সামরিক কলেজ হিসাবে খড়কভসলা জাতীয় সমর শিক্ষালয়ের নাম ভারতবিদিত।

কৃষিকার্য জেলার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপজীবিকা। শতকরা ৬৩% জনই কৃষির উপর নির্ভরশীল। জেলার শতকরা ৬২ ভাগে কৃষিকার্য হয়। প্রধান ফসলের মধ্যে ধান্য, বজরা, গম, ছোলা, ডাল, তৈলবীজ, তামাক, মসলা, ইক্ষু, তুলা, সবজি, ফল, চীনাবাদাম, সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার জন্য সেচব্যবস্থা ব্যাপক। নীরা জলসেচপ্রকল্প উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ের ঢালে কমলালেবু, আঙ্গুর, জলপাই, কলা প্রভৃতির চাষ হয়।

জেলাটিতে ১৬০টি বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে; অধিকাংশই পুনা, কিরকী ও পিম্পরির আশেপাশে অবস্থিত। পুনা শহরে চলচ্চিত্রের স্টুডিয়ো, বস্ত্রশিল্প ও পিম্পরিতে ভেষজকেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। পুনা, বরামতী, খেড়, ধোন্দ্, শিরুর প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র হিসাবে পরি-গণিত। নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পোদ্যোগের মধ্যে কিরকীর অস্ত্র-নির্মাণের কারখানা ও লোনাবলার রেলকারখানা বিশেষ-ভাবে উল্লেযোগ্য।

জেলার বিভিন্ন অংশ রেলপথে কলিকাতা, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোরের সহিত যুক্ত। তিনটি জাতীয় সড়ক (৪, ৯ এবং ৫০ নং) এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। পুনাতে বিমান-অবতরণক্ষেত্র ও একটি বেতারকেন্দ্র আছে।

পুনা শহর (১৮°৩১′ উত্তর এবং ৭৩°৫১′ পূর্ব) বিভাগ তথা জেলার সদর দপ্তর ও প্রধান কেন্দ্র; বোম্বাই-এর পর মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। বোম্বাই হইতে ইহার দূরত্ব ১৯২ কিলোমিটার। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জন-সংখ্যা ৫৯৭৫৬২, সামরিক ছাউনির জনসংখ্যা ৬৫৮৩৮ জন। কিরকী সামরিক ছাউনিটি শহরের বহির্ভাগে অবস্থিত। মূলা ও মুথা নদীর সঙ্গমস্থলে শহরটি অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে শহরটি বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। নানা ধর্মের জনগণ দেখা যায়। গ্রীষ্মাবাস হিসাবে শহরটির খ্যাতি আছে। আবহাওয়া চমৎকার। বার্ষিক গড় উত্তাপ ২২° সেন্টিগ্রেড; বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৭০০ মিলিমিটার। শহরের আয়তন ১১২ বর্গকিলোমিটার। শহরটি 'দাক্ষিণাত্যের রানী' হিসাবে পরিগণিত (ভূপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা ৫৬৩ মিটার)। প্রাচীন ঐতিহ্য, মনোরম দৃশ্যাবলী, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক কেন্দ্র হিসাবে শহরের খ্যাতি সুবিদিত। সমুদ্রতীর হইতে দূরত্ব প্রায় ১০১ কিলোমিটার; অনেকে মনে করেন সংস্কৃত পুণ্যপুর (মূলা ও মুথা নদীর পুণ্য সংগমস্থল) হইতেই বর্তমান পুনা শহর ও জেলার নামকরণ হইয়াছে। আগা খাঁর প্রাসাদ, খড়কভসলা খাল, পার্বতী-মন্দির, হ্রদ, উদ্যান, মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি নানা প্রকার মনোহর দৃশ্যাবলী দর্শকের মন জয় করে। অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে পেশোয়াদের প্রাসাদ, মন্দির, শৈব গুহা, কাউন্সিল গৃহ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখানে সরকারি আবহবিদ্যার কার্যালয়টি অবস্থিত। পুনা শহর একটি বড় রেলকেন্দ্র।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. 20, Oxford, 1908; *Gazetteer of Bombay State (Revised Edition): District Series*, vol. 20, *Poona District*, Bombay, 1954; *District Census Handbook: Poona*, Bombay, 1966.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

পুরশ্চরণ তান্ত্রিক অনুষ্ঠানবিশেষ। উপাস্য মন্ত্রকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান করার কথা। প্রাণহীন জীব যেমন কোনও কার্যের যোগ্য নহে পুরশ্চরণ-হীন মন্ত্রও সেইরূপ। সুতরাং ইহা সাধকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। অনুষ্ঠানের পাঁচটি অঙ্গ—মন্ত্রজপ, মন্ত্রের দ্বারা হোম, মন্ত্রের দ্বারা তর্পণ, মন্ত্রের দ্বারা অভিষেক এবং ব্রাহ্মণভোজন। জপ সংখ্যার দশভাগ হোম, হোমের দশভাগ তর্পণ, তর্পণের দশভাগ অভিষেক ও অভিষেকের দশভাগ ব্রাহ্মণভোজন। জপই মুখ্য—জপসংখ্যার বৃদ্ধির দ্বারা পুরশ্চরণের অঙ্গবিশেষের ত্রুটি সংশোধিত হইতে পারে; কেবল জপের দ্বারাই স্থলবিশেষে পুরশ্চরণ সম্পন্ন হইতে পারে। শুক্লপক্ষে শুভ দিনে পুরশ্চরণ আরম্ভ করিতে হয়। সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত জপ করিতে হয়। চন্দ্রসূর্য-গ্রহণের সময় পুরশ্চরণ বিশেষ প্রশস্ত। বর্তমানে এই অনুষ্ঠানের তেমন প্রচলন নাই।

দ্র কৃষ্ণানন্দ, তন্ত্রসার

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পুরাণ[১] প্রাচীন আখ্যায়িকা-সম্বলিত গ্রন্থ-সমুদয়। অথর্ববেদে, শতপথ ও গোপথ ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে, আপস্তম্ব ও গৌতমের ধর্মসূত্রে এবং মহাভারত ও মনু-সংহিতায় পুরাণ-প্রসঙ্গ রহিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে ইতিহাস ও পুরাণের একত্র নির্দেশ দেখা যায় এবং ইহারা সমার্থক। পুরাভবম্ ইতি পুরাণম্ এবং ইতি-হ-আস হইল ইতিহাস। সংক্ষেপে পুরাণ বলিতে বেদোত্তর যুগের ইতিহাস আখ্যায়িকা উপকথা ও ধর্মমূলক এক শ্রেণীর বিশিষ্ট গ্রন্থ বুঝায়।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিলেও বাস্তবিক ইহা বেদতুল্য বা অপৌরুষেয় নহে, তথাপি ইহাকে গৌণপ্রমাণ বলিয়া আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন। বর্তমানে উপলব্ধ পুরাণ সংখ্যায় বহু হইলেও অষ্টাদশ পুরাণ উক্তিটি প্রসিদ্ধ। পরবর্তী কালে প্রধানগুলি মহাপুরাণ এবং অপ্রধানগুলি উপপুরাণ নামে প্রচলিত হয়।

প্রাচীন বিশ্বাস এই যে পুরাণ 'আজ্ঞাসিদ্ধ' শাস্ত্র এবং চতুর্দশ বিদ্যাস্থানের অন্তর্গত। সমুদয় পুরাণই বেদব্যাসের রচনা, ইহাদের নাম জয় এবং ইহাদের প্রবক্তা লোমহর্ষণের পুত্র সূত উগ্রশ্রবা। নৈমিষারণ্যে ইহাদের প্রচার হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহাভারতও পঞ্চম এবং সার্ববর্ণিক বেদ, মহাভারতের নামও জয়। ইহাও নৈমিষারণ্যে উগ্রশ্রবা কর্তৃক প্রচারিত হয়। ইহার পর্বসংখ্যাও অষ্টাদশ। মহাভারতের খিলপর্ব হরিবংশ সকল দিক দিয়াই পুরাণপদবাচ্য।

পুরাণের একটিও বেদবাহ্য নহে, প্রত্যেকটিই বেদ-সম্মত। শাস্ত্রে ইতিহাস ও পুরাণজ্ঞানের দ্বারা বেদজ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে বলা হইয়াছে এবং চতুর্বেদবিৎকেও পুরাণ-বিৎ হইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তথাপি বৈদিক ধর্ম হইতে পুরাণের ধর্ম এতই পৃথক যে তাহা নূতন ধর্ম বলা চলে। যজ্ঞের জটিলতা এবং ইন্দ্র মরুৎ ও অগ্নি উপাসনার পরিবর্তে এখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পূজা, মন্দির ও প্রতিমা নির্মাণ, নূতন উপকরণ ও পূজাবিধি, অবৈদিক মন্ত্র ও স্তবাদির বাহুল্য এবং তীর্থ মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

অমরকোষ এবং বায়ু মৎস্যাদি পুরাণের মতে ইহার লক্ষণ পাঁচটি (১) সর্গ (সৃষ্টি) (২) প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর নবসৃষ্টি) (৩) বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশ-তালিকা) (৪) মন্বন্তর (চৌদ্দ জন মনুর শাসন বিবরণ) ও (৫) বংশানুচরিত (রাজগণের বংশাবলী)। ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্তমতে মহাপুরাণের লক্ষণ দশটি—যথা সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু ও অপাশ্রয় (ভাগবত ১২।৭)।

মৎস্যপুরাণে প্রথমোক্ত পঞ্চলক্ষণের সহিত ভুবনবিস্তর দানধর্মবিধি, শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রম বিভাগ, ইষ্টাপূর্ত ও দেবতা প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সমুদয়ে একাদশ লক্ষণ কথিত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণ রাজস, সাত্ত্বিক, তামস ও সংকীর্ণ এই চারিভাগে পুরাণগুলিকে ভাগ করিয়াছে। রাজসে ব্রহ্মা, সাত্ত্বিকে বিষ্ণু, তামসে শিব এবং সংকীর্ণে পিতৃগণ কীর্তিত হইয়াছেন।

স্কন্দপুরাণ চারিখানি বিষ্ণুর, দুইখানি ব্রহ্মার, দুইখানি সূর্যের, এবং দশখানি পুরাণ শিবের মাহাত্ম্যসূচক এরূপ বলিয়াছেন। মৎস্য কূর্মাদি পুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে সমুদয় পুরাণের শ্লোক সংখ্যা পৃথকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বর্তমানে উপলব্ধ পুরাণগুলির সহিত উক্ত শ্লোক সংখ্যার কিন্তু সামঞ্জস্য বিধান এবং প্রদত্ত বিষয় সূচীর সঙ্গতি নির্ণয় প্রায় দুঃসাধ্য। ব্রহ্মার উপাসনা প্রচলিত না থাকায় বর্তমানে পুরাণকে শৈব শাক্ত এবং বৈষ্ণব এই তিনভাগে ভাগ করাই সঙ্গত।

বিষ্ণুপুরাণ যথাক্রমে পুরাণের নাম এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, (১) ব্রহ্ম (২) পদ্ম (৩) বিষ্ণু (৪) শিব (৫) ভাগবত (৬) নারদ (৭) মার্কণ্ডেয় (৮) অগ্নি (৯) ভবিষ্য (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত (১১) লিঙ্গ (১২) বরাহ (১৩) স্কন্দ (১৪) বামন (১৫) কূর্ম (১৬) মৎস্য (১৭) গরুড় (১৮) ব্রহ্মাণ্ড।

মৎস্য ও নারদপুরাণ শিবপুরাণের স্থলে বায়ুপুরাণের নির্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ বায়ুপুরাণকেই মহাপুরাণ রূপে স্বীকার করেন। ইহাদের বিষয়সূচী সংক্ষেপে এইরূপ ঃ

ব্রহ্মপুরাণ—সমুদয় তালিকায় ইহার নাম প্রথমে নির্দিষ্ট থাকিলেও বর্তমানে ইহা প্রাচীন নহে। সৃষ্টিক্রম ও বংশবর্ণনার পর তীর্থ মাহাত্ম্য। মাহাত্ম্যসহ উড়িষ্যার মন্দিরগুলির বর্ণনা থাকায় ইহা ১২-১৩ শতকের পর রচিত বলিয়া মনে হয়।

পদ্মপুরাণ—বৈষ্ণবপুরাণ। বঙ্গবাসী সংস্করণে সৃষ্টি ভূমি, স্বর্গ, ব্রহ্ম, পাতাল, উত্তর ও ক্রিয়াযোগসার এই ৭টি খণ্ড আছে। ক্রিয়াযোগসার—উপপুরাণ।

বিষ্ণুপুরাণ—পঞ্চরাত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম মূলগ্রন্থ। আচার্য রামানুজ ইহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামীর উৎকৃষ্ট টীকা রহিয়াছে। উইলসন একমাত্র

বিষ্ণুপুরাণকেই পঞ্চলক্ষণযুক্ত পুরাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

শিব—বর্তমানে উপলব্ধ শিবপুরাণ প্রাচীন নহে। উহা জ্ঞান, বিদ্যেশ্বর, কৈলাস, সনৎকুমার, বায়ু ও ধর্ম এই ৬টি সংহিতায় বিভক্ত এবং নানা অবান্তর বিষয়ে পরিপূর্ণ। কুমারসম্ভবের অনেক শ্লোক ইহাতে গৃহীত হইয়াছে।

বায়ু—আধুনিক মতে ইহা সর্বপ্রাচীন পুরাণ। বাণ-ভট্ট বায়ুপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। গয়াশ্রাদ্ধ ও গয়ামাহাত্ম্য ইহার অন্তর্গত। প্রক্রিয়া, অণুষঙ্গ, উপোদ্‌ঘাত ও উপসংহার ইহার চারিটি পাদ।

ভাগবত—সমুদয় পুরাণ-সাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম-গ্রন্থ। শ্রীধর স্বামীর টীকা সর্বজনমান্য। সর্বযুগের বৈষ্ণবগণ সম্প্রদায় অনুযায়ী ইহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শ্লোকসংখ্যা ১৮০০০, স্কন্ধ ১২টি। ইহার অন্তর্গত (১০২৯-৩৩) রাসপঞ্চাধ্যায় কাব্য এবং দার্শনিক তত্ত্বের সংমিশ্রণে অপূর্ব বস্তু। ভাষার গাম্ভীর্যে, রসের মর্যাদায়, ছন্দ ও অলঙ্কার পারিপাট্যে ইহা সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির অন্যতম।

নারদ—শিব ও বিষ্ণুমাহাত্ম্য এবং তীর্থপ্রসঙ্গ রহিয়াছে। বল্লালসেন দানসাগরে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

মার্কণ্ডেয়—সুপ্রসিদ্ধ দেবীমাহাত্ম্য বা সপ্তশতী চণ্ডী ইহার অন্তর্গত (৮১-৯৩ অধ্যায়)।

অগ্নি—বহু প্রকীর্ণ বিষয়ের সমাবেশে বিশ্বকোষতুল্য গ্রন্থ। মূর্তি বা প্রতিমালক্ষণ, রত্নপরীক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠা, বাস্তুশাস্ত্র, হস্তী ও অশ্ব চিকিৎসা, আয়ুর্বেদ, নাটক, অভিনয় ও রসাদি নিরূপণ, অলঙ্কার বিচার, ব্যাকরণ ও অভিধান অংশ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ হাজরা এই পুরাণখানিকে উপপুরাণ বলিয়া বহ্নিপুরাণকে প্রাচীন অগ্নিপুরাণ বলিয়াছেন।

ভবিষ্য—সূর্যপূজার বিস্তৃত ইতিহাস সম্বলিত। শাম্ব কর্তৃক শকদ্বীপ হইতে মগ ব্রাহ্মণ আনয়নের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রতিসর্গ পর্বে অষ্টাদশ শতকের ঘটনাও বিবৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত—কৃষ্ণলীলাত্মক। ব্রহ্ম, প্রকৃতি, গণেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম এই ৪ খণ্ডে বিভক্ত অত্যন্ত আধুনিক পুরাণ। বঙ্গদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

লিঙ্গ—শৈবপুরাণ। হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্বস্বে বৃহল্লিঙ্গ পুরাণের কথা বলিয়াছেন।

বরাহ—বৈষ্ণবপুরাণ। ব্রতকথা ও তীর্থমাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। মথুরার বর্ণনা আছে। ব্রতপ্রকরণে বুদ্ধদ্বাদশী ব্রতের বিবরণ দেখা যায়।

স্কন্দ—শৈবপুরাণ। তীর্থমাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কাশী, আবন্ত্য, নাগর, প্রভাস এই ৭ খণ্ডে ৮১,০০০ শ্লোকে বঙ্গবাসী সংস্করণে ছাপা হইয়াছে। মতান্তরে ইহা ৬খানি সংহিতায় বিভক্ত। অত্যন্ত আধুনিক। সত্যনারায়ণ ব্রতকথাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। কাশীখণ্ড বহুল প্রচারিত।

বামন—শিব ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সূচক। উত্তর বামন অংশ পাওয়া যায় না। কাশী, প্রয়াগ ও নর্মদামাহাত্ম্য আছে।

কূর্ম—প্রাচীন পুরাণ। ইহার ব্রাহ্মসংহিতা বাদে অন্য সংহিতাগুলি লুপ্ত।

মৎস্য—সুবৃহৎ প্রাচীন পুরাণ। সমুদয় পুরাণের অনুক্রমণী দেওয়া আছে। প্রতিমালক্ষণ, বাস্তু ও প্রাসাদলক্ষণ কথিত হইয়াছে।

গরুড়—বৃহৎ বৈষ্ণবপুরাণ। অসংখ্য প্রকীর্ণ বিষয়ে পরিপূর্ণ। জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, বাস্তুবিদ্যা, রত্নপরীক্ষা প্রভৃতি অংশ উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মাণ্ড—প্রাচীন পুরাণ। ললিতোপাখ্যান এবং সপ্তকাণ্ডাত্মক অধ্যাত্ম-রামায়ণ ইহার অন্তর্গত।

অষ্টাদশ মহাপুরাণ ভিন্ন অষ্টাদশ উপপুরাণও সর্বত্র স্বীকৃত। কূর্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, হেমাদ্রিকৃত চতুর্বর্গ চিন্তামণি, রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম আছে। বৈষ্ণব, শাক্ত এবং শৈব উপপুরাণ ভিন্ন সৌর, গাণপত্য এবং 'সঙ্কীর্ণ' উপপুরাণ সমুদয় মিলাইয়া সংখ্যায় শতাধিক হইবে। বাহুল্যভয়ে নামের আলোচনা হইল না। উপপুরাণগুলিও পুরাণের লক্ষণযুক্ত। কয়েকটির উল্লেখ করা হইতেছে :

দেবীভাগবত—ইহা ১২ স্কন্ধ এবং ১৮০০০ হাজার শ্লোকযুক্ত। শাক্তগণ ইহাকেই ভাগবত এবং মহাপুরাণ বলেন।

কালিকা পুরাণ—বঙ্গ ও কামরূপে স্মার্তগণের প্রামাণ্য গ্রন্থ। শারদীয়া দুর্গাপূজা প্রধানতঃ এই মতেই হইয়া থাকে। নন্দিকেশ্বর, বৃহদ্ধর্ম, শাম্ব এবং সৌর-পুরাণ নানা বিষয়ের সমাবেশে উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণুধর্মোত্তর—সমুদয় উপপরাণের মধ্যে বৃহৎ এবং বিশিষ্ট। প্রথম খণ্ডে সৃষ্টি, বংশতালিকা ও উপাখ্যানাদির

সহিত কাশ্মীর ও গান্ধার দেশের ভৌগোলিক বিবরণ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ে নীতি ও ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিষের প্রাধান্য। তৃতীয়ে ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দ, অলঙ্কার, নৃত্যগীত, স্থাপত্য, প্রতিমা নির্মাণ ও চিত্রকলা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ অল্‌বিরুনী (১০৩০ খ্রী) অষ্টাদশ মহাপুরাণের সহিত এই কোষতুল্য বিষ্ণুধর্মোত্তরের বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন।

কহ্লন কর্তৃক স্বীকৃত নীলমতপুরাণকে কাশ্মীরের, স্বয়ম্ভূ-পুরাণকে নেপালের এবং একাম্রপুরাণকে উৎকলের আঞ্চলিক পুরাণ বলাই সঙ্গত। বাহুল্যভয়ে পুরাণের কালনির্ণয়ের আলোচনা হইল না।

জৈনমতে চব্বিশজন তীর্থঙ্করকে লইয়া চব্বিশখানি পুরাণ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আদি, অরিষ্টনেমি, উত্তর ও পদ্ম পুরাণ প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধগণ নয়খানি পুরাণ স্বীকার করিয়া উহাদের নবধর্ম আখ্যা দিয়াছেন। ললিতবিস্তর এইমতে বৌদ্ধ পুরাণ।

ক্ষত্রিয় পিতার ও ব্রাহ্মণ মাতার সন্তান স্তুতিপাঠক সূতগণ ছিলেন প্রথম যুগে পুরাণের প্রবক্তা। স্মৃতি ও তন্ত্রের প্রাধান্যের সহিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতবর্গ যদৃচ্ছাক্রমে ইহার সংযোজন ও সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের কেহই সজ্ঞানে ঐতিহাসিক ছিলেন না। তথাপি অতিশয় অসংবদ্ধরূপে গ্রথিত এবং অতিরঞ্জনে পরিপূর্ণ এই পুরাণগুলিই বেদোত্তর যুগ হইতে পরীক্ষিতের রাজ্যলাভ এবং তৎপরবর্তী ঐতিহাসিক হিন্দুযুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সর্বপ্রধান উপাদান।

বিগত দেড়শত বৎসর ধরিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্রহ্ম-বৈবর্ত এবং বিষ্ণু পুরাণ বহুবার মুদ্রিত হইলেও জীবানন্দ বিদ্যাসাগরই প্রথম সর্বশ্রেণীর পুরাণ মুদ্রণ করিতে থাকেন। পরে বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে ভবিষ্যপুরাণ বাদ দিয়া অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং বহু উপপুরাণের অনুবাদ সহ বঙ্গদেশীয় পাঠ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। আধুনিক পণ্ডিত-গণ বেঙ্কটেশ্বর (বোম্বাই) সংস্করণের পাঠকেই মোটা-মুটি পরিশুদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

পুরাণ২ স্বর্গত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এলাহাবাদ প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনে বলেন পুরাণে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ. বি. কীথ পুরাণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিগ্ধ; কিন্তু ভি. এ. স্মিথ দেখাইয়াছেন যে মৎস্যপুরাণে অন্ধ্ররাজগণের বংশ-তালিকা ও তাঁহাদের রাজত্বকাল প্রায় ঠিকই দেওয়া হইয়াছে। এফ্. ই. পার্জিটার বেদ অপেক্ষা পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য বেশি বলিয়াছেন ও এল. ডি. বার্নেট তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণের কথা সব সময় বিশ্বাস করা যায় না। পুরাণে শাক্য জনৈক ব্যক্তি, সিদ্ধার্থ একজন রাজা ও প্রদ্যোত বিম্বিসারের অনেক পরে রাজা হন এইরূপ অসঙ্গতি দেখা যায়। সুতরাং পুরাণকে যথাযথ ইতিহাস বলা যায় না। বর্তমানে আর. সি. হাজরা পুরাণ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, এক্ষণে আমরা যাহা ইতিহাস বলি প্রাচীন ভারতে তাহা ছিল না। বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, মার্কণ্ডেয়, বিষ্ণু, মৎস্য ও ভাগবত এই ছয়টি প্রাচীন পুরাণ। ইহাতে যে বংশ তালিকা দেওয়া আছে তাহাতে সেই সব বংশের আদি পুরুষকে সূর্যের পুত্র বৈবস্বত মনুর বংশধর বলা হইয়াছে। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র বিকুক্ষি-শশাদ এবং নিমি যথাক্রমে অযোধ্যায় ও বিদেহে রাজত্ব করিতেন। প্রথমোক্ত বংশে দশরথপুত্র রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বৈবস্বতের অপর পুত্র নাভানেদিষ্ঠা বৈশালীতে রাজত্ব করেন ও বৈশাল বংশের স্থাপয়িতা। বৈবস্বতের আর একটি পুত্র শর্যাতি গুজরাতের শর্যাত বংশের আদি পুরুষ। বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলা ও সোমের পুত্র পুরূরবা প্রতিষ্ঠান বা এলাহাবাদের চন্দ্রবংশের স্থাপয়িতা। পুরূরবার পুত্র অমাবসু কান্যকুব্জ বা কনৌজের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পুরূরবার পৌত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ কাশীরাজবংশের স্থাপয়িতা। পুরূরবার অপর পৌত্র নহুষের পৌত্রেরা যথাক্রমে হৈহয়, যাদব, তুর্বসু, দ্রুহ্যু, আনব ও পৌরব এই সকল বংশ স্থাপন করেন। কিন্তু সকল বংশতালিকা সত্য হইলে ইঁহাদের আদি পুরুষ ভারতযুদ্ধের ২০০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন বলিতে হয়। ভারতযুদ্ধের পরে তিনটি বংশের যথা ঐক্ষ্বাকু, পৌরব ও মগধ বংশের বংশতালিকা পুরাণে দেওয়া হইয়াছে। অর্জুনের নিম্নতম ষষ্ঠপুরুষ অধিসীমকৃষ্ণ পর্যন্ত এই বংশতালিকা পাওয়া যায়। অপরাপর বংশ সম্বন্ধে অতি অসম্পূর্ণ তালিকাও আছে। ইহার পরে ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, মৎস্য ও ভাগবত পুরাণে ঐতিহাসিক যুগের শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ, কাণ্ব, আন্ধ্র ও গুপ্ত রাজবংশের রাজগণ ও তাঁহাদের রাজত্বকাল দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শক, যবন, তুসর, হূণ, গর্দভিল্ল আভীর প্রভৃতি কয়েকটি বৈদেশিক বর্বরজাতির বর্ণনাও আছে। রাজগণের বংশতালিকা দিবার পর পুরাণে উত্তর ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের পর যে নিরানন্দ, বিষণ্ণ অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা বর্ণিত

হইয়াছে। ইহাই পুরাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; কিন্তু বিশেষ সাবধানতার সহিত ইহার বিচার করিতে হইবে।

দ্র H. C. Raichaudhuri, *Political History of Ancient India*, Calcutta, 1950; R.C. Hazra, *The Puranas, The Cultural Heritage of India*, vol. II.

পুরী ওড়িশা রাজ্যের জেলা ও শহর। জেলাটি সমুদ্রোপকূলে ১৯° ২৮′ হইতে ২০° ৩৫′ উত্তর এবং ৮৪° ২৯′ হইতে ৮৬° ২৫′ পূর্বে অবস্থিত। জেলার আয়তন মোট ১০৪৭১ বর্গকিলোমিটার (৪০৪৩ বর্গমাইল) এবং ইহা ৪টি মহকুমায় বিভক্ত। পুরী জেলার উত্তরে কটক এবং ঢেঙ্কানাল জেলা, পশ্চিমে ছত্রপুর (গঞ্জাম) জেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।

জেলাটির উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম অংশ পাহাড়ী অঞ্চল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশ পলল মৃত্তিকাগঠিত সমভূমি। সমুদ্রতীরে বালিয়াড়ি দেখা যায়। উত্তর-পূর্ব কোণে পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখী মহানদী প্রধান নদী। ইহা ব্যতীত আরও নদীনালা আছে, তবে সবগুলিই উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে চিল্কা হ্রদ অবস্থিত। ঋতু হিসাবে এই হ্রদের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। জেলার পাহাড়ের অধিকাংশই নিস প্রস্তরে গঠিত। ইহা ছাড়া ল্যাটেরাইট এবং বেলে পাথরও প্রচুর পরিমাণে পরিব্যাপ্ত।

জেলাটির প্রাচীন মন্দির-সমন্বিত পুরী, ভুবনেশ্বর, কণারক ইত্যাদির ঐতিহাসিক খ্যাতি সুবিদিত।

সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে আবহাওয়ার সমতা লক্ষ্যণীয়; অভ্যন্তরে শুষ্ক ধরনের আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়। মে মাসে তাপমাত্রা প্রায় ৩৮° সেন্টিগ্রেড হয় ও ডিসেম্বর মাসে প্রায় ১৬° সেন্টিগ্রেডে নামে। জেলার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ১৪৭০ মিলিমিটার।

জেলার শতকরা ৩৫ ভাগ অঞ্চল চিরহরিৎ বনভূমিতে পূর্ণ। শাল, শিশু ও পিয়াশাল প্রধান বৃক্ষ। জেলাটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। খুরদা মহকুমায় ল্যাটেরাইট, চুন ও বেলে পাথর এবং অন্যান্য এলাকায় শ্বেত মৃত্তিকা পাওয়া যায়।

জেলার মোট জনসংখ্যা (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে) ১৮৬৫৪৩৯। জেলায় ৫টি বড় শহর আছে; উহাদের মধ্যে পুরী (জনসংখ্যা ৬০৮১৫), নব্য রাজধানী ভুবনেশ্বর (জনসংখ্যা ৩৮২১১) ও রেলওয়ে কলোনি খুরদা (জনসংখ্যা ১২৪৯৭) উল্লেখযোগ্য। ওড়িয়া প্রধান ভাষা। শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৪ ভাগ। উচ্চতর শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ আছে। কৃষিকার্য, মৎস্যাহরণ ও চাকুরি জনগণের প্রধান উপজীবিকা। হীরাকুদ জলবিদ্যুৎ-প্রকল্প হইতে জেলার বিভিন্ন অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য ও জমির উর্বরতা চাষবাসের সহায়ক। শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ জমিতে জলসেচ করা হয়। ধান, ছোলা, তৈলবীজ, ডাল ও ইক্ষু প্রধান শস্য। মৎস্যাহরণ, বনোৎপাদন (চিল্কা হ্রদ এলাকায়) প্রস্তর-খোদাই, বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি প্রধান শিল্প। ইহা ব্যতীত পিতল ও কাঁসার বাসনপত্র, কৃষির জন্য যন্ত্রপাতি এবং বাঁশের নানাপ্রকার দ্রব্যের উৎপাদন কুটিরশিল্পের অন্তর্গত। জেলার যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত। কলিকাতা-মাদ্রাজ জাতীয় সড়ক, হাওড়া-মাদ্রাজ রেলপথ ও পুরী শাখা-রেলপথ জেলাটির মধ্য দিয়া গিয়াছে।

মহারাজ অশোকের শিলালিপি, কণারকের সূর্যমন্দির, পুরী ও ভুবনেশ্বরের হিন্দুস্থাপত্য, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির প্রাচীন জৈন গুহামন্দির জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য বহন করিতেছে। পুরীর রথযাত্রা এবং ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের অশোকাষ্টমীর মেলা বিখ্যাত উৎসব। কণারক, ভুবনেশ্বর ও পুরী প্রসিদ্ধ তীর্থকেন্দ্র।

পুরী (১৯° ৪৮′ উত্তর ও ৮৫° ৪৯′ পূর্ব) জেলার অন্যতম প্রধান শহর। শহরটি প্রাচীন ঐতিহ্যময়। আয়তন প্রায় ১৭ বর্গকিলোমিটার। সমুদ্রোপকূলবর্তী শহরটি হাওড়া হইতে ৪৯৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শহরটি জগন্নাথদেবের লীলাক্ষেত্র, প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে শহরটি পৌর শাসনের অন্তর্গত হয়। সমুদ্রতীরে রাজভবন, সার্কিট হাউস ও জেলাশাসকের বাসস্থান অবস্থিত। রথযাত্রার সময়ে প্রচুর জনসমাগম হয়।

দ্র L.S.S. O' Malley, *Bengal District Gazetteer : Puri*, Calcutta, 1908; *Census of India : 1961 Orisa, District Census Handbook : Puri*, Cuttack, 1966.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা ও শহর। জেলাটি (২২° ৪২′-২৩° ৪৩′ পূর্ব ও ৮৫° ৪৮′-৮৬° ৫২′ উত্তর) আয়তনে ৬২৫৫ বর্গকিলোমিটার। জেলার উত্তরে হাজারিবাগ ও ধানবাদ জেলা, পূর্বে বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা, দক্ষিণে সিংভূম জেলা এবং পশ্চিমে রাঁচি জেলা অবস্থিত। জেলার পশ্চিমাংশ নিম্ন মালভূমি ও পূর্বাংশ প্রস্তরযুক্ত অনুর্বর সমতলভূমি। সমতলভূমিকে টাঁড়

ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিকে 'ডি' বলা হয়। উত্তর-পশ্চিম দিকে পর্যায়ক্রমে পাহাড় ও উপত্যকা দৃষ্ট হয়। ঝালদা অঞ্চলে উচ্চ পাহাড় দেখা যায়। আরও দক্ষিণে বাঘমুণ্ডি এবং অযোধ্যার পাহাড় অবস্থিত। সিংভূমসীমান্তে অবস্থিত ডালমা পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গের উচ্চতা ১০৩৮ মিটার (৩৪০৭ ফুট); অযোধ্যা পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গজবুরু ৬৭৬ মিটার উচ্চ।

জেলার নদ-নদীগুলি পাহাড়ী অংশ হইতে বহির্গত হইয়া আঁকাবাঁকা পথে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ধাবিত। বর্ষার পর নদীগুলি জলধারায় পুষ্ট হয়, অন্য সময়ে শুষ্ক থাকে। বর্ষার সময়ে হঠাৎ জলস্ফীতির ফলে নদীতে বন্যার প্রকোপ দেখা দেয়। দামোদর নদী জেলার উত্তর প্রান্তে প্রবাহিত। জেলার অন্যান্য নদীগুলির মধ্যে সুবর্ণরেখা, বরাকর, দ্বারকেশ্বর, শিলাই বা শীলাবতী, কাঁসাই বা কংসাবতী, কুমারী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কংসাবতী জেলার পশ্চিমে ঝালদার উত্তরের পাহাড়ী এলাকা হইতে উঠিয়া দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখা বাঘমুণ্ডির পশ্চিম ও ডালমা পাহাড়ের দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবাহিত।

জেলার পশ্চিম অঞ্চল শুষ্ক ও পূর্ব অঞ্চল আর্দ্র। মার্চ হইতে মে মাস পর্যন্ত উষ্ণ পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয় ও গ্রীষ্মের প্রখর তাপ অসহ্য হইয়া ওঠে। তাপমাত্রা গড়ে প্রায় ৪৩° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ওঠে। জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বর্ষাকাল। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ১২৫০ মিলিমিটার হইতে ১৩৭৫ মিলিমিটার পর্যন্ত ওঠানামা করে।

জেলার পশ্চিমাংশের পাহাড়ী অঞ্চল আর্কিয়ান যুগের নিস্, গ্রানিট এবং ল্যাটেরাইট শিলায় গঠিত। স্থানে স্থানে গণ্ডোয়ানা স্তরের শেল ও বেলে পাথর এবং কোথাও কোথাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আকারে কেলাসিত চুনা পাথর দেখা যায়। দক্ষিণ সীমান্তে কোয়ার্টজাইট, বেলে পাথর, অভ্র, শ্লেট ইত্যাদির প্রাধান্য আছে। ডালমা পাহাড়ে আগ্নেয়শিলার ডাইকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। জেলার খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা, আকরিক লৌহ, মৃত্তিকাময় লৌহপ্রস্তর, স্বর্ণ (কোয়ার্টজ প্রস্তরের মধ্যে), তাম্র, কোরাণ্ডাম, খড়িমাটি, কেওলিন, কাইনাইট, ডলোমাইট, সোপস্টোন, অভ্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ধাদ্‌কা অঞ্চলে সীসার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিমে, দক্ষিণে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের পাহাড়ী অঞ্চলে বনভূমি আছে। প্রধান বৃক্ষাদির মধ্যে শাল, কুসুম, পলাশ, মহুয়া এবং বাঁশ উল্লেখযোগ্য। কুসুম ও পলাশের আধিক্য থাকায় প্রচুর পরিমাণে লাক্ষাকীট জন্মায়।

জেলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রাচীন কালে মুণ্ডা, ভূমিজ প্রভৃতি জাতিগুলি এইস্থানে বসবাস করিত বলিয়া নৃতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন। মুসলমানযুগে এই অঞ্চল ঝাড়খণ্ড নামে অভিহিত অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে পাঞ্চেতের জমিদারগণ তাঁহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ইংরেজদের করতলগত হয়। স্থানীয় অধিবাসীগণ প্রায়শঃই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের গঙ্গানারায়ণের হাঙ্গামা, কোল-অভ্যুত্থান ও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের বিস্তার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর এই জেলাটি তৎকালীন মানভূম জেলার সহিত বিহার রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী চাস ও চন্দনকেয়াড়ি ব্যতিরেকে মানভূম জেলার এই মহকুমাটি পুরুলিয়া নাম ধারণ করিয়া ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর পশ্চিম বঙ্গের সহিত একটি পৃথক জেলা হিসাবে যুক্ত হয়।

জেলার মোট জনসংখ্যা (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী) ১৩৬০০১৬; তন্মধ্যে পুরুষ ৬৮৯৩৫১ এবং নারী ৬৭০৬৬৫ জন। মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ২৪১৯৭৯। জেলার শতকরা ৭২ জন বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। পশ্চিম সীমান্তে হিন্দীর প্রচলনও আছে। মুণ্ডারি ও সাঁওতাল ভাষার ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। কোড়া, মুণ্ডা, খোড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিগণ এই জেলার পাহাড়ী অঞ্চলে ও পশ্চিম সীমান্তে বসবাস করেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কুর্মী, সাঁওতাল, ভূমিজ, বাউড়ী, আহির, কুমার, রাজওয়ার, ভুঁইয়া, লোহার ইত্যাদি প্রধান। মাহাতোরা এখানকার প্রধান প্রভাবশালী সম্প্রদায়। এখানে কুষ্ঠ রোগের প্রাধান্য দেখা যায়।

কৃষি জনগণের প্রধান উপজীবিকা। শতকরা ৪০ ভাগ জমিতে ব্যাপকভাবে চাষ-বাস হয়, দামোদর-উপত্যকায়ই বেশি। অন্য শুষ্ক অঞ্চলে অনাবৃষ্টি এবং মৃত্তিকার অনুর্বরতার জন্য উৎপাদন কম। দামোদর-উপত্যকাপরিকল্পনা, কংসাবতীপরিকল্পনা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্পের সাহায্যে ব্যাপকভাবে জমিতে জলসেচ করা হয়। প্রধান কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ধান, ডাল, তৈলবীজ, ভুট্টা, যব, ইক্ষু, সবজি উল্লেখযোগ্য।

জেলার শিল্পের মধ্যে লাক্ষাশিল্পই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের শতকরা ৬০ ভাগ লাক্ষা-উৎপাদন এই জেলাতেই, প্রধানতঃ ঝালদা এবং বলরামপুর অঞ্চলে হয়। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে রঘুনাথপুর, কেন্দা ও পুরুলিয়ার তসর ও রেশমবস্ত্রবয়ন, কার্পাসবস্ত্রবয়ন, ঝালদার কৃষির যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য লৌহনির্মিত দ্রব্যাদি, পুরুলিয়ার পিতল ও কাঁসার বাসন এবং দড়ি, ঝুড়ি ও মাদুর বিখ্যাত। জেলার রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে লাক্ষা এবং তসরই প্রধান।

সংযোগব্যবস্থা খুব উন্নত নহে। প্রধান সড়কগুলির মধ্যে রাঁচি-বাঁকুড়া রোড এবং বরাকর-টাটা রোড উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। নদীগুলি নৌবহনযোগ্য নহে। বর্ষাকালে ফেরি সার্ভিস চালু থাকে। জেলার ৫টি শহরের মধ্যে পুরুলিয়া, ঝালদা, রঘুনাথপুর ও আদ্রা উল্লেখযোগ্য। আদ্রা জেলার দ্বিতীয় শহর ও রেলওয়ে-কলোনি।

জেলার প্রধান শহর ও সদর কার্যালয় পুরুলিয়া (২৩° ২০´ উত্তর ও ৮৬° ২২´ পূর্ব)। পূর্বে মানভূম জেলার সদর দপ্তরটি এই শহরেই ছিল। শহরটি কাঁসাই নদীর প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) উত্তরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের আদ্রা শাখায় অবস্থিত। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শহরটি পৌরশাসনের অধিকারে আসে। রেলপথে সুষ্ঠু যোগাযোগ আছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে মোট জনসংখ্যা ৪৮১৩৪। শহরটি ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সংযোগ-স্থল হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়া শুষ্ক, স্বাস্থ্যপ্রদ। এখানে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সৈনিক স্কুল, রামকৃষ্ণ মিশন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, কারিগরি মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া মেয়েদের ১টি ও ছেলেদের ১টি কলেজ আছে। খনিজ পদার্থের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জিওলজিক্যাল সার্ভের একটি স্থায়ী কার্যালয় আছে। লাক্ষা-উৎপাদন, বস্ত্রবয়ন, তৈলকল, বেতের কাজ জনগণের প্রধান শিল্পোপজীবিকাগুলির অন্যতম। শহরের মধ্যে অবস্থিত কৃত্রিম হ্রদ 'সাহেব বাঁধ' চিত্তবিনোদন-কেন্দ্র। শহরটির মোট আয়তন প্রায় ১৪ বর্গ-কিলোমিটার।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XX, Oxford, 1908; H. Coupland, ed., *Bengal District Gazetteer : Manbhum*, Calcutta, 1911.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

পুরূরবা সুদর্শন ব্রহ্মবাদী বলশালী চন্দ্রবংশীয় নৃপতি। সোমসুত বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম। উর্বশীর সহিত তাঁহার মিলনকাহিনী প্রসিদ্ধ। পুরূরবার কাহিনী ঋগ্‌বেদ (১০।৯৫), শতপথ ব্রাহ্মণ (১১।৫।১), মহাভারত (পুনা-সংস্করণ ১।৭০।১৬-২২), রামায়ণ (উত্তরকাণ্ড ৫৬), হরিবংশ (২৬), বিষ্ণুপুরাণ (৪।৬), শ্রীমদ্ভাগবত (৯।১৪), মৎস্যপুরাণ (২৪), অগ্নিপুরাণ (২৭৪), কথাসরিৎসাগর (৩।৩।৪-৩০) প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ঋগ্‌বেদের সংবাদ সূক্ত অনুসারে চারি বৎসর একত্র অবস্থানের পর উর্বশী পুরূরবাকে পরিত্যাগ করিলে পুরূরবা তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য কাতর অনুরোধ করেন, কিন্তু উর্বশী তাহা নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে এই কাহিনীর বিস্তৃতি দেখা যায়। তবে উর্বশীর সহিত রাজার পুনর্মিলনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে গন্ধর্বলোকে উর্বশীর সহিত পুরূরবার বাস করার উল্লেখ আছে।

যূথিকা ঘোষ

পুলকেশী খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মৈসূরের বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাদামিকে কেন্দ্র করিয়া যে চালুক্যসাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম পুলকেশী (আনুমানিক ৫৩৫-৬৬ খ্রী)। বাদামি দুর্গে তাঁহার যে শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে উহার তারিখ ৪৬৫ শকাব্দ অর্থাৎ ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম পুলকেশীর পিতা রণরাগ এবং পিতামহ জয়সিংহ ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। বাদামির চালুক্যবংশ মূলতঃ বনবাসীর কদম্ব-রাজবংশের সামন্ত ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। প্রথম পুলকেশী অশ্বমেধ এবং অগ্নিষ্টোম, অগ্নিচয়ন, বাজপেয়, বহুসুবর্ণ, পৌণ্ডরীক প্রভৃতি অন্যান্য শ্রৌত যজ্ঞ ও হিরণ্যগর্ভ নামক মহাদান সম্পাদনপূর্বক চালুক্যবংশের স্বাধীনতা ও গৌরব ঘোষণা করেন।

সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রথম পুলকেশীকে যেসকল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, তাঁহার পুত্রগণ উহা পরিচালনা করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পূগবর্মা তাঁহার জীবৎকালেই পরলোকগমন করেন। তাই প্রথম পুলকেশীর মৃত্যুর পর কীর্তিবর্মা (৫৬৬-৯৮খ্রী) এবং মঙ্গলেশ (৫৯৮-৬১০ খ্রী) নামক তাঁহার অপর দুই পুত্র ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রথম পুলকেশী এবং কীর্তিবর্মা উভয়কেই বাতাপি অর্থাৎ বাদামি নগরীর প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। বোধ হয়, পিতার

রাজত্বকালে কীর্তিবর্মার প্রতি নগরীনির্মাণের ভার অর্পিত হইয়াছিল।

কীর্তিবর্মার পুত্র ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৪২খ্রী)। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তিনি চালুক্যসিংহাসন লাভ করিবেন; কিন্তু মঙ্গলেশ চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাহাতে তাঁহার নিজের পুত্র সিংহাসন অধিকার করিতে পারে। ফলে মঙ্গলেশ এবং দ্বিতীয় পুলকেশীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। পরিণামে মঙ্গলেশকে নিহত করিয়া দ্বিতীয় পুলকেশী চালুক্যসিংহাসন অধিকার করিলেন। কিন্তু তখন সাম্রাজ্যের অনেক অংশেই সামন্ত ও বশীভূত মিত্রগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এমন কি, সুযোগ বুঝিয়া আপ্পায়িক এবং গোবিন্দ নামক দুইজন শত্রু নরপতি চালুক্যরাজধানী আক্রমণের অভিপ্রায়ে ভীমা নদীর উত্তর তীরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই দুর্দিনে দ্বিতীয় পুলকেশীর কূটনীতি ও পরাক্রমে চালুক্যসাম্রাজ্য পুনর্গঠিত হইয়াছিল। প্রথমে তিনি আপ্পায়িক এবং গোবিন্দের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেন এবং গোবিন্দকে নিজের দলে টানিয়া আপ্পায়িককে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। ইহার পরেই তিনি নিকটবর্তী শত্রুরাজ্যগুলি আক্রমণ করেন। মৈসুর অঞ্চলের কদম্ব, গঙ্গ এবং আলুপেরা পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করে। শীঘ্রই দক্ষিণ কোঙ্কণের মৌর্যগণ পরাজিত হয় এবং তাহাদের রাজধানী পুরী দ্বিতীয় পুলকেশীর করতলগত হয়। অতঃপর চালুক্যরাজ উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া আধুনিক গুজরাত অঞ্চলে অবস্থিত লাট, মালব এবং গুর্জরগণকে দমন করিয়া সামন্তে পরিণত করেন। ইতিমধ্যে উত্তর ভারতের নরপতি হর্ষবর্ধন কাঠিয়াবাড়ের মৈত্রকবংশীয় দ্বিতীয় ধ্রুবসেন বালাদিত্যকে পরাজিত করিলে গুর্জরেশ্বর দ্বিতীয় দদ্দ প্রশান্তরাগ মৈত্রকরাজকে আশ্রয় দেন। হর্ষ ধ্রুবসেনের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহার সহিত মৈত্রীবদ্ধ হন এবং দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় পুলকেশীর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। হর্ষকে পরাজিত করার পর চালুক্যরাজ আপনাকে মহারাষ্ট্রত্রয়ের অর্থাৎ মহারাষ্ট্র, কর্ণাট ও লাটদেশের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর উত্তরাধিকারীরা বলিয়াছেন যে, হর্ষবর্ধনকে জয় করিয়া তিনি 'পরমেশ্বর' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হর্ষ ও পুলকেশীর যুদ্ধ সম্ভবতঃ ৬২৯-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। অতঃপর পুলকেশী দাক্ষিণাত্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কোশল এবং কলিঙ্গ দেশের অধিবাসীদিগকে পরাজিত করেন এবং সমুদ্রকূল ধরিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। পথে পিষ্টপুর এবং কল্লেরু দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি পল্লবরাজ্যে উপস্থিত হন। পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মা (আনুমানিক ৬০০-৩০ খ্রী) পরাজিত হইয়া রাজধানী কাঞ্চীপুরে অবরুদ্ধ হইলেন। কিছুকালের জন্য সমগ্র পল্লবরাজ্য পুলকেশীর পদানত হয়। তিনি দক্ষিণে কাবেরী নদী অতিক্রম করিয়া পল্লবরাজের সামন্ত বা মিত্র চোল, পাণ্ড্য এবং কেরলরাজগণকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। অবশেষে পল্লবসেনাকে পুনর্বার পরাজিত করিয়া পুলকেশী বাদামিতে প্রত্যাবর্তন করিল।

কিন্তু পুলকেশীর এই জয়গৌরব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মার পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মা (আনুমানিক ৬৩০-৬৮ খ্রী) ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া চালুক্যরাজধানী এবং চালুক্যসাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশ অধিকার করেন। এই অঞ্চলে ১৩ বর্ষকাল পল্লবঅধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবদিগকে পরাজিত করিয়া রাজ্য পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন।

দ্বিতীয় পুলকেশী প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এনৎসাঙ তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পারস্যরাজ খুসরু পরবীজের সভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিজাপুর জেলার ঐহোলিগ্রামে প্রাপ্ত ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ রবিকীর্তি নামক জৈন কবির রচিত প্রশস্তি হইতে তাঁহার রাজত্বকালীন ঘটনাবলী জানিতে পারা যায়।

দ্র J. F. Fleet, *Dynasties of the Kanarese Districts, Bombay Gazetteer*, vol. I, Part, II, Bombay, 1896; F. Keilhorn, '*Aihole Inscription of Pulakesin II, Saka-Samvat 556*', *Epigraphia Indica*, vol. VI, (1900-01), Calcutta; D. C. Sircar, '*The Chalukyas*', *The Classical Age*, (*The History and Culture of the Indian People*, vol. III), Bombay, 1954.

দীনেশচন্দ্র সরকার

পুলিনবিহারী দাস (১৮৭৭-১৯৪৯) বিপ্লববাদী ব্যায়ামগির। জন্ম ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ জানুয়ারি লোনসিং, ফরিদপুরে। পিতামহ গৌরচন্দ্র দাস ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। পিতা নবকুমার দাস বরিশালে ম্যাজিস্ট্রেটের হেড ক্লার্কের চাকরি লইয়াছিলেন। সেখানেই ছয় বৎসর বয়সে পুলিনবিহারী ব্রজমোহন

ইনষ্টিটিউশনে লেখাপড়া শুরু করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলা স্কুল হইতে এনট্রান্স পাশ করিয়া কুচবিহার কলেজে ভর্তি হন। পরে তিনি ঢাকা কলেজে পড়িতে আসেন। বি. এ. পড়িতে পড়িতে পুলিনবিহারী ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরীতে অ্যাসিস্টান্টরূপে প্রবেশ করেন ও পরে ডিমনষ্ট্রেটর হন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ তিনি কলিকাতার সরলা দেবীর আখড়ার অনুকরণে টিকাটুলীতে এক আখড়া স্থাপন করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় শ্রীরামপুরের বিখ্যাত ওস্তাদ মুর্তাজা সাহেবের লাঠি খেলা দেখেন এবং তাঁহার কাছে ছোট লাঠি ও তরবারি খেলা শিক্ষা করেন। এই সময়ে উয়াড়ীর বাসায় গোপনে একদল ছাত্র লইয়া লাঠি ও অসিচালনা শিক্ষা দিতে শুরু করেন।

পূর্ব বঙ্গে অনুশীলন সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পি. মিত্র ঢাকায় আসিলে পুলিনবিহারীর সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ হয়, এবং পুলিনবিহারী কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার নিকট বিপ্লবীর দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ঢাকায় অনুশীলন সমিতি সংগঠিত করেন।

ঢাকা অনুশীলন সমিতিতে তিনি এইসব শিক্ষা ছাড়াও কুচকাওয়াজ এবং কৃত্রিম যুদ্ধের প্রচলন করিয়াছিলেন, ফলে সমিতির বিপুল প্রসার হইয়াছিল।

পুলিনবিহারীকে বৃটিশ সরকার ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ নম্বর রেগুলেশনে আটক করিয়া মণ্টগোমারী জেলে প্রেরণ করেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পুলিনবিহারী অন্যান্য রাজবন্দীদের সহিত মুক্ত হওয়ার পরেই সরকার ঢাকায় এক ষড়যন্ত্র-মামলা গঠন করে এবং পুলিনবিহারীকেও পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া সেই মামলার আসামীশ্রেণীভুক্ত করে। ষড়যন্ত্র-মামলায় পুলিনবিহারীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। পরে আপিলে উহার মেয়াদ ৭ বৎসর হয়। তিনি আন্দামানে প্রেরিত হন এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মুক্ত হইয়া দেশে ফেরেন। অতঃপর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হইলে পুলিনবিহারী অহিংস আদর্শের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করার জন্য ভারতসেবক সংঘ গঠন করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর তিনিও ভারতসেবক সংঘ ভাঙ্গিয়া দেন এবং ব্যবহারিক রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি ও আখড়া স্থাপন করিয়া লাঠি, ছোরা প্রভৃতির খেলা শিক্ষা দিতে থাকেন। এইসব খেলার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধীয় পুস্তকও তিনি রচনা করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি আখড়ায়ও লাঠি, ছোরা, জিউজিৎসু প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ আগস্ট তিনি যথানিয়মে ব্যায়াম-সমিতিতে শিক্ষা দিতে যান, এবং অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগের আক্রমণে সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুলিশ আইন-আরোপক সংস্থাগুলিকে সাধারণভাবে পুলিশ বলা হয়। প্রাচীন ভারতে উহাদিগকে রক্ষী বলা হইত। পুলিশের ক্রমবিকাশের ইতিহাস দুই ভাগে বিভক্ত: ১. জনগণসৃষ্ট পুলিশ ২. শাসক-আরোপিত পুলিশ। প্রাচীন ভারতেও রাজন্যবর্গ তথা শাসক-আরোপিত নগরপুলিশ এবং জনগণসৃষ্ট স্থানীয় গ্রামীণ পুলিশ ছিল। মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষেও দুইপ্রকার পুলিশ দেখা গিয়াছে। জনগণদ্বারা সৃষ্ট পুলিশের চৌকিদার, দফাদার প্রভৃতি গ্রামীণ পর্যায়ে পড়ে। ভারতের অন্য প্রদেশে উহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি দেশের বহু কাউন্টিতে এবং নগরে ঐরূপ নিজস্ব স্থানীয় পুলিশ আছে। ঐসব দেশে বহু মিউনিসিপ্যালিটির অধীন নিজস্ব পুলিশ বর্তমান। পূর্বে কলিকাতা পুলিশও কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের অধীন ছিল; বহু পরে উহাকে পুরাপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

শাসককুলদ্বারা উপর হইতে আরোপিত পুলিশকে শাসক-আরোপিত পুলিশ বলা হইয়া থাকে। সমগ্র রাষ্ট্রের বা কোনও একটি বিশেষ প্রদেশের জন্য উহা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সংঘবদ্ধ একটিমাত্র বাহিনী। পূর্বতন ব্রিটিশ, ওলন্দাজ ও ফরাসী উপনিবেশে ও অন্যান্য বিজিত দেশে ঐরূপ উপর হইতে শাসকগণদ্বারা আরোপিত কেন্দ্রীয় শক্তির অধীন পুলিশের প্রাধান্য দেখা যায়। মুসলিম ভারতে শাসককুল-আরোপিত নগরপুলিশ-গুলি রাজধানীতে সুবাদার এবং অন্য শহরে ফৌজদারদের অধীন কোতোয়ালীসমূহের কোতোয়ালগণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। সুবা বাংলাতে একমাত্র পাটনা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও হুগলিতে ঐরূপ পুলিশ ছিল। মুসলিম শাসকগণ জনগণসৃষ্ট স্থানীয় গ্রামীণ জমিদারি পুলিশগুলিতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। জমিদার শাসকদের স্থানীয় পুলিশ ত্রিস্তরীয় ছিল: যথা ১. গ্রামীণ পুলিশ ২. থানাদারি পুলিশ ৩. জমিদারি পুলিশ।

গ্রামীণ পুলিশ: প্রতিটি গ্রামের বিভিন্ন অংশ বা পল্লীর চৌকিগুলির জন্য একজন করিয়া চৌকিদার ছিল।

উহাদের কার্যের খবরদারি করিতে গ্রামসমষ্টির জন্য একজন দফাদার থাকিত। উহারা দফায় দফায় পদব্রজে বা অশ্বারোহণে গ্রামগুলি পরিদর্শন করিত। গ্রামসমষ্টিগুলির মধ্যবর্তী প্রান্তরে বহির্পথসমূহের সংযোগস্থলের ঘাঁটিগুলি ঘাঁটিয়ালগণ তাহাদের দলবলসহ পাহারা দিত। গ্রামসমূহের প্রবেশমুখে দস্যুদলকে তাহারা আটকাইত। ইহারা পঞ্চায়েতের অধীন ছিল। জমিদার শাসকগণের দ্বারা গ্রামীণ পঞ্চায়েতের অভিযোগে ও সুপারিশে গ্রামীণ পুলিশ যথাক্রমে বরখাস্ত ও নিযুক্ত হইত।

থানাদারি পুলিশ: স্থানীয় গ্রামীণ পুলিশকে সাহায্যের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থানের থানাতে থানাদার ও তাহাদের লোকজন মোতায়েন থাকিত। ঐ সময়ে থানাগুলির এলাকা ছোট ছিল। উহা বড় হইলে উহাদের অধীন কয়েকটি ফাঁড়িতে ফাঁড়িদার ও উহাদের লোকজনদের রাখা হইত। থানাদারি পুলিশ স্থানীয় গ্রামীণ পুলিশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রয়োজন মত উহাদের সাহায্য করিত মাত্র। এই সময়ে পরিবহণ ও পথঘাট অনুন্নত থাকাতে বেতন পাঠানো সম্ভব হইত না; এইজন্য জমিদারপ্রদত্ত জমি-জমার উপস্বত্ব হইতে উহাদের ভরণপোষণ ও ব্যয়নির্বাহ হইত। ঐসকল পুলিশী সংস্থা স্বয়ংনির্ভর ও স্বাধীন ছিল। ঐ পদগুলিও স্থানবিশেষে পুরুষানুক্রমিক হইত। উল্লিখিত পদগুলি ব্যতীত থানাদারদের ঊর্ধ্বতন কর্মীরূপে দারোগা নামে আরও একজন উচ্চপদস্থ কর্মী ছিল। জমিদারদের দেওয়ানগণ-নিয়ন্ত্রিত দারোগাদের সহিত বর্তমানকালীন ম্যাজিস্ট্রেটদের তুলনা করা যায়।

জমিদারি পুলিশ: গ্রামীণ ও থানাদারি পুলিশকে গুরুতর বিপাককালে সাহায্য করার জন্য জমিদার-শাসকগণ নিজ নিজ রাজধানীতে বেতনভোগী সাহায্যকারী পুলিশবাহিনী মোতায়েন রাখিতেন। উহার সশস্ত্র বিভাগকে বরকন্দাজ এবং সাধারণ পুলিশকে পাইক বলা হইত। উভয় বাহিনীর পাইকরা যথাক্রমে নায়ক, দারোগা এবং দেওয়ানদের অধীন ছিল। আহ্বান আসামাত্র দ্রুতগামী ছিপ-নৌকা, অশ্ব বা গজ এবং রণ-পার সাহায্যে তাহাদিগকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হইত। অবশ্য ঐ কার্যে থানাদারি পুলিশ বিফল হইলে জমিদার-নিবাস হইতে ঐরূপ ব্যবস্থা লওয়া হইত।

কলিকাতা শহরের পত্তনের পর উহা জেলার অনুকরণে ব্রিটিশ কোম্পানির পক্ষে জমিদার-পদবীধারী এক ইংরেজ শাসকের অধীন হয়। ইংরেজ বণিকগণের স্বার্থে তাঁহাদের বাঙ্গালী দেওয়ান ও কর্মীদের দ্বারা জমিদারি পুলিশের মত কলিকাতা পুলিশ তৈয়ারি হয়। উহাতে থানাদারি পুলিশ, বাউণ্ডারি পুলিশ, জল বা পোর্ট পুলিশ এবং অগ্নি-নির্বাপক বিভাগ ছিল। পরে উহাতে গোয়েন্দা বিভাগ ও অশ্বারোহী বিভাগ যুক্ত হয়। উহাদের প্রধান কর্তারা প্রথমে কিছু কিছু বিচারকার্যও করিতেন। উহারা বহু বৎসর পরে ইংল্যাণ্ডে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে স্যার রবার্ট পিল সর্বপ্রথম পুলিশবাহিনী সৃষ্টি করেন। এইজন্য লণ্ডন পুলিশের মধ্যে তৎকালীন কলিকাতা পুলিশের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। পরে কলিকাতার অনুকরণে মাদ্রাজ, রেঙ্গুন ও বোম্বাই শহরে মেট্রোপলিটান পুলিশের সৃষ্টি হয়। শুরু হইতে কলিকাতা পুলিশ প্রদেশ পুলিশ হইতে পৃথকভাবে গড়িয়া ওঠে।

কোম্পানির রাজত্বকালে কলিকাতা পুলিশ ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিলেও গ্রামীণ জমিদারি পুলিশ-ব্যবস্থায় তাঁহারা বহুকাল হস্তক্ষেপ করেন নাই। পরে জমিদারি পুলিশ তথা জাতীয় পুলিশকে আইনপ্রণয়ন দ্বারা ভাঙ্গিয়া দিয়া উহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রদেশ পুলিশকে কেন্দ্রাধীন করিয়া সমগ্র প্রদেশের জন্য একটি মাত্র বেতনভোগী বাহিনী সৃষ্টি করিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ থানার এলাকার পরিধি বহুগুণে বর্ধিত করিয়া ঐগুলিকে দূর দূর স্থানে স্থাপন করেন ও ঐগুলিকে দারোগাপদের এক এক ব্যক্তির অধীন করেন। পরে পূর্বতন থানাদার ও পূর্বতন দারোগার বদলে যথাক্রমে সাব-ইনস্পেক্টর ও ইনস্পেক্টরপদের সৃষ্টি করা হয়। প্রথমে রাষ্ট্রায়ত্ত জেলাভিত্তিক সরকারি পুলিশ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীন ছিল। একজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ ঐ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। পরে সমগ্র প্রদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত পুলিশকে একজন ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের অধীন করা হয়। তাঁহার সাহায্যের জন্য পরে বিভাগে বিভাগে ডেপুটি ইনস্পেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত হন। পরে ভারতীয় ও ইংরেজ সদস্য-সংবলিত বিভিন্ন পুলিশ কমিশনসমূহের পরামর্শে উহাতে বহু পদ এবং বিভাগ ও বেতন-ক্রম যুক্ত হয়।

সিপাহীবিদ্রোহের পর অপসারিত ও বরখাস্ত সিপাহীদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলা পুলিশে তাহাদিগকে ভর্তি করা হয়; সেজন্য কনস্টেবল ও হেড কনস্টেবল বুঝাইতে ফৌজী নাম সিপাহী ও জমাদার নাম ব্যবহারের রীতি ছিল। ঐ সময়ে নিম্ন পদে হিন্দীভাষী সিপাহী ও উচ্চ পদে ইংরেজ কর্মীর প্রাধান্য ছিল। পরে সমাজের ঘৃণা সহিয়াও বহু বাঙ্গালীও উহার উচ্চ পদে ভর্তি হয়।

অপরাধ-নিবোধ ও নির্ণয় ব্যতিরেকে পুলিশকে অগ্নি-নির্বাণ, দাঙ্গাহাঙ্গামা-দমন, পশুধৃতি ও হিংস্রপশু-নিধন, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা, নিখোঁজ বালকদের খোঁজা, রোগীদের হাসপাতালে প্রেরণ, যানবাহন-নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল-নিবারণ, মুনাফা-নিরোধ প্রভৃতি সামাজিক কার্যও করিতে হয়। গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের সুনাম ও স্থায়িত্ব পুলিশের আনুগত্য, সততা, নিয়ম-তান্ত্রিকতা ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে।

পুলিশ কর্মচারী জনগণ অপেক্ষা কোনও বিশেষ সুবিধাভোগী বা ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি নন। জনতার করণীয় কার্য করার জন্য তাহাদিগকে উর্দীতে ভূষিত করা হইয়াছে মাত্র। সর্বক্ষণব্যাপী ঐ কার্য করার জন্য তাহাদিগকে বেতন ও বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। জনগণও পুলিশের মত আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করিতে ও অপরাধীদের ধরিয়া সোপর্দকরণ করিতে সমর্থ। একমাত্র পুলিশগ্রাহ্য অপরাধে (কগ্‌নিজেব্‌ল অফেন্স) গৃহতল্লাসী ও অন্য কয়েকটি বিষয় ব্যতিরেকে পুলিশের সকল ক্ষমতাই জনগণের আছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে কিংবা আদালতের করণীয় কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিলে জনগণের মত পুলিশকেও শাস্তি পাইতে হয়। জনগণের প্রত্যেকের করণীয় কার্য পুলিশ তাহাদের পক্ষে সমাধা করে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জনগণের প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিই এক একজন পুলিশকর্মী। প্রতিদিনই পুলিশের কার্য জটিলতর হইতেছে। বহু কারণে উহাদের জন-প্রিয়তা বজায় রাখা দুষ্কর হয়। এক্ষণে কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত এবং বিকেন্দ্রিক পুলিশের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি সচেষ্ট। কারণ উভয়েরই বহু সুবিধা ও সেই সাথে অসুবিধাও আছে। কারণ এক এলাকার অপরাধীরা অন্য এলাকাতেও অপরাধ করিয়া থাকে। দ্রুতগতি যানবাহন উহার কারণ। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতেও পুলিশী সংগঠন সম্বন্ধেও নূতন করিয়া চিন্তা করার প্রয়োজন হইতেছে।

পঞ্চানন ঘোষাল

পুলীকট (১৩° ২৫′ উত্তর ও ৮০° ২২′ পূর্ব) ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ শহর হইতে ৩৭ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি উপহ্রদ। ইহার দৈর্ঘ্য ৫৯ কিলোমিটার ও বিস্তার ৫-১৭ কিলোমিটার। হ্রদটি একটি সংকীর্ণ দ্বীপদ্বারা সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন। সংকীর্ণ দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে পুলীকট নামে একটি শহরও আছে। হ্রদের লবণাক্ত জলে জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়।

চিত্রা সেন

পুশকিন, সারগেভিচ আলেকজাণ্ডার (১৭৯৯-১৮৩৭ খ্রী) রুশ কবি ও রাশিয়ার জাতীয় সাহিত্যের পথিকৃৎ। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মে মস্কভা শহরের একটি প্রাচীন অভিজাত বংশে পুশকিনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন সৈনিক বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত সাহিত্যানুরাগী অফিসার। তাঁহার শিক্ষার ভার পড়িয়াছিল কয়েকজন ফরাসী শিক্ষকের উপর। শৈশবে তাঁহার ধাত্রীমাতাই রুশ রূপকথার ভাণ্ডারের দ্বার তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া দেন এবং তাঁহার অপরূপ রূপকমূলক কাব্য-সাহিত্যের প্রেরণা যোগান।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট পিটার্সবার্গে এক অভিজাত বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা শুরু হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন এবং রাজকর্মচারী হিসাবে সেণ্ট পিটার্সবার্গেই বাস করিতে থাকেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে রুশীয় রূপকথার বিষয়বস্তু লইয়া 'রুশলান অ্যাণ্ড লুড্‌মিলা' (Ruslan and L'udmila) -শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। পুশকিনের এই কাব্য-কথিকাটি সমগ্র রুশ দেশে অত্যন্ত প্রিয় হইয়া ওঠে। সেই বৎসরেই (১৮২০ খ্রী) তিনি সংস্কারব্রতী একদল যুবকের সহিত যোগ দেন। আর এই জনকল্যাণ সংঘের প্রেরণায় তিনি বহু পুস্তিকা ও কবিতা রচনা করেন। তাঁহার 'স্বাধীনতার প্রতি' কবিতাটিতে রুশ সরকার সন্ত্রাসবাদের গন্ধ পান এবং তাঁহাকে বেসঅ্যারেবিয়ায় সরকারি কাজে পাঠানো হয়। দক্ষিণের পথে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে কয়েক মাসের জন্য ককেসাস অঞ্চলে এক বন্ধুর গৃহে আশ্রয় লন। এই সময়ে তিনি ইংরেজ কবি বায়রনের আদর্শে ছোট ছোট গীতিকবিতা ও গল্প রচনা করেন। তিনি 'ককেসাসের বন্দী' -শীর্ষক একটি নারীভক্তিমূলক কাব্য এখানে রচনা করেন।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার ধাত্রীমাতার নিকট থাকিয়া রুশ রূপকথা লইয়া ৬টি কাব্যকথিকা রচনা করেন। এই সময়ে তিনি মহাকবি সেক্সপীয়রের একজন অনুরক্ত ভক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ইভ্‌জেনি অনেজিন' (Evgeni Onegin, ১৮২৩-৩১ খ্রী) রচিত হয়। ইহা বায়রনের আদর্শে রচিত একটি ছন্দোবদ্ধ উপন্যাস, তদানীন্তন রুশজীবন ইহার বিষয়বস্তু। সেক্সপীয়রীয় প্রভাবে তিনি ঐতিহাসিক নাটক 'বোরিস গড্‌উনোভ' (১৮২৬ খ্রী) রচনা করেন। নাটক হিসাবেই ইহা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত গল্প 'পিকোভায়া দামা' (ইস্কাপনের

বিবি) রচিত হয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'কাপিতান্স্কায়া দোচ্‌কা' (এক ক্যাপ্টেনের কন্যা) নামক উপন্যাস রচনা করেন। পরবর্তী রুশ ঔপন্যাসিকদের উপর ইহা প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

পুশকিন এক দিকে ছিলেন ফরাসী সাহিত্যিকগণ ও বিশেষভাবে বায়রন, শেক্সপীয়র প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত ইওরোপীয় সাহিত্যিক, অন্য দিকে খাঁটি রুশ সাহিত্যিক। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী রুশীয় কবিকুলের উপর তিনি বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার দাম্পত্য জীবন সুখের হয় নাই। তাঁহার স্ত্রীর রূপের স্তাবকগণের মধ্যে একজনের সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি আহত হন এবং দুই দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কমলকৃষ্ণ ঘোষ

পুষ্কর রাজস্থানের একটি শহর ও হ্রদ। শহরটি আজমীর জেলার মালভূমির উপর ২৬° ২৯´ উত্তর ও ৭৪° ৩৩´ পূর্বে অবস্থিত। ইহার নিকটেই পুষ্কর হ্রদ। আরাবল্লী গিরিশ্রেণী পুষ্কর হ্রদকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সরস্বতী নদীর ৫টি শাখা হ্রদের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

পুষ্কর হিন্দুদিগের প্রাচীন পিতৃতীর্থ। বামন ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুযায়ী জমদগ্নিনন্দন রাম ঐ তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, ব্রহ্মা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইখানে ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বদ্রিনারায়ণ, বরাহ এবং শিব, এই ৫টি মন্দির আছে। আশ্বিন-কার্তিকে পুষ্করে একটি বড় মেলা বসে ও বহু তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে পুষ্করের জনসংখ্যা ছিল ৬৭০৩। আজমীর রেলস্টেশন হইতে পুষ্করের দূরত্ব ১১ কিলোমিটার (৭ মাইল) এবং পুষ্কর পর্যন্ত মোটর যাইবার উপযোগী বাঁধানো সড়ক আছে।

শ্রীলা সেন

পুষ্যভূতিবংশ বাণভট্টপ্রণীত 'হর্ষচরিত' অনুসারে শ্রীকণ্ঠ দেশান্তর্গত স্থাণ্বীশ্বরে (থানেশ্বর) শৈব পুষ্পভূতি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শাসনলিপি হইতে জানা যায় যে, এই বংশের রাজা নরবর্ধন ও তাঁহার পরবর্তী দুইজন রাজা রাজ্যবর্ধন ও আদিত্যবর্ধন 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করিতেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তাঁহারা খুব পরাক্রান্ত বা স্বাধীন রাজা ছিলেন না। আদিত্যবর্ধন মহাসেনগুপ্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ পরবর্তী গুপ্তরাজবংশীয় মহাসেনগুপ্তের ভগ্নী ছিলেন। আদিত্যবর্ধনের পুত্র মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক প্রভাকরবর্ধনের সময়ে এই রাজ্য বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া ওঠে। তিনি হূণ, সিন্ধু, গুর্জর, গান্ধার, লাট ও মালব দেশ জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু এই দেশগুলিকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই। উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাবের অন্তর্গত হূণরাজ্য, উত্তরে হিমালয়, পূর্বে মৌখরিশাসিত কনৌজ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণে পাঞ্জাব ও রাজপুতানার মরুভূমি পর্যন্ত প্রভাকর-বর্ধনের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

রানী যশোমতীর গর্ভে তাঁহার রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন নামে দুইটি পুত্র এবং রাজ্যশ্রী নামে একটি কন্যা জন্মে। মৌখরিরাজ গ্রহবর্মণের সঙ্গে তিনি স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। রাজ্যবর্ধন উত্তরাপথে হূণদিগের বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যস্ত থাকাকালীন প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হয় (আনুমানিক ৬০৫ খ্রী)। রানী যশোমতী স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হন।

রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত কাল পরে দূতমুখে সংবাদ পাইলেন যে, মালবরাজের হস্তে গ্রহবর্মণ নিহত এবং রাজ্যশ্রী কারারুদ্ধ হইয়াছেন। রাজ্যবর্ধন তৎক্ষণাৎ শত্রুদমনে যাত্রা করেন। তিনি অতি সহজে মালবরাজকে পরাজিত করেন, কিন্তু মালব-রাজের মিত্র গৌড়াধিপ শশাঙ্কের হস্তে নিহত হন ('শশাঙ্ক' দ্র)।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন সিংহাসনারোহণপূর্বক (৬০৬ খ্রী) রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন। দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা এবং উত্তরাপথে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন ('হর্ষবর্ধন' দ্র)।

৬৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হইলে পুষ্যভূতি-বংশ ও সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।

দ্র. Vincent A. Smith, *Early History of India*, Oxford, 1924 ; Radhakumud Mukhopadhyay, *Harsa* (Rulers of India series), Oxford, 1929 ; Radhagobinda Basak, *History of North Eastern India*, Calcutta, 1934 ; R. S. Tripathi, *History of Kanauj to the Muslim Conquest*, Varanasi, 1959.

অধীর চক্রবর্তী

পূজা ফুল, বেলপাতা, তুলসী, চন্দন প্রভৃতির দ্বারা দেবতার আরাধনা। সাধারণতঃ প্রতিমায় বা ঘটে পাঁচ, দশ বা ষোলটি বস্তু বা উপচারের দ্বারা দেবতার পূজা করা হয়। অন্য বস্তুর অভাবে অগত্যা কেবল জলের দ্বারা নিত্য-কর্তব্য পূজা সম্পন্ন হইতে পারে। এক এক দেবতার পূজায় এক একটি বস্তু প্রশস্ত এবং এক একটি বস্তু নিষিদ্ধ: যেমন বিষ্ণুপূজায় শাদা ফুল, শাদা চন্দন ও তুলসীপাতা; শিবপূজায় ধুতুরা, আকন্দ, করবী ফুল ও বেলপাতা এবং শক্তিপূজায় লাল চন্দন ও লাল ফুল প্রশস্ত। বিষ্ণুপূজায় লাল ফুল, লাল চন্দন ও বেলপাতা এবং শিবপূজায় তুলসীপাতা নিষিদ্ধ। প্রতিমা মাটি, পাথর বা ধাতুর (সোনা, রূপা বা অষ্টধাতু) দ্বারা প্রস্তুত হয়। মাটির প্রতিমার ব্যবহারই বেশি। যে প্রতিমা অঙ্গহীন বা বিকৃতাঙ্গ, কাঠ-খড় দিয়া যে মাটির প্রতিমার কাঠামো তৈয়ারি হয় নাই, যে প্রতিমা ছাঁচে তৈয়ারি, যে প্রতিমার মাটি পোড়ান হইয়াছে এমন প্রতিমা পূজা করিতে নাই। তবে এসব নিয়ম বা প্রতিমা-নির্মাণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লিখিত নানা নির্দেশ এখন আর তেমন মানিয়া চলা হয় না। পূজার পূর্বে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক প্রতিমায় দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও চক্ষুদান করিয়া লইতে হয়। যে কয়দিন পূজা করিবার সংকল্প গ্রহণ করা হয়, তাহার পরে পূজিত দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রতিমা নাড়িয়া বিসর্জন দেওয়া হয়। অনেকে লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা প্রভৃতি দেবতার প্রতিমা জলে বিসর্জন দেন না। প্রতিমা ছাড়া শুধু ঘটের উপরেও দেবতার পূজা হইতে পারে। অবশ্য প্রতিমা থাকিলেও ঘটের প্রয়োজন হয়। শালগ্রামশিলা বা শিবলিঙ্গ পূজার সময়ে ঘটের প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ শালগ্রামের উপর ঘট ছাড়াই সমস্ত দেবতার পূজা হইতে পারে। শিবলিঙ্গের উপর শক্তিপূজা করা চলে। মাটি বা ধাতুর (সাধারণতঃ তামা বা পিতলের) জলপূর্ণ ঘট বা কলসীর উপর আমের পল্লব ও কোনও ফল দিয়া বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্রপাঠ-সহকারে ঘট-স্থাপন করিতে হয় এবং সেই স্থাপিত ঘটের উপর দেবতার পূজা করিতে হয়।

একক কোনও দেবতার পূজা করা হয় না। প্রধানভাবে যে দেবতারই পূজা করা হউক না কেন সেই দেবতার পূজার পূর্বে ও পরে অন্যান্য অনেক দেবতার পূজা করিতে হয়। এই পূজা সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেবতার পূজার প্রথমে বিঘ্ননাশ ও সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে গণেশের পূজা করা হয় ও অনেক ক্ষেত্রে সূর্যকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়। প্রারম্ভে পূজিত অন্যান্য দেবতারা হইতেছেন শিবাদি পঞ্চদেবতা (সূর্য, বহ্নি, শিব, দুর্গা ও বিষ্ণু), আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশ অবতার। পুরুষ দেবতার সহিত স্ত্রীরূপে কল্পিত প্রাসঙ্গিক স্ত্রী-দেবতার সহিত পতিরূপে কল্পিত প্রাসঙ্গিক পুরুষ-দেবতার (শিবের সহিত শক্তির এবং শক্তির সহিত শিবের, বিষ্ণুর সহিত লক্ষ্মীর ও লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর) পূজা অবশ্য কর্তব্য। পূজার অন্যান্য আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অধিবাস, স্বস্তিবাচন, সংকল্প, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, বলি, আরতি, দক্ষিণা উল্লেখযোগ্য। স্বস্তিবাচন হইল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বস্তি বা মঙ্গলকামনা। নিত্যপূজা ছাড়া অন্য পূজার পূর্বে সংকল্পে পূজার দিন-ক্ষণ ও উদ্দেশ্য (ধন, ঐশ্বর্য বা শুধু পূজিত দেবতার প্রীতিকামনা) উল্লেখ করা হয়। মন্ত্রের দ্বারা আসন ও পুষ্প শোধন করিয়া লওয়া হয়। বলি শক্তিপূজার অপরিহার্য অঙ্গ। পূর্বে ছাগ, মেষ বা মহিষ-বলি শক্তিপূজার মস্ত বড় আকর্ষণ ছিল। বর্তমানে পশুবলির পরিবর্তে অনেকে কুষ্মাণ্ডাদি ফল বলি হিসাবে প্রদান করেন ও পশুর মত খড়্গের দ্বারা উহা ছেদন করেন। রক্তচন্দন মাখানো রক্ত-পুষ্পও দেবতাকে বলিরূপে নিবেদন করা হয়।

যে পূজার কথা বলা হইল তাহা নিম্নস্তরের অধিকারীর জন্য বিহিত বাহ্য পূজা। উচ্চস্তরের অধিকারীরা অন্তর্যাগ বা আন্তর পূজার অনুষ্ঠান করেন। এই পূজায় বাহিরের কোনও উপকরণের প্রয়োজন হয় না। ইহাতে মনঃকল্পিত উপকরণ দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। ইহা মানসপূজা নামেও পরিচিত। তান্ত্রিক পূজায় বাহ্য পূজার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর পূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যাস, ভূতশুদ্ধি, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানে দেবতা, পূজোপকরণ ও পূজকের ঐক্য-ভাবনার নির্দেশ আছে। প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্বে আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠায় পূজক নিজদেহে দেবতার আবির্ভাব কল্পনা করিয়া নিজেকে দেবময় বলিয়া ধারণা করেন। নিজেকে দেবস্বরূপ বিবেচনা করিয়া পূজক দেবপূজায় প্রবৃত্ত হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের বিধান। আন্তর পূজাই সর্বোত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়; যে পর্যন্ত জ্ঞানলাভ না হয় সেই পর্যন্তই বাহ্য পূজার বিধান। অধিকারীভেদে বহিঃপূজাও তিনপ্রকার: তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। তামসিক পূজায় আড়ম্বর ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রাধান্য থাকে; রাজসিক পূজাও আড়ম্বরবহুল, তবে তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় না; সাত্ত্বিক পূজা ধীর-শান্তভাবে অনুষ্ঠিত হয়। 'অধিবাস', আরতি', 'উপচার' ও 'দক্ষিণা' দ্র।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পূর্ণচন্দ্র দাস (১৮৯০-১৯৫৬ খ্রী) প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা। জন্ম ফরিদপুর জেলার সমাজ-ইবিশপুর গ্রামে। তিনি ফরিদপুরে নিজস্ব এক বিপ্লবী দল গঠন করেন এবং ১৯১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঘা যতীন'-এর নেতৃত্বে কাজ করেন। বালেশ্বরের সশস্ত্র ট্রেঞ্চ-যুদ্ধে যে চারজন যুবক যতীন্দ্রনাথের পার্শ্বচর ছিলেন, তাঁহারা ছিলেন পূর্ণ দাসের দলের কর্মী। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ দাস রাজবন্দীরূপে জেলে আটক হন। মুক্তির পরে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে পূর্ণ দাস আবার তিন বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৯২৪-২৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় রাজবন্দী ছিলেন। কলিকাতা কংগ্রেসে (১৯২৮ খ্রী) তিনি স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের লেফ্‌টেন্যাণ্ট হন; আবার ১৯৩০-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯৪২-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজবন্দী থাকেন। ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর তিনি কিছুকাল শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বালিগঞ্জে এক উদ্বাস্তু যুবকের ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হন। বালিগঞ্জে ত্রিকোণ-পার্কে তাঁহার মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বঘাট পর্বতমালা ভারতের দাক্ষিণাত্যের একটি পর্বতমালা। ইহা ওড়িশার উত্তরভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ধ্রপ্রদেশের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূল ধরিয়া বিক্ষিপ্তভাবে তামিলনাড়ুর পশ্চিমাংশে নীলগিরি পর্বতমালায় যাইয়া মিলিত হইয়াছে। এই পর্বতমালা কোনও বিশেষ একটি যুগের প্রস্তরে গঠিত নয়; ইহার আকারগত কোনও বৈশিষ্ট্যও নাই। সেইজন্য এই অঞ্চলকে কোনও একটি বিশেষ পর্বতমালা বলা ঠিক নয়। বহু প্রাচীন যুগের পর্বতমালার কিছু কিছু অবশিষ্টাংশ ইহাতে উচ্চ মালভূমির আকারে রহিয়াছে; এই অবশিষ্টাংশগুলি আরাবল্লী পর্বতমালার সমসাময়িক। পূর্বঘাট পর্বতমালার গড় উচ্চতা ৭৬০ মিটার, কোনও কোনও অঞ্চল ১৫২০ মিটারেরও বেশি উচ্চ। কালাহাণ্ডির বাঙ্কসামো (প্রায় ১২৭৫ মিটার) কোরাপুটের নিমাইগিরি (১৫১৫ মিটার) উল্লেখযোগ্য। ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তরাংশে এই পর্বতমালা খোণ্ডালাইট এবং চার্ণকাইট প্রস্তরে গঠিত। দক্ষিণে পূর্বঘাটের নাল্লামালাই ও পালকোণ্ডা পর্বতাঞ্চল কাড্ডাপ্পা ও কুর্নূল পাললিক শিলায় গঠিত। পূর্বঘাটের প্রস্তরে চার্ণকাইটের প্রাধান্য বেশি।

সমগ্র পূর্বঘাট পর্বতমালার জলবায়ু একপ্রকার নহে। উত্তরাংশে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২৫০ মিলিমিটার হইতে ৪০০০ মিলিমিটার পর্যন্ত হইয়া থাকে। দক্ষিণে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৭৫০ মিলিমিটার হইতে ১০০০ মিলিমিটারের মধ্যে থাকে।

এখানে বহু আদিবাসী বাস করে। ইহাদের মধ্যে নাল্লামালাই পর্বতের চেঞ্চুদের নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্র O. H. K. Spate, *India and Pakistan*, London, 1962.

প্রদীপকুমার দাশগুপ্ত

পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান দ্র

পূর্বমীমাংসা, মীমাংসা দর্শন ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারায় বেদের প্রভাব সামান্য নয়। হিন্দু ষড়্‌-দর্শনের মধ্যে অন্ততঃ দুইটি দর্শনপ্রস্থানকে অর্থাৎ মীমাংসা ও বেদান্তকে বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার বলা চলে। বিষয়ের দিক হইতে বেদে প্রথমে কর্ম (রিচুয়াল) ও শেষে জ্ঞান আছে (স্পেকুলেশন)—এই দুইটি ভাগ বা কাণ্ড আছে। মীমাংসা দর্শন বলিতে সাধারণতঃ পূর্ব মীমাংসা দর্শনকেই বুঝায়। মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসা দর্শনের সূত্র-প্রণেতা; কিন্তু তিনি এই দর্শনের উদ্ভাবক নহেন। দীর্ঘকাল হইতে ভারতের সনাতন সমাজে যে যাগযজ্ঞাদি বৈদিক অনুষ্ঠানের ধারা চলিয়া আসিতেছে, মীমাংসা দর্শন তাহারই বিধি-নিষেধ প্রভৃতির ব্যবস্থাপক শাস্ত্র। মীমাংসা দর্শন বেদের কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্মকাণ্ডের বিচার ও মীমাংসাই পূর্বমীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। ইহা বেদের প্রথম ভাগ লইয়া বিচার করিয়া থাকে, এজন্য কর্মমীমাংসার অপর নামই পূর্বমীমাংসা। আর বেদান্তদর্শন বেদের জ্ঞানকাণ্ড লইয়া বিচার করিয়া থাকে, এজন্য এই দর্শনের অপর সংজ্ঞা উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মমীমাংসা।

প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিবার প্রথা ছিল। সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্য বেদবিহিত যজ্ঞাদির বিচারের প্রয়োজনও ছিল। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই মীমাংসা দর্শনের উদ্ভব। পূর্ব মীমাংসা উত্তর মীমাংসার মতই শ্রুতি বা বেদের উপর নির্ভরশীল। মীমাংসা দর্শনের মতে বেদ পুরুষসৃষ্ট নয়, এমন কি ঈশ্বর-প্রণীতও নয়। বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য এবং সেইজন্য পুরুষসুলভ ভ্রমপ্রমাদাদি-শূন্য। বেদ অবাধিত শাব্দবোধ সৃষ্টি করে। সেইহেতু

পূর্বমীমাংসা

বেদই প্রমাণ। এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার জন্য মীমাংসা দর্শনে শব্দের লক্ষণ ও প্রকারভেদ প্রভৃতি প্রশ্ন লইয়া অনেক আলোচনা আছে।

বেদান্ত দর্শনে যেমন ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই প্রধান কথা, মীমাংসা দর্শনে তেমনই ধর্মজিজ্ঞাসাই আলোচনার মধ্যমণি। মীমাংসামতে বেদবিহিত কর্মই হইল ধর্ম। বেদে যে কর্ম বিহিত হইয়াছে তাহাই কর্তব্য কর্ম আর বেদে যে কর্ম নিষিদ্ধ তাহাই অকর্তব্য কর্ম। মীমাংসা দর্শনের মতে কর্তব্য কর্ম কর্তব্য বলিয়াই করিতে হইবে। ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্তব্য কর্ম করিলেও কর্মের নিজস্ব নিয়ম অনুসারে কর্তব্য কর্ম শুভফল উৎপন্ন করে। তবুও সেই শুভফলের, এমন কি স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্য করাই ধর্মতত্ত্বের সারাৎসার।

মীমাংসা দর্শনে বেদার্থবিচার ছাড়াও যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ প্রমা ও প্রামাণ্য বিচার করা হইয়াছে। প্রমাজ্ঞান দুই প্রকারের : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া আরও পাঁচ প্রকারের প্রমাণ মীমাংসা দর্শনে স্বীকৃত ; যথা অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি ('প্রমাণ' দ্র)। মীমাংসকেরা জ্ঞানের প্রামাণ্য বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ, তবে পরতঃ অপ্রমাণ।

অদ্বৈতবেদান্তমতে ব্রহ্ম একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা বা মায়া। মীমাংসাদর্শনের মতে জগৎ সত্য, মিথ্যা বা মায়া নয়। জগৎ ও জাগতিক বস্তুনিচয় যে সত্য, প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে তাহা সিদ্ধ হয়। মীমাংসা দর্শন একদিকে বৌদ্ধদের ক্ষণিকবাদ ও শূন্যবাদ এবং অন্যদিকে অদ্বৈতবেদান্তের মায়াবাদ, উভয় মতবাদকেই খণ্ডন করিয়াছে।

জীবাত্মার স্বরূপ লইয়া মীমাংসা দর্শনের দুই প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্রভাকর ও কুমারিল ভট্টের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। প্রভাকরের মতে জীবাত্মা অচিদ্রূপ অর্থাৎ জড়পদার্থ। মনের সংযোগ ঘটিলে জীবাত্মাতে চেতনার আবির্ভাব হয়। ইচ্ছা-দ্বেষ সুখ-দুঃখ ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি জীবের গুণ। এই মতে প্রত্যেক জ্ঞানেই জ্ঞান, তদাশ্রয়ী জীব এবং জ্ঞানের বিষয়—এই তিনেরই প্রকাশ ঘটে। এই কারণে প্রভাকর মতকে 'ত্রিপুটী প্রত্যক্ষবাদ' বলা হয়।

কুমারিল ভট্টের মতে আত্মা দ্রষ্টারূপে চিৎস্বরূপ এবং দৃশ্য (অবজেক্ট)-রূপে জড়স্বরূপ। সুষুপ্তিকালেও জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব হয় না। 'গাঢ় নিদ্রাতে আমি জড়ভাবে সুপ্ত ছিলাম'—সুপ্তোত্থিত মানবের এইপ্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালে আত্মাতে জড়তা না থাকিলে জড়তার অনুভব সম্ভব নহে ; অতএব আত্মা অচিদ্রূপও বটে। আর অনুভব ছিল বলিয়াই আত্মা চিদ্রূপ। অর্থাৎ আত্মা জড় এবং অজড় দুই-ই।

দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে জীব ভিন্ন। জীব নিত্য, সর্বব্যাপী এবং পরম-মহৎ-পরিমাণ। জীব অনেক, প্রতি শরীরে পৃথক পৃথক জীবের প্রকাশ।

অনেকের মতে মীমাংসা দর্শন নিরীশ্বরবাদী। প্রকৃতপক্ষে জৈমিনি জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। বৈদিক যজ্ঞের বিচারই মীমাংসা দর্শনের প্রধান কাজ। এইজন্যই মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বরতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নাই। মীমাংসকদের মতে কর্মের নিয়ম অনুসারেই জগতের সৃষ্টি হয় এবং সেই নিয়ম অনুসারেই জীবের কর্মফলভোগও ঘটে। ফলে জগৎস্রষ্টা ও পাপপুণ্যের বিধাতারূপে ঈশ্বর মানিবার কোনও হেতু নাই।

মানবজীবনের পরম পুরুষার্থের প্রসঙ্গ লইয়া মীমাংসা দর্শনে আলোচনা আছে। প্রাচীন মীমাংসকদের মতে স্বর্গলাভই পরম পুরুষার্থ। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী মীমাংসকদের মতে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ।

জৈমিনিপ্রণীত মীমাংসার সূত্রগ্রন্থে অধ্যায়সংখ্যা ১২। এই সূত্রগ্রন্থ ছাড়াও 'সঙ্কর্ষকাণ্ড' নামে চারি অধ্যায়ের এক গ্রন্থ জৈমিনির রচিত বলিয়া কথিত। ইহাও মীমাংসাসূত্রের পরিপূরক।

আচার্য বৌধায়নের 'কৃতকোটি' ভাষ্য এবং আচার্য উপবর্ষের 'বৃত্তি' মীমাংসাসূত্রের সুপ্রাচীন ব্যাখ্যা। দেবস্বামীর ভাষ্য ও ভবদাসের ব্যাখ্যাও নাকি এক সময়ে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন অধ্যাপকগণের মুখে এইসকল গ্রন্থের নামমাত্র শোনা যায়। শবরস্বামী জৈমিনিসূত্রের ১২ অধ্যায়ের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্যই বর্তমানে বিদ্যার্থীগণের প্রধান অবলম্বন। বিচারপ্রসঙ্গে বৌদ্ধমতখণ্ডনের প্রথম পথপ্রদর্শক সম্ভবতঃ শবরস্বামী। ভাষ্যকার শবরস্বামীর পরেই মীমাংসাদর্শন তিনটি ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। ভট্ট কুমারিল, গুরু প্রভাকর ও মুরারি মিশ্র—এই ত্রিধারার প্রবর্তক। কুমারিলের শ্লোকবার্তিক, তন্ত্রবার্তিক ও টুপটীকা বিস্তৃত ও সমধিক প্রচলিত। প্রাচীন আচার্যগণ বলিয়া থাকেন—'ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ'—অর্থাৎ শাস্ত্রবিচারে ভট্টের বিচারপদ্ধতিই আদরণীয়। বেদান্তদর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের বিচারে কুমারিলের পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়। মিতাক্ষরা, শ্রাদ্ধবিবেক প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের কোনও কোনও গ্রন্থে প্রভাকরের মতও গৃহীত হইয়াছে।

প্রভাকর শবরভাষ্যের উপর 'বৃহতী' ও 'লঘ্বী' নামে দুইখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশের 'তত্ত্বচিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থে যেসকল মীমাংসা-মতবাদ পূর্বপক্ষরূপে স্থান পাইয়াছে, সেইগুলি প্রভাকরেরই সিদ্ধান্ত। প্রভাকরের অনেক সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তের খুব কাছাকাছি। তার্কিক কবি শ্রীহর্ষ 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' গ্রন্থে প্রভাকরকে বুদ্ধবন্ধু বিশেষণে উপহাস করিয়াছেন।

মুরারি মিশ্রের কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না। 'তর্কামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্বপক্ষরূপে তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থান পাইয়াছে। একটি প্রবাদবাক্য আছে—'মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ'। ইহাতে অনুমিত হয়, একসময়ে পণ্ডিতসমাজে তিনটি মতই পরিচিত ছিল।

আজকাল প্রধানতঃ ভট্টের গ্রন্থই বিদ্বৎসমাজে আলোচিত হয়। বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতির ব্যাখ্যায় এবং হিন্দুর পূজাপার্বণাদিতে মীমাংসাজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। এক কথায় বলিতে গেলে বৈদিক গবেষণার অনুকূল তর্ক মীমাংসা দর্শনেই দেখিতে পাওয়া যায়।

মীমাংসা দর্শনেরও চরম লক্ষ্য জীবের মুক্তি। মুক্তির প্রাথমিক উপায় কর্মানুষ্ঠান। কর্মানুষ্ঠান হইতে জীবের অদৃষ্ট বা 'অপূর্ব' উৎপন্ন হয়। কর্মানুষ্ঠান ভোগ ও মোক্ষ, উভয়েরই কারণ। মুক্তিকামী জীব বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধ কর্মের বর্জন করিবেন। তাহাতে প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধি এবং পরে মুক্তিলাভ হইবে। এই কর্মবাদের প্রধান প্রচারক হইতেছে মীমাংসা দর্শন।

দ্র S. N, Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, vol. I, Cambridge, 1932 ; Ganganath Jha, *Purva-Mimansa—in its Sources*, Benares, 1942.

সুখময় ভট্টাচার্য
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ। সূর্য হইতে দূরত্ব অনুসারে ইহা তৃতীয় স্থানীয়। এই গ্রহ মনুষ্য এবং অগণ্য জীব ও উদ্ভিদের আবাসস্থল। অন্য কোনও গ্রহের জলবায়ু ও তাপমাত্রা এইপ্রকার জীব ও উদ্ভিদ-বসতির অনুকূল বলিয়া জানা যায় না।

পৃথিবী প্রায় গোলকাকৃতি; উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। প্রাচীন কালে লোকে মনে করিত পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল। পিথাগোরাস (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮০-৫০০ অব্দ) পৃথিবী গোলাকার বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে আরিস্তোতল (৩৮৫-৩২২ খ্রীষ্টপূর্ব)-এর যুক্তি বর্তমান কালের যুক্তির অনুরূপ।

পৃথিবী আপন অক্ষের উপর পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে আবর্তন করে—আবর্তনকাল সৌর সময় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪·০৯৫ সেকেণ্ড। পৃথিবীর অক্ষ পৃথিবীপৃষ্ঠকে সুমেরু বা উত্তর মেরু ও কুমেরু বা দক্ষিণ মেরুতে ছেদ করে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে সমদূরবর্তী যে বৃত্ত পৃথিবীর উপর কল্পনা করা যায়, তাহা বিষুববৃত্ত। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে বিষুবরেখাস্থ কোনও বিন্দুর দূরত্ব ৬৩৭৮·৩৮৮ কিলোমিটার; কেন্দ্র হইতে মেরুর (সুমেরু বা কুমেরু) দূরত্ব ৬৩৫৬·৯০৯ কিলোমিটার। পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর দিয়া মেরুবিন্দু হইতে বিষুবরেখা পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় দশ সহস্র কিলোমিটার। পৃথিবীর ভর ৫·৯৮ × ১০২৭ গ্রাম = ৫·৯৮ × ১০২১ মেট্রিক টন। গড় ঘনাঙ্ক ৫·৪৯৩।

প্রত্যেক গ্রহই উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং সূর্য এইসকল উপবৃত্তের এক নাভিতে আছে। পৃথিবীর গতিপথের পরাক্ষ ৩০ কোটি কিলোমিটার; সূর্য হইতে পৃথিবীর মধ্যক দূরত্ব ইহার অর্ধেক ১৫ কোটি কিলোমিটার। পৃথিবীর কক্ষে সূর্যের নিকটতম বিন্দু অনুসূরের দূরত্ব মধ্যক দূরত্ব অপেক্ষা ২৪ লক্ষ কিলোমিটার কম এবং দূরতম বিন্দু অপসূরের দূরত্ব এই পরিমাণ বেশি। পৃথিবীর সূর্যপরিক্রমা-কালকে বৎসর বলা হয়।

পৃথিবীর গতিপথের নাভিতে সূর্য রহিয়াছে কিন্তু সূর্য স্থির নহে।

পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চন্দ্র। পৃথিবী ও চন্দ্রের ভরকেন্দ্র পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে ৪৮০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই ভরকেন্দ্রই সূর্য-পরিক্রমা করিতে করিতে সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন এবং বার্ষিক সূর্য-পরিক্রমণের কথা কোপার্নিকাস ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। হিন্দু জ্যোতিষী আর্যভট্ট (জন্ম ৪৭৬ খ্রী ?) পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা বলিয়াছেন।

বিজ্ঞানী ফুকো ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম দেখান যে, সরল দোলকের দোলনতল বাম হইতে ডান দিকে ঘোরে। এই পরীক্ষা প্রমাণ করে যে, পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘোরে।

আলোর অপেরণ (aberration) হইতে পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমা প্রমাণিত হয়। বেড্‌লি ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই অপেরণ আবিষ্কার করেন। বায়ুপ্রবাহ না থাকিলে

বৃষ্টির ফোঁটাসমূহ উল্লম্বভাবে পড়ে। কিন্তু কোনও লোক যদি বৃষ্টির ভিতর দিয়া হাঁটে বা দৌড়ায় তাহা হইলে যে দিকে লোকটি চলে সে দিক হইতে বৃষ্টি তির্যকভাবে আসে। পৃথিবীর গতিবেগের জন্য কোনও তারা হইতে আগত আলোর গতির অনুরূপ দিক-পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং তারাটিকে প্রকৃত অবস্থান হইতে পৃথিবীর গতির দিকে কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুত দেখায়। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া খ-গোলকে তারাটি তাহার প্রকৃত অবস্থানের চারিদিকে এক বৎসর সময়ে একটি ছোট উপবৃত্তাকার পথে ঘুরিয়া আসে। দূরবীনে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ হয়।

অক্ষবিচলন: পৃথিবীর অক্ষকে উভয় দিকে বাড়াইয়া দিলে উহা খ-গোলককে খ-মেরুতে ছেদ করে। পৃথিবীর অক্ষের অবস্থানের দিক ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। ইহা ২৬০০০ বৎসরে একটি শঙ্কু রচনা করিয়া আসে। শঙ্কুর অক্ষ পৃথিবীর ভ্রমণপথের উপর লম্ব। অক্ষের দিক-পরিবর্তন হয় বলিয়া খ-মেরুর অবস্থানেরও ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে।

পৃথিবীর বয়স: স্বয়ং তেজস্ক্রিয় ধাতু ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম সীসাতে রূপান্তরিত হয়। এই সীসা সাধারণ সীসা হইতে ভিন্ন। লক্ষ বা কোটি বৎসরে যে পরিমাণ রূপান্তর ঘটে তাহা নির্দিষ্ট। কোনও আকরিক পদার্থে প্রাপ্ত ইউরেনিয়াম এবং পরিবর্তিত সীসার পরিমাণ জানিয়া পৃথিবীর বয়সের হিসাব পাওয়া যায়। আধুনিক হিসাবে পৃথিবীর বয়স চারিশত কোটি বৎসর।

দ্র Harold Jeffries, *The Earth*, New York, 1952.

কামিনীকুমার দে

পৃথূদক (৩০°৫৯′ উত্তর ও ৭৬°৫৫′ পূর্ব) পাঞ্জাবের একটি তীর্থস্থান। পাঞ্জাবে অবস্থিত বর্তমান পেহোয়া শহরই সরস্বতীতটবর্তী পৃথূদক। প্রাচীন কালের মহাভারতের বনপর্ব অনুসারে সরস্বতী ও কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা পৃথূদকের মাহাত্ম্য অধিক। শান্তিপর্বে ও পদ্মপুরাণের আদি খণ্ডেও পৃথূদককে শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে রাজা পৃথু ঐ স্থানে শ্রাদ্ধকালে দ্বাদশ দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বারি প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম পৃথূদক। মহাভারতে পৃথূদক কার্তিকেয়তীর্থ, কিন্তু বামনপুরাণে ব্রহ্মযোনি-তীর্থ। প্রাচীনকালে পৃথূদকে বহু মন্দির ছিল।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XX, Oxford, 1908.

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

পৃথ্বীরাজ রাজপুত চাহমানবংশীয় রায় পিথোরা নামেও পরিচিত। দিল্লী, আজমীর ও রাজস্থানের এক বিস্তৃত অংশের অধীশ্বর সোমেশ্বর ও কর্পূর দেবীর পুত্র। ১১৬২-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১১৭৮ হইতে ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পিতৃব্যপুত্র নাগার্জুন, আলওয়ারের ভাদানকরাজ, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লরাজ পরমাল ও গুজরাতের দ্বিতীয় ভীমকে পরাজিত করেন। তাঁহার রাজ্যসীমা উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাবের অন্তর্গত হিসার ও 'শিরহিন্দ' পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ঘুররাজ্যের অন্তর্গত গজনীর তুর্কি শাসনকর্তা মুইজ-উদ-দীন মুহম্মদ (মুহম্মদ ঘুরী নামেও পরিচিত) পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ অধিকার করিয়া চাহমানরাজ্যভুক্ত তারারহিন্দ (সম্ভবতঃ শিরহিন্দ) দুর্গ অধিকার করিলে পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া ওঠে। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯০-৯১ খ্রী) পৃথ্বীরাজের নিকট ঘুরী পরাস্ত হন। পরবৎসর মুসলমানবাহিনী পুনরায় চাহমানরাজ্য আক্রমণ করিলে পৃথ্বীরাজ উত্তর ভারতের অনেক নেতৃবর্গসহ আক্রমণকারীর সম্মুখীন হন, কিন্তু তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রী) পৃথ্বীরাজ পরাজিত হন ও বন্দী হন। পরে বন্দী পৃথ্বীরাজকে হত্যা করা হয়। সমসাময়িক জয়ানক-রচিত 'পৃথ্বীরাজ বিজয়' ও চন্দ বরদাঈ-রচিত 'পৃথ্বীরাজ রাসো' কাব্যেও পৃথ্বীরাজ-সম্পর্কে বহু তথ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, পৃথ্বীরাজের সহিত কনৌজের গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এবং জয়চন্দ্র তাঁহার কন্যা সংযোগিতার স্বয়ম্বরসভায় পৃথ্বীরাজকে নিমন্ত্রণ করেন নাই; কিন্তু সংযোগিতা পৃথ্বীরাজের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সভায় উপস্থিত থাকিয়া সংযোগিতাকে বলপূর্বক হরণ ও বিবাহ করেন। এই কাহিনী কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না।

দ্র Chand Bardai, *Prithviraja Raso*, M. B. Pandia and S. S. Das, ed, Benares, 1913; H. C. Ray, *Dynastic History of Northern India*, vol. II, Calcutta, 1936; R. C. Majumder, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. V, Bombay, 1957.

কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত

পৃথ্বীশচন্দ্র রায় (১৮৭০-১৯২৮ খ্রী) প্রখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ্‌। পৃথ্বীশচন্দ্র ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত উলপুরের প্রসিদ্ধ রায়চৌধুরীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী। ইনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। রাজনীতিতে মধ্যমপন্থী (মডারেট) হইলেও সরকারি অব্যবস্থাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করিতে ইনি কখনও কুন্ঠিত হন নাই। ইনি দীর্ঘকাল 'ভারত-সভা' ('ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন')-এর সম্পাদক ছিলেন।

রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রকাশের জন্য পৃথ্বীশচন্দ্র 'দি ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড' নামক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন (১৯০৫ খ্রী)। পরে এই পত্রিকা সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে ইনি কিছুকাল দৈনিক পত্রিকা 'দি বেঙ্গলী'র সম্পাদনা করেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, দিনশাহ্‌ ওয়াচা-প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত ইঁহার খুবই হৃদ্যতা ছিল। 'গোখলে স্মারক গ্রন্থাগার' স্থাপনার্থে ইনি নিজের মূল্যবান গ্রন্থাগারটি 'ভারত-সভা'কে দান করেন। ইংরেজী ভাষায় ইনি কয়েকটি সুচিন্তিত গ্রন্থ রচনা করেন যথা 'দি পভার্টি প্রব্লেম ইন ইণ্ডিয়া' (১৮৯৫ খ্রী); 'ইণ্ডিয়ান ফেমিন্‌স : দেয়ার কজেস অ্যাণ্ড রেমিডিজ' (১৯০১ খ্রী); 'এ নোট অন দি ইণ্ডিয়ান সুগার ডিউটিজ (১৮৯৯ খ্রী)', 'দি ম্যাপ অফ ইণ্ডিয়া' (১৯০৪ খ্রী) এবং 'লাইফ অ্যাণ্ড টাইম্‌স অফ সি. আর. দাস' (১৯২৭ খ্রী)।

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র শশিভূষণ বিদ্যালংকার, জীবনীকোষ, ৫ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ; বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, সাংবাদিকের স্মৃতিকথা, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

পেঙ্গুইন পেঙ্গুইন স্ফেনিস্‌কিফোরমিস বর্গের (Order-Sphenisciformis) পাখি। প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ, দক্ষিণ মেরু, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার কিয়দংশ এবং উত্তমাশা অন্তরীপের অদূরবর্তী কয়েকটি দ্বীপে ইহারা দলবদ্ধ বা এককভাবে বাস করে। পেঙ্গুইনের বুকের রঙ শাদা, ডানা কালো অথবা ধূসর বর্ণের। ডানা দুইটি আকারে ছোট এবং উড়িবার উপযোগী নয়। জলে সাঁতার কাটিবার জন্য ডানা দুইটি দাঁড়ের মত। ডানার পালকগুলি ছোট ছোট আঁশের মত হইয়া ডানাকে 'জলনিরোধক' করিয়াছে। পা দুইটি আকারে ছোট এবং শরীরের একটু পিছন দিকে অবস্থিত। পায়ের পাতা ভূমির সমান্তরাল হওয়ায় পেঙ্গুইন ডাঙ্গায় সোজা হইয়া চলিতে পারে। এম্পারার পেঙ্গুইন আকারে সর্ববৃহৎ—দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মিটার ও ওজনে প্রায় ৪০ কিলোগ্রাম।

মাছ ও ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণী পেঙ্গুইনের প্রধান খাদ্য। শিকারের সন্ধানে ইহারা দ্রুতগতিতে সাঁতার কাটিয়া জলের গভীরে যাইতে পারে। আহার্য-গ্রহণ না করিয়া পেঙ্গুইন প্রায় ৩ মাস বাঁচিতে পারে।

কোনও কোনও পেঙ্গুইন গর্তে ডিম পাড়িয়া গর্তের মুখ ছোট ছোট নুড়িপাথর দিয়া ঢাকিয়া রাখে। আবার এম্পারার পেঙ্গুইন দুই পায়ের মধ্যবর্তী চামড়ার থলির মধ্যে ডিম রাখিয়া দেয়। ডিম পাড়িয়া স্ত্রী পেঙ্গুইনরা আহারের সন্ধানে সমুদ্রে চলিয়া যায় এবং প্রায় তিন সপ্তাহ বাদে ফিরিয়া আসে। এই সময়ে পুরুষ পেঙ্গুইনরা ডিমের রক্ষণাবেক্ষণ করে ও ডিমে তা দেয়। পুরুষ পেঙ্গুইনরা এই সময়ে আহার্য গ্রহণ করে না।

পেঙ্গুইনের শরীর হইতে বর্জিত 'গুয়ানো' নামক বস্তু কৃষিকার্যে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সীমানন্দ অধিকারী

পেট্রোলিয়াম খনিজ তৈল দ্র

পেত্রার্কা, ফ্রান্‌চেস্‌কো (Petrarca Francesco, ১৩০৪-৭৪ খ্রী) ইটালীয় কবি, নবজাগৃতির (রেনেসাঁস) অন্যতম হোতা। জন্ম আরেৎসো নগরীতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করার পর পেত্রার্কা যাজকবৃত্তি অবলম্বন করেন। ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে পেত্রার্কা আভিনিঅঁ (আভিন্‌ঁ)-র গির্জায় তাঁহার মানসী লরাকে প্রথম দর্শনে মুগ্ধ হন। তিনি লরার পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লরার মৃত্যুর বহু পরেও তিনিই ছিলেন পেত্রার্কার শ্রেষ্ঠ কাব্যপ্রেরণার উৎস। তাঁহার উপর বোক্যাচিও (১৩১৩-৭৫ খ্রী) এবং ত্রুব্যাদ্যর কবিদের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। রাজকর্ম উপলক্ষ্যে তিনি ইওরোপের বহু দেশ ঘুরিয়াছিলেন (১৩৩০-৫৩ খ্রী)। ১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দে পেত্রার্কা রোম নগরীতে রাজকবির মুকুট লাভ করেন।

পেত্রার্কার গীতিগুচ্ছ (Conzoniere)-এর অধিকাংশই লরার উদ্দেশ্যে লেখা প্রেমের কবিতা। কবিতাগুলিতে সুমহান আনন্দ হইতে গভীর হতাশা পর্যন্ত প্রেমিক-হৃদয়ের বিভিন্ন প্রকারের আবেগ-অনুভূতির বিচিত্র প্রকাশ রূপায়িত হইয়াছে। লরা দিব্য প্রেমের প্রতীক ও

প্রতিমা। পেত্রার্কার চতুর্দশপদী কবিতাগুলি সাধারণতঃ আট ও ছয় পঙ্‌ক্তির ছুইটি অংশে বিভক্ত; প্রথম স্তবকে মিল ক খ খ ক ক ক খ খ ক; পরের স্তবকে ছুই বা তিনটি নূতন মিল। পেত্রার্কা ল্যাটিন ভাষাতেও পত্রাবলী, 'আফ্রিকা' নামক মহাকাব্য প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন। চসার, রঁসার, স্পেন্সার, মিল্‌টন, মধুসূদনপ্রমুখ সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের বিভিন্ন দেশের বহু কবি নানাভাবে পেত্রার্কার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন।

দ্র W. D. Foulke, tr. & ed., *Some Love Songs of Petrach*, London, 1915; J. H. Whitfield, *Petrarch and the Renascence*, Oxford, 1943; Anna M. Armi, tr. T. E. Mommsen, introdn, *Petrarch: Sonnets and Songs*, New York, 1946.

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

পেনগঙ্গা মহারাষ্ট্র রাজ্যের নদী। অজন্তা পর্বতশ্রেণী এই নদীর উৎস। সেইস্থান হইতে ইহা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া রাজুর তালুকের উত্তরে গোদাবরীর উপনদী ওয়ার্ধার সহিত মিলিত হইয়াছে। পেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা ও ওয়াইগঙ্গার মিলিত প্রবাহ প্রাণহিতা নামে গোদাবরীতে পতিত হইয়াছে।

জয়শ্রী রায়

পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিকস দ্র

পেন্নার দক্ষিণ ভারতের নদী। ইহার প্রাচীন নাম পিনাকিনী। নন্দীদুর্গ পর্বতের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া উত্তর পেন্নার নদী পূর্বাভিমুখে প্রায় ৫৭১ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করিয়া অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লুর শহরের নিকট বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। জয়মঙ্গলী, পাপঘ্নী ও চিত্রাবতী ইহার উপনদী। কৃষ্ণার সহিত ইহা খালদ্বারা যুক্ত। নদীবক্ষে আনিকট আছে। দক্ষিণ পেন্নার নামে আর একটি নদীও নন্দীদুর্গ পর্বত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং সেন্ট ডেভিড দুর্গের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৩৯২ কিলোমিটার।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XX, Oxford, 1908; O. H. K. Spate, *India and Pakistan, London*, 1962.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পেপ্‌টিক আল্‌সার পরিপাকনালীর যে অংশে পেপ্‌সিন নামক এন্‌জাইমের সাহায্যে পরিপাক সংঘটিত হয়, সেই অংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষতকে পেপ্‌টিক আল্‌সার বলে। সাধারণতঃ পাকস্থলী ও গ্রহণী (ডুয়োডেনাম) এবং কখনও কখনও অন্ননালীর শেষ প্রান্ত, মধ্য ক্ষুদ্রান্ত্র (জেজুনাম) প্রভৃতি স্থানে ইহার আক্রমণ ঘটে। পাকস্থলীর অম্লধর্মী পাচকরসের প্রভাবেই ইহার সৃষ্টি হয়। যে পাকস্থলীর মধ্যে অ্যাসিডের ক্ষরণ নাই, তাহাতে কখনও এরূপ ক্ষত হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় পাকস্থলী ও তৎসন্নিহিত অঙ্গগুলির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী পাকস্থলীর অম্লধর্মী রসের ক্রিয়া প্রতিরোধ করিতে পারে; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর গাত্রে অবস্থিত শ্লেষ্মার স্তরটিই অ্যাসিডের হানিকর প্রভাব হইতে ঐ ঝিল্লীকে রক্ষা করে। কোনও কারণে পাকস্থলী হইতে অ্যাসিডের ক্ষরণ বৃদ্ধি পাইলে অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরি-উক্ত প্রতিরোধ-ক্ষমতা হ্রাস পাইলে আল্‌সার হয়। পেপ্‌টিক আল্‌সারের প্রধান লক্ষণ উদরের ঊর্ধ্বভাগে যন্ত্রণা; গ্রহণীর (ডুয়োডেনাল) আল্‌সারের ক্ষেত্রে পাকস্থলী শূন্য হইলে এবং পাকস্থলীর (গ্যাস্ট্রিক) আল্‌সারের ক্ষেত্রে খাদ্যগ্রহণের পর যন্ত্রণা অনুভূত হয়। ক্ষারজাতীয় পদার্থগ্রহণে যন্ত্রণার উপশম ঘটে। এতদ্ব্যতীত গ্রহণীর আল্‌সারে আহার্য গ্রহণ করিলে এবং পাকস্থলীর আল্‌সারে বমি করিলে যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। বেরিয়াম-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ খাইবার পর এক্‌স্‌-রে দ্বারা পাকস্থলী ও গ্রহণীর চিত্র গ্রহণ করিয়া আল্‌সারের অবস্থিতি নির্ণয় করা যায়। আল্‌সার কোনও রক্তবাহে ছিদ্র করিয়া প্রভূত রক্তপাত ঘটাইতে পারে; সে ক্ষেত্রে রক্তবমন, মলে রক্তের উপস্থিতিহেতু কৃষ্ণবর্ণ মল প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কখনও কখনও আল্‌সার সারিবার সময়ে টিস্যুর বৃদ্ধির ফলে পাকস্থলীর ক্ষুদ্রান্ত্র-সন্নিহিত প্রান্ত সংকীর্ণ হইয়া যায় (পাইলোরিক স্টেনোসিস)। কদাচিৎ পাকস্থলীর আল্‌সার হইতে ক্যানসারের উৎপত্তি হইতে পারে। প্রধানতঃ নিয়মিত আহারের অভ্যাস এবং পাকস্থলীর অ্যাসিড-ক্ষরণ ও সংকোচন হ্রাস করিবার উপযোগী ঔষধপ্রয়োগের দ্বারাই পেপ্‌টিক আল্‌সারের চিকিৎসা করা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসার দ্বারা পাকস্থলীর আক্রান্ত অংশ অপসারণ করিতে হয়; গ্রহণীর আল্‌সারেও অ্যাসিড-ক্ষরণ কমাইবার জন্য পাকস্থলীর অংশবিশেষ অপসারণের প্রয়োজন হইতে পারে। 'ক্ষত' দ্র।

দ্র A. C. Ivy, M. I. Grossman & W.

Bachrach, *Peptic Ulcer*, Philadelphia, 1950 ; D. Sandweiss, ed. *Peptic Ulcer*, Philadelphia, 1951.

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

পেঁপে পাস্‌সিফ্লোরাসিঈ গোত্রের (Family-Passifloraceae) অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম কারিকা পাপাইয়া (*Carica Papaya*)। আদি উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ আমেরিকা; ভারতবর্ষে পর্তুগীজরা পেঁপের চাষ প্রচলন করিয়াছিল। গাছের ঋজু কাণ্ড প্রায়শঃ শাখাহীন; দীর্ঘ ফাঁপা বৃন্তের প্রান্তে করতলাকার পত্র বর্তমান। গাছের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। জল দাঁড়ায় না, এমন জমি ছাড়া সর্বত্রই ইহার চাষ সম্ভব তবে উর্বরা দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী। বীজ হইতে চারা তুলিয়া আষাঢ়-শ্রাবণে ৫-৬ হাত দূরে দূরে লাইনে ৪ হাত অন্তর প্রতি গর্তে দুটি করিয়া চারা বসাইতে হয়। চারা বসাইবার ১ মাস পূর্বেই গর্তে মাটির সহিত জৈব সার মিশাইয়া লইতে হয়। ৬ মাস পরে ফুল ধরার পর প্রতি গর্তে একটি করিয়া চারা রাখিয়া শতকরা ৯০টি পুরুষ এবং অতিরিক্ত স্ত্রী-গাছ কাটিয়া ফেলিতে হয়। একটি গাছ প্রায় ৩ বৎসর ভাল ফল দেয়। পেঁপের ফল কাঁচা অবস্থায় সুস্বাদু সবজি এবং পাকা অবস্থায় সুমিষ্ট ও রসাল। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি থাকে। কাঁচা পেঁপের শাদা কষে 'পেপেইন' নামক এন্‌জাইম বর্তমান। পেপেইন প্রোটিনের পরিপাকে সাহায্য করে। সেজন্য মাংস সুসিদ্ধ করিতে কাঁচা পেঁপের টুকরা ব্যবহার করা হয়। যকৃতের রোগে পেপেইন ফলপ্রদ। পেঁপের চাষে সবজি এবং ফল ছাড়াও কাঁচা পেঁপের কষ হইতে অশোধিত পেপেইন উৎপাদন করিয়া ভাল লাভ করা যায়।

দ্র M. P. Guha, 'Papaya-Medicine, Vegetable and Fruit,' *Sunday Hindusthan Standard, Calcutta*, 1 November, 1953.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

পেয়ারা জাম গোত্রের (ফ্যামিলি-মির্টাসিঈ, Family-Myrtaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বহুবর্ষজীবী বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম প্সিদিয়ম গুআয়াভা (*Psidium guajava*)। পেয়ারার জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চল। সম্ভবতঃ ১৭শ শতাব্দীতে পেয়ারা ভারতে আসিয়াছিল। পেয়ারার সরল পত্রগুলির প্রান্ত অখণ্ড, পত্রাগ্র ভোঁতা ও পুষ্প উভলিঙ্গ। পুষ্পে ৫টি দল ও ৫টি বৃত্যংশ বর্তমান। ফল মিষ্টস্বাদ, বেরীজাতীয় ও বীজপূর্ণ; উন্নত জাতের পেয়ারার বীজের সংখ্যা অত্যন্ত কম; উত্তর প্রদেশে সফেদা ও চিত্তিদার সবচেয়ে জনপ্রিয়। সফেদা গোলাকার, খোসা মোলায়েম এবং শাঁস শাদা ও মিষ্ট। চিত্তিদার ঐ একই রকমের, কিন্তু খোসা লাল ছিটযুক্ত এবং সম্ভবতঃ শাঁস আরও মিষ্ট। বিহারে সফেদা, হরিঝা এবং হাবসী জনপ্রিয়। হাবসীর শাঁস লাল এবং তত মিষ্ট না হইলেও স্বাদ অনেকের প্রিয়। ফলে যথেষ্ট ভিটামিন সি থাকে।

উষ্ণ এবং মন্দোষ্ণ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জন্মানো হয়; কিন্তু যে অঞ্চলে শীতকাল সুব্যক্ত সেখানে উষ্ণ অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ভালো জাতের ফল উৎপন্ন হয়। পেয়ারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। ইহা অন্য ফসলের চেয়ে অনেক বেশি খরা সহ্য করিতে পারে এবং বিনা সেচেই জন্মানো যায়। বীজ অথবা গুটিকলমের চারা বর্ষার শুরুতে আষাঢ়-শ্রাবণে বসানো হয়। গুটি কলম সবচেয়ে উপযোগী এবং বাংলা দেশে সুপারিশ করা হয়।

১×১×১ হাত গর্তে ১৬ হাত অন্তর ভালো জাতের ১ বছর বয়সের কলম বপন করিতে হয়। ২-৩ বৎসরেই গাছে ফুল-ফল ধরে। বৎসরে দুইবার—বসন্ত এবং বর্ষাকালে ফুল ধরে এবং বসন্তের ফুলের ফল বর্ষায় এবং বর্ষার শীতে পাকে। শীতের ফলই উৎকৃষ্ট এবং এই কারণে বসন্তের ফুল সেচ বন্ধ করিয়া ঝরাইয়া দিয়া কেবলমাত্র শীতকালেই ফল পাকিতে দেওয়া হয়। পেয়ারার ডগা-শুখা মারাত্মক রোগ; ইহার নিরাময়-ব্যবস্থা জানা নাই। প্রথমে ডগা শুখাইয়া অল্প দিনেই সম্পূর্ণ গাছ শুখাইয়া মরিয়া যায়। সম্পূর্ণ গাছ তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলিলে নিকটবর্তী গাছে রোগপ্রসারের ভয় থাকে না।

প্রচুর ভিটামিনযুক্ত পেয়ারা ঘরে রাখিয়া খাওয়ার সহজ উপায় জ্যাম জেলি তৈয়ারি করা। ইহাতে ভিটামিন নষ্ট হয় না অথচ স্বাদে অতি উপাদেয়। জ্যাম তৈয়ারি করিতে সমস্ত শাঁস বীজ হইতে আলাদা করিয়া অর্ধেক পরিমাণ জলে সিদ্ধ করা হয়। নরম হওয়ার পর সমপরিমাণ চিনি এবং সামান্য লেবুর রস যোগ করিয়া বেশ ঘন হওয়া পর্যন্ত জাল দেওয়া হয়।

জেলি তৈয়ারি করার জন্য পেয়ারা ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া টুকরা করিয়া কাটিয়া অল্প জল ও লেবুর রস দিয়া অর্ধ ঘণ্টা সিদ্ধ করা হয়। মোটা কাপড়ে রস ছাঁকিয়া

একরাত্রি রাখার পর পরিষ্কার রস উপর হইতে ঢালিয়া লইয়া পেক্‌টিনের পরিমাণ অনুযায়ী চিনি দিয়া জাল দিতে হয় এবং রস তার ধরিলে নামাইয়া বোতলজাত করিয়া রাখা হয়।

দ্র W. B. Hays, *Fruit Growing in India*, Allahabad, 1953; G. S. Cheema & Others, *Commercial Fruits of India*, Calcutta, 1954.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

পেরিয়ার দক্ষিণ ভারতের অন্যতম নদী। ইহা পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিম পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়া আরব সাগরে পড়িতেছে। কেরল ও তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ) রাজ্যের সীমানায় নদীটির উপর একটি বাঁধ দিয়া পেরিয়ার হ্রদ নামে একটি বৃহৎ জলাশয়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে। হ্রদের মোট আয়তন ৩২৩৭ হেক্টর। প্রায় ১৭৩৯ মিটার দীর্ঘ একটি পার্বত্য সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া এই হ্রদের জল পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্ব পার্শ্বে বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

পেরিয়ার পরিকল্পনায় মোট ৫৮০০০ হেক্টর জমিতে জল সেচ করা হইতেছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XX, Oxford, 1908; O. H. K. Spate, *India and Pakistan*, London, 1962.

পীযষ সাহা

পেরিস্কোপ সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে ইহা একটি অতি সরল যন্ত্র। ইহার সাহায্যে কোনও বাধার অপর পার্শ্বের বস্তুকে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহাতে দুইটি সমতল আয়না থাকে। এই আয়না দুইটি কোনও একটি লম্বা নল বা বাক্সের বিপরীত দিকে নলের প্রধান অক্ষের সঙ্গে ৪৫° কোণ করিয়া অবস্থান করে। এই বাক্স বা নলের আয়নার বিপরীত দিকের অংশ খোলা থাকে। আরও উন্নত ধরনের যন্ত্রে আয়নাগুলিকে আনুভূমিকতলে ঘোরান যায়। দূরস্থিত বস্তু হইতে আলো আসিয়া পর পর দুইটি আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া দর্শকের চক্ষুতে পড়ে ও বস্তুটিকে দৃশ্যমান করে। এই সরল পেরিস্কোপের সাহায্যে কোনও ট্রেঞ্চ হইতে বাহিরের দৃশ্য দেখা যায়। ডুবোজাহাজ হইতে জলের উপরিভাগে অবস্থিত কোনও বস্তুকে দেখার জন্য পেরিস্কোপ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ডুবোজাহাজে ব্যবহৃত পেরিস্কোপের কার্যপ্রণালী একই হইলেও ইহার যন্ত্রাংশ অনেক জটিল।

সুধেন্দুপ্রসাদ বসু

পেশী প্রাণিদেহের টিস্যু বা দেহকলাবিশেষ। বিভিন্ন পেশীর সংকোচন ও শৈথিল্যের ছান্দস ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপরেই প্রাণীর চলৎশক্তি ও তাহার দেহাভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির বিচলন নির্ভর করে। প্রাণিভেদে এবং অঙ্গভেদে পেশীর গঠন ও ধর্মে নানাপ্রকার বিভিন্নতা দেখা যায়। অবশ্য সকলপ্রকার পেশীই বহু পেশীকোষ অর্থাৎ পেশীতন্তু (মাস্‌ল-ফাইবার) দিয়া গঠিত; প্রত্যেক পেশীকোষে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস, পেশী-প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ (সার্কোপ্লাজ্‌ম্‌), কোষঝিল্লী (সার্কোলেম্মা) এবং বহু সূক্ষ্ম তন্তুর মত বস্তু (মায়োফাইব্রিল) বর্তমান। গঠন ও ধর্ম অনুসারে পেশীকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—অনৈচ্ছিক পেশী, ঐচ্ছিক পেশী ও হৃৎপেশী।

পৌষ্টিক নালী, রক্তবাহ, গ্রন্থিনলী, মূত্রাশয় এবং সংকোচনক্ষম যাবতীয় আভ্যন্তরীণ অঙ্গে অনৈচ্ছিক পেশী বর্তমান। অনৈচ্ছিক পেশীর ক্রিয়া দেহীর ইচ্ছাধীন নহে; ইহারা প্রধানতঃ স্বতঃক্রিয় (অটোনমিক) নার্ভতন্ত্রের প্রভাবে সক্রিয় হয়। অনৈচ্ছিক পেশীর কোষ মূলকাকার, ৪-৭ মাইক্রন পুরু (১ মাইক্রন=০.০০১ মিলিমিটার) এবং প্রায় ০.২ মিলিমিটার দীর্ঘ; কোষে একটি নিউক্লিয়াস এবং বহু সূক্ষ্ম তন্তু (মায়োফাইব্রিল) থাকে।

ঐচ্ছিক পেশী প্রধানতঃ বিভিন্ন অস্থিগাত্রে সংযুক্ত থাকে। ঐচ্ছিক পেশীর ক্রিয়া দেহীর ইচ্ছাধীন এবং ইহারা বিভিন্ন চেষ্টীয় (মোটর) নার্ভের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐচ্ছিক পেশীর কোষ বা পেশীতন্তুগুলি একান্তর-ভাবে সজ্জিত ঘোর ও লঘু বর্ণের পটির মত অংশের সমন্বয়ে গঠিত; কোষমধ্যে ১-২ মাইক্রন পুরু সূক্ষ্ম তন্তু (মায়ো-ফাইব্রিল) বর্তমান। একান্তর ঘোর ও লঘু পটি থাকায় ঐচ্ছিক পেশীকে সরেখ (স্ট্রায়াটেড) দেখায়; এজন্যই ইহার অপর নাম সরেখ পেশী। ঐচ্ছিক পেশীর পেশী-তন্তুর অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম তন্তুগুলিতে (মায়োফাইব্রিল) অ্যাক্টিন ও মায়োসিন নামে দুইপ্রকার প্রোটিন থাকে। ইহাদের পরস্পর বিক্রিয়ার সহিত পেশীর সংকোচন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ঐচ্ছিক পেশীর সংকোচনের ফলেই হস্তপদাদি অঙ্গের সঞ্চালন ও স্থানান্তরে গমন সম্ভবপর হয় এবং বাগ্‌যন্ত্র হইতে কণ্ঠস্বর উৎপন্ন হয়।

হৃৎপেশী (কার্ডিয়াক মাস্‌ল) কেবল হৃৎপিণ্ডের গাত্রেই অবস্থিত। ইহার সরেখ (স্ট্রায়াটেড) ও আয়তাকার কোষগুলি শাখার সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত হওয়ায় হৃৎপিণ্ডের সকল পেশী একত্রে সংকুচিত বা শিথিল

হইতে পারে। হৃৎপেশী দেহীর ইচ্ছানিরপেক্ষ এবং স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন।

সকল প্রকার পেশীরই উদ্দীপনশক্তি, উদ্দীপনা-পরিবাহিতা, সংকোচনক্ষমতা প্রভৃতি ধর্ম অল্পাধিক বর্তমান। অক্সিজেনের অভাবেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত পেশী তাহার কাজ চালাইয়া যাইতে পারে। ক্রমাগত কার্যের ফলে পেশীতে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। ল্যাকটিক অ্যাসিড জমিয়া গেলে ও শক্তিপ্রদায়ী পদার্থগুলি নিঃশেষ হইয়া গেলে পেশী শ্রান্ত হইয়া পড়ে। মৃত্যুর পরে ঐচ্ছিক পেশীর প্রসার্যতা হ্রাস পায়; ইহাকেই মরণসংকোচ (রাইগর মর্টিস) বলে।

অজিতকুমার চৌধুরী

পেশোয়া মারাঠাসাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী; প্রথমে শিবাজীর 'অষ্ট প্রধানের' অন্যতম প্রধান এবং পরে মারাঠা-সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। প্রথম ৬ জন পেশোয়া ছত্রপতির প্রাশাসনিক কর্মচারীমাত্র ছিলেন। ৭ম পেশোয়া ভটবংশীয় চিৎপাবন ব্রাহ্মণ কর্মকুশল বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-২০ খ্রী) নানা প্রকারে মহারাষ্ট্র রাজ্যের উন্নতি সাধন করেন এবং পেশোয়ার পদে স্বীয় বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র ২য় বাজীরাও-এর (১৭২০-৪০ খ্রী) সময় হইতে সাম্রাজ্যবাদী পেশোয়াতন্ত্রের সূচনা। অপুত্রক অবস্থায় ছত্রপতি সাহুর মৃত্যুর (১৭৪৯ খ্রী) পর প্রাশাসনিক সকল কার্য ছত্রপতির নামে নির্বাহ করা হইলেও পেশোয়া বালাজী বাজীরাও (১৭৪০-৬১ খ্রী) প্রকৃতপক্ষে ছত্রপতির প্রভু হইয়া বসেন। ফলে মারাঠা প্রশাসন ব্যবস্থায় একটি নীরব রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে। পেশোয়ার ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে মারাঠাসাম্রাজ্যে পেশোয়ার অনুগ্রহপুষ্ট একটি নবীন অভিজাতশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। নূতন সামন্ত সর্দারগণ পারস্পরিক বিরোধে লিপ্ত হইয়া পেশোয়ার ক্ষমতালোলুপতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে থাকেন। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রী) মারাঠাপরাজয় পেশোয়ার মর্যাদা হ্রাস করে, পরবর্তী পেশোয়া মাধবরাও (১৭৬১-৭২ খ্রী), নারায়ণরাও (১৭৭২ খ্রী) ও মাধবরাও নারায়ণ (১৭৭৪-৯৬ খ্রী), চিম্নাজি আপ্পা (১৭৯৬ খ্রী) ও ২য় বাজীরাও (১৭৯৬-১৮১৮ খ্রী) এর ক্ষমতা ক্রমশঃ সীমিত হইতে থাকে। ২য় বাজীরাও ইংরেজদের সহিত 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তি (১৮০২ খ্রী) স্বাক্ষর করিলে পেশোয়াপদের মর্যাদা লুপ্ত হয়। ইহার পর নূতন এক সন্ধির দ্বারা পেশোয়াকে মারাঠা-সংঘের নেতৃত্বও ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয় এবং তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃত অংশ ইংরেজরা অধিকার করেন (১৮১৭ খ্রী)। অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া পেশোয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কিন্তু কির্কি ও আষ্টির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। ইংরেজরা পেশোয়ার রাজ্য অধিকার করে এবং পেশোয়াকে কানপুরের নিকটবর্তী বিঠুরে নির্বাসিত করে ও তাঁহার জন্য বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা পেন্‌সন বরাদ্দ হয় (১৮১৯ খ্রী)। অবশেষে লর্ড ড্যাল্‌হৌসি (১৮৪৮-৫৬ খ্রী) ২য় বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর (১৮৫৩ খ্রী) তাঁহার পোষ্যপুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করেন।

দ্র সুরেন্দ্রনাথ সেন, পেশবাদিগের রাজ্যশাসনপদ্ধতি, কলিকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ; Surendranath Sen, *Administrative System of the Marathas*, Calcutta, 1925; G. S. Sardesai, *New History of the Marathas*, Bomboy, 1957.

কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত

পেশোয়ার (৩৩° ৪৩´-৩৪° ৩২´ উত্তর ও ৭১° ২২´-৭২° ৪৫´ পূর্ব) পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। ইহার আয়তন ৪২৬৩ বর্গকিলোমিটার (১৬৪৬ বর্গমাইল)। ইহার পূর্বসীমা সিন্ধু নদ। পূর্বে হাজারা ও মর্দান, পশ্চিমে আফগানি-স্তান, দক্ষিণে কোহাট ও উত্তরে মলকন্দ জেলা। পেশোয়ার জেলাটি ৩টি তহসিল এবং ৬২০টি গ্রাম লইয়া গঠিত।

জেলার উত্তর-পূর্ব দিকে ৩টি শৈলশিরা-মোরা, সাকত ও মলকন্দ সোয়াতের দিকে গিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে হিন্দুকুশ পর্বতের অংশ জেলার পশ্চিম সীমান্ত দিয়া কাবুল নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে কতকগুলি উচ্চ শৃঙ্গ অবস্থিত, উহাদের মধ্যে চেরাত এবং ঘাইথানাসির উল্লেখযোগ্য। জেলাটি একটি পর্বতবেষ্টিত উপত্যকা, চতুর্দিকের পর্বত হইতে এখানে নদী আসিয়া পড়িতেছে। জেলার প্রধান নদী কাবুল জেলাটিকে বিধৌত করিয়া খাইবার গিরিপথের নিকট একটি গভীর খাতের মধ্য দিয়া আটকের উত্তরে সিন্ধু নদে মিলিত হইতেছে।

জেলার উত্তরাংশ নীস, সিস্ট প্রভৃতি শিলার দ্বারা, নৌশেরা ও পেশোয়ার সমভূমি এবং চেরাত পর্বতের উত্তরের ঢালু অংশ চুণা পাথর, মার্বেল ও শ্লেটপাথরের দ্বারা এবং জেলার দক্ষিণাংশ শেল ও বেলে পাথরের দ্বারা

গঠিত। পেশোয়ার উপত্যকা কাবুল নদীবাহিত অবক্ষেপের দ্বারা গঠিত। জেলার জলবায়ু শীতপ্রধান। শীতকালীন তাপমাত্রার গড় কখনও কখনও ০° সেন্টিগ্রেডের নীচে নামিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে ধুলার ঝড় ওঠে। বিভিন্ন স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৭৫-৪২৫ মিলিমিটার পর্যন্ত হইয়া থাকে।

প্রাচীন কাল হইতেই ভৌগোলিক কারণে পেশোয়ার ভারতীয় ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আর্য্যরা এই পথেই ভারতে আসেন। গ্রীক ও ব্যাক্‌ট্রিয়ানরা এই অঞ্চলে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। কুষাণসাম্রাজ্য এই অঞ্চলেই স্থাপিত হয়। এখানে বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানেরাও এই অঞ্চল দিয়াই ভারতবিজয়ের পথে অগ্রসর হন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ারের কর্তৃত্ব শিখদের অধিকারে আসে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইলে পেশোয়ার জেলা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ার জেলা পেশোয়ার বিভাগের অন্তর্গত হইয়াছে।

পেশোয়ারে লোকসংখ্যা ১২১৩৪৬৮ (১৯৬১ খ্রী); তন্মধ্যে ৭১০৩২৮ পুরুষ ও ৫০৩১৪০ স্ত্রী। লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২৮৪ জন। পেশোয়ারের পাঠান, গুর্জর এবং ভগবন প্রভৃতি হিন্দকী উপজাতি মুসলমান-ধর্মাবলম্বী। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ ভাগ মুসলমান, ৪ ভাগ হিন্দু ও ১ ভাগ অন্যান্য। উপজাতির সংখ্যা ৬৭৮৮।

প্রধান খাদ্যশস্য গম ৭৪৪৬৪ হেক্টর জমিতে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বার্লি, ভুট্টা, তুলা ও ইক্ষু উল্লেখযোগ্য। উপত্যকাবিশেষে এখানে উৎকৃষ্ট ধান জন্মে। পেয়ারা, পীচ, আপেল, আখরোট প্রভৃতি ফলও প্রচুর উৎপন্ন হয়।

পেশোয়ার হইতে ৩২ কিলোমিটার দূরে মহম্মদ পর্বতে অবস্থিত ওয়ারসাক পরিকল্পনা হইতে ১৬০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

খনিজ সম্পদে জেলাটি সমৃদ্ধ নহে; পেশোয়ারের চেরল পাহাড়ে কয়লা আছে। ইহা ছাড়া কিছু লৌহ-আকরিক, জিপ্‌সাম ও অ্যান্টিমনিও পাওয়া যায়। পেশোয়ারের অল্পসংখ্যক শিল্পের মধ্যে মর্দানে এশিয়ার বৃহত্তম চিনির কল উল্লেখযোগ্য। পেশোয়ার কুটির-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। পশমের কার্পেট, রেশমের পাগড়ি, কম্বল, মৃৎশিল্প, কারুকার্যখচিত চর্মশিল্প, সূচিশিল্প, তামার জিনিষপত্র, কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্য, মাদুর, ঝুড়ি ও হাতপাখা বিখ্যাত।

এই জেলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলির মধ্যে নৌসেরা, কালান, হোতি, শঙ্করগড়, টাঙ্গি, চারসদ্দ ও রুস্তম বিখ্যাত। জেলার প্রধান রপ্তানিদ্রব্য কার্পাসজাত তুলা, সুতা, চর্মজাত দ্রব্য, গম, লবণ, মশলা, ফল, চিনি, চা, তামাক ও লৌহ প্রভৃতি। প্রধান আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে এঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, কয়লা, তৈল ও ঔষধ উল্লেখযোগ্য।

মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫২ কিলোমিটার। উত্তর-পশ্চিম রেলপথের একটি শাখা আটকের সেতু দিয়া জেলায় প্রবেশ করিয়া পেশোয়ার শহরের মধ্য দিয়া জামরুদ পর্যন্ত গিয়াছে। অপর একটি শাখা নৌসেরা হইতে মর্দান ও দরগই গিয়াছে। প্রধান রেলকেন্দ্র মর্দান, দরগই, পেশোয়ার ও নৌসেরা। জেলার প্রধান সড়ক আটকসেতু দিয়া প্রবেশ করিয়া পেশোয়ার হইয়া জামরুদ ও খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত গিয়াছে। পেশোয়ারে বিমানের অবতরণক্ষেত্র আছে। জেলায় শিক্ষিতের হার শতকরা প্রায় ৯ ভাগ। পেশোয়ারে বিশ্ববিদ্যালয়, ২টি কলেজ, ৩০টি উচ্চ মাধ্যমিক এবং ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

পেশোয়ার : জেলার প্রধান শহর (৩৪° ১′ উত্তর ও ৭১° ৩৭′ পূর্ব)। পেশোয়ারের শাহ্‌জী কি ঢেরী, কণিষ্কের স্তূপ, হিসার দুর্গ, শাহী নিমান খান, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও জিন্না চিকিৎসালয় উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান।

প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে চরসাদায় প্রাচীন গান্ধারের রাজধানী পুষ্কলাবতীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

দ্র Pakistan Publication, *Pakistan 1963-64*, Karachi, 1964.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পেশোয়ারের প্রাচীন নাম পুরুষপুর। খ্রীষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতকে অল-মসূদী ও আবুরীহান অল-বীরুনী এবং ১৬শ শতকে বাবর ইহাকে পরশাওয়র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী) ইহার নামকরণ করেন পেশাওয়র অর্থাৎ সীমান্ত নগর।

পুরুষপুর নগরের পত্তন ঠিক কখন হয়, জানা যায় না; তবে ইহার সমৃদ্ধি ঘটে খ্রীষ্টীয় ১ম শতকে কুষাণদের আমলে। খ্রীষ্টীয় ৩য় শতকে কুষাণদের পতনের পর রাজধানীর গৌরবচ্যুতি হইলেও সমৃদ্ধ বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠানের জন্য পুরুষপুর বহু দিন প্রসিদ্ধ থাকে।

পুরুষপুরে কনিষ্কের অবিস্মরণীয় কীর্তি একটি ধাতুগর্ভ স্তূপ ও তৎপরিপার্শ্বস্থ প্রসিদ্ধ সংঘারাম, যেখানে পার্শ্ব, বসুবন্ধু প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্যগণ জ্ঞান বিকিরণ করিয়াছিলেন। এই বিরাট কীর্তিদ্বয় পরবর্তী কালে বিদেশী পরিব্রাজকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ফা-হিয়েনের মতে, "পরিব্রাজকদৃষ্ট সমুদয় স্তূপ ও মন্দিরের মধ্যে কোনওটিই গঠনসৌন্দর্যে ও শক্ত বুনিয়াদে এই স্তূপের সমকক্ষ ছিল না। প্রবাদ, এইটি জম্বুদ্বীপের উচ্চতম স্তূপ।" সুঙ্গ-উন (খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের ১ম পাদ) বলেন, "সমস্ত সৌধটিতে কনিষ্ক ক্ষোদিত কাষ্ঠ ব্যবহার করিয়াছিলেন; উপরে আরোহণের জন্য সোপান নির্মাণ করিয়াছিলেন। ছাদে সমস্ত প্রকারের দারু ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৩শ তলের উপর তিন ফুট উচ্চ লৌহের যষ্টি ছিল এবং ইহার শীর্ষে ১৩টি গিল্‌টি করা চাকতি অর্থাৎ ছত্র ছিল। ভূমি হইতে মোট উচ্চতা ৭০০ ফুট।" হিউএন-ৎসাঙ পুরুষপুরের অবনত অবস্থা দেখিতে পান। অগ্নিদগ্ধ কনিষ্কস্তূপটির তখন পুনর্নির্মাণ চলিতে ছিল। মুখ্য স্তূপের পশ্চিম পার্শ্বে কনিষ্কনির্মিত জরাজীর্ণ সংঘারামে তখন অল্পসংখ্যকই হীনযানী ভিক্ষু বাস করিতেছিলেন। হিউএন-ৎসাঙ-এর পরেও পুরুষপুরের বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠানের খ্যাতি বহু দিন অক্ষুণ্ণ ছিল। পালবংশীয় দেবপালের (আনুমানিক ৮১০-৮৫০ খ্রী) রাজত্বকালের ঘোষরাওয়া-লেখ হইতে জানা যায়, নগরহার (বর্তমান জলালবাদ) নিবাসী বীরদেব এই স্থানের সংঘারামে জ্ঞানলাভের জন্য আসেন। কেম্‌ব্রিজ-এ রক্ষিত ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি পুথিতে উত্তরাপথের পুরুষপুরমণ্ডলের শ্রীকণকচৈত্যের একটি চিত্র রহিয়াছে।

পেশোয়ার নগরের গঞ্জ দরওয়াজার বাহিরে শাহ্‌-জী কী ঢেরী (রাজার ঢিপি) নামক দুইটি বিরাট ঢিপিতে খননের ফলে কনিষ্কের স্তূপ ও সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হইয়াছে। স্তূপটির বেদিটিই মাত্র বিদ্যমান। ইহার বাস্তু নকশা বা আসন পঞ্চরথ; প্রতি কোণে একটি করিয়া মোট চারিটি বুরুজের মত গোলাকার প্রলম্বন। প্রতি পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ১৮০ ফুট। বেদির বহির্গাত্রে করিন্থীয় গাত্রস্তম্ভাবলীর ফাঁকে ফাঁকে সুধাকর্মের (স্টাকো) বুদ্ধমূর্তি। স্তূপটির অভ্যন্তরে কনিষ্কের একটি মুদ্রা ও ধাতুগর্ভ মঞ্জুষা পাওয়া গিয়াছে। মিশ্রিত ধাতুর (তামার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক) মঞ্জুষাটির উপর আদিতে গলিত সোনার প্রলেপ ছিল। মঞ্জুষার ঢাকনির উপর অভয়মুদ্রায় বুদ্ধ ও দুইজন বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্তি। ইহার অভ্যন্তরে মৃত্তিকার একটি সীলমোহর ও তিন টুকরা অস্থিসহ স্ফটিকের ক্ষুদ্র কৌটা। মঞ্জুষার লেখ হইতে জানা যায়, কনিষ্কের রাজত্বে স্তূপটি উৎসর্গ করা হইয়াছিল সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষুদের পরিগ্রহের জন্য। এই লেখে মহাসেন সংঘারামের অন্তর্গত কনিষ্ক বিহারের উল্লেখ আছে। সংঘারামটিতে বিভিন্ন পর্যায়ের নির্মিতি ও অধিবসতির নিদর্শন উদ্ঘাটিত হইয়াছে। খননের ফলে বেশ কয়েকটি প্রস্তরের ও সুধার মূর্তি ও খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকের হরফে লেখা বৌদ্ধধর্ম-সারগাথাযুক্ত একটি মৃত্তিকাফলক পাওয়া গিয়াছে।

মোগল সাম্রাজ্যের কাবুল প্রদেশের শীতকালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইত এই শহরে। শাহ্‌জাহান (১৬২৮-৫৮ খ্রী) ও ঔরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রী) অধীন শাসক মহাবত খান এখানকার প্রধান মসজিদটির নির্মাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। আহমদ শাহ্‌ দুরানীর পুত্র তৈমুর শাহ্‌ (১৭৭৩-৯৩ খ্রী) পেশোয়ারকে শীতকালের রাজধানী করিয়া এখানে অতি সুন্দর সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদ (বালা হিসার) নির্মাণ করেন এবং মনোরম উদ্যানাদির সৃষ্টি করিয়া এই নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরেই ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রণজিত সিংহের অধীন শিখেরা পেশোয়ার লুণ্ঠন করিয়া দুরানীদের সমস্ত কীর্তিই অবলুপ্ত করেন। রাজপ্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়; উদ্যানগুলিও রেহাই পায় নাই। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রণজিত সিংহের সেনাপতি হরিসিং-এর নেতৃত্বে শিখেরা পেশোয়ার অধিকার করেন।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগেই শিখ ও আফগানদের দ্বন্দ্বের অবসান করিয়া পেশোয়ার উপত্যকা ইংরেজরা স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাঞ্জাব হইতে পৃথক হইলে জেলার সদর পেশোয়ার সীমান্ত প্রদেশের প্রধান শহরে পরিণত হয়।

দ্র A. Cunningham, *Archaeological Survey of India Report*, vol. II, Simla, 1871; *Gazetteer of the Peshawar District*, 1897-98, Lahore, 1898; Annual Report, *Arechaeological Survey of India*. 1908-09, 1910-11, Calcutta, 1912, 1914; Olaf Caroe, *The Pathans*, London, 1958.

দেবলা মিত্র

পৈশাচী একটি 'প্রাকৃত' অর্থাৎ মধ্যকালীন ভারতীয় আর্যভাষা। কোথায় এই ভাষা প্রচলিত ছিল তাহা লইয়া পণ্ডিতসমাজে মতদ্বৈধ আছে। একমতে ইহা ছিল মধ্য ভারতের বিন্ধ্যগিরি অঞ্চলের ভাষা, অন্যমতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার অঞ্চলের; আসলে পৈশাচী একটি 'সাহিত্যিক' ভাষা। হেমচন্দ্র তাঁহার ব্যাকরণে পৈশাচীর যেসব লক্ষণ দিয়াছেন তাহার অধিকাংশই পালির সঙ্গে মেলে। মনে হয়, যে ভাষা বৌদ্ধদের হাতে পালিরূপ ধরিয়াছে তাহারই ব্রাহ্মণ্যরূপ পৈশাচী। পৈশাচীর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সংস্কৃতের ঘোষবৎ স্পর্শবর্ণগুলি ইহাতে অঘোষ হইয়া যায় যেমন; গজ>কচ, রাজা>রাচা, মদন>মতন ইত্যাদি। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে পৈশাচী ভাষায় একটি বৃহৎ গল্প-সংকলন হইয়াছিল। উহার সংকলয়িতা গুণাঢ্য। মূল গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে কাহিনীগুলি একাধিক সংস্কৃত অনুবাদে রহিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রসিদ্ধতম 'কথাসরিৎসাগর'।

সুকুমার সেন

পো, এড্‌গার অ্যালেন (১৮০৯-৪৯ খ্রী) মার্কিন দেশীয় ছোটগল্পলেখক, কবি ও সমালোচক। আমেরিকার বস্টন শহরের মঞ্চ-অভিনেতা ও অভিনেত্রীর একমাত্র সন্তান। পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত ও দুই বৎসর বয়সে মাতৃহীন হইয়া তিনি জন অ্যালেন নামক এক ব্যবসায়ীর তত্ত্বাবধানে পালিত হন। ভর্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এক বৎসর অধ্যয়ন করেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে একজন বস্টনবাসী এই ছদ্মনামে Tamerlane and other Poems নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। Ms. Found in a Battle নামক ছোটগল্প লিখিয়া তিনি সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার রচনাপ্রকাশের প্রধান আশ্রয় ছিল তৎকালীন সাময়িক পত্রিকা। তিনি Southern Literary Messenger এবং Graham's Magazine পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার গল্পসংকলন *Tales of the Grotesque and the Arabesque* (দুই খণ্ডে), ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে *The Gold Bug* নামক ছোটগল্প, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে *The Raven* নামক কবিতা প্রকাশিত হইলে তিনি প্রভূত জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার স্ত্রী ভার্জিনিয়া ক্লেমের দীর্ঘ অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে তাঁহার জীবনের শেষ কয় বৎসর ছিল দারুণ দুঃখময়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রহস্যজনকভাবে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কবি হিসাবে তাঁহার অবদান অনবদ্য; তাঁহার *To Helen, The Raven, Annabel Lee, Lenore, Ulabume* কাব্যকৃতিগুলি রোমান্টিক প্রতীকধর্মী, অপূর্ব বাক্‌প্রতিভা ও শব্দশৃঙ্খলার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁহার কাব্যে শব্দের অর্থ-ব্যঞ্জনা ও ভাবদ্যোতনা বিস্ময়কর।

কাহিনীকার হিসাবে Gothic novel-এর রীতি অনুসরণ করিয়া তিনিই প্রথম ভীতি-উদ্দীপক গল্পের জন্ম দেন। তিনি ছিলেন ডিটেক্‌টিভ গল্পেরও জনক। তাঁহার *The Pit and the Pendulum, Berenice, Liglia, The Fall of the House of Usher, The Cask of Amontillado, The Murders in the Rue Morgue, Purloined Letter* প্রভৃতি বহু গল্প বিশ্ববিখ্যাত। The Unparalleled Adventure of one Hans Pfaak নামক গল্প লিখিয়া তিনি আধুনিক Science fiction-এর প্রবর্তন করেন।

আধুনিক যুগের লেখকগোষ্ঠীর তিনি একজন সর্বপ্রধান অনুপ্রেরক। বোদলেয়ার, ভেরলেন, মালার্মে-প্রমুখ সিম্বলিস্ট কবিসম্প্রদায়, দস্তয়েভ্‌স্কি, এইচ. জি. ওয়েল্‌স, কোনান ডায়েল প্রভৃতি বহু লেখক তাঁহার নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন।

দ্র M. N. Stanard, ed., *Some Edgar Allan Poe's Letters: In the Valentine Museum*, Philadelphia, 1925; K. C. Kampbell, *The Mind of Poe*, 1932.

শিশির চট্টোপাধ্যায়

পোড়া উত্তপ্ত দ্রব্য এবং অত্যন্ত অম্ল বা ক্ষারধর্মী পদার্থের সংস্পর্শে দেহে পোড়া-ঘায়ের সৃষ্টি হয়। তীব্র যন্ত্রণা, দগ্ধ অঙ্গ হইতে ক্রমাগত লসিকা রসের (লিম্‌ফ) নিঃসরণের ফলে রক্তে জল ও অজৈব লবণের অভাব, দগ্ধ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হিস্টামিন নামক রাসায়নিক পদার্থের দেহের উপর বিষক্রিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপসর্গ। যন্ত্রণা লাঘবের জন্য অবসাদক ঔষধপ্রয়োগ, রক্তের জলীয় অংশ ও অজৈব লবণের অভাব দূরীকরণ এবং দগ্ধ অঙ্গের উপর দেহের সুস্থ অংশ হইতে সংগৃহীত ত্বক অধিরোপণ (স্কিন গ্রাফ্‌টিং) চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

অশোক বাগচী

পোতাশ্রয় কথাটির শব্দগত অর্থ করিলে দাঁড়ায় পোত বা জাহাজ প্রভৃতির আশ্রয় স্থল। পোতাশ্রয় সাধারণতঃ সমুদ্রবন্দরের সংলগ্ন থাকে। পোতাশ্রয়ে বিভিন্ন জলযান

তৈয়ারি করা ও মেরামত করা হয়। পোতাশ্রয় সমুদ্র-তরঙ্গের হাত হইতে ও ঝড়-ঝাপ্টা হইতে আশ্রিত জাহাজগুলিকে রক্ষা করে। বন্দর গঠনের জন্য উপকূলের নিকটবর্তী সাগরের জল গভীর হওয়া প্রয়োজন। পোতাশ্রয় নির্মাণ করিতে হইলে সেইস্থানে জাহাজ নোঙ্গর করিবার উপযুক্ত ভূমি থাকা আবশ্যক। যে সকল পোতাশ্রয়নির্মাণে কোনওরূপ যন্ত্রবিদ্যার সাহায্য লইবার প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ যে সকল স্থান প্রাকৃতিক কারণেই পোতাশ্রয় হইবার উপযুক্ত, উহাদিগকে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বলা হইয়া থাকে। প্রাচীন পোতাশ্রয়গুলির অধিকাংশই প্রাকৃতিক। সাধারণতঃ সমুদ্রের ভগ্ন তটরেখায় ও নদীমোহনায় স্বাভাবিক পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠিতে পারে। ভাল স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের প্রবেশপথ সংকীর্ণ অথচ সুগভীর হয় এবং উহার অভ্যন্তরভাগে সুবিস্তৃত এবং গভীর জলরাশি থাকে।

যে সকল পোতাশ্রয় নির্মাণের জন্য যন্ত্রবিদ্যার সাহায্য লইতে হয়, উহাদিগকে কৃত্রিম পোতাশ্রয় বলা যাইতে পারে। পোতাশ্রয়গুলিতে যাতায়াতকারী জাহাজের আকার বড় হইলে এবং উহাদের ওজন বেশি হইলে উহাদের ভাসিবার জন্য জলের যে গভীরতা প্রয়োজন হয়, স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ে সাধারণতঃ সেই গভীরতা থাকে না। তাই যন্ত্রবিদ্যার সাহায্য লইয়া নানারূপ নির্মাণ-কার্য এবং উন্নতিসাধন করিতে হয়। যে সকল স্থানে প্রকৃতিপ্রদত্ত অনুকূল পরিবেশ একেবারেই নাই সে সকল স্থানেও যন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে কৃত্রিম পোতাশ্রয় গঠন করা হইয়া থাকে।

যে সকল স্থানে জাহাজ প্রভৃতিকে সমুদ্র তরঙ্গ হইতে রক্ষা করিবার স্বাভাবিক প্রতিরোধক নাই, সে সকল স্থানে কৃত্রিম ঊর্মিরোধক বাঁধ নির্মাণ করিতে হয়। তরঙ্গপ্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ করিবার সময়ে নানা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়; যথা, সমুদ্রের কোন দিক হইতে সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন তরঙ্গ আসিতেছে, সমুদ্র-যান পোতাশ্রয়ে আসিবার কালে সমুদ্রের রক্ষিত জল-ভাগে যাহাতে প্রবল তরঙ্গের সৃষ্টি না হয়, পোতাশ্রয়ের প্রবেশমুখ যাহাতে যথেষ্ট প্রশস্ত হয়, জাহাজ-যাতায়াতের সময়ে প্রতিরোধকটির সন্নিকটে যাহাতে ঘূর্ণির সৃষ্টি না হয়, তরঙ্গমালা যাহাতে তির্যকভাবে প্রতিরোধক বাঁধের পৃষ্ঠে প্রতিহত হইয়া প্রবেশমুখের বিপরীত দিকে ফিরিয়া যায় ইত্যাদি।

বোম্বাই ভারতের একটি স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। বোম্বাই বন্দরটি আরব সাগরের উপর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের আশ্রয়ে অবস্থিত। এই দ্বীপটি ভারত-ভূমণ্ডলের খুব কাছাকাছি। এই দ্বীপের অন্তরালে অবস্থিত জলভাগই বোম্বাই নগরীর স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। এই স্থানের জলভাগ খুব গভীর এবং নিস্তরঙ্গ। স্থানটি দ্বীপের অন্তরালে অবস্থিত বলিয়া ঝড়-ঝাপটার ভয়ও কম। তাহা ছাড়া বোম্বাই বন্দরের নিকট বিপজ্জনক মগ্ন চড়াও নাই। ভাল পোতাশ্রয় হইতে গেলে যে সকল প্রাকৃতিক আনুকূল্য প্রয়োজন বোম্বাই-এ তাহার প্রায় সব কয়টিই বিদ্যমান।

মাদ্রাজ ভারতের একটি কৃত্রিম পোতাশ্রয়। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য পোতাশ্রয় হিসাবে নিউইয়র্ক, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, সিডনি ও রায়ো ডি জেনিরো প্রভৃতির নাম করা যায়।

অজয়কুমার চক্রবর্তী

পোপ রোম নগরের ধর্মপাল (বিশপ) সাধারণতঃ পোপ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। পোপ শব্দটির অর্থ পিতা; লাতিন ভাষার পাপা (পিতা) শব্দ হইতে এই শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। পোপকে 'হোলি ফাদার' (পুণ্যশীল পিতা)-আখ্যাও প্রদত্ত হয়।

ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মতে পোপ প্রভু খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি এবং সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলীর (চার্চের) সর্বপ্রধান ধর্মাধ্যক্ষ। খ্রীষ্টশিষ্যদের মধ্যে পিতর (Peter) স্বয়ং খ্রীষ্টের নিকট হইতে যে বিশেষ নেতৃত্ব ও দায়িত্বের ভার পাইয়াছিলেন, রোমের ধর্মপাল পিতরের উত্তরাধিকারী বলিয়া সেই নেতৃত্ব ও দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পিতর জাতিতে ইহুদী ছিলেন, যীশুর শিষ্যদলের অন্যতম একজন। যীশুর স্বর্গারোহণের পরে পিতর খ্রীষ্টবিশ্বাসী ভক্তমণ্ডলীর প্রধান নেতা হইয়াছিলেন। জেরুসালেম ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে খ্রীষ্টের পরিত্রাণবাণী প্রচার করার পর তিনি আন্তিয়োখে এবং পরবর্তী কালে রোমেই তাঁহার প্রচারকার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। অনুমান ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোমে ক্রুশার্পিত হইয়া নিজ রক্তদানে খ্রীষ্টসাক্ষী হইলেন। সেই সময় হইতে রোমের বিশপ খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রধান গুরুরূপে অধিকাংশ খ্রীষ্টানের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন। পিতরের সঙ্গে যে শিষ্যেরা খ্রীষ্টের প্রথম অনুগামী ও সহকারী হইয়াছিলেন, সেই প্রেরিত শিষ্যেরা (অ্যাপসল্‌স্)-ও পিতরের ন্যায় নানাদেশে খ্রীষ্টবাণী প্রচার করিয়া ঐ সব দেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারী হইলেন অন্যান্য স্থানীয় মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ধর্মপালগণ। পোপকে ও ধর্মপালদের লইয়াই প্রেরিত পালক-সংসদ

'অ্যাপস্টলিক কলেজ' গঠিত; এই সংসদের মধ্যে পোপের প্রাধান্য আছে। স্থানীয় মণ্ডলীসমূহের ধর্মপালগণ পোপের অনুমোদনেই তাঁহাদের কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বিশপদের মধ্যে কয়েকজন পোপের বিশেষ সহযোগী পরামর্শদাতা বা অমাত্যরূপে বিশ্বমণ্ডলীর পরিচালনাকার্যে তাঁহাকে সহায়তা করেন, তাঁহাদের কার্ডিনাল নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে কমবেশি ১৩০জন কার্ডিনাল এবং ২৫০০ জন বিশপ আছেন; প্রতিটি দেশ ও জাতির মধ্য হইতে কার্ডিনাল-পরিষদ সংগৃহীত হয়। একজন পোপের মৃত্যু হইলে সকল কার্ডিনাল সম্মিলিত হইয়া এক নূতন পোপকে নির্বাচিত করেন। যে কোনও দেশ বা জাতির মানুষ পোপ হইতে পারেন। সাধারণতঃ একজন ধর্মপাল (বিশপ) পোপরূপে নির্বাচিত হন।

মধ্যযুগে যখন পাশ্চাত্য জগতের দেশে দেশে সামন্ততন্ত্র প্রবর্তিত হয়, তখন রোমের ধর্মপাল ও সমগ্র খ্রীষ্টীয় জগতের ধর্মগুরু পোপের স্বাধীনতা ও জাতিনিরপেক্ষতা রক্ষা করিবার জন্যই পোপকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের কর্তা হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রের নাম বর্তমানে 'ভ্যাটিকান সিটি'; তাহার মধ্যে আছে একটি বৃহৎ গির্জা, পোপের বাসগৃহ আর কতকগুলি কার্যালয় ও উদ্যান; এই ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র কিন্তু সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। যিনি পোপপদে নিযুক্ত হন, তিনি আর কোনও রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া থাকিতে পারেন না, কোনও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীনতা স্বীকার করেন না।

পোপের প্রধান কর্তব্য জগতের সকল স্থানীয় বিশ্বাসী-মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্যবন্ধন ও পারস্পরিক যোগাযোগ সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করা। তিনি যেন বিশ্বমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ কেন্দ্রস্থল। খ্রীষ্টবাণী ও খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের যথার্থতা এবং ধর্মতত্ত্ব ও নীতির প্রামাণিক শিক্ষাপরম্পরার অভ্রান্ততা রক্ষা করা পোপেরই বিশেষ দায়িত্ব।

গত দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাসে অনেক পোপ তাঁহাদের ব্যক্তিগত সাধনা এবং বিশ্বজনীন মণ্ডলীর পরিচালনার সাফল্যের জন্য যথোচিত খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া গিয়াছেন। নানা সময়ে কিন্তু কয়েকজন অনুপযুক্ত বা অযোগ্য ব্যক্তি পোপপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন খ্রীষ্টবিশ্বাসী জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ ও অস্থিরতা দেখা দিয়াছিল। তথাপি মোটের উপর এই কথা বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ পোপ তাঁহাদের গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কার্যের উপযুক্ত হইয়াছেন।

বর্তমান শতাব্দীতে যাহারা পোপ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই খ্রীষ্টধর্মের উৎকৃষ্ট উপদেশক। তাঁহারা সকল খ্রীষ্টানের মধ্যে একতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এবং জগতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে উদার ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগ প্রবর্তনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন।

পিয়ের ফালোঁ

পোয়ঁ্যাকারে, ঝ্যুল আঁরি (১৮৫৪-১৯১২ খ্রী) আধুনিক গণিতের অন্যতম পথিকৃৎ। প্রায় চির-অসুস্থ এই ফরাসী গণিতজ্ঞের অবদান গণিতের প্রায় সব শাখাকেই সমৃদ্ধ করিয়াছে। উচ্চ বীজগণিতের 'গ্রুপ'-তত্ত্বে তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য। গণিতের ভিত্তি ও অন্যান্য বিজ্ঞানের কাঠামো সম্বন্ধে তাঁহার বহু আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যাতত্ত্বে, আধুনিক বিশ্লেষণতত্ত্বে, 'মড্যুলার ফাংশন্স'-এ সসীম অন্তরতত্ত্বে, (ফাইনাইট ডিফারেন্স), আন্তরিক ও সমাকলনিক সমীকরণ (ডিফারেন্শিয়াল অ্যান্ড ইন্‌টিগ্র্যাল ইকুয়েশন) প্রভৃতি গণিতের বিভিন্ন শাখায় তাঁহার প্রভূত মৌলিক অবদান আছে। তাঁহাকে বর্তমানে 'টপলজি'র জনক বলা যায়। তাঁহার 'Analysis Situs' (১৮৯৫ খ্রী) এ-বিষয়ে প্রথম নিবন্ধ। গুণনির্ভর (কোয়ালিটেটিভ) গতিবিদ্যার উৎপত্তি তাঁহার রচনায় লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার 'Les Methods Nouvelles da la Mecanique Celeste' গণিতের একটি ক্লাসিক। পদার্থবিদ্যার নানা শাখায়ও তাঁহার দান অবিস্মরণীয়। তিনি তৎকালীন সাহিত্যিক-দের মধ্যেও সুপরিচিত ছিলেন। ফরাসী বিজ্ঞান-পরিষদের ও ফরাসী সাহিত্য-পরিষদের তিনি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

মহাদেব দত্ত

পোর্ট ব্লেয়ার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ও পোতাশ্রয়। দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে পোর্ট ব্লেয়ার শহর অবস্থিত। আয়তন প্রায় ৮ বর্গকিলোমিটার।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্চিবল্ড ব্লেয়ারের তত্ত্বাবধানে জল-দস্যুদের উৎপাত দমনের জন্য আন্দামান দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে একটি ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। তাঁহার নামানুসারেই এই স্থান পোর্ট ব্লেয়ার নামে অভিহিত। এই অঞ্চল কিছুকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বহু বন্দী আনিয়া ভারত সরকার এইখানে একটি বন্দীপল্লী বা দণ্ডনিবেশ স্থাপন

করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রতীরে বিখ্যাত সেলুলার জেল স্থাপিত হয়। কর্নেল ফেরারের শাসনকালে (১৯২৩-৩১ খ্রী) এই উপনিবেশের যথেষ্ট উন্নতি হয়। দণ্ডনিবেশের পরিবর্তে সাধারণ উপনিবেশের সুযোগ-সুবিধা ক্রমে ক্রমে দেওয়া হয়। স্থানীয় বন্দীদের গৃহ, জমি ও চাষ-আবাদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইল। দেশপ্রত্যাগত বন্দীরা অনেকেই নিজেদের স্ত্রী ও পরিবার লইয়া আসিল এবং যাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল না তাহাদের অনেকেই স্ত্রী-বন্দীদের বিবাহ করিল। সুতরাং পোর্ট ব্লেয়ার শহরের উন্নতির সূচনা এই সময়ে হইতেই হয়। ভারত স্বাধীন হইবার পর দণ্ডনিবেশটি উঠিয়া যায়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এখানে পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন শুরু হয়।

পোর্ট ব্লেয়ার শহরটি একটি উপদ্বীপ-আকারের। আন্দামান সাগর ইহার উত্তর ও পশ্চিমে প্রবেশ করিয়াছে। পোর্ট ব্লেয়ারের উত্তর ও দক্ষিণে কয়েকটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। শহর অসমতল ও অনুচ্চ। পোর্ট ব্লেয়ারের দক্ষিণে অবস্থিত সর্বোচ্চ পর্বত মাউণ্ট হেরিয়েট (উচ্চতা ৪৫৭ মিটার)। শহরে বাসস্থান কাঠের তৈয়ারি এবং বসতি-অঞ্চল স্থানে স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তর দিকে চাথাম দ্বীপ কাষ্ঠসেতুর দ্বারা পোর্ট ব্লেয়ার শহরের সহিত যুক্ত। পোর্ট ব্লেয়ারের শহরতলীর প্রধান ব্যবসায় ও বাসস্থান অঞ্চলের নাম অ্যাবার্ডিন। মধ্যস্থলে ক্লক-টাওয়ার-এর সন্নিকটে শহরের প্রধান বাজার অবস্থিত।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী পোর্ট ব্লেয়ারের জনসংখ্যা ১৪০৭৫; তন্মধ্যে ৮৯৪৬ জন পুরুষ ও ৫১২৯ জন স্ত্রী।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের যাবতীয় দ্রব্যাদি কলিকাতা ও মাদ্রাজ হইতে আমদানি হয়। কৃষিজ দ্রব্য প্রধানতঃ ধান, রবার ও নারিকেল; কফিও উৎপন্ন হয়। শাক-সবজি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সামুদ্রিক মৎস্যও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চাথামে অবস্থিত শিল্প-কারখানার মধ্যে করাতকল, উইম্কো দিয়াশলাই-কারখানা, পোতমেরামতের কারখানা ও কতিপয় কাঠের কারখানা উল্লেখযোগ্য।

অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ শহরটিকে ভ্রমণকারীদের পক্ষে মনোরম করিয়াছে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপ্যাল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ছেলেদের একটি এবং মেয়েদের একটি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষালয় আছে। ('আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ' দ্র)।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XX, Oxford, 1908.

প্রভাতকুমার সেন

পোলিও রোগ, পোলিওমাইলাইটিস সুষুম্না-কাণ্ডের ধূসরবর্ণ অংশের প্রদাহজনিত রোগ। ভাইরাস-এর সংক্রমণে উক্ত রোগের সৃষ্টি হয়। পোলিও রোগের ভাইরাস খাদ্য বা পানীয়ের মাধ্যমে দেহে সংক্রামিত হয় এবং রোগীর মলের সহিত নিষ্ক্রান্ত হয়। প্রধানতঃ শৈশবকালীন রোগ হইলেও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও কখনও কখনও এ রোগ দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট পরিণত বয়সে পোলিও রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় শরীরের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায় এবং হঠাৎ রোগী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া যায়। ক্রমে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের পেশীগুলি অপুষ্টির ফলে শুকাইয়া যায়, কিন্তু কখনও ক্লিষ্ট অঙ্গের স্পর্শচেতনার হানি হয় না। মার্কিন বিজ্ঞানী শাল্‌ক এই রোগের প্রতিষেধক টিকা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন; এই টিকা সূচিকার সাহায্যে শিশুর দেহে প্রয়োগ করিলে চিরস্থায়ী প্রতিষেধক ক্ষমতা সৃষ্ট হয়। পরবর্তী কালে বিজ্ঞানী সাবিন সেবনযোগ্য টিকা আবিষ্কার করিয়াছেন।

অশোক বাগচী

পোলো ক্রীড়াবিশেষ। জনৈক ঘোড়সওয়ার একটি সিকে বা ছড়ির সাহায্যে বল খেলিতেছেন—ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত অতি পুরাতন এই তৈলচিত্রটি দেখিয়া ঐতিহাসিক এফ. হার্বার্ট বলিয়াছেন যে, চিত্রটি প্রাচীন পারস্যের চৌখান খেলারই দৃশ্যপট। খ্রীষ্টপূর্ব বহুশতাব্দী আগে পারস্যে চৌখান খেলার প্রচলন ছিল।

পরবর্তী কালে পারস্য ও চীনের মধ্যে ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপিত হইলে চৌখান খেলা চীন দেশেও প্রচলিত হয়। প্রাচীন চৌখান খেলাই একালে পোলো নামে অভিহিত। নামটির উৎপত্তি তিব্বতী শব্দ পুলু হইতে। কালে লোকমুখে পুলু পোলোতে রূপান্তরিত হয়।

ভারতে ১৩শ শতকে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক পোলো খেলার সময়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। সম্রাট আকবরও পোলোর অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে একদল মণিপুরী কাছাড়ে আসিয়া পোলো খেলার কৌশল প্রদর্শন করার পর কাছাড়ের চা-

বাগানের ইংরেজ মালিকেরা এই খেলাসম্পর্কে আগ্রহী হইয়া ওঠেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শিলচর পোলো-ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই ক্লাবই বিশ্বের প্রথম পোলো-সংস্থা। তাহার পর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা পোলো-ক্লাব।

ব্রিটিশ সেনানীরা স্বদেশে ফিরিয়া ইংল্যাণ্ডে এই খেলাটির প্রচলন ঘটান। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের হার্লিংহাম ক্লাবের উৎসাহ ও সক্রিয়তায় খেলাটি অচিরে জনপ্রিয় হইয়া ওঠে এবং হার্লিংহাম ক্লাবের চেষ্টাতেই খেলার নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়। কালক্রমে পোলো ইংল্যাণ্ড হইতে ফ্রান্স, স্পেন, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে। যোধপুরাধিপতি মহারাজ প্রতাপ সিংহের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে পোলো খেলার পুনরুজ্জীবন ঘটে। তিনি নিজেও ছিলেন একজন সুদক্ষ খেলোয়াড়। তাঁহাকে ভারতীয় পোলোর জনক বলা হয়। ভারতীয়দের মধ্যে আভে সিং, পৃথ্বি সিং, রত্নামের মহারাজা, রাও রাজা হনুত সিং, জয়পুরের বর্তমান মহারাজা প্রমুখেরা পোলোতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কয়েকটি-পেলো-প্রতিযোগিতা হয়। তন্মধ্যে 'কাপ ভিত্তর' প্রতিযোগিতাই সর্বশ্রেষ্ঠ। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের দোভিল (Deauville) শহরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ভারত শীর্ষস্থান পাইয়াছিল। বিশ্ব-ওলিম্পিক ক্রীড়াসূচীতেও এক সময়ে পোলো-প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯০৮ ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট-ব্রিটেন এবং ১৯২৪ ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আর্জেন্টিনা ওলিম্পিক পোলো-প্রতিযোগিতা জয় করিয়াছিল।

দ্র E. D. Millen, *Modern Polo*, London, 1929.

অজয় বসু

পোলো, মার্কো (১২৫৪-১৩২৪ খ্রী) মধ্যযুগের পরিব্রাজক। ভিনিস নগরে এক সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী সদাগর পরিবারে জন্ম। পিতা নিকোলো ও পিতৃব্য (Maffeo) বাণিজ্য ব্যপদেশে চীনদেশে গিয়াছিলেন। পিকিনে এক বৎসর অবস্থানের পর পোপের নিকটে কুবলাই খানের বিশেষ বার্তা-সহ ভিনিসে ফিরিয়া আসেন (১২৬৯ খ্রী)। ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে নিকোলো মাফু ও মার্কোকে সঙ্গে করিয়া আবার চীন অভিমুখে স্থলপথে রওয়ানা হইলেন। শাংটুতে চীনসম্রাট কুবলাই খান তাঁহাদের সমাদর করিয়া গ্রহণ করেন (১২৭৫ খ্রী)।

মার্কো পোলো বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ও লোকচরিত্রজ্ঞ ছিলেন; তদুপরি ভাষাশিক্ষাতেও পটু ছিলেন। তাই তিনি কুবলাই খানের বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রজাদের ভাষা সহজেই আয়ত্ত করিয়া শীঘ্রই সম্রাটের আস্থাভাজন হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি ইয়াংচাউ (Yangchow) প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজকার্যব্যপদেশে এবং সম্রাটের বিশেষ দূত হিসাবে তিনি চীনের বহু স্থানে এবং বহির্চীনে পরিভ্রমণ করেন।

বহু সম্মান ও সম্পদের মালিক হইয়া পোলো-পরিবার ১৭ বৎসর চীনে কাটানোর পর স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি চাহিলে সম্রাট সম্মতি দিলেন না। অবশেষে পারস্য দেশের ভাইসরয়ের ভাবী বধূরূপে একজন মোঙ্গল রাজকুমারীকে সমুদ্রপথে পাঠানো হইলে অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক হিসাবে মার্কো পিতা ও পিতৃব্যের সাথে কন্যাযাত্রীদলের সঙ্গে পারস্য অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। কুবলাই খান ইওরোপের রাজন্যবর্গ এবং পোপের নিকটে তাঁহাদের মারফতে চিঠি দিলেন। দুই বৎসর পরে সুমাত্রা ও দক্ষিণ ভারত হইয়া তাঁহারা পারস্যে উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারীকে যথাস্থানে অর্পণ করিয়া ৯ মাস পরে তাঁহারা ভিনিসে প্রত্যাবর্তন করিলেন (১২৯৫ খ্রী)।

এক বৎসর পরে জেনোয়া ও ভিনিসের বিবদমান বণিকদের এক নৌ-সংঘর্ষে তিনি বন্দী হন (১২৯৮ খ্রী)। বন্দী-অবস্থায় তিনি তাঁহার ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করাইতে স্থির করিলেন। জেনোয়ার কারাগারে রাস্টিচিয়ানো (Rusticiano) একজন সাহিত্যরসিক বন্দী ছিলেন। পোলো তাঁহার কাছে তাঁহার ভ্রমণকাহিনী স্মৃতি হইতে বলিয়া যাইতেন আর রাস্টিচিয়ানো লিখিয়া রাখিতেন। এইভাবে সর্বপ্রথম তাঁহার তথ্যপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী লিখিত হয় ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট অঞ্চল তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেখানকার সমকালীন চিত্র তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায়। এত তথ্যপূর্ণ বিবরণ তাঁহার পূর্বে আর কোনও ইওরোপীয় পরিব্রাজকের ডায়েরিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, নৈসর্গিক বিবরণ ও রাজসভার কথা বিস্তৃতভাবে রহিয়াছে।

সমকালীন বাংলা দেশ, ব্রহ্ম দেশ, সিংহল ও দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে অনেক তথ্য তাঁহার বিবরণীতে আছে। তাঁহার ভ্রমণকাহিনী দেশবিদেশের বহু ভাষাতে অনূদিত হইয়াছে।

দ্র H. Yule, *Book of Marco Polo*, H. Cordier, ed., Vol. II, London, 1903 ; K. A. Nilkantha Sastri, *Foreign Notices of South India*, Madras, 1939 ; H. Cordier, *Ser Marco Polo*, New York, 1920 ; L. F. Benedetto, *Travels of Marco Polo*, A. Ricci, tr, 1950.

শিবদাস চৌধুরী

পোশাক পরিচ্ছদ আত্মরক্ষা, লজ্জা নিবারণের ইচ্ছা ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির প্রয়াস হইল পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহারের অন্যতম কারণ। কোথাও কোথাও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে পোশাক পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া বা জলবায়ুর তারতম্য, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানবগোষ্ঠীর পারস্পরিক সংশ্লেষ ও মিলন বহু ক্ষেত্রে পোশাক পরিচ্ছদ বা অঙ্গসজ্জার তারতম্য আনিয়াছে।

প্রস্তরযুগের মানুষ জীবজন্তু শিকার করিয়া তাহার লোমময় চর্মকে পোশাক বা অঙ্গাচ্ছাদনরূপে ব্যবহার করিত। অস্থিনির্মিত সীবনযন্ত্রে তাহা গ্রথিত হইত। সেইজন্য অনেকের অনুমান, মানুষ প্রথমে প্রাণীচর্ম ও পরে তৃণ বৃক্ষাদির পল্লব বা বল্কল এবং কার্পাস বা অন্যান্য তন্তুকে পরিধেয়ের প্রধান উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে।

আমাদের দেশের মানবগোষ্ঠীর পোশাক পরিচ্ছদ লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, পুরুষের প্রধান পরিধেয় সেলাই না-করা বস্ত্রখণ্ড বা ধুতি বা কোথাও সেলাই-করা পরিধেয় প্যাণ্ট পায়জামা ইত্যাদি। অঞ্চলভেদে ধুতির তারতম্য দেখা যায়। কোঁচা-সহ কাছা দিয়া ধুতি পরিলে প্রায় ৯-১০ হাত কাপড় লাগে আর কাছা না দিলে ৪-৫ হাত লম্বা লুঙ্গিজাতীয় বস্ত্রখণ্ড লাগে। মাদ্রাজ বা কেরল রাজ্যে 'বৌষ্টি' বা 'ভেট্টি' পাঞ্জাবের কোনও কোনও অঞ্চলে 'টম্বা' এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ছোটনাগপুরের ওঁরাও উপজাতি, বস্তার জেলার গোণ্ড বা রাজপুতানার ভীলদের অনেকে স্বল্প-পরিসর লম্বা বস্ত্রখণ্ডকে কোমরে ঘুনসির দ্বারা আটকাইয়া রাখে। বিভিন্ন রকমের প্যাণ্ট বাদ দিলে প্রায় তিন রকমের পায়জামা দেখা যায়। খুব আলগা বা ঢিলে পায়জামা, চুড়িদার বা আঁট-পায়জামা আর পায়ের কাছে পাড়ের মত সালোয়ার পায়জামা। সাধু-সন্ন্যাসীরা কৌপিন বা গৈরিক আলখাল্লা ব্যবহার করেন।

ঊর্ধ্বাঙ্গের আচ্ছাদন হিসাবে সার্ট জামা অথবা গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় পোশাক এখন প্রচলিত আছে। জামার ভিতরে গেঞ্জি বাদ দিলে আধ-হাতা কলার-ছাড়া বেনিয়ান, জার্সি বা জ্যাকিট উল্লেখযোগ্য। কোথাও কোথাও জামার উপরে চাদর বা 'অঙ্গবস্ত্রম' ব্যবহৃত হয়; ইহা জম্মু, কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশে 'পক্ক', 'ফেরান', 'চলা', 'চড়া' ইত্যাদি ভিন্ন নামে পরিচিত। বাংলা দেশে উত্তরীয় ব্যবহৃত হয়; বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণদের অনেকে নগ্ন দেহে নামাবলী গাত্রাবাস হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে অনেক জায়গায় পুরুষেরা পাগড়ী টুপি বা নানা রকমের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আসাম অঞ্চলের উপজাতিগোষ্ঠীর অনেকে বাঁশের বা বেতের টুপিতে রঙিন পাখির পালক, জীবজন্তুর লোম, নখ ও দাঁত আটকাইয়া লয়। মধ্য প্রদেশ, পূর্ব ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র ও মহীশূরে শিরস্ত্রাণ অত্যন্ত জনপ্রিয়। উত্তর ভারত ও বিহার অঞ্চলে টুপির নানা ধরন দেখা যায়। নেপালী, ভুটিয়া, লেপ্‌চারা পশমী বা সুতীর টুপি ব্যবহার করে। মুসলমানদের অনেকে টুপি বা ফেজ মাথায় নেয়। কৃষকবালকেরা কোথাও কোথাও হোগলা বা তালপাতার টুপি মাথায় দিয়া রোদ আটকায়।

স্ত্রীলোক বা মহিলার পোশাকে আঞ্চলিকতার প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়। মহিলার পোশাক সাধারণতঃ সেলাইকরা পায়জামা বা সালোয়ার, ঘাগরা, লহঙ্গা, কাঁচুলি, ব্লাউজ এবং লম্বা এক খণ্ড বা দুই খণ্ড বস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাশ্মীর, জম্মু ও হিমাচল প্রদেশে কামিজ কুর্তা হইল লম্বা হাতাওয়ালা ব্লাউজ। কাশ্মীরের হিন্দু মহিলারা ঢিলে কামিজ বা ফেরন পরেন। মেয়েদের অনেকে ঘোমটার মত ওড়না, লুগড়া, 'তরঙ্গা' কোথাও বা কালপুশ বা গুজ ব্যবহার করেন। অনেকে দোপাট্টা নামক বস্ত্রখণ্ডে মস্তক আবৃত করিয়া থাকেন। রাজস্থানে, মধ্য প্রদেশের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে ৬ হাত হইতে ২০ হাত পর্যন্ত লম্বা বস্ত্র কোমরে আটকান থাকে, তাহা ঘাগরা বা লহঙ্গা নামে পরিচিত। কোনও কোনও স্থানে ছোট ব্লাউজ অর্ধেক হাতাওয়ালা 'কাবড্যা' ব্যবহৃত হয়।

৫ গজ হইতে ১০ গজ পর্যন্ত লম্বা ৪৮ ইঞ্চি চওড়া পাড়বিশিষ্ট শাড়ি সমস্ত দেহের আবরণ হিসাবে মহিলারা কোমরে জড়াইয়া কখনও ঘোমটা হিসাবে তাহার এক প্রান্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, ওড়িশা, পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, গুজরাত ও উত্তর প্রদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে শাড়ি পরার প্রচলন আছে। শাড়ির অন্তর্বাস হিসাবে শায়া ইত্যাদি পরা হইয়া থাকে।

মহারাষ্ট্র ও মধ্য প্রদেশের কয়েকটি জেলায় বর্ণ ও সামাজিক মর্যাদানির্বিশেষে মহিলারা কাছা দিয়া শাড়ি পরিয়া থাকেন। আবার মাদ্রাজ ও মহীশূর (কুর্গ ব্যতীত) অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের কেবলমাত্র বিবাহিতা মেয়েরা কাছা দিয়া শাড়ি পরিয়া থাকেন। কেরল রাজ্যের উচ্চ বর্ণের মহিলারা কাছা দিয়া শাড়ি পরেন। মাদ্রাজে কাছা দিয়া শাড়ি পরার দুইটি ধরন আছে; একটি আয়ারপ্রথায়, অন্যটি আয়েঙ্গারপ্রথায়। কেরল রাজ্যে নাম্বুদিরি, মেনন ও নায়ারগোষ্ঠীর মহিলারা প্রথমে একখণ্ড কাপড়কে কাছা দিয়া পরে। ৫-৬ হাত লম্বা আর একখানি কাপড় দেহের উপর এমনভাবে রাখে যাহা ঐ কাছাকে ঢাকিয়া রাখে। আসামের অনেক অংশে 'মেখলা' বা 'রিহা'-র ব্যবহার আছে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ কার্পাস, তন্তু, রেশম ও পশম পোশাকের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে, সামাজিক কারণে ও পরিবেশের প্রভাবে পোশাক পরিচ্ছদের তারতম্য হয়; যেমন বাংলা দেশের হিন্দু বিধবারা থান ধুতি পরিয়া থাকেন। মহীশূরে ব্রাহ্মণ বিধবারা লাল শাড়ি পরেন। বিহারের মৈথিলী ব্রাহ্মণের কুমারীরা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত শাড়ি পরিয়া থাকেন, বিবাহের পর ঘাগরা পরার নিয়ম আছে। মহীশূর, অন্ধ্র ও মাদ্রাজ অঞ্চলে কেবলমাত্র উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাহের পর কাছা দিয়া শাড়ি পরার নিয়ম আছে। ধর্মীয় দীক্ষা, উপনয়ন, বাৎসরিক শ্রাদ্ধশান্তিতে, পুত্রকন্যার বিবাহের সময়ে অথবা পারিবারিক পূজা বা ব্রতের উদ্‌যাপনসময়ে বিশেষ বিশেষ পোশাক পরার নিয়ম আছে। নেপালের পূর্বাঞ্চলের দহল শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ভোজনের সময়ে সেলাই না-করা বস্ত্রখণ্ড পরে। অনেক পরিবারে ঐ ধরনের একটিমাত্র বস্ত্র থাকে। শীতকালে কাপড় ছাড়িবার ভয়ে তাহাদের অনেকে খাওয়া বন্ধ করে। মুসলমান মহিলারা বোরখা পরে আর নমাজের সময় পুরুষদের মাথায় টুপি দিতে হয়।

আমাদের দেশে নানা রকমের জুতা দেখিতে পাওয়া যায়। গোড়ালি দেওয়া জুতা স্যাণ্ডাল বা চটি হইল স্থানীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রবোধকুমার ভৌমিক

পোঁস্‌লে, ঝাঁ ভিক্তর (১৭৮৮-১৮৬৭ খ্রী) ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার। তিনি সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। সম্রাট নাপোলেঅঁ-র রুশ-আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিয়া ভল্‌গা নদীর ধারে সারাটোফে প্রচণ্ড শীত কাটাইতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে সম্পূর্ণ সংশ্লেষণমূলকভাবে (ইউক্লিডীয় জ্যামিতির পদ্ধতিতে) প্রক্ষেপক (প্রোজেক্টিভ) জ্যামিতির বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এগুলি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে 'ত্রেতে দে প্রোপ্রিয়েতে প্রোঝেক্তিভ্‌দে ফিগুর্' (*Traite des proprietes projectives des figures*) নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। ইনি সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতির প্রবল সমর্থক ছিলেন। এই জ্যামিতির 'নিরবচ্ছিন্নতাতত্ত্ব', 'দ্বৈততত্ত্ব' ও 'রূপান্তরতত্ত্ব' (প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অফ কন্‌টিনিউইটি, ডুয়ালিটি, ট্রান্‌স্‌ফর্‌মেশন্‌স) তাঁহার মৌলিক অবদানরূপে উল্লেখযোগ্য।

দ্র E. T. Bell, *Development of Mathematics*, New York, 1948

মহাদেব দত্ত

পৌষপার্বণ সংক্রান্তি দ্র

প্যাটেল, বল্লভভাই সর্দার (১৮৭৫-১৯৫০ খ্রী) জন্ম ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর নাদিয়াদের নিকট করমসাদের এক পাতিদার পরিবারে। নাদিয়াদ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন এবং জেলাকোর্ট ওকালতি পরীক্ষা পাস করিয়া গোধরা জেলাকোর্টে ফৌজদারি উকিল হইলেন। পরে তিনি ব্যারিস্টারি পড়িতে বিলাত যান এবং মিডল টেম্পল হইতে ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আহমেদাবাদে আইনব্যবসায় আরম্ভ করেন। গুজরাতের প্রাদেশিক রাজনৈতিক সভাতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আহমেদাবাদ কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন। ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে বরদৌলি কৃষক গণআন্দোলনের সার্থক নেতৃত্ব করিয়া তিনি কৃতজ্ঞ জাতির নিকট হইতে 'সর্দার' উপাধি লাভ করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি রাজাগোপালাচারির নেতৃত্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে ইংরেজের সাহায্যে স্বীকৃত

হন ও উক্ত কমিটিতে বল্লভভাই ও পণ্ডিত নেহরু একমত হন। পরে গান্ধীজীর সহিত 'ভারত ছাড়' (কুইট ইণ্ডিয়া) আন্দোলনে নেহরু ও প্যাটেল যোগ দেন ও জেলে যান। মুক্তিলাভের পর হইতে ক্রমে প্যাটেল ও নেহরুর মধ্যে মতবিরোধ হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে গান্ধীজী এক পত্রে প্যাটেলকে বিরোধ মিটাইতে উপদেশ দেন। গান্ধীজী মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ঐ বিরোধনিষ্পত্তির চেষ্টা করেন। স্বাধীনতার পর অধিকাংশ দেশীয় রাজাগুলিকে ভারতের অঙ্গীভূত করিয়া তিনি এক বৃহৎ কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া তিনি দিল্লী হইতে বোম্বাইয়ে আসিয়া বিরলা হাউসে অবস্থান করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

অতুলানন্দ চক্রবর্তী

প্যাটেল, বিঠলভাই (১৮৭৩-১৯৩৩ খ্রী) ইনি অধিকতর বিখ্যাত ভারতের সর্দার জনপ্রিয় বল্লভ ভাইয়ের অগ্রজ। জন্ম নাদিয়াদ, কনিষ্ঠের সাহায্যেই ইনি ব্যারিস্টারি শিক্ষার জন্য বিলাত যান। রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়া চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টিতে যোগ দেন। এই উপলক্ষ্যে বিঠলভাই রাজনীতিতে বল্লভ-ভাইয়ের বিরুদ্ধ দলে যান। গয়া কংগ্রেসে (১৯২২ খ্রী) স্বরাজপার্টি প্রতিষ্ঠার পর তিনি কেন্দ্রীয় আইন সংসদের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। অতঃপর আইন সংসদের স্পিকার বা সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অতীব স্বাধীনচেতা সভাপতি বলিয়া প্রশংসিত হন। এই সময়ে তিনি বরদৌলির কৃষক-আন্দোলনের প্রকৃত জাতীয় পরিস্থিতিসম্পর্কে বড়লাটের নিকট একটি সমীক্ষা দাখিল করেন ও গান্ধীজী তাহার প্রশংসা করেন। তিনি গান্ধীজীকে গণ-আন্দোলনের জন্য মাসিক এক হাজার টাকা দিতে থাকেন। লাহোর কংগ্রেসের (১৯২৯ খ্রী) প্রাক্কালে তিনি বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষচেষ্টা করেন, যাহার ফলে লণ্ডনে গোলটেব্‌ল সভার ব্যবস্থা হয়। শেষ বয়সে অসুস্থ হইয়া তিনি ইউরোপে অবস্থান করেন ও সেখানেই দেহত্যাগ করেন। ইউরোপে থাকাকালে সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত তাঁহার হৃদ্যতা স্থাপিত হয়।

অতুলানন্দ চক্রবর্তী

প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫ খ্রী) কলিকাতাস্থ চোরবাগানে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি প্যারীচরণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলে এবং পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। প্যারীচরণ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বারাসত গভর্নমেণ্ট স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ঐ স্থানে বালিকাবিদ্যালয় কৃষি বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনেও তিনি বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তিনি কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (পূর্বেকার হেয়ার সাহেবের স্কুল) প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসেন (১৮৫৪, ১ আগস্ট)। এই পদে থাকার সময়েই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হন (১৮৬৩ খ্রী)। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি উক্ত কলেজের স্থায়ী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের হেয়ার স্কুল নামকরণে প্যারীচরণের যথেষ্ট হাত ছিল। শিশুদের সহজে ইংরেজি শিক্ষার জন্য তিনি 'ফার্স্ট বুক অফ রীডিং' রচনা করেন। প্যারীচরণ 'বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি' বা 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর। সভার পক্ষে 'দি ওয়েল-উইশার' এবং 'হিতসাধক' পত্রিকা দুইখানি তাঁহার সম্পাদনায় বাহির হয়। 'এডুকেশন গেজেট'-ও তিনি দুই বৎসর সম্পাদনা করেন। বিধবাবিবাহের প্রচেষ্টায় তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন। কর্মকালেই তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর মারা যান।

দ্র নবকৃষ্ণ ঘোষ, প্যারীচরণ সরকার, কলিকাতা, ১৯০২

যোগেশচন্দ্র বাগল

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৮ খ্রী)। প্যারীচাঁদ ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কালিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামনারায়ণ মিত্র রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন। বাল্যকালে ফার্সীশিক্ষান্তে তিনি হিন্দু কলেজে ডিরোজিও-র নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং কৃতী ছাত্র হিসাবে পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করেন। উত্তরকালে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, দি বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, দি বীটন্ (বেথুন) সোসাইটি, পশুক্লেশনিবারণী সভা, বঙ্গীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভা প্রভৃতি দেশকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। তিনি এগ্রিকাল্‌চারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার-ও সদস্য নির্বাচিত হন। দেশীয় ও বহির্দেশীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যে কৃতী পুরুষ ছিলেন বলিয়া বহু বিলাতী সওদাগরী কোম্পানীর তিনি ডিরেক্টর নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ক্যাল্‌কাটা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকরূপেও তিনি যশস্বী হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লেফ্‌টন্যাণ্ট গভর্নর

স্যর উইলিয়ম গ্রে তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করেন।

প্যারীচাঁদ 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' পত্রিকায় কয়েকটি রচনা প্রকাশ করেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার বার্ষিক বিবরণী পুস্তকেও তাঁহার রচনা মুদ্রিত হয় (১৮৪৬-৪৯ খ্রী)। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় মহিলাদের হিতকরী 'মাসিক পত্রিকা' সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ইহা হইতেই বাংলা গদ্য ভাষার আলালী রীতি প্রচারিত হয়।

'ক্যালকাটা রিভিউ' 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড,' 'হিন্দু পেট্রিয়ট,' 'বেঙ্গলী,' 'বেঙ্গল হরকরা,' 'ইংলিশম্যান,' 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রভৃতি সংবাদপত্রেও তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ডেভিড হেয়ার, দেওয়ান রামকমল সেন, রুস্তমজী কাওয়াস্‌জী ও কোল্‌সওয়ার্দি গ্রাণ্টের জীবনীও তিনি রচনা করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৪৮ খ্রী)। টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে উপন্যাসটি রচিত হয়। পূর্বে 'বাবুর উপাখ্যান' (১৮২১ খ্রী) এবং 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩ খ্রী) প্রকাশিত হইলেও চলিত রীতির গদ্যে পূর্ণাঙ্গ সমাজ-আলেখ্য হিসাবে ইহা সেকালের শ্রেষ্ঠ রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনাটিকে বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাসের সম্মান দিয়াছেন। 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯ খ্রী) তাঁহার অপর একটি বাস্তবধর্মী নক্‌শা। 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৮ খ্রী) 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০ খ্রী), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০ খ্রী) ও 'বামাতোষিণী' (১৮৮১ খ্রী) প্যারীচাঁদের নারীকল্যাণমূলক রচনা। 'কৃষি পাঠ' (১৮৬১ খ্রী) নামে কৃষিবিষয়ক গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা।

ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্যারীচাঁদ কালক্রমে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন 'গীতাঙ্কুর' গ্রন্থের ব্রহ্মসংগীতগুলি তাহার নিদর্শন। পরে তিনি প্রেততত্ত্বের আলোচনায় আগ্রহী হন, এবং 'স্ট্রে থট্‌স অন স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম' ও 'স্পিরিচুয়াল স্ট্রে লীভ্‌স' নামক দুই-খানি গ্রন্থও রচনা করেন। তিনি বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রথম সভাপতিও হন। 'যৎকিঞ্চিৎ' ও 'অভেদী' (আধ্যাত্মিক উপন্যাস) তাঁহার থিয়সফি-চর্চার ফল। কলিকাতায় নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে তাঁহার পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিবমন্দিরের বিগ্রহের সেবাও বজায় রাখিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ শে নভেম্বর প্যারীচাঁদের মৃত্যু হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৯ কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় রাজা (১৮৪০-১৯২২ খ্রী) প্রখ্যাত ভূম্যধিকারী ও দেশনায়ক রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র।

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর (১৮৬৪ খ্রী) এবং আইন (১৮৬৫ খ্রী) পরীক্ষায় সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের মনোনীত সদস্য হন (১৮৮৪ ও ১৮৮৬ খ্রী)। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করার সময়ে তিনি প্রগাঢ় আইন জ্ঞানের পরিচয় দান করেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহারানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক 'রাজা' এবং 'সি. এস. আই.' উপাধি প্রাপ্ত হন।

তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কিছু কালের জন্য তিনি উহার কর্মসচিব ও সভাপতিও হইয়াছিলেন।

তিনি সৎকর্মানুরাগী, সুবক্তা, ধীরপ্রকৃতি, অমায়িক পুরুষ ছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, জীবনীকোষ, কলিকাতা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ; C. E. Buckland, *Dictionary of Indian Biography*, London, 1906.

অশোকা সেনগুপ্ত

প্রক্সিমা সেণ্টরাই দক্ষিণ আকাশে মেরু প্রদেশের নিকটে সেণ্টরাস তারামণ্ডল। ইহার প্রথম প্রভার আল্‌ফা একটি যুগ্মতারা, ইহারা পরস্পরের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে ৮০ বৎসর সময় লাগে। আল্‌ফা হইতে ২° দূরে একাদশ প্রভার একটি তারা আছে। ইহাই হইল সূর্যের নিকটতম তারা, এইজন্য নাম প্রক্সিমা। ইহার দূরত্ব ৪⅙ আলোকবর্ষ। এই তারাটি আল্‌ফা হইতে ২° দূরে হইলেও তিনটি তারা পরস্পরের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে চালিত হইতেছে। খালি চোখের দৃষ্টিগোচর

তারাদের মধ্যে আল্ফা সেন্টরাই আমাদের নিকটতম। ইহার দূরত্ব প্রক্সিমা অপেক্ষা কিছু বেশি।

কামিনীকুমার দে

প্রজনন জীবের বংশবৃদ্ধির পদ্ধতি। জীবনের অপরিহার্য লক্ষণগুলির মধ্যে প্রজনন অন্যতম। প্রজননের ফলে এক জীব হইতে সেই প্রজাতিরই অন্য এক বা একাধিক জীবের সৃষ্টি হয় এবং উত্তরপুরুষের দেহমনে পূর্বপুরুষের নানা গুণ ও প্রকৃতি বংশানুক্রমিকভাবে সঞ্চারিত হয়। জীবজগতে দুইপ্রকার প্রজনন দেখিতে পাওয়া যায়—যৌন ও অযৌন ('অযৌন ও যৌন জনন' দ্র)।

প্রাণিজগতে অযৌন প্রজনন প্রধানতঃ নিম্নপর্যায়ের প্রাণীদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম প্রভৃতি এককোষী প্রাণীর দ্বিভাজন (বাইনারি ফিশন) ইহারই এক দৃষ্টান্ত। দ্বিভাজন পদ্ধতিতে প্রজননের সময়ে এককোষী প্রাণীর কোষটি কোষবিভাজনের দ্বারা দুইটি কোষে পরিণত হয়, ফলে একটি এককোষী প্রাণী হইতে দুইটি অনুরূপ প্রাণীর সৃষ্টি হয়। কোনও কোনও এককোষী প্রাণীর অযৌন প্রজননকে বহু-ভাজন (মাল্‌টিপ্‌ল ফিশন) বলা হয়; প্রজননকালে এরূপ প্রাণীর কোষটি অনেক ক্ষেত্রে প্রথমে একটি বিশেষ প্রাচীরে আবৃত হইয়া যায়, তাহার মধ্যে থাকিয়া কোষটি বহু কোষে বিভক্ত হয় এবং তাহার পরে বহিঃপ্রাচীরটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বহু এককোষী প্রাণী মুক্তিলাভ করে। প্রাণিজগতে তৃতীয় প্রকার অযৌন প্রজননকে কোরকোদ্‌গম (বাডিং) বলা হয়। হাইড্রা, ওবেলিয়া প্রভৃতি একনালী প্রাণীর ক্ষেত্রে এরূপ প্রজনন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে সুপরিণত একটি প্রাণীর দেহের কোনও স্থানে কোরকের মত একটি অংশের সৃষ্টি হয়, সেই কোরক-সদৃশ অংশটি ক্রমে কিছুটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মূল প্রাণিদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং নূতন একটি প্রাণীতে পরিণত হয়।

যৌন প্রজনন পদ্ধতিতে দুইপ্রকার যৌনকোষের (গ্যামেট) মিলনের ফলে নূতন প্রাণীর সৃষ্টি হয়; সাধারণতঃ এই দুইপ্রকার যৌনকোষের মধ্যে একটিকে ডিম্বাণু (ওভাম) ও অন্যটিকে শুক্রাণু (স্পার্মাটোজোয়া) বলা হয়। কোনও কোনও প্রাণীর ক্ষেত্রে একই প্রাণিদেহে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উভয়প্রকার যৌনকোষই উৎপন্ন হয়; এরূপ প্রাণীকে উভলিঙ্গ প্রাণী বলে, যথা কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি অঙ্গুরীমাল গোষ্ঠীর (আন্নেলিদা) প্রাণী ('কেঁচো' ও 'জোঁক' দ্র)। অধিকাংশ উচ্চপর্যায়ের প্রাণী একলিঙ্গ অর্থাৎ তাহাদের স্ত্রীপুরুষভেদ বর্তমান; যে সকল প্রাণীর দেহে কেবল ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় তাহারা স্ত্রীজাতীয় এবং যাহাদের দেহে কেবল শুক্রাণু উৎপন্ন হয় তাহারা পুংজাতীয় প্রাণী বলিয়া পরিচিত। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর উৎপাদন, উহাদের মিলনের ফলে নূতন জীবনের উৎপত্তি, সন্তানধারণ প্রভৃতি যৌন প্রজনন-সম্পর্কিত কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য উচ্চপর্যায়ের প্রাণিদেহে যে সকল অঙ্গ উদ্ভূত ও বিকশিত হয়, তাহাদের সমাহারকেই প্রজননতন্ত্র বলা হয়।

প্রজননতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত যে অঙ্গটিতে যৌনকোষ উৎপন্ন হয় তাহাকে মুখ্য জননাঙ্গ বলে, যথা পুংদেহে অণ্ডকোষ ও স্ত্রীদেহে ডিম্বাশয় ('অণ্ডকোষ' ও 'ডিম্বাশয়' দ্র)। প্রজননতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য যে সকল অঙ্গ যৌনকোষ উৎপাদন করে না, কিন্তু প্রজননের জন্য আবশ্যকীয় অন্যান্য জৈবক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তাহাদের গৌণ জননাঙ্গ বলে, যথা পুংদেহে প্রস্টেট গ্রন্থি, শুক্রস্থলী (সেমিন্যাল ভেসিক্‌ল), শুক্রনালী (ভাস ডেফারেন্স), লিঙ্গ প্রভৃতি এবং স্ত্রীদেহে জরায়ু, জরায়ুনালী, স্তন, যোনি ইত্যাদি ('প্রস্টেট গ্রন্থি', 'জরায়ু' ও 'স্তন' দ্র)। মুখ্য জননাঙ্গগুলি যৌনকোষ উৎপাদন ব্যতীত যৌনহর্মোনও ক্ষরণ করে; পুংদেহে অণ্ডকোষ হইতে টেস্টোস্টেরোন নামক পুং-যৌনহর্মোন এবং স্ত্রীদেহে ডিম্বাশয় হইতে ঈস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরোন নামক স্ত্রী-যৌনহর্মোন ক্ষরিত হয়। এসকল যৌনহর্মোনের প্রভাবে যথাক্রমে পুংদেহে ও স্ত্রীদেহে গৌণ জননাঙ্গগুলি বিকশিত হইয়া ওঠে, তাহাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা অব্যাহত থাকে এবং স্বাভাবিক প্রজনন ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত যৌনহর্মোনগুলির প্রভাবে স্ত্রী-পুরুষের বিশেষ বিশেষ বাহ্য দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ লাভ করে, যথা টেস্টোস্টেরোনের প্রভাবে পুংদেহে শ্মশ্রু-গুম্ফের আবির্ভাব। পক্ষান্তরে অণ্ডকোষ ও ডিম্বাশয় এই দুই মুখ্য জননাঙ্গের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং এগুলিতে যৌন-কোষ ও যৌনহর্মোনের উৎপাদন পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখ ভাগ হইতে ক্ষরিত কতিপয় জননাঙ্গ-উদ্দীপক (গোনাডোট্রোপিক) হর্মোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ('অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি', 'ঋতু', 'গর্ভ' 'ডিম', 'দুগ্ধ', 'হর্মোন' দ্র)।

উদ্ভিদজগতে অঙ্গজ-জনন (ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাক্‌শন), অযৌন প্রজনন এবং যৌন প্রজনন দেখিতে পাওয়া যায়। মূল উদ্ভিদদেহের বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে নূতন উদ্ভিদের উৎপাদনকে অঙ্গজ-জনন বলে। অনেক শ্যাওলার দেহ ভাঙ্গিয়া প্রত্যেকটি খণ্ড একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়, ব্যাক্‌টিরিয়ার এককোষী দেহ দ্বিভাজন পদ্ধতিতে দুইটি কোষে বিভক্ত হয়, ছত্রাকজাতীয় ঈস্টের কোষদেহে

কোরকসদৃশ একটি অংশ উৎপন্ন হইয়া ও মূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন ঈস্টের জন্ম দেয়; এসকলই অঙ্গজ-জননের দৃষ্টান্ত। পাথরকুচির পাতা হইতে নূতন গাছের উৎপাদনও ইহারই অপর এক দৃষ্টান্ত ('পাথরকুচি' দ্র)।

অযৌন প্রজননের সময়ে উদ্ভিদদেহের কোনও অংশে সাধারণতঃ রেণু (স্পোর) নামক বিশেষ একপ্রকার কোষ উৎপন্ন হয় এবং এই রেণু হইতেই নূতন উদ্ভিদের উদ্ভব ঘটে। মস, ফার্ন, মিউকর প্রভৃতি অপুষ্পক উদ্ভিদের প্রজনন প্রধানতঃ এরূপ রেণুর সাহায্যেই সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে উদ্ভিদের যৌন প্রজনন পুং ও স্ত্রী যৌনকোষের মিলনের ফলেই ঘটিয়া থাকে; সপুষ্পক উদ্ভিদের ফুলের বিভিন্ন অংশে এসকল যৌনকোষ বর্তমান ('পরাগযোগ', 'ফল', ও 'ফুল' দ্র)।

জীবের যৌনকোষে ক্রোমসোমের সংখ্যা অন্যান্য দেহকোষের তুলনায় অর্ধেকমাত্র। ফলে দুইটি যৌন-কোষের মিলনে উদ্ভূত নূতন জীবের প্রথম কোষটিতেই ক্রোমসোম-সংখ্যা পুনর্বার স্বাভাবিক হইয়া যায় ('ক্রোম-সোম' ও 'জার্মপ্লাজ্‌ম' দ্র)।

প্রজাপতি সন্ধিপদ গোষ্ঠীর (ফাইলাম-আর্‌থ্রোপোদা) অন্তর্ভুক্ত পতঙ্গশ্রেণীর প্রাণী। সম্ভবতঃ ৭ কোটি বৎসর পূর্বের ইওসিন যুগে প্রজাপতির উদ্ভব হইয়াছে। সন্ধিপদ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যতীত ইহাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে ডানা দুইজোড়া ও পাতলা এবং অন্যান্য অঙ্গাংশের ন্যায় আঁশের মত রোমে আবৃত; মুখাংশ প্রায়শঃ দুর্বল ও শুঁড়ের মত এবং পানীয় শোষণের উপযোগী; শূককীটের পা প্রায় ৮ জোড়া এবং মূককীট সাধারণতঃ গুটিকার মধ্যে থাকে। লেপিদোপতেরা বর্গের অন্তর্গত প্রজাপতির প্রায় ৮৮টি গোত্রকে (ফ্যামিলি) ব্যবহারিক সুবিধার্থে প্রজাপতি (রোপালোসেরা, Rhopalocera) ও মথ (হেতেরোসেরা, Heterocera) নামক দুইটি উপবর্গে বিভক্ত করা হয়। প্রজাপতি ও মথের কতকগুলি সাধারণ পার্থক্য বর্তমান। প্রজাপতির ডিম সাধারণতঃ উপবৃত্তাকার, শূককীটে রোম ঘনসংবদ্ধ বা সুবিন্যস্ত নহে ও মাংসল রোম বিরল এবং মূককীট সাধারণতঃ গুটিকায় আবদ্ধ থাকে না। মথের ডিম সাধারণতঃ গোলাকার বা আঁশের মত, শূককীটে রোম ঘনসংবদ্ধ বা সুবিন্যস্ত ও মাংসল রোম প্রায়ই বর্তমান এবং মূককীট সাধারণতঃ গুটিকায় আবদ্ধ থাকে। পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি সাধারণতঃ বৃহদাকার ও তুলনামূলকভাবে কৃশ, দেহে আঁশতুল্য রোম অল্প, চক্ষুদ্বয় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, ডানা প্রায়ই সুচিত্রিত এবং শাখাহীন ও সোজা সামনের দিকে বিস্তৃত শুঁয়া দুইটির অগ্রভাগ স্থূল। পূর্ণাঙ্গ মথ সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকৃতি ও তুলনামূলকভাবে স্থূল, দেহ প্রচুর আঁশতুল্য রোমে আবৃত, চক্ষুদ্বয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, ডানা প্রায়ই একবর্ণ এবং শাখাযুক্ত ও ঈষৎ বক্র শুঁয়াদুইটির অগ্রভাগ স্থূল নহে। পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি সাধারণতঃ দিবাচর; পূর্ণাঙ্গ মথ সাধারণতঃ নিশাচর। বিশ্রামকালে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতির ডানা দুইটি খাড়াভাবে পরস্পর সংবদ্ধ বা দুইপার্শ্বে বিস্তৃত থাকে; পূর্ণাঙ্গ মথের ডানা বিশ্রাম-কালে পৃষ্ঠদেশে শায়িত থাকে।

কিন্তু উল্লিখিত পার্থক্যগুলির বহু ব্যতিক্রম থাকায় এবং গঠনগত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে এরূপ দুইটি উপবর্গে বিন্যাসের বিজ্ঞানসম্মত সমর্থন না থাকায় সর্বাধুনিক মতে যাবতীয় প্রজাপতিকে দিত্রিসিয়া উপবর্গের (Sub-order-Ditrysia) দুইটি অধি-গোত্রের (সুপার-ফ্যামিলি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে একটি অধি-গোত্র হেস্‌পেরিইদেয়া (Hesperioidea) প্রায় ৩০০০ প্রজাপতিবিশিষ্ট; এ সকল প্রজাপতির চলতি ইংরেজী নাম 'স্কিপার্স'। ইহারা প্রায় সর্বদেশেই বর্তমান এবং প্রজাপতিদের মধ্যে বিবর্তনের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর। ইহাদের উড়িবার ভঙ্গী বিসদৃশ এবং একসঙ্গে ইহারা বেশিক্ষণ উড়িতেও পারে না। অন্যান্য সকল প্রজাতির প্রজাপতি পাপিলিওনিদেয়া (Papilio-noidea) নামে দ্বিতীয় অধি-গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। ইহা আবার পাঁচটি গোত্রে বিভক্ত: ১. পাপিলিওনিদী (Papilionidae) গোত্র: নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণপ্রধান দেশের প্রায় ৬০০ প্রজাতি ইহার অন্তর্গত। সাধারণতঃ ইহাদের জমকালো বর্ণের ডানা থাকে। এ গোত্রের সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য ভারতীয় প্রজাপতির ইংরেজী নাম 'ব্লু-পিকক' ২. পিয়েরিদী (Pieridea) গোত্র: ইহারা তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র বা মধ্যমাকৃতি এবং ইহাদের শাদা, হলুদ বা কমলা বর্ণের ডানায় কালো দাগ থাকিতে পারে। মাঠেঘাটে ইহারা সচরাচর চোখে পড়ে। ইহাদের কতিপয় প্রজাতির শূককীট শস্যের ক্ষতি করে ৩. নিম্‌ফালিদী (Nymphalidae) গোত্র: সাধারণ-ভাবে বৃহৎ বা মধ্যমাকৃতি প্রজাপতির ৫০০০ প্রজাতি লইয়া ইহা গঠিত। অধিকাংশেই প্রথম পদযুগল অতি ক্ষুদ্র ৪. রিওদিনিদী (Riodinidae) গোত্র: প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সীমাবদ্ধ, প্রায় ১০০০ প্রজাতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহারা ক্ষুদ্রকায় ৫. লিকীনিদী (Lycaenidae) গোত্র: ইহাতে প্রজাতির সংখ্যা কম,

কিন্তু ইহাদের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এই গোত্রের কোনও কোনও প্রজাতির প্রজাপতির দেহনিঃসৃত রস পিপীলিকার প্রিয় খাদ্য।

পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি ফুলের মধু, অ্যাফিস নামক পতঙ্গের দেহনিঃসৃত রস 'হনি-ডিউ', পচনশীল জৈবপদার্থের রস, বদ্ধ জলাশয়ের জল প্রভৃতি পান করে। সাধারণতঃ সূর্যতাপে বায়ুমণ্ডল সামান্য উষ্ণ হইলে ইহারা উড়িয়া বেড়ায়, দিনের প্রখর তপ্ত মধ্যভাগে বিশ্রাম লয় ও সূর্যাস্তের দুই-তিন ঘণ্টা পূর্বে আবার উড়িতে থাকে। বৎসরের যে সময়ে সবুজ গাছপালার বিকাশ সর্বাধিক, তখনই ইহাদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। ইহাদের স্পর্শ ও ঘ্রাণের শক্তি প্রখর, দৃষ্টিশক্তি সামান্য এবং শব্দ উপলব্ধির ক্ষমতা নাই। যৌনমিলনকালে পুং-প্রজাপতি অ্যাণ্ড্রোকোনিয়া নামক বিশেষ রোমগুচ্ছের দ্বারা দেহনিঃসৃত গন্ধদ্রব্য ছড়াইয়া স্ত্রী-প্রজাপতিকে আকৃষ্ট করে। দুই ঘণ্টা স্থায়ী যৌনমিলন উপবিষ্ট অবস্থায় হইলেও এ সময়ে কারণ ঘটিলে যুগল আবদ্ধ অবস্থাতেই ইহারা উড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে। স্ত্রী-প্রজাপতি গাছের পাতায় ১০০ বা ততোধিক ডিম পাড়ে। শূককীট এককভাবে থাকে ও সাধারণতঃ পরবর্তী বসন্তকাল পর্যন্ত শীতনিদ্রায় কাটায়। বসন্তসমাগমে শূককীট তৎপর হয়, উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গ খায় ও ৪-৫ বার খোলস বদলাইয়া পরিণতির পথে যায়। পরবর্তী দশা মূককীট স্থানুর মত উদ্ভিদের অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া থাকে। অবশেষে ইহা পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে রূপান্তরিত হয়। ক্ষুদ্রকায় পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি সাধারণতঃ প্রায় ১৫ দিন, বৃহদাকার পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি ১-১½ মাস এবং যে সকল প্রজাপতি শীতনিদ্রা দিতে পারে তাহারা ১ বৎসরেরও বেশি বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কোনও কোনও প্রজাতির প্রজাপতি পূর্ণাঙ্গ দশায় দেশান্তরে যাইতে সক্ষম—পশ্চিম গোলার্ধের উষ্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী 'মনার্ক' প্রজাপতি বসন্তে কানাডার উত্তরাংশে যায় ও শরতে স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। জীবাণুঘটিত সংক্রামক ব্যাধি, বিভিন্ন পাখি, কোনও কোনও পতঙ্গ প্রভৃতির আক্রমণে প্রজাপতি বিনষ্ট হয়। পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বহু উদ্ভিদের পরাগযোগে অংশগ্রহণ করে। 'ওয়াণ্ডারার্স' নামক প্রজাপতির শূককীট মাংসাশী এবং ইহারা শস্যনাশক নানাপ্রকার পতঙ্গ মারিয়া ফেলে।

দ্র E. B Ford, *Butterflies*. London, 1937 ; G. Talbot, *The Fauna of British India, Including Ceylon and Burma : Butterflies*, Vol. I, London, 1939 ; M. A. Wynter-Blyth, *Butterflies of the Indian Region*, Bombay, 1957.

সুজিতকুমার দাশগুপ্ত

প্রজাসোশ্যালিস্ট পার্টি (পি. এস. পি.) প্রজা-সোশ্যালিস্ট পার্টির জন্ম ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে। বোম্বাই সহরে সোশ্যালিস্ট পার্টি, কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি ও সুভাষবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের মিলিত সম্মেলনের ফলে ইহার উদ্ভব হয়।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনের কয়েকমাস পরে তৃতীয় শক্তি গঠন প্রয়াসে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির জন্ম। পি. এস. পি. নামে এই পার্টি অধিক পরিচিত।

এই পার্টিতে তিনটি মতাদর্শের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যথা—মার্ক্সবাদ, পাশ্চাত্য-গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও গান্ধীবাদ।

পার্টির উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা। সংসদীয় রাজনীতি, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ, গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি ও সমবায়ের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পার্টি সতত চেষ্টা করিবে।

উপর্যুপরি কয়েকটি আঘাতের ফলে এই পার্টির বিপর্যয় ঘটে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার নেতৃত্বে একদল সভ্য তীব্রতর সংগ্রামী কার্যক্রম অনুসরণের জন্য এই পার্টি ত্যাগ করিয়া সোশ্যালিস্ট পার্টি নামে সংগঠন স্থাপিত করেন।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান অশোক মেহতা কংগ্রেস পার্টির ভিতরে সকল সমাজবাদী শক্তিকে সংহত করিবার উদ্দেশ্যে কিছু অনুগামীকে লইয়া কংগ্রেসে যোগ দেন। ইহার পরে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পি. এস. পি. ও সোশ্যালিস্ট পার্টি সংযুক্ত সোশ্যালস্ট পার্টি (এস-এস-পি) নাম গ্রহণ করিয়া মিলিত হয়। এই মিলন হয় ক্ষণস্থায়ী। পি. এস. পি. ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই মিলিত পার্টি ত্যাগ করিয়া আবার পি. এস. পি. নামেই কাজ করিতেছে।

এই পার্টি ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স ইত্যাদির জাতীয়করণ, সার্থক ভূমিসংস্কার প্রবর্তন, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীয়করণ, শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যমূল্যের সমতা, কৃষির উন্নতিতে প্রাধান্য, উচ্চতম ও নিম্নতম আয়ের মধ্যে ব্যবধান ১০ : ১-এ সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী।

আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে রাজ্যের শাসনকার্যে প্রচলন, ইংরেজীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সহযোগী ভাষা হিসাবে

মান্যতাদান ও হিন্দীকে ভারতের সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসাবে গণ্য করা এই পার্টির নীতি।

এই পার্টির মজদুর-সংগঠনগুলি হিন্দ মজদুর সভার পরিচালনায় সংগঠিত। 'ট্রেড ইউনিয়ন' দ্র।

শক্তিরঞ্জন বসু

প্রজ্ঞাপারমিতা দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা—এই ছয়টি পারমিতা বা উৎকর্ষের সাধন মহাযানী বৌদ্ধদর্শন অনুসারে বোধিসত্ত্বের অবশ্য কর্তব্য। অন্যান্য পারমিতা ও বিভিন্ন বৌদ্ধচর্যার সম্যক্ অনুশীলনের সাহায্যেই প্রজ্ঞাপারমিতা অধিগত হয়।

প্রজ্ঞাপারমিতাকে অবলম্বন করিয়া মহাযানী বৌদ্ধদের পরম পবিত্র গ্রন্থ 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র' রচিত হইয়াছে। এই সূত্রে উল্লিখিত আছে যে ভগবান বুদ্ধ তাঁহার শিষ্য সুভূতি, সারিপুত্র, পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র এবং দেবরাজ শক্র প্রভৃতির সহিত কথোপকথনের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপারমিতার এবং মহাযানী দার্শনিকমতের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেন। ইহাতে সর্বধর্মের শূন্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। প্রজ্ঞাপারমিতা অধিগত হইলে সাধক উপলব্ধি করেন যে পারমিতা সমাধি, সমাপত্তি প্রভৃতির উপদেশ বুদ্ধ দিয়াছেন কেবলমাত্র সাধককে তাঁহার লক্ষ্যে পৌছিবার সহায়ক হিসাবেই।

'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র' নামে বিভিন্ন আকারের বহু গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শত সাহস্রিকা, পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা, দশ সাহস্রিকা ও অষ্ট সাহস্রিকা (শ্লোক-সমন্বিত) প্রজ্ঞাপারমিতাই প্রধান। পণ্ডিতগণের অভিমতে 'অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রই' মূল সূত্র গ্রন্থ। হিউএন-ৎসাঙ্ ১২টি বিভিন্ন আকারের সূত্রের চীনা অনুবাদ করেন, তন্মধ্যে বিস্তৃততমটিতে ছিল ১০০-০০০ ও সংক্ষিপ্ততমটিতে ছিল ১৫০টি শ্লোক। তিব্বতে প্রাপ্ত ২১ খানি সূত্রের একটি হইল একাক্ষরী—'অ' এই একটিমাত্র অক্ষরের মধ্যে সমস্ত প্রজ্ঞাপারমিতা সন্নিবিষ্ট আছে।

বিস্তৃতি অনুসারে বিভিন্ন 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের' রচনাকাল যাহাই হউক না কেন, 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র' মূলতঃ যে প্রাচীনতম মহাযান সূত্রগুলির অন্যতম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চীনা ভাষায় ১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম একটি প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের অনুবাদ হয়।

দ্র M. Winternitz, *History of Indian Literature*, Vol. II, Calcutta, 1933.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণবানন্দ, স্বামী (১৮৯৬-১৯৪১ খ্রী) ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমায় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিষ্ণুচরণ ভূঁইঞা তথাকার রাজা সূর্যকান্ত রায়ের অধীনে নায়েবের পদে কাজ করিতেন। প্রথম জীবনে তাঁহার নাম ছিল 'বিনোদ'। পরবর্তী জীবনে প্রণবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি স্বামী প্রণবানন্দ নামে পরিচিতি লাভ করেন।

শৈশব হইতেই তাঁহার শিবভক্তি ছিল, এই সময় হইতে তিনি প্রণব সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন, 'ওঁ'-কারের উপর ত্রাটক অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অধ্যাত্মসাধনা কঠোর হইতে কঠোরতররূপ পরিগ্রহ করে, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গোরক্ষপুরে যোগিরাজ গম্ভীরনাথজীর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইলে তিনি বিপ্লবী যুবকদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। তাঁহার তাঁহাদিগকে চরিত্র গঠনে সহায়তা করিতেন। তাঁহার এই যোগাযোগের ফলে একবার তিনি গ্রেপ্তার হন, কিন্তু পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরোধে খুলনা জেলাভুক্ত সুন্দরবন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের সেবাকার্যের উদ্দেশ্যে তিনি পার্ষদগণকে লইয়া এক অস্থায়ী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রমের নামকরণ হয় 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ'। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাজিতপুরে আশ্রমের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে তাঁহার কর্মকেন্দ্র সম্প্রসারিত হইতে থাকে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

দ্র অদ্বৈতানন্দ স্বামী, প্রণবানন্দ লীলা স্মৃতি কলিকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

অশোকা সেনগুপ্ত

প্রণালী দুইটি বৃহৎ স্থলভাগ বা মহাদেশের মধ্যে এক ফালি জলভাগকে সাধারণতঃ প্রণালী বলা হইয়া থাকে। এই জলভাগ নিকটে অবস্থিত কোনও সমুদ্র বা মহা-সমুদ্রের অংশ হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষের দক্ষিণে ভারত ও সিংহলের মধ্যে অবস্থিত পক প্রণালীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

লীনা চট্টোপাধ্যায়

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (১৮৪০-১৯০৫ খ্রী) ব্রাহ্ম নেতা ও প্রসিদ্ধ বক্তা; জন্ম হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া

গ্রামে এবং শিক্ষা হেয়ার স্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। অতঃপর ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন (১৮৫৯ খ্রী) এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে ব্রতী হন ও এই উপলক্ষ্যে কয়েকবার ইওরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন ও একবার জাপানেও যান। ব্রাহ্মআন্দোলনে বিভেদ দেখা দিলে তিনি কেশবচন্দ্রের সহায়করূপে নববিধান সমাজে থাকিয়া যান। তিনি কিছু-কাল 'ইন্টারপ্রেটার' নামক ইংরেজি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ: 'Oriental Christ', 'Heartbeats', 'Spirit of God' এবং 'The Life and Teachings of Keshab Chandra Sen'।

প্রতাপ সিংহ (১৫৪০-৯৭ খ্রী) মেবারের শিশোদীয় কুলে জন্ম। বাবরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাণা সঙ্গের পৌত্র ও রাণা উদয়সিংহের পুত্র। মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আকবরের বিরুদ্ধে জীবনব্যাপী সংগ্রাম তাঁহার চির-স্মরণীয় কীর্তি।

মেবারের এক সংকটকালে প্রতাপসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫৭২ খ্রী)। মাত্র চার বৎসর আগে রাজধানী চিতোর মোগলসম্রাট আকবরের করায়ত্ত ও বিধ্বস্ত হয়। তাহা ছাড়া রাজপুতগণ একে একে দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। রাণা প্রতাপও যাহাতে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন এই উদ্দেশ্যে আকবর তিনবার দূত পাঠাইলেন (১৫৭৩ খ্রী), কিন্তু দৌত্য ব্যর্থ হইল। তখন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য মোগলপক্ষের প্রধান সেনাপতিরূপে প্রথমে আসিলেন অম্বরের রাজপুতরাজ মানসিংহ। প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল গোগুণ্ডায়, কিন্তু ইহা ইতিহাসে হলদিঘাটের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ (১৫৭৬ খ্রী)। অসীম বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করিয়াও প্রতাপ পরাজিত হইলেন। টডের ভাষায় হলদিঘাট হইল 'মেবারের থার্মপাইলি'।

পরবর্তী কয়েকটি বৎসর (১৫৭৭-৮৫ খ্রী) প্রতাপ বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াও সপরিবারে আরাবল্লীর পর্বতারণ্যে আত্মগোপন করিলেন, কিন্তু মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে একে একে পাঠাইলেন শাহবাজ খাঁ, আব্‌দার রহিম খাঁ ও রাজা জগন্নাথকে। মেবারের দুর্গগুলি শত্রুর হস্তগত হইল। মোগলসাম্রাজ্যের বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতাপ অবিরাম সংগ্রাম চালাইতে লাগিলেন। এই দুর্দিনে তাঁহার প্রতি বিশ্বস্ত রহিলেন কেবল অধীন সামন্ত ও ভীল অনুচরগণ।

অবশেষে সুদিন আসিল। আকবরের অন্যত্র ব্যস্ত থাকার সুযোগে প্রতাপ অনেকগুলি দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়া মৃত্যুর পূর্বে মেবারের নানাবিধ উন্নতি ও সংস্কার সাধন করেন (১৫৮৫-৯৭ খ্রী)। শুধু চিতোর ও মণ্ডলগড় শত্রুহস্তে রহিয়া গেল। সাতান্ন বৎসর বয়সে প্রতাপের মৃত্যু হয়।

মোগল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপসিংহের সুদীর্ঘ সংগ্রাম মধ্যযুগের ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়।

দ্র James Tod, *Annals and Antiquities of Rajasthan*, Calcutta, 1879; G. N. Sharma, *Mewar and the Mughal Emperors, Agra*, 1954.

নীহারকণা মজুমদার

প্রতাপাদিত্য বাঙালী কায়স্থ জমিদার, শ্রীহরির পুত্র, বিখ্যাত বারভূঁইয়াদের অন্যতম।

সুবাদার ইস্‌লাম খান যখন বাংলা দেশে মোগল-শাসন সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে জাহাঙ্গীর কর্তৃক প্রেরিত হন (১৬০৮ খ্রী) তখন প্রতাপাদিত্য যশোহর, খুলনা ও বাখরগঞ্জের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করিতেন। ইছামতী ও যমুনার সঙ্গমে অবস্থিত ধূমঘাটে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি অগাস্টাস পেড্রো নামক পর্তুগীজ নাবিকের সহযোগিতায় এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন। প্রতাপাদিত্য প্রথমে মোগলের আনুগত্য স্বীকার করেন, পরে কিন্তু বিরাগভাজন হন এবং মোগল সুবাদার বাংলার অন্যান্য জমিদারদের বিরুদ্ধে যথোচিত সাহায্য না করায় তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রথমে সালকার নৌ-যুদ্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্য এবং পরে মাগরাঘাটের যুদ্ধে তিনি স্বয়ং পরাজিত হওয়ায় মোগল সেনাপতি গিয়াস খানের নিকট তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হয় (১৬১২ খ্রী)। 'বহরিস্তান'-প্রণেতা মির্জানাথান এই অভিযানে মোগল-নৌবাহিনী পরিচালনা করেন এবং তিনি প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমের যে-সমুদয় কাহিনী প্রচলিত আছে তাহার অধিকাংশেরই কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। গিয়াস খান প্রতাপাদিত্যকে ঢাকায় লইয়া যাইবার পর সুবাদার ইস্‌লাম খান তাঁহাকে সপরিবারে বন্দী করিয়া দিল্লী প্রেরণ করেন। প্রবাদ এই যে, পথিমধ্যে বারাণসীর নিকট তাঁহার মৃত্যু হয় (আনুমানিক ১৬১২ খ্রী)।

দ্র সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫ ; J. N. Sarkar, ed., *History of Bengal*, Vol. II, Dacca, 1948.

কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত

প্রতিবর্ত ক্রিয়া রিফ্লেক্স অ্যাকশন। অনেক সময়ে কোনও টিস্থ বা দেহকলার উদ্দীপনার ফলে তথা হইতে উদ্ভূত আবেগ (ইম্পাল্স) নার্ভ বাহিয়া আসিয়া সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিকভাবে কোনও পেশী বা গ্রন্থির ক্রিয়া সংঘটিত করে ; এই নার্ভঘটিত ক্রিয়াকেই প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মুখবিবরে খাদ্য রাখিলেই মুখে অনৈচ্ছিক-ভাবে লালাক্ষরণ হয়, চোখের সম্মুখে কিছু আনিলেই অজ্ঞাতসারে চোখের পাতা বন্ধ হয়—এরূপ ক্রিয়াই প্রতিবর্ত ক্রিয়া। দেহের কোনও অঙ্গের বিশেষ প্রকার গ্রাহকযন্ত্র (রিসেপ্টর) দেহের বাহির বা ভিতর হইতে উপযুক্ত উদ্দীপনা লাভ করিলে উক্ত গ্রাহকযন্ত্র হইতে উৎপন্ন আবেগ তৎসংশ্লিষ্ট অন্তর্বাহী (অ্যাফারেণ্ট) নার্ভ বাহিয়া কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে অবস্থিত বিশেষ এক নার্ভ-কেন্দ্রে (সেণ্টার) পৌছায়, ফলে ঐ কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত আবেগ বহির্বাহী (ইফারেণ্ট) নার্ভ বাহিয়া পেশী বা গ্রন্থিতে আসিয়া তাহাদের ক্রিয়া সংঘটিত করে। গ্রাহকযন্ত্র, অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী নার্ভদ্বয়, নার্ভকেন্দ্র, এবং পেশী বা গ্রন্থি লইয়া গঠিত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উপরি-উক্ত পথকে প্রতিবর্ত চক্র (রিফ্লেক্স্ আর্ক) বলে। নার্ভঘটিত ক্রিয়া হইলেও এই ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয় না। বিশেষভাবে সচেতন থাকিলে প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া তিনপ্রকার : ১. সহজ (সিম্প্ল) প্রতিবর্ত ক্রিয়া, যথা চোখের অচ্ছোদপটল (কর্নিয়া) স্পর্শমাত্রে চোখের পাতা বন্ধ হওয়া ২. সুসংবদ্ধ (কো-অর্ডিনেট) প্রতিবর্ত ক্রিয়া, যথা সুশৃঙ্খলভাবে হাঁটাচলা, হাত-পা নাড়া প্রভৃতি কাজ ৩. বিশৃঙ্খল (কন্‌ভাল্‌সিভ) প্রতিবর্ত ক্রিয়া, যথা ধনুষ্টংকার রোগে বা ষ্ট্রিক্‌নিন-প্রয়োগে উৎপন্ন বিশৃঙ্খল ক্রিয়া। নার্ভের রোগ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে অগভীর (সুপারফিশিয়াল), গভীর (ডীপ) এবং আঙ্গিক (ভিসেরাল) এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

সহজাত (ইন্‌বর্ন) প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলির উপর নির্ভর করিয়া অভ্যাস বা ক্রমাগত সম্বন্ধের ফলে কতক-গুলি অভ্যাসলব্ধ বা সাপেক্ষ (কন্‌ডিশন্‌ড) প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শেষোক্তগুলি সঠিকভাবে প্রতিবর্ত ক্রিয়া নহে ; ইহাদের জন্য মস্তিষ্কের প্রয়োজন। 'নার্ভতন্ত্র' দ্র।

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রতিমা 'মূর্তিতত্ত্ব' দ্র।

প্রতিমা ঠাকুর (দেবী) (১৮৯৩-১৯৬৯ খ্রী) জন্ম ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর ও মৃত্যু ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জানুয়ারি। পিতা শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র ; মাতা বিনয়িনী দেবী, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথের ভগিনী। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী রথীন্দ্রনাথের অনুবর্তিনী হইয়া তিনি বিশ্বভারতীর বিভিন্ন কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। বিচিত্র কারুশিল্পের প্রবর্তনে ও রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যপরিকল্পনায় তাঁহার সহযোগ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত 'নির্বাণ' (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে রবীন্দ্রজীবনের শেষ বর্ষের কাহিনী মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করিয়াছে। 'স্মৃতিচিত্র' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে ঠাকুর-পরিবারে অতিবাহিত তাঁহার শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি, অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের কথা নিবদ্ধ। তাঁহার 'নৃত্য' (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট নৃত্যধারা ও রবীন্দ্ররচিত নৃত্যনাট্যের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিবৃত্ত বিবৃত। কবিতা ও কথিকা-রচনার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল ; 'চিত্রলেখা' (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) পুস্তকে এগুলি সংকলিত। চিত্রশিল্পীরূপেও তিনি নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছিলেন।

পুলিনবিহারী সেন

প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতার সাধারণ অর্থ ক্রেতাদের অথবা বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পূর্ণ প্রতি-যোগিতার অবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা এত বেশি যে মূল্যের উপর কাহারও কোনও কর্তৃত্ব নাই। এক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের মধ্যে কোনও সচেতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। উৎপাদন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়েও কাহাকেও প্রতিযোগীদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবিতে হয় না। পণ্যের ভেদহীনতা, বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ ও নির্গমন, এগুলি পূর্ণ প্রতিযোগিতার অন্যান্য লক্ষণ। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অধীনে উৎপাদনের অপ্রচুর সম্বলগুলির ব্যবহার সর্বোৎকৃষ্ট হয়। ইহাই তাহার সর্বপ্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরল, বর্তমানে তাহা কেবল কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। পূর্ণ একচেটিয়াত্বও বিরল; বাস্তব জগতে এই দুই চরম প্রান্তের মধ্যভাগে কমবেশি নানা মাত্রায় প্রতিযোগিতা বিরাজ করে। একচেটিয়াত্বের সহিত মিশ্রিত ও সীমিত প্রতিযোগিতাকে বলা হয় অপূর্ণ প্রতিযোগিতা। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় ক্রেতা বা বিক্রেতা অল্পসংখ্যক। প্রত্যেকেরই মূল্যের উপর অল্পবিস্তর কর্তৃত্ব থাকে; ইহাই অপূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিক্রেতার সংখ্যা মাত্র দুইজন হইলে অবস্থাটিকে বলা হয় দ্বৈততন্ত্র (ডুওপলি)। বিক্রেতা অল্প কয়েকজন হইলে বাজারটিকে বলা হয় গোষ্ঠীতন্ত্র (অলিগোপলি)। উক্ত দুই বাজারেই অবাধ প্রবেশ অবিদ্যমান এবং বিক্রেতাদের মধ্যে প্রবল, সচেতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দৃষ্ট হয়। উৎপাদন বা মূল্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে প্রত্যেককেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবিতে হয়। গোষ্ঠীতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি মূল্য সম্বন্ধে প্রায়ই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমঝোতায় উপনীত হয়, কিন্তু মূল্যগত প্রতিযোগিতা স্তব্ধ হইলেও তাহাদের মধ্যে দ্রব্যগত বা বিক্রয়গত প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে। আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প বহুক্ষেত্রেই গোষ্ঠীতান্ত্রিক; যেমন, মোটরগাড়ী শিল্প, সিগারেট শিল্প, গ্যাসোলিন শিল্প ইত্যাদি। যদি বাজার এইরূপ হয় যে বিক্রেতা বহুসংখ্যক ও অবাধ প্রবেশ বিদ্যমান, কিন্তু পণ্যের প্রকৃত বা কাল্পনিক (বিজ্ঞাপনের কল্যাণে) গুণভেদ আছে, তাহা হইলে অবস্থাটিকে বলা হয় একচেটিয়াত্মক প্রতিযোগিতা (মনোপলিস্টিক কম্‌পিটিশন)। এক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র নহে, একটি বিশেষ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান প্রতিদ্বন্দ্বীদের উচ্ছেদ না করিয়া বা নিজে উচ্ছিন্ন না হইয়া মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। কেশতৈল, গেঞ্জি, মোজা, ও পোষাক শিল্প, ঔষধের দোকান, শাল মেরামতের দোকান ও বস্ত্রালয় প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। পূর্ণ একচেটিয়াত্ব অপূর্ণ প্রতিযোগিতার চরম দৃষ্টান্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। 'একচেটিয়া' ও 'মূল্য, মূল্যতত্ত্ব' দ্র।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী (১৮৯৪-১৯৫৭ খ্রী) প্রখ্যাত বিপ্লবীনায়ক। প্রতুলচন্দ্র ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চাঁদপুরের নিকটবর্তী চান্দতাবাড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহিমচন্দ্র গাঙ্গুলী। ঢাকা অনুশীলন সমিতির নারায়ণগঞ্জ শাখায় ছাত্রকর্মী হিসাবে প্রতুলচন্দ্রের বিপ্লবীজীবন শুরু হয়। অতঃপর বিপ্লবনিষ্ঠায় ও কর্মতৎপরতায় তিনি বাংলা ও ভারতের বিপ্লবীনায়করূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দেই গৃহ ত্যাগ করিয়া বিপ্লবপ্রয়াসকে ব্যাপক করিয়া তুলিবার জন্য তিনি আত্মগোপন করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেরারী জীবনে ধৃত হইয়া বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলায় দ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তিলাভের পর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজবন্দীরূপে বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী অবস্থায়ই তিনি ব্রহ্মদেশে ইন্‌সিন্ জেলে প্রেরিত হন। মুক্তিলাভের পর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা শহর হইতে এম. এল. সি. নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-সম্মিলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং সেখান হইতেই গ্রেফ্‌তার হন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিনাবিচারে বিভিন্ন বন্দীনিবাসে আবদ্ধ থাকিয়া মুক্তি লাভের পর ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ মিউনিসিপ্যাল-নির্বাচনকেন্দ্র হইতে এম. এল. এ. নির্বাচিত হন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তিনি গ্রেফ্‌তার হইয়া ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিরাপত্তাআইনে বিভিন্ন বন্দীনিবাসে আবদ্ধ থাকেন। এই সময়েই সুভাষচন্দ্রের সহিত জেলে তিনি অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন ও স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে সুভাষচন্দ্রের সহিত তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। অতঃপর সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পুনরায় বন্দীনিবাসে আবদ্ধ করা হয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগের পর প্রতুলচন্দ্র পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুলাই কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

সত্যরঞ্জন ঘটক

প্রত্নতত্ত্ব ঐতিহাসিকের লক্ষ্য হইল, বিশেষ বিশেষ যুগে মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কিরকম ছিল তাহা আবিষ্কার করা। সমাজে মানুষ সমবেতভাবে নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা কিভাবে মিটায়; উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে কোন শ্রেণীর অধিকারে কতখানি শক্তি আছে; জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে অথবা অন্যান্য কারণবশে উৎপাদনব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়, এইরূপ বহু প্রশ্ন ঐতিহাসিকগণের মনে উদিত হইয়া থাকে। দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত গবেষণার ফলে কোনও কোনও বিশিষ্ট ইতিহাস-

শাস্ত্রের দার্শনিক সর্বদিক বিচার করিয়া এবং নানা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির গতিবিধি তুলনা করিয়া মানবসভ্যতার বিবর্তন সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বা নিয়ম আবিষ্কার করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন।

যে কোনও বিশিষ্ট সমাজের ইতিহাস উদ্ধার করিবার মোটামুটি দুইটি উপায় আছে। মানুষ যতদিন হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, ততদিনের ইতিহাস আংশিক-ভাবে সমসাময়িক কাগজপত্র হইতে উদ্ধার করা সম্ভব; কিন্তু লিপিমালার সহায়তায় একটি সমাজের সমগ্র জীবনের চিত্র পাওয়া সব সময়ে সম্ভব হয় না।

মানুষ যেখানেই বসবাস করে, কালক্রমে তাহার ব্যবহৃত নানাবিধ দ্রব্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। বসতবাড়ি, মঠ বা মন্দির, আফিস-আদালত ভাঙ্গিয়া যায়, হয়ত বা মাটিচাপাও পড়ে। আবার সেখানে মানুষের বাস হয়, নূতন ঘরবাড়ি, এমন কি মৃতের জন্য সমাধিও স্থাপিত হয়। পূর্বে যেখানে ছোট একখানি গ্রাম ছিল, সেখানে আরও বড় গ্রাম বা শহর স্থাপিত হয়। আগে যেখানে শুধু দরিদ্র চাষীকুল বা পশুপালক জাতির স্বল্পকাল স্থায়ী আবাস ছিল, সেখানে কালক্রমে বহু জনের বাস হয়। তাহার মধ্যে এক পল্লীতে ধনীর বাস, অপরটিতে দরিদ্রের বাস। কোথাও শিল্পীকুলের কর্মশালা, কোথাও বা রাজকোষে ধন বা শস্যসম্ভার সঞ্চিত থাকে।

শুধু লিখিত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন কাল সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান জন্মে তাহা পর্যাপ্ত নহে বলিয়া উৎখননের ('উৎখনন' দ্র) দ্বারা আমরা সেই কালের আরও পূর্ণাঙ্গ চিত্র রচনা করিবার চেষ্টা করি। ইহাই প্রত্নতত্ত্ব বা প্রত্নবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, লিখিত প্রমাণ এবং উৎখনন, এতদুভয়ের দ্বারা আমরা কোনও বিশেষ কালের পূর্ণাঙ্গ চিত্র সংগ্রহ করিতে পারি না। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন শ্রেণী বা জনসমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সুখ ও দুঃখ, আশা ও আকাঙ্খা, আদর্শ এবং উপলব্ধির যেসকল সূক্ষ্ম প্রবাহ বহিতে থাকে, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি ইতিহাস উদ্ধার করিবার যেসকল কৌশল প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আজ পর্যন্ত আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহার সহায়তায় বিগত কালের মানবসমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আশাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে গবেষণার দ্বারা ইহা নির্ধারিত হইয়াছে যে, সুদূর অতীতে মানুষ বনজাত ফলমূল আহরণ করিয়া ও মৎস্য বা বন্য পশু শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। কাঠের বা পাথরের অস্ত্র অথবা শিকারলব্ধ পশুর হাড়ে তৈয়ারি নানাবিধ অস্ত্রের উপরেই তাহার একান্ত নির্ভর ছিল। পরে সে চাষ করিতে শেখে, পশুর লালনপালন আরম্ভ করে এবং যাযাবর অবস্থা হইতে স্থায়ীভাবে এক এক স্থানে বসবাস আরম্ভ করে। মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থানের আয়তন, বাসগৃহ নির্মাণের রীতিও ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র এরূপ ঘটিয়াছে; কিন্তু দেশে দেশে বিভিন্ন কালে ইতিহাসের গতি নানা বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে। সর্বশেষে প্রত্নতত্ত্বের বিভিন্ন শাখার নামোল্লেখ করা প্রয়োজন। লিপিতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অপরাপর ললিতকলার আলোচনা যেমন বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমনই আবার প্রত্নবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ মাটির বাসনপত্র অথবা নিত্যব্যবহার্য নানবিধ সাজসরঞ্জামের বিষয়ে বিশেষ প্রকারের গবেষণায় লিপ্ত থাকেন।

বর্তমান যুগে ইওরোপ বা আমেরিকায় প্রত্নবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। শুধু যে আবিষ্কার বা উৎখননের পদ্ধতিতেই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহা নহে। প্রাচীন কাষ্ঠ বা কাঠকয়লার খণ্ড অথবা মাদুর বা কাপড়ের টুকরা বা হাড়ের অবশিষ্টাংশের উপরে পদার্থবিজ্ঞানীগণ নানাবিধ আণবিক পরীক্ষার প্রয়োগ করিয়া (C_{14} এবং থুয়োরিন টেষ্ট) বস্তুটি কত বৎসরের পুরাতন তাহাও মোটামুটিভাবে নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ('উৎখনন দ্র')।

দ্র V. Gordon Childe, *Progress and Archaeology*, London,1945 ; R. J. C. Atkinson, *Field Archaeology*, London, 1946 ; Graham Clark, *Archaeology and Society*, London, 1947 ; L. Wooley, *Digging up the Past*, London, 1949 ; Kathleen M. Kenyon, *Beginning in Archaeology*, London, 1952 ; Gordon Childe, *Piecing Together the Past*, London, 1956.

নির্মলকুমার বসু

প্রত্যক্ষণ প্রত্যক্ষণের দ্বারা বহির্জগৎ এবং শরীরের বিবিধ অবস্থাসম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি বহির্জগতের সহিত সংযোগের একমাত্র মাধ্যম। বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনা ইন্দ্রিয়ের সংবেদনক্রিয়াকে উদ্দীপিত

করে। এই সংবেদন মূলতঃ এক বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক উত্তেজনাপ্রবাহ যাহা নার্ভের মধ্যদিয়া মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার দ্বারাই এই সংবেদন অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ সংবেদন যেখানে একটি সরল ও সহজাত শারীরিক প্রতিক্রিয়া মাত্র, প্রত্যক্ষণ সেখানে এমন একটি জটিল মনঃশারীরিক প্রক্রিয়া—যাহা স্মৃতি, পূর্বজাত ধারণা ও অর্জিত অভিজ্ঞতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেহেতু সংবেদন ব্যতীত প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়, সেহেতু সংবেদনকে প্রত্যক্ষণের একটি আবশ্যকীয় শর্ত বলা চলে। কোনও ব্যক্তির তৎকালীন মনোভাব, ঔৎসুক্য, মনোযোগ, প্রয়োজনবোধ ও উদ্দেশ্যও তাহার প্রত্যক্ষণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং প্রত্যক্ষণও কোনও সংবেদনের শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করিয়া বিবিধ অর্জিত অভিজ্ঞতা, অনুষঙ্গ, আবেগ ইত্যাদির সাহায্যে ইন্দ্রিয়ের একটি উদ্দীপনাকে অর্থপূর্ণ উপলব্ধিতে রূপান্তরিত করে। বিভিন্ন উদ্দীপক ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যেসকল সংবেদনক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে; যথা—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ ও ঘ্রাণ, তাহাদের সম্পর্কে ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত ও বিকৃত হইয়া থাকে। শুধু রজ্জুতে সর্পভ্রমই নয়, বস্তু-বিষয়-ঘটনার বাস্তব প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের প্রত্যক্ষণে যথাযথরূপে প্রতিফলিত হয় না। অর্থাৎ, সংবেদন যে তথ্য সরবরাহ করে, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, সংস্কার, পক্ষপাত, একদেশদর্শিতা ও ব্যক্তিগত রুচি-অরুচি ইত্যাদির প্রভাবে তাহার ভুল বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা হইতে পারে। এমন কি উদ্দীপকের অনুপস্থিতি এবং ফলতঃ সংবেদনের অভাব সত্ত্বেও মানসিক উত্তেজনা, শারীরিক অবসাদ অথবা স্নায়বিক বিকারজনিত সম্পূর্ণ অমূলক প্রত্যক্ষণের উদাহরণও বিরল নয়।

উল্লেখযোগ্য যে, সংবেদন প্রত্যক্ষণের আবশ্যকীয় শর্ত হইলেও সংবেদনমাত্রই প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করে না। মনোযোগ ব্যতীত কখনই কোনও সংবেদন প্রত্যক্ষণে পরিণত হয় না। পথে চলিতে চলিতে দৃশ্য-শব্দ-গন্ধের বিভিন্ন উপকরণ ইন্দ্রিয়সমূহকে উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে, কিন্তু মন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকিলে অথবা সেই সকল উদ্দীপকের প্রতি কোনও কারণে মনোনিবেশ না করিলে সংবেদনসত্ত্বেও চেতনায় প্রত্যক্ষণের কোনও অভিজ্ঞতা হয় না। প্রসঙ্গতঃ সংবেদন, মনোযোগ ও প্রত্যক্ষণকে সর্বদা বিচ্ছিন্ন করা চলে না। আকস্মিক প্রবল শব্দে সচকিত হইলে এই তিনটি প্রক্রিয়া মিলিয়া একযোগে চেতনাকে আক্রান্ত করে। সুসংবদ্ধতা প্রত্যক্ষণের আরও একটি বিশেষ ধর্ম। গেস্টল্ট বা সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে, বিভিন্ন সংবেদনের বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলি প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বতঃই একটি একক, সুসংবদ্ধ ও অর্থপূর্ণ উপলব্ধিতে পরিণত হইয়া থাকে। যেহেতু চেতনার ধারণক্ষমতা সীমাবদ্ধ, সেহেতু বহুবিধ আপাত-বিচ্ছিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংযোগস্থাপনের দ্বারা প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়া তাহাদের একটি অর্থপূর্ণ সামগ্রিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় এবং ফলতঃ চেতনায় ঐ সংবেদনসমষ্টির একক এবং একত্র উপলব্ধি জাগ্রত হয়।

পরিশেষে, যেহেতু বহির্জগৎসম্পর্কে সংযোগের একমাত্র মাধ্যম আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ এবং যেহেতু সংবেদন তথা প্রত্যক্ষণের সহিত বহির্বাস্তবের কোনও অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী, অভ্রান্ত ও সরাসরি সম্পর্ক নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, সেহেতু অনেক দার্শনিকের মতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোনও বাস্তব ভিত্তি নাই। অন্ততঃ অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বাস্তব জগতের প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষণে স্বভাবতঃই প্রতিফলিত হয় কিনা, এই প্রশ্ন দর্শনের একটি মৌলিক সমস্যারূপে নানাভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষণের স্বরূপ বিষয়ে এই দার্শনিক সংশয়বাদ সত্ত্বেও আধুনিক মনোবিজ্ঞান পরীক্ষামূলক গবেষণার দ্বারা প্রত্যক্ষণের মনঃশারীরিক ভিত্তি এবং বাস্তব ঘটনার সহিত তাহার সম্পর্কের প্রকৃতি বিষয়ে নানাবিধ আলোকপাত করিয়াছে। সংস্কার, পক্ষপাত ও অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রবণতার প্রভাব হইতে প্রত্যক্ষণকে কিভাবে মুক্ত রাখা যায় এবং কিরূপে বাস্তব ও বিষয়গত (অব্জেক্টিভ) দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বস্তুজগতের সহিত প্রত্যক্ষণের সাযুজ্য ঘটানো যায়, সেই সমস্যার সমাধানে এইসকল গবেষণার ফলাফল বিশেষভাবে সহায়ক।

দ্র K. Kaffka, *Principles of Gestalt Psychology*, New York, 1935; S. H. Bartley, *Principles of Perception*, New York, 1958; J. E. Hochburg, *Perception, Foundations of Modern Psychology Series*, 7, New Jersey, 1964.

সত্রাজিৎ দত্ত

প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর (১৮৭৩-১৯৪২ খ্রী) বিখ্যাত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পের সংগ্রাহক; মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র। তিনি ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার ও অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভূস্বামীসম্প্রদায়ের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। ১৮৭৩

খ্রীষ্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। বিলাতের রয়্যাল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির তিনি প্রথম ভারতীয় সদস্য নির্বাচিত হন (১৮৯৮ খ্রী)। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে তিনি ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন ও সমগ্র ইওরোপ ভ্রমণ করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'নাইট' উপাধি লাভ করেন ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'মহারাজা' হন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, কলিকাতার শেরিফ এবং ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল ট্রাস্ট, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সভাপতির আসনে বিভিন্ন সময়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর তদানীন্তন রাজা তাঁহাকে সম্মানসূচক 'অর্ডার' প্রদান করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ হিসাবে 'ডিভাইন মিউজিক' ও 'অ্যান্টিক্স্ বাই অ্যান অ্যান্টিকুয়েরিয়ান' উল্লেখযোগ্য। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ আগস্ট কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রফুল্লকুমার সরকার (১৮৮৪-১৯৪৪ খ্রী) প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যসেবী। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কুষ্টিয়ার কুমারখালি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রসন্নকুমার সরকার। পাবনা জেলা স্কুল ও কলিকাতা জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'বঙ্কিম পদক' লাভ করেনে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল. পাশ করিবার পর কিছুকাল ফরিদপুরে ও ডাল্টনগঞ্জে ওকালতি করিয়া তিনি কয়েক বৎসর ওড়িশার ঢেন্‌কানাল রাজপরিবারে গৃহশিক্ষকের কাজ করেন। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় (১৯২২ খ্রী) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠা করেন (প্রথম প্রকাশ ১৩ মার্চ, ১৯২২ খ্রী)। প্রথম কয়েক মাস তিনি ইহার সম্পাদকতা করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)-এর জীবনী ও তাঁহার বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিবার দায়ে তিনি অভিযুক্ত ও কারারুদ্ধ হন। পুনরায় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকপদে বৃত ছিলেন। বাংলা দেশে যে কয়েকজন সাংবাদিকের নির্ভীক লেখনী ও অবিচল নিষ্ঠার ফলে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি দ্রুত প্রতিষ্ঠা লাভ করে, প্রফুল্লকুমার সরকার তাঁহাদের অন্যতম। প্রফুল্লকুমারের সাহিত্যসেবার ক্ষেত্র বিস্তৃত। কথা ও প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁহার রচনা উল্লেখযোগ্য। 'ভ্রষ্টলগ্ন' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), 'অনাগত' (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ), 'বালির বাঁধ' (১৩৪১ বঙ্গাব্দ) তাঁহার রচিত জনপ্রিয় উপন্যাস। 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' ও 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ' (১৩৫২ বঙ্গাব্দ) তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় বহন করে। তাঁহার 'শ্রীগৌরাঙ্গ' (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) শ্রীচৈতন্যের জীবনী।

প্রফুল্লকুমার সরকার বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ও অনেক কাল পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

অমরেন্দ্রনাথ রায়

প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪ খ্রী)। ভারতবর্ষে রসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপনা ও গবেষণার এবং রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় প্রবর্তক প্রফুল্লচন্দ্র রায় যশোহর (পরবর্তী কালের খুলনা) জেলার অন্তর্গত রাড়ুলি কাঠিপাড়া গ্রামে জমিদারবংশে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২ আগস্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিশচন্দ্র রায়, মাতা ভুবনমোহিনী। প্রফুল্লচন্দ্র পিতার তৃতীয় পুত্র।

দশ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসিয়া হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন; কিন্তু অল্পকাল পরেই গুরুতর রোগে আক্রান্ত হওয়ায় স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অ্যালবার্ট স্কুলে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া মেট্রোপলিটন কলেজে যোগদান করেন। এ সময়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যাইয়া রসায়নবিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করিতেন। বি. এ. পরীক্ষার পূর্বে তিনি গিল্‌ক্রাইস্ট বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হন। ঐ বৃত্তিদত্ত অর্থের উপর নির্ভর করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস্. সি. পরীক্ষা পাশ করিয়া অধ্যাপক ক্রামব্রাউনের অধীনে তিনি রসায়নবিজ্ঞানে গবেষণার কাজ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ বৎসর বয়সে রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণাব ফলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডি. এস্‌সি. ডিগ্রী লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হোপ পুরস্কারও তাঁহাকে প্রদান করা হয়।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের

রসায়নবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার অধ্যাপনায় আকৃষ্ট হইয়া বহু কৃতী ছাত্র তাঁহার অধীনে রসায়নবিজ্ঞানের গবেষণার কাজে যোগদান করেন। অল্পকালের মধ্যেই একটি ভারতীয় রাসায়নিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় এবং ভারতে রসায়নচর্চা ও গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজে কার্যকালে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ '*History of Hindu Chemistry*' দুইখণ্ডে (১৯০২ ও ১৯০৯ খ্রী) রচনা করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র জীবনে বহু সম্মান লাভ করিয়াছেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে সি. আই. ই. এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাইট উপাধি দান করেন। ডারহাম, কলিকাতা, ঢাকা এবং বেনারস (বনারস) বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে গৌরবার্থক ডি. এস্‌সি. উপাধিতে সম্মানিত করে। ভারতীয় বিজ্ঞানসভা তাঁহাকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সভার মূল সভাপতিরূপে বরণ করে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিক শহরের 'ডয়ট্‌সে অকাদেমি' এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি তাঁহাকে তাহাদের সম্মানিত সভ্যরূপে নির্বাচিত করে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রেরণায় ও অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি তাঁহাকে প্রথম চারিবৎসরব্যাপী প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতিরূপে নির্বাচিত করে।

প্রফুল্লচন্দ্র ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপ্রস্তুতের প্রথম কারখানা 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মেসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহারই সহকর্মী কয়েকজন একাজে তাঁহার বিশেষ সহায় ছিলেন।

বাংলা দেশে বিবিধ শিল্পোন্নতিবিধানের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচেষ্টায় সকল সময়েই তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় (১৯২১ খ্রী) হইতে তিনি গান্ধীজীর অনুরক্ত হন। গান্ধীজীর খদ্দর-প্রচারে তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

নিজে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদি হিন্দুসমাজের বহুবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন ছিল প্রফুল্ল-চন্দ্রের একটি জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি গভীর সহানুভূতি, সর্ববিধ জাতীয়শিক্ষা এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত অকৃত্রিম সহযোগিতা ও অকৃপণ সহায়তা এবং দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতে প্রপীড়িত নরনারীর সাহায্যে আত্মনিয়োগ ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য।

সরল ও সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর জীবনযাপন, ছোটবড় নির্বিশেষে সর্বসাধারণের সঙ্গে অবাধ মিলন, আপন শিষ্যদের সঙ্গে নিবিড় প্রীতির বন্ধন, অর্জিত অর্থের অকাতর বিতরণ ইত্যাদি ছিল চিরকুমার প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রের বিশেষত্ব। বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যাপক হিসাবে যে বেতন তিনি অর্জন করিয়াছিলেন তার অধিকাংশই (প্রায় দুই লক্ষ টাকা) তিনি দান করিয়া গিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রসায়নশিক্ষার উন্নতিকল্পে। দরিদ্র ছাত্রদের অর্থ-সাহায্য ছিল তাঁহার দানের একটি বিশেষ অঙ্গ।

ইতিহাস এবং ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন। তাঁহার রচিত আত্মচরিত (*Life and Experiences of a Bengali Chemist*) এবং ইংরেজী ও বাংলাতে লেখা বহুবিধ প্রবন্ধাবলী তাঁহার সাহিত্যসাধনার পরিচয় দেয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রবর্তনেও তিনি অগ্রণী এবং উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্যঃ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-কলেজের রসায়নবিভাগে পালিত অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। প্রায় বিশবৎসরব্যাপী অব্যাহতভাবে গবেষণার কাজ করিয়া ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭৫ বৎসর বয়সে আচার্য রায় বিজ্ঞান কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুন ৮৩ বৎসর বয়সে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের বাসকক্ষে কিছুকাল অসুস্থতার পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র অনিলচন্দ্র ঘোষ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, কলিকাতা, ১৯৪১ ; মনোরঞ্জন গুপ্ত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কলিকাতা, ১৯৫৭ ; Profulla Chandra Ray, *Life and Experiences of a Bengali Chemist*, Calcutta, vol. I, 1932, vol. II, 1935.

প্রিয়দারঞ্জন রায়

প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮ খ্রী) বাংলার বিপ্লবী শহীদ, বগুড়া জেলার বিহার গ্রামে জন্ম।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রংপুরে অধ্যয়নকালে তিনি বাড়িতেই এক কুস্তির আখড়া স্থাপন করেন, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বান্ধব সমিতি'-তে যোগদান করেন এবং ক্রমে গুপ্ত বিপ্লবীদলের কর্মী হন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রফুল্ল ছাত্রদের লাঠিখেলা মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি শিক্ষা দেন এবং সৈন্যদলের ন্যায় সংগঠিত করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বারীন ঘোষ রংপুরে আসিয়া প্রফুল্ল চাকীকে কলিকাতায় লইয়া আসেন।

এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলারকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। বারীন্দ্র প্রফুল্ল চাকীকে এই হত্যাপ্রচেষ্টায় নিযুক্ত করেন। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে প্রফুল্ল মানিকতলার বাগানে বোমার আড্ডায় বিপ্লবীদের সহিত বাস করেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়। তিনি মজঃফরপুরের জজরূপে বদলি হন। সেখানে তাঁহাকে হত্যা করার বন্দোবস্ত হয়। তদুদ্দেশ্যে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরে প্রেরিত হইয়া কিংস্‌ফোর্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় কিংস্‌ফোর্ড ফিটন গাড়িতে ইওরোপীয়ান ক্লাবে যাইতেন। ৩০ এপ্রিল এইরূপ এক ফিটন গাড়ি ক্লাব হইতে বাহির হইলে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম গাড়ির উপর বোমা নিক্ষেপ করেন। গাড়িতে ছিলেন, কিংস্‌ফোর্ড নয়, মিসেস ও মিস কেনেডি। তাঁহারা উভয়েই নিহত হন।

অতঃপর প্রফুল্ল সারারাত্রি হাঁটিয়া সমস্তিপুরে পৌঁছিয়া ট্রেনে মোকামাঘাট অভিমুখে রওনা হন। সেই গাড়িতেই দৈবক্রমে দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যাইতেছিলেন। প্রফুল্লকে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়। প্রফুল্ল মোকামাঘাটে নামিয়া কলিকাতার ট্রেন ধরিবার আগেই নন্দলাল একদল কনেষ্টবলের সাহায্যে তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিতে যান এবং প্রফুল্ল নিজ রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ, বাংলা প্রবন্ধ এক বিশেষ প্রকরণের গদ্য রচনা, যাহা লেখকের মননশীলতার কাঠামোর উপর যুক্তি এবং রসের আয়তন প্রতিষ্ঠা করিয়া পাঠকের সম্মুখে তত্ত্ব ও তথ্যের বিচার করার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। যেসব প্রবন্ধে যুক্তিমালার বিন্যাস প্রবলতর সেগুলি বুদ্ধিসাপেক্ষ; রসানুভূতির আবেদন যেগুলিতে প্রখরতর, সেগুলি রম্যরচনারূপে গণনীয়।

ব্যবহারিক প্রয়োজনে গদ্য লেখার নজির, সমস্ত বয়স্ক ভাষার মতই বাংলাতেও প্রাচীন; তবে বাংলা প্রবন্ধের প্রাথমিক আভাস পাওয়া যায় এদেশের পর্তুগীজ পাদ্রীদের রচনায় ১৭শ-১৮শ শতকে। ইহাদের মধ্যে দোম আন্তোনিও এবং মানোয়েল-দা-আসুম্পসাও উল্লেখ্য।

তাঁহাদের লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করা। ১৯শ শতকের গোড়ায় কলিকাতার উপকণ্ঠে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেখানকার উইলিয়ম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু প্রমুখ অধ্যাপকদের গদ্যরচনায় প্রবন্ধ-সাহিত্যের অঙ্কুরোদ্‌গম হয়, বলা চলে। লেখনরীতির দিক হইতে মৃত্যুঞ্জয়ের স্বচ্ছন্দ শব্দঝংকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী আমল হইতে বাংলা প্রবন্ধের নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রবাহ দেখা দিল। ধর্মবিচার এবং সমাজ-সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া রামমোহন রায় যে প্রবন্ধরীতির প্রবর্তন করিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাহার উত্তর সাধক। বাংলা ব্যাকরণকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট করিয়া রামমোহন যে গদ্য প্রচলিত করিলেন, তাহার ফলে সামগ্রিকভাবে বাংলা গদ্যভাষা হইতে রামরাম বসুর রচনায় পরিস্ফুট অন্বয়ের কাঠিন্যও দূর হইল।

দেবেন্দ্রনাথের লেখায় মূলতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব এবং ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে অভিনিবেশ দেখা গেলেও, তাঁহার প্রধান অবদান অক্ষয়কুমার দত্তের সহযোগিতায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে মননশীল প্রবন্ধধারার বিকাশসাধন। বিদ্যাসাগর মূলতঃ বিধবাবিবাহপ্রবর্তন প্রসঙ্গেই প্রাবন্ধিক হইলেও সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধেও কিছু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লেখার সরস এবং সরল রীতি তাঁহার প্রবন্ধকে সাহিত্যশ্রী দান করিয়াছে। ধর্মগত এবং সমাজগত বিতর্কে লিপ্ত হইয়া তদানীন্তন পত্র-পত্রিকাও বাংলা গদ্যের পুষ্টি ঘটাইয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত মননশীল গদ্যধারার এক প্রধান স্রষ্টা। প্রাকৃতিকবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় লইয়া তিনি যেসকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলি ঋজুতায় ও বৈজ্ঞানিক মনস্বিতায় সমৃদ্ধ।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ-চন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীগণ অক্ষয়কুমার-প্রবর্তিত প্রবন্ধধারার অনুবর্তন করিয়া মননশীল ও বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। প্রবণতার দিক হইতে তাঁহাদের কেহ কেহ ছিলেন যথেষ্টই রক্ষণশীল।

চিন্তাশীলতা ও রক্ষণশীলতা, এই উভয়বিধ উপাদানই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গম্ভীর নিবন্ধগুলিতে অসামান্য

লিখনকুশলতার সহিত পরিণততর ভঙ্গীতে প্রকাশ পায়। বঙ্কিম, ভূদেব, রাজনারায়ণ প্রভৃতি প্রাবন্ধিকগণ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের ও স্বাজাত্যবোধের প্রেরণায় লিখিয়াছিলেন, যদিচ পাশ্চাত্যশিক্ষা এবং সংস্কৃতিও ছিল ইঁহাদের কাছে সুপরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমই ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। তাঁহার হাতে বাংলা প্রবন্ধ বয়স্কতা লাভ করিল।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের লেখা হইতে যে বিদ্রূপাত্মক হাল্‌কা গদ্য রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল এবং যাহার স্মরণীয় ও প্রোজ্জ্বল বিকাশ ঘটিয়াছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখায়, তাহারও পূর্ণপরিণত রস-সমৃদ্ধ বিকাশ ঘটিল বঙ্কিমের হাতে।

বঙ্কিমচন্দ্রের লঘু এবং গম্ভীর, এই দুই পর্যায়ের প্রবন্ধই রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও বিদ্যা, রস এবং অনুভূতির কারণে সার্থকতার সর্বোচ্চ স্তরে উপস্থিত হইয়াছে। দর্শন, ধর্মচিন্তা, ইতিহাস চেতনা, সমাজচিন্তা, বিজ্ঞানবোধি, সাহিত্যপ্রজ্ঞা, রসবিচার সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার প্রাবন্ধিক মনীষা রক্ষণশীল মনের পিছুটান সত্ত্বেও ভাস্বর।

বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং অচির-পরবর্তী বাংলা প্রবন্ধকারদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর পাঁড়ে, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামদাস সেন, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র বসু, স্বর্ণকুমারী দেবী, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, মীর মশারফ হোসেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ অবশ্য স্মর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা গম্ভীর প্রবন্ধরীতির নবরূপ আসিল ভাবৈশ্বর্যশীল ও কাব্যস্পন্দী ভাষার মাধ্যমে। কাব্যানুভূতিও যে যুক্তি বিচারের সহায়ক হইতে পারে, তাহা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে সুপ্রতিষ্ঠ হইল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, দর্শন, ধর্ম, সমাজচিন্তা, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানবিক প্রজ্ঞার যতগুলি বিভিন্ন দিক আছে, তাহাদের প্রায় সবই রবীন্দ্রপ্রবন্ধে কোনও না কোনও ভাবে প্রতিবেদিত। ভ্রমণকাহিনী, আত্মকথা ইত্যাদিও এতকালের প্রচলিত ভঙ্গী ত্যাগ করিয়া রবীন্দ্রনাথের হাতে তত্ত্বদর্শনের আকর হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রযুগ বলিতে যে ব্যাপক সময়কাল বোঝায়, সেই সময়ে বাংলা প্রবন্ধের প্রধান পুরুষ হইলেন প্রমথ চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, শশাঙ্কমোহন সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, বিনয়কুমার সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি স্মরণীয়।

প্রমথ চৌধুরীর কলমে বাংলা প্রবন্ধ সার্থকতার এক পরম স্তরে পৌঁছিয়াছে। ফরাসী গদ্যের রসধর্ম তাঁহার প্রবন্ধে বিরাজমান। সাম্প্রতিকতম কালের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য মূলতঃ গবেষণাধর্মী কিংবা সাংবাদিকতাধর্মী। গম্ভীর ও রসনিষ্ঠ প্রবন্ধের রেওয়াজ হ্রাস পাইতেছে; তুলনায় রম্যরচনার জনপ্রিয়তা এখনও যথেষ্ট।

পল্লব সেনগুপ্ত

প্রবর্তক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে শ্রীঅরবিন্দের, পৃষ্ঠপোষকতায়, স্বদেশভক্ত বিপ্লবী মতিলাল রায় (১৮৮২-১৯৫৯ খ্রী) চন্দননগরে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বরে অধ্যাত্ম-বিপ্লব ও সমাজ সংগঠনের উদ্দেশ্যে 'প্রবর্তক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত করেন। সংঘের মুখপত্র 'প্রবর্তক' পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সংঘের আহ্বানে প্রবর্তক বিদ্যাপীঠে যাঁহারা যোগ দিতে আসেন, তাঁহারা মতিলালকে সংঘ-গুরুরূপে বরণ করেন। সংকল্পের দৃঢ়তার জন্যই সংঘ প্রতিষ্ঠালাভ করে।

সমাজ-উন্নতির পরিকল্পনায় শিক্ষার এবং আর্থিক ক্ষেত্রে প্রবর্তকের বিভিন্ন শাখা গড়িয়া ওঠে, যথাঃ প্রবর্তক পাঠশালা, প্রবর্তক বুনিয়াদী বিদ্যালয়, প্রবর্তক বিদ্যার্থীভবন, প্রবর্তক নারীমন্দির ও বালিকা বিদ্যালয়, প্রবর্তক ব্যাঙ্ক, প্রবর্তক পাবলিশার্স ইত্যাদি।

অশোকা সেনগুপ্ত

প্রবাল অধিকাংশ প্রবাল-প্রাণীই একনালী গোষ্ঠীর (ফাইলাম-কোয়েলেন্টেরাটা, Phylum-Coelenterata) আন্থোজোয়া বা আক্তিনোজোয়া শ্রেণীর (Class-Anthozoa or Actinozoa) মাদ্রেপোরারিয়া বর্গের (Order-Madreporaria) অন্তর্গত। আল্‌সিওনারিয়া বর্গের (Order-Alcyonaria) প্রবালও পাওয়া যায়। এমন কি হিদ্রোজোয়া শ্রেণীর (Class-Hydrozoa) হিদ্রোকোরালিয়া বর্গের (Order-Hydrocorallia)

অধোবর্গ মিল্লেপোরিনা-ভুক্ত (Suborder-Milleporina) প্রবালও আছে।

উপরি-উক্ত সামুদ্রিক প্রাণীগুলির বহিস্ত্বক্ হইতে ক্ষরিত আঠাল রস সমুদ্রের চুনের সহিত মিশিয়া প্রাণী দেহের চতুর্দিকে এক কঠিন আবরণের সৃষ্টি করে। ইহাই কালে জমিয়া পাথরের মত কঠিন হইয়া প্রবালে রূপান্তরিত হয়।

অধোবর্গ মাদ্রেপোরারিয়াভুক্ত প্রবাল-প্রাণীর দেহ ক্ষুদ্র নলাকৃতি। পার্শ্বপ্রাচীর গোল বেষ্টনীর মত। ইহার উপরে একটি চাকতি আছে। এই চাকতির উপরে ৬-এর গুণিতক সংখ্যায় চক্রাকারে শাখাহীন ফাঁপা কর্ষিকা (টেণ্টাকৃল) সজ্জিত থাকে। চাকতির কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রমুখ আছে। মুখটি দেহাভ্যন্তরে খাদ্যগহ্বরে নালিকার (গালেট) মত নামিয়া গিয়াছে। খাদ্যনালী তলদেশ স্পর্শ করে নাই। নালিকাটির নীচে প্রান্তভাগ হইতে কয়েকটি সূতার 'অ্যাকন্‌সিয়া'র (acontia) সৃষ্টি করিয়াছে। পার্শ্বপ্রাচীর হইতে এই নালিকা পর্যন্ত ৬ জোড়া বা তাহার গুণিতক সংখ্যার প্রাচীর লম্বভাবে দেহের অভ্যন্তর ভাগকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। সকল প্রাচীরই নালিকা অবধি বিস্তৃত নহে, অর্থাৎ প্রাচীরগুলি দুই শ্রেণীর—সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। প্রাচীরগুলির গায়ে জননাঙ্গ অবস্থিত। দেহের তলদেশে পদচাকতির পরিবর্তে একটি বাটির আকারে কঠিন চুন-বেষ্টনী আছে। পেশীতন্তু ও নার্ভ অপেক্ষাকৃত স্বল্পপুষ্ট।

প্রবাল লাল, নীল, কালো, শাদা, হলুদ প্রভৃতি নানা বর্ণের হয়। প্রবালের, বিশেষ করিয়া রক্ত প্রবালের (কোরাল্লিয়ম রুব্রম, *Corallium rubrum*) অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক মূল্য আছে। প্রাচীনকাল হইতেই ভূমধ্য-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রবাল ভারতবর্ষে আমদানি হইয়া আসিতেছে। অঙ্গাভরণে ইহা খুবই আদরণীয়। জ্যোতিষীরা গ্রহশান্তির জন্য প্রবালধারণের উপদেশ দেন। আয়ুর্বেদে ইহার ভস্ম ঔষধরূপে উল্লেখিত আছে।

ভূগঠনে ও দ্বীপসৃষ্টিতে প্রবালের বিশেষ ভূমিকা আছে। অধিকাংশ ক্ষুদ্রাকৃতি প্রবাল-প্রাণীই ক্রমান্বয়ে কোরক-সৃষ্টির (বাডিং) দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও উপনিবেশ সৃষ্টি করে। ইহাদের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত গভীরতা ও তাপমাত্রা প্রয়োজন; সেই কারণে ইহাদের ব্যাপ্তি ২৮° উত্তর হইতে ২৮° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত, যেখানে সমুদ্রের গভীরতা ৮০ হাতের মধ্যে ও তাপমাত্রা ১৮° সেণ্টিগ্রেড হইতে ২২° সেণ্টিগ্রেড।

সমুদ্রের তলদেশে প্রবাল-প্রাণীর যুগপৎ জন্ম, বৃদ্ধি, চুনক্ষরণ ও মৃত্যুর দ্বারা ভূমি উঁচু হইয়া ওঠে ও কালের ব্যবধানে বর্ধমান বস্তুর ভরচাপে চুনাপাথরের পাহাড় সৃষ্টি হয়। এইরূপ ভূগঠনকে প্রবালদ্বীপ বলে। প্রবাল-দ্বীপ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সামান্যই জাগিয়া ওঠে, মাত্র কয়েক হাত, কেননা সমুদ্রের জল প্রবালপ্রাণীর বৃদ্ধির পক্ষে একান্তই অপরিহার্য। প্রবালদ্বীপ তিন শ্রেণীর:

১. ফ্রিঞ্জিং রীফ বা তটসংলগ্ন দ্বীপ—সমুদ্রতটের সন্নিকটে অবস্থিত এবং মাত্র কয়েক মিটার হইতে অর্ধ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত খালের মত অগভীর জলরাশি-দ্বারা ভূভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন; যেমন সিংহল, নিকোবর, মরিসাস, ও ভারতের রামেশ্বরমের অদূরে অবস্থিত প্রবাল-দ্বীপগুলি।

২. বেরিয়ার রীফ বা প্রাচীরাকৃতি প্রবালদ্বীপ—ফ্রিঞ্জিং রিফ্‌সেরই মত কিন্তু ইহারা অনেক বেশি স্থূলাকৃতি। জলবিভাজিকা অধিকতর গভীর ও প্রশস্ত। সমুদ্রের দিকের জলও বেশ গভীর। উদাহরণ অস্ট্রেলিয়ার নিকটে গ্রেট বেরিয়ার রীফ।

৩. অ্যাটল বা গোলাকৃতি অথবা অশ্বক্ষুরাকৃতি প্রবালদ্বীপ—ইহা ভূভাগ হইতে অনেক দূরে মহাসমুদ্রে অবস্থিত। এই গোলাকৃতি বা অশ্বক্ষুরাকৃতি দ্বীপ বা ক্ষুদ্র দ্বীপ-পুঞ্জমালা মধ্যভাগে হ্রদের ন্যায় জলভাগকে (লেগুন) বেষ্টন করিয়া থাকে। 'লেগুন' প্রায় ৭০ হাত হইতে ৮০ হাত গভীর হয়। ইহার উদাহরণ মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ ও পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি।

প্রায় ২৫০০ জাতের জীবন্ত ও ৫০০০ জাতের অবলুপ্ত প্রবাল আছে বা ছিল। প্রবালের উদ্ভব হয় ক্যাম্ব্রিয়ান কালে; 'টেট্রাকোরাল্লা' ওর্ডোভিসিয়ান কালে উৎপন্ন হয় আর ম্যাড্রিপোরারিয়ার উদ্ভবকাল হইল ক্যাম্ব্রিয়ান কাল।

দ্র L. H. Hyman, *The Invertebrates*, vol. I, New York, 1959; T. J. Parker & W. A. Haswell, *A Textbook of Zoology*, vol. I, New York, 1961.

অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবালদ্বীপ প্রবাল দ্র

প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮-১৯৫৬ খ্রী) ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ নভেম্বর যশোহর জেলার শ্রীকোল গ্রামে প্রবোধচন্দ্র বাগচী জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক বাসস্থান ছিল খুলনা

জেলায়। প্রবোধচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় নিজের গ্রামের স্কুলে। পরে ঐ জেলারই মাগুরা শহরে থাকিয়া শিক্ষালাভ করেন। তিনি মাগুরা হাইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা (১৯১৪ খ্রী), কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষা (১৯১৮ খ্রী) এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শেষোক্ত খ্রীষ্টাব্দেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিভাগে লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন এবং সেখানে সিলভ্যাঁ লেভির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অধ্যাপক লেভির আগ্রহে প্রবোধচন্দ্র তাঁহার সহিত নেপালে যান (১৯২২ খ্রী) এবং নেপাল দরবারের গ্রন্থাগারে রক্ষিত বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপি লইয়া কাজ করেন। এই সময় হইতে স্যার রাসবিহারী ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলো হিসাবে ইন্দোচীন ও জাপান হইতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহ করেন (১৯২২-২৫ খ্রী)। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যান। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভোট ও চীনা ভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তাঁহার এই গবেষণার ফল ফরাসী ভাষায় তিন খণ্ডে 'চীনদেশে বৌদ্ধ শাস্ত্র (*Le Canon Bouddhique En Chine*)' এবং দুই খণ্ডে 'দুইখানি সংস্কৃত-চীনা অভিধান (*Deux Lexiques Sanskrit-Chinois*)' গ্রন্থ। এই দুই বইয়ের জন্য তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের Docteur-ès-letters ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আসেন। দোঁহা-কোষ চর্যাপদ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য তিনি দ্বিতীয়বার নেপালে যান। ইহার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা কার্যে নিযুক্ত থাকেন (১৯৩০-৪৪ খ্রী)। এই সময়ে তাঁহার লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির মধ্যে দোঁহাকোষের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ (১৯৩৫ খ্রী), চর্যাপদের মূল পাঠ ও ব্যাখ্যা (১৯৩৮ খ্রী), *Studies in the Tantras* (১৯৩৯ খ্রী) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি স্বীয় প্রচেষ্টায় '*Sino-Indian Studies*' নামে চীন-ভারত সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা সম্পাদন ও প্রকাশ করিতে থাকেন। তিনি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ব-ভারতীর চীনাভবনে গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে অধ্যাপকরূপে তিনি চীনদেশে যান। ১৯৪৮-৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বিশ্বভারতীর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং পরে বিদ্যাভবন গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইলে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক এবং স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে ভারতীয় সংস্কৃতি সংঘের সদস্যরূপে পুনরায় তিনি চীনদেশে যান। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য নির্বাচিত হন। এই কার্য করিবার কালে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রভা (১৯০৩-১৯৫২ খ্রী) প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে অল্প কয়েকদিনের জন্য অভিনয় করেন। পরে ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানির অধীনে এবং আরও পরে শিশির-কুমার ভাদুড়ী পরিচালিত রঙ্গালয়গুলিতে অভিনয় করেন। ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিশিরকুমারের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া আমেরিকায় গমন করেন; এবং সীতার ভূমিকায় অভিনয় করিয়া সেখানকার নাট্যরসিক ও সমালোচকদের নিকট হইতে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। শিশির-কুমারের সম্প্রদায় ত্যাগ করিবার পর অন্যান্য সম্প্রদায়েও তিনি কতকগুলি ভূমিকায় বিশেষ সুনামের সহিত অভিনয় করেন। তাঁহার অভিনীত ভূমিকাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সীতা (১৯২৩-২৪ খ্রী), অহল্যা (১৯২৫ খ্রী), ইন্দুমতী (শেষরক্ষা ১৯২৭ খ্রী), বিষ্ণুপ্রিয়া (১৯৩১খ্রী), সুমিত্রা (১৯৩৯ খ্রী)। প্রভা চলচ্চিত্রেও সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করেন। স্নেহময়ী অথচ তেজস্বিনী পার্শ্বচরিত্রের অভিনয়ে তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখান।

প্রবোধকুমার দাস

প্রভাকর মিশ্র (খ্রী ৭ম-৮ম শতক) মীমাংসা দর্শনে অন্যতম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইহার মত প্রভাকরমত বা গুরুমত নামে প্রসিদ্ধ। ইনি বৃহতী এবং লঘ্বী নামে শাবরভাষ্যের দুই ব্যাখ্যা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি প্রাচীনতর আচার্য কুমারিল ভট্টের বিরোধী। কিংবদন্তী অনুসারে প্রভাকর প্রথমে কুমারিল ভট্টের শিষ্য ছিলেন।

ইনি দক্ষিণ কোশলরাজের প্রধান অমাত্য বিভাকরের পুত্র এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ প্রভাকরকে দাক্ষিণাত্যবাসী বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গবিদেহ প্রান্তে প্রভাকর-মতের দীর্ঘকালব্যাপী প্রচার লক্ষণীয়। মৈথিল মণ্ডন তথা বাচস্পতি এবং মাগধ প্রজ্ঞাকরগুপ্ত ইঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। বৃহতী এবং লঘ্বীর ব্যাখ্যা (যথাক্রমে ঋজুবিমলা পঞ্জিকা ও দীপশিখা পঞ্জিকা) ও মীমাংসা-পারিশিষ্ট তথা প্রকরণ পঞ্জিকার প্রণেতা গৌড়াচার্য শালিকনাথ প্রভাকর সম্প্রদায়ের প্রধান ধারক ও বাহক। অমৃতবিন্দু এবং ন্যায়রত্নাকর প্রণেতা রাঢ় দেশীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্র তথা মীমাংসামহোদধিকার পূর্ব-ভারতীয় আচার্য মহোদধিও প্রভাকরমতাবলম্বী ছিলেন। ন্যায়াচার্য উদয়ন ও উপাধ্যায় গঙ্গেশ প্রভাকর-মত পূর্বপক্ষ রূপে স্বীকার করিয়াছেন। লটকমেলক প্রহসনে শঙ্খধর রাঢ়প্রান্তে এই প্রস্থানের বহুল প্রচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনন্দনের স্মৃতি নিবন্ধেও প্রভাকর-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নিয়োগবাদ, অখ্যাতি-বাদ, অন্বিতাভিধানবাদ, কার্যবাক্যার্থবাদ, অপূর্বশাস্ত্রার্থবাদ, প্রভৃতি প্রভাকরের বিশেষ অবদান।

অনন্তলাল ঠাকুর

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭২-১৯৩১ খ্রী) জন্ম ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ২২ মাঘ বর্ধমানে ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে। আদি নিবাস হুগলি জেলার গুরুপ। পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়। প্রভাতকুমার ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জামালপুর হাইস্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন। কিছুদিন সিমলায় কেরাণীগিরি করিয়া তিনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করেন ও ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফেরেন। আট বৎসর গয়ায় আইন ব্যবসায় করিয়া ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ল'-কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে তাঁহার সাহিত্যজীবনের শুরু হয় ছাত্রাবস্থাতেই; প্রথমে তিনি কবিতা লিখিতেন, পরে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়াই গল্পরচনায় হাত দেন। শ্রীমতী রাধামণি দেবী ছদ্মনামে তিনি কুন্তলীনের প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বহুকাল 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন।

প্রভাতকুমার সর্বসমেত ১৪টি উপন্যাস ও শতাধিক গল্প লিখিয়াছিলেন। ঔপন্যাসিকের সামগ্রিক দৃষ্টি তাঁহার ছিল না। 'রত্নদীপ' তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া বিবেচিত হয়। সরল, অনাবিল হাস্যরসের গল্পলেখকরূপেই তাঁহার সমধিক প্রসিদ্ধি। 'রসময়ীর রসিকতা', 'বাস্তসাপ', 'বলবান জামাতা' প্রভৃতি গল্পে তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ১. ব্যঙ্গকাব্য—অভিশাপ (১৯০০ খ্রী) ২, গল্পগ্রন্থ—'নবকথা' (১৮৯৯ খ্রী), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯ খ্রী), 'গল্পাঞ্জলি' (১৯১৩ খ্রী), 'গল্পবীথি' (১৯১৬ খ্রী), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭ খ্রী), 'গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প' (১৯২১ খ্রী), 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৪ খ্রী), 'বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৬ খ্রী), 'যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৮ খ্রী), 'নূতন বউ ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৯ খ্রী), 'জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩১ খ্রী) ৩. উপন্যাস—'রমাসুন্দরী' (১৯০৮ খ্রী), 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২ খ্রী), 'রত্নদীপ' (১৯১৫ খ্রী), 'জীবনের মূল্য' (১৯১৭ খ্রী), 'সিন্দুর কৌটা' (১৯১৯ খ্রী), 'মনের মানুষ' (১৯২২ খ্রী), 'সত্যবালা' (১৯২৫ খ্রী), 'আরতি' (১৯২৭ খ্রী), 'সুখের মিলন' (১৯২৭ খ্রী), 'সতীর পতি' (১৯২৮ খ্রী), 'প্রতিমা' (১৯২৮ খ্রী), 'গরীব স্বামী' (১৯৩০ খ্রী), 'নবদুর্গা' (১৯৩০ খ্রী), 'বিদায়বাণী' (অসম্পূর্ণ, ১৯৩৩ খ্রী)।

জয়ন্তী সেন

প্রভাস (২১° ৪´ উত্তর ৭০° ২৬´ পূর্ব) গুজরাতে জুনাগড় জেলায় সমুদ্রতীরে অবস্থিত; প্রভাসপত্তন বা সোমনাথপত্তন হিন্দুদের ও জৈনদের তীর্থস্থান। বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির এই স্থলে অবস্থিত। কথিত আছে, দক্ষের জামাতা চন্দ্র বা সোমদেব এইখানে তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া লুপ্ত 'প্রভা' ফিরিয়া পান বলিয়া ইহার নাম প্রভাস। গান্ধারীর শাপে এইখানে যদুবংশ ধ্বংস হয়। সোমনাথ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম।

প্রাচীনকালে ইহা একটি বৃহৎ বন্দর ছিল। মার্কো পোলোর বিবরণীতে ইহার উল্লেখ আছে। এখন বন্দর ৪ কিলোমিটার দূরে ভেরাওয়ালে। কেশোদ বিমানক্ষেত্র ৫৩ কিলোমিটার দূরে। প্রথম সোমনাথ মন্দিরের নির্মাণকাল ও ধ্বংস সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায় না। দ্বিতীয় সোমনাথ মন্দির তৈয়ারি করেন সম্ভবতঃ বল্লভী রাজবংশ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে এবং ধ্বংস করেন সিন্ধুর আরব শাসনকর্তা (৭২৫ খ্রী)।

তৃতীয় মন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীতে লাল পাথরে নির্মিত হয়। সুলতান মামুদ মন্দিরটি দখল ও লুণ্ঠন করেন

(১০২৫ খ্রী)। ইহার পরেই আনুমানিক ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের ভীমদেব ও মালবের ভোজরাজা যৌথভাবে চতুর্থ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। আংশিক কাষ্ঠনির্মিত এই মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করেন কুমার পাল (১১৬৯ খ্রী)। ইহা পুনরায় ধ্বংস হয় আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতির হাতে (১১৯৭ খ্রী)। পঞ্চম মন্দিরটির নির্মাণ আরম্ভ করেন রাজা মহীপালদেব (১৩০৮-২৫ খ্রী) আর শেষ করেন তাঁহার পুত্র চতুর্থ খঙ্গর (১৩২৫-৫১ খ্রী)। প্রায় ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের শাসনকর্তা মুজফ্‌ফর খান মন্দিরটিকে আবার ধ্বংস করিয়া মসজিদে রূপান্তরিত করেন। ইহার পর অহল্যাবাঈ এখানে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

পুরাতন মন্দিরের ভিত্তির উপর বর্তমান ষষ্ঠ মন্দির নির্মিত হয় সর্দার প্যাটেলের আগ্রহাতিশয্যে। মন্দিররক্ষার জন্য সমুদ্রতীরে একটি পাথরের বাঁধও দেওয়া হইয়াছে। পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রাখা হইয়াছে সূর্য মন্দিরে।

যেখানে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে সেখানে ভাল্‌কা তীর্থ। সরস্বতী, কপিলা ও হিরণ্য, এই তিন নদীর সঙ্গমে রুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ইহাকে প্রাচী সঙ্গম বলে।

ইহা ছাড়া এখানে অপরূপ কারুকার্য মণ্ডিত জুনাগড় তোরণ, গৌরীকুণ্ড, মহাকালী ও পার্শ্বনাথের মন্দির, কোঠা বা হিন্দু দুর্গের ভগ্নাবশেষ, শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিধন্য মহাপ্রভুর বৈঠক ও হিন্দুমন্দির হইতে রূপান্তরিত মাইপুরী ও জামী মসজিদ দ্রষ্টব্য।

প্রভাসে তৈয়ারি কাষ্ঠের অর্গল ও লোহার তালার প্রসিদ্ধি আছে।

দ্র স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড ; H. Cousens, *Somnath and Other Mediaeval Temples in Kathiawad*, Calcutta, 1931 ; K. M. Munshi, *The Glory that was Gurjara Desa*, Pt. II, Bombay, 1954 ; R. C. Majumdar, ed. *The Delhi Sultanate*, Bombay, 1960.

কমলকুমার গুহ

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬ খ্রী) বাংলা সাহিত্যে 'বীরবল' ও প্রমথ চৌধুরী নামে খ্যাত প্রমথনাথ চৌধুরী পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের এক বিখ্যাত পরিবারের সন্তান। পিতা দুর্গাদাস, মাতা মগ্নময়ী। জন্ম ৭ আগস্ট ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে যশোহরে। কলিকাতার হেয়ার স্কুল হইতে তিনি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন, প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. (১৮৮৯ খ্রী) এবং ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. (১৮৯০ খ্রী) পাশ করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়িতে যান। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী আইন কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি কিছুকাল ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন বহুপঠনশীল সাহিত্যিক। তিনি জ্যেষ্ঠাগ্রজ আশুতোষ চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। লোকেন্দ্রনাথ পালিত এবং রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে তাঁহার সাহিত্যানুরাগ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সংগীতের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল।

বাংলা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ স্মরণীয়তার কারণ সাহিত্যে চলিত ভাষাকে মর্যাদাদান এবং 'সবুজপত্র' নামক পত্রিকা প্রকাশ (১৯১৪ খ্রী)। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া চলিত ভাষায় একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। প্রবন্ধকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর স্থান একান্ত স্বকীয় ও স্বতন্ত্র। তথ্যভারগ্রস্ত বক্তব্যসর্বস্ব প্রবন্ধ লিখনের ধারা পরিহার করিয়া তিনি প্রবন্ধকে বিদ্রূপে-পরিহাসে মার্জিত 'বিদগ্ধ' ভঙ্গিপ্রধান ও ব্যক্তিত্ব-দ্যোতক করিয়া তুলিয়াছেন। চিন্তায় তিনি বাঙ্গালীকে বিশ্বতোমুখী এবং কালসচেতন করিয়া গিয়াছেন।

প্রধানতঃ প্রবন্ধ লেখক বলিয়া পরিচিত হইলেও প্রমথ চৌধুরী কবিতা এবং প্রচুর গল্পও লিখিয়াছিলেন। সেগুলিতে তাঁহার বিশিষ্টতার চিহ্ন রহিয়াছে। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩ খ্রী), দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পদচারণ' (১৯১৯ খ্রী)। তিনি ফরাসী সনেটরীতি 'ট্রিয়লেট', 'তের্জারিমা' প্রভৃতি বিদেশী কাব্য-বন্ধ প্রবর্তিত করেন। 'চার-ইয়ারি কথা' (১৯১৬ খ্রী) 'আহুতি' (১৯১৯ খ্রী) 'নীললোহিত' (১৯৩২ খ্রী) প্রভৃতি তাঁহার সুপরিচিত গল্পগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত গল্পগুচ্ছের আদর্শ হইতে প্রমথ চৌধুরীর গল্প ভিন্নরীতি প্রবর্তন করিয়াছে।

প্রমথ চৌধুরী কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ-বক্তারূপে' তিনি বঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ভাষণ দেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

তাঁহাকে 'জগত্তারিণী' পদক দিয়া সম্মানিত করেন। সেই বছরেই আশুতোষ হলে প্রমথ-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভবতোষ দত্ত

প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৮৬৫-১৯৪৪ খ্রী) ভাটপাড়ার ভারত-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইঁহার পিতা তারাচরণ তর্করত্ন কাশীতে অধ্যাপকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত সেকালের প্রখ্যাত পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্ন। কাশীর দ্বারভাঙ্গা পাঠশালায় সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে ইঁহার দীর্ঘ অধ্যাপক-জীবনের সূচনা হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর প্রবর্তন হইলে ইনি তাহার সহিতও সংশ্লিষ্ট হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রমথনাথ বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি ভারত সরকারের নিকট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান করেন। নানা সভাসমিতি ও বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর সহিত তিনি নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে যশোহরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের নবম অধিবেশনে তিনি দর্শন শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের বৈদিক শাখায় তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে তিনি হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে মৈমনসিংহে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে প্রমথনাথ হিন্দু সমাজবিধির কালোচিত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কার্যতঃ তিনি মন্ত্র-দীক্ষার দ্বারা অনুন্নত জাতির উন্নয়ন ব্যাপারে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের সহযোগিতা করেন। ফলে রক্ষণশীল সমাজে গুরুতর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তর্কভূষণ মহাশয় বহু সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মৌলিক বাংলা গ্রন্থের মধ্যে কর্মযোগ (১৯০২ খ্রী) গীতাসভার প্রকাশিত পুস্তকাবলীর প্রথম পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়। ইহাতে গীতার বৈশিষ্ট্য ও গীতোক্ত কর্মযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। 'মায়াবাদ' (১৯০৮ খ্রী) ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংখ্য ও বেদান্ত বিষয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে তিনটি বক্তৃতার সংকলন। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে উহা বিশ্বভারতী প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় পুনর্মুদ্রিত হয়। 'সনাতন হিন্দু' (১৯৩০ খ্রী) হিন্দু সমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠন বিষয়ক বক্তৃতার সংকলন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম' (১৯৩৯ খ্রী) গ্রন্থে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অধর মুখার্জী বক্তৃতা স্থান লাভ করিয়াছে। বুদ্ধদেবের জীবনচরিত 'শাক্যসিংহ' (২য় সংস্করণ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ) ও বৌদ্ধ যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মণিভদ্র' (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত অপেক্ষাকৃত লঘু ধরনের গ্রন্থ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[১] (১৮৭৮-১৯৬০ খ্রী) প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও অর্থনীতিবিদ্ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত মীর্জাপুরে জন্ম গ্রহণ করেন।

শৈশবকাল হইতে ছাত্রজীবনের সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত তিনি বিশেষ সফলতা অর্জন করেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে ডি. এস্‌সি. উপাধি পান। কর্মজীবনে তিনি শিক্ষাবিদ্ হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বহু বৎসর (১৯২০-৩৫ খ্রী) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির 'মিণ্টো প্রফেসার' ছিলেন।

প্রমথনাথ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার প্রভাবে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগদান করেন। ১৯২৩-৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং ১৯৩৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার সভ্য ছিলেন। ১৯৪২-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভায় ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন। তিনি রামমোহন হলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯৪৪-৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৪৪-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতসভা (Indian Association)-র অধ্যক্ষ ছিলেন।

তিনি বহুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিণ্ডিকেট-এর সভ্য ছিলেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর তিনি মারা যান। তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তকাবলী : *A Study of Indian Economics,*

Public Administration in Ancient India, Indian Finance in the days of the Company, History of Indian Taxation.

অশোকা সেনগুপ্তা

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[২] (১৮৬৪-১৯৫৬ খ্রী) বাংলার এক দিকপাল সঙ্গীতাচার্য। দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর নিবাসী হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। সুরশৃঙ্গার বাদকরূপে সুপরিচিত হইলেও তিনি সংগীতে বহুমুখী প্রতিভার আধার এবং ধ্রুপদ ও খেয়াল রীতির কণ্ঠ সংগীতেও অভিজ্ঞ ছিলেন। ধ্রুপদী মুরাদ আলী ও আলী বখ্সের নিকট ধ্রুপদ, মেটিয়াবুরুজের নবাব দরবারের গায়ক আন্দাদ্দৌলার নিকট খেয়াল, শ্রীজান বাঈয়ের নিকট খেয়াল ও টপ্পা, গুরু বিনায়কের নিকট ধ্রুপদ, পুনার বীন্কার ও দ্বারবঙ্গরাজের সভাবাদক আন্না ঘোড়পুরের নিকট বীণা, শ্যামলাল গোস্বামীর নিকট এসরাজ এবং রামপুর দরবারের ওস্তাদ উজীর খাঁর নিকট সুরশৃঙ্গার শিক্ষা করেন। বর্তমান শতকে পশ্চিমাঞ্চলের সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনে বাংলা হইতে যাঁহারা প্রথম আমন্ত্রিত হন, তিনি তাঁহাদের অগ্রণী। লখনৌ, আমেদাবাদ, লাহোর, পুণা, নাগপুর, বাঙ্গালোর, শিমলা, কাশ্মীর, বারাণসী, দ্বারবঙ্গ, গিধোড়, পাটনা প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে, দরবারে কিংবা আসরে তিনি গুণপণা প্রদর্শন করিয়া যশস্বী হন। জীবনের শেষ ৫ বৎসর তিনি দিল্লীর সংগীত নাটক আকাদমির কার্য-নির্বাহক পর্ষদের সদস্য ছিলেন।

তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্যবৃন্দের মধ্যে জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, কুমুদেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মিশ্র, বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রমথনাথ বসু (১৮৫৫-১৯৩৫ খ্রী) ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের পুরোধা। প্রমথনাথ বসুর জন্ম ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মে চব্বিশ পরগনার গৈপুরে।

কৃষ্ণনগর হইতে তিনি এন্ট্রান্স (১৮৭২ খ্রী) এবং এফ. এ. (১৮৭৩ খ্রী) পাশ করেন। কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পাঠকালে গিল্‌ক্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করেন (১৮৭৪ খ্রী)। পরে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এস্‌সি. পাশ করেন। পর বৎসর তিনি রয়্যাল স্কুল অফ মাইন্‌স-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

প্রমথনাথ দেশে ফিরিয়া ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক-সংস্থা (জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া)-র উচ্চপদে নিয়োজিত হন (১৮৮০ খ্রী)। তাঁহার চাকরিকালের অধিকাংশই অতিবাহিত হয় মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খনিজ সমীক্ষায়। দল্লী, রাজাহারা ও বইলাডিলার বিপুল লৌহ আকর-সম্ভার তাঁহার উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। ইহা ব্যতীত রানীগঞ্জ, দার্জিলিং ও আসামে কয়লা; সিকিমে তামা এবং ব্রহ্ম দেশেও খনিজ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে এক বছর (১৯০১ খ্রী) প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূবিদ্যার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন।

সরকারি চাকরির শেষে (১৯০৩ খ্রী) ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের খনিজ-অধিকর্তারূপে গুরুমহিষানি এলাকায় লৌহ আকরের অবস্থান নির্ণয় করেন এবং সেই ভিত্তিতে টাটা-কর্তৃপক্ষকে লৌহ-ইস্পাতের কারখানাস্থাপনে সম্মত করান। ইহা তাঁহার একটি বিশিষ্ট কীর্তি।

স্বদেশপ্রেমী প্রমথনাথ বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে বিলাতে ইণ্ডিয়া সোসাইটির কর্মসচিব এবং দেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-এর প্রথম অবৈতনিক অধ্যক্ষ (১৯০৬-২০ খ্রী) ও পরে পরিদর্শকরূপে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া 'এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও হিন্দু সভ্যতাসম্বন্ধে তিনি বহু পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। শেষজীবনে ইংরেজী 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় নিজের জীবনস্মৃতি সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন (১৯৩২-৩৪ খ্রী)।

রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা কমলা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল প্রমথনাথের মৃত্যু হয়।

তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা: ১. *A History of Hindu Civilisation Under British Rule,* 3 vols. (১৮৯৪-৯৬ খ্রী), ২. *Epochs of Civilisation* (১৯১৩ খ্রী), ৩. *Swaraj—Cultural and Political* (১৯২৯ খ্রী)

দ্র Jogesh Chandra Bagal, *Pramatha Nath Bose,* Calcutta, 1955.

দিলীপ বসু

প্রমথনাথ মিত্র, পি. মিত্র ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সাধারণের নিকট পি. মিত্র নামে পরিচিত। চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটির মিত্র পরিবারে প্রমথনাথ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টার হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলনতত্ত্বের' দ্বারা তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। সুবিখ্যাত অনুশীলন সমিতিতে যুক্ত হইয়া পড়েন। প্রথমে এই সমিতির নাম ছিল ভারত অনুশীলন সমিতি। প্রমথনাথ ইহার নূতন নামকরণ করিলেন—অনুশীলন সমিতি। শারীরিক শক্তির উন্মেষ এবং দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসচর্চা এই সমিতির দুইটি প্রধান কার্য ছিল। প্রমথনাথ অনতিবিলম্বে সমিতির সভাপতি-পদে বৃত হন এবং ইহার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নিজে সমিতির যুবকগণকে ইতিহাস পড়াইতেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। ('বিপ্লবী আন্দোলন' দ্র)

দ্র জীবনতারা হালদার, বাংলার প্রসিদ্ধ অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৯৬৪ ; রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, নিরালম্ব স্বামী, কলিকাতা, ১৯৬৭।

যোগেশচন্দ্র বাগল

প্রমথলাল সেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নবীনচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র। প্রমথলাল ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রমথলাল 'নালুদা' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি অ্যাল্‌বার্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর কলেজে পড়েন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তিনি কিছুদিন সাধু হীরানন্দ আদভানির সহিত সিন্ধু দেশে কাটান। তাহার পর তিনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহকারীরূপে কাজ করেন। তিনি ১৮৯৭-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে ধর্মবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন ও খুবই সুনাম অর্জন করেন এবং বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সহিত ঘনিষ্ঠ হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নববিধান-সমাজের প্রচারক হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বার্লিন শহরে ধর্মমহাসভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রমথলাল খুব ভাল চিঠি লিখিতেন। তাঁহার কিছু চিঠি 'নালুদার চিঠি' নামে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তিনি বহু বৎসর *Interpreter and the Youngman, World and the New Dispensation* ও 'Navavidhan' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯১৪-৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেশবচন্দ্রপ্রতিষ্ঠিত 'ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন'-এর কর্মসচিব ছিলেন। তাঁহার গভীর সুমিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা সকলকে পরিতৃপ্ত করিত। তিনি চিরকুমার ছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র শ্রীশরৎকুমার রায় সম্পাদিত, 'সাধু প্রমথলাল' কলিকাতা, ১৯৩৩।

সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া (১৯০৩-১৯৫১ খ্রী) আসাম গৌরীপুরের জমিদার রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাল্যকালেই শিকার, খেলাধুলা ও গানবাজনায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ পায়। কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বি. এস্‌সি. পাশ করেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রমথেশ আসাম আইন সভায় যোগ দেন প্রথমে মনোনীত, পরে নির্বাচিত সদস্যরূপে।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম্‌স লিমিটেড'-এর বোর্ড অব ডিরেক্টার্সের অন্যতম সভ্য হিসাবে চলচ্চিত্র শিল্পের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের 'পঞ্চশর' ছবিতে একটি ছোট ভূমিকায় তিনি প্রথম চিত্রাবতরণ করেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইউরোপে যান এবং প্যারিসে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে হাতে-কলমে কাজ শেখেন। দেশে ফিরিয়া ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'বড়ুয়া ফিল্ম' নামে নিজস্ব চিত্র-সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'অপরাধী' ছবিতে নায়করূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এই ছবিতেই এদেশে কৃত্রিম আলোকে চিত্রগ্রহণ রীতির প্রথম প্রবর্তন হয়।

পরিচালক হিসাবে প্রমথেশের প্রথম ছবি 'বাংলা ১৯৮৩'। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউ থিয়েটার্স-এ যোগ দেন এবং পর পর কয়েকটি যুগান্তকারী চিত্র উপহার দিয়া ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজন করেন। শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে গঠিত 'দেবদাস' ও 'গৃহদাহ' ছবি দুইটি একাধারে পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

প্রমথেশ পরিচালিত ছবির সংখ্যা ২১ ; বাংলাতে ১৪ এবং হিন্দীতে ৭। শেষোক্ত শ্রেণীর চারখানি তাঁর মূল বাংলা ছবির হিন্দী চিত্ররূপ।

কয়েকটি ছবিতে তিনি সুরকার হিসাবেও নিজের বহুমুখী প্রতিভার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

প্রমাণ যাহা দ্বারা প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমাণপদবাচ্য। প্রমাণ ব্যতীত জ্ঞানের যাথার্থ্য নির্ধারিত হয় না।

ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে প্রমাণের বিষয় কমবেশি আলোচিত হইয়াছে। ন্যায় মতবাদে প্রমাণের আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ন্যায়শাস্ত্র প্রমাণশাস্ত্র বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রমাণ দ্বারাই বস্তুর পরীক্ষা সিদ্ধ হয়। প্রমাণের সংখ্যা এক বা একের অধিক সে প্রশ্ন লইয়াও বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা এবং স্থূল, সূক্ষ্ম, দৃশ্য, অদৃশ্য নানা গুণভেদে প্রমেয় বস্তুর বিভিন্নতার ফলে প্রমাণ একের অধিক বলা যায়।

চার্বাক বা লোকায়ত মতে প্রত্যক্ষ ভিন্ন অপর কোনও প্রমাণ স্বীকৃত হয় নাই। বৈশেষিক ও বিভিন্ন বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। কোনও কোনও বৈশেষিক মতাবলম্বীরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটি স্বতন্ত্র প্রমাণের উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে অনুপলব্ধি প্রমাণ ভিন্ন অন্যান্য প্রমাণ সকল অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত এবং অনুপলব্ধি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন বৌদ্ধ মতানুসারে, যেমন নাগার্জুন, প্রমাণ চারি প্রকার। পরে বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্যগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ সমর্থন করিয়াছেন। তদনুসারে বৌদ্ধেরা প্রমাণদ্বয়বাদী, ইহাই প্রসিদ্ধি। প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম এই ত্রিবিধ প্রমাণ সাংখ্য, পাতঞ্জল, ও রামানুজ মতে স্বীকৃত। নৈয়ায়িক সম্প্রদায় (প্রাচীন ও নব্য) চারিটি প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় নৈয়ায়িকগণ-স্বীকৃত উক্ত চারি প্রকার প্রমাণ ভিন্নও অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, ঐতিহ্য ও অভাব নামীয় আরও কয়েকটি প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। মীমাংসকগণ ছয়টি প্রমাণের উল্লেখ করিয়া থাকেন, যেমন প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। প্রাভাকরেরা উক্ত প্রমাণ সকলের মধ্যে প্রথম পাঁচটি স্বীকার করেন, অনুপলব্ধিকে তাঁহারা স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।

ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের, মনের সহিত আত্মার সন্নিকর্ষ হয়। মীমাংসকেরা প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে ন্যায়ের এই সন্নিকর্ষের কথা স্বীকার করেন। ন্যায়ের সহিত মীমাংসকদের পার্থক্য সন্নিকর্ষের স্বরূপ ও সংজ্ঞা বিষয়ে। ('ন্যায়, ভারতীয়' দ্র)।

চার্বাক বা লোকায়ত সম্প্রদায়মতে অনুমানাদি প্রমাণ স্বীকৃত নয় কারণ আনুমানিক জ্ঞান ব্যভিচাররহিত ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীল কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞান চার্বাকমতে স্বীকৃত নহে। চার্বাক ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ে অনুমান প্রমাণ স্বীকৃত।

অনুমান শব্দটি অনুমিতিকরণের বোধক। সেই হেতু অনুমিতির করণই অনুমান প্রমাণ।

যে সাদৃশ্য বলে কোনও দ্রব্য দ্রব্যান্তরে তাহার প্রতীতির সৃষ্টি করে, উক্ত দ্রব্যান্তর ইন্দ্রিয়সংযোগরহিত হয় এবং সেই সাদৃশ্যকেই উপমান প্রমাণ বলা হয়। যেমন, গবয় দর্শন করিয়া গোর স্মরণ। একটি জ্ঞাত ও একটি অজ্ঞাত বস্তুর মধ্যে যে সাদৃশ্য তাহাই উপমান।

আপ্তোপদেশের নাম শব্দ প্রমাণ। শব্দপ্রতিপাদ্য অর্থ বিষয়ে যিনি অভ্রান্ত, নিজে যাহা যথার্থ বলিয়া জানিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যা করাই যাঁহার উদ্দেশ্য তিনি তদ্বিষয়ে আপ্ত, তাঁহার উপদেশ শব্দ প্রমাণ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ নাই এমন কোনও বিষয়ের জ্ঞান যে শব্দের উঁপর নির্ভর করিয়া উৎপন্ন হয় তাহাই শাস্ত্র বা বৈদিক শব্দ। বৈদিক ও অবৈদিক উভয় শব্দকেই কুমারিল ভট্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রভাকর অবৈদিক শব্দের সিদ্ধতা স্বীকার করেন না; তাঁহার মতে বৈদিক শব্দই প্রকৃত শব্দ প্রমাণ।

কোনও একটি বস্তুর জ্ঞান যখন অপর একটি বস্তুর জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে তখন দ্বিতীয় বস্তুটির জ্ঞানই অর্থাপত্তি প্রমাণ। আপাত বিরোধের সামঞ্জস্যসাধনই অর্থাপত্তিকে অনুমান হইতে পৃথক করিয়াছে ইহাই কুমারিল ভট্টের অভিমত। প্রভাকর মনে করেন সংশয়ই অর্থাপত্তির জনক এবং ইহাই অর্থাপত্তিকে অনুমান হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

ইন্দ্রিয়সংযোগ ব্যতিরেকে যাহা অভাববোধের সৃষ্টি করে সাধারণার্থে তাহা অনুপলব্ধি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রভাকর অভাবকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে গ্রহণ করেন নাই সুতরাং তিনি অনুপলব্ধিকে জ্ঞানের কারণরূপে স্বীকার করেন না। কুমারিল অভাবকে অনুপলব্ধিপ্রসূত স্বতন্ত্র পদার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

কোনও কোনও সম্প্রদায় সম্ভব ও ঐতিহ্যকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন আবার কেহ কেহ

উক্ত প্রমাণদ্বয়কে যথাক্রমে অনুমান ও শব্দের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

যাহা দ্বারা ব্যাপক কোনও পদার্থের সত্তাগ্রহণাধীন ব্যাপ্য কোনও পদার্থের সত্তাগ্রহণ করা যায় তাহাকে সম্ভব প্রমাণ কহে, যেমন ব্যাপক সহস্র জ্ঞানাধীন ব্যাপ্য শতের জ্ঞান হয়।

যে প্রমাণের প্রথম প্রবক্তা কে তাহার ঠিক নাই কিন্তু বহুদিন হইতে প্রবাদ বাক্য হিসাবে চলিয়া আসিতেছে তাহাকে ঐতিহ্য প্রমাণ কহে।

যাহা দ্বারা বিরোধী কোনও বস্তুর অভাব দর্শনে সেই বস্তুর কল্পনা করা যায় তাহাকে অভাব প্রমাণ কহে।

ভারতীয় বিভিন্ন প্রমাণশাস্ত্রে প্রমাণের প্রামাণ্য সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা আছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, নৈয়ায়িক সম্প্রদায় পরতঃপ্রামাণ্যবাদী। তাঁহাদের মতে জ্ঞানমাত্রের প্রামাণ্য পরতোগ্রাহ্য। অপরপক্ষে মীমাংসক সম্প্রদায়গুলি স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী।

পাশ্চাত্য দেশে বিভিন্ন দার্শনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রমাণ, বিশেষভাবে অনুমান প্রমাণের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সব আলোচনা প্রধানতঃ আকারগত (ফর্ম্যাল)। কিন্তু ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক পদ্ধতিতে প্রমাণের আলোচনা মূলতঃ যাথার্থ্যগত।

মনোরঞ্জন বসু

প্রমীলা১ স্ত্রীরাজ্যের অধিনায়িকা। ইঁহার নির্দেশে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের অশ্ব নিরুদ্ধ হইলে অর্জুন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহার সহিত বিবাহে সম্মত হইয়া অশ্বমুক্ত করেন।

দ্র জৈমিনীয় মহাভারত, অশ্বমেধ পর্ব; কাশীদাসী মহাভারত।

প্রমীলা২ রাক্ষসরাজ রাবণের বীরপুত্র মেঘনাদের সহধর্মিণী প্রমীলা মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র একটি মহীয়সী বীরাঙ্গনা। তিনি দানবরাজ কালনেমির কন্যা।

সীতানাথ গোস্বামী

প্রমোদকুমার ঘোষাল (১৯০৫-১৯৬১ খ্রী) বাংলার ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন; পিতা প্রসন্নকুমার ঘোষাল। ইনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। হিন্দুস্কুল হইতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জলপানি পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; আই. এস. সি. পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলন দ্রুত প্রসারলাভ করে; প্রমোদকুমার ঘোষাল এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন ('ছাত্র আন্দোলন' দ্র)। এই বৎসর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে ছাত্র সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং এই সম্মিলনীতে গঠিত নিখিলবঙ্গ ছাত্র সমিতির (এ. বি. এস. এ.) প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এ. বি. এস. এ.-র মুখপত্র "India Tomorrow" পত্রিকার তিনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইনঅমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত "বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদ"-এর কার্যকরী সমিতির তিনি সভ্য ছিলেন এবং এই অপরাধে তাঁহার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। উত্তরকালে তিনি নানাবিধ রাজনৈতিক ও সমাজহিতকর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৪ অক্টোবর ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অমরেন্দ্রনাথ রায়

প্রয়াগ এলাহাবাদ দ্র

প্রলয় প্রলয় শব্দের অর্থ ধ্বংস বা বিনাশ। পুরাণে চতুর্বিধ প্রলয়ের কথা পাওয়া যায়; যথা—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। বস্তুর প্রাত্যহিক ক্ষয়ের নাম নিত্য প্রলয়। সুষুপ্তিকেও নিত্য প্রলয় বলা হয়। সুষুপ্ত ব্যক্তির লিঙ্গশরীর বাসনারূপে অবস্থিত থাকে। সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়। ব্রহ্মার দিবাবসানে ত্রৈলোক্যের বিনাশকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। ইহাকে খণ্ড প্রলয়ও বলা হইয়া থাকে। এই প্রলয়কালে প্রজাপতি ত্রিলোককে কুক্ষিগত করেন।

প্রাকৃত প্রলয়ে হিরণ্যগর্ভের বিনাশে সকল কার্যবস্তু বিনষ্ট হইয়া যায়। মহদাদি তত্ত্বসমূহের বিনাশের নামই প্রাকৃত প্রলয়। দুই পরার্ধ কালের পর কালাগ্নিরুদ্র কর্তৃক এই প্রলয় সংঘটিত হয়। প্রাকৃত প্রলয়ে নিখিল প্রপঞ্চের ধ্বংস ঘটে। ইহাকে মহাপ্রলয়ও বলা হয়। যোগীর পরমাত্মাতে স্থিতির নাম আত্যন্তিক প্রলয়।

সুখময় ভট্টাচার্য

প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়িয়া প্রশান্ত মহাসাগর বিস্তৃত। বৃহত্তম এই মহাসমুদ্রটি প্রায় ত্রিভুজাকৃতি। নিরক্ষরেখা বরাবর ইহার প্রাশস্ত্য প্রায় ১৬০০০ কিলোমিটার, উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘতম বিস্তৃতি ১৫১২৮ কিলোমিটার। উত্তরদিকে সংকীর্ণ বেরিং প্রণালী সুমেরু মহাসাগরের সহিত ইহার যোগাযোগ রক্ষা করে; পূর্ব দিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিমে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকা এই মহাসাগরটির সীমানা সূচিত করে।

কেহ কেহ বলেন, ভূপৃষ্ঠের যে অংশ হইতে চন্দ্রের সৃষ্টি সেই বিশাল গহ্বরটি প্রশান্ত মহাসাগর অধিকার করিয়া আছে। এই মতবাদ বহু বিতর্কিত; আবার কেহ কেহ বলেন, এক বা একাধিক ভূখণ্ড ক্রমশঃ বসিয়া যাইবার ফলেই বর্তমান প্রশান্ত মহাসাগরের সৃষ্টি।

প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমতল বা অধোভঙ্গ ও ঊর্ধ্বভঙ্গ হেতু ঢেউ-খেলানো এবং গড়ে প্রায় ৪৬০০ মিটার গভীর। কখনও ইহার অধোভঙ্গ সমুদ্রখাত সৃষ্টি করিয়াছে, আবার কখনও প্রশস্ত ঊর্ধ্বভঙ্গ মগ্ন-মালভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকা সংলগ্ন "অ্যাল্‌ব্যাট্রস-মালভূমি" নামক মগ্ন অংশটি অপেক্ষাকৃত অগভীর এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া অবস্থিত। হাওয়াই দ্বীপও একাধিক আগ্নেয়গিরি-সম্বলিত একটি ঊর্ধ্বভঙ্গ।

প্রশান্ত মহাসাগরের আর একটি বৈচিত্র্য ইহার দ্বীপ-মালার সন্নিকটবর্তী গভীর সমুদ্রখাত। এইগুলি প্রধানতঃ দ্বীপমালার সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত সমুদ্র-সমতলের গভীরতম অংশ। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই গভীরতম খাতগুলি তটপার্শ্বস্থ ভঙ্গিল পর্বতমালার সহিত অচ্ছেদ্যরূপে সম্পর্কিত। অ্যালিউশিয়ান, কুরীল, জাপান, গুয়াম, ফিলিপ্পীন প্রভৃতি দ্বীপমালার পার্শ্বেই অবস্থিত যথাক্রমে অ্যালিউশিয়ান খাত, কুরীল ও জাপান খাত, মারিয়ানা খাত, ফিলিপ্পীন খাত ইত্যাদি এবং নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্বে কার্মাডাক ও টোংগা খাত এবং দক্ষিণ আমেরিকার সন্নিকটবর্তী আটাকামা খাত প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে গভীরতম সমুদ্রখাত হইল মারিয়ানা খাত। ইহার গভীরতা ১০৮৭০ মিটার।

প্রশান্ত মহাসাগরে প্রায় ২০০০০ দ্বীপ আছে। দ্বীপগুলি নানা শ্রেণীর। মহাদেশীয় দ্বীপগুলি মহাদেশের মহীসোপানে অবস্থিত ও তাহারই উত্থিত অংশবিশেষ। মহাদেশের প্রধান ভূখণ্ডের সহিত এই দ্বীপগুলির ভূতাত্ত্বিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম তটের সন্নিকটস্থ অ্যালিউশিয়ান, জাপান, কুরীল, রিউকিউ, ফিলিপ্পীন, ইন্দোনেশিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জগুলি দীর্ঘবিস্তৃত ভঙ্গিল পর্বতমালার উচ্চতর অংশ। এই ভঙ্গিল পর্বতমালার বলয়টি ভূপৃষ্ঠের অন্যতম দুর্বল অংশ। আগ্নেয়গিরি-সমাকীর্ণ বলিয়া এই অঞ্চল প্রশান্ত মহাসাগরের আগ্নেয়মেখলা নামে পরিচিত। সমুদ্রতল হইতে আগ্নেয়গিরি ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া ক্রমে আগ্নেয়দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্বভাগে গালাপাগোস, ক্লিপারটন, ঈস্টার আইল্যাণ্ড উল্লেখযোগ্য দ্বীপ।

প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবালদ্বীপের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল জুড়িয়া এই দ্বীপগুলি ছড়াইয়া রহিয়াছে। মেলানেশিয়া অঞ্চলের সলোমন ও ফিজি; মাইক্রোনেশিয়া অঞ্চলের ক্যারোলিন, মার্শাল ও গিলবার্ট এবং পলিনেশিয়া অঞ্চলের কুক, লাইন, সোসাইটি ও টুয়ামাটো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রবালদ্বীপ।

প্রশান্ত মহাসাগরের চতুর্দিকে নবগঠিত ভঙ্গিল পর্বত-মালা প্রধানতঃ উপকূলভাগের সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত। কাজেই তটসংলগ্ন খাঁড়ি বা উপসাগরের সংখ্যা সীমিত। পূর্ব দিকে কালিফোর্নিয়া উপসাগর ও পশ্চিম দিকে এশিয়ার প্রধান ভূখণ্ড ও দ্বীপমালার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বেরিং সাগর, ওখটস্ক সাগর, জাপান সাগর, পীত সাগর, পূর্ব চীন সাগর ও দক্ষিণ চীন সাগর উল্লেখযোগ্য। কার্পেন্টারিয়া উপসাগর ও আরাফুরা সাগর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত।

প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে ডায়াটোম, রেডিও-লারিয়া, গ্লোবিজারিনা ইত্যাদি নানারূপ সামুদ্রিক সঞ্চয় (সিন্ধুমল) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সঞ্চয় প্রধানতঃ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক বা একাধিক কোষবিশিষ্ট সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ। সমুদ্রতলদেশে এইগুলি তিলে তিলে সঞ্চিত হয়। সমুদ্রবক্ষের অন্যান্য সঞ্চয়ের মধ্যে রহিয়াছে আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত বিভিন্ন উপাদান, উল্কাখণ্ডের অবশেষ এবং হিমশৈলবাহিত নানা আকারের প্রস্তরখণ্ড অথবা প্রশান্ত মহাসাগরের উভয় পার্শ্বের মহীসোপানের ভূভাগ হইতে ক্ষয়িত নুড়ি, বালি, কাঁকর ও পলি ইত্যাদি।

পৃথিবীর গতি, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রজলের উচ্চতা ও লবণতা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে অন্যান্য মহাসাগরের ন্যায় প্রশান্ত মহাসাগরেরও উত্তর ও দক্ষিণ অংশে নানা সমুদ্রস্রোত চক্রাকারে আবর্তন করিতেছে। শীতল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ঘেঁসিয়া হামবোল্ট বা পেরুস্রোত নাম লইয়া

নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং তথায় ইহার নাম দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে নিরক্ষীয় অঞ্চলস্থিত উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত উষ্ণ স্রোতরূপে এশিয়ার পূর্ব উপকূল অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে এবং তথায় ইহার নাম জাপানস্রোত বা কুরোশিও স্রোত। শীতল কামচাটকাস্রোত ও কালিফোর্নিয়াস্রোত উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয় উপকূল-সন্নিকটবর্তী মহীসোপানে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ মৎস্যচারণক্ষেত্র অবস্থিত। জাপানের নিকটবর্তী সমুদ্রাঞ্চলে পৃথিবীর সর্বাধিক মৎস্য উত্তোলিত হয়। ইহা ছাড়াও প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশি লবণ ও বহুবিধ রাসায়নিক উপাদানে সমৃদ্ধ বলিয়া ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

দ্র R. C. Sharma and N. Vatal, *Oceanography for Geographers*, Allahabad, 1962.

সাবিত্রী মুখোপাধ্যায়

প্রশান্তকুমার সেন (১৮৭৪-১৯৫০ খ্রী) নববিধান-সমাজের অন্যতম প্রচারক প্রসন্নকুমার সেনের একমাত্র পুত্র। প্রশান্তকুমার ১১ নভেম্বর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুপুরুষ, ধীমান, সুগায়ক ও সুবক্তা ছিলেন। 'এল্‌বার্ট' স্কুল হইতে প্রবেশিকা এবং 'জেনারেল এসেম্ব্রীজ' কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৯-১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ময়্যাল সায়েন্স'-এ 'ট্রাইপস' পাশ করিয়া ও ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফেরেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডি. এল. উপাধি পান। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে 'সিটি কলেজে' ও 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে' আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং দুইবার 'টেগোর ল লেকচারার' নিযুক্ত করেন। তিনি কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় করিয়া পাটনা হাইকোর্টের জজ হন। পরে তিনি ময়ূরভঞ্জ এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের দেওয়ান হন। তিনি ভারতীয় গণপরিষদের (১৯৪৬-১৯৪৯ খ্রী) এবং উহার অন্তে ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন।

তিনি বালকদিগের 'নীতিবিদ্যালয়ে'র শিক্ষক ছিলেন ও কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন'-এর সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি কয়েকবার বিলাতে যান ও বিবিধ ধর্মসভায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে মাদ্রাজে 'অল-ইণ্ডিয়া থিয়িষ্টিক কন্‌ফারেন্স'-এর সভাপতি মনোনয়ন করা হয়। তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *Penology, Crime and Punishment, Keshubchander Sen and Coochbehar Betrothal*, 1878, *Biography of a New Faith*, vol. I & II (1950-1954)। তিনি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর দেহত্যাগ করেন।

সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রসন্নকুমার আচার্য (১৮৯০-১৯৬০ খ্রী) প্রখ্যাত ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পবিশারদ্। জন্ম ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং লেইডেন (Leyden) ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ. ডি. ও ডি. লিট. ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। তিনি বিখ্যাত 'মানসার সিরিজ' ৭ খণ্ডে সম্পাদনার পর পণ্ডিতসমাজে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। বিদেশের পণ্ডিতমহল হইতে স্থাপত্যশিল্পের উপর বক্তৃতা প্রদানের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রিত হইয়া তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ভাষণ দেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের এবং প্রাচ্যবিভাগীয় বিষয়ের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহার অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত কয়েকটি পুস্তক : A Dictionary of Hindu Architecture (1927); Indian Architecture according to Manasara Silpasastra (1927); An Encyclopaedia of Hindu Architecture (1946)।

অশোকা সেনগুপ্ত

প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-৬৮ খ্রী) আইনজ্ঞ, বদান্য ভূস্বামী ও জনহিতৈষী। পিতামহ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ও পিতা গোপীমোহন ঠাকুর। জন্ম ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর, মৃত্যু ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ আগষ্ট, শিক্ষা শেরবোর্ন স্কুলে ও হিন্দু কলেজে। সরকারি উকিল হিসাবে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। লর্ড ড্যালহৌসি কর্তৃক ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইলে প্রসন্নকুমার তাহার ক্লার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত হন (১৮৫৪ খ্রী) এবং পরে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, কলিকাতা পৌরসংস্থা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সদস্য ছিলেন এবং মেয়ো হাসপাতাল এবং হিন্দু কলেজের গভর্নর ছিলেন। তিনি বাংলা 'অনুবাদক' ও ইংরেজী 'রিফর্মার' পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সি. এস. আই. উপাধি পান। তিনি বাঙ্গালীর নিজস্ব প্রথম নাট্যশালা 'হিন্দু থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (১৮৩১ খ্রী)। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং পরে তাহার সভাপতি হন (১৮৬৭ খ্রী)। তিনি রাজা রামমোহনের বিশেষ অনুগামী এবং সতীদাহ আন্দোলনে তাঁহার অন্যতম সহযোগী ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন লক্ষ টাকা দান করেন, সেই টাকার সুদে প্রখ্যাত 'টেগোর ল লেকচার' প্রবর্তিত হয়। তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: *An Appeal to Countymen, Table of Succession according to the Hindu Law of Bengal.*

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসন্নকুমার রায় (১৮৪৯-১৯৩২ খ্রী) খ্যাতনামা দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্‌ প্রসন্নকুমার রায় (ড: পি. কে. রায়) ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্ভুক্ত শুভাঢ্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানে স্নাতক উপাধি লাভ করেন। তিনি 'গিলক্রাইস্ট' বৃত্তি লাভ করিয়া ইংল্যাণ্ডে গমন করেন, এবং মনোবিজ্ঞানে লণ্ডন ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্‌সি. উপাধি অর্জন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রসন্নকুমার পাটনা ও ঢাকায় এবং পরে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপকের পদে নিয়োজিত হন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের (১৯০২-১৯০৫ খ্রী) পদে উন্নীত হন। পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, কলেজসমূহের পরিদর্শক ও ইংল্যাণ্ডে ভারতসচিবের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতার কাজে নিযুক্ত হন।

যৌবনের প্রারম্ভে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার এবং আনন্দমোহন বসুর চেষ্টাতেই বিলাতে ব্রাহ্মসমাজ, 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' ও একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। ইনি কিছুদিন সাধারণ ব্রাহ্মসভার সভাপতি ছিলেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অশোকা সেনগুপ্ত

প্রসাদ দেবতাকে নিবেদিত অথবা গুরুজনের ভুক্তাবশিষ্ট বস্তু। পবিত্রভাবে শ্রদ্ধার সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়; প্রসাদের অবমাননা করিতে বা উহা উপেক্ষা করিতে নাই। দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়া পশুর মাংস ও পুরীর জগন্নাথদেবের প্রসাদ মহাপ্রসাদ নামে পরিচিত। জগন্নাথদেবের প্রসাদ সম্পর্কে স্পর্শদোষ বিচার করা হয় না। শনির প্রসাদ পূজাস্থানে গ্রহণ করিতে হয়, ইহা ঘরে নেওয়া বা বাসি করা নিষিদ্ধ। (সভাতে লইবে প্রসাদ ঘরে নাহি নিবে। সদ্যঃ খাইবে প্রসাদ বাসি না করিবে।) তবে সকল দেবতার প্রসাদগ্রহণ বিহিত নয়। জয়দুর্গা ও জাতাপহারিণীর প্রসাদ এবং শিবের নির্মাল্য অগ্রাহ্য।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রসাধন অলংকরণ; দেহ ও গৃহাদির শোভা বৃদ্ধি করিবার প্রকরণকে প্রসাধন বলা হইত। পরে কেবলমাত্র দেহের ক্ষেত্রেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কামসূত্রে লিখিত আছে—নায়ক প্রাতঃকালে উঠিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে দন্তধাবনপূর্বক কিছু অনুলেপন, ধূপ ও মাল্য গ্রহণ করিয়া অধরোষ্ঠে সিক্‌থ (মোম) ও অলক্তক দিয়া আদর্শে মুখ দেখিয়া মুখবাস ও তাম্বুল লইয়া কার্যে নিযুক্ত হইবে। শরীর সংস্কারের জন্য নানা বিধান দিন ধরিয়া বলা হইয়াছে। যেমন প্রত্যহ স্নান, দ্বিতীয় দিনে উৎসাদন অর্থাৎ ক্ষার ইত্যাদির দ্বারা দেহের মল অপনোদন, তৃতীয় দিনে ফেনকের লেপন, চতুর্থ দিনে ক্ষৌরকর্ম ইত্যাদি। দেহের এই প্রসাধন ছাড়াও বেশভূষাদির দ্বারা দেহের অলংকরণও প্রসাধন। স্ত্রীলোকদিগের ক্ষেত্রে প্রসাধন বলিতে অধিকন্তু বুঝায় কেশসংস্কার, ক্ষারাদির দ্বারা মস্তকের চর্মের মল অপনোদন, বেণী ও কবরী রচনা করিয়া তাহাতে 'শেখরক' ও 'আপীড়াদি' পুষ্পময় শিরোভূষণ দিয়া কেশের শোভাবর্ধন ইত্যাদি। নারীগণ ওষ্ঠে সিক্‌থ ও মুখমণ্ডলে চন্দনরজঃ বা লোধ্ররেণু দিয়া প্রসাধন করিত। ভ্রূ ও নয়নে কাজল দিত। অঙ্গে চন্দন অগুরু প্রভৃতির অনুলেপন দিয়া দেহ সুরভিত করিত। প্রসাধনের জন্য প্রাচীনকালের বিলাসী ও বিলাসিনীগণ নানা কলা শিক্ষা করিত। প্রাচীনকালের প্রসাধন সামগ্রীর পরিবর্তে একই উদ্দেশ্যে বর্তমানকালে বহু ও বিবিধ প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহৃত হইতেছে।

ত্রিদিবনাথ রায়

প্রসেনজিৎ ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম কোশলের রাজা মহাকোশলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রসেনজিৎ

সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ভগ্নীর সহিত মগধের রাজা বিম্বিসারের বিবাহ হয়। বিম্বিসার তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক নিহত হইলে সেই নৃশংসতার প্রতিফল দিবার জন্য প্রসেনজিৎ বিম্বিসারের বিবাহে যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত কাশীগ্রাম অজাতশত্রুর নিকট হইতে ফিরাইয়া নেন এবং যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে প্রথমে অজাতশত্রু জয়ী হইলেও পরে এক অতর্কিত আক্রমণে তিনি সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করেন। শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। প্রসেনজিৎ স্বীয় কন্যার তাঁহার সহিত বিবাহ দেন এবং যৌতুক স্বরূপ কাশীগ্রাম ফিরাইয়া দেন।

প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। বুদ্ধদেবের জেতবনে অবস্থানকালে তিনি নিয়মিত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেন। তাঁহার রানী মল্লিকাও বুদ্ধদেবের ভক্ত ছিলেন।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

প্রহসন ইংরেজী ফার্স (Farce)-এর প্রতিশব্দ। হাস্যরসই তাহার মূল উপাদান; সে হাস্যরস অতিমাত্রায় লঘু ও অতিরঞ্জিত হওয়ায় কিছুটা অবাস্তব। 'ট্রাজেডি'র সহিত 'মেলোড্রামা'র যে সম্পর্ক কমেডির সহিত ফার্সের তাহাই। কমেডিতে সমাজে দুষ্ট ক্ষতের প্রতি যে বিদ্রূপ ও ব্যক্তিগত দুর্বলতার যে হাস্যকর প্রকাশ থাকে, তাহারই অতিরঞ্জিত রূপ প্রহসনের উপজীব্য।

প্রাচীন সমাজে সাধারণ মানুষের স্থূল রসবোধের উপযুক্ত করিয়াই বিভিন্ন ধরনের প্রহসনের সৃষ্টি। প্রাচীন গ্রীসে মেগারা শহরে উদ্দামনৃত্যসহযোগে ব্যঙ্গকৌতুক পরিবেশন করা হইত। তাহার অনেক কিছুই ছিল অশ্লীল। তাহারই পরিবর্তিত রূপ গ্রীসের প্রাচীনতম কমেডি। কমেডির মধ্যে অনেক দৃশ্যই থাকিতে পারে যাহা প্রহসন বলা চলে, কিন্তু শুধু অট্টহাস্যের ভিত্তিতে বড় প্রহসন সম্ভব নয়। সেইজন্য সংস্কৃত নাটকের মধ্যে 'ভান' ও 'প্রহসন'-শ্রেণীর নাটক স্বল্পপরিসর। এই দুই শ্রেণীর নাটকের স্থূল হাস্যরসের ভিত্তি লম্পট, ধূর্ত ও ভবঘুরেশ্রেণীর লোকদের দোষাবলী ও বিসদৃশতার অতিরঞ্জন। সাধারণ নাটকের বিট ও বিদূষকগণই এসকল নাটকের মূলচরিত্র। 'ভান'-শ্রেণীর নাটকের কামগন্ধযুক্ত আবহাওয়া প্রহসনে কম থাকায় ইহার মধ্যে ব্যঙ্গ-হাস্যের প্রকাশ বেশি।

মধ্যযুগের ইওরোপে 'মিস্ট্রি প্লে' -জাতীয় নাটকের কয়েকটিতে প্রহসনের উপযোগী চরিত্র দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডের '*Second Shepherd's Play*'-তে ম্যাকচরিত্র, '*Deluge*' নাটকে 'নোহ'র কলহপরায়ণা পানাসক্তা স্ত্রী ইত্যাদি চরিত্রে স্থূল হাস্যরসের অবতারণা দেখা যায়। 'ইণ্টারল্যুড'গুলি প্রহসনধর্মী। ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর প্রহসনধর্মী নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জার্মানীর হানস্ শাকয়ের, ইটালীর জর্জিও আলিওনে দা আস্তি-র কয়েকটি নাটক, সেক্সপিয়রের 'এ কমেডি অফ এররস্' ও 'দি মেরি ওয়াইভ্স অফ উইণ্ড্সর' এবং ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের 'লে ফুরবেরিয়ে দ্য স্কাপ্যাঁ' প্রভৃতি কয়েকটি নাটক। এইগুলির অতিরঞ্জন ও স্থূল হাস্যরস সুস্পষ্ট। ১৯শ শতাব্দীর প্রহসনের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা অনেক মার্জিত রূপ দেখা যায়। ফরাসী নাট্যকার ইউজেন লাবিশ-এর নাম এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। ২০শ শতাব্দীর সমস্যাকণ্টকিত সমাজে প্রহসনের প্রয়োজনীয়তা কমে নাই। ইংল্যাণ্ডে অ্যাণ্ড্‌ইচ থিয়েটারে ও হোয়াইট হল থিয়েটারে বেন ট্র্যাভার্স প্রভৃতির রচিত আধুনিক প্রহসনগুলির জনপ্রিয়তা তাহার প্রমাণ।

নীতীশকুমার বসু

প্রহসন, বাংলা বাংলা নাটকের ন্যায় বাংলা প্রহসনও আধুনিক কালের সৃষ্টি। ইওরোপীয় আদর্শ যে সম্মুখে ছিল না তাহা নহে, তবুও প্রহসনরচনার ক্ষেত্রে বাঙালী প্রতিভার সহজ কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'কে (১৮৫৪ খ্রী) বাংলা প্রহসনের আদি বলিয়া গণ্য করা হইলেও ইহা বিশুদ্ধ প্রহসন নহে, সমাজঘটিত নকশানাটক। ইহার ফলশ্রুতি নিছক হাস্যাবেগ নহে। রামনারায়ণ তিনখানি বিশুদ্ধ প্রহসন রচনা করেন; 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (১৮৬৫ খ্রী), 'উভয়সংকট' ও 'চক্ষুদান' (১৮৬৯ খ্রী) (নাটক, বাংলা দ্র)। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা' প্রহসন হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের বিদ্রূপাত্মক সামাজিক প্রহসনদ্বয় 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হয়। প্রথমটিতে ইঙ্গবঙ্গ যুবসমাজের বিকৃত রুচিবোধ, পানাসক্তি ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা এবং দ্বিতীয়টিতে অধর্মাচারী প্রাচীন সমাজের ভণ্ডামি ও লাম্পট্য ধিকৃত হইয়াছে। প্রহসনদ্বয় মধুসূদনের সার্থক ও অবিস্মরণীয় কীর্তি। পরবর্তী কালের সমস্ত প্রহসনই এই দুইটির দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত। এই সময়েই দীনবন্ধু মিত্র প্রহসনরচনায় ব্রতী হন।

করুণ হাস্যরস 'হিউমার'-জাতীয় সৃষ্টিই তাঁহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তাঁহার 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬ খ্রী) কেবল শ্রেষ্ঠ প্রহসনই নহে, উৎকৃষ্ট হাস্যরসাত্মক নাটক। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬ খ্রী) ও 'জামাই বারিক' (১৮৭২ খ্রী) হাসি-অশ্রুর মিলনে চমৎকার সৃষ্টি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তিনটি মৌলিক প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন; যথা 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২ খ্রী), 'এমন কর্ম আর করবো না' (১৮৭৭ খ্রী) পরে 'অলীকবাবু' এবং 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬ খ্রী)। ইহাদের মধ্যে 'অলীকবাবু' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার অপর দুইটি প্রহসন 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪ খ্রী) ও 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৯০২ খ্রী) যথাক্রমে বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার মোলিয়েয় প্রণীত 'ল্য বুর্জোয়া জাঁতিয়ম' ও 'ল্য মারিয়াজ্ ফোর্সে' নামক প্রহসনদ্বয়ের স্বাধীন অনুবাদ। বিচিত্র সংগীতধারায় তাঁহার প্রহসনগুলি মধুরসসিক্ত।

শিশিরকুমার ঘোষ 'নয়শো রুপেয়া' (১৮৭৩ খ্রী) ও 'বাজারের লড়াই' (১৮৭৪ খ্রী) নামে দুইখানি প্রহসন রচনা করেন। প্রহসন দুইখানি স্যাটায়ার-জাতীয় বিদ্রূপাত্মক। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পঞ্চরং'-জাতীয় প্রহসনগুলি ('বেল্লিক বাজার', 'সপ্তমীতে বিসর্জন' ইত্যাদি) রচনা হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে। একমাত্র 'য্যায়সা কি ত্যায়সা' (মলিয়েয়-প্রণীত 'লা'মুয়ার মেদ্স্যাঁ' অবলম্বনে রচিত) কিছুটা সার্থক।

রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রহসনরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রহসনগুলির অধিকাংশই স্যাটায়ার-জাতীয় অর্থাৎ বিদ্রূপাত্মক, তবে বিশুদ্ধ প্রহসনও আছে। বিদ্রূপের লক্ষ্য পাশ্চাত্যভাব-বিকৃত পুরুষ ও স্ত্রীসমাজ। রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য তিনি পাশ্চাত্যভাবাপন্ন প্রগতিশীল সমাজ-জীবনের প্রতি সর্বত্রই সুবিচার করিতে পারেন নাই। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার রচনায় শিল্প-গুণের হানি ঘটিয়াছে। গানের আধিক্য তাঁহার প্রহসন-গুলিকে কতকটা যাত্রাধর্মী করিয়া তুলিয়াছে, আবার গানগুলিও সর্বত্র রুচিসম্মত নহে। 'বিবাহবিভ্রাট' (১৮৮৪ খ্রী), 'বাবু', 'একাকার' (১৮৯৪ খ্রী), 'বৌমা' (১৮৯৭ খ্রী) প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক রচনা। 'বিবাহবিভ্রাট' বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (১৮৭৬ খ্রী), 'ডিস্‌মিস' (১৮৮৩ খ্রী), 'চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে' (১৮৮৬ খ্রী), 'কৃপণের ধন' (১৯০০ খ্রী) প্রভৃতি বিশুদ্ধ প্রহসন। 'চোরের উপর বাটপাড়ি' ও 'কৃপণের ধন'-এ মোলিয়েয়-এর প্রভাব আছে। 'চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে'-ও বিদেশীপ্রভাবমুক্ত নহে। 'অবতার', 'প্র-পরা-অপ-সংহসন', 'খাস দখল' (১৯০৬ খ্রী) ও 'নব যৌবন' (১৯১৩ খ্রী) কমেডির পর্যায়ভুক্ত। 'ব্যাপিকাবিদায়' প্রহসনখানির জনপ্রিয়তা আজিও অক্ষুণ্ণ আছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রণীত প্রহসনের সংখ্যা ৬ খানি। সেগুলি হইতেছে 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫ খ্রী), 'বিরহ' (১৮৯৭ খ্রী), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০ খ্রী), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২ খ্রী) 'পুনর্জন্ম' (১৯১১ খ্রী) এবং 'আনন্দবিদায়' (১৯১২ খ্রী)। গান বাদ দিলে প্রহসনগুলি বিশেষত্ব-বর্জিত হইয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২ খ্রী) পরে 'শেষরক্ষা' (১৯২৮ খ্রী), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭ খ্রী), 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭ খ্রী), 'চিরকুমার-সভা' (১৯২৬ খ্রী) এবং 'মুক্তির উপায়' (১৯৪৮ খ্রী) বিমল হাস্যরসের প্রবাহ। 'হাস্যকৌতুক'-এর অন্তর্গত 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক'-এর অন্তর্গত 'বশীকরণ' ক্ষুদ্রাকার হইলেও প্রহসন হিসাবে চমৎকার। 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমারসভা' ও 'শেষরক্ষা' উচ্চাঙ্গের রচনা। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠ ও চিরকুমারসভার চন্দ্রবাবুর চরিত্রে ব্যক্তিত্ব-সমুজ্জ্বল জীবনগভীরতা আছে। অন্যত্র চরিত্রচিত্রণ স্বাভাবিক ও সুন্দর। সর্বত্রই সংলাপের তীক্ষ্ণতা, ঔজ্জ্বল্য ও মাধুর্য অসাধারণ।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' (১৯৩১ খ্রী) একখানি উৎকৃষ্ট কৌতুকরসাত্মক প্রহসন। 'বনফুল' বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'মন্ত্রমুগ্ধ' (১৯৩৮ খ্রী) নূতন ধরনের প্রহসন। এই রচনায় একটি মনুষ্যেতর জীব—কুকুর নায়কের আসনে প্রতিষ্ঠিত। 'কল্কি' উপভোগ্য কমেডি। প্রমথনাথ বিশীর বিদ্রূপাত্মক প্রহসনগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ঋণং কৃত্বা' (১৯৩৫ খ্রী), 'ঘৃতং পিবেৎ' (১৯৩৫ খ্রী), 'মৌচাকে ঢিল' (১৯৩৮ খ্রী), 'পরিহাসবিজল্পিতম্' (১৯৪০ খ্রী), 'ডিনামাইট' (১৯৪২ খ্রী), 'গভর্নমেণ্ট 'ইন্‌স্পেকটার' (১৯৪৩ খ্রী), 'পারমিট' (১৯৪৭ খ্রী) প্রভৃতি প্রহসনে তিনি নির্মম ভাবে বর্তমান সভ্যসমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে শাণিত বিদ্রূপ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

দ্র সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়-৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪০ খ্রী; অজিত দত্ত, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, কলিকাতা ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ; আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম-২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৭-৬৮ বঙ্গাব্দ।

জীবনকৃষ্ণ শেঠ

প্রহ্লাদ বিষ্ণুদ্বেষী দৈত্যরাজ হিরণকশিপু ও কয়াধুর আদর্শ বিষ্ণুভক্ত পুত্র। প্রহ্লাদের আচরণে অসন্তুষ্ট পিতা তাঁহাকে বধ করিবার নির্দেশ দান করেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হয়। প্রহ্লাদ কর্তৃক বিষ্ণুর সার্বত্রিক অস্তিত্ব ঘোষণার যাথার্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে হিরণ্যকশিপু সভাগৃহস্থিত স্ফটিকস্তম্ভে আঘাত করেন। এক প্রচণ্ড শব্দে স্তম্ভ হইতে বিষ্ণু নৃসিংহমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া গদাযুদ্ধরত হিরণ্যকশিপুর বক্ষ নখরদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে বধ করেন। বিষ্ণুর করস্পর্শে মহাভাগবত প্রহ্লাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বিষ্ণু বরদানে অভিলাষী হইলে প্রহ্লাদ কামনাহীনতা ও পিতার পাপমুক্তি প্রার্থনা করেন। (ভাগবতপুরাণ ৭।৩-১০ ; বিষ্ণুপুরাণ ১।১৬-২০)।

যূথিকা ঘোষ

প্রাকৃত ভাষা প্রাকৃত ভাষা বলিতে এখন বোঝায় প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ এক প্রাচীন বৈয়াকরণ ও আলংকারিকদের উল্লিখিত ভাষা, যাহার ব্যবহার সংস্কৃত নাটকে, কোনও কোনও কাব্যগ্রন্থে এবং জৈনশাস্ত্রে দেখা যায়; দ্বিতীয়তঃ ও গৌণতঃ সংস্কৃতের পরবর্তী এবং বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী প্রভৃতি আধুনিক ভাষার পূর্ববর্তী আর্যভাষার অবস্থা অর্থাৎ অশোকের অনুশাসন ও পালি হইতে আরম্ভ করিয়া তাবৎ আর্যভাষা। দ্বিতীয় অর্থে প্রাকৃত শব্দটি বাকতত্ত্বে (ভাষাবিজ্ঞানে) ব্যবহৃত মধ্যকালীন ভারতীয় আর্য ভাষার সমার্থক। প্রথম অর্থে প্রাপ্ত ভাষাগুলি ইহারই দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত। এই আলোচনায় প্রাকৃত বলিতে মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা বুঝিব এবং সাহিত্যিক প্রাকৃত বলিতে প্রাচীন বৈয়াকরণ ও আলংকারিকদের উল্লিখিত ভাষা বুঝিব।

সংস্কৃত অর্থাৎ আদ্য বা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন। উৎপত্তিকাল মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ শতাব্দী ধরা হয়। স্থিতিকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপর ১০ম অথবা ১১শ শতাব্দী। এই সময়ের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষা হইতে নব্য বা আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির উদ্ভব ঘটিয়া গিয়াছিল। প্রাকৃত ভাষার এই প্রায় দেড় হাজার বছরের ইতিহাসকে ভাষার গতিপ্রকৃতি অনুসারে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। তিন স্তর হইল যথাক্রমে আদি মধ্য ভারতীয়-আর্য, মধ্য মধ্য ভারতীয়-আর্য এবং অন্ত্য মধ্য ভারতীয়-আর্য। প্রাচীন বৈয়াকরণেরা আদি স্তরের কথা বলেন নাই। মধ্য স্তরকে বলিয়াছেন 'প্রাকৃত' (অর্থাৎ সাহিত্যিক প্রাকৃত), অন্ত্য স্তরকে বলিয়াছেন 'অপভ্রংশ'। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা উৎপন্ন হইবার পরেও সাহিত্যকর্মে অপভ্রংশের ব্যবহার ছিল। কিন্তু তখন অপভ্রংশের যথেষ্ট বিকৃতি ঘটিয়াছিল। সে ভাষাকে সমসাময়িক লেখকেরা 'অবহট্‌ঠ' (অর্থাৎ অপভ্রষ্ট) বলিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষার সহিত তুলনা করিলে প্রাকৃত ভাষার এই লক্ষণগুলি বিশিষ্টভাবে নজরে পড়ে। ১. পদান্তে ম-কার (এবং দৈবাৎ ন-কার) অনুস্বাররূপে রহিয়া-গিয়াছে। নতুবা পদান্তে ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত অথবা অন্য স্বরধ্বনিযোগে অপদান্ত হইয়াছে। যেমন 'একম্' হইতে 'একং' (পরে 'এঅং') গচ্ছন্ হইতে 'গচ্ছং' অথবা 'গচ্ছন্তো', 'পরিষৎ' হইতে 'পরিসা' অথবা 'পরিসদা', 'বিদ্যুৎ' হইতে 'বিদ্দু'। ২. যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের আদি ছাড়া অন্যত্র যুগ্ম অথবা যুগ্মকলা ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। যেমন 'ধর্ম' হইতে 'ধম্ম'; কার্য হইতে কাজ্জ, কজ্জ; 'অক্ষি' হইতে 'অক্‌খি,' 'অষ্ট' হইতে 'অট্‌ঠ'; অস্থি হইতে 'অত্থি'। শব্দের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি এককধ্বনি হইয়াছে। যেমন 'ব্রাহ্মণ' হইতে 'বম্হণ'; 'ত্যাগ' হইতে 'তাগ', 'স্নান' হইতে 'নহান'। ৩. ঋ, ঐ, ঔ এবং বিসর্গ—এই ধ্বনিগুলি নাই। ঋ-স্থানে পাওয়া যায় র-কারবিহীন অথবা র-কারযুক্ত অন্য স্বরধ্বনি। যেমন 'ঋষি' হইতে 'ইসি' অথবা 'রিসি' 'কৃত' হইতে 'কত', 'কিদ', 'বৃদ্ধ' হইতে 'বুড্‌ঢ'। ঐ, ঔ হইয়াছে যথাক্রমে এ, ও। যেমন 'ঐরাবণ' হইতে 'এরাবণ', 'ঔষধ' হইতে 'ওসধ'। বিসর্গ পদান্তে থাকিলে অ-কারের পর হইলে ও-কারে অথবা এ-কারে পরিণত, অন্যথা লুপ্ত, শব্দমধ্যে থাকিলে যুক্ত ব্যঞ্জনের মত পরিবর্তিত হয়। যেমন 'মনঃ' হইতে 'মনো' (মনে), 'দেবাঃ' হইতে 'দেবা', 'দুঃখ' হইতে 'দুক্‌খ'। ৪. পদান্তে অনুস্বারের এবং শব্দমধ্যে যুগ্ম ও যুগ্মকলা ধ্বনির পূর্বে দীর্ঘ স্বর থাকিলে তাহা হ্রস্ব হইয়াছে। এই বিশেষত্ব আদিস্তরে আবির্ভূত হয়, গোড়ায় ছিল না। যেমন 'ক্রান্তম্' হইতে 'কন্তং', 'তাম্' হইতে 'তং'। ৫. শব্দরূপে দ্বিবচন রহিল না। সব শব্দেরই হইল স্বরান্তবৎ রূপ। প্রথমে অ-কারান্ত শব্দের একবচন ছাড়া অন্যত্র চতুর্থী বিভক্তির স্থানে ষষ্ঠী বিভক্তি ব্যবহার হইত, পরে সব শব্দেই চতুর্থীর স্থানে ষষ্ঠীর ব্যবহার হয়। তৃতীয়া ও পঞ্চমীর পদ এক রকম হইল। দুই-একটি পুরাতন বিভক্তির স্থানে নূতন বিভক্তি দেখা দিল। যেমন 'নরাঃ' স্থানে 'নরে', 'নরে' স্থানে 'নরম্হি', 'লতয়া', 'লতাস্থৈ', 'লতায়াঃ' স্থানে 'লতয়ে' ইত্যাদি। ৬. ধাতুরূপেও দ্বিবচন লুপ্ত হইল। দশ ল-কারের মধ্যে শুধু রহিল লট্, লোট্, লৃট। লঙ্-

লুঙ্‌ মিলিয়া এক হইল। মধ্য স্তরে লঙ্‌-লুঙ্‌-ও লুপ্ত হইল। আত্মনেপদের ব্যবহার কমিতে কমিতে লুপ্ত হইল। ভাব ও কর্মবাচ্যে পরস্মৈপদ ব্যবহার হইল। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্র্য কমিয়া গেল।

আদিস্তরের প্রাকৃত ভাষা বলিতে অশোকের অনুশাসনগুলির ভাষা ও উপভাষা, খরোষ্ঠী অক্ষরে লেখা ধম্মপদের ভাষা এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রধান ভাষা পালি। এই স্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক পাঁচশত বৎসর। পরবর্তী স্তরের স্থিতিকালও আনুমানিক পাঁচশত বৎসর। মধ্যস্তরের প্রথম অর্ধকে পণ্ডিতেরা পরিবর্তনকালীন (Transitional) প্রাকৃত বলেন। এই প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে চীনীয় তুর্কিস্তানে নিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রত্নলিপিতে (আনুমানিক ৩০০ খ্রী)। এই প্রাকৃতের প্রধান লক্ষণ হইল দুইস্বর মধ্যবর্তী পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির ঘোষীভবন ও পরে উষ্মীভবন। মধ্য স্তরের শেষ অর্ধের ভাষাগুলিই সাহিত্যিক (literary) প্রাকৃত। ‘প্রাকৃত-প্রকাশ’ প্রভৃতি প্রাচীন প্রাকৃত ব্যাকরণে ও দণ্ডী প্রমুখ প্রাচীন আলংকারিকগণের গ্রন্থে সাহিত্যিক প্রাকৃতের অন্তর্গত এই প্রধান ভাষাগুলি আলোচিত হইয়াছে, যথা—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী ও পৈশাচী। মাহারাষ্ট্রী হইল মুখ্য প্রাকৃত, সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত কবিতার ভাষা। শৌরসেনী অনেকটা সংস্কৃত ঘেঁষা, সংস্কৃত নাটকে সাধারণ নারী ও অশিক্ষিত ভদ্র পুরুষের ভাষা। অর্ধমাগধী জৈনশাস্ত্র-সাহিত্যের ভাষা, সংস্কৃত নাটকে প্রযুক্ত নয়। সাহিত্যে মাগধীর ব্যবহার মাত্র কয়েকখানি নাটকে অত্যন্ত অশিক্ষিত লোকের ভাষা হিসাবে এবং হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। সংস্কৃত-নাটকে পৈশাচীর ব্যবহার নাই। একদা এ ভাষায় লোক-প্রচলিত গল্পের এক বড় সংগ্রহ হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের ব্যাকরণে (খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী) পৈশাচী ভাষার আলোচনা আছে। তাহা হইতে মনে হয় যে, পৈশাচী পালিরই রূপান্তর ও নামান্তর। মধ্যস্তরের প্রাকৃতের প্রধান সাধারণ লক্ষণ অল্প কথায় তিনটি মাত্র : ১. দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ অথবা হ-কারে পরিণতি। কেবল শৌরসেনীর বেলায় ‘দ’ ও ‘ধ’ অবিকৃত থাকে। যেমন ‘কৃত’ হইতে ‘কিঅ’, ‘কঅ’ (শৌরসেনী ‘কিদ’ ‘কদ’), ‘বধূ’ হইতে ‘বহূ’ (শৌরসেনী ‘বধূ’)। ২. ন-কারের স্থলে ণ-কারের অত্যধিক ব্যবহার। ৩. শব্দ ও ধাতুরূপে আরও সংক্ষেপ এবং অতীত কালের সমাপিকা ক্রিয়ার লোপ। তাহা ছাড়া প্রত্যেক সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তাহাদের উপভাষাও আছে।

অন্ত্যস্তরের প্রাকৃত ভাষা অপভ্রংশকে প্রাচীন বৈয়াকরণেরা একটি বিশিষ্ট মধ্যস্তরের ভাষা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্যসৃষ্টির কালে এ ভাষার ব্যবহার জৈন লেখকরাই করিয়াছিলেন। অপভ্রংশের বিশিষ্টতম লক্ষণ এইগুলি : ১. শব্দমধ্যে পাশাপাশি স্বরধ্বনির মিলন-প্রচেষ্টা ; ২. স্বরমধ্যবর্তী ম-কারের (এবং পরে ণ-কারেরও) লোপ-প্রবণতা ; ৩. নূতন প্রত্যয়ের আমদানি (যেমন ‘ভয়েল্ল’, ‘ভরিল্ল’), এবং ৪. সমমাত্রক ছন্দ এবং সে ছন্দে অন্ত্যমিলের ব্যবহার।

সুকুমার সেন

প্রাকৃত সাহিত্য “প্রাকৃত”কে “মধ্য (বা মধ্য-যুগের) ভারতীয়-আর্য” ভাষার সমার্থক ধরিলে প্রাকৃত সাহিত্যের আলোচনায় পালিতে নিবদ্ধ বিরাট বৌদ্ধ সাহিত্যেরও আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু পালি সাহিত্য মর্যাদায়, বস্তুতে এবং পরিধিতে এতই বিশিষ্ট যে সে সাহিত্যের ও ভাষার আলোচনা পৃথক্‌ভাবে করা হয়। এ আলোচনায় তাই পালি সাহিত্যের কথা নাই।

প্রাকৃত সাহিত্যের প্রকাশ সংস্কৃত সাহিত্যের উপাঙ্গ রূপে, নাটকে, গানে, নারীভূমিকায় ও অশিক্ষিত পুরুষ-ভূমিকায়। খ্রীষ্টপর দ্বিতীয় শতাব্দীতে অশ্বঘোষের নাটকে প্রাকৃত প্রয়োগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে স্বাধীন প্রাকৃত রচনার রীতি আরও অনেক পুরাতন। পুরাতন ব্রাহ্মী অক্ষরে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী) লেখা দুইটি প্রাকৃত কবিতা ভূতপূর্ব সরগুজা রাজ্যের অন্তর্গত রামগড় পাহাড়ের যোগীমারা গুহার ভিত্তিতে উৎকীর্ণ আছে। তাহার মধ্যে একটি ভাষা, ভাব ও ছন্দের দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি ‘সুতনুকালিপি’ নামে প্রসিদ্ধ। কবিতাটির ভাষায় পরবর্তী কালের মাগধী প্রাকৃতের লক্ষণ বিদ্যমান। দ্বিতীয় কবিতাটি মাহারাষ্ট্রী ভাষার লক্ষণ বহন করে। প্রাকৃত সাহিত্যের আলোচনা বিভিন্ন ‘প্রাকৃত’ (অর্থাৎ সাহিত্যিক বা সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা) ধরিয়াই করিতে হয়। প্রথমে আসে মাহারাষ্ট্রী ভাষা। প্রাচীন পণ্ডিতেরা সকলেই মাহারাষ্ট্রীকে শ্রেষ্ঠ ও প্রধান প্রাকৃত বলিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত ভাষার মধ্যে মাহারাষ্ট্রীর স্থান বেশ মর্যাদার। এ ছিল গানের ভাষা। পঞ্চম খ্রীষ্ট শতাব্দীর পরে মাহারাষ্ট্রী ভাষায় লেখা সংস্কৃত-রীতির মহাকাব্য দুই তিন খানি পাওয়া গিয়াছে। যেমন

প্রবরসেনের 'সেতুবন্ধ', বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বধ' ('গউড়বহো') ইত্যাদি। প্রবরসেনের কাব্যের নামান্তর 'রাবণবহ' অর্থাৎ রাবণবধ এবং তাহাতেই কাব্যটির বিষয় জানা যাইতেছে। বাক্‌পতিরাজের কাব্যের বিষয় হইল তাঁহার পোষ্টা যশোবর্মা কর্তৃক এক 'গৌড়'রাজকে পরাজয় ও বধ করা।

এইসব প্রাকৃত মহাকাব্য সংস্কৃতের এতটা ঘনিষ্ঠ অনুকরণে লেখা যে, এগুলিকে প্রাকৃত কাব্য না বলিয়া প্রাকৃত ছায়া-কাব্য বলিলেই ঠিক হয়। ছন্দ এবং ভাষা (তাহাও অনেকখানি বিকৃত বা সংস্কৃতানুগ) ছাড়া ইহার মধ্যে প্রাকৃতত্ব কিছু নাই। সংস্কৃতজ্ঞ শিষ্ট ব্যক্তিদের কাছেই এ সব কাব্যের আদর ছিল। হর্ষ-চরিতের উপক্রমণিকায় বাণ প্রবরসেনের কাব্যের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। বাণ আরও একটি প্রাকৃত কাব্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। সেটিও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা, নাম 'গাথাসপ্তশতী'। প্রাকৃত 'গাহা' (সংস্কৃত আর্যা) ছন্দে লেখা, প্রায় সাত শত প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহ। সংগ্রহ যিনি করিয়াছিলেন, তিনি হাল নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার সংগৃহীত শ্লোকের সংখ্যা অত বেশি ছিল না। পরে ক্রমশঃ যোগ হইয়াছে। পরবর্তী কালের প্রক্ষেপের সাক্ষ্য কোনও কোনও শ্লোকের ভাষায় পাওয়া যায়। মূল মাহারাষ্ট্রীর মধ্যে যেখানে যেখানে অপভ্রংশ অথবা মাগধীর পদ পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে তাহা প্রক্ষিপ্ত। অনেকে মনে করেন, সংগ্রহকর্তা হাল ছিলেন কোনও এক সাতবাহন নরপতি। কিন্তু কোনও প্রমাণ নাই। হর্ষচরিতে বাণ হালের সূক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং অষ্টম শতাব্দীর আগেই গাথা-সপ্তশতীর সংকলন হইয়াছিল। তাহার পরেও কিছু কিছু শ্লোক যোগ হইয়া থাকিবে। কোনও কোনও পুথিতে কবির নাম দেওয়া আছে। এগুলির উপর নির্ভর করিলে বলিতে পারি যে, সেকালের মেয়েরাও কবিতা রচনা করিতেন। এই নারী কবিদের নাম পাই গাথা-সপ্তশতীতে—রেবা, পহঈ (=পৃথিবী?), রোহা, অনুলক্ষী (=অনুলক্ষ্মী), মাহবী (=মাধবী)।

গাথাসপ্তশতীর কবিতায় সেকালের লোকসাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। কোনও কোনও কবিতা বৈষ্ণব পদাবলীর কথা মনে করাইয়া দেয়। বৈষ্ণব অলংকারের অনেক বস্তু ইহার মধ্যে খুঁজিলে মিলিবে।

গাথাসপ্তশতী ছাড়া আরও দুই-একখানি প্রাকৃত কবিতা সংকলন হইয়াছিল। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বজ্জালগ্‌গ' (=ব্রজ্যালগ্ন)।

দিগম্বরপন্থী জৈনদের 'আগমশাস্ত্র' অর্ধমাগধী ভাষায় লেখা। এই আগম গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হইল 'আয়রঙ্গ সুত্ত', তাহার পর 'সূয়কড়ঙ্গ সুত্ত', 'উত্তরজ্‌ঝয়ন সুত্ত' ইত্যাদি। 'আগম' গ্রন্থাবলী ছাড়া জৈনশাস্ত্রের অপর গ্রন্থ মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে (এবং শৌরসেনীতে) রচিত। জৈনশাস্ত্রের মাহারাষ্ট্রী রচনায় অর্ধমাগধীর প্রভাব আছে বলিয়া ভাষাবিদ্ পণ্ডিতেরা নাম দিয়াছেন 'জৈন-মাহারাষ্ট্রী'। তেমনই জৈনশাস্ত্রে শৌরসেনী রচনার ভাষার নাম হইয়াছে 'জৈন-শৌরসেনী'।

জৈন-মাহারাষ্ট্রীতে এবং জৈন-শৌরসেনীতে লেখা অন্য গ্রন্থে অনেক ভালো ভালো গল্প পাওয়া যায়। সেগুলি পালি জাতক গল্পের তুলনায় কম উপাদেয় নয়। এ বিষয়ে 'বসুদেবহিণ্ডী' বিশেষ মূল্যবান। এই বইটির ভাষায় অপভ্রংশের মিশ্রণ আছে।

প্রথম হইতেই সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃতের ব্যবহার দেখা যায়। কেবলমাত্র প্রাকৃতে লেখা নাটক (যাহার নাম অলংকার শাস্ত্রে 'সট্টক') নবম শতাব্দীর আগে পাওয়া যায় না। রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' (নবম শতাব্দীর শেষভাগ) প্রাকৃতে লেখা প্রথম নাটক। ভাষা শৌরসেনী।

পৈশাচী প্রাকৃতে একদা এক বড় গল্প-সংকলনগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। লেখকের নাম রহিয়া গিয়াছে—গুণাঢ্য, গ্রন্থের নাম রহিয়া গিয়াছে 'বড্‌ডকহা' (বা বৃহৎকথা), কিন্তু মূল গ্রন্থটি মিলে নাই। তবে গল্পগুলির বস্তু পাওয়া গিয়াছে দুই-তিনটি অনুবাদে। একটি অনুবাদ হইল একাদশ শতাব্দীর কবি পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথা-মঞ্জরী', আর একটি অনুবাদ হইল সোমদেবের 'কথাসরিৎ-সাগর'। দুই জনেই কাশ্মীরের লোক ছিলেন।

অপভ্রংশ ভাষা অবলম্বন করিয়া জৈন কবিরা শাস্ত্র রচনা করেন নাই বটে, কিন্তু প্রচুর সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাষার বিষয়ে খানিকটা নিরঙ্কুশ ছিলেন। অপভ্রংশের মধ্যে প্রাকৃত এবং অবহট্‌ঠ মিশাইতেও সংকুচিত হইতেন না। এইসব কাব্যরচনা প্রাকৃত কাব্যের মত সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুকরণ করে নাই। সমসাময়িক লৌকিকরীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। কাব্যগুলির বিষয় সাধারণতঃ জৈন পুরাণকাহিনী অথবা কল্পিত মহাপুরুষের বিচিত্র কাহিনী। রচনাভার সংস্কৃত কাব্যকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

এই জৈন কবিরা তাঁহাদের পুরাণকাহিনীর মধ্যে রামকথা ও কৃষ্ণকথাও আনিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে বিচিত্র কিছু ভরিয়া দিয়াছেন। এই দুই বিষয়ে বিশেষ

করিয়া কৃষ্ণকথায়, জৈনশাস্ত্রে অন্যরকম ঐতিহ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। জৈন অপভ্রংশে লেখা রামায়ণ কাব্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল স্বয়ম্ভূর 'পউমচরিউ' (অর্থাৎ পদ্মচরিত), ইহার কাহিনীতে কিছু কিছু নূতনত্ব আছে। স্বয়ম্ভূ দশম শতাব্দীর লোক।

সবচেয়ে বৃহৎকায় পুরাণগ্রন্থ হইল 'মহাপুরাণ', নামান্তর, 'ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত'। ইহাতে তেষট্টি-জন মহাপুরুষের চরিতকথা আছে। বইটি গুরুশিষ্যের রচনা। গুরু জিনসেন লিখিয়াছিলেন প্রথম অংশ। এই অংশের নাম 'আদিপুরাণ'। শিষ্য গুণভদ্র লিখিয়াছিলেন শেষ অংশ। এই অংশের নাম 'উত্তর পুরাণ'।

পুরাণকাহিনী ছাড়া আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—হরিভদ্রের 'সমরাইচ্চকহ' (সমরাদিত্যকথা), এবং ধনপালের 'ভবিসসযত্তকহা' (ভবিষ্যদত্ত কথা)। হরিভদ্রের কাব্যের ভাষা বিশুদ্ধ অপভ্রংশ। ধনপালের কাব্যে অনেক বিচিত্র গল্প আছে।

অপভ্রংশে কাব্যরচনা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এমন কি পরেও চলিয়াছিল। উপরে যে জৈন অপভ্রংশ রচনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার রচনাকালও খ্রীষ্টীয় দশম-ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে। এই সময়ে এবং পরবর্তীকালে রচিত কয়েকটি সাহিত্যগ্রন্থ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—'অদ্দহমাণ' বা আবদুর্-রহমানের 'সংনেহয়রাসয়' (=সংস্নেহকরাসক) অথবা 'সন্দেশ-রাসক'। বিষয় মেঘদূতের বিপরীত, প্রবাসস্থিত স্বামীর কাছে গৃহস্থিতা বিরহিণীর পথিকদূত প্রেরণ।

সুকুমার সেন

প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে চিকিৎসা। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দেহের ৫টি প্রধান উপাদান বা পঞ্চভূতের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারিটির প্রয়োগের দ্বারা প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রণালী আছে, তন্মধ্যে অপ্ বা জলচিকিৎসা এবং তেজ বা রশ্মি-চিকিৎসাই প্রধান।

জলচিকিৎসা : জল পান, উষ্ণ বা শীতল জলে স্নান ও গাত্রমর্দন কিংবা তড়িৎযুক্ত বা তেজস্ক্রিয় জলের ব্যবহার জলচিকিৎসার অঙ্গ। প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয়, গ্রীক, রোমান, ইউনানি সকল পদ্ধতিতেই রোগীকে প্রচুর জলপান করাইয়া মূত্র ও ঘামের সঙ্গে দেহের দূষিত পদার্থ বহিষ্কারের ব্যবস্থা চিকিৎসার একটি প্রধান অঙ্গ। এতদ্ব্যতীত ফুটবাথ, সিজ্‌বাথ প্রভৃতি জলচিকিৎসা বর্তমানেও ফলপ্রদ বলিয়া গণ্য। কোনও কোনও গভীর কূপ ও নলকূপের জলে ম্যাগ্‌নেশিয়াম-ঘটিত লবণ মিশ্রিত থাকায় ঐ জল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কোনওটির জলে অধিক লৌহঘটিত লবণাদি থাকায় তাহা পেটের অসুখে উপকারী, আবার কোনওটির জলে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম -ঘটিত ক্ষারধর্মী লবণ থাকায় তাহা অম্লরোগের রোগীর পক্ষে হিতকর। এমনই কোনও কোনও জলে পরিপাক শক্তিও বৃদ্ধি পায়। হাজারিবাগ ও রাঁচির জল পেটের অসুখের এবং ভুবনেশ্বরের ও মীর্জাপুরের জল পরিপাকের পক্ষে অত্যুত্তম। এদেশে রাজগির, জালামুখী প্রভৃতি স্থানে উষ্ণজলের প্রস্রবণ আছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও 'স্পা' নামক বহু উষ্ণ প্রস্রবণ বর্তমান। এ সকল প্রস্রবণের জলে স্থানভেদে গন্ধক, কার্বন, ফস্‌ফরাস, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম, তামা প্রভৃতি উপাদান, হিলিয়াম, আর্গন, ক্রিপ্টন প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য গ্যাস এবং সময়ে সময়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকায় বহু লোক রোগনিরাময়ার্থ ঐ সকল প্রস্রবণের জল পান ও তাহাতে স্নান করিতে যায়। শ্বাসতন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, ধমনী, শিরা, বৃক্ক, মূত্রনালী, ত্বক, নার্ভ, পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ, অস্থি, অস্থিসন্ধি প্রভৃতির রোগ এবং মধুমেহ, বাত, গেঁটেবাত, মেদবৃদ্ধি, রক্তাল্পতা, স্ত্রীরোগ প্রভৃতি ব্যাধি ঐরূপ কোনও না কোনও উষ্ণ প্রস্রবণ বা স্পা-র জলচিকিৎসায় সহজেই অন্য ঔষধ ব্যতিরেকেও নিরাময় হইতে পারে।

তেজচিকিৎসা বা রশ্মিচিকিৎসা : সূর্যালোকের অবলোহিত (ইন্‌ফ্রা-রেড) এবং অতিবেগুনী (আলট্রা-ভায়োলেট) রশ্মিই এই চিকিৎসায় প্রযুক্ত হয়। প্রাতঃকালের রৌদ্রে অধিক পরিমাণে অতিবেগুনী রশ্মি থাকে। পাহাড়ের উপরে ও সমুদ্রসৈকতে ইহার পরিমাণ অধিক ; ধূম ও ধূলিপূর্ণ জনপদে পরিমাণ অত্যল্প। ভোরে রৌদ্রসেবনে অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে দেহমনের সতেজতা, ক্ষুধাবৃদ্ধি, শ্বসনক্রিয়া ও পেশীর কর্মক্ষমতার উন্নতি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে, ত্বকে ভিটামিন ডি-এর সংশ্লেষণ ঘটিয়া রিকেট্‌স, অস্থিওম্যালাশিয়া প্রভৃতি অস্থি-বিকৃতি রোগেরও প্রতিষেধ হয়। যক্ষ্মা, চর্মরোগ প্রভৃতির পক্ষেও অতিবেগুনী রশ্মি হিতকর। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এরূপ রশ্মির সাহায্যে যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যনিবাস আছে। মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নের সূর্যালোকে অবলোহিত রশ্মির প্রাচুর্য থাকে ; ইহার প্রভাবে গাত্র-বেদনা নিরাময় হয়, দেহের শক্তি ও কার্যক্ষমতাও বাড়ে। হাসপাতাল ও গৃহাভ্যন্তরে রশ্মিচিকিৎসার জন্য মার্কারি-কোয়ার্টজ্ ভেপার ল্যাম্পের সাহায্যে কৃত্রিম পদ্ধতিতে

রশ্মি প্রয়োগ করা যায়। রশ্মি গ্রহণের সময় কালো চশমার দ্বারা চোখে রশ্মিপ্রবেশ নিবারণ করিতে হয়।

বায়ুচিকিৎসা: সূর্যোদয়ের সময় নদীতীর, উন্মুক্ত প্রান্তর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া মুক্ত বায়ু সেবন করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। সমুদ্রতীরের বায়ুতে ওজোন থাকায় বায়ুচিকিৎসার পক্ষে সমুদ্রতীরই উপযুক্ত স্থান। যক্ষ্মা, অন্যান্য শ্বাসরোগ বা হৃদরোগে মুক্ত বায়ুপূর্ণ স্থান কল্যাণকর। অবাধ বায়ুচলনযুক্ত গৃহেও বায়ুস্নান করা যায়।

মৃত্তিকাচিকিৎসা: মাটির সহিত বহু ধাতব লবণ, আয়োডিন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস ইত্যাদি অধাতব উপাদান, নানা জীবাণুনাশক ছত্রাক প্রভৃতি মিশিয়া থাকে। এ জন্যই স্নানের আগে দেহপরিষ্কারকরূপে গঙ্গামৃত্তিকা ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট-পূর্ণ কর্দম হইতে প্রস্তুত 'ফুলার্স আর্থ' নামক মৃত্তিকাচূর্ণের প্রলেপ প্রদাহজনিত ব্যথায় ও জীবাণুনাশকরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্ষতে ব্যবহারের জন্য ইহাকে বিশোধিত করিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক। এজন্য মৃত্তিকাচিকিৎসার কর্দমকে বিশেষতঃ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তড়িৎ-প্রয়োগে ফুটাইয়া জীবাণুশূন্য করিয়া প্রলেপের জন্য ব্যবহার করা হয়। গান্ধীজী প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিশেষতঃ মৃত্তিকা-চিকিৎসায় খুবই বিশ্বাসী ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মৃত্তিকায় বর্তমান এক প্রকার ছত্রাক হইতেই স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

বালুকাচিকিৎসা: গরম বালির ভিতর হাত বা পায়ের বিভিন্ন অস্থিসন্ধি প্রোথিত করিয়া বাতের চিকিৎসা বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। এখনও বালির ছোট থলির সাহায্যে ব্যথাস্থানে তাপ-প্রয়োগের প্রথা আছে।

বর্তমানে এ সকল প্রাকৃতিক চিকিৎসার বহুল বিজ্ঞান-সম্মত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং ইহা 'ফিজিওথেরাপি' নামক চিকিৎসাপদ্ধতির অন্তর্গত হইয়াছে।

সনৎকুমার সরকার

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ভূত্বকের বিভিন্ন সময়ে গঠিত স্তর হইতে যে সকল ফসিল অর্থাৎ জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভূতত্ত্ববিজ্ঞানী ও প্রত্নজীব-বিজ্ঞানীরা জীবনের ক্রমবিকাশের তথ্যাদি জানিতে পারিয়াছেন। জীব-বিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই সুদীর্ঘ সময়কে পাঁচটি মহাযুগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা—১. আর্কেইক অর্থাৎ প্রাচীনতম মহাযুগ ২. প্রোটারোজোয়িক বা প্রাথমিক জীবনের কাল ৩. প্যালিওজোয়িক বা প্রাচীন জীবনের কাল ৪. মেসোজোয়িক বা মাধ্যমিক জীবনের কাল এবং ৫. কাইনোজোয়িক মহাযুগ বা নবজীবনের কাল। এতদ্ব্যতীত শেষোক্ত তিনটি মহাযুগকে আবার কয়েকটি পর্যায় বা উপমহাযুগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

বর্তমানকাল হইতে প্রায় ২১০ কোটি বৎসর পূর্বে আর্কেইক মহাযুগ প্রায় ৯৮ কোটি বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। এই মহাযুগে গঠিত স্তরগুলির মধ্যে কোনও জীবাশ্মের সন্ধান না পাওয়া গেলেও সম্ভবতঃ এই মহাযুগেরই কোনও এক সময়ে জীবনের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ইহার পরবর্তী প্রোটারোজোয়িক মহাযুগ প্রায় ৬০ কোটি বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। এই মহাযুগের স্তরগুলিতে এককোষী প্রাণী, সামুদ্রিক শ্যাওলা এবং নানা রকম সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোনও স্থলজ উদ্ভিদ বা স্থলচর প্রাণীর অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। বর্তমান কাল হইতে প্রায় ৫৫ কোটি বৎসর পূর্বে এই মহাযুগের অবসান ঘটিয়াছিল। ইহার পর প্যালিওজোয়িক মহাযুগের আরম্ভ। পূর্ববর্তী মহাযুগের শেষভাগে জল এবং স্থলভাগে যে সকল জীবনের সূচনা হইয়াছিল, এই মহাযুগের প্রারম্ভে তাহাদের প্রাচুর্য ঘটে। অভিব্যক্তির (ইভলিউশন) কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই মহাযুগকে ক্যাম্ব্রিয়ান, সিলুরিয়ান, ডিভোনিয়ান কার্বনিফেরাস ও পার্মিয়ান প্রভৃতি উপ-মহাযুগ বা পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। ক্যাম্ব্রিয়ান পর্যায়ের প্রস্তরীভূত স্তরগুলির মধ্যে মেরুদণ্ডী ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর বহু অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে এককোষী প্রাণী, ছিদ্রালী প্রাণী প্রভৃতির জীবাশ্ম রহিয়াছে। এই সময়ে সমুদ্রজলে ট্রায়ালোবাইট নামক অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের আধিপত্য ঘটিয়াছিল। এই পর্যায়ের শেষের দিকে উদ্ভিদ ও প্রাণীরা স্থলভাগে অগ্রসর হইয়াছিল। প্রাথমিক মৎস্যজাতীয় প্রাণীরও এই সময়ে আবির্ভাব ঘটে। এই পর্যায় প্রায় ৮ কোটি বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। পরবর্তী সিলুরিয়ান পর্যায়ে স্থলচর বৃশ্চিক-জাতীয় প্রাণী ও স্থলজ উদ্ভিদের বংশবিস্তার ঘটিতে থাকে। জেলিমাছ ও মৎস্যজাতীয় প্রাণীদের প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য দেখা দেয়। ১২ কোটি বৎসর অতিবাহিত হইবার পর ডিভোনিয়ান পর্যায়ের শুরু হয়। ডিভোনিয়ান পর্যায়

প্রায় সাড়ে ৫ কোটি বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। এই পর্যায়ে মাছেরই আধিপত্য ঘটিয়াছিল। সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজাতীয় মাছ বিরাট আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। এই সময়ে পতঙ্গেরও আবির্ভাব ঘটে। এই উপ-মহাযুগে সম্ভবতঃ সমুদ্রবৃশ্চিক হইতে উদ্ভূত প্রাথমিক স্থলচর প্রাণীর অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই পর্যায়ের অবসানে কার্বনিফেরাস পর্যায়ের শুরু হয়। এই পর্যায়ে ফার্নজাতীয় উদ্ভিদ, ক্লাব মস, হর্স টেল, সাইকাড ও গিঙ্কো প্রভৃতি উদ্ভিদের ঘন আবরণে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঢাকিয়া গিয়াছিল। এই বিশাল অরণ্যানী চাপা পড়িয়াই পরবর্তী কালে কয়লাস্তরে পরিবর্তিত হইয়াছিল। এই পর্যায়ে কীটপতঙ্গের বিচিত্র বিকাশ এবং তাহাদের প্রাচুর্যের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই পর্যায়ে কোনও রকম ফুলের গাছ ছিল না এবং পাখি, সাপ বা কোনও লোমশ প্রাণীরও আবির্ভাব ঘটে নাই। কার্বনিফেরাস পর্যায়ের শেষের দিকে প্রাথমিক সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল। এই পর্যায়ের অবসানের পর পার্মিয়ান পর্যায়ে সরীসৃপেরা বিচিত্র আকৃতি ধারণ করিয়া দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। উভচর মেরুদণ্ডী প্রাণীরা ইহার পূর্ববর্তী পর্যায়েই আবির্ভূত হইয়াছিল। এই উভচর প্রাণী হইতেই সম্ভবতঃ সরীসৃপের উদ্ভব হইয়াছিল। পার্মিয়ান পর্যায়ে কয়েকজাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিলেও আকৃতি-প্রকৃতি ও দৈহিক শক্তিসামর্থ্যে সরীসৃপেরাই প্রাধান্যলাভ করিতে থাকে। আড়াই কোটি বৎসর স্থায়ী হইবার পর এই পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় মহাযুগেরও অবসান ঘটে।

ইহার পর মেসোজোয়িক মহাযুগের শুরু হয় বর্তমান সময় হইতে প্রায় সাড়ে ১৮ কোটি বৎসর পূর্বে। এই মহাযুগকে প্রকৃত প্রস্তাবে সরীসৃপের যুগই বলা যায়, কারণ বিরাট আকৃতির ডাইনোসরেরাই এই মহাযুগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এই মহাযুগকে ট্রায়াসিক, জুরাসিক এবং ক্রিটেশস—এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। ট্রায়াসিক পর্যায় ৩ কোটি বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। এই পর্যায়ে স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব ঘটে। ইহার পরবর্তী জুরাসিক পর্যায় অবধি ডাইনোসরদের আধিপত্য চলিতে থাকে। বিভিন্ন জাতীয় নানারকমের সরীসৃপেরা পৃথিবীর জল, স্থল, এমন কি, আকাশ-বাতাসেও ইহারা আধিপত্য বিস্তার করে। ব্রন্টোসরাস বা বজ্র-টিকটিকি নামক একজাতীয় ডাইনোসর প্রায় ৪.৫ মিটার উঁচু এবং প্রায় ২১ মিটার লম্বা হইত। শরীরের ওজন ৩০ হইতে ৪০ টন। ইহারা হ্রদ বা অন্যান্য জলাশয়েই বিচরণ করিত। ডিপ্লোডোকাস নামক ডাইনোসরগুলির শরীর ৩০ মিটারেরও বেশি লম্বা হইত। টাইরেনোসরাস রেক্সকে বলা হয় সরীসৃপদের রাজা। ইহাদের চোয়াল ছিল অতি শক্তিশালী এবং দাঁতগুলিও ছিল বৃহৎ এবং তীক্ষ্ণ। এতদ্ব্যতীত হংসচঞ্চু ডাইনোসর, উড্ডয়নক্ষম ডাইনোসরের জীবাশ্মেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সমুদ্রজলে ইক্‌থিওসরাস, প্লেজিয়োসরাস নামক বিশাল আকৃতির সরীসৃপের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই পর্যায়ের শেষের দিকে কয়েকজাতীয় সরীসৃপের অবলুপ্তি ঘটিয়াছিল। পরবর্তী জুরাসিক পর্যায়ে উড়ন্ত সরীসৃপেরা আকাশে তাহাদের প্রাধান্য বিস্তার করে। উড়ন্ত সরীসৃপগুলির মধ্যে ছিল লেজ ও দন্ত-সমন্বিত রামফোরিঙ্কাস এবং লেজবিহীন টেরোড্যাক্টিল। ইহা ছাড়াও বুকে-হাঁটা, দুই পায়ে হাঁটিতে সক্ষম, লতাগুল্মভোজী এবং হিংস্র প্রকৃতির ছোট-বড় বিভিন্ন জাতীয় সরীসৃপের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই সময়েই বিরাট আকৃতির সামুদ্রিক কুমির, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীরাও তাহাদের স্থলচর পূর্ব-পুরুষ হইতে ক্রমবিকশিত হইয়াছিল। আলোচ্য পর্যায়ের পূর্ববর্তী পর্যায়ের শেষভাগে প্রাথমিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। এই পর্যায়ের শেষভাগে সম্ভবতঃ ক্রিটেশস পর্যায়ে পানকৌড়ির মত হেস্‌পেরোনিস, ইক্‌থিওর্নিস প্রভৃতি পক্ষী-জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে এবং অতিকায় উড়ুক্কু প্যাঙ্গোলিন টেরানোডনের জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। সমুদ্রে বড় বড় মেছো প্যাঙ্গোলিন ইক্‌থিওসরাস এবং সাপের মত লম্বা গলা-সমন্বিত মেসোসরাস বিচরণ করিত। এই সকল সরীসৃপজাতীয় প্রাণী ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাণীরাও সেই সময়ে পৃথিবীতে বাস করিত। এই পর্যায়ে ইঁদুরের মত ছোট ছোট একপ্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। ইহার পর কাঠবিড়ালের মত এক্‌প্রকার পতঙ্গভুক স্তন্যপায়ী প্রাণী হইতেই সম্ভবতঃ মর্কটজাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবর্তনের ফলে এই বানরজাতীয় প্রাণী হইতেই মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ক্রিটেশস পর্যায়ের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সরীসৃপের প্রাধান্য হ্রাস পাইয়াছিল এবং বড় বড় প্যাঙ্গোলিন এবং দন্তুর পাখিরাও লুপ্ত হইয়া যায়। ইহার পর হইতেই কাইনোজোইক মহাযুগ অর্থাৎ পৃথিবীতে নবজীবনের যুগের সূচনা ঘটে। এই মহাযুগকে টার্শিয়ারি ও কোয়ার্টারনারি বা অ্যান্‌থ্রোপোজেনাস (পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভবের কাল) পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। অ্যান্‌থোপোজেনাস পর্যায়টি প্রায় ১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে শুরু হইয়াছিল এবং এখনও চলিতেছে।

টার্শিয়ারি পর্যায়ের প্রথমার্ধে মানুষের জন্মদাতা বানর-জাতীয় প্রাণীর প্রাচীনতম পূর্বপুরুষদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। টার্শিয়ারি পর্যায়েই গর্ভফুল (প্ল্যাসেন্টা)-সমন্বিত স্তন্যপায়ীদের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ অ্যান্থ্রোপোজেনিক পর্যায়ে মানুষের আবির্ভাব এবং তাহাদের আধিপত্য বিস্তারলাভ করিতে থাকে। এই পর্যায়ের শেষভাগে বৃক্ষবাসী বানরদের মধ্যে মনুষ্যাকৃতির বানর অ্যাম্ফিপিথেকাস ও প্রোপ্লিয়োপিথেকাসের উদ্ভব ঘটে। এই প্রাণীগুলি ছিল খুবই ছোট এবং দীর্ঘদিনের অভিব্যক্তির ফলে ক্রিটেশস পর্যায়ের পতঙ্গভুক পূর্বপুরুষ হইতে অনেকটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর মনুষ্যাকৃতির বানর ড্রাইয়োপিথেকাসের উদ্ভব ঘটে। ইহারা গাছের উপর বিচরণ করিলেও অনেক সময়ে মাটিতে নামিয়া খাদ্যান্বেষণ করিত। ইহার পর আরও উন্নত ধরনের অস্ট্রালেপিথেকাস নামক মনুষ্যাকৃতির বানরের আবির্ভাব হয়। ইহাদের বংশধরেরা মাটির উপরেই বসবাস করিত। ক্রমবিকাশের ফলে প্রায় ১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রথমে আবির্ভূত হয় পিথেকান্থ্রোপাস এবং তাহার পরে সিনেন্থ্রোপাস। ৫ লক্ষ বৎসর পূর্ব হইতে ক্রমশঃ নিয়েণ্ডারথাল, হাইডেলবার্গ এবং ক্রোম্যাগনন মানুষের উদ্ভব ঘটে। এইভাবেই সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ এবং উদ্ভিদজগতের অভাবনীয় বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রাণনাথ দত্ত (১৮৪০-৮৮ খ্রী) উনবিংশ শতকের নাট্যকার, সম্পাদক, ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী, অনুবাদক ও সমাজ-হিতৈষী। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে হাটখোলার (কলিকাতা) দত্ত পরিবারে জন্ম। পিতা লোকনাথ দত্ত। প্রাণনাথ প্রথমে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করেন।

হিন্দু কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর তিনি পণ্ডিতদের সাহায্যে গৃহে সংস্কৃত, ফারসী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার অনুশীলন করিতে থাকেন। উত্তরকালে 'রহস্য সন্দর্ভ' এবং 'বসন্তক' ('কার্টুন' দ্র) সম্পাদক রূপে তিনি যশস্বী হন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র -সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এ এবং 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকায় ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর -সম্পাদিত 'ভারতী'-তে প্রাণনাথ লেখক ছিলেন। তিনি 'প্রাণেশ্বর নাটক' (১৮৬৩ খ্রী) এবং 'সংযুক্তা স্বয়ম্বর' (১৮৬৭ খ্রী) নামক নাটক রচনা করেন। উত্তরকালে প্রাণনাথ 'রহস্য সন্দর্ভ' সম্পাদনা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন (এপ্রিল ১৮৭২ খ্রী) এবং দুই বৎসর ঐ সাময়িক পত্র তাঁহার প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহাকে নানা প্রকার সাহায্য করেন।

সাময়িক পত্র সম্পাদক হিসাবে প্রাণনাথের দ্বিতীয় উদ্যোগ মাসিক 'বসন্তক' প্রতিষ্ঠা (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি) ও পরিচালনা। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ জর্জরিত কার্টুন-প্রধান 'বসন্তক'-এর স্থান ঐতিহ্যময়। প্রাণনাথের নিজের অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্র ও নানা রচনা 'বসন্তক'-এ প্রকাশিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ৩৩৬ নম্বর চিৎপুর রোডে 'সুচারুযন্ত্র' নামে এক মুদ্রণ কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'বসন্তক' এই মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কালিদাস ও অন্যান্য ভারতীয় কবিদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদির ইংরেজী ভূমিকা -সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশ তাঁহার অপর উল্লেখ্য কীর্তি। তিনি টমাস মুরের 'লালা রুখ'-এর 'পদ্মমুখী' নামে পদ্যানুবাদও করেন। তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'সংশোধিত মানচিত্রাবলী' অঙ্কন ও প্রকাশ করেন।

লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্প্‌ল-এর আমলে (১৮৭৪-৭৭ খ্রী) যে আন্দোলনের ফলে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ কলিকাতার নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন বিধিবদ্ধ হয় সে আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন প্রাণনাথ। এই আইনের ফলে প্রথম কলিকাতা কর্পোরেশনে (তখন মিউনিসিপ্যালিটি) নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং প্রাণনাথ ছিলেন প্রথম নির্বাচিত সদস্যদের অন্যতম। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' এবং শিশিরকুমার ঘোষ -প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান লীগ'-এর তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর উত্তর কলিকাতায় নিজগৃহে প্রাণনাথের মৃত্যু হয়।

কমল সরকার

প্রাণ-রসায়ন বায়োকেমিস্ট্রি দ্র

প্রাণায়াম শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া বিশেষ। এক নাসারন্ধ্রের দ্বারা বায়ুগ্রহণ, দুই নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া উহা ধারণ এবং দ্বিতীয় নাসারন্ধ্রের দ্বারা উহা মোচন করা এই প্রক্রিয়ার তিন অংশ। ইহাদের নাম যথাক্রমে পূরক, কুম্ভক ও রেচক। যতটা সময় বায়ু গ্রহণ করা হইবে, তাহার চতুর্গুণ সময় উহা ধারণ ও দ্বিগুণ সময়

মোচনে ব্যয় করিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্র জপ করার বিধান আছে। প্রাণায়াম যোগের অষ্ট অঙ্গের এক অঙ্গ। ইহা দ্বারা জ্ঞানের আবরক কর্মের ক্ষয় হয়। ইহা দ্বারা মনের বিশুদ্ধি ও জ্ঞানের দীপ্তি সাধিত হয় (পাতঞ্জল যোগসূত্র ও ব্যাসভাষ্য—২।২৯, ৪৯, ৫২)। প্রাণায়ামের দ্বারা পূজার যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়। পূজার আদিতে ও অন্তে ইহা অবশ্য কর্তব্য। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেও প্রাণায়াম বিহিত (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়, ৩০৫)।

দ্র পতঞ্জলির যোগসূত্র, কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রাণীবিদ্যা জীববিদ্যার দুইটি শাখা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা। ক্ষুদ্র অ্যামিবা হইতে বৃহৎ হস্তী ও তিমি পর্যন্ত সকল প্রাণীর সম্পর্কে সকল বিষয়ে জ্ঞানই প্রাণী-বিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

ন্যূনপক্ষে একটি কোষ দ্বারা গঠিত দেহ, যাহার মৌলিক উপাদান প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ এবং যাহাতে প্রাণের সকল লক্ষণ বিদ্যমান তাহাই প্রাণী। তুলনামূলক বিচারে উদ্ভিদকোষের সহিত প্রাণীকোষের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রভেদ আছে। ক্লোরোফিলের অভাব থাকায় প্রাণীরা প্রাকৃতিক সরল উপাদান হইতে আপন খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাণীরা খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া প্রাণীদের সংবেদন-শীলতা ও চলৎশক্তি আছে।

প্রাণীবিদ্যায় প্রথম আলোচ্য বিষয় হইল প্রজাতি (স্পেসিস)। সম-আকৃতি ও প্রকৃতি-বিশিষ্ট প্রাণীদের লইয়া এক-একটি প্রজাতি। প্রজাতি প্রাণীরাজ্যের মূল একক।

দ্বিমাত্রিক নামকরণ (বাইনোমিয়াল নোমেন্‌ক্লেচার) হইল প্রাণীদের নামকরণের বৈজ্ঞানিক রীতি। এই রীতি অনুসারে প্রাণীদের নামের দুইটি অংশ আছে। ইহার প্রথম অংশটি গণ (জেনাস) এবং দ্বিতীয় অংশটি প্রজাতি নির্দেশ করে। বিজ্ঞানী লিনিয়াস এই নামকরণ পদ্ধতির প্রবর্তক। এই পদ্ধতি অনুসারে কুনো ব্যাঙের নাম হইল 'বুফো মেলানোস্তিক্‌তাস' (*Bufo melanostictus*)। হিমালয় পর্বত অঞ্চলে একজাতীয় কুনো ব্যাঙ পাওয়া যায়, তাহাকে বলা হয় 'বুফো হিমালয়ান' (*Bufo himalayan*)। একই গণ-ভুক্ত হইয়াও ইহারা দুইটি ভিন্ন প্রজাতি। আবার সোনা ব্যাঙ 'রানা' গণ-ভুক্ত। লাতিন বা লাতিনীকৃত ভাষায় এই নামকরণ হইয়াছে।

একই প্রজাতিভুক্ত কোনও দুইটি প্রাণী সম্পূর্ণভাবে সদৃশ নহে। একই প্রজাতিভুক্ত প্রাণীদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কয়েকটি প্রকার (ভ্যারাইটি) বা জাতিতে (রেস) বিভক্ত করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে মানুষের নাম হোমো সাপিয়েন্‌স্ (*Homo sapiens*); কিন্তু মানুষ মঙ্গোল, নিগ্রো, আর্য প্রভৃতি জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে 'রেস' শব্দটির পরিবর্তে 'ভ্যারাইটি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ও ভূনিম্নে যে অসংখ্য প্রাণী আছে তাহাদের প্রজাতিসংখ্যা প্রায় ১০০০০০০। ইহাদের সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজন, তাই প্রাণিজগৎকে অভিব্যক্তির ধারা অনুযায়ী তাহাদের সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। কতকগুলি প্রজাতি লইয়া একটি গোত্র (ফ্যামিলি)। আবার গোত্রের সমষ্টি হইল বর্গ (অর্ডার)। কতকগুলি বর্গ মিলিয়া একটি শ্রেণী (ক্লাস)। শ্রেণীগুলির সমন্বয়ে গঠিত হয় এক-একটি গোষ্ঠী (ফাইলাম)। সকল গোষ্ঠী লইয়াই প্রাণিরাজ্য। ইহা ছাড়া ঊর্ধ্ব ও অধঃ বিভাগেরও পদ্ধতি আছে; যেমন অধঃরাজ্য (সাব-কিংগ্‌ডম) এককোষী প্রাণী (প্রোটোজোয়া) এবং অধঃরাজ্য বহুকোষী প্রাণী (মেটাজোয়া)। প্রাণিরাজ্যের শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপ:

১. এককোষী প্রাণী গোষ্ঠী (ফাইলাম প্রোটোজোয়া) এককোষী প্রাণী অধঃরাজ্যে এই একটিমাত্র গোষ্ঠী বর্তমান ('এককোষী প্রাণী' দ্র)।

২. ছিদ্রালী প্রাণী গোষ্ঠী (ফাইলাম পোরিফেরা): এককোষী প্রাণী ব্যতীত সকল প্রাণীরই দেহ বহু কোষ দ্বারা গঠিত এবং বহুকোষী প্রাণী অধঃরাজ্যের (মেটাজোয়া) অন্তর্ভুক্ত। ছিদ্রালী প্রাণীর কলাসংস্থান অপরিণত বা নাই বলিলেই চলে। দেহগাত্রে অসংখ্য ছিদ্র আছে ('ছিদ্রালী প্রাণী' দ্র)।

৩. একনালী প্রাণী গোষ্ঠী (ফাইলাম কোয়েলেন্‌-টেরাটা): ইহাদের দেহ অরীয় সুষম (র‍্যাডিয়্যালি সিমেট্রিক্যাল) ও দ্বিস্তরবিশিষ্ট। ইহাদের মুখ আছে, কিন্তু পায়ু নাই। ('একনালী প্রাণী' দ্র)।

৪. চ্যাপটা কৃমি গোষ্ঠী (ফাইলাম প্লাটিহেল্‌-মিন্‌থেস): দেহ ত্রিস্তর, গহ্বরবিহীন এবং উদর ও পৃষ্ঠের দিকে চাপা ('কৃমি' দ্র)।

৫. গোল কৃমি গোষ্ঠী (ফাইলাম নেমাটহেল্‌-মিন্‌থেস): ইহারা দেখিতে সূতার ন্যায়। ইহাদের

প্রস্থচ্ছেদ বৃত্তাকার বলিয়া ইহাদের গোল কৃমি বলা হয় ('কৃমি' দ্র)।

৬. অঙ্গুরীমাল গোষ্ঠী (ফাইলাম আন্নেলিদা): ইহাদের দেহ অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত। কৃত্তিকা (কিউটিক্‌ল্) নরম। দেহে প্রকৃত দেহগহ্বর ('সিলোম') আছে। ইহাদের উদাহরণ কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি।

৭. সন্ধিপদ গোষ্ঠী (ফাইলাম আর্‌থ্রোপোদা): ইহাদের কৃত্তিক-আবরণী কাইটিন নামক রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। খণ্ডিত দেহের সাধারণতঃ প্রতিখণ্ডে একজোড়া করিয়া উপাঙ্গ (অ্যাপেন্‌ডেজ) আছে। পুঞ্জাক্ষি ইহাদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। চিংড়ি, আরশুলা, মশা, মাছি, ছারপোকা, উকুন, পঙ্গপাল, মৌমাছি, রেশমকীট, মাকড়সা, কাঁকড়াবিছা, কেন্নো, বিছা, প্রভৃতি ইহাদের উদাহরণ।

৮. শম্বুক গোষ্ঠী (ফাইলাম মোলাস্কা): ইহাদের দেহ নরম, কিন্তু খণ্ডে বিভক্ত নহে। দেহ একটি বিশেষ মাংসল চাদর বা 'ম্যান্‌ট্‌ল্ ফোল্ড' দ্বারা আবৃত এবং এই ম্যান্‌ট্‌ল্ ফোল্ড সাধারণতঃ একটি চুনা খোলের আবরণ তৈয়ারি করে। সাধারণভাবে উদরের দিকে একটি পা আছে। সম্মুখভাগে মাথার দিকেও পা থাকে ('শামুক' দ্র)।

৯. কণ্টকত্বক প্রাণী গোষ্ঠী (ফাইলাম একিনোদের্মাতা): ইহারা সামুদ্রিক প্রাণী। ইহাদের দেহত্বক চুনা-কাঁটায় ঢাকা ('কণ্টকত্বক প্রাণী' দ্র)।

১০. কর্ডাটা গোষ্ঠী (ফাইলাম কর্ডাটা): পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত এক বিশেষ দণ্ডের ন্যায় গঠনকে 'নোটোকর্ড' বলে। যাহাদের এই নোটোকর্ড আছে তাহারা কর্ডাটাভুক্ত প্রাণী এবং যাহাদের নোটোকর্ড নাই, তাহারা-সকলেই নন-কর্ডাটা। হীন কর্ডেটগুলিতে নোটোকর্ডটি নোটোকর্ড অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে; ইহার স্থান মেরুদণ্ডের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। কেন্দ্রীয় নার্ভরজ্জু (নার্ভকর্ড) একটিমাত্র ও ফাঁপা এবং পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। প্রকৃত লেজ শুধুমাত্র কর্ডেট প্রাণীদেরই আছে। ইহাদের গলবিল সছিদ্র।

মেরুদণ্ডীদের দেহে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নোটোকর্ডটির স্থান মেরুদণ্ডের দ্বারা গৃহীত হয়। মেরুদণ্ডীরা দুইটি প্রধান ঊর্ধ্ব-শ্রেণীতে বা সুপার-ক্লাসে (Super-class) বিভক্ত। একটি হইল চোয়ালবিহীনদের ঊর্ধ্ব-শ্রেণী 'আনোথা' এবং অপরটি চোয়ালবিশিষ্টদের ঊর্ধ্ব-শ্রেণী 'গ্‌নাথোস্তোমাতা'। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত।

ক. সাইক্লোস্তোমাতা শ্রেণী: ইহাদের কোনও চোয়াল নাই। তাই ইহারা আনোথা ঊর্ধ্ব-শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের গোল শোষণক্ষম মুখ আছে, একটি অযুগ্ম কাঁটাহীন পাখনা আছে, মেরুদণ্ড অপরিপুষ্ট এবং গলবিলে ছিদ্রসংখ্যা ৬ হইতে ১৪ জোড়ায় সীমাবদ্ধ। 'পেট্রোমিজন' (Petromyzon) ও 'মিক্সিন' (Myxine) ইহাদের উদাহরণ।

চোয়ালবিশিষ্ট গ্‌নাথোস্তোমাতা ঊর্ধ্ব-শ্রেণীর অন্তর্গত শ্রেণীগুলি নীচে উল্লেখিত হইল।

খ. মৎস্য শ্রেণী (ক্লাস পিসেস): প্রকৃতপক্ষে মৎস্য শ্রেণীতে দুইটি পৃথক শ্রেণী আছে—মুচমুচে হাড়-বিশিষ্ট মৎস্য 'কণ্ড্রিকৃথিস' ও দৃঢ় হাড়বিশিষ্ট মৎস্য 'ওস্‌টিকথিস' ('মাছ' দ্র)।

গ. উভচর শ্রেণী (ক্লাস আম্‌ফিবিয়া): এই শ্রেণীর প্রাণীদের ত্বক সিক্ত ও শল্কবিহীন। শুক (লার্ভা) অবস্থায় জলচর ও তখন ফুলকার সাহায্যে শ্বসণ চালায়, কিন্তু পরিণত অবস্থায় স্থলচর ও ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায়। ইহারা তাপনিয়ন্ত্রণক্ষম নহে ('উভচর' দ্র)।

ঘ. সরীসৃপ শ্রেণী (ক্লাস রেপ্‌টিলিয়া): ত্বক শুষ্ক। বহিঃত্বকসৃষ্ট শল্কে আবৃত। ইহারা চতুষ্পদী এবং ডাঙ্গায় ডিম পাড়ে ('সরীসৃপ' দ্র)।

ঙ. পক্ষী শ্রেণী (ক্লাস আভিস): ত্বক পালকে আবৃত। সম্মুখের পা-দুইটি ডানায় পরিণত হইয়াছে। ইহারা দেহের তাপনিয়ন্ত্রণে সক্ষম। পক্ষীরা অণ্ডজ ('পাখি' দ্র)।

চ. স্তন্যপায়ী প্রাণী (ক্লাস মামালিয়া, Mammalia): ইহাদের ত্বক রোমাবৃত। ইহারা তাপনিয়ন্ত্রণে সক্ষম ও স্তনবিশিষ্ট। শিশুরা দুগ্ধপুষ্ট ('স্তন্যপায়ী প্রাণী' দ্র)।

এই শ্রেণীবিন্যাস প্রাণীদের পরস্পর সম্পর্কের পরিচায়ক।

প্রাণীবিদ্যার বিভিন্ন শাখাগুলি নিম্নরূপ। মর্‌ফোলজি (অঙ্গগঠন) শাখায় অঙ্গের সংস্থান বা গঠনের আলোচনা করা হয়। বহিরঙ্গের বিচার হইল এক্সটার্নাল মর্‌ফোলজি; ব্যবচ্ছেদের দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ অঙ্গের বিচারপদ্ধতি হইল ইণ্টার্নাল মরফোলজি বা অ্যানাটমি। অণুবীক্ষণের সাহায্যে অঙ্গসকলের ক্ষুদ্র অংশের বিচার-প্রক্রিয়া হইল হিস্টোলজি। আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুধু কোষকে পরীক্ষা করার নাম কোষতত্ত্ব (সাইটোলজি)। তুলনামূলকভাবে অন্তঃস্থ অঙ্গসংস্থানের বিচার কম্প্যারাটিভ অ্যানাটমির বিষয়বস্তু। প্রাণীদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির ক্রিয়াবিচারই হইল প্রাণী-শারীরবিদ্যা

(অ্যানিম্যাল ফিজিওলজি)। প্রাণীবিদ্যার যে শাখায় বংশগত গুণাবলীর ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, সেই শাখাকে সুপ্রজননবিদ্যা (জেনেটিক্স) বলে। নিষিক্ত ডিম হইতে ভ্রূণের উৎপাদন ও ভ্রূণের গঠন-বিচার সম্বন্ধে বিদ্যা ভ্রূণতত্ত্ব (এম্‌ব্রায়োলজি)। বাস্তু-সংস্থান তত্ত্ব (ইকোলজি) প্রাণীদের আশ্রয়স্থল ও তাহার পরিবেশ এবং প্রাণীদেহে এই পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার আলোচনা। প্রাণীরা পৃথিবীতে বহু বিস্তারিত; এই প্রাণীবিস্তারের আলোচনাকে প্রাণী-ভূগোল (জু্‌জিওগ্রাফি) বলে। প্রাগৈতিহাসিক কালে বিলুপ্ত প্রাণীদের জীবাশ্মের বিচার-বিশ্লেষণ প্রত্নাশ্মবিদ্যার (প্যালিওণ্টোলজি) আলোচ্য বিষয়। বর্তমান প্রাণীসমূহ পূর্ববর্তী প্রাণীদের পরিবর্তিত রূপ; কি ভাবে এই প্রাণীগুলির ক্রমবিকাশ ঘটিল তাহার বিচারপদ্ধতি হইল—অভিব্যক্তি (ইভলিউশন)। আবার এক প্রাণীর সহিত আর এক প্রাণীর সম্বন্ধ থাকিতে পারে, একটি প্রাণী আর একটির উপর তাহার আশ্রয়ের জন্য নির্ভরশীল হইতে পারে। ইহা পরজীবিবিদ্যার (প্যারাসাইটোলজি) বিচার্য বিষয়।

অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাথমিক শিক্ষা কথাটি দুই রকম অর্থে ব্যবহার করা হয়। এক অর্থে বলা হয় ছেলেমেয়েদের প্রথম বয়সের শিক্ষাকে; অর্থাৎ ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সের শিক্ষাকে। দ্বিতীয় অর্থে বলা হয়, সমাজে ব্যক্তির প্রথম স্তরের শিক্ষা; অর্থাৎ ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের শিক্ষাকে।

৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের শিক্ষাকে দুইভাবে ভাগ করা হয়। ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সের শিক্ষাকে বলা হয় নিম্ন-প্রাথমিক আর পরবর্তী শিক্ষাস্তরকে বলা হয় উচ্চ-প্রাথমিক বা মধ্য-বিদ্যালয় বা নিম্ন-মাধ্যমিক।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করিবার আন্দোলন দেখা গিয়াছে। ইংরেজ আমলে কতকগুলি দেশীয় রাজ্য এবং অন্যত্র কিছু কিছু অঞ্চলে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

স্বাধীন ভারত কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়ের মিলিত সহযোগে এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

দুইটি প্রধান নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে: ১. চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকবালিকার শিক্ষাকে আবশ্যিক এবং অবৈতনিক করা ২. প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনের এবং এই শিক্ষাকে বুনিয়াদি শিক্ষায় পরিবর্তিত করা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে ৬ হইতে ১০-১১ বৎসর বয়সের শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা ছিল। গ্রামাঞ্চলের এই প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে দুইটি বিশেষ নীতি গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে: ১. প্রতি ৩০০ গ্রামবাসীর জন্য গ্রামের একটি করিয়া নিজস্ব প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিবে; যে সব গ্রামে অধিবাসীর সংখ্যা ৩০০-এর কম, সেখানে কয়েকটি গ্রামকে মিলিত করিয়া ঐ সংখ্যা-অনুযায়ী একটি করিয়া গোষ্ঠী বিদ্যালয় (গ্রুপ স্কুল) প্রতিষ্ঠা করা হইবে। কিন্তু এই বিদ্যালয় ঐ গ্রামগুলির ১ মাইলের মধ্যেই তৈয়ারি করা হইবে।

সারা ভারতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের দিকে ২৭৮১৩৫টি বিদ্যালয় ছিল। তাহার পর আরও কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দরকার ছিল আরও ৭০০০০টি বিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে আনুমানিক ২৭৭৯০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল; ছাত্রসংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষের মতো; শিক্ষকসংখ্যা প্রায় ৭৮ হাজার; ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দ ছিল ৬·৩৭ কোটি টাকা।

১৯৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৭৮০০০ এবং তাহাদের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৬৬ লক্ষ।

সুধীরচন্দ্র রায়

প্রায়শ্চিত্ত কৃত পাপকর্মের পাপক্ষয়ের নিমিত্ত অনুষ্ঠেয় ব্রত-তপস্যাদি। ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, ব্রাহ্মণের সোনা চুরি, গুরুপত্নীগমন প্রভৃতি মহাপাপ হিসাবে পরিগণিত ছিল; গোবধ, চৌর্য, ঋণ শোধ না করা, স্ত্রী-শূদ্রাদিবধ, পিতৃ-মাতৃসুতত্যাগ প্রভৃতি উপপাতকরূপে গণিত ছিল। এই সমস্ত পাপের জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল। ব্রহ্মহত্যার একটি প্রায়শ্চিত্ত—নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিয়া একজন ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা। মদ্যপানের প্রায়শ্চিত্ত—অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত সুরা, জল, গব্য ঘৃত, গোমূত্র বা গোদুগ্ধ পান করিয়া মৃত্যুবরণ। ব্রাহ্মণের স্বর্ণাপহারী স্বকৃত কর্ম ঘোষণা করিয়া রাজাকে মুষল অর্পণ করিবে ও রাজা সেই মুষলের দ্বারা তাহাকে বধ করিবেন। গোবধের প্রায়শ্চিত্ত—এক মাস সংযতভাবে অবস্থান, পঞ্চগব্যপান, গোশালায় শয়ন, গোরুর পরিচর্যা ও মাসান্তে গোদান। সাধারণভাবে অন্য

উপপাতকের স্থলেও এই প্রায়শ্চিত্ত অথবা চান্দ্রায়ণ, পরাক (বার দিন উপবাস) বা (শত বা শতাধিক) প্রাণায়ামের ব্যবস্থা। এখনকার সমাজে এই সমস্ত ব্যবস্থা অনপেক্ষিত বা অচল। ক্বচিৎ সামান্য অর্থ দানের দ্বারা কার্য সমাধা করা হয়। পূর্বে অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরাই এই দানের অর্থ গ্রহণ করিতেন। প্রায়শ্চিত্তের পূর্বদিন মস্তক মুণ্ডন করিবার নিয়ম ছিল।

দ্র যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা—প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়; মনুসংহিতা; ভবদেব ভট্ট, প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ; রঘুনন্দন, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব; শূলপাণি, প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রিন্সেপ, জেম্‌স (১৭৯৯-১৮৩৯ খ্রী) লণ্ডনের অন্ডারম্যান জন প্রিন্সেপের পুত্র জেম্‌স প্রিন্সেপ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতার সহিত ভারতবর্ষে আসেন এবং কলিকাতা টাঁকশালের সহকারী 'অ্যাসে মাস্টার' পদে নিযুক্ত হন। এই টাঁকশালের তদানীন্তন 'অ্যাসে মাস্টার' স্বনামধন্য হোরেস হেম্যান উইল্‌সনের সংস্পর্শে আসিবার ফলে জেম্‌স প্রিন্সেপের মনে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি-সম্পর্কে আগ্রহ জাগে এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁহার সংযোগ সাধিত হয়। প্রিন্সেপ পরে এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রয়াসে ও প্রযত্নে মেজর হার্বার্ট নামে কোম্পানির বিজ্ঞান দপ্তরের জনৈক পদস্থ কর্মচারী-সম্পাদিত 'গ্লিনিংস ইন সায়ান্স' নামক পত্রিকাটি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মার্চ হইতে 'জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি' নামে প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশিত হইতে শুরু করে।

ভারততত্ত্ববিদ্‌ হিসাবে জেম্‌স প্রিন্সেপের অবিস্মরণীয় কীর্তি অশোক লেখমালার পাঠোদ্ধার ('ব্রাহ্মী' দ্র)। সাঁচীতে প্রাপ্ত কয়েকটি নিবেদনাত্মক বৌদ্ধ স্তূপে উৎকীর্ণ লেখসমূহের ছাপ (এস্টেম্পেজ) পরীক্ষাকালে তিনি 'স', 'দ' ও 'ন' অক্ষর তিনটি উদ্ধার করেন। অতঃপর তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া দিল্লীর ও গিরনারের অশোকলেখ-এর পাঠোদ্ধার করেন। তিনি খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধারেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব সম্পর্কেও প্রিন্সেপের অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রিন্সেপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত ফসিল প্রাণীর কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে আকর্ষণীয় আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া প্রিন্সেপ 'ভিয়ুজ অ্যাণ্ড ইলাস্ট্রেশান্‌স অফ বেনারস' গ্রন্থে চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। প্রিন্সেপের আর একটি কৃতিত্ব ভারতে মুদ্রা-সংক্রান্ত ওজন ও মাপের সংস্কারসাধন।

তিনি ভারতীয় প্রত্নবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অশোকলেখ-এর পাঠোদ্ধারক প্রিন্সেপের কাছে ভারতীয়দের ঋণ অপরিশোধ্য।

দ্র কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, 'জেম্‌স প্রিন্সেপ,' চতুরঙ্গ, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ; James Prinsep, *Essays on Indian Antiquities*, E. Thomas, ed. 2 vols., London, 1858.

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬ খ্রী) সাহিত্যরসিক, পিতা মহেন্দ্রনাথ সেন, মাতা হীরামণি, জন্ম ১০ নভেম্বর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু ২৫ অক্টোবর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। সাহিত্যে তিনি ছিলেন 'সাত সমুদ্রের নাবিক'। তিনি বাংলা ইংরেজী, ফরাসী, এবং ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্য অধিগত করিয়াছিলেন। তিনি রচনাকুণ্ঠ ছিলেন কিন্তু তাঁহার রসজ্ঞতা দ্বারা বিহারীলাল চক্রবর্তী, প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। প্রিয়নাথ সেনের গদ্য রচনার অনেকগুলিই রবীন্দ্রনাথের কাব্যব্যাখ্যান বা সাহিত্যদ্বন্দ্বে তাঁহার সমর্থন উপলক্ষ্যে রচিত। মোপাসাঁ ও রাস্কিন সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) তাঁহার যাবতীয় গদ্য রচনা সংকলিত। তিনি কিছু কবিতাও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজী কবিতা এড্‌মণ্ড গস্‌-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ; প্রমথ চৌধুরী, "প্রিয়নাথ সেন", সবুজ পত্র, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ; Nagendranath Gupta, "Some Celebrities...Preonath Sen." *The Modern Review*, May, 1927.

পুলিনবিহারী সেন

প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫ খ্রী) জন্ম ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে পাবনা জেলার গুনাইগাছা গ্রামে। পিতা কৃষ্ণকুমার বাগচী। মাতা প্রমথ চৌধুরীর সহোদরা প্রসন্নময়ী দেবী। বাল্যশিক্ষা কৃষ্ণনগরে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন স্কুলে ভর্তি হইয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রেন্স্‌ এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। ঐ বৎসরেই মধ্যপ্রদেশে রায়পুরের আইন-

জীবী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিধবা হন। ইহার পরে তাঁহার একমাত্র পুত্রটিও অকালে লোকান্তরিত হয়। শূন্য জীবনে সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত হইলেও কাব্যচর্চাই তাঁহার জীবনে প্রধান অবলম্বন ছিল। তাঁহার কবিতাগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র, করুণ বিষণ্ণ অশ্রুবিন্দুর মতই স্বচ্ছ-সুন্দর। প্রিয়ম্বদা দুঃখবাদী কবি। কাব্যরচনায় ইনি রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কিছু কিছু কবিতা ও কাব্যকণিকা ভ্রমক্রমে রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের নাম— 'রেণু' (১৯০০), 'তারা' (১৯০৭), 'পত্রলেখা' (১৯১১), 'অংশু' (১৯২৭), 'চম্পা ও পাটল' (১৯৩৯)। তাঁহার অন্যান্য বই—'অনাথ' (১৯১৫), 'পঞ্চুলাল' (১৯২৩), 'কথা ও উপকথা' (১৯২৩)। 'ঝিলেজঙ্গলে শিকার', কুমুদনাথ চৌধুরীর ইংরেজী 'শিকার' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ (১৯২৪)।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রিয়ম্বদা দেবীর জীবনাবসান ঘটে।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে নারী, কলিকাতা ১৯৫০।

রাধারাণী দেবী

প্রিয়রঞ্জন সেন (১৮৯৩-১৯৬৭ খ্রী) প্রখ্যাত অধ্যাপক, সাহিত্যসেবী, গান্ধীবাদী ও দেশপ্রেমিক। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রসন্নকুমার সেন। তাঁহার স্কুলের শিক্ষা শুরু হয় দিনাজপুরে। তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে চাইবাসা জেলা স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পরে কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজ হইতে আই. এ. ও বি. এ. পাশ করেন ; ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজীতে এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন।

তাঁহার কর্মজীবন শুরু হয় রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে (১৯২০-২৩ খ্রী), পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কার্যে যোগদান করেন (১৯২৩ খ্রী)। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপকরূপে তিনি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে লিটারারি ওয়ার্কশপের পরিচালক নিযুক্ত হন, পরে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতী ইনস্টিটিউট অফ রুর‍্যাল হায়ার এডুকেশন-এর সঞ্চালক-রূপে কাজ করেন (১৯৫৭-৬০ খ্রী)।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তিনি গান্ধীজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে দমদম জেলে আটক ছিলেন। ১৯৪৪ হইতে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 'হরিজন সেবক সংঘ'-এর বঙ্গীয় শাখার অবৈতনিক কর্মসচিব ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় গণ-পরিষদের সদস্য হন ও ১৯৫২-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : সাহিত্য-প্রসঙ্গ (১৩৫৩), 'ওড়িয়া সাহিত্য' (১৩৫৮), *Western Influence in Bengali Literature* (১৯৩২ খ্রী), *Western Influence in Bengali Novels* (১৯৩২ খ্রী), *Modern Oria Literature* (১৯৪৭ খ্রী) ইত্যাদি। তিনি প্রেমচন্দের 'গোদান' (১৯৪৫ খ্রী), র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো-র *In Tune With the Infinite* ('অনন্তের সুরে', ১৯৪৯ খ্রী), হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'বাণভট্টের আত্মকথা' (১৯৫৮ খ্রী) প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার (১৯১১-১৯৩২ খ্রী) বাংলার অন্যতম নারী বিপ্লবী ও শহীদ। প্রীতিলতার জন্ম চট্টগ্রামে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা-মাতা জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দাদার ও প্রতিভাময়ী। প্রীতিলতা ছাত্রজীবনে ঢাকায় দীপালী সংঘে ও কলিকাতায় ছাত্রীসংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঢাকা বোর্ডের আই. এ. পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিস্টিংশনে বি. এ. পাশ করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর তিনি বিপ্লবনেতা সূর্য সেনের প্রভাবে আসেন এবং ছাত্রী অবস্থায় কলিকাতার কাজের ভার নেন। এই সময়ে ফাঁসীর আদেশ প্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সহিত জেলে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। পাশ করার পর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে নন্দন-কানন স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন। পলাতক মাস্টারদা সূর্য সেন যখন ধলঘাট গ্রামে সাবিত্রী দেবীর আশ্রয়ে ছিলেন, বিপ্লবের কাজে প্রীতিলতা সেখানে যাইতেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুন রাত ৮টায় স্থানীয় মিলিটারি ওই আশ্রয়স্থল ঘিরিয়া ফেলে। সেখানে সংঘর্ষে অন্যতম নেতা নির্মল সেনের গুলিতে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন নিহত হন। কিন্তু গুর্খা সৈন্যের গুলিতে নির্মল ও অপূর্ব সেনের মৃত্যু হয়। সূর্য সেন প্রীতিলতাকে লইয়া পলাইতে সক্ষম হন।

প্রীতিলতার গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়। ওই বৎসরই ২৪ সেপ্টেম্বর কয়েকজন কর্মী এবং বোমা ও পিস্তল-সহ প্রীতিলতা পাহাড়তলি ইওরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। ক্লাবের একজন হত এবং কয়েকজন আহত হয়। বিপ্লবীরা অক্ষত দেহে সূর্য সেনের নিকট ফিরিয়া যান। কিন্তু প্রীতিলতা পটাশিয়াম সায়ানাইড খাইয়া দেহ ত্যাগ করেন।

দ্র কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

কমলা দাশগুপ্ত

প্রুধ, পিয়ার জোসেফ (১৮০৯-৬৫ খ্রী) ফরাসী সমাজতন্ত্রী, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মনস্বী, দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তা। অল্প বয়সে ছাপাখানায় কাজ করিতেন; স্বয়ং শিক্ষিত ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। বিনা সুদে কর্জ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন কিন্তু তাহা টিঁকে নাই। 'দারিদ্র্যের দর্শন' (System des Contradictions economiques ou philosophie de la misere) তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তিনি এই প্রসিদ্ধ উক্তি করিয়াছিলেন: 'সম্পত্তি হইল চৌর্য'। তিনি মনে করিতেন, মানুষের দ্বারা মানুষের সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় শাসনই উৎপীড়ন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ভাবীকালের আদর্শ সমাজে সকলের বেতন সমান হইবে এবং শৃঙ্খলার সহিত নৈরাজ্যের ('অ্যানার্কি') মিলন ঘটিবে। কিন্তু অবিরাম সমালোচনা ও সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী সামাজিক রূপান্তরের দ্বারা ঐ লক্ষ্যে পৌছাইতে হইবে। রাতারাতি সমাজের উপর এক আনকোরা নূতন ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টাকে তিনি অবৈজ্ঞানিক ও অশুভ বলিয়া মনে করিতেন। এইখানেই ছিল প্রুধঁর সহিত মার্কসের মূলগত বিরোধ। সমকালীন ও উত্তরকালীন সমাজতান্ত্রিক সিণ্ডিক্যালিস্ট ও মিউচুয়ালিস্ট প্রভৃতি আন্দোলনের উপর তাঁহার প্রভাব প্রভূত।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

প্রুস্ত, মার্সেল (১৮৭১-১৯২২ খ্রী) প্রখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক। জন্ম প্যারিসে; পিতা বিখ্যাত চিকিৎসক। মাতা সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিমান ইহুদী পরিবারের কন্যা। পুত্রের স্পর্শকাতর কাব্যিক মনোবৃত্তি মাতৃসূত্রে লব্ধ। সুনির্দিষ্ট ধারায় তাঁহার লেখাপড়া হয় নাই। তিনি ছিলেন চিররুগ্ণ। অর্ধশায়িত অবস্থায়ই তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-কর্ম সৃজিত হয়।

তাঁহার সমগ্র জীবনের সাহিত্যকৃতি একটি বৃহদায়তন উপন্যাসে বিধৃত। তাঁহার সেই বিখ্যাত উপন্যাসের নাম, 'A la Recherche du temps perdu' (Remembrance of Things Past')। ১৯১৩ হইতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার মূল ফরাসী গ্রন্থ ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়, এবং শেষ খণ্ডটি তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। হেন্‌রি জেম্‌স, জেম্‌স জয়েস ও টি. এস. এলিয়ট -এর মতো প্রুস্ত সময় ও তাহার প্রবহমান গতিশীলতাকে তাঁহার রচিত উপন্যাসের মর্মমূলে নিবদ্ধ করেন। তাঁহার এই সুবৃহৎ উপন্যাসে স্মৃতিচারণ, অতীত-ভবিষ্যৎ সমীকরণ প্রভৃতির ব্যবহারে এক সুষমামণ্ডিত কাব্যজগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। কলাকৃতির উৎকর্ষ ব্যতিরেকে তাঁহার উপন্যাসে তদানীন্তন ক্ষয়িষ্ণু ফরাসী সমাজজীবনের সজীব আলেখ্য চিত্রিত।

প্রুস্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার গৃহের কাগজ-পত্রের মধ্য হইতে তাঁহার আর একটি অপ্রকাশিত উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'Jean Santeuil' নামক তাঁহার একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ইহা তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম খসড়া বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। তিনি রাস্কিনের ভক্ত ছিলেন এবং জর্জ এলিয়টের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উপর প্রুস্তের প্রভাব উল্লেখনীয়।

দ্র E. R. Curtis, *Marcel Proust*, London, 1928.

শিশির চট্টোপাধ্যায়

প্রেত মৃত্যুর পর মানুষ প্রেতদেহ প্রাপ্ত হয়। আদ্য-শ্রাদ্ধ হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত ষোলটি শ্রাদ্ধের দ্বারা প্রেতত্বের বিমুক্তি ঘটে। প্রেতত্ব-বিমুক্তির পর আপন কর্মানুসারে জীব ভোগানুকূল দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে অথবা নরকে গমন করেন। শবদাহ হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত কৃত্যসমূহকে প্রেতকৃত্য বলা হয়। প্রেতকৃত্যে প্রদত্ত দ্রব্যাদি অগ্রদানী ব্রাহ্মণের প্রাপ্য। প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠান করিয়া শ্রাদ্ধকর্তা স্নানের দ্বারা শুদ্ধ হন। প্রেতকৃত্য বাস-গৃহে সম্পাদন করার নিয়ম নাই।

প্রেতের উদ্দেশ্যে গয়াতীর্থের প্রেতপর্বত বা প্রেত-শিলায় পিণ্ডদান করিলেও প্রেতত্বের বিমুক্তি ঘটে।

সুখময় ভট্টাচার্য

প্রেমচন্দ, প্রেমচাঁদ (১৮৮০-১৯৩৬ খ্রী) সাহিত্যিক জগতে মুন্‌শী প্রেমচন্দ নামে বিখ্যাত। তাঁহার মাতৃ-পিতৃদত্ত নাম ছিল 'ধনপত্‌ রায়'। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীর নিকটে লমহী গ্রামে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুন্‌শী অজায়বলাল ডাকঘরে ক্লার্কের কাজ করিতেন। সাত বৎসর বয়সেই প্রেমচন্দ মাতৃহীন হন। মাতৃহীন হইবার অল্পকাল পরেই বিমাতার আগমন ও অসদ্ব্যবহার তাঁহার জীবনকে আরও দুঃসহ করিয়া দিল। ম্যাট্রিক পাস না করিতেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং সংসার প্রতিপালনের ভার তাঁহাকে বহন করিতে হয়। নিজের চেষ্টায় তিনি বি. এ. পাশ করেন ও দরিদ্র স্কুলমাস্টার হইতে ধীরে ধীরে তিনি প্রাথমিক স্কুলের ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উপন্যাস লেখা আরম্ভ করেন। তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ছোটগল্প লেখেন। প্রথমে তিনি উর্দু ভাষাতেই লিখিতেন। হিন্দী ভাষায় তাঁহার প্রথম উপন্যাসের নাম 'প্রেমা'। তাঁহার রচনাগুলি হইতে একথা স্পষ্ট হইয়া ওঠে যে তিনি যতই সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসিতে থাকেন ততই কৃত্রিম ও কঠিন রচনাশৈলী ছাড়িয়া সুন্দর, সহজ ও সরলতর রচনাভঙ্গীর দিকে অগ্রসর হন।

'সোজে ওঅতন' গল্পসংগ্রহটি তাঁহার জীবনে ও সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের আদর্শ জাগ্রত করার অপরাধে এই বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

প্রথমে তিনি 'নবাব রায়' নামে লেখা আরম্ভ করেন। 'সোজে ওঅতন'-এর পর হইতে তিনি 'প্রেমচন্দ' নামে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং সরকারি চাকরি ছাড়িয়া দেন। জীবনব্যাপী দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তিনি যে সত্যদর্শন করিয়াছিলেন—তাহারই ফলস্বরূপ তাঁহার সাহিত্য এত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে হিন্দী ও উর্দু-ভাষী জনসমাজে।

ছত্রিশ বৎসরের সাহিত্যিক জীবনে তিনি বারোটি উপন্যাস ও প্রায় তিনশত গল্প লেখেন। তাঁহার সাহিত্যে গ্রামীণ ভারতীয় কৃষকদের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন এবং আমাদের দেশের সামাজিক ব্যবস্থার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করা এবং অন্ধবিশ্বাস, দম্ভ ও শোষণ ইত্যাদি অমানবিক শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলিবার প্রেরণাদানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আদর্শবাদী লেখক ধীরে ধীরে বাস্তববাদী হইয়া পড়েন। সমাজ সংস্কারের পরিবর্তে সংঘর্ষ ও আমূল পরিবর্তনেই তিনি বিশ্বাসী হইয়া পড়েন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্বভারতীয় প্রগতিলেখক সঙ্ঘের প্রথম সভাপতি হন। ঐ বৎসরেই ৮ অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়।

নানা দেশী ও বিদেশী ভাষায় তাহার রচনা অনূদিত হইয়াছে। উর্দু ও হিন্দী ভাষার অন্যতম প্রধান লেখক হিসাবে তাঁহার স্থান সুদৃঢ়। তাঁহার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: গোদান, সেবাসদন, রঙ্গভূমি, কর্মভূমি, গবন ইত্যাদি।

রেবতীরঞ্জন সিংহ

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ (১৮০৬-৬৭ খ্রী) সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক। বর্ধমানের অন্তর্গত শাকনাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম; পিতার নাম রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন; সেখানে চারি বৎসর ছয় মাস অধ্যয়ন করিয়া এডুকেশন কমিটি হইতে 'তর্কবাগীশ' উপাধি লাভ করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে অলংকারের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সে পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কাশীধামেই বাস করেন।

বাল্যকালে প্রেমচন্দ্রের কবির দলে গান রচনার অভ্যাস ছিল। কলিকাতায় আসিয়া সেই সূত্রেই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' এবং গৌরিশংকর তর্কবাগীশের 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকার সংস্কৃত শিরোলেখ রচনা করিয়া দেন। প্রথম দিকে 'প্রভাকর' পত্রিকার তিনি লেখকও ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় কাব্যরসপূর্ণ শ্লোকরচনাতেই তাঁহার খ্যাতি ছিল সমধিক। সংস্কৃত সমস্যাপূরণে তাঁহার কবিত্ব-কুশলতার পরিচয় 'সমস্যাকল্পলতা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থের তদ্রচিত টীকাও সুপ্রসিদ্ধ।

প্রেমচন্দ্র সুবিখ্যাত জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কালে ক্ষোদিত তাম্রশাসন ও প্রস্তরফলকের পাঠোদ্ধারে সাহায্য করিয়াছিলেন।

দ্র রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবন-চরিত ও কবিতাবলী, ৫ম সংস্করণ, ১৯২৪; জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (উত্তর ভারত), কলিকাতা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

ভবতোষ দত্ত

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ (১৮৩১-১৯১৮ খ্রী) প্রখ্যাত ধনী ও জনহিতব্রতী গুজরাটি জৈন ধর্মাবলম্বী দোমা অসওয়াল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট নগরে এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বিদ্যালয়ে পাঠরত ষোড়শ বর্ষীয় প্রেমচাঁদকে আনিয়া তাঁহার পিতা রায়চাঁদ দীপচাঁদ আপন সহকারীপদে নিয়োজিত করেন। প্রেমচাঁদ এখানে ব্যবসায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেন।

আমেরিকার গৃহবিবাদকালে তুলার ব্যবসায়ে প্রেমচাঁদ কিছুকালের মধ্যে ব্যবসায়ী মহলে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

আমেরিকায় গৃহ-বিবাদ শান্ত হওয়ায় ইংল্যাণ্ড পুনরায় তাহার সহিত তুলার ব্যবসা শুরু করে। ফলে প্রেমচাঁদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে এবং কিছুকাল পরে তিনি বাধ্য হইয়া দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পুনরায় বোম্বাইয়ের তুলার বাজার ভাল হইলে তিনি আবার ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

প্রেমচাঁদ অকাতরে দান করিতেন। সারা জীবনে তিনি মোট ষাট লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত দুই লক্ষ টাকার সুদ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা কৃতী ছাত্রগণকে 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' নামক গবেষণা বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রথম এই বৃত্তি দেওয়া শুরু হয়।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অশোকা সেনগুপ্ত

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০-১৯৬৪ খ্রী) প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক। পিতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহেশচন্দ্র আতর্থী। বাল্যকাল হইতেই প্রেমাঙ্কুর কল্পনাপ্রবণ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার-প্রিয় ছিলেন। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ না করিলেও প্রেমাঙ্কুর নিজপ্রচেষ্টায় দেশবিদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। প্রেমাঙ্কুরের জীবন বৈচিত্র্যময়। অল্প বয়সেই গৃহ হইতে পলাইয়া তিনি বোম্বাই চলিয়া যান। নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়া অবশেষে তিনি চৌরঙ্গির এক ক্রীড়াসামগ্রীর বিপণির সহিত কর্মসূত্রে যুক্ত হইয়া পড়েন। তাহার পর তিনি দৈনিক 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা-কার্যে ব্রতী হন। 'হিন্দুস্থান' ব্যতীত 'বৈকালী' নামক সান্ধ্যপত্রিকা, 'যাদুঘর' নামক কিশোরদের মাসিকপত্র, 'জাহ্নবী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রভৃতির সম্পাদনা ও প্রকাশনের সহিতও প্রেমাঙ্কুর বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন। 'বেতারজগত' পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক ছিলেন। প্রথমে লাহোরের একটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানে এবং পরে কলিকাতার নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডে তিনি চলচ্চিত্র প্রণয়নকার্যে অংশগ্রহণ করেন। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম সবাক চিত্র 'দেনা-পাওনা'র পরিচালক ছিলেন প্রেমাঙ্কুর। এতদ্ব্যতীত 'কপালকুণ্ডলা', 'দিক্‌শূল', 'ভারত-কী-বেটী', 'সরলা', 'সুধার প্রেম', 'য়ীহুদী-কী লড়কী' প্রভৃতি চলচ্চিত্র প্রণয়নেও তাঁহার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

কথাসাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর রম্যরস, ঘটনাবৈচিত্র্য ও রোমাঞ্চের দ্বারা নিজ রচনাকে বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'আনার-কলি' (১৯২৫ খ্রী), 'বাজীকর' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ), 'চাষার মেয়ে' (১৩৩১), 'কল্পনা দেবী' (১৩৩৮), 'দুই রাত্রি' (১৩৩৪), 'তখত-তাউস', 'মহাস্থবির জাতক' (১ম খণ্ড-১৩৫১, ২য় খণ্ড-১৩৫৪, ৩য় খণ্ড-১৩৬১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর প্রেমাঙ্কুর পরলোকগমন করেন।

দেবজ্যোতি দাশ

প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া—সংক্ষেপে যাহাকে বলা হয় পি. টি. আই.। প্রাকস্বাধীনতা যুগের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া এবং রয়টারকে ইহার পূর্বসূরী বলা যাইতে পারে, কারণ এই দুই প্রতিষ্ঠানের একীকরণের ফলেই ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পি. টি. আই.-এর সূত্রপাত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই সংস্থা কাজ শুরু করে। সাংবাদিক কেশবচন্দ্র রায়, এভারার্ড কোট্‌স্ এবং রয়টারের ভারতস্থিত এজেন্ট এডোয়ার্ড বাক এই তিন সাংবাদিক একত্র হন এবং প্রধানতঃ কেশববাবুর চেষ্টায় সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে এক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়—অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া নামে। উহার কিছুকাল পরে কেশববাবু নিজস্ব এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন—প্রেস নিউজ বুরো নামে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুই সংস্থারই আর্থিক ক্ষতি হইতে থাকে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রয়টার কর্তৃপক্ষ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, কেশববাবুর প্রেস নিউজ ব্যুরো এবং কোট্‌স্ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান নিউজ এজেন্সি—এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের স্বত্ব কিনিয়া নেয় এবং রয়টারের শাখা হিসাবে ভারতবর্ষে উহা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া নামেই চলিতে থাকে, যদিও এই সংস্থা রেজিস্ট্রীকৃত হয়

ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সিরূপে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কে. সি. রায় মহাশয় এ. পি. আই.-এর ডিরেক্টর ছিলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর রয়টার কর্তৃপক্ষ দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহাওয়ার বিষয় চিন্তা করিয়া উহার ভারতীয় শাখা এ. পি. আই.-এর স্বত্ব হস্তান্তর করিতে মনস্থ করে এবং উহার পরিচালনার দায়িত্ব সংবাদপত্রের মালিকগোষ্ঠীর উপর ন্যস্ত করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত হইতেই জন্ম হয়—প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান এবং ইষ্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির চেষ্টায় একটি লিমিটেড কোম্পানি গঠিত হয়। পি. টি. আই. নামে এবং এই নবগঠিত সংস্থার অংশীদার হন ভারতীয় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ। রয়টারের সঙ্গে পি. টি. আই.-এর একটা যোগসূত্র থাকিয়া যায় এবং বর্তমানে উহা আছে। কিছু কিছু বিদেশী সংবাদ পি. টি. আই. রয়টারের মারফৎ ক্রয় করে। আবার ভারতীয় সংবাদও রয়টারের মাধ্যমে বিদেশে বিক্রয় করা হয়। রয়টার ছাড়া পি. টি. আই. আরও দুইটি বিদেশী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মারফৎ সংবাদ খরিদ করে—উহাদের একটি হইল ফরাসী প্রতিষ্ঠান, এ. এফ. পি. আর অন্যটি আমেরিকান সংস্থা, ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টারন্যাশান্যাল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এ. এফ. পি. ও ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউ. পি. আই.-এর সঙ্গে সংবাদ ক্রয়ের চুক্তি হয়।

বৈদেশিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংবাদ খরিদ ব্যতিরেকেও পি. টি. আই.-এর নিজস্ব প্রতিনিধি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত আছে। বিশেষতঃ ইউনাইটেড নেশন্‌স, মস্কো, কায়রো, পারী, বেলগ্রেড, টোকিও, কলম্বো, রেঙ্গুন এবং নাইরোবিতে পি. টি. আই.-এর নিজস্ব প্রতিনিধি দীর্ঘ দিন যাবৎ কাজ করিতেছে।

পি. টি. আই.-এর মারফৎ প্রেস ট্রাস্ট অফ সিলোন (কলম্বো), টোকিওর কিছু সংবাদপত্র এবং রেডিও নেপালও সংবাদ খরিদ করে।

পি. টি. আই. গঠনকালে স্থির হয় যে এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার শুধু ভারতস্থিত সংবাদপত্রের মালিকগণই হইতে পারিবে এবং তাহাদিগকে এই সংস্থাপ্রচারিত সংবাদ কিনিতে হইবে। আরও স্থির হয় যে, এই সংস্থা কোনও সময়েই এক বা একাধিক কোনও স্বার্থ বা মালিকগোষ্ঠীর আয়ত্তাধীনে আসিতে পারিবে না। এই সংস্থার অংশীদারগণ কোনও ডিভিডেণ্ডেরও দাবি করিতে পারিবে না। না লাভ না লোকসান এই ভিত্তিতে উহা পরিচালিত হইবে।

পি. টি. আই. একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। এই বোর্ডের ডিরেক্টারগণ স্বভাবতঃই বিভিন্ন সংবাদপত্র কর্তৃক মনোনীত হন। এই ডিরেক্টরগণের মধ্য হইতেই একজন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পি. টি. আই.-এর সর্বপ্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন কে. শ্রীনিবাসন (১৯৪৯-৫২ খ্রী)। বর্তমানে এই সংস্থার শুধু ভারতবর্ষেই ৫৫টি অফিস ও শাখা আছে।

নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রোটিন উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের অন্যতম জৈব উপাদান। কোষের প্রোটোপ্লাজ়মের ইহা একটি প্রধান রাসায়নিক পদার্থ। প্রোটিন অণুগুলি প্রধানতঃ কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দিয়া গঠিত। এতদ্ব্যতীত প্রায়ই গন্ধক, ফস্‌ফরাস প্রভৃতির পরমাণুও ইহাতে পাওয়া যায়। বহুসংখ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিডের অণু পরস্পরের সহিত পেপ্‌টাইড বন্ধনে যুক্ত হইলে একটি প্রোটিন অণু গঠিত হয়। বিশ্লেষিত প্রোটন অণু হইতে প্রায় ২৫টি বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া গিয়াছে। কয়েক শ্রেণীর প্রোটিনে, অ্যামাইনো অ্যাসিড ব্যতীত অন্য কয়েক প্রকার রাসায়নিক অণু মূল প্রোটিন অণুর সহিত রাসায়নিক বন্ধনে সম্বদ্ধ থাকে। বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড ও ইহাদের সংখ্যা ও সংস্থানবৈচিত্র্যের উপর প্রোটিনের আণবিক ওজন, কলয়ড-প্রকৃতি, সান্দ্রতা, সক্রিয়তা প্রভৃতি গুণাবলী নির্ভর করে। প্রোটিন অণুগুলির আণবিক ওজন সাধারণত: ২০০০-৪০০০০০০০। ইহাদের গঠন তন্তু-জাতীয় অথবা বর্তুলাকার।

প্রোটিনগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—সরল প্রোটিন, সম্বদ্ধ (কন্‌জুগেটেড) প্রোটিন ও পরিবর্তিত (ডিরাইভ্‌ড) প্রোটিন।

সরল প্রোটিন মোটামুটিভাবে পেপ্‌টাইড বন্ধনে আবদ্ধ বহু অ্যামাইনো অ্যাসিড সহযোগে গঠিত। সরল প্রোটিনগুলিকে বিভিন্ন উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়—১. অ্যাল্‌বুমিন: ইহা বিশুদ্ধ জলে দ্রবণীয় ও উত্তাপে জমিয়া শক্ত ও অদ্রাব্য হয়। ডিমের শাদা অংশ, রক্ত, দুধ, ডাল প্রভৃতিতে অ্যাল্‌বুমিন থাকে ২. গ্লোবিউলিন: ইহা ঈষৎ লবণাক্ত জলে দ্রবণীয়, ও বিশুদ্ধ জলে অদ্রাব্য। জান্তব গ্লোবিউলিনগুলি উত্তাপে জমিয়া শক্ত হয়; উদ্ভিজ্জ গ্লোবিউলিন গরমে তেমন ভালভাবে জমে না। ডিমের

শাদা অংশ, রক্ত, ডাল প্রভৃতিতে গ্লোবিউলিন পাওয়া যায় ৩. গ্লুটেলিন: ইহা ক্ষার জলে দ্রবণীয়, কিন্তু বিশুদ্ধ, লবণাক্ত বা কোহলযুক্ত জলে অদ্রাব্য। ইহা কেবল শস্যবীজেই বর্তমান। চালের ওরিজেনিন ও গমের গ্লুটেনিন ইহার উদাহরণ ৪. প্রোলামিন: ইহা ৭০-৮০% কোহলযুক্ত জলে দ্রবণীয়। ইহাতে প্রোলিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। ভুট্টায় জিন ও গমে গ্লায়াডিন নামক প্রোলামিন পাওয়া যায় ৫. স্ক্লেরো প্রোটিন: ইহা উল্লিখিত সাধারণ প্রোটিন দ্রাবকগুলিতে অদ্রাব্য। চুল, ত্বক প্রভৃতিতে ইহা বর্তমান। চুলের কেরাটিন ইহার উদাহরণ ৬. হিস্টোন: ইহা বিশুদ্ধ জলে দ্রবণীয়, কিন্তু সেই জলে সামান্য অ্যামোনিয়া দিলেই হিস্টোন থিতাইয়া নীচে পড়ে। যথেষ্ট পরিমাণে ডাই-অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকায় হিস্টোন ক্ষারধর্মী। রক্তের সম্বদ্ধ প্রোটিন হিমোগ্লোবিনের প্রোটিন অংশটির নাম গ্লোবিন; উহা একটি হিস্টোন। ৭. প্রোটামিন: প্রোটামিনে হিস্টোন অপেক্ষাও অধিক ডাই-অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকায় উহা আরও অধিক ক্ষারধর্মী। স্যামন মাছের শুক্রাণু হইতে আহৃত স্যামিন উল্লেখযোগ্য প্রোটামিন।

সম্বদ্ধ প্রোটিনে মূল প্রোটিন অংশ এক বা একাধিক প্রোটিনেতর অণুর সহিত রাসায়নিক বন্ধনে সংযুক্ত থাকে। সম্বদ্ধ প্রোটিনের নানা উপশ্রেণী নিম্নরূপ—১. নিউক্লিও প্রোটিন: ইহা নিউক্লিইক অ্যাসিডের সহিত সংযুক্ত প্রোটিন ('নিউক্লিওপ্রোটিন' দ্র) ২. ক্রোমোপ্রোটিন: ইহা নানা প্রকার রঙ্গক (পিগ্‌মেণ্ট) পদার্থের অণুসম্বদ্ধ প্রোটিন। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিমোগ্লোবিন নামক ক্রোমো-প্রোটিনের অণুতে হিম নামক রঙ্গক পদার্থ গ্লোবিন নামক হিস্টোন জাতীয় প্রোটিনের সহিত সংযুক্ত থাকে ৩. ফস্‌ফোপ্রোটিন: ইহা ফস্‌ফরাস-যুক্ত প্রোটিন। ছানা (কেসিন) ও ডিমের কুসুমের ভিটেলিন ইহার দৃষ্টান্ত ৪. গ্লাইকোপ্রোটিন: কার্বোহাইড্রেট-সম্বদ্ধ প্রোটিন। শ্লেষ্মার মিউসিন ইহার উদাহরণ ৫. লাইপোপ্রোটিন স্নেহদ্রব্যযুক্ত প্রোটিন।

অম্ল, ক্ষার বা এন্‌জাইমের সহায়তায় জলবিশ্লেষিত হইলে প্রোটিনের পেপ্‌টাইড বন্ধনগুলি উত্তরোত্তর ভাঙ্গিয়া ক্রমে মেটাপ্রোটিন, প্রোটিয়োজ়, পেপ্‌টোন প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর পরিবর্তিত প্রোটিন অণুর উদ্ভব হয়। ইহাদের মধ্যেও পেপ্‌টাইড বন্ধন বিদ্যমান কিন্তু ইহাদের আণবিক ওজন অনেক কম। ক্রমাগত বিয়োজনের ফলে পেপ্‌টাইড বন্ধনগুলি সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গেলে ইহাদের প্রোটিনসুলভ প্রায় বিশেষত্বই লোপ পায়। এরূপ বিয়োজনের ফলে একটি প্রোটিন অণু বহু অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়।

প্রোটিন খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। যথোপযুক্ত সংযোজন-বিয়োজন প্রক্রিয়ার প্রভাবে, খাদ্যের প্রোটিন হইতে টিস্যুগঠনের উপযোগী প্রোটিন, বিপাক বৃদ্ধির নিয়ামক হরমোন ও এন্‌জাইম প্রভৃতি দেহের নানা প্রোটিন উৎপন্ন হয়। খাদ্যের প্রোটিনগুলিকে পরিপাক করিবার জন্য পাকস্থলীর রসে পেপ্‌সিন ও রিনিন, অগ্ন্যাশয়ের রসে ট্রিপ্‌সিন, কাইমোট্রিপ্‌সিন ও কার্বক্সিপেপ্‌টাইডেজ় এবং ক্ষুদ্রান্তের রসে এণ্টেরোকাইনেজ়, অ্যামাইনোপেপ্‌টাইডেজ়, ডাইপেপ্‌টাইডেজ় প্রভৃতি এনজ়াইম বর্তমান; পাকস্থলীর রসে বিদ্যমান হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও প্রোটিন পরিপাকে সহায়তা করে। ইহাদের প্রভাবে খাদ্যের প্রোটিন বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হইয়া ক্ষুদ্রান্ত হইতে রক্তে বিশোষিত হয়। বিশোষিত হইবার পরে এ সকল অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রয়োজনমত দেহোপ-যোগী প্রোটিন অণু তৈয়ারি করে। এই কার্যে যে সকল অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রয়োজন, তন্মধ্যে কয়েকটি অ্যামাইনো অ্যাসিড কেবলমাত্র খাদ্য হইতেই পাওয়া সম্ভব, কারণ উহারা দেহে সংশ্লেষিত হয় না, অন্যান্য অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি বিপাকজাত পদার্থ হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে। যে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি কেবলমাত্র খাদ্য হইতে পাওয়া যায়—যেগুলি দেহে সংশ্লেষিত হয় না, উহাদিগকে অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে। ইহাদের নাম—লাইসিন, লিউসিন, আইসো-লিউসিন, ভ্যালিন, মেথিওনিন, থ্রিওনিন, ফিনাইল-অ্যালানিন, ট্রিপ্‌টোফ্যান, হিস্‌টিডিন ও আর্‌জিনিন। খাদ্যের প্রোটিনের দেহপোষণশক্তি (বায়োলজিক্যাল ভ্যালু) বহুল পরিমাণে উহার অণুতে বর্তমান অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। জান্তব প্রোটিনের দেহপোষণ শক্তি উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের তুলনায় সাধারণতঃ অধিক। মিশ্র প্রোটিনযুক্ত খাদ্যে, একটি প্রোটিনের অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের ন্যূনতা অন্য প্রোটিনে, সেই অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রাচুর্যের দ্বারা পূরণ হইতে পারে; ইহাকে প্রোটিনের সম্পূরক মূল্য (সাপ্লিম্যাণ্টারি ভ্যালু) বলে।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে কি পরিমাণ প্রোটিন খাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও সর্বসম্মতিক্রমে খাদ্যে প্রোটিনের নিম্নতম পরিমাণ নির্দিষ্ট

করা সম্ভব। দেহ হইতে যে পরিমাণ প্রোটিন ভাঙ্গিয়া নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্যদ্রব্যরূপে বাহির হইয়া যায়, সেই পরিমাণ প্রোটিন গঠন করিবার উপযোগী প্রোটিন আহার করা অত্যাবশ্যক। খাদ্যের সকল প্রোটিন এই কাজের জন্য সমান উপযোগী নহে। কি পরিমাণ দেহের ঘাটতি-পুরণে ব্যবহৃত হইবে খাদ্যের নীট প্রোটিন মূল্য হইতে তাহা জানা যায়।

নীট প্রোটিন মূল্য = প্রোটিনের দেহপোষণশক্তি × সুপাচ্যতা × [নাইট্রোজেনের পরিমাণ × ৬·২৫]

বিবিধ শিল্পে প্রোটিনের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ পশম ও রেশম-শিল্প, চর্মশিল্প, প্ল্যাস্টিক সিরিশ ও জেলাটিন শিল্প প্রভৃতির নাম করা যায়। তৈলবীজের খৈল ও খাদ্যের অনুপযোগী শুষ্ক মৎস্য প্রভৃতি প্রোটিনপ্রধান দ্রব্য জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 'খাদ্য' দ্র।

দ্র H. C. Sherman, *Chemistry of Food and Nutrition*, New York, 1952; Food and Agriculture Organization, United Nations, *Protein Requirements*, F. A. O. Nutritional Studies, no. 16, Rome, 1957; H. C. Sherman & C. S. Lanford, *Essentials of Nutrition*, New York, 1963.

পরিমলবিকাশ সেন

প্রোস্টেট গ্রন্থি, প্রস্টেট গ্রন্থি—পুং-জননতন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ। মূত্রাশয় ও মূত্রনালীর সংযোগস্থলের নিকট মূত্রনালীকে বেষ্টন করিয়া ইহা অবস্থিত। প্রস্টেটের মধ্যে বহু রসক্ষরণকারী গ্রন্থি ও অনৈচ্ছিক পেশী থাকে। শুক্রাশয়ের হর্মোন টেস্টোস্টেরোন প্রস্টেটের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও রসক্ষরণ অব্যাহত রাখে। সাধারণ অবস্থায় এই গ্রন্থি হইতে ঘণ্টায় ১-২ মিলিলিটার রস ক্ষরিত হয়, যৌন সংগমের সময়ে পরাসমব্যথী (প্যারাসিম্প্যাথেটিক) নার্ভের উদ্দীপনার ফলে রসক্ষরণের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়। প্রস্টেটের রসে জল, অজৈব লবণ, প্রোটিন, সাইট্রিক অ্যাসিড, কোলেস্টেরল, শর্করা, বিভিন্ন এন্‌জাইম প্রভৃতি থাকে। এই রস মূত্রনালী দিয়া দেহের বাহিরে আসে। এই রসের সহিত শুক্রাণু এবং শুক্রস্থলীর (সেমিন্যাল ভেসিক্‌ল্) রসের মিশ্রণকেই শুক্র বলে। শুক্রাণুকে স্ত্রী-জননতন্ত্রে সক্রিয় রাখাই প্রস্টেটের রসের প্রধান কার্য।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পুরুষের দেহেও অল্প পরিমাণে ঈস্ট্রোজেন নামক স্ত্রী-যৌনহর্মোনও ক্ষরিত হয়। বার্ধক্যে রক্তে পুং ও স্ত্রী -যৌনহর্মোনের পরিমাণের সুষম অবস্থা ব্যাহত হয়; অনেক বিজ্ঞানীর মতে এ-কারণেই সেই সময়ে প্রস্টেটের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে।

দেবজ্যোতি দাশ

প্লাঙ্ক, ম্যাক্স (১৮৫৮-১৯৪৭ খ্রী) জার্মান তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্। ইনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। যে কোনও বিকিরিত শক্তি, যেমন আলোক, তাপ, এক্‌স-রে প্রভৃতি দেশের (স্পেস) মধ্য-দিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় না; উহারা বিচ্ছিন্ন অতি ক্ষুদ্র অংশ বা কোয়ান্টার আকারে প্রবাহিত হয়—ইহাই হইল কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল কথা।

প্রতিটি কোয়ান্টা কি পরিমাণ শক্তিকে বহন করে, প্লাঙ্ক $E = hv$, এই সমীকরণটির মাধ্যমে প্রকাশ করিলেন; এখানে E, h ও v হইল যথাক্রমে কোয়ান্টার শক্তির মাপ, প্লাঙ্কের ধ্রুবক (একটি অতি ক্ষুদ্র সংখ্যা) এবং বিকিরণের কম্পনসংখ্যা (ফ্রিকোয়েন্সি)। বিকিরণের যে কোনও প্রক্রিয়ায়, বিকিরিত শক্তির পরিমাণকে উহার কম্পনসংখ্যার দ্বারা ভাগ করিলে উহা সব সময়েই প্লাঙ্কের ধ্রুবকের সমান হইবে। ('কোয়ান্টাম থিয়োরি' দ্র)।

পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া-ছিল। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

শংকর চক্রবর্তী

প্লাজ্‌মা ফিজিক্স প্লাজ্‌মা ফিজিক্স-এ আয়নিত গ্যাসীয় পদার্থের ভৌতধর্মসমূহ আলোচিত হয়। তনুভূত গ্যাসের মধ্যদিয়া তড়িৎপ্রবাহ পাঠাইলে আয়নিত অণুর সৃষ্টি হয়। ল্যাঙ্গ্‌মুর ও টঙ্ক গ্যাস-ডিস্‌চার্য টিউবে প্রবাহ চালিত করিয়া তাহার মধ্যে আয়নিত অণুর সৃষ্টি করেন। এই আয়নিত গ্যাসের ভৌতধর্মের সহিত জেলিজাতীয় পদার্থের ভৌতধর্মের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া উক্ত বিজ্ঞানীদ্বয় ইহার নামকরণ করেন 'প্লাজ্‌মা'। প্লাজ্‌মাকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থাও বলা যায়। প্লাজ্‌মায় ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎকণা সমপরিমাণে থাকায় সামগ্রিকভাবে ইহা তড়িৎবিহীন। প্লাজ্‌মার মধ্যে আয়ন ও ইলেকট্রনসমূহ সতত স্পন্দনশীল। প্রায় দশহাজার বা তাহার অধিক তাপমাত্রার পদার্থ প্লাজ্‌মা অবস্থায় থাকে। সূর্য, তারকা প্রভৃতি অগ্নিপিণ্ডবৎ বস্তুপুঞ্জগুলি অতি উত্তপ্ত প্লাজ্‌মার সমষ্টিমাত্র। কঠিন ধাতব পদার্থের অভ্যন্তরস্থ মুক্ত

ইলেকট্রনসমূহকেও (আবদ্ধ কেন্দ্রকগুলির পটভূমিকায়) একপ্রকার প্লাজ্‌মা বলা যায়।

বিদ্যুৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্র প্লাজ্‌মাকে প্রভাবিত করে। প্লাজ্‌মা বিভিন্ন প্রকার তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে। তরঙ্গ-সঞ্চালন বিষয়ে প্লাজ্‌মার ধর্ম বিদ্যুৎ-পরিবাহী তরলের ধর্মের অনুরূপ।

প্লাজ্‌মাস্থিত ইলেকট্রন ও আয়ন পারস্পরিক আকর্ষণে ত্বরগতিসম্পন্ন হইয়া শক্তি বিকিরণ করে। প্লাজ্‌মাকে উক্ত চৌম্বকক্ষেত্রে সংস্থাপিত করিলে ইলেকট্রন ও আয়নসমূহ হইতে শক্তি বিকীর্ণ হয়। ইলেকট্রন লঘুভর-সম্পন্ন বলিয়া অধিকতর গতিপ্রাপ্ত হয় ও অধিক শক্তি বিকিরণ করে। ইহাকে সাইক্লোট্রন বিকিরণ বলে।

উত্তপ্ত প্লাজ্‌মা আয়নসমূহের গতির ও তড়িৎবলের প্রভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং ধাতব আধার ইত্যাদির সংস্পর্শে শীতল হইয়া পড়ে। তখন আয়ন ও ইলেকট্রন পুনরায় মিলিত হইয়া অণুর সৃষ্টি করে। তজ্জন্য প্লাজ্‌মাকে চৌম্বকক্ষেত্রের সাহায্যে বিশেষভাবে আবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়। প্লাজ্‌মা আবদ্ধীকরণ সমস্যা বিশেষ জটিল এবং অদ্যাপি ইহার সম্যক সমাধান হয় নাই। প্লাজ্‌মাকে আবদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রক-সংযোজন ক্রিয়া পরিচালনাপূর্বক শক্তি আহরণ বিষয়ে প্রচেষ্টা চলিতেছে। হাইড্রোজেন, ভারী হাইড্রোজেন প্রভৃতি লঘু-কেন্দ্রক-বিশিষ্ট মৌল পদার্থের প্লাজ্‌মাকে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ করিয়া অত্যুচ্চ চাপ ও উত্তাপের প্রয়োগে কেন্দ্রক-সংযোজন ক্রিয়া ঘটানো হয়। ইহার ফলে অপেক্ষাকৃত ভারী কেন্দ্রক উৎপন্ন হয় এবং প্রভূত শক্তি নির্গত হয়। প্লাজ্‌মা আবদ্ধীকরণ প্রয়াসে বিভিন্ন চৌম্বক-ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী যন্ত্রের প্রস্তাবনা হইয়াছে। নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রক-সংযোজন ক্রিয়া ঘটানো সম্ভব হয় নাই। প্লাজ্‌মাকে চৌম্বকক্ষেত্রের লম্বভাবে পরিচালিত করিলে চৌম্বকক্ষেত্রের এবং প্লাজ্‌মার গতির লম্বাভিমুখী এক বিদ্যুৎক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই বিদ্যুৎক্ষেত্র দ্বারা বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপাদন করা যায়। ইহাই ম্যাগ্‌নেটো-হাইড্রো-ডাইনামিক জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের মূলতত্ত্ব। এতদ্ব্যতীত প্লাজ্‌মা-উৎস হইতে তীব্রবেগে প্লাজ্‌মাকে নির্গত করিয়া উৎপন্ন বিপরীত বলের সাহায্যে রকেটে গতিসঞ্চার, প্লাজ্‌মা বিচ্ছুরণকারী উৎসের সাহায্যে তীব্র উত্তাপসৃষ্টি, বিবিধ তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গসৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্লাজ্‌মার ব্যবহার লইয়া গবেষণা চলিতেছে। 'অণু', 'আয়ন' ও 'কেন্দ্রক সংযোজন' দ্র।

দ্র L. Spitzer, *Physics of Fully Ionised Gas*, New York, 1962; L. A. Arzimovich, *Elementary Plasma Physics*, New York, 1965; F. I. Boby, *Plasmas—Laboratory and Cosmic*, New York, 1966.

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত

প্লাতো, প্লেটো (৪২৮-৩৪৮ খ্রীষ্টপূর্ব) বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক; জন্ম আথেন্সের এক অভিজাত পরিবারে। প্রায় বিশ বৎসর বয়সে সোক্রাতেসের সাহচর্যে আসিলে তিনি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া দার্শনিক আলোচনাকেই জীবনের মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। সোক্রাতেসের মৃত্যুর পর কিছুকাল তিনি সতীর্থ ইউক্লিডের সাহচর্যে মেগারায় অতিবাহিত করেন; সেই সময়ে পারমেনিদেসের প্রভাব তাঁহার উপর পড়ে। মিশর, ইটালী প্রভৃতি দেশ পরি-ভ্রমণান্তে তিনি সিসিলিতে ভ্রমণ করেন। তিনি আনু-মানিক ৩৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আথেন্সে একটি উদ্যান ক্রয় করিয়া নিজ শিক্ষালয় 'আকাদেমি' প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরও দুইবার স্বল্পকালের জন্য তিনি সিসিলি পরিদর্শন করিলেও আকাদেমিতেই আমরণ অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া ইওরোপীয় দর্শনে যুগান্তর আনয়ন করেন। তাঁহার প্রভাব আজিও ইওরোপীয় চিন্তাধারায় বর্তমান।

প্লাতোর ভাবতত্ত্ব (থিওরি অফ আইডিয়াজ্‌) দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব (ডায়ালেক্‌টিক) নামেও অভিহিত। শব্দটি 'ডায়ালগ' (কথোপকথন) শব্দ হইতে উদ্ভূত। প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্য নির্ধারণ করার পদ্ধতি ও পরিশেষে যাহা সৎ, নিত্য বা সনাতন, তাহাকে সামান্য ধারণার মাধ্যমে জানার পদ্ধতি বা তাহার জ্ঞানই ডায়ালেক্‌টিক বা দ্বান্দ্বিকতত্ত্বের মর্মকথারূপে বিবেচিত হয়। বস্তু অপরিবর্তনীয়; তাহার জ্ঞানলাভের পদ্ধতি বা সেই সম্পর্কিত বিজ্ঞানই প্লাতোর মতে ডায়ালেক্‌টিক। বিশেষ ব্যক্তি বা দ্রব্য সর্বদাই পরিবর্তনশীল, সেজন্য তাহারা বস্তু (রিয়ালিটি) বলিয়া বিবেচনাযোগ্য নয়। অপরদিকে বহু বিশেষ (পার্টিকুলার) বিষয় যে সামান্য (ইউনিভার্সাল) বিষয়কে অনুকরণ করে, সেই সাধারণ বিষয় স্বরূপতঃ অপরিবর্তনীয়, সুতরাং নিত্য, অতএব তাহাই বস্তু। পরিবর্তনশীল ব্যাপার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু অপরিবর্তনীয় তত্ত্ব বা বস্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য। প্লাতো এইরূপ বস্তুর নাম দিয়াছেন 'আইডিয়া' বা ভাব; ভাব চিন্তার

বিষয়মাত্র নয়, বস্তুতঃ যথার্থ সত্তা একমাত্র ভাবেরই রহিয়াছে। বিশেষ বিষয় বা ব্যক্তি অবভাসমাত্র, কিন্তু তাহাদের ভাবগুলি শাশ্বত অপরিবর্তনীয় ও অতিবর্তী (ট্রান্‌সেণ্ডেন্ট)। ভাব ও বিশেষ বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে প্লাতোর মোটামুটি মত হইতেছে এই যে, ভাব দ্রব্য (সাব্‌স্টান্স), সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র ও পরমবস্তু, দ্বিতীয়তঃ ভাব বিশেষ বিষয় না হওয়ার জন্য সামান্যধর্মী বা সামান্য তত্ত্ব, দেশকালের অতীত তথাপি তাহাদের সহিত বিশেষ বিষয়ের সম্পর্ক অনস্বীকার্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে ভাবতত্ত্বের সম্পর্ক হইতেছে এই যে, ভাব বিশেষ বিষয়ের ভিত্তি, ভাব বিশেষ বিষয়ের মূল বা উৎস, বিশেষ বিষয় তাহার অনুকরণ মাত্র। ভাবের অপর নাম আকার (ফর্ম) বা সামান্য। এই বিষয়ে প্লাতোর মতবাদের তীব্রতম সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য আরিস্তোতল ('আরিস্তোতল' দ্র)।

মানবাত্মার ত্রিবিধ বৃত্তির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্লাতো প্রজ্ঞা, শৌর্য ও মিতাচার নামে তিনটি মানবধর্ম (ভার্চু) যেমন স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি তাহাদের নিয়ামক-ধর্ম হিসাবে 'ন্যায়' (জাস্টিস) নামক চতুর্থ ধর্মও স্বীকার করিয়াছেন। রাষ্ট্রের ধর্ম তাহার নাগরিক-গণের মধ্যে নিবেশিত। রাষ্ট্রের প্রজ্ঞা তাহার সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক, শাসকগণের মধ্যেই থাকে, রাষ্ট্রের শৌর্য থাকে ক্ষাত্রধর্মী অবর শাসকগণের মধ্যে, আর মিতাচার এই দুই শ্রেণীতে যেমন বর্তমান তেমনই তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমজীবীগণের মধ্যেও বর্তমান। ক্ষাত্রধর্মী অবর শাসক ও শ্রমজীবী নাগরিকের মিতাচার বলিতে প্লাতো মনে করেন যে, তাঁহারা সর্বোচ্চ শাসকগণের শাসন করিবার যোগ্যতা স্বীকার করিয়া লইবেন, আর সর্বোচ্চ শাসক-গণের মিতাচারের অর্থ হইল এই যে, তাঁহারা শাসনভার গ্রহণ করিতে সর্বদা সম্মত থাকিবেন। এখন রাষ্ট্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নাগরিকগণের নিজ নিজ শক্তি, শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে কর্মভার বণ্টনের নীতি থাকা প্রয়োজন। এই নীতিই হইতেছে 'ন্যায়'। কিভাবে দুই শ্রেণীর শাসকগণের নির্বাচন ও শিক্ষাদান করিতে হইবে, তাহা প্লাতোর আদর্শ রাষ্ট্রের একটি প্রধান বিচার্য বিষয়। বিবাহ, দাম্পত্যজীবন ও পারিবারিক ধর্মে সাধারণ নাগরিকগণের অধিকার থাকিলেও শাসকগণ ব্যক্তিগত ধনহীন ও পারিবারিক বন্ধনহীন হইয়া আজীবন শিবির-জীবন যাপন করিবেন। অনাসক্ত দার্শনিকগণই শাসনভার গ্রহণ করার পক্ষে উপযুক্ত; সেজন্য রাষ্ট্রের শাসনভার তাহাদের হাতেই সমর্পণ করিতে হইবে।

প্লাতো বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, নৈতিক ধর্ম ও সুখ এক জিনিস নয়। ইন্দ্রিয়সুখের নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নাই। সেজন্য তাহার উপর ভিত্তি করিয়া নৈতিক ধর্মের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। নৈতিক কর্মের নিজস্ব মূল্য আছে—এই কথা স্বীকার করিলে নৈতিক কর্ম আর সুখ যে এক বস্তু, তাহা আর বলা চলে না। নৈতিক ধর্মের ভিত্তি প্রজ্ঞা, কিন্তু এই প্রজ্ঞা মানবিক দৃষ্টিবর্জিত নয়। সেজন্য প্লাতো সর্বোত্তম মঙ্গলকে কেবল ভাবতত্ত্বের জ্ঞান বলেন নাই; ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে ভাব যে রূপে নিজেকে প্রকাশ করে, তাহার ধ্যান, যাহা কিছু সুন্দর, সুসমঞ্জস ও শৃঙ্খলাবদ্ধ তাহার যথোচিত বোধ, কলা ও বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানে অভিনিবেশ, সংযত সুখ—এই সবগুলি লইয়াই তিনি সর্বোত্তম মঙ্গলের কল্পনা করিয়াছেন।

দ্র A. E. Taylor, *Plato, the Man and His Work*, London, 1948; K. R. Popper, *The Open Society and Its Enemies*, London, 1952; R. B. Levinson, *In Defence of Plato*, Oxford, 1954.

রামচন্দ্র পাল

প্লাস্‌টিড উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজ্‌ম্‌-এ বর্তমান বর্ণহীন বা রঙীন সজীব ক্ষুদ্র দানা। ছত্রাক প্রভৃতি কতিপয় জাতের উদ্ভিদ ব্যতীত সকল উদ্ভিদের কোষেই প্লাস্‌টিড বর্তমান। নিউক্লিয়াসের মতই পুরাতন প্লাস্‌টিডের বিভাজনে নূতন প্লাস্‌টিড সৃষ্ট হয়। মূল, মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ কাণ্ড প্রভৃতি গাছের যে সকল অংশ সূর্যালোক পায় না, সাধারণতঃ সেখানেই ছোটবড় বর্ণহীন প্লাস্‌টিড (লিউকোপ্লাস্‌টিড) পাওয়া যায়, সূর্যালোকের সংস্পর্শে ইহারা সবুজ বর্ণ ধারণ করে। বড় বর্ণহীন প্লাস্‌টিড-গুলিকে শ্বেতসার-উৎপাদক প্লাস্‌টিড (অ্যামাইলোপ্লাস্ট) বলে। সবুজ প্লাস্‌টিডকে ক্লোরোপ্লাস্ট এবং লাল, হলুদ, কমলা প্রভৃতি অন্যান্য বর্ণের প্লাস্‌টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলে। ক্লোরোপ্লাস্ট সাধারণতঃ গোল বা ডিম্বাকার; ইহার চারিধারে দুইটি পাতলা আংশিকভাবে প্রবেশ্য ঝিল্লী থাকে এবং ভিতরে 'গ্রানা' নামক বহু ক্ষুদ্র ও ঘন সবুজ দানা থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টে সবুজ ক্লোরোফিল, হলুদ জ্যান্‌থোফিল ও কমলাবর্ণের ক্যারোটিন নামক রঙ্গক পদার্থ থাকে; তন্মধ্যে ক্লোরোফিলের প্রাধান্যহেতু এই প্লাস্‌টিডটিকে সবুজ দেখায় ('ক্লোরোফিল' দ্র)। রঙ্গক পদার্থগুলি গ্রানার মধ্যে লাইপো-প্রোটিনের সঙ্গে

সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে। ক্রোমোপ্লাস্ট সাধারণতঃ কোণ-যুক্ত বা লাটিমাকার হয়। ইহাদের মধ্যে ক্যারোটিন ও জ্যান্‌থোফিল নামক রঞ্জক পদার্থ দুইটি দেখা যায়। বীট, গাজর, রঙিন ফুল ও ফলে এই প্লাস্‌টিড বর্তমান।

দ্র J. Brachet & A. E. Mirsky, *The Cell*, vol. II, New York, 1959.

সন্তোষকুমার পাইন

প্ল্যানিং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দ্র

প্ল্যানেটেরিয়াম প্ল্যানেটেরিয়াম বলিতে বর্তমান কালে যাহাকে বুঝায় তাহা আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার এক অত্যাশ্চর্য, চমকপ্রদ সৃষ্টি। এই সৃষ্টির পিছনে এক দীর্ঘ প্রচেষ্টার ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস আছে।

প্ল্যানেটেরিয়াম শব্দটি প্রথমতঃ একটি অত্যন্ত সীমিত অর্থে—সৌর জগতের ঘূর্ণমান গ্রহরাজি-সংবলিত অনুকৃতি বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত। পরবর্তী কালে শব্দটির বহুল অর্থপ্রসার ঘটিয়াছে। আধুনিক অর্থে শব্দটির সার্থক বঙ্গানুবাদ হইতে পারে 'নভোগৃহ' বা 'আকাশ-ঘর'।

আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়াম হইতেছে মুখ্যতঃ গম্বুজযুক্ত বৃত্তাকার একটি কক্ষ—যাহার মধ্যে বসানো আছে আশ্চর্য ক্ষমতাশালী একটি আলোক-প্রক্ষেপক যন্ত্র (অপ্‌টিক্যাল প্রজেক্টর)। এখানে প্রায় নিখুঁতভাবে মহাকাশ ও তাহার বিচিত্র ঘটনাবলীর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা যায়। দর্শক এখানে বসিয়া কৃত্রিম আকাশে অর্থাৎ অর্ধগোলকাকৃতি ছাদের পটভূমিতে সূর্যের (আপাত) গতি, দিবা-রাত্রির অনুবর্তন, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা-ছায়াপথখচিত আকাশের বিচিত্র রূপ, স্থান-কালভেদে আকাশের পরিবর্তন, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ, সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহরাজির আবর্তন, অয়ন-চলন, ধূমকেতুর আকস্মিক আবির্ভাব-অন্তর্ধান প্রভৃতি যাবতীয় জ্যোতিষিক ঘটনা সহজেই প্রত্যক্ষ ও অনুধাবন করিতে পারেন। একই সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞানলাভ ও চিত্তবিনোদন করার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়; যেন একই আধারে রঙ্গালয় ও বিদ্যালয়। আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়ামের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ সর্বপ্রথম ঘটে জার্মানীতে, বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে।

চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রখচিত আকাশকে তথা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে কৃত্রিম রূপদানের প্রচেষ্টার প্রাচীনতম যে নিদর্শনগুলি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি প্রাচীন গ্রীকজাতির কীর্তি। এগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন গ্রীক জ্যোতিষিক জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীক চিন্তানায়করা মনে করিতেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমতল এবং অমিত শক্তিধর 'টাইটান' তাহার বাহক। প্রাপ্ত সমকালীন পুরাকীর্তি-গুলিতে তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনুকৃতি—একটি শক্তিশালী মানুষের স্কন্ধোপরি স্থাপিত তারকাচিহ্নিত একটি সমতল প্রস্তর ফলক। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে আনাক্সিমান্দার প্রথম গোলকাকৃতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরি-কল্পনা করেন এবং এই বিশ্বাসের ফলস্বরূপ 'নভোগোলক' (সেলেশ্চিয়াল গ্লোব)-এর সৃষ্টি হয়। খ্রীষ্টপূর্ব যুগের এই জাতীয় গোলকের সবচেয়ে সুন্দর নিদর্শনটি রোমে আবিষ্কৃত হয় এবং ফারনেসে প্রাসাদে সংরক্ষিত হওয়ার জন্য এইটি সাধারণতঃ সংগ্রহশালার পরিভাষায় ফারনেসে অ্যাট্‌লাস নামে পরিচিত। এই জাতীয় গোলকেরই পরবর্তী উন্নততর সংস্করণে গোলকটিকে তাহার মেরুরেখার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাইবার ব্যবস্থা থাকিত, যাহার ফলে আকাশে জ্যোতিষ্কসমূহের পশ্চিমাভিমুখী আপাত গতি এবং তাহাদের উদয়াস্তের ঘটনা সহজেই অনুধাবন করা যাইত। আর্কিমিদিস, যাঁহাকে প্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্ বলা যাইতে পারে, এই পর্যায়ে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেন এবং তাঁহাকেই কেহ কেহ প্ল্যানেটেরিয়ামের আদি স্রষ্টা বলিয়া থাকেন। আর্কিমিদিসের নভোগোলকে শুধু জ্যোতিষ্করাজির উল্লিখিত গতিই নয়, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহের বিশেষ বিশেষ গতি, গ্রহণ প্রভৃতি জটিল জ্যোতিষিক ঘটনাও প্রদর্শন করা যাইত। গোলকে নানাবিধ গতি-সৃষ্টির জন্য আর্কিমিদিস জলশক্তি ব্যবহার করিতেন।

মধ্যযুগে আরবদের কিছু কিছু প্রচেষ্টার কথাও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। সুন্দর সুন্দর নভোগোলক ছাড়া তাঁহাদের একটি বিশেষ স্মরণীয় কীর্তি হইতেছে, ৮ম শতকে সিরিয়ার দামাস্কাসে একটি রাজ-প্রাসাদের গোলকাকৃতি ছাদে আকাশের অনুকরণে জ্যোতিষ্কের প্রতিকৃতি স্থাপনা করা। শেষোক্ত প্রচেষ্টাটিকে অবশ্যই একদিক হইতে আধুনিক প্ল্যানেটে-রিয়ামের প্রত্যক্ষ ও কতকাংশে নিকট পূর্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদিও সেখানে আকাশের অনুকৃতি নিখুঁত ছিল না এবং তাহা ছিল নিশ্চল, অপরিবর্তনীয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইওরোপে গোটর্প শহরে একটি নভোগোলক নির্মিত হয়। এক্ষেত্রেও গোলকের অন্তর্গাত্রে জ্যোতিষ্ক সমাবেশ করা হয়। গোটর্প গ্লোব নামে পরিচিত এই গোলকটির ব্যাস ছিল ৩·৫ মিটার বা ১৩ ফুট; গোলকের মেরুরেখা হইতে ১০ জনের

প্ল্যানেটেরিয়াম

উপবেশনোপযোগী একটি চৌকি ঝুলানো ছিল। গোলকটি দর্শকরাই ইচ্ছানুসারে ঘুরাইতে পারিতেন।

উল্লিখিত প্রচেষ্টাগুলি মোটামুটিভাবে কাঠামোগত বা আধারগত উৎকর্ষের পরিচায়ক। অতঃপর যান্ত্রিক দিক হইতেও কিছু কিছু উন্নতি ঘটিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে জর্জ গ্র্যাহাম একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন এবং পরে আর্ল অফ ওরেরীর পৃষ্ঠপোষকতায় জন রাওলে তাহার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ইহাতে সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের প্রতিনিধিস্বরূপ কতকগুলি ছোটবড় গোলকের সাহায্যে গ্রহণ, চন্দ্রের কলা ও তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি, পৃথিবীর দিবারাত্রি ও ঋতুগুলির অনুবর্তন প্রভৃতি ঘটনা অতি সহজে সুন্দরভাবে প্রত্যক্ষ ও অনুধাবন করা যাইত। সাধারণতঃ ওরেরী নামে পরিচিত এই জাতীয় যন্ত্র এখনও স্কুল-কলেজে ব্যবহৃত হয়।

স্বল্পপরিসর এই নিবন্ধে, আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়ামের পূর্বগামী আর দুইটি প্রচেষ্টার কথা অবশ্য-উল্লেখ্য। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় একটি বৃহৎ গোলক নির্মাণ করা হয়। অনেকাংশে গোটর্প গোলকের অনুরূপ এই গোলকটি অ্যাটউড গোলক নামে সুপরিচিত। বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত ৪·৬ মিটার বা ১৫ ফুট ব্যাসের এই গোলক-গাত্রে জ্যোতিষ্কসমূহের প্রতিকৃতি হিসাবে সঠিক মাপের, সঠিক সংস্থানে বহু ছিদ্র করা হয়; গোলকটির ভিতর থাকে অন্ধকার কিন্তু বাহিরে চতুর্দিকে উজ্জ্বল আলোকের সমাবেশ। আলোকপ্রক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে যত প্ল্যানেটেরিয়ামের উদ্ভাবন হইয়াছে, কাঠামো বা গঠনের দিক হইতে এইটি তন্মধ্যে সবচেয়ে সন্তোষজনক। যান্ত্রিক ব্যাপারে অভূতপূর্ব সূক্ষ্ম কলা-কৌশলের নজির সৃষ্টি করে কোপার্নিকান প্ল্যানেটেরিয়াম। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ম্যুনিখ শহরে স্থাপিত এই প্ল্যানেটেরিয়াম একটি গোলাকার কক্ষ যাহার ছাদ হইতে প্রলম্বিত বিভিন্ন বৈদ্যুতিক আলোক সৌরজগতের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের প্রতিনিধি। এই প্ল্যানেটেরিয়াম যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গ্রহ-উপগ্রহের যাবতীয় গতিবিধি নিখুঁতভাবে প্রদর্শনক্ষম।

আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়াম-নির্মাণের সূত্রপাত হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসরে হাইডেলবার্গের বাডেন মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ম্যাক্স ভোলফ্-এর মাথায় একটি অভিনব পরিকল্পনা আসে। তিনি ম্যুনিখের ডয়েৎসে মিউজিয়ামের প্রধান অস্কার ফন মিলার-এর সহিত আলোচনা করেন এবং মিলার কার্ল ৎসাইসের সুপ্রসিদ্ধ লেন্স-ঘটিত যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ করেন। অতঃপর তুমুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে কাজ শুরু হইয়া যায়। প্রথম নির্মাণ-প্রণালীটি ব্যর্থ হয়, তৎপরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বাউয়েরর্সফেল্ড সম্পূর্ণ নূতন পন্থা অবলম্বন করেন। কয়েক বৎসরের অসাধারণ যত্ন, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম ফলপ্রসূ হয়—মানুষের দুই সহস্র বৎসরের স্বপ্ন অতীব সন্তোষজনকভাবে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে।

প্রথম সৃষ্ট প্ল্যানেটেরিয়াম শুধুমাত্র ম্যুনিখ শহরের আকাশকে কৃত্রিম রূপদান করিয়াছিল। পরে ভিলিগার ইহাকে বিশাল ব্যাপকতা দান করেন—আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়াম পৃথিবীর যে কোনও জায়গার আকাশ সৃষ্টি করিতে পারে।

পূর্ববর্তী যাবতীয় প্রচেষ্টা হইতে আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়ামের মূলগত পার্থক্য হইতেছে ইহার প্রক্ষেপক যন্ত্র; এখানে জ্যোতিষ্কের নিখুঁত প্রতিকৃতি সৃষ্টি করা হয় আলোর বিন্দু বা আলোর চক্র প্রক্ষেপ করিয়া, এখানে ঘূর্ণমান গোলক নয়—বিদ্যুৎচালিত প্রক্ষেপক যন্ত্র। শুধু ঘূর্ণনই অবশ্য নয়, প্রক্ষেপক যন্ত্রটিকে নানাবিধ গতি প্রদান করা যায়, আর তদনুসারে কৃত্রিম আকাশের পটভূমিতে নানা জ্যোতিষিক ঘটনার প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা যায়।

প্রক্ষেপক যন্ত্রটি আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের এক পরম বিস্ময়কর অবদান। ইহার নির্মাণপদ্ধতি অত্যন্ত শ্রম ও ব্যয়-সাধ্য। এখনও পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে পূর্ণাঙ্গ প্ল্যানেটেরিয়ামের সংখ্যা ৫০-এর কম। কমন্‌ওয়েল্‌থ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রথমটি স্থাপিত হয় লণ্ডনে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয়টি কলিকাতার বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম স্থাপিত হয় ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে। বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম পৃথিবীর বৃহত্তম প্ল্যানেটেরিয়ামগুলির মধ্যে অন্যতম, ইহার গম্বুজের ব্যাস ২৩ মিটার বা ৭৫·৫ ফুট। বৃহত্তর ব্যাসযুক্ত প্ল্যানেটেরিয়াম পৃথিবীতে একটিই আছে—মস্কোয়, সেটির ব্যাস ২৫ মিটার বা ৮২ ফুট। এশিয়ার মধ্যে প্রথম প্ল্যানেটেরিয়াম স্থাপিত হয় জাপানের ওসাকা শহরে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে।

অবিভক্ত জার্মানীর কার্ল ৎসাইস প্রতিষ্ঠান যুদ্ধের পর জার্মান রাষ্ট্রের মতই দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর দুই অংশ হইতেই, যথাক্রমে ইয়েনা ও ওবেরকোখেন শহরে, প্ল্যানেটেরিয়াম প্রক্ষেপক যন্ত্র প্রস্তুত হয়। অধুনা আমেরিকার স্পিটজ ও জাপানের গোটো প্রতিষ্ঠানও এই যন্ত্র নির্মাণ করা শুরু করিয়াছেন।

দ্র R. Sarkar, 'Paradise Gained of Man's Endeavour to Replicate the Heavens, and the Fruit (with apologies to Milton)', *Indian Pulp and Paper*, vol. 18, no. 10, 1964; Heinz Letsch, *Captured Stars*, Jena, 1959; Helmut

Werner, *From the Aratus Globe to the Zeiss Planetarium*, Stuttgart, 1957.

রমাতোষ সরকার

প্ল্যাস্টিক্স রেজিন দ্র

প্ল্যাস্টিক সার্জারি অগঠিত বা পঙ্গু অঙ্গের পুনর্গঠন ও সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য প্রযুক্ত শল্যচিকিৎসা। জন্মগত দৈহিক বিকৃতি থাকিলে বা দুর্ঘটনায় অঙ্গহানি ঘটিলে সুচারুরূপে বিকল অঙ্গের অধিরোপণ (ট্রান্‌স্‌প্ল্যান্টেশন) ইত্যাদির দ্বারা দেহের ত্রুটি দূর করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতে কণিষ্কের শাসনকালে এরূপ শল্যচিকিৎসার প্রচলন ছিল বলিয়া সুশ্রুতসংহিতায় উল্লেখ আছে। কর্ণ ও নাসিকা কর্তন অপরাধীর শাস্তির অঙ্গ ছিল; পরে শল্যচিকিৎসকগণ কর্তিত নাসিকা ও কর্ণের পুনর্গঠনে প্রয়াসী হইতেন। ইহার উন্নততর পদ্ধতিও ভারতেই উদ্ভাবিত হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মাদ্রাজ গেজেটে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে টিপু সুলতান এক শকটচালককে বন্দী করিয়া তাহার নাসিকা ও হস্ত কাটিয়া দেন; ১ বৎসর পরে পুনার নিকট এক শল্যচিকিৎসক তাহার নাসিকা পুনর্গঠন করেন।

অধিরোপণের দ্বারা চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল চক্ষুর রোগাক্রান্ত বা ক্ষতযুক্ত অচ্ছোদপটল (কর্নিয়া)-এর স্থানে সুস্থ অচ্ছোদপটল অধিরোপণ। এভাবে অন্ধত্ব নিবারণার্থ সদ্যমৃত মানবদেহ হইতে সুস্থ অচ্ছোদপটল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য বহু স্থলেই চক্ষুব্যাঙ্ক-এর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। আবার প্রধানতঃ অক্ষিগোলকের পেশীর পুনর্গঠনের দ্বারা ট্যারা চক্ষুর পুনর্বিন্যাসও করা হইতেছে। ক্ষতযুক্ত বা কর্তিত নাসাকর্ণের পুনর্গঠন, দ্বিধাবিভক্ত ওষ্ঠ ও তালুর পুনর্গঠন, অগঠিত, মেদযুক্ত বা ক্যান্সার রোগের জন্য অপসারিত বক্ষের পুনর্গঠন, কর্তিত অঙ্গুলির কার্যনির্বাহের জন্য হস্তপদাদির অংশ বিশেষের পুনর্বিন্যাস, বিনষ্ট ত্বকের স্থলে নূতন ত্বক অধিরোপণ প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। দেহের বিভিন্ন অংশে অধিরোপণের জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে ত্বক লওয়া হয়; গালের জন্য হাত হইতে, চোখের পাতার জন্য কানের পিছন হইতে এবং নাসিকার জন্য সাধারণতঃ কপাল হইতে ত্বক লওয়া হয়। বিভিন্ন স্থানের জন্য আবার ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট ত্বকের প্রয়োজন হয়; দহনজনিত ক্ষতের জন্য পাতলা ত্বক এবং মুখের জন্য পুরু ত্বক প্রয়োজন। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে প্যাজেট এবং হুড 'ডার্মাটোম' নামক যন্ত্র উদ্ভাবন করেন; ইহার সাহায্যে প্রয়োজন মত উচ্চতাবিশিষ্ট ত্বক সংগ্রহ করা যায়।

কান বা মুখের তালুতে ফাঁক থাকিলে তরুণাস্থি (কার্টিলেজ) অধিরোপণের দ্বারা এবং কোনও স্থানের অস্থি বিনষ্ট হইলে অন্যস্থান হইতে গৃহীত অস্থি অধিরোপণের দ্বারা চিকিৎসার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। দোষযুক্ত থুতনির চিকিৎসায় অস্থির অধিরোপণ প্রযুক্ত হয়।

দ্র T. Gibson, *Modern Trends in Plastic Surgery*, 1964.

অমলকুমার ঘোষ

প্লীহা উদরের উপরাংশে ও মধ্যচ্ছদার (ডায়াফ্রাম) নীচে অবস্থিত অঙ্গ। স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্লীহার গড় ওজন প্রায় ২০০ গ্রাম এবং গড় দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ১২ ও ৭ সেন্টিমিটার; পুরাতন ম্যালেরিয়া, মাইলয়েড লিউকিমিয়া প্রভৃতি রোগে প্লীহার আয়তন ও ওজন বৃদ্ধি পায়। সকল সময়ে প্লীহায় প্রচুর রক্ত সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজনের সময়ে প্লীহার অনৈচ্ছিক পেশীগুলির সংকোচনের ফলে অঙ্গটি সংকুচিত হয় এবং সঞ্চিত রক্ত বাহির হইয়া আসিয়া দেহের রক্তপ্রবাহে যোগ দেয়। ভ্রূণের দেহে প্লীহা লোহিত রক্তকণিকার জন্মস্থান। প্রাচীন ও বিকৃত রক্তকণিকার বিনাশও প্লীহায় ঘটিয়া থাকে। লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন ভাঙ্গিয়া তাহার লৌহ-অংশ প্লীহার মধ্যে সঞ্চিত হয়। ইহা ছাড়া প্লীহা রক্তের পরজীবী, জীবাণু ও বিষাক্ত বস্তু অপসরণ করে এবং সেগুলিকে নির্বিষ ও বিনষ্ট করে। রক্ত-উৎপাদন, রক্তসঞ্চয়, রক্তপরিশোধন প্রভৃতি কার্যে প্লীহা প্রয়োজনীয় হইলেও ইহাকে দেহের অপরিহার্য অঙ্গ বলা চলে না; প্লীহা অপসারণের পর অন্যান্য অঙ্গের সাহায্যে ইহার কার্য সমাধা হয়।

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

প্লুটো সৌর জগতের নবম এবং সূর্য হইতে দূরতম গ্রহ। ইহা পঞ্চদশ প্রভার একটি অতিম্লান জোতিষ্ক; ইহাকে বড় দূরবীনে একটি তারার মত দেখা যায়।

সূর্য হইতে প্লুটোর মধ্যক দূরত্ব পৃথিবীর দূরত্বের ৩৯·৫ গুণ; ইহার সূর্য পরিক্রমাকাল ২৪৮ বৎসর। গতিপথের উৎকেন্দ্রতা ০·২৫ এবং ক্রান্তিবৃত্ত তলের সহিত

নতি ১৭°—উভয়ই গ্রহদের মধ্যে উচ্চতম। প্লুটোর ব্যাস ৫৮০০ কিলোমিটার এবং ভর পৃথিবীর ভরের দশাংশের বেশি নহে। উজ্জ্বলতার তারতম্যের পর্যায়কাল পর্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, অক্ষের উপর ইহার আবর্তনকাল ৬·৪ দিন। ইহার পৃষ্ঠদেশ অপরিসীম শীতল; তাপমাত্রা -২০০° সেন্টিগ্রেডের অধিক হইতে পারে না। ইহার কোনও আবহমণ্ডল থাকার সম্ভাবনা কম। ইহার কোনও উপগ্রহ আছে বলিয়া মনে হয় না; থাকিলেও কোনও দূরবীনে তাহা দেখা যাইবে না।

প্লুটোর ক্ষুদ্র আয়তন, গ্রহদের মধ্যে অস্বাভাবিক গতিপথ এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া কোনও কোনও বিজ্ঞানী অনুমান করেন যে, এক সময়ে ইহা নেপচুন গ্রহের একটি উপগ্রহ ছিল।

নেপচুন গ্রহের গণিতের দ্বারা নির্ধারিত গতিপথ এবং প্রকৃত গতিপথের মধ্যে কিছু অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলে নেপচুন হইতে দূরে অবস্থিত কোনও অনাবিষ্কৃত গ্রহের আকর্ষণের ফলে এরূপ ঘটিতেছে মনে করিয়া আমেরিকার দুইজন জ্যোতির্বিদ পার্সিভ্যাল লাওয়েল এবং পিকারিং স্বতন্ত্রভাবে এরূপ একটি গ্রহের কক্ষ এবং অবস্থান গণনা-দ্বারা নির্ণয় করেন। অনুসন্ধান চলিতে থাকে এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লাওয়েল মানমন্দিরে এই নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। সৌর জগতের প্রান্ত সীমায় তমসাবৃত অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া গ্রহটির নাম দেওয়া হয় প্লুটো; গ্রীক পুরাণের প্লুটো দেবতা অন্ধকার পাতালপুরীর অধীশ্বর।

কামিনীকুমার দে

প্লুরিসি ফুসফুসের আবরণী অর্থাৎ ফুসফুসধরাকলার (প্লুরা) প্রদাহ। নিকটবর্তী কোনও আভ্যন্তরীণ অঙ্গ বা অবয়বের ক্ষত বা রোগই ইহার কারণ; দৃষ্টান্তস্বরূপ যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের ক্যান্সার ও পঞ্জরাস্থির ক্ষত উল্লেখযোগ্য। প্রদাহের ফলে ফুসফুসধরাকলার আক্রান্ত অংশের মসৃণ ঝিল্লীতে 'ফাইব্রিন' জমিয়া শুষ্ক প্লুরিসির সৃষ্টি হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় বুকে বেদনা অনুভূত হয়। পরে ফুসফুসধরাকলার মধ্যে জল জমিয়া ভিজা প্লুরিসির সৃষ্টি হয়; সে অবস্থায় বুকের বেদনা কমিয়া যায়। শুষ্ক প্লুরিসির বেদনা নিরসনের জন্য প্লাস্টার করা, সেঁক দেওয়া ও মালিস করার ব্যবস্থা আছে। ভিজা প্লুরিসিতে অতিরিক্ত জল জমিয়া শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি হইতে থাকিলে বুক ফুটা করিয়া সঞ্চিত জল (প্লুরাল ফ্লুইড) বাহির করার চিকিৎসা প্রচলিত। কিন্তু প্লুরিসির প্রকৃত চিকিৎসা উহার প্রকৃত কারণস্বরূপ রোগ, যথা যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া প্রভৃতিরই চিকিৎসা।

অরুণ শীল

প্লেগ জীবাণুঘটিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ার্সিন এবং কিটাসাটো নামে দুইজন বিজ্ঞানী ইহার জীবাণু আবিষ্কার করেন। সাধারণতঃ উষ্ণপ্রধান দেশের রোগ হইলেও বহুবার ইহা প্রাচ্যের নানা অংশ হইতে পৃথিবীর নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া বহু প্রাণহানি ঘটাইয়াছে। ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা মিশর হইতে ইওরোপে রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইহারই তাণ্ডবে ১৬৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের ৪৬০০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৭০০০০ লোকের মৃত্যু হয়। তৎকালে লণ্ডন হইতে ইওরোপের অনেক স্থানেই প্লেগ প্রসার লাভ করে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হংকং হইতে প্রথমে বোম্বাই ও তৎপরে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে পেরু, কালিফোর্নিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম সমুদ্রতট হইয়া ইহা ইকুয়েডর প্রভৃতি দেশেও ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এক ভারতবর্ষেই ১০ লক্ষেরও অধিক লোকের প্লেগে প্রাণহানি ঘটে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাভায় প্রথম আবির্ভাবের পর প্রতিবৎসর সেখানে ৩-৬ হাজার লোক প্লেগে আক্রান্ত হইতে থাকে। ১৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলে এই মহামারীতে বহু লোকের মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষ, আফ্রিকার উগাণ্ডা, দক্ষিণ-পশ্চিম চীন ও য়ুনানই এই রোগের প্রাথমিক আবাসস্থল। বাংলা দেশে প্লেগ কদাচিৎ দেখা যায়; সময়ে সময়ে অন্যান্য রাজ্য হইতে ইহা বাংলা দেশেও প্রসার লাভ করে।

ইঁদুরমক্ষিকা নামক একপ্রকার পতঙ্গ এ রোগের বাহক। রোগজীবাণু বহন করিয়া প্রথমে তাহারা ইঁদুরের দেহে রোগ সংক্রামিত করে এবং অসংখ্য আক্রান্ত ইঁদুর মরিতে থাকে। আক্রান্ত ইঁদুরের দেহ হইতে রোগ মানবদেহে সংক্রামিত হয়। প্রথমেই খুব জ্বর হয়, তৎসহ দেহের সকল গ্রন্থির প্রদাহহেতু সেগুলি লাল হইয়া ফুলিয়া ওঠে, না হয় জীবাণুগুলি ফুসফুসে যাইয়া নিউমোনিয়ার সৃষ্টি করে; জীবাণুগুলি সামগ্রিক রক্তদুষ্টি ঘটাইয়াও প্রাণহানি করায়। আক্রান্ত গ্রন্থিগুলির উপর কার্বলিক লোশনের প্রলেপ এবং ইয়ার্সিন ও অন্যান্য প্রতিরোধক সিরাম ইন্‌জেকশনের দ্বারা গ্রন্থিস্ফীতিযুক্ত প্লেগের চিকিৎসায় কিছুটা ফললাভ হইলেও নিউমোনিয়া ও রক্তদুষ্টিযুক্ত প্লেগরোগে বিশেষ উপকার হয় না।

প্লেগের প্রতিষেধক হাফ্‌কিন ভ্যাক্‌সিন নামক টিকা ৭ দিন পর পর ২ বার নিলে নিশ্চিতরূপে রোগ এড়ানো যায়। যাহারা প্লেগরোগীর সংস্পর্শে গিয়াছে বা সেবা করিতে যাইবে তাহাদের প্রথম মাত্রা হাফ্‌কিন ভ্যাক্‌সিন-এর সহিত ৩ মিলিমিটার ইয়ার্সিন প্লেগপ্রতিরোধক সিরাম ও ইন্‌জেক্‌শন লওয়া উচিত।

প্লেগের সাধারণ প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে প্লেগের আবির্ভাবমাত্র ঘরে-বাহিরে ইঁদুর নির্মূল করা এবং কীট-নাশক পদার্থের দ্রবণের সাহায্যে গৃহমধ্যে ইঁদুরমক্ষিকারও বিনাশসাধন অত্যাবশ্যক। প্লেগাক্রান্ত দেশ হইতে আগত লোকজন সহ জাহাজকে ১০ দিন বন্দরে ভিড়িতে না দিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ (করান্টিন, quarantine) এবং বিষ-বাষ্পের সাহায্যে জাহাজের ইঁদুর ও ইঁদুরমক্ষিকা নিধনের ব্যবস্থাও অবশ্য কর্তব্য। প্লেগাক্রান্ত গৃহের অধিবাসীদেরও কিছুদিন স্বতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা অবশ্য বিধেয়। কোনও গৃহে অকারণে ইঁদুর মারা পড়িতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করা উচিত এবং গৃহে ফিরিবার পূর্বে জীবাণুনাশক পদার্থের সাহায্যে গৃহবিশোধন করা প্রয়োজন। মৃত ইঁদুরকে কখনই স্পর্শ করা উচিত নয়, চিমটার সাহায্যে দূরে লইয়া গিয়া পেট্রোল বা কেরোসিন দিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। রোগের প্রকোপের সময়ে ইঁদুরমক্ষিকার দংশন হইতে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা জুতা-মোজা পরিয়া থাকা কর্তব্য। শুশ্রূষাকারীর লাইজল-নিষিক্ত লম্বা গাউন, রবারের দস্তানা ও মোজার উপর হাঁটু পর্যন্ত গামবুট পরিয়া এবং গাউনটি গলা, কবজি ও পায়ের গোড়ালিতে ভালভাবে বাঁধিয়া রোগীর সেবা করা উচিত; ঐ অবস্থায় দাড়িগোঁফ কামানোও উচিত নয়।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

ফক্‌নার, উইলিয়াম (১৮৯৭-১৯৬২ খ্রী) বিখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প লেখক, আমেরিকার মিসিসিপিতে জন্ম ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি বিমানবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি ক্রমান্বয়ে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাসকৃতিগুলির মধ্যে উল্লেখনীয়: *Soldier's Pay* (১৯২৬ খ্রী), *Mosquitoes* (১৯২৭ খ্রী) এবং *Sartoris* (১৯২৯ খ্রী)। তাঁহার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: *The Sound and the Fury* (১৯২৯ খ্রী), *As I Lay Dying* (১৯৩০ খ্রী), *Light in August* (১৯৩২ খ্রী); এই কয়টি উপন্যাসে তিনি মার্কিন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ সমাজের উপরতলার মানুষ এবং শ্বেতকায় দরিদ্র ও নিগ্রো জীবনের আলেখ্য উপ-স্থাপিত করেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় '*Sanctuary*'—সুপরিকল্পিত 'বিভীষিকা' উপন্যাস। উল্লিখিত চারিটি উপন্যাস রচনা করিয়া তিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার ছোটগল্প-সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: '*These Thirteen*' (১৯৩১ খ্রী) ও '*Doctor Martine*' (১৯৩৪ খ্রী)।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করার সময়ে স্টকহল্‌মে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য 'আত্মদ্রোহী মানবহৃদয়'। তাঁহার সমগ্র রচনা এই মানবহৃদয়ের সংঘাতমুখর ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার উপন্যাসে ও ছোটগল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নাই এবং বহু উপন্যাসে তিনি চেতনাপ্রবাহ-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন।

শিশির চট্টোপাধ্যায়

ফজলুল হক, হক ফজলুল দ্র

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (১৮৭৬-১৯৪২ খ্রী)। জন্ম ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি যশোহর জেলার তালখড়ী গ্রামে। পিতা সৃষ্টিধর ভট্টাচার্য, মাতা মোক্ষদা দেবী।

প্রথমে কৈলাসচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট, পরে ফরিদপুর জেলায় ক্রোকদি-নিবাসী জানকীনাথ তর্করত্নের নিকট এবং শেষে নবদ্বীপের রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। ক্রোকদির টোলে তাঁহার অধ্যাপক-জীবনের সূত্রপাত। পরে পাবনা দর্শন টোলে, কাশী টীকমণি সংস্কৃত কলেজে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগে কার্য করেন।

'ন্যায়দর্শন' নামে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত (পরিষদ গ্রন্থাবলী, ১৩২৪-৩৬ বঙ্গাব্দ) বাৎস্যায়ন ভাষ্যসহ ন্যায়সূত্রের সম্পাদন ও বাংলা ব্যাখ্যা তাঁহার জীবনের অক্ষয় কীর্তি। তাঁহার অন্য গ্রন্থ 'ন্যায়-পরিচয়' (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)। ইহা ছাড়া নানা সাময়িক পত্রে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি কাশীধামে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য

ফণীন্দ্রনাথ বসু (রায় চৌধুরী) (১৮৮৮-১৯২৬ খ্রী) ইওরোপে শিক্ষিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙ্গালী ভাস্কর। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২ মার্চ ঢাকা জেলার বহর গ্রামে জন্ম ; পিতা তারানাথ বসু। প্রথমে তিনি কলিকাতায় সরকারি আর্ট স্কুলে চিত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। পরে এই স্কুলের ইটালীয় শিক্ষক শেভ্যালিয়র ও'গিলার্ডির অনুপ্রেরণায় ইটালী যাত্রা করেন (১৯০৪ খ্রী)। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এডিনবরা 'কলেজ অফ আর্ট'-এ প্রবেশ করেন এবং তিন বছর পরে ডিপ্লোমা ও 'স্টুয়ার্ট প্রাইজ' লাভ করেন।

শিক্ষান্তে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ফণীন্দ্রনাথকে ১০০ পাউণ্ডের বৃত্তি দেন। সেই টাকায় তাঁহার ইওরোপীয় ভাস্কর্য ও শিল্পকলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ হয়। এই সময়ে তিনি প্যারিসে ভাস্কর রোদ্যাঁর কাছে কিছুদিনের জন্য শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি এডিনবরায় প্রত্যাবর্তন (১৯১৩ খ্রী) করিয়া স্টুডিও স্থাপন করেন।

মার্বেল ও প্লাস্টার উভয় রীতিতেই তাঁহার সমান দক্ষতা ছিল। ভারতে বরোদার 'লক্ষ্মীবিলাস প্যালেস' উদ্যানে ও 'আর্ট গ্যালারি'-তে তাঁহার ভাস্কর্য সংরক্ষিত আছে।

১৮ মার্চ, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'রয়্যাল স্কটিস অ্যাকাডেমি' ফণীন্দ্রনাথকে 'অ্যাসোসিয়েট' (এ. আর. এস. এ.) নির্বাচিত করে। 'রয়্যাল স্কটিস অ্যাকাডেমি'তে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ফণীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য 'দি হাণ্টার' ও 'দি বয় অ্যাণ্ড দি ক্র্যাব' প্রথম প্রদর্শিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'বয় ইন পেইন' 'ব্রিটিশ রয়্যাল অ্যাকাডেমি'র প্রদর্শনীতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

তৎকালীন রয়্যাল স্কটিশ অ্যাকাডেমির সভাপতি জি. ওয়াশিংটন ব্রাউন ও খ্যাতনামা ব্রিটিশ ভাস্কর স্যার উইলিয়াম গেকম জন, প্রমুখের ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁর ভাস্কর্য সংরক্ষিত আছে।

স্কটল্যাণ্ডের পার্থ শহরে 'সেণ্ট জন চার্চ'-এ কয়েকটি প্যানেল ও একাধিক মূর্তি ফণীন্দ্রনাথের ভাস্কর্যের অনিন্দ্য অবদান। এই ভাস্কর্যগুলির অন্যতম 'জন দি ব্যাপ্‌টিস্ট' (ব্রোঞ্জ) ফণীন্দ্রনাথের স্মরণীয় কীর্তি। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গায়কোয়াড়ের আমন্ত্রণে স্বল্পকালের জন্য একবার ভারতে আসিয়াছিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ আগস্ট স্কটল্যাণ্ডের পিব্‌ল্‌স শহরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র রাজেন্দ্রলাল আচার্য, 'বাংলার ভাস্কররাজ ফণীন্দ্রনাথ বসু', মানসী ও মর্মবাণী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ ; St. Nihal Singh, 'A Bengali Sculptor trained in Europe' The Graphic, London, May 1, 1920 ; The Times, London, August 7, 1926.

কমল সরকার

ফতেপুর সিক্রি উত্তর প্রদেশ রাজ্যের আগ্রা জেলার কিরাউলী তহসিলের অন্তর্গত শহর (২৭° ৫´ উত্তর ও ৭৭° ৪০´ পূর্ব)। আগ্রা হইতে ৩৭ কিলোমিটার (২৩ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে আকবর কর্তৃক নির্মিত আনুষ্ঠানিক রাজধানী। মাত্র চতুর্দশ বৎসর পরে শহরটি আকবর কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়।

এখানকার দুর্গ এবং প্রাসাদগুলি রক্তবর্ণের বেলে পাথরে নির্মিত। প্রধান তোরণদ্বার ৫৪ মিটার উচ্চ বুলন্দ দরওয়াজা সম্রাট আকবরের সাফল্যময় দাক্ষিণাত্য অভিযানের স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে নির্মিত। অনেকগুলি স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে হিন্দু শিল্পের প্রভাব সুপরিস্ফুট। হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ এখানকার সর্বোত্তম শিল্পকীর্তি শেখ সেলিম চিস্তির সমাধির মধ্যে প্রতিফলিত।

১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে শহরটির নির্মাণকার্য শুরু হয় এবং ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। শহরটি শিলাময় এলাকার উপর বিস্তৃত, পরিখা ও তোরণদ্বারগুলি উত্তর-পশ্চিমে উন্মুক্ত। শহরটির অভ্যন্তরভাগে বিশাল জলাধার, প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহ, উদ্যান, প্রমোদকুঞ্জ, স্নানাগার, মসজিদ, স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি অবস্থিত। অসম ও শিলাময় অঞ্চলের উপর শহরটির বিস্তৃতি হওয়ায় ইহা সুসম পরিকল্পনায় রচিত হয় নাই।

ফতেপুর সিক্রির উল্লেখযোগ্য স্থপতিকীর্তিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হইল। দেওয়ান-ই-আম : সম্রাটের সিংহাসন, রাজমহিষীদের বসিবার নির্দিষ্ট স্থান ও জনগণের জন্য রক্ষিত স্থানগুলি দ্রষ্টব্য। দেওয়ান-ই-খাস : এখানে রাজা মধ্যস্থলে উপবেশন করিতেন এবং প্রধান অমাত্যগণ কোণে উপবেশন করিতেন। তুরস্ক সুলতানার গৃহ : ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক কারুকার্যখচিত। পাঁচমহল : পঞ্চতল বিশিষ্ট গৃহ, ইহা বৌদ্ধ অনুকরণে নির্মিত, রাজা ও রাজমহিষীদের প্রমোদকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত। মরিয়ম গৃহ (সুনহারা মকাম বা স্বর্ণগৃহ) : বারান্দার গাত্রে হিন্দু-দেব-দেবীর মূর্তিখচিত ও দেওয়াল গাত্রে দরবারী কবি ফৈজী রচিত কবিতা ও শিল্পকলার বিন্যাস লক্ষণীয় ; অম্বর-মহিষী এই গৃহে থাকিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। যোধাবাঈ প্রাসাদ : সর্ববৃহৎ

প্রাসাদ, দ্বিতলবিশিষ্ট ও উঠানের চতুষ্পার্শ্বে প্রকোষ্ঠগুলি বিন্যস্ত। বীরবল প্রাসাদ : দ্বিতলবিশিষ্ট ও কারুকার্যময়। হিরণমিনার : জলাশয়ের তীরে অবস্থিত ও ১৮ মিটার উচ্চ; হস্তীদন্তের অনুকরণে নির্মিত। সম্রাট ইহার উপর হইতে হরিণ ও অন্য জন্তু শিকার করিতেন। জামী মসজিদ : সর্বোত্তম স্থাপত্যকীর্তি। দক্ষিণের তোরণটি বুলন্দ দরওয়াজা ও পূর্বের তোরণটি বাদশাহী দরওয়াজা নামে খ্যাত। শেখ সেলিম চিস্তির সমাধি : ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে শেখ সেলিম চিস্তির দেহত্যাগের পর মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে এই সমাধিগৃহ নির্মিত হয়। শ্বেতমর্মর প্রস্তরে নির্মিত এই স্মৃতিসৌধ কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত।

শহরটির আয়তন ৮·২৪ বর্গ কিলোমিটার (৩·১৮ বর্গ মাইল)। জনসংখ্যা (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে) ১০৫৭৯। বর্তমান শহরটি প্রাক্তন শহরের পশ্চিম পার্শ্বে কিছুটা পার্বত্য এলাকায় ও অংশতঃ সমতল ভূমিতে অবস্থিত। শহরটিতে মসজিদের উত্তরাংশে আবুল ফজল ও ফৈজী ভ্রাতৃদ্বয়ের বাসস্থান অবস্থিত।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XII, Oxford, 1908 ; *Archaeological Remains, Museums & Monuments*, part I-II, New Delhi, 1964.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ফরওয়ার্ড ব্লক ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক দল, পূর্ণাঙ্গ নাম নিখিল-ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনের পর ওয়ার্কিং কমিটির গঠন সম্বন্ধে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা ব্যর্থ হইলে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া ৩ মে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ফরওয়ার্ড ব্লক নামক একটি সংস্থা গঠনের সংবাদ ঘোষণা করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত সকল বামপন্থী দলের ও সমূহের সংহতিসাধন, ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দান ও জাতীয় আন্দোলনকে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের আপস মনোবৃত্তি হইতে মুক্ত করিয়া ব্যাপক গণ-সংগ্রামের পুনরারম্ভ।

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দল, কমিউনিস্ট দল, রায়পন্থী দল, ইহারা কেহই ফরওয়ার্ড ব্লকের সভ্যভুক্ত হইতে সম্মত হয় নাই। কার্যতঃ একটি আলাদা দলরূপেই ফরওয়ার্ড ব্লক ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নাগপুরে বাম-সংহতি সমিতির বৈঠকে যোগ দেয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে ফরওয়ার্ড ব্লকের একক নেতৃত্বেই 'আপস বিরোধী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সম্মেলনে ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত একটি আলাদা দল বলিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়। ইহার প্রথম সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু ও সহসভাপতি ছিলেন শার্দূল সিং কাবেশীর।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্বগৃহান্তরীণ সুভাষচন্দ্রের ভারত হইতে পলায়নের পর ফরওয়ার্ড ব্লকের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট আন্দোলনে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা ও কর্মীরা আগুয়ান হন এবং যুদ্ধকালে তাঁহাদের অধিকাংশই কারারুদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধান্তে ফরওয়ার্ড ব্লকের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ইহার কার্যকরী সমিতি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার ডাক দেয় এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির ফেব্রুয়ারি ঘোষণার ও ৩ জুন পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস বহির্ভূত দল বলিয়া ঘোষিত হয়।

যুদ্ধোত্তর চার বৎসরে ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে ভাবাদর্শ, লক্ষ্য ও পথ লইয়া গুরুতর মতভেদ দেখা দেয় ও ভাঙন ধরে। সুভাষবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ও মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক নামে দুইটি সংস্থার উদ্ভব হয় এবং প্রথমটি অবশেষে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে নিমজ্জিত হয়। বর্তমান নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের মিশ্রণসহ আদি ফরওয়ার্ড ব্লকের বামপন্থী উত্তরাধিকার বহন করিতেছে। ইহার কর্মসূচী এইরূপ : সকল মূল শিল্পের জাতীয়করণ; জমির ন্যায়সঙ্গত পুনর্বণ্টন ও ভূমিহীন কৃষককে জমি দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা; শ্রমিকদের জন্য ন্যায়সঙ্গত মজুরি ও তাহাদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ও ধর্মঘটের পূর্ণ অধিকার; স্নাতক স্তর পর্যন্ত সকল ছাত্রকে বিনামূল্যে শিক্ষাদান; ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনা আক্রমণের অবসান সাধন; ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি ইত্যাদি। ফরওয়ার্ড ব্লক কাশ্মীর সমস্যা লইয়া পাকিস্তানের সহিত কোনও প্রকার আলাপের বিরোধী এবং জম্মু ও কাশ্মীরের পাক-অধিকৃত অঞ্চলের মুক্তিসাধনের জন্য সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

ফরাসী বিপ্লব আঠারো শতকের শেষপ্রান্তের ফরাসী বিপ্লব ইতিহাসে এক প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। হাজার বৎসরের ঐতিহ্যমণ্ডিত ফরাসী রাজতন্ত্র এই আঘাতে ছিন্নমূল হইয়া গেল; উনিশ শতাব্দীতে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কিছুতেই পুরাতন আস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই, সে-প্রচেষ্টা হয় ক্ষীণপ্রাণ ও স্বল্পস্থায়ী। সমাজে রূপান্তর আরও উল্লেখযোগ্য। বহুদিন ধরিয়া সামন্ততান্ত্রিক ফিউডাল সমাজের মূল আশ্রয় ছিল ফ্রান্স; কালক্রমে ফিউডাল আর্থিক বনিয়াদ শিথিল হইয়া আসিলেও জাতীয় জীবনের চূড়াদেশে আঠারো শতক পর্যন্ত বিরাজমান থাকে ফিউডাল বিধি প্রতিষ্ঠান সংস্কার। ফরাসী বিপ্লবের বিরাট বিস্ফোরণ সমাজের জীর্ণ প্রাচীন সৌধকে ধূলিসাৎ করিল, আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের জয়যাত্রার পথ হইল পরিষ্কার। চিরায়ত আভিজাত্যের আইনসম্মত অধিকার নির্মূল হওয়াতে জীবনযাত্রায় ও রাষ্ট্রশাসনে গণতান্ত্রিক ধারণা ও পদ্ধতির জয় সূচিত হইল। বাস্তবের ঘাতপ্রতিঘাতে বিপ্লবের পর গণতন্ত্র অনেকাংশে ব্যাহত হয় বটে, কিন্তু তবুও বর্তমান যুগমানসে যে গণতান্ত্রিক আদর্শ আজও দীপ্যমান তাহার মূল প্রেরণা এই বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লব শুধু ফ্রান্সের ব্যাপার নয়; ফিউডালবন্ধন-মুক্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (ইংরেজিতে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক রেপাব্লিক) প্রতীক হিসাবে ইতিহাসে তাহার স্থান বিশিষ্ট। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার ছাপ পড়িয়াছে ভারতের মুক্তি-আন্দোলন ও পুনর্গঠন পর্যন্ত।

মধ্যযুগের আর্থিক রূপান্তর বহু শতাব্দীর ব্যাপার। জীবনযাত্রায়, শাসনব্যবস্থায়, চিন্তা ও সংস্কৃতির রাজ্যে আনুষঙ্গিক পরিবর্তনও কিছু একপুরুষ বা একশতকের কথা হইতে পারে না। ইতিহাস ঘটনা-পরম্পরার স্রোত, খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহার অঙ্গহানি সম্ভব। মধ্যযুগ হইতে আধুনিক ইওরোপে উত্তরণের পথটা ঘটনাবহুল। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে পরিবর্তন, জলযাত্রা ও নূতন দেশ আবিষ্কার, সমাজে অভিজাত শীর্ষ এবং অবনত জনতার মধ্যবর্তী স্তরসমূহের বিকাশ, রেনেসাঁসের নবজাগরণ, রেফর্মেশনের ধর্মসংস্কার, বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, কেন্দ্রায়ত শক্তিশালী রাষ্ট্রের উত্থান, ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি, ধনতন্ত্রের সংগঠন—উত্তরণের লক্ষণ এই সব কিছুর মধ্যেই চোখে পড়ে, ইহারা আবার পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। কিন্তু ইতিহাসের স্রোতঃপ্রবাহের মধ্যেও হঠাৎ প্রচণ্ড পরিবর্তনের দেখা পাওয়া যায়, যখন অল্প কয়েক দিনে অনেকখানি পথ অতিবাহিত হইতে পারে, অন্তর্নিহিত ঝোঁক যখন সংঘাতের আবর্তে উদ্বেল হইয়া ওঠে। ফরাসী বিপ্লব তেমন এক ঐতিহাসিক পর্যায়, বা দর্শনের ভাষায় মুহূর্ত।

পূর্ববর্তী দুই শতকে রাষ্ট্রবিপ্লব হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাতে ঘটিয়াছিল, ইহাদের প্রভাব সংকীর্ণতর। ফরাসী বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করে যেন দুই জগতের সংঘাতরূপে। ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা অনুরূপ সংঘর্ষ পশ্চিমের অন্য অনেক দেশেও দেখা যায়, কিন্তু এমন ব্যাপক তীব্র রূপ অন্যত্র প্রকাশ পায় নাই। অথচ ফরাসী বিপ্লবের উৎপত্তি ফ্রান্সের বিশেষ অবস্থা হইতে একথা ভুলিলে চলিবে না।

দীর্ঘযুগব্যাপী যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ফরাসী বিপ্লব উচ্ছেদ করিল তাহার মূল অঙ্গ তিনটি—রাজশক্তি, আভিজাত্য এবং সনাতনী ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা চার্চ। ফরাসী রাজতন্ত্রের চূড়ান্ত পরাক্রম সতেরো শতকে চতুর্দশ লুই-এর আমলে, তখন তাহার খ্যাতি ছিল প্রায় অবাধ রাজতন্ত্র হিসাবে। ইহার পর আসে স্থবিরত্ব; পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই তুলনায় নির্জীবপ্রায় প্রতিপন্ন হইলেন, নেতৃত্ব হইল রাজাদের হস্তচ্যুত, শাসনব্যবস্থা দুর্বল বিশৃঙ্খল, টাকার অভাব এক স্থায়ী সংকট। এদিকে রাজসভার জাঁকজমক বজায় রাখার চেষ্টায় খরচ বাড়িয়া চলিয়াছে, সরকারি ঋণের বোঝা দুর্বহ। এমন অবস্থাতেও সামান্যতম সংস্কার, ব্যয়-সংকোচন, আয়বৃদ্ধি, শাসনের পুনর্বিন্যাস রাজাদের সাধ্যে কুলাইল না, সংস্কারক মন্ত্রীরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইলেন। ফরাসী রাজতন্ত্রকে তখন আর সক্রিয় অবাধ স্বেচ্ছাচারী বলা চলে না, তাহার রূপ তখন জীর্ণ জরাগ্রস্ত। অভ্যাসের দাসত্ব ও জড়তা কাটাইবার শক্তি ও ইচ্ছা তখন তাহার লোপ পাইয়াছে।

আসলে বিপ্লবী আঘাতের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্র নয়, আভিজাত্য ও সংশ্লিষ্ট বিশেষ অধিকারসমষ্টি (privilege)। অভিজাত স্বার্থের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়া জনবিপ্লবকে মানিয়া লইতে না পারাটাই শেষপর্যন্ত বুর্বন রাজবংশের পতনের কারণ। জন্মগত বিশেষ অধিকার বিপ্লবী মনের কাছে অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। খাঁটি ফিউডাল জমিদারদের স্বর্ণযুগ শেষ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিস্তীর্ণ জমিদারির অস্তিত্ব তখনও লক্ষণীয়, চাষীদের কাছ হইতে নানা অছিলায় ফিউডাল প্রাপ্য আদায়ে কিছু ঘাটতি ছিল না। প্রাচীন জমিদারদের পাশাপাশি গড়িয়া উঠিয়াছিল নূতন অভিজাত স্তর, জনসাধারণ

ফরাসী বিপ্লব

হইতে ইহাদেরও পার্থক্য দুস্তর। আড়াই কোটি ফরাসীর মধ্যে মাত্র কয়েক লক্ষ এই অভিজাত শ্রেণী আইন ও সমাজসম্মত বিশেষ অধিকার আঁকড়াইয়া বসিয়াছিল, মনে করিত ইহা ভগবানের দান, অচল, অপরিবর্তনীয়। নীতিগত বিশ্বাস ছিল যে, সমাজের মাথার উপর কিছু লোকের জন্মগত দৈব অধিকার আছে নেতৃত্ব করিবার, ক্ষমতা হাতে রাখিবার, আদেশ জারি করিবার; সাধারণ লোকের কর্তব্য শুধু অনুসরণ, মানিয়া চলা, হুকুম তামিল করা। ফরাসী অভিজাতদের সংগঠিত প্রতিষ্ঠান হইল বিচারক-গোষ্ঠী বা পার্লামেণ্ট (parlements) কিম্বা স্থানীয় প্রাদেশিক সভা (estates)। প্রাদেশিক শাসকেরা সকলে, মন্ত্রীরা প্রায় সকলে, চার্চের নেতা সব কয়টি বিশপ, সমস্ত উচ্চপদস্থ সেনানীরা অভিজাত গোত্রীয়। বিপ্লবের আগে বেশ কিছুদিন ধরিয়া রাজশক্তির দৌর্বল্যের পাশাপাশি অভিজাতদের অভিমান লক্ষণীয়। টুর্গো, নেকার, কালোন ইত্যাদি মন্ত্রীদের সংস্কারপ্রয়াস তাহারা ব্যর্থ করিয়া দেয়; রাষ্ট্রের আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও সাক্ষাৎ কর হইতে অব্যাহতির অধিকারটুকু ছাড়িতে চায় না; ধুয়া তোলে যে রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাচারে পরিণত হইতেছে, এখন প্রয়োজন অভিজাতদের শক্তিবৃদ্ধি, জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা সমর্পণ অবশ্য নয়। এই আন্দোলনকে অভিজাত-বিদ্রোহ বলা হইয়াছে, কিন্তু আসলে ইহা বিপ্লব নয়, শাসকদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ মাত্র। বস্তুতঃ রাজশক্তি ও আভিজাত্য পরস্পরাশ্রয়ী, পৃথক সামাজিক শক্তি নয়।

সনাতনী ক্যাথলিক ধর্ম ফ্রান্সে প্রাচীন ব্যবস্থাকে (ancien regime) সংহত রাখিবার উপায় ছিল। নেতৃস্থানীয় পুরোহিতেরা অভিজাত-বংশীয়; চার্চের শিক্ষা রাজার প্রতি ভক্তিনিবেদন; ধর্মের প্রচার হইল জনসাধারণের দৃষ্টি অসার পার্থিব জগত হইতে চিরন্তনী অলৌকিকের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া; স্বাধীন ধর্মচিন্তা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। চার্চের জমিদারি বহুবিস্তৃত, চাষীরাও তাহার ফিউডাল প্রজা। সাধারণ গরিব পাদরিরা অবশ্য অভিজাত গণ্ডির বাহিরে বলিয়া বিপ্লবের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হয়।

চিন্তার রাজ্যে প্রাচীন ব্যবস্থার ভিত্তিতে নাড়া দিল আঠারো শতকের যুক্তিবাদ। আগেকার শতাব্দীর বিজ্ঞানদর্শন, নবোদিত অর্থশাস্ত্র, ইংরাজ ও আমেরিকান বিপ্লবের সাফল্য যুক্তিবাদের পুষ্টিসাধন করে। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ডিডেরো-সম্পাদিত ফরাসী বিশ্বকোষের প্রকাশ নূতন ভাবনার জয়যাত্রা। জন্মগত অধিকারের ধারণার উপর বিদ্রূপ বর্ষিত হইতে লাগিল, ভাববাদী দর্শনের উপর আক্রমণ চলিল। ভল্‌টেয়ার পুরোহিত-তন্ত্রের যাবতীয় গলদ তুলিয়া ধরিলেন, ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবি আনিলেন, স্বাধীন চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করিলেন। আভিজাত্যের সনাতনী দাবিকে ধূলিসাৎ করেন রুসো। সমাজ স্বাধিকারবিশিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সমাবেশ নয়, স্বাধীন সমান মানুষের সমষ্টি লইয়া সমাজ গঠিত হয়। জন্মগত বিশেষ অধিকার সমাজের ভিত্তি হইতে পারে না, সমাজ নির্ভর করে সকল ব্যক্তির সম্মতির উপর। সকল মানুষের ইচ্ছায় গঠিত সমাজে অবশ্য চালক-শক্তির প্রয়োজন আছে, কিন্তু শাসনের নৈতিক সমর্থন পাওয়া যায় একমাত্র সকলের সম্মতির ভিতর, রাজা অভিজাত পুরোহিতের বিধানে নয়। সুতরাং নীতিগত হিসাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌম প্রভু হইল জনগণ, সরকার শেষপর্যন্ত আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র। প্রাচীন ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ মধ্যশ্রেণীর মনের সুপ্ত আবেগ রুসো প্রভৃতির লেখায় প্রথম মূর্ত হইয়া ওঠে বলিলে অন্যায় হয় না।

চিন্তা-ভাবনা কিছু নিরালম্ব পদার্থ নয়। মধ্যশ্রেণীর বৈষয়িক অসন্তোষের দিকটাও উপেক্ষা করা চলে না। বণিক ও ব্যবসায়ী, কারখানা ও ছোট খামারের মালিক; আইনজীবী, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি ভদ্রলোক, দোকানী ও নানা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, কষ্টসঞ্চিত টাকার সুদের উপর নির্ভরকারী ইত্যাদি লোকের অবস্থা দুর্গত না হইলেও প্রাচীন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইহাদের বিস্তর অভিযোগ জমিয়াছিল। লাভজনক নানা বৃত্তির পথ অভিজাত স্বার্থের খাতিরে ইহাদের কাছে রুদ্ধ, কৃষি-বাণিজ্য-শিল্পে আয়-বিস্তার নানা বাধায় ব্যাহত, বিশেষ অধিকারের চাপে জীবনযাত্রা কণ্টকিত, ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার তুলনায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার একান্ত অভাব, রাষ্ট্রশাসনে অংশগ্রহণের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। তাহার উপর আবার অভিজাতদের কৃপাদৃষ্টি বা অবজ্ঞা, অথচ ব্যক্তি হিসাবে মধ্যশ্রেণীর অনেকেই তুলনায় কিছু হীন ছিল না। বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তাই ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল।

ক্ষুব্ধ অথচ শক্তিশালী মধ্যশ্রেণীর হাতে ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্ব আসিয়া পড়ে। কিন্তু সাধারণ লোকের সবল সক্রিয় সমর্থন বাদ দিলে বিপ্লবের ব্যাপ্তি ব্যাখ্যা অসম্ভব। জনসংখ্যার বেশির ভাগ, অর্থাৎ চাষীদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। মধ্যযুগের কৃষিব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িলেও জমিদারের ফিউডাল নানাবিধ প্রাপ্য, পুরোহিতদের দেয় অর্থদাবি, সরকারী করের বোঝা চাষীদের নিষ্পেশিত করিয়া রাখিত। বোঝা ঝাড়িয়া ফেলার প্রবৃত্তি তাই

সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। শহরে গরিবদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। কাজের অনিশ্চয়তা, খাদ্যের অনটন, প্রয়োজনীয় সব কিছুর অভাব ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের উত্তেজিত করিবে ইহাতে আশ্চর্য কি। সঙ্কট-মুহূর্তে প্রাচীন ব্যবস্থা উড়াইয়া দিবার কাজে এমন লোকেরই তো প্রয়োজন। মধ্যশ্রেণী নেতৃত্ব দিলেও বিপ্লবের হাতিয়ার হইয়াছিল নিম্নস্তরের লোকেরা।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অভিজাত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে রাজার সংঘর্ষে সারা দেশ বিচলিত হয়। রাজা স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, শাসন-সংস্কারের জন্য সাবেকী তিন মণ্ডলী-(estates) বিশিষ্ট রাজ্যসভাকে (States-general) পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। অভিজাত প্রতিষ্ঠানগুলি তখন ঘোষণা করিল যে, রাজ্যসভার প্রাচীন সংগঠনে রদবদল চলিবে না ; অর্থাৎ পুরোহিত-মণ্ডলী, অভিজাত-মণ্ডলী, এবং সাধারণী-মণ্ডলী (third estate), প্রত্যেকের বৈঠক হইবে স্বতন্ত্র। ইহার অর্থ, বিশেষ অধিকারের ধ্বজাধারী প্রথম দুই মণ্ডলী তৃতীয়ের সকল সংস্কার-প্রচেষ্টা আটকাইয়া রাখিতে পারিবে, দুই-এর মত বাকি একের উপর প্রাধান্য পাইবে। অভিজাতদের স্বার্থ ও স্বরূপ এইভাবে প্রকট হইয়া পড়িল, বিদ্রোহের আস্ফালন হইতে প্রকৃত বিপ্লবের ধারা পৃথক হইয়া গেল।

১৭৮৯-এর মে মাসে রাজধানী ভের্সাই নগরীতে রাজ্যসভার অধিবেশন বসে ১৭৫ বৎসর পর। পুরোহিত, অভিজাত ও জনসাধারণ—মধ্যযুগীয় এই তিন মণ্ডলীর পৃথক পৃথক নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সমবেত হইলে, ব্যাপক সংস্কারকামী তৃতীয় মণ্ডলীর নেতারা স্থির করেন যে, স্বতন্ত্র বৈঠক চলিবে না। তৃতীয় মণ্ডলীর প্রতিনিধি সংখ্যা অপর দুইটির দ্বিগুণ বলিয়া যুক্তবৈঠকে সংস্কারপ্রস্তাব পাশ করার শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা। দুই মাস অসহযোগের অচল অবস্থার চাপে সরকার নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। তিন মণ্ডলীর মিলিত বৈঠক আরম্ভ হইল—মধ্যযুগের রাজ্যসভা পরিণত হইল জাতীয় মহাসভায়।

রাজার পরামর্শদাতারা এবার সৈন্যদল ডাকিয়া মহাসভা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবে, এই আশঙ্কায় প্যারিসের জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করিয়া দিল। ১৪ জুলাই-এর এই স্মরণীয় দিনটি আজও ফরাসী বিপ্লবের বাৎসরিক রূপে গণ্য হয়। প্যারিস ও অন্যান্য নগরে জন-অভ্যুত্থানের ফলে বিপ্লবী পৌরসভার পত্তন হইল ; শৃঙ্খলা রাখিবার ভার পড়িল বে-সরকারী বিপ্লবী জাতীয় রক্ষা-বাহিনীর হাতে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহী চাষীরা মুক্তি খুঁজিল জমিদারের কাছারি পুড়াইয়া, দলিলপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, ফিউডাল কর বন্ধ করিয়া, অভিজাতেরা দলে দলে দেশ ত্যাগ করিতে লাগিল। বিপ্লবের মোড় ঘুরিয়া গেল জুলাই মাসে জনতার সশস্ত্র হস্তক্ষেপে।

আগস্টে জাতীয় মহাসভার সিদ্ধান্তে সমস্ত বিশেষ অধিকার লুপ্ত হয়। কিছু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে চরমপন্থী জ্যাকবিন আমলে ক্ষতি-পূরণেরও অবসান হইল। সকল মানুষের অধিকার ঘোষণার পত্র মহাসভার অপর কীর্তি। এক কথায় ইহার সার মর্ম—মুক্তি সাম্য মৈত্রী।

অক্টোবরে জনতার বিক্ষোভের ফলে রাজা ও মহাসভাকে প্যারিসে সাধারণ লোকের মধ্যে চলিয়া আসিতে হয়। এই সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নিশানা হিসাবে বাম, দক্ষিণ ও মধ্য শব্দ তিনটির ব্যবহার শুরু হইল—দৃঢ় সংস্কারক, সংস্কার-বিরোধী ও মাঝামাঝি এই অর্থে।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে আসিল চার্চের উপর আঘাত। পুরোহিতদের বিশাল জমিদারি বাজেয়াপ্ত হইল ; টুকরা টুকরা ভাবে সে-জমি বিক্রয় হইতে লাগিল রাষ্ট্রের অর্থাভাব মিটাইবার জন্য ; সকল পাদরির নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল ; তাহারা এখন রাষ্ট্রের বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র। চার্চ-সংস্কারের অনেকখানি পরে নাপোলেঁর আমলে প্রত্যাহার করা হয়, কিন্তু ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও প্রাচীন প্রভুত্ব আর ফিরিয়া আসে নাই।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী সংবিধান কার্যকরী হয়। রাজার পদ লুপ্ত না হইলেও রাজাকে রাষ্ট্রের প্রধান কর্মচারী মাত্র জ্ঞান করিয়া ক্ষমতা সীমিত করা হইল। আসল প্রভুত্ব ন্যস্ত হইল নির্বাচিত ব্যবস্থাসভার হাতে। সেই সভা নাগরিকদের প্রতিনিধি, মণ্ডলীতে বিভক্ত নয়। সারা দেশ ছোট ছোট স্বায়ত্ত-শাসিত জেলায় পুনর্গঠিত হইল। স্থির হইল কর্মচারীরা, এমন কি বিচারকেরাও নির্বাচিত হইবে।

রাজা ষোড়শ লুই দুর্ভাগ্যবশতঃ বিপ্লবকে মানিয়া লইতে পারেন নাই। বিদেশী শক্তির সাহায্যের আশায় তিনি দেশত্যাগের চেষ্টা করেন, চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭৯১-এর মধ্য হইতে বিপ্লবী সংস্কারকেরা দুই দলে ভাগ হইতে থাকে। চরমপন্থীরা তাহাদের বিখ্যাত সমিতির নামে জ্যাকবিন বলিয়া পরিচিত। তাহারা ক্রমেই রাজতন্ত্রের বিরোধী হইয়া উঠিতেছিল ; সংবিধানে ভোটের অধিকার সাক্ষাৎ করদাতাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় ইহারা দাবি করিল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মাত্রেরই ভোটাধিকার ; বিপ্লব শেষ হয় নাই, ইহাকে সম্প্রসারিত করিয়া চলিতে হইবে, ইহাদের বিশ্বাস এই। প্রথম পর্বের নেতা—মিরাবো,

লাফায়েৎ, সিয়ে, বার্নাভে ইত্যাদির তুলনায় রোব্‌সপিয়ার, মারাট, ডান্টন, ব্রিসো প্রমুখ জ্যাকবিন নেতারা স্পষ্টতঃই ঘোর বিপ্লবী।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপের প্রধান শক্তিগুলি বিপ্লবী ফ্রান্সের বিপক্ষে যুদ্ধে নামে। এদিকে রাজা দেশদ্রোহী এই সন্দেহে ১০ আগস্ট ষোড়শ লুইকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাকে দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব বলা চলে। এই সময় দেশরক্ষার জন্য জনতার অভ্যুত্থান বিশেষ স্মরণীয়, তখনকার লা মার্সেই গানটি আজও ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত। নবনির্বাচিত প্রতিনিধি-সভা কন্‌ভেন্‌শন তখন জ্যাকবিনদের শক্ত ঘাঁটি। নূতন সংবিধান রচিত হইল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে—পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র তাহার রূপ। যুদ্ধের সঙ্কটে সংবিধান কার্যকরী না হইলেও এই দ্বিতীয় বিপ্লবী সংবিধান ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের আদর্শ হিসাবে সম্মানিত হয়। ক্রমে জ্যাকবিনদের মধ্যেও দুই দল দেখা গেল। অন্তর্দ্বন্দ্বের পর নরমপন্থী জিরণ্ডিনদের হঠাইয়া ক্ষমতা দখল করে উগ্রপন্থী পর্বতগোষ্ঠী (Mountain)—তাহাদের প্রধান নেতা রোব্‌সপিয়ার।

১৭৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দটি বিপ্লবের শীর্ষবিন্দু। দেশরক্ষা ও প্রতিবিপ্লব ব্যর্থ করিতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় জনরক্ষা সমিতিতে সংগঠিত কয়েকটি নেতার হাতে। গৃহশত্রু দমন করিতে প্রবর্তিত হয় চণ্ডশাসনের নীতি (terror)। রাজা হইতে শুরু করিয়া হাজার হাজার লোকের প্রাণদণ্ড হয় দেশদ্রোহিতার অভিযোগে, ইহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক নিশ্চয় নিরপরাধ। নবগঠিত বিপ্লবী সৈন্যদল কিন্তু আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিতে থাকে। জনতার স্বার্থে মূল্যনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হয়। তবু অন্তর্বিরোধ জ্যাকবিনদের দুর্বল করিয়া দেয়, গণ-সংগঠনও ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসে।

১৭৯৪-এর জুলাই মাসে উপদলীয় চক্রান্তে রোব্‌সপিয়ার নিহত হওয়াতে বিপ্লবের অগ্রগতি থামিয়া গেল। ইহার পর দেখা যায়, বিপ্লবের কিছুটা পশ্চাদ্‌গমন, নরমপন্থায় প্রত্যাবর্তন। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের মূল কীর্তি অনেকাংশে বজায় থাকিয়া যায়, অন্যদেশকেও প্রভাবিত করিতে থাকে। অবাধ রাজশক্তির অবসান, আভিজাত্যের বিশেষ অধিকার লোপ, পুরোহিত কর্তৃত্বের উচ্ছেদ, রাষ্ট্রশাসনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ, আইনের চোখে সমতা, আর্থিক জীবনে ফিউডাল বাধা অপসারণ—মৌলিক এই সব পরিবর্তন অক্ষুণ্ণ থাকিয়া গেল। আর পূর্ণগণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রী সম্প্রসারিত বিপ্লবের জ্যাকবিন আদর্শ পরাজয়ের পরেও ভবিষ্যতে প্রভাববিস্তার করিতে লাগিল অগ্রগতির প্রতীক হিসাবে।

দ্র L. Madelin, *The French Revolution*, London, 1925 ; H. M. Stephens, *Revolutionary Europe*, London, 1928 ; J. M. Thompson, *French Revolution*, London, 1944 ; R. R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution*, vol. I, Princeton, 1959 ; G. Lefevre, *French Revolution, From Its Origins to 1793*, London, 1962.

সুশোভন সরকার

ফরাসী, ভারতে সপ্তদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যভিত্তিক ধনতন্ত্রের প্রতিভূরূপে যে সকল পাশ্চাত্য শক্তি ভারতবর্ষে পদার্পণ করে, ফরাসীদের আগমন তাহাদের সকলের শেষে। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী মন্ত্রী কোলবেয়ার (Colbert)-এর উদ্যোগে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষে কোম্পানির প্রথম কুঠি কারঁর নেতৃত্বে ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে স্থাপিত হয়। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মসুলিপটমে ও ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরিতে আরও দুইটি কুঠির পত্তন হয়। পণ্ডিচেরিকে তাঁতীদের এক নগণ্য বসতি হইতে ভারতবর্ষে ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করেন ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ (Francois Martin)। তাঁহারই আগ্রহে বাংলাদেশে ১৬৯০-৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চন্দননগর কুঠি গড়িয়া ওঠে। ফরাসীরা এই সময়ে প্রধানতঃ ইওরোপে সুরাট, করমণ্ডল ও পরে বাংলাদেশের সুতির কাপড়, রেশম, সোরা ও কড়ি রপ্তানি করে। প্রাথমিক অধ্যায়ে ফরাসীদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ওলন্দাজ কোম্পানি।

ফরাসী কোম্পানি জন্মাবধি সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট ও শাসনাধীন, ওলন্দাজ বা ইংরেজ কোম্পানির ন্যায় প্রধানতঃ বণিকদের প্রতিনিধি ছিল না। বাণিজ্যে ফরাসী কোম্পানি ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানির ন্যায় সাফল্য লাভ করে নাই। তাহার কারণ নানাবিধ, যথা, বৈদেশিক বাণিজ্যে ফরাসীদের অনাগ্রহ, প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, অত্যধিক রাষ্ট্রনির্ভরতা ও চতুর্দশ লুইয়ের আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি। ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইওরোপে স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধের সময়ে ভারতস্থিত ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি ওলন্দাজ ও ইংরেজ নৌবাহিনীর যৌথ বিরোধিতার

ফলে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত এবং অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। ফরাসী কোম্পানি ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের পর নিজ বাণিজ্যাধিকার সাময়িকভাবে এক স্বাধীন ফরাসী বণিকসংস্থার কাছে অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করে।

১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানিকে পুনর্গঠিত করা হয়। তখন হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে ফরাসীদের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। ফরাসীরা ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে মরিশাস দ্বীপ, ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে মালাবার উপকূলে মাহে ও ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কারিকল অধিকার করে। এই সময়ে চন্দননগর ও পরে পণ্ডিচেরির শাসনকর্তা ডুপ্লেক্সের বলিষ্ঠ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে ফরাসী বাণিজ্য, বিশেষতঃ তাহার এশীয় শাখার অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন হয়। চন্দননগর ও পণ্ডিচেরির বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। ১৮শ শতাব্দী পৃথিবীর দুই প্রধান বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের তীব্রতম সংঘর্ষের যুগ। ইহার প্রথম অধ্যায় অষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (১৭৪০-৪৮ খ্রী)। ইহাতে ভারতস্থিত ইংরেজ ও ফরাসীগণ কিছুটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লিপ্ত হন। প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধে ('কর্ণাটক যুদ্ধ' দ্র) ফরাসী নৌবাহিনীর দুর্বলতার লক্ষণগুলি প্রকট হয়। কিন্তু লা বুর্দোনে ব্যতীত অপর কেহ ভারতে ক্ষমতা বিস্তারের পক্ষে ভারতমহাসাগরে শক্তিশালী ফরাসী নৌঘাঁটি গঠনের অপরিহার্যতার কথা উপলব্ধি করেন নাই।

এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ডুপ্লেক্সকে ভারতে ফরাসী বাণিজ্য বিস্তারের প্রধান বাধা মূলধনের অভাব দূর করিবার এক অভিনব উপায়ের নির্দেশ দেয়। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসক বা বিজেতারূপে নয়, স্থানীয় শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত মনসবদার বা অনুরূপ উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ রূপে বিস্তীর্ণ ক্ষমতা ও ভূমিরাজস্বের অধিকারী হইতে পারাই তাঁহার নিকট তদানীন্তন অবস্থাচক্রে মূলধন সমস্যার একমাত্র সমাধান বলিয়া প্রতিভাত হয়। দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও স্থানীয় রাজন্যবর্গের সামরিক দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কোনও এক পক্ষকে সামরিক সাহায্যদানের বিনিময়ে উক্ত অধিকার লাভ করা ডুপ্লেক্সের বহু বিতর্কিত ও আলোচিত নীতির সারমর্ম।

১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরাবাদ ও আর্কটের শাসকদ্বয়কে সাহায্যের বিনিময়ে ডুপ্লেক্স কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসকপদ লাভ করেন। মসুলিপট্টম সহ পণ্ডিচেরির নিকটস্থ এলাকা তাঁহাকে জায়গীর দেওয়া হয়। ইহা ভারতবর্ষে ফরাসীদের সর্বোচ্চ সম্মানের ক্ষণ।

১৭৫৬-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ভারতীয় অধ্যায়ে ফরাসীগণের শোচনীয় পরাজয় হয়। ক্লাইভ কর্তৃক চন্দননগরের অর্লেয়াঁ দুর্গ ধ্বংস (১৭৫৭ খ্রী) ও ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বন্দিবাসের যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজয় ভারতবর্ষে ফরাসীদের রাজনৈতিক প্রাধান্যলাভের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পারী সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী ফরাসীগণকে পণ্ডিচেরি, চন্দননগর, মাহে প্রভৃতি তাঁহাদের পূর্ব-অধিকৃত স্থানগুলি প্রত্যর্পণ করা হয়। এই সঙ্গে তাঁহারা ব্যবসায়বাণিজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় অধিকারও ফিরিয়া পান। কিন্তু তাঁহাদের চন্দনগরের দুর্গ পুনর্নির্মাণের অধিকার দেওয়া হয় নাই। বন্দিবাসের পরাজয় ফরাসীগণের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিতে পারে নাই। হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাঁহারা হায়দরাবাদ, মহীশূর ও মারাঠা শাসকদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে ল ছ লরিস্ত প্রমুখ উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ ও রণে মাদেক্, মোদভ্ ও জঁাতি প্রভৃতি কয়েকজন ভাগ্যান্বেষীর নাম উল্লেখযোগ্য। হায়দরাবাদে রেমঁ ও সিন্ধিয়াগণের বেতনভোগী ছ বোয়ান (de Boigne) ও পের঳ প্রমুখ সেনানায়কগণ মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত স্বার্থ-সন্ধানী হইলেও ভারতীয় রাজন্যবর্গের সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন ও শিক্ষাদানে ইহাদের ভূমিকা সামান্য নহে। ফরাসী সরকারের উদ্দেশ্যে রচিত বহু কূটনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনা এই সময়ে ভারতপ্রবাসী ফরাসীদের উদ্যম ও উচ্চাশার পরিচায়ক। কিন্তু ফরাসী রাজসরকারের অকর্মণ্যতা এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অপবাদভারাক্রান্ত ফরাসী ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিলোপসাধনের দরুণ এইসব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তবে ফরাসী স্বাধীন ব্যবসায়ীগণ এই সময়ে ভারত-ইওরোপ বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন।

আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ (১৭৭৮-৮৬ খ্রী) কালে ফরাসী সরকার ইংরেজের বিরুদ্ধে নৌঅধ্যক্ষ স্যুফ্রঁ এবং প্রবীণ সেনানায়ক বুসীর অধীনে ভারতবর্ষে নৌবাহিনী ও সৈন্যদল প্রেরণ করে। কিন্তু কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জয়লাভ সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। ফরাসী বিপ্লব ও নাপোলেঅঁ-র যুগে ফরাসীগণ শেষবারের মত যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ও ভারত-মহাসাগরে প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস পায়। এই অধ্যায়ে ফরাসীদের সহিত মহীশূর শাসক টিপু সুলতানের

অন্তরঙ্গতা উল্লেখযোগ্য। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সমস্ত ফরাসী উপনিবেশ ইংরেজের হস্তগত হইলেও মরিশাস হইতে ফরাসী 'প্রাইভেটিয়ার'গণ ইংরেজদের বাণিজ্য ও সামরিক নৌবাহিনীর প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। অবশ্য ইহাদের ভারতে ইংরেজ আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করার ক্ষমতা ছিল না। যুদ্ধান্তে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীগণকে তাহাদের ভারতস্থিত উপনিবেশগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

এই ক্ষুদ্র বসতিগুলির পরবর্তী কাহিনীর সহিত ফরাসী ঔপনিবেশিক ইতিহাসের যোগ নামমাত্র। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতে ফরাসী বসতিগুলি ফ্রান্স কর্তৃক ভারত সরকারের নিকটে হস্তান্তরিত হয় এবং ভারতে ২৫০ বৎসরব্যাপী ফরাসী শাসনের অবসান ঘটে।

দ্র S. P. Sen, *The French in India, First Establishment & Struggle*, Calcutta, 1958. S. P. Sen, *The French in India: 1763-1816*, Calcutta, 1958.

ইন্দ্রাণী রায়

ফরাসী ভাষা ফরাসী দেশের প্রাচীন নাম ছিল 'গাল্লিয়া' (Gallia) বা 'গল' (Gaul)। পশ্চিমের রোম সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্বেই, সমগ্র গলদেশে প্রাচীন অধিবাসীদের কেলটিক ভাষা লোপ পাইয়া তাহার স্থানে লাতিন ভাষার প্রসার ঘটে। ইহাকে বলা হয় গলের লৌকিক লাতিন। এই স্থানীয় লৌকিক লাতিনের বিবর্তন হইতে খ্রীষ্টীয় ৮ম-৯ম শতকে ফরাসী ভাষার উদ্ভব হয়। মুখ্য আঞ্চলিক রূপভেদ হইতে ইহার দুইটি নামকরণ হয়—উত্তর ফ্রান্সে *Langue d' oil*, এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে *Langue d' oc*। 'হাঁ' এই অর্থে উত্তরের লোকেরা বলিত *oil*, আর দক্ষিণের লোকেরা *oc*; এই শব্দ ভেদ হইতে এইরূপ নামকরণ হয়।

ফরাসী ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন, ১২শ শতকের কতকগুলি বীরগাথা ও অন্য উপাখ্যান—*Chanson de geste*—উত্তরের *Langue d' oil*-এ রচিত; এগুলির মধ্যে 'শাঁস ্য রোলাঁ' (*Chanson de Roland*) নামক বীরকাব্য অগ্রগণ্য। দক্ষিণে *Langue d' oc*-এর অন্তর্গত Provencal-এও সাহিত্য রচিত হয়। ১৫শ শতকে উত্তরের ভাষাই—Ile de France-এর, পারী (প্যারিস) অঞ্চলের ভাষা—সমগ্র ফ্রান্সের সাধুভাষারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অঞ্চল নির্বিশেষে ইহাই সাহিত্যের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

১৬শ শতকে 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের প্রেরণায় লাতিনের পরিবর্তে ফরাসী ভাষার অনুশীলন হইতে থাকে এবং এই সময় হইতেই ফরাসী ভাষা ফ্রান্সের রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ১৭শ শতক ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ। আধুনিক ফরাসী ভাষার শিষ্ট রূপটি এই সময়েই গড়িয়া ওঠে। মধ্য যুগের অবসানে ইওরোপে লাতিনের স্থান গ্রহণ করে ফরাসী ভাষা এবং গত শতকের শেষ পর্যন্ত ফরাসী ভাষার এই ভূমিকা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। এক সময়ে সমগ্র ইওরোপের [illegible] অভিজাত সমাজে ফরাসী ভাষায় জ্ঞান উচ্চত[illegible] ভব্যতা, বৈদগ্ধ্য ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞান[illegible] হইত।

ফরাসী ভাষা খাস ফ্রান্সের বাহিরেও, বে[illegible]মে সুইৎসারল্যাণ্ডে, কানাডার পূর্বাংশে এবং আফ্রিকার কোনও কোনও স্থলে প্রচলিত। মধ্য প্রাচ্যে, দূর প্রাচ্যে এবং ভারতেও (চন্দননগরে, পণ্ডিচেরিতে) ইহার প্রসার ঘটিয়াছিল। সারা পৃথিবীতে ফরাসীভাষীর সংখ্যা সাত কোটির মত।

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

ফরিদপুর পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা ও শহর। জেলাটি ২২°৫১´-২৩°৫৫´ উত্তর, ৮৯°১৯´-৯০°৩৭´ পূর্বে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৭৩০৬ বর্গকিলোমিটার (২৮২১ বর্গমাইল)। উত্তরে পদ্মা, পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে গড়াই, মধুমতী ও ইহার শাখা বরসিয়া নদী ইহাকে যথাক্রমে ঢাকা, নোয়াখালি কুষ্টিয়া ও যশোহর জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ইহার দক্ষিণে বাখরগঞ্জ জেলা।

এই জেলায় সদর, গোয়ালন্দ, গোপালগঞ্জ ও মাদারিপুর এই ৪টি মহকুমা, ২৪টি থানা, ৩৫৭২টি গ্রাম এবং ২টি মিউনিসিপ্যালিটি আছে।

ফরিদপুর পদ্মা ও মেঘনার পলিমাটির দ্বারা গঠিত। জেলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চল অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিয়া বর্ষা ভিন্ন শুষ্ক থাকে। জমি ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে ঢালু হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার সীমান্তে আসিয়া জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণের জলাভূমি নাবীবশাহী বলিয়া পরিচিত। নদীগুলির সন্নিকটস্থ জমিতে এঁটেল মৃত্তিকা ও জলাভূমিতে পিট (peat) দেখা যায়।

এই জেলার প্রধান নদী পদ্মা, মেঘনা, গড়াই, মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁ। ইহা ব্যতীত চন্দনা, ভুবনেশ্বর,

মেরা, পালং এবং নয়া ভাঙ্গ উল্লেখযোগ্য নদী। জেলার গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫° সেন্টিগ্রেডের অধিক হয় না। জানুয়ারি মাসে বৎসরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩° সেন্টিগ্রেডে নামিয়া আসে। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় ১৩৫০ মিলিমিটার।

ফরিদপুর নাম ফরিদ খাঁ নামে এক ফকিরের নাম হইতে হইয়াছে বলিয়া কথিত। চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে ফরিদপুর জেলা পূর্ব বাংলার অন্যান্য অংশের সহিত মুসলমানদের অধীন হইয়া পড়ে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে [illegible]র ভূঁইয়াদের ইতিহাসের নিদর্শন এখনও এই [illegible] দেখা যায়, যথা, কেদার রায়ের কীর্তি পরিখা-বি[illegible] [illegible]কদারবাড়ি এবং ভূষণা থানার কেল্লাবাড়িতে [illegible] রায়ের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ইংরেজ আমলে ১৮[illegible] খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর একটি স্বতন্ত্র জেলা হইয়া ওঠে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় ফরিদপুর পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে আদমসুমারীতে ফরিদপুর জেলার লোকসংখ্যা ৩১৭১০০০। তন্মধ্যে ২৩৪৭০০০ মুসলমান, ২২৯০০০ হিন্দু, ৫৯৪০০০ নিম্নবর্ণের হিন্দু, ৯০০০ খ্রীষ্টান। লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪৩১ জন।

কৃষিজমির পরিমাণ মোট জমির শতকরা ৭০ ভাগ। ধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহা ছাড়া ডাল, তৈলবীজ, লঙ্কা, যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। গম ও বার্লিও কিছু পরিমাণে হয়। পাট প্রধান অর্থকরী উৎপন্ন দ্রব্য। অন্যান্যের মধ্যে ইক্ষু, তামাক, নারিকেল ও সুপারি উল্লেখযোগ্য।

জেলার গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ৯০৩৬৫৫। জেলার যাহা কিছু শিল্প তাহা প্রধানতঃ ফরিদপুর শহরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে চর্ম শিল্প, সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং, হোসিয়ারী, ছাপাখানা, চাউলকল, রেল মেরামতের কারখানা, সাবান প্রস্তুতের কারখানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ফরিদপুর জেলায় বহু কুটিরশিল্প আছে। এখানে শীতলপাটি, বেতের ঝুড়ি, ডালা, মাদুর, তাঁতের কাপড়, চটের থলি ইত্যাদি তৈয়ারি হয়।

গোয়ালন্দ, মাদারিপুর, ফরিদপুর, পাংসা, রাজবাড়ি, কালুখালি, ভাটিয়াপাড়া ঘাট, মধুখালি, কামারখালি ঘাট রেলকেন্দ্র ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

ফরিদপুর জেলায় মোট ১৫০ কিলোমিটার রেলপথ ও ৩৩ কিলোমিটার পাকা রাস্তা আছে।

জেলার মধ্যে মেঘনা, পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, মধুমতী, গড়াই প্রভৃতি নদী বার মাসই নৌবহনযোগ্য বলিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপযোগী। জলপথের প্রধান কেন্দ্র গোয়ালন্দ, মাদারিপুর, রাজবাড়ি, সৈয়দপুর, গোপালগঞ্জ, ভাটিয়াপাড়া প্রভৃতি। ফরিদপুর হইতে বিমান ঢাকা ও খুলনা যায়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র জেলার শিক্ষিতের সংখ্যা ৪৬১৭৬৬ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২ জন। ইহার মধ্যে ৩৫৮৯৯৭ জন পুরুষ ও ১০৮৭৮০ স্ত্রীলোক।

ফরিদপুর জেলার সদর শহর (২৩°৩৭´ উত্তর ও ৮৯°৫১´ পূর্ব) মরাপদ্মা খালের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। আয়তন ১৩ বর্গকিলোমিটার।

দক্ষিণদিকে প্রকাণ্ড ঢোল সমুদ্র নামে একটি বিল আছে। বর্ষাকালে এই বিলের জল শহরে প্রবেশ করে। ফরিদপুর শহরে একটি কলেজ আছে। গোয়ালন্দ মহকুমার সদর দপ্তর। রাজবাড়ি বা মূলঘরে সংস্কৃত-চর্চার কেন্দ্র ছিল। মাদারিপুর মহকুমা শহর। পালং একটি ছোট শহর। কুরাশী গ্রামে পুরাতন পুকুর ও শিবমন্দির আছে। ছয়গাঁ গ্রাম সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্র ছিল। ধানুকা, মাত্রসার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র। ফতেজঙ্গপুর জ্যোতিষবিদ্যার কেন্দ্র ছিল।

দ্র *Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Eastern Bengal & Assam,* Calcutta, 1909 ; H. H. Namani, *Census of Pakistan* : 1961, vol. III & IV ; Nafis Ahmed, *An Economic Geography of East Pakistan*, London, 1958 ; *Pakistan* : 1963-64, Pakistan Publications, Karachi, 1964.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ফল নিষিক্তকরণের জন্য ফুলের ডিম্বক বীজে পরিণত হয় এবং ডিম্বাশয়টি বর্ধিত হইয়া ফলে রূপান্তরিত হয়। পরাগযোগ ও নিষিক্তকরণের ফলে অক্সিন-জাতীয় হর্মোন উৎপন্ন হয় এবং এই হর্মোনের প্রভাবে ডিম্বাশয় বর্ধিত হইয়া ফল উৎপন্ন করে। সাধারণতঃ পরাগসংযোগ ও ফলের পূর্ণতা লাভের জন্য ২ সপ্তাহ হইতে ৬ মাস সময় লাগিয়া থাকে। মরুভূমির কোনও কোনও উদ্ভিদে পরাগযোগের কয়েক দিনের মধ্যে ফল পরিপক্ব হয়। কিন্তু সিচেলা দ্বীপের (Scychella island) জোড়া-নারিকেল পাকিতে প্রায় ১০ বৎসর লাগিয়া থাকে। নিষিক্ত না হইলে ডিম্বাশয়টি শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে।

কলা, আঙ্গুর প্রভৃতি উদ্ভিদে নিষিক্তকরণ ব্যতীতই ফল উৎপন্ন হয়। এরূপ বীজহীন ফলকে 'পার্থেনোকার্পিক' ফল বলা হয়।

'ইন্‌ডোল-অ্যাসেটিক অ্যাসিড,' 'ইন্‌ডোল-বিউটিরিক অ্যাসিড' প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে বীজহীন ফল উৎপন্ন করা সম্ভব। ইহা ব্যতীত উদ্ভিদের ক্রোমসোম-সংখ্যার পরিবর্তন ঘটাইয়াও বীজহীন ফল উৎপন্ন করা যায়। ট্রিপ্‌লয়েড (riploid) তরমুজ ও আঙ্গুরে বীজহীন ফল উৎপন্ন হয়। বীজদ্বারা সপুষ্পক উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি হয় বলিয়া বীজের বিস্তারের জন্য ফল সুস্বাদু, সুগন্ধি ও নানা বর্ণের হইয়া থাকে। পশু, পক্ষী ও মানুষ আকৃষ্ট হইয়া এই সকল ফল নানা স্থানে লইয়া যায় এবং বীজের বিস্তারে সহায়তা করে। চোরকাঁটা, বাঘনোখা প্রভৃতির কাঁটাযুক্ত ফল অতি সহজেই জীবজন্তুর পায়ে লাগিয়া স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। নারিকেল প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলবর্তী বৃক্ষের ফল জলে ভাসিয়া দূর-দেশে চলিয়া যায়। শাল, মাধবলতা প্রভৃতির ফল পক্ষযুক্ত বলিয়া সহজেই বাতাসে ভাসিয়া যাইতে পারে।

সাইট্রিক, অক্‌সালিক প্রভৃতি জৈব অ্যাসিডের জন্য অনেক ফল অম্লস্বাদ হইয়া থাকে। কোনও কোনও ফল তিক্ত, কষায় অথবা ঝালও হইয়া থাকে। ধুতুরা, কলিকা, কুচিলা প্রভৃতির বীজে উপক্ষার বা অ্যালকালয়েড থাকায় ঐসকল ফল বিষাক্ত।

মানুষ নানাভাবে ফল ব্যবহার করিয়া থাকে। ধান, গম প্রভৃতি শস্যজাতীয় ফল খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়; বেগুন, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি শবজি ও আম, কলা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ফল মানুষের অতি প্রিয় খাদ্য। পপি, কুচিলা প্রভৃতি ফল হইতে ঔষধ উৎপন্ন হয়। কার্পাস ও শিমুল ফলের ভিতর তুলার আঁশ উৎপন্ন হয়; হরিতকি, বয়ড়া প্রভৃতির ফল হইতে ট্যানিন-জাতীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। তৈলজাতীয় পদার্থ সাধারণতঃ ফলের অভ্যন্তরে বীজের ভিতরে থাকে। আপেল, কমলালেবু প্রভৃতি ভিটামিনযুক্ত ফল মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য।

আপেল, ন্যাসপাতি, চালতা প্রভৃতি ফলে ডিম্বাশয় ব্যতীত অন্যান্য অংশও ফলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে; ইহাদের অপ্রকৃত ফল (ফল্‌স্‌ ফ্রুট) বলা হয়। আপেল ও ন্যাসপাতির পুষ্পাক্ষ (থ্যালামাস) ফলটিকে ঘিরিয়া থাকে এবং চালতার বৃত্যংশগুলি ফলকে আবৃত করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ফলের তিনটি অংশ থাকে। অন্তস্ত্বক (এন্‌ডোকার্প), মধ্যত্বক (মেসোকার্প) ও অধিস্ত্বক (এক্‌সোকার্প)। আম ও অনেক ফলের এই অংশগুলি সুস্পষ্ট।

ফলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। ১. সরল বা একক ফল: এক্ষেত্রে একটি গর্ভপত্র হইতে মাত্র একটি ফল উৎপন্ন হয়; কলা আম, বেগুন প্রভৃতি অধিকাংশ ফলই সরল ২. গুচ্ছিত বা পুঞ্জীভূত ফল (এগ্রিগেট ফ্রুট): এক্ষেত্রে একটি ফুলের অনেকগুলি যুক্ত গর্ভপত্র হইতে অনেক ফল উৎপন্ন হয়; চাঁপা, কাঁঠালিচাঁপা, দেবদারু প্রভৃতি এজাতীয় ফল ৩. যৌগিক ফল (কম্‌পোজিট ফ্রুট): কাঁঠাল, আনারস, ডুমুর প্রভৃতি ফলে একটি পুষ্পবিন্যাস (ইন্‌ফ্লোরেসেন্স) হইতে একটি ফল উৎপন্ন হয়; পুষ্পপত্র, মঞ্জরী এবং গর্ভাশয় একত্রে যুক্ত হইয়া ফলের সৃষ্টি হয়।

একক ফল দুই প্রকার হইয়া থাকে। ধুতুরা, চীনা-বাদাম, গম ধান প্রভৃতি পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পর শুখাইয়া যায়; এই সকল ফলকে নীরস ফল বলা হয়। কলা, আম, টমাটো প্রভৃতির ফল পাকিলে নরম ও শাঁসালো হইয়া যায়; ইহাদের সরস ফল বলা হয়। নীরস ফলের মধ্যে চীনাবাদাম, আকন্দ, ধুতুরা প্রভৃতির ফল পাকিবার পর ফাটিয়া যায় বলিয়া ইহাদের বিদারী (ডেহিসেন্ট) ফল বলা হয়; কিন্তু ধান, গম, কাজুবাদাম প্রভৃতি নীরস ফল কখনও ফাটিয়া যায় না, ইহারা অবিদারী (ইন্‌ডেহিসেন্ট) ফল নামে অভিহিত।

ছোলা, মটর, শিম প্রভৃতির ফল পাকিবার পর শুখাইয়া ফাটিয়া দুইভাগ হইয়া যায়; ইহাদের শিম্ব ('লেগুম' বা 'পড্‌') বলা হয়। আকন্দের ফল একদিকে ফাটিয়া যায়; ইহাকে 'ফলিকল' বলা হয়। ঢেঁড়স, কার্পাস, শিমুল প্রভৃতির ফল পাকিলে অনেকগুলি অংশে ফাটিয়া যায়; ইহারা 'ক্যাপসিউল' নামে পরিচিত।

নীরস অবিদারী ফলের মধ্যে ধান, গম প্রভৃতি এক-বীজযুক্ত ফলকে 'ক্যারিয়প্‌সিস' বলা হয়; কাজুবাদাম, ওক প্রভৃতির ন্যায় কঠিন আবরণযুক্ত ফল বাদাম বা 'নাট' বলিয়া পরিচিত। চুপড়ি আলু, শাল, মাধবলতা প্রভৃতির অবিদারী ফল হালকা ও পক্ষযুক্ত। ইহারা সহজে বাতাসে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে। ইহাদের 'সামারা' বা 'কি ফ্রুট' বলা হইয়া থাকে।

সরস ফল বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। আমের তিনটি অংশ থাকে। খোসাকে বহিস্ত্বক, শাঁসালো অংশকে মধ্যত্বক এবং ভিতরের কঠিন অংশকে অন্তস্ত্বক বলা হইয়া থাকে। অন্তস্ত্বক কঠিন হয় বলিয়া এই সকল ফলকে 'ড্রুপ' বা 'স্টোন ফ্রুট' বলা হয়। নারিকেল

ও সুপারি ড্রুপজাতীয় ফল, কিন্তু ইহাদের মধ্যত্বক শাঁসালো না হইয়া তন্তুময় হইয়া থাকে। নারিকেলের শাঁস হইল বীজের অংশ শস্য ('এন্ডোস্পার্ম')। কলা, পেয়ারা, টম্যাটো প্রভৃতির ফল পাকিবার পর শাঁস নরম হইয়া গলিয়া যায়; ইহাদের 'বেরি' বা 'বাক্কা' বলা হয়। লাউ, কুমড়া প্রভৃতির ফল পাকিলে অভ্যন্তরভাগ নরম হইয়া যায়, কিন্তু আবরণটি কঠিন থাকে; এই সকল ফল 'পেপো' বলিয়া পরিচিত। খোসার দ্বারা আবৃত লেবুজাতীয় ফলকে 'হেসপেরিডিয়াম' বলা হয়।

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

ফল্গু বিহার রাজ্যের গয়া জেলার একটি নদী। বুদ্ধগয়ার প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে লীলাজান ও মোহনার মিলিত স্রোতোধারাই অন্তঃসলিলা ফল্গু। গয়া শহরের উত্তরে প্রবাহিত হইয়া ইহা অবশেষে গঙ্গার শাখা পুনপুনের সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে ফল্গু শুষ্ক থাকে।

মহাভারতের মতে গয়াতীর্থের পার্শ্বদিয়া প্রবাহিত বালুকাবৃত অন্তঃসলিলা এই পবিত্র নদীটি (বনপর্ব ৮৪।৯৪) দর্শন করিলে অশ্বমেধের ফল পাওয়া যায় এবং মহতী সিদ্ধি লাভ করা যায়। ফল্গুনদীর জল অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া তাহা পুণ্যজলা নামে প্রসিদ্ধ (বনপর্ব ৮৭।১১-১২)।

কৃত্তিবাসরচিত বাংলা রামায়ণের আযোধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত কাহিনী অনুসারে সীতার অভিশাপে এই নদী ক্ষীণকায়া হইয়া যান। বলা হয়, রাম ও লক্ষ্মণ যখন সীতাকে একাকী ফল্গুনদীর তীরে রাখিয়া দশরথের শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে গিয়াছিলেন, তখন দশরথ উপস্থিত হইয়া সীতার নিকট হইতে অন্য জিনিসের অভাবে বালির পিণ্ড গ্রহণ করেন। তুলসী, বটবৃক্ষ, ফল্গুনদী ও ব্রাহ্মণ এই পিণ্ডদানের সাক্ষী থাকিলেও বটবৃক্ষ ব্যতীত অপর তিন জন রাম-লক্ষ্মণের কাছে তাহা অস্বীকার করায় সীতা কর্তৃক অভিশপ্ত হন। সীতার অভিশাপে ফল্গুনদী ক্ষীণস্রোতা—শৃগাল-কুক্কুরও তাহাকে অনায়াসে লঙ্ঘন করিতে পারে।

সীতানাথ গোস্বামী
মঞ্জুশ্রী বসু

ফস্‌ফরাস অধাতব মৌল, পারমাণবিক সংকেত P, পারমাণবিক ওজন ৩১, পারমাণবিক সংখ্যা ১৫। ফস্‌ফরাস সাধারণতঃ মৌল অবস্থায় পাওয়া যায় না। প্রধানতঃ বিবিধ অজৈব ফস্‌ফেট লবণরূপে ফস্‌ফরাস স্বাভাবিক অবস্থায় বর্তমান। খনিজ ফস্‌ফেট মূলতঃ ক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেট। অনেক সময়ে ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যাল্‌সিয়াম ফ্লুয়োরাইড ইহার সহিত সংযুক্ত থাকে (ক্লোর-অ্যাপাটাইট ও ফ্লুয়োর-অ্যাপাটাইট)। জীবজন্তুর হাড়েও প্রচুর পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেট বর্তমান। জীবকোষ, মাংসপেশী, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, অস্থিমজ্জা ও ডিমের কুসুমে জৈব যৌগিক পদার্থরূপে ফস্‌ফরাস বর্তমান।

ব্র্যাণ্ড ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মৌলিক ফস্‌ফরাস প্রস্তুত করেন; তবে সম্ভবতঃ পূর্বেই আরবীয় অ্যাল্‌কেমিস্টগণ ইহার সহিত পরিচিত ছিলেন।

ফস্‌ফরাসের শ্বেত, লোহিত ও কালো, এই তিন প্রকারের প্রধান রূপ (allotropic form)। শ্বেত ফস্‌ফরাস বিশেষ বিক্রিয়াশীল ও অত্যন্ত বিষাক্ত; দেখিতে শাদা মোমের ন্যায় ও অনচ্ছ। গলনাঙ্ক ৪৪° সেন্টিগ্রেড ও স্ফুটনাঙ্ক ২৮০° সেন্টিগ্রেড। শ্বেত ফস্‌ফরাসকে ২৪০-২৬০° উষ্ণতায় উত্তপ্ত করিয়া লোহিত ফস্‌ফরাস প্রস্তুত করা হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত কম বিক্রিয়াশীল, গলনাঙ্ক ৫৯০-৬০০° সেন্টিগ্রেড। শ্বেত ফস্‌ফরাসকে ১২০০০ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ২০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিলে ইহা কেলাসিত কালো ফস্‌ফরাসে রূপান্তরিত হয়।

শ্বেত ফস্‌ফরাস বায়ুতে সাধারণ উষ্ণতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবুজ রঙের শিখায় জ্বলিয়া ওঠে ও জারণের ফলে ফস্‌ফরাস ট্রাই-অক্সাইড (P_2O_3) উৎপন্ন হয়; অধিক উষ্ণতায় জারণের ফলে পেন্টোক্সাইড (P_2O_5) উৎপন্ন হয়। এইরূপ বিক্রিয়াশীলতার ফলে ফস্‌ফরাস বায়ুতে একপ্রকার আলোক বিকিরণ করে; ইহাকে অনুপ্রভা (Phosphorescence) বলে।

বর্তমানকালে বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনে ফস্‌ফেট খনিজ, বালি ও কোক একত্রে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে উত্তপ্ত করিয়া মৌলিক ফস্‌ফরাস প্রস্তুত করা হয়। লোহিত ফস্‌ফরাস দিয়াশলাই শিল্পের বিশেষ উপাদান। প্ল্যাস্টিক শিল্পে ও কীটনাশক রাসায়নিক যৌগ প্রস্তুতের উপাদান হিসাবে ফস্‌ফরাস ব্যবহৃত হয়। ফস্‌ফরিক অ্যাসিড ও ক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেট সারপ্রস্তুত শিল্পে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বস্ত্রাদির পরিষ্কারক (detergent) ও জলের মৃদুকারক (softener) হিসাবে বিভিন্ন ফস্‌ফরাসঘটিত যৌগের বিস্তৃত ব্যবহার রহিয়াছে।

অমরেন্দ্রনাথ রায়

ফাইলেরিয়া উকেরেরিয়া বান্‌ক্রফ্‌তি (*Wuchereria bancrofti*) নামক গোল কৃমি ঘটিত ব্যাধি ('কৃমি' দ্র)। ইহা প্রধানতঃ মানবদেহের লিম্ফ বা লসিকাতন্ত্রকে আক্রমণ করে। ব্যাধির শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রান্তীয় প্রত্যঙ্গ প্রচণ্ড ফুলিয়া ওঠে ; তাহাকে বলা হয় এলিফ্যান্টা-ইয়াসিস বা গোদ। আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। মানব-দেহে ফাইলেরিয়া পরজীবীর অনুপ্রবেশ ঘটে কিউলেক্স, ঈডিস, মানসোনিয়া ও অ্যানোফিলিস মশার কামড় হইতে। রোগীর রক্ত শোষার সময়ে কৃমি মশার দেহে ঢুকিয়া যায় ; সেই মশা সুস্থ লোককে কামড়াইবার সময়ে কীট ত্বকের নীচে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে রক্তস্রোত বাহিয়া লসিকাতন্ত্রে ও অন্যান্য দেহযন্ত্রে চলিয়া যায়। ইহাদের বৈশিষ্ট্য হইল রাত্রে ঘুমাইবার সময়ে ইহারা প্রান্তীয় রক্তস্রোতে চলিয়া আসে। কাহারও রাতে কাজ দিনে নিদ্রার অভ্যাস থাকিলে তাহার প্রান্তীয় রক্তস্রোতে দিনের বেলায় ফাইলেরিয়া কৃমি পাওয়া যাইতে পারে। এই রোগে জ্বর, তাহার ফলে ত্বকের উপর দাগড়া দাগড়া স্ফীতি, লসিকানালী বা গ্রন্থির প্রদাহ ও অণ্ডকোষ ফুলিয়া ওঠা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। রোগ পুরাতন হইয়া গেলে বিভিন্ন প্রান্তীয় প্রত্যঙ্গ প্রচণ্ড ফুলিয়া উঠিয়া গোদ সৃষ্টি করে। মশক ধ্বংস করাই এই রোগ প্রতিষেধের পথ। বর্তমানে হেট্রাজান, বেনোসাইড প্রভৃতি ঔষধ দিয়া ফাইলেরিয়ার সফল চিকিৎসা এবং প্রতিষেধও করা হইতেছে।

সমর রায়চৌধুরী

ফাট্‌কা পণ্যদ্রব্য বা শেয়ার মূল্যের উঠানামার সম্ভাবনা সম্বন্ধে পূর্বানুমান করিয়া লাভের আশায় যে কেনাবেচা করা হয়, তাহাকে ফাট্‌কা বলা হয়। যে ব্যক্তি ফাট্‌কা করে বা "খেলে" তাহাকে ফাট্‌কাওয়ালা বলা হয়। মূল্যের উঠানামা সম্বন্ধে ফাট্‌কাওয়ালার পূর্বানুমানকে "ধ্যান" বলা হয়। অচির ভবিষ্যতে মূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঘটিবে, এইরূপ ধ্যান যাহারা করে তাহাদিগকে তেজী-ওয়ালা ('বুল্‌স') বলা হয়। আর যাহারা মূল্য সম্পর্কে নিম্নগামী ধ্যান করে তাহাদিগকে "মন্দীওয়ালা" ('বেয়ার্‌স') বলা হয়। তেজীমন্দীওয়ালাদের মধ্যে বাজির লড়াই লইয়াই ফাট্‌কা বাজারের "খেলা" হয়। মূল্যের ঊর্ধ্বগতি হইলে তেজীওয়ালা লাভবান হয়, আর নিম্নগতি হইলে মন্দীওয়ালা লাভবান হয়।

বাজারের স্বাভাবিক কেনাবেচার সহিত ফাট্‌কার মূলগত পার্থক্য আছে। স্বাভাবিক কেনাবেচা নগদ অর্থ দিয়া সম্পন্ন করিবার চুক্তিতে করা হয়। ব্যক্তিদের কেনাবেচার পরিমাণ তাহাদের অর্থ-সাকল্যের দ্বারা সীমিত হয়। ফাট্‌কা বাজারে কেনাবেচার পরিমাণ কিন্তু এরূপ কোনও অর্থ-সাকল্যের উপর নির্ভর করে না। ফাট্‌কা বাজারে কেনাবেচা অবিশ্রান্তভাবে একপক্ষ কাল ধরিয়া চলিতে থাকে। পক্ষকালের এই কেনাবেচা একটি নির্দিষ্ট হিসাবভুক্ত হয়। ধরা যাক, পাক্ষিক হিসাবের সময়ে কেহ প্রায় এক কোটি শেয়ারের কেনাবেচা করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিমাণ শেয়ার কেনাবেচা করিবার মত অর্থ-সাকল্য তাঁহার নাই। পক্ষান্তে হিসাব মিটানর সময় দেখা গেল যে, উক্ত কালের মধ্যে তিনি ৫০০০০০০ শেয়ার কিনিয়াছেন ও ৪৯৯৯৯০০ শেয়ার বেচিয়াছেন ; তাঁহার কেনাবেচার ফাজিল বাকী মাত্র ১০০ শেয়ার। তাঁহাকে মাত্র ১০০ শেয়ার গ্রহণ করিয়া উহার মূল্য বিক্রেতাকে দিতে হইবে। যদি ১০০ শেয়ার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত অর্থ-সাকল্যও তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে শেষ দিনে তিনি উক্ত ১০০ শেয়ার "বদলা" ('ক্যারী ওভার') করিতে পারেন। উক্ত ১০০ শেয়ার তাঁহার নামে পরবর্তী "হিসাবে" অন্তরিত করা হইবে। এইরূপ "বদলা" করিবার জন্য তাঁহাকে মাত্র সামান্য কিছু (সাধারণতঃ শেয়ার প্রতি ১ পয়সা হইতে ১২ পয়সা) ব্যাজ দিতে হইবে। এইরূপ ব্যাজকে "সট্টা" বলা হয় সট্টা যখন ক্রেতাকে দিতে হয়, তখন ইহাকে "সিদা সট্টা" ('কন্‌টান্‌গো') বলা হয় ; আর যখন বিক্রেতাকে দিতে হয় তখন ইহাকে "উল্টা সট্টা" ('ব্যাক্‌ওয়াডে'শন') বলা হয়।

ফাট্‌কার নানারূপ রকমফের আছে। যেমন ১. একপক্ষ কালের হিসাবের ভিত্তিতে তেজীমন্দী-খেলার ফাটকা ২. তরওয়ানীওয়ালা বা কাটনিওয়ালার ফাট্‌কা ৩. তেজীমন্দী "খাওয়ার" ফাটকা ৪. "আর্‌বিট্রেজ" ও ৫. "হেজিং"। প্রথমটি পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তরওয়ানীওয়ালার প্রাদুর্ভাব আছে বোম্বাই বাজারে ; আর কাটনিওয়ালার প্রাদুর্ভাব কলিকাতায়। দুইজনের ফাটকা করিবার পদ্ধতি প্রায় একই রকমের। ইহারা সারাদিন ধরিয়া যাহা কেনাবেচা করে, দিনের শেষে ফাজিল-বাকী কাটিয়া নগদ টাকা দিয়া হিসাব চুকাইয়া লয়। ইহাদের মধ্যে শেয়ার আদান-প্রদান করার কোনরূপ ঝঞ্ঝাট নাই। ইহারা অনুমোদিত শেয়ার-বাজারের অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায় নহে। কিন্তু ইহাদের

কেনাবেচা অনুমোদিত শেয়ার বাজারের মূল্যগতিকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে।

তেজীমন্দী "খাওয়াকে" ইংরেজীতে "অপ্‌শ্যন্‌স" বলা হয়। যাহারা এইরূপ কেনাবেচায় অংশগ্রহণ করে, তাহারা তেজীমন্দী-খাদকের নিকট হইতে ভবিষ্যতে কোনও নির্দিষ্ট মূল্যে মাল বা শেয়ার কিনিবার বা বেচিবার অধিকার ক্রয় করে। ইহার জন্য পণ দিতে হয়, সাধারণতঃ ৪ টাকা।

দুই বাজারের মধ্যে মূল্য-পার্থক্যের ভিত্তিতে যে কেনাবেচা করা হয়, তাহাকে "আর্‌বিট্রেজ" বলা হয়। এইরূপ কেনাবেচায় এক বাজারে সওদা করিয়া অপর বাজারে তাহার বিপরীত সওদা করা হয়। অর্থাৎ এক বাজারে নিম্নমূল্যে কিনিয়া অপর বাজারে ঊর্ধ্বমূল্যে বেচা হয়, বা এক বাজারে ঊর্ধ্বমূল্যে বেচিয়া অপর বাজারে নিম্নমূল্যে কেনা হয়।

"হেজিং" ফাট্‌কা বটে, কিন্তু ঠিক জুয়া নহে। কোনও পূর্ববর্তী সওদার বিপক্ষে ভবিষ্যতে "ডেলিভারী" লইবার বা দিবার শর্তে আগাম-চুক্তির ভিত্তিতে যে ক্ষতি-নিরোধক বিপরীত ধরনের কেনাবেচা করা হয়, তাহাকে হেজিং বলা হয়। মূল্যের সমতা রক্ষা করিয়া ইহা ব্যবসায়পতিদিগকে মূল্যপরিবর্তনজনিত ক্ষতির হাত হইতে বাঁচায় ও এইরূপে সমাজের মঙ্গল সাধন করে।

যাঁহারা ফাট্‌কা অনুমোদন করেন, তাঁহারা বলেন যে, ফাট্‌কা দ্বারা বাজারে মূল্য-গতির তরলতা ও অবিচ্ছিন্নতা রক্ষিত হয়। কিন্তু ইহা ব্যতীত ফাট্‌কার দ্বারা অন্য কোনও সামাজিক মঙ্গল সাধিত হয় না। সিকিউরিটিজ কন্‌ট্র্যাক্টস (রেগুলেশন) অ্যাক্ট-এ শেয়ার বাজারে ফাট্‌কা দমনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সরকার আজ পর্যন্ত উক্ত আইন অনুযায়ী কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। ফাট্‌কা সমগ্রভাবে জুয়া না হইলেও মোটের উপর যে সমাজ-বিরোধী জুয়া খেলা-বিশেষ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

অতুলকৃষ্ণ সুর

ফারসী সমগ্র ইরানে ব্যবহৃত ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর ইন্দো-ইরানীয় উপগোষ্ঠীর ভাষা। ইহার বিকাশ-কাল তিনভাগে বিভক্ত: ১. প্রাচীন ফারসী: হখমানীয় অভিলেখ এবং অবেস্তার (বৈদিক ভাষার সহিত সাম্যযুক্ত) ভাষা, ২. মধ্য ফারসী: সাসানীয় শাসকদের অভিলেখগুলিতে প্রাপ্ত, ইহাদের রাজভাষা পহ্লবী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, ৩. আধুনিক ফারসী: মধ্য ফারসীর দক্ষিণ ইরানীয় কথ্য রূপ হইতে ইহার উৎপত্তি। এই ভাষার উপর ইরানের পশ্চিমোত্তরের কথ্য ভাষার সমধিক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আরবী ও তুরস্ক ভাষার অনেক শব্দ এই ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই বিদেশী শব্দগুলির বহিষ্কার চলিতেছে। আরবী লিপিকে যৎসামান্য সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করিয়া ফারসী ভাষা লেখা হইয়া থাকে।

ফারসী ভাষা ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাধিক বিশ্লেষণাত্মক। আধুনিক ফারসী ভাষায় রুশ ও ফরাসী ভাষা হইতে অনেক শব্দ ধার করা হইয়াছে। আধুনিক ফারসী ভাষার সর্বপ্রাচীন রূপ ৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি কবিতায় পাওয়া যায়। সাহিত্যের ভাষা এক হওয়া সত্ত্বেও ফারসীর একাধিক কথ্য ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি ভারতে, আফগানিস্তানে ও সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের তাজিকিস্তানে দেখিতে পাওয়া যায়।

রামঅধার সিংহ

ফারাক্কা বাঁধ, ফরাক্কা বাঁধ ভারত সরকার পরিচালিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। গঙ্গানদীর উপরে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের অদূরে ফরাক্কা নামক স্থানে এই বাঁধ প্রকল্পটি রূপায়িত হইতেছে। রাজমহল হইতে ইহা ২৯ কিলোমিটার দক্ষিণে।

গঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে চড়া পড়িতেছে এবং ভাগীরথী-হুগলীর গর্ভ জোয়ারের জলে আনীত বালির দ্বারা ভরিয়া উঠিতেছে। জলস্রোতের অভাবে মোহানার মুখ পরিষ্কার না হওয়ায় কলিকাতা বন্দরে জাহাজ চলাচল কঠিন হইয়া উঠিতেছে। ভাগীরথী-হুগলীকে পুনঃ সঞ্জীবিত করাই প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রথমে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আর্থার কটন এবং তৎপরে স্যার উইলিয়াম উইলকক্স (১৯৩০ খ্রী), স্যার ক্লড ইংলিস (১৯৪৭ খ্রী) এবং সর্বশেষে প্রফেসর হেনসেন (১৯৫৫ খ্রী) হুগলী নদীকে পলি সঞ্চয়ের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য উপর হইতে অধিক জল প্রবাহিত করার একটি প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

ফরাক্কা বাঁধটি গঙ্গার নদীবক্ষে কংক্রীটের পাতলা চাদরে (স্ল্যাব) তৈয়ারি। প্রায় ২ কিলোমিটার লম্বা ও ৯১ মিটার চওড়া এই বাঁধটির উপর বসানো ১০৯টি ৬ মিটার উচ্চ লৌহনির্মিত কপাটদ্বারা গঙ্গার জলের কিয়দংশ একটি ফিডার খালে প্রবাহিত করা হইতেছে।

ফিডার খালটি ১৫০ মিটার চওড়া ও ৬ মিটার গভীর হইবে। ইহা ফরাক্কার দক্ষিণ পাড় হইতে গঙ্গার জল লইয়া ৩৫ কিলোমিটার দূরে গিয়া জঙ্গীপুরের নিকট ভাগীরথীতে পড়িবে। এই জল ভাগীরথী হইতে যাহাতে গঙ্গায় ফিরিয়া না যায় তজ্জন্য জঙ্গীপুরে ভাগীরথীর উপর আর একটি ১১ কপাট-বিশিষ্ট বাঁধ দেওয়া হইতেছে। ফিডার খালটি সম্পূর্ণ নাব্য হইবে এবং ইহার মধ্যদিয়া সারা বৎসর কলিকাতা হইতে উত্তরবঙ্গ ও বিহারে বড় বড় লঞ্চ চলাচল সম্ভব হইবে। ফিডার খালে এইজন্য কয়েকটি বড় বড় লকগেটও নির্মিত হইতেছে। বর্তমানে ভাগীরথী ও গঙ্গার মধ্যে নৌযোগাযোগ বৎসরে মাত্র ৪ মাস সম্ভব।

উল্লিখিত আভ্যন্তরীণ জলপথের উন্নতি ব্যতীত, ফিডার খালের এই জল কলিকাতা বন্দর হইতে সমুদ্র-মোহানা পর্যন্ত (২০২ কিলোমিটার) জলপথটির গভীরতা সারা বৎসর ন্যূনপক্ষে ৮ মিটার রাখিতে সাহায্য করিবে। বর্তমানে বৎসরে মাত্র ৭ মাসকাল এই জলপথে ৮ মিটার গভীরতা থাকে এবং সেই নাব্যতা রক্ষা করিতে কলিকাতা পোর্ট কমিশনারকে ড্রেজিং-এর নিমিত্ত প্রতি বৎসরই প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হয় এবং জাহাজ আটকাইয়া গেলে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতি বৎসর প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ফরাক্কা বাঁধের সাহায্যে আনীত জল এই সকল পৌনঃপুনিক অর্থ অপচয়ের হাত হইতে কলিকাতা বন্দরকে চিরকালের জন্য মুক্ত করিবে ইহাই আশা।

বাঁধের একটি সড়কসেতু ও একটি রেলসেতু নির্মিত হইতেছে। এই সেতুর সাহায্যে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলার মধ্যে যোগাযোগ অনেক সহজ হইবে। আসাম, উত্তর বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে স্থলপথে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ সাধিত হইবে।

এই প্রকল্পের জন্য আনুমানিক ১২৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের যানবাহন মন্ত্রক ইহা সম্পূর্ণভাবে বহন করিতেছেন। ফরাক্কা বাঁধের কংক্রীটের কাজ ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হইয়া ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কপাট বসানো এবং সড়ক সেতুটিও সমাপ্তপ্রায়। ফিডার খালের এক-তৃতীয়াংশ কাজ এখনও বাকী। জঙ্গীপুর বাঁধ এবং ফরাক্কার রেলসেতুটি ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হইবে।

ফরাক্কা বাঁধটি ভারতের দীর্ঘতম ব্যারেজ। ইহা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় স্থপতিগণদ্বারা পরিচালিত ও নির্মিত এবং বিদেশী সাহায্যবর্জিত।

দ্র Debes Mookherjee, 'Farakka Barrage Project, What it stands for', *Indian Journal of Power & River Valley Development*, Calcutta, May, 1965.

ফার্গুসন, জেম্‌স (১৮০৮-৮৬ খ্রী) স্থাপত্যবিদ্যার ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ঐ বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থকার। জন্ম স্কটল্যাণ্ডে; প্রথম বয়সে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন ও সামান্য চাকুরি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষে আসিতে হয়। পরে তিনি ভারতবর্ষে কিছুকাল নীলকরের বৃত্তিতে ও স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কৈশোর কাল হইতেই পুরাতন সৌধাদির প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। এই কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া ভারতবর্ষে অবস্থানকালে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল একাধিকবার পরিভ্রমণপূর্বক অত্রস্থ স্থাপত্যকীর্তিসমূহের প্রত্যক্ষ অনুশীলন করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অবশিষ্ট জীবন স্থাপত্যবিদ্যার, বিশেষতঃ ভারতীয় স্থাপত্যের চর্চা ও গবেষণায় অতিবাহিত করেন।

জেম্‌স ফার্গুসনের মনের গতি বহুমুখী ছিল. তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ ও সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্থাপত্যভিত্তিক সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার গ্রন্থ 'অ্যান্ হিস্টরিকাল্ এন্‌কোয়ারি ইন টু দ্য ট্রু প্রিন্সিপ্‌ল্ অফ বিউটি ইন আর্ট মোর স্পেসিয়ালি উইথ রেফারেন্স টু আর্কিটেক্‌চার' ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রাচীন গ্রীক মন্দিরসমূহের আলোকীকরণপদ্ধতি সম্পর্কে যে মত তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'দ্য পার্থেনন' শীর্ষক প্রবন্ধে পুনরায় তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য বিষয়েই সম্ভবতঃ ফার্গুসন সর্বাধিক লিখিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ঈস্টার্ন আর্কিটেক্‌চার' প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতবর্ষীয় স্থাপত্যকলার বিকাশের ইতিহাস-অনুশীলনেচ্ছুগণের নিকট এই গ্রন্থ ইহার কিছু কিছু ত্রুটিসত্ত্বেও অদ্যাবধি প্রামাণ্য বিবেচিত হয়। এই ব্যাপক সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তিনি ভারতীয় স্থাপত্যের যে বিভাগটি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে চর্চা করিয়াছিলেন তাহা প্রাচীন যুগের গুহাস্থাপত্য। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে

ভারতীয় গুহাস্থাপত্য বিষয়ে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন; ইহার ফলে তদানীন্তন ইংরেজ-কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি ভারতবর্ষীয় পুরাকীর্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনবিভাগের নিকট ঐ সকল অঞ্চলস্থ প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তিসমূহের মাপগ্রহণ ও চিত্রসংগ্রহের নিমিত্ত নির্দেশ প্রেরিত হয়। জেম্‌স বার্জেসের সহযোগিতায় রচিত তাঁহার 'দ্য কেভ টেম্পল্‌স অফ ইণ্ডিয়া' (১৮৮০ খ্রী) এই বিষয়ে অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। সাঁচী ও অমরাবতীর সুবিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপদ্বয়ও ফার্গুসনের গবেষণা ও আলোচনার বিষয় ছিল। স্তূপগাত্রের ভাস্কর্যগুলি বিশ্লেষণপূর্বক তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের বৃক্ষপূজা ও নাগপূজাসম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন ও এই বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ 'ট্রী অ্যাণ্ড্ সার্পেন্ট্ ওয়ারশিপ্: অ্যান্ ইলাস্ট্রেশন অফ মাইথলজি ইন ইণ্ডিয়া' ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের কালক্রম সম্পর্কেও ফার্গুসন গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করিতে হয়, কুষাণ রাজগণের ক্ষোদিত লেখমালায় উল্লিখিত সংবৎকে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আরব্ধ শক-সংবতের সহিত অভিন্ন ঘোষণা করিয়া ও কণিষ্ককে শক-সংবতের প্রতিষ্ঠাতা নির্ণীত করিয়া তিনি বহুকাল পূর্বে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, বর্তমান গবেষকগণের অনেকেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থাপত্য আলোচনার অঙ্গ হিসাবে ফার্গুসন আধুনিক দুর্গনিবেশ পদ্ধতি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। ইহার ফলে তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষা-সম্পর্কীয় রয়্যাল কমিশনের অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। যীশুখ্রীষ্টের সমাধির অবস্থান নির্ণয়-সম্পর্কিত দুইখানি পুস্তকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্তমানে জেরুজালেমে যে-স্থলে ওমরের মসজিদ অবস্থিত উহাই যীশুখ্রীষ্টের মূল সমাধিস্থান। এই মত অবশ্য সাধারণ-ভাবে গৃহীত হয় নাই। মানব সভ্যতার প্রাচীন প্রস্তর-যুগ বিষয়ে তাঁহার 'রুড্ স্টোন মনুমেন্ট্‌স ইন অল কান্ট্রিজ' শীর্ষক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তিনি গঙ্গার মোহানা-সংলগ্ন ভূভাগের সাম্প্রতিক পরিবর্তন বিষয়ক প্রামাণ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কিছুকালের জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডে জাতীয় অট্টালিকা-স্মৃতি স্তম্ভাদির পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্থাপত্যবিদ্যায় পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত স্বর্ণপদক দানে তাঁহাকে সম্মানিত করেন। ইংল্যাণ্ডের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

ফার্গুসনের প্রকৃতিতে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুতা ছিল। অধ্যয়ন-গবেষণার ক্ষেত্রে আলোচনা প্রসঙ্গে কোনও বিতর্ক উপস্থিত হইলে তিনি অনেক সময়ে অতি উগ্র ভাষায় প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিতেন। ইহার নিদর্শন স্বরূপ স্বনামধন্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতি তাঁহার অসংযত আক্রমণ দুঃখের সহিত স্মরণীয়। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, সহজাত প্রতিভা ও প্রায় অমানুষিক পরি-শ্রমের সাহায্যে তিনি স্থাপত্যবিদ্যাচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থায়ী কীর্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিশেষত: ভারতীয় স্থাপত্যেতিহাসের ছাত্রগণ তাঁহার নাম সর্বদা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করিবে।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

ফার্ন টেরিডোফাইটা গোষ্ঠীর (ফাইলাম) অন্তর্ভুক্ত অপুষ্পক উদ্ভিদ। ফার্নের প্রায় ৩০০টি গণ (জেনাস) ও প্রায় ৯০০০ প্রজাতি (স্পিসিস) বর্তমান। উষ্ণ-প্রধান ও শীতপ্রধান, পৃথিবীর সকল দেশেই ফার্ন গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও ফার্ন জলেও হয়, আবার আরও কতকগুলিকে মরুভূমির তীব্র জলা-ভাবের মধ্যেও স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। সকল ফার্ন গাছেই একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণুর ন্যায় 'স্পোর' হয়। সহস্র সহস্র স্পোর এক-একটি থলির (স্পোরান্‌জিয়া) ভিতর থাকে এবং এরূপ অনেক থলি একত্র হইয়া এক-একটি 'সোরাস' সৃষ্ট হয়। ফার্নের পাতাকে 'ফ্রণ্ড' বলে; ফ্রণ্ডের অগ্রভাগ কুকুরের লেজের মত গুটানো থাকে। ফার্নের কাণ্ডকে 'রাইজোম' বলে। কাণ্ড ও পাতার নিচের দিকে প্রচুর পশমের লালচে রং-এর সুন্দর রোম দিয়া ঢাকা থাকে।

পাহাড়ের গায়ে, পাথরের নিচে, মহীরুহের শাখায়, শুষ্ক বা সিক্ত সকল স্থানেই ফার্ন এক বিশেষ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। পাতার আকৃতি, সোরাস্-এর অবস্থান ইত্যাদির দ্বারাই ফার্নের গণ প্রভৃতি নির্ধারিত হয়। ঈগল ফার্ন, আঙ্গুরগুচ্ছাকৃতি ফার্ন, শিলাখণ্ডাকৃতি ফার্ন, স্বর্ণাভ স্পোরযুক্ত গোল্ডেন ফার্ন, রৌপ্যবর্ণ স্পোরযুক্ত সিল্‌ভার ফার্ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'ট্রি-ফার্ন'কে ছোট খেজুর গাছের ন্যায় দেখিতে।

কয়লাযুগে ফার্নের পূর্বপুরুষেরা প্রায় ১৬ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হইত।

দ্র F. O. Bower, *The Ferns (Filicates)*, vols. I-III, Cambridge, 1923-28.

সন্তোষকুমার পাইন

ফার্নেস তাপ উৎপাদনের প্রক্রিয়া অনুসারে চুল্লীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: ১. ধাতু নিষ্কাশন চুল্লী (মেটালার্‌জিক্যাল ফার্নেস) ২. বৈদ্যুতিক চুল্লী।

ধাতু নিষ্কাশন চুল্লীতে উপযুক্ত জ্বালানি হইতে উৎপন্ন তাপের সাহায্যে ধাতুর রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। এই চুল্লীর দুইটি প্রধান অঙ্গের একটি হইল অগ্নিকুণ্ড (যেখানে জ্বালানি দহন করা হয়) এবং অপরটি দহনাগার (যেখানে তাপের সাহায্যে ধাতুর দহন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে)। জ্বালানি দহনের জন্য প্রয়োজনীয় বায়ু বিদ্যুৎচালিত পাখার সাহায্যে অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হয়। জ্বালানি দহনের ফলে প্রাপ্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে নির্গত অপ্রয়োজনীয় গ্যাসীয় পদার্থ নির্গমনের জন্য এই সকল চুল্লীতে চিমনি সংস্থাপন করা হইয়া থাকে। বস্তুগুলি যেভাবে তাপিত হয় তদনুসারে এই প্রকার চুল্লীগুলির শ্রেণীবিন্যাস করা হইয়া থাকে: ১. একপ্রকার চুল্লীতে জ্বালানি ও বস্তুগুলি উত্তাপের সময় পরস্পরের নিকট সংস্পর্শে আসে ২. পরাবতক চুল্লী বা যেখানে উত্তপনীয় বস্তুটি জ্বালানির দহন হইতে উদ্ভূত গ্যাসীয় পদার্থের সংস্পর্শে আসে কিন্তু জ্বালানিকে স্পর্শ করে না।

নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক চুল্লীর সাধারণভাবে অধিক প্রচলন দেখা যায়: ১. প্রকোষ্ঠ বা আচ্ছাদিত চুল্লী (চেম্বার ফার্নেস) এক বা ততোধিক অর্গলযুক্ত একটি প্রকোষ্ঠ। তাপ উৎপাদনের জন্য ক্রোমিয়াম (৮০%) ও নিকেলের (২০%) একপ্রকার সংকর-ধাতুর পাত ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহে তাপ উৎপন্ন হয়। এই সংকর-ধাতুর পাতগুলি প্র কাষ্ঠের গাত্রে এমন বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবেশিত থাকে যাহাতে চুল্লীর অভ্যন্তরে সর্বত্র একই তাপমাত্রা পাওয়া যায়। পরিচ্ছন্নতা এই চুল্লীর একটি বিশেষ অঙ্গ। গলিত ধাতু হইতে নির্গত গ্যাস তাপরোধক্ষম পদার্থে নির্মিত চিমনির দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া হয় ২. আর্ক চুল্লী: ইস্পাত বা সমধর্মীয় অন্যান্য ধাতু গলনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কার্বন কিংবা গ্রাফাইট তড়িৎদ্বারের অগ্রভাগ এবং নির্দিষ্ট উত্তপনীয় ধাতুকে সংশ্লিষ্ট করিয়া এক বৃত্তাকার আর্কের সাহায্যে এই প্রকার চুল্লীতে তাপ উৎপাদন করা হয়। এক-দশ এবং ত্রি-দশ এই দুই প্রকারের আর্ক চুল্লী হইতে পারে। ত্রি-দশ আর্ক চুল্লী সাধারণতঃ ইস্পাতের সংকর-ধাতু নির্মাণের জন্য এবং এক-দশ চুল্লী ইস্পাত ব্যতীত অন্যান্য সংকর-ধাতু নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে ৩. মজ্জাহীন আবেশ গলন চুল্লী (কোর্‌লেস ইন্‌ডাক্‌শন মেল্টিং ফার্নেস) একটি মোটর জেনারেটর সেট হইতে প্রাপ্ত ৫০০-১০০০০ পর্যন্ত কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। চুল্লীটিতে জলদ্বারা শীতলীকৃত একটি তাম্রকুণ্ডলীর ভিতর উচ্চ কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ প্রেরণ করার ফলে ঐ কুণ্ডলীটি একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন পরিবর্তী চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। তাম্রকুণ্ডলীটির ভিতর অবস্থিত পরিবাহী বস্তুর (যে বস্তুকে উত্তপ্ত করার প্রয়োজন) সহিত আবেশের ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া ঐ বস্তুটিকে গলাইয়া দেয়। কুণ্ডলীটির গাত্র তাপনিরোধক পদার্থের দ্বারা নির্মিত থাকে।

কান্তিভূষণ দত্ত

ফার্মেন্টেশন সন্ধান দ্র

ফাসিবাদ প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সমগ্র ইওরোপে জনগণের যে আর্থিক দুর্গতি দেখা দেয় তাহার ঝাপ্টা আসিয়া ইটালীতেও লাগিল। এই সময়ে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়া বেনিতো মুসোলিনি ইটালীকে একনায়কত্বের পথে লইয়া যান। মুসোলিনির নেতৃত্বে যে জঙ্গীবাদের সৃষ্টি হইল তাহাই ফাসিবাদ নামে পরিচিত। জার্মানীর নাৎসিবাদ-এর সহিত ইহার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

ফাসি একটি দল নয়। ইটালী জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইহা একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। ফাসিরা প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে বিশ্বাসী। প্রকৃতির রাজ্যে সবল দুর্বলের উপর বাহুবলে প্রভুত্ব করে। মানুষের রাজ্যেও ইহার ব্যতিক্রম অসম্ভব। ফাসি জীবনদর্শনে সংগ্রামই হইল আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়।

ফাসিবাদের তিনটি মূলসূত্র। প্রথমতঃ রাষ্ট্রপূজা। ব্যক্তির জীবন রাষ্ট্রের নিকট উৎসৃষ্ট। এই সর্বাত্মক রাষ্ট্রকে ফাসিরা দলের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। দল হইল রাষ্ট্রের বনিয়াদ এবং দলনেতা হইলেন জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা। রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিবার জন্য দল নেতার হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দেয়। জাতির গরিমা ফাসিবাদের দ্বিতীয় সূত্র। এই সূত্র ধরিয়া ফাসিরা রোমক সাম্রাজ্যের প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধারে তৎপর হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ ফাসিদের যাবতীয় আর্থিক

ও রাজনৈতিক পরিকল্পনা এক অবিচ্ছিন্ন সমবায়োজনের উদ্দেশ্যে গৃহীত হইয়াছিল।

ফাসিবাদ মূলতঃ একটি গণ-আন্দোলন। ফাসিরা জনগণের সহযোগিতা চাহিয়াছিল। তবে তাহাদের মতে রাষ্ট্রের শাসনভার চালাইবার মত যোগ্যতা এবং শিক্ষা জনতার নাই। গণতন্ত্রের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জায়গায় তাহারা শৃঙ্খলা, দায়িত্ব ও নেতার অনুগমনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিল।

ফাসিরা সংসদীয় গণতন্ত্র ও কম্যুনিজম উভয়েরই বিরোধী। তাহারা উৎপাদনে শ্রমিকের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে এবং ধনতন্ত্র ও ব্যক্তিগত মালিকানাই প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে করে। তাহারা শ্রেণীসংগ্রাম এড়াইতে চায়। শ্রেণী-সংগ্রাম রোধের জন্য ফাসিরা ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীতে বৃত্তির ভিত্তিতে সিণ্ডিকেট গঠন করিয়াছিল। প্রত্যেক বৃত্তির লোককে দুইটি সিণ্ডিকেটে প্রবেশ করিতে হইবে —একটি মালিকদের অপরটি শ্রমিকদের। ধর্মঘট ও তালাবন্ধ (লক্-আউট) বেআইনী বলিয়া গণ্য হয়। শ্রমিক ও মালিকের বিরোধ বাধ্যতামূলক আপসের দ্বারা মীমাংসার ব্যবস্থা হয়। ইটালীতে আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচন তুলিয়া দিয়া পেশার ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

দ্র H. W. Schneider, *The Making of the Fascist State*, New York, 1928; Carmen Haider, *Capital and Labour Under Fascism*, New York, 1930.

নারায়ণী বসু

ফা-হিয়েন ভারত-পর্যটনকারী প্রাচীন চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের অন্যতম। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে তাঁহার জন্ম। তিনি চীনের শান্-সি জনপদভুক্ত ফিং-ইয়াংএর অন্তর্গত উ-ইয়াং নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। বাল্যবয়সেই তিনি শ্রামণের রূপে বৌদ্ধ-সংঘে যোগদান করেন ও উত্তর জীবনে শ্রদ্ধাবান ও আচারনিষ্ঠ ভিক্ষুরূপে চীনা বৌদ্ধসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে তাও-আন্ নামক এক সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ভিক্ষুর শিক্ষায় ও প্রভাবে চীনদেশীয় ভিক্ষুসম্প্রদায়ের মধ্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিবার প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইয়াছিল। মুখ্যতঃ এই অনুপ্রেরণার ফলে ফা-হিয়েন অপর চারিজন চীনা ভিক্ষু হুই-কিং, তাও-কিং, হুই-য়িং ও লুই-ওয়েই সহ ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশ হইতে মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে ভারতগামী আরও একটি চীনা ভিক্ষুদল তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হন। তুন-হুয়াং হইতে তাঁহারা অগ্নিদেশে (কারাসর) আসেন ও তথা হইতে দুর্গম ও বিপদসংকুল মরুপথ অতিক্রম করিয়া মধ্য এশিয়ার অন্যতম বৌদ্ধ সংস্কৃতিকেন্দ্র খোটানে উপনীত হন। এখানে কিছুকাল অতিবাহিত করিবার পর ফা-হিয়েন ও তাঁহার সঙ্গীরা পামীর অঞ্চল পার হইয়া গিলগিটের পথে কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। পথকষ্টে ও রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া এই পর্বে দলের অনেকে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেও ফা-হিয়েন তাঁহার সংকল্প হইতে বিচ্যুত হন নাই। অতঃপর তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ অধিকাংশ সময় একাকী উত্তর-ভারতের উড্ডিয়ান, সুবাস্ত, পুরুষপুর, তক্ষশীলা, নগর, মথুরা, কান্যকুব্জ, শ্রাবস্তী, কপিলবাস্ত, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, বারাণসী প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করেন। ভ্রমণকালে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের বিভিন্ন পুথি সংগ্রহ করেন ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও পুথি নকল করিবার উদ্দেশ্যে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। মগধ হইতে তিনি চম্পায় (বর্তমান বিহারের ভাগলপুর অঞ্চল) ও পরে তাম্রলিপ্তিতে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের তমলুক) উপস্থিত হন। তাম্রলিপ্তি এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। ফা-হিয়েন এখানে বাইশটি সংঘারাম দেখিয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন, পুথি নকল ও বুদ্ধমূর্তির চিত্র ও নকশা অঙ্কনের কার্যে দুই বৎসর তাম্রলিপ্তিতে কাটাইয়া তিনি এখান হইতে সমুদ্রপথে সিংহল যান এবং সেখানেও দুই বৎসর বাস করেন। সিংহল হইতেও কিছু বৌদ্ধ পুথি সংগ্রহ-পূর্বক তিনি সমুদ্রপথে বহু বিপদ অতিক্রম করিয়া প্রথমে যবদ্বীপে পৌছান ও অবশেষে সেখান হইতে ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি চীনদেশে আগত ভারতীয় ভিক্ষু বুদ্ধভদ্রের সহযোগিতায় তাঁহার আনীত শাস্ত্রগ্রন্থের পুথিগুলির চীনাভাষায় অনুবাদের কার্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন। দক্ষিণ-চীনের অন্তর্গত কিং-চিউ নামক স্থানে 'সু-য়ু-সিন্-সে' সংঘারামে বিরাশি (মতান্তরে অষ্টাশি) বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর বৎসরদ্বয় জানিতে পারা যায় নাই।

ফা-হিয়েনের ভারত পর্যটনের উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধতীর্থ-সমূহ পরিদর্শন, সংস্কৃত-ভাষা-শিক্ষা ও বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থের পুথি সংগ্রহ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৌদ্ধবিহারে

অবস্থানকালে তিনি সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর সহিত তাঁহার ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম ছিল সংস্কৃতভাষা। তাঁহার মনে বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ছিল না। তিনি সরল বিশ্বাসী ও সংঘের অনুশাসনাবলীর প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিলেন। এই কারণে বৌদ্ধশাস্ত্রের বিনয়ভাগের প্রতি তাঁহার আগ্রহ স্বভাবতঃ প্রবল ছিল। বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থের যে সকল পাণ্ডুলিপি তিনি স্বদেশে লইয়া যান তন্মধ্যে মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের ও মহীশাসক সম্প্রদায়ের বিনয়পিটকদ্বয় প্রধান। মহাসাংঘিক বিনয়টি তিনি চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ফা-হিয়েন সর্বসমেত সাতখানি গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া জানা যায়; তন্মধ্যে ছয়খানি সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থের চীনা অনুবাদ ও অবশিষ্টখানি তাঁহার ভারত-পর্যটনবিষয়ক মৌলিক রচনা (ফো-কুয়ো-কিং)। শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে চতুর্থ শতকের শেষভাগে ও পঞ্চম শতকের আরম্ভে মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্মের, বৌদ্ধতীর্থস্থানগুলির ও বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চার অবস্থা সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মজগৎ ভিন্ন ফা-হিয়েনের অপর কোনও বিষয়ে কৌতূহল ছিল না। সেই কারণে তিনি ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা বা তৎসংক্রান্ত অপর কোনও প্রসঙ্গ প্রায় কখনই তাঁহার আলোচনাভুক্ত করেন নাই। সেই সময়ে গুপ্তবংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উত্তর ভারত শাসন করিতে-ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজাসাধারণের সুখসমৃদ্ধির উল্লেখ সাধারণভাবে করিলেও তিনি সম্রাটের নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণ পাঠে ভারত-ইতিহাসের ছাত্রগণের কিছু অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। অপরপক্ষে তাঁহার অনুবাদগ্রন্থগুলি চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিল ও তাঁহার ভারত-পর্যটনকাহিনী উত্তরকালের চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে বুদ্ধের জন্মভূমি পরিদর্শন করিবার প্রেরণা দিয়াছিল—ইহা সর্বতোভাবে স্বীকার্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৌদ্ধমন্দির হইতে বুদ্ধমূর্তির যে সকল মাপ, চিত্র ও নমুনা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেগুলি চীন-শিল্পে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে সহায়ক হইয়াছিল।

দ্র S. Beal, *Travels of Fa-hien*, London, 1869; J. Legge, *A Record of Buddhistic Kingdoms being an account by the Chinese Monk Fa-Hien of his travels in India and Ceylon*, Oxford, 1886; Giles, *Travels of Fa-hien*, London, 1923; P. C. Bagchi, *Le Canon Bouddhique in Chine*, Tome I, Paris, 1927; S. N. Sen, *India through Chinese Eyes*, Calcutta, 1956; যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, সমসাময়িক ভারত, অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় কল্প, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ; ভারত ও চীন, কলিকাতা ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

দিলীপকুমার বিশ্বাস।

ফ্যানোরোগ্যাম সপুষ্পক উদ্ভিদ দ্র

ফ্যারাডে, মাইকেল (১৭৯১-১৮৬৭ খ্রী) পরীক্ষা-মূলক গবেষণায় অসাধারণ প্রতিভাধর বিজ্ঞানী। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর নেউইংটনে এক কর্মকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সপরিবারে লণ্ডনে বসবাস করিতে আসেন। তাঁহার শৈশব অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি এক দোকানে বই বাঁধানোর ও বিক্রয়ের কাজে শিক্ষানবীশরূপে যোগ দেন। এই সময় বিজ্ঞানের কয়েকটি গ্রন্থ পাঠ করিয়া ও মাঝে মাঝে বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া ফ্যারাডের মনে ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাম্‌ফ্রি ডেভির কয়েকটি বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করেন ও তাহা ডেভির নিকট পাঠাইয়া দেন। ফলে ডেভি রয়্যাল সোসাইটির গবেষণাগারে নিজের সহায়করূপে ফ্যারাডেকে নিযুক্ত করেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ফ্যারাডে স্বাধীন-ভাবে গবেষণার কাজ শুরু করেন। এই সময়ে তাঁহার প্রধান আকর্ষণ ছিল রসায়নে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তড়িৎ-চুম্বক বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার 'তড়িৎ-চৌম্বক আবেশের নিয়ম' (Law of Electro-magnetic induction) রয়্যাল সোসাইটিতে ঘোষণা করেন। এই আবিষ্কার শিল্পক্ষেত্রে তড়িৎ-যুগের সূচনা করে। এই নিয়ম হইতেই ডাইনামো তৈয়ারি করিয়া প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যারাডে রয়্যাল সোসাইটিতে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ফ্যারাডের বহু আবিষ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য —তরলের তড়িদ্‌বিশ্লেষণের নিয়ম, যাহা হইতে তাড়িত-রসায়নবিদ্যার সূত্রপাত হয়, চৌম্বক ক্ষেত্রে 'ফ্যারাডে এফেক্ট' নামে পরিচিত আলোকের পরিবর্তন, ক্লোরিন গ্যাসকে তরলে রূপান্তর করা, বেন্‌জিন আবিষ্কার

ইত্যাদি। প্রধানতঃ ফ্যারাডের পরীক্ষার ফলাফল অবলম্বন করিয়াই পরবর্তীকালে ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েল বেতারতরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণে সমর্থ হন। ব্যক্তিগত জীবনে ফ্যারাডে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির, উদারহৃদয় ও গভীর ধর্মভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ আগস্ট তাঁহার মৃত্যু হয়। অনেকের মতে তাত্ত্বিক গবেষণায় নিউটনের যে স্থান, পরীক্ষাসংক্রান্ত গবেষণায় ফ্যারাডের স্থান তদনুরূপ।

দ্র J. Tyndall, *Faraday as a Discoverer*, New York, 1870; T. Martin, *Faraday*, London, 1934.

শ্যামল সেনগুপ্ত

ফিচ, র‍্যাল্‌ফ আকবরের রাজত্বকালে (১৫৮৩ খ্রী) বাণিজ্যিক সুবিধা অনুসন্ধানার্থে জন নিউবেরীর নেতৃত্বে তিনজন ইংরেজ বণিক ভারতে আগমন করেন এবং সম্রাট আকবর রাজসভায় তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (১৫৮৫ খ্রী)। ফিচ এই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। দিউ, গোয়া, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, উজ্জয়িনী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, প্রয়াগ, বারাণসী, পাটনা, তাণ্ডা, সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম, বাকোলা (বাকলা বা বাখরগঞ্জ), শ্রীপুর, সোনারগাঁ (ঢাকা) ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করিয়া ফিচ পেগু অভিমুখে রওনা হন (১৫৮৭ খ্রী)। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৫৯১ খ্রী) করার পর তিনি প্রাচ্যদেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন।

ফিচের রচনা হইতে জানা যায়, আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রি জনবহুল এবং লণ্ডনের চেয়ে বড় শহর ছিল। সোনারগাঁয়ে তৈয়ারি বস্ত্র সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্যে ছিল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ। তাণ্ডা ছিল তুলা ও তুলাজাত বস্ত্রের বিরাট ব্যবসায়কেন্দ্র। বাকোলা অতি সম্পদশালী অঞ্চল ছিল। এখানকার বাড়ি ও রাস্তা ছিল অতি প্রশস্ত এবং মেয়েরা প্রচুর পরিমাণে রুপার গহনা এবং হাতির দাঁতের আংটি পরিধান করিত।

দ্র William Foster, ed. *Early Travels in India* (1583-1619), Oxford, 1921.

কুমুদরঞ্জন দাস

ফিজিওক্র্যাট সম্প্রদায় অর্থনৈতিক চিন্তার ক্রম-বিকাশ দ্র

ফিজিওথেরাপি ভৌত শক্তির সাহায্যে চিকিৎসার পদ্ধতি। তাপ ও শৈত্য, অতিবেগুনী ও অবলোহিত আলোকরশ্মি, উচ্চমাত্রার শব্দ, বিভিন্ন কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ-প্রবাহ, অঙ্গ-সংবাহন, চিকিৎসাবিদ্যাসম্মত ব্যায়াম, ইলেকট্রনিক্‌স প্রভৃতির সাহায্যে চিকিৎসা এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ইহার কতিপয় শাখা বহু পূর্ব হইতেই প্রাকৃতিকচিকিৎসা নামে ভারতে প্রচলিত ছিল; এই প্রসঙ্গে ভারতে প্রচলিত যৌগিক ব্যায়াম ও জলচিকিৎসার কোনও কোনও পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। বাত, পক্ষাঘাত, স্নায়বিক ব্যাধি, অঙ্গসন্ধি ও পেশীর রোগ, চর্মরোগ, পোলিওমাইলাইটিস, আঘাতজনিত ব্যাধি, রক্তবাহের রোগ প্রভৃতির চিকিৎসায়, বেদনার উপশমে এবং অঙ্গ-বিশেষের কর্মশক্তির পুনরুদ্ধারে ফিজিওথেরাপি ব্যবহৃত হয়।

দ্র Basil Kiernander, ed., *Physical Medicine and Rehabilitation*, Oxford, 1953; Howard A. Rusk, ed., *Rehabilitation Medicine*, St. Louis, 1958.

সনৎকুমার সরকার

ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি, আমেদাবাদ পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি ভূপৃষ্ঠে পতিত নানা তড়িৎ-চুম্বকীয় ও কণাঘটিত বিকিরণ এবং তাহাদের ভূ-প্রাকৃতিক ফলাফল সম্বন্ধে বিশদ গবেষণার কার্যে নিয়োজিত আছে। পরীক্ষানির্ভর ও তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার কোনও কোনও অধ্যায়ের গবেষণার সহিতও সংস্থাটির সম্পর্ক আছে। বিগত কয়েক বৎসর মহাকাশ গবেষণায় প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

প্রতিষ্ঠানটির গবেষণাধীন বিষয়গুলিকে স্থূলতঃ এইভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায়: ১. মহাজাগতিক রশ্মি, সৌর-পার্থিব সম্পর্ক ও নাক্ষত্র পদার্থবিদ্যা (আস্‌ট্রো-ফিজিক্‌স) ২. আকাশবিদ্যা (এয়ারোনমি) ও ভূ-চৌম্বকবিদ্যা—বায়বীয় ওজোন, আকাশদীপ্তি (এয়ারগ্লো), মধ্যমণ্ডল (মেসোস্ফিয়ার), আয়নমণ্ডল (আয়নো-স্ফিয়ার) ও চৌম্বকমণ্ডল (ম্যাগ্‌নেটোস্ফিয়ার) ৩. তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা (মৌলিক কণা, কেন্দ্রকবিদ্যা ও প্লাজ্‌মা ফিজিক্‌স) ৪. মহাকাশ গবেষণা (থুম্বা নিরক্ষীয় রকেট-উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র হইতে উৎক্ষিপ্ত রকেটবাহিত যন্ত্রাদির সাহায্যে পরিচালিত) ৫. বেতার ও এক্‌স্‌-রে নির্ভর জ্যোতির্বিদ্যা।

আয়নমণ্ডলীয় পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে আয়নমণ্ডলের গতিবিদ্যা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

ওজোনের উর্ধ্বাধ-বিস্তার সম্বন্ধে ২০ বৎসর ধরিয়া নিয়মিত পরিমাপের ফলে প্রাসঙ্গিক অক্ষাংশগুলিতে স্তরমণ্ডলীয় (স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার) সংবহন বিষয়ে উপলব্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহাজাগতিক রশ্মির কাল-নির্ভর মাত্রাবৈচিত্র্য বিচারের দ্বারা মহাজাগতিক রশ্মি গবেষণা-গোষ্ঠী আন্তর্গ্রহ আকাশের তড়িৎ-চৌম্বক অবস্থা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

থুম্বা নিরক্ষীয় রকেট-উৎক্ষেপণ-কেন্দ্রে নানাপ্রকার রকেটবাহিত যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত ও আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রশমিত (নিউট্রাল) বায়ুমণ্ডলের গতিবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণার্থে বাষ্পীয় মেঘ উৎক্ষেপক (ভেপার ক্লাউড ইজেক্টর), আয়নমণ্ডলের বিশদ চিত্র ও সংযুতি (কম্পোজিশন) নির্ণয়ার্থে বিশেষ প্রকার বর্ণালীমাপক (আয়ন-মাস-স্পেক্ট্রোমিটার) প্রভৃতি এরূপ রকেটবাহিত যন্ত্রাদির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

গবেষণাগারের বর্তমান বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। প্রতিবৎসর প্রতিষ্ঠানটির সহিত যুক্ত বিজ্ঞানীদের দ্বারা রচিত গড়ে প্রায় ৫০টি বৈজ্ঞানিক গবেষণাপ্রবন্ধ ভারতীয় ও বৈদেশিক গবেষণাপত্রিকা-গুলিতে প্রকাশিত হয়।

পিশারথ রাম পিশারতি

ফিনিসীয় সভ্যতা প্রাচীন যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধ ফিনিসীয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে সিরিয়ার উপকূলে ও লেবানন পর্বতের পশ্চিমে প্রায় ৩২০ কিলোমিটার (২০০ মাইল) দীর্ঘ ভূখণ্ড জুড়িয়া অবস্থিত ছিল। সমুদ্রোপকূলের কয়েকটি দ্বীপও এই ফিনিসীয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফিনিসীয়গণ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টজন্মের চতুঃসহস্র বর্ষ পূর্বে সিরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিলেও তাঁহারা অষ্টাদশশত খ্রীষ্টপূর্ব হইতে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ বৎসর হইতে আলেক্জাণ্ডার কর্তৃক খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩২ অব্দে টায়ার বিজয় পর্যন্ত প্রায় পঞ্চদশশত বৎসর ফিনিসীয় সভ্যতার যুগ। এই সময়ের মধ্যে ফিনিসীয়া প্রথমে মিশর-সম্রাট তৃতীয় থাড্‌মোসের (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী) অধীন হয়, পরে ব্যাবিলনীয় সম্রাট নেবুচাড্‌নেজার ফিনিসীয়া জয় করেন ; ইহার পরে ফিনিসীয়গণ পারস্যসম্রাটের অধীন হয়। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ফিনিসীয়া কয়েকবার স্বাধীন হইয়াছিল। টায়ারের রাজা হিরাম ইস্রায়েলরাজ বিখ্যাত সোলেমনকে (খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দী) সাহায্য করেন ও পারস্যসম্রাট জের্ক্সেস (Xerxes) খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে গ্রীস আক্রমণ করিলে ফিনিসীয়গণ তাঁহাকে নৌসাহায্য করেন। আলেক্জাণ্ডার টায়ার বিজয়ের পরে ফিনিসীয়গণ সেলিউকিডদের অধীন হয় ও পরে রোমান সাম্রাজ্যের সিরিয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার পর ফিনিসীয়ার ঐতিহ্য আর বিশেষ কিছু নাই।

বিব্‌লস, সিডন ও টায়ার ফিনিসীয়ার সমধিক প্রসিদ্ধ তিনটি নগরী, তন্মধ্যে বিব্‌লস সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও উত্তরে অবস্থিত, মধ্যে সিডন ও সর্বদক্ষিণে টায়ার। ফিনিসীয়গণ বাণিজ্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন ও তাঁহারা বাণিজ্য উপলক্ষে সমগ্র ভূমধ্যসাগর, ইংল্যাণ্ডের উপকূল, এমন কি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গমন করেন ও আফ্রিকা মহাদেশ জলপথে প্রদক্ষিণ করেন বলিয়া শোনা যায়। বণিক জাতির ন্যায় তাঁহারা বিস্তর উপনিবেশ স্থাপন করেন, তন্মধ্যে কার্থেজ, উটিকা, গেড্‌স ও থারসিস্ সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত সাইপ্রাস, রোড্‌স, ইজিয়ান সমুদ্রের কতিপয় দ্বীপে, সিসিলি, সার্ডিনিয়া, বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে ও স্পেনে ফিনিসীয় উপনিবেশ ছিল। ফিনিসীয়গণ স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য ও পিত্তলের কার্যে বিশেষ দক্ষ ছিল। সিডনের কাচনির্মিত দ্রব্য ও শেল-ফিস (shell-fish) হইতে প্রস্তুত একপ্রকার বেগুনী লাল রঙ (purple dye) ফিনিসীয়গণের বিশেষ পণ্য-দ্রব্য ছিল। মিশর হইতে বস্ত্র ও শস্য, আরব দেশ হইতে মশলা, ভারত হইতে কার্পাসবস্ত্র ও হস্তিদন্ত ও কর্নওয়াল হইতে টিন সংগ্রহ করিয়া ফিনিসীয়গণ বাণিজ্য করিতেন।

ফিনিসীয়ায় প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় নগর রাষ্ট্র ছিল ও তাঁহারা কখনও একটি একত্বসম্পন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করিতে সক্ষম হন নাই। প্রত্যেক শহরে একজন রাজা বা প্রধান, একটি ক্ষমতাশীল অভিজাততন্ত্র ও নির্বাচিত ম্যাজিস্ট্রেটগণ থাকিতেন। ফিনিসীয়গণ বেআলকে (Baal) ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেন ও প্রত্যেক শহরে একজন বেআল থাকিতেন। ফিনিসীয় ভাষা সেমিটিক ভাষাবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল ও হিব্রুভাষার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য ছিল। ফিনিসীয় বর্ণমালা গ্রীক বর্ণমালার জনক। গ্রীকগণ এই বর্ণমালা গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্বরবর্ণ (vowel) যোগ করেন।

দ্র *The Cambridge Ancient History*, vol. I-IV and VI, ; H. R. Hall, *The Ancient History of the Near East*, London, 1927 ; J. H. Breasted, *Ancient Times*, Boston, 1961.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

ফিরদৌসি (৯৩২ ? -১০২০ খ্রী) পূর্ব পারস্যে খোরাসানের অন্তর্গত তুস শহরে ৯৩২ (?) খ্রীষ্টাব্দে জন্ম, ঐ স্থানেই ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু। ফিরদৌসির প্রকৃত নাম আবুল কাসিম মনসুর। ইসলাম-পূর্ব প্রাচীন পারস্যের পুরাণ ও ইতিহাস অবলম্বনে ফারসী ভাষায় রচিত, ষাট হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ 'শাহ্‌নামা' (রাজ-কথা) ফিরদৌসির অবিনশ্বর কীর্তি। ধর্মে মুসলমান হইলেও, ফিরদৌসির শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল প্রধানতঃ ইসলাম-পূর্ব পারস্যের প্রাচীন সংস্কৃতি ও কীর্তির প্রতি। 'শাহ্‌নামা' পারস্যের শ্রেষ্ঠ জাতীয় মহাকাব্য; ইহা যুগপৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইরানের একপ্রকার পুরাণগ্রন্থও বটে। মহাবীর রুস্তম সম্বন্ধে উপাখ্যানগুলি এই মহাকাব্যের মধ্যমণি। ইরান ও তুরান অর্থাৎ পারস্যের আর্য ও মধ্য এশিয়ার তুর্ক এই দুই জাতির মধ্যে বিরোধ হইতেছে রুস্তম প্রমুখ ইরানীয় বীরগণের পটভূমিকা। ফিরদৌসি 'শাহ্‌নামা' ব্যতীত ক্ষুদ্র কাব্য ও কবিতাও লিখিয়াছেন। পারস্যের প্রাচীন ধর্মের অনুবর্তী জরথুশ্‌ত্রীয়দের নিকটও ফিরদৌসি বিশেষ সম্মানের পাত্র। তাঁহার ভাষায় আরবী শব্দের সংখ্যা খুব কম। এই ভাষার প্রভাবে ফারসী ভাষা তাহার মূল আর্য প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে। ইওরোপের বিভিন্ন ভাষাতে শাহ্‌নামার অনুবাদ হইয়াছে। ভারতীয় ভাষাতেও ইহার উপাখ্যান প্রচারিত হইয়াছে।

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

ফিরোজ শাহ্‌ তোগলক তোগলক দ্র

ফিশার, লুই (১৮৯৬-১৯৭০ খ্রী) মার্কিন সাংবাদিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেল্‌ফিয়া-স্থিত শিক্ষাবিজ্ঞান বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর ফিশার শিক্ষকতাকার্যে যোগদান করেন। অত্যল্পকাল পরেই ইহুদী জাগরণে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ব্রিটিশ উদ্যোগে গঠিত ইহুদী বাহিনীতে যোগ দিয়া তুরস্কের গ্রাস হইতে প্যালেস্টাইন উদ্ধারের কার্যে অংশগ্রহণ করেন (১৯১৭ খ্রী)। অতঃপর 'নিউইয়র্ক ইভ্‌নিং পোস্ট' পত্রিকার সংবাদদাতারূপে তিনি বের্লিনে যান (১৯২১ খ্রী)। পরবৎসর স্বাধীন (ফ্রি-ল্যান্স) সাংবাদিক হিসাবে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়া প্রায় সার্ধ একদশক কাল সেদেশে যাপন করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে গৃহযুদ্ধের সময়ে সংবাদদাতা হিসাবে ফিশার স্পেনে যান। সে সময়ে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে স্পেনীয়দের সাহায্যার্থে গঠিত আন্তর্জাতিক বাহিনীতেও তিনি যোগ দিয়াছিলেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসিয়া তিনি কিছুকাল এদেশে যাপন করেন; তন্মধ্যে ১৯৪৪ ও ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফিশার গান্ধীজীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে গান্ধী-জীবনী রচনার জন্য তিনি ওয়াটুমল পুরস্কার লাভ করেন। লেনিন-জীবনী রচনার জন্য স্বদেশে তাঁহাকে জাতীয় গ্রন্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব জার্মানীতে বিক্ষোভের সংবাদ পাইয়া ফিশার তৎসম্বন্ধে সংবাদসংগ্রহের জন্য বের্লিনে গমন করেন। এতদ্ব্যতীত বহু বৎসর এবং বহুবার তিনি ইওরোপ ও এশিয়ার নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

প্রথম জীবনে রুশবিপ্লব সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ ছিল; পরে তাঁহার মতামতের পরিবর্তন লক্ষিত হয়। লেনিনের মৃত্যু ও স্তালিনের ক্ষমতালাভ সম্বন্ধে রাশিয়া হইতে তাঁহার প্রেরিত সংবাদ বিস্ময়কর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এবং সমকালীন রাজনীতির নানাদিক সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার প্রায় ২০টি গ্রন্থমধ্যে কয়েকটির নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদত্ত হইল: The Soviets in World Affairs (২ খণ্ড, ১৯৩০ খ্রী), A Week with Gandhi (১৯৪৩ খ্রী), The Great Challenge (১৯৪ খ্রী), Gandhi and Stalin (১৯৪৭ খ্রী), The Life of Mahatma Gandhi (১৯৫১ খ্রী), Russia Revisited (১৯৫৭ খ্রী), The Life of Lenin (১৯৬৪ খ্রী), Russia's Road From Peace to War (১৯৬৯ খ্রী) ইত্যাদি।

ফুটবল বলখেলা দ্র

ফুরিয়ার (১৭৬৮-১৮৩০ খ্রী) 'ফুরিয়ার শ্রেণী'র আবিষ্কর্তা জোসেফ ফুরিয়ারের জন্ম মধ্য ফ্রান্সের অরে (Auxerre) প্রদেশে এক দর্জির ঘরে। ৮ বৎসর বয়সে তিনি মাতৃপিতৃহীন হন এবং প্রতিবেশীদের দয়ায় তিনি শিক্ষালাভ করেন। কঠিন বস্তুর মধ্য দিয়া তাপের বিস্তৃতি বিষয়ক গবেষণা তাঁহার অমর কীর্তি। তাঁহার 'Theorie *Analytique de la Chaleur*' (১৮২২ খ্রী) জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ। সমীকরণের বাস্তব বীজের সংখ্যা-নির্ণয় সংক্রান্ত 'ফুরিয়ার বুডান প্রতিজ্ঞা' তাঁহার '*Analyse des Equationes Determines*' (১৮৩১ খ্রী) গ্রন্থের অন্তর্গত।

দ্র F. Cajori, *A History of Mathematics*, London, 1919.

নলিনীকান্ত চক্রবর্তী

ফুল রূপান্তরিত শাখা। ফুল হইতে উৎপন্ন ফল ও উহার আভ্যন্তরীণ বীজ উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ও বিস্তারে সহায়তা করে। ফুল কতকগুলি পুষ্পপত্রের (ফ্লোরাল লীভ্‌স) সমন্বয়। সাধারণ ফুলে চারিটি চক্রে পুষ্পপত্রগুলি পুষ্পাধর (থ্যালামাস) নামক ক্ষুদ্র দণ্ডের উপর সজ্জিত থাকে। প্রথম চক্রটিকে বৃতি (ক্যালিক্স) এবং ইহার অংশগুলিকে বৃত্যংশ (সেপাল) বলা হয়। দ্বিতীয় চক্র দলমণ্ডল (করোলা) কতকগুলি দল বা পাপড়ির সমষ্টি। বিভিন্ন সংখ্যক পুংকেশর (স্ট্যামেন) লইয়া তৃতীয় বা পুংকেশর চক্র (অ্যান্‌ড্রীসিয়াম)। চতুর্থ চক্র স্ত্রীস্তবক (গাইনীসিয়াম) এক বা একাধিক গর্ভপত্র (কার্পেল) দ্বারা গঠিত। জবা, ধুতুরা, গোলাপ প্রভৃতি উদ্ভিদে একই ফুলে স্ত্রীস্তবক ও পুংকেশর চক্র থাকে ; ইহাদের উভলিঙ্গ ফুল বলা হয়। কিন্তু লাউ, কুমড়া প্রভৃতি উদ্ভিদে স্ত্রীস্তবক ও পুংকেশর চক্র ভিন্ন ভিন্ন ফুলে হইয়া থাকে ; ইহাদের একলিঙ্গ ফুল বলা হয়। একলিঙ্গ ফুল স্ত্রী অথবা পুং -পুষ্প হইয়া থাকে।

কতকগুলি সবুজ যুক্ত ও মুক্ত বৃত্যংশ মুকুলের বিভিন্ন অংশগুলিকে আবৃত ও রক্ষা করিয়া থাকে। ফুল ফুটিবার পর পুষ্পের বিভিন্ন অংশের সহিত ইহারা ঝরিয়া পড়ে। বেগুন, চালতা প্রভৃতির বৃত্যংশ ফলের সহিত যুক্ত অবস্থায় বর্ধিত হইয়া থাকে।

দল বা পাপড়ির বর্ণ, আকৃতি ও গন্ধ মনোহর হইতে পারে। ফুলের লাল, নীল বা বেগুনী রং অ্যান্থোসিয়ানিন নামক রঙ্গক দ্রব্যের (পিগ্‌মেণ্ট) জন্য। এই রঙ্গক দ্রব্যটি অম্লরসে লাল ও ক্ষাররসে নীল হইয়া থাকে। হলুদ ও কমলা রং অ্যান্‌থোজ্যান্থিন নামক রঙ্গক দ্রব্যের জন্য হইয়া থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল-এর জন্যও হলুদ রং হইয়া থাকে।

ফুলে বৃত্যংশ বা দল কিছুই না থাকিলে তাহাকে অকুঞ্চক ফুল বলে। কৃষ্ণকলি প্রভৃতি ফুলে শুধু পাপড়ি থাকে ; ইহাদের এককুঞ্চক ফুল বলা হয়। সাধারণ ফুলে বৃত্যংশ ও দল উভয়ই থাকে বলিয়া ইহাদের দ্বিকুঞ্চক ফুল বলে। রজনীগন্ধা, চাঁপা প্রভৃতি ফুলে বৃত্যংশ ও দলকে পৃথক করা যায় না ; ইহাদের পুষ্পপুট (পেরিয়ান্থ) বলা হয়।

জবা, ধুতুরা, গোলাপ প্রভৃতি ফুলকে কাটিয়া দুইটির অধিক সমান অংশে ভাগ করা যায় ; এরূপ ফুলকে বহুপ্রতিসম (অ্যাকটিনোমর্ফিক) বলা হয়। মটর, বক, তুলসী প্রভৃতি ফুলের দলমণ্ডলকে মাত্র দুইটি সমান অংশে ভাগ করা যায় ; ইহাদের একপ্রতিসম (জাইগোমর্ফিক) বলা হয়। বহুপ্রতিসম ফুলের দলগুলি সমান হয় বলিয়া এইসকল ফুলকে সমাঙ্গ এবং একপ্রতিসম ফুলকে অসমাঙ্গ বলা হয়। ঝুমকালতা, করবী প্রভৃতি ফুলের দলমণ্ডলে মুকুট (করোনা) নামক একপ্রকার সুন্দর অংশ থাকে।

দলমণ্ডলের আকৃতি ও গঠন নানারূপ হইয়া থাকে। সরিষা, মূলা প্রভৃতির ফুলে ৪টি মুক্ত পাপড়ি ক্রুসের ন্যায় থাকে বলিয়া ইহাদের ক্রুসাকার বলা হয়। মটর, বক প্রভৃতির ফুলে ৫টি অসমান মুক্ত দল প্রজাপতির ন্যায় দেখিতে বলিয়া ইহাদের প্রজাপতিসম (প্যাপিলিওনেসিয়াস) বলা হয়। টেঁপারি, কুমড়া প্রভৃতির যুক্ত দলগুলি একটি ঘণ্টার আকার ধারণ করে ; ইহাদের ঘণ্টাকৃতি (ক্যাম্‌পানিউলেট) বলা হয়। সূর্যমুখীর মঞ্জরীর ভিতরের ফুলগুলির পাপড়ি যুক্ত হইয়া নলের আকার ধারণ করে। ধুতুরার ৫টি দল যুক্ত হইয়া ফানেলের আকার ধারণ করে ; ইহাকে ফানেল-আকৃতি (ইন্‌ফান্‌ডিবিউলিফর্ম) বলা হয়। শিউলি, যুঁই প্রভৃতি ফুলের পাপড়ির তলদেশ যুক্ত হইয়া নলের আকার ধারণ করে এবং ফুলটিকে চক্রের ন্যায় দেখিতে হয় বলিয়া ইহাদের চক্রাকার (রোটেট) বলা হয়। তুলসী, বাসক প্রভৃতি ফুলে দলগুলি যুক্ত হইয়া দুইটি ঠোঁটের ন্যায় দেখিতে হয় ; ইহাদের ওষ্ঠাকৃতি (বাইলেবিয়েট) বলা হয়। স্ন্যাপ্‌ড্রাগনের ঠোঁট দুইটি বন্ধ বলিয়া তাহাকে উপমুখ (পার্‌সোনেট) বলা হয়।

প্রত্যেক পুংকেশরে সূত্র (ফিলামেণ্ট) নামক একটি সরু, সূক্ষ্ম দণ্ডের উপর পরাগধানী (অ্যান্থার) থাকে। পরাগধানীর ভিতর ৪টি কক্ষে পরাগরেণু উৎপন্ন হয়। পুংকেশরের সংখ্যা এক বা একাধিক হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ মুক্ত ; কখনও কখনও যুক্ত হইয়া একগুচ্ছ (যথা—জবা প্রভৃতি ফুলে), দ্বিগুচ্ছ (যথা—মটর প্রভৃতি ফুলে) বা বহুগুচ্ছ (যথা—শিমুল প্রভৃতি ফুলে)। যে সকল ফুলে দলগুলি যুক্ত তাহাদের পুংকেশরগুলি দলমণ্ডলের সহিত সংলগ্ন থাকে। সাধারণ ফুলে পুংকেশরগুলির দৈর্ঘ্য সমান। কিন্তু তুলসীতে ৪টি পুংকেশরের মধ্যে ২টি ছোট এবং ২টি বড় ; ইহাকে দীর্ঘদ্বয়ী বলা হয়। সরিষা, মূলা প্রভৃতি ফুলে ৬টি পুংকেশরের মধ্যে ৪টি বড় ; ইহাদের দীর্ঘচতুষ্টয়ী বলা হয়। পরাগরেণুর রং শাদা বা হলুদ হইয়া থাকে। প্রত্যেক পরাগরেণু ২টি ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে ; ভিতরের নরম আবরণটিকে অন্তস্ত্বক এবং বাহিরের আবরণটিকে বহিস্ত্বক বলা হয়।

গর্ভপত্রের তিনটি অংশ: ডিম্বাশয় (ওভারি), গর্ভদণ্ড (স্টাইল) ও গর্ভমুণ্ড (স্টিগ্‌মা)। গর্ভপত্রের যে গোলাকার অংশটির মধ্যে ডিম্বক উৎপন্ন হয়, তাহাকে ডিম্বাশয় (ওভারি) বলা হয়। নিষিক্তকরণের জন্য ডিম্বাশয়টি বর্ধিত হইয়া ফলে পরিণত হয় এবং ডিম্বকগুলি বীজে রূপান্তরিত হয়। ডিম্বাশয়ের উপরে সরু অংশটিকে গর্ভদণ্ড বলা হয়। গর্ভদণ্ডের উপরে পরাগরেণু গ্রহণের জন্য গর্ভমুণ্ড নামক অংশটি থাকে। গর্ভপত্রের সংখ্যা বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। ছোলা, মটর প্রভৃতি ফুলে একটি গর্ভপত্র থাকে; ইহাদের একগর্ভপত্রী বলা হয়। জবা, গোলাপ প্রভৃতি ফুলে অনেকগুলি গর্ভপত্র থাকে বলিয়া ইহাদের বহুগর্ভপত্রী বলা হয়। চাঁপা, কাঁঠালিচাঁপা, পদ্ম প্রভৃতি ফুলে গর্ভপত্রগুলি মুক্ত থাকে বলিয়া একই ফুল হইতে অনেকগুলি ফল উৎপন্ন হয়। জবা, কুমড়া প্রভৃতি অধিকাংশ ফুলে গর্ভপত্রগুলি যুক্ত থাকে। ডিম্বকগুলি অমরা (প্ল্যাসেন্টা) নামক অংশের সহিত যুক্ত থাকে। অনেক পুষ্পের বৃন্তের তলদেশে সবুজ বা রঙিন মঞ্জরীপত্র (ব্র্যাক্‌ট) থাকে। রজনীগন্ধা, বাসক প্রভৃতি ফুলের মঞ্জরীপত্র সবুজ এবং ছোট; লালপাতা, কলা, বাগানবিলাস প্রভৃতির মঞ্জরীপত্র অপেক্ষাকৃত বড় ও সুন্দর। বাগানবিলাসের ফুলগুলি ছোট, কিন্তু রঙিন মঞ্জরীপত্রগুলিকে পুষ্পের ন্যায় দেখায়।

ফুলের বর্ণ বা গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অথবা মধু এবং পরাগরেণুর লোভে মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি কীটপতঙ্গ এক ফুল হইতে অন্য ফুলে যাইবার সময়ে পরাগযোগ ঘটায়। 'পরাগযোগ' দ্র।

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

ফুলখেলা গাজন উৎসবের একটি অন্যতম আনুষ্ঠানিক রীতি। ফুলখেলায় ঢাকের বাজনার সহিত নৃত্যের তালে তালে জলন্ত অঙ্গার এক হাত হইতে অপর হাতের তালুতে নিক্ষেপ ও স্থাপন করিতে করিতে ভক্তগণ মন্দির বা গ্রামথান প্রদক্ষিণ করেন। ফলে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয় বলিয়া ইহাকে ফুলখেলা বলা হয়। গাজনের আত্মনিপীড়ন ও নিগ্রহমূলক কঠোর নিয়ম-আচারের মধ্যে ফুলখেলা এক বিশেষ কৃচ্ছ্রসাধন প্রথা।

দ্র আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকশ্রুতি, কলিকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

ফুসফুস বক্ষঃপিঞ্জর ও মধ্যচ্ছদা (ডায়াফ্রাম) দ্বারা পরিবেষ্টিত বক্ষঃগহ্বরের (থোরাক্স) ভিতর হৃৎপিণ্ডের দুইদিকে দুইটি ফুসফুস অবস্থিত। ইহারা আবার ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত। সমস্ত ফুসফুস একটি ভাঁজ-করা পর্দার দ্বারা বক্ষঃপিঞ্জরের সহিত যুক্ত। ইহার ফলে সকল স্বাভাবিক অবস্থায় ফুসফুস বক্ষঃপিঞ্জরের সহিত আটকাইয়া থাকে এবং বক্ষঃপিঞ্জর ও মধ্যচ্ছদার সংকোচন-প্রসারণের ফলে নাসারন্ধ্র, শ্বাসনালী (ট্র্যাকিয়া) ও ক্লোমশাখার (ব্রংকাস) পথে ফুসফুসে বায়ু যাতায়াত করে। ইহাকেই শ্বসনক্রিয়া বলে।

নাসারন্ধ্র, গলবিল (ফ্যারিংক্স) ও স্বরযন্ত্রের (ল্যারিংক্স) শেষে শ্বাসনালী দুইটি ক্লোমশাখায় বিভক্ত হয়। প্রত্যেক ক্লোমশাখা নানা প্রশাখা ও ক্ষুদ্রতর প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ক্রমে অনেকগুলি বায়ুস্থলীর (অ্যাল্‌ভিওলাস) সহিত যুক্ত হয়। বায়ুস্থলীর গাত্র একটি পাতলা কোষের স্তরে গঠিত। প্রতিটি বায়ুস্থলী কৈশিক-জালের (ক্যাপিলারি-নেটওয়ার্ক) দ্বারা পরিবেষ্টিত। রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ নিলয় হইতে বাম অলিন্দে চালিত হইবার পথে এই কৈশিক-জালের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং এসময়ে রক্ত বায়ুস্থলী হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া ও বায়ুস্থলীতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিষ্কাশন করিয়া পরিশোধিত হয়। শ্বসনক্রিয়ার ফলে বায়ুস্থলী পুনরায় বাহিরের নির্মল বাতাসে অনেকটা পরিশোধিত হইয়া যায়।

সুখময় লাহিড়ী

ফেডারেশন হল বর্তমানে 'মিলন মন্দির' নামে আখ্যাত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনকালে ইহার উদ্ভব। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ বঙ্গ-মনীষীদের সহযোগিতায় আনন্দমোহন বসু বঙ্গভঙ্গের দিন কলিকাতায় (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে) বঙ্গভাষী জনগণের ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ ফেডারেশন হলের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন।

ফেডারেশন হল নির্মাণ সম্পন্ন করিবার জন্য ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি হলের ভূখণ্ডটি ক্রয় করেন। পরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। ইহার সভাপতি হন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক হন নিবারণচন্দ্র রায় ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ১. বঙ্গভাষী

জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা; ২. বিখ্যাত ব্যক্তিদের পূর্ণাবয়ব মূর্তি ও চিত্রাদি স্থাপন; ৩. রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান ও শাসনকার্য সংক্রান্ত পুস্তকের একটি গ্রন্থাগার গঠন।

স্বাধীনতালাভের পর হলটি নির্মিত হইয়াছে।

দ্র Surendranath Banerjea, *A Nation in Making*, Calcutta, 1925; J. C. Bagal, History of the Indian Association, Calcutta, 1953.

যোগেশচন্দ্র বাগল

ফের্‌মা, পিয়ের দ্য (১৬০১-৬৫ খ্রী) ফরাসী গণিতবিদ্। ইনি ছিলেন আইনব্যবসায়ী; গণিত লইয়া অবসরবিনোদন করিতেন। ইনি অতি উচ্চ শ্রেণীর পাটীগণিতবিদ্ ছিলেন। সংখ্যাতত্ত্বে ইহার প্রতিভা বিশেষভাবে বিকাশ পাইয়াছিল। 'শেষ উপপাদ্য' (লাস্ট থিওরেম) বলিয়া অভিহিত ফের্‌মার নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞাটি প্রসিদ্ধ:

x, y, z এবং n প্রত্যেকে পূর্ণসংখ্যা হইলে

$$x^n + y^n = z^n \qquad xyz = 0$$

$n > 2$ অখণ্ড সংখ্যা লইয়া অসম্ভব। এই প্রতিজ্ঞা আদর্শ সংখ্যার তত্ত্বনিরূপণে প্রেরণা জোগাইয়াছে। ফের্‌মা প্রমাণ করিয়াছেন, যে কোনও পূর্ণ সংখ্যাকে 0 (শূন্য) সহ অপর চারিটি পূর্ণ সংখ্যার বর্গের সমষ্টিরূপে ব্যক্ত করা যায়।

ফের্‌মাকে কলনশাস্ত্রেরও আবিষ্কারক বলা যায়। নিউটন তাঁহার কলনশাস্ত্রের চিন্তাধারা কোথা হইতে পান জিজ্ঞাসিত হইলে বলিয়াছিলেন—'ফের্‌মার নিকট হইতে'। ফের্‌মার স্পর্শক অঙ্কনের রীতি তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। দেকার্তের পূর্বে ফের্‌মা স্থানাঙ্ক জ্যামিতির আবিষ্কারেও তাঁহার চিন্তাধারা নিয়োগ করিয়াছিলেন।

কামিনীকুমার দে

ফের্‌মি, এন্‌রিকো (১৯০১-৫৪ খ্রী) বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর ইটালীর রোম শহরে। পিসা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট লাভের পরে তিনি ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৪-২৮ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষকতা করেন। ফের্‌মি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন ১৯২৭ হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ফের্‌মি ও তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ মৃদুগতি নিউট্রনের সাহায্যে সাধারণ পদার্থকে আঘাত করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে পরমাণুকেন্দ্রক কর্তৃক নিউট্রন শোষণের ফলে প্রায় প্রতি পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রকই তেজস্ক্রিয় সমঘরে (আইসোটোপ) রূপান্তরিত হয়। একাজে দ্রুতগতি নিউট্রন অপেক্ষা ধীরগতি নিউট্রনই অধিকতর উপযোগী। এইভাবে ফের্‌মি ও তাঁহার সহকর্মীবৃন্দের কার্যের ফলে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি ও তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে বহুবিধ জ্ঞানলাভ করা যায়। এজন্য ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফের্‌মিকে নোবেল পুরস্কার অর্পণ করা হয়।

মুসোলিনীর সময়ের ফাসিস্ত অত্যাচারের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে ফের্‌মি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া যান ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকপদে বৃত হন। পরবর্তীকালে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ও লস আলামস গবেষণাগারে পরমাণুকেন্দ্রক সংক্রান্ত গবেষণার কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

ফের্‌মির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান প্রথম পারমাণবিক চুল্লি (নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর) নির্মাণ। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২ ডিসেম্বর প্রথম রি-অ্যাক্টর চালু করা হয়। বস্তুতঃ ফের্‌মি-নির্মিত পরমাণুচুল্লিই মানুষের নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডারকে উন্মোচিত করিয়াছে।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ নভেম্বর ফের্‌মি পরলোকগমন করেন।

দ্র Laura Fermi, *Atoms in the Family—My Life with Enrico Fermi*, London, 1955.

বিমলেন্দু মিত্র

ফেরিস্তা, মহম্মদ কাশিম (১৫৭০-১৬১২ খ্রী) কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে অস্ত্রাবাদে প্রায় ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বার বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার পিতা গোলাম আলীর সহিত আহ্‌মদনগরে আসেন এবং ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজাপুরের সুলতান ২য় ইব্রাহিম আদিল শাহের অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বিখ্যাত ইতিহাস তারিখ্-ই-ফেরিস্তা বা গুল্‌সান্-ই-ইব্রাহিমি ফারসী ভাষায় রচনা করেন। গজনি, দিল্লী, দাক্ষিণাত্য, গুজরাত, মালব, খান্দেশ, মুলতান, সিন্ধু, কাশ্মীর, বাংলা, বিহার এবং মালাবার প্রভৃতি স্থানের মধ্যযুগীয় শাসকগণের বহু মূল্যবান বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থে

পাওয়া যায়। ভারতের জলবায়ু, ভূগোল এবং অনেক সাধুসন্তের বর্ণনাও ইহাতে আছে। সুলতানী আমলের ভারতীয় ইতিহাসরচনায় পরবর্তী ঐতিহাসিকগণকে এই গ্রন্থের উপরে অনেক বিষয়ে নির্ভর করিতে হয়। তবে পরবর্তী গবেষণার ফলে ইহার প্রামাণিকতা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র J. Briggs, *History of the Rise of the Mahomedan Power in India*, London, 1829.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

ফৈয়াজ খাঁ (১৮৮৬-১৯৫০ খ্রী) সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। আগ্রার নিকটবর্তী সিকান্দ্রায় তাঁহার জন্ম, পিতা সব্দর খাঁ, মাতামহ আগ্রার রঙ্গিলা ঘরানার ওস্তাদ গোলাম আব্বাস। মাতামহের নিকটেই এবং কিছুটা মথুরার গণেশীলাল চৌবের নিকটে তিনি সংগীত-শিক্ষা পাইয়াছিলেন। গম্ভীর, ওজস্বী ও জোয়ারিদার কণ্ঠের গায়করূপে ফৈয়াজ খাঁ নিজস্ব গীতশৈলী প্রকটিত করিয়া ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার তানকর্তব্, বিশেষ বোল্তান স্বকীয় ঐশ্বর্যে ভাস্বর। আসরে তিনি সাধারণতঃ খেয়াল অঙ্গের সংগীত পরিবেশন করিলেও ধ্রুপদ, ধামার ও হোরি গানেও পারদর্শী ছিলেন। মহীশূরের মহারাজার প্রদত্ত 'আফ্তাব্-এ-মৌসিকি' (সংগীতের সূর্য) উপাধিতে ভূষিত ফৈয়াজ খাঁ দীর্ঘকাল বরোদার রাজসভায় দরবারী গায়ক ছিলেন। তাঁহার অনেক গান রেকর্ড করা রহিয়াছে। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে আত্তা হুসেন, সরাফৎ হুসেন, আসমৎ হুসেন, শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য।

দ্র অমিয়নাথ সান্যাল, স্মৃতির অতলে, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ফোটোগ্রাফি আলোকচিত্রণ দ্র

ফোড়া শরীরের বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যে আবদ্ধ পুঁজের উৎপাদনকে ফোড়া বলা হয়। বাহ্য পারিপার্শ্বিক বা জীবাণুদুষ্ট রক্তধারা হইতে পুঁজ-উৎপাদক জীবাণু দেহের টিস্যুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফোড়ার সৃষ্টি করে। স্ট্রেপ্টোকক্কাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, নিউমোকক্কাস, গনোকক্কাস, টিউবার্কুল ব্যাসিলাস প্রভৃতি জীবাণু এবং বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক -সংক্রমণ হইতে ফোড়া হয়। গুরুত্ব অনুসারে ফোড়া সাধারণতঃ দুইপ্রকার: ১. তীব্র ফোড়া ২. দীর্ঘস্থায়ী ফোড়া। যক্ষ্মার জীবাণুর দ্বারা সৃষ্ট ফোড়া সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী হয়। ফোড়ার চিকিৎসায় সাধারণতঃ 'সাল্ফা'-বর্গীয় ঔষধ এবং অ্যান্টিবায়োটিক্স ব্যবহৃত হয়। অনেক সময়ে অস্ত্রোপচারের দ্বারা ফোড়ার অভ্যন্তরস্থ পুঁজ বাহির করিয়া দিলেও সত্বর রোগনিরাময় ঘটে।

অশোক বাগচী

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লি ও তাঁহার কাউন্সিলের প্রস্তাব (৯ জুলাই ১৮০০ খ্রী) অনুসারে কলিকাতায় কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়াম স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অল্পশিক্ষিত অল্পবয়সী নবাগত ইংরেজ কর্মচারীদের এদেশের আইনকানুন, আচারবিচার ও ভাষা শিক্ষা দেওয়া এবং দেশে যাহাদের শিক্ষা নিম্নমানের ছিল তাহাদের কিছু গ্রীক, লাতিন ও ইংরেজী সাহিত্যের এবং বিবিধ বিজ্ঞান-শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবার বৎসরাধিক কাল পূর্বে লর্ড ওয়েলেস্লির গভর্নমেণ্ট ঠিক করিয়াছিলেন যে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারির পর কতকগুলি নির্দিষ্ট পদে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রার্থীদের একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। তাহাদিগকে প্রচলিত আইনকানুন জানিতে হইবে এবং দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ হইতে হইবে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কার্যের আরম্ভ হইয়াছিল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ আগস্ট। সেদিন ঠিক হয়, যতশীঘ্র সম্ভব এইসব বিষয়ে অধ্যাপক ও শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া নিয়মিত শিক্ষা দিতে হইবে: ১. আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ উর্দু), বাংলা, তেলিঙ্গা (অর্থাৎ তেলুগু), মারাঠা, তামুল (অর্থাৎ তামিল) ও কনড়া (অর্থাৎ কানাড়ী) ভাষা; ২. মুসলমান-আইন; ৩. হিন্দু আইন; ৪. নীতিবিদ্যা (এথিক্স), বিচারনীতি (সিভিল জুরিস্প্রুডেন্স) এবং নানা দেশের আইনপদ্ধতি (ল অফ দ্য নেশন্স); ৫. ইংরেজের আইন; ৬. গভর্নর জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের বিধিবদ্ধ আইনকানুন (রেগুলেশন্স অ্যাণ্ড লজ); ৭. উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস ও প্রত্নবস্তু; ৮. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান; ৯. উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন ও জ্যোতিষ। কলেজের প্রধান বা পরিচালক (প্রোভস্ট) হইলেন পাদরি ডেভিড ব্রাউন, তাঁহার সহকারী হইলেন সি. বুকানন। ২৪ নভেম্বর হইতে অধ্যাপনা শুরু হইল, প্রথমে তিনটি বিষয়ে—আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী (উর্দু)।

কলেজে ছাত্ররা ছিল আবাসিক। বৎসরে দুইবার পরীক্ষা। পরীক্ষায় ভালো করিলে প্রকাশ্য সভায় পুরস্কার দেওয়া হইত। নির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ ও বিচার-বিতর্ক রচনা করিতে হইত। ভালো রচনা হইলে প্রকাশ্য সভায় পঠিত ও মুদ্রিত হইত।

আটজন অধ্যাপক লইয়া কলেজে পড়ানো শুরু হয়:

অধ্যাপক	বিষয়
জি. এইচ. বার্লো	গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের বিধিবদ্ধ আইন।
এইচ. টি. কোল্‌ব্রুক	হিন্দু-আইন ও সংস্কৃত।
জে. গিল্‌ক্রাইস্ট	হিন্দুস্থানী (উর্দূ)।
ডব্‌লিউ. কার্কপ্যাট্রিক	ফারসী।
এন. বি. এড্‌মনস্টোন	ফারসী।
এফ্. গ্ল্যাড্‌উইন	ফারসী।
জে. বেলী	আরবী, ফারসী ও মুসলমান-আইন।
সি. বুকানন	গ্রীক, লাটিন ও ইংরেজী সাহিত্য।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলাবিভাগ খোলা হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে এই শিক্ষকবর্গ লইয়া:

শিক্ষক	বেতন
উইলিয়াম কেরী	৫০০৲
প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	২০০৲
দ্বিতীয় পণ্ডিত রামনাথ বাচস্পতি	১০০৲

৬ জন সহকারী পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন রামরাম বসু, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বাংলাবিভাগের শিক্ষকের সংখ্যা সবশুদ্ধ ছিল ১৫ জন। কেরী ও তাঁহার সহকারীদের প্রযত্নে বাংলাবিভাগ দিন দিন বাড়িতে থাকে। বাংলা গদ্যের প্রথম গ্রন্থগুলির রচনা ও প্রকাশ এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত (আংশিক) প্রকাশদ্বারা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (এবং শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস) যে উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা সুবিদিত। কলেজের আর একটি সমধিক গুরু কাজ হিন্দুস্থানী ভাষাকে দুই ভাগ করা। আরবী-ফারসী-পূর্ণ ভাগের লিপি রহিয়া গেল ফারসী; আর যথাসম্ভব আরবী-ফারসী-নিষ্কাশিত সংস্কৃত শব্দমণ্ডিত নূতন সৃষ্ট গদ্য রীতির লিপি হইল নাগরী। নাগরীকে সংস্কৃত ভাষার লিপিরূপে প্রচলনও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কীর্তি।

১৮০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে (হার্টফোর্ডের নিকটবর্তী হেলিবেরিতে) কোম্পানির নবনিযুক্ত কর্মচারীদের শিক্ষা দিবার জন্য একটি কলেজ স্থাপিত হওয়ার ফলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কোনও কোনও বিভাগ উঠিয়া যায় এবং কোনও কোনও বিভাগে ছাঁটাই হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের আরও খর্বতা ঘটে। ফারসীর স্থান ইংরেজী ও বাংলা গ্রহণ করায় আরবী-ফারসী শিখাইবার আবশ্যকতা ঘুচিয়া যায় এবং বাংলা শিক্ষার গুরুত্ব চলিয়া যায়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এইভাবে ছাঁটাই হইতে হইতে অবশেষে বোর্ড অফ্ একজামিনার্সের মধ্যে নিলীন হইয়া যায় (জানুয়ারি, ১৮৫৪ খ্রী)।

সুকুমার সেন

ফোর্ড, হেন্‌রি (১৮৬৩-১৯৪৭ খ্রী) প্রখ্যাত শিল্পপতি। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুলাই আমেরিকার মিশিগানের অন্তর্গত ডিয়ারবার্ন-এর এক কৃষিক্ষেত্রে হেন্‌রি ফোর্ড জন্মগ্রহণ করেন। পিতা উইলিয়াম ফোর্ড, মাতা মেরি লিটিগট। বাল্যকালে পিতার সহিত ইঁহাকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত হইতে হয়। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন ১৫ বৎসর বয়সে লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া শিক্ষানবীশ হিসাবে ড্রাইডক এঞ্জিন ওয়ার্ক্‌স-এ প্রবেশ করেন। শৈশব হইতে যন্ত্রপাতি বিষয়ে গভীর অনুসন্ধিৎসাই ফোর্ডকে পরবর্তী কালের নিপুণ যন্ত্রশিল্পী ও প্রখ্যাত কর্মবীর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিচিত্র কর্ম ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়া হেন্‌রি ফোর্ড ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মোটরগাড়ি নির্মাণ করেন। ফোর্ডের তৈয়ারি গাড়িখানিই ছিল ডেট্রয়-এ প্রথম মোটরগাড়ি। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'ফোর্ড' মোটর কোম্পানি'র গোড়াপত্তন করেন। নিজ কারখানার শ্রমিকদের সহিত ফোর্ড এক নূতন ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত। ইহার পর হইতে বিভিন্ন পরিকল্পনা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সাধু ব্যবসায়ীর মনোভঙ্গী লইয়া হেন্‌রি ফোর্ড তাঁহার মোটরশিল্পকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ এপ্রিল ডিয়ারবার্ন-এ তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

ফৌজদারি আইন দণ্ডবিধি দ্র

ফ্রয়েড, সিগ্‌মণ্ড (১৮৫৬-১৯৩৯ খ্রী) অস্ট্রিয়াদেশীয় মনোবিজ্ঞানী। তৎকালে অস্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত মোরাভিয়া

প্রদেশের ফ্রেইবের্গ শহরে এক ইহুদী পশমব্যবসায়ীর পুত্ররূপে তাঁহার জন্ম হয়। ইহুদীবিরোধী আবহাওয়ার চাপে শৈশবেই তাঁহার স্বজনবর্গ হ্বীন (ভিয়েনা) শহরে চলিয়া আসেন। কৃতিত্বপূর্ণ স্কুলজীবনের পর ফ্রয়েড হ্বীন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। অতঃপর নার্ভরোগ সম্বন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাঁ মার্তে শার্কো-র নিকট মনোরোগ ও সংবেশন (হিপ্‌নোটিজ্‌ম) সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ইহার পর হ্বীন-বাসী চিকিৎসক ব্রয়ের-এর সহিত ফ্রয়েড হিষ্টিরিয়া সম্পর্কে গবেষণা করিতে থাকেন এবং মনোরোগের চিকিৎসকরূপে খ্যাত হন। কিন্তু ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রয়ের ও ফ্রয়েডের মধ্যে গভীর মতভেদ হয় ও অচিরেই পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটে। ক্রমাগত গবেষণা ও মনোরোগীদের বিশ্লেষণের ফলে ফ্রয়েডের ধারণা হয় যে, শিশুর মনে যৌনবোধ ও মাতাপিতা সম্পর্কে যৌন আকর্ষণ (ঈডিপস গূঢ়ৈষা) বর্তমান। তাঁহার মতে, মনের তিনটি স্তর—সজ্ঞান, অন্তর্জ্ঞান ও নির্জ্ঞান; শিশুকাল হইতে ক্রমবিকশিত অহংবোধ বা ইগো এবং অধিশাস্তা বা সুপার-ইগোর প্রভাবে অবদমনের ফলে বহু যৌনকামনা সজ্ঞানমন ছাড়িয়া নির্জ্ঞান মনে জমা হয়। ফ্রয়েড মনে করিতেন, মনোবিকার মূলতঃ অবদমিত ও অপরিতৃপ্ত যৌনকামনা হইতেই উৎপন্ন হয়; স্বপ্নে ঐ অপরিতৃপ্ত যৌনকামনাগুলিরই স্ফুরণ ও চরিতার্থতা ঘটে। যৌনবোধই তাঁহার মতবাদের মূলসূত্র হওয়ায় বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক-সমাজ তাঁহার সমালোচনায় মুখর হইয়া ওঠেন।

সংবেশনের দ্বারা মনোবিকারের সম্পূর্ণ নিরাময় অসম্ভব বোধ করিয়া ফ্রয়েড অবাধ অনুসঙ্গ (ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন) ও মনঃসমীক্ষণ (সাইকো-অ্যানালিসিস) পদ্ধতির প্রচলন করেন। এই পদ্ধতিতে বহুদিন ধরিয়া রোগী জাগ্রত অথচ নিরুদ্বিগ্ন ও শান্ত অবস্থায় মনঃসমীক্ষকের নিকট নিজ মনোভাব অবাধে ব্যক্ত করিতে থাকে এবং তাহার নির্জ্ঞান মনে সঞ্চিত অবদমিত কামনাগুলিও ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়; এগুলির বিশ্লেষণের দ্বারা মনোবিকারের চিকিৎসা করা হয়।

ফ্রয়েড ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হ্বীন বিশ্ববিদ্যালয়ে নার্ভরোগবিদ্যার অধ্যাপকপদে আসীন ছিলেন। তাঁহার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে গ্যোটে পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি তাঁহাকে বৈদেশিক সদস্য নির্বাচিত করেন। তাঁহার প্রথম যুগের সহকর্মী ও শিষ্যদের মধ্যে আল্‌ফ্রেড অ্যাড্‌লার (১৮৭০-১৯৩৭ খ্রী), কার্ল গুস্তাভ ইয়ুংগ (১৮৭৫-১৯৬১ খ্রী) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য; অবশ্য ইঁহাদের অনেকেরই সহিত ক্রমে তাঁহার মতপার্থক্য উপস্থিত হয়।

ফ্রয়েড ছিলেন ইহুদী। যৌনবোধ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ছিল রক্ষণশীল চিন্তার পরিপন্থী। এগুলি ছিল হিটলারের চক্ষে তাঁহার অপরাধ। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসী জার্মানীতে তাঁহার গ্রন্থগুলির পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া নাৎসী-অধিকারভুক্ত হইলে দেশত্যাগ করিয়া তিনি ব্রিটেনে যান। পরবৎসর লণ্ডনে ক্যান্সার রোগে তাঁহার দেহাবসান হয়।

তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য Studien über Hysterie বা হিষ্টিরিয়াসম্পর্কে গবেষণাবলী (১৮৯৫ খ্রী), Die Traumdeutung বা স্বপ্নের ব্যাখ্যা (১৯০০ খ্রী), Über den Traum বা স্বপ্নসম্বন্ধে (১৯০১ খ্রী), Psychopathologie des Alltagslebens বা প্রাত্যহিক জীবনের মনোরোগ (১৯০৪ খ্রী), Drei Abhandlungen Zur Sexualtheorie বা যৌনবাদসম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ (১৯০৫ খ্রী), Jenseits des Lustprinzips বা সুখ-সূত্রের ঊর্ধ্বে (১৯২০ খ্রী), Das Ich und Das Es বা অহম ও অদস (১৯২৩ খ্রী), Neue Folge der Vorlesungen Zur Einführung in die Psychoanalyse বা মনঃসমীক্ষণের নবমুখবন্ধ (১৯৩৩ খ্রী), Abriss der Psychoanalyse বা মনঃসমীক্ষণের প্রস্তাবনা (১৯৪০ খ্রী) প্রভৃতি।

দ্র H. Sachs, *Freud : Master and Friend*, Cambridge, 1944; E. Jones, *Life and Works of Sigmund Freud*, vols. 1-3, New York, 1953-57.

আরতি দাশ

ফ্রাঁস, আনাতোল (১৮৪৪-১৯২৪ খ্রী) ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম Jacques Anatole Francois Thibault, বিখ্যাত ফরাসীকবি, সমালোচক ও ঔপন্যাসিক। প্যারীতে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল জন্ম। তিনি যথার্থ জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'সীলভেস্টার বোনার্ডের অপরাধ' (Le Crime de Sylvestre Bonnard) প্রকাশের পর। ইহার পর হইতেই উচ্ছ্বসিত সৃজনের পর্ব। এই পর্বে লিখিত উপন্যাসের মধ্যে ৪র্থ শতাব্দীর মিশরের পটভূমিতে রচিত

Thais (১৮৯০ খ্রী), 'রাইন পেদোক-এর পাকশালা' (Rhatisserie de la Reine Pédauque, ১৮৯৩ খ্রী) আর প্রেম ও ঈর্ষার কাহিনী 'লাল কমল' (Le Lys Rouge, ১৮৯৪ খ্রী) বিখ্যাত। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Le Temps পত্রিকার সাহিত্যসম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী আকাদেমীর সভ্যরূপে নির্বাচিত হন।

তাঁহার পরবর্তী সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রাধান্য লাভ করে। বিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস 'পেঙ্গুইন দ্বীপপুঞ্জ' (*L' Ile des Pingouins*, ১৯০৮ খ্রী) ফরাসীবিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত মহৎ উপন্যাস 'দেবতারা তৃষ্ণার্ত' (*Les Dieuse out Soif*, ১৯১২ খ্রী) এবং 'দেবদূতদের বিদ্রোহ' (*La Revolte des Anges*, ১৯১৪ খ্রী) এই পর্বের শেষের দিকে রচিত। তাঁহার হৃদয়বত্তা, প্রাণবন্ত রচনাশৈলী, উদার মানবিকতা সূক্ষ্ম রসবোধ ও খাঁটি ফরাসী মেজাজে প্রভাবিত উজ্জ্বল সাহিত্যকীর্তির জন্য তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়।

দেবব্রত রেজ।

ফ্রেজারগঞ্জ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন শাসনকর্তা সার অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের নামানুসারে মেক্লেনবার্গ দ্বীপের এই নব নামকরণ হয়। ফ্রেজারগঞ্জের আঞ্চলিক নাম নারায়ণতলা। ২৪ পরগনা জেলার, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার, কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত এই গ্রামটির দূরত্ব কলিকাতা হইতে প্রায় ১২২ কিলোমিটার (৭০ মাইল)।

প্রায় ১৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যসম্বলিত এই গ্রামটির আয়তন ৩৫ বর্গকিলোমিটার। পূর্বে সপ্তমুখী নদী, উত্তরে ও পশ্চিমে পাতিবুনিয়া খাল ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ইহাকে প্রায় একটি দ্বীপে পরিণত করিয়াছে। হুগলি নদীর মোহানায় অবস্থিত এই স্থানটি বর্তমানে ইহার সমুদ্র সৈকতের জন্য ভ্রমণকারীদিগকে আকর্ষণে সক্ষম।

এখানকার বালি ভারী। দুইটি বালিয়াড়ির অন্তর্ভুক্ত স্থানে প্রায় ২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি 'ঝিল' রহিয়াছে। সুমিষ্ট জলের এই আধারটি ছাড়াও আরও অনেক প্রাকৃতিক জলাধার এই অঞ্চলে আছে।

সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে সাধারণতঃ লবণাক্ত মৃত্তিকার নিমিত্ত কৃষিকার্য হয় না। উত্তর দিকে কৃষিক্ষেত্রে প্রধানতঃ পাটনাই ধান উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া পাট, তামাক ও শাকসব্জী উৎপাদিত হয়। আমন ধান সমগ্র কৃষিক্ষেত্রের শতকরা ৯৬ ভাগ অধিকার করে।

বনজ উদ্ভিদের মধ্যে ঝাকুল, গর্জন, বায়েন ইত্যাদি প্রধান। ফলপ্রসূ বৃক্ষাদির মধ্যে নারিকেল, পেয়ারা, তাল, আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যবিভাগ ফ্রেজারগঞ্জে একটি মৎস্যপ্রক্রিয়ণকেন্দ্র ও গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছের অব্যবহার্য অংশ হইতে নিত্য ব্যবহারের উপযোগী বহু প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ারি হইতেছে। ইহাদের মধ্যে হাঁস-মুরগীর খাদ্য, কৃমিনার, হাঙরের শুকনো মাংস ইত্যাদি প্রধান। মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্য ফ্রেজারগঞ্জ হইতে প্রথমে নামখানার বাজারে ও পরে সেখান হইতে কাকদ্বীপ, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়।

প্রথমে ফ্রেজারগঞ্জকে একটি স্বাস্থ্যোদ্ধারকেন্দ্ররূপে তৈয়ারি করিবার পরিকল্পনা ও তদনুরূপ প্রচেষ্টা করা হয়। পরে নানা কারণে সরকার কর্তৃক এই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। বর্তমানে পুনরায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফ্রেজারগঞ্জ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। নামখানা হইতে ফ্রেজারগঞ্জ সমুদ্রতট পর্যন্ত একটি পাকা সড়ক নির্মিত হইয়াছে।

বর্তমানে ফ্রেজারগঞ্জের লোকসংখ্যা হইতেছে আনুমানিক ১০০০০।

দ্র A Mitra, *District Hand-book : 24 Parganas*, 1951, Calcutta, 1954.

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

ফ্লবেয়ার, গুস্তব (Gustave Flaubert, ১৮২১-৮০ খ্রী) একজন বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক ; ইনি এক শল্যচিকিৎসকের পুত্র। পারীতে আইন অধ্যয়নকালে তিনি তদানীন্তন রোমান্টিক লেখকগোষ্ঠীর সহিত পরিচিত হন এবং এই সময় হইতেই তিনি হিউগোর ভক্ত হইয়া ওঠেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ক্রয়াসেট (Croisset)-এ তাঁহার গ্রামের বাড়িতে বিশ্রামের জন্য গমন করেন। এই সময়ে একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবন হইতে মুক্তিলাভের জন্য তিনি লেখায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ফ্লবেয়ার সামান্য কয়েকটি স্থানে ভ্রমণ ব্যতীত তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই ক্রয়াসেট-এ অতিবাহিত করেন। ১৮৮০

খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্থানেই গুস্তব ফ্লবেয়ারের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।

ফ্লবেয়ার অন্তরে রোমান্টিক ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার রোমান্টিক ভাবপ্রবণতাকে সংযত করিয়াছেন এবং তাঁহার রচনার প্রতিটি পংক্তিকে কঠোর বস্তুনিষ্ঠার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। ফ্লবেয়ারের উদ্দেশ্য ছিল মনোবিজ্ঞানে প্রাণীবিজ্ঞানের মত সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করা এবং যে নিয়মের দ্বারা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা আবিষ্কার করা। তিনি তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিসম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকিতে চাহিতেন এবং উপন্যাসরচনার পূর্বে উপন্যাসকে বস্তুনিষ্ঠ করার জন্য আবশ্যক যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিপুল গবেষণাকার্যে লিপ্ত হইতেন। ফ্লবেয়ারের নিরপেক্ষতার দাবি সত্ত্বেও তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলিতে লেখকের গভীর নৈরাশ্যবাদ এবং বিশেষ করিয়া ফরাসী বুর্জোয়াদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শ ছিল সুকঠোর। তিনি বাস্তবতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া আঙ্গিকে নির্খুত সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে চাহিতেন। বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর সুষ্ঠু সমন্বয় করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি অপরিসীম পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার মতে বিষয়ের ভালমন্দ নাই, এমন কি, আদৌ কোনও বিষয়ই নাই, শৈলীই (স্টাইল) জগৎকে দেখার স্বয়ংসম্পূর্ণ পরম উপায়।

ছোটগল্প ছাড়া তিনি কয়েকটি উপন্যাসও রচনা করিয়াছিলেন। উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইল 'মাদাম বভারি'। ইহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক সাধারণ মেয়ের জীবনকাহিনী; মেয়েটি রোমান্টিক ভাবপ্রবণতার স্রোতে ভাসিয়া যায় এবং অবশেষে আত্মহত্যা করে। 'সালাম্বো' প্রথম পিউনিক যুদ্ধের পর কার্থেজের পুনরুজ্জীবন লইয়া রচিত উপন্যাস। ইহাতে হামিলকারের কন্যা সালাম্বো এবং 'মার্সিনারি'-দের অধিনায়ক মাটোর শোকাবহ প্রণয়কাহিনী চিত্রিত। *L' Education Sentimentale*-নামক উপন্যাসটিতে একজন ধনী যুবকের দৃষ্টি দিয়া অভিজাত সমাজের পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা রহিয়াছে।

রবেয়ার আঁতোয়ান

ফ্লীট, জন ফেইত্‌ফুল (John Faithful Fleet, ১৮৪৭-১৯১৭ খ্রী) ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ইহার জন্ম হয়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস কর্মচারীরূপে ফ্লীট ভারতে আসেন ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন স্থানে কর্মরত হন। ভারতবাসের অল্পদিনের মধ্যেই ইনি একাধিক ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় ইতিহাস ও প্রাচীন জ্যোতিষ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। কিছুদিন ইনি ভারত সরকারের অধীনে প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার কার্যের জন্য একটি বিশেষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ফ্লীট কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন লিপিগুলির আবিষ্কার, পাঠোদ্ধার ও প্রকাশ দ্বারা ভারতীয় ইতিহাসের কাল-পরম্পরা নির্ধারণে প্রভূত সহায়তা সাধিত হয়। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ভারতবিদ্যা-সংক্রান্ত সুপ্রসিদ্ধ 'ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী' পত্রিকাটি ফ্লীট কর্তৃক বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হয়। ইহাতে ভারতবিদ্যা-সংক্রান্ত বহু মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের বিভাগীয় কমিশনারের উচ্চ পদ হইতে অবসরগ্রহণ করিয়া ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯০৬ হইতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্লীট লণ্ডনস্থ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ইহার দেহান্ত হয়।

দ্র গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ফ্লেমিং, আলেক্‌জাণ্ডার (১৮৮১-১৯৫৫ খ্রী) ব্রিটিশ জীবাণুবিদ্ এবং পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা। দক্ষিণপশ্চিম স্কটল্যাণ্ডের আয়ারশায়ার কাউন্টির অন্তর্গত লশ্‌ফিল্ডে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগস্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত কাউন্টির কিলমার্নক শহরে কিলমার্নক অ্যাকাডেমিতে পাঠান্তে আলেক্‌জাণ্ডার ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সেন্ট মেরীজ হস্‌পিট্যাল মেডিক্যাল স্কুলে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। কৃতিত্বপূর্ণ শিক্ষাজীবনের পর ফ্লেমিং ইংরেজ টীকাবিশেষজ্ঞ ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক আল্‌ম্‌রথ এডওয়ার্ড রাইটের নির্দেশাধীনে গবেষণাকার্য আরম্ভ করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ফ্লেমিং ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত ব্রিটিশ সেনাদলে সামরিক চিকিৎসকরূপে যোগদান করেন। যুদ্ধশেষে ব্রিটেনে ফিরিয়া তিনি লণ্ডনের সেন্ট মেরীজ হাসপাতালে জীবাণুবিদ্যার

ফ্লেমিং, আলেক্‌জাণ্ডার

অধ্যাপনা ও গবেষণায় রত হন। টাইফয়েডের রাইট-প্রবর্তিত প্রতিষেধক টীকার প্রচলন এবং সিফিলিস রোগের চিকিৎসায় সালভারসন নামক ঔষধের প্রচলনেও তাঁহার উল্লেখ্য ভূমিকা ছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লেমিং 'হান্টেরিয়ান অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অশ্রুতে বিদ্যমান লাইসোজাইম নামক এন্‌জাইমের বীজবারক (অ্যান্টিসেপ্‌টিক) গুণাবলী আবিষ্কার করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে 'রয়্যাল কলেজ অফ সার্‌জন্‌স্'-এ 'অ্যারিস অ্যাণ্ড গেল লেক্‌চারার, পদে নিয়োগ করা হয়। ঐ বৎসর তিনি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ সম্বন্ধে গবেষণায় রত ছিলেন; সে-সময়ে আকস্মিকভাবে স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণুর আধারে পেনিসিল্লিয়ম নোতাতম্ নামক এক-প্রকার ছত্রাকের জীবাণুনাশক ক্রিয়া তাঁহার চোখে পড়ে। অতঃপর ফ্লেমিং পেনিসিল্লিয়ম নোতাতম্-এর জীবাণুবারক ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন; অচিরেই তিনি উক্ত ছত্রাক হইতে উদ্ভূত পেনিসিলিন নামক জীবাণুনাশক বা অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের 'জার্নাল অফ এক্সপেরিমেন্টাল প্যাথোলজি' নামক গবেষণা-পত্রিকায় তাঁহার পেনিসিলিন আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লেমিং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাণুবিদ্যার অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। কিছুকাল পরে হাওয়ার্ড ফ্লোরি এবং আর্নস্ট বোরিস চেইন নামক দুইজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পেনিসিলিন উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইলে রোগনিরাময়ে পেনিসিলিনের প্রয়োগ সহজসাধ্য হয়। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে রোগনিরাময়ে পেনিসিলিনের গুরুত্ব বিশ্বে স্বীকৃতিলাভ করে।

যুগান্তকারী গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লেমিংকে ইংল্যাণ্ডের 'রয়্যাল সোসাইটি'র 'ফেলো' নির্বাচিত করা হয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'নাইট' উপাধি ও জন স্কট পদক লাভ করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লেমিং, ফ্লোরি ও চেইনকে একত্রে চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁহাদের অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদানে সম্মানিত করা হয়।

ফ্লেমিং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মার্চ লণ্ডনে হৃদ্‌রোগে পরলোকগমন করেন।

দেবজ্যোতি দাশ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	কলম	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	২	৩৮	রাজপ্রসাদ	রাজপ্রাসাদ
২৫	২	৫	বাসুপ্ত	বা সুপ্ত
২৯	১	১	কিন্তু ২, ৩, ৫২৫	কিন্তু ২, ৩, ৫, ২৫
			এবং ৫০ পয়সা	এবং ৫০ পয়সা
৩৪	২	১০	ইহার স্থানটির	ইহার
৬৭	১	৩১	কলংক	কলঙ্ক
৬৮	২	১৮	উদ্ভুত	উদ্ভূত
৮১	২	১৩	নির্মিত	নির্মিত
৮৮	২	২৮	ঊপাচার্য	উপাচার্য
৯৯	১	৩৮	দেলত কাজী	দৌলত কাজী
১০১	২	২৫	মাকুইস্	মার্কুইস
১০৯	১	৫	আইন-জীবি	আইন-জীবী
১০৯	২	৩৪	খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত	খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত
১১৭	১	৩৪	উচ্চযোগরূপী	উপযোগরূপী
১৩৭	১	২৩	ঘরাণার	ঘরানার
১৫১	২	৪১	অকৃতিতে	আকৃতিতে
১৫৪	১	১১	অদাত্ম্য	তাদাত্ম্য
১৫৮	২	৩১	চিন্তামণি-দাধিতির	চিন্তামণি-দীধিতির
১৭৪	১	১	নেপানগরের	নেপানগরে
১৭৪	২	৩২	কৃষ্ণের মন্দিরদ্বয়	কৃষ্ণের মন্দির
১৭৪	২	৩৫	অঞ্চলদ্বয়	অঞ্চল
১৭৫	১	২৬	নগর	নাগর
১৮৯	২	১০	ধূর্ত	ধূর্ত
১৮৯	২	১২	এষং	এবং
১৯১	২	২৯	সৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী	সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
১৯৯	২	৩৮	২৯°৩৮	২৯°৩৮′
২০১	২	৪০	বেল্লর	বেল্লুর
২০৪	২	১	ডপ	গ্রুপ
২০৬	২	১১	মুখোপাব্যায়	মুখোপাধ্যায়
২১১	১	৪১	ইয়লো	ইয়োলা
২২৬	১	২৮	বেদ্বিদের	বেদবিদের
২২৭	২	৮	ভগবত্তা	ভগবত্তা
২৩১	১	৪	অনন্তচিন্ত্য	অনন্তাচিন্ত্য

পৃষ্ঠা	কলম	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩২	১	১৮	ভগবদ্‌নুগ্রহই	ভগবদনুগ্রহই
২৫২	২	৩৭-৩৮	৮০°১৫′ হইতে ৮৮°১৫′ উত্তর ও ২৬°২০′ হইতে ৩০°১০′ পূর্ব	২৬°২০′ হইতে ৩০°১০′ উত্তর ও ৮০°১৫′ হইতে ৮৮°১৫′ পূর্ব
২৫৮	২	১২	গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ	গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ উত্তাপ
২৬২	২	২	ব্যবহারজীবী	ব্যবহারজীবী ও
২৬২	২	৩৫	সব-দলীয়	সর্বদলীয়
২৬৩	২	২৪	Inperial	Imperial
২৬৯	১	১২	জাজমেণ্ট	জাজ্‌মেণ্ট
২৬৯	১	৪০	বেগ	বেন
২৬৯	২	১৬-১৭	Indentity	Identity
২৭১	১	২১	নৈর্বাক্তিকরূপী	নৈর্ব্যক্তিকরূপী
২৭১	২	২৮-২৯	শব্দের ন্যায়শাস্ত্র	শব্দের অর্থ ন্যায়শাস্ত্র
২৭২	২	৬	প্রতক্ষীভূত	প্রত্যক্ষীভূত
২৭৭	২	৪০	পরিপ্রেক্ষিতে	পরিপ্রেক্ষিত
২৭৯	১	২৯	(২৫ শতাংশ)	(২৫ শতাংশ)।
২৮০	১	৯	হয়	হয় ঃ
২৮৫	১	২১	বিষ্ঠিকরণ	বিষ্টিকরণ
২৮৯	২	১৪	আর্টেজীও	আর্টেজীয়
২৯৩	২	৩৫	রাধামেহেন	রাধামোহন
২৯৫	২	১৭-১৮	তড়িৎবিজ্ঞানে	তড়িৎবিজ্ঞান
২৯৬	১	৪	ইথারের	ঈথারের
৩০৩	১	২০	সাবয়র	সাবয়ব
৩০৩	২	২৭	ভট্টাচার্ষ	ভট্টাচার্য
৩১২	১	৩	ভট্টাচার্ষ	ভট্টাচার্য
৩২০	১	৪০	কোম্পানীর	কোম্পানির
৩২০	২	৬	সুযোগসুবিধা	সুযোগসুবিধা
৩২৯	১	৬	৫′৩৮	৫·৩৮
৩২৯	১	৪১	বৌদ্ধধর্ম	বৌদ্ধধর্ম
৩৩৩	১	৪	দঙ্গিণ	দক্ষিণ
৩৩৩	১	১০	পাশ্ববর্তী	পার্শ্ববর্তী
৩৪৬	১	৩৯	১৮১০.১৫	১৮১০—১৫
৩৪৭	২	১৪	Encylopaedia	Encyclopaedia
৩৫৭	১	৩	ধূসর	ধূসর
৩৫৭	১	২৭	মৃৎভাণ্ড	মৃদ্‌ভাণ্ড
৩৫৮	১	১০	চিবির	ঢিবির

পৃষ্ঠা	কলম	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫৮	১	৩৩	প্রমাণ-দৃষ্টে মনে হয় কাল এইগুলির নির্মাণকাল...	প্রমাণ-দৃষ্টে মনে হয় এইগুলির নির্মাণকাল
৩৬০	২	১১	অম্বালা	আম্বালা
৩৬৬	২	১৫	কার্যকরিতা	কার্যকারিতা
৩৬৬	২	২০	সেণ্টিফিউগাল	সেণ্ট্রিফিউগাল
৩৭৪	১	১৮	সাহয্যে	সাহায্যে
৩৭৪	২	৩৬	একধিকবার	একাধিকবার
৩৮৭	১	৩০	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ
৩৯০	১	১৫	অরুণচন্দ্র বসু	অরুণকুমার বসু
৩৯০	১	১৬	১৭৮২-১৯৩৬	১৮৭২-১৯৩৬
৩৯০	১	৩৭	চুক্তির	মুক্তির
৩৯২	২	১২	করাইয়াছেন	করাইয়াছে
৩৯২	২	২৫	ষ্ষ্ঠীতলা	ষষ্ঠীতলা
৩৯৬	১	২৭	উল্লেযোগ্য	উল্লেখযোগ্য
৩৯৮	২	৪০	উপপরাণের	উপপুরাণের
৩৯৯	১	১	বিররণ	বিবরণ
৩৯৯	১	৩১	আধুনিক	আধুনিক
৪০৩	২	৯	করিল	করিলেন
৪১৫	১	৩৪	মির্তাসিঙ্গ	মির্তাসিঙ্গ
৪১৫	২	২৯	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ
৪১৬	১	২৩	পীষষ সাহা	পীযূষ সাহা
৪১৯	১	১	অবিস্মবণীয়	অবিস্মরণীয়
৪১৯	১	২৪	বীরদের	বীরদেব
৪২১	১	৩৭	ঘূণির	ঘূর্ণির
৪২৩	২	১০	ষায়	যায়
৪২৪	১	২২	পেলো-প্রতিযোগিতা	পোলো-প্রতিযোগিতা
৪২৬	১	২৮	ব্রহ্মণের	ব্রাহ্মণের
৪২৭	২	৩৮	কোম্পানীর	কোম্পানির
৪২৭	২	৩৯	লাইব্রেরী	লাইব্রেরি
৪২৯	২	৪০	পদ্ধতিতি	পদ্ধতিতে
৪৩৬	২	১৬	নানবিধ	নানাবিধ
৪৩৮	১	১৮	রাজপরিররারে	রাজপরিবারে
৪৩৯	২	৩৯	ষোগদান	যোগদান
৪৪৫	২	৩৯	পরিচয়	পরিচায়ক
৪৫০	৯	৩৯		সীতানাথ গোস্বামী
৪৫২	১	৩২	জম্বু	জম্মু

পৃষ্ঠা	কলম	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৫৬	১	১	হিরণকশিপু	হিরণ্যকশিপু
৪৬৬	২	৩২	পুলিনবিহারা	পুলিনবিহারী
৪৬৮	১	১১	প্রধ	প্রধং
৪৭০	১	৯	তুলার	তুলার
৪৭১	১	১	ইস্টার্ন	ঈস্টার্ন
৪৭১	১	১০	ইস্টার্ন	ঈস্টার্ন
৪৭৮	১	২২	কনিরা	কর্নিয়া
৪৭৮	২	২৬	অপসরণ	অপসারণ
৪৮০	১	৫	মিলিমিটার	মিলিলিটার
৪৮৭	১	১৪	বাণিজ্য	বাণিজ্যিক
৪৮৯	১	৭	প্রথমা	প্রথমার্ধে
৪৯০	১	৮	riploid	triploid
৪৯৪	২	২৪	ইন টু দ্য ট	ইন্‌টু দ্য ট্রু
৫০৭	২	৩২	ফ্রাস	ফ্রাঁস

তৃতীয় খণ্ডের কয়েকটি ভ্রম সংশোধন

৫৫	১	১৬	ঋণশোধ-শারদোৎসব অভিনয়ে (১৯২২) সম্রাট বিজয়াদিত্যের ভূমিকায়	শারদোৎসব অভিনয়ে (১৯২২) 'ভূমিকা'ংশে রাজার ভূমিকায়
৬৭০	২	৩৮	দারুকেশ্বর দ্র	দ্বারকেশ্বর দ্র

ভারতকোষ পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। সুতরাং পরিশিষ্ট পঞ্চম খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইবে। ঘনীভবন, চিদম্বরম, চুম্বকবিদ্যা, তদন্তকার্য, তরঙ্গতত্ত্ব, ত্বরণযন্ত্র, দলীপ-সিংজী, ধর্মপাল (বৌদ্ধধর্ম) ও নৃপেন্দ্রনাথ সরকার প্রসঙ্গগুলি পরিশিষ্টে স্থান পাইবে।

তৃতীয় খণ্ডে টি. এন. টি প্রসঙ্গে 'বিস্ফোরণ দ্র' স্থানে 'বিস্ফোরক দ্র' হইবে।

তৃতীয় খণ্ডের লেখক বিবরণে ভ্রমক্রমে 'জেটপ্লেন' প্রবন্ধের লেখক হিসাবে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 'জেটপ্লেন' প্রবন্ধের লেখক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক।